ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

ঊনত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ় ১৩৪৮—অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

আষাঢ়—১৩৪৮

বিশেষ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৪৮

বিশেষ চিত্র

১। পুরীধামে রথযাত্রা

২। দিল্লী শহরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী—দিল্লী বাঙ্গালী ক্লাবের উদ্যোগে ক্যাপিটাল সিনেমায় নৃত্য

৩। ৮ বৎসর সাইকেল ভ্রমণের পর কলিকাতায় প্রত্যাগত পার্শী ভ্রমণকারীদের সম্বর্দ্ধনা

৪। হাওড়া ষ্টেশনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকরের সম্বর্দ্ধনা

৫। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে দেশবন্ধু স্মৃতিসভায় সমবেত জনতা

৬। বরিশাল ভোলায় ঝড়ের পর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল মুসলেম ছাত্রাবাসের দৃশ্য

৭। ঝড়ের পর নোয়াখালি শহরে ভুলুয়ার জমিদারদের সদর কাছারীর অবস্থা

বহুবর্ণ চিত্র

১। বুদ্ধ ও জরা   ২। অবসর

৩। পাশা খেলা

ভাদ্র—১৩৪৮

বিশেষ চিত্র

১। আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়—গত ২রা আগষ্ট তাঁহার জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে

২। সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ (শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্ম্মিত মর্ম্মর মূর্ত্তি)

৩। বোম্বায়ে বন্যার পর—ডোমবিভলি ও কল্যাণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেলওয়ে কোয়ার্টার্স।

৪। বোম্বায়ের শহরতলী ডিভাতে বন্যার পর নৌকাযোগে নিরাশ্রয়দিগকে অনুসন্ধান

৫। রাজসাহীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে কলিকাতার নেতৃবৃন্দ—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, নলিনীরঞ্জন সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি

৬। ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজি সন্দর্শনে নেতৃবৃন্দ—বামে খান বাহাদুর

বহুবর্ণ চিত্র

আশ্বিন—১৩৪৮

বিশেষ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক—১৩৪৮

বিশেষ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৪৮

বিশেষ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র





ভারতবর্ষ



আষাঢ়—১৩৪৮

প্রথম খণ্ড	ঊনত্রিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

বৈদিক-প্রসঙ্গ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ

বেদ চারিটি। ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। বেদের অপর নাম শ্রুতি। প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মহর্ষি আপস্তম্ব বেদের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং"—অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলিরই নাম বেদ। বেদের মন্ত্র নামক অংশের অপর নাম সংহিতা। এই অংশ প্রায়ই দেবতার স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ-অংশে যজ্ঞ করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-অংশের শেষভাগ আরণ্যক নামে পরিচিত ঋষিগণ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অরণ্যে গমন করিয়া যে সকল জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতেন আরণ্যকে সেই সকল জ্ঞানের কথা আছে। আরণ্যকের শেষ ভাগের নাম উপনিষদ। উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষভাগ বলিয়া ইহার নাম বেদান্ত।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের মতে মন্ত্র বা সংহিতা-অংশই বেদ—ব্রাহ্মণ-অংশ বেদ নহে। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দের এই মত কোনও প্রাচীন আচার্যের মতের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। মহর্ষি আপস্তম্বের মত আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। মহর্ষি বাদরায়ণ বা বেদব্যাস, শঙ্কর, রামানুজ, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি সকল প্রাচীন পণ্ডিতই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বেদ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-অংশে বর্ণিত যজ্ঞ করিবার প্রণালী যে মনুষ্য-কল্পিত নহে, এই প্রণালীও যে বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় ঋষিগণ 'দর্শন' করিয়াছিলেন এবং ইহা যে অভ্রান্ত তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্

—মুণ্ডক উপনিষদ

"মন্ত্রের মধ্যে ঋষিগণ যে কর্ম (যজ্ঞ) দর্শন করিয়াছিলেন তাহা সত্য।"

বেদ অপৌরুষেয়। ইহা কোনও মনুষ্যের রচিত নহে। সকল মনুষ্যরচিত গ্রন্থে ভ্রম ও প্রমাদের সম্ভাবনা আছে।

ঈশ্বরের কখনও ভ্রম হইতে পারে না। বেদ ঈশ্বরের রচিত অথবা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রচারিত। এজন্য বেদে ভ্রম ও প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। প্রলয়ের শেষে যখন ঈশ্বরের জগৎ রচনা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তখন তিনি প্রথমে চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদসকল প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

"যে ঈশ্বর পূর্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার নিকট বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

বেদে যেরূপ জগতের বর্ণনা আছে ব্রহ্মা তদ্রূপ জগৎ সৃষ্টি করিযাছিলেন। প্রলয়ের পূর্বে সৃষ্টি ছিল, সেই সৃষ্টিতে যেরূপ সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র মনুষ্য পশু পক্ষী ছিল, বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও সেইরূপ সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় যে বেদমন্ত্র বলা হয় তাহাতে ইহার উল্লেখ আছে—"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূবম্ অকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরীক্ষঞ্চ অথস্বঃ" অর্থাৎ—ব্রহ্মা পূর্বসৃষ্টির অনুরূপ সূর্য, চন্দ্র, স্বর্গ, আকাশ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। সৃষ্টির অর্থই বৈষম্য। কেহ মনুষ্য কেহ পশু হইল, কেহ সুখী কেহ দুঃখী হইল—পূর্ব সৃষ্টিতে যে যেরূপ কর্ম করিয়াছিল, বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভে সে সেইরূপ দেহপ্রাপ্ত হইল। পূর্বকৃত কর্ম অনুসারেই ঈশ্বর জীবকে বিভিন্ন দেহ প্রদান করেন। তিনি অকারণ কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী করেন না।

খৃস্টান ধর্ম, মুসলমান ধর্মেও সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা আছে। কিন্তু এই সৃষ্টির পূর্বেও যে সৃষ্টি ছিল, প্রলয়ের পরেও যে সৃষ্টি হইবে ইহা অন্য ধর্মে নাই, হিন্দু ধর্মেই আছে। হিন্দু ধর্মেই পূর্ণ সত্য আছে।

ব্রহ্মা ঈশ্বরের নিকট যে বেদ লাভ করিলেন তাহা ঋষিদের দ্বারা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। ঋষিগণ তপস্যা করিয়া বেদের বিভিন্ন অংশ লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য বেদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ঋষির নামে পরিচিত। এই সকল ঋষি বেদ রচনা করেন নাই, 'দর্শন' করিয়াছিলেন। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।"

বেদ যে অনাদি তাহা বেদে উক্ত হইয়াছে "বাচা বিরূপ-নিত্যয়া" (ঋগ্বেদ, ৮-৭৫-৬) অর্থাৎ—বেদের শব্দসকল বিবিধ রূপযুক্ত এবং নিত্য। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ববেদঃ" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্) অর্থাৎ—ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিটি বেদ এই মহাভূতের (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাসের ন্যায়! মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে বেদের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া এই সূত্র রচনা করিয়াছেন "অত এব চ নিত্যত্বং" (ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।২৯)।

বেদের অর্থ গ্রহণ করা অতিশয় দুরূহ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে তাহার পর বেদের অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। শিক্ষা অর্থাৎ—উচ্চারণ করিবার প্রণালী। কল্প অর্থাৎ—যজ্ঞ করিবার প্রণালী। ব্যাকরণ অর্থাৎ—শব্দের উৎপত্তি। নিরুক্ত অর্থাৎ—শব্দের অর্থ। ছন্দঃ অর্থাৎ—অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে বেদবাক্য সজ্জিত করা। জ্যোতিষ অর্থাৎ—গ্রহনক্ষত্রদের সংস্থান। এই ছয়টি বিদ্যাকে বেদের ষড়ঙ্গ বলা হয়। ব্রাহ্মণ বালকগণ অষ্টম বর্ষ বয়সে উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুগৃহে দীর্ঘকাল বাস করিয়া এই সকল বিদ্যার সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতেন এবং বেদের অর্থ অবগত হইতে পারিতেন। কিন্তু এই ভাবেও অনেক সময় বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। তাহার জন্য তপস্যা প্রয়োজন। ঋষিগণ এই ভাবে তপস্যা করিয়া বেদের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমাজের কল্যাণের জন্য বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রচার করা প্রয়োজন ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে যাহাতে সহজে বেদের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে এজন্য তাঁহারা কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের সাধারণ নাম 'স্মৃতি'। ঋষিগণ বেদের অর্থ 'স্মরণ' করিয়া এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এজন্য ইহাদের নাম হইয়াছে 'স্মৃতি'। স্মৃতি গ্রন্থগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র। রামায়ণ ও মহাভারতের নাম 'ইতিহাস'। অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ প্রসিদ্ধ। মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম ধর্মশাস্ত্র। এই সকল স্মৃতি গ্রন্থে যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে অনেক স্থলেই তাহার সমর্থক বেদবাক্য পাওয়া যায়; কিন্তু কোন কোনও স্থলে

তাহা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ বেদের অনেক অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! পাণিনি মহাভাষ্যে বেদের সহস্রাধিক শাখার বা অংশের উল্লেখ আছে। এক্ষণে মাত্র কয়েকটি শাখা পাওয়া যায়। বেদের কয়েক অংশ যে লুপ্ত হইবে তাহা ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য সেই সকল অংশের সারভাগ ঋষিগণ তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্মৃতিগ্রন্থের সাহায্যে যে বেদার্থ বুঝিতে হইবে ইহা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে।

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদঃ মাময়ং প্রহরেদিতি ॥

—মহাভারত, ১।১।২৬

অর্থাৎ—ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারত) এবং পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যাহার বিদ্যা অল্প বেদ তাহাকে ভয় করেন যে ঐ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে। (অর্থাৎ—আমার দুর্ব্যাখ্যা করিবে)।

বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞের কথা আছে, উপনিষদে জ্ঞানের কথা আছে, পুরাণে ভক্তির কথা আছে, অবতারের কথা আছে, এই সকল কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত উপনিষদের বিরোধ আছে, উপনিষদের সহিত পুরাণের বিরোধ আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই সকল মত বিচারসহ নহে। উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা থাকিলেও ইহা বলা হয় নাই যে, যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয় না বা যজ্ঞ করা উচিত নহে। প্রত্যুত উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে গমন করা যায়; কিন্তু যেহেতু স্বর্গে চিরকাল বাস করা যায় না, পুণ্য ফুরাইলেই পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, অতএব যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ব্রহ্মকে জানিয়া মুক্তিলাভ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মুক্তিলাভের পক্ষেও যজ্ঞের উপযোগিতা আছে। কারণ, নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। সুতরাং বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত উপনিষদের কোনও বিরোধ নাই। উপনিষদে যদিও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। জীব উত্তম কর্মের ফলে দেবত্ব লাভ করে এবং ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির সাহায্যে জগৎ পরিচালনা কার্যে সহায়তা করে। উপনিষদে জ্ঞানের কথা আছে বটে, কিন্তু ভক্তির কথা উপাসনার কথাও আছে। উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং ॥

—মুণ্ডকোপনিষদ

অর্থাৎ—ঈশ্বরকে বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা লাভ করা যায় না। ঈশ্বর যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তাঁহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহা ভক্তির কথা, সুতরাং উপনিষদে ভক্তির কথা নাই– ইহা যথার্থ নহে। কেনোপনিষদে দেখা যায়, পরব্রহ্ম একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। সুতরাং ভগবানের অবতারের কল্পনা উপনিষদের বিরোধী নহে।

বেদ বলিয়াছেন "পিতৃদেবো ভব" (—তৈত্তিরীয় উপনিষদ) অর্থাৎ—পিতাকে দেবতার ন্যায় উপাসনা করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্যপালনার্থ বনবাস-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি এই বৈদিক উপদেশ আপামরজনসাধারণের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। বেদ বলিয়াছেন, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" মহাভারতে ভিক্ষুক পাণ্ডবদের নিকট প্রবলপরাক্রান্ত কৌরবদের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস এই বৈদিক সত্য উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এইভাবে পুরাণ সকলেও বৈদিক তত্ত্বসকল প্রচারিত হইয়াছে।

মনুসংহিতার ব্যবস্থাগুলি বেদ সমর্থন করিয়াছেন। "যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদতৎভেষজং" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক) অর্থাৎ—মনু যাহা-কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায়। ঔষধ যেমন অনেক সময় বিস্বাদ হয়, চিকিৎসকের ব্যবস্থা যেমন অনেক সময় কষ্টকর হয়, সেইরূপ মনুর ব্যবস্থাও অনেক সময় কষ্টকর। কিন্তু সেজন্য মনুর ব্যবস্থার নিন্দা করা উচিত নহে। বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন ঔষধ প্রদান করেন, সেইরূপ মনুও বিভিন্ন রকম রোগীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষপাতের পরিচায়ক নহে। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে,

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মোমনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

অর্থাৎ—মনু যাহার জন্য যে ব্যবস্থা দিয়াছেন সে সকলই বেদে বলা হইয়াছে, কারণ মনু সর্বজ্ঞানময়। ভারতের কোনও প্রাচীন পণ্ডিত এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই।

মনুসংহিতার ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা বেদানুযায়ী। সুতরাং এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। কোনও কোনও স্থলে বিরোধ আছে বলিয়া আপাতত মনে হইতে পারে, কিন্তু বিচার করিলে সেই সকল বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ একটি ধর্মই প্রতিপাদন করিতেছে। তাহা বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। এক্ষণে তাহা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত।

এক্ষণে আমরা বৈদিকধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি বিভিন্ন আচার্যের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ নাই আমরা প্রথমে সেই সকল বিষয়গুলিই উল্লেখ করিব।

বেদ বলিয়াছেন, এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। জীব পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। পুণ্যের ফল সুখ। পাপের ফল দুঃখ। কোনও কর্মের ফল আমরা ইহজন্মে ভোগ করি, কোনও কর্মের ফল মৃত্যুর পর স্বর্গে বা নরকে ভোগ করি। স্বর্গ ও নরকে চিরকাল বাস করিতে হয় না। পুণ্য ফুরাইলে স্বর্গবাস শেষ হয়, পাপ ফুরাইলে নরকবাস শেষ হয়। তখন আবার পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য বা পশুপক্ষী হইয়া জন্মাইতে হয়।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেই কিছু পরিমাণে দুঃখভোগ অনিবার্য। সুতরাং চিরকালতরে সকল দুঃখের নিবৃত্তি করিতে হইলে পুনর্জন্ম নিবারণ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরকে জানিলে পুনর্জন্ম নিবারণ করা যায়। পুনর্জন্ম নিবারণের অন্য উপায় নাই।

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি।
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।"

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

"একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। মোক্ষ লাভ করিবার অন্য উপায় নাই।"

বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না—ঈশ্বর যাঁহাকে কৃপা করেন তিনিই ঈশ্বরকে জানিতে পারেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং॥

—মুণ্ডক উপনিষদ

"ঈশ্বরকে উৎকৃষ্ট বাক্য দ্বারা লাভ করা যায় না, বুদ্ধির দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা লাভ করা যায় না। ঈশ্বর যাঁহাকে বরণ করেন তিনিই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট ঈশ্বর নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

যে সাধক সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করে সে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

"প্রতিবোধ বিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে।"

—কেনোপনিষদ

অর্থাৎ প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহাকে মনে রাখিলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

আমাদের হৃদয়ে কামক্রোধ প্রভৃতি মলিনতা আছে বলিয়া আমরা ঈশ্বরের কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের চিন্তায় নিমগ্ন হই। শাস্ত্রবিহিতকর্ম অনাসক্ত ও নিষ্কামভাবে করিলে আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সর্বদা ঈশ্বরকে চিন্তা করা সম্ভব হয়। এজন্য ঈশ্বর-লাভের পক্ষে কর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন—

তমেব ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা
অনাশকেন।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ

অর্থাৎ—অনাসক্তভাবে যজ্ঞ দান ও তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সেই ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্ উত্তমং॥

—গীতা, ১৮।৫।৬

অর্থাৎ—যজ্ঞ দান ও তপস্যা এই সকল কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়, এই সকল কর্ম চিত্ত শুদ্ধ করে, আসক্তি ও ফলাকাংখা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম করা উচিত—ইহাই আমার নিশ্চিত মত।

বলা বাহুল্য, শাস্ত্রবিহিত যে কর্মে যাহার অধিকার আছে তাহার সেই কর্ম করা বিধেয়। যে কর্মে অধিকার নাই সে কর্ম করা উচিত নয়। এই বিষয়ে বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়মসকল পালনীয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন বর্ণের জন্য যে সকল নিয়ম উল্লেখ করা হইয়াছে সে সকল বেদানুযায়ী। এইজন্য রামানুজ তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপসংহারে মোক্ষলাভের উপায় সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

এবং অহরহরনুষ্ঠীয় মানব-বর্ণাশ্রমধর্মানুগৃহীত—তদুপাসন-রূপ-তৎসমারাধনপ্রীত উপাসীনান্ অনাদিকালপ্রবৃত্ত—অনন্ত-দুস্তর-কর্মসঞ্চয়রূপ-অবিদ্যাং বিনিবর্ত্ত্য স্বযাথাত্ম্য-অনুভবরূপ-অনবধিক-অতিশয়-আনন্দং প্রাপয্য পুনর্নআবর্ত্তয়তি। অর্থাৎ—বর্ণাশ্রমধর্ম অনুসারে কর্ম করিয়া সেই কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে উপাসনা করিলে তিনি প্রীত হন। তাহার ফলে বহুকালকৃত অনেক দুষ্কর্মের ফলরূপ অজ্ঞান নাশ করেন। তখন জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করে। আর পুনর্জন্ম হয় না।

এক্ষণে শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যদের কোন্ বিষয়ে মতভেদ তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইবে। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম নিগুর্ণ। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণের পারাবার। শঙ্কর বলেন, জীবের স্বরূপ যাহা ব্রহ্মও তাহা। রামানুজ বলেন, জীবের স্বরূপ ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মের দেহের ন্যায়। বিভিন্ন আচার্যদের মধ্যে এই প্রকার মতভেদ থাকিলেও অনেক প্রধান বিষয়ে তাঁহারা যে একমত, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

প্রিয়া-শোক

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ভালবাস প্রিয়জনে এটা কভু নয় বড় কথা,
হারাইয়া প্রিয়জনে মর্ম্মে তুমি পাইয়াছ ব্যথা
নিশ্চয়ই তা শোকাবহ, কিন্তু তাহা কহিবে কাহারে ?
কে সহিবে বাড়াবাড়ি ? কত ভালবাসিতে তাহারে
সেই কথা জনে জনে জানাবার কিবা প্রয়োজন ?
সাহিত্যে তাহারে ঠাঁই দিবে না ক কোন সুধীজন ;
নগণ্য মানুষ তুমি। ভালবাসে যদি রাজেশ্বরে।
কখনো কারেও ভালোবাসেনিক যেবা ক্ষণতরে,
যার ভালবাসা লাগি করিয়াছে অসাধ্য সাধন
শত শত নরনারী, হারায়েছে শত শত জন
যাহার আদেশে প্রাণ, সে যদি কারেও ভালবাসে
তবে তাহা ঠাঁই পায় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে।
তাহা ত সামান্য নয়। যার কাছে সকলি সুলভ
কোন ধন হারায়নি যা চেয়েছে পেয়েছে তা সব,
এ বিশ্বের সর্ব্বকাম্য যার গৃহে আছিল সঞ্চিত,
বিধাতাও পারেনিক কোন ধনে করিতে বঞ্চিত,
সে যদি হারায় তার হৃদয়ের আদরের ধন,
তাহা ত নগণ্য নয় তব তুচ্ছ ব্যথার মতন,
তার শোক রুদ্ধ যদি নাহি রয় সংযমের বাঁধে,
যে কখনো কাঁদেনিক, হারায়ে তা সেও যদি কাঁদে,
তবে তাহা তুচ্ছ নয়। ইতিহাস অশ্রুর অক্ষরে
অক্ষয় করিয়া রাখে তবে তারে দাগিয়া প্রস্তরে।
মর্ম্মর সৌধের রূপে রাজগর্ব্বে মিশি অশ্রু তার
অপূর্ব্ব ঘোষণাপত্রে বিশ্বময় করে সে প্রচার,—
"অশ্রুপাত কর সবে।" কাঁদিয়াছে মর্ম্মর প্রস্তর
কেঁদেছে কালিন্দী নদী, মহাকাল, কেঁদেছে ভাস্কর,
কাঁদিয়াছে কত শিল্পী, লক্ষ লক্ষ কেঁদেছে শ্রমিক
কেঁদেছে ছেদনী যন্ত্র, প্রজাবৃন্দ, মুকুতা মাণিক।
কাঁদ যুগ যুগ ধরি রাজশোকে বিশ্বজন যত,
জানে না যে এই বার্ত্তা এ সংসারে সেই ভাগ্যহত।
মর্ম্মরে মণ্ডিত শোক, এর মর্ম্ম বুঝে না যে জন
সভ্যতা সংস্কৃতি হ'তে দূর তার শতেক যোজন।
না কাঁদিলে তাই দেখে নহ তুমি যথার্থই কবি
মহিমা না গাহ যদি ছন্দোবদ্ধ ব্যর্থ তব সবি।

কলঙ্কিনীর খাল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মধ্যাহ্নে অমিয় সারকেলের মেয়ে বাব্‌লি একটা জোরালো সংবাদ লইয়া হাজির হইল। টিয়া তখন নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল, আর অপরের নিকট হইতে তাহা গোপনের জন্য দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া একখানি কার্পেটের আসন বুনিতেছিল।

বাব্‌লি জানাইল, আজ নবদুর্গার সরোজবাবু এসেচেন। দুর্গাকে কাল নাকি নিয়ে যাবেন। একবার ওর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি চ', কাল ভোরেই হয় তো চ'লে যাবে। আর সেদিনের বিয়ের সময় ভিড়ের মধ্যে তেমন আলাপ করা তো হয়নি, এবার করা যাবে'খন। রাখ্ তোর আসন বোনা এখন।

টিয়া কার্পেট, সূঁচ ও পশম পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিল—বলিস্ কি বাব্‌লি, দুর্গা যে সাতদিনও এসে এখানে রইলো না, আর এরই মধ্যে নিয়ে যাবে কিরকম?

বাব্‌লি তাড়াতাড়ি বলিল—উঠে চল্ না, সরোজবাবুকে দু'কথা তাই নিয়ে শুনিয়ে দেওয়া যাবে বেশ।

টিয়া বলিল, না ভাই, দুর্গা চ'লে যাবে এরই মধ্যে—আমার যেন ভাল লাগচে না।

বাব্‌লি তখন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তা ভাল না লাগে সরোজবাবুকে ব'লে দু'দিন এখানে আট্‌কে রাখিস্। উঠে আয় এখন শীগ্‌গির।'

টিয়া তবু ভাবিতে পারিতেছিল না। ছোটমা রূপসীর নিকট হইতে অনুমতি লওয়া প্রয়োজন কি-না সেই কথাই সে ভাবিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত অনুমতি না লইয়াই বাব্‌লির সঙ্গে সে নবদুর্গাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে উভয়ের মধ্যে তখন বিশেষ কোন কথা হইল না। নবদুর্গাদের বাড়ীর উঠানে আসিয়াই তাহারা দেখিল, নবদুর্গা ঘোম্‌টা টানিয়া ত্রস্ত অথচ সলজ্জপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়াছে। বাব্‌লি তাড়াতাড়ি একপ্রকার ছুটিয়া গিয়া নবদুর্গাকে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। টিয়াও প্রায় বাব্‌লির পিছু পিছু আসিয়াছিল, সেও নবদুর্গার বড় করিয়া টানিয়া দেওয়া ঘোম্‌টা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

নবদুর্গা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আঙুল তুলিয়া তাহাদের পশ্চিমের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া চাপা মৃদুকণ্ঠে বলিল, এই—এখানে আর টানাটানি করিস্ না মাইরি—ঐ ওঘরে ব'সে আছেন, এখুনি দেখে ফেলবেন।

বাব্‌লি নবদুর্গার কথা শুনিয়া ব্যঙ্গ-বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে, তোর আবার এত লাজ-লজ্জা হ'লো কবে থেকে?

টিয়া বলিল—আমরা যে আলাপ করতে এলাম; কই, আলাপ করিয়ে দিবি চ'।

—না, ধ্যেৎ!—বলিয়া নবদুর্গা বাব্‌লির হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। তাহাতে ফল ভাল ফলিল না, টিয়াও তাহার কাপড়ের একাংশ চাপিয়া ধরিল।

বাব্‌লি বলিল, আজ আর ছাড়াছুড়ি নেই। আমাদের সাম্‌নে সরোজবাবুর সঙ্গে তুই কথা বল্‌বি—আমরা শুনবো।

টিয়া বলিল, হুঁ ভাই, সেটি কিন্তু হওয়াই চাই।

—বেশ, হবে। এখন কাপড় ছাড়্।—বলিয়া নবদুর্গা উভয়ের হাত দুই হাত দিয়া ধরিল। তাহারা কাপড় ছাড়িয়া দিলে নবদুর্গা তাহাদের ডাকিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। রান্নাঘরে আজ তাহাদের বিরাট ঘটা হইয়া গেছে, নবদুর্গার মা সেখানে তখনও কাজে ব্যস্ত ছিল এবং একমাত্র তাহারই আহারাদি তখনও বাকী ছিল।

নবদুর্গাকে বাব্‌লি ও টিয়ার সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নবদুর্গার মা বলিলেন, কেমনধারা মেয়ে বাপু তুই দুর্গা, একবার দেখাটি পর্য্যন্ত দিয়ে এলি না?

নবদুর্গা মায়ের কথায় মহা বিব্রত হইয়া বলিল, তোমার যেমন কথা মা, আমি যাবো ঐ একঘর লোকের মাঝে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে! আর বাবার সঙ্গেই তো ব'সে কথা কইচে, সেখানে কি যাওয়া যায় নাকি কখনও?

নবদুর্গার মা বলিলেন, আর কর্ত্তারও বলি বাপু, বুদ্ধি-

শুদ্ধি যদি ওঁর একটুও থাকে। সমস্ত সকাল দুপুরে যদি জামাইকে একটু রেহাই দিলে। বেচারা হয় তো এতক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেচে। জামাই আমার নেহাত ছেলেমানুষ—তার সঙ্গে অত কি বুড়ো বুড়ো কথারে বাপু সারা সকাল-দুপুর!

নবদুর্গা বিশেষ লজ্জায় পড়িয়া গিয়া বলিল—হয়েচে, তুমি এখন থামো তো মা।

বাব্‌লি তৎক্ষণাৎ বলিল, কেন, মাসিমা তো ঠিকই বলেচেন।

নবদুর্গার মা বলিলেন, মানুষের একটু বিবেচনা থাকা তো উচিত। কর্ত্তার যেন সে সব কিছু বলতে কিছু নেই। যা না বাব্‌লি, জামাইকে ডাক দিয়ে তুলে নিয়ে আয় দক্ষিণের ঘরে—আমার নাম ক'রেই তুলে নিয়ে আয়, ডাকচি ব'লে। কর্ত্তা যখন গল্প জুড়েচেন তখন ঘুমও তো ওখানে ওর হবে না, ডেকে নিয়ে এসে তোরাই বরং গল্প কর্।

টিয়া নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অপ্রতিভ বিব্রত ভাব দেখিয়া মুখ ঘুরাইয়া অতি আস্তে করিয়া প্রায় ইঙ্গিতেই যেন বলিল, কেমন জব্দ!

নবদুর্গার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙিয়া উঠিয়াছিল, সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এখন থামো তো মা। দশজনের সাম্‌নে তুমি আমাকে নাকাল ক'রে ছাড়বে।

বাব্‌লি একেবারে যেন খেপিয়া গিয়া বলিল, থাক্ রে দুর্গা, থাক্! অতও আবার ভাল না! মাসিমা যেন খুব অন্যায় কথা বলেচেন। চ' তো টিয়া, আমরা সরোজবাবুকে দক্ষিণের ঘরেই ডেকে নিয়ে আসি।

নবদুর্গা রাগ প্রকাশ করিতে একটা পিঁড়ি সশব্দে মাটিতে পাড়িয়া সেখানেই ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। বাব্‌লি ও টিয়া পশ্চিমের ঘরের দিকেই চলিয়া গেল। নবদুর্গার রাগ তো ভাণমাত্র, ভিতরে ভিতরে সে কৌতুকোচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, কাজেই উচ্ছ্রিত দুই হাঁটুর মধ্যে সে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

সরোজ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দক্ষিণের ঘরে আসিয়া বসিয়াই তাই সে বলিল, আপনারা বাঁচালেন এতক্ষণে আমাকে।

—বটে!—বলিয়া বাব্‌লি চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিল, আরও বাঁচাচ্ছি আপনাকে। এতক্ষণে একবার আপনার সেই তার মুখ না দেখে বেঁচে আছেন কেমন ক'রে? দাঁড়ান, তাকেও এনে দেখাচ্ছি।

সরোজ বলিল, থাক্, অত ক'রে আর কাজ নেই। এই যা করেচেন এতেই আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইবার বসুন আপনারা, আপনাদের সঙ্গেই বরং গল্প করি।

টিয়া ঠাট্টার সুরে বলিয়া উঠিল, যান্, যান্, অত আর আমাদের জন্যে দরদ দেখাতে হবে না। আপনার সেটিকে ডেকে আনি, আপনারা দু'জনে গল্প করুন, আমরা শুনবো।

বাব্‌লি বলিল, যান্, যান্, অত আর ভালমান্‌ষি দেখাতে হবে না আপনাকে। আপনার মনের কথা আমরা জানি।

সরোজ অগত্যা বলিল, তবে তো জানেনই; বেশ, তাই করুন।

টিয়া আর বাব্‌লি সরোজকে সে-ঘরে রাখিয়া—পালাবেন না যেন আবার—বলিয়া নবদুর্গাকে রান্নাঘর হইতে ধরিয়া আনিতে গেল।

নবদুর্গা কি সহজে আসে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিতে হইল এবং ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল সরোজের পাশে। বাব্‌লি উঠিয়া আবার দরজাটা একটু ভেজাইয়া দিয়া আসিল। নবদুর্গা আসিয়াই সেই যে ঘাড় গুঁজিল, আর সে কিছুতেই ঘাড় তুলিতে চাহিল না। সরোজ দেখিল বাব্‌লি ও টিয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন সে চকিতে এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল যাহা নবদুর্গার স্বপ্নাতীত। ফস্ করিয়া নবদুর্গার চিবুক স্পর্শ করিয়া সরোজ বলিয়া উঠিল, তোলই•না ছাই মুখখানা—কতদিন যে দেখি না ও মুখ তোমার।

বাব্‌লি ও টিয়া সরোজের কাণ্ড দেখিয়া চাপিয়া চাপিয়া দুলিয়া দুলিয়া হাসিয়া উঠিল। সরোজও মুখ চাপিয়া হাসিল। হাসিল না নবদুর্গা—লজ্জা পাইয়া মানুষ মরে না, তাই সে মরিল না। একটু যেন কেমন কৃত্রিম কোপে ঘাড় তুলিয়া বলিয়া ফেলিল, বাবা বাবা, কি ফাজিল! য্—যাও!

টিয়া চট্ করিয়া বলিল, এই তো বেশ কথা কইতে পারিস্ দুর্গা। সরোজবাবু, আপনারটিকে কথা বলান, আমরা শুনি।

—কইগো! আবার ঘাড় গুঁজে বসলে কেন? কথা

কও, ওরা তোমার কথা শুনতে এসেচে যে!—বলিয়া সরোজ মৃদু একটু হাসিল।

বাব্‌লি বলিল, বেশ, ঐসব বললেই তো দুর্গা আর কথা বলেচে। সেই সব কথা বলুন আপনি—ঐ যে—কি-না—হ্যাঁ, শুধু দুর্গাতে বুঝি মানাচ্ছিল না তাই নবদুর্গা নাম রাখতে হ'লো।

সরোজ মৃদু হাসিয়া নবদুর্গার দিকে চাহিল, নবদুর্গা মুখ সামান্য তুলিয়া বাব্‌লির পিঠে একটা চিম্‌টি কাটিয়া ভ্রূভঙ্গী করিল।

সরোজ নবদুর্গাকে আবার মাথা গুঁজিয়া বসিতে দেখিয়া বলিল, বে—শ! সব কথাই তবে বন্ধুদের বলা হয়েচে!

নবদুর্গা সহসা একেবারে রুখিয়া উঠিয়া বলিল, হ্যাঁ, বলা হয়েচেই তো।

তারপর আবার লজ্জায় একেবারে মুশ্‌ড়াইয়া পড়িল। টিয়া আর বাব্‌লি নবদুর্গার মুখ ঝাম্‌টি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তারপরে সরোজের নানা কথার প্যাঁচে বা টিয়া-বাব্‌লির শত অনুরোধেও আর নবদুর্গা কথা কহিতে চাহিল না। মুখ যে সে গুঁজিয়া রহিল—গুঁজিয়াই রহিল। শেষে সরোজ কৃত্রিম রোষে বলিয়া উঠিল, তবে আমি উঠি। এর চেয়ে ও-ঘরে ব'সে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গেই গিয়ে বরং গল্প করি।

নবদুর্গা মাথা নীচু রাখিয়াই ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসি ভাসাইয়া বলিল—না, যেতে হবে না।

টিয়া ও বাব্‌লি প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল, এই তো!

নবদুর্গা কৃত্রিম লজ্জায় বাব্‌লিকে সজোরে একটা ধাক্কা দিল।

সরোজ বাব্‌লি ও টিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, আপনাদের বন্ধুটিকে ভাল ক'রে মুখ তুলে কথা কইতে বলুন। নইলে এভাবে ব'সে থাকা যায় না।

টিয়া অমনি বলিল, হ্যাঁ ভাই দুর্গা, সত্যিই তো, এ তুই আরম্ভ করলি কি! খামোখা তা হ'লে সরোজবাবুকে আমরা ডেকে আনলাম কেন?

নবদুর্গা বলিল, তোরা গল্প করবি ব'লে তো ডেকে এনেচিস্‌, গল্প কর্‌।

—আমরা গল্প করবো, না, গল্প শুনবো ব'লে ডেকে এনেচি? বলিয়া বাব্‌লি নবদুর্গাকে জোর করিয়া সরোজের দিকে একটু ঠেলিয়া আগাইয়া দিল।

নবদুর্গা আবার পিছাইয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল।

ক্ষণিকের জন্য সেখানে নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। এই নীরব মুহূর্ত্তে টিয়া ও বাব্‌লির মধ্যে চোখে চোখে ইসারায় কি যেন কথা হইয়া গেল। টিয়া ও বাব্‌লি একসঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বাব্‌লি বলিল, বেশ, আমরা চললাম, তোরা দু'জনেই গল্প কর্‌। কতকাল পরে দু'জনে দেখা—আমরা কেন শাপ কুড়োই।

বলিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেছিল, নবদুর্গা টিয়ার কাপড় চাপিয়া ধরিল। টিয়া তাহা ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

সরোজ বলিল, যাবেন না, গেলে কিন্তু ভাল হবে না।

টিয়া ও বাব্‌লি সত্যই ঘরের বাহিরে গিয়া ঘরের দরজাটা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া শিকল টানিয়া ধরিয়া রাখিল।

কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর নীরবতা জাগিয়া রহিল, তারপরে সরোজ বলিল, বাঃ রে! এভাবে ব'সে থাকা যায় নাকি? ওদের ডেকে নিয়ে এসো।

নবদুর্গা অতি আস্তে করিয়া বলিল, বেশ হয়েচে! ফাজিল কোথাকার! ওদের সাম্‌নে আমাকে ওভাবে জব্দ না করলে হ'তো না, না? আমি পারবো না ওদের ডাকতে।

ইহারও কিছুক্ষণ পরে টিয়া ও বাব্‌লি অকারণে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সরোজ একটু সরিয়া বসিল, নবদুর্গা বিপর্য্যস্ত ঘোম্‌টা টানিয়া তুলিয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। নবদুর্গার মুখে তখন লজ্জা ও ক্লান্তি সমভাবে বিরাজ করিতেছিল।

টিয়া সহসা লক্ষ্য করিল, সরোজের গণ্ডের একপ্রান্তে খানিকটা সিঁদুর লাগিয়া রহিয়াছে। অমনি নবদুর্গার কপালের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল—নবদুর্গার কপালের সিঁদুর স্থানভ্রষ্ট তো একটু হইয়াছেই, অধিকন্তু আশে-পাশে বহুস্থানে লাগিয়া গেছে। নবদুর্গা সে-কারণেই যেন ঘোম্‌টায় যথাসাধ্য মুখ ঢাকিয়া নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা পাইতেছিল।

টিয়া রঙ্গ-বিধুর কণ্ঠে তাই বলিল, এ কি কাণ্ড করলেন সরোজবাবু! দিনে-দুপুরে এ কি কাণ্ড আপনার! রুমাল বের ক'রে শীগ্‌গিরই সিঁদুর পুছে ফেলুন। লোকে দেখলে পরে বলবেই বা কি! না, আপনাদের তো বিশ্বাস করা আমাদের উচিত হয় নি।

বাব্‌লি আর টিয়া একসঙ্গেই উচ্চহাস্য করিয়া সরোজ ও নবদুর্গাকে রীতিমত বিব্রত করিয়া তুলিল।

বাব্‌লি মহা বিস্ময়ে একেবারে বলিয়া উঠিল—সত্যি, এ কি কাণ্ড আপনাদের!

সরোজ রুমাল বাহির করিয়া গালের সকল দিক তাহাতে ঘষিয়া রুমালের দিকে চাহিয়া সত্যই লজ্জায় পড়িয়া গেল। টিয়া ও বাব্‌লির হাসি কিছুতেই আর থামিতে চাহে না। নবদুর্গার ইহাতে যেমন লজ্জা করিতেছিল তেমন আবার হাসিও পাইতেছিল। সে পট্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের একটা তাক্ হইতে একটা ছোট ভাঙ্গা আরসি আনিয়া সরোজের সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া পুনর্ব্বার ঘাড় বিশেষভাবে গুঁজিয়া বসিল।

সরোজের লজ্জার আর সীমা রহিল না, কিন্তু এভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াও সে খুশী না হইয়া পারিল না। এসব ব্যাপারে ধরা দেওয়ায় লজ্জা আছে, কিন্তু ধরা পড়িলে পর লজ্জা ডিঙাইয়া যে আনন্দের সন্ধান মেলে তাহার আর তুলনা নাই।

নবদুর্গা চলিয়া গেল। সরোজ ও নবদুর্গাকে খালের ঘাটে নৌকায় তুলিয়া দিতে আর সকলের সঙ্গে বাব্‌লি এবং টিয়াও আসিয়াছিল। প্রথমবার নবদুর্গা অনেক কান্নাকাটি করিয়াছিল, কিন্তু এবার আর একবিন্দু চোখের জলও সে ফেলে নাই।

ইহা লইয়া টিয়া তাহাকে একটু বিদ্রূপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। নবদুর্গা ভাল হাতেই তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িয়াছে। নবদুর্গা সরোজের সাম্‌নেই একেবারে বলিয়া বসিয়াছিল—ছ্যাথ্‌ টিয়া, খালের ঘাটে গা ধু'তে যাস্ যাবি, তা বলে চিঠি লিখতে ভুলিস্ না যেন! মাইরি, তা হ'লে ভারী রাগ করবো। আর দত্তবাড়ীর ছেলের খবরও যেন চিঠিতে থাকে।

সরোজের সাম্‌নে টিয়া নিজেকে সহসা ভারী বিপন্ন মনে করিয়াছিল। লজ্জায় নবদুর্গার কথায় আর পাল্টা জবাব দিতে পারে নাই।

টিয়া বাড়ী ফিরিয়া একান্তে এখন সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। কেন সে নবদুর্গার কথার উত্তরে জোর করিয়া কিছু বলিয়া বসিল না? কেন যে সে নবদুর্গাকে জবাব দিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে পারিল না—কে জানে। অথচ, জবাব দিবার মত কত কথাই তো এখন তাহার মনে আসিতেছে। সরোজ কাছে না থাকিলে জবাব সে দিতে পারিত নিশ্চয়ই, কিন্তু সরোজ কাছে থাকায় জবাব দিতে না পারাটা তাহার পক্ষে নিতান্তই অন্যায় হইয়া গেছে। তাহার পক্ষে এতখানি দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। যাহা হউক্, একটা কিছু জবাব দিয়া সেই লজ্জা-বিজড়িত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তটিকে সহজ করিয়া তোলা তাহার খুবই উচিত ছিল এবং যে অক্ষমতা সে-মুহূর্ত্তে তাহার প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই জন্য এখন তাহাকে অনুতাপ করিতে হইতেছে।

কিন্তু নবদুর্গার কথায় মধুও তো মেশানো ছিল, নহিলে এত ভালই বা তাহার লাগিল কেন। তা লজ্জা সে একটু পাইয়াছে সত্য, আনন্দও তো হৃদয়ে তাহার ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে লাভ-লোকসান তাহার দুইই হইয়াছে। আরও যাহা হইয়াছে তাহাতে টিয়া বিব্রত হইতেছিল এখনই বেশী—কারণ সে-জিনিষটা পূর্ব্বে কখনও এমন সহজ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। অর্থাৎ সুন্দরের প্রতি সে আকৃষ্ট হইয়াছে—আর সে সংবাদ গ্রামের সকলেই যেন অনায়াসে অনুমান করিতে পারিতেছে। নবদুর্গার কথায় তাহারই যেন পূর্ব্বাভাষ আজ ধ্বনিয়া উঠিল! টিয়া সেই কথাই গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। ফলে খালের ঘাটে কাজ করিতে যাইতেও তাহার কেমন জানি আজ বাধিতে লাগিল। রায়েদের দীঘিতেই তাহাকে আজ তাই গা ধুইতে এবং জল আনিতে বৈকালের দিকে একা একা যাইতে হইল। বাব্‌লিকে ডাকার সাহসও তাহার আর হইল না। কি জানি, বাব্‌লি যদি আবার দীঘিতে যাওয়া লইয়া কোন বিদ্রূপ করিয়া বসে, কিংবা নবদুর্গার সকালের কথাটারই টীকা সমেত ব্যাখ্যা সুরু করিয়া দেয়! সে এখন একা একাই তাই দীঘিতে গেল।

দীঘি হইতে ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যার সামান্য পূর্ব্বেই। বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই সহসা পিতার কথা শুনিয়া টিয়ার মনে হইল, ফিরিয়া না আসাই যেন তাহার উচিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে এমন কোন সংকল্প লইয়া তো আর সে দীঘিতে যায় নাই, তবে আর একটু আগে-পরে আসিলেই তো ভাল হইত। পিতার অধুনা-উচ্চারিত দুর্ব্বাক্য কানে তাহার না গেলেই ভাল ছিল। এমন অস্বস্তি তাহা হইলে তাহাকে আর ভোগ করিতে হইত না।

বাক্য সামান্যই, কিন্তু অসামান্য রূপ পরিগ্রহ করিল টিয়ার চিন্তা-কাতর মনে।

টিয়া যখন সন্ত্রস্তপদে বাড়ীর উঠানে পা বাড়াইল তখনই ঠিক নিশি সজ্জন উঠানে দাঁড়াইয়া দাওয়ায় উপবিষ্টা রূপসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, এই এক মেয়ে থেকেই আমার সর্ব্বনাশ হবে! দু-দশ গাঁয়ের মধ্যে সজ্জন-বাড়ীরই এতকাল কোন কলঙ্ক ছিল না—তাও এবার হবে। সজ্জন-পরিবারের যশ-খ্যাতি সবই এবার ডুবতে বসেচে। না, সে আমি হ'তে দেবো না, কিছুতেই না। আর তা বন্ধ করতে যদি মেয়েকে আমার নিজ হাতে খুন করতে হয় তো তাও আমি করবো। শেষকালে মধু ঘোষাল—ঐ চামারটা কিনা ঠারে আমাকে কথা শোনালে? বলে কি-না—'মেয়েটি তো বেশ ডাগর হয়েচে ব'লেই আমরা মনে করি সজ্জন, এইবার পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করো। আর ব্যবস্থা তো মেয়েই ক'রে তুলেচে শুনতে পাই। দাও, সেখানেই দাও, পাত্রটি ভালই তো; মেয়েও তোমার সুখে থাকবে, আর চোখের সাম্‌নেই থাকবে। পারাপারের জন্য দু বেয়াই-এ আধাআধি বখ্‌রা দিয়ে একটা সাঁকো শুধু বেঁধে নিলেই চলবে। আমরাও দেখে খুশী হ'তে পারবো যে, এতকালের এত শত্রুতা দু বাড়ীতে শেষ হ'লো শেষ পর্য্যন্ত গাঁটছড়া বেঁধে।' শেষে মধু ঘোষালের কথা পর্য্যন্ত আমাকে দাঁড়িয়ে শুনতে হ'লো। না, আর না! কালকেই আমি কাম্‌লা ডেকে ঘাটে বেড়া তুলে দিচ্ছি। এখানেই এর শেষ হোক্, নইলে কলঙ্কিনীর খালে আবার রক্তগঙ্গা বইয়ে তবে সজ্জন-বংশের পরিচয়।

টিয়া চকিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সমস্তই সে শুনিল। শুনিয়া নির্ভীক হইয়া উঠিল এবং অচিরে উঠানেই যে রক্তগঙ্গা বহিয়া গিয়া সজ্জন-বংশের পরিচয় বাহাল থাকিতে পারে তাহা আশঙ্কা করিয়াও উঠানের মাঝ দিয়া নিশি সজ্জনের রোষদীপ্ত দৃষ্টি কাটিয়া রান্নাঘরের দিকে জল লইয়া ভিজা কাপড়েই সহজ সজীব গতিতে চলিয়া গেল।

আশ্চর্য্য! নিশি সজ্জন একটা কথাও কহিল না, যদিও টিয়া তাহার সম্মুখ দিয়াই অশঙ্কিত চিত্তে চলিয়া গেল। না কহিবার কারণও আছে। নিশি সজ্জন একটু বিচলিত হইয়াই পড়িয়াছিল। টিয়ার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া সে যে এতক্ষণ রূপসীর কাছে এভাবে টিয়ারই অপযশ-কীর্ত্তন করিতেছিল তাহারই অন্যায় তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। টিয়া বুঝি আবার তাহা শুনিয়াও গেল। নিশি সজ্জন তাহারই দুশ্চিন্তায় আরও বিচলিত হইয়া উঠিল।

টিয়া রান্নাঘরে জলের কলসী নামাইয়া দিয়া আবার উঠানে নামিয়া আসিল। কিন্তু নিশি সজ্জন ততক্ষণে উঠান ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। দাওয়ায় কিন্তু রূপসী তখনও বসিয়াছিল।

টিয়াকে উঠানে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া এবং স্বামী সেস্থান মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিল, আহা-হা! ম'রে যাই পুরুষ-মানুষের সাহস দেখে! আর পুরুষ-মানুষ এমন না হ'লে কি কখনও ঘরের মেয়ে করে দাপটের সঙ্গে শত্রুতা! আরও না জানি অদৃষ্টে কত হেনস্থাই লেখা আছে!

টিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া গেল।

পরদিন বেড়া উঠিল। কলঙ্কিনীর খালে সজ্জন-বাড়ীর ঘাট দাব্‌নার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়া পর্দ্দানশীন ঘাট করিয়া তোলা হইল। আর এমন করিয়া ঘাট ঘেরা হইল যে, বনপলাশীর দত্ত-বাড়ীর ঘাট হইতে এ-ঘাটের কিছুই প্রায় দেখা যাইতেছিল না। ঘাট বেড়া দিয়া ঘিরিতে প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। নিশি সজ্জনের বুকের নিশ্বাস কথঞ্চিৎ হাল্কা হইয়া আসিল।

টিয়া আয়োজন দেখিয়া মনে মনে হাসিল, কিন্তু ভয়ও সে পাইল। পিতার মনে সন্দেহের আগুন জ্বলিয়াছে, রূপসী যথারীতি তাহাতে ইন্ধন যোগাইবে, সে অনলে না পুড়িয়া তাহার আর নিস্তার নাই।

সুন্দর সহসা তাই আজ তাহার চোখে মুহূর্ত্তে অপার্থিব,

দুর্লভ ও অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিভাত হইল এবং এই অদ্বিতীয়ের জন্য পুড়িয়া মরিতে পারিলেও যেন অনন্ত শান্তি বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিল। টিয়া তাই মরণ মানিয়া লইল, কিন্তু আমরণ বিক্ষোভ মানিয়া লইতে পারিল না।

সুন্দর সকালে বাড়ী ছিল না। শ্রীমন্তকে সঙ্গে লইয়া বকফুলীর ওপারে গিয়াছিল বিশেষ কি যেন কাজে। কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে তাহার অনেক বেলা হইয়া গেল। শ্রীমন্তকে তাহাদের বাড়ীর ঘাটে নৌকা হইতে নামাইয়া দিয়া সুন্দর নিজেদের ঘাটে আসিয়া সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের নূতন রূপ দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য বিস্মিত হইয়া রহিল এবং পর মুহূর্ত্তেই তাহার বিপুল হাসি পাইল। সজ্জন-বাড়ীর ঘাটে সহসা আজ যে বেড়া উঠিল কেন—তাহা সে ভাবিয়া না পাইলেও একথা সে বুঝিল যে তাহারই কারণে ও-ঘাটে বেড়া উঠিয়াছে। কিন্তু কারণটা সঠিক সে ধারণায় আনিতে পারিতেছিল না। রূপসী সজ্জন-বাড়ীতে আজ নূতন আসে নাই, এতকাল সে বেড়া-হীন ঘাটেই প্রয়োজনে আসিয়াছে, কাজেই তাহার অসুবিধার জন্য আর বেড়া ঘিরিয়া ঘাট ঢাকা হয় নাই। হইয়াছে অবশ্য টিয়ার জন্যই। টিয়ার বয়স হইয়াছে, কিন্তু বয়স হওয়াই যথেষ্ট কারণ এক্ষেত্রে হইতে পারে না। আরও কি যেন তবে ঘটিয়াছে। হইতে পারে তাহার চোখ হইতে টিয়াকে আড়াল করিয়া রাখিবার জন্যই নিশি সজ্জনের এ ব্যর্থ প্রয়াস। কিন্তু সে যাহাই হউক, সুন্দরের বেশ লজ্জা করিতে লাগিল; ঘাটে বেড়া উঠিয়াছে বলিয়াই নয়, সেদিন সে যে সজ্জন-বাড়ীর ভিটায় পা দিয়াছিল, আর টিয়ার সঙ্গে কথা বলিতে যখন ব্যস্ত তখন যে রূপসীর কাছে তাহারা ধরা পড়িয়াছিল—সেই কারণেই। হইতে পারে সেই ঘটনাকেই সূত্র করিয়া বহু ঘটনার আলোচনা এবং তাহারই ফলে সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের এ আব্রু-ঘেরা রূপ।

সুন্দর লজ্জায় তাই হাসিয়া ফেলিয়া ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া ডাঙায় উঠিয়া গেল পিছন দিকে একবারও দৃষ্টি না ফেলিয়া।

ব্যাপারটা সুন্দরকে বেশ ভাবাইয়া তুলিল। স্নানাহার সারিতে তাই তাহার বেলা একেবারে গড়াইয়া গেল এবং স্নানাহার সারিয়াই সে ডাঙা-পথে শ্রীমন্তের বাড়ী গেল। শ্রীমন্ত তখন নিদ্রার আয়োজন করিয়াছিল। শ্রীমন্তের চোখ তখন নিদ্রায় ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সুন্দর তাহাকে স্বস্তিতে নিদ্রা যাইতে দিল না। সজ্জন-বাড়ীর নূতন কীর্ত্তির কথাই সে তাহাকে শুনাইতে লাগিল।

শ্রীমন্ত সমস্ত শুনিয়া মৃদু একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, এখন থেকে সজ্জন-বাড়ীতে একটা কাকপক্ষীও যদি ডাকে তো বুঝতে হবে যে সে তোরই কারণে। তোর যেমন কথা! এমনও তো হ'তে পারে যে খাল দিয়ে বেপারীদের নাও আজকাল খুব বেশী চলচে ব'লে ঘাটে বেড়া দিয়েচে।

সুন্দর বলিল, না, সে হ'লে বহু আগেই বেড়া উঠতো।

শ্রীমন্ত বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ'লো—তোরই জন্যে বেড়া দিয়েচে। আর দেবেই বা না কেন, টিয়ার তো বয়েস হয়েচে। তোর চোখের সাম্‌নে যখন তখন আসতে দেবে কেন শুনি? বেশ করেচে, ভালই করেচে।

সুন্দর ম্লান হাসিয়া বলিল, আমি তো ভাল-মন্দের কথা কিছু বলিনি, তুই চট্‌চিস্ কেন?

শ্রীমন্ত মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, চটবো না-ই বা কেন শুনি? বাবা, বাবা, পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র শুনি তোর আর টিয়ার কীর্ত্তিকলাপ, আবার তোর কাছেও একতরফা দিবারাত্র, সারা সকাল তো জ্বালিয়েচিস্, আবার এসেচিস্ জ্বালাতে—ঐ এক কথা, টিয়া আর টিয়া। না চ'টে মানুষ পারে?

সুন্দর ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। কারণ শ্রীমন্তকে সে চেনে। ইহা তাহার মনের কথা না, তাহাকে একটু বিব্রত করার জন্যই এভাবে তাহার বলা।

সুন্দর তাড়াতাড়ি বলিল, আচ্ছা, আসি তবে।

সুন্দর অভিমানের ভান করিয়া দরজা পর্য্যন্ত যাইতেই শ্রীমন্ত ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া তাহার গতি রোধ করিল। বলিল, ছেলেমানুষি আর করতে হবে না সুন্দর। রাগ দেখিয়ে আর চ'লে যেতে হবে না।

সুন্দর আবার আসিয়া বসিল।

শ্রীমন্তের কাছে সুন্দরের কোন কথাই আর গোপন ছিল না। সুন্দরের সকলপ্রকার দুর্ব্বলতার সঙ্গে শ্রীমন্তের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহা সত্ত্বেও সুন্দর কতভাবে কতবার যে এই একই ঘটনার বিবৃতি শ্রীমন্তের কাছে সুযোগ পাইলেই

করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই, তথাপি সুন্দরের কথা আর শেষ হয় না ; বলিয়াও মনে হয়, বুঝি-বা বলা হইল না। শ্রীমন্ত তাহার কথা শুনিয়া কখনও বিদ্রূপ করে ; কখনও হাসিয়া জিনিষটাকে তরল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, কখনও আবার সহানুভূতি প্রকাশ করে, কখনও আবার বুদ্ধি-পরামর্শ প্রয়োজন মত দেয়, কখনও আবার হয় তো শুনিয়া নীরব থাকে—কোন ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে দেয় না। সুন্দরকে লইয়া রঙ্গ করিতে শ্রীমন্তের বেশ লাগে, আর অধুনা তাহা অতি সহজ হইয়াও উঠিয়াছে।

রঙ্গ-কৌতুকে বহু সময় কাটাইয়া দিয়া সুন্দর ও শ্রীমন্ত উঠিল। বেলা তখন একেবারে গড়াইয়া গেছে। শ্রীমন্তকে সুন্দর সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের বেড়া দেখাইতেই লইয়া চলিল।

ওপারে টিয়া বাতাবী লেবু গাছটার একটা ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘাটে তাহার কাজ ছিল, কিন্তু ঘাটে তখনও সে নামে নাই। ঘাটটুকু শুধু বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছিল, কাজেই পাড়ে দাঁড়াইলে অপর পার অতি স্পষ্টই দেখা যায়। শ্রীমন্ত ও সুন্দর টিয়াকে স্পষ্টই দেখিতে পাইল। টিয়া প্রথম তাহাদের দেখিতে পায় নাই, যেহেতু সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল ; পরে যখন তাহাদের প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে অনাবৃত বলিয়া বোধ করিল তখনই লজ্জায় মুখ ফিরাইল এবং পলাইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া যাইবে কি-না তাহাই বিচার করিতে লাগিল। কিন্তু কাজটা সহসা করিতে পারিলেই ভাল ছিল, পরে আর সম্ভব হইল না, পলাইয়া যাইতে কেমন জানি সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিল।

সুন্দর শ্রীমন্তের অতি কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও উচ্চকণ্ঠে টিয়াকে শুনাইবার জন্যই বলিয়া উঠিল, শ্রীমন্ত, কালই আমাদের ঘাট বেড়া দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি। আমাদের ঘাটই বা বে-আব্রু থাকতে যাবে কেন শুনি? আমাদের কি মান-সম্মান ব'লে কিছু নেই?

টিয়া সুন্দরের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল, শ্রীমন্ত প্রকাশ্যেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, হুঁ, ঘাটে বেড়া দিলেই যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যেত তো আর ভাবনা ছিল কি!

শ্রীমন্ত উচ্চকণ্ঠেই কথাগুলি বলিল, টিয়ার কানেও সে কথা গেল। সুন্দর তাই ততোধিক উচ্চকণ্ঠে বলিল, হুঁ, লোকের মুখ বন্ধ করবার জন্যে আমার তো চোখে ঘুম নেই। টিয়া আর দাঁড়াইল না। আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকেই পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু কান তাহার পিছনেই পড়িয়া রহিল—এখনই একটা মন্তব্য হইবে আশায়।

সুন্দর বলিল, ব্যস্, তাড়ালি তো?

শ্রীমন্ত হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ডেকে ফেরালেই পারিস্। এটুকুও এতদিনে পারিস্ না? লোকে তবে এত কথা থামোখাই বলে?

সুন্দর কিছু বলার পূর্ব্বেই টিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্ত পরেই আবার ঘাটে নামিয়া গেল।

শ্রীমন্ত তখন উচ্ছ্বাসবিধুর হইয়া হাসিয়া সুন্দরের গায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, দেখলি তো, তীর ঠিক বিঁধে গেচে পাখীর ডানায়—আর কি পালাতে পারে কখনও।

টিয়া ঘাটে বসিয়া অকারণে জলে হাত ডুবাইয়া ঘটা করিয়া আওয়াজ করিতে লাগিল।

সুন্দরের মনে হইল, ঘাটের বেড়ার গায়ে একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিলে মন্দ হয় না। কিন্তু আজ আর তাহা সম্ভব হইল না। শ্রীমন্তের কাছে অতখানি বাড়াবাড়ি করিতে তাহার বাধিল।

এককালে লোকের মুখে, শিখীপুচ্ছের সজ্জন-বাড়ী ও বনপলাশীর দত্ত বাড়ীর বিরোধের নানাবিধ কাহিনী নিত্য নূতন শুনা যাইত, যেখানে-সেখানে তাহা লইয়া হইত বিচিত্র আলোচনা, ভাল-মন্দের বিচার এবং বীরত্বের ব্যাখ্যা চলিত, নানা ভাষা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া। বহুকাল সে সব আর লোকে শোনে নাই, কারণ দুই বাড়ীর বিরোধ এযাবৎকাল একপ্রকার অন্তরেই ঝিমাইয়া ছিল, বাহিরে প্রকাশ কিছু করে নাই। অধুনা আবার দুই বাড়ীর নাম লোকের মুখে একত্রে শুনা যাইতেছে, কিন্তু বিরোধ-শত্রুতার বালাই তাহাতে নাই আছে—আসন্নপ্রায় পরম মিত্রতার আভাষ। তাহারই দরুণ দেখা দিয়াছে গোলমাল। শত্রুতার মধ্যে আছে পৌরুষ—সবল মনের দ্বিধাহীন প্রকাশ, কিন্তু মিত্রতার মধ্যে আছে ঘন দুর্ব্বলতা—যেন পরাজয়ের গ্লানি এবং তাহারই দরুণ ভয়-ভীতি যাহা কিছু দেখা দিয়াছে কন্যার পিতা নিশি সজ্জনের মনে। এক্ষেত্রে একমাত্র তাহারই পরাজয় সম্ভব; অগৌরব যদি কিছু কাহাকেও স্পর্শ

করে তো তাহা করিবে নিশি সজ্জনকেই। দুর্ভাবনাও অন্তরে তাই তাহার—হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আবার শত্রুতা সুরু হউক, আবার কলঙ্কিনীর খাল রক্তে রক্তে লাল হইয়া উঠুক ; এমন কি, তাহার নিজের রক্তেও যদি কলঙ্কিনীর খালের জল লাল হইয়া ওঠার প্রয়োজন দেখা দেয় তো দিক্, কিন্তু এপারে-ওপারে যাতায়াতের জন্য যে সাঁকো বাঁধা—তাহা অসম্ভব!

নিশি সজ্জন তাই ঘাটে বেড়া তুলিয়াই আর ক্ষান্ত রহিল না। গ্রামে গ্রামে সৎপাত্রের সন্ধান লইতে লাগিয়া গেল। টিয়ার বয়স হইয়াছে—বিবাহের আর বিলম্ব করা উচিত না। আর অযোগ্য পাত্রেও তো টিয়াকে সমর্পণ করা সম্ভব হয় না—লোকেই বা বলিবে কি! শেষ পর্য্যন্ত হয় তো বলিবে যে, নিশি সজ্জন দ্বিতীয় পক্ষের পরামর্শে মেয়েটাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছে। চট্ করিয়া আর ভাল পাত্রের সন্ধানই বা মেলে কোথা হইতে, সামান্য বিলম্ব না করিয়াও তো উপায় নাই। কিন্তু বিলম্ব না করিতে হইলেই যেন ছিল ভাল। নিশি সজ্জন এইকারণে নিজেকে সহসা বিশেষ বিপন্ন মনে করিল। কিন্তু বিবাহের আর বিলম্ব করা চলে না কোনমতেই। গ্রামের লোকের মুখ বন্ধ করিতে হইলে টিয়ার যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। আগামী অগ্রহায়ণে দিতে পারিলেই সে স্বস্তি পায়।

এদিকে আবার পূজা প্রায় আসিয়া গেল। নিশি সজ্জন দশভূজা মায়ের পূজার আয়োজনের ভাবনাই ভাবিবে, না টিয়ার বিবাহের কথাই ভাবিবে? এ দুইটির একটিও যে স্থগিত রাখিবার উপায় নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল নিশি সজ্জন ততই গুরুভার চিন্তাক্রান্ত হইতে লাগিল।

রূপসী কেন জানি টিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ-নির্লিপ্ত রহিল। কিন্তু টিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে নিশি সজ্জনের প্রচেষ্টা দেখিয়া সে খুশীই হইল। টিয়ার কোন শুভাশুভের জন্য রূপসীর কিছুমাত্র মাথা-ব্যথা কোন দিনই ছিল না, আজিও দেখা দেয় নাই ; তবে টিয়া যে অন্য কোন ঘরের মানুষ হইয়া যাইবে এবং সে যে নিষ্কণ্টক হইয়া সজ্জন-বাড়ীর মধ্যে নিজ খেয়াল-খুশী বজায় রাখিয়া বসবাস করিতে পারিবে কাহারও চোখে কিছুমাত্র না বাধিয়া তাহারই সুখ-কল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই টিয়ার বিবাহ হইয়া যাওয়ার দিকে তাহার একটা আন্তরিক আগ্রহ বিদ্যমান ছিল।

কাজেই নিশি সজ্জন সেদিন যখন রূপসীর কাছে টিয়ার বিবাহের কথা তুলিয়া বসিল, তখন রূপসী কথা কওয়া বা মতামত দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না এবং চুপ করিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। নিশি সজ্জন কোথায় কোথায় পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং কাহার কি যোগ্যতা তাহা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া রূপসীকে একবার প্রশ্ন করিল, এর মধ্যে কোন্ পাত্রটিকে তোমার পছন্দ হয় শুনি?

রূপসী প্রথম ভাবিল, মতামত কিছু না দেওয়াই ভাল। কিন্তু কথা না বলিয়াও কেন জানি সে থাকিতে পারিল না। কাজেই বলিল, তা সে তুমি মেয়েকে জিগ্যেস্ করলেই পারো। আমার মতামতে আসবে যাবে কি শুনি?

নিশি সজ্জন ইহাতে নিজেকে সামান্য বিব্রত মনে করিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার সাম্‌লাইয়া উঠিয়া বলিল, এ আমার মস্ত দায়িত্ব—পরে এ নিয়ে অনেক কথাই উঠতে পারে। কাজেই দশজনের মতামতের ওপর আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে।

রূপসী ইহাতে বিরক্ত বোধ করিয়া বলিল, আমার মতামতের ওপর নির্ভর না করলেও তোমার চলবে। মতামত দিয়ে কি শেষে নিজেকে দোষের ভাগী করবো নাকি? তা দোষ তো লোকে আমাকেই দেবে—তা দিক গিয়ে। ওসব আমি গ্রাহ্যি করিনে। ভাল আমার কেউ দেখবে না সে আমি জানি। কপাল আমার মন্দ—কে তা খণ্ডাবে বলো!

নিশি সজ্জন এত কথার পরেও বলিল, তবু?

রূপসী একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, মেয়ে তো আমার নয় যে আমার কথায় কাজ হবে। মেয়ে তোমার—তুমি যেখানে খুশী তাকে বিয়ে দেবে। আমি এ-ব্যাপারে সাতেও নেই—পাঁচেও নেই।

—আচ্ছা!—বলিয়া নিশি সজ্জন রূপসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল এবং মনে মনে ঠিক করিল, আর কখনও টিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে রূপসীকে সে জড়াইতে চাহিবে না। রূপসীর মতামতের প্রয়োজনও এক্ষেত্রে কিছু নাই বলিয়াই এখন তাহার মনে হইতে লাগিল। একথা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিলে তাহাকে রূপসীর কাছে এমন অপ্রস্তুত হইতে হইত না। সে কারণে নিশি সজ্জন মনে মনে আফশোষই করিল। অবশ্য, রূপসীর আচরণে

আফশোষ তাহাকে বহুদিন করিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও করিতে হইবে তাহা সে জানে, কাজেই ভাবিয়া কিছু আর লাভ নাই।

মুখের কথা—দশজনের কানে উঠিতে উঠিতে সুন্দরের কানেও উঠিল। টিয়ার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে, পাত্রের সন্ধান করা হইতেছে। সুন্দর সহসা বেশ বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু বিচলিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণও সে খুঁজিয়া পাইল না। টিয়ার বয়স হইয়াছে, টিয়ার জন্য পাত্রের সন্ধান তো তাহার পিতাকে করিতেই হইবে। ইহা তো সহজ কথা! কিন্তু পাত্রের জন্য সন্ধান না চলিলেই যেন সে খুশী হইত, ভাবনার তাহার কিছু থাকিত না। অথচ ভাবনাও যে এক্ষেত্রে অসঙ্গত তাহাও সে মনে মনে বুঝিল।

রাত্রে হাজারখুনীর বিলে নৌকার 'পরে বসিয়া শ্রীমন্ত ঠিক এই কথাই তুলিল সুন্দরকে বিশেষ করিয়া ভাবাইয়া তুলিবার জন্য। সুন্দর শ্রীমন্তের কথা শুনিয়া ভাবিত বিশেষ হইল না, কারণ ভাবনা তাহার পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল। কাজেই নিস্পৃহকণ্ঠে বলিল, বিয়ের বয়েস হয়েচে, পাত্রের সন্ধানতো চলবেই। সেকথা শুনে আমার লাভ?

শ্রীমন্ত ব্যঙ্গ-চতুরকণ্ঠে বলিল, তোর লাভের কথা নয়, লোকসানের কথাই বলা হচ্ছে।

সুন্দর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, নারে শ্রীমন্ত, লোকসান কিছু নয়। টিয়ার খুব ভাল বিয়ে হোক্, তাইই আমি চাই।

শ্রীমন্ত সুন্দরের কণ্ঠে তাহার নিজেরই অন্তরের সুর প্রতিধ্বনিত দেখিয়া ব্যথিত হইল, কিন্তু ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়িল না। বলিল, কি চমৎকার তোর স্বার্থত্যাগ সুন্দর! কেন, দত্ত-বাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে কি খুব ভাল বিয়ে হয় না?

—না, হয় না। তুই চুপ কর্ এখন। বলিয়া সুন্দর অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া বসিল।

শ্রীমন্ত সুন্দরকে ঘুরিয়া বসিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিল। তারপরে বলিল, তা আমার ওপর রাগ করিস্ কেন সুন্দর? বেশ, ওকথা না হয় নাই তুললাম আর। কিন্তু টিয়ার সঙ্গে অন্য কারও বিয়ে হবে এ যেন আমি ভাবতেই পারি না। আর টিয়াই কি তাতে রাজী হবে নাকি? সেই দেবে দেখিস্ বাধা।

সুন্দর সহসা আবার ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, হুঁ, বাধা দেবে না ছাই! আর কেনই বা সে বাধা দেবে, কিসের তার গরজ! না, উচিত হবে না তার বাধা দেওয়া। সজ্জন-বংশের রক্ত তো ওরও শরীরে আছে, ও-ই বা শত্রুতা কম করবে কেন বনপলাশীর দত্তদের সঙ্গে? হোক্, ভাল ক'রেই তবে আবার শত্রুতা সুরু হোক্।

সুন্দরের কথায় শ্রীমন্ত হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তোর হ'লো কি সুন্দর? কিসের আবার শত্রুতা সুরু হবে শুনি?

—হবে, হবে, সে তুই বুঝবি না।—বলিয়া সুন্দর নীরব হইল।

শ্রীমন্ত উচ্চহাস্য করিল। চেষ্টা না করিয়া অমন উচ্চহাস্য মানুষের দ্বারা সম্ভব হয় না। সুন্দর তাই বিশেষ বিব্রত হইল। (ক্রমশঃ)

"মনোরথানাম্—"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভুবনের খেয়া বন্ধ করিয়া হয়েছি এবারে বাসনা-বাসী,—
মনেই রচনা বৃন্দাবনের, মনে-মনে রচি মথুরা-কাশী!
সখাগণসাথে চরাই গোধন শ্যাম যমুনার শ্যামল কূলে,
ঘরে-ঘরে চুরি করি ননী-ছানা, বাঁশরী বাজাই কদম-মূলে;
ব্রজগোপীদের হেলায় খেলাই, রাধায় কাঁদাই, নিজেও কাঁদি,
সখীসাথে দুলি তমালশাখায় লতার ঝুলনে দোলনা বাঁধি';
আপন মনের গোপন গহনে আপনারে লয়ে নেশায় মাতি'
বৃন্দাবনের বনে-বনে ফিরি—কে জানে দিবস, কে জানে রাতি!

শেষ করি' খেলা, রথে চড়ি' চলি মথুরাপুরীর নূতন হাটে,
নরনারী নিয়ে নূতন নেশায় দিন কেটে যায় রাজ্যপাটে;
পরদল ভাঙি, নিজদল গড়ি, সন্ধিতে বাঁধি বন্ধুদলে,
দুষ্টশাসনে শত্রুনাশনে শক্তির সেবা-সাধনা চলে;
কংসধ্বংসে শিশুপালবধে আপন হস্তে অস্ত্র ধরি,
কল্পনারঙে ভারত ভরিয়া মনে-মনে খেলি রক্ত-হোরি;
দুর্য্যোধনের বিপক্ষ হয়ে পাণ্ডবরথে সারথি সেজে
ইহজগতের কলা-কৌশল—স্বাদ লভি তার আপনাতে যে!

যত ভোগ-পাট, যত লীলা-নাট, শেষ করে' হই শ্মশানবাসী,
গঙ্গার কূলে বিশ্বের মূলে আপনাতে রচি ত্যাগের কাশী;
ক্লান্ত মনের মণিকর্ণিকা, রিক্ত হরিশ্চন্দ্র ঘাটে,
চিতার আগুনে শুদ্ধি মাগিয়া ভস্ম মাখিয়া সন্ধ্যা কাটে;
নারদ-তুলসী-কেদার-চরণে ভক্তির পথে মুক্তি লাগি'
ইহজীবনের পঞ্চমাঙ্কে শেষ গান গেয়ে বিদায় মাগি।
বিশ্বসিন্ধু দুলুক শিয়রে, মনে [illegible]
কেন ছুটাছুটি, কেন লুটো[illegible]

ভাগবত-জীবন

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস (অবসরপ্রাপ্ত)

মনোময় জীবের মধ্যে তাহার কল্পিত জ্ঞানের সহিত যথার্থ সত্য বা পূর্ণ সত্যের বিরোধ সর্ব্বদাই রহিয়াছে। দিব্য-চেতনার স্বভাব এই যে, তাহার দৃষ্টি ও কার্য্য আংশিক হয় না, there is a wholeness of sight and action. সেই জন্য তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি একত্রে এক অভিন্ন শক্তিরূপে কাজ করে এবং পরম সত্যের সহিত তাহার পূর্ণ যোগ থাকে। আমাদের মনের ভেদজ্ঞান সসীমতা ও অপূর্ণতার দরুণ যেটুকু সত্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি তাহাও পুরাপুরি কাজে লাগাইতে পারি না। ফলে আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়, অনেক সময়ে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া বসি। একটা কোন কল্পনা মনে জাগিলেও তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না, ফলে উৎসাহ ভঙ্গ ও আবার নূতন করিয়া আরম্ভ, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। আমরা যাহা দেখি, যাহা বুঝি, তাহার সহিত চরম সত্যের সঙ্গতি নাই, তাই যাহা গড়িতে যাই তাহাই পণ্ড হয়। এই যে মানবের মনের মধ্যে বিরোধ, ইহা শুধু জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের নয়, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। কখনও যথেষ্ট জ্ঞান সত্ত্বেও ইচ্ছার অভাব হয়, কখনও প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও জ্ঞানের অভাব ঘটে। আমাদের জীবনে ও কার্য্যধারাতে জ্ঞান ইচ্ছা সামর্থ্য ও ব্যবহারের নানা প্রকারের অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা ক্রমাগত দেখা দেয়। ফলে সকল প্রচেষ্টাতেই অল্পবিস্তর ব্যর্থতা আসিয়া পড়ে।

All kinds of disparity and maladjustment and incompleteness of our knowledge, will, capacity, executive force and dealing intervene constantly in our action, our working out of life and are an abundant source of imperfection or ineffectivity.

এই যে অপূর্ণতা অক্ষমতা ইত্যাদি, ইহা অজ্ঞানের চির সহচর। উর্দ্ধতর জ্যোতির সাহায্য না মিলিলে ইহার প্রতিবিধান অসম্ভব। মানবমন বিজ্ঞানের আলোকে যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তেমনই সে অভিন্নতা সঙ্গতি ইত্যাদি দিব্যগুণসমূহ উপলব্ধি করিতে থাকিবে, অক্ষমতা ও ব্যর্থতার কারণগুলি কমিতে থাকিবে, ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে আরম্ভ করিবে, জ্ঞানের শক্তি ও ইচ্ছার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। বিজ্ঞানময় জীবনে জ্ঞান ও ইচ্ছা উভয়ই বিস্তৃতি লাভ করিবে, সূক্ষ্মতর শক্তিতে শক্তিমান হইবে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, will reach a greater magnitude—a higher degree of themselves, a richer instrumentation. চেতনার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সামর্থ্যও বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।

বিজ্ঞানময় জীবে জ্ঞান ও শক্তি সুসমঞ্জস হইবে। আমাদের মধ্যে যে এই সামঞ্জস্য দেখা যায় না, তাহার কারণ আমাদের চেতনা নিৰ্জ্ঞানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং আমাদের শক্তি অজ্ঞান আবরণের দ্বারা ব্যাহত। জগতে নিশ্চেতন জড়শক্তিই প্রধান শক্তি, সচেতন মন তাহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ব্যাপার। ব্যক্তিগত মনের গতিবিধি নিতান্তই সীমাবদ্ধ কিন্তু নিশ্চেতন বলিলে বুঝায় প্রচ্ছন্ন বিশ্বব্যাপী চেতনার বিরাট ক্রিয়া—The inconscient is an immense action of a universal concealed consciousnes. চারিদিকে দেখিতেছি প্রচণ্ড জড়শক্তির খেলা, আমরা ভুলিয়া যাই যে, তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বিশ্বপ্রাণ বিশ্বমন এবং সুপ্ত অতিমানস।

প্রাণশক্তির সামর্থ্য মনের অপেক্ষা বেশী কেন না যদিচ কল্পনা ধারণার রাজ্যে মন প্রধান, তথাপি সে কার্য্য করিতে পারে না জড় ও প্রাণশক্তির সাহায্য বিনা। তবু আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব জন্তুদের মধ্যে যাহা, তাহা অপেক্ষা মানুষে বেশী। ইহার কারণ চেতনা ও জ্ঞানের অধিক শক্তি, ইচ্ছার অধিক শক্তি। প্রাণময় (vital) মানব ও মনোময় (mental) মানবের তুলনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে, প্রাণময়ের সক্রিয়তা বেশী। চিন্তার ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীর সামর্থ্য বেশী কিন্তু জীবনের উপর প্রাণময়ের প্রভাব অধিক। তবে ক্রমশ মনোবুদ্ধির বলে মনোময় মানব এমন অবস্থায় পৌছিতে পারে যেখানে শুধু প্রাণশক্তি বা প্রাণীর সহজবুদ্ধি (life

instinct) পৌঁছিতে পারিবে না। চেতনা আরও অগ্রসর হইলে, মনের বাধাসমূহ অপসারিত হইলে, জড় প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব আরও অনেক বাড়িবে।

তবে মানবমন প্রাণশক্তি ও জড়পদার্থের মুখাপেক্ষী থাকার দরুণ তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ হইবেই, যদিচ সে সীমা অলঙ্ঘ্য নয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মনের উপর প্রাণের বা জড়ের প্রভাব প্রকৃতির চিরন্তন বিধান নয়। মানবের মন, ততোধিক তাহার আত্মা, নানা উপায়ে নানাদিকে জড়শক্তিকে ও প্রাণশক্তিকে আপন আয়ত্তাধীন করিতে পারে। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সাহায্যেও যে পারে তাহা নিশ্চিত। দিব্যমানসের প্রতিষ্ঠা হইলে ত কথাই নাই। গুরুবর বলিতেছেন, For the greater knowledge of the Gnostic Being would not be in the main an outwardly acquired or learned knowledge, but the result of an evolution of consciousness and of the force of consciousness, a dynamisation of the being. অর্থাৎ বিজ্ঞানময় মানবের গভীরতর জ্ঞান আসিবে, বাহিরের বিদ্যাচর্চ্চা হইতে নয়, আপন পূর্ণ পরিণত চেতনা ও সেই চেতনার শক্তি হইতে, তাহার সমগ্র সত্তার সক্রিয়তা হইতে। ফলে সে নিজের ও অপরের অন্তর সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রচ্ছন্ন শক্তিসমূহ সম্বন্ধে আপন মন—প্রাণ—দেহ সম্বন্ধে, সকল তত্ত্ব স্বতই জানিবে। এই জ্ঞানের, অন্তর্দৃষ্টির, ভিত্তি হইবে, বুদ্ধি নয়, বোধি। কেন না, বিজ্ঞানময় মানবের পূর্ণ যোগ থাকিবে সেই চিৎশক্তির সহিত, যাহা সৃষ্টির মূল। দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিতে স্নাত মানব ক্রমশ হইবে আপনার নিয়ন্তা, চৈতন্য শক্তির নিয়ন্তা, জড়শক্তির নিয়ন্তা, আপন দেহপ্রাণরূপী যন্ত্রের নিয়ন্তা —more and more master of himself, master of the forces of consciousness, master of the energies of Nature, master of his instrumentation of life and matter. অবশ্য এ অভিব্যক্তি একেবারে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক মধ্যবর্ত্তী স্তরে উর্দ্ধতম লোকের জ্যোতির সংস্পর্শের ফল দেখা যাইবে।

দিব্যচেতনার অধিষ্ঠানের ফলে নব নব শক্তির আবির্ভাব হইবে। মন দেহ-প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, দেহ প্রাণের আয়ত্তে আসিবে, আত্মা দেহ-প্রাণ-মনকে আপন আয়ত্তাধীন করিবে। আত্মা ও আত্মার মধ্যে, মন ও মনের মধ্যে, প্রাণ ও প্রাণের মধ্যে সীমা অপসারিত হইবে। ব্যক্তিগত চেতনা ও অপর সকলের চেতনা এক অভিন্ন হইয়া যাইবে। একত্বের সহিত সঙ্গতি আপনা হইতে আসিবে। একত্ব ও অভেদের বোধ হইতে পরস্পরের সম্বন্ধে একটা সহজ আন্তরিক জ্ঞান জন্মিবে। সকলেই সকলের অনুভূতি চিন্তাধারা কার্য্যধারা সম্পূর্ণরূপে জানিবে—মনের সহিত মনের, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের, প্রাণের সহিত প্রাণের, পূর্ণযোগ ও পূর্ণ পরিচয় থাকিবে।

নবজীবনের স্বভাবই হইবে অভেদজ্ঞান—conscious unanimism. আত্মার নিয়ম সঙ্গতি। সঙ্গতির মূলে বহুর মধ্যে, বিচিত্র নামরূপের মধ্যে, অনুস্যূত একত্বের অনুভূতি। বিচিত্রতা নহিলে সঙ্গতির কোন অর্থ থাকে না। বৈচিত্র্য থাকিলে হয় অসঙ্গতি নয় সঙ্গতি, হয় অসামঞ্জস্য নয় সুসামঞ্জস্য। মনোময় জগতে ভেদ ও অসঙ্গতি, বিজ্ঞানময় জগতে অভেদ ও সঙ্গতি।

চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্ভবের পূর্ব্বে জগতে যে সঙ্গতি ছিল তাহাকে শ্রীঅরবিন্দ instinctive বা সহজবুদ্ধিজাত বলিয়াছেন। মানবজীবনে ইহার জায়গায় আসিয়াছে বোঝাপড়া, মিটমাট বাকৃশক্তির সাহায্যে। কিন্তু সে বোঝাপড়াকে সঙ্গতি বলা যায় না, কারণ তাহার মূলে অভিন্নতাবোধ নাই। ভাগবত জীবনে আসিবে এক স্বতস্ফূর্ত্ত আধ্যাত্মিক একত্বজ্ঞান। বিজ্ঞানময় জীব নূতন ইন্দ্রিয় নূতন দেহযন্ত্রের উদ্ভব ত করিবেই, উপরন্তু পুরাতন যন্ত্রগুলির সূক্ষ্মতর উপযোগ করিবে।

অতি-আধুনিক মন গূঢ় প্রচ্ছন্ন চেতনা শক্তির জাগরণ মানে না। এরূপ অভিব্যক্তিকে বুজরুকি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রচ্ছন্ন চেতনার অভিব্যক্তি কেন সম্ভবপর হইবে না? প্রাকৃতিক নিয়মে চেতনা শক্তি যতটা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, মানুষ আপন চেষ্টা দ্বারা চেতনার ততোধিক অভিব্যক্তি কেন আনিতে পারিবে না, সেই পূর্ণ পরিণত চেতনা শক্তিকে কেন কাজে লাগাইতে পারিবে না? শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, It is a question of discovering and developing an instrumentation

of powers of consciousness overpassing anything that Nature has herself organised. তাহা হওয়াতে অবিশ্বসনীয় অসম্ভব কিছু নাই। যাহা আমাদের প্রকৃতি তাহা পশুদের কাছে অতিপ্রাকৃতিক। তেমনই আজ মানবের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃতিক, দেবমানবের পক্ষে দাঁড়াইবে তাহা স্বাভাবিক। আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতাতেও ত এক আধ বার আমরা উর্দ্ধতর লোকের জ্যোতির দেখা পাই। অতিমানবের অবতরণকে অযৌক্তিক অসম্ভব ভাবিবার যথাযোগ্য কারণ কিছু নাই।

আমাদের আজিকার মনোময় জীবনে দিব্য-জ্যোতির সংস্পর্শ মিলে ক্বচিৎ কখনও, কিন্তু তাহাকে কেহ বড় একটা আমল দেয় না। Mystic সাধকের গূঢ় সাধনাতে চেতনার নব নব শক্তির উন্মেষ দেখা যায় বটে কখনও কখনও। একাগ্র সাধনার ফলে অন্তরের দ্বার খুলিয়া গেলে অকস্মাৎ স্বতঃসূক্ষ্মশক্তির অবতরণ ঘটে। কিন্তু অনেক সময়ে ইহাতে সাধককে বিপদে পড়িতে হয়; কেন না, সে তখনও সেইরূপ শক্তি আবাহনের জন্য প্রস্তুত নয়। আবার যে সাধক মুক্তিকামী, ভগবৎ প্রেমে মশগুল, সে এ শক্তিসমূহ চায় না—কেন না, তাহার ভয় যে অলৌকিক শক্তি তাহার আসল কাজে ব্যাঘাত ঘটাইবে। তেমনই যেখানে সাধক কাঁচা, তাহার পক্ষেও দৈবশক্তির অকস্মাৎ অবতরণ বিপদজনক—কেন না, ইহার ফলে তাহার অহমিকা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কিন্তু যেখানে উচ্চতর সূক্ষ্মতর চেতনার জাগরণের ফলে দৈবশক্তি স্বতস্ফূর্ত্ত হইয়াছে, সেখানে বিচলিত হইবার কিছু নাই, কেন না ইহা অন্তঃপুরুষেরই অভিপ্রেত, তাঁহারই প্রকট হইবার লক্ষণ। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, Such a growth is part of the very aim of the Spiritual being within us. উচ্চতর শক্তি না নামিলে উচ্চতর চেতনাতে আরোহণের অর্থই হয় না, আরোহণ অসম্পূর্ণ থাকে। সাধারণ মানব যেরূপ তাহার মানসিক শক্তির উপযোগ করে, দেবমানব সেইরূপ ঋতচিতের শক্তির উপযোগ করিবে। ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তিতে অযৌক্তিক অবিশ্বসনীয় অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃত কিছুই ঘটিবে না। জড় হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে বুদ্ধিহীন জীব, বুদ্ধিহীন জীব হইতে বুদ্ধিজীবী মানব, যেমন অভিব্যক্তির পথে একে একে আবির্ভূত হইয়াছে, তেমনই বুদ্ধিজীবী মনোময় মানবের একদিন পরিণতি হইবে দিব্য চেতনাতে উদ্বুদ্ধ দেবমানবে। দিব্য চেতনার শক্তিসমূহ দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যম্ভাবী, indespensable to a greater or more perfect life.

সাধারণ মানব-জীবনে যে সঙ্গতি সাধিত হইতে পারে, তাহা আংশিক ও অপূর্ণ। কেন না, সে সঙ্গতি আনিবার জন্য জনসাধারণের কাহাকেও মিষ্ট কথায় ভুলাইতে হয়, কাহাকেও বোকা বুঝাইতে হয়, আবার কাহাকেও বা জোর জবরদস্তি করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, বলবান্ যাঁহারা, তাঁহারা একটা মনগড়া ব্যবস্থা করিয়া তাহা সমাজ বা রাষ্ট্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দেন। ফলে একটা জোড়াতালি-মত সঙ্গতি আসে বটে, কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু সাধারণের মনে সেই ব্যবস্থা বা সমবেত লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকে না। প্রবলের দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা অন্ধভাবে যে কার্য্যধারা বা ব্যবস্থা মানিয়া লয়, তাহার অর্থ তাহারা সম্যক বোঝে না। তাই বিরোধের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থাকে। আর থাকে, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, a mass of repressed or unfulfilled desires and frustrated wills, a simmering suppressed unsatisfaction or an awakened or eruptive discontent—রাশি রাশি অপূর্ণ বাসনা, ব্যাহত ইচ্ছা, প্রচ্ছন্ন ধূমায়মান অতৃপ্তি বা জাগ্রত অসন্তোষ-বহ্নি। এরূপ সমাজ বা রাষ্ট্র-প্রচেষ্টার মধ্যে ধ্বংসের বীজ সদাই নিহিত। নূতন চিন্তাধারা, নূতন লক্ষ্য আসিলেই বিপ্লব মারামারি কাটাকাটি অনিবার্য্য। বাহ্যিক আপাত-প্রতীয়মান সামঞ্জস্য-সঙ্গতির সহিত ভিতরের উদ্দাম প্রাণশক্তির অথবা প্রতিকূল আবেষ্টনের সংঘর্ষ নিয়ত চলিয়াছে। আধ্যাত্মিক শক্তি, আত্মসংযম, একাত্মবোধ এবং আবেষ্টনের উপর অব্যাহত প্রভাব ব্যতিরেকে স্থায়ী ও পূর্ণ সঙ্গতি সাধন কিরূপে সম্ভবে!

কিন্তু গলদ ত কেবল সমষ্টি ও সমাজ লইয়া নয়! প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই পরস্পর-বিরোধী শক্তিসমূহ অবিরাম যুদ্ধ করিতেছে। সেই শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন সামর্থ্য ব্যক্তির নাই। আপনার উপর এরূপ প্রভাব তাহার নাই। একমাত্র অন্তঃপুরুষ পারে দুর্দ্দম শক্তিসমূহকে সংযত করিতে, কিন্তু সাধারণ মানবের ত অন্তঃপুরুষ সুপ্ত! মানবের চেতনাতে যেমন একদিকে

প্রেম দয়া দরদ ইত্যাদি স্বাভাবিক সদ্গুণাবলী রহিয়াছে, তেমনই অপর দিকে রহিয়াছে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দাবী, প্রাণশক্তির ঠেলাঠেলি, স্বার্থের আকর্ষণ। সমাধান কোথা হইতে হইবে! একমাত্র পন্থা সুপ্ত পুরুষের উদ্বোধন, সত্যের দিব্য জ্যোতিতে নিরন্তর বাস।

আমাদের অন্তরের পরস্পর-বিবাদী শক্তিগুলি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, In order to make them concordant and actively fruitful in the whole being and whole life, we have to grow into a more spiritual nature. We have to live in the light and force of a higher and larger and more integral consciousness of which knowledge and power, love and sympathy and play of life-will are all natural and ever-present accorded elements. অর্থাৎ এই শক্তিসমূহকে সুসমঞ্জস ও কার্য্যকরী করিতে হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। উচ্চতর বৃহত্তর চেতনার আলোকে ও শক্তিতে আমাদের বাস করিতে হইবে। তবে আমাদের জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, দয়া, দরদ ইত্যাদি বৃত্তিগুলি সেই দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ সঙ্গতি লাভ করিবে।

একটা কথা স্পষ্ট বোঝা চাই যে, মনোবুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা মানুষ কোনদিন তাহার অন্তরের বৃত্তিসমূহের বেখাপ্পা দাবীদাওয়া মিটাইতে পারিবে না। পারিবে শুধু যদি তাহার আত্মাপুরুষ 'জাগ্রত হয়। দিব্যমানবের দিব্যজীবন আত্মাপুরুষের এই জাগরণ-সাপেক্ষ। প্রজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ মানবের ভেদবোধ থাকিবে না, তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইবে একত্ববোধ, সঙ্গত চেতনা ও সঙ্গত ক্রিয়া। এইভাবে ব্যক্তিগত জাগৃতি আসিলে প্রবুদ্ধ মানবের সমষ্টির মধ্যেও সঙ্গতিবোধ আসিতে বাধ্য। অবশ্য হয়ত এরূপ সমষ্টি বা সমাজের বাহিরে এমন সব মানুষ থাকিবে যাহারা তখনও অন্ধতা জড়তা পরিহার করিতে পারে নাই। অভিব্যক্তির পথে তাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশী দিন টিকিতে পারে না।

পুরাকালে জগতে যখন বুদ্ধিজীবী পূর্ণপরিণত মানবের উদ্ভব হইয়াছিল, তখনও অপরিণত অর্দ্ধমানব বিস্তর ছিল। কিন্তু নব-আবির্ভূত ধীশক্তিসম্পন্ন অবিনাশীয় মানবের সম্মুখে অর্দ্ধপরিণত নিয়েণ্ডারটাল নর টিকিল কই! সব মরিয়া গেল কি-না, কিরূপে মরিয়া গেল, তাহা আজও জানা যায় নাই। দুই জাতির মনুষ্যের মধ্যে যে ভীষণ রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছিল, তাহারও কোন প্রমাণ ভূগর্ভে পাওয়া যায় নাই। তেমন কিছু ঘটিলে নিশ্চয়ই ভূগর্ভে একস্থানে বহু নরপঞ্জর এবং বহু আদিম অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া যাইত। যাই হোক, নিয়েণ্ডারটাল জগতে একটিও রহিল না। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানময় মানব কাটাকাটি করিবে না, কেন না কাটাকাটি তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। মনোময় মানবকে সে দুঃসহ মেরুপ্রদেশে কি দুর্গম মরুভূমিতে বিতাড়িত করিবে না। মনোময় মানবের মুখের গ্রাস সে কাড়িয়া খাইবে না। কিন্তু দেবমানবের আবির্ভাবের পরে বুদ্ধিজীবী মানব যে ধীরে ধীরে লোপ পাইবে তাহাও সুনিশ্চিত। গুরুদেব বলিতেছেন, দিব্য নব-মানবকে পৃথিবীর সাধারণ জীবনধারার মধ্যে খাপ খাওয়াইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব সেই ধারার মধ্যে একত্ববোধ ও সঙ্গতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু বিজ্ঞানময় জীব ও অজ্ঞানময় জীবের মধ্যে একত্ববোধ, পরস্পরের সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ জ্ঞান থাকিতে পারে কি? শ্রীঅরবিন্দ আশ্বাস দিতেছেন যে ব্যাপারটি যত কঠিন মনে হইতেছে তত কঠিন কিছু সত্যই নয়, কারণ the gnostic knowledge would carry in it a perfect understanding of the consciousness of the ignorance—প্রবুদ্ধ মানব অজ্ঞানের চেতনাকেও স্বতই পূর্ণভাবে বুঝিবে। মনোময় মানব দিব্য আলোককে প্রথম প্রথম হয়ত চিনিবে না, প্রত্যাখ্যান করিবে, কিন্তু দিব্য জ্যোতি ও ঋতচিৎকে কত দিন ঠেকাইয়া রাখিবে! অবশেষে অভেদ ও সঙ্গতির প্রতীক নব মানবের চরণে তাহাকে নত হইতেই হইবে। অন্ধকার ক আলোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশীক্ষণ করিতে পারে?

এই যদি আমাদের পরিণতির চরম লক্ষ্য হয় ত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার স্বরূপ কি, তাহা বোঝা একান্ত আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত আমাদের অভিব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছে অতি আঁকাবাঁকা পথে মন্থরগতিতে। অদূর ভবিষ্যতে সোজা পথ ধরিবার কতদূর সম্ভাবনা আছে, তাহা ভাবিবার কথা। আমাদের মনোমধ্যে নানা বিরোধী ভাবনা-চিন্তার

সমাবেশ হইয়া থাকিলেও বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের অন্তরের একটা আস্পৃহা আছে জীবনের পূর্ণতার দিকে, একটা অস্পষ্ট বোধ লুক্কায়িত আছে অখণ্ড একতার।

কিন্তু কিরূপ পূর্ণতা পরিণতি চাই আমাদের! ব্যক্তিগত না সমষ্টিগত, না ব্যক্তির সহিত সমষ্টির পরস্পর সম্বন্ধগত? এ বিষয়ে মতের বা লক্ষ্যের মিল দেখা যায় না। কেহ বলেন, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই প্রধান জিনিষ। তিনি এমন সমাজ, এমন রাষ্ট্র চান, যেখানে ব্যক্তির চিন্তাক্ষেত্র, ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্র অব্যাহত, যেখানে তাহার আপন উন্নতি, আপন ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতাই হইবে চরম কাম্য। অপরে বলেন, সমষ্টিগত জীবনই আমাদের ধ্যেয়, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণই আমাদের কাম্য বস্তু, ব্যক্তিগত স্বার্থ সমগ্র জাতির স্বার্থের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। জীবদেহে এক একটি কোষ যেমন, সমুদয় জাতিতে এক একটি ব্যক্তি তেমনই। জীবের প্রাণই মুখ্য, কোষের প্রাণ নয়। আবার একথাও শোনা যায় যে এক একটি সমাজ বা রাষ্ট্র এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা, তাহার নিজস্ব প্রাণ আছে, শক্তি আছে, সংস্কৃতি আছে, ধর্ম্ম আছে, সার্থকতা আছে—এই সমষ্টিগত প্রাণ ও ধর্ম্মের কাছে ব্যক্তির জীবন কিছুই নয়। আবার এরূপ মতও শোনা যায় যে, মানুষের জীবন ত সমাজের জন্য, অপরের জন্য—তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করিতেছে, সে সমষ্টির স্বার্থে আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ কতটা নিমজ্জিত করিয়াছে তাহার উপর। ইঁহারা এরূপও বলেন যে, ব্যক্তি যেমন সমাজের জন্য, সমাজও তেমনই মানব জাতির জন্য। অর্থাৎ সমগ্র জাতির শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার ভাত-কাপড়, তাহার বাসগৃহ, তাহার ঔষধোপচার, ইহারই জন্য মানবের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র।

প্রাচীনদের চক্ষে প্রথমে সমাজের অভিব্যক্তিই ছিল মুখ্য বস্তু, কিন্তু ক্রমশ ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং পরিণতিও তাঁহাদের নজরে প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভারতের কল্পনা ছিল অন্যরূপ। ঋষিগণ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিকেই বড় বলিয়া জানিতেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিতেন যে, ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পূর্ণ পরিণতি দিতে হইলে যে সমাজের মধ্য হইতে তাহাকে উঠিতে হইবে সেই সমাজও সুগঠিত সুসমঞ্জস পূর্ণ পরিণত হওয়া চাই।

বর্ত্তমান জগতের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে জাতীয় জীবন, সুগঠিত নিখুঁত সমাজ এবং সমগ্র মানব জাতির জীবনধারাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংঘটন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, the life of the race, a perfect society and latterly to a concentration on the right organisation and scientific mechanisation of the life of mankind as a whole. ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা হইলে সমষ্টির উপকরণ বা unit মাত্র। মানুষ একটা স্বতন্ত্র মানসিক বা আধ্যাত্মিক জীব, যাহার আপন সত্তার অধিকার বা শক্তি আছে, ইহা আর কেহ বড় একটা মানিতে চাহিতেছে না।

ব্যক্তি এখন এই ভীষণ দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। প্রকৃতি তাহাকে তাহার নিজের জন্য বাঁচিতে বলিতেছে, আপন স্বতন্ত্র সত্তা সার্থক করিতে বলিতেছে। সমাজ তাহাকে বলিতেছে সমষ্টির জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য বাঁচিতে, শুদ্ধ সমষ্টির স্বার্থ সাধনের জন্য কাজ করিতে। রাষ্ট্র চাহিতেছে তাহার আনুগত্য আত্মদান স্বার্থত্যাগ। তাহার অন্তর চাহিতেছে আপন ব্যক্তিগত লক্ষ্য অনুসরণ করিতে, আপন মতানুসারে চলিতে, আপন স্বাধীন বিবেকের নিকট হইতে সর্ব্ববিষয়ে আদেশ লইতে। এই যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে, কল্পনাতে কল্পনাতে, ভাবনাতে ভাবনাতে বিরোধ—ইহা অজ্ঞানের ফল। সঙ্গতি আসিতেছে না একত্ববোধের অভাবে, চরম সত্যের উপলব্ধি নাই বলিয়া। সমস্যার সমাধান হইতে পারে শুধু চরম জ্ঞানের দ্বারা, একত্ব ও সঙ্গতির অনুভূতির দ্বারা। এই প্রজ্ঞানের মূল আমাদেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের কাজ।

There is a Reality, a truth of all existence which is greater and more abiding than all its formations and manifestations. বিচিত্র নামরূপের পশ্চাতে যে অখণ্ড অনন্ত সত্য নিহিত আছে সেই সত্যের সন্ধান পাইলে তবে মানুষ পূর্ণতম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সমগ্র মানব জাতি, ইহার প্রত্যেকটিই সেই সত্যের প্রকাশ। তবে এ কথা উপলব্ধি করা চাই যে, চরম সত্য সমগ্র মানব জাতিকে মানবত্বকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। মনোময় মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও

বিশ্ব ছিল, আবার মনোময় মানব যখন বিজ্ঞানে জাগ্রত হইবে তখনও বিশ্ব, তখনও সত্য থাকিবে।

তেমনই ব্যক্তিগত মানবের একটা সত্তা ও অভিব্যক্তি আছে যাহা সত্যের অনুসারী, যাহা তাহার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, although his mind and life are, in a way, part of the communal mind and life, there is something in him that can go beyond them ……He is not a mere cell of the collective existence. অর্থাৎ যদিচ একরকমে বলা যায় যে, ব্যক্তির মনপ্রাণ সমষ্টির মনপ্রাণের অন্তর্গত, তথাপি ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা তাহার সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সে সমাজ দেহের কোষমাত্র নয়। আবার ইহাও সত্য যে সমাজ-অর্থে সমগ্র মানবজাতি নয়, বিশ্বও নয়। যে-কোন ব্যক্তি সমাজ ছাড়িয়া সমগ্র জাতির মধ্যে বাস করিতে পারে, আবার জাতিকে ছাড়িয়া দিয়া একা বিশ্বে বাস করিতে পারে।

মোট কথা, সমাজ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইলেও সমাজকে, সামাজিক জীবন ও সামাজিক আদর্শকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তির আপন জীবন ও আদর্শ আছে। পর্ব্বতে মরুভূমে এমন সব যাযাবর মানুষ আছে যাহাদের জীবন স্বার্থসর্ব্বস্ব, যাহারা সমাজের রাষ্ট্রের ধার ধারে না। পর্ব্বত কন্দরে, গভীর অরণ্যে তপস্যারত এমন সব মানুষ আছে যাহারা অপর মানুষের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না।

তথাপি ব্যক্তিই ক্রমপরিণতির কেন্দ্র—The individual is the key of the evolutionary movement. কেন না, উচ্চতর চেতনা, সত্যের অনুভূতি যে আসিবে তাহার ব্যক্তির মনে। সমষ্টির গতিবিধি প্রধানত অবচেতন। ব্যক্তির মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পায়, সচেতন হয়। সমাজের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর তাহাদের চেতনারই ছাপ পড়ে সমাজগত চেতনার উপর। সমষ্টির পরিণতি সর্ব্বদা অনুসরণ করে ব্যক্তিগত পরিণতিকে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, Its general mass consciousness is always less evolved than the consciousness of its most developed individuals.

রাষ্ট্র যন্ত্রবিশেষ, সমাজ সমগ্র জীবনের একাংশ মাত্র। ব্যক্তির চরম পূজা, চরম allegiance, তাই এই দুইটির কাহারও প্রতি নয়, তাহার চরম বরেণ্য সেই সত্য, সেই আত্মন্, সেই ব্রহ্ম, যাহা সবের মধ্যে অনুস্যূত। তাই ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়—রাষ্ট্র বা সমাজের মধ্যে আপন স্বতন্ত্র সত্তাকে একেবারে হারাইয়া ফেলা, তাহার যথার্থ কাজ—আত্মোপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধির আলোকে সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র জাতির ক্রমোন্নতি সাধন। কিন্তু তাহার ক্ষমতা নির্ভর করিতেছে তাহার আপন সত্তার অভিব্যক্তির উপর। পূর্ণ পরিণতি তাহাকে দিবে আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য মানে isolation বা একক অস্তিত্ব নয়। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়া মানেই আধ্যাত্মিক একত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া।

এইভাবে জাগ্রত বিবেকানন্দ সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখিয়া আর্ত্ত ও দুঃস্থের ডাক শুনিয়াছিলেন। বুদ্ধ নির্ব্বাণের দ্বারে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মোহমুগ্ধ দুঃখপীড়িত মানবকে ডাক দিয়াছিলেন।

For the awakened individual the realisation of his truth being and his inner liberation and perfection must be his primary seeking.

প্রবুদ্ধ মানবের প্রথম সন্ধান হইবে সত্যের উপলব্ধি, অন্তরের পূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তির পূর্ণ-পরিণতি না হইলে সমাজের পূর্ণতা আসিতে পারে না। যেমন যথার্থ স্বাধীনতা মানে অন্তরস্থ আত্মার মুক্তি ও চরম সত্যের উপলব্ধি তেমনই পূর্ণতা মানে আমাদের সকল চিন্তা ও সকল কার্য্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতিষ্ঠা।

আমাদের স্বরূপ জটিল ও আপাত অসমঞ্জস। এই অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতির একটা সরল পন্থা বাহির করা আমাদের মুখ্য কাজ। জড়জীবনই ক্রমোত্তরণের ভিত্তি। প্রকৃতি ক্রমবিকাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন সেইখান হইতে। মানুষকেও আরম্ভ করিতে হইবে সেইখানে। যাত্রা আরম্ভ মাত্র। থামিলে চলিবে না, থামিলে ত মানুষের আপন অভিব্যক্তি বন্ধ হইত। তাহাকে প্রথম চিনিতে হইবে নিজেকে জড় আবেষ্টনে অবস্থিত মনোময় জীব বলিয়া, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে। প্রাচীন ইউরোপে গ্রীসীয় জাতি এই পন্থাই ধরিয়াছিল। রোমক যুগে গ্রীসীয় সংস্কৃতি

ধারা কতকটা অন্য পথে গেল, রোমকেরা সংহতি শক্তিকে, সংঘটনকে বড় করিয়া দেখিতে লাগিল। এই গ্রীসীয় রোমক সাধনারই ক্রমিক পরিণতি আধুনিক কালে দাঁড়াইল যুক্তিবাদ, কেবল বুদ্ধির দ্বারা জীবনের নিয়মন, জড়বিজ্ঞানকে সাধনা মন্দিরে শ্রেষ্ঠ আসন দান।

আমাদের পূর্ব্বজদের প্রেরণা ছিল সত্য শিব ও সুন্দর। এই প্রেরণার আলোকে তাঁহারা আপন দেহ-প্রাণ-মনকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সাধনা এখানে থামে নাই; কেন না অতি সত্বরই তাঁহাদের মনে জাগিয়াছিল একটা আধ্যাত্মিক আস্পৃহা। তাঁহারা চরম সত্যের জ্যোতিতে সারা বিশ্বকে এক অখণ্ড অনন্ত সত্তা বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই জ্যোতিই হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টীয় প্রভৃতি আশিয়া মহাদেশের সম্প্রদায়সমূহ জগৎময় বিকীর্ণ করিয়াছিল। কিন্তু সে দিব্য ভাতি পরবর্ত্তী বর্ব্বর যুগের মারামারি কাটাকাটির মধ্যে নিভিয়া গেল। অরাজকতার অবসানে এক নবীন কৃত্রিম আলোকে সভ্যজগৎ উদ্ভাসিত হইল, সত্য-শিব-সুন্দরের বেদীর উপর অধিষ্ঠিত হইল বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞান। নূতন সংস্কৃতির লক্ষ্য হইল অর্থনীতির দিক দিয়া পূর্ণপরিণত সমবেত জীবন—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, শান্তিরক্ষা,স্বাস্থ্যরক্ষা, শিল্পকলা, বিদ্যানুশীলন, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। পরন্তু সবেরই ভিত্তি বুদ্ধি-উপলব্ধ নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক রহিল না। আমাদের প্রাচীনেরা যে ঐহিক ও পারত্রিকের সামঞ্জস্য দেখিয়াছিলেন, তাহা লোপ পাইতে বসিল। ইহার অনিবার্য্য পরিণাম যাহা, তাহা ঘটিল—বিশৃঙ্খলা অন্তরে ও বাহিরে, ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, all received values were overthrown and all firm ground seemed to disappear—নবীন সংস্কৃতির ভিত্তি হইল চোরা বালি। এই বিরাট গণ্ডগোলের মাঝে আজ আমরা দাঁড়াইয়া আছি।

মানব পরিণতবুদ্ধি, জড়বিদ্যার কল্যাণে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ তাহার দাসীবাঁদী, অথচ আধ্যাত্মিক প্রেরণার একান্ত অভাব, এ অবস্থাকে আদিম বর্ব্বরতাতে প্রত্যাগমন বলিলে দোষ হয় না। এরূপ সমাজ বা রাষ্ট্র অতি সহজেই হীন স্বার্থসাধনের যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়, মানবের অন্তরস্থ সুপ্ত রাক্ষস ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। ইতিহাসে আমরা বহুবার দেখিয়াছি যে, অতি সভ্য কিন্তু প্রাচীন, জরাগ্রস্ত, অবসন্ন জাতি শক্তিশালী বর্ব্বরের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এবার আর বোমা-বিমান সংরক্ষিত সভ্যতার কোন লোকসান বর্ব্বরে করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাদেরই অন্তরের বর্ব্বরকুল সভ্যতার মুখোস পরিয়া আমাদের ধ্বংস সাধনের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, That is bound to come if there is no high and strenuous mental and moral idcal liberating him from himself into his inner being. অর্থাৎ মানুষ যদি উচ্চতর মানসিক ও নৈতিক প্রেরণাবশে আপন অন্তরতম সত্তার সংস্পর্শ লাভ না করে ত তাহার এই গতি অবশ্যম্ভাবী। শুধু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একটা জাতিকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। যদি তাহার অন্তর পরমসত্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া থাকে, তবেই সে অভিব্যক্তির পথে বাঁচিয়া থাকিবে, নহিলে নয়। প্রকৃতির অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে। তাহা নিয়তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু দিব্য চেতনা হইতে বিচ্যুত মানব বহু প্রাচীন প্রাণীসমূহের মত পথপার্শ্বে পড়িয়া থাকিবে, as an evolutionary failure. যে প্রকৃতির অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে পারিল না, তাহার আর স্থান কোথায় হইবে! বড় জোর, সে একটা সামান্য নগণ্য জীবরূপে নবীন জগতের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইবে। যেমন সেকালের Dinosaur প্রভৃতি অতিকায় গোধাকুল বিবর্ত্তমান প্রকৃতির সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া বাঁচিয়া রহিল ক্ষুদ্র টিকটিকি গিরগিটি রূপে। মানবের ক্রম-পরিণতির পথে একটা সঙ্কট সময় আসিয়াছে। একদিকে সে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু অপর দিকে তাহার বাড় থামিয়া গিয়াছে। এই বাড় থামিয়া যাওয়া overspecialisation, অতিবৈশেষ, ক্রম-পরিণতিতে অতি মারাত্মক রোগ। প্রকৃতির অগ্রগতির সহিত এই রোগগ্রস্ত প্রাণী চলিবে কিরূপে! মানুষ আজ বিশাল জটিল সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহ গড়িয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সসীম মনোবুদ্ধি, তাহার অপরিণত আধ্যাত্মিক সত্তা সেই বিরাট সংঘটনের সহিত তাল রাখিতে পারিতেছে না। তাহার সৃষ্ট সভ্যতা সংস্কৃতি তাহাকেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে। মানবের সভ্যতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে a too dangerous servant of his blundering ego and its appetites,

বোকা মনিবের অতিচতুর চাকর। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নানাবিধ দাবী-দাওয়া মিটাইবার শক্তি মানুষের নাই। নিত্য নব নব অভাব সে সৃষ্টি করিতেছে ও সেই অভাব পুরাইবার জন্য অহরহ হাঁকুপাকু করিতেছে। সমষ্টিগত স্বার্থ এবং সেই স্বার্থের সিদ্ধি লইয়া সমষ্টিগুলির মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রাকৃত বিদ্যার চর্চার ফলে মানুষের শক্তি বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, সমগ্র মানব জাতির বাহ্যিক জীবনধারা এক ছাঁদের হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অন্তরে সাম্য বা মৈত্রী নাই, একত্ববোধ ত দূরের কথা! প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক সমষ্টি, আপন মত, আপন চিন্তাধারা ও আপন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া মশগুল। সঙ্গতির আশা সুদূরপরাহত। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়

All that is there is a chaos of clashing mental ideas, urges of individual and collective physical want…a rich fungus of political and social and economic nostrums …slogans and panaceas for which men are ready to kill and be killed. অর্থাৎ আছে শুধু পরস্পর-বিরোধী মনোভাব, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভাব-অভিযোগের তাড়না, রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতিক সামাজিক ব্যাধির টোট্‌কা ঔষধ, মুখে নানারূপ বাঁধা বুলি নানা বাঁধা গৎ—যাহার জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ও প্রাণ লইতে সদাই উন্মুখ।

(ক্রমশঃ)

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

যেদিন হৃদয়-জলধিতে তব জাগিল মন্ত্র—আমার দেশ,
উঠিল বঙ্গে মহাকলরব প্রাসাদ হইতে কুটীর-শেষ ;
নবীন জীবন আনিল তোমার সঙ্গীত নব, জাতীয় ঋক্,
হর্ষে-পূরিল বঙ্গের প্রাণ বরষিল আশা সকল দিক্ ;
ঊর্দ্ধে ধরিলে বিজয়মাল্য, অহে বঙ্গের চারণ বীর,
গৌরব হার লইতে তোমার উন্নত হ'ল আনত শির।

ত্যজিয়া নিদ্রা উঠিয়া বসিল স্বপ্ন-জড়িত অলস প্রাণ,
ধূলিধূসরিত ছিন্নবীণায় সহসা বাজিল ভিন্ন গান,
মোহিত বঙ্গ-হৃদি-মৃদঙ্গে শত মুদ্গর-কঠোরাঘাতে
মুর্ত্তনিনাদে বাজিল দামামা নবজীবনের দীপ্ত প্রাতে ;
ঊর্দ্ধে বাজালে ভৈরব-ভৈরী ভক্ত গায়ক, বাদক বীর,
চমকি উচ্চে চাহিল বাঙ্গালী উন্নত করি আনত শির।

কহিলে পরশি দৈন্য মলিনে—মানুষ তোমরা, নহত মেষ,
পরশে শিহরি কহিল তাহারা—মুছাব কালিমা, ঘুচাব ক্লেশ ;
কহিলে ডাকিয়া—পরানুকরণ, এ নহে তোমার উচিত কার্য্য,
কহিল তাহারা, আজ হ'তে মোরা আপনার ঘরে ফিরিব আর্য্য!
গাহি সঙ্গীত কহিলে, বিদেশে যুদ্ধ করেছে বাঙ্গালী বীর,
লজ্জা মলিন কহে দীনহীন, উচ্চ করিব আনত শির।

হাসিয়া কহিলে, মানুষের দেশ, নিশ্চয় এরা বানর নয়,
বিদেশীয় ভাষা, বিদেশী সজ্জা কেন তবে সবে বরিয়া লয়।
লজ্জায় হাসি কহিল তাহারা, ক্ষম এ মোদের ক্ষণিক ভ্রান্তি,
শুষ্ক নীরস বিদেশের ভাব মোদেরো চিত্তে এনেছি শ্রান্তি!
পরালে বস্ত্র ইঙ্গ-বঙ্গে স্বদেশের বুলি ধরালে বীর,
অসার গর্ব্বে গর্ব্বিত সবে—সত্যই হ'ল উচ্চ শির!

সক্রোধে কহ, ধর্ম্ম তোমার—ধর্ম্মের নামে পাপের পথ,
পঙ্কিল পথে কেমনে চলিবে উন্নতিশীল জাতির রথ?
জিজ্ঞাসে সবে, দাও কহি তবে, কোন্ পথে যেতে মোদের কও?
কেশরি-কণ্ঠে মন্দ্রিত হ'ল—আবার তোমরা মানুষ হও!
ঘর্ঘরি চলে বঙ্গের রথ, আপনি তাহাতে সারথি বীর,
পার্থের রথে যেন হৃষীকেশ ধরিয়া রজ্জু উচ্চ শির!

প্রাণটা তোমার মেবার পাহাড়—ঠিক তারি মত বিশাল, উচ্চ,
অটুট প্রতাপ যুঝিল সেথায় করিয়া দীনতা হীনতা তুচ্ছ!
শান্ত সমীর গঙ্গার তীর—পুণ্য সলিল অমল স্নিগ্ধ,
হৃদয় তোমার তুল্য তাহার পাতকি রাজ্যে অপাপবিদ্ধ ;
পতিত এদেশে জনম লইয়া পতিতোদ্ধার করিলে বীর,
জীবনে মরণে ঐক্য রাখিতে জাহ্নবী তীরে রাখিলে শির।

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

তেরো

ছিরু পাল অকস্মাৎ শ্রীহরি ঘোষ অথবা ঘোষ মশায় হইয়া গেল। জমিদারের গমস্তা হইয়া আকৃতিতে প্রকৃতিতে সত্যই অনেকটা ভদ্র হইয়া উঠিল। শ্রীহরি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া অনুভব করিল যে, এতদিন ধরিয়া—লোকের অনিষ্ট করিয়া অন্যায়-ভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াও যাহা সে আকাঙ্ক্ষা করিযাছিল অথচ পায় নাই—এই গমস্তা-গিরি লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহা পাইয়া গেছে। নতুবা তাহার মন পরিতৃপ্ত হইল কেমন করিয়া!

শ্রীহরির আড়ালে আছে কিন্তু দেবদাস ঘোষ—দেবু পণ্ডিত। দেবু পণ্ডিত বুদ্ধিমান লোক, তাহার উপর আপনার বুদ্ধি বিদ্যার উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। বুদ্ধির সহিত তাহার খানিকটা কল্পনাও আছে। বিদ্যা অবশ্য অল্প, কিন্তু দেবু সেইটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে। এ গ্রামে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি কাহাকেও তো সে দেখিতে পায় না! জগন ডাক্তার পর্য্যন্ত তাহার তুলনায় কম-শিক্ষিত। কঙ্কণার হাই-ইস্কুলে জগন ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া—পড়া ছাড়িয়া বাপের কাছে ডাক্তারী শিখিয়াছে। দেবু পড়িয়াছে সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত। পড়া শুনাতে সে ভালই ছিল, পড়িলে সে যে ম্যাট্রিক পাশ করিত—ভালভাবেই পাশ করিত, এ-কথা আজও কঙ্কণার মাস্টারেরাই স্বীকার করে। দেবু নিজে জানে—পড়িতে পাইলে—সে বৃত্তি লইয়া পাশ করিত। তাহার পর আই-এ, বি-এ—দেবদাসের কল্পনা সুদূর-প্রসারী। সঙ্গে সঙ্গে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য। হঠাৎ তাহার বাপ মারা গেল। চাষবাস, সংসার দেখিবার দ্বিতীয় পুরুষ বাড়ীতে ছিল না। তাহার মা অন্য গ্রাম্য মেয়েদের মত মাঠে ঘুরিয়া—অন্য লোকের সঙ্গে পুরুষের মত ঝগড়া করিয়া ফিরিবে—এও দেবুর কল্পনায় ছিল অসহ্য। তাই সে পড়াশুনা ছাড়িয়া চাষ ও সংসারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু সন্তুষ্ট-চিত্তে নয়, অসন্তোষ অহরহই তাহার মনে জাগিয়া থাকিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় ইউনিয়ন-বোর্ড ফ্রি-প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিতেই সে চাষবাস ছাড়িয়া—ঐ স্কুলে একজন পণ্ডিত হইয়া বসিল। বেতন—মাসে বারো টাকা। চাষ-বাস সে ভাগে ঠিকায় বন্দোবস্ত করিয়া দিল। লোকে এইবার তাহাকে বলিল—পণ্ডিত। খানিকটা সম্মানও করিল, কিন্তু তাহাতেও তাহার পরিতৃপ্তি হইল না। তাহার ধারণা, এ গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্মান তাহার প্রাপ্য। অরণ্যানীর শিশু-শাল যেমন বন্যলতার দুর্ভেদ্য জালকে ভেদ করিয়া সকলের উপরে মাথা তুলিতে চায়, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে একা নিজে আলোক-ভোগের জন্যই সে উর্দ্ধলোকে উঠিতে চায় না। নীচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার সঙ্গে আকাশ-লোকে চলুক—এই তাহার আকাঙ্ক্ষা। ছিরু পালের অর্থ-সম্পদ এবং বর্ব্বর পশুত্বকে সে ঘৃণা করিত, কারণ ছিরুর অর্থের জন্য লোকে তাহাকে সম্মান করিত, বর্ব্বর পশুত্বকে করিত ভয়। জগনের আভিজাত্যের আস্ফালনও তাহার অসহ্য। বংশানুক্রমিক দাবীতে হরিশ মণ্ডল গ্রামের মণ্ডল—এও সে স্বীকার করিতে চাহিত না। ভবেশ মুকুন্দ বয়সের প্রাচীনত্বের দাবীতে বিজ্ঞতার ভানে কথা কহিলে—সেও সে সহ্য করিতে পারিত না।

দেবুর ঘৃণা অবশ্য অহৈতুকী অথবা একমাত্র আত্মপ্রাধান্য-হইতেই উদ্ভুত নয়। সে যে চোখের উপর গ্রামখানাকে দিন দিন অবনতির পথে গড়াইয়া যাইতে দেখিতেছে। অর্থ-বলে এবং দৈহিক শক্তিতে ছিরু যথেচ্ছাচার করিতেছে। শুধু ছিরু কেন—গ্রামের কেহই কাহাকেও মানে না, সামাজিক আচার ব্যবহার লোপ পাইতে বসিয়াছে, মানুষ মরিলে—মড়া বাহির হয় না, সামাজিক ভোজনে—একই

পংক্তিতে ধনী দরিদ্রের ভেদ দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি কামার, ছুতার, বায়েন কাজ ছাড়িল, দাই, নাপিত চিরকেলে বিধান লঙ্ঘনে উদ্যত হইল। যাহার পাঁচ টাকা আয়—সে দশ-বিশ টাকা খরচ করিয়া বাবু সাজিয়া বসিয়াছে। ঋণের দায়ে জমি বিকাইয়া যাইতেছে, ঘটি বাটী বেচিতেছে, তবু জামা চাই, জুতা চাই, সৌখীন-পাড় কাপড় চাই, ঘরে ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন চাই। ছোকরাদের পকেটে বিড়ি দেশলাই ঢুকিয়াছে, তামাক চকমকি বাতিল হইয়া গেল। এ-সবের প্রতিকার করিবার সাধ্য যাহাদের নাই, তাহারা প্রধান হইতে চায় কেন, কিসের জোরে?

দেবু পণ্ডিত পাঠশালায় ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে অনেক কিছু ভাবিত। গ্রামের সকল জন হইতে নিজেকে পৃথক রাখিয়া—আপনার চিন্তাকে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিত—অক্লান্তভাবে—অবিরাম। সামান্য সুযোগও সে কখনও ত্যাগ করে নাই।

অকস্মাৎ ছিরুকে আয়ত্ত করিয়া তাহার কল্পনা আকাঙ্ক্ষা—অভাবনীয়রূপে সফল হইবার উপক্রম করিল।

* * * *

একশত বৎসর পূর্ব্বেও ডাকাতেরা কালী পূজা করিত। ডাকাত হইলেও কালীপূজায় তাহাদের নিষ্ঠা ছিল অকৃত্রিম এবং ভক্তিতে তাহারা কাহারও চেয়ে খাটো ছিল না। ছিরুর দেবপূজায় নিষ্ঠা এবং ভক্তি ঠিক ওই জাতীয়। আধ্যাত্মিক জীবনের সংস্কার এবং জটিল বিষয়বুদ্ধির প্রেরণায় তাহার জীবন যেন ছোট-বড় দুইটা কুঠুরীতে বিভক্ত। যখন যেটার মধ্যে ছিরু প্রবেশ করে, তখন সেই ঘরের প্রভাব তাহার জীবনে প্রধান, এমন-কি সর্ব্বস্ব হইয়া ওঠে, ভোজরাজার সিংহাসনের মত। তাই সে নবান্নের দিন অন্নপূর্ণা পূজা করিতে গিয়া দ্বারিক চৌধুরীর দৃষ্টান্তে—অথবা প্রতিযোগিতায়—গ্রামের লোকের ট্যাক্সটা দিয়া ফেলিয়াছিল। দেবদাসও সে দিন সেই মুহূর্ত্তে ছিরুর কাছে আগাইয়া আসিয়াছিল শ্রদ্ধেয় গুণগ্রাহীর মত।

তারপরই আসিল এই গমস্তা-গিরির প্রস্তাব। জমিদারের তরফ হইতেই প্রস্তাবটা আসিল। উনিশ শো চৌদ্দ হইতে উনিশ শো আঠারো পর্য্যন্ত—সর্ব্বনাশা মহাযুদ্ধের ফলে—জমিদারদের অবস্থা বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আয় তাহাদের নির্দ্দিষ্ট, অথচ জিনিষপত্র হইয়া উঠিয়াছে অগ্নিমূল্য। প্রজাদের অবস্থাও ধীরে ধীরে শোচনীয় হইয়া আসিতেছে, চাষের অন্ন উৎপন্নের দাম ক্রমশ কমিতে সুরু করিয়াছে; অথচ প্রত্যেকটি জিনিষের দাম মরণ-জ্বরজর্জ্জর রোগীর দেহের উত্তাপের মত ডিগ্রীর পর ডিগ্রী বাড়িয়া চলিয়াছে। জমিদারের সিন্দুক শূন্যগর্ভ, মহাজনের ঘরে সুদের অঙ্ক গোকুলের শিশুর মত কলায় কলায় বাড়িতেছে। জমিদার অনেক হিসাব করিয়া শাঁসালো-প্রজা শ্রীহরিকে গমস্তা নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব পাঠাইল।

ছিরু রাজী হইল না। আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল, কিন্তু আশঙ্কা তাহার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশী। কাগজের উপর গুটি গুটি কালীর আখরের অরণ্য তাহার অপরিচিত।

দেবু তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল—নিবি না—মানে? চিরকালই কি চাষাই থাকবি না কি? কাল যদি এ মহল বিক্রী হয়, তোর টাকা আছে, তুই নিবি না?

ছিরু স্থির দৃষ্টিতে দেবু পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহল কিনিলে সে তো জমিদার হইবে! নখের ডগা হইতে মাথার উপরে রক্তপ্রবাহ সন্ সন্ করিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। জমিদার আসিলে তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে! কঙ্কণার জমিদারদের আসরে—সেহোড়া গ্রামের নিম্নজাতীয় সৌ বাবুরাও বসিয়া হা-হা করিয়া হাসে; জাতিতে সাহা হইলেও, জমিদারীর দাবীতে—তাহারা অপাংক্তেয় হয় না!

দেবু আবার বলিল—টাকা মানুষের কিসের জন্যে? শুধু পেটে খাবার জন্যে, না বাড়ীতে কাঁড়ি ক'রে পুঁতে রাখবার জন্যে?

ছিরুর বুকে হৃদ্‌পিণ্ড ধ্বক ধ্বক করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল।

পণ্ডিত বলিয়াই চলিয়াছিল—জমিদার সেধে গমস্তা-গিরি দিতে চাচ্ছে, তোর পয়সা রয়েছে, তুই নিবি নে? ... নে তুই গমস্তা-গিরি, দেখ্ না, গাঁখানাকে একেবারে কেমন সোজা সায়েস্তা করে দিই। গাঁয়ের লোক বাপ বলবে—আর তোর কাছে মাথা নোয়াবে।

ছিরুর মনে একটা অদ্ভুত মোহ জাগিয়া উঠিল। সে গমস্তাগিরি গ্রহণ করিল। সঙ্গে-সঙ্গে বেশ ভাল-রকমের একখানা বাহিরের ঘরের পত্তন হইল। নিত্য সন্ধ্যায় গ্রাম্য

মজলিসের সব চেয়ে বড় জটলাটি—ছিরুর ওখানেই এখন বসে। ছিরু তামাকের বন্দোবস্ত রাখিয়াছে। লোকে তামাক খায়, গল্প করে, ছিরুর বড় ভাল লাগে। এতগুলি লোক তাহার বাড়ীতে তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে!

জমিদার বাকী-বকেয়ার হিসাব দেখাইয়া টাকাটা ছিরুর কাছে দাবী করিতেই কিন্তু ছিরু লাফাইয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! দেড় হাজার টাকার হিসাব! এই টাকা ঘর হইতে দিয়া পরে এই দেশ সুদ্ধ লোকের কাছে তাহাকে কড়াক্রান্তি হিসাবে আদায় করিয়া উশুল করিতে হইবে! সে রাগে উদ্বেগে অধীর হইয়া দেবুর কাছে আসিয়া ফর্দ্দখানা দেখাইয়া বলিল—এই দেখ!

দেবু ফর্দ্দখানায় চোখ বুলাইয়া দেখিল। দেনদার প্রজা কেবল শিবপুর কালীপুরের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। কঙ্কণার বাবু-নামধারী মহাশয়গণও এ গ্রামের প্রজা, তাঁহাদের হাতেই এখন জমি বেশী এবং খাজনার বাকীর পরিমাণও তাঁহাদেরই মোটা। নদীর ওপারে জংসন শহরটাতে এ গ্রামের প্রজা আছে। দেবু মনে মনে চোখের সম্মুখে বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্র এবং অসংখ্য মানুষ প্রত্যক্ষ করিল; গম্ভীর ভাবে সে বলিল—হুঁ।

ছিরু বলিল—হুঁ তো বটে। কিন্তু আমাকে যে ডুবতে হবে। এই দেড় হাজার টাকা ঘর থেকে দিয়ে—

বাধা দিয়া দেবু বলিল—সুদ সুদ্ধ পাবি তুই। আপোষে না দেয়, আইন-আদালত আদায় ক'রে দেবে। খাজনা আইনের সুদ জানিস? প্রথম বছরের বাকীতে টাকায় এক আনা সুদ, দ্বিতীয় বছরের তিন আনা, তৃতীয় বছরের পাঁচ আনা, চতুর্থ বছরের সাত আনা! দেবুর চোখ দুইটা গুরুত্বের গাম্ভীর্য্যে স্থির এবং দীপ্ত হইয়া উঠিল। তারপর আবার সে বলিল—তুই কিচ্ছু ভাবিস নে, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। চুপ করে বসে তুই কেবল দেখে যা।

দেবু ছিরুকে মিথ্যা অভয় দিল না। সে আগাগোড়া বাকীদার প্রজার নাম ও বকেয়ার হিসাবের ফর্দ্দ করিয়া নালিশের উদ্যোগ করিতে বসিল। লোকে এবার চমকিয়া উঠিল। এই অনটনের দিনে অধিকাংশ চাষী প্রজারই খাজনা বাকী পড়িয়া আছে,. অন্য গ্রামের—বিশেষ করিয়া কঙ্কণার মধ্যবিত্ত ভদ্র চাকুরে বাবুরা—জমিদারের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া খাজনা বাকী ফেলিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ছিরুর অর্থ আছে। নালিশ করিতে তাহার অর্থের অভাব হইবে না। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই টাকা আদায় আরম্ভ হইয়া গেল। চাষী প্রজারা ঋণ করিয়া কিছু কিছু মিটাইয়া দিল। ঋণের ব্যবস্থা করিয়া দিল দেবুই। সে তাহার সঞ্চিত দুইশত টাকা পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া টাকাটা গ্রামের চাষীদের দাদন করিল। সুদ সে বেশী চাহিল না। সুদের আকাঙ্ক্ষাও তাহার বেশী ছিল না। দশের উপকারের জন্য এবং ছিরুকে গমস্তা-গিরিতে সাহায্য করিবার জন্যই কাজটা সে করিল এবং কাজটা করিয়া নিজে সে খুসীও হইল। গ্রামের দশজনেও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া পারিল না।

ছিরু নিজেও দেবুর আচরণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

খাজনা দিল না, এমন কি নালিশ না করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিবার জন্যও কোন অনুরোধ জানাইল না—ডাক্তার জগন ঘোষ, অনিরুদ্ধ কর্ম্মকার, গিরীশ সূত্রধর। তাহারা আসিবে না একথাটা জানা-কথা। তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশের আর্জ্জি প্রস্তুত হইয়াই আছে। পাতু মুচির দেবত্র চাকরাণ উচ্ছেদের নালিশের আর্জ্জিও হইয়া গিয়াছে। ওটাতে দেবুর খানিকটা স্বার্থ আছে। পাতুর দেবত্র চাকরাণ জমিটা তাহার জমির পাশেই। ছিরু দেবুর মনের কথার আঁচ যে পায় না এমন নয়, কিন্তু পাতু বা জগন অনিরুদ্ধের বিরুদ্ধে সব কিছুতেই সে রাজী। বরং এতটুকুতে সে সন্তুষ্টই নয়। সে আরও কঠিনতর কোন পথ অবলম্বন করিতে চায়। সকলের চেয়ে বেশী আক্রোশ তাহার অনিরুদ্ধের উপর। তারা নাপিত সেদিন তাহাকে কামাইতে বসিয়া জগনের কাছে শোনা-কথা ছিরুকে বলিয়াছে। অনিরুদ্ধ দেবস্থলে অথবা কোন অপদেবতাস্থলে তাহার অনিষ্ট কামনায় যাতায়াত করিয়াছে শুনিয়া ক্রোধ এবং শঙ্কার তাহার সীমা নাই। প্রতিকারের জন্য মন্ত্র-তন্ত্রে সিদ্ধ ওঝা-বন্ধু চন্দ্র গড়াঞীর কাছে একটা মন্ত্রপূত শিকড় তামার কবচের মধ্যে পুরিয়া ছিরু হাতে ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেটাকে সে কপালে স্পর্শ করে।

সে-দিন দেবু উপস্থিত ছিল না। সে ও-পারে জংসন সহরে গিয়াছে এই খাজনা আদায়েরই কাজে। সহরের

একজন মাড়োয়ারী এ গ্রামের সীমানায় জমি কিনিয়াছে। সেই জমির খারিজ-নজর এবং বাকী খাজনা লইবার জন্য মাড়োয়ারী নিজেই লোক পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়াছে। ছিরু একা বসিয়া গম্ভীর ভাবে সেরেস্তার কাগজের পাতা উল্টাইতেছিল। সহসা খিড়কীর ওদিকে মায়ের কর্কশ ভাঙা গলার গালিগালাজে ছিরু চমকিয়া উঠিল। মা গাল দিতেছে বউকে। সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। এখন তাহার মান-সম্মান হইয়াছে, এখন এমন ইতরের মত গালিগালাজ কি শোভা পায়! তাহার উপর বউটা এখন পূর্ণগর্ভা। ছিরু মায়ের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া পড়িল। দাওয়া হইতে নামিতেই কিন্তু আর একটা কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিল। তীক্ষ্ণ—তীব্র—অতি মাত্রায় হিংসাজর্জ্জর কণ্ঠস্বর।

কে—কার কণ্ঠস্বর?

অনিরুদ্ধ কামারের বউটা; দীর্ঘাঙ্গী কামারিণীর কণ্ঠস্বর!

নবলব্ধ আভিজাত্যের গণ্ডী ঘেরা বর্ব্বরতা তাহার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। একখানা বাঁশের কঞ্চি কুড়াইয়া লইয়া সে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু পিছন হইতে কে ডাকিল—সালাম গো পালমশয়।

ছিরু পিছন ফিরিয়া দেখিল—কঙ্কণার অন্যতম জমিদার মণিবাবুর চাপরাশী তাহাকে সেলাম জানাইতেছে। সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ওই লোকটি বেশ নাম-করা লাঠিয়াল, মণিবাবুর বাড়ীর বহুদিনের পুরানো লোক। আজও পর্য্যন্ত কখনও সে তাহাকে সেলাম করে নাই। ছিরু হাসিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—এস সেখজী এস।

সেখ বলিল—বাবু পাঠালেন গো আপনার কাছে। বুললেন, পালকে একবার খবর দিবা তো সেখ। জরুরী কথা আছে তেনার সাথে।

ছিরু অধিকতর বিস্মিত হইল। তাহার সহিত মণিবাবুর কথা আছে! মণিবাবু তাহাকে 'তেনার' বলিয়াছেন! ছিরু, সেখকে খাতির করিয়া বলিল—বস বস সেখ, তামাক খাও। ওরে—ও ছিদাম! ছিদাম রে! ছিদাম ছিরুর মাহিন্দার।

সেখ বলিল—ওই সব বাউড়ী মুচিতে কাম চলে না পাল মশই, এইবার আপুনি একজন ভালো লোক রাখেন।

ভাল লোক!—দিতে পার সেখজী একজন ভাল লোক?

—হাঁ। কেনে পারব নাই? এমন লোক দিব, দেখবেন, হুকুম করলি বাঘের মুণ্ডু লিয়ে আসবে।

ছিরুর মনে জাগিয়া উঠিল—অনিরুদ্ধ জগন গিরীশ পাতু।

ওদিকে মায়ের কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। কি বিপদ! এই লোকটা বলিবে কি? ছিরু উঠিল, সেখকে বলিল—একটু বস সেখ, আমি আসছি এখুনি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ছিরু দ্রুতপদে আসিয়া খিড়কীর দরজায় ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া শাসন করিয়াই ডাকিল—মা!

তাহার মা ওই খিড়কীর ঘাটে দাঁড়াইয়াই অনিরুদ্ধের খিড়কীর দুয়ারে দাণ্ডায়মানা কামারিণীর গালিগালাজের উত্তর দিতেছে। পদ্ম নিজের খিড়কীর দরজার মাথায় দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিষ্ঠুর অভিসম্পাত দিতেছে। তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

ছিরুর মন আবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—তাহার শক্তি আছে, অর্থ আছে, সে জমিদারের প্রতিভূ; অনিরুদ্ধের সম্পত্তি, অনিরুদ্ধের ইজ্জত—ধন মান সব কাড়িয়া লইয়া সে যদি তাহাকে ধূলায় লুটাইয়া দিতে না পারে—তবে সবই মিথ্যা—সবই ব্যর্থ!

অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়িসই জমিটাকে তাহার মনে পড়িল। প্রত্যক্ষ চোখের উপর দাঁড়াইয়া আছে—শীর্ণাঙ্গী—দীর্ঘতনু কামারিণী।

চৌদ্দ

পদ্ম অভিসম্পাত দিতেছিল—নিষ্ঠুর অভিসম্পাত। শ্রীহরির সন্তান, স্বাস্থ্য, সম্পদ—সমস্ত কিছুর উপর ধ্বংসের অভিসম্পাত দিতেছিল। অপরাধ ওজন করিয়া অভিসম্পাত নয়, গভীরতম আক্রোশে নিষ্ঠুরতম অভিসম্পাত।

অনিরুদ্ধ বাড়ীতে নাই, ভোর বেলাতেই সে জংসন সহরে চলিয়া গিয়াছে, আসিবে সেই গভীর রাত্রে। রাত্রে আসিয়া হয় তো খাইবে, নয় তো খাইবে না। মাসের অর্দ্ধেক দিনই খায় না, আসিয়াই বিছানায় পড়িবামাত্রই ঘুমাইয়া পড়ে। জংসনে মদের দোকানে—মদের সঙ্গে এটা-ওটা-সেটা খাইয়া আসে। নেশা কম থাকিলে অথবা নেশা না করিলে—সেই কয়েক দিন খায়। সকাল ছ'টা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত সে এখন জংসনের কলে খাটে। দৈনিক মজুরী আট আনা। পাঁচটার পর সে আপনার

কামারশালা খুলিয়া বসে। সেখানে কাজ করে রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত, যেদিন যেমন কাজ থাকে। কাজই বা কোথায়? চাষের যন্ত্রপাতি মেরামতের সামান্য কাজ। গত বৎসর পর্য্যন্তও চাষের যন্ত্রপাতি গড়ার কাজ কিছু ছিল; কিন্তু জংসন সহরে বড় লোহার দোকানটা খুলিয়া অবধি সে-কাজ উঠিয়া গিয়াছে। ফাল, কোদাল, টামনা, এমন কি কাস্তে পর্য্যন্ত তাহারা আমদানী করিয়াছে। জিনিষগুলা মজবুত হয় তো কম, কিন্তু এমন চাকচিক্যময় আর এমন সস্তা যে লোকে ওই ছাড়া আর কেনে না। কলের কাজটা পাইয়া অনিরুদ্ধ একরূপ বাঁচিয়া গিয়াছে! শুধু উপার্জ্জনের দিক হইতেই নয়, মানসিক অশান্তির হাত হইতেও বাঁচিয়াছে। তাহাকে পাইলে পদ্ম তাহাকে লইয়াই পড়ে। তুচ্ছ খুটিনাটি লইয়া সে এমন কাণ্ড বাধাইয়া তোলে যে, অনিরুদ্ধের ইচ্ছা হয় সে আত্মহত্যা করে অথবা পদ্মকেই হত্যা করিয়া ফাঁসীকাঠে ঝোলে। অনিরুদ্ধ উত্তেজিত হইলে বিপদ বাড়িয়া যায়, পদ্মের মৃগী রোগ উঠিয়া পড়ে। দেবস্থান—অপদেবতাস্থান ঘুরিতে অনিরুদ্ধ বাকী রাখে নাই, কিন্তু কোন স্থানেই কোন ফল হয় নাই। সকল স্থানেই অবশ্য এক কথাই বলিয়াছে, অনিরুদ্ধ যে কথা জগনকে বলিয়াছিল—সেই কথা।

পদ্ম কিন্তু বলে—তোমার পাপে।

—আমার পাপে?

—হ্যাঁ তোমার পাপে। পদ্মের চোখের জলে মুখ ভাসিয়া যায়। দেবতাকে অবহেলা করলে তুমি। নবান্নের ভোগ উঠিয়ে নিয়ে এলে—ঘরে লক্ষ্মী পাতা রইল আর তুমি ঘরের টাকা বার ক'রে দিলে!

অনিরুদ্ধের মাথায় রক্ত উঠিয়া যায়। রবিবার দিন কল বন্ধ থাকে—সেইদিন এই বচসা নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে। অনিরুদ্ধ উঠিয়া চলিয়া যায়—দুর্গার বাড়ী বা গিরীশের বাড়ী অথবা জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানায়। দুর্গার বাড়ীতেই কাটে বেশীর ভাগ সময়। দুর্গার ওখানে সে সুধু অশান্তি হইতেই রেহাই পায় না, তৃপ্তিও পায়। কল ও কামারশালার কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে প্রতি রাত্রেই সে একবার করিয়া দুর্গার বাড়ী হইয়া আসে।

সকাল হইতে রাত্রি প্রায় দু-পহর পর্য্যন্ত পদ্ম একা থাকে। অবলম্বনের মধ্যে একটা বিড়াল। সেটা থাকিলে পদ্ম অহরহ তাহাকে তিরস্কার করে—তিরস্কার নয় শাসন করে। সেটা যখন বাহিরে যায় তখন কাজ-কর্ম্ম করে। অনেক সময় কাজে কর্ম্মেও বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়—সে তখন আঁচল বিছাইয়া শুইয়া আপনমনেই কাঁদে। কখনও কখনও খিড়কীর দরজায় দাঁড়াইয়া তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নামহীন কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া নিষ্ঠুরতম অভিসম্পাত দেয়।

—বেটা মরবে, পিণ্ডি লোপ হবে, জোড়া বেটা একসঙ্গে এক বিছানায়—যাবে। শরীরে ঘুণ ধরবে—অকাট রোগ হবে, শরীর যদি পাথর হয় তো ফেটে যাবে, লোহার হয় তো গলে যাবে। আলক্ষ্মী ঘরে ঢুকবেন—লক্ষ্মী বনবাসে যাবেন। ঘরে আগুন লাগবে, ধানের মরাই ছাইয়ের গাদা হবে। রূপো গলে রাঙ হবে, সোণা গলে পেতল হবে!

দিনের বেলা রান্নার পাট সে তুলিয়া দিয়াছে। রান্না করে সন্ধ্যায়, অনিরুদ্ধের অভুক্ত বাসী ভাতেই তাহার দিনের বেলা চলে; যেদিন রাত্রে অনিরুদ্ধ খায় তাহার পরদিন সে চিঁড়ে মুড়ি খাইয়াই কাটাইয়া দেয়। তাই কর্ম্মহীন দ্বিপ্রহরে সে খিড়কীর দরজায় দাঁড়াইয়া নিত্য নিয়মিত ওই অভিসম্পাতগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে।

* * * *

ছিরুর মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল। গালিগালাজ অভিসম্পাত আজ তাহার নূতন নয়, পূর্ব্বে যখন সে অন্ধকারের আবরণের মধ্যে অন্যজনের অনিষ্ট করিয়া আসিত তখন লোকে এমনইভাবে নামহীন তাহার উদ্দেশ্যে গালি-গালাজ বর্ষণ করিত, তখন শুনিয়া সে অনুভব করিত একটা কৌতুক। আজ কিন্তু তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। রুদ্ধ ক্রোধে অন্তরটা গলিত ধাতুর মত টগবগ করিয়া উঠিল। এমন ক্রোধ পূর্ব্বে হইলে সে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়া গিয়া কঞ্চি অথবা বাখারীর ঘায়ে ওই মুখরা মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়া আসিত, এই কিছুদিন পূর্ব্বেই যেমন ভাবে সে পাতুমুচির পিঠখানা রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ সে তাহা পারিল না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একখানা কঞ্চি সে কুড়াইয়া লইয়াছিল, কঙ্কণার বাবুদের পাইক সেখকে দেখিয়া সেখানা সে ফেলিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে ফিরিল। তাহার মা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে; কামারিণীর গালিগালাজ ও অভিসম্পাতের উত্তরে গালিগালাজ করিতে শ্রীহরি নিষেধ করিয়াছে, শুধু

নিষেধ নয় তিরস্কার করিয়াছে। তাহার শীর্ণ গৌরবর্ণা বউটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে মাটির পুতুলের মত। কাহাকেও কিছু না বলিয়া ছিরু বাহিরে আসিয়া কঙ্কণার বাবুদের পাইক সেখকে বলিল—ভালো লোক দিতে পার সেখজী? ভালোলোক!

—কালুকে লিবেন? আমার ছেল্যাকে?

তরুণ জোয়ান কালুকে শ্রীহরি জানে। বাঘের মত হিংস্র, শিয়ালের মত ধূর্ত্ত চতুর। ভয়ঙ্কর জীব কালু। খাঁ-এর পাড়ার জমিদার খাঁ সাহেবদের বাড়ীতে চাকরী করিতে গিয়া কালু যাহা করিয়াছে, তাহাতে কালুকে ঘরে স্থান দেওয়া আর খালকাটিয়া কুমীর আনা এ-দুই সমান। কিন্তু কামার ও কামারিণীকে শাস্তি দিতে কালু উপযুক্ত লোক! ছিরু ভাবিতেছিল। এমন সময় দেবু আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল। কথাটা শুনিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সে একবার ছিরুর দিকে চাহিল, যেমন করিয়া সে পাঠ-শালার ছেলেদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শাসন করে; তারপর সেখকে বলিল—আমরা ভেবে দেখি সেখ। পরমুহূর্ত্তেই হাসিয়া বলিল—ভেবেই বা আর কি দেখব সেখজী, হাতী পোষা কি আমাদের সাজে! আমাদের ঘরে কি কালুকে মানায়! ছিরু এখন গমস্তা, যদি কখনও জমিদার হয় তো তখন রাখবে।

—বেশ, বেশ! তবে কাজকর্ম্ম পড়লি খবর দিবেন, কালু করে দিবে।

—হ্যাঁ তা দেব বই কি? তা' হ'লে তুমি এখন এস সেখজী।

—বাবুকে কি বুলব? কখন যাবেন?

শ্রীহরি কিছু বলিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু দেবু তাহার পূর্ব্বেই বলিল—এখন তো যাওয়াও আমাদের হয়ে উঠবে না সেখজী। তামাদীর সময়, এবার নালিশ হবে বিস্তর। আমাদের এখন মরবার সময় নাই।

—তবে? বাবু বুললেন জরুরী কাম! সেখ চিন্তিত হইয়া পড়িল।

—বাবুকে ব'ল, তাঁর লোকজনের তো অভাব নাই, কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। তারপরই হাসিয়া দেবু বলিল—কাজতো তোমার বাবুর সেখজী, আমাদের তো নয়, বাবুকেই বলবে—লোক পাঠাতে! সেখ ছিরুর দিকে চাহিয়াও কোন সাড়া পাইল না। শ্রীহরি মনে মনে দেবু-খুড়োর বিজ্ঞতা এবং আভিজাত্যবোধের প্রশংসা করিতে-ছিল। সাড়া না পাইয়া সেখ অগত্যা উঠিল, বলিল—তাই বুলব তবে বাবুকে।

সে চলিয়া যাইতেই—দেবুর পায়ের ধুলা লইয়া শ্রীহরি বলিল—বলিহারি বাবা আমার। আচ্ছা বলেছ, বহুত আচ্ছা! গরজ থাকে লোক পাঠিয়ে দিক, আমাদের কি গরজ!

দেবু এবার তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল—তোর এমন মাথা গরম হ'ল কেন? কালুকে বাহাল করবি? কোন লাট বাহারবন্দ কিনেছিস তুই?

শ্রীহরি পদ্মের গালি-গালাজের কথা বলিয়া বলিল—আর সহ্য হচ্ছে না খুড়ো, মনে হচ্ছে ধরে এনে জুতো মেরে মাগীর মুখ ছেঁচে দি।

কঠিন দৃষ্টিতে দেবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওসব গোয়ার্ত্তুমি ছাড়। গায়ের জোরের দিন আর নাই। আর মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলবি কি? ওসব যদি কর তবে আমার সঙ্গে ভাল হবে না।

পাঠশালার ভ্রান্ত ছাত্রের মতই লজ্জিত হইয়া ছিরু এবার বলিল—তা' তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে তো আর কিছু করছি না। মাগী যে রকম গাল দিচ্ছিল সে যদি তুমি শুনতে তবে তোমারও রাগ হ'ত।

—ছমাস সবুর কর তুই। ছমাস! ছমাসের মধ্যে অনিরুদ্ধ দাঁতে কুটো ক'রে তোর পায়ে এসে গড়িয়ে পড়বে। তারপর হাসিয়া দেবু বলিল—হাতের মারই সংসারে বড় মার নয় রে, ভাতের মারই হ'ল আসল মার। ভাতই হ'ল সংসারে মানুষের বিষদাঁত।

কিছুক্ষণ ধরিয়া একমনে তামাক টানিয়া শ্রীহরি বলিল—নালিশের ফর্দ্দটা তুমি কর দেখি। ক নম্বর নালিশ হবে তাতে খরচই বা লাগছে কত।

কোমর হইতে লম্বা একটা থলি খুলিয়া দেবু বলিল—হিসেব প্রায় সেরেই রেখেছি আমি। খানিকটা বাকী আছে। আগে টাকাগুলো দেখে নে দেখি। ভকতের খারিজ-ফি আর খাজনার টাকা। সিকির বেশী কিছুতেই দিলে না ভকত। পাঁচশোটাকার সিকি ফি একশো পঁচিশ, নায়েব গমস্তার দশ, আর খাজনা আটচল্লিশ টাকা দশ আনা। একশো তিরাশী টাকা দশ আনা।

টাকাগুলি গুনিয়া লইতে লইতে শ্রীহরি বলিল—সিকি ফি নিয়েই ছেড়ে দিলে মাড়োয়ারীকে ?

—কিছুতেই দিলে না।

শ্রীহরি আর কিছু বলিল না। দেবুকে সে সত্যসত্যই শ্রদ্ধা করিয়াছে। দেবুই আবার বলিল—তবে একটা সুবিধে করে নিয়েছি। কিস্তির সময় আমাদের প্রজাকে ধানের ওপর টাকা এ্যাডভান্স দেবে। তারপর ধান উঠলে ধান নেবে।

সহসা বাড়ীর ভিতরে একটা আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। শ্রীহরি এবং দেবু দুজনেই সচকিত হইয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে অগ্রসর হইল। ছিরুর মা চীৎকার করিতেছে। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াই ছিরু বলিল—বুঝলে খুড়ো, বুড়ী আর আমার মান মর্য্যাদা রাখলে না। দিনরাত ছোটলোকের মত চীৎকার করছে।

বুড়ী সত্যসত্যই তারস্বরে চীৎকার করিতেছে—পদ্মকে কদর্য্য ভাষায় গাল দিতেছে, আর বলিতেছে—আমার সর্ব নাশ করে দিলে রে, আমার সর্ব্বনাশ করে দিলে।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীহরি শিহরিয়া উঠিল। শ্রীহরির পূর্ণ-গর্ভা স্ত্রী উঠানের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। রক্তে তাহার কাপড়টা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার শীর্ণ-গৌর দেহখানি মধ্যে মধ্যে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ছিরুর মা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে—ওই রাক্ষসীর অভিসম্পাতেই এই সর্ব্বনাশ হ'ল রে !

ছিরুর মনে চকিতের মত মনে পড়িয়া গেল—তারা নাপিতের কথা। অনিরুদ্ধ দেবস্থানে—উপদেবতা স্থানে তাহার অনিষ্ট কামনায় ঘুরিতেছে।

দেবু বলিল—আমি এখুনি আসছি ছিরু, জগন ডাক্তারকে ডাকি। আর জংসনের রেলের ডাক্তারের কাছেও একজন লোক পাঠিয়ে দি।

ছিরুর বউ মাটির পুতুলের মত বসিয়া—পদ্মের গালি-অভিশম্পাত শুনিতেছিল। একসময় উঠিয়া দাঁড়াইয়াই ভারকেন্দ্রচ্যুত মূর্ত্তির মত টলিতে টলিতে সে দাওয়ার উপর হইতে একেবারে উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানশূন্য বউয়ের মাথার গোড়ায় বসিয়া শ্রীহরি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। বুকের ভিতর তাহার কেমন করিতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার চোখে জল আসিতেছে।　　ক্রমশঃ

কাজল নয়নে কি আছে

শ্রী প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

কি জানি তোমার কাজল নয়নে
　　কি আছে !
কোন যাদুকর কি মোহের মায়া
　　দিয়াছে !
ঘন-পল্লব-ঘেরা ওই আলো
নীলিমার মাঝে ওইটুকু কালো
অশ্রু-সাগরে দীপ্তি ফুটালো
　　প্রিয়া যে !
কি জানি তোমার কাজল নয়নে
　　কি আছে !
শুধু চেয়ে থাকি—কেন চেয়ে থাকি
　　জানি না—
মানুষের বিধি-বন্ধন-বাধা
　　মানি না।

ক্ষতি কিবা কার কহ তুমি প্রিয়া
যদি ভরি প্রাণ শুধু আঁখি দিয়া
বাহুর বাঁধনে আমি তো টানিয়া
　　আনি না।
শুধু চেয়ে থাকি— কেন চেয়ে থাকি
　　জানি না।
নয়নের ভাষা— প্রীতি ভালোবাসা
　　নিবেদন।
প্রাণের প্রদীপে থর-থর শিখা
　　শিহরণ।
শুধু কাছে গিয়ে আঁখি তুলে চাওয়া
শুধু আঁখি দিয়ে মনটুকু পাওয়া
বকুলের তলে বৈখরী গাওয়া সমাপন।
নয়নের ভাষা প্রীতি ভালোবাসা নিবেদন।

মুক্তির পথ

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

এবারকার সেন্সাস নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট মন কষাকষি দেখা দিয়েছে। হিন্দু মুসলমানের উপর অন্যায় সংখ্যাবৃদ্ধির অভিযোগ আনছেন, আর মুসলমান হিন্দুর উপর অন্যায় সংখ্যাবৃদ্ধির অভিযোগ আনছেন; আর উভয় সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা এমন সব কথা বলছেন, যা শুনে প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই মাথা হেঁট হয়। মনে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, আমরা কি সত্যই আত্মনিয়ন্ত্রণশীল হবার যোগ্য?

সংবাদপত্রাদিতে যে সব লেখা বের হচ্ছে, তা পড়ে মনে হয়, হিন্দু চান মুসলমানের সংখ্যা কমুক, আর মুসলমান চান হিন্দুর সংখ্যা কমুক। এ মনোবৃত্তি জাতীয়তার আদর্শকে আগিয়ে নিয়ে যাবে না, তাতে সন্দেহ নাই। লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, তথাকথিত নেতৃস্থানীয়েরা জনসাধারণকে উচ্চতর আদর্শের সন্ধান দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁরা এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করছেন, যার ফলে হিন্দু জনসাধারণ মুসলমানদের মরণ কামনা করছে, আর মুসলমান জনসাধারণ হিন্দুদের মরণ কামনা করছে। বিষের ধারা তো চারিদিক থেকেই আমাদের জীবনে এসে পড়ছে। এই সেন্সাস-সমস্যা তাতে নূতন এক উৎকট বিষের আমদানি করেছে। যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন চান এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান, তাঁদের জন্য এই সেন্সাস-বিভ্রাট নূতন এক সমস্যার আমদানি করেছে। তাঁদের তরফ থেকে কি এই সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত করা যায় না?

আমাদের অবিকৃত মন বলে, যে হিন্দু চায় যে মুসলমানের সংখ্যা কমুক, সে হিন্দু কৃপার পাত্র; আর যে মুসলমান চায় যে হিন্দুর সংখ্যা কমুক, সে মুসলমানও কৃপার পাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোকেরই এখন প্রাধান্য।

কোন কারণে যদি হিন্দুর সংখ্যা কমতে থাকে, তা হলে—যে মুসলমান প্রকৃতই দেশপ্রেমিক তার চিন্তান্বিত হওয়া উচিত; পক্ষান্তরে যদি কোন কারণে মুসলমানের সংখ্যা কমতে থাকে, তা হলে যে হিন্দু প্রকৃতই দেশপ্রেমিক তারও চিন্তান্বিত হওয়া উচিত। কেন না, যে সত্যিকার দেশপ্রেমিক, সে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই মঙ্গল চাইবে, আর যদি এই দুই সমাজের কোনটী ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে, তা হলে তার প্রতিকারের বিষয় সচেষ্ট হবে। এ মনোবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন মনোবৃত্তি নিয়ে যে দেশের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় চিন্তা করে, তাকে আমি প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলি না।

পরিতাপের বিষয় এই, যে মনোবৃত্তিকে আমি এখানে কাম্য বলে উল্লেখ করলুম, সে মনোবৃত্তি আপাততঃ এ দেশে একান্তই বিরল।

এর কারণ কি? আর প্রতিকারের উপায়ই বা কি?

একটি গল্প বলি শুনুন। বিলাতে একবার কয়েকজন বন্ধু মিড্‌ল্ টেম্প্‌ল্-এ ডিনার খাচ্ছিলুম। আমাদের দলে একজন দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ ছিলেন—তাঁর নাম রাসেল্। বয়স অনুমান ৩৫ বৎসর। এই পরিণত বয়সেই তিনি আইন শিখতে এসেছিলেন। কল্-নাইট্-এর ডিনার। প্রচুর সুরার সদ্ব্যবহার হচ্ছিল। কত রকম গল্প-গুজব চলছিল। ভারতীয় বন্ধুরা সেই চিরন্তন হিন্দু-মুসলিম সমস্যার আলোচনাই করছিলেন। ইংরেজেরা আলোচনা করছিলেন জার্মানীর সামরিক তোড়জোড়ের কথা, ইটালীর অভিপ্রায়ের কথা, আন্তর্জাতিক আরও অনেক কথা।

রাসেল এক চুমুকে এক গ্লাস শ্যাম্পেন শেষ করে বললেন, "শোন, শোন, আফ্রিকার একটা অদ্ভুত গল্প বলি তোমাদের। রাজনীতির আলোচনা তো রোজই কর। আমি যে গল্প বলব, সে রকম গল্প বোধ হয় তোমরা কখনও শোন নি।"

আমি গল্প শুনতে বরাবরই ভালবাসি। আগ্রহের সঙ্গে বললুম "বল, বল, তোমার গল্পটাই তা হলে বল।" রাসেল এক নিশ্বাসে আর এক গ্লাস শ্যাম্পেন শেষ করে বললেন, "শোন তবে মনোযোগ দিয়ে।"

"আমি জোহান্সবার্গের এক হোটেলে অবস্থান করছিলুম। একদিন স্ট্রাইকিং গোছের একটা লোক হোটেলের অতিথি হল। লোকটার চেহারায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। মাংস-

পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ। অনাবশ্যক মেদ-মাংসের কোন চিহ্ন কোথাও নাই। চোখের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, সুদূর-প্রসারী—ঠিক ঈগল পাখীর মত। অথচ তাতে একটা করুণার ভাব মাখানো ছিল। লোকটিকে একটু অন্যমনস্ক বলে মনে হত। যেন কোন সদ্য-ঘটিত দুর্ঘটনার স্মৃতি তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লোকটিকে জানবার জন্য আমার মনে কৌতুহল হচ্ছিল।

একদিন দুপুরে দেখি লোকটি হোটেলের লাউঞ্জের এক কোণে একা এক সোফায় বসে আছে। সামনে টিপয়ে এক গ্লাস বিয়ার। অন্যমনস্কভাবে সে বিয়ার পান করছে, আর কোন্ সুদূরের কথা ভাবছে। আমি ওয়েটারকে এক বোতল বিয়ার আনতে বলে সোফায় বসে বললুম, "আপনার আপত্তি নাই তো?" একান্ত সৌজন্যের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, "বসুন, আমি বড় আনন্দিত হলুম।"

ওয়েটার বিয়ার নিয়ে এল। বন্ধুর—তাঁর নাম জানতে পারলুম—হক্। বিয়ার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। অনুমতি নিয়ে তাঁর জন্য এক বোতল বিয়ারের অর্ডার দিয়ে আলাপ আরম্ভ করলুম।

কত কথা যে হয়েছিল সে সব বলতে গেলে সমস্ত রাত কেটে যাবে। তার দরকারও নাই। তবে কেন যে তাঁর চোখে মুখে অমন অন্যমনস্কতার ভাব ছিল, তাই নিয়ে তিনি যে গল্প বললেন তাই এখন তোমাদের শুনাই।

রাসেল বললেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে স্মীড (Schmid) নামক এক ডাচ বন্ধুতে আর আমাতে মিলে উগাণ্ডার জঙ্গলে গিয়েছিলুম, কতকটা দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে, আর কতকটা ভাগ্যপরীক্ষার জন্য। সারা দিন ঘুরে ঘুরে একবার ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। গভীর জঙ্গল। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নাই। আগুন জ্বালিয়ে একটা গাছের তলায় আমরা আস্তানা বাঁধলুম রাতটি কাটাবার জন্য। রাইফেল দুটী পাশে রেখে আমরা একটু আরাম নেবার চেষ্টা করলুম। বলাবাহুল্য অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলুম।

আমাদের ঘুম ভাঙ্গল রাত দুপুরে—বর্ব্বর সমর-বাদ্যের কর্ণবিদারক কলরোলে। ভয়ঙ্করমূর্ত্তি কাফ্রি নরনারীর দল আমাদের ঘিরে হট্টগোল করছিল। দেখলুম আমাদের রাইফেল দুটি এবং আসবাব-পত্র ইতিমধ্যে তারা হস্তগত করেছে। তারা যে আমাদের কি বলছিল, কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমাদের কথাও তারা বুঝলে না। বর্শা উদ্যত করে শেষে আমাদের দিকে তারা অগ্রসর হল। তাদের বাধা দেবার কোন উপায় আমাদের ছিল না। আপাতত আত্মসমর্পণই যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা স্থির করলুম। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ আশাও আছে।

কাফ্রিরা আমাদের খোলা একটা মাঠে নিয়ে গেল। মাঠের মাঝখানটা বৃত্তাকারের কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা। প্রবেশের দ্বারটি অদ্ভুত রকমের একটা তালা দিয়ে তারা বন্ধ করে দিলে, আর আমাদের প্রহরী নিযুক্ত করলে এক কাফ্রী তরুণীকে। সে প্রত্যহ দুবেলা আমাদের আহার দিয়ে যেত—শুটকি মাছের তরকারী আর রুটি, অথবা সিদ্ধ মাংস। আমাদের পানের জন্য সে এক রকম দেশী মদ দিয়ে যেত, তাতে গুড়ের মত এক রকম মিষ্ট জিনিস মেশান থাকতো। খেতে বেশ সুস্বাদ, তবে একটু বেশী খেলেই ভয়ানক ঘুম আসতো, আর সমস্ত দেহটা যেন অসাড় হ'য়ে যেত।

বন্ধু স্মীড তৃপ্তির সঙ্গে আকণ্ঠ সেই দেশী মদ পান করতেন, আর সারা দিন তন্দ্রামগ্ন থাকতেন। তাঁর ব্যবহার মোটেই আমার ভাল লাগতো না। আমরা কাফ্রিদের হাতে বন্দী। কি করে মুক্তি পেতে পারি দিনরাত তাই নিয়ে চিন্তা করা দরকার, এ কি মদ খেয়ে ঘুমোবার সময়? তা ছাড়া এই নেশার প্রভাবে ঘুমিয়ে যাওয়া কখনও আমি পছন্দ করিনি। ঘুম আসবে, তেমন ভাবে নেশা করব কেন? জেগে থাকাই তো জীবন! আমি পান করি চেতনাকে বেশী করে পাবার জন্যে, চেতনাকে বিলুপ্ত করবার জন্যে নয়। তার পর, অসভ্যদের মধ্যে আত্মসম্মান হারিয়ে মদ খেয়ে বেসামাল হওয়া, সেটাও আমার কাছে নিতান্ত হেয় কাজ বলেই মনে হত। স্মীডকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করে-ছিলুম, কিন্তু কোন ফল হয় নি। তাঁর মুখে সেই একই বুলি—'ঈট্, ড্রিঙ্ক, এণ্ড বি মেরি, ফর্ টুমরো উই ডাই।' আমি এক চুমুকের বেশী মদ কখনও খেতুম না, আর সেটুকুও বাধ্য হয়েই খেতুম। কেননা, সে দেশের আন্‌ফিল্টার্ড জলের উপর আমার বিশ্বাস ছিল না। স্মীডের শরীর দেখে অবাক হয়ে যেতুম। তিনি অসম্ভব রকম মোটা

হয়ে যাচ্ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁর এই ফ্যাটী ডিজেনারেসি দেখে সত্যই আমি দুঃখিত হতুম।

কাফ্রিরা রোজ এসে আমাদের দেখে যেত। গায়ে পিঠে হাত দিয়া আমরা আশানুরূপ মোটা হয়েছি কি-না তারা তা পরীক্ষা করতো। স্মিডকে পরীক্ষা করে যে তারা অনাবিল আনন্দ পেত, সে তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যেত। তাদের রসনা থেকে সত্যই জল পড়তো। আমার দেহ পরীক্ষা করে কিন্তু তাদের ভ্রূকুঞ্চিত হত। আমি ক্রমেই রোগা হয়ে যাচ্ছিলুম। সেটা তাদের মোটেই ভাল লাগতো না।

ইঙ্গিতে ইসারায় আমাদের রক্ষিণীকে প্রশ্ন করে বুঝলুম, তারা আমাদের বড় এক জাতীয় পর্ব্বের জন্য দেবতার বলি-রূপে প্রস্তুত করছে। আমরা যথাসম্ভব মোটা হই এই তাদের ইচ্ছা। হৃষ্টপুষ্ট বলির সামগ্রীই দেবতার বেশী প্রিয়। আমাদের মদের সঙ্গে এমন এক জিনিস মিশিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে দেহ অসম্ভব রকম পুষ্টি লাভ করে। আমরা যাতে মোটা হই সেই জন্য এই মদ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের দেওয়া হচ্ছে। স্মীডের দেহ যে ভাবে ভরে উঠেছে তা দেখে তারা সত্যই সন্তুষ্ট। তবে আমি যে শুকিয়ে যাচ্ছি এতে তারা সত্যই দুঃখিত। আমি যাতে যথেষ্ট পরিমাণে পানাহার করি সে বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে রক্ষিণীকে তারা নির্দ্দেশ দিয়েছে। রক্ষিণী বললে—এতে বিচিত্র কিছুই নাই। রোগা জন্তুর মাংস কে খেতে চায় বল?

আমি স্মীডকে আমাদের অবস্থার কথা বললুম, আর পানাহারের বিষয় সংযম অবলম্বন করতে উপদেশ দিলুম। অপরিমিত মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে ছিল। তিনি আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন না। হাসতে হাসতে তাঁর সেই পুরান গৎ আওড়াতে লাগলেন—'ঈট্, ড্রিঙ্ক, এণ্ড বি মেরি, ফর্ টুমরো উই ডাই!'

দেখলুম, স্মীডকে উপদেশ দিয়া লাভ নাই। নিজের বিষয়ই ভাবা দরকার। পানাহার তো আমি কম করতুমই, এখন আরও কমিয়ে দিলুম। আর দিন রাত কেবল মুক্তির কথাই চিন্তা করতে লাগলুম। মুক্ত জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম, মুক্তির উপায়ের কথা ভাবতে লাগলুম, আর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে লাগলুম।

আমাদের তরুণ রক্ষিণী আমার আচার ব্যবহার দেখে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে সে আমার সঙ্গে কথা এবং ইঙ্গিতের সাহায্যে আলাপ করতো, আর আমার বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতো।

একদিন সে বললে, 'তোমার উপর আমার দরদ জন্মেছে, তোমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি না দিলে আমি শান্তি পাব না।'

আমি মুক্তিই খুঁজছিলুম, মুক্তির চিন্তাতেই মশগুল ছিলুম। মুক্তির একটা উপায় হয়েছে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। স্মীডকে জাগিয়ে বললুম 'রক্ষিণী আমাদের সাহায্য করবে, চল এখান থেকে পালান যাক।'

স্মীড তখন অসম্ভব রকম মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। সর্ব্বক্ষণ তিনি তন্দ্রার আবেশে মগ্ন থাকতেন। দুর্গম বন জঙ্গল অতিক্রম করে পালাবার শক্তি তাঁর ছিল না। আমার প্রস্তাব শুনে জড়িতকণ্ঠে বললেন, 'দরকার নেই বাবা! বনে জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুকের খোরাক হওয়ার চেয়ে এখানে মানুষের খোরাক হওয়াই ভাল।' দেখলুম স্মীডের মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

সুযোগ বুঝে রক্ষিণীর সাহায্যে একাই রাত্রিযোগে বেরিয়ে পড়লুম। আসবার সময় সেই করুণহৃদয় রক্ষিণীকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে এলুম, তার জন্য এর বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। স্মীডকে ভাল করে বিদায় অভিবাদন করতেও পারলুম না। তিনি তখন মদের নেশায় বিভোর!

দশ দিন দশ রাত ক্রমাগত বন জঙ্গল পার হয়ে, কপালের জোরে অসংখ্য বিপদ অতিক্রম করে আমি শেষে বৃটিশ দক্ষিণ-আফ্রিকার এলাকায় এসে পৌছুলুম। বড় একটা দোকানে গিয়ে ম্যানেজারকে আমার এই অপূর্ব্ব য়্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা বললুম। তিনি ছিলেন হৃদয়বান লোক। আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। আর প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় এবং কিছু নগদ টাকা আমায় তিনি দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে আমি এই জোহান্সবার্গে এসেছি, এখান থেকে আমার ফার্ম দুদিনের পথ।'

রাসেল গল্প শেষ করে বললে, 'কেমন গল্প?' আমরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বললুম, এমন গল্প আমরা কখনও শুনিনি।

সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু রাসেলের গল্প এখনও

ভুলতে পারিনি। বর্ত্তমান সেল্লাস বিদ্রাটের কথা ভাবতে ভাবতে গল্পটি হঠাৎ আমার মনে এল। আমার মনে হল, এই গল্পের মধ্যেই যেন আমাদের মুক্তির ইঙ্গিত আছে।

পাঠক বলবেন, গল্প তো হল। কিন্তু এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সমস্যার সম্পর্ক কি? শুনুন তবে।

আমাদের দেশের এই বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষটাকে যদি গল্পের কাফ্রি উপজাতি রূপে ধরে নেওয়া হয়, আর কাফ্রিদের দেওয়া মদকে যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের লভ্যাংশ রূপে ধরে নেওয়া হয়, তাহ'লে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নামক রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচবার একটা উপায় এই গল্প থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

হক এবং স্মীড উভয়কেই কাফ্রীরা তাদের মদ খেতে দিয়েছিল। হক ছিল বুদ্ধিমান, সংযমী লোক। সে সেই মদ যথাসম্ভব বর্জ্জন করেছিল। পক্ষান্তরে স্মীডের বুদ্ধি ছিল মোটা, আর লোভ ছিল বেশী। কাফ্রীদের দেওয়া মদ সে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই ভক্ষণ করেছিল। হক এবং স্মীড উভয়েই ছিল বন্দী। হক কিন্তু দিনরাত মুক্তির চিন্তায় মগ্ন থাকতো, মুক্তির স্বপ্ন দেখতো, আর মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করতো, তাই শেষে সে তার বাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করে ধন্য হল।

স্মীড মুক্তির কথা ভাববার অবসর পেত না। দিনরাত সে কাফ্রীদের দেওয়া মদের নেশায় বিভোর থাকতো। মুক্তির উপায় যখন উপস্থিত হ'ল, তখন সে মুক্তির স্পৃহাই হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং মুক্তিলাভ তার ভাগ্যে আর ঘটল না।

কাফ্রি রক্ষিণীকে আমাদের কৌশলী বুদ্ধি ধরে নিন। যে সজাগ থাকে, যার কোন একটা উদ্দেশ্য কিম্বা কাম্য আছে, কৌশলী বুদ্ধি তাকেই পথ দেখায়; আর সেই বুদ্ধির নির্দ্দেশের সদ্ব্যবহার করতে পারে। হককে বুদ্ধি পথ দেখিয়েছিল, আর সেও বুদ্ধির প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতেও পেরেছিল। স্মীডকে বুদ্ধি পথ দেখায় নি। বন্ধু হিসাবে হক যদিও তাকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, আলস্য এবং নির্বুদ্ধিতার দরুণ স্মীড কিন্তু বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করতেই পারলে না।

আমাদের মধ্যে যে হকের মত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নামক রাক্ষসের দেওয়া লাভের মোহ যথাসম্ভব বর্জ্জন করবে, আর এই রাক্ষসের হাত থেকে মুক্তি পাবার চিন্তায় সদা বিভোর থাকবে, তাকে কাফ্রি রক্ষিণী রূপী সুবুদ্ধি এসে মুক্তির পথ শেষে বাতলে দেবে, আর মুক্তির অদম্য স্পৃহা সে পথ অবলম্বন করতে তাকে বাধ্য করবে। পক্ষান্তরে, যে স্মীডের মত সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ রাক্ষসের প্রদত্ত লাভের মদ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষণ করবে, তার মন থেকে মুক্তির স্পৃহা চলে যাবে, মুক্তি লাভের জন্য যে সাধনার দরকার, সে সাধনার ক্ষমতা তার লোপ পাবে, আর বন্ধুরা মুক্তির উপায় বলে দিলেও সে উপায় সে অবলম্বণ করতে পারবে না। সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ রূপ রাক্ষসই শেষে তাকে ভক্ষণ করবে।

তুমি ও আমি

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার

তুমি যেন মাধবী মঞ্জরী
উঠিছ সঞ্চরি'
কি জানি কি লীলাচ্ছলে
আনন্দ দোলার মাঝে—মাধুর্য্যের স্নিগ্ধ শতদলে।

সুরভি তোমার
কেন জানি বার বার
কুণ্ঠিতা বধূর মতো—মুখে নাহি ভাষ,
আমার হৃদয়-দ্বারে ফেলে শুধু সজল নিঃশ্বাস।

তাহারি পরশ লভি' চিত্তে মোর জাগিল কবিতা;
অমানিশা-অন্ধকারে—যেন, এক শুভ্র দীপাম্বিতা
দীপ হাতে কাহার সন্ধানে,
আমারে লইয়া চলে নিরুদ্দেশ পানে;—
বাজাইয়া বিজয়-বাঁশরী
আমি চলি ছন্দাকারে তা'রে অনুসরি'।

জঙ্গম

বনফুল

১২

মৃন্ময় গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। নিজেকে নিতান্ত একা মনে হইতেছিল। এই সেদিন পর্য্যন্ত তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না, এখন অখণ্ড অবসর। নিমেষের মধ্যে সমস্ত যেন ওলোট-পালোট হইয়া গেল। চিন্ময়টা গোপনে গোপনে এত কাণ্ড করিতেছিল! বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। সহসা মৃন্ময়ের স্বর্ণলতাকে মনে পড়িল। তাহাকে অন্বেষণ করিবার জন্যই তো সে পুলিশের চাকুরি লইয়াছিল। অন্বেষণ তো করা হয় নাই, চাকরিটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল। চোর, জুয়াচোর, খুনি, জালিয়াৎ ইহাদেরই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে, স্বর্ণলতাকে অন্বেষণ করিবার সে অবসর পাইল কই! প্রথম প্রথম প্রত্যহই তাহার মনে হইত হাতের কাজটা শেষ করিয়া স্বর্ণলতার খোঁজ করিবে, কিন্তু হাতের কাজ কোন দিনই শেষ হয় নাই। শেষে স্বর্ণলতার কথা তাহার মনেও পড়িত না। মানুষ কত সহজে ভোলে! দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক দাবী এত প্রবল, এত অনিবার্য্য এবং এত সর্ব্বগ্রাসী যে অতীতকে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাহারা নিকটে রহিয়াছে, যাহাদের সর্ব্বদা দেখিতেছি তাহাদেরই সকলকে সর্ব্বতোভাবে মনে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নয়। সচেতন মনের পরিসর বড় ক্ষুদ্র, সমভাবে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সেখানে অসম্ভব। স্বর্ণলতার মুখখানা মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল, সেই নিটোল গৌর মুখখানি, প্রদীপ্ত কালো চোখ দুটি, অধরে অর্দ্ধবিকশিত মৃদুহাসি। নিমীলিত নয়নে মৃন্ময় স্বর্ণলতার মানসমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল স্বর্ণলতা যেন মৃদুগুঞ্জনে বলিতেছে, আমাকে খোঁজ নাই বলিয়াই তোমার এই শাস্তি। আমাকে খুঁজিবার জন্যই বিবাহ করিয়া পুলিশে চাকুরি লইয়াছিলে, কিন্তু হাসি এবং চাকরি ইহারাই তোমাকে ভাগ করিয়া লইয়াছিল, আমার জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। এত প্রবঞ্চনা সহিবে কেন? ··· সহসা একটা গানের সুর ও হাসির হল্লা গঙ্গাবক্ষ হইতে ভাসিয়া আসিল। মৃন্ময় চাহিয়া দেখিল একদল লোক নৌকা-বিহার করিতেছে, সঙ্গে একজন গায়িকা। হার্মোনিয়ম ও ডুগি-তবলা-সহযোগে গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

একটু তফাতে একজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ছি ছি, ছোকরা একেবারে বখে গেল! দেখুন দিকি কাণ্ডখানা! ছি ছি ছি—"

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, "আপনি চেনেন নাকি?"

"চিনি না! আমাদেরই পাড়ার রাসু দত্তের মেজ-ছেলে বিশু দত্ত! সোনাগাছিতে আজকাল কাপ্তেনি করে বেড়াচ্ছে। দেখুন দিকি কাণ্ডখানা ছোকরার—"

বিশু দত্ত নামটা মৃন্ময়ের চেনা-চেনা ঠেকিল। চাকুরি-চ্যুত না হইলে এখনি আর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া মৃন্ময় বিশু দত্তের অনুসরণ করিত। একটা চুরির তদন্ত করিতে করিতে বিশু দত্তের নামটা মৃন্ময়ের কর্ণগোচর হয়। বিশু দত্ত না কি নিজের সুন্দরী রক্ষিতাকে টোপ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া বড় বড় লোককে আকৃষ্ট করে এবং তাহাদিগকে নানাভাবে বেকায়দায় ফেলিয়া তাহাদের আংটি, ঘড়ি, টাকা প্রভৃতি অপহরণ করে। ঠিক নিজ হস্তে করে না, তাহার রক্ষিতাই না কি তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে অপহরণ করে। মৃন্ময়ের মনে পড়িল কিছুদিন পূর্ব্বে এক শূন্য নাচের আসর হইতে পুলিশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত একটি নর্ত্তকীর পদাঙ্ক লইয়া সে বহু মাথা ঘামাইয়াছিল। উক্ত নর্ত্তকীই নাকি বিশু দত্তের চতুরা প্রণয়িনী, মদ-বিহ্বল এক মাড়োয়ারি-সন্তানের বহুমূল্য একটি হীরক অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়াছিল। মাড়োয়ারির বন্ধুবর্গ পুলিশে খবর দেন, পুলিশ আসিয়া তাহাকে ধরিতে পারে নাই, নর্ত্তকীর পদাঙ্কটি কেবল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, তাহার বন্ধু মিস্টার মজুমদার এখনও হয় তো

ব্যাপারটা লইয়া তদন্ত করিতেছেন। আর কিছুদিন পূর্ব্বে হইলে নৌকাবিহারী বিশু দত্তের সন্ধান পাইয়া মৃন্ময় উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন কিন্তু সমস্তই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। সে অসাড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, স্বর্ণলতার মুখচ্ছবি মন হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল। মৃন্ময় একমনে বসিয়া গান শুনিতে লাগিল।

১৩

বেলা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না, না শঙ্করবাবু?"

"কি করে বুঝলেন আপনি?"

"কি করে তা বলতে পারব না, কিন্তু ঠিক কি না বলুন! এই নিন বড় কাপটাই আপনি নিন, এই নিয়ে তিন কাপ হ'ল কিন্তু!"

"তা হোক। খেতে তো আজ দেরি হবে, কত রাত্তির হবে বলুন দেখি—"

"এগারোটার কম নয়। একা হাতে সব করতে হবে তো—"

"আপনার কজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছেন?"

"বেশী নয়, একজন।"

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "আপনিও চেনেন তাকে।"

"কে?"

"চুনচুন।"

শঙ্কর বিস্মিত হইল।

"আমি যে চুনচুনকে জানি তা আপনাকে কে বললে!"

বেলা স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমি সব জানি।"

"সব জানেন, মানে? আর কি জানেন?"

"আপনি ওর স্বামীর মৃত্যুকালে শুশ্রূষা করেছিলেন এবং আপনার দশটাকা যা পাওনা হয়েছিল তা আপনি নেন নি—"

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইল।

"এত খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে?"

"চুনচুনের কাছ থেকেই।"

দুই-এক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, "আপনার ন্যায্য পাওনা দশটাকা আপনি নিলেন না কেন?"

"এমনি—"

"এমনি? নিছক এমনি?"

বেলা দেবী ফিক করিয়া হাসিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কেন নেন নি তা-ও আমি জানি—"

"কি বলুন তো— "

"বলব না। ইকমিকের আঁচটা ঠিক আছে কি-না দেখে আসি। একটু বসুন আপনি—"

বেলা পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বেলার আগ্রহাতিশয্যে শঙ্কর মেসের বাসা উঠাইয়া দিয়া বেলার বাসাতেই আসিয়া বাস করিতেছে। দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া শঙ্কর প্রথমে আসিতে চাহে নাই। কিন্তু বেলা কিছুতেই শোনেন নাই। তাঁহার যুক্তি—লোকে কি বলিবে না বলিবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে সুরু করিলে মাথাই ঘামিয়া সারা হইয়া যাইবে, আর কিছুই হইবে না। শঙ্কর একদা বিপন্ন বেলাকে আশ্রয় দিয়াছিল, এখন ঘটনাচক্রে শঙ্কর বিপন্ন হইয়াছে, বেলার কি উচিত নয় এখন তাহাকে দুই-চারিদিনের জন্যও আশ্রয় দেওয়া এবং বেলার যখন সে সুবিধা রহিয়াছে? বেলার আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িল—"সমাজের নিষ্কর্ম্মাদের দিকটাও তো দেখতে হবে! পরের আচরণের সমালোচনা করেই বেচারারা সময় কাটায়। ওই তাদের মানসিক রোমন্থনের একমাত্র জাবর, তার থেকে তাদের বঞ্চিত করাটা কি উচিত? আমার তো মনে হয় ওদের মুখ চেয়েই মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু আচরণ করা কর্ত্তব্য—"

একরূপ জোর করিয়াই বেলা শঙ্করকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। শঙ্কর আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বস্তি পাইতেছে না। বেলার উপার্জ্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে। কিন্তু একথাও সে মনে মনে বারম্বার স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না যে, ভাগ্যে বেলার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, না হইলে সে কি মুশ্‌কিলেই পড়িত! টিউশনি ছাড়িয়া দেওয়াতে প্রফেসার গুপ্ত একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রফেসার গুপ্তের কথাগুলি তাহার কানে বাজিতেছে—"আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বনে যাও। কোলকাতা শহরে বাবুয়ানি করে থাকবে

অথচ আত্মসম্মানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলে সইতে পারবে না, তা হয় না। তা ছাড়া, অমন সজারুর মতো বিবেক নিয়ে কোথাও কিছু করতে পারবে না তুমি, আজীবন কেবল কষ্টভোগ করবে। স্থানকালের উপযোগী নতুন বিবেক তৈরী করে নাও—"

সুতরাং টিউশনির জন্য প্রফেসার গুপ্তের নিকট পুনরায় আর যাওয়া চলে না। কিন্তু বেলার কাছেই বা আর কতদিন থাকা চলিবে? বেলা অবশ্য বারবার বলিতেছেন যে যতদিন না একটা কাজ হয় ততদিন আপনি আমার বাসাতেই থাকুন। কিন্তু তাহা শঙ্কর পারিবে না। অবিলম্বে যেমন করিয়া হউক তাহাকে বেলার বাসা ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু যে বেলার উপার্জ্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে তাহা নয়, অন্তর-গুহা-নিবাসী পশুটা বারম্বার প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। শঙ্কর যদিও ইহা সুনিশ্চিত ভাবেই জানে যে, প্রলুব্ধ পশুর কবলে পড়িয়া বিক্ষত হইবার সম্ভাবনা আর যাহারই থাক, বেলার নাই। বিধিদত্ত এক অদ্ভুত বর্ম্মে তিনি আবৃত। আক্রমণ করিলে পশুটাই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে, বেলার কিছু হইবে না। সমস্ত জানিয়াও কিন্তু পশুটা প্রলুব্ধ হয়, বরং বেশী করিয়া হয়। সুতরাং এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া হইতে যত শীঘ্র অপসৃত হইয়া পড়িতে পারা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু অপসৃত হইবার কোন পথই শঙ্কর দেখিতে পাইতেছে না। কোথায় যাইবে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহাই বা কয়দিন সম্ভব? তাহার বর্ত্তমান তমসাচ্ছন্ন জীবনে বেলা মল্লিকই একমাত্র আলো, যাহার সাহায্যে সে অন্তত খানিকটা পথ অতিবাহন করিতে পারে। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, বেলা মল্লিক শুধু আলো নয়, শিখাও। একটু অসাবধান হইলেই তাহা দহন করে এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও মন অসাবধান হইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া ওঠে। মাত্র কয়েকদিন বেলা মল্লিকের সহিত আলাপ করিয়া শঙ্কর ইহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই পলাইবার পথ খুঁজিতেছে। বেলা আশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্রয় দিবেন না। হাসিতে হাসিতে যে কথাগুলি বেলা আজ সকালে বলিয়াছিলেন তাহা শঙ্করের মনে পড়িল। শঙ্কর বেলাকে বলিয়াছিলেন, "আর কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না মিস মল্লিক, একটা বিয়ে করুন—"

"আমি তো এখ্খুনি রাজি কিন্তু পাত্র কই?"

"কি রকম পাত্র চাই আপনার!"

"গোটা এবং সুস্বাদু—"

"তার মানে?"

"তার মানে—সুস্বাদু পেয়ারা হলেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা গোটা হওয়া চাই। তার আধখানা আর একজন কামড়ে খেয়ে গেছে সে রকম জিনিস আমার চাই না। কারো উচ্ছিষ্ট জিনিস ছুঁতেও আমার ঘেন্না করে। তাই বলে গোটা নিম, গোটা মাকাল বা গোটা কুমড়োর প্রতিও লোভ নেই আমার!"

"সে রকম পাত্রের অভাব কি!"

বেলা নাসাকুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠভঙ্গী সহকারে উত্তর দিয়াছিলেন, "সব এঁটো!"

"কটা লোক দেখেছেন আপনি!"

"যে ক'টা দেখেছি তাই যথেষ্ট। হাঁড়ির ভাত একটা দুটো টিপলেই বোঝা যায় বাকীগুলোর অবস্থা কি রকম। দেশসুদ্ধ ব্যাটাছেলে হয় হাঁদা, না হয় এঁটো!"

হাসিতে হাসিতে প্রসঙ্গটা উঠিয়াছিল এবং হাসিতে হাসিতে তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু হাসির অন্তরালবর্ত্তী সত্যটা শঙ্কর উপলব্ধি না করিয়া পারে নাই।

ইকমিকের তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া বেলা দেবী ফিরিয়া আসিলেন।

"বড্ড দেরি হয়ে গেল, নয়? বেগুনগুলো পোড়ালাম, বিরিঞ্চি করব।"

"এত রকম রান্না আপনি শিখলেন কোথা থেকে?"

"পাকপ্রণালী থেকে—"

"চুনচুনকে নেমন্তন্ন করেছেন যখন, তখন সব নিরামিষ রান্না করেছেন নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ—"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, "চুনচুনের জন্যে ভারী দুঃখ হয় আমার—"

বেলা দেবী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "সাবধান, দুঃখ হওয়াটাই কিন্তু প্রথম ধাপ!"

তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, আমার বরং রাগ হয়। মনে হয় বেশ হয়েছে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—"

"কেন ?"

"ও রকম বোকার মতো লুকিয়ে বিয়ে করতে গেছল বলে—"

"বাঃ, ভালবেসেছিল, বিয়ে করবে না ?"

"ভালবাসলেই তাকে বিয়ে করতে হবে! বেশ তো যুক্তি আপনার। সত্যি সত্যি যাকে ভালবাসা যায় তাকে বিয়ে না করাই বরং ভাল, ভালবাসাটা ঘসা পয়সার মতো হয়ে যায় না—"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "আপনি থামুন তো, এসব ব্যাপারে আপনার নিজের যখন কোন অভিজ্ঞতাই নেই তখন এ বিষয়ে আপনার কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নই আমি। ওসব কেতাবি কথা আমিও জানি—"

"অভিজ্ঞতা নেই আপনি জানলেন কি করে ?"

"আমি জানি।"

"কিছু জানেন না। কিম্বা জেনেও না-জানার ভান করছেন—"

উভয়ে উভয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর বলিল, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান আপনি কাউকে ভালবেসেছেন অথচ তাকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠেন নি!"

"আকুল হয়ে উঠলেও দমন করেছি সে আকুলতা। আমার আকুলতা আমার আত্মসম্মানজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি কখনও, পারবেও না!"

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, "যে ভালবাসা আত্মসম্মান-জ্ঞানকে বিপর্য্যস্ত করে দিতে না পারে সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়!"

"আপনি পুরুষের দিক দিয়ে ভাবছেন, আমি বলছি ভদ্র মেয়ের মনোভাব—"

আলোচনা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হইত কিন্তু দ্বারের বাহিরে একটা মোটর থামিবার শব্দ হওয়াতে আর হইল না।

বেলা দেবী উঠিয়া পড়িলেন।

"সায়েবের ওখান থেকে মোটর এল। আপনি বসুন, আমি চট্ করে ঘুরে আসছি এক্ষুনি—"

"আজ না গেলে কি হয়!"

"আর কিছু না, কিছুই বলবেন না—কিন্তু বড় কষ্ট পাবেন। এত অসহায়, যদি দেখেন তাঁকে। আমি যাব আর আসব—"

"সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছে তা হ'লে বলুন—"

"হ্যাঁ, ঠিক মা আর ছেলের মতো—"

হাসিয়া বেলা পাশের ঘরে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনি ততক্ষণ 'ওল্ড্ কিউরিয়সিটি শপ্'-খানা পড়ুন। আমি বেশী দেরি করব না। আর ইতিমধ্যে যদি চুনচুন এসে পড়ে তা হ'লে তো ভালই হবে—"

মুচকি হাসিয়া বেলা চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া 'ওল্ড্ কিউরিয়সিটি শপ'-খানার পাতা উলটাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মানসপটে চুনচুনের মুখখানা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। চুনচুনের কালো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া দিল।

১৪

সাড়ে পাঁচশত টাকার নোটগুলি সযত্নে ভিতরের পকেটে রাখিয়া ভন্টু নিবারণবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কি করিয়া নিবারণবাবুকে কথাটা বলিবে তাহা সহসা তাহার মাথায় আসিল না। বেচারা তাহার সহিত দারজির বিবাহ দিবে বলিয়া কত আশা করিয়া বসিয়া আছে। সহসা এমন করিয়া তাহার আশা-ভঙ্গ করিতে হইবে! নিবারণবাবুর আশা-ভঙ্গ করিতে ভন্টুর হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল তাহা নয়, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো! তা ছাড়া, লোকটা দাগী লোক, একবার একটা গুরুতর ঘা খাইয়াছে! অকারণে আবার একটা আঘাত করা সত্যই অন্যায় হইবে। কিন্তু আঘাত না করিয়া ভন্টুর উপায়ও নাই। যাহা স্বপ্নাতীত ছিল তাহাই সত্য হইতে চলিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের খামখেয়ালী বাদশাহ হারুণ-অল-রশীদের প্রেতাত্মাই সম্ভবত জুলফি-দার বড়বাবুর স্কন্ধে ভর করিয়াছে। তিনি ভন্টুকে জামাই না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। ইহার জন্য যত অর্থ লাগে তাহা তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। এতদিন ধরিয়া তিনি ভন্টুর গতিবিধি, চরিত্রবল, কর্ম্মতৎপরতা, কর্ত্তব্যবোধ সমস্তই

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, কোনরূপ বাধাকেই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে চান না। বাধার যতগুলি ঐরাবত ভন্টু খাড়া করিয়াছিল জুলফি-দারের উৎসাহস্রোতে সমস্তগুলিই ভাসিয়া গিয়াছে। বিবাহ-সম্পর্কে ভন্টুর সঙ্গত অসঙ্গত যতগুলি দাবী ছিল সমস্তই তিনি মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত। অসঙ্গত দাবীগুলি শুনিয়া জুলফি-দার বরং অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এগুলির দ্বারা ভন্টুর চরিত্রের মহত্তর দিকটাই না কি তাঁহার নিকট আরও সুপরিস্ফুট হইয়াছে। ভন্টু বড়বাবুকে বলিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার কন্যাকে যত টাকার অলঙ্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন সে টাকার দ্বারা যেন ঠিক একধরণের দুই সেট গহনা গড়ানো হয়। কারণ বড়লোকের মেয়ে এক-গা গহনা পরিয়া আসিবে এবং তাহার বৌদিদি—গুড্ ওল্ড্ বিড্ডিকার—নিরাভরণা হইয়া থাকিবেন ইহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। সংসারের জন্যই বৌদিদির গহনাগুলি একে একে গিয়াছে, বৌদিদির গহনা আগে না হইলে সে কোন ক্রমেই পূর্ণালঙ্কৃতা বধূ ঘরে আনিতে পারিবে না। বড়বাবু এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইয়াছেন। ভন্টুর দ্বিতীয় প্রস্তাব—বিবাহরূপ দায়িত্ব লইবার পূর্ব্বে সে অন্তত পাঁচহাজার টাকার লাইফ্ ইনসিওরেন্স করিতে চায়, কিন্তু এখন তাহার যাহা বেতন তাহার দ্বারা সে প্রিমিয়ম চালাইতে পারিবে না। বড়বাবু প্রিমিয়ম চালাইতে রাজি হইয়াছেন। বড়বাবুর ভাষায়—মানি ইজ্ নো কোশ্চেন—তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার জন্য একটি সৎপাত্র চান। তিনি ইচ্ছা করিলে মেয়েকে বড়লোকের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন, মেয়েটি সুশ্রী, তাঁহার টাকাও আছে। কিন্তু তিনি বড়লোকের ঘরের বয়াটে অকর্ম্মণ্য পাত্রের হাতে মেয়েকে দিতে চান না। তিনি চান গরীবের ঘরের সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, কর্ম্মঠ একটি যুবক এবং ভন্টুর মধ্যে তাহা তিনি পাইয়াছেন। টাকার জন্য তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না।

আপিসের বড়বাবু শ্বশুর হইলে অনিবার্য্যভাবে চাকরিরও উন্নতি হইবে। তাহার প্রমোশনের জন্য বড়বাবু ইতিমধ্যে রেকমেণ্ড করিয়াছেন। মেয়েটিও দেখিতে ভাল, কুষ্টিতেও নাকি রাজ-যোটক হইয়াছে। এতগুলি প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিবারণবাবুর কালো মেয়েকে বিবাহ করিবে এতবড় আদর্শবাদী ভন্টু নয়। নিজের সুবিধার জন্যই সে দারজিকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিল, এখন অধিকতর সুবিধার খাতিরে সে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করিতে মোটেই কুণ্ঠিত নয়। বড়বাবুকে নিবারণবাবু-ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় বড়বাবু অবিলম্বে তাহাকে নগদ সাড়ে পাঁচশত টাকা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন টাকাটা অবিলম্বে নিবারণবাবুকে ফেরত দিয়া আসিতে। কথাটা বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। একটা ওজুহাত তো খাড়া করিতে হইবে!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভন্টু শেষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, আজই সে নিবারণবাবুকে টাকাটা দিবে না। আজ দারজির কুষ্টিটা চাহিয়া আনিবে এবং পরদিন গিয়া বলিবে যে কুষ্টির মিল হইল না। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না। তাহার পর টাকাটা ফেরত দিলে দেখিতে শুনিতে সব দিক দিয়াই ভদ্র হইবে। সব ক্ষেত্রে সরল সত্য কথা বলিলে কি চলে?

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্যপ্রকারে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিত ভাবে। ভন্টু যখন নিবারণবাবুর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল তখন নিবারণবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দারজিই সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিল এবং বাহিরের ঘরটা খুলিয়া ভন্টুকে বসিতে বলিল। ভন্টু দারজিকে সামনাসামনি দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল; দারজি অবশ্য বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না, বাহিরের ঘরটা খুলিয়া দিয়াই চলিয়া গেল। ভন্টু বসিয়া রহিল। পাশের বাড়ির ছাদে একজন প্রৌঢ়া বিধবা বড়ি দিতেছিলেন এবং আপন মনেই কাহার উদ্দেশে কি যেন বলিতেছিলেন, ভন্টু অন্যমনস্ক হইয়া তাহাই শুনিতেছিল। দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া ভন্টু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল দারজি স-সঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"কি?"

"যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে একটা কথা বলব—"

"কি বল।"

দারজি কিছুক্ষণ আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "আমার ইচ্ছে নয় যে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়—"

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে ভন্টু কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল, কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিস্মিতকণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "ইচ্ছে নেই কেন ?"

দুই চক্ষুর দৃষ্টি ভন্টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া দারজি মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাকে বিয়ে করছেন খালি টাকার জন্যে—"

ভন্টু নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দারজিই পুনরায় বলিল, "তাছাড়া আমি ভিন্ন বাবাকে দেখবার এখন কেউ নেই। আপনি দয়া করে ভেঙে দিন বিয়েটা। আমি এখন বিয়ে করতে পারব না—"

আর কিছু না বলিয়া দারজি ভিতরে চলিয়া গেল।

ভন্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এরকম ঘটনা যে বঙ্গদেশে ঘটিতে পারে তাহা ভন্টুর কল্পনাতীত ছিল। একটু পরেই নিবারণবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিতেই ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অসঙ্কোচে তাঁহার হাতে টাকাগুলি দিয়া বলিল, "মাপ করবেন নিবারণবাবু, বাবা, বৌদি কেউ মত দিচ্ছেন না--"

নিবারণ আকাশ হইতে পড়িলেন।

"সে কি, মানে—"

"কিছুতেই মত হচ্ছে না, কি করি বলুন—"

"আমি একবার গিয়ে যদি—"

"না, আপনি আর কষ্ট করবেন না—"

নোটের তাড়া হাতে করিয়া নিবারণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১৫

মুকুজ্যে মশাই নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া তিনি মৃন্ময় এবং শঙ্করের জন্য চাকরির চেষ্টা করিতেছিলেন। একরূপ জোর করিয়াই তিনি হাসিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া মৃন্ময়কে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। শঙ্করের কিন্তু কোন সন্ধানই তিনি পাইতেছিলেন না। শিরিষবাবু তাঁহাকে যে ঠিকানা দিয়াছিলেন তাহা একটি মেসের ঠিকানা। মুকুজ্যে মশাই সেখানে গিয়া শঙ্করের দেখা পান নাই; কয়েক দিন পূর্ব্বেই না কি শঙ্কর সে বাসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারিল না। হয়তো শঙ্কর শিরিষবাবুকে তাহার নূতন ঠিকানা জানাইয়াছে এই আশায় মুকুজ্যে মশাই শিরিষবাবুকে পুনরায় পত্র দিয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত জবাব আসে নাই। মৃন্ময়কে লইয়া পরিচিত অপরিচিত নানা ব্যক্তির ও আপিসের দ্বারে মুকুজ্যে মশাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে মুকুজ্যে মশাই যেমন একটা সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, এই চাকুরি অনুসন্ধানেও তিনি ঠিক তাহাই করিতেছেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইংরেজী বাংলা কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকা কেনা হয়। মৃন্ময় অথবা শঙ্করের উপযুক্ত যেখানে যত কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখেন সর্ব্বত্রই একটি করিয়া দরখাস্ত পেশ করিয়া দেন। কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতায় থাকিলে নিজে গিয়া অথবা মৃন্ময়কে পাঠাইয়া তদ্বির করেন। এ পর্য্যন্ত তিনি কুড়ি জায়গায় দরখাস্ত করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন, কিন্তু দমেন নাই। মৃন্ময় দমিয়া গেলে হাসিয়া বলিয়াছেন, "ছেলেবেলার সেই কবিতাটা ভুলে গেলে ? 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ', দমে গেলে চলবে কেন ? চেষ্টা থাকলে ঠিক একটা না একটা কিছু লেগে যাবেই, দেখ না তুমি"—বলেন আর হাসেন। মৃন্ময় লজ্জিত হইয়া পড়ে।

সেদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে মৃন্ময় বাসায় একা ছিল। মুকুজ্যে মশাই এক-বিংশ দরখাস্তটির তদ্বির করিতে স্বয়ং বাহির হইয়াছিলেন। মৃন্ময় একা শুইয়া শুইয়া নিজের ছন্নছাড়া জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। বাল্যকালে পিতা-মাতা মারা গিয়াছেন, দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের যৎসামান্য সাহায্যে এবং প্রাইভেট টিউশনি করিয়া বহুকষ্টে সে এম. এ. পাশ করিয়াছে। নিজে পছন্দ করিয়া স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং এই বিবাহের জন্যই দূর-সম্পর্কের সেই আত্মীয়টির সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটে। আত্মীয়টির ইচ্ছা ছিল, বিবাহ-বাজারে মৃন্ময়কে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ-উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু আদর্শবাদী মৃন্ময় তাহা ঘটিতে দেয় নাই। সে নিজে পছন্দ করিয়া দরিদ্রের কন্যা স্বর্ণলতাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়াছিল এবং অনেক আশা করিয়া এই কলিকাতা শহরেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারটি পাতিয়াছিল। অতিশয় আকস্মিকভাবে তাহার সে সংসার

ছারখার হইয়া গেল। মনের আবেগে তখন মূর্খের মতন সে কি অদ্ভুত কাণ্ডটাই না করিয়া বসিল। স্বর্ণলতাকে খুঁজিবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিশে চাকরি লইল! একবার ভাবিল না যে পুনরায় বিবাহ করা মানেই স্বর্ণলতাকে অপমান করা, তাহার স্মৃতির সম্মুখে একটা যবনিকা টাঙাইয়া দেওয়া। স্বর্ণলতার সদ্যবিরহে সে ভাবিয়াছিল যে হাসিকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু উন্মেষিত-যৌবনা অনুরাগিণী পত্নীর সুনিবিড় সান্নিধ্যকে ঔদাসীন্যভরে পাশ কাটাইয়া যাওয়া কি এতই সহজ! তিলে তিলে ক্ষণে ক্ষণে অনিবার্যভাবে হাসি মৃন্ময়ের মনে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বর্ণলতার কথা এখন জোর করিয়া মনে করিতে হয়। তাহার স্মৃতিকে সজীব রাখিবার জন্য প্রথম প্রথম সে প্রতিদিন তাহাকে পত্র লিখিত। কিন্তু তাহাও ক্রমশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সহসা মৃন্ময় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। স্বর্ণলতার পত্রগুলি সে যে চন্দন কাঠের বাক্সটাতে রাখিত সে বাক্সটা তো হাসির সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে! মৃন্ময়ের গরম জামা কাপড় যে ট্রাঙ্কটাতে থাকিত সেই ট্রাঙ্কটাতেই চন্দন কাঠের বাক্সটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে ট্রাঙ্কটা তো হাসি লইয়া গিয়াছে। এতদিন সে ট্রাঙ্কের চাবি মৃন্ময়ের কাছে থাকিত; যাইবার সময় হাসি তাহা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দনের বাক্সটার কথা মৃন্ময়ের মনেই ছিল না। স্বর্ণলতার কথা হাসি কিছুই জানে না। হাসি এখন বেশ লিখিতে পড়িতেও শিখিয়াছে, সে যদি চিঠিগুলো পড়ে! মৃন্ময় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

"মৃন্ময়বাবু বাড়ি আছেন না কি?"

"আছি, আসুন—"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া মৃন্ময় বুঝিল পাশের বাড়ির এম. এ. পরীক্ষার্থী বিকাশবাবু আসিয়াছেন। ভদ্রলোক এবার ফিলজফিতে এম. এ. পরীক্ষা দিতেছেন। মৃন্ময়ও ফিলজফিতে এম. এ. শুনিয়া বিকাশবাবু মৃন্ময়ের নিকট সাহায্য লইবার জন্য মাঝে মাঝে আসেন। কাল মৃন্ময় বাড়ি ছিল না, বিকাশবাবু আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন—মুকুজ্যে মশায়ের নিকট মৃন্ময় তাহা শুনিয়াছিল। মৃন্ময় উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

বিকাশবাবু আসিয়াই বলিলেন, "মুকুজ্যে মশাই কোথায়?"

"তিনি বেরিয়েছেন—"

"হি ইজ্ এ ওয়াণ্ডারফুল ম্যান! অদ্ভুত লোক মশাই, কাল আপনি বাড়ি ছিলেন না, আমি একটু হতাশ হয়েই ফিরছিলুম; মুকুজ্যে মশাই বললেন পরীক্ষা না কি কাল থেকে, আমি বললাম, হ্যাঁ, মৃন্ময়বাবুকে আজ একবার পেলে ভাল হত। মুকুজ্যে মশাই আমাকে তখন কয়েকটা কোশ্চেন সাজেস্ট করে দিলেন, বললেন, এগুলো ভাল করে দেখে যেও, পড়তে পারে। আমি তো প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলুম; মুকুজ্যে মশাই যে এম. এ-র ফিলজফির কোশ্চেন সাজেস্ট করতে পারেন তা আমার ধারণারই বাইরে ছিল। যাই হোক, বললেন যখন দেখে গেলুম; আমাদের অবস্থা তো বোঝেন—ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচেস্ য়্যাট্ এ ষ্ট্র—গিয়ে দেখি ঠিক পড়েছে মশাই! উনিও নিশ্চয় এম. এ, নয়? কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই—"

মৃন্ময়ও বিস্মিত হইয়াছিল।

বলিল, "আমি ঠিক জানি না, উনি নিজের কোন পরিচয় কাউকে দেন না—"

"ফিরবেন কখন?"

"ঠিক বলতে পারি না। এলে খবর দেব আপনাকে—"

"দেবেন তো কাইণ্ডলি, নেক্স্‌ট্ পেপারটার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব—"

"আচ্ছা—"

বিকাশবাবু চলিয়া গেলেন। মুকুজ্যে মশায়ের নূতন পরিচয় পাইয়া মৃন্ময় যদিও বিস্মিত হইয়াছিল কিন্তু সে বিস্ময় তাহার মনকে এখন ততটা অধিকার করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত মন একটি মাত্র চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল—হাসির হাতে যদি স্বর্ণলতার চিঠিগুলি পড়িয়া থাকে তাহা হইলে কি হইবে!

১৬

শৈলর দিন কাটিতেছিল, কারণ সময়ের গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অমোঘ নিয়মে সূর্য্য ওঠে এবং অস্ত যায়, মানবের সুখদুঃখে দিশাহারা হইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও শ্লথগতি হয় না। বড় অফিসার মিস্টার এল. কে. বোসের পত্নী শৈলবালারও জীবনের দিনগুলি একে একে আসিতেছিল এবং যাইতেছিল। শৈল সুখী ছিল কি-না



শিল্পী — শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী — গাঁয়ের মোড়ল — ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এ প্রশ্ন কাহারও মনে উদিত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুখের উপকরণ হিসাবে যে সব জিনিস আহরণ করিবার জন্য আমরা প্রলুব্ধ হই, যাহার জন্য নিজেকে ক্লিষ্ট করি, অপরকে বঞ্চিত করি, মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করি—সুখের সে উপকরণগুলির অভাব শৈলর ছিল না। শৈল বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের পত্নী। বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি গহনা কিছুরই অভাব নাই। স্বামী রূপবান পদস্থ ব্যক্তি। শৈলর সহিত তিনি কোন দুর্ব্যবহার তো করেনই না, বরং শৈলর সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে স্বামীর নৈতিক কর্ত্তব্যবোধ মিস্টার এল. কে. বোসের একটু বেশী বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাড়িতে ঠাকুর চাকর দাই বাবুর্চি বেয়ারা গিজগিজ করিতেছে, শৈলকে গান-বাজনা এবং ইংরেজী শিখাইবার জন্য মিস মল্লিককে বাহাল করিয়াছেন, শৈলর নিজের ব্যবহারের জন্য আলাদা একখানা মোটরও তিনি সেদিন তাহার জন্মদিনে তাহাকে উপহার দিয়াছেন। শৈল তথাপি সুখী নয়। তাহার কারণ, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে উৎস উৎসারিত হইলে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ সুখী হয়, শৈলর অন্তরে সে উৎস ছিল না। শৈল স্বামীকে প্রিয়তম করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। শৈল স্বামীকে ভয় করে, তাঁহার নানাবিধ গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হয়, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাঁহাকে ভাল-বাসিতে পারে না। মিস্টার বোসের কর্ম্ম-ব্যস্ত জীবন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে নিয়মিত। তিনি নিক্তির ওজনে কর্ত্তব্য করেন, চুল চিরিয়া বিচার করেন, ওজন করিয়া কথা বলেন। চাকরির উন্নতিই তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান, উপর-ওলা সাহেবদের বিষয়ই তাঁহার প্রিয় আলোচ্য বিষয়। সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্থান তাঁহার জীবনে নাই। যতটুকু আছে তাহা সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য। ঝকঝকে বাঁধানো কতকগুলি মূল্যবান সংস্করণের নামজাদা পুস্তক দামী আলমারিতে সাজানো আছে, প্রতি ঘরের দেওয়ালে সুন্দর ফ্রেমে প্রসিদ্ধ কয়েকখানি ছবিও ঝুলিতেছে। বাড়িতে গ্রামোফোন আছে, পত্নীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী আছে, রেডিওর চলন তখন ছিল না, থাকিলে তাহারও লেটেস্ট মডেল নিশ্চয় মিস্টার বোসের গৃহ অলঙ্কৃত করিত। কিন্তু মিস্টার বোসের অন্তরে ইহাদের কোন শ্রদ্ধার স্থান নাই, মনে মনে তিনি এসব কবিত্ব টবিত্বকে অনুকম্পার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। শৈলর সহিত মাঝে মাঝে ইহা লইয়া আলোচনাও হয়। মিস্টার বোসের ভাষায় এ সমস্ত জিনিসই ওয়ার্থলেস্ অকর্ম্মণ্য লোকেদের উপজীব্য। পৃথিবীতে যাহারা কাজের লোক তাহাদের ওসব লইয়া মাতামাতি করিবার অবসর কই! সুতরাং শৈলর নূতন শেখা সুরটা শুনিয়া মুগ্ধ হইবার, নূতন প্যাটার্নের শেলাইটা দেখিয়া তারিফ করিবার অথবা নূতন শোনা নাটকটার কাহিনী ধৈর্য্যভরে শুনিবার ইচ্ছা মিস্টার বোসের নাই, ইচ্ছা নাই বলিয়া অবকাশও নাই। তিনি নিখুঁত কর্ম্ম-তৎপরতার সহিত নিজের নিখুঁত কর্ম্মজীবন যাপন করিয়া চলিয়াছেন। নিম্নতন কর্ম্মচারিরা সকলে জানে—বোস সায়েব ভারি স্ট্রিক্ট্ লোক, কোন কিছুরই খাতিরে তিনি বিধিবদ্ধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না।

শৈল মাঝে মাঝে ভাবে তাহার স্বামী যদি একটু কম নিখুঁত হইত, একটু কম বুদ্ধিমান হইত, একটু কম মাহিনার চাকরি করিত তাহা হইলে হয় তো সে সুখী হইত। এমন প্রবল রকম নিখুঁত লোককে ভয় করা চলে, শ্রদ্ধা করা চলে, ভালবাসা যায় না।

শৈলর মাঝে মাঝে শঙ্করদা'র কথা মনে পড়ে। বাল্য-কালে শঙ্করদা তাহার সঙ্গী ছিল, তাহার অসঙ্গত মান ভাঙাইবার জন্য কত সাধ্যসাধনা করিত। শঙ্করদা আজকাল আর আসে না। কেনই বা আসিবে? বিবাহ হইয়াছে, নূতন বউ লইয়া সে হয় তো আনন্দেই আছে। মিস্ মল্লিকের সহিত শঙ্করদা'র মাঝে মাঝে না কি দেখা হয়। মিস্ মল্লিককে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলে শঙ্করদা নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু ডাকিয়া পাঠাইতে লজ্জা করে, ভয়ও হয়।

১৭

সকালের টিউশনি সারিয়া বেলা দেবী এগারোটা নাগাদ বাসায় ফিরিলেন। স্নানাহার করিয়া আবার বাহির হইতে হইবে। দুপুরে আরও গোটা দুই টিউশনি আছে। মেয়েদের গানের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বেলা মল্লিকের পশার বেশ জমিয়া গিয়াছে। প্রথমত মেয়েদের গান শিখাইবার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারী শিক্ষকেরই বেশী চাহিদা, দ্বিতীয়ত বেলার শুধু রূপ নয় গুণও আছে। গান বাজনায় বেশ

দখল হইয়াছে, হার্মোনিয়াম, সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো এই চারিটি যন্ত্র খুব ভালভাবে বাজাইতে পারেন এবং ছাত্রীদের খুব যত্নসহকারে শিখাইয়া থাকেন। বেতনও যে খুব অসম্ভব রকম বেশী তাহা নয়, সুতরাং গীত-বাদ্য-জিজ্ঞাসু ছাত্রীমহলে বেলা দেবীর চাহিদা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমন কি, সময়ের অভাবে আজকাল অনেক ছাত্রীকে ফিরাইয়া দিতেও হইতেছে। দাদার সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়া প্রথমে তিনি অকূল পাথারে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সত্য সত্যই নিজের পায়ে সমর্থভাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। দাদার প্রতি মনোভাবও অনেকটা কোমল হইয়া আসিয়াছে। হয় তো আর কিছুদিন পরে দাদার নিকট তিনি ফিরিয়াও যাইতেন। মনের ভিতর এই যুক্তিটা ক্রমশ অঙ্কুরিত হইতেছিল, এখন আর ফিরিয়া যাইতে আপত্তি কি, এখন তো আমি সত্য সত্যই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছি, দাদার অর্থ অথবা অনুগ্রহের উপর আর তো নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না। অন্য সব টিউশনি ছাড়িয়া দিলেও ওই বৃদ্ধ সাহেবটি যাহা দেন তাহাতেই তাহার একার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল। বেলা দেবী ফিরিয়া আসিয়াই একখানি পত্র পাইলেন—প্রিয়নাথ মল্লিকের পত্র। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পড়িলেন, সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিতেছেন—

বেলা,

এতদিন পরে বুঝিলাম কেন তুমি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলে এবং এতদিন পরে তোমার সম্বন্ধে আমার একটা ভ্রান্ত ধারণাও অপনোদিত হইয়া গেল। এতদিন তোমাকে আমি পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়েদের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিয়া ছোট করিয়া দেখিতে পারি নাই। তোমার স্বাধীনভাবে থাকিবার অসামাজিক ইচ্ছাকে তোমার খামখেয়ালি জেদি প্রকৃতিরই স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি তুমিও পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়ে, শাসনের গণ্ডী ডিঙাইয়া স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা করিতে চাও। শঙ্করবাবু নামক ব্যক্তিটি যে তোমার প্রণয়ী তাহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু এখন তোমার আচরণে তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি আশ্চর্য্য হইয়া কেবল ভাবিতেছি, তোমার সামাজিক জ্ঞান কি একেবারে লোপ পাইয়াছে! লোকটাকে প্রকাশ্যভাবে ঘরে স্থান দিয়াছ! তোমাকে এখনও অনুরোধ করিতেছি, এখনও তুমি যদি ভালভাবে থাকিতে চাও, আমার কাছে ফিরিয়া এস। ইহাই আমার শেষ অনুরোধ জানিবে। ইতি

তোমার দাদা
প্রিয়নাথ মল্লিক

বেলা পত্রখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দাদার নিকট ফিরিয়া যাইবার যে ইচ্ছাটি মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল তাহা মুহূর্ত্তে অপসারিত হইয়া গেল! শঙ্করকে প্রকাশ্যভাবে বাড়িতে স্থান দেওয়ায় ক্ষুব্ধ জনার্দ্দন সিংও চাকরিতে জবাব দিয়া গিয়াছে। এই পত্রখানি বেলাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় আঘাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাক, বেলা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। শঙ্করবাবুর যতদিন না কোথাও চাকরি হইতেছে ততদিন বেলা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিবেন না ইহাতে যে-ই যাহা বলুক না কেন।

বেলা দেবী পাশের ঘরে গেলেন। ইক্‌মিক্ কুকারটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন একটু গরম আছে, একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। তাড়াতাড়ি স্নানটা সারিয়া লইতে হইবে, শঙ্করবাবু হয় তো এখনি আসিয়া পড়িবেন। তেলের শিশি এবং সাবানের কৌটা লইয়া বেলা বাথ-রুমে গেলেন। বাথ-রুমের ভিতর যে তৃতীয় আঘাত উদ্যত হইয়াছিল তাহা বেলা প্রত্যাশা করেন নাই। বাথরুমের জানালা গলাইয়া কে একটা প্রকাণ্ড খাম মেঝের উপর ফেলিয়া গিয়াছে। জনার্দ্দন সিং নাই, সুতরাং ওপাশের ছোট দেওয়ালটা অতিক্রম করিয়াই কেহ নিশ্চয় আসিয়াছিল এবং জানালা গলাইয়া ইহা রাখিয়া গিয়াছে। বিস্মিত বেলা দেবী খামটা তুলিয়া লইলেন। বেশ মোটা লম্বা খাম। খাম খুলিয়া বেলা দেবীর সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইয়া গেল। খামের ভিতর অতিশয় অশ্লীল একটা ছবি এবং ততোধিক

অশ্লীল একটা চিঠি। চিঠিটা দরখাস্তের আকারে লেখা, নীচে আট-দশজনের নাম। প্রণয়ী-হিসাবে ইহারা সকলেই যে শঙ্করের অপেক্ষা বেশী যোগ্য তাহাই অতি অশ্লীল ভাষায় বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বেলা কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর খামখানা লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহা স্পিরিটে ভিজাইয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। খামখানা যখন নিঃশেষে পুড়িয়া গেল তখন আবার তিনি বাথরুমে ফিরিয়া গেলেন।

একটু পরেই শঙ্কর আসিয়া পড়িল। সঙ্গে চুনচুন। চুনচুনকে দেখিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, "ও, তাই এত দেরি! আমি ভাবছিলাম শঙ্করবাবু চাকরির সন্ধানে বুঝি বিবাগীই বা হয়ে গেলেন! চুনচুনের সঙ্গে কোথায় দেখা?"

শঙ্কর বলিল, "আমিই ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

বেলা চুনচুনের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোরা সার্ভিস্ সিকিওরিং বিউরো খুলেছিস না কি!"

চুনচুনের মুখ বিষণ্ণ, তবু এই কথাগুলি শুনিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "না, শঙ্করবাবু গিয়েছিলেন প্রকাশবাবুর খোঁজে—"

"প্রকাশবাবুর খোঁজে কেন?"

শঙ্কর বলিল, "প্রকাশবাবু আমার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবেন বলেছিলেন। তার জানা-শোনা একটা প্রেসে প্রুফ-রীডারের একটা কাজ না কি খালি আছে—"

"কত মাইনে?"

"প্রকাশবাবুর দেখাই পেলাম না। চুনচুনের দিদির সঙ্গে আলাপ হল, তিনি সব শুনে দয়ার্দ্র হলেন, বললেন যতদিন আপনার কোন কাজ না হয় ততদিন আপনি না হয় আমার ছেলে দুটিকে পড়ান আর আমাদের বাড়িতে থাকুন—"

বেলা দেবী অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া একটু হাসিলেন। "আপনি রাজি হয়ে এসেছেন তো?"

"না হয়ে উপায় কি—"

একটু থামিয়া শঙ্কর আবার বলিল, "এনি পোর্ট ইন্ দি স্টর্ম। আপনার দাক্ষিণ্যে আর কতদিন বাস করা যায় বলুন—"

বেলা ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সংবাদে, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য শঙ্করের এই আকুলতায় তাঁহার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তবু তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ করেছেন! এখন চলুন খাওয়া যাক, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চুনচুন, তুই খেয়ে এসেছিস তো?"

চুনচুন বলিল, "হ্যাঁ।"

তিনজনে খাইবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

অসীম ও সসীম

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

১

দিনরাত্রি, রাত্রিদিন, অবিরাম ঘুরে—
কাল-চক্রে অবিরত হ্রাস-বৃদ্ধি হয়;
নদ-নদী যেথা আজ, কাল তাহা দূরে,
ভাঙা-গড়ার হাটে সবই হয় লয়।

২

অসীম সমুদ্র দেখি' সম্মুখে আমার
মধ্যে তার মণি-মুক্তা করিতেছে খেলা,
ডুব দিয়া দেখি শুধু ঘেরিয়া আঁধার,
এমনি কাটিয়া যায় জীবনের বেলা!

৩

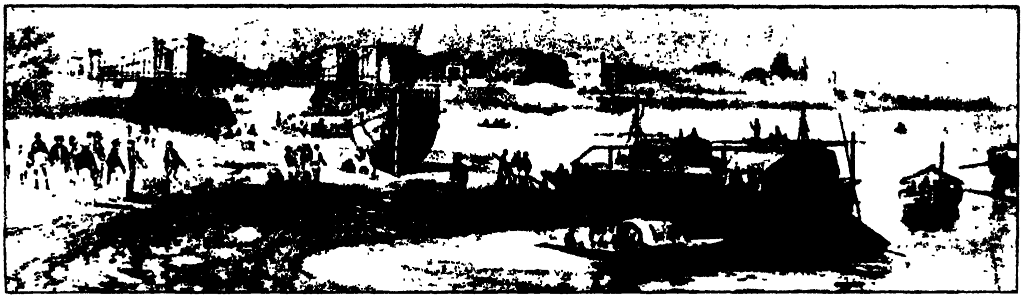
তীরে উঠে দেখি পুনঃ প্রবাল মাণিক
আলোকিত করে আছে, অতল অসীম,
তুলে আনি' শক্তি নাই, তাহার খানিক;
চিন্তাই অনন্ত শুধু, জীবন সসীম।

সেকালের ইংরেজ-সমাজ *

শ্রীহরিহর শেঠ

দৈনন্দিন জীবন

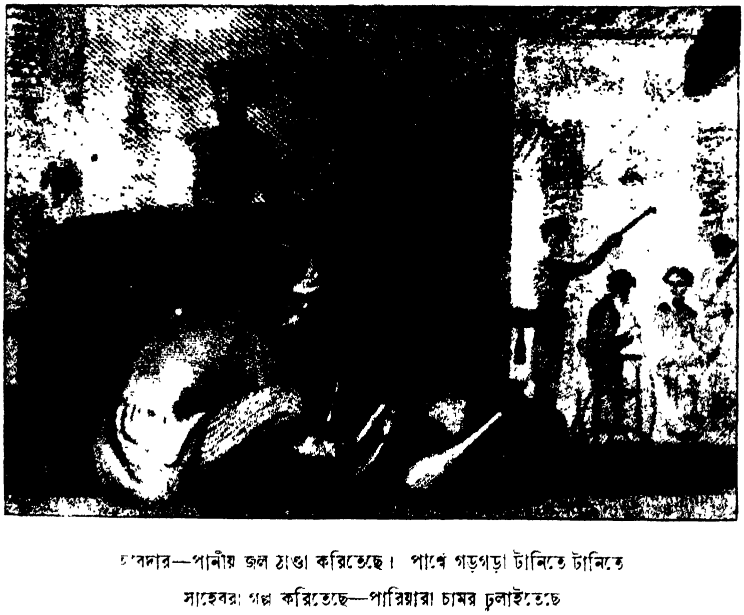
অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় ইংরেজ অধিবাসীদের জীবন তেমন কর্ম্মবহুল ছিল না। কাজ যাহা কিছু সাধারণত



ভাগীরথী তীরের একটি দৃশ্য

প্রাতে সারিয়া লইত এবং সন্ধ্যার সময় দুই-এক ঘণ্টা কাজ লইয়া থাকিতে হইত। অবশিষ্ট অধিকাংশই কেরানির দ্বারা সম্পন্ন হইত। তদ্ভিন্ন পরিশ্রমের তত আবশ্যকও তখন ছিল না।

নিদাঘের দিনে মধ্যাহ্নে এগারটা হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত দেখা-সাক্ষাতের পক্ষে নিষিদ্ধ সময় বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। সায়াহ্নই এজন্য প্রকৃষ্ট সময় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন ডিনার সূর্য্যাস্তের সময় পরিবর্ত্তিত হয়, তখন দেখা সাক্ষাৎ সাধারণত প্রাতেই হইত। ভদ্রমহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রধানত এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রযুক্ত ছিল।



আবদার—পানীয় জল ঠাণ্ডা করিতেছে। পার্শ্বে গড়গড়া টানিতে টানিতে সাহেবরা গল্প করিতেছে—পারিয়ারা চামর ঢুলাইতেছে

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় ইংরেজ মহিলা খুবই অল্প ছিলেন। অল্পসংখ্যক যাহারা ছিলেন তাঁহারা বড়ই বিলাসিনী ছিলেন। সাংসারিক কাজ-কর্ম্মের দিকে তাঁহারা আদৌ মনোযোগ দিতেন না, দাসদাসী বা ক্রীতদাসদাসীদের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেন। সাধারণত

* পূর্ব্বে "ভারতবর্ষ"-এ অনেকগুলি প্রবন্ধে প্রাচীন কলিকাতার বিবিধ বিষয় পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। এক্ষণে এই প্রবন্ধে তদানিন্তন ইংরেজ-সমাজের কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে হয়ত কোন কোনটি পূর্ব্বে অন্য বিষয়ের সহিত দেওয়া হইয়া থাকিতে পারে। প্রবন্ধের অঙ্গসৌষ্ঠব রক্ষার জন্য তাহা পরিবর্জ্জনের চেষ্টা করি নাই।—লেখক।

তাঁহারা প্রাতে আটটা হইতে নয়টার মধ্যে শয্যাত্যাগ করিতেন। দেড়টার সময় মধ্যাহ্ণ ভোজন শেষ করিয়া পুনরায় বৈকালে চারিটা পাচটা পর্য্যন্ত নিদ্রা দিতেন। তৎপরে সাজসজ্জা



সেকালের বাঙ্গালী বাবুর ব্যঙ্গচিত্র

করিয়া সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কোন নাচের আসরে অথবা গঙ্গার ধারে বা গঙ্গাবক্ষে আমোদ প্রমোদে কাটাইতেন। এই সবের দ্বারা তাঁহাদের অর্থব্যয়ও যথেষ্টই হইত।

পান-ভোজন

আহারীয়ের মধ্যে গুল্ ও স্টু বিশেষ করিয়া বর্দ্ধমান স্টু নামে মৎস্য মাংস বা ফাউল সহযোগে প্রস্তুত একপ্রকার স্টু বিশেষ প্রিয় ছিল। তবে ইহা যদি রজত পাত্রে প্রস্তুত না হইত তাহা হইলে তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত না। "হার্টলি হাউস্" গ্রন্থে যে ডিনারের বর্ণনা আছে তাহাতে দেখা যায়, বারটার সময় কোল্ড হ্যাম্, মুরগী এবং ঠাণ্ডা সুরা বা সরবৎ ব্যবহৃত হইত। হংস মাংসও দেওয়া হইত, কিন্তু সুপের ব্যবহার তখন প্রচলিত ছিল না।

রাত্রের ভোজনের ব্যবস্থা ছিল রাত্রি দশটার সময়। তখন সাধারণত ভোজ্যের মধ্যে থাকিত পনির ও দুই-এক পাত্র অনতিতীব্র মদ্য—এই মাত্র পানীয়। তৎপরে কিছুক্ষণ হুক্কা টানিয়া এগারটার সময় শয়ন করিত। সুরাপান তখন অধিক পরিমাণেই প্রচলিত ছিল। অনেক ভদ্রলোক দৈনিক তিন-চারি বোতল এবং মহিলাগণ অন্তত এক বোতলও পান করিত। তখনকার প্রিয় পানীয় ছিল ক্লারেট্ ও মদিরা। বিয়ার এবং পোর্টারপিও প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইত না। সিডার্ ও পেরি নামক আপেল ও পিয়ার হইতে প্রস্তুত মদ্যগুলিও আদরণীয় ছিল। গ্রীষ্মকালে তালরস, চিনি, আদা ও বিয়ার মদ্য সহযোগে একপ্রকার দেশীয় মাদক পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। অতিরিক্ত গরমের দিনে অনেকে 'অ্যারাক্' মদ্য পানে নিজেদের পরিতৃপ্ত করিতেন।

পোষাক-পরিচ্ছদ

ভদ্রলোকেদের পোষাক সেকালে বিভিন্ন প্রকার ছিল। কোট্জামা অল্পই ব্যবহৃত হইত। অনেক সময় বৈকালিক পোষাক নিতান্ত হালকা রকমের ছিল। সচরাচর ভিতরে একটা আস্তীন শূন্য ও উপরে একটা আস্তীন সমেৎ সাদা



সেকালের মেম সাহেব

লিনেন্ কাপড়ের অঙ্গরাখা থাকিত। অবশ্য ইউরোপ হইতে নবাগত, বিশেষত রেজিমেণ্টের কর্ম্মচারীরা, অসুবিধা বোধ

সত্বেও প্রথম প্রথম কোট পরিধান করিত, কিন্তু কোন ভদ্রলোকের বাটীতে যাইতে হইলে প্রথম ঐরূপ আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেও অল্প পরেই উপরের



গঙ্গাবক্ষে বজরা

জামা খুলিয়া তাঁহার সঙ্গের চাকর যে অঙ্গরাখা লইয়া যাইত তাহা পরিধান করিত। ক্রমে উপরি উক্ত লিনেন্ কাপড়ের পোষাকের পরিবর্ত্তে আলপাকার জামার প্রচলন হয়। বাটীর অভ্যন্তরে থাকা কালীন সকলেরই মশক দংশন নিবারণ কল্পে পায়ে মোটা কাগজের একটা করিয়া আবরণী ব্যবহার হইত। যাহা হউক ভদ্রলোকেরা এখানকার জলবায়ু বা শীতাতপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলেও মহিলাগণ সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন না, তাঁহারা জাঁকজমকপূর্ণ মূল্যবান পোষাকেই সমধিক অনুরক্ত ছিলেন এবং লণ্ডনের মহিলাবর্গের পরিচ্ছদের অনুকরণে পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন।

গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র

গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র এখনকার তুলনায় তখনকার দিনে খুব কমই ছিল। তাহার কারণ প্রথমত উহা পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না এবং যাহা পাওয়া যাইত তাহাও অত্যন্ত মহার্ঘ্য ছিল। সাধারণত বিলাতি জাহাজের কাপ্তেনের নিকট হইতে বা চীনা আমদানি হইতে সংগ্রহ করিতে হইত। কদাচিৎ কোন গৃহে সব কেদারাগুলি এক প্রকার দেখা যাইত। ভাল শিল্পীর অভাবে এখানকার প্রস্তুতগুলি প্রায়ই নিকৃষ্ট জাতীয় হইত। দরজা বা জানালায় কাচ-সংলগ্ন সাশি তখন ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে বেতের বুনন এক-প্রকার প্রস্তুত হইত। কাচের সাশি প্রথম সামান্য যে কয়জনের গৃহে ছিল তন্মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নাম উল্লেখযোগ্য। উহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য ছিল। দরিদ্রগণ প্রায়ই একতলা বাটীর মেজেতে নিদ্রা যাইত। দ্বিতল বাটী তখন খুবই কম ছিল।

ইউরোপীয়গণ রাত্রে গৃহ আলোকিত করিবার জন্য নারিকেল তৈলের ব্যবহার বেশী করিত না, তৎপরিবর্ত্তে মোমের বাতি প্রজ্বলিত করিত। বাহিরের বাতাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য বড় বড় কাচের আলো-ঢাকা ব্যবহার হইত।



সেকালের চাপরাসি

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত টানা পাখার প্রচলন ছিল না, তালপত্রনির্ম্মিত বড় বড় হাতপাখার

ব্যবহার হইত। বড় বড় মজলিসে শ্বেতবর্ণ পোষাক পরিহিত দেশীয় চাকরেরা এ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। কথিত আছে, কোন সরকারি অফিসে একজন কেরানি ঘটনাক্রমে একখানি টেবিলের উপরের তক্তা কড়িতে ঝুলাইয়া উহার সঞ্চালনে গৃহাভ্যন্তর শীতল হয় বোধ করায় ক্রমে টানা পাখার আবিষ্কার হয়।* বরফের প্রচলনও তখন ছিল না, অন্য কৃত্রিম উপায়ে তখন জল ঠাণ্ডা করা হইত। যাহারা এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত থাকিত তাহাদের 'আবদার' বলিত।

নৈতিক চরিত্র

সুরাপান ব্যভিচার প্রভৃতি দেশীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের ন্যায় ইংরেজ-সমাজেও তখন খুব বেশী প্রচলিত ছিল। তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মনে করিতেন অর্থ, অবসর এবং দেশের জলবায়ুই ইহার কারণ। অনেককে প্রকাশ্যভাবে উপপত্নী লইয়া ঘর করিতে দেখা যাইত। সময় সময় দুইটি লইয়াও থাকিত। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়ের ন্যায় ইহাদের সাধারণত মাসিক ত্রিশ-চল্লিশ টাকা করিয়া নিয়মিত বরাদ্দ থাকিত। নৈতিক আবহাওয়া তখন খুব নিম্নস্তরেরই ছিল। প্রতারণা, শঠতা, লাম্পট্য প্রভৃতি সমাজের অতি পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইত। ড্রেক্, ক্লাইভ্, ফোর্ট উইলিয়মের প্রথম ইঞ্জিনীয়ার বয়ার প্রভৃতির চরিত্রও ইতিহাসে এই ভাবে মসিলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ্যাড্মিরাল্ ওয়াট্সনের কৃত কর্ম্মের ফলে উমিচাঁদ প্রবঞ্চিত হইয়া একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পরিশেষে উন্মাদ-গ্রস্ত হইয়াছিল। মহারাজা নন্দকুমারকে যে অপরাধে বৃটীশ আইনে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই অপরাধ করিয়াও ক্লাইভ্ আভিজাত্য শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বয়ার সাহেব গভর্নমেণ্টকে প্রতারণার দ্বারা বিশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়া পরে ডাচ্ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ব্যবসাক্ষেত্রেও ইউয়োপীয়দের নৈতিক চরিত্র প্রশংসনীয় ছিল না। সিভিলিয়নদের চরিত্রও সাধারণত বহু দোষ-সম্বলিত ছিল। বিবাদ কলহও প্রায় সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা দেখা যাইত। হেস্টিংস ও ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইতিহাসে চির-অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে যে তরুতলে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বহু দিন পর্য্যন্ত তাহাকে লোকে ধ্বংসতরু আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিল।

ধর্ম্মভাব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মভাব অতি নিম্নস্তরে ছিল। ধর্ম্মের সাধারণ নীতিগুলিও অনেকক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রতিপালিত হইত না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ডেভিড্ ব্রাউন্ প্রথম যাজকরূপে কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার সময়ে গির্জ্জায় গিয়া উপাসনায় যোগদান করা কতকটা বে-রেওয়াজ হইয়া গিয়াছিল। তখন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের



সেকালের ইংরাজ মহিলার বেশবিন্যাস

জন্য প্রধানত দরিদ্র শ্রেণীর লোকেদেরই প্রায় দেখা যাইত। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সেণ্টজন্ গির্জ্জায় রবিবারে যে লোক সমাগম হইত অর্দ্ধ ডজন পাল্কি বা গাড়ি তাহাদের আনয়নের জন্য যথেষ্ট ছিল। পাদ্রিরা তখন বেশ মোটা বেতন ও যথেষ্ট উপরি পাইলেও প্রার্থনা একবার করিয়াই হইত। সাধারণত তাঁহারা প্রতি-বিবাহে ষোল হইতে বিশ মোহর দক্ষিণা পাইতেন এবং দীক্ষাভিষেক কার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কম দক্ষিণা ছিল পাঁচ মোহর। তখনকার দিনে কলিকাতায় এক মোহর বিলাতের অর্দ্ধ ক্রাউনের সমান ধরা হইত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের প্রথমাংশে

* টানাপাখার আবিষ্কার সম্বন্ধে অন্যান্যরূপ বৃত্তান্তও পাওয়া যায়।

ধর্ম্মযাজকগণ সরকারের চক্ষে বিপদজনক লোক বলিয়া বিবেচিত হইত।

খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদ

গৃহাভ্যন্তরের খেলার ভিতর সামর্থ্যবানদের মধ্যে বিলিয়ার্ড খেলাই বিশেষ প্রিয় ছিল, কিন্তু অপরাপর সাধারণ সকলের মধ্যেই তাস খেলার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। চা পান করিয়া সন্ধ্যার পর রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত, যতক্ষণ নৈশ-



সেকালের সিভিলিয়ানের বেশবিন্যাস

ভোজের জন্য ডাক না পড়িত ততক্ষণ তাস খেলা চলিত। কেহ কেহ কোন প্রকার গীতবাদ্য লইয়াও থাকিত।

নৌকাবিহার, ঘোড়দৌড়, শীকার—বিশেষ করিয়া—বরাহ শীকার তখনকার দিনে এখানকার ইংরেজ অধিবাসীদের অত্যন্ত আদরের ছিল। গঙ্গাবক্ষে বহু মূল্যবান সুন্দর সুন্দর ছিপের ন্যায় অপ্রসর লম্বা নৌকা-রোহণে ইংরেজ নরনারীদের সর্ব্বদা বেড়াইতে দেখা যাইত। সেগুলিকে সর্পনৌকা ও ময়ূরপঙ্খী বলিত। এই সকল নৌকা একশত ফিটের অধিক লম্বাও দেখা যাইত কিন্তু প্রস্থে আট ফিটের অধিক হইত না। এই যানযোগে তাঁহারা চন্দননগর, চুঁচুড়া, এমন কি, সুখসাগর পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাইতেন। ঘোড়দৌড় তখনও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। গার্ডেন্‌রীচের নিকট যে স্থানকে আক্রা বলে তথায়ও ময়দানে দুইটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। মহিলা-দের বাজার করিতে যাওয়া তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

পদব্রজে ভ্রমণ সে সময়ে সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহলেও কোনরূপ নিন্দনীয় বা সম্মানহানিকর বিবেচিত হইত না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স তাঁহার গার্ডেন্‌রীচের বাটী হইতে প্রত্যহ সুপ্রীম কোর্টে পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। এমন কি, রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণও প্রতি রবিবারে সাড়ম্বরে মিছিল করিয়া গীর্জ্জায় উপাসনায় যোগদান করিতেন।

সেকালে থিয়েটার প্রচলনের পূর্ব্বেও গীতবাদ্যের দল ছিল। আনুমানিক ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে একশত টাকা করিয়া চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত একলক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান স্কচ্ গীর্জ্জা যেখানে আছে তথায় একটি নাট্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবৈতনিক সখের দলগুলিই কেবলমাত্র পুরুষ লইয়া তখন অভিনয় করিত। সে অভিনয় অনেক সময় হাস্যজনক হইত, তাহা হইলেও তাহা দেখিবার জন্য একমোহর মূল্যের পর্য্যন্ত টিকিটও বিক্রীত হইত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া যায়। মার্কুইস্ অফ্ কর্ণওয়ালিস্ এরূপ নাট্যাভিনয়ে বীতশ্রদ্ধ থাকায় তৎপরে অনেকদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় ইহাতে আর উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। (ক্রমশঃ)



রূপ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী

দৃষ্টিসীমার ভিতরে একই সময়ে অনেক জিনিষ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু প্রয়োজনের বস্তুকে খুঁজে নিতে হয় তা থেকে। যা দেখা যায় তাকেই রূপ বলব। দৃষ্টিজ্ঞান রূপ-উপলব্ধির একমাত্র অধিকারী—অনায়াসে তা স্বীকার করা যায় না—কেন না, অপর ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যের অভাবে দৃষ্টিজ্ঞান পূর্ণতালাভে অসমর্থ হয়। বস্তুর বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতি আমাদের দৃষ্টিকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখে। বৃক্ষের যে রূপ তার শাখা-পল্লব-পুষ্প বা ফলের সে রূপ হয় না, আবার একই বৃক্ষের ফল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ছোট বা বড় হতে দেখা যায়।

দৃষ্টিজ্ঞান হবার সঙ্গেই শিশুগণ বিভিন্ন বস্তুর রূপ গ্রহণের শক্তি লাভ করে এবং এই জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তারা পরিচিত হতে থাকে। আলোক ব্যতীত বস্তুর রূপ গ্রহণ করবার মত এমন কোন বিশেষ শক্তি মানুষের দৃষ্টিযন্ত্রের ভিতরে নেই বলে হয় ত ভগবান দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য আলোকের সৃষ্টি করেছেন। স্পর্শ দিয়ে বস্তুর আকৃতি উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু বর্ণজ্ঞান লাভ হয় না।

সূর্যের আলোক ব্যতীত মানুষের আবিষ্কৃত আলোকও রূপ দেখার কাজে লাগে। যেমন—প্রদীপ গ্যাসের আলো বিজলি বাতি প্রভৃতি। বস্তুতে প্রতিফলিত আলোক বয়ে আনে তার রূপকে আমাদের দৃষ্টিযন্ত্রের ভিতরে। দৃষ্টিযন্ত্র রূপবহা (optic) স্নায়ুর সাহায্যে তাকে মস্তিষ্ক-গ্রহণ-কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়, পুনরায় উপলব্ধির প্রেরণা নিয়ে সে রূপ ফিরে আসে। দৃশ্য জগতের সঙ্গে মস্তিষ্ক-স্নায়ু-কেন্দ্রের ক্রমাগত যোগাযোগ এ ভাবেই চলছে। সূর্যের আলোক বিশ্লেষণ করে নিউটন দেখিয়েছেন, বহুবিধ বর্ণের সমাবেশ তাতে আছে। সেই আলোক-রশ্মির আঘাতে আকাশে বিভিন্ন বর্ণের যে ঢেউ উৎপন্ন হয়, বস্তুর সংস্পর্শে তা এলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বর্ণসমূহ ফিরিয়ে দিয়ে বাকিটা সে গ্রহণ ক'রে নিজেকে মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে রঙিণ করে' তোলে। রঙিণ ঢেউগুলি বিশিষ্ট পরিধিযুক্ত, বৈজ্ঞানিকগণ এইটেই প্রমাণ করেছেন। রক্ত বর্ণ ঢেউএর পরিধি ও গতি সর্বাপেক্ষা অধিক, পীতবর্ণ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, নীল বর্ণের ঢেউ ক্ষুদ্রতম এবং সর্বশেষে আমাদের দৃষ্টি-কেন্দ্রে এসে পৌঁছায়। নীল-এর পরে আরো কতকগুলি বর্ণের ঢেউ আসে, তা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত বর্ণের তাৎপর্য বোঝা যায় না—তা মিশ্র বর্ণের সমষ্টিমাত্র। বিভিন্ন বর্ণের ঢেউ কাটাকাটি হয়ে ঐ সকল বৈশিষ্ট্যহীন বর্ণের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

পদার্থবিদ্‌গণ বলেন, বর্ণের বিদ্যমানতার জন্যই আলোর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অন্ধকারের কোনই বর্ণ নেই, কেন না আলো তথায় প্রবেশ করে না। চিত্রশিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী এর বিপরীত। তাঁরা দেখেন, রক্তবর্ণের আলোক স্পর্শে পীতবর্ণের আলোক কমলা লেবুর বর্ণে রূপান্তরিত হয় না, কিন্তু রক্তবর্ণ ও পীত বর্ণের মিশ্রণে তা হয়। বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে অন্ধকারের রূপ এবং শুভ্র আলোককে বর্ণহীন করে তাঁরা চিত্রিত করেন। উপরোক্ত কোন মতবাদকেই অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্থূল দৃষ্টিতে সূর্যালোকে বর্ণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় না। জলের যেমন বিশিষ্ট কোন রূপ নেই—যে পাত্রে রাখা যায় তার রূপই ধারণ করে, সূর্যের আলোককেও স্থূল দৃষ্টি দিয়ে তেমনই করে আমরা দেখে থাকি। আলোক-স্পর্শে বস্তুর যথার্থ রূপ প্রকাশ পায় সাধারণ জ্ঞানে—এটাই আমরা মনে করি এবং এই মনে করার অভিজ্ঞতা নিয়েই বাস্তবকে কল্পনার জগত থেকে টেনে এনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা উপভোগ করি।

আলোকেরও একটা রূপ আছে ~~তা অন্য~~ রূপের সংযোগ ব্যতীত বোঝা যায় না। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এই ছড়িয়ে পড়া আলো খেলে বেড়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন রঙিণ পদার্থের বুকের উপর দিয়ে। প্রকৃতির এই রঙিণ পটভূমিকার জন্যই আলোর রূপকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। পৃথিবীর সর্বত্র যদি আলো অথবা অন্ধকারময় হ'ত তবে তাদের বিশেষত্ব মানুষের দৃষ্টিতে হয় ত ধরা পড়ত না। আকাশের নীল আভা সূর্যের উজ্জ্বল বর্ণকে প্রকাশ করে, অপর পক্ষে ঐ নীল আভার অস্তিত্ব প্রমাণ করে সূর্যালোক।

বর্ণের বিভিন্ন রূপ (value) যা আমরা বস্তুতে প্রত্যক্ষ করি, প্রকৃতপক্ষে সে বস্তুর রূপ তা নয়। সূর্য-কিরণ বিশ্লেষণ করে বর্ণের যে সকল রূপ পাওয়া গেছে তাদিকে খাঁটি রূপ বলে মেনে নিতে হবে। ঐ রূপ অবলম্বনেই বর্ণক (pigment) প্রস্তুত হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে ঐ সকল বর্ণের প্রভাব দ্বারা নানারূপ ব্যাধির চিকিৎসা হতেও দেখা যায়। ঘাসের বর্ণ সবুজ না বলে যদি কমলা লেবুর বর্ণ অথবা তাকে বর্ণহীন বলি, ব্যক্তিবিশেষের সন্দিগ্ধ মনে হয় ত তা উপহাস বলেই ধারণা হবে। কিন্তু সত্যি করে তা নয়। কেন না, আলোকের তারতম্যে ঘাসের সবুজ বর্ণকে যথাক্রমে পীত নীল কমলা লেবুর বর্ণের মত দেখা যেতে পারে—আমরা দেখিও তা-ই। কালো চুলের স্থানবিশেষে ধূসর বর্ণ সময়ে দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ, চুলের মসৃণতা ও প্রতিফলিত আলোকের প্রভাব। বস্তুপৃষ্ঠ অসমান বা মসৃণ হবার জন্য অথবা বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রতিফলিত আলোককে অবাঞ্ছিত বর্ণ-উৎপত্তির কারণ হতে দেখা যায়।

জীব দেখে এই জগত, সূর্য ও তার আলোককে। সকলের ভিতর দিয়ে সেই বর্ণ এবং আকৃতিই এসে পড়ে। বর্ণ অথবা আকৃতি কোন্‌টি পূর্বে দেখা যায় তাহাই এখন প্রশ্ন। আর্থার ম্যাকমরল্যাণ্ড বলেছেন, "......we see form through colour. Shapes and edges

of things are fixed by their colour boundaries.......In other words, the study of colour and form should be so closely related that the student conceives their excellences at one and the same time." যদিও বর্ণ ও আকৃতি আমরা একই সময়ে উপলব্ধি করি কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বর্ণকে পূর্বে দেখার প্রশ্নই স্বভাবত প্রথমে মনে জাগে।

দেখার বিষয়টা সূক্ষ্ম বিচারদৃষ্টির ভিতর দিয়ে আলো-ছায়ার গণ্ডির ভিতরে এসে পড়ে। আলো-ছায়ার রূপকে বর্ণ ব্যতীত অপর কিছু ভাবা যায় না। দৃশ্য জগতের সব কিছুই আলোক দ্বারা প্রতিফলিত ; এমন কি, ছায়া কালো স্থানে পর্যন্ত আলোকের স্পর্শ লাভ ক'রে স্বকীয় অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আলো যেখানে ছায়াকে সীমাবদ্ধ করে দেয় বস্তুর আকৃতি সেখানেই ফুটে ওঠে। বিশিষ্ট কোন বর্ণযুক্ত বস্তুর সকল দিক একই শক্তির আলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে তার রূপের বৈশিষ্ট্য চলে যায়—বর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কোন বস্তুর সর্বত্র সমপরিমিত আলোকপাত হতে দেখা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল আলোক রশ্মি আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃতিক দুটি বস্তুর রূপ পৃথক হয় কেন ? উত্তরে বলা যেতে পারে, তা ভগবানের সৃষ্টিবৈচিত্র্য। কিন্তু বর্তমান যুগের লোক এরূপ সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে পারবে না, কেন না, বিচারের দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তাই হবে উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর এবং সে উত্তর দেওয়ার কর্তা দর্শক স্বয়ং। রূপ-পর্যালোচনা দ্বারা দু-এর পার্থক্য নির্দিষ্ট করেন দর্শক। এই পর্যালোচনায় আলো ও ছায়াকে বাদ দেওয়া চলে না।

বস্তুর অবস্থানকে বাদ দিয়ে তার রূপকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। সকল বস্তুই যে-কোন প্রকার আশ্রয় অবলম্বন করে আছে। প্রাকৃতিক বস্তুর আশ্রয়স্থল এই পৃথিবী—পৃথিবীর আশ্রয়স্থল আকাশ। কথাটা নূতন নয় বটে কিন্তু এই পুরাতনের রূপ নিয়েই নূতনের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে হয়। বৃক্ষ লতা ঘর বাড়ী জীব জন্তু জলাশয় প্রভৃতির আশ্রয়স্থল যেমন পৃথিবী, এক বস্তুর আশ্রয়স্থল তেমনি অপর বস্তু। এক গাদা পুস্তকের আশ্রয়স্থল টেবিলটি, টেবিলের আশ্রয়স্থল দোতালার মেঝে—আবার মেঝের আশ্রয়স্থল ভূমিতল। এইরূপ কত কি। তা হলেই দেখা যাচ্ছে জগতে আছে মাত্র দুটো বস্তুর অস্তিত্ব—একটি আধার অপরটি আধেয়। একটি হ'ল সমতল ভূপৃষ্ঠ (horizontal plane), অপরটি উন্নত সমতল ক্ষেত্র (virtical plane) ; অথবা বক্রোন্নত সমতল ক্ষেত্র (oblique plane) ; উন্নত বা বক্রোন্নত সমতল ক্ষেত্র সমতল ভূপৃষ্ঠকে আশ্রয় করে আছে। কোন বৃক্ষ সরলোন্নত, কেউ বাঁকা, কেউ-বা শায়িত অবস্থায় থাকে—এটাই আমরা দেখতে পাই। বস্তুর ঘনতা যা সমতল ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে কোণ সৃষ্টি করে, উন্নত সমতল ক্ষেত্র তাকেই মনে করে নিতে হয়। প্রাকৃতিক এই রূপবৈচিত্র্য মানুষেরই উপভোগ্য, কেন না প্রকৃতিকে রূপায়িত করে তোলে মানুষেরই কল্পনা।

বস্তুর অবস্থানকে পর্যালোচনা করতে গেলে তার পরিপ্রেক্ষিত রূপকে (perspective view)ও বাদ দেওয়া যায় না। নিকট ও দূরের দৃশ্য বর্ণ বা আকৃতির দিক থেকে ঠিক একই প্রকার দেখা যায় না। বস্তুর গাত্রস্থিত ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র অগণিত কণা থেকে আলোক-রশ্মি বস্তুর প্রতিকৃতি বয়ে আনে আমাদের দৃষ্টিকেন্দ্রে। ঐ সকল আলোকরশ্মি একই আয়তনবিশিষ্ট নিকট বা দূরের বস্তু হতে বড় এবং ছোট কোণ সৃষ্টি করে' আমাদের দৃষ্টিকেন্দ্রে প্রবেশ করে—যার ফলে বড় কোণে অবস্থিত বস্তুকে বৃহৎ এবং ছোট কোণে অবস্থিত বস্তু ক্ষুদ্রাকৃতি দেখায়।

দূরের এবং কাছের বস্তুর বর্ণে অনেক পার্থক্য বর্তমান থাকে। দূরের বৃক্ষলতার বর্ণ নীলাভ, নিকটের বৃক্ষলতাকে সবুজ আভা-বিশিষ্ট দেখায়। কোন নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অর্থাৎ আধিপ্রায়নিক দৈর্ঘ্য (focal length) পর্যন্ত বস্তুর সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করতে পারি আমরা। ক্রমদূরবর্তী বর্ণের ঢেউগুলির আয়তন বেড়ে চলে, তাই তারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যথার্থ রূপের স্পর্শ দিতে তারা অক্ষম হয়। তা ছাড়া আমাদের গ্রহণ ও অভিব্যক্তির উপরও যথেষ্ট নির্ভর করতে হয়। আমি যে বস্তুকে নীল বর্ণ বলে নির্দেশ করতে চাই অপরে হয় ত তাকেই সবুজ বর্ণ বলে বসেন। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এমন ভ্রম হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব বলতে পারা যায় না। বৃক্ষলতার বর্ণে পীত ও নীল বর্ণের আধিক্য বর্তমান থাকে, রক্ত বর্ণের আভা নিতান্তই কম দেখতে পাওয়া যায়। ঐ বর্ণগুলি ক্রম-দূরবর্তী হওয়ার ফলে রক্ত ও পীত বর্ণ অদৃশ্য হতে থাকে, নীল বর্ণের অনুভূতি পশ্চাতে থেকে যায়। দূরের ছায়া কালো নীল বর্ণে রক্ত বর্ণের আভাস অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিফলিত আলোয়ার বৈশিষ্ট্য ছাড়া তা অন্য কিছু মনে করা কঠিন। এরূপ বর্ণ রঙিণ মেঘের প্রতিবিম্ব অথবা পারিপার্শ্বিক কোন রক্তবর্ণ বস্তুর প্রভাব বলে স্বীকার করা ব্যতীত উপায় নেই।

প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যক্ষজাত যে জ্ঞানলাভ হয়, মনুষ্যত্ব লাভের দিক থেকে তাকে যথেষ্ট মনে করা চলে না। "Have eyes, see not" চক্ষু থাকতেও অন্ধ এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। দু ব্যক্তি সমপরিমাণ অভিজ্ঞতা নিয়ে কোন বস্তু দেখে না। ফুটবল খেলা দেখতে যায় অনেকে—কিন্তু খেলার বিষয় পূর্বলব্ধ জ্ঞান যার আছে সাধারণ দর্শক অপেক্ষা সে তা উপভোগ করবে বেশী। রাস্কিন্ বলেন, "As we increase the range of what we see, we increase the richness of what we can imagine." দৃষ্টিসীমার বিস্তৃতির সঙ্গে আমাদের কল্পনা-শক্তি প্রসার লাভ করতে থাকে। অতএব রূপকে যথার্থভাবে জানতে হলে দৃষ্টিশক্তিকে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা শক্তিশালী করে নিতে হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাকৃত বা মানবকৃত রূপ কি কি উপায়ে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটা দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু তার প্রয়োজনের বিষয় তেমন কিছু বলা হয়নি।

সুন্দর কুৎসিত রূপেরই প্রকারভেদ মাত্র এবং উভয়েই উপভোগ্য। চিত্রে প্রতিফলিত যে রূপ দেখতে পাই আমরা, প্রকৃতির অনুকরণেই তা

অঙ্কিত হয়ে থাকে। বিরাট প্রকৃতির ভিতর সুন্দর দৃশ্যটুকু বেছে নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রকৃতির সে গোপন সৌন্দর্য চিত্রে জানা যায়, আবার চিত্রের ভিতরে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যটুকু খুঁজে বার করা আর এক সমস্যা। গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যার দৃশ্যটি ভাল লাগে, কিন্তু দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হয় এমন স্থানটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রাকৃতিক চিত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাভাবিক হয়েছে, অথচ দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না —এমনও দেখা যায়। ভাললাগা না-লাগার প্রশ্নকে বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে মানুষ চায়। দেখার অজ্ঞানতার কাছে এই চাওয়াকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতি বা চিত্রের রূপ জানা না থাকলে তাকে বোঝবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। চিত্রের ভিতর দিয়ে জগতের অনেক রূপ আমাদের গ্রহণ করতে হয়। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা না থাকলে অথবা কেউ বুঝিয়ে না দিলে চিত্রের মর্ম বোঝা অসাধ্য।

বরপক্ষ ক'নে দেখে এলেন। কথাও পাকা হতে চলল। বর ক'নের কিন্তু পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হলো না। বর তার ভাবী সহধর্মিণীর আলোকচিত্র সম্মুখে নিয়ে অজ্ঞাত তৃপ্তিকে টেনে এনে মনটাকে তাতে ডুবিয়ে দিলে। ক'নের বর্ণ যতদূর জানা গেছে সাহানার বর্ণের মতই হবে—গড়নটাও অনেকটা তারই মত দেখতে—চোখ দুটি কলেজের সেই মেয়েটির চোখের মত না হয়ে যায় না—ওষ্ঠাধর সাহানার তুলনায় আরো পাতলা—গণ্ডদ্বয় তার গণ্ডের মত পরিপুষ্ট না হলেও লাবণ্যযুক্ত ইত্যাদি ভাবতে গিয়ে আলোকচিত্রের প্রতিকৃতিকে একেবারে যেন সে সজীব করে তুলতে লাগল। কলেজের মেয়েটিও সাহানার রূপের অভিজ্ঞতা না থাকলে তার বিচার-দৃষ্টি ক'নের প্রতিকৃতিকে অমন ভাবে উপভোগ করতে পারত না। ক'নের জীবন্ত রূপের অভিজ্ঞতা থাকলে তার প্রতিকৃতির ভিতরে বর তার তৃপ্তির খোরাক আরও বেশী খুঁজে নিতে পারত।

প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর রূপ গ্রহণ করতে হলে এ সকল বিষয় অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নয়। কেন না, প্রাকৃতিক নিয়মে যে জ্ঞান লাভ হয়, শিক্ষিত মত তা যথেষ্ট মনে করে নিতে পারে না। বাস্তবের রূপ নিয়েই কল্পনার সৃষ্টি। মানুষের ভাবধারা এই কল্পনাকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে চলা ভাবধারা মানুষকে টেনে নিয়ে যায় সফলতার সিংহদ্বারে—যেখানে সৃষ্টির উন্মাদনা কর্মজীবনকে সার্থক করে দেয়।

অকৃতার্থ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(গান)

আজিও তোমারে
　　সাধিতে শিখি নি গানে :
চেয়েছি আঁধারে
　　দীপটিকা—অভিমানে।
ছন্দে তোমার এসেছে আভাষ,
গন্ধ তোমার এনেছে বাতাস
ফুলের ফোয়ারা
　　ঝরায়েছি কলতানে :
শুধু—ধ্রুবতারা
　　করি নি বরণ প্রাণে ॥

রূপে তুমি আছ
　　জানি সুন্দর, জানি :
গুণে তুমি রাজো
　　তাই তো গুণীরে মানি।
তবু সঙ্গীতে তোমার আরতি
সন্ধ্যা জ্বালে নি—হে প্রেমসারথি,
গভীর গহনে
　　অধীর আত্মদানে
তোমার চরণে
　　চাহি নি শরণ প্রাণে ॥

নিশি করো ভোর
　　প্রভাতবন্ধু মম!
গান প্রিয় মোর,
　　তুমি হও প্রিয়তম।
রাগিণীদোলায় দুলিব না আর :
আজ শুধু চাই চির-অভিসার
অচিন মধুর
　　অকূলের কূল পানে :
দূরে যাক সুর
　　তুমি কাছে এসো প্রাণে ॥

ঝড়-পূর্ণিমা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

১

ভীষণ দুর্য্যোগ! তিথি পূর্ণিমা হ'লে কি হয়, নক্ষত্র মঘা। দ্বি-প্রহরে যাত্রা করলে তারা সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বে খুলনা পৌছে যেত, কিন্তু সে প্রস্তাবে শৈলেন গুপ্তের অন্তরাত্মায় লুকানো কবিতার ফোয়ারা গুমরে উঠেছিল।

—আরে বিলক্ষণ! ছিঃ! বৈশাখের কাট-ফাটা রোদে মোটর চালিয়ে লাভ কি? বেলা পাঁচটায় কলকাতা থেকে যাত্রা করব—ফুট্‌ফুটে চাঁদের আলোয় আলোয়—ওঃ, কেয়া মজেদার!

সুরেশ দত্ত শৈলেন গুপ্ত অপেক্ষা একটু অধিক হিসাবী। সে বললে—বলছ শলু, কিন্তু কাল-বৈশাখী—

—বিলক্ষণ! কাল-বৈশাখী, বেনো-শ্রাবণ, পচা-ভাদ্দর—এসব ভাবতে গেলে নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকতে হয়। জীবন থেকে রোমান্স বাদ দিলে, অবশিষ্ট অংশের মূল্য কতটুকু?

সুরেশ বললে—একটা হিসাবের খাতা না থাকলে জীবন দুর্ব্বিসহ হয়।

শৈলেন হেসে বললে—হিসাবের যথেষ্ট সময় আছে। যৌবনে ভবঘুরের সফর জমে ভাল, যদি চেতনার পিছনে একটা অনির্দ্দিষ্ট দুর্দৈবের কালো ছায়া থাকে।

কিন্তু বারাসাত পার হয়ে যখন তারা দেখলে পথের ধারে পুকুরের বুকে কালো মেঘের ছায়া, তখন নিজেদের চেতনায় আতঙ্কের কালো রেখার সন্ধান পেলে। হাবড়া পার হবার পর, গগনের বর্ণ হ'ল কাজল-কালো। হাওয়া বন্ধ হ'ল, পাখীর কলরবে মুখরিত হ'ল বড় গাছ। চীল আর বাজ-পাখী মাথা নিচু ক'রে আকাশ থেকে টুপ্ টুপ্ ক'রে উঁচু তরুর মাথায় ঝরে পড়তে লাগলো।

ছুট্, ছুট্, মোটর ছুটলো। রাস্তার দুধারে অব্যবহিত সন্নিকটে কোনও ঘর-বাড়ি দেখা গেল না। পথে লোক নাই। গাড়ির বাঁশীও নীরব। কেবল পথের সঙ্গে চাকার মিলনের মৃদু শব্দ। সেই থমথমে প্রকৃতির অঙ্গ ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে, সামনে পিছনে দক্ষিণে বামে ক্ষণিক আত্ম-প্রকাশ করলে আগুনের কাল-নাগিণীর মত ক্ষণ-প্রভা। সে আঁকা-বাঁকা জলন্ত দেহ লুকাচ্ছিল আকাশের অন্তরের মাঝে। ঝলসানো গগনের মর্ম্মস্থল হ'তে আর্ত্তনাদ উঠ্‌ছিল—কড়, কড়, কড়, কড়।

ছুট্! ছুট্! ঊর্দ্ধশ্বাসে মোটর ছুট্‌ছিল লোকালয়ের সন্ধানে। অবশেষে দুর্য্যোগের সংযম লোপ পেলে। তার স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলুপ্ত হ'ল। প্রলয়ের শিহরণে বিশ্ব কেঁপে উঠ্‌লো। ভীষণ সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে মাতাল হাওয়া অভদ্রভাবে ছুটাছুটি করতে লাগলো। ধাবমান মোটরের সঙ্গে সে শক্তি পরীক্ষা করলে। সংগ্রামের ভীম আরাবে যাত্রীযুগল সন্ত্রস্ত হ'ল। উপায় কি? শৈলেনের হাতের নিয়ামক-চক্রও যেন শ্রান্ত। যখন আশে পাশে মট্ মট্ করে গাছের ডাল ভাঙ্গতে লাগলো, শৈলেন ও সুরেশের গাঢ় উদ্বেগ উচ্চারিত হ'ল সমস্বরে—সর্ব্বনাশ।

গাড়ি থামালে মাথায় গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা। দ্রুত চালানও অসম্ভব হ'ল। কারণ বড় দীপের আলোর পথ রোধ করে দাঁড়ালো সংখ্যাতীত ধূলিকণা।

পথ ঘাট নভস্তল হ'তে অদূর ভবিষ্যত সম্বন্ধে বহু কু-সমাচার পরিবেশন করলে নানাপ্রকার ধ্বনি—সোঁ-ও-সোঁ, কোঁ-ও-কোঁ, ধুপ্, ধাপ্, কড় কড়। বন্ধুদের মুখ থেকে উপেক্ষার চিহ্ন উপে গেল। ধীরে ধীরে ময়াল সাপের মত অগ্র-গমন করছিল গাড়ি। চিন্তার স্রোত দোটানা—আকস্মিক বিপদের আতঙ্ক, সৌভাগ্যবশে পথের ধারে পল্লীর সন্ধান।

রাতের আঁধার যখন গাঢ় হয়, উষার আলো থাকে তার বুকের মাঝে। হঠাৎ সুরেশ অদূরে একটা অট্টালিকার আভাস পেলে। সেকালের লোক হ'লে বলত—জয় মা কালী! এরা তা বললে না, বললে—ভগবানের কৃপায় একটা গ্রামে পৌছেছি।

বড় রাজপথ ছেড়ে তারা গ্রাম্য-পথে গাড়ি ফেরালে।

২

নীরব বিস্ময়ে তরুণী আগন্তুকদের দেখলে।

ঘন আঁধারের পর উষার আলো। মৃত্যু বিভীষিকার অবলুপ্তি। তার উপর এই সুন্দরীর নীরব আতিথেয়তা পথিক যুগলকেও বিস্মিত করলে। পুরুষস্য ভাগ্যং ইত্যাদি ইত্যাদি সত্য। তাদের সহজ স্ফূর্ত্তির মৃত্যু-স্বপন টুটলো। তারা ঘুম-ভাঙা চোখে এক কমনীয় মূর্ত্তি দেখলে মুগ্ধ হর্ষে।

শৈলেন বিপদের কথা বুঝিয়ে শেষে বললে—আজ আপনার অতিথি হয়ে আমরা মৃত্যুর নিমন্ত্রণ এড়ালাম।

সুরেশ বললে—এ আশ্রয় না লাভ করলে—ভীষণ—ওর-নাম-কি—

বজ্রের নিস্বন তার বাকী কথাগুলাকে ডুবিয়ে দিলে। ঘরের রুদ্ধ জানালাগুলা কেঁপে উঠলো।

তরুণীর নাম সুশীলা। তার শালীনতা প্রকাশ পেলে তার অমায়িক নিঃশঙ্ক হাসিতে। সে জোড়হাত করে বললে—কি সব বলছেন? আপনারা স্বচ্ছন্দ হন। ঝড়ের সময় যে-কোনো গৃহস্থের বাড়িতে পথিক নিঃসঙ্কোচে আশ্রয় নিতে পারে। সৌভাগ্য গৃহস্থের।

—বিলক্ষণ—ব'লে শৈলেন্দ্রকুমার বন্দুক আর টোটার পেটি রাখলে ঘরের কোণে। মনে মনে বললে—মিস্ বাবা যে সব বড় বড় বাঙলা কথা বলছে, হঠাৎ না বানান জিজ্ঞেস করে বসে।

তার পাশে নিজের বন্দুক আর টোটা রাখবার সময় দেওয়ালের মুকুরে সুরেশ মুখ দেখ্‌লে।

—বাই জোভ—ব'লে সে শিষ্ দিলে।

এবার ঝড়ের শব্দ মন্দ হ'ল, কারণ প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। ক্ষুব্ধ বায়ু দারুণ বেগে বারিধারাকে তাড়না করতে লাগলো। গাছের পাতায়, কক্ষের প্রাচীরে, গো-শালার টিনের ছাদে, বৃষ্টি আছড়াতে লাগলো।

সুশীলা ঘরের আলোয় তাদের চেহারা দেখলে। বিদ্রূপের হাসিকে দমন ক'রে বললে—আপনারা বড় ধূলা মেখেছেন। এরকম ঝড়ে সেটা স্বাভাবিক। কোট্ খুলে, হাত, মুখ, মাথা ধুয়ে ফেলুন। আরাম বোধ করবেন।

শৈলেন সুরেশের মুখের দিকে তাকালো। বন্ধু সুরেশ শৈলেন্দ্রকে দেখলে। উভয় যুবকের ভুরু সাদা, চুল সাদা, এমন কি ধূলা-ধূসরিত চোখের পাতার সূক্ষ্ম কেশগুলাও সাদা।

সহজ নিষ্ঠুরতা তাদের উভয়কে হাসালে।

সুশীলার আত্মসংযম অপূর্ব্ব। দেওয়ালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র ছিল। সে তাঁর প্রশস্ত ললাটের দিকে তাকিয়ে রহিল।

মানুষ অপমান সহ্য করতে পারে, কিন্তু তার সহিষ্ণুতা অবজ্ঞার কাছে পরাজিত হয়। প্রফুল্ল-মুখ মেয়েটি তাদের ধূলা-মাখা পাগলের মত চেহারা দেখে হাস্য-সম্বরণ করলে—এ তিতিক্ষা বাড়াবাড়ি। তাদের জিদ্ চাপলো কুমারীটিকে তাদের চেহারার উদ্দেশ্যে হাসাবার। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীর্ঘ ললাটের কৃপায়, অশোভন স্থৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য সুশীলার আকৃতি হইতে নির্ব্বাসিত হ'ল না।

তাঁদের বিদ্রূপ-বাণের তূণ যখন শূন্য হ'ল, সুশীলা মোলায়েমভাবে বললে—আপনারা কোট্ খুলে ফেলুন, আমি মুখ ধোবার জলের ব্যবস্থা করছি।

চঞ্চল-গতিতে সে অন্তর্ধান করলে।

সুরেশ দত্ত বললে—দুঃখের পর সুখ, ফেল হওয়ার সংবাদের পর, বাই চান্স পাশ-করাদের ফিরিস্তির মধ্যে নাম দেখ্‌তে পাওয়ার মত।

—হাঁ। কোথায় মৃত্যু-পুরের পথিক, আর কোথায় অচিন দেশের রাজ-কন্যার অতিথি। মেয়েটি—

সুরেশ কপাল কুঁচকে তর্জ্জনী তুলে ইঙ্গিত করলে। শৈলেন সাম্‌লে নিলে।

অচিরে সুশীলা এসে বললে—শ্রীকান্ত, বাবুদের—মানে, সাহেবদের নিয়ে যাও।

শ্রীকান্ত ফতুয়া-পরা, গাল-পাট্টাধারী খানসামা। একটা ঝট্‌কা মেরে সে তার বাবরি চুলের থোকাকে তরঙ্গায়িত করে বললে—হুজুররা, আসুন।

স্নানের ঘরে জল ছিল, ধবধবে তোয়ালে ছিল, বুরুষ ছিল। এরা যথাসম্ভব নিজেদের সুদর্শন ক'রে যখন ফিরলো, টেবিলের উপর সুশীলা চা তৈরি করছিল।

মিঃ সুরেশ দত্ত একটু লাজুক, বিশেষ মাতৃ-জাতির সান্নিধ্যে। মিঃ শৈলেন গুপ্ত বললে—বিলক্ষণ। এসব কি করছেন? মিস—

কুমারী সুশীলা রায় বল্লে—চা। আমি মিস্ রায়।

জাপানী চীনে-মাটির পেয়ালার গায়ে আঁকা অজানা গাছে তার পটোল-চেরা চক্ষের চাহনি নিবদ্ধ ছিল।

শৈলেন বললে—চা তো দেখতে পাচ্ছি, মিস্ রায়।

সুরেশ দত্তের এবার কথা ফুটলো। সে বললে—দেখতে পাচ্ছ তো জিজ্ঞাসা করছ কেন? দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রে অবসন্ন হ'য়ে পড়া গেছে। আবার সৌভাগ্যের সঙ্গে লড়াই সুরু করছ কেন? মিস্ রায়—ধন্যবাদ। এ সময় চা অমৃত।

এবার তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সরল হাসি হেসে সুশীলা বললে—চিনি?

শৈলেন বললে—আমি কেম্‌ব্রিজে পড়বার সময় চিনি খাওয়া ছেড়েছি।

সুরেশ বললে—আর আমি পাই না বলে খাই না।

তাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে সুশীলা বললে—আমার বঙ্কুকাকা চিনি খান না। কিন্তু তিনি কেম্‌ব্রিজ দেখেন নি। আর সদা সত্য কথা বলেন ব'লে নিজের চিনি কেনবার সামর্থ্য নাই এ কথা বলেন না।

সে অপাঙ্গে তাদের দিকে চাহিল। কথাগুলা সরল। কিন্তু এরা কৃতবিদ্য তরুণ—প্রচ্ছন্ন শ্লেষের আভাস পেলে। এ ক্ষেত্রে সরল প্রতিপ্রশ্নই সমীচীন। শৈলেন বললে—একটা তো কিছু বলেন।

সুশীলা অতি অমায়িকভাবে হেসে বললে—বঙ্কুকাকা পরিহাস করে বলেন, ইংরেজী প্রবচন মতে নিউকাসেলে কয়লার আমদানি নিষ্প্রয়োজন। তিনিও মিষ্টতার খনি—তাঁর অঙ্গে বাহিরের চিনির আমদানি নিরর্থক।

সুরেশ সামলে নিয়েছিল। সে বললে—মধুর খনি আপনাদের বংশ জুড়ে।

এবার সুশীলা খোলা হাসি হাসলে। বললে—আমরা বনগ্রামের নিকটে বাস করি, মধুর হ'ব কেমন করে। আর ক্ষমা করবেন—আচ্ছা থাক্।

সে শৈলেনের হাতে চা দিতে গেল। শৈলেন আম কাঠের তক্তা ছেড়ে এগিয়ে এসে সে দান গ্রহণ করলে। মাথা হেঁট করে কুমারীকে অভিবাদন করলে।

ঠিক ঐ প্রকার প্রক্রিয়ার পর সুরেশ বললে—থাক্ কেন? বরষার দিনে খোস্ গল্প মনোরম। বলুন কি বলছিলেন।

সে বললে—আমার বাবা ধৃষ্টতা পছন্দ করেন না।

অনিচ্ছা, ধৃষ্টতা তার উপর লজ্জায় রাঙা গাল। তারা জিদ্ করতে লাগলো অনুচ্চারিত কথাগুলা শোনবার জন্য।

সে বললে—মানে, খনিতে মধু পাওয়া যায় না—আল্‌কাতরা পাওয়া যায়। মধু পাওয়া যায় চাকে। আর মৌমাছি চাক গড়ে যেখানে সেখানে।

তারপর একটু ক্ষীণ স্বরে বললে—শহরে গড়ে না।

এবার তারা তাকে হাতে পেলে। শুনেছিল গ্রামটা বনগ্রামের সন্নিকটে।

সুরেশ বললে—খাঁটি সত্য কথা। বনগ্রামের কাছে গ্রাম সহরের ত্রিসীমার বাইরে।

পরাজিতা বিজেতার মত হাসলে। এর পর কথাবার্ত্তা সরল হ'ল। ঝড়ের কথা, পূর্ণিমার কথা।

কুমারী বললে—বৈশাখী পূর্ণিমা ঝড়-পূর্ণিমা হ'লে ভারি বিরক্তিকর হয়।

সভা এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলে।

এবার শীকারের কথা হ'ল।

সুশীলা বললে—মহিলার পক্ষে শীকারের পক্ষপাতিত্ব, নারীত্বের অবমাননা। কারণ, নেশাটা নিষ্ঠুর। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি—

সুরেশ অনেকগুলা বাঙলা নভেল পড়েছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল। সে বললে—প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতা মানব-প্রকৃতি। নারীত্ব নিষ্ঠুরতাকে কমিয়ে ফেলেছে, কিন্তু প্রকৃতি থেকে তার শিকড় উপ্‌ড়ে ফেলতে পারে নি।

আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও শৈলেন হিন্দুসংস্কৃতি বর্জ্জিত ছিল না। সে বললে—শীকার, এমন কি, মানুষ-শীকার, মনে মনে পছন্দ না করলে, সীতা ধনুক-ভাঙা রাজপুত্রের অপেক্ষায় বসে থাকতেন না—তপোবন থেকে বেদান্তবাগীশ এনে বিবাহ করতেন।

সুরেশেরও প্রেরণা এলো। সে বললে—মধ্যযুগের নাইটদের উদ্দীপনার মূল ছিল নারী-প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতা।

সুশীলা এখনও বি-এ পাশ করে নি। সুষ্ঠু শব্দ তার আয়ত্তে ছিল কিন্তু এত গভীর মনস্তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি ছিল না। বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে সে সম্মত হ'ল না। বললে—শীকারের সঙ্গে জয়-পরাজয়ের সম্বন্ধ। সে অনুভূতি

অহঙ্কারের। তাই মানুষ বিজয়ের তৃপ্তি পায় শীকার ক'রে, নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে না। বিশেষ মাতৃজাতি। অবশ্য বাঘ-ভাল্লুক মারলে মানুষের মঙ্গল হয়।

এ কথার পর শৈলেনকে বল্‌তে হল—বাঘ মারা ভাল স্পোর্ট। এতে একটু থ্রিল্‌ আছে। সেবার সেই—ঐ যে —মানে—বিলক্ষণ—

সে ঘাড় নাড়লে, তুড়ি মারলে, কিন্তু ঐ যে কি, সে তা বল্‌তে পারলে না।

সুরেশ ভদ্র। এ ক্ষেত্রে ঈর্ষার যথেষ্ট কারণ ছিল যেহেতু বাঘ মারার উত্তেজনায় সুশীলার সফরী আঁখি বিস্ফারিত হ'য়েছিল। কিন্তু বিপদে সৌহার্দ্দ্যই প্রকৃত মিত্রতা। সে কথা জুগিয়ে বললে—হ্যাঁ, সেই সাগর-দুল-দুল জঙ্গলে। বিদ্যাসাগর-চিত্রের সাগর এবং সুশীলার কানের দোদুল্যমান দুল—জোড়াতাড়া দিয়ে সে বন্ধুর বাক্য-দৈন্য মোচন করলে।

শৈলেন বললে—হ্যাঁ, সাগর-দুল-দুল-জঙ্গল। এত জঙ্গল ঘুরেছি—যাক। বলছিলাম, সেবার হঠাৎ এই পাখী মারা বন্দুকটা নিয়ে রাম-শালিক মারতে গিয়ে একেবারে পড়বি তো পড়, বেয়াড়া এক বাঘের সামনে। দুটো লক্‌-লকে চক্ষু —যেন আগুনের ছানাবড়া। আর দাঁত—ওরে বাবা! কী বীভৎস—

—ওঃ! বাবা, ব'লে সুশীলা এমন একটা শিহরণের পূর্ব্বাভাষ দিলে যার ফলে শৈলেনের মগজের কল্পনার গ্রন্থি-গুলা সৃষ্টি-চঞ্চলতায় কেঁপে উঠলো।

সোৎসাহে সে বললে—এই জেফ্রির দু-নলা—স্প্রিংফিল্ড না —মওজার না—ম্যাগাজিন না। এক নলে দুনম্বর ছটরা—

—সুশীলা, শীলা, শীলু!—বলে কে ডাকলে।

—যাই বাবা! মাপ করবেন—বলে চকিতে চপলার মত চলে গেল সুশীলা।

সুরেশ বললে—ভো কাট্টা! মধুর ধ্বনিতে আলকাতরা।

শৈলেন সামলে নিয়ে বললে—অবশ্য আমাদের কর্ত্তব্য ছিল প্রথমেই ওর বাবার খোঁজ নেওয়া।

সুরেশ বললে—মেয়েটিকে বেশ শিক্ষা দিয়েছেন ব্রাহ্মণ।

শৈলেন গুপ্ত বললে—কে ব্রাহ্মণ! নিশ্চয় বৈদ্য। শব্দ শুনে বুঝতে পারছ না, জেলা-জজ, ছুটিতে বাড়ি এসেছেন।

শ্লেষের সুরে সুরেশ বললে—জ্যোতিষী!

—মূর্খ, দেখছ না আলমারিতে সাবেকি সংস্করণ আইনের বই। আর মান্ধাতার আমলের একখানা ভৈষজ্য-রত্নাবলী। ওটা শীলার পিতামহের। তিনি কবিরাজ ছিলেন।

—তা হ'লে ওরা বিলেত-ফেরতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না।

—বিলক্ষণ!

কিন্তু আর কিছু বলা হ'ল না, কারণ তাড়াতাড়ি সকন্যা গৃহস্বামী এলেন।

এরা প্রতিযোগিতা ক'রে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে।

—থাক্‌। থাক্‌। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার কন্যা আমাকে আপনাদের শুভাগমনের সংবাদ দেন নি।

—অঙ্ক কষবার সময় বিরক্ত করলে আপনি যে বাবা বকেন।

পিতা আদরে মেয়ের কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন—তা ব'লে বোকা মেয়ে। যাক্‌। আপনারা একটু সুস্থ হ'য়েছেন?

—বিলক্ষণ—

—কি মুস্কিল! আপনার কন্যার আতিথ্য—

—বিলক্ষণ—আর তাঁর আদর যত্ন—

—আর বিশেষ তাঁর ওর—নাম—কি—

—স্নানের ব্যবস্থা।

একটু হেসে গৃহস্বামী সৌজন্য-প্রতিযোগিতা বন্ধ করলেন।

দুই-একটা কথা হ'ল ঝড়-পূর্ণিমার। কিন্তু ভদ্রলোক অশান্ত—অন্যমনস্ক। তিনি বাইরের দরজা খুললেন। হাওয়া বন্ধ হয়েছিল। জলের বেগ কমেছিল। বৃষ্টির ধারা সরল রেখায় আকাশ ও ধরণীর যোগ-সূত্রের আকার ধারণ করেছিল।

তিনি বললেন—না। অসম্ভব। কোনো চিহ্ন নাই। বৃষ্টি থাম্‌লেই বিনু আস্‌বে—কি বলিস শীলু?

—হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়। এই বৃষ্টি মাথায় করে দাদা কেমন করে আসবেন বল।

কর্ত্তা আশ্বস্ত হ'লেন। তিনি হেসে বললেন—বিনু আমার ছেলে—পাজি ছেলে। সাঁতার কাটতে গেছে—এই জল ঝড়ে। বৃষ্টি থামলেই এসে আপনাদের দেখাশুনা করবে।

সাঁতারু বিনয় রায় না এলেই ভাল—মনে মনে এক জোটে ভাবলে তারা। কিন্তু সমাজ সত্যকে প্রশ্রয় দেয় না।

শৈলেনকে বলতে হ'ল—বিলক্ষণ! আর বৃষ্টি না থামলে আমরাও এক পা নড়ছি না।

—নিশ্চয় না। আর শীলুর গর্ভধারিণী ভীষণ মর্ম্মাহত হবেন আপনারা এখানে না খাওয়া-দাওয়া করলে।

শৈলেন সুরেশের মুখের দিকে তাকালে, সুরেশের দৃষ্টি পড়লো শৈলেনের মুখে—অচিরে যুগ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল কুমারী সুশীলা রায়ের হাসি-মুখে।

সে বললে—নিশ্চয়।

কর্ত্তা বললেন—আপনারা জ্যোতিষ জানেন?

ওরা উভয়েই কলেজে জ্যোতিষ পড়েছিল—ফলিত জ্যোতিষ নয়। কিন্তু সে কথা স্বীকার করলে কর্ত্তার সঙ্গে বাক্যালাপ এবং পরাজয়ের লাঞ্ছনা অনিবার্য্য। তারা সমস্বরে বললে—মোটেই নয়।

মিঃ রায় বললেন—ঐটাই আমার হবি। আমি একটা গণনা অসমাপ্ত রেখে এসেছি। যদি অনুমতি দেন তো—

—বিলক্ষণ—অসমাপ্ত অঙ্ক বোঁ বোঁ ক'রে মাথার ভেতর ঘোরে।

—অবশ্য। অঙ্ক একটা যুদ্ধ। এস্পার-ওস্পার না হওয়া অবধি ভীষণ, ওর নাম কি—

তারা ভাবলে বাকী আটচল্লিশটি বায়ু তাঁর মস্তিষ্কে সমাবেশ হ'লে আরো ভাল হ'ত।

—আচ্ছা! ধন্যবাদ। বিনু এখনি আসবে—ব'লে উদ্বিগ্ন গৃহস্বামী কক্ষান্তরে চলে গেলেন।

মাথায় হাত দিয়ে তরুণী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে—বাবা! আহা! বেচারী বাবা। দেবতা বাবা কিন্তু—

অচিরে সামলে নিয়ে সুন্দরী বললে—ওঃ! কি বলছি? হ্যাঁ! তার পর বাঘটা কি করলে?

কিন্তু বেচারা বাবার কাহিনী তাঁর অনুপস্থিতিতে, সুশীলার ভাষায় আরও মনোরম হবে। তারা সহানুভূতি দেখালে। জিদ্ করলে জানবার জন্য, তার দেবতা বাবা কেন বেচারা! এরা অনেক নাটক-নভেল পড়েছিল। কারও রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে, বন্ধুত্বের ভিৎ-গাড়া হয়, এ তথ্য জান্‌তো।

অগত্যা তাকে বলতে হ'ল। তার কণ্ঠস্বর হ'ল করুণ। চাউনী হ'ল স্থির, সুদূর-চাওয়া।

—ঠিক এমনি পূর্ণিমার সন্ধ্যা—ঝড়ে জলে চাঁদের প্রভা অবলুপ্ত। দাদা প্রতিবেশীর পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। আজ এক বৎসর পূর্ণ। আমার মা—

সে আর বলতে পারলে না। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো।

শৈলেন বললে—কী ভীষণ! বুঝেছি। থাক।

সুরেশ বললে—সর্ব্বনাশ! দেহটি পাওয়া যায়নি?—থাক।

সুশীলা একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। বললে—আশ্চর্য্য ঐখানে। তার দেহ পাওয়া যায় নি। তা হ'লে বোধ হয়—হ্যাঁ। দীঘিটাও সর্ব্বনেশে প্রকাণ্ড কুমীরের বাসা। দাদা জেনে শুনে গোঁয়ারতুমি করে সেই পুকুরে নাইতে গিয়েছিল।

বোধ হচ্ছিল, বাইরে যেন বৃষ্টির বেগটা প্রশমিত হয়েছে। এবার মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শৈলেন বললে—এখন বোধ হয় আমরা যেতে পারব।

সুরেশ বললে—ক্ষমা করবেন। আপনাদের শোকের সাম্বৎসরিকে—

কুমারী বললে—না তা হবে না। এ বিপদের উপর আরও বিপদ বাবাকে নিয়ে। তাই জ্যোতিষের বই দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছি। আমাদের পেলেই ঐ কথা—

—বিলক্ষণ। সেটা স্বাভাবিক।

কুমারী বিজ্ঞের মত, সংযতভাবে বললে—শোকের তীব্রতা কমে কালের গতিতে। কিন্তু বাবা বায়ুগ্রস্ত হয়েছেন। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা জ্যোতিষ গ্রন্থ পাঠ ক'রে, আঁক ক'ষে স্থির করেছেন যে দাদা বেঁচে আছেন। আর আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায়, বুদ্ধদেবের জন্মদিনে—ঝড় বৃষ্টি থামলে—ঠিক্ তেমনি সাঁতারের পোষাক পরে, মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে, এমন কি, আমায় ভেংচি কাট্‌তে কাট্‌তে এই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবে।

হাসি চাপতে তাদের সমস্ত শক্তিতে টান পড়লো, কিছু বল্‌তে পারলে না।

সুশীলা আবার শোকাতুরা হ'ল। দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে—বৃষ্টি থামবার পূর্ব্বেই আপনাদের খাওয়াব। কারণ, বাবার নিরাশা—

সুরেশ বললে—হুঁ!

শৈলেন বললে—বিলক্ষণ। এ দিনে ওসব হাঙ্গামা কেন? এর পর হাসি-ঠাট্টাও চলে না। গাড়ির মধ্যে

স্যাণ্ডুইচ্ আছে, সে সমাচারও সেন্সার করতে হ'ল। পালানও অভদ্র—থাকলেও পাগলের কাতরতা।

সুশীলা বললে—বাবার গণনা-শক্তিও অসাধারণ। বাবা গুণে বলেছিলেন—আজ ঝড়-বৃষ্টি হ'বে। বৈশাখের সন্ধ্যায় একথা মিলে যেতে পারে। কিন্তু তিনি আপনাদের আসার সংবাদে কেন লাফিয়ে উঠেছিলেন জানেন? তিনি গণনা করে বলেছিলেন, ঝড়ের সময় দুজন বিপন্ন পথিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেবে—মানে, তাঁদের পায়ের ধূলা পড়বে এখানে।

ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়া আর তারপর কুমীরে খাওয়া যুবকের ভেঙচি-কাটা ভূতের প্রত্যাবর্ত্তনের গল্পে শৈলেনের মোহ কাট্‌ছিল, প্রাণে করুণা জাগছিল। সে ভাব্‌লে—আহাঃ! এমন মেয়ে পিতার সঙ্গ-দোষে বায়ুগ্রস্ত না হয়। সে শহীদ্ হ'তে মনস্থ করলে। এর নিরাময়তার জন্য নিজের তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ করবার বাসনা তার মর্ম্মস্থলকে উতল করলে।

সুরেশের ধারণা, জ্যোতিষ একটা মনোরম বুজরুকি। দু'পয়সা ব্যয় করতে পারলেই অভিপ্রেত অনাগত ইষ্টের সমাচার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তার প্রাণে সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করবার বাসনা জাগলো যে, আগন্তুক দুজনের মধ্যে কোনো জন কি অচিরে বরের টোপর মাথায় দিয়ে এই ঘরে বসবে। কিন্তু তার সংযম তাকে এ প্রশ্ন করতে দিলে না।

শ্রীকান্ত তাদের কোট দু'টি পরিষ্কার করে এনে দিলে।

সুশীলা আর তাদের সঙ্গে অগ্রজের কথা কহিল না। কি ক'রে বন্দুক ছুঁড়তে হয় তা দেখাবার জন্য অনুরোধ করলে।

তারা টোটার পেটি পরলে পৈতার মত। বন্দুকের মাছিতে লক্ষ্য রেখে কি ক'রে নিশান করতে হয় দেখালে। টোটা ভরা, খালি টোটা বার করা, নলী সাফ করা প্রভৃতি সম্বন্ধে তারা পাল্লা দিয়ে কুমারীকে শিক্ষা দিতে লাগলো।

৩

বাইরে আর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। এরা তিন জনেই একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিল। রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ভয়ে যুগল-বন্ধুর গা ছম্‌ছম করছিল। কিন্তু ফণীর শিরে হাত না দিলে মণি কোথা পাওয়া যায়?

ঠিক্ তাদের উপরের কক্ষে কর্ত্তার উদ্বিগ্ন পায়চারির শব্দ শোনা গেল। উপরের জানালা খুল্‌লো।

ঠিক্ সেই সময় বাহির হ'তে তাদের কক্ষের দ্বারে কে টোকা মারলে।

সুশীলা দরজা খুলে দিয়ে পেছিয়ে এসে টেবিল ধ'রে কাঁপতে লাগলো।

সর্ব্বনাশ! দ্বারে সাঁতারের পোষাক-পরা, মাথায় তোয়ালে জড়ানো এক সুশ্রী যুবা-পুরুষ সুশীলার প্রতি মুখ-ভঙ্গী করছে।

কম্পিতকণ্ঠে কুমারী বললে—দা-দা!

এবার আগন্তুক ভীষণ মুখ-ভঙ্গী ক'রে তার দিকে এগিয়ে এলো।

উপর হ'তে তৃপ্ত কণ্ঠের শব্দ এলো—বিনু!

এদের হাতের বন্দুক কাঁপছিল। ভূতের পায়ের আঙ্গুলগুলা সামনে না পিছনে তা অবধি দেখবার তাদের অবসর হ'ল না। অবারিত মুক্ত দ্বার হ'তে বার হ'য়ে তারা প্রাণপণে ছুট্‌লো। বাইরে খোলা মাঠে গাড়ি ছিল। ঝড়ের সময় এক নিরাশ্রয় খেঁকী কুকুর শৈলেন সেনের ভক্স-হলের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। পলায়নতৎপরেরা তাকে লক্ষ্য করলে না। গাড়ি যখন গতিশীল হ'ল—একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ তাদের আরও সন্ত্রস্ত করলে।

বিকার-গ্রস্তের মত নির্জ্জন গ্রাম্য-পথ ছেড়ে যশোহর রোডে উঠে তারা চোঁ-চাঁ ছুট্‌তে লাগ্‌লো। দে ছুট্! দে ছুট!

এসব নিমেষে ঘট্‌লো।

ক্ষণকাল পরে রায় মহাশয় নীচে এসে দেখলেন—ভাই-বোন অশিষ্টের মত হাসছে। তাঁকে দেখে তারা সংযত হবার চেষ্টা করলে—কিন্তু অসম্ভব।

কি হয়েছে?

তাদের জননী অন্দরের পর্দ্দা ভেদ করে বাইরে এলেন। ব্যাপার কি? যখন দেখলেন অপরিচিতেরা নাই, তিনি তিরস্কারের সুরে বললেন—বিনু-শীলু কি অসভ্য পানা হচ্ছে।

তার পর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—তুমিই আদর দিয়ে এদের মাথা খেয়েছো।

—ও পুরানো কথা। নূতন কিছু বল। বিনু, এই জল-ঝড়ে কেন তুমি নাইতে গিয়েছিলে? কেবল ভাবনা বাড়াও। ছিঃ!

সে বললে—দেখুন বাবা, গায়ে হাত দিয়ে—স্নান করিনি। ননীদাদার বাড়ি—

শীলা অসংযত ভাবে হেসে বললে—এক বৎসর কুমীরের বাড়ি বাস করে—

সে আর বলতে পারলে না—দম-বন্ধ-করা হাসির প্রকোপে। গৃহিণী বললেন—তোরা কি পাগল হ'লি নাকি? সে ভদ্রলোকেরা কোথা?

সুশীলা বললে—দাদা-ভূতের ভয়ে তারা দে পিট্টান।

সব কথা শুনে হাসির পালা শেষ ক'রে জননী বললেন—আহা বেচারারা না খেয়ে গেল!

শীলা বললে—ওরা বীর-পুরুষ। রাস্তায় বাঘ মেরে খাবে। তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে একটা কুকুর মেরে গেছে।

এবার গৃহ-কর্ত্তার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ফিরে এলো। ছেলে-মেয়েকে নীতি-শিক্ষা দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য। তিনি বললেন—মিথ্যা কথা সব সময় নিন্দনীয়। অভ্যাগত গুরু।

আজ এ সংসারে শৃঙ্খলা জাহান্নমে গিয়েছিল। তা না হ'লে বাপের কথার উপর এক ফোঁটা মেয়ে বলতে সাহস করে—বাবা, মুখে বাঘ-মারা ভূতের ভয়ে ভীত অতিথি গুরু না গরু?

আষাঢ়

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আবার এসেছে আষাঢ়,
এসেছে সে নূতন হয়ে;
নিদাঘ তপ্ত ধরণী ছিল পথ চেয়ে যার
একান্ত আগ্রহে।
চেয়েছিল জনপদ-বধূরা জনে জনে
উদয় শিখর পানে মুখে তুলে
সূর্য্যমুখী ফুলের মতো;
চঞ্চল নয়নে কাঁপে প্রতীক্ষার প্রদীপশিখা
নবীনের আবির্ভাবকে বরণ করে নিতে।
কিন্তু, কোথা সে আষাঢ়—
শ্যামলা কৃষিলক্ষ্মীর চিরবাঞ্ছিত প্রিয়তম?
পূবসাগরের ওপার হতে যে আসে
তার মেদুর মেঘের উত্তরীয় উড়িয়ে
দিকে দিগন্তে—বনে বনান্তে—
নিবিড় ঘন স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে,
কোথায় সে?—
যে ঢেলে দিয়ে যায় তার জলদ-ভৃঙ্গার হতে
তৃষিত মৃত্তিকার শুষ্ক কণ্ঠে
নির্ম্মল শীতল বারিধারা?
কোথা সে আষাঢ়?—
কান্তা-বিরহ-বিধুরা অবন্তীর পুরনারীরা
যার পথ চেয়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করে
উজ্জয়িনীর প্রাসাদ শিখরে—?
সে ত' আসেনি পূবের আকাশে তার
নবীন মেঘের সমারোহ নিয়ে?
সে বুঝি নেমে এসেছে আজ
পশ্চিমের প্রশান্ত গগনে
অগণিত খগ-বাহিনীর বিশাল পক্ষ বিস্তার করে;
ঢেকে ফেলেছে প্রতীচ্যের দিকচক্রবাল
অকাল-মৃত্যুর করাল কৃষ্ণ যবনিকায়।
কোথা সে মেঘ ডম্বরুর গুরু গুরু গম্ভীর তালে
অথির বিদ্যুতের চকিত নৃত্য—?
কোথা সে ঝরঝর নবজলধারায়
সদ্যসমাগত প্রাবৃটের প্রাণদ বর্ষণোৎসব?
এ যে নিয়ে এসেছে প্রলয়ের অগ্নি বৃষ্টি—
উগ্র উল্কাপিণ্ডের বিশ্ব-বিধ্বংসী প্রচণ্ড বজ্রানল!
এ যে স্ফুরিত বিস্ফোরকের অজস্র স্ফুলিঙ্গে—
ছড়িয়ে দিয়েছে বসুমাতার সর্ব্বাঙ্গে
অনল-হলাহলের দুর্ব্বিষহ জ্বালা!
পশ্চিম গগনে জ্বলে উঠেছে যে আগুন
ছড়িয়ে পড়েছে সে আজ নিখিল ভুবনের
দিকে দিকে;
প্রাচীর দিগন্তও রঞ্জিত হয়ে উঠেছে
সে ক্ষুধিত অগ্নিশিখার লোলুপ লেহনে।
পর্ব্বতে মরুতে—অরণ্যে প্রান্তরে—বন্দরে নগরে—
চলেছে তার তাণ্ডব লীলা;
মহাসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গবক্ষ বিক্ষুব্ধ করে
প্রলয়ের উন্মত্ত নৃত্যে নেচে উঠেছে মহাকাল।
স্তব্ধ হয়ে গেছে মেঘনাদের গম্ভীর আরাব
অগ্নি-আয়ুধের বিশ্ব-বিদারি বজ্রহুঙ্কারে।
স্তিমিত হলো কি বিদ্যুতের জলদর্চ্চি
আসন্ন আষাঢ়ের অতন্দ্র চক্ষে—
সন্ধানী আলোর অন্ধ-করা তীব্র তেজে?—
দিগ্বিজয়ী মনুর বিজ্ঞানের যজ্ঞশালায়
বিঘোষিত হল কি—
মিত্র বরুণের মন্ত্র-শক্তির পরাজয়?

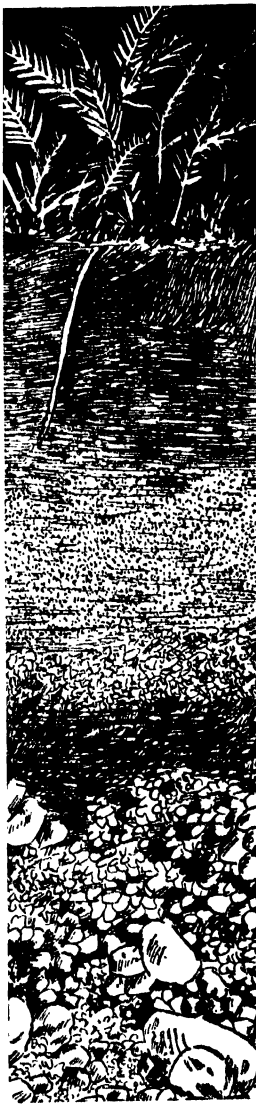
জমির গঠন ও শস্যোৎপাদন

শ্রীকাননগোপাল বাগ্‌চী এম-এস্‌-সি, এফ-জি-এম-এস

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। সেজন্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে, দেশের অবস্থার উন্নতি করতে গেলে নানা জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যতখানি প্রয়োজন, ততখানি দৃষ্টি দেওয়া দরকার কৃষিকার্যের উৎকর্ষের দিকে। কিন্তু উৎকর্ষ হওয়া তো দূরের কথা, প্রতি বৎসরই শোনা যায় হয় জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, নয় আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হচ্ছে না। এ অভিযোগও শোনা যায়, যে সব জমিতে সার দিলে আগে ভাল ফসল হ'ত এখন সেগুলি ক্রমশঃই পড়ো জমিতে পরিণত হতে চলেছে। এ ছাড়া অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির উপদ্রব তো আছেই। আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে শিল্পোন্নতিরও কমতি নেই, চাষবাসের দিকেও সেখানে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের দেশের কথা আলোচনা করে বিশেষ লাভ নেই। কৃষিকার্যের সময় আমাদের দেশে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় তাদের সমাধানের কি উপায় আছে এবং সেগুলি সহজসাধ্য ও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর কিনা, সংক্ষেপে সেই আলোচনাই করব।

চাষবাস সংক্রান্ত ব্যাপারে, জমি বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি পৃথিবীর উপরে অবস্থিত নরম মাটীর অংশটুকু, যার উপরে উদ্ভিদ্ জগৎ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের অভিনয়। তারা এই জমিতেই জন্মায়, এরই থেকে শেকড় দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মৃত্যুর পর এতেই সমাধিপ্রাপ্ত হয়। এই নরম জমির স্তরটুকু খুঁড়ে আর একটু নীচের দিকে অগ্রসর হলেই পাওয়া যাবে কঠিন পাথর। বস্তুতঃ তলদেশে অবস্থিত কঠিন পাথরই আবহাওয়ার তাড়নায় ও অম্ল ক্ষার ইত্যাদি পদার্থের প্রভাবে ধীরে ধীরে নরম জমিতে পরিণত হয়; কাযেই যে পাথর থেকে জমি গঠিত হয় সেই পাথরের গঠনের তারতম্য অনুসারে জমিরও প্রকার ভেদ হয়ে থাকে। এ ছাড়া ভূমির ভৌগলিক অবস্থানও জমি গঠনে কম প্রভাব বিস্তার করে না; যেমন যে সব দেশে গরম ও শীতের প্রভাব বেশী এবং অত্যধিক বৃষ্টি হয়, সেখানের জমি, তুষার মণ্ডিত দেশের জমির থেকে স্বতন্ত্র।

কোন জমির মাটী বিশ্লেষণাগারে পরীক্ষা করলেই সাধারণতঃ এই কয়টি অংশ পাওয়া যায়: ছোট ছোট পাথরের কণা (fine gravel), মোটা বালি (coarse sand), মিহি বালি (fine sand), পলি (silt), মিহি পলি (fine silt) ও কাদা (clay)। জমির পার্থক্য অনুযায়ী এই কয়টি অংশের আপেক্ষিক অনুপাতেরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। বাংলার দুটো জমির বিশ্লেষণের ফলাফল দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।



কঠিন প্রস্তর হইতে উদ্ভিদ্ ধারণোপযোগী নরম জমির উৎপত্তি
(ডেভিসের চিত্র অবলম্বনে)

	ভারেঙ্গা (পাবনা জিলা) শতকরা	কুলপি (২৪ পরগণা) শতকরা
মোটা বালি	০·৪৭	২·৪৭
মিহি বালি	২৫·৪৭	২৯·৫৩
কাদা	২০·৮৫	১৫·৬৫
পলি	২৯·৬৫	৩৫·০০

উপরোক্ত বিশ্লেষণ ছাড়া আরও দুটি জিনিষ জানা থাকলে তবে সে জমির ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়। সে দুটির একটি হ'ল জমিতে অম্লের ভাগ বেশী, না ক্ষারের ভাগ বেশী। অন্যটি হচ্ছে কি পরিমাণ ধাতব পদার্থ খাদ্যোপযোগী অবস্থায় উদ্ভিদের জন্য পাওয়া সম্ভব। কোন জমির মাটী বিশ্লেষণ করতে ও উপরোক্ত তথ্যগুলি জানতে খরচ খুব বেশী পড়ে না, অথচ এগুলি জানা থাকলে চাষের প্রভূত উপকার হয়।

দক্ষিণ পূর্ব ইংলাণ্ডে বিভিন্ন জমির মাটী বিশ্লেষণ করে ও তার সঙ্গে জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করে হল্ এবং রাসেল বলেন যে, মাটী বিশ্লেষণ ক'রে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার সাহায্যে সেই জমির কৃষি সম্বন্ধীয় ব্যবহারের অনেক আভাস দেওয়া যায়, যেমন:

কোন জমিতে যদি পাথরের কণার পরিমাণ থাকে শতকরা ০·৫ হতে ৫·৯, মোটা বালি ০·০ থেকে ১২·৮, মিহি বালি ১৪·৭ থেকে ৩১·১, পলি ১১·৩ থেকে ৩৫·৫, মিহি পলি ৯·৪ থেকে ২৩·৭ ও কাদার পরিমাণ থাকে ১৩ ২ থেকে ২৩·৭, তাহলে সে জমিতে গমের চাষ ভাল হয়। তেমনি কোন জমিতে যদি পাথরের কণার পরিমাণ থাকে শতকরা ০·১ হতে ২·৯, মোটা বালি ২·০ হতে ৪৬·৬, মিহি

বালি ২২·৯ থেকে ৬৮·১, পলি ৩·৫ থেকে ২১·৪, মিহিপলি ৪·৮ থেকে ৮·৮ ও কাদার ভাগ শতকরা ৫·৫ থেকে ১২·৬, তাহলে সে জমি আলুর পক্ষে প্রশস্ত। এই বিশ্লেষণের আরও একটি সুবিধা এই যে কোন জমিতে যদি ক্ষারীয় অংশ বেশী থাকে বা অপর কোন ধাতব পদার্থের মাত্রাধিক্য লক্ষিত হয় তাহ'লে তার পরিপূরক সারের ব্যবহারে জমির দোষ নষ্ট করা সম্ভব। আন্দাজে সার দিলে হয়ত যে পদার্থগুলি ইতিপূর্বেই মাত্রাধিক্য আছে তারই পরিমাণ বেড়ে চলবে। বলাবাহুল্য উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি না হয়ে এতে উল্টা ফলই হবে।

আমাদের দেশে বহুদিন যাবৎ এ বিষয়ে কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি। কয়েক বৎসর মাত্র ভারতের কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এ জাতীয় কায আরম্ভ হয়েছে। এ বিষয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রচেষ্টাই প্রথম উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহপরিচালক অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ বহুদিন যাবত বাংলার বিভিন্ন স্থানের জমির বিশ্লেষণ কাযে নিযুক্ত আছেন। ২৮ পরগণার অন্তর্গত কয়েকটি জমির পরীক্ষা করে তিনি বলেন যে "পলির ও কাদার পরিমাণ থেকে ধানের পরিমাণ সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যায়। জমিতে যদি শতকরা ৪০ ভাগের বেশী পলি থাকে ও কিছু পরিমাণ কাদা, তাহ'লে ২৪ পরগণার জল বায়ুতে ধান ভাল জন্মাবে। এর সঙ্গে অবশ্য ধাতব পদার্থের পরিমাণও জানা দরকার। বারুইপুর ও অন্যান্য যে সব স্থান নদী হতে দূরে অবস্থিত সেগুলিতে ভাল তরি-তরকারী জন্মিতে পারে। এ সব স্থানে বালির পরিমাণ শতকরা ৪০ থেকে ৫০, কিছু পরিমাণ কাদা ও প্রচুর খাদ্যোপযোগী ধাতব পদার্থ আছে। গাছের পক্ষে জমিতে অম্লের ভাগ ঈষৎ বেশী থাকলেই সুবিধা হয়।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও ভূগোল বিভাগেও জমি পরীক্ষার কায আরম্ভ হয়েছে। ইতিপূর্বেই ভূগোল বিভাগে কয়েকটি জেলার জমির মাটী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাদের ফলাফল নীচে দেওয়া গেল।

ঢাকার জমিতে পলি ও কাদার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক—৬৮%, বালি ২৫%। এখানে ধান ও পাট চাষ ভাল হয়।

২৪ পরগণার অন্তর্গত দত্তপুকুরের জমিতে বালির পরিমাণ শতকরা ৬০, কাদা ও পলি ২৪। এখানে তরিতরকারী ভাল জন্মাবে, ধানের চাষ সুবিধা নয়।

পাবনার অন্তর্গত ভারেঙ্গা গ্রামের জমিতে কাদা ও পলির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ, বালি ২৫। এখানে ধানই ভাল হবে। তরিতরকারীও মন্দ জন্মাবে না।

পূর্বেই বলেছি যে এই জাতীয় বিশ্লেষণে খরচ অধিক পড়ে না, সময়ও খুব বেশী লাগে না। এক একটি বিশ্লেষণে দিন দুই আন্দাজ সময় নেয়, তবে এক সঙ্গে একাধিক বিশ্লেষণ একই ব্যক্তির দ্বারা করা সম্ভব। সুতরাং এ জাতীয় কাযের যাতে বেশী প্রসার হয় সকলেরই সে জন্য সহযোগিতা দেওয়া উচিত। এতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দিকটাও যেমন অগ্রসর হবে সেই সঙ্গে কৃষির কাযেও সহায়তা করবে সন্দেহ নেই।

দ্বৈত

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ কাব্যরঞ্জন

একটি বীণায় দু সুর বাজে—
বিষাদ এবং আনন্দেরি,
চল্‌ছে দুটি স্রোতের ধারা
প্রবাহিনীর বক্ষ ঘেরি'!
দুখের মাঝে সুখের রেখা
বুকের ফাঁকে যায় গো দেখা ;—
অমার নিবিড় অন্ধকারে
চাঁদের আলো আজকে হেরি।

এক আকাশে দুইটি তারা
জ্বল্‌ছে সারা রাত্রি ধরি',
উদয় হ'ল এক সাথে কি
দিবস এবং বিভাবরী ?
বিসর্জ্জনের শোকের মাঝে
আগমনীর সানাই বাজে!
জীবন-মরণ সাথে সাথে
হাতে হাতে চল্‌ছে মরি!

একটি হিয়ায় নিত্য বাজে
দুইটি প্রেমের আকুলগীতি,
আজকে শুধু একটি তাহার
জাগায় আশা, করুণ স্মৃতি!
ভৈরবী আর পূরবীতে
মিলন হ'ল আমার চিতে—
স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যপানে
চল্‌ছে ধেয়ে আমার প্রীতি।

একটি প্রাণের স্নিগ্ধ ছায়ায়
বাঁধলো বাসা দুইটি পাখী,
পালিয়ে গেছে একটি তাহার—
ক'রে খানিক ডাকাডাকি!
কাকলি তার আজো ভাসে
আমার হিয়ার আশে পাশে,—
সঙ্গীতে সে করলো পাগল—
ভোলা কভু যায় গো তা কি ?

ভাঙ্গা-গড়া

শ্রীমনোজ গুপ্ত

বেলা প্রায় পৌনে ন'টা হয়েছে। শ্যামবাজার অঞ্চলের একটা সরু গলির মধ্যে একতলা বহু পুরান বাড়ীর আলো হাওয়া থেকে বঞ্চিত একটা ঘরের অধিকারসূত্রে পাওয়া তক্তপোষের ওপর বসে অবনী মাথায় তেল মাখছিল আর একটি ছোট ছেলেকে পড়া বলে দিচ্ছিল। দেখে বেশ বোঝা যায়, সে খুব ব্যস্ত অথচ এ দুটো কাজের কোনটা না করলেই নয়। জানলা দিয়ে সামনের বাড়ীর দেয়ালে টাঙান ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, "রোজ বলি আর একটু সকাল সকাল উঠবি, তা শুনবি না। বড্ড বেলা হয়ে গেছে, এখন আর থাক্।" সে উঠে পড়ল। সাধারণত ছেলেরা এ সুযোগ হারায় না, টপ্ ক'রে উঠে পড়ে কিন্তু এ ছেলেটি উঠ্ল না। অবনীর সেদিকে লক্ষ্য করবার সময় ছিল না। দেয়ালে টাঙ্গান দড়ি থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে সে বাইরে যাচ্ছিল, ছেলেটি বললে, "বাবা—" বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরে অবনী বললে, "কি?"

ভয়ে ভয়ে ছেলেটি বললে, "আমার জুতোটা ছিঁড়ে গেছে।"

অবনীর অপ্রসন্ন মুখ আরও অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সে বললে, "এখন জুতো কিনে দিতে পারব না। এই তো পূজো আসছে, সেই সময় জুতো হবে।"

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক বললে, "ইয়ে এগার নম্বর কোঠি হ্যায়?"

অবনী দরজার দিকে পিছন ক'রে ছিল তাই তাকে দেখতে পায় নি। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "হ্যায় তো কেয়া হ্যায়?"

লোকটা কোন কথা না বলে একটা প্যাকেট এগিয়ে ধরে বললে, "সহি কর্ দি জিয়িয়ে।"

তার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে অবনী পরীক্ষা ক'রে দেখলে। সেটা একটা মাসিক পত্র; অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত প্যাকিং কাগজে মোড়া। তার ওপর মোটা কাল হরপে ছাপা "জীবন ও যৌবন"; নীচে হাতে লেখা—শ্রীমতী অমিয়া দেবী ইত্যাদি।

অবনী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, "এ কাগজ নেহি লেগা।"

লোকটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, বললে, "কাহে নেই লেগা? মায়্জীকো পাশ তো ভেজ দিজিয়ে।"

অবনী বললে, "পয়সা মায়জী নেই দেতা, হাম্ দেতা।"

লোকটা এতক্ষণে 'নেই লেগার' কারণ বুঝতে পেরে বললে, "ইস্ লিয়ে পয়সা দেনে নেহি হোগা। ইয়ে একদম্ মুফৎ।"

সন্দেহের সঙ্গে লোকটার হাত থেকে সই করবার খাতাটা নিয়ে অবনী ভেতরে গেল। অমিয়া তখন সবেমাত্র ভাত নামিয়ে কড়ায় কি একটা তরকারি চড়িয়েছে। চোখমুখ তার লাল হয়ে রয়েছে, সেটা যে লজ্জায় নয়, আগুনের তাতে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। মাসিক-পত্রটা ঝপাৎ করে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে অবনী বললে, "তোমার নামে মাসিক পত্র আসে, অথচ তার দাম দিতে হয় না, ব্যাপার কি বল ত? কোন জানা লোক কাগজ বার করেছে নাকি? আর তাই যদি করে থাকে তা হ'লে আমার নামে না পাঠিয়ে তোমার নামে পাঠাবার মানে কি? আমাদের বাড়ীতে কোনদিন ওরকম করে মেয়েদের নামে জিনিষ আসে না। ওটা আমরা অপমান বলে মনে করি।"

কথাটায় অমিয়ার মুখে চোখে বোধহয় কৌতুকের আভাষ পাওয়া গেল। যাদের বাড়ীর বৌয়ের সদর দরজায় গিয়ে জঞ্জাল ফেলে আসতে হয় আর তাতে অপমান হয় না, তাদের অপমান হয় বাড়ীর বৌয়ের নামে মাসিকপত্র এলে! তার ইচ্ছে ছিল স্বামীকে খুলে সব কথাটা বলে কিন্তু এই কুৎসিত ইঙ্গিতে তার সে ইচ্ছে লোপ পেয়ে গেল।

আর কোন কথা বলবার বা শোনবার মত সময় অবনীর ছিল না। কোন রকমে মাথায় দু'বালতি জল ঢেলে নাকে মুখে দু'টি গুঁজে বেরুতে পারলে হয়। তারপর ছুটতে আরম্ভ করবে। ছোটা ছাড়া আর কি? ওকে চলা বলে না, ছোটা বললেই কম মিথ্যে কথা বলা হয়। আধ-ময়লা

শার্টটা গায়ে দিয়ে অবনী আবার সামনের বাড়ীর ঘড়িটা দেখলে। চোখে, মুখে তার বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। আজ চারটে পয়সা খরচ হ'বেই। তাও ট্রামগুলো যে আস্তে আস্তে চলে। দশটার মধ্যে পৌছুতে পারলে হয়। সাহেবের আজকাল যা মেজাজ হয়েছে। ভাবতে ভাবতে সে বেরিয়ে গেল।

* * * *

আরও পাঁচ জন কেরাণির বৌয়ের সঙ্গে অমিয়ার কোন পার্থক্য নেই। অভাবের সংসার, ডাইনে টানতে বাঁয়ে কুলোয় না, মার্চেন্ট অফিসের অল্প মাইনের কেরাণি স্বামী; পোষ্য সে তুলনায় কম নয়। কাজের লোক কম, দোষ ধরবার লোক বেশী। অনেক কিছুই তাকে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়। সে নেহাৎ নতুন বৌ নয়; ইচ্ছে করলে সে দু-একটা কথার জবাব দিতে পারে না তাও নয়; দিলেও বেমানান হয় না। বিয়ের এতদিন পরে প্রায় সব মেয়েরই মুখ ফোটে, কার-কার বুকও ফাটে—কিন্তু অমিয়া গোলোযোগ পছন্দ করে না, তার জন্যে যদি নিজেকে একটু কষ্ট সহ্য করতে হয় তা সে বেশ পারে। তার বাপের বাড়ীর সংসারেও বিশেষ স্বচ্ছলতা ছিল না, তবে অশান্তিও ছিল না। তাই সে অশান্তিকেই বড় ভয় করত। বিয়ের প্রথম উৎসব কেটে যেতেই সে বুঝেছিল, তাকে কষ্ট করে অনেক কিছু মানিয়ে নিতে হবে, ছাড়তে হবে অনেক কিছু। সে বিদ্রোহ করে নি। এক একবার যে তার মনে হত না এ সব লোক বিয়ে করে কেন, তা নয়; তবে এটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিত।

অবনীর আজকের ব্যবহারে আশ্চর্য্য হবার মত কিছুই ছিল না। মাত্র তিন বছর অফিসে চাকরি করে তার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন এসেছে, সারা জীবন ধরে সাহেবের ধমক খেলেও বেশীর ভাগ লোকের তা আসে না। অমিয়া ভাবে, তার স্বামীর দোষ নেই, বেচারা অনেক চেষ্টা করেও সব কিছু মেনে নিতে পারে না। সে আজও ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখে, আজও আশা করে জীবনকে সে সার্থক করে তুলবে, তাই তার দুঃখও বেড়ে যায়।

* ৬ * *

অবনী অফিস চলে যাওয়ার পর অমিয়া পায় অখণ্ড অবসর। ভোর থেকে উঠে বেলা ন'টা পর্য্যন্ত কোন রকমে কাটাতে পারলেই হ'ল। শ্বশুর-শাশুড়ীর খেতে বসতে সেই বেলা একটা-দেড়টা। সে পর্য্যন্ত তার আর কোন কাজ থাকে না। সেই সময়টা তার সব চেয়ে খারাপ লাগে। কাজের মধ্যে নিজেকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু অবসর তাকে দুঃখের সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। ঘরের খুটিনাটি কাজ করে সে সময় কাটাবার চেষ্টা করত কিন্তু সেই বা এমন কি কাজ যাতে রোজ রোজ মন নিবিষ্ট করা চলে? এমন একটুকরো বই নেই যা হাতে নিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা যায়। শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে গিয়ে যে বসবে তারও বিশেষ উপায় নেই। তাঁরা অবশ্য তার সঙ্গে ব্যবহার খারাপ করেন না কিন্তু তাঁদের মনে সহানুভূতির অভাব টুকুও লক্ষ্য না করে পারে না। অবনী যে সারাদিন অফিসের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এসে সন্ধ্যেবেলা কেন একটা ছেলে পড়ানোর যোগাড় করে না, সে কৈফিয়ৎ তাঁরা অমিয়ার কাছেই তলব করেন। অমিয়া উঠে আসে নিজের ঘরের একাকীত্বের মধ্যে। বিয়ের ক্যাশবাক্স থেকে কাগজ বার করে সে চিঠি লিখতে বসে। চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না। কি সব এলোমেলো ভাবনা মাথায় আসে। সে লিখতে থাকে। একটা বেজে যায়; শাশুড়ী হাঁক দেন, "কি গো বৌমা, ঘুমিয়ে পড়লে না কি?" অমিয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়; কাগজ কলম রেখে সে উঠে পড়ে।

লেখা তাকে ক্রমশঃ নেশার মত পেয়ে বসল। চিঠির কাগজ ছেড়ে সে সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ কিনে আনালে ছেলেকে দিয়ে। পয়সা তার কাছে বড় থাকে না। বিয়ের বাক্সের টাকা পয়সা অনেক দিন সংসারের প্রয়োজনে গোঁজামিল দিয়েছে। বাজারের পয়সাও তাকে সাহায্য করতে পারে না—বাজার অবনী নিজের হাতেই করে। হাতে পাওয়ার মধ্যে পায় ছেলেমেয়ের দু'টো খাবারের পয়সা, তা থেকে নিতে ইচ্ছে করে না; আর পায় কাঠ, কেরোসিন তেলের পয়সা, সেই তার ভরসা। তার মধ্যে থেকে লেখবার কাগজ কেনা শক্ত কিন্তু তাকে কিনতে হয়। স্বামীর কাছে চাইতে পারত কিন্তু তাতে তাকে বিব্রত করা হবে; আর তা ছাড়া তার মধ্যে অনেকটা দৈন্য আছে—অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে। স্বামীর কাছে সে হাত পাততে পারে, কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে পারে না।

* * * *

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে অবনী অফিসে পৌঁছয়। ভাবে আর পাঁচ মিনিট আগে বাড়ী থেকে বেরুতে পারলে চারটে পয়সা খরচ হ'ত না। দু'দিনের চায়ের দাম! অনেকের মত অবনীও অফিসে চা খাওয়া অভ্যেস করেছিল, ছাড়তে পারলে না। চায়ের খরচ যোগাতে তাকে সকালে ট্রামে আসা ছাড়তে হল। সে ভাবলে, ভালোই হোল, দু'টো করে পয়সা বাঁচল—ছেলেটার আর মেয়েটার জলখাবার চলে যাবে।

হাজিরা খাতায় সই করে নিজের চেয়ারে বসবার আগেই বেয়ারা এসে বললে, "বড়বাবু অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে ডাকছেন।" পাশ থেকে সহকর্ম্মী বললে, "বাপ্ বসতেও দেবে না। দশটা বাজবার আগে থেকেই ডাকাডাকি সুরু করেছে।" অবনীর মনেও ঠিক এই কথাই উঠেছিল কিন্তু সে কোন কথা না বলে চলে গেল।

বড়বাবু চেয়ারে ঠেসান দিয়ে কি একটা মন দিয়ে পড়ছিলেন, অবনীর আসার কথা জানতে পারেন নি। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে অবনী বললে, "আমায় ডাকছিলেন স্যার?"

একটু চমকে উঠে বড়বাবু বললে, "ও, হাঁ ডাকছিলাম। তুমি এত বেলা করে আস কেন হে?"

অবনীর ইচ্ছে হল বলে, 'এর আগে এসে কি তোমার পায়ে তেল মালিশ করব, না অফিস ঝাঁট দোব' কিন্তু জলে বাস করে কোন একটি বিশেষ জলজন্তুর সঙ্গে নাকি আড়ি করা চলে না, তাই সেটা আর বলা হ'ল না। সে বললে, "আজ একটু ঝঞ্ঝাটে পড়ে গিয়েছিলাম স্যার। কোন দরকারি কাজ ছিল জানলে, যেরকম করে হোক্ আসতাম।"

"দেখ তোমায় একটা কথা বলি, অবশ্য তুমি আমায় রাজা করে দেবে না—আর তোমরা যে আমার ওপর কত সদয় তাও জানি, তবু বলছি। তোমার ওপর ছোটসাহেবের নজর আছে। সে আর কার নাম জানে না কিন্তু তোমার নাম জানে। কাল তোমরা তো পাঁচটা বাজতেই চলে গেলে। আমি বসেছিলাম। সাহেবরা না গেলে কোন দিনই যাই না। ছোটসাহেব যাবার সময় বললে, বড়বাবু, তুমি একা বসে থাক কেন? আর কোন বাবুকে থাকতে বল না কেন? তোমার কাছে একটু করে কাজ শেখে না কেন? বললাম, 'কারও সে রকম চাড় তো দেখি না।' সে বললে, 'ঐ যে অবনী বলে ছোকরাটি—ওকে তো বেশ চালাক বলে মনে হয়, ওকে কিছু কিছু কাজ শেখাও না।' তাই বলছি একটু সাবধানে থেক, তার মত বদলাতে দিও না।"

অবনীর মনে হল সবটাই ধাপ্পা; তাকে দিয়ে কতকগুলো পড়া-কাজ করিয়ে নেবার ফন্দি। ছোটসাহেবের বয়ে গেছে এ সব কথা বলতে। যে অফিসে এসে পর্য্যন্ত আজ চার বছর কারও মাইনে বাড়ে নি, দু'টোর বেশী তিনটে নিব খরচ হলে যে খেপে যায়, সে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে এল আমাকে নিয়ে। তবু তাকে মুখে বলতে হল, "আচ্ছা স্যার, আপনি না বললে আজ থেকে আর যাব না। আপনি একটু এ রকম করে বলে কয়ে না দিলে দাঁড়াই কোথা।"

"আমি তোমাদের জন্যে করে মরি, আর তোমরা মনে কর আমি কেবল তোমাদের অনিষ্ট করি।"

"সে কি স্যার? আপনি অনিষ্ট করবেন মনে করলে কি চাকরি থাকে? আপনিই তো আমাদের সব, সাহেব আর কি দেখে? কেবল সই করে বই তো নয়।"

"দেখ, সাহেবের ভাবগতিক দেখে আমি একবার তোমার কথা ওকে একটু বলব। ক'দিন বাদে শিলং যাবে। ফিরে এলে মনটা ভালই থাকবে, সেই সময় একবার ··· বুঝলে? আচ্ছা এখন যাও।"

অবনী ভাবলে ব্যাপার কি? হঠাৎ এতটা দয়া? কোন বদ মৎলব নেই তো? নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠল। কি নীচ মনই তার হয়ে গেছে! ভদ্রলোক যে একটা সুখবর দিলে আর সে তার কদর্থ করছে। হতেও তো পারে সত্যি। লোকে বলে খাটলে তার ফল পাওয়া যাবেই; সেও তো প্রাণ দিয়ে খাটে! কেরাণি-জীবনের আশা! যৌবনের রঙিণ স্বপ্ন। চলে আসবার সময় দেখলে বড়বাবু যে কাগজটা পড়ছিলেন সেটা হচ্ছে, "জীবন ও যৌবন"। মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। ভাবলে, একবার চেয়ে নিয়ে দেখে ওটা কাদের কাগজ। কি বিশ্রী নাম দিয়েছে! নিশ্চয় কতকগুলো কলেজে পড়া ছেলে মিলে বার করেছে, কিন্তু তারা হঠাৎ তার স্ত্রীর নামে কাগজ পাঠাতে গেল কেন?

* * *

অবনীর সেদিন বাড়ী ফিরতে রাত হ'ল। অমিয়া ভাবলে, সে বোধ হয় সত্যিই একটা ছেলে পড়ান যোগাড়

করেছে। অবনীকে সে কথা জিগেস করতে তার সাহস হ'ল না। যদি না হয়! সে ভাববে অমিয়াও তাকে তাড়া দিচ্ছে। চা খাওয়া হয়ে গেলে অবনী বললে, "ও কাগজটা কোথা থেকে এল ?"

অমিয়া বুঝলে সকালের বিরক্তি এখনও কাটে নি। সে একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বললে, "কাগজের অফিস থেকে।"

"সে তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু হঠাৎ তোমার নামে অফিস থেকে কাগজ এল কেন সেইটাই বুঝতে পারছি না।"

"আচ্ছা, এবার থেকে বলব তোমার নামে পাঠাতে।"

"কাগজটা নিয়ে এস দেখি।"

"কি হবে দেখে ? ওতে দেখবার মত কিছু নেই।"

"তা হোক নিয়ে এস।"

অবনীর ছেলে বললে, "মা কেন দেখাচ্ছে না জান বাবা ? ওতে মা'র লেখা ছাপা হয়েছে।"

হঠাৎ যদি বড়বাবু বলতেন, তোমার দশ টাকা মাইনে বেড়েছে তাতেও অবনী এত আশ্চর্য্য হত না।

অমিয়ার আপত্তি করা চলল না; তার লেখা অবনীকে দেখাতেই হোল। হয়তো সে নিজে থেকেই দেখাত কিন্তু সকাল বেলাকার কথাগুলো তার বিশ্রীভাবে মনে ছিল। লেখাটা দিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল। একটু পরে তার ছেলে এসে বললে অবনী তাকে ডাকছে। সে ঘরে আসতে অবনী বললে, "এ সব লেখবার মানে কি ?"

আশ্চর্য্য হয়ে অমিয়া জিগেস করলে, "কেন, কি হয়েছে ?"

"সেটা কি তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে ? তোমার গল্পের নায়িকার নামটা না বদলে নিজের নামটা দিলেই পারতে।"

"কেন ? নায়িকার সঙ্গে আমার কোন মিল আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"জোর করে সব কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না; কি মিল আছে না আছে তা তুমিও যেমন বোঝ, অন্য পাঁচ জনেও তেমনি বোঝে। গল্প লিখি না বলে কি আর এটুকু বোঝবার ক্ষমতাও নেই। গল্পের মধ্যে অত কেঁদে না ভাষালেও চলত। তোমার বাবা-মা যখন তোমার বিয়ে দেন তখন তো জানতেন কোন রাজা-মহারাজার ঘরে তোমার বিয়ে দিচ্ছেন না, আর সেটা বোধ হয় তুমিও আশা কর নি। আজ হঠাৎ ছাপার অক্ষরে নিজের দুঃখ প্রচার করলে কি হবে ?"

"তুমি যা বলছ তার কোনটাই সত্যি নয়; আমি নিজের সম্বন্ধে কোন কথা লিখিনি, তবে মানুষ যা ভাল করে জানে, লিখতে গেলে তার ছায়া পড়ে।"

"লেখবার জন্যে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ?"

"কেন, তাতে কোন অপরাধ হয়েছে কি ?"

এই সোজা কথাটার জবাব অবনী দিতে পারল না। সে বললে, "গরীবের ঘরের বৌ-ঝির গল্প-উপন্যাস লিখে নষ্ট করবার মত সময় নেই।"

অমিয়া অনেক চেষ্টা করেও তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারলে না, বললে, "সংসারের কোন কাজের ক্ষতি এর জন্যে হয় নি।"

"হয় নি কিন্তু হবে। আজ একটা কাগজে লিখছ। দু'দিন পরে আরও দু'চারটে জুটবে, তারপর ধরবে উপন্যাস।"

"অতটা আশা রাখি না, তবে তা যদি কোন দিন সম্ভব হয় সেদিনও তোমাদের সংসারে কাজ ঠিকই চালিয়ে দেব; সে বিষয়ে তোমার ভয় করবার কিছু নেই।"

বলবার মত কিছু না পেয়ে অবনী জিজ্ঞাসা করলে, "এ সব মাথায় ঢোকালে কে ?"

"এ সব কারও সাহায্য নিয়ে মাথায় ঢোকাতে হয় না।"

"তোমার লেখা ওদের কাছে কে দিয়ে এসেছিল ?"

"অন্তত আমি নিজে যাই নি।"

"আজ যাও নি কিন্তু তারও বেশী দেরী নেই। দু'দিন বাদে সম্পাদকরা আসবেন তোমার কাছে, তারপর সাহিত্য সভা বসলেই তার নিমন্ত্রণ ···"

"অনর্থক কতকগুলো আজগুবি ধারণা নিয়ে মাথা ঘামিও না।"

"আমি গল্প-উপন্যাস লেখা পছন্দ করি না।"

এর ওপর কথা চলে না।

* * * *

অমিয়ার দাদা শুভেন্দু এসে বললেন, "এই নে, তোকে ওরা দশটা টাকা দিয়েছে তোর গল্পটার জন্যে, আর লেখাও একটা চেয়েছে, আসছে মাসে ছাপবে। তোর আরও লেখা আছে তো ?"

অমিয়া জানত, গল্প লিখে অনেকে টাকা পায়; কিন্তু তার লেখা ছাপিয়ে যে কেউ টাকা দেবে সে আশা এমন করে নি। তার সন্দেহ হ'ল তার দাদা হয় তো নিজে থেকে দিচ্ছেন তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে। সে বললে, "আচ্ছা দাদা, আমার মত লোকের লেখা পয়সা দিয়ে ওরা কিনবে কেন? লেখা তো তারা যথেষ্টই পায়।"

অমিয়া কি ভাবছিল তা শুভেন্দুর বুঝতে দেরী হ'ল না; সে বললে, "তোর গল্পটা তাদের ভাল লেগেছে তাই টাকা দিয়েছে। টাকা দেবার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, সব সময় যে টাকা দেয় তাও নয়। আচ্ছা, এবার থেকে না হয় তোর কাছেই টাকা পাঠাতে বলব।"

"না দাদা, তার দরকার নেই; তা ছাড়া, আমি আর গল্প লিখব না।"

"কেন? কি হ'ল; তোর শ্বশুর-শাশুড়ী কি রাগ করেছেন না কি?"

"না, তাঁরা জানেন না এখনও পর্য্যন্ত।"

"তবে কে? অবনী?

অমিয়া চুপ ক'রে রইল। শুভেন্দু বললে, "ওর দিন দিন কি হচ্ছে? লোকে তিরিশ বছর কেরাণিগিরি করেও যা হয় না, ও এরই মধ্যে তাই হয়েছে যে! কেন? তুই গল্প লিখলে কি ওর জাত যাবে? না, আর কিছু আছে?"

"সে সব জানি না, তবে লেখায় আপত্তি আছে এইটুকু জানি। ওঁর ভয় হয়, গল্প লিখতে আরম্ভ করলে সংসারের কাজ করব না।"

"আমার ভয় হয় ওর মাথা খারাপ হচ্ছে। দেখ, তুই লেখার অভ্যেস ছাড়িস নি, এখন নাই বা ছাপালি। দু'বছর পরে ওর এসব ধারণা বদলে যাবে।"

কথাগুলো অমিয়ার মন্দ লাগল না; না ছাপালে তো আর অবনী আপত্তি করতে পারে না। স্বামী পছন্দ করে না বলে যে নিজের তৃপ্তির জন্যে লিখতেও পারবে না এ রকম বাধ্য স্ত্রী সে নাই বা হ'ল!

গল্প লিখে টাকা পাওয়ার কথা সে কাউকে জানাবে না মনে করেছিল। জানালেও লাভ হ'ত না। সে টাকা তাকে সংসার খরচের মধ্যে গোঁজামিল দিতে হবে; কেউ খোঁজ করবে না কিন্তু যদি কেউ জানতে পারে এ তার গল্প লিখে পাওয়া টাকা, তা হ'লে হয় তো আরও কতকগুলো কথার খোঁচা তাকে খেতে হবে। কথাটা কিন্তু লুকিয়ে রাখা চলল না। ছেলে তার বাপকে বলেছিল জুতো কিনে দেবার জন্যে; বাপ তাকে পূজোর আশা দেখিয়েছিল। সে মাকে ধরলে। মা'র শক্তি কতটুকু তা ছোটছেলের বোঝবার ক্ষমতা নেই, তার কাছে মা'র ক্ষমতা অনেক, তাই সে মা'র কাছে জোর করে। অমিয়ার হ'ল মহা বিপদ! টাকা যদি না থাকত তা হ'লে উপায় নেই বলে সহ্য করত, কিন্তু তার কাছে দশটা টাকা থাকতেও তার ছেলে টাকার অভাবে জুতো পরতে পাবে না এ সে কি করে মেনে নেয়? সে তো কার' কাছে হাত পাতে নি! তার স্বামী অফিসে চাকরি করে রোজকার করেন, তাতে যদি অন্যায় না হয়—তা হ'লে তারপক্ষে একটা গল্প লিখে টাকা পাওয়ায় কি অন্যায় হতে পারে?

রাত্রে অমিয়া শুতে গিয়ে বললে, "আমি আর গল্প লিখব না।"

কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হয়ে অবনী বললে, "বারণ করবার পরও লিখবে এ কথা তো আমি ভাবি নি।"

আহত হয়ে অমিয়া বললে, "না, তাই বলছি।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইল। বিবাহিত জীবনের সম্বন্ধে যাঁদের খুব সুন্দর রোমাঞ্চকর ধারণা আছে তাঁরা এদের মনের খবর পেলে চমকে যেতেন। বিয়ে হয়েছে তাদের প্রায় সাত বছর; অমিয়ার বয়েস হ'বে বছর একুশ আর অবনীর বছর আটাশ—কিন্তু এদের জীবন থেকে সমস্ত কাব্য এরই মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছে জীবনের দৈন্যের উত্তাপে। মাঝে মাঝে অমিয়া ভাবে কেন এমন হয়, কিন্তু তার কোন জবাব পায় না। এটা সত্যি হয়—কিন্তু কেন হয় তা কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি।

অমিয়া বললে, "তুমি ঘুমুলে?"

বিরক্ত হয়ে অবনী বললে, "না, কেন?"

"বলছিলাম কি ছেলেটার জুতো ছিঁড়ে গেছে ···"

বাধা দিয়ে অবনী বললে, "জানি কিন্তু কি করব? ঐ ক'টাকা মাইনেয় এতগুলো লোকের খাওয়াপরা করে সময় মত ছেলেমেয়ের জুতো যোগান সম্ভব নয়।"

"তোমায় কষ্ট করতে হবে না, কাল একজোড়া জুতো এনে দিও, আমার কাছে টাকা আছে।"

অবনী উঠে বসে বললে, "তোমার কাছে টাকা? ক'টাকা আছে?"

"যা আছে তাতে ওর এক জোড়া জুতো হবে।"

"সে কথা জিগেস করি নি, ক'টাকা আছে?"

অমিয়া মিথ্যা কথা বলতে পারে না; তাকে স্বীকার করতে হ'ল—তার কাছে দশ টাকা আছে।

অবনী ভেবে দেখলে তাকে সে দশ টাকা ছেড়ে দশ পয়সাও কোন দিন দেয় নি। জানতে চাইলে "দশ টাকা পেলে কোথায়?"

কথাটাকে হাল্কা করে নেবার জন্যে অমিয়া বললে, "ভয় নেই, চুরি করি নি।"

"তা জানি। পেলে কোথায়? এ সংসারে এমন স্বচ্ছলতা নেই যে তুমি বছর দশেকে দশ টাকা জমাতে পার। বাপের বাড়ী থেকে কি আজকাল মাসোহারা আসছে নাকি?" এ খোঁচাটা না দিলে হয় তো অমিয়া কোথা থেকে টাকা পেয়েছে তা বলত না। অনেক মেয়ের পক্ষেই বাপের বাড়ী থেকে সাহায্য নেওয়াটা লজ্জাকর—তা স্বামীর অবস্থা যত খারাপই হোক না কেন। অমিয়া বললে, "না, বাপের বাড়ীর অবস্থা যে সাহায্য করবার মত নয় তা তুমি জান; আর সে রকম অবস্থা হলেও সাহায্য নেবার মত মনের অবস্থা আমার আজও হয় নি। সব জিনিষের খারাপ দিকটা দেখ কেন?"

গল্প লিখে অমিয়া দশটা টাকা পেয়েছে শুনে অবনীর মন বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠল। সে বেশ তিক্তকণ্ঠেই বললে "স্ত্রীর রোজকারের একটা মাত্র উপায় আছে, আর সেটা কোন স্বামীর পক্ষেই সম্মানজনক নয়।"

স্বামীর সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে গরমিল থাকা সত্ত্বেও অমিয়া ভাবতে পারে নি সে তাকে এত বড় অপমান করতে পারে। এমন অবিশ্বাসী স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকতেও তার ঘৃণা হচ্ছিল। এই তার স্বামী! এরই আদেশে সে গল্প লেখা বন্ধ করতে রাজি হয়েছে।

*　　*　　*　　*

অফিস থেকে বাড়ী ফিরতে অবনীর দেরী হয়ে গেল। সাহেবরা চলে যাবার পর বড়বাবুর সঙ্গে সে অফিস থেকে বেরুল। বড়বাবু বললে, "তোমার ভাল হবে হে, ভাল হবে। ছোটসাহেব দেখেছে তুমি এতক্ষণ ছিলে।"

একটা ক্ষীণ আশা অবনীর মনের মধ্যে উঁকি দেয়, সত্যিই তার ভাল হবে।

ফেরবার পথে বেন্‌টিঙ্ক স্ট্রীটের চীনে জুতোর দোকানে অবনী হঠাৎ ঢুকে পড়ল। কেরাসিনের আলোয় ভাল করে বিশ বার এক জোড়া ছোট জুতো দেখে, অসম্ভব দর দেখে বেরিয়ে আসে, আবার একটা দোকানে গিয়ে ঢোকে। চণ্ডুর ধোঁয়ায় প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসবার যোগাড় হতে চ'লল। শেষ পর্য্যন্ত সবচেয়ে সস্তা এক জোড়া জুতো কিনে বাড়ী ফিরে। ভাবে, ছেলেটা কত আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, কত খুশী হবে। ঠিক সেইটুকুর জন্যে নিজেকে যদি একটু বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয় কিংবা যদি আত্ম-সম্মান সম্বন্ধে দু-একটা ধারণা বদলাতে হয় তো ক্ষতি কি? কেরাণির আবার আত্ম-সম্মান!

অবনী বাড়ী ফিরতে তার মা বললেন, "তোর আজকাল রোজ দেরী হচ্ছে কেন রে? একটা ছেলে-পড়ানো পেয়েছিস বুঝি?"

ছোট্ট একটা 'না' বলে অবনী চলে গেল। ছেলে বাপকে খুব বেশী ভয় করে, পড়বার সময় ভিন্ন কাছে আসে না। আজ অবনী বাড়ীতে ঢুকেই তাকে ডেকে কাগজে মোড়া জুতো জোড়াটা দিলে। সেটা যে কি হতে পারে সে সম্বন্ধে ছেলের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, জুতো বাক্সেই আসে সে জানে। তাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবনী বললে, "খুলে দেখ্।" নতুন জুতো দেখে ছেলেটি ভারী খুশী হল। বাপের সামনে পায়ে দিতে তার সাহস হচ্ছিল না। অবনী বললে, "পায়ে দিয়ে দেখ্ ঠিক হ'ল কি না, দেখিস যেন দাগ লাগে না।" তারপর নিজে উঠেই তার পায়ে পরিয়ে দেখলে ঠিক হয়েছে; বললে, "এবার আর পূজোয় জুতো হবে না।" ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। বর্ত্তমানই তার কাছে সব, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। সে খুশীই হ'ল।

অমিয়া চা নিয়ে ঘরে এল, কিন্তু কোন কথা বললে না। চা দিয়েই সে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল; অবনী বললে, "খোকার জুতো দেখেছ?"

অমিয়া নির্লিপ্তভাবে বললে, "দেখেছি।"

অবনী ভেবেছিল মাসের শেষে ছেলের জুতো কেনার টাকা কোথা থেকে যোগাড় হ'ল সে সম্বন্ধে অমিয়ার

ঔৎসুক্য হবে, তাই তার নির্লিপ্ততা দেখে সে বিরক্ত হ'ল; বললে, "তোমার রোজকারের টাকা তোমার নিজের জন্যেই খরচ কর, আমার ছেলের খরচ আমিই চালাতে পারব, আর না পারি সে কষ্ট ভোগ করবে।"

অনেকগুলো কড়া কথা অমিয়ার মুখে আসছিল; কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে বললে, "অনর্থক কতকগুলো মন্দ কথা বলে কি লাভ হবে? মন্দ কথা বলবার অনেক সুযোগ পাবে, তার জন্যে অন্য লোকও আছে।"

"আরও পাঁচজন বাঙ্গালী ঘরের বৌ-এর চেয়ে কি তুমি খুব বেশী কষ্টে আছ বলে মনে কর?"

"করলেই কি তুমি তার প্রতিকার করতে পারবে?"

"না পারব না, কারণ এর চেয়ে বেশী সুখে রাখবার যোগ্যতা আমার নেই। ধার করে ছেলের এক জোড়া জুতো কিনে দিতে পেরেছি বলে তোমায় বিবি বানাতে পারব না।"

"চেষ্টা করে ঝগড়া করবার কোন দরকার নেই।—" বলে অমিয়া ঘর থেকে চলে গেল।

ছেলের নতুন জুতো দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল কি উপায়ে জুতোর দাম সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু মেনে নিতে পারে নি। সে জানত অবনী ধার নেওয়াকে ঘৃণা করে। অফিসে যে সব কেরাণি ধার করে তাদের কথা বলতে বলতে অবনী চটে উঠত। সে বিশ্বাস করত না তারা বেঁচে থাকবার জন্যে ধার করে, সুখে থাকবার জন্যে নয়। সেই অবনীও ধার করেছে। এ ধার করা যে তাকে কতখানি আঘাত করেছে তা বুঝতে অমিয়ার অসুবিধে হ'ল না—আর ধার যে করেছে শুধু স্ত্রীর রোজকারের টাকা নেবে না বলেই —সে কথা বোঝাও কঠিন নয়।

* * * *

কি একটা কাজের জন্যে বড়বাবু অবনীকে ডেকেছিলেন। কাজটা হয়ে গেলে বড়বাবু "জীবন ও যৌবন" কাগজটা তাকে দিয়ে বললেন, "ওহে, এতে একটা গল্প পড়ে ভারী ভাল লাগল, পড়ে দেখ। দাগ দিয়ে রেখেছি।" তিনি তাকে অমিয়ার লেখাটা খুলে দেখালেন। অবনী ভাবলে, বলে যে সে পড়েছে—কিন্তু তা হলে হয় তো বড়বাবু আরও কিছু জিগেস করতে পারেন, তাই সে কিছু না বলে কাগজটা নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল। কাগজের প্রথম পাতায় সম্পাদকের নামটা দেখে তার একটু সন্দেহ হ'ল। বড়বাবুও দত্ত, সম্পাদকও দত্ত, বড়বাবুর কেউ হয় না কি? বড়বাবুকে তো কোন দিন অফিসে বসে মাসিকপত্র পড়তে দেখেনি; এক 'দৈনিক বসুমতী' ছাড়া আর কোন কাগজ ভদ্রলোক সহ্য করতে পারেন না।

শেষ পর্য্যন্ত সে অমিয়ার লেখাটাই পড়তে আরম্ভ করলে। বড়বাবু অনেক জায়গায় লাল পেন্‌সিলের দাগ দিয়েছেন। সেই জায়গাগুলোই বেশী করে চোখে পড়ে। সে জায়গাগুলো পড়ে তার মনে হোল অমিয়া যেন নিজের অবস্থা নিয়েই কান্নাকাটি করেছে।

তাকে মাসিকপত্র পড়তে দেখে একজন সহকর্ম্মী জিগেস করলে, "কি হে, বড়বাবু যে বড্ড বেশী ভাল বাসছেন দেখছি! নিজের কাগজখানাও পড়তে দিয়েছেন!" লেখাটায় দাগ দেওয়া দেখে বললে, "দেখি দেখি, কার লেখা! এতগুলো দাগ দেওয়া! অমিয়া দেবী কে হে? বড়বাবুর গিন্নি না কি?"

হঠাৎ অবনীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "না, আমারই।"

তার সহকর্ম্মী প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললে, "তোমার গিন্নি! বল কি হে? তিনি যে এত লেখাপড়া-জানা তা জানতাম না।"

"আমিও জানতাম না। আজ সাত বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে এক ধোপার খাতা ছাড়া আর কিছু তো লিখতে দেখি নি; তা ছাড়া স্কুলে কখনও গিয়েছিল বলেও তো শুনি নি।"

"তা হলে জিনিয়াস্ বল? তা এরা পয়সাকড়ি দেয়?"

"শুনছি দশ টাকা দিয়েছে।"

"তোমার তো বরাত ভাল হে! গোটা দু' এক করে গল্প যদি তোমার বৌ মাসে মাসে লেখে তা হলে তো তোমার আধাআধি রোজকার দাঁড়িয়ে গেল।"

অবনী চুপ করে গেল কিন্তু তার সহকর্ম্মী এমন সুখবরটা শুনে চুপ করে থাকতে পারলে না। কথাটা অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত অফিসে রাষ্ট্র হয়ে গেল—আর "জীবন ও যৌবন"খানা হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। অনেকে অনেক রকম মন্তব্যও করলে, তার সবগুলোই অবনীর পক্ষে শ্রুতিসুখকর নয়। একজন বললে, "যাই বল ভাই, কেরাণির লেখিকা-স্ত্রী

হওয়াটা যেন একটু বেমানান হয়।" কথাগুলো অবনীর মনের মধ্যে ভিড় করে রইল।

অবনী বাড়ী ফিরে দেখলে শুভেন্দু এসেছে। শুভেন্দুর আসাটা খুব অস্বাভাবিক নয়, তবু অবনী জিগেস করলে, "হঠাৎ যে? কি খবর?"

শুভেন্দু বললে, "নেহাৎ হঠাৎ নয়! বরং তুমি আমাদের বাড়ী গেলে এ কথা বলা সঙ্গত হয়। তুমি তো ওপথ ছেড়েই দিয়েছ।"

"একেবারে সময় পাই না।"

"সময় না পাওয়া - ও সব বাজে কথা! চাকরি তো আর কেউ করে না। ও কথা থাক্, আমি অমুকে কিছু দিন নিয়ে যেতে চাই, তোমার আপত্তি আছে?"

"না, আমার আর আপত্তি কি? বিশেষ ওর মন এখন বোধ হয় ভাল নেই, এখানে কষ্টও হচ্ছে।"

"ও সব কথা তুলছ কেন? এখানে কষ্ট হচ্ছে এমন কথা আমি বলি নি; আর আমি যে ওকে এর চেয়ে বেশী সুখে রাখতে পারব তাও নয়, রাখতে পারলেও ও তা চাইবে না। অনেক দিন যায় নি, তাই বলছিলাম, তোমার যদি আপত্তি থাকে ···"

"বলেছি তো আমার আপত্তি নেই। যাক্, কিছু দিন ঘুরে আসুক।"

অবনী যেতে মত দিয়েছে শুনে অমিয়া সন্তুষ্ট হতে পারলে না।

* * * *

অমিয়া চলে গেলে যে তার কিছু মাত্র অসুবিধে হয় না, একথাটা অমিয়াকে বোঝাবার জন্যই সে অত সহজে তার বাপের বাড়ী যাওয়ার কথায় মত দিয়েছিল। একদিন তাকে না হলে চলত আর আজ চলে না—এ কথা সে কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয়। অমিয়ার এক দিনের অনুপস্থিতিতেই সে বুঝলে কতটা তার ওপর নির্ভর করে। প্রতি মুহূর্তের ছোট-খাট অসুবিধেগুলো এমন সুন্দরভাবে জড়িয়ে থাকে যে তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। নিজের অসহায় অবস্থা যত বেশী নিজের কাছে ধরা পড়তে লাগল তত বেশী সে বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল; আর সে রাগটা গিয়ে পড়ল অমিয়ার ওপর। সে ঠিক করলে যত দিন সে বাপের বাড়ী থাকতে চায় থাক, সে আপত্তি করবে না, তার যত অসুবিধেই হোক। মাঝে মাঝে মা'র কথাগুলো একটু অসহ্য হয়ে উঠত। সে না কি বৌকে যতখানি স্বাধীনতা দিয়েছে ততখানি আর কেউ দেয় না—আর তার ফল মোটেই ভাল নয় ইত্যাদি।

এ সব থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সে অফিসে বেশী করে থাকতে আরম্ভ করলে। বড়বাবু চলে যাবার পরও সে অফিসে থাকতে চায় জেনে চাপরাশীরা গালাগাল দিতে আরম্ভ করলে। বড়বাবু একদিন বললেন, "আচ্ছা, সেই অফিসে তো বসে থাক, একটা টিউশানি কর না কেন? তোমাদের পেটে বিদ্যে আছে, আমাদের মত তো নয়।"

সে বললে, "পাই না স্যার, পেলেই করি।"

"আচ্ছা, আমি দেখব, অনেকেই তো বলে প্রায়ই।"

অবনীকে বড়বাবুর দেখবার জন্যে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না; পরদিনই বললেন, একটা ছোট ছেলেকে যদি রোজ রাত্রে এক ঘণ্টা করে পড়াতে রাজি থাক তা হলে গোটা বার টাকার একটা টিউসানি হাতে আছে।"

অবনী রাজি হয়ে গেল। যা পাওয়া যায়। ছোট ছেলে যখন, কিছুদিন চলবে নিশ্চয়।

* * * *

বাড়ীতে থাকাটা অবনী যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিন টিউসানি করে রাত নয়টার সময় বাড়ী ফিরতে তার মা এসে বললেন, "বৌমা আর কতদিন বাপের বাড়ী থাকবে?"

তার ঘরে মায়ের আসাটা যত অপ্রত্যাশিত এ প্রশ্নটা তার চেয়ে কম নয়; কারণ এর আগে আর কোন দিন এমন কথা ওঠে নি। অবনী বললে, "কেন? তার না থাকায় কি বিশেষ অসুবিধে হ'চ্ছে?"

"তা হচ্ছে বই কি! এই বুড়ো বয়েসে এত খাটুনি কি চলে? তা ছাড়া ···"

"কি?"

"আমরা কাশী যাব ঠিক করেছি।"

বিরক্ত হয়ে অবনী বললে, "এতেই সংসার চলে না, এর ওপর বিদেশ যাওয়ার খরচ যোগাব কোথা থেকে?"

"তা আমি কি জানি? ছেলে হয়েছিলি কি করতে যদি কাশীও পাঠাতে পারবি না? যখন ছোট ছিলি তখন কি তোর কোন অভাব আমরা রেখেছিলাম?"

অবনী বুঝলে তর্ক করা অসম্ভব; ছেলেটার জুতো কেনবার জন্যে যে দু'টো টাকা ধার করতে হয়েছিল তা বলেও কিছু লাভ নেই; তাকে মেরে ফেললেও আর কিছু পাওয়া যাবে না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে তার মা বললেন, "তুই তো একটা ছেলে-পড়ান যোগাড় করেছিস, কাশী যাবার খরচা দিতে পারবি না কেন শুনি?"

খবরটা যে কি করে তাঁদের কানে এসে পৌঁচেছে তা সে বুঝতে পারলে না। কোন জবাব না দিয়ে সে বাইরে চলে গেল।

পরদিন সকালে উঠে শুনলে—বাপ-মা সেই দিনই কাশী যাবেন। সে বললে, "আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।" তার মা বললেন, "তোর পয়সার ওপর নির্ভর করলে কাশী যাওয়ার কথা মুখেও আনতাম না।" একটা কথা অবনীর মনে হ'ল কিন্তু সেটা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলে। দশ টাকায় দু'জনের কাশী যাওয়া হয় না।

* * * *

অবনীর বাড়ীর ওপর বিতৃষ্ণা বেড়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। নিজেহাতে রেঁধে খাওয়ার আনন্দ যাঁরা রেঁধে খেয়েছেন তাঁরা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবেন না। অমিয়াকে নিয়ে এলেই সব দিক ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু তাতে যে পরাজয় স্বীকার করা হবে তার রোজকারের টাকা নিলেও তত হ'ত না। মেসে থাকার অভিজ্ঞতাও তার আছে; সে তা আবার ফিরে পেতে চায় না, আর চাইলে তাতেও অমিয়ার প্রয়োজন একান্তভাবে মেনে নেওয়া হয়।

এত বিরক্তির মধ্যে এক মাত্র শান্তি ছিল অফিসের কাজে। বড়বাবু তাকে বিশেষ ভাবে কাজ শেখাচ্ছেন; প্রায়ই সাহেবদের কাছে যাচ্ছে, কাজও করছে তাদের সঙ্গে। তার আশা হচ্ছিল বোধ হয় পাথর চাপা বরাতের পাথর ফাটল এইবার। বড়বাবু তাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

সেদিন সকাল থেকে অবনীর মেজাজটা ছিল বিশ্রী রকম হ'য়ে। সকালে শুভেন্দু এসে নিমন্ত্রণ করে গেছে, তার নিজে হাতে রান্নার দুর্ভোগও দেখে গেছে! অফিসে আসতেই বেয়ারা বললে, "সাহেব ডেকেছে।" সে সাহেবদের আসবার আগেই আসে, আজ শুভেন্দু দেরী করে দিয়েছে। সাহেবের কাছে যেতে আজকাল আর তার ভয় হয় না। সাহেবের ঘরে ঢুকে সে চমকে গেল। অফিসের প্রায় সব সাহেবই সেখানে হাজির। একজন তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললে, "পড়।" চিঠিটা পড়ে তার মনে হ'ল সেটা তার মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ। সে কিছু বলবার আগেই সাহেব বললে, "তোমার কি বলবার আছে?"

সে ইতস্তত করে বললে, "কি করে ভুল হল বুঝতে পারছি না স্যার।"

"তা পারবে কেন? শেষটা পড়েছ?"

অবনী ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে পড়েছে। সাহেব বললে, "এর পর তোমার চাকরি থাকা সম্ভব নয় বুঝতেই পারছ। হেড অফিস লিখেছে তোমার মত লোক যেন অফিসে না থাকে; আমরা কিছু করতে পারি না।" সে চলে যাচ্ছিল; সাহেব আবার বললে, "এ ভাবে চাকরি গেলে তোমার আর চাকরি হবে না। আমরা তোমার জন্যে এইটুকু করতে পারি—তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ বলে চিঠি দাও, আমরা সেটা মেনে নেব।" অবনীর অবস্থার লোকের পক্ষে কোন কারণে নিজে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মূলে যে একটা গভীর রহস্য আছে, সেটুকু বুঝতে কারুর বাকি রইল না।

অফিসের মধ্যে ভীষণ আলোচনা সুরু হল। সবাই একবাক্যে সাহেবদের গালাগালি দিলে। বড়বাবু কোন কথা বললেন না। অবনীর সঙ্গে তাঁর রীতিমত মাথামাথির কথাটা তুলে অনেকে অনেক রকম মন্তব্যই করলে—অবনীকে সরাবার জন্যে ভুলটুকু নাকি অবনীর অজ্ঞাতে তিনিই সযত্নে এবং স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেছিলেন। ছোটসাহেব বাড়ী যাবার আগে অবনীকে বললে, "আমার কোন কথা ওরা শুনলে না। তুমি যেখানে চাকরির সন্ধান পাবে, আমায় জানিও, আমি নিজে তোমার জন্যে চেষ্টা করব।"

অবনীর বাড়ীতে যাওয়ার মত শক্তি ছিল না। কোন রকমে সে বাড়ী ফিরে এল। ভেবেছিল একান্ত নির্জ্জনে সে একটু চুপ ক'রে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাববে। বাড়ী এসে দেখলে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আশ্চর্য্য হয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে ছেলে এসে দরজা খুলে দিলে। অমিয়া কি বলতে যাচ্ছিল, স্বামীর মুখ দেখে থেমে গেল। অবনী কোন কথা না বলে ভেতরে চলে গেল। তাড়াতাড়ি চা তৈরী করে নিয়ে এসে অমিয়া আবার ঘরে এল। অবনী বললে, "তোমরা না এলেই ভাল করতে।"

অমিয়া বললে, "আমায় ক্ষমা কর; আমি ভেবেছিলাম কিছুদিন এখানে না থাকলে ···"

"তোমাদের খেতে দেবার মত ক্ষমতা আমার আজ নেই। চাকরি গিয়েছে।"

অমিয়ার মনে হ'ল ঘরের হাওয়াটা জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। দু'জনের একান্ত নীরবতা ঘরের শৈত্য যেন আরও ভীষণ ক'রে তুলছে।

অনেকক্ষণ পরে অবনী বললে, "তোমার রোজকারের টাকায় ছেলের জুতো কিনতে বেধেছিল, এবার তাতে নিজের খাওয়া-পরা চালাতে হবে। তোমাকে লিখতে বারণ করেছিলাম, এবার লিখতে বলছি। আমি কেরাণি, তা তখন ভুলে গিয়েছিলাম।"

অমিয়া ভাবছিল উপন্যাস লিখে পাওয়া টাকাগুলো শ্বশুর, শাশুড়ীর কাশী যাওয়ার জন্যে খরচা না করলেই হত।

* * *

"জীবন ও যৌবন" থেকে চিঠি এল—প্রত্যেক মাসে গল্প লেখবার জন্য।

প্রথম বরষা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ভোরে উঠে মেঘময়—স্বপ্নময় মায়াময় হেরি এ ধরণী—
দক্ষিণে নিবিড় মেঘ;
পূরবে কিঞ্চিৎ;
উত্তর পশ্চিমে নহে ঘন।
বিদ্যুৎ খেলিছে হেথা হোথা;
গুরু গুরু গরজিছে বজ্র মাঝে মাঝে।
গাছপালা স্তব্ধ ধীর—
পাতার অঙ্গুলি নাড়ে নাকো—
নিরুদ্ধ নিশ্বাস যেন শত শত সতর্ক প্রহরী।

মেঘের ছায়ায় আর ছায়ার মায়ায়
সূর্য্য ডুবে আছে—
নাহি লেশ রক্তিম ছটার।
ছায়ার মায়ায় আমি ঘুরি ফিরি ছাদের উপরে।
কল্যকার বিনিদ্র রাত্রির ব্যথা
স্নিগ্ধ হস্তে কে যেন মুছায়।

সহসা পড়িল জল ঝম্ ঝম্ ঝম্,
যার আগমনে রুদ্ধ শ্বাস ছিল তরুগণ,
সে এল যখন—বাঞ্ছিত বরষা—
তরুগণ এককালে দুলে ওঠে,
নেচে ওঠে অদম্য হরষে;
পাতা নাড়ি' নাড়ি' জানায় আহ্বান—
সে আনন্দ বুঝি, কিন্তু বুঝাতে অক্ষম।

ঝম্ ঝম্ তড়্ তড়্ অবিরাম উদ্দাম বর্ষণ;
পাতা দোলে, নাচে ধারা,
বায়ু ছোটে, তারি সাথে ধারা করে খেলা।
হেথা হোথা মেঘের গর্জন—
যেন ক্রুদ্ধ লোক অতৃপ্ত আবেগে করে মৃদু আস্ফালন।

উদ্দাম বর্ষণ থামে;—
ঝিরি ঝিরি ঝরে জল;
বায়ু চলে ধীরে;
গাছের পাতায় মৃদু নাচ।
ভিজা কাক ডাকে দু'চারিটা;
পাতার আড়ালে বুলবুলি;
একটা শালিক ডাকে;
মাছরাঙা একটানা সুরে হাঁকে।
থেমে থেমে দূরে দূরে বজ্র চাপা সুরে ডাকে।
বর্ষণ থামিয়া গেল।
নিস্তব্ধ প্রকৃতি;
গাছপালা অচঞ্চল।
বায়ু যেন কোথায় লুকায়।
নেচে নেচে ছিন্ন হ'ল যেই কলা পাতা,
সে এবে স্তব্ধ রয় ভগ্ন তরবারি মত।
ছেলেদের ওঠে কণ্ঠস্বর;
নারীর সবাক্ আন্দোলন;
পথিকের এক কলি গানের মহড়া;
এক সাথে ডাকে অনেক টুনটুনি।
মেঘের তেমনি ছায়া, তেমনি নিবিড় মায়া
ঘিরে রহে দশদিক্।
ছাদে এসে পুনরায় হেরি
স্পন্দহীন প্রকৃতিরে জড়িমা-জড়িত;
বর্ষণের আগেকার প্রতীক্ষা নহেক ইহা;
এ যেন রে শান্ত তৃপ্তি বাঞ্ছিতে লভিয়া।

মঙ্গলকোট

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল

মঙ্গলকোট বর্দ্ধমানের প্রাচীন রাজধানী।১ বর্দ্ধমান শব্দটী পৌরাণিক। মহাভারত ও পাতঞ্জলিতে বর্দ্ধমান 'শুমা' নামে বিদিত। খৃঃ-পূঃ ৬০০ অব্দে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারগণ ইহাকে 'লাঢ়া', 'বিজ্জভূমি', ও 'সুব্বাভূমি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রীসদেশীয় ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে 'পার্থালি' বা 'পোর্ত্তালি' বলিয়া অনুমান করিতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্দ্ধমান যে মানবজাতির আবাসস্থল ছিল প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার ফলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে নদিয়া নামক স্থানে ভারতীয় সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ খনন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরফলকাদি আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীনকালে এতদঞ্চলে অনার্য ও দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল। তৎপরে আর্য্যগণের বসতিবিস্তারের ফলে ইহা সুসমৃদ্ধ স্থানে পরিণত হয়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়—মঙ্গলকোটে শ্বেত নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। আনুমানিক খৃষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ইনি একজন সামন্তরাজ ছিলেন। কারণ কুষাণ রাজত্বের পতনের পর সামন্ত-রাজগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত প্রায় শতাধিক বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না এবং এই সময়কে ভারতীয় ইতিহাসের "তামস যুগ" বলা হয়। শ্বেত রাজার পর রাজা চন্দ্রকেতু মঙ্গলকোটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শত্রুগণের আক্রমণ নিবারণার্থে রাজধানীর প্রান্তভাগে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অধুনা সেই দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং সেই স্থান 'কেতুগ্রাম' নামে পরিচিত। রাজা চন্দ্রকেতুর পরবর্ত্তীকালে আর কেহ মঙ্গলকোটের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন কি না তাহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বহুকাল যাবৎ মঙ্গলকোট 'বাগড়ি' বা বর্গক্ষত্রীয়গণের অধীনস্থ ছিল। এই নিমিত্ত সেন-বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে এতদঞ্চল পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত "বাগড়ি" নামে অভিহিত হয়। সেন-বংশীয় শেন নৃপতি মঙ্গলকোট উদ্ধারকল্পে চেষ্টা না করায় ইহা পূর্ব্ববৎ বর্গক্ষত্রিয়গণের অধিকারে থাকে।

খৃষ্টীয় ১২০৩ অব্দে সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরির আক্রমণের ফলে মঙ্গল-কোটের প্রাচীন প্রাসাদাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অদ্যাপি কতিপয় রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ পরিদৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্তূপটীর নাম "রাজার ডাঙ্গা"।

পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতে মঙ্গলকোট মুসলমানগণের বাস-ভূমিতে পরিণত হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মঙ্গলকোট একটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল। প্রতাপাদিত্যকে দমনপূর্ব্বক রাজা মানসিংহের দিল্লী প্রত্যাগমন বর্ণনাস্থলে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গলে লিখিয়াছেন :

> এড়াল মঙ্গলকোট উজানী নগর,
> খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর।

সম্রাট শাহ্‌ জহানের রাজত্বকালে মঙ্গলকোটের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মঙ্গলকোটের উত্তরাংশে তৎকালীন 'মজলিস দীঘি' নামে একটী বৃহৎ সরোবর এবং মধ্যাংশে একটী মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মসজিদের দ্বারদেশের উপরিভাগে একটী প্রোথিত প্রস্তরলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়—বাদশাহ্‌ শাহ্‌ জহানের আদেশে ১০৬৫ হিজরীতে মসজিদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাট এবং মৌলানা হামিদ নামে জনৈক ফকির একই গুরুর শিষ্য ছিলেন। সম্রাট মৌলানা হামিদের নিমিত্ত মঙ্গলকোটে এক বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তৎপরে মৌলানা হামিদের মৃত্যুর পর সম্রাটের নির্দ্দেশানুসারে শবদেহ সমাহিত হয় এবং একটী সমাধিও নির্ম্মিত হয়। প্রায় ৩০০ বৎসর অতীত হইল আজিও সেই পবিত্র সমাধি দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং ইহা দর্শনমানসে প্রতি বৃহস্পতিবারে বহু মুসলমান ও হিন্দু যাত্রীর সমাগম হয়। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমাননিবাসী জনৈক ক্ষত্রিয় বণিক আবুরায় মঙ্গলকোটস্থ বাদশাহের ফৌজদারকে বিপজ্জনক অবস্থায় রসদ সরবরাহ করায় সম্রাট শাহ্‌ জহান পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উক্ত ফৌজদারের অধীনে রেকাবীবাজারের চৌধুরী এবং পরে কোতোয়াল নিযুক্ত করেন। কালক্রমে আবুরায়ের বংশধরগণ প্রভূত ধনশালী হইয়া রাজা ও মহারাজাদি উপাধিতে বিভূষিত হন এবং বর্দ্ধমান শহরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহার ফলে বর্দ্ধমান শহরের উন্নতি এবং মঙ্গলকোটের রাজধানীর গৌরব লুপ্ত হয়।

মঙ্গলকোটের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি নষ্ট হইলেও আজও ইহার চারিপাশে 'আউলিয়া', 'সতীমন্দির', '১০১ মন্দির' প্রভৃতি বহু প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন শাহ্‌ আবদুল্লা গুজরাটী, শাহ্‌ জাফর আলী প্রমুখ খ্যাতনামা সতর জন মুসলমান ফকিরের সমাধি রহিয়াছে। মঙ্গলকোটের অনতিদূরে 'জওহর' নামক পল্লীতে এক প্রাচীন কালী-মন্দির দৃষ্ট হয়। স্থাপত্য-শিল্পে মন্দিরটী বরাকরস্থ প্রাচীন মন্দিরের সমতুল্য। বস্তুতঃ এই সকল নিদর্শন বিদ্যমান থাকায় মঙ্গলকোটের প্রাচীন গৌরব আজিও সর্ব্বরূপে লুপ্ত হয় নাই। অধিকন্তু এখানকার প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলি খনন করিলে বহু ঐতিহাসিক সামগ্রী আবিষ্কৃত হইতে পারে।

---

(১) বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথে নিগন ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মঙ্গলকোট অবস্থিত।

পরিশেষে প্রাচীন মঙ্গলকোটের অধীনস্থ কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে দাঁইহাট নামক স্থান প্রাচীনকালে একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। তৎকালে এতদঞ্চলের সর্ব্ববিধ উৎপন্ন দ্রব্য নৌকাযোগে সপ্তগ্রাম বন্দর এবং তথা হইতে বাণিজ্য পোতে সুদূর দেশদেশান্তরে রপ্তানি হইত। বর্ত্তমানে দাঁইহাট তসরবস্ত্র, পিত্তল ও কাংসের তৈজসপত্র, লবণ, তুলা, তামাক প্রভৃতি ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে ক্ষীরগ্রাম একটী প্রাচীন তীর্থস্থান। এখানে প্রাচীন "শ্রীশ্রীযুগাদ্যা" দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। প্রতি বৎসর বৈশাখ সংক্রান্তিতে মহোৎসব হইয়া থাকে।

ভাগীরথী ও অজয় নদের সঙ্গমস্থলে কাটোয়া শহর অবস্থিত। প্রাচীনকালে ইহা দাঁইহাটের ন্যায় একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। মোগল আমলের শেষভাগে ওমরাহগণ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে একটী শাসনকেন্দ্রে পরিণত করেন। আজিও মুর্শিদকুলিখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী অভগ্ন মসজিদ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন এখানে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া চারি শত বৎসর অতীত হইল ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী পরম পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ওস্কুরা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে আউসগ্রাম যাইবার পথে "পঞ্চগজা" নামক একটী প্রাচীন দুর্গের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। দুর্গটী শ্বেতরাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তৎকালে এইস্থানে যে হিন্দুদের মন্দিরাদি ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমানগণের আক্রমণের ফলে তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্বেতরাজা প্রত্যহ প্রাতঃকালে মঙ্গলকোট হইতে বক্রেশ্বর গমন করতঃ বক্রনাথ মহাদেবের পূজা করিতেন। বক্রেশ্বরের "শ্বেতগঙ্গাকুণ্ড" তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। অধুনা বক্রেশ্বর বীরভূম জেলার অন্তর্গত অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথে সিউড়ী ষ্টেশন হইতে প্রায় সাত ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং তৎকালে বীরভূম জেলাও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমান জেলার পার্ব্বত্যময় অঞ্চল এবং নদনদীতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ পরিদর্শন করিলে বহু প্রাচীন ধ্বংস স্তূপ ও বিক্ষিপ্ত প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে। সেই সকল ঐতিহাসিক সামগ্রীর সবিশেষ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকল্পে জেলাস্থ সর্ব্বসাধারণের চেষ্টা থাকা একান্ত আবশ্যক।

বিধবা

কাদের নওয়াজ

সিঁদুরের রেখা আজো মুছেনি সিঁথিতে যার—
সেই 'রাকু' পরিয়াছে কেন বেশ বিধবার ?
এ কি দেখি ?—প্রভাতেই রবি রাহুগ্রস্ত,
প্রতিপদ-সম চাঁদ উদয়েতে অস্ত।
'মৃগশিরা' উঠি যেন গগনেরি আঙিনায়—
ক্ষণিক বিলায়ে জ্যোতি লুকালো মেঘের গায়।
মনে পড়ে বধূবেশ—আজো মধু-সমীরণ,
'সানায়ে'র সুর কানে আনে যেন অনুখন্।
যৌবন-নিধু-বন উন্মন-চঞ্চল,
এই ত সেদিন ছিল উড়েছিল অঞ্চল।
ক্ষণিকে মিলালো কেন সকলি স্বপন-প্রায়,
মেঘে ঢাকা চাঁদ দেখা দিল না ত পুনরায়।
যাক্ অতীতের স্মৃতি, তব হৃদি-যমুনার—
কূলে যে বাজালো বাঁশী, সেই তব হাতে তার—
দিয়ে গেছে একখানি ছবি মনোরঞ্জন,
যাহারে করেছ তুমি নয়নেরি অঞ্জন।
সে তনয় প্রতিভায় হোক 'রবি' 'জগদীশ',
ঝরুক্ শিরেতে তার বিধাতার শুভাশীস্।
হায় হেনার মত বিধবারি শ্বেতবাস,
পরিয়াছ 'রাকু' তুমি, তবু তব মধুমাস,
আসিতেছে ঐ দেখ, তোমারি তনয় মাঝ,
নব-'আশুতোষ' যেন হেরিতেছি মোরা আজ
উর্ষসী সিঁদুর পরি মুছে ফেলে সাঁঝেতেই,
তেম্নি সিঁদুর তব মুছে গেছে ক্ষণিকেই।
হে বিধবা ! তবু তুমি বরণীয়া এ ধরায়,
জীবনের কালিদহে কমলে-কামিনী-প্রায়—
বিরাজিছ তুমি যেন কমল-কানন মাঝ,
'শান্তি-শতক' তুমি প্রণমি তোমারে আজ।

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ-উৎসব

রাধারাণী দেবী

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ উৎসব। যার সাথে উপমা করি, এমন কিছু সহজে খুঁজে পাইনে। প্রকৃতির স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক সরল হৃদয়ের অনাড়ম্বর আনন্দ প্রকাশ। নবীন আশার নির্মল ব্যঞ্জনা।

কালের আবর্তনচক্রে বর্ষযাত্রায় মানুষ বারংবার নূতন উৎসাহ নবীন আশা নিয়ে জীবনের পথে সাগ্রহে ছুটে চলেছে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা তার সফল হয় না, সকল আশা হয় না সার্থক। পথে আছে দুঃখ, শোক, রোগ, জরা, মৃত্যু, দারিদ্র্য, নিরাশা ;—আরও কতো বেদনা।

সমস্ত বৎসরের ঘাত প্রতিঘাতে চিত্তে হতাশা, দুঃখ, অবিশ্বাসের যে মালিন্য জমে ওঠে, তাকে বিস্মৃতির বারিধারে ধুয়ে ফেলে চিত্তকে নিষ্কলুষ নব আশা-উদ্দীপ্ত করে তোলে এই বর্ষ-বোধন উৎসব।

শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখ-উৎসবে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য ইতিপূর্বেও ঘটেচে। সেই রজনীশেষে তরল ম্লান অন্ধকারে আশ্রম-বীথিকার তরুশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে বৈতালিক-গণের কিশোর কণ্ঠের সতেজ মধুর স্বরে সুমিষ্ট উষাসংগীত। নব বর্ষের আসন্নপ্রভাতকে সুরের সুধাধারায় অভ্যর্থনা করার সুন্দর স্মৃতি কারুরই ভোলা সম্ভব নয়। এই অপূর্ব ভোরাই সংগীত মানুষের হৃদয় নিবিড় প্রসন্নতায় অমৃতসিক্ত করে তোলে। বিগত দিনগুলির সকল কঠোরতা, অসৌন্দর্য, দুঃখ গ্লানি নিঃশেষে বিস্মৃত হয়ে চিত্ত নির্মল সাত্ত্বিক আনন্দে সুরভিত হয়ে ওঠে।



নববর্ষ—১৩৪৮ ফটো : শক্তিরঞ্জন বসু

প্রদোষান্ধকারে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই, নিশায় নিদ্রিত মানুষের সদ্যজাগ্রত হৃদয় মনকে একটি সদ্যবিকশিত শিশির ধোয়া ফুলের মতো অনুভব করার অনুকূল বাস্তব-পরিবেশ

সৃষ্টি—এ কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। যে-মানুষ, সংস্কৃতি-বিলুপ্ত পরাধীন একটি মহাদেশের শিক্ষা, রুচি ও মানবতাকে সচেতন এবং সংগঠনের দায়িত্ব সহজ শক্তিতে গ্রহণ করেচেন।

পূর্বদিগন্তে শুকতারা তখনও নীলকান্তমণির মতো কিরণ বিকীরণ করচে। আশ্রমের বৃক্ষনীড়ে কলকূজন সবে আরম্ভ হয়েচে অস্ফুট আলোকের সম্ভাবনায়। মৃদঙ্গের গম্ভীর তালে সঙ্গত্-সুন্দর নববার্ষিক বৈতালিক গীতে ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্রাণ বিভোর হয়ে উঠলো নিম-মঞ্জরীর সুমিষ্ট মৃদু সৌরভে। আশ্রমের প্রাচীন নিমগাছ-গুলি গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পমুকুলে মুঞ্জরিত হয়ে হাওয়ায় দুলচে। ভোরের শীতল বাতাস ভারি হয়ে উঠচে সেই নিম-মঞ্জরীর আশ্চর্য লঘু সৌগন্ধে। মাঝে মাঝে ঝির-ঝিরে হাওয়ার দমকায় ভেসে আসচে আম্র-বনের কচি আম আর শেফা-বউলের তীব্র মদির সৌরভ।



সপ্তপর্ণমূলে মহর্ষির ধ্যানপীঠ



নববর্ষ—১৩৪৩ মন্দিরে উপাসনা ফটো: সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

নববর্ষের উৎসবে যেন প্রধান অংশ গ্রহণ করেচে ভোরের আম্রবন আর পুষ্পমুঞ্জরিত নিমতরুপুঞ্জ। উৎসবকে সংগীত মুখরিত করে তুলেচে আশ্রমের পাখীরা।

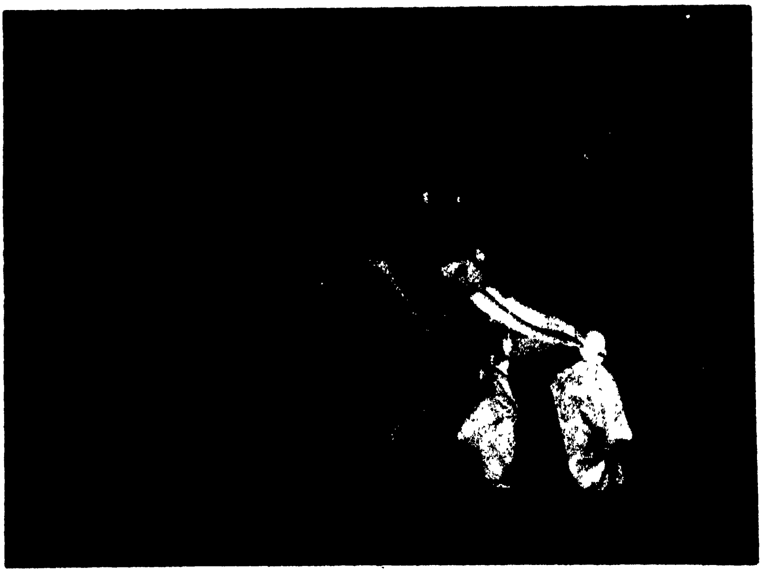
শান্তিনিকেতনে ভোরের পাখীর গান যারা শুনেচেন, তাঁরা জানেন, এই পাখীদের উষা-কাকলি শান্তিনিকেতনের কতো বড়ো একটি সম্পদ! এত বহুবিচিত্র মধুরকণ্ঠ পাখীর উল্লাস-কলরব অন্যত্র অল্পই শুনেচি।

গতকল্য সন্ধ্যায় মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনা শেষ হওয়ার পর রাত্রে বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা "মুক্তধারা" নাটক অভিনয় করেছিল।



অবদান　　ফটো: সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

দিনের আলো ফুটবার সাথেই দেখা গেল, দিকে দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ দিয়ে, সবুজ শালবীথির মধ্য দিয়ে, রক্তবর্ণ রাস্তা দিয়ে পুরুষ নারী ছোট বড় সকলে এগিয়ে আসচেন মন্দিরের পানে। মেয়েদের পরিধানে পীতবর্ণ শাড়ী, পুরুষদের পীত উত্তরীয় কিংবা পীত পরিচ্ছদ। আসচে চীবর বর্ণের (প্রগাঢ় কমলা রং) রেশমী পরিচ্ছদধারী চীনা ছাত্রদল, আসচে পীতবর্ণ বাসে জাপানী ছাত্র। আসচে সিংহলবাসী, যবদ্বীপবাসী, য়ুরোপবাসী মানুষেরা। উপাসনা-কেন্দ্রের পানে আসচে এগিয়ে, ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দু, বৌদ্ধ খৃষ্টান, জৈন শিখ। বিভিন্ন প্রদেশবাসী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধি, মাদ্রাজী, উৎকলী, আসামী, বেহারী, বাঙালী। চিত্তে সাম্প্রদায়িকতা কিংবা প্রাদেশিকতা নেই, ব্যবহারে বৈষম্যের স্পর্শ মাত্রও নেই। আনন্দ উৎফুল্ল ছাত্রছাত্রীদল, তারা মাত্র বিশ্বভারতীর ছাত্র বা ছাত্রী এই ঐক্যতায়—ব্যগ্রচরণে সমবেত হচ্চে নববর্ষ উৎসবে—স্বর্গীয় মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত মন্দির প্রাঙ্গণে। আসচেন অধ্যাপক

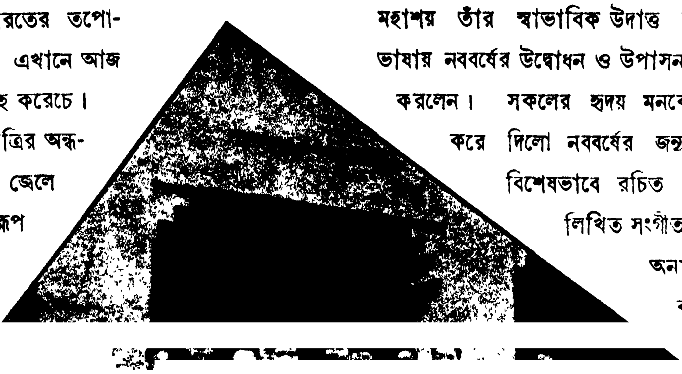


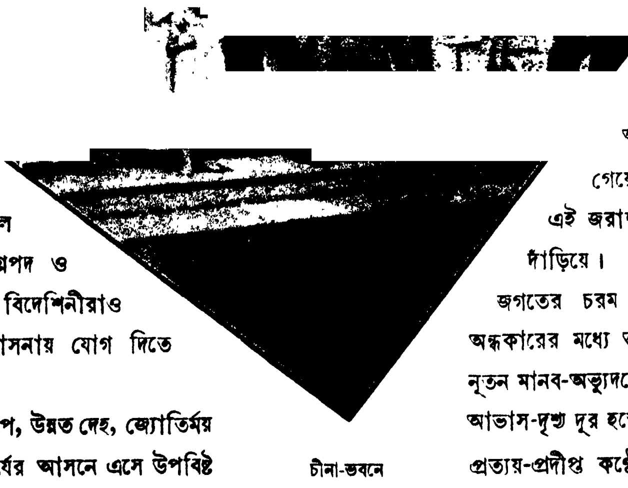
নৃত্যোৎসব　　ফটো: সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

অধ্যাপিকা শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীগণ গুরুপল্লীর দিক হতে। আসচেন অতিথিনিবাস, পান্থশালা, রতনকুঠী হতে আগন্তুক, যাঁরা শান্তিনিকেতনের এই উৎসবে যোগ দিয়ে ধন্য হতে এসেচেন।

শুভ্র প্রভাতে আশ্রমের বৃক্ষতরুচ্ছায়ায় আশ্রমবাসী ও আশ্রবাসিনীদের প্রাতঃস্নাত নির্মল হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি দেখে মনে হয়, সত্যই ভারতের তপোবনের সুন্দর আদর্শ এখানে আজ প্রাণবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেচে।

আশ্রমকন্যারা রাত্রির অন্ধকার থাকতে বাতি জ্বেলে মন্দিরের চত্বর অপরূপ আলিপনায় কারু-চিত্রিত করে





চীনা-ভবনে

রেখেচেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই মন্দির এবং মন্দিরের চতুর্দিক জনাকীর্ণ হয়ে উঠলো। অনেকেরই পরিধানে নির্মল নববস্ত্র। মেয়েদের সকলেরই নগ্নপদ ও অনাড়ম্বর বেশবাস। অভারতীয়া বিদেশিনীরাও নগ্নচরণে শাড়ী পরে মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতে এসেচেন।

আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রতীক্ স্বরূপ, উন্নত দেহ, জ্যোতির্ময় ঋষিমূর্তি কবিগুরু মন্দিরের আচার্যের আসনে এসে উপবিষ্ট হলেন না এবার। অন্য বৎসরে এ আসনে তাঁকেই স্বকীয়তার সর্বতোমুখী দীপ্তি বিকীর্ণ করে বসতে দেখেচি। তাঁর অনুপস্থিতি সকলেরই চিত্তে বিশেষভাবে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল।

তিনি আজ রোগদুর্বল, পীড়িত। যদিও বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের পক্ষ থেকে উত্তরায়ণ-পল্লীতে কবির জন্মদিনের মহোৎসব আজই সন্ধ্যায় বিরাট আকারে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েচে—তবুও, প্রভাতে নববর্ষ-উৎসবে মন্দিরে তাঁর অনুপস্থিতি সমস্ত উৎসবকেই যেন নিষ্প্রভ মলিন করে তুলেছিল।

নানা দেশদেশান্তরের নরনারী পরিবেষ্টিত হয়ে, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত কণ্ঠে স্বচ্ছন্দ স্রোতোময়ী ভাষায় নববর্ষের উদ্বোধন ও উপাসনা কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন। সকলের হৃদয় মনকে অভিভূত রোমাঞ্চিত করে দিলো নববর্ষের জন্য রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিশেষভাবে রচিত অপূর্ব উন্মাদনাময় নিম্নলিখিত সংগীতটির কথা ও সুর।

অনাগত নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে যে নতুন মনুষ্যহৃদয় আসচে, দ্রষ্টা ঋষি তারই অভ্যর্থনা সংগীত গেয়ে দিয়ে গেলেন এই জরাজীর্ণ-পৃথিবীতেই দাঁড়িয়ে। আজ সমগ্র জগতের চরম হতাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যদ্দর্শী কবি, নূতন মানব-অভ্যুদয়ের স্বর্ণ অরুণ-আভাস-দৃশ্য দূর হতে প্রত্যক্ষ করে প্রত্যয়-প্রদীপ্ত কণ্ঠে সবার আগে আনন্দজয়ধ্বনি দিয়ে উঠেচেন। এই প্রাণোদ্বেল স্বাগতবাণী অনাগত নবযুগের জন্য তোলা রইল। গানটি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম।

ঐ মহা মানব আসে!
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমা-রাত্রির দুর্গ তোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন ॥
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় হে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে ॥

সংগীতাদির পর নববর্ষের প্রণাম আশীর্বাদ ও প্রীতি-নমস্কার বিনিময় শেষ হলে পীতবাস জনতা আম্রকুঞ্জের পানে হাস্য আলাপ-গুঞ্জরণে অগ্রসর হলো। আম্রবনে নববর্ষ-উৎসবের প্রসাদ বিতরিত হচ্চে, ফলমূল, মিষ্টান্ন। তারপরেই উত্তরায়ণে যাত্রা কবিকে নববর্ষের প্রণতি নিবেদনের জন্য।



শ্যামলী ফটো: সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

শান্তিনিকেতনের গাছে গাছে পাতায় পাতায় নববর্ষের নূতন রবি-কিরণ ঝলমল্ করে উঠেচে তখন। দীর্ঘ ঋজু গাছগুলি বেয়ে কাঠবেড়ালীদের চঞ্চল ছুটাছুটি উঠা-নামার বিরাম নেই। ছাতিম গাছের পূবদিকে কতকগুলি শালিখ পাখী জুড়ে দিয়েচে প্রবল চেঁচামেচি। কোকিলের চীৎকার আকাশ চিরে ফেলতে চায় যেন। প্রভাতী কোলাহলের মধ্যেই এক অদৃশ্য ঘুঘুপাখী দ্বিপ্রাহরিক শ্রান্তিপূর্ণ বিলাপের সুরে করুণ ডাক শুরু করে দিয়েচে।

শান্তিনিকেতন—এক মহর্ষি মানবের ধ্যানলোকের সৃষ্টি। তাঁরই আত্মজ সেই সৃষ্টিকে তাঁর, অপূর্ব সার্থক করে তুলেচেন। দেখে মনে হয়, সার্থক সেই পিতামাতা, যাঁরা এমন সন্তানের জনক জননী। যাঁর জন্ম উপলক্ষে—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" বললে যথোচিত হয় না, বলতে হয় যাঁর জন্মগ্রহণে—"দেশং পবিত্রং ধরণী কৃতার্থা।"



মিসিং-লিঙ্ক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

পথে পড়ে-পাওয়া-চোদ্দ-আনা, এই ভেলো কুকুর। ওর কালো রঙে মাটি লেগেছে, অযত্ন মেখেচে। কাজেই সহজে বলতে পারবে না কি রঙা প্রাণী ও। নখ কাটা, চুল ছাটা, দাড়ি কামানোর বালাই নেই, কিন্তু তবু জ'টে-বুড়ির মতন ভয়ঙ্কর দেখায় না। পোষাক পরিচ্ছদ গয়না গাঁটির হাঙ্গামা নেই, তবু ওকে দেখতে কোনদিন পুরোনো লাগে না। পোষাকী আর আটপৌরে যেন মিলে আছে।

শহুরে লোকের কথা ধরচি না। কিন্তু যারা পাড়াগেঁয়ে মোড়ল দেখেচে—সকালবেলা একটা খেলো হুঁকা হাতে নিয়ে, অন্য হাতটা কাছার পাশে গুঁজে, পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা মারতে বেরোয়, তাদের সঙ্গে এই ভেলো কুকুরের তফাৎ কি?

সকালে উঠে ভেলো চলল প্রোগ্রামলেশ্‌লি লিজারলি। হয়ত বেণী বাগ্দীর দাওয়ায়। বড়ো রাস্তার ধারে দাওয়া। পান-বিড়ির দোকান আছে, বেগুনি-ফুলুরি বিক্রি হয়, সময়ে ডাব কিনতে পাবে। এখানে গাঁয়ের চাষাভুষা, মালো মাঝিরা দু-দণ্ড ঠেক্ খায়, পথিক জিরিয়ে যায়। এমন এই যে গ্রাম আর সদরের মিলনক্ষেত্র—এখানটিতে ভেলোর প্রত্যহ একবার আসা চাই। লক্ষ্য করে দেখো, ওর চলা-ফেরা, ওঠা-বসায়, একটা মুড্ আছে। কোনদিন এখানটায় এসে একটু দাঁড়ায়। নতুন লোক দেখলে, চোখ তুলে একটু চায়। কিন্তু তা নিস্পৃহ। তারপর কি একটু ভাবে। শেষে চলতে সুরু করে অর্থাৎ আড্ডাটা আর জমল না। এখানে যদি কোনদিন বচসা হয়, ভেলো রইল একধারে দাঁড়িয়ে, সবটা শুনবে এবং যে-যে লোকের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলচে তাদের উভয়ের মুখের দিকে ঘন ঘন চাইবে। যেন মনের কথাটা বুঝচে। কিম্বা মুড়ি-মুড়কির দোকানের সামনে একপাশে কোথাও গুটিসুটি হয়ে ঘুমোবে। যেন বড় আদরের পোলাটি। দোকানী যদি ইযাকি ক'রে একবার ডেকেচে, ভেলো! কোথায় ঘুম, কোথায় কি! স্প্রীংয়ের মতন ভেলো লাফিয়ে উঠবে। তারপরে দোকানীর মুখের দিকে চেয়ে ল্যাজের দোলন। আর আশ্চর্য্য, তার চাওয়া। দু-চোখ দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে, দুবার ক'রে দেখতে থাকবে। দেখেচ, ডাকলে পরে, কুকুরের সাড়া-দোয়া-চোখ! এ-চাওয়া যদি দেখে থাক, কুকুরকে তুমি জন্তু বলতে পারবে না। দোকানী যদি বলে, কি গো বাপু, মুড়ি-মুড়কির লোভে জুটেচ নাকি। ব্যাস। ভাব দেখলে তোমার মনে হবে যেন বলতে চাইচে—হুজুর, সবই তো জানেন, তবে আর যন্ত্রণা দ্যান কেন! শুধু কি তাই। হ্যাংলাটার সভ্য হবার চেষ্টা দেখেচ? মুড়ি-মুড়কির নামে জিবে জল। অতএব লটপটে জিব দুলিয়ে নাল পড়ার বে-ইজ্জতি ঢাকতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় না। ভেবো না, এটা উড়িয়ে দেবার মতন কথা। তোমার কাছে তেঁতুল খাওয়ার গল্প করি যদি কি কর? ঠোঁট দুখানি একটু চেপে ছোট্ট একটু ঢোক গিলে নেবে না কি? সত্যি করে বল তো!

প্রাতর্ভ্রমণের প্রথম আইটেম্‌টা শেষ হ'ল যদি, ভেলোবাবু চললেন গ্রামের মধ্যে। এখন, এই পথে রসি দুয়েক গেলে পরেই একটা মেটে ঘর পড়ে। চার-পাচটা তাল আর খেঁজুর গাছের মাঝে একটা কুড়ে। একখানা মাত্র ঘর, তাল আর খেঁজুর পাতা দিয়ে ছাওয়া। পাশে একটা ডোবা আছে। এই ঘরে একটা বুড়ি থাকে। কোথাকার বুড়ি, কবে এসে ঘর বেঁধেচে, কে জানে। ভিক্ষে ক'রে খায়। মাথার চুলগুলা শনের মত, চোখ দুটা ভাঁটার মতন ঘোরে, গায়ের চামড়া কুঁচকে এসেচে, পুরোনো গাছের ছালের মতন। কুঁজী বুড়ি চলে যখন, হাতে থাকে তল্‌তা বাঁশের একটা লাঠি, ওর দ্বিগুণ লম্বা হবে। ভেলো যখন প্রথম বুড়িকে দেখল, খুব আশ্চর্য্য লাগল। একবারও ঘেউ ঘেউ করল না। দূর থেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে লাগল। বুড়ির চুলের নুড়ো আর খড়ি-ওঠা গায়ের কোঁচকানো চামড়া দেখে ভেলোর বোধ হয় মনে হ'তে লাগল, ইস্, ছাতা-পড়া বুড়িকে রোদ্দুরে দিলে হয়। বুড়ির ঘরে যে দ্বিতীয়

প্রাণী নেই অথচ সর্ব্বক্ষণ গজগজ করতে থাকে এতে বোধ হয় ভেলোর খুব ইন্টারেষ্টিং লেগেচে। কাজেই ভেলোবাবুর এটা হ'ল একটা রেগুলার ভিজিটিং প্লেস্। এ-পথ দিয়ে গেলে, ও বুড়ির ঘরে একবার উঁকি মেরে যাবেই। দরজা খোলা দেখলেই, ভেলো এসে দাঁড়াবে সেখানে। উঁচু দাওয়ার হাঙ্গামা না থাকায় ভারি সুবিধে। পথ থেকেই সোজা বুড়ির ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। ভেলোকে দরজার সামনে দেখলেই, বুড়ি নির্ঘাত করবে তাড়া আর অজস্র গালাগালি। এই সময়ে ভেলোর মুভমেণ্টস্ দেখলে অবাক হবে। তাড়া-খাওয়া ভেলো, কাৎ-হয়ে-যাওয়া নৌকোর মতন টাল খেয়ে, তিন পায়ে ভর দিয়ে, লাট্টুর মতন খানিকটা কেৎরে যাবে। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে আস্তে আস্তে চলতে থাকবে। দূরে এসেও দাঁড়িয়ে দেখে—বুড়ির ঘরের উপরে তালের শুখনো পাতা খড়মড় করচে। কে জানে, হয় ত ভাবে, ঐ যে তাল পেকেচে। পাকা তাল, চাল ফুঁড়ে বুড়ির মাথায় পড়লেই হ'ল। কে জানে, বুড়ির প্রতি ওর একটা টান আচে কি-না। বুড়ি ভিক্ষে করতে বেরলে, ভেলোর সঙ্গে পথে দেখা হয় যদি, মন দিয়ে দেখো, ও তখন বুড়ির পেছন পেছন খানিকটা ঠিক এগিয়ে দেবেই। বুড়ি লাঠি উঁচিয়ে এলেই ওর সেই টাল্ খাওয়া। তখন যদি ওর মুখের ভাব লক্ষ্য কর, দেখবে, যেন বলচে, আ গ্যালো যা।

লোকের আনাচ কানাচ হেঁস্‌কেল-চেঁশ্‌কেল আর সদর-অন্দরই বল—কোথাও যেতে পাশ-পোর্ট লাগে না। সর্ব্বত্র সহজ গতি, অবাধ বিচরণ। আলাপ? তা স্ত্রী-পুরুষ কাউকে বাদ দেয় না। সাত-সকালে হয় তো দেখবে, রান্নাঘরের দাওয়ার ছাঁচতলায় এসে দাঁড়িয়েচে। আর চোখ দিয়ে গিন্নিকে খুঁজচে, যদি কিছু মিলে যায়। গিন্নিঠাকরুণ হয় ত তেড়ে উঠ্‌লেন, আ মোলো, মুখপোড়া যে রাত না পোয়াতেই গিলতে এলো। দেখবে তখন কাণ্ডটা। ভেলো তৎক্ষণাৎ কথাটা বুঝবে। একটু অপমান বোধ করবে এবং মুখটা কাঁচুমাচু ক'রে ঘাড় হেঁট ক'রে, বার দুই নাক ঝাড়বে। শেষে আস্তে আস্তে উঠান পেরিয়ে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তারপর খুঁজে দেখ, পাঁশগাদায় পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্চে। যদি ভাব, ঘুমাচ্চে, তা হলে ভুল হ'ল। মোটেই তা নয়, বরঞ্চ অনুশোচনায় মুহ্যমান হয়ে থাকে খানিকটা। তারপরে দেখো বিরস মনে চলতে থাকে। কোথায় যে, তার কি কোন ঠিক আছে। ওর চলার ভাব দেখে মনে হবে যেন, যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাই।

কুকুর যে সব সময়েই খাবারের তাকে ঘুরে বেড়ায়, একথা ব'ল যদি, তা হলে তোমরা অন্ধ। মন দিয়ে দেখোনি একটা কুকুর হন্তদন্ত হয়ে, একা একা নিজের মনে নির্জ্জন পথ দিয়ে কোথায় চলেচে? মনে মনে মিলোলে দেখবে, ভাবটা যেন, কোথাও মিটিং আছে, নয় ত টী-পার্টি, কিম্বা কোর্টে তিন নম্বর রুজু করতে হবে। এই যে এক্-বগ্‌গা হয়ে চলা, তার মাঝে দেখবে, হঠাৎ থেমে পড়ে আর পেছন দিকে চেয়ে দেখে। আমি যদি বলি, বাস আসচে কি-না ফিরে ফিরে তাই দেখে, তা হলে খণ্ডন করতে পারবে না। যাই বল, আমার মনে হয়, কুকুর সিরিয়াস্‌লি ভাবে। অন্তত ভাববার চেষ্টা করে। একটা পারসোন্যালিটি আছে। একটু খুলেই না হয় বলি।

গ্রামে এক জায়গায় যাত্রা হচ্চে। তা রামায়ণই হোক্, আর মহাভারতের পালাই হোক। যাও সেখানে, দেখবে, দু-দশ শো লোক তন্ময় হয়ে শুনচে। বড় বড় ডে-লাইট জ্বলচে, একটিং চলচে, তরোয়াল ঘুরচে, পাখোয়াজ আর মন্দিরার আওয়াজে যুদ্ধের ভাব ঘন হয়ে এসেচে। এমন সময়ে আসর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের অন্ধকারে দেখ, পাঁচ-সাতটা কুকুর আছেই। যাত্রায় খেতে পাওয়া যায় না, তুমি কি ভাব, কুকুরে একথা জানে না! তবে যায় কেন? আসল কথা, একটা দায়িত্ববোধ আছে। যেখানে আর পাঁচজন জোটে, সেখানে ওদেরও থাকা চাই।

নেমন্তন্ন বাড়ির কথা না হয় ছেড়ে দিলুম। কিন্তু কাজের বাড়ির জন্যে পুকুরে মহাজাল পড়েচে, বড় বড় মাছ লাফাচ্চে, পুকুরপাড়ে কর্ত্তা ব্যক্তি থেকে ছেলে ছোঁড়ার দল। আচ্ছা বলো, সেখানে ভেলো কেন? কুকুর তো আর বেরাল নয়—কাঁচা মাছ খায় না। তা হলেই বলতে হয়, এরকম একটা গুরুতর ব্যাপারে, বৃহৎ কর্ম্মে, ও নিজের উপস্থিতি দরকার মনে করে।

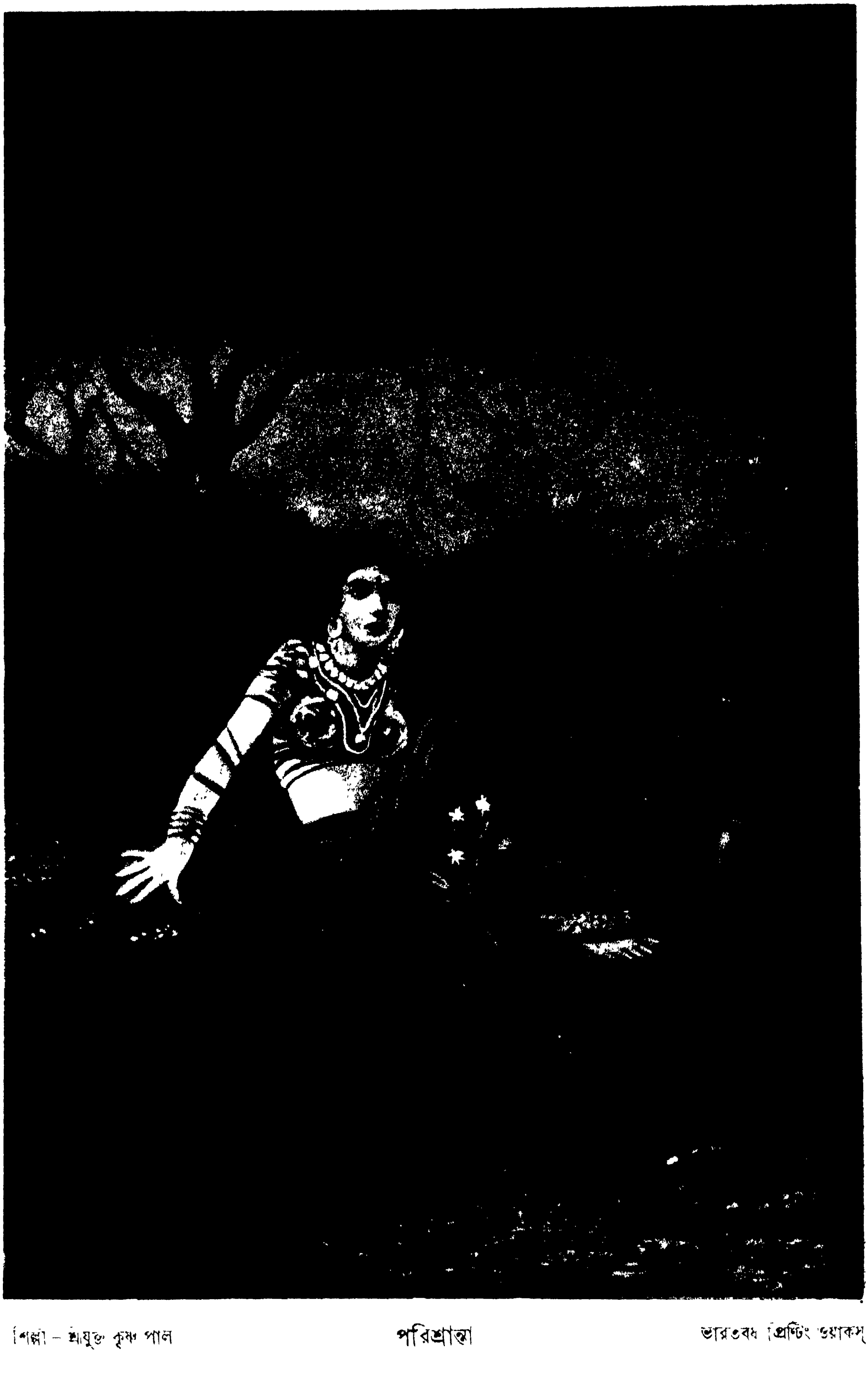
স্বভাবের কথা বিবেচনা করে যদি দেখো, অবাক সাজবে। গৃহীর মতন ঘরে থাকে, অথচ বাঁধন মানে না। যেখানে সেখানে যখন তখন চলে যায়। কিন্তু নাম ধরে

ডাক দু-বার দেখবে, ভানুমতীর খেল্। উর্দ্ধশ্বাসে এসে হাজির। ল্যাজ নাড়া আর শরীর দোলানি এবং জিজ্ঞাসু চোখ মিলিয়ে দেখলে মনে হবে, বলচে, এই তো, এখানেই ছিলুম, কি বলচেন, বলুন না। মনে করে দেখো বাড়ির গিন্নির প্রতি ও কত অনুরক্ত। সন্ধ্যেবেলা গিন্নি হয় তো বললেন, চাল ধুয়ে আনি, ভাত চড়াতে হবে। ভেলো উঠোনে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঠিক শুনেচে এবং কর্ত্তব্যবোধে ও গিন্নির পেছু পেছু গিয়ে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং কাজ শেষ হ'লে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। তারপরে যখন দেখবে গিন্নির আর কোন ফরমাজ নেই তখন বাড়ির বাইরে কোথাও শুয়ে থাকবে। এবং শুতে না শুতেই ঘুম। আর সে কি ঘুম! একেবারে ঘড়র্-ঘড়র্ ক'রে নাক ডাকতে থাকবে। লক্ষ্য করে দেখেচ তো, মানুষের চেয়ে বেশী করে নাক ডাকায় অথচ বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ নেই। বল তো আর কোন জন্তুর নাক ডাকে কি?

কুকুর সম্বন্ধে আমি কোন প্রচারের কাজে লিপ্ত, এ-কথা ভাবাই মিছে। কুকুরের না আছে রিস্ট-ওয়াচ, না জানে মাইল-স্টোন পোড়তে। তবু দেখো, তার লাঞ্চ টাইমের গণ্ডগোল হয় না। সকালের রোঁদে বেরিয়ে যতদূরেই গিয়ে পড়ুক, কুয়াসাই থাক আর মেঘলাই হোক, ঠিক মনে থাকে, কখন গিন্নি-ঠাকরুণ সান্‌কিতে ভাতমাছের কাঁটা নিয়ে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াবে। তারপর মিহি গলার বিলম্বিত সুরে দুটো ডাক্—ভেলো, ভেলো আ—তু! ব্যাস্। উল্কার মতন আঁদাড়-পাঁদাড় পেরিয়ে ভেলো রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। তখনকার ভেলোর ভাব যদি দেখো, মনে হবে বলচে, তোমার জয় হোক গিন্নিঠাকরুণ। এটা অবিশ্বাস করতে সাহস পাবে না। প্রবাদ আছে, কুকুরে খেতে পেলে প্রাণ খুলে গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদ করে। বলে, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক, তোমার বাড়িতে অনেকগুলি পাত পড়ুক, তা হলে সবাইকার পাত-কুড়োনো আমি পাব। অথচ দেখো, বেরালে বলে, তোমার সংসার ছোট হোক, তা হলে আমি একাই সব খাব। মেয়েলি কথা বলে উড়িয়ে দিলেও তোমাকে ভেবে দেখতে হবে, মানুষে এই দুটো জন্তু সম্বন্ধে দু-রকম নিয়ম এবং প্রচার কেন করেচে। কুকুরকে খেতে দিলে, তার ভাবভঙ্গি দিয়ে তোমাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবে যে, সে কত কৃতজ্ঞ। কিন্তু গোরু পোষ, মোষ, ভেড়া, ছাগল, মুর্গী, হাঁস—গৃহপালিত যে পশুই ধর, এমন সাড়া আর কার কাছে পাবে বল তো!

আচ্ছা, আরামের কথাই ধরা যাক। বেরালের চেয়ে ওস্তাদ এবিষয়ে আর কাকে পাবে। তুমি বসে আছ কি ঘুমিয়ে আছ হয় তো, দেখবে, আদিখ্যেতা করে, গা ঘেঁষে গুটিশুটি হয়ে ঘুম লাগাল। তার জন্মে বাছ-বিচার নেই, তা তোমার যত দামী শাড়িই হোক, আর যত পরিষ্কার বিছানাই হোক। দু-ঘা মার, তিড়িং ক'রে লাফিয়ে, হোঁয়াও, ক্যাঁও ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে চলে যাবে। কিন্তু দু-পা গেলেই যে-কে সেই। কথায় বলে, আড়াই-পা গেলে, বেরালের আর কিছু মনে থাকে না। আসলে তা নয়, ওটা বেহায়া নির্লজ্জ প্রাণী। আর আমাদের ভেলোর কথাই ধর। দেখবে, আরাম সম্বন্ধে তার ধারণা কিছু কম নয়। কোথায় খড়ের গাদার মধ্যে একটু গর্ত্ত ক'রে গদীর সুখ আর আরাম চায়। মানুষের বিছানার দিকে না-চায় যে তা নয়। কিন্তু জানে, ওখানে তার অধিকার নেই। অর্থাৎ আরামের ধারণাও আছে, বিবেচনা, খাতির এবং সম্ভ্রমও আছে। সত্যি কথা বোলতে কি, মানুষ-জাতকে ভেলো জগতের প্রাণী শ্রদ্ধা করে। কারণ মানুষকে সে স্টাডি কোরতে পারে। আর কোনো জানোয়ার পারে কি? কিন্তু বেরাল দেখো, তোমাকে আমাকে তোয়াক্কাই করে না। সত্যিকার একটা জান্তব ডাল্‌নেস্ ওতে আছে। এই বিষয়ে কুকুর ওকে ঢের ঢের ছাড়িয়ে গেছে।

বুলডগ, গ্রেহাউণ্ড, ফক্সহাউণ্ড, আল্‌শেশিয়ান, হাইব্রেড, লাব্রেড্, ক্রশবেড কত রকম দেখেচ শুনেচ, জ্যান্ত, মরা, ছবিতে। কিন্তু কি ফল? কাকে ভয় পেয়েচ, মনে হ'ল চিড়িয়াখানায় রাখাই ছিল ভাল। কারে দেখে দূর থেকে শ্রদ্ধা করেচ। কাউকে একটু ভয়ে, একটু ব্রাভাডোতে দু-একবার পিঠ থাব্ড়াবার চেষ্টা করেচ। ঐ পর্য্যন্ত। কাউকে নিজের ক'রে নিতে পেরেচ কি? আর এই আমাদের ভেলোবাবুকে দেখ। তাকে তুমি গ্রাহ্যই কর না, তোয়াক্কাই রাখ না, লক্ষ্যই কর না। কারণ সে এল্-টি, বি-টি পাশ করে নি, নিছক চাষাড়ে এবং গেঁয়ো রয়ে গেছে। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে বেচারি কলকে পেলে না। কিন্তু বোধ হয় পাশ না ক'রে ভালই করেচে। তফাৎটা বলব নাকি?



শিল্পী – শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ পাল

পরিশ্রান্তা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

পরদেশী কুকুর তো ট্রেনিং-এর ফলে একেবারে পি-এইচ-ডি, ডি-লিট্, ডি-ফিল—তাতে সন্দেহ নেই। যাকে খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় বলে, একেবারে আগ মরি। কিন্তু সে যে একটা জ্যান্ত-যন্তর, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ আছে কি? শিক্ষাটা কি, না নিজের স্বাধীন সত্তা বাদ দিয়ে তোমার হুকুম মানতে শেখা। বেশ, পোষ এমনিতর একটা কুকুর, একটু তাতিয়ে—দাও ইসারা ক'রে, তৎক্ষণাৎ ধরবে টুঁটি চেপে। আত্মীয়-পর চেনা-অচেনা সাধু-অসাধু কিছু চিনবে না, শুধু কর্ত্তব্য পালন করবে। খুব বাহবা আর হাততালি দেবার মতন বটে।

কিন্তু ভেলোকে ডেকে কারুর দিকে লেলিয়ে দাও—দিয়েচ কখনও? কি হবে বল তো? বিশ্বাস কর আর নাই কর, ভেলো তোমার মনস্তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করবে। তারপরে কাজ করবে। অর্থাৎ—তুমি যদি গম্ভীরভাবে, শান্তভাবে ভেলোকে লেলিত হতে বল, দেখবে, ভেলোও পরম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে মুখ তুলে, দু-চার বার ঘেউ ঘেউ করবে মাত্র। কিন্তু তুমি যদি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবের অভিনয় করে ওকে ডাক, ভেলো ভেলো, লুযো লুয়ো! তৎক্ষণাৎ দেখবে, ভেলো আর গেয়ো ভুত নেই, একেবারে তাজা রেসের ঘোড়া। আর গলার আওয়াজে যে বিক্রম প্রকাশ পাবে তাকে সিংহের গর্জ্জনের সঙ্গে তুলনা অনায়াসে করতে পার। আচ্ছা, আর একটু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর। দেখ ভেলোর দৌড় কতটা। তাতেও অবাক হবে। আচ্ছা, স্পীডের পা কেটে দিলে কি হয়? পাথর তো? আমাদের ভেলোর সেই অবস্থা। অর্থাৎ রেস-হর্সের মতন স্টার্ট নিয়ে এক কদম যেতে না যেতেই, কি মনে হয় কে জানে, হয় তো ভাবে—নাঃ, সামান্য একটা গোরুর পেছনে, এতটা বোধ হয় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল—তখন একেবারে আলিস্যিতে জরজর হয়ে ধীরে গম্ভীরে তোমার দিকে ফিরে আসতে থাকে। তুমি মনিব, যদি তখনও দাঁড়িয়ে থাক, দেখবে, ভেলো কিছুদূর এসে তোমার চোখ-মুখের ভাষা টপ করে পড়ে নেবে। তারপর নির্ব্বিবাদে গোরুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিরাট গর্জ্জন সুরু করবে, আর তোমারই পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে মাটি আঁচড়াবে এবং দু-পা এগোবে তো তিন-পা পেছোবে। যে গোরু তোমার বাগানের বেড়া ভেঙেছিল, সে যখন ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল—তখন দেখ, ভেলোবাবুর আহ্লাদ-পানা ভাব ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সোজা তোমার চোখের দিকে চেয়ে বলতে চাইবে কিছু! কি? বলত বোধ হয়, তা বাবু, দেখলেন তো আমার ক্যাদ্দানিটা। সিকেটা, আধুলিটা এইবার বখশিস্ ঝেড়ে দিন। আর তুমি যে দেবে না, আশ্চর্য্য তাও জানে। কিন্তু তুমি মনিব, তোমার মান বাঁচাবার জন্যে, একটু ভদ্রতা কোরে, এধার ওধার চেয়ে, দেখে, শুনে, এমন ভাব দেখাবে, যেন টপিক্ বদলে এখুনি বলে ফেল্‌বে, আজ বড় গরম পড়েচে।

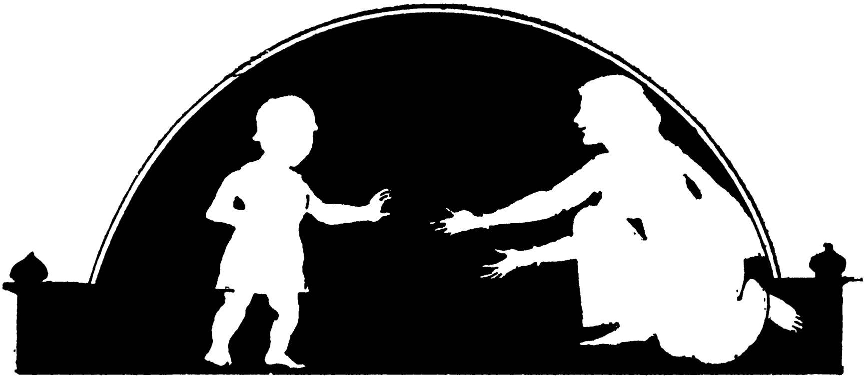
তারপর ধর, একটু কুঁকড়ি শুঁকড়ি হয়ে সবে শুয়েচে। তুমি যদি পরীক্ষা করবার জন্যে আবার হঠাৎ উত্তেজিতভাবে লেলিয়ে দাও, ঠিক সাড়া দেবে। দু-একবার ঘেউ ঘেউ করবে। তারপর যখন দেখবে কিছুই নয়, একটা কেঁউ-কেঁউয়ে আওয়াজ করে উঠবে এবং ল্যাজ নাড়তে নাড়তে নির্ঘাৎ বলে ফেল্‌বে, কি মস্করা করেন বাবু! যদি তৃতীয় বার ডাক, ভেলোবাবুর রীতিমতন রাগ হয়ে যাবে। গলা দিয়ে গরগরে একটা আওয়াজ বেরোবে। শেষে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। তারপর একটা ডন্ কষে নিয়ে এমন একটা ঔদাস্য ও বিরক্তির ভাব দেখাবে, যেন বলচে জ্বালালে দেখচি। একটু পরেই মুখের এমন একটা ইঙ্গিত করবে এবং হঠাৎ সরে পড়বার ভাব দেখাবে যে, মনে হবে যেন বললে, আজ্ঞে, কাওরা পাড়ায় একটু কাজ আছে, সেরে আসি এবং কালবিলম্ব না করেই চলতে সুরু করবে। খানিকটা চলে যাওয়ার পর, হাসিমুখে ফের যদি ডাক, এই ভেলো! তুমি মনিব, উপায় নেই, ভেলো পথের মাঝে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও থমকে দাঁড়াবে, তোমার মুখের দিকে তাকাবে, আর ভাববে, নাঃ বড়ই মুস্কিলে ফেললে দেখচি।

ভেলোকে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন বা ভীতু বলবে যে তার উপায় নেই। গ্রামে যেই কাব্‌লিআলা ঢুকল, ভেলো তৎক্ষণাৎ চিনবে, এটা অভাজন অবাঞ্ছিত লোক। কাজেই তারস্বরে বন্ধুবান্ধবদের ডাকতে থাকবে, গাঁয়ের লোকদের জানান দেবে। ওর কর্ত্তব্য এই পর্য্যন্ত, তাই ক'রেই খালাস। কাবলিআলাকে কামড়ে দেওয়া ওর কাজ নয়। ও শুধু প্রোটেস্ট করে, বিরক্তি জানায়। কিন্তু দেখেচ তো টেনাসিটি—একেবারে ছিনে জোঁক। অবশ্য কাবলি-

আলা লাঠি উঁচালে বা ঢিল ছুঁড়লে অবলীলাক্রমে দৌড় মারে। এতে ওকে ভীতু নাম দেওয়া চলে না। এটা ওর আত্মরক্ষার ছল মাত্র। কি করবে বেচারি, ওর নিজের কি কোন অস্ত্র আছে যে আক্রমণ করবে। পরদেশী হ'লে পর টুঁটি চেপে ধরত হয় তো। এতে বীর্য্য থাকতে পারে কিন্তু বুদ্ধি বা কালচারের লেশমাত্র নেই। কাবুল দেশ থেকে এলেও সে মানুষ—একথা ভেলোর মনে আছে। আর তাও যদি চাও, কুকুর কেন, বাঘ পুষলেই পার। কিন্তু এই ভেলোর সাহায্যে তুমি একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে যাও, দেখবে তার বীরদর্প কতটা।

এখন এই ভেলো যদি আনট্রেণ্ড হয় হোক। তাতে কি-ই বা ক্ষতি। তার হিউম্যানিটিকে জিইয়ে রেখেচে তো। সেটা কম কথা নয়। অবিশ্যি ওর একটা লজ্জাকর দোষ আছে। সারারাত বেচারির চোখে ঘুম নেই। কোথায় একটা পাতা পড়ল, কোথায় কলাপাতার ছায়া দুলচে, কখন শুখন পাতা মাড়িয়ে অন্ধকার বাঁশবনে শেয়াল যাচ্ছে, সব-তাতেই হাউমাউ ক'রে উঠবে। কারুর কাছে বলবার উপায় নেই যে ভেলোর রীতিমত ভূতের ভয় আছে। তা সে যাই হোক, পরদেশীদের সঙ্গে আমাদের ভেলোবাবুর তুলনাই হয় না। যাও দুলে বাগ্দী পাড়ায়। দেখবে, চার-পাঁচটা ন্যাংটা ছেলে ওকে ঘোড়ার মতন চড়চে। মানুষের ভার বইতে পারে কখন। কিন্তু বিরক্তির ভাব দেখেচ? উল্টে কি সহিষ্ণুতা! তা ওর কানই মলুক, একটা ঠ্যাং ধরে টানা-হ্যাঁচড়াই করুক, আর সামনের পা দুটো উঁচু করে মানুষের মতন দু-পা হাঁটাক। বিরক্তি দূরে থাক, মজাই পায় যেন। খুব ত্যক্ত করলে পর, হাত ফসকে সাঁৎ ক'রে একদিকে ছিটকে যাবে এবং ঘাড় কাৎ করে একটু একটু ল্যাজ নাড়তে থাকবে। ভাব দেখলে মনে হবে, আমায় ধর দিকিনি! সত্যিই যদি ধরতে যাও, ফড়িঙের মতন তিড়িং ক'রে এক লাফে একটু দূরে চলে যাবে অর্থাৎ রীতিমতন লুকোচুরি খেলতে চায়! বল, সত্যি কি-না?

যাই বল, ভেলোকে নিয়ে খুব সুন্দর একটা উপন্যাস বা জীবন-চরিত লেখা যায়। কোন্ রসের অভাব ওতে আছে? আচ্ছা, পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের একমাত্র সঙ্গী তো এই ভেলোই ছিল? কোথাকার প্রাণী কোথায় আর কিসের জন্যে প্রাণ দিলে বল তো? বিচার করে দেখ, মানুষ পশু সবাইকার সঙ্গেই মানুষিকতায় পাশবিকতায় আশ্চর্য্যভাবে মিলে মিশে আছে। অথচ ও যে জন্তুর থেকে ওপোরে আর মানুষের থেকে নিচে তা ওর ঔদাস্যের, অবসাদের ঘটায় এবং কথা বলতে না পারায় প্রকাশ হয়েচে। নয় কি? ওর মেশাটা এতই সহজে ঘটেচে যে আমরা লক্ষ্যই করি না, মনেই রাখি না। পুষ, একটা কুকুর পুষ। যা-তা নয়, আসল গেযো-মার্কা একটি ভেলো হোক, কেলো হোক, বাঘা হোক। তখন দেখবে, জন্তু বলতে আমরা যা ভাবি, ভেলো, কেলো, বাঘা কেউই তার মধ্যে পড়ে না। তা চারটে পা, আর ল্যাজ থাকলে কি হবে! বাদুড় যেমন পক্ষী, ভেলোও তেমনি পশু, আর কি। তাই ভাবি, মানুষের পরিকল্পনা ভেলোর জীবন-চরিত থেকে এসেচে কি? তা হলে, ভেলোও একদিন কথা বলবে? ডারুইন সম্ভবত ভেলোকে দেখেনি। তোমার কি মনে হয়?



মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত বড়গঙ্গা শিলালিপি

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পিএইচ-ডি

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে একখানি ইংরেজী ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে (১৯৩৭-৩৮) ১৪-৫৭ পৃষ্ঠায় আসাম পি-ডব্লিউ-ডির শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি-ই মহোদয় একটি বিস্তৃত প্রবন্ধে আসামের নাওগাঙ্গ বা নওগাঁ জেলার কপিলী ও যমুনা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের বর্ণনা প্রদান করেন। ঐ পত্রিকারই প্রথম খণ্ডে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি-সি-সেনগুপ্ত (১৯৩৩, পৃষ্ঠা ১৪-১৫ এবং ১২৪) দেখান যে নওগাঁ জেলায় অদ্যাপি ডবোকা বলিয়া পরিচিত একটি স্থান আছে। সমতট নামক প্রাচীন দেশটি ইতিপূর্ব্বেই শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালির সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গৌহাটী-কেন্দ্র কামরূপদেশও সর্ব্বজনপরিচিত। ডবোকা ঠিক এই কামরূপ ও সমতটের মধ্যে অবস্থিত। অধ্যাপক সেনগুপ্ত তাই জোর করিয়া বলেন যে, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লিপিতে যে সমতট—ডবাক—কামরূপ বলিয়া তিনটি প্রত্যন্ত দেশের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যস্থ ডবাক এবং নওগাঁ জেলার ডবোকা এক ও অভিন্ন হইবারই সম্ভাবনা। রায় বাহাদুর ৺কনকলাল বড়ুয়া তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত কামরূপের প্রাচীন ইতিহাসে এই ডবোকা-ডবাকের অভিন্নত্ব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথও তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে এই অভিন্নত্ব সমর্থন করিয়া ডবোকার নিকটস্থ কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের বর্ণনা প্রদান করেন।

এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নাথ ডবোকার ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষের পরিচয় প্রদান করেন। মন্দিরটি বড়গঙ্গা নামক ক্ষুদ্র তটিনীর পারে অবস্থিত। এই প্রবন্ধ হইতে নিম্নে একাংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"By the south of the Mahamaya Hill flows the river Harkati···To the south of this river, running almost parallel to this, is a small stream known as Badaganga, written as Barkhuga in the map. About $1\frac{1}{2}$ miles to the southwest of the Mahamaya temple, there is a small lake formed in this Badaganga river and on the left bank of the lake, there is a slightly elevated big plot of land, now covered with thick jungles, which contains the ruins of a very big temple. The whole structure 86′ feet long and 30 ft wide, consisted of three parts—the ***manikuta***, built with hard sandstone, and the ***deorighar*** and the ***natmandir*** built with bricks······



মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মের নবাবিষ্কৃত বড়গঙ্গা শিলালিপি (ছাপের উপর কালীদ্বারা স্পষ্টীকৃত)

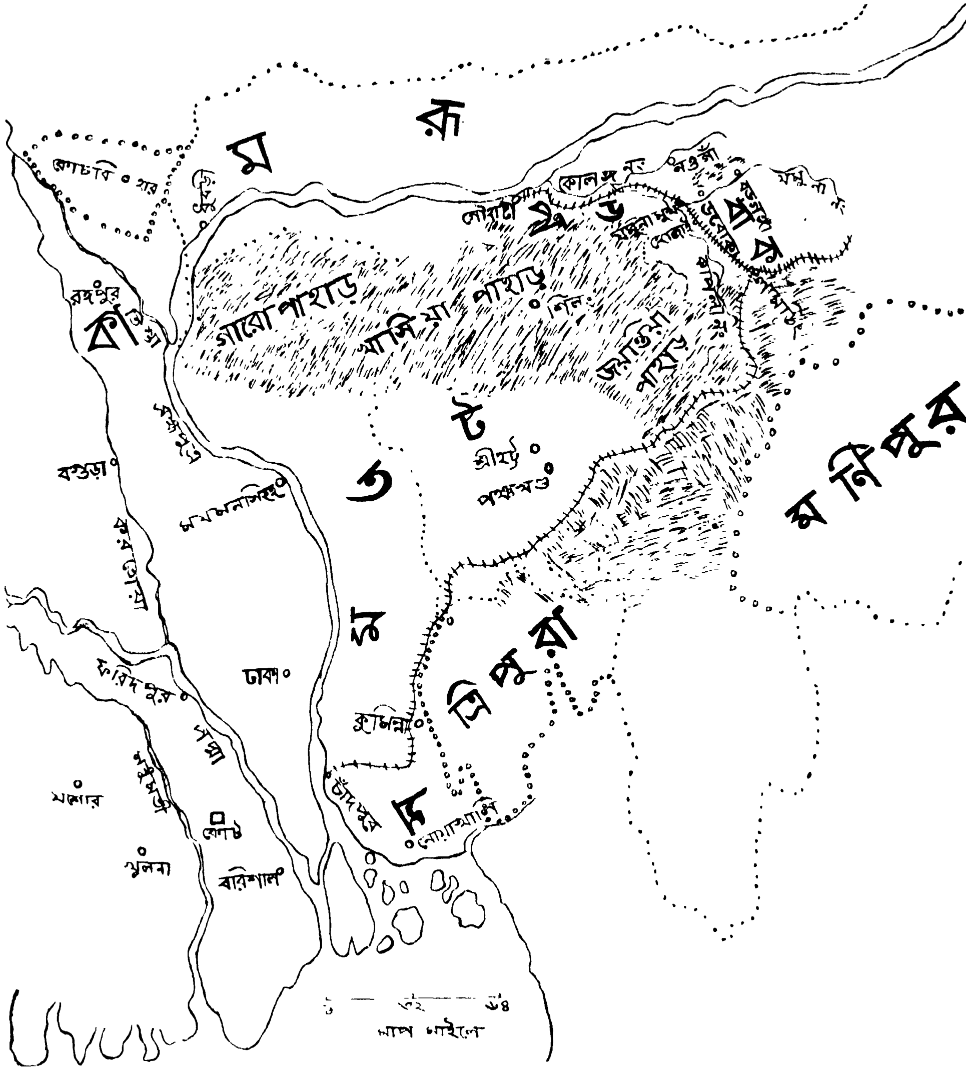
On the bank of the Badaganga stream where the river has abruptly widened into a lake, there are two huge blocks of natural rock standing side by side, with small gap in between. The rocks are about 22 ft long, 12 ft high and 7 ft to 12 ft wide. Each rock has got a *dwarapala* 4 ft high with a spear in his hand, engraved on the rock at the entrance. The left rock has got a figure of Hanuman engraved on it. On the inside face of the left rock and facing the passage, there are 3½ lines of writing in an embossed block, 2′×2′. The writing has been partly damaged by the continued effect of rain, sun and wild fire of the jungle for years together. The figure of the *dwarapala* looks like the figure of an up-country man."

বঙ্গানুবাদ :—"হরকতি নদী মহামায়া পাহাড়ের দক্ষিণদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই নদীর আরও দক্ষিণে সমান্তরালভাবে বড়গঙ্গা নামে (ম্যাপে বরখুগা) একটি ক্ষুদ্র নদী সোজা চলিয়া গিয়াছে। মহামায়ার মন্দির হইতে প্রায় ১½ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বড়গঙ্গা নদীই প্রশস্ত হইয়া একটি ছোট হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে; এই হ্রদের বাম পাড়ে একটি বেশ বড়, জঙ্গলাকীর্ণ, উঁচু জমির মধ্যে একটি বৃহৎ পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই বৃহৎ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৮৬´, প্রস্থে ৩০´ এবং তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ কঠিন বালুকাপ্রস্তরে নির্মিত, ইহাকে মণিকূট বলা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি ইষ্টক নির্মিত, ইহাদিগকে যথাক্রমে দেওড়ীঘর এবং নাটমন্দির বলা হয়। বড়গঙ্গা নদীর পারে, যেখানে সহসা নদীটি প্রস্থে বাড়িয়া একটি হ্রদে পরিণত হইয়াছে, সেইখানে দুইটি বিরাট স্বাভাবিক প্রস্তরখণ্ড মধ্যখানে সামান্য ফাঁক রাখিয়া পাশাপাশি পড়িয়া আছে। এই খণ্ডগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২২ ফুট, উচ্চতায় ১২ ফুট এবং প্রস্থে ৭ হইতে ১২ ফুট। প্রথম শিলার সম্মুখে প্রায় চারি ফুট উচ্চ এক বর্শাধারী দ্বারপালের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। বামদিকের শিলাখণ্ডটির উপর একটি হনুমানের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই বামদিকের শিলাখণ্ডটিরই ভিতরের দিকে, সঙ্কীর্ণ রাস্তার দিকে মুখ করিয়া, ২ ফুট × ২ ফুট স্থান জুড়িয়া ৩½ ছত্র লিপি আছে। বৎসরের পর বৎসরের রৌদ্র-বৃষ্টিতে এবং বনে যে আগুন লাগে তাহার ফলে; লিপিটি অংশতঃ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রস্তরে খোদিত দ্বারপালের মূর্ত্তির চেহারা উত্তরদেশীয় অধিবাসীদের মত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

বিগত ১৯৩৯ সনের জুন মাসে নাথ মহাশয় আমাকে একটি চতুষ্কোণাকার ৩½ লাইনযুক্ত শিলা-লিপির ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। সহজেই চিনিতে পারিলাম যে, ইহাই বড়গঙ্গা-শিলালিপির প্রতিচ্ছবি। ইহাতে গুপ্তযুগের লিপি দেখিয়া নিঃসন্দেহে বুঝিলাম যে, আসাম প্রদেশের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত যত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। আমি তৎক্ষণাৎ নাথমহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলাম যে এই শিলালিপির অক্ষর গুপ্তযুগের এবং ইহাতে জনৈক মহারাজাধিরাজের নাম আছে। ইহার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যের কথা উল্লেখ করিয়া আর একটি ভাল বড় ফোটো এবং কয়েকটি কালির ছাপ পাঠাইতে শ্রীযুক্ত নাথকে লিখিলাম। নাথমহাশয় আমাকে অনতিবিলম্বে কতকগুলি কালির ছাপ পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এইগুলিও ভালভাবে পড়িবার পক্ষে অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। যাহা হউক, ধৈর্য্য ধরিয়া সেইগুলিই পড়িতে বসিলাম। পরিশেষে নির্ণয় করিলাম যে, উহা মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মদেবের ২*৪ গুপ্তাব্দের শিলালিপি। এই গুপ্তাব্দের দশকের ঘরের অস্পষ্ট অক্ষরটিকে লইয়া মহাসমস্যায় পড়িলাম। শেষে সসন্দেহে ইহাকে ৩ বলিয়া পাঠ করিলাম। সুতরাং এই শিলালিপিটি ২৩৪ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৫৫৩—৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হইয়াছিল বলিয়াই অবধারিত হইল। এই পাঠের যথার্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমি সেই শিলালিপির ফটোগ্রাফ, ছাপ এবং আমার পাঠ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে দেখিবার জন্য পাঠাইলাম। তিনি এই শিলালিপির ছাপ পড়িতে পড়িতে আমাকর্ত্তৃক অপঠিত একটি শব্দ পাঠ করিতে পারিয়া আবিষ্কার করিলেন যে মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মদেব অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু ফটোগ্রাফের কতকগুলি অস্পষ্ট অক্ষর কিছুতেই পড়া গেল না। সুতরাং আমি নিজে সেই শিলালিপি দেখিয়া আসিবার জন্য নওগাঁ যাইতে প্রস্তুত হইলাম। রাজমোহনবাবুকে আমার ইচ্ছার কথা জানাইলাম। তিনি সানন্দে আমাকে জানাইলেন যে, 'আমার জন্য সেইস্থানে

যাতায়াতের সমস্তরকম সুবন্দোবস্ত তিনি করিয়া রাখিবেন। অবশেষে ১৯৪০ সনের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ঢাকা হইতে নওগাঁ অভিমুখে রওনা হইলাম। নওগাঁতে যাইয়া শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ সেই হস্তী-ব্যাঘ্রসঙ্কুল আসামের গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়া প্রত্নতত্ত্বচর্চ্চা সম্ভব হইত না। পুরকায়স্থ মহাশয় শুধু যে তাহার মোটরগাড়ীখানি আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি নিজে গাড়ী চালাইয়া



প্রাচীন সমতট, ডবাক ও কামরূপ-রাজ্য

করিলাম। সেইখানকার ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর পুরকায়স্থ মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যব্যতীত আমার আমাকে সেই শিলালিপির অবস্থানের প্রায় ২½ মাইল দূরে—যেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের রাস্তা শেষ হইয়াছে (ডবোকা হইতে ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে) সেই ডকমকা বাংলা পর্য্যন্ত

পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। সেইখান হইতে চন্দ্রশেখরবাবু এবং জিতেন্দ্রবাবুর সহিত ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের একটি বিরাট হাতীতে চড়িয়া সেই শিলালিপির স্থান পর্য্যন্ত আমরা গিয়াছিলাম। সেই স্থানে গিয়া প্রথমে সেই শিলালিপির কয়েকটি ফটো লইলাম। কিন্তু সেই শিলার জীর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত অক্ষরগুলির ছাপ পরিষ্কার উঠিল না। দুইটি প্রকাণ্ড পাথরের মধ্যে সরু পথ; সেই পথের উপর পাথরের গায়ে শিলালিপিটি অবস্থিত। পথের সম্মুখ ভাগ আবার একটি বেশ বড় অশ্বত্থ গাছে ঢাকা। সুতরাং ফটোগ্রাফ নিতে হইলে পথের বাহিরে এক পাশ হইতে নিতে হয়। সম্মুখ হইতে লইবার কোন উপায় ছিল না। তাহা সত্ত্বেও কয়েকটী ফটোগ্রাফ নিলাম, যদিও সেগুলি মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। যাহা হউক, বহু কষ্টে নাথমহাশয়ের পূর্ব্বপ্রদত্ত ফটো ও ছাপের সহায়তায় এবং আমার নিজের সংগৃহীত ফটো ও ছাপের সাহায্যে এই শিলালিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম। এই সঙ্গের মানচিত্রে মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মার রাজ্যের সীমানা এবং বড়গঙ্গা নদীর পারে এই শিলালিপির অবস্থান প্রদর্শিত হইতেছে।

মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মা এবং তাহার পঞ্চম অধস্তন পুরুষ ভাস্করবর্ম্মদেবের নাম বাণভট্টের হর্ষচরিতের প্রদত্ত কামরূপরাজগণের বংশলতায় আছে এবং উহার পাঠকমাত্রই এই নামদ্বয়ের সহিত পরিচিত আছেন। নিধনপুরের তাম্রশাসনেও তাঁহাদের নামের উল্লেখ দেখা যায়। ভাস্করবর্ম্মদেব এই তাম্রশাসনে বিভিন্ন গোত্রের প্রায় ৩০০ ব্রাহ্মণকে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ড পরগণার প্রায় ৫ মাইল × ২$\frac{১}{২}$ মাইল আয়তনের জমি পুনরায় দান করিয়াছিলেন। (J. A. S, B. 1936. p. 419—427) এই তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায়, এই ভূমি ভাস্করবর্ম্মদেবের পঞ্চম ঊর্দ্ধতন পুরুষ ভূতিবর্ম্মদেবই প্রথম দান করিয়া যান। পূর্ব্ব তাম্রশাসন নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ভাস্করবর্ম্মদেব সেই জমিই পুনরায় সীমানির্দ্দেশ করিয়া দান করেন। নওগাঁ জিলায় আবিষ্কৃত বর্ত্তমান শিলালিপি হইতে পূর্ব্ব ভারতের একচ্ছত্র নরপতি মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মার প্রভূত পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। সুরমা এবং কুশিয়ারা উপত্যকায় অর্থাৎ বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জিলা পর্য্যন্তও ভূতিবর্ম্মদেবের রাজত্ব বিস্তার দেখিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের বিশালতা এবং প্রতাপের পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষের বর্ম্মণগণ আদৌ কেবল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিপতি ছিলেন। ডবোকা অর্থাৎ বর্ত্তমান নওগাঁ জিলা যে কামরূপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজ্য ছিল, ইহার দুইটি প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, প্রয়াগের স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে লিপি আছে তাহাতে সমতট, ডবাক এবং কামরূপ নামে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের উল্লেখ আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায় যে এই তিনটি রাজ্য যখন একত্র উল্লিখিত হইয়াছে তখন এই তিনটি সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যসীমানার বাহিরে পাশাপাশি রাজ্যরূপে অবস্থিত ছিল। হিউয়েন্ সাঙ সমতট কামরূপের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের পারে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপির বর্ণনামতে সমতট একটি প্রত্যন্ত রাজ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্যসীমানার বাহিরে স্বাধীন রাজ্য ছিল। সমতট প্রত্যন্ত রাজ্য হইলে নিশ্চয়ই ইহা সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য সীমানা অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল না। এখন সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান ঢাকা জিলার পূর্ব্বাংশ দিয়া যে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ একদা প্রবাহিত হইত, তাহারই পূর্ব্বভাগের ভূখণ্ডের নাম প্রাচীনকালে সমতট ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল অর্থাৎ ২৪পরগণা, যশোহর, খুলনা এবং বাখরগঞ্জ জিলা সমতটের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হিউয়েন্ সাঙ কামরূপ হইতে ১২।১৩ শত লি দক্ষিণে চলিয়া সমতটের সীমা পাইযাছিলেন। এই বিবেচনায় তাঁহারা মাপকাঠির সীমানা সোজা দক্ষিণে না লইয়া, দক্ষিণ পশ্চিমে সরাইয়া এই সমস্ত জিলাগুলি সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিবেচনাকালে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশ সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করিযাছিলেন। সমগ্র উত্তরভারতসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ জয় করিয়া তিনি বঙ্গের দক্ষিণাংশ, প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত গঙ্গাদক্ষিণস্থ ভূভাগ দয়া করিয়া অজিত রাখিয়াছিলেন, এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। সুতরাং এই সমস্ত জিলাগুলি কিছুতেই সমতট নামক প্রত্যন্তরাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

ত্রিপুরা জিলার বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত নারায়ণ মূর্ত্তির নিম্নে যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে যে

বিলকিন্দ অর্থাৎ বাঘাউড়ার নিকটস্থ বর্ত্তমান বিলকেন্দুয়াই গ্রাম সমতটে অবস্থিত (E. I. XVII P. 255)। ইহা দৈর্ঘ্যে নিশ্চয়ই ২৫০ মাইলের কম নহে। কারণ সমগ্র বেষ্টনীর পরিমাপ ৬০০ মাইল। সমতট রাজ্যের পরিমাপ



লিপি শিলা—(লিপিস্থান শ্বেত রেখাদ্বারা বেষ্টিত)

এই গ্রাম ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় সুপরিচিত বিদ্যাকূট গ্রামের অদূরে অবস্থিত। সুতরাং এই গ্রাম যদি সমতটে অবস্থিত হয়, তবে সহজেই বুঝা যায় যে সমুদ্রের উত্তরস্থ এবং লৌহিত্য অথবা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বস্থ এবং ত্রিপুরা ও কাছাড়ের পর্ব্বতসমূহের পশ্চিমস্থ ভূভাগই সমতট। হিউয়েন্ সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন যে সমগ্র সমতট রাজ্যের বেষ্টনীর পরিমাপ প্রায় ৩০০০ লি অর্থাৎ প্রায় ৬০০ মাইল, চৈনিক পরিব্রাজক প্রদত্ত পরিমাপ যদি মোটামুটিও ঠিক হইয়া থাকে, তবে আমরা অনায়াসেই সমতটের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি। পাঠকগণ মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ত্রিপুরা পর্ব্বতমালা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্ত্তী যে ভূভাগ, তাহা কোন স্থানেই ৩০।৪০ মাইলের অধিক প্রশস্ত নহে। সুতরাং সমতট রাজ্য যদি প্রস্থে ৩০।৪০ মাইল হয়, তবে যদি নোয়াখালীর সমুদ্রোপকূল হইতে ২৫০ মাইল উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয়, তবে নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে যে ইহা গারো, খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে সমতটের উত্তর সীমা গারো, খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে কাছাড় ও ত্রিপুরার পর্ব্বত এবং পশ্চিমে মহানদ ব্রহ্মপুত্র। সুতরাং প্রাচীন সমতট রাজ্য বর্ত্তমান শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি জিলা—ময়মনসিংহ জিলার পূর্ব্বভাগ এবং ঢাকা জিলার পূর্ব্ব সীমান্তে কিঞ্চিদংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। এই ভূভাগের পরিধি সত্য সত্যই প্রায় ৬০০ শত মাইল।*

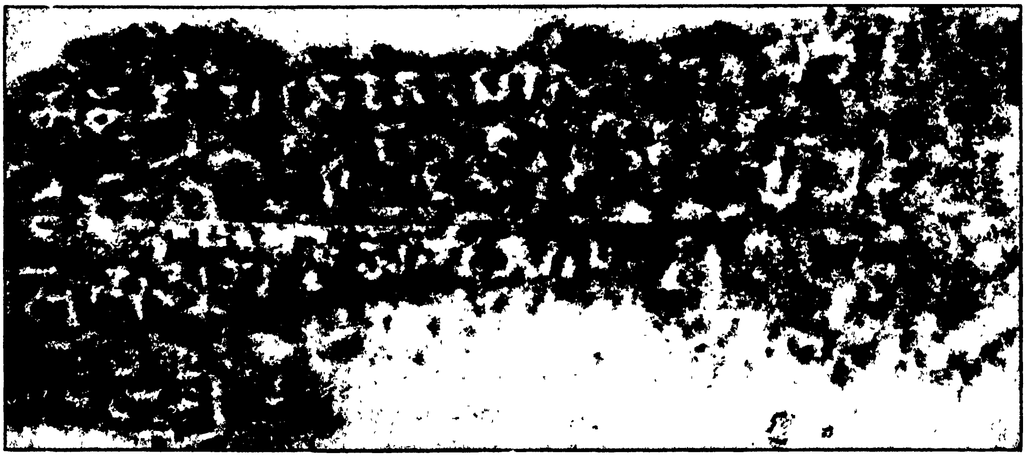
* ত্রিপুরা জিলায় মেহার নামক বিখ্যাত গ্রামে প্রাপ্ত একখানা সম্প্রতি-প্রাপ্ত তাম্রশাসনে মেহার গ্রামটি সমতট মণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন অদ্যাপি অপ্রকাশিত। শুনিলাম, ডক্টর বড়ুয়া ইহার সম্পাদন করিয়াছেন। ডক্টর বড়ুয়ার প্রবন্ধ বাহির হইলে এই বিষয়ে বিস্তৃত জানা যাইবে।

সমতট রাজ্যের সীমা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। এখন অতি সহজেই আমরা সমতটের উত্তরভাগস্থিত পর্ব্বতমালার অপরদিকে কাপিলী, যমুনা ও কোলঙ্ উপত্যকায়, বর্ত্তমান নওগাঁ জিলায়, প্রাচীন ডবাক রাজ্যের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারি। এই ডবাকের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের পরে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত। পৌরাণিক যুগ হইতেই কামরূপের পশ্চিম সীমা করতোয়া নদী। কালিকা-পুরাণে ও যোগিনী-তন্ত্রেও করতোয়া নদীই কামরূপের পশ্চিম সীমা বলিয়া পরিষ্কার নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরাতন চৈনিক সাহিত্যেও ক-লো-তু অর্থাৎ করতোয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং কামরূপের মধ্যবর্ত্তী সীমা বলিয়া উল্লিখিত। (Watter's Yuan Chwang: vol. II. p 186)। পূর্ব্বদিকে কামরূপ চীনদেশের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু সঠিক রেখা টানিয়া এই সীমা নির্দ্দেশ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। ডবাক এবং কামরূপের মধ্যবর্ত্তী সীমাও সুনির্দ্দিষ্ট নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যসীমানায় সমতট, ডবাক, কামরূপ এই তিনটি রাজ্যের উল্লেখে বুঝা যায়, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে (EI. XXI. pp. 3) এই রাজ্যত্রয় পৃথক পৃথক রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। এই রাজ্যত্রয়ের নৃপতিগণ—"সর্ব্বকরদান-আজ্ঞাকরণ-প্রণাম-আগমন" দ্বারা সম্রাটের পরিতোষ বিধান করিতেন। ডবাকের পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যবিধ কিঞ্চিৎ প্রমাণও আছে। ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে কপিলীর রাজা চন্দ্রপ্রিয় বা চন্দ্রগুপ্ত চীনদেশে এক দৌত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কপিলীর রাজধানী একটি নদীর পূর্ব্বে এক হ্রদের তীরে ধূম্ররক্তিম বর্ণের পর্ব্বতে বেষ্টিত একটি নগর বলিয়া চৈনিক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। (J. R. A. S. 1898, p. 540)।

৺কনকলাল বড়ুয়া মহোদয় তাহার "কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই কপিলী রাজ্য এবং কপিলী উপত্যকায় অবস্থিত ডবাক রাজ্যকে এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, যদিও রাজ্যের নাম না করিয়া চীনগ্রন্থকার রাজ্যস্থ নদীর নামে দেশটাকে কেন পরিচিত করিলেন বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ডবোকা সত্যই কপিলী নদীর পূর্ব্বধারে অবস্থিত এবং ইহা প্রকৃতই চতুর্দ্দিকে ঘন রক্তবর্ণ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানের দক্ষিণে কাছাড়ের পাহাড়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বত; উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্বে মহামায়া ও মিকির পর্ব্বত এবং পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত সমভূমি।

প্রবন্ধারম্ভে রাজমোহনবাবুর যে প্রবন্ধটি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, সেই প্রবন্ধেই রাজমোহনবাবু ডবোকার অদূরে অবস্থিত জুগীজান নামক স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের এক বর্ণনা দিয়াছেন। এই স্থানটি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের লামডিং-গোহাটী অংশের হোজাই এবং যমুনামুখ ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে, রেললাইনের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান হইতে ডবোকা ৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে।



মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মার আবিষ্কৃত বড়গঙ্গা শিলালিপি (যথাযথ ও অসংস্কৃত)

এই বর্ণনার সহিত চৈনিক সাহিত্যের কপিলী রাজ্যের রাজধানীর বর্ণনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। শ্রীযুক্ত নাথের প্রবন্ধ হইতে এই স্থানটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"At a distance of about six miles from either Yamunamukh or Hojai Railway stations, at a distance of about a mile from the Assam Bengal Railway line, opposite mile 400, lie the ruins of the Jugijan temples. The stream Jugijan has a peculiarity. It is very narrow on the up-stream side and on the down stream side, but at the particular place where the shrines stand, it is about 150′ wide and about a mile long. It is fordable in other places, but here it is very deep. On the north bank of this lake, about half a furlong off, there are three little mounds, each about 300 feet apart. Each contains the ruins of a stone temple···These three temples serve as the gateway to the main shrines, which are situated at a distance of about a quarter-mile from them. Here there are ruins of two huge temples···

About half-a-furlong to the north of the shrine is a big area, bounded on all sides by high earthen walls. There is also a big tank inside, now reduced to a quagmire. This is locally known as the Rajbadi (royal palace). (J. A. R. S. Vol V, 1937-38. P, 30)

To a cursory observer who travels in the interior of Hojai, it will easily appear that this area was once really thickly populated and highly civilized. Wherever you go, you notice huge tanks, some of them having *pucca* ghats with stone and brick works (Do. p. 31)···

All about the place, there are innumerable big tanks and hundreds of ruins of old stone structures (Do, p. 51)···It is no exaggeration to state that in the Hajai area in the Yamuna valley, wherever you cast your eyes, you come upon some old ruins. It is here only that ruins of hundreds of old stone temples and images···have been found. (Do. p. 52). In the beginning of the Nineteenth century, the Burmese entered Nowgong···they pillaged all the surrounding country and committed appalling atrocities on the helpless inhabitants···The depopulation of the region round Doboka and the Kapili valley dates from these disastrous times. The final dose was given by the horrifying kala-azar epidemic, during which people died quietly in thousands. So, what was once a thickly populated area and a highly civilized country, relapsed mostly into thick forests (Do. p. 16—17).

"(অনুবাদ) আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের হোজাই এবং যমুনামুখ ষ্টেশন হইতে সমান (প্রায় ৬ মাইল) দূরে, রেল-লাইন হইতে মাইল-খানেক পশ্চিমে, ৪০০ অঙ্কিত মাইল পাথরের ঠিক বিপরীত দিকে, জুগীজান নামক স্থানে, অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। জুগীজানের নদীটির একটি বিশেষত্ব আছে। নদীটি উজানে এবং নিম্নাংশে প্রায় সমান সঙ্কীর্ণ, কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষ-সমূহের নিকটবর্ত্তী প্রায় এক মাইল স্থানে ইহা প্রায় ১৫০ ফিট প্রশস্ত (এবং হ্রদের আকৃতি)। অন্য স্থানে এই নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, কিন্তু এই হ্রদাকৃতি স্থানে ইহা অত্যন্ত গভীর। এই হ্রদের উত্তর পারে প্রায় ১১০ গজ দূরে তিনটি ছোট ছোট ধ্বংসস্তূপ আছে। একটি অপরটি হইতে প্রায় ১০০ গজ দূরে। প্রত্যেকটিই একটি প্রস্তরময় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মূল মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ এই স্থান হইতে প্রায় ¼ মাইল দূরে এবং এই তিনটি ধ্বংসাবশেষ যেন উহাদের প্রবেশদ্বার স্থানীয়। মূল ধ্বংসাবশেষগুলি দুইটি প্রকাণ্ডকায় মন্দিরের। এই মূল-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতেও প্রায় ১২০ গজ উত্তরে প্রকাণ্ড একটি স্থান চারিদিকে উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার বেষ্টিত। মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দীঘিও আছে। উহা বর্ত্তমানে শুষ্কপ্রায় ও কর্দ্দম পরিপূর্ণ। অদ্যাপি এই স্থান রাজবাড়ী বলিয়া পরিচিত। (Journal of the Assam Research Society. Vol V, Page 30.) নিতান্ত অসতর্ক পরিদর্শনকারীও যদি হোজাই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া আসেন, তবুও তিনি বুঝিতে পারিবেন যে এই অঞ্চল এক সময় বহু সভ্য ও সমৃদ্ধিশালী জনপূর্ণ স্থান ছিল। যেদিকেই যাওয়া যায়, বড় বড় দীঘি পুষ্করিণী নজরে পড়ে, উহাদের ঘাটগুলি ইষ্টকে ও প্রস্তরে বাঁধা।

(ঐ, ৩১ পৃষ্ঠা)। সমস্ত স্থানটি বৃহদায়তন জলাশয় সমাকীর্ণ এবং শত শত প্রস্তরময় আয়তনের ধ্বংসাবশেষ যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। (ঐ—৫১ পৃষ্ঠা)। ইহা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে হোজাই অঞ্চলে যমুনা নদীর উপত্যকায় যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেদিকেই প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নয়নগোচর হয়। শুধু এই স্থানেই শত শত প্রস্তরময় মন্দির ও মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। (ঐ, পৃষ্ঠা ৫২)—উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য আসাম আক্রমণ করে এবং নওগাঁ জেলাতে প্রবেশ করে। তাহারা সমস্ত দেশ লুটপাট করিয়া ছারখার করে এবং অসহায় অধিবাসীগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। কপিলী নদীর উপত্যকা এবং ডবোকা অঞ্চল এই সময় হইতেই জনশূন্য হইতে আরম্ভ করে। ইহার পরে কালাজ্বরের মড়কে হাজার হাজার লোক মারা যায়। এইরূপে বহু জনাকীর্ণ সভ্য জনপদ একেবারে জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া দাঁড়ায়।” (ঐ—১৬—১৭ পৃঃ)। *

উপরে উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইবে যে চৈনিক সাহিত্যে কপিলী দেশের যে বর্ণনা আছে—সেই দেশের রাজা ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—তাহার সহিত কপিলী নদীর পূর্ব্বে ও ডবোকোর অদূর পশ্চিমে অবস্থিত জুগীজান নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা বেশ মিলিয়া যায়। ইহাই প্রাচীন ডবাক রাজ্য এবং এই রাজ্যের রাজা চন্দ্রপ্রিয় বা চন্দ্ররক্ষিত বা চন্দ্রগুপ্তই চীন দেশে ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অবধারণ নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। সম্ভবতঃ এই রাজ্য আরও কিছুদিন স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিয়া পৃথক রাজ্যরূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। পরে কামরূপের বর্ম্মণগণ শক্তিশালী হইয়া কামরূপ ও ডবাক এক রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া ফেলেন।

হর্ষচরিতে কামরূপের বর্ম্মণগণের বংশমালা ভূতিবর্ম্মা হইতে আরব্ধ। ভূতিবর্ম্মা ভাস্করবর্ম্মার ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। এই শ্রেণীর বংশানুকীর্ত্তনে সাধারণতঃ তিন পুরুষের বেশী নাম করিতে দেখা যায় না। পঞ্চম পুরুষ অর্থাৎ ভূতিবর্ম্মা হইতে বংশাবলি কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে দেখিয়া অনুমান হয়, ভূতিবর্ম্মা হইতেই এই বংশ প্রবল হইতে আরম্ভ করে। শ্রীহট্ট জেলা যে ভূতিবর্ম্মার সময়ে কামরূপ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর শাসন তাহার অকাট্য প্রমাণ। এই তাম্রশাসনের সম্পূর্ণ পাঠ ৺পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের “কামরূপ শাসনাবলি” নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এই তাম্রশাসনে দেখা যায় যে শ্রীহট্ট জেলায় পঞ্চখণ্ড পরগণায় উদ্যোগী পুরুষসিংহ ভূতিবর্ম্মা বিভিন্ন গোত্রের প্রায় তিন শতাধিক ব্রাহ্মণ উপনিবিষ্ট করাইয়া এই প্রত্যন্ত প্রদেশে আর্য্য-কর্ষণাধারা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই তাম্র-শাসন নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ভূতিবর্ম্মার পাঁচ পুরুষ পরে হর্ষবর্দ্ধনের বন্ধু ভাস্করবর্ম্মা এই তাম্রশাসন নূতন করিয়া প্রদান করেন এবং ভূতিবর্ম্মার এই নবাবিষ্কৃত বড়গঙ্গা শিলালিপিতে যখন দেখিতে পাই যে ভূতিবর্ম্মার বিষয়ামাত্য আর্য্যগুণ ডবোকার প্রায় ১৪ মাইল পশ্চিমোত্তরে মহামায়া পাহাড়ের সন্নিকটে ২৩৪ গুপ্তাব্দে (=৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তখনি আমাদের বোধগম্য হয় যে উদ্যোগী বীর ভূতিবর্ম্মা গুপ্তবংশের পতনের সুযোগে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক কামরূপ, ডবাক ও সমতট মিলাইয়া পূর্ব্বভারতে প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া নিজেকে মহারাজাধি-রাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

নিম্নে এই শিলালিপির পাঠ ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

১। স্বস্তি শ্রীপরমদৈবত-পরমভাগবত-মহারাজা-

২। ধিরাজাশ্বমেধযাজিন্ শ্রীভূতিবর্ম্মণ্য পাদানাং সং

৩। ২০০ ৩০ ৪ মা বিষয়ামাত্য আর্য্যগুণস্য

৪। ইদং আশ্রমং ॥

(অনুবাদ।) মঙ্গল হউক। পরমদেবভক্ত পরম বিষ্ণুভক্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারী মহারাজাধিরাজ শ্রীভূতিবর্ম্মপাদের সংবৎ ২৩৪, মা (ঘ মাস); বিষয়ামাত্য আর্য্যগুণের এই আশ্রম (প্রতিষ্ঠিত হইল)।

পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে মন্তব্য

পাঠোদ্ধারের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে খুঁটিনাটি পাঠকসাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে না অনুমান করিয়া এই স্থানে মোটামোটি

* একই প্রবন্ধের বিবিধ স্থান হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ পর্য্যায়ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া উপরের উদ্ধারণ গঠিত হইল।

কথা মাত্র লিপিবদ্ধ করিব। পাঠোদ্ধারের বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক বিচার যাঁহারা অনুধাবন করিতে চাহেন, তাঁহারা Epigraphia Indica পত্রিকায় অনতিবিলম্বে প্রকাশিতব্য আমার এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত প্রবন্ধ অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

১। যে স্থানে "ভূতিবর্ম্মণ্যপাদানাং" পাঠ করিয়াছি, তথায় "ভূতিবর্ম্মদেব পাদানাং" পাঠ করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার নিকট যে ছাপগুলি আছে, তাহা হইতে "বর্ম্মণ্য" ভিন্ন অন্য পাঠ করা যায় না।

২। বিষয়ামাত্যের নাম "আর্য্যগুণ" না হইয়া "আদ্য গুণ"ও হইতে পারে।

৩। রাজার নাম, তারিখ এবং অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার কথা শিলালিপিতে সুস্পষ্ট আছে। কাজেই এই মূল্যবান তথ্যগুলি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

৪। তারিখের শতকে ২০০ এবং এককে ৪ অতি স্পষ্ট। মধ্যের অঙ্কটি ৩০ ভিন্ন অন্য কিছু পড়া সম্ভব নহে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দের জল বৃষ্টিতে শিলালিপির নিজস্ব বামাংশ অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তারিখটি দক্ষিণাংশে অবস্থিত এবং সমস্ত ছাপেই স্পষ্ট উঠিয়াছে।

৫। শিলালিপির যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল, তাহা ঠিক 'বৈজ্ঞানিক' প্রতিলিপি নহে। আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাপটিতে অক্ষর বাঁচাইয়া মধ্যবর্ত্তী এব্ড়ো খেব্ড়ো অংশগুলিতে কালী দিয়া লেপিয়া মূল লিপিটিকে যথাসম্ভব স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় মূল অক্ষরগুলিতে যাহাতে কোন রকমে হাত না পড়ে, সেইদিকে যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখা গিয়াছে। সঙ্গে অস্পৃষ্ট অস্পষ্ট ছাপও একখানা তুলনার সুবিধার জন্য মুদ্রিত হইল। শেষের ছাপখানি শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ প্রদত্ত।

ভূতিবর্ম্মার সময় নির্ণয়

এই নবাবিষ্কৃত শিলালিপির তারিখ ঠিক পড়া হইল কিনা, তাহা পরখ করিবার উপায় আছে। তাহার পূর্ব্বে ভূতিবর্ম্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কামরূপের বর্ম্মরাজগণের বংশতালিকা অনুধাবন করা আবশ্যক :—

ভূতি বর্ম্মা = মহারাণী বিজ্ঞানবতী
|
চন্দ্রমুখ বর্ম্মা = „ ভোগবতী
|
স্থিত বর্ম্মা = „ নয়ন শোভা
|
সুস্থিত বর্ম্মা = „ শ্যামা দেবী
|
ভাস্কর বর্ম্মা = ?

(আনুমানিক ৫৯০ খ্রীঃ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ)

সকলেই জানেন, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সহিত কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মের মিত্রতা ছিল। শ্রীযুক্ত সি-ভি-বৈদ্য মহাশয় তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত "মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে (Ed. 1921, Pp. 43) ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুনকে হর্ষের জন্মদিন বলিয়া জ্যোতিষিক গণনায় অবধারণ করিয়াছেন। "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" প্রণেতা সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরও গণনা করিয়া আমার নিকট লিখিত এক পত্রে এই গণনা সমর্থন করিয়াছেন। ভাস্কর হর্ষের সমসাময়িক এবং প্রায় সমবয়সী ছিলেন। ৫৯০ খ্রীঃ এ অথবা দুই এক বছর আগেপাছে তাঁহারও জন্ম হইয়াছিল। এখন হিসাবের সুবিধার জন্য যদি ধরি, কুমারগণ সকলেই পিতার ২৫ বৎসর বয়সের সন্তান, তবে ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুস্থিতের বয়স ২৫ এবং তাঁহার জন্ম সন ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই স্থিতের জন্ম ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে, চন্দ্রমুখের জন্ম ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভূতির জন্ম ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়া থাকিলে ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ২০০ গুপ্তাব্দে তিনি রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন। নূতন শিলালিপির শতকের অঙ্ক অতি স্পষ্ট ২০০। কাজেই অনুমানলব্ধ রাজত্বারম্ভ কাল এবং নব-শিলালিপিতে পঠিত অঙ্ক বেশ মিলিয়া যাইতেছে। এককের ঘরে ৪ অঙ্কটিও সুস্পষ্ট। এই যুগের ১০ এবং ২০ সংখ্যার অঙ্ক অতি নির্দ্দিষ্টরূপ, তাহাদের সহিত আমাদের নূতন শিলালিপির দশকের অঙ্ক মিলে না। অনেক বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে উহা ৩০ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। এইরূপে এই নূতন শিলালিপির তারিখ —২৩৪ গুপ্তাব্দ = ৫৫৪

শিলালিপির স্থান

এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে সামান্য একটু বিবৃতি মাত্র দরকার।

আমি যখন জানুয়ারী ১৯৪০ সনে এই স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন বড়গঙ্গা ৫।৬ গজ প্রশস্ত শৈবালসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পাহাড়ীয়া নদী মাত্র। লিপিশিলার স্থানে এই জলধারা একটু প্রশস্ত হইয়া একটি কুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে, ঐ স্থানের পাশ কিঞ্চিৎ বেশী। ইহাই শ্রীযুক্ত নাথ বর্ণিত হ্রদ। লিপিশিলার উপর একটি যুদ্ধরত নারীমূর্ত্তি, বর্শা চালাইয়া একটি হাটু গাড়িয়া প্রতিপ্রহারে উদ্যত পুরুষ-মূর্ত্তিকে (অসুর ?) লক্ষ্য করিতেছেন। এই শিলার চিত্র প্রদত্ত হইল এবং তাহাতে দুই শিলার অভ্যন্তরের পথের প্রবেশ দ্বারা ও লিপির সংস্থান প্রদর্শিত হইল।*

* এই প্রবন্ধে ইংরেজী হইতে অনুবাদ ইত্যাদি কার্য্যে স্নেহভাজনা পুত্রবধূ শ্রীমতী কল্যাণী দেবী এবং তদীয় দেবর শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ ভট্টশালীর নিকট হইতে বহুবিধ সাহায্য লাভ করিয়াছি।

যদি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

এ পথেতে আবার যদি
আস্‌তে আমায় হয়,
যে গৃহেতে ছিলাম—দিও
সেই গৃহে আশ্রয়।
যেথায় জেনেছিলাম আমি
তুমিই কর্ত্তা গৃহস্বামী,
তোমা ভিন্ন করতে হয় না
অন্য কারও ভয়।

২

সেই যে পুণ্যবতী মাতার
পুত্র যেন হই,
জগন্মাতা হেসে যাঁহার
সঙ্গে পাতান সই।
পূর্ণ ভবন পরিজনে
পবিত্র সব দেহে মনে,
কড়ির কথা কমই—শুধু,
হরির কথা কয়।

৩

বিশুদ্ধ যে অন্তঃপুরের
রূপ কি গৃহশ্রীর,
নিত্য সেথা আনাগোনা
সীতা সাবিত্রীর।
অন্ন নয় সে মহাপ্রসাদ,
পেতান তাতে কি সুধাস্বাদ,
শুন্য সাথে পুণ্যে হ'ত
পুষ্ট এ হৃদয়।

৪

যেথা অভাব অনটনের
বেদন ছিল কম,
হরিণ শিশুর ঢুঁ-এর মত
লাগতো মনোরম।
'ভক্তমালে'র ভক্তগণে
দেখতে পেতাম যে অঙ্গনে,
দৈন্য মাঝে রইতো ঢাকা
বিপুল অভ্যুদয়।

৫

সেইখানেতে ছড়িয়ে গেছি
অনুরাগের ফাগ,
হয়ত আজও তরুলতায়
মিলায়নিক দাগ।
মেঠো গানে হয় ত মিঠে
পাব চেনা রঙের ছিটে
স্নিগ্ধ-জনে জন্মান্তরের
মিল্‌বে পরিচয়।

৬

অভিষিক্ত আশীর্ব্বাদে
ভবন সে মধুর,
স্বর্গ থেকে সে গৃহদ্বার
নয়কো বেশী দূর।
সুখ যেথানে কি সংযত,
দুঃখ যেথায় তপস্যা ত,
আকাঙ্খিত জীবন মরণ
দুই অমৃতময়।

যুদ্ধ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

সাজি-ধামাটা দাওয়ায় রাখিয়া রায় মহাশয় ডাকিলেন: শানু—ও শানু—

একটি সাত-আট বছরের ছেলে বাড়ীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল।

রায় মশায় বলিলেন: মাকে ডাক্ তো শানু, সাজিটা ঘরে তুলে রাখুক।

বাহির হইতেই শানু গলা বাড়াইয়া ডাকিল: ওমা, শিগ্‌গির এসো। বাবা কত সব পূজার জিনিষ এনেছে, দেখে যাও।

মুখের কথা শেষ না করিয়াই শানু সাজিটার পাশে উপুড় হইয়া বসিল।

—বাঃ, কেমন বাহারে তরমুজটা। আচ্ছা বাবা, ভিতরে খুব লাল হবে তো। খুব লাল না হলে আবার দাদা খেতে ভালবাসে না। না মা?

মা ততক্ষণ দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রবাসী পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহার মুখ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। বলিলেন: হাঁ, দাদা তোদের সংসারের কত সামিগ্রি খেতে আসছে।

রায় মশায় মুখ তুলিয়া বলিলেন: এবার সতু নিশ্চয় আসবে। এই ছাখ না চিঠি।

যে তিন পয়সার পোস্টকার্ডখানি প্রবাসী পুত্রের বাড়ী আসিবার শুভ সংবাদটি বহন করিয়া আনিয়াছে, তিন দিন যাবৎ রায় মশায় যক্ষের মত তাহাকে বুকে বুকে রাখিয়াছেন। এ-পাড়া ও-পাড়ায় কতজনকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন:

> প্রণতি অন্তে নিবেদন এই—বাবা, আট দিনের ছুটি পাইয়াছি। আমষষ্ঠির দিন দুপুরের ট্রেনে বাড়ী পৌঁছিব। আপনার ষ্টেশনে আসিবার প্রয়োজন নাই। আমি রাণুকে ষ্টেশনে থাকিতে চিঠি লিখিয়াছি।

রাণু ভট্‌চায-বাড়ীর ছেলে। সতুর ছোট বেলার বন্ধু। জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রে বৃদ্ধ পিতার কষ্ট হইবে বলিয়া সতু আগেই রাণুর নিকট চিঠি দিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছে। সে-ই ষ্টেশনে থাকিবে।

চিঠিখানা সযত্নে পকেটে রাখিয়া রায় মশায় বলিলেন: কলার ফানাটা বের কর্ তো শানু। তোর দাদার আবার সব্‌রি কলা না হলে মুখেই উঠবে না।

সাজির ভিতর হইতে একফানা বড় বড় মর্তমান কলা তুলিয়া শানু সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল: দেখছ মা, কেমন বড় বড় কলা। সেই যে সেবার দাদা কিনে এনেছিল দিকনগরের হাট থেকে, একেবারে সেই রকম।

কলার ফানাটা হাতে লইয়া মা বলিলেন: এ কলা কিন্তু তোমরা খেও না শানু, এ তোমার দাদার। হাঁ গো, ওদের জন্যে মালভোগ কলা এনেছ তো?

রায় মশায় জবাব দিলেন: হ্যাঁ। একফানা এনেছি ঘটের জন্যে, আর ছয়টা এনেছি নৈবেদ্যের জন্য।

সাজি হইতে বাহির করিয়া শানু কলা গুণিতে আরম্ভ করিল: এক, দুই, তিন—

মা বাধা দিলেন: থাক। তোমাকে আবার সব ছড়াতে হবে না বাড়ীময়। এখন যাও তো, দাদার টেবিলটা ভাল করে গুছিয়ে রাখো গে।

অভিমানভরা গলায় শানু বলিল: বা রে, সে তো কোন্ ভোরে গুছিয়ে রেখেছি আমাতে আর দিদিতে মিলে।

রায় মশায় শুধাইলেন: ছাদের ওপর থেকে চায়ের সেই ভাল কাপ-ডিস কটা বের করেছ তো? ছেলের আবার চা খাওয়াটি চাই সায়েব-সুবোর মত।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন: আর তো কোন সময় কিছু মুখেই দেয় না। ওই চায়ের সময়টাই যা-কিছু খায়। তোমাদের কেমন, অষ্টপহর তামাকের নলটি চাই-ই।

রায় মশায়ও হাসিয়া বলিলেন: আহা, রাগ করছ কেন তুমি? আমিও তো তাই বলছি, চায়ের ব্যবস্থাটা ভাল করে ঠিক করে রাখো। এই নাও চা। খুঁজে খুঁজে ভাল চা নিয়ে এলাম। এই চা ইস্কুলের হেড মাষ্টার মশায় খান কি-না, তিনিই বলে দিলেন।

চায়ের প্যাকেটটা শানুর হাতে দিয়া মা সাজিটা লইয়া ভিতরে পা বাড়াইলেন।

শানু বলিল: আমিও কিন্তু চা খাব মা দাদার সঙ্গে।

বাবা বলিলেন: আগে দাদার মত পাশ কর, তারপর খাবি চা।

শানু তবু আব্দার ধরিল: না মা, আমি চা খাব।

মা বলিলেন: দাদা যদি বলে, তা হলে খেও, কেমন?

ইহার উপর কোন কথা চলে না। শানু ঘাড় নাড়িয়া বলিল: আচ্ছা।

একটি ক্রন্দনরত শিশুকে কোলে লইয়া একটি কিশোরী প্রবেশ করিল। চঞ্চলতা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

মা বলিলেন: রতন কাঁদছে কেন রে পিতি?

প্রতিমার কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল: কাঁদবে না! বাবাঃ, কি কাছারিই যে তোমরা জমিয়েছ এখানে। ওদিকে ক্ষীর-সাঁচ সব নষ্ট হয়ে গেল, সে খেয়াল কি কারু আছে?

সতু ক্ষীর-সাঁচ বড় ভালবাসে। তাই না মা এত আয়োজন করিয়াছেন। গয়ার বড় পাথর বাটি ভরিয়া ক্ষীর পাতিয়া রাখিয়াছেন। সাঁচের জন্য নূতন করিয়া দুধ উনুনে চড়াইয়া এখানে আসিয়াছেন। সেই দুধ বুঝি পুড়িয়া গেল। আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল: কি করছিলি তোরা দুজন তা হলে?

প্রতিমা চড়া গলায়ই জবাব দিল: কি আবার করব আমরা। আমি তো তোমাদের কাঁদুনে গোপাল নিয়েই অস্থির। কি করবে দিদি একলা?

মা বলিলেন: তা ওই বা এত কাঁদছে কেন আজ? ওকে কি একটু দুধও খাওয়াতে পারিস নাই কড়াই থেকে নিয়ে?

এ প্রশ্নের জবাবে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। প্রতিমার চাঞ্চল্য ও কণ্ঠঝঙ্কারের অর্থ আবিষ্কৃত হইল।

প্রতিমা জবাব দিল অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে: আমি তো বললামই—দাও না দিদি একহাতা দুধ, রতনকে খাইয়ে দি। তা কিছুতেই দিদি দিল না। বলল—আজ কেউ দুধ খেতে পাবে না।

রায় মশায় বিস্মিত হইয়া শুধাইলেন: কেন? আজ কেউ দুধ খেতে পাবে না কেন?

মা বুদ্ধিমতী। বড় মেয়ের মনোভাব তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। বলিলেন: সতুর জন্যে ক্ষীর-সাঁচ হবে তাই আমি বলেছিলাম, আজ আর কারু দুধ খেয়ে কাজ নাই।

রায় মশায় অল্পেই চটিয়া যান। বলিয়া উঠিলেন: তাই বলে ওই কচি ছেলেটাও খাবে না দুধ?

মা বলিলেন: আমি কি আর তাই বলেছি। সিমিরও যেন বুদ্ধি দিন দিন বাড়ছে। যত বয়স হচ্ছে, ততই আক্কেল কমছে। আমি ভাল মনে বললাম, আর তাই বলে কচি ছেলেটার মুখে এক চামচে দুধ দিল না—

প্রতিমা মাঝখানে কথা পাড়িল: আমিও তো তাই—

মা ধমক দিয়া উঠিলেন: থাক্, তোমাকে আর সাক্ষী দিতে হবে না। এতবড় ধিঙ্গি মেয়ে হ'ল, কুটোগাছটা ভেঙে দুখানা করবার নাম নাই।

প্রতিমা অভিমানে ফোঁস করিয়া উঠিল: বেশ তো, আমি তো কিছু করিই না তোমাদের সংসারে, করবও না।

রতনকে ধপ্ করিয়া মাটিতে বসাইয়া দিয়া প্রতিমা তড়িৎচরণে চলিয়া গেল। রতনের কান্না সপ্তমে চড়িল। মা তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াইলেন।

সীমন্তিনী তখন একমনে দুধ জ্বাল দিতেছিল।

মা বলিলেন: এ তোর কেমন আক্কেল সিমি। দাদা আসবে বলে তোর তো দুদিন ধরে কাজের শেষ নাই। তাই বলে ছেলেটাকেও কি এমন করে রাখতে হয়।

সীমান্তিনী বলিল: কি হয়েছে মা?

—এত বেলা হয়ে গেল, ছেলেটার মুখে এক চামচে দুধ দিতে পারলি না?

সীমন্তিনী বুঝিল এ প্রতিমার কাণ্ড; বলিল: এই তো দুধ, সবাই যদি খেয়েই ফেলে তবে আর সাঁচ হবে কি দিয়ে?

—তাই বলে দুধের ছেলেটাকে উপোসী রেখে আমার ছেলের জন্যে পারণ সাজাতে হবে! না বাপু, বুঝি না তোমাদের এসব ব্যাভার। দুদিন এসেছ, ভালভাবে থাক, দুটি ভালমন্দ খাও, তা নয়—

অপেক্ষাকৃত দরিদ্রঘরে সীমন্তিনীর বিবাহ হইয়াছে। সে হীনতাবোধ-সংস্কার অনুক্ষণ তাহাকে পীড়া দেয়। তাই

মায়ের একথা তাহার অন্তরে বড় বিষম হইয়াই বাজিল। সেও ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল: আমরা কি তোমাদের এখানে শুধু খেতেই আসি মা? বাড়ীতে কি নুনভাতও আমাদের জোটে না যে, কথায় কথায় খাবার কথাই বল—

অভিমানে সীমন্তিনীর দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। আগুনের আভায় উজ্জল মুখখানি শান্তমেঘ অপরাহ্নের আকাশের মত করুণ হইয়া উঠিল।

মাও ব্যথা পাইলেন। বলিলেন: এই ছাখ, আমি বা কি বললাম, আর ওই বা কি বুঝল। নে বাপু, আমারই ঘাট হয়েছে, তোদের যা খুশী তাই কর্। ওলো ও পিতি, এদিকে একবার আয় তো মা। রতনকে একটু নে। আমরা দুজনে সাঁচগুলো বানিয়ে ফেলি। এদিকে পূজার সময় তো হয়ে এল। সতুও আসবে সাত তেতে মেতে। ওরে শানু, ডাবটা বালতিতে ডুবিয়ে রাখ্ তো—

প্রতিমা আসিয়া রতনকে লইয়া গেল। সীমন্তিনী বাঁ হাতের আঁচলে চোখ মুছিয়া দুধে কাটি দিতে বসিল। শানু ডাবটা মাথায় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরের বালতিতে ভিজাইয়া রাখিল।

বাহির বাড়ী হইতে রায় মশায় ডাকিলেন: ওরে শানু, থালইটা নিয়ে আমার সঙ্গে আয় তো। ও পাড়ায় তিনুটুর কাছে পয়সা দিয়েছিলাম, ফরিদপুর থেকে কিছু বড় মাছটাছ যদি আনতে পারে। একবার দেখে আসি তার কি হল।

খালই হাতে শানু তিন লাফে বাহির হইয়া আসিল: কি মাছ আনতে দিয়েছ বাবা, ইল্‌সে তো? তা না হ'লে কিন্তু দাদা খাবে না।

বাবা হাসিয়া বলিলেন: দেখি, কি মাছ এনেছে। বলেছিলাম তো ভাল দেখে একটা ইলসেই যেন আনে।

কথা বলিতে বলিতে পিতাপুত্র জঙ্গলের ওপাশে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বড় ছেলে সত্যপ্রসন্ন কলিকাতায় চাকুরী করে। সংবাদ-পত্র অফিসের সাব-এডিটর। প্রায় দুই বৎসর হইয়া গেল, সে বাড়ী আসে না। ছোট ভাইয়ের হিজিবিজি লেখা, বোনের প্রার্থনা, মায়ের অনুরোধ-অনুযোগ, বাবার নির্দেশ—সব ব্যর্থ হইয়াছে। প্রায় দুই বৎসর সত্যপ্রসন্ন বাড়ী আসে না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দুইটি কারণকেই নানা ভাষায় সাজাইয়া কৈফিয়ৎ দেয়। কখনো লেখে: কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না, তাই এ সময় বাড়ী যাওয়া অসম্ভব। না হয় তো লেখে: সেন মশায়ের দেনার টাকাটা এ মাসে না দিলেই নয়, তাই বাড়ী যাওয়া আপাতত বন্ধ রহিল।

পিতা স্থবির, অসহায়। অতি বেদনায় হইলেও সংসারের বোঝা ছেলের ঘাড়ে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাই চুপ করিয়া থাকেন। আকাশের দিকে চোখ মেলিয়া নিরুপায়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। প্রবাসী-পুত্রের শত অসুবিধা-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া মায়ের চোখে নীরবে জল ঝরে। ছোট ভাই-বোন দুটির বহু প্রতীক্ষার স্বপ্ন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। সত্যপ্রসন্ন প্রায় দুই বছর বাড়ী আসে না।

আজ আমষষ্ঠি! সত্যপ্রসন্নর ছোটবেলার প্রিয় উৎসব। ভোর সকালে উঠে সাত বছরের সতু এক আঁটি লাল সুতো দিয়ে বাঁধা দূর্বা ও সকলের সেরা আমটি লইয়া মায়ের সঙ্গে পুকুর-ঘাটে যাইত। দূর্বা-আঁটি জলে ভিজাইয়া সকলের গায়ে জল ছিটাইত আর মন্ত্রের মত আওড়াইত:

ষাট্ ষষ্টি—ষাট্, আপদ-বালাই দূরে যাক্। তারপর সারা দুপুর, সারা দিন তাই নিয়ে হৈ-হুল্লোড়!

আজ সেই আমষষ্টির দিনে যুবক সত্যপ্রসন্ন বাড়ী আসিতেছে। মায়ের মনে বারবারই সাত বছরের সতুর ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। কেমন দুরন্ত, কেমন সুন্দর!

উঠানে বটের ডাল পুঁতিয়া, ছোট্ট পুকুর কাটিয়া, নৈবেদ্য সাজাইয়া পূজা যথারীতি হইয়া গেল। পুরুত ঠাকুর মশায় সকলকে আশীর্বাদ লইতে ডাকিলেন। ছোট-বড় সকলে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইল।

প্রতিমা আশীর্বাদী ফুল-পাতা কানে গুঁজিয়া আবার হাত বাড়াইল: দাদার আশীর্বাদী দিন ঠাকুর মশায়।

ঠাকুর মশায় চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কার জন্য—সতুর?

মা ওপাশ হইতে উত্তর দিলেন: আজ আমার সতু বাড়ী আসবে কি-না, তাই।

—বেশ, বেশ। এই নাও, নির্মাল্য তাকে দিও মা। আর সন্ধের পর যেন আমাদের বাড়ী একবার যায়। প্রসাদ পেয়ে আসবে। আহা, বড় ভাল ছেলে আমাদের সতু।

মা পুনরায় ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি লইলেন।

ঠাকুর মশায় চলিয়া গেলেন। পূজারী, এয়োস্ত্রীরা ছেলেমেয়ে লইয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল। বেলাও গড়াইয়া চলিল। কিন্তু সত্যপ্রসন্ন আসিয়া পৌছিল না।

পূজার নৈবেদ্য লইয়া মা বসিয়া আছেন। প্রতিমা ও শানুকে প্রসাদ লইতে বলিয়াছিলেন, তাহারা দাদার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

রতনকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া সীমন্তিনী বলিল: গাড়ী তো সেই একটায় আসে, না মা?

মা কাতর চোখ তুলিয়া বলিলেন: উনি তো তাই বললেন। ওগো, সতু তো এখনো এল না, তুমি কি এগিয়ে একটু দেখবে?

রায় মশায় দাওয়ায় বসিয়া নল টানিতেছিলেন। জবাব দিলেন: আমিও তো তাই ভাবছি। আজকাল যে রকম মোটর চলে এ রাস্তায়, এতক্ষণ তো সতুর আসাই উচিত।

তামাকে আরো কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন: আচ্ছা, আমি একটু দেখেই আসছি বড় রাস্তাটা। সীমু, আমার ছাতি আর চাদরটা দে তো মা।

সীমন্তিনী ছাতি-চাদর আনিয়া দিল: পূজার পরে খালি মুখে যাবে বাবা, নৈবেদ্যের একটু সন্দেশ দিয়ে একগ্লাস জল খেয়ে যাও।

বাবা ম্লান হাসিয়া বলিলেন: যার জন্যে সন্দেশ এনেছি মা, সেই এল না ঘরে, আমি খাব সন্দেশ। বরং শানু আর পিতিকে ডেকে প্রসাদ দাও। আমি এখনি আসছি। কজনে আজ একসঙ্গে বসেই খাব।

বাবা বাহির হইয়া গেলেন। মা ও মেয়ে সেই খর-রৌদ্রের দিকে ব্যথাতুর চোখে চাহিয়া রহিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে আকাশের রঙও বদলাইয়া গেল। রৌদ্রদীপ্ত শাণিত ছুরির মত ঝকঝকে আকাশ কাজল চোখের মত মেঘসজল হইয়া উঠিল।

এ-পাড়া ও-পাড়ায় পূজা দেখিয়া শানু ও প্রতিমা ফিরিয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে আজ আর ওদের মন টিকিতেছে না।

দাদাটা যেন কি, বিকেল হইয়া গেল এখনো আসিল না। প্রশ্নে প্রশ্নে শানু মা ও দিদিকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর কোথাও পাইল না।

আকাশ ভাঙিয়া বর্ষা নামিল। ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া রায় মশায় দাওয়ায় উঠিলেন। নাঃ, এদিনেও সতুর আসা হ'ল না। ছুদিন ধরে আমার মনটাই যেন ডেকে বলছিল, সে আসবে না।

সীমন্তিনী একখানা গামছা আনিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু দাদা যে চিঠি লিখেছে—

—চিঠি তো লিখেছে, কিন্তু এল তো না। এই তো বুড়ো মানুষ, রোদে পুড়ে জলে ভিজে এলাম এতটা পথ হেঁটে, কোন্ লাভ হল?

দীর্ঘ তিনটি দিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। তাই আহত আশার বেদনায় পিতৃ-হৃদয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে।

মা পূজার জিনিষপত্র আগলাইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের ভিতর হইতেই বলিলেন: তা নিয়ে রাগারাগি করেই বা কোন্ লাভ হবে? বেলা তো গেছে। এখন হাতমুখ ধুয়ে কিছু মুখে দাও—

খাবার কথায় রায় মশায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন: তোমরা তো চিরদিন আমার খাওয়াটাই দেখলে। ছেলের ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে পায়ের উপর পা তুলিয়ে পিণ্ডি গিলবার কপাল আমার, তা না হলে—

উর্ধ্বতন কর্মচারীর অপরাধের জন্য কবে তাঁহার চাকুরিটি গিয়াছিল, রায় মশায় হয় তো সেই বহুবার-বলা কাহিনীটিরই পুনরুল্লেখ করিতেন; কিন্তু ব্যথার আবেগে তাঁহার গলা আটকাইয়া গেল। তিনি বাঁ হাতে চোখ মুছিলেন।

মা দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন: পূজাগণ্ডার দিনে আজ আর অমন করে চোখের জল ফেলো না। আমারি ঘাট হয়েছে—

—না, তোমার ঘাট কি, সব দোষ আমার কপালের। তা না হলে আমারি বা এ দশা হবে কেন, আর তোমার ছেলেই বা সারা বছর বিদেশে পড়ে থাকবে কেন? দিন নাই, রাত নাই, অষ্টপহর হাড়ভাঙা খাটনি। কিসে কি হয়েছে, তাই বা কে জানে, নইলে চিঠি দিয়ে—

পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় মায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিল। দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন: ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ও অমঙ্গলের কথা মুখে এনো না। মানুষের খারাপ হতে বেশি ক্ষণ লাগে না—

বলিতে বলিতেই মা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দীর্ঘ সময়ের অবরুদ্ধ ব্যথা-বন্যা দুকুল ছাপাইয়া বহিয়া চলিল।

প্রতিমা ও শানু স্তব্ধ হইয়া একপাশে বসিয়াছিল। মায়ের কান্না দেখিয়া শানুও 'মাগো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সীমন্তিনী আসিয়া তাহাকে কেবল তুলিয়া লইল: লক্ষ্মীদাদা, কাঁদে না।

শানু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল: মা কাঁদে যে।

মা হাত বাড়াইয়া শানুকে কোলে লইলেন। বলিলেন: না বাবা, আমি আর কাঁদব না, তুমি চুপ করো লক্ষ্মীটি।

—তা হলে দাদা আসবে তো?

—হ্যাঁ বাবা, দাদা আসবে।

—কখন আসবে মা?

উদ্গত অশ্রু চাপিয়া মা বলিলেন: বৃষ্টি থামলেই আসবে। আজ রাতে কি কাল সকালে তো নিশ্চয়।

হঠাৎ কি কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি রায় মশায়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন: হ্যাঁগা, এও তো হতে পারে যে শহরের ওদিকে আগেই বৃষ্টি হয়েছে খুব। তাই সতু শহরে এসে আটকা পড়েছে। মোটর আসছে না জলের জন্যে।

—হতেই তো পারে। নতুন আশায় রায় মহাশয়ের ভাঙা মন নাচিয়া উঠিল যেন। তিনি বলিলেন: তাও তো বটে। বটে কেন, নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। দেখছ না, মেঘটা শহরের দিক থেকেই আসছে। নিশ্চয়ই ওদিকে খুব বৃষ্টি হয়েছে দুপুরের দিকে।

তারপর আপনমনেই বলিলেন: আহা রে, এত পথ এসে এখন বাড়ীর দরজায় আটক হয়ে আছে রে!

মায়ের কোল হইতে নামিয়া শানু ধীরে ধীরে বাবার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। শুধাইল: দাদা তা হলে আসবে তো বাবা?

শানুকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিয়া রায় মশায় বলিলেন: নিশ্চয় আসবে বাবা; এই তো এলো বলে।

বাইরে কার গলা শোনা গেল: রায় মশায় বাড়ী আছেন—রায় মশায়?

—কে?

—আজ্ঞে আমি সতীশ পিওন। আপনার চিঠি আছে রায় মশায়।

চিঠি! অজ্ঞাত আশঙ্কায় সকলেই চমকিয়া উঠিল। রায় মহাশয় বলিলেন: এদিকে এসো বাবা, আমি ভিতরেই আছি।

অতি-পরিচিত ভাঙা ছাতাটা মাথায় চড়াইয়া সতীশ পিওন হাজির হইল; এই নিন। বোধ করি ছোটবাবুর চিঠিই হবে।

রায় মশায় হাত বাড়াইয়া চিঠি নিলেন। চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন: সতুর চিঠিই বটে।

সীমন্তিনী জিজ্ঞাসা করিল: কি লিখেছে বাবা?

রায় মশায়ের হাত কাঁপিতেছে। কোন রকমে খামখানি ছিঁড়িয়া পকেটে হাত দিলেন, ওই যাঃ, চশমা তো রয়েছে কোটের পকেটে।

সীমন্তিনী বলিল: আমি এনে দিচ্ছি বাবা।

রায় মশায়ের আর বিলম্ব সহিতেছে না। ভাঙা গলায় তিনি বলিলেন: না, থাক। তুমিই পড়তো বাবা সতীশ, কি লিখেছে সতু। একটু জোরে পড়।

চিঠির ভাজ খুলিয়া সতীশ পিওন পড়িতে লাগিল:

> শ্রীচরণেষু, প্রণতি অন্তে নিবেদন এই বাবা, অকস্মাৎ ইউরোপে যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। তাই আপিস হইতে ছুটি বাতিল হইয়া গেল। সুতরাং এ সময় বাড়ী যাওয়া হইল না। আপনার ও মায়ের শরীর ···

চিঠির বাকী কথাগুলি রায় মশায়ের কানে গেল না। তাঁহার কান ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পুত্রের প্রত্যাগমনের শেষ আশাটুকুও এবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। আপন-মনেই তিনি বলিলেন: সত্যি তা হলে সতু এবারও এলো না।

চিঠিখানি ফিরাইয়া দিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল: যুদ্ধ কি তা হলে সত্যি ভালভাবে বাধল রায় মশায়?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রায় মশায় জবাব দিলেন: হুঁ।

বৈষ্ণব-কবিতা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
পূর্ব্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান—
অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন
বৃন্দাবন গাথা এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারিচক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে.—একি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন—"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?" পূর্ব্বরাগে, অভিসারে, মিলনে, মানে, বিরহে —এই যে হরিচন্দন-গন্ধামোদিত ব্রজ-প্রবাহিনীর অমৃতধারা, ইহা কি দীন মর্ত্তবাসীর তপ্ত-প্রেমতৃষ্ণা মিটাইবে না ?

কবি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

এ গীত-উৎসব মাঝে—
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে।

সামান্ত দুইটী ছত্রের মধ্যে বৈষ্ণব-কবিতার সম্বন্ধে এমন সত্যকথা এত মধুর করিয়া বুঝি-বা আর কেহ কখনও বলে নাই। বৈষ্ণব-কবিতা গানের উৎসবই বটে এবং এ উৎসব ভক্ত ও ভগবানের মিলনোৎসব! বৈষ্ণব-কবির দিব্যানুভূতি আমাদিগকে এই আশ্বাসই দিয়াছে যে, মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন ঘটিতে পারে। মানুষ এই মাটীর মর্ত্তে এই জীবনেই ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারে।

কবি বলিয়াছেন—

এ গীত উৎসব মাঝে—
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে ;
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটী তান, দূর হ'তে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে, শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা, মধুময় হ'য়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটী ছুটে
মোদের কুটীরপ্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে, সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে বহি নিজ মৌন ভালবাসা
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজভাষা
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেম জ্যোতি,
তোমার কি তার বন্ধু তাহে কার ক্ষতি ?"

ক্ষতি তো নাই-ই, বরং লাভই আছে। এই প্রেমের আলোকে যদি কেহ সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করে, এই প্রেমের আলোকে যদি কাহারও জগতকে দেখিবার সৌভাগ্য হয়, এই প্রেমের দিব্যানুভূতিতে যদি কেহ দেশকে, জাতিকে, সমাজকে ভালবাসিতে পারে, তাঁহার জীবন ধন্য হইবে, দেশ পবিত্র হইবে, জননী কৃতার্থা হইবেন। বৈষ্ণব-কবিতার সুরে সত্যই ধরণী মধুরা হইয়া উঠে, বনপথ-বাহিনী তরঙ্গিণী মধুময়ী হয়। কুটীরপ্রান্তে প্রস্ফুটিত কদম্ব মধু বর্ষণ করে; "মধুবাতা ঋতায়তে"! কিন্তু সে সুর শুনিবার সৌভাগ্য কয়জনের হয় ?

কবি অনুযোগ করিয়াছেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে
বিজন বসন্ত রাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহু ডোরে
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি ! এত প্রেম কথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা

চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে ! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে ! তারি নারী হৃদয় সঞ্চিত
তার ভাষা হ'তে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন !

কবির এই অনুযোগ সম্বন্ধে আমাদের কিছু নিবেদন করিবার আছে। প্রথমত সমস্ত বৈষ্ণব-কবিই রমণী-নয়ন দেখিয়াই রাধিকার অশ্রু-আঁখি কল্পনা করেন নাই। বিজন বসন্তরাতে মিলনশয্যায় প্রেয়সীর বাহুবন্ধনে বন্দী হইয়াই যে বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজপ্রেমের অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, এমন কথাও বলা চলে না। সুতরাং কোন নারীর হৃদয়-সঞ্চিত ভাষা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার কথাও উঠিতে পারে না।

যে কয়জন কবি প্রাকৃত-কান্তা প্রেমের মধ্য দিয়া এই অপ্রাকৃত-উজ্জ্বল প্রেমের দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব আপনাদের কবিতার মধ্যে আপন আপন মানসী-প্রতিমা চিন্তামণি ও পদ্মাবতীর নাম সগৌরবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দেশ-প্রচলিত নানা আখ্যান উপাখ্যানেও সে কথা স্বীকৃত হইয়াছে। আর চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রেমের কবিতার মধ্যে কবিহৃদয়ের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই চিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া দেশবাসী এক বিচিত্র আলেখ্য রচনা করিযাছে। সে চিত্র শশ-লাঞ্ছিত সারদ-রাকার মতই শান্ত, মধুর ও মনোহারী! সেই চিত্রের পার্শ্বে রজকিনী রামী ও মহারাণী লছিমাকে আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কবিদের কবিতা পাঠ করিয়া জাতি তাঁহাদের যে জীবনচরিত রচনা করিয়াছিল, কিম্বদন্তীর সহস্র-রসনা আজিও তাহাকে নীরব হইতে দেয় নাই। বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিতার সঙ্গে চিন্তামণি, পদ্মাবতী, রামমণি ও লছিমার নাম অমর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইঁহাদের সম্বন্ধে চুরি ও বঞ্চনার কোন প্রশ্নই নাই।

অতঃপর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণের কথা। বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিগণ যাঁহার করুণা-ছলছল সজল-আঁখির দর্পণে রাধিকার অশ্রুআঁখির স্মরণ নয়—একেবারে সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালার প্রেম-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব। বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে ধূলিমলিন পল্লীপথে অগণিত দীন মর্ত্তবাসীকে যিনি আপনার বাহুডোরে বন্দী করিয়াছিলেন তিনি বাঙ্গালীর অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীমহাপ্রভু। যিনি আপনার হৃদয়ের অগাধ প্রেম-সাগরের চলোর্ম্মি-ভঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ডুবাইয়াছিলেন, ভাসাইয়াছিলেন, যাঁহার হৃদয়-সঞ্চিত ভাষায় অজস্র বৈষ্ণব-কবিতা রচিত হইয়াছে, তিনি দীনের দেবতা শ্রীগৌরচন্দ্র। সে সঙ্গীত হইতে আজিও কেহ তাঁহাকে বঞ্চিত করে নাই। সে সঙ্গীতে আজিও তাঁহারই পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বৈষ্ণব-কবি তাঁহাকেই বন্দনা করিয়া তাঁহারই হেমছবি প্রাণপটে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এই অপরূপ প্রেমের কবিতা রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিতায় "গৌরচন্দ্র" গান এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে গান মধুর এবং সুন্দর!

প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং সে আজ সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্রজভূমি নবদ্বীপে। বাঙ্গালী সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। বাঙ্গালী দেখিয়াছিল—নয়নে দরবিগলিত করুণাধারা, মুখে ভুবন-মঙ্গল ভগবন্নাম, হেমগৌরতনু ধূলিধূসরিত, বিশ্ববাসীর জন্য আলিঙ্গনোদ্যত প্রসারিত বাহু, হৃদয়ে অগাধ প্রেম, অপার প্রীতি—মানবের দুয়ারে এক অপূর্ব্ব অতিথি! "রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতার" জীবন্ত মূর্ত্তি! প্রাণময় বিগ্রহ! রাধা-প্রেম মাত্র প্রিয়-দয়িতের প্রতি প্রেয়সীর ভালবাসা নহে। রাধা-প্রেম জগতের সমস্ত প্রেমের অনন্ত অক্ষয় উৎস, জাগতিক সমস্ত প্রেমের আদর্শ। মানুষ কেবল পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণের কথাই জানিত, শাস্ত্র এই তিনটী ঋণ পরিশোধের জন্যই মানুষকে উপদেশ দিত। কিন্তু যাহা হইতে মানুষের উদ্ভব, যাহাতে স্থিতি এবং যাহাতে বিলয়—সেই আনন্দের কথা, প্রেম-ঋণের কথা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল। "রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি!" নিজে আনন্দিত হও, জগতকে আনন্দদান কর, আনন্দের হেতু হও, আনন্দের আধার হও, তোমার আনন্দে ভগবান আনন্দিত হউন, এমনই করিয়াই আনন্দের ঋণ পরিশোধ কর। সৃষ্টির আদি হইতে একাল পর্য্যন্ত মানুষকে এ কথা কেহ বলে নাই। মহাপ্রভু আসিয়াই প্রথম সে কথা বলিলেন—আনন্দের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। জগত হইতে ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব গ্লানি দূর করিতে হইবে।

মানুষকে—জগতকে ভালবাসিতে হইবে। তিনি পৃথিবীর কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, বিশ্বের ঋণভার মাথায় তুলিয়া লইয়া আনন্দের ঋণ—"রাধাঋণ" পরিশোধ করিলেন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ না হইলে মানুষ রাধা-প্রেমের অর্থ বুঝিতে পারিত না। জাতীয়-জীবনে রাধা-প্রেমের সার্থকতা উপলব্ধ হইত না। রাধা-ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় কোন উপায় থাকিত না।

মলয়ের মধুর আন্দোলন যেমন বসন্তের বনভূমিকে অপূর্ব্ব কুসুমশ্রীতে মণ্ডিত করে, বিহগকণ্ঠকে সঙ্গীত-মুখর করে, তেমনই মহাপ্রভুর আবির্ভাব বাঙ্গালাকে এক অভিনব রূপ দান করিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালা—রূপে রংএ গানে গন্ধে এক পরিপূর্ণ শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিল। এক মহিমাময় সৌন্দর্য্যের অমৃতায়মান মাধুর্য্যলোকে বাঙ্গালী নবজন্ম লাভ করিল। বাঙ্গালায় এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইল। সে-দিন যে সমস্ত পুণ্যস্মৃতি ভগবৎ-প্রেমিক পিক্ পাপিয়ার মধুর কণ্ঠে মহাপ্রভুর বন্দনাগান ধ্বনিত হইয়াছিল, বৃন্দাবন-গাথা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারাই বৈষ্ণব-কবি, তাঁহাদের কবিতাই বৈষ্ণব-কবিতা। বৈষ্ণব-কবিতা যেমন সাধক হৃদয়াবেগের তীব্র প্রগাঢ় এবং প্রসারিত বাঙ্ময়রূপ, তেমনই কবি-মানসের সুগভীর অধ্যাত্ম দৃষ্টির সঙ্গে বিচিত্র মানব মনোবৃত্তির মিলিত লীলাবিলাস!

বৈষ্ণব-কবিতার আরও কয়েকটী দিক্ আছে। বৈষ্ণব-কবিতার সুরে প্রেয়সী যদি আপনার ভাষা খুঁজিয়া পান, যদি তাঁহার মুখে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি ফুটিয়া উঠে, তিনি আমার বাম বাহু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আপনার মৌন ভালবাসা আমাকে নিবেদন করিতে পারেন, তাহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু সেই ভাষা ও জ্যোতির মধ্য দিয়া যদি অখিল-প্রেমস্বরূপের পরিপূর্ণ অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই ভাষা ও জ্যোতির আকুলতা ও আবেগ আমাদিগকে সাগরসঙ্গমের যাত্রাপথের সন্ধান দিতে পারে, তবেই না বৈষ্ণব-কবিতার সার্থকতা। কারণ যাহা অল্প, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা আত্মেন্দ্রিয়-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার স্বার্থপরতায় ক্লিন্ন, তাহা পরম প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে না।

কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণ-স্মৃতি-সারম্
সরস-বসন্ত-সময়-বন বর্ণন-মনুগত-মদনবিকারম ॥

"হরিচরণ-স্মৃতিসারং" ইহাই বৈষ্ণব-কবিতার একতম রহস্য।

বৈষ্ণব-কবিতার আর একটী দিক্ "পরকীয়াভাব"। বৈষ্ণব-কবিতার মর্ম্মগত এই দ্বিতীয় রহস্যটীকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং এই কবিতার সুরে ধরার সঙ্গিনীর মুখে যেমন ভাষা এবং যেমন জ্যোতিই ফুটিয়া উঠুক, বৈষ্ণব-কবিতার সুরকে তাহা প্রকৃত রূপ দিতে পারিবে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥"

প্রশ্ন করিলেও রবীন্দ্রনাথও সেই একই কথাই বলিয়াছেন—"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার সুন্দর একটি সিদ্ধান্ত আছে। পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রভু বলিতেন—

যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র।
হেরি পদ্মলোচন সফল হইল জীবন
জুড়াইল তনু মন নেত্র ॥

কুরুক্ষেত্রের মিলন শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায়। কৃষ্ণহীন বৃন্দাবন শ্রীহীন, ম্লান। স্থাবর জঙ্গমের একই দশা। এমন সময় একদিন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বলদেব সনাথ পরাক্রান্ত যদুবীরগণ, জননী দেবকী এবং মহিষী রুক্মিণী আদি পুরনারীগণ; আবার অন্যদিকে সাক্ষাৎ-প্রার্থনায় সমাগত কুরু, ভোজ, মৎস্য পাঞ্চাল প্রভৃতি অগণিত রাজন্যবৃন্দ! তাঁহাদের সঙ্গেও পুররমণীগণ এবং মর্য্যাদার অনুরূপ সৈন্যবাহিনী। সুবিস্তীর্ণ স্যমন্তপঞ্চকে যেন তিলধারণের স্থান নাই। সংবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছে। হৃদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্য যূথ-পরিবৃতা শ্রীমতী রাধিকা, প্রাণ কানাইকে দেখিবার জন্য শ্রীদামাদি রাখালগণ এবং নয়নপুত্তলি ননীচোরকে দেখিবার জন্য গোপরাজ নন্দ ও জননী যশোমতী ব্রজের গোপ-গোপীসহ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথায়—বৃন্দাবনের সেই নয়নানন্দ! "ইহ রাজবেশ হাতী

ঘোড়া মনুষ্য গহন" এই গহনের মাঝে এই রাজবেশ—এখানে তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তৃপ্তি হইল না। শ্রীমতীর মনে পড়িয়া গেল আনন্দের শত স্মৃতি-বিজড়িত যমুনার কাল জল —আর তাঁরই তীরে পুষ্পিত নিকুঞ্জ বন নীপতরুতল। রাখালগণের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল—উন্মুক্ত আকাশ-তলে প্রকৃতির সেই আনন্দ কানন, দিগন্ত বিস্তৃত শ্যাম শষ্প-ক্ষেত্র, গোষ্ঠভূমি! আর জননী যশোমতীর অশ্রুসিক্ত আঁখি খুঁজিতে লাগিল ব্রজভূমির সেই নিরালা নিকেতনের কক্ষ-কুট্টিম। সেই কৃষ্ণ, সেই সাক্ষাৎ, সেই মিলন! কিন্তু দর্শনে সে তৃপ্তি কই, মিলনে সে আনন্দ কই! দেখা হইল, কিন্তু সে দেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত? মাধুর্য্যের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত অমৃতপ্রবাহ—প্রকৃতির আনন্দনির্ঝর গিরিবক্ষ বহিয়া বনপথ ধরিয়া স্বচ্ছন্দ ধারায় যে অবাধ মুক্তগতিতে ছুটিয়া যায়, কৃত্রিম উদ্যানের মণিমণ্ডিত অববাহিকায় তাহার সে আবেগ, সে উচ্ছ্বাস, সে লীলায়িত ভঙ্গিমার স্থান কোথায়? তাইতো মহাপ্রভু বলিতেন—

রথে দেখি জগন্নাথ　　সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে আমি আইনু কুরুক্ষেত্র

তাই তো শ্রীরাধিকাও বলিয়াছিলেন—

প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত—
তথাহং সা রাধা তদিদ মুভয়ো সঙ্গম সুখম।
তথাপ্যন্তঃ খেলন মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

অতএব বলিতে হয় "বৈষ্ণবের গান শুধু বৈকুণ্ঠের তরে" নয়, ইহা বৈকুণ্ঠেরই গান! ভক্ত বলেন—বৈষ্ণব-কবিতা বৃন্দাবনের বস্তু, বৃন্দাবনের সম্পদ। সে বস্তুর আস্বাদ লইতে হইলে, সে সম্পদ উপভোগ করিতে হইলে হৃদয়কে বৃন্দাবনে রূপান্তরিত করিতে হইবে। প্রাণের মধ্যে রস-ভাবকে অবতারিত করিতে হইবে। মনকে গোপী-অনুগামী করিতে হইবে। কারণ—

"ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস?"

এবং ভক্ত বলেন—

"মনে বনে এককরি মানি।"

একজন আধুনিক সমালোচক সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের অনুসরণ না করিয়াও ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছেন। চণ্ডীদাস-নান্নুরে বীরভূম-জেলা-সাহিত্য-সম্মেলনে বিগত অধিবেশনের মূল সভাপতি স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পী-এইচডি, মহাশয় তাঁহার অভি-ভাষণে প্রসঙ্গত বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"বঙ্গ-সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কেবল একবার মাত্র প্রেম-কবিতার আদর্শ পটভূমিকা রচিত হইয়াছিল, একবার মাত্র বাস্তব জীবনের বিচিত্র নিগূঢ় অনুভূতি প্রেমের হৃৎস্পন্দন রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি বঙ্গসাহিত্যের চির-আদর ও গর্ব্বের বস্তু, ইহার কৌস্তভমণি বৈষ্ণব-কবিতার কথা উল্লেখ করিতেছি। বৈষ্ণব-কবিতার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্কের কথায় অনেকেই চমকাইয়া উঠিতে পারেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতি যাহার প্রাণস্বরূপ, ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আবেশে যাহা বিভোর, যাহার মান অভিমান বিরহ মিলন প্রমুখ ভাববৈচিত্র্যসমূহ পার্থিব জীবনের যবনিকা ভেদ করিয়া অলৌকিক জ্যোতিরহস্যে মায়াময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত বাস্তব-সমন্বয় কেমন করিয়া সম্ভব?

এই প্রশ্ন যাঁহারা করেন তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই ধরিয়া লন যে, আধ্যাত্মিকতার সহিত বাস্তবতার পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ ধারণা সমর্থনযোগ্য নহে। যে জাতির ধর্ম্মসাধনা অনেকখানি অগ্রসর, যাঁহাদের মধ্যে স্বতঃই একটা ধর্ম্মপ্রবণতা আছে, তাহাদের অধ্যাত্ম অনুভূতি, আর পাঁচটা বাস্তব অভিজ্ঞতার মতই সহজ এবং সুলভ। এমন কি যে সমস্ত জাতি বিশেষ করিয়া ধর্ম্মপ্রবণ নহে, তাহাদের প্রেম কবিতার মধ্যেও উচ্চতম আবেগের মুহূর্ত্তে অসীমের আভাষ ও ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে প্রেমের হোমানল স্বভাবতই উর্দ্ধশিখ্—প্রেমের গতি দেহ হইতে দেহাতীতের দিকে। সমস্ত উচ্চাঙ্গের প্রেম কবিতার মধ্যেই ভোগের মধ্যে ত্যাগের, আত্মতৃপ্তির মধ্যে আত্মবিসর্জ্জনের, বিশেষের মধ্যে সার্ব্ব-ভৌমের সুর ঝঙ্কৃত হয়। প্রেমে ঈশ্বর আরাধনা মানবাভি-মুখী হইয়াছে—বিয়েট্রিসের প্রতি দান্তের, লরার প্রতি পেট্রার্কের, ব্রাউনিং-এর প্রতি ব্রাউনিং-পত্নীর মনোভাব—এই পূজারই নামান্তর মাত্র।

সুতরাং বৈষ্ণব-কবিতায় আধ্যাত্মিক মনোভাবের প্রাধান্য প্রেম-কবিতার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। অবশ্য এখানে প্রেমিকের প্রতি ঈশ্বরত্বের আরোপ রূপক হিসাবে নয়, অবিসংবাদিত তথ্যরূপেই সক্রিয় হইয়াছে।

তথাপি যদি কেহ বৈষ্ণব-দর্শনের মূল স্বীকৃতিগুলি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে তাঁহাকে মানবীয় দিক্ দিয়াই ইহার রস উপভোগ করিতে হইবে। সমস্ত অধ্যাত্মব্যঞ্জনা বাদ দিলেও বৈষ্ণব প্রেমকবিতায় যে বাস্তব রসের প্রাচুর্য্য প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই ইহার অনন্যসাধারণ উৎকর্ষের একটী প্রধান হেতু। বৈষ্ণবকবিতার ছত্রে ছত্রে যে আবেগ গদগদ, বাষ্পোচ্ছ্বাস স্খলিত ভাষা প্রেমকে বাণীরূপ দিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রগাঢ় প্রত্যক্ষ অনুভূতির ছাপ অতি সুস্পষ্ট। এই প্রেম কেবলমাত্র কল্পনাতে জন্ম পরিগ্রহ করে নাই, ইহার সহিত কবি-হৃদয়ের নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয়। এই বাস্তব রস-সমৃদ্ধির প্রধান কারণ বাস্তব প্রতিবেশের সমাবেশ-কৌশল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ঘিরিয়া একটী অখণ্ড সমাজ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সখাসখী প্রতিবেশী সকলের সহযোগিতায় এই অনুপম প্রণয়লীলায় বাস্তবতা ও মাধুর্য্য সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহা প্রেমিক-প্রেমিকার কেবল ব্যক্তিগত বা নিজের ব্যাপার নহে, সমগ্র প্রতিবেশমণ্ডল এই খেলাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। নিন্দা, কলঙ্ক, সমাজের ভ্রূকুটি একদিকে, আর একদিকে সহানুভূতি, সমবেদনা, বন্ধুবাৎসল্য, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মিলন ঘটাইবার নানাবিধ সস্নেহ চাতুরী, এই প্রণয়কাহিনীকে মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত ও তাহার নিগূঢ় প্রাণরসে ভরপুর করিয়াছে। সুবল সুদাম, ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সহচর-সহচরীকে বাদ দিয়া কি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কল্পনা করা যাইতে পারে?

আবার শুধু মানুষ নহে, ভৌগলিক প্রতিবেশও এই প্রণয়লীলায় এক অপরিহার্য্য অংশ লইয়াছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলে যেমন মহর্ষি কণ্বের অরণ্যাশ্রম শকুন্তলার হৃদয়-মাধুর্য্য বিকশিত করিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহার অজস্র উৎসারিত স্নেহকোমলতার আধার স্বরূপ হইয়াছে—সেইরূপ ব্রজভূমির প্রেমলীলায় বৃন্দাবনধামও নিজ সক্রিয় সচেতন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বৃন্দাবনের তরুলতা, পল্লবকুঞ্জ, বংশীবট, কেলিকদম্ব, নীলসলিলা যমুনা, সঙ্কীর্ণ-পিচ্ছিল বনপথ, মেঘগর্জ্জন ও বর্ষাবারিধারা—সমস্তই এই প্রেমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত হইয়াছে, সমস্তই এই প্রেমের অঙ্গে এক উচ্ছল, জীবনীরস-সমৃদ্ধ শ্যাম চিক্কণ আরণ্য-শ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সঙ্কেত ধ্বনির অনুসরণে দুর্গম অরণ্যপথে অভিসার-যাত্রা, বিরহের দুঃসহ তপস্যা দ্বারা অধিকতর স্পৃহনীয় মিলনাকাঙ্ক্ষা ও মিলনের নিবিড় আনন্দের মধ্যে আসন্ন বিরহের শঙ্কিত ছায়াপাত, সমাজের প্রতিকূলতার প্রতি বিদ্রোহের পরিবর্ত্তে নীরব উপেক্ষা, ব্যাকুল অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের মানদণ্ডে প্রচলিত নীতি সংস্কারের অতিক্রম প্রয়াস, প্রীতি অভিমান, আসক্তি বিরাগ, আশা নৈরাশ্যের দ্বিধা দ্বন্দ্ব, হৃদয়ের গভীর মন্থন-প্রসূত অমৃত গরল, এক কথায় প্রেমের সমস্ত নিগূঢ় লীলামাধুর্য্য কেবল বারেকের জন্য পারিপার্শ্বিকের এক বিরল সামঞ্জস্য ও আনুকূল্যের ফলে আমাদের এই শত বন্ধনশীর্ণ নির্জ্জীব সমাজের মধ্যেই ফলে ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি না হইলে প্রেম কবিতা বৃহত্তর সমাজ-প্রতিবেশের সহিত স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়া পাইবে না। প্রেমের উদ্দেশ্য কেবল সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা নহে, সমাজ দেহ হইতে নিজ পুষ্টিরস আহরণ। ইহা অন্তঃসঞ্চিত বিদ্রোহের বাষ্পনিঃসরণ যন্ত্র নহে, সমাজের বিচিত্র সংস্কৃতি ও যুগব্যাপী সৌন্দর্য্য-সাধনার মিষ্টতম ফল, তাহার মর্ম্মকোষক্ষরিত মধুসঞ্চয়।"

বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে অনেকেই মানবতার পরিপূর্ণ বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের সে-সৌভাগ্য হয় নাই, তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য-পরযুগের সকল বৈষ্ণব-কবিই শ্রীচৈতন্য-প্রভাবেই অনুপ্রাণিত। সুতরাং তাঁহাদের কবিতায় মানব-প্রেম আপন সহজ স্বাভাবিক পরিণতিতেই ভগবৎপ্রেমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা"—বৈষ্ণব কবিতারই প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

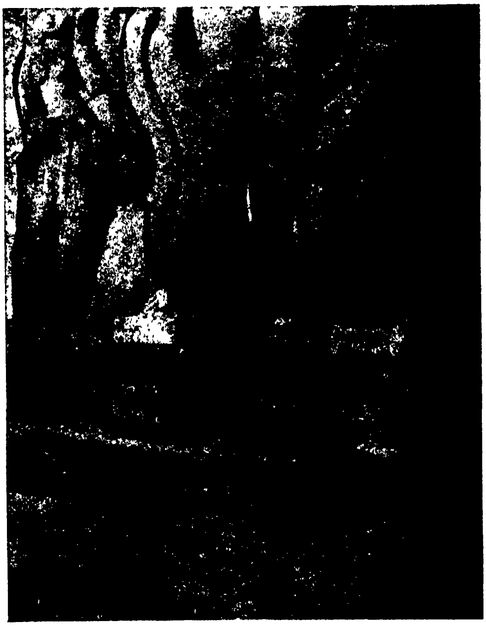
"আমাদেরি কুটীর কাননে—
ফুটে পুষ্প কেহ দেয় দেবতা চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ, এই প্রেম গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা,
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

বিক্রমপুর আউটসাহী পল্লী-কল্যাণাশ্রমের বাসুদেবমূর্ত্তি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিগত কালীপূজার কিছুদিন পূর্ব্বে আমি বিক্রমপুর পরিভ্রমণে বাহির হই। সে সময়ে আমি বিক্রমপুরের গ্রামসমূহ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। আউটসাহী পল্লী কল্যাণাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমান্ কিরণচন্দ্র সেন আমাকে কিছুকাল পূর্ব্বে তৎসংগৃহীত এবং পল্লী কল্যাণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত একটি খোদিত লিপিসংযুক্ত বাসুদেব মূর্ত্তির বিবরণ জানাইয়াছিল। কিন্তু ফোটোগ্রাফারের অভাবে সে উহার ফোটোগ্রাফ বা খোদিত লিপির ছাপ পাঠাইতে পারে নাই।

প্রসিদ্ধ চিত্র শিল্পী শ্রীযুত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সে সময়ে নিজ গ্রামে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে এ বিষয় জানান মাত্রই তিনি আমার জন্য বহু ক্লেশে ও যত্ন সহকারে খোদিত লিপির কয়েকটি ছাপ সংগ্রহ করিয়া আনেন। আমি প্রীতিভাজন বন্ধুবর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়কে উহার পাঠোদ্ধার করিতে দিই; তিনি উহার পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের 'ভারতবর্ষে' পাইকপাড়ার বাসুদেব মূর্ত্তিতে গোবিন্দচন্দ্রের লেখ নামে এক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।



বাসুদেব মূর্ত্তির খোদিত লিপি

শ্রীবৈদ্যনাথ সেনের সৌজন্যে

সম্প্রতি আমার আত্মীয় শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ সেন বাসুদেব মূর্ত্তিটির পাদপীঠে খোদিত লিপির অংশ এবং মূর্ত্তির নিম্নভাগের ফোটোগ্রাফ করিয়া পাঠাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগেই বাসুদেব মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত লিপির আলোকচিত্র প্রদান করিতে সক্ষম হইলাম।

বিক্রমপুরে বিষ্ণুমূর্ত্তির সংখ্যা অনেক। তাহাদের বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তির পরিচয়ও নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই মূর্ত্তিটি বাসুদেব মূর্ত্তি। খোদিত লিপিতেও তাহাই উল্লিখিত আছে।

বাসুদেব মূর্ত্তির ধ্যান এইরূপ :

পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্রঃ
পক্ষিরাজোপরি স্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ নীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ
সংকীত দেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে
তদধোধিক চাম্বুজম্।
বামোর্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং
ধত্তে ইবঃ শঙ্খমেব চ।
শ্রীবৎস বক্ষাঃ সততং
কৌস্তুভং হৃদিচাদ্ভুতম্।
ধত্তে বক্ষে হ্যধো বামে
তূণীরং বাণং পূরিতম্।
দক্ষিণে কোষগং খড়্গং
নন্দকং সশরাসনম্।
শীর্ষে কীরিটং সদ্যোতং
কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলাস্থিতাম্।
দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতাম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্ বরদং হরিম্।
(শব্দকল্পদ্রুম)

দক্ষিণে পদ্মহস্তা ও চামরধারিণী শ্রী। বামে বীণাহস্তা সরস্বতী তাঁহার পার্শ্বচারিণী। পার্শ্বচারিণীরা মূলদেবতার উরুদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ। বাসুদেবের মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল,

বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তুভমণি। গলায় আজানু-বিলম্বিত স্বর্ণমালা। গরুড়ের দুই পার্শ্বে উপাসক দুইজনও দ্রষ্টব্য।

বাসুদেব বিকশিতশতদলোপরি দণ্ডায়মান। শতদল-নিম্নে বা বাসুদেবের পদতলে যোড়হস্তে গরুড় উপবিষ্ট। গরুড়ের দুই পার্শ্বে ও পদনিম্নে খোদিত লিপি দেখিতে পাইবেন। লিপি-পরিচয় ও বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লিপিটি এই:—শ্রীমদ্গোবিন্দচন্দ্রস্য সং বৎ ২৩ রালজিকো পরত-পারদাস-সুত গঙ্গাদাস-কারিত-বাসুদেব ভট্যারকঃ॥ এখানে সংক্ষেপে বাসুদেব মূর্ত্তির পরিচয় মাত্র দিলাম। শিল্পের দিক্ দিয়া এই মূর্ত্তিটির তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই। আজ ইতিহাসানুরাগী পাঠকগণের নিকট এই মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি।

অসঙ্কোচ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

তবে তাই হোক,
খসালেম মিথ্যার নির্মোক।
দেখ' তবে দেখ' মোরে এ নিরাবরণে।
শুধু অকারণে
লয়েছিনু অকারণে ছলনার অলীক আশ্রয়,
তোমার অব্যর্থ আঁখি করেছিল সত্যের নির্ণয়
অসত্যের অন্তরালে ?
ছদ্মবেশিনীর এই কৃত্রিম মোহন ইন্দ্রজালে
ভোলো নাই, হও নাই কভু প্রতারিত ?
সে যদি তোমার চক্ষে খুলিয়া ধরিত
হৃদয়ের পুঁথিখানি,
বহুজন বিলিখিত মসীয়সী বাণী
তাহলে কি নিতান্ত নির্ভরে
গ্রহণ করিতে মোরে অকুণ্ঠিত সহজ অন্তরে ?

ভালবেসেছিলে যারে অনাঘ্রাত পুষ্পকলি ভ্রমে,
তখন অন্তরে তার আনাচে কানাচে ছিল জমে
বহু জীর্ণ পূর্বস্মৃতি কভু না পড়েনি চক্ষে তব।
ভেবেছিনু চিরমৌনে র'ব,
অতীত কাহিনী মোর সুগভীর কবরের তলে
ধূলায় মিশিয়া যাবে বিস্মৃতির অমোঘ কবলে।
যত ঝরামরা পাতা মাটিতে পচিয়া হবে সার,
পচিয়া পরাণ মূলে অভিনব জীবন সঞ্চার
করিবে যখন,
তখন তোমারে আমি দিব মোর নবমুঞ্জরণ
অনাঘ্রাত মুকুলে মুকুলে,
চেয়ে রব তোমা পানে ঊর্দ্ধে মুখ তুলে
সবিতা আমার !
তখন করিও আবিষ্কার
জীবনের প্রত্নতত্ত্ব, রাখিব না কিছু সঙ্গোপনে
সে নব জীবনে।

তবু বলি, ভাবিছ যা মিথ্যা আজি, মিথ্যা তাহা নয়,
আমার কলঙ্কলিখা অতীতের বহু পৃষ্ঠাময়
লেপিয়াছে মসী,
সেই আমি আজি গরীয়সী
তোমার প্রেয়সী হয়ে অসঙ্কোচে কব আত্মকথা।
ক্ষতোপরি জীর্ণ ত্বক নহেক অযথা,
তার অন্তরালে
ব্রণ হয় নিরাময়, সে ক্ষত শুকালে
শুষ্ক চটা পড়ে খসি শেষে।
তুমি ভালবেসে
আমারে করেছ আজি সুখে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে নবীনা,
তাই আমি আজি লজ্জাহীনা,
কোনো আবরণে মোর নাই আর কাজ,
তুমি ঘুচায়েছ মোর সর্বগ্লানি লাজ।
তাই ত অকুতোভয়ে সব কথা বলিবারে চাই,
তুমি হাসিমুখে বল, জানি সব, বলে কাজ নাই।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আফ্রিকার যুদ্ধ

গত একমাসে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বার্দ্দিয়া দখলের পর শত্রুসৈন্য সল্লামের চারিধারে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাইতেছিল, একথা গতসংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূল। দীর্ঘ পঞ্চাশ মাইলব্যাপী মরুভূমিতে প্রচণ্ড যুদ্ধে মিত্রশক্তি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে। বৃটিশ-সৈন্য কর্ত্তৃক সল্লাম পুনরধিকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হালফায়া গিরিপথ এবং মুসাদও বৃটিশের হস্তগত। কিন্তু যুদ্ধের গতি এখানে বর্ত্তমানে মন্থর হইলেও অতি শীঘ্রই যে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করিবে ইহা নিঃসন্দেহ। জার্মান বাহিনীর লক্ষ্য আলেকজান্দ্রিয়া এবং সুয়েজ। শত্রু সৈন্যের এই উদ্বেগজনক লক্ষ্যে অগ্রগতিতে উপযুক্ত বাধাদান করিবার জন্যই বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত। পাঁচ লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী এবং তদুপযুক্ত সমরোপকরণ লইয়া ওয়াভেল প্রস্তুত হইতেছেন। কারণ এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর বৃটেনের স্বার্থ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। ভূমধ্যসাগর পথে ভারতের সহিত বৃটেনের যোগাযোগ, তাহার বাণিজ্য, ভারতের নিরাপত্তা—সকলই নির্ভর করিতেছে বৃটেনের এই যুদ্ধ জয়ের উপর।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর বিজয় আরও উল্লেখযোগ্য। আবিসিনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর সিয়াসিমান্না সাম্রাজ্যবাহিনী অধিকার করিয়াছে। আদেলাও ইটালীর হস্তচ্যুত হইয়াছে। আম্বা আলাগীতে সাম্রাজ্যবাহিনী কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া বিপুল ইটালীয় বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। গত ২০শে মে ডিউক অফ্ আওষ্টা পাঁচজন জেনারেলসহ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ১৯ হাজার সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় জার্মান বাহিনী যদি বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে, একমাত্র তাহা হইলেই যোগাযোগ রক্ষা ও মালপত্রাদি প্রেরণের দ্বারা পূর্ব্ব আফ্রিকার ইটালীয়-বাহিনী স্বীয় অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। অন্যথা, "মরুভূমি কুড়াইতে গিয়া মুসোলিনীকে পূর্ব্ব অধিকৃত অঞ্চল পর্য্যন্ত হারাইয়া যে পূর্ব্ব আফ্রিকায় দেউলিয়া হইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিতে হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

ইরাক

গত মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে এই রাজ্যটি মানচিত্রে স্থান লাভ করে। পূর্ব্বে ইহা তুরস্কেরই অংশ ছিল। তুরস্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও ইরাক (মেসোপটেমিয়া) ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত বৃটেনের রক্ষণাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ছিল। মাত্র এগার বৎসর পূর্ব্বে ইহা স্বাতন্ত্র্যলাভ করে এবং জাতিসঙ্ঘেও স্থান পায়। কিন্তু স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-হিসাবে পরিগণিত হইলেও ইরাকে দেশীয় সৈন্যদের শিক্ষাদানের জন্য একটি বৃটিশ সামরিক মিশন তথায় অবস্থান করে, বৃটিশ বিমান ঘাঁটিও তথায় স্থাপিত হয়। তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্র-হিসাবেও ইরাক পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং তথাকার বহু তৈল প্রতিষ্ঠানের সহিত বৃটেনের বিশেষ স্বার্থ থাকায় বাণিজ্যক্ষেত্রেও বৃটেনের সহিত ইরাকের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। গত ১লা এপ্রিল যখন রসিদ আলি হঠাৎ ইরাকে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, তখনই আমরা প্রথম জানিতে পারি যে ইরাক বর্ত্তমানে



লণ্ডনে ধ্বংসের পর অগ্নি নির্ব্বাপণে নিযুক্ত কর্ম্মী (মই-এর উপর)

জার্মান-প্রভাবাধীন। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করার পর রসিদ আলি ঘোষণা করেন যে তিনি ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি মানিয়া চলিবেন। বৃটিশ সরকারও চুক্তির বিধান অনুযায়ী ১৮ই এপ্রিল ইরাকে এক বৃটিশবাহিনী প্রেরণ করেন। নির্ব্বিবাদে ঐ সৈন্যদল বসোরায় পৌঁছায়। ফলে বৃটেনের অনুগ্রহাধীন ইরাক এখনও বৃটেনের পক্ষেই আছে বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গোল বাধিল দ্বিতীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ উপলক্ষে।

প্রথম বৃটিশবাহিনী স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বে আর কোন সৈন্যদলকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া রসিদ আলি আপত্তি উত্থাপন করেন। এই আপত্তি উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় বৃটিশবাহিনী প্রেরিত হইলে ইরাকী সৈন্য হাবানিয়ার বৃটিশ বিমানঘাঁটি আক্রমণ করে এবং যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

সম্প্রতি বৃটেনের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, গত ১৯৩৬ সাল হইতেই নাকি ইরাকে জার্মান ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ সালে জার্মাণরা বিতাড়িত হইলে তাহাদের স্থানে নাকি ইটালীয় চর ও সৈন্যাদি গ্রহণ করে এবং ষড়যন্ত্র পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। গত ৭ই মে মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় জানান যে ১৯৪০ সালের মে মাসেই বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে ইরাকে সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটিশবাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ইরাকে বৃটিশবাহিনী পাঠান সম্ভব হয় নাই।

যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটিশবাহিনী বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়াছে। হাবানিয়া ও বসোরা হইতে ইরাকীরা বৃটিশবাহিনী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। কিন্তু রসিদ আলি জার্মানীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন জানান। কয়েক দিনের মধ্যেই জার্মানীর বোমাবর্ষণ বিমান, সমরোপকরণ এবং জার্মান যন্ত্রবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ ইরাকে বিমানযোগে উপস্থিত হন। রাজকীয় বিমানবাহিনী দামিরা, দামাস্কস্ এবং রায়াকে জার্মান বিমানসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করে। মোসুল বিমানঘাঁটিতেও বোমা বর্ষিত হয়।

এদিকে অন্যান্য সংবাদের মধ্যে প্রকাশ যে, জার্মানরা নাকি জাহাজযোগে সিরিয়ার বন্দরে ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সমরোপকরণ প্রেরণ করিয়াছে। অধিকন্তু ভিসি সরকার জার্মানীর দাবী মানিয়া লওয়ায় সিরিয়াতেও জার্মানরা বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছে। সিরিয়া জার্মানীর সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছে এবং তথাকার বিশটি বিমানঘাঁটি নাকি জার্মান সৈন্যদের অধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

জার্মানী যদি এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার ফল হইবে সুদূরপ্রসারী। ভূমধ্যসাগর ও ভিসি সরকারের উপর জার্মানীর প্রভাব বিস্তারের সহিত ইহার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উপযুক্ত বিবরগুলি সম্বন্ধে যথাযথ অবস্থা দেখিয়া লইয়া পরে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।



আলবেনিয়ায় পর্ব্বতস্থ দুর্গ-আক্রমণে রত গ্রীক সৈন্যগণ

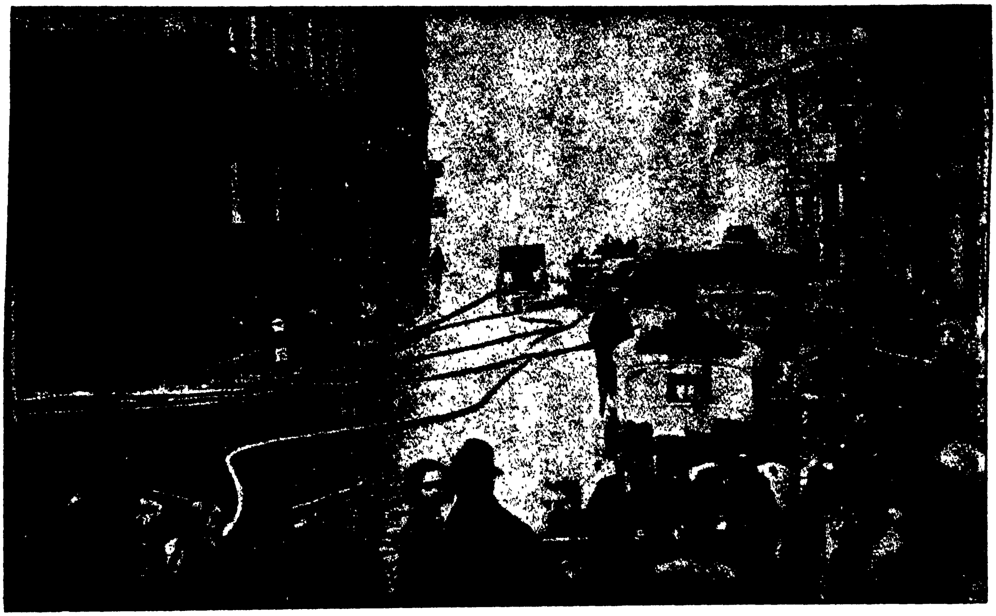
ফ্রান্স ও জার্মানী

ভিসি সরকার যে জার্মানীর দাবীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে, এ আশঙ্কা আমরা গত সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। জার্মানীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ফ্রান্স দাঁড়াইতে পারে নাই, জার্মানীর কূটনীতিক চালের নিকটও ফ্রান্সকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল। গত ১৪ই মে ফরাসী মন্ত্রীসভার বৈঠকে ফ্রান্সকে প্রদত্ত জার্মানীর সর্ত্তাবলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এই সর্ত্ত অনুযায়ী সীমান্ত সম্বন্ধে কড়াকড়ি তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ফ্রান্সে অবস্থিত জার্মান সৈন্যের ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা হইবে। সম্ভবত এই

মাসের শেষ হইতে এই চুক্তি কার্য্যকরী হইবে। এই চুক্তির ফলেই সিরিয়াতেও জার্মানী বিশেষ সুবিধা লাভে সক্ষম হইতেছে।

আমেরিকা

ভিসি সরকারের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি আমেরিকায় উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছেন। জার্মান ও ফ্রান্সের সক্রিয় সহযোগিতা পশ্চিম গোলার্দ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে—এই আশঙ্কা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে মিঃ যশলী ডাকার দখল করার প্রস্তাব করিয়াছেন। পশ্চিম আফ্রিকায় ডাকার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং জার্মাণী যে স্বীয় প্রয়োজনে ইহা একদিন ব্যবহার করিতে পারে, ইহার আভাস আমরা গতসংখ্যাতেই প্রদান করিয়াছিলাম। ফরাসীর মার্টিনিক দ্বীপ ও ফরাসী গায়েনা মার্কিন কর্ত্তৃক জোর করিয়া



লণ্ডনে ভীষণ বিমান আক্রমণের পরের অবস্থা—আগুন নিবাইবার শেষ চেষ্টা

দখল করিবার অভিপ্রায় অনেকে নাকি প্রকাশ করিতেছেন। অনধিকৃত ফ্রান্সের যে সকল জাহাজ যুক্তরাষ্ট্র আটক করিয়াছে, সে সকলকে মুক্তি দিবার চিন্তা পর্য্যন্ত না করিতে সেনেটের অনেকে অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন। স্পেনের সহিত জার্মানীর যে চুক্তি হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমেরিকা বিশেষ উদ্বিগ্ন। মিঃ কর্ডেল হাল বলেন যে, স্পেন-জার্মান চুক্তি যে সামরিক চুক্তি এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি সেনর সুনার পদত্যাগপত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কো তাহা এখনও গ্রহণ করেন নাই, বরং তাঁহাকে আরও ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা যায় কি-না সেই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য স্পেনিশ মন্ত্রীসভার এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। সেনর সুনারের পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করার কারণও তাই। জার্মানীর সহিত সহযোগিতা যত শীঘ্র সম্পন্ন করা যায় এবং পরিকল্পিত কার্য্যধারা অবিলম্বন করা চলে তদুদ্দেশ্যেই সেনর সুনার এই পদত্যাগের হুমকি প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। কাজেই এই সকল চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। আমেরিকার সাহায্য যাহাতে নিরাপদে বৃটেনে পৌঁছায় সেই জন্য মার্কিন সমরসচিব মিঃ ষ্টিম্‌সন্ আটলান্টিকে মার্কিন নৌবহর ব্যবহারের অভিপ্রায় বেতারযোগে জ্ঞাপন করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ প্রায় অক্ষত অবস্থায় বৃটেনে পৌঁছিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিলেও আটলান্টিকে যে পরিমাণ জাহাজ ডুবি হইতেছে তাহা বড় সামান্য নয়। গত এপ্রিল মাসের জাহাজ ডুবির পরিমাণ সম্বন্ধে যে সরকারী হিসাব বাহির হইয়াছে উহাতে দেখা যায় যে, বিপক্ষের আক্রমণে মোট ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ১ শত ২৪ টনের ১০৬টি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বৃটিশ জাহাজের সংখ্যা ৬০ (২৯৩০৮৯ টন), মিত্রশক্তির জাহাজের সংখ্যা ৪৩ (১৮৯৪৭৩ টন) এবং নিরপেক্ষ জাহাজ ডুবিয়াছে ৩টি (৫৫৬২ টন)। শত্রুপক্ষ অবশ্য ইহার প্রায় আড়াই গুণ অর্থাৎ জার্মানীর ১১৪৪৯৯৫ টন এবং ইটালীর ৭৪০০০ টন মোট ১২১৮৯৯৫ টন দাবী করিতেছে। এই দাবীর পরিমাণ অবিশ্বাস্য হইলেও পৌনে পাঁচ লক্ষ টনের ক্ষতি নেহাৎ সামান্য নয়। গত মহাযুদ্ধে জার্মান ডুবো জাহাজ ডুবাইয়াছিল ১১,১৫৩,৫০৬ টন, ইহাদের মধ্যে ৭০খানি ছিল যুদ্ধ জাহাজ। বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজের শতকরা ৪০ ভাগ নিমজ্জিত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলবর্ত্তী আটলান্টিকে ৫খানি জার্মান ডুবোজাহাজ ৫০খানা জাহাজকে ডুবাইয়া দিয়াছিল। ইহার সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধের মাসিক

জাহাজ ডুবির পরিমাণের তুলনা করিলেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। অদূর ভবিষ্যতে জার্মানীর সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে এই আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি গ্রীনল্যাণ্ডে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নির্ম্মিত যুদ্ধাস্ত্র ও উপকরণ চক্রশক্তির নিকট যাহাতে না প্রেরিত হয় তদুদ্দেশ্যে প্রতিনিধি পরিষদে একটি আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নির্ম্মিত সমরোপকরণ রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট নাকি অতি শীঘ্র ফরাসী উপনিবেশ গ্রহণের জন্য একটি বিল কংগ্রেসে উত্থাপন করিবেন। কার্য্যত ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্কের অবসান হইয়াছে বলা চলে।



লণ্ডন হইতে আনীত শিশুগণ। (গ্রামে বাসকালীন অবস্থা।)

ভূমধ্যসাগর

বৃটেনকে আঘাত করিতে হইলে যে ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন একথা নূতন করিয়া বলিবার দরকার নাই। সেইজন্যই যুদ্ধের আরম্ভ হইতে জার্মানী জিব্রাল্টার ও সুয়েজ সম্বন্ধে এত বেশী নজর দিয়াছে। আফ্রিকায় ইটালীর পরাজয় লক্ষ্য করিয়া বহু পূর্ব্বেই জার্মানী সিসিলিতে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। বৃটিশ অধিকৃত মাল্টায় কয়েক মাস ধরিয়াই বোমা বর্ষণের বিরাম নাই। ক্রীট এবং সাইপ্রাসেও প্রবলভাবে বোমা বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীস সরকার জার্মানীর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম হইয়া ক্রীটে আপনাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। যুগোশ্লাভিয়ার ব্যবস্থা করিয়া জার্মানী এইবার এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়াকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্রোশিয়া রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র করিয়া ৪১ বৎসর বয়স্ক স্পোলেটোর ডিউককে তথাকার রাজা করা হইয়াছে। আবিসিনিয়ায় যুদ্ধরত ইটালীয় সেনাপতি ডিউক অফ্ আওষ্টা ইঁহার ভাই। ভাগ্যচক্রে এক ভাই যখন ক্রোশিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন, অপর ভাই তখন বৃটিশের হস্তে নিজের ও অধীনস্থ সৈন্যদলের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

গত ২০এ মে মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় জানান যে, নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যদলের যুদ্ধসাজ পরিয়া ১৫০০ শত্রুসৈন্য গ্লাইডার ও প্যারাসুট সাহায্যে ক্রীট দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। অবতরণের পূর্ব্বে তাহারা সুদা উপসাগরে প্রবল বোমা বর্ষণ করে। পরদিন প্রধান মন্ত্রী আরও জানান যে, ক্রীটের যুদ্ধ ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিবে। সাত হাজার প্যারাসুটবাহিনী সহ বিমান ও জলপথে জার্মান সৈন্য ক্রীট আক্রমণ করিয়াছে। ঐদিন ৩০০০ সৈন্য তাহারা ক্রীটে নামাইয়া দিয়াছে। তবে মনে করা যাইতেছে যে, উহাদের অধিকাংশই নিহত বা বন্দী হইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর, ও নিকট-প্রাচীর সংগ্রাম একত্র করিয়া দেখিলে জার্ম্মানীর যে পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই আশঙ্কাজনক। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও জার্মানীর এই অভিযানে যে তাহা যথেষ্ট ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম দ্বার জিব্রাল্টার বৃটিশের হইলেও স্পেনের সহিত জার্মানীর চুক্তি হওয়ায় জিব্রাল্টার আক্রমণ বিষয়ে আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। মধ্যপথে সিসিলি ও প্যাণ্টালেরিয়া দ্বীপ জার্মান ও ইটালীর অধীনে। ভিসি সরকারের সহিত যে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী নৌবহর যদি জার্মানীর হস্তগত হয় তাহা হইলে নৌশক্তিতে বৃটেনকে বাধা দিবার একটা প্রয়াস জার্মানী পাইতে পারে। মাল্টা, সাইপ্রাস ও ক্রীটে সে বোমা বর্ষণ করিতেছে। ক্রীটের নিকটস্থ ডোডেকানিজ্ দ্বীপপুঞ্জ ইটালীর। সিরিয়া আবার ভিসি সরকারের। ফলে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব যথেষ্ট থাকিলেও জাহাজযোগে জার্মান সিরিয়াতে ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে তাহা সত্য

হওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। সিরিয়ার বিমানঘাঁটিগুলি জার্ম্মানী অবাধে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইতেছে। তুরস্ক এতদিন ধরিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে থাকিলেও অক্ষ-শক্তির বিরুদ্ধে সে বিশেষ কোন দৃঢ় পন্থা অবলম্বন করে নাই। বরং রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, সিরিয়া হইতে সমরোপকরণ তুরস্কের মধ্য দিয়া ইরাকে গিয়া পৌঁছিতেছে। আইনত নাকি তুরস্কের এ বিষয়ে বাধা দিবার ক্ষমতা নাই। বর্ত্তমানে রাজনীতি ক্ষেত্রে আইনের প্রতি এতখানি মর্য্যাদা প্রদর্শন কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহাও একটু চিন্তা করিবার বিষয়। কমন্স সভায় মিঃ ইডেন স্বীকার করিয়াছেন যে, ফ্রান্সের মধ্য দিয়া জার্ম্মানী ভূমধ্যসাগরে টর্পেডো বোট প্রেরণ করিতেছে। ইরাকে বিরুৎ বিমানকেন্দ্রে জার্ম্মান বিমান আক্রমণকারী বৃটিশ বিমানের প্রতি ফরাসী কামান হইতে গোলা বর্ষণ করা হইয়াছে। সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়া জার্ম্মানী একদিকে প্যালেষ্টাইনের মধ্য দিয়া সুয়েজ ও অপর দিকে ইরাকের তৈল খনির প্রতি আক্রমণ চালাইতে পারে। প্যালেষ্টাইনের হাইফা বন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহা তিনটি রেলপথের সংযোগস্থল এবং মসুলের তেলও এখানে সঞ্চিত রাখা হয়। একথা গত সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, সিরিয়া জার্ম্মানের করতলগত হইলে শুধু ইরাক নয় মিশর ও সমস্ত বিপন্ন হইবে। মিশরের প্রান্তে অবস্থিত জার্ম্মান সৈন্য একদিক হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজের দিকে বৃটিশ সৈন্যের উপর চাপ দিবে, আবার অপর দিকে প্যালেষ্টাইন হইতে শত্রুপক্ষ সুয়েজ আক্রমণ চালাইবে—এই আশঙ্কা অমূলক নয়। যদি এইরূপ সুযোগ জার্ম্মানী কোনরূপে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে মিত্রশক্তিকে সত্যই কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। তবে দুর্দ্দিনের সহযোগী ফ্রান্সের প্রতি মমতাবোধেই এতদিন বৃটিশ সরকার তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র ধারণ করিতে ইতস্তত বোধ করিতেছিলেন বলিয়াই জার্ম্মানী ভিসি সরকার হইতে এতখানি সুযোগ সিরিয়ায় লাভ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ফ্রান্স যখন বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ শক্তি প্রয়োগে উদ্যত হইয়াছে, তখন বৃটিশ সরকার যে পূর্ব্ব বন্ধুত্বের খাতিরে আর চুপ করিয়া থাকিবেন না ইহা আমরা আশা করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত ফ্রান্সের নৌবহর হাতছাড়া হইবার আশঙ্কাও একটি কারণ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই আশঙ্কাও সত্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত একেবারে অমূলক নয়। তৃতীয়ত পূর্ব্ব আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনী ইটালীয় সৈন্যদের পর্য্যুদস্ত করিয়া যে গৌরবময় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, উত্তর আফ্রিকায় সেইভাবে শত্রুসৈন্যকে পরাভূত করিতে পারিলেই বিপদের অর্দ্ধেক কাটিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ক্রীট দ্বীপের বর্ত্তমান গুরুত্বও বৃটেনের অজ্ঞাত নয়। ইটালী গ্রীস আক্রমণ করার অব্যবহিত পরেই বৃটেন ক্রীটে শক্তিশালী ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিলও ক্রীটের গুরুত্বকে আদৌ উপেক্ষা করেন নাই। সুতরাং জার্ম্মানী যে অতি সহজেই এখানে স্বীয় অভিলাষ অনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে সে আশা যথেষ্ট কম।

রুশিয়া ও জার্ম্মানী

সম্প্রতি আঙ্কারা হইতে নিউইয়র্ক টাইমস্-এর সংবাদদাতা খবর দিতেছেন যে, মধ্য-প্রাচ্যে রুশিয়া এবং জার্ম্মানী সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য বুঝাপড়া করিতে পারে। ইরাণ সীমান্তে তাসখান্দে সোভিয়েট সৈন্য নাকি কুচকাওয়াজ আরম্ভ করিয়াছে এবং যথেষ্ট সৈন্য সেখানে সমবেত হইয়াছে। মস্কোর একটি সংবাদ জার্ম্মান রেডিও হইতে ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, একটি খাল কাটিয়া বাল্টিক সাগরকে কৃষ্ণসাগরের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং এই নীপারবাগ খাল জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত।



ইথিওপিয়ার রাজা হাইলে-সেলাসির প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাজসভায় বক্তৃতা

জার্ম্মানীর সহিত রুশিয়ার সৌহার্দ্দ্য যে বর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ বেশী সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বল্কান অঞ্চলে জার্ম্মানী স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিলে সোভিয়েটের স্বার্থ-ক্ষুণ্ণ হইতে পারে বলিয়া সোভিয়েট যে জার্ম্মানীর এই কার্য্য বরদাস্ত করিবেনা, অনেকেই এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যত হইল তাহার বিপরীত। সেইজন্য অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, জার্ম্মানীর সহিত রুশিয়ার নিশ্চয়ই এরূপ কোন বোঝাপড়া হইয়াছে যেজন্য রুশিয়া এক্ষেত্রে নীরব রহিয়া গেল। বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের প্রধান সহায় যেরূপ আমেরিকা, জার্ম্মানীর সহায় তেমনই রুশিয়া। আমেরিকা যখন বৃটেনকে সাহায্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং

প্রকৃতপক্ষে তাহাকে বর্ত্তমানে যুযুধান দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখন রুশিয়ার পক্ষেও জার্মান সহযোগিতা দেখান আবশ্যক। একথা যে একেবারে মিথ্যা নয় তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে এ বিষয়ে আরও কিছু ভাবিবার আছে। জার্মানী বর্ত্তমানে ইয়োরোপে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং জার্মানী ও রুশিয়ার সীমান্ত আজ পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে নিকট-প্রাচীতে জার্মানী যদি ক্রমশ স্বীয় শক্তি বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে নাৎসী সমুদ্রে রুশিয়া একটি কম্যুনিষ্ট দ্বীপে পরিণত হইবে। কিন্তু রুশিয়া এরূপ ব্যবস্থা নিশ্চয় সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। কারণ এরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লওয়ার অর্থ কম্যুনিজমের আত্মহত্যা। এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে মঃ ষ্ট্যালিন যখন রুশিয়ার কর্ণধার হইলেন, তখন তিনি যে বিশেষ কোন পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে ঠিক না করিয়াই কম্যুনিজমের তরী নাৎসী স্রোতে ভাসাইয়া দিবেন ইহা আশা করা যায় না।

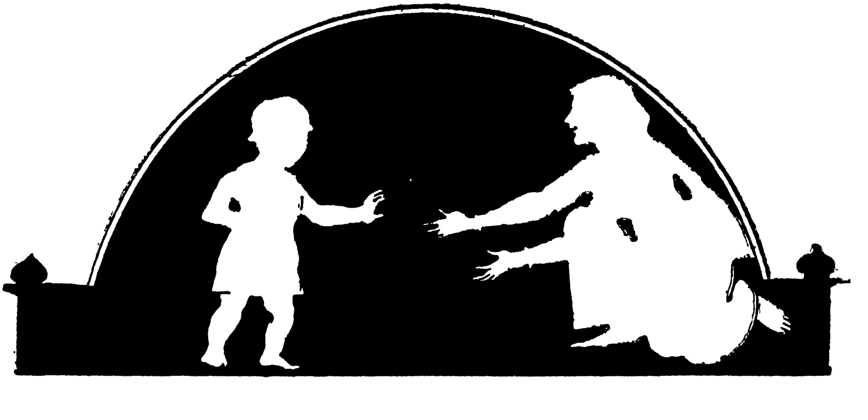
সুদূর-প্রাচী

বিগত ১৩ই এপ্রিল সোভিয়েট ও জাপানের মধ্যে নিরপেক্ষতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতেই জাপান প্রাচ্যে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। স্বংমিট, চুমান প্রভৃতি দ্বীপে জাপান ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। দক্ষিণ চীনের সমগ্র উপকূল অবরোধের জন্য জাপ নৌবহরের আয়োজন চলিয়াছে। চীনের প্রতিও জাপান প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে। উত্তরে হোনান ও দক্ষিণে সান্‌সি প্রদেশে জাপ-বাহিনী যুগপৎ অভিযান চালিত করায় চীনে যুদ্ধের অবস্থা বর্ত্তমানে বিশেষ গুরুতর। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে হ্যাঙ্কাও যুদ্ধের পর এরূপ অভিযান জাপানের এই প্রথম। দক্ষিণ সান্‌সিতে ৩৪টি চীনা বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কুপিংক্যান্ বিপুল বাহিনী সহ জাপানদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। বন্দী চীনা সৈন্যের সংখ্যা আনুমানিক ৬০ হাজার। পীত নদীর তীরে প্রায় ৫০ মাইল স্থান ঘিরিয়া জাপ-বাহিনী প্রবল যুদ্ধ চালাইতেছে। গরিলা যুদ্ধ বন্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ৩০ হাজার সৈন্য নাকি নিহত হইয়াছে। চীনা অষ্টম বাহিনীর সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কাউ-চো টুংও নিহত হইয়াছেন। জাপান তাহার বিরাট বাহিনী এই অঞ্চলে নিযুক্ত করিয়াছে। উহাদের সৈন্য সংখ্যা ১২০ হাজার বলিয়া সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। চীনা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ১৮০ হাজার বলিয়া অনুমিত হয়।

'সেণ্ট্রাল চাইনিজ্ নিউস্' পত্রের সংবাদে প্রকাশ যে রুশিয়া ও চীনের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় চুক্তির ব্যবস্থা আর সম্প্রসারিত করিতে উভয় পক্ষই স্বীকৃত হইয়াছেন। অপর পক্ষে, নূতন রুশ-জার্মান চুক্তির সম্ভাবনাতেই কয়েকদিন পূর্ব্বে জাপানের সেনা-বাহিনীর মুখপত্র 'কোকুমিন' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হইয়াছে যে, জার্মানীকে প্রচুর মাল সরবরাহের পরিবর্ত্তে জার্মানী যদি সোভিয়েটকে প্রাচ্যে যথেচ্ছ অভিযান পরিচালনা করিতে দিতে সম্মত হয় তাহা হইলে জাপান নিরপেক্ষভাবে ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় উহা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিবে না।

জাপানের সহিত সোভিয়েটের চুক্তি হইলেও চীনের প্রতি সোভিয়েট মনোভাবের যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহা স্পষ্ট। ইহার কারণও আমরা গত সংখ্যাতেই উল্লেখ করিয়াছি। জাপানের সহিত অদূর ভবিষ্যতে মিত্রশক্তির যদি সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমেরিকার সাহায্য লাভ করা চীনের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সেরূপ অবস্থায় একমাত্র রুশিয়াই হইবে চীনের ভরসাস্থল। কম্যুনিষ্ট বিরোধী চিয়াং-কাই-শেক যাহাতে এ বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ভবিষ্যতে কম্যুনিষ্টদের সহিত অন্তত বাহ্য সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিতে বাধ্য হন সেই উদ্দেশ্যেই রুশিয়া এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। জাপানও নিজের "সুবর্ণ সুযোগ" সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে চীনের সহিত বিবাদ মিটাইতে ইচ্ছুক। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান তৎপরতার সহিত যে সকল কার্য্যপদ্ধতি চালাইতেছে তাহাতে সে যে পাশ্চাত্য যুদ্ধে নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে থাকিবে ইহা মনে হয় না। ফ্রান্স ও স্পেনের সহযোগিতায় জার্মানী যখন ভূমধ্য সাগরে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিবে, সুয়েজ এবং জিব্রাল্টারে যখন একসঙ্গে প্রবল আক্রমণ চলিবে, সেই সময় জাপানও সিঙ্গাপুরে আক্রমণ চালাইবে বলিয়াই বোধ হয়। কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জীও এই ধারণাটা পোষণ করেন। তবে জাপানের এই পরিকল্পনা কতদূর কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

২৫।৫।৪১





রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুর

[illegible]

রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুর

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এবার আমরা যে মহৎ ব্যক্তিটির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও চিত্র প্রকাশ করিব, তিনি জীবনে একদিক দিয়া একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোক এখনও গ্রামে বাস করে এবং গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাস করিলে যে নানাভাবে জীবন বিপন্ন হইয়া থাকে, তাহার বহু প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু দরিদ্র বা মধ্যবিত্তদিগকে লইয়া গ্রামে বাস করা চলে না; দেশের ধনী জমিদারগণ ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই গ্রামের বাস ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়াই আজ বাঙ্গালার গ্রামগুলি বাসের অযোগ্য হইয়াছে এবং গ্রামগুলি ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

যে সময়ে বাঙ্গালার অধিকাংশ ধনী জমিদার গ্রাম ছাড়িতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই স্বর্গত রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয় শহরে ব্যবসা করিয়া ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় শুধু বাস করেন নাই—নিজ গ্রাম ও তৎসন্নিহিত পল্লীগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের গ্রামের নাম আজ সর্ব্বজনবিদিত—২৪পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া গ্রামের নাম আজ কে না জানেন?

ইংরেজী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগটিকে বাঙ্গালার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা চলে। সে সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনীতিক্ষেত্রে আনন্দমোহন বসু, সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিরও আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই যুগে জন্মিয়া কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথও আপন কর্ম্মের দ্বারা দেশকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথের পিতা পতিতচন্দ্রও পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তেজস্বিতা ও সাধুতার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১২৪৯ সালে সামান্য মূলধন লইয়া পতিতচন্দ্র কলিকাতায় দেশী চিনি, তিসি ও পাটের ব্যবসা আরম্ভ করেন; ধান্যকুড়িয়া নিবাসী পতিতচন্দ্রের স্বজাতি গোবিন্দচন্দ্র গাইন পতিতচন্দ্রের কর্ম্মশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহযোগী হইয়াছিলেন। পরে আবার শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়কেও পতিতচন্দ্র নিজ ব্যবসায়ে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত নিজের একমাত্র কন্যা দাক্ষায়ণীর বিবাহ দেন। উত্তরকালে এই তিন বংশ—সাউ, বল্লভ ও গাইন মহাশয়েরা—একযোগে ব্যবসা করিয়া ধান্যকুড়িয়া গ্রামকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রামের পাঠশালায় উপেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়; পাঠশালায় পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার এমন সব গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত, যদ্দ্বারা তিনি যে ভবিষ্যতে একজন মহৎ ব্যক্তি হইবেন, তাহা বুঝা যাইত। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া উপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হন। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তিনি পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উহা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথের কিন্তু অধিক দিন বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। ১২৮৫ সালে পতিতচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন—তখন পতিতচন্দ্রের ব্যবসা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে ও তিনি প্রভূত ধনের মালিক হইয়াছেন। কাজেই অতি অল্প বয়সে উপেন্দ্রনাথকে পিতার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে হইল। সেই সময়ে গাইনবাবুরা ও উপেন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় কলিকাতার ব্যবসায়ের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। শ্যামাচরণ অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে পতিতচন্দ্রের অনুগ্রহে ও চেষ্টায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুর পর হইতে গ্রাম-সংগঠনে বিশেষভাবে মনোযোগী হইলেন এবং নিম্নলিখিত কাজগুলি একে একে গ্রহণ করিতে লাগিলেন—(১) রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কার, (২) জল নিকাশের সুব্যবস্থা, (৩) জলাশয় খনন, (৪) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, (৫) চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, (৬) পূজা,

উৎসব ও কথকতা দ্বারা লোকশিক্ষা, (৭) বিবাদের আপোষ নিষ্পত্তি ও (৮) গ্রামবাসীর অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধন।

প্রথমে তিনি গ্রামের পথগুলি পাকা করিয়া দেন এবং প্রধান পথটির নাম নিজ পিতার নামে 'পতিতচন্দ্র সাউ রোড' নামে অভিহিত করেন। ধান্যকুড়িয়া হইতে বাদুড়িয়া যাইবার পথে একটি খাল পার হইতে হইত—উপেন্দ্রনাথ বহু অর্থব্যয়ে তাহার উপর একটি প্রশস্ত সেতু নির্ম্মাণ করেন। পানীয় জলের জন্য তিনি গ্রামে অনেকগুলি বড় বড় পুকুর কাটাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ধান্যকুড়িয়ায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম অবস্থায় বহুদিন স্কুলটিকে অবৈতনিকভাবেই চালাইতে হইয়াছিল। পরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে স্কুলের নূতন গৃহ ও ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড জমির উপর স্কুল অবস্থিত; স্কুলের নিকটেই ঐ জমির মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ও খেলার মাঠ আছে। স্কুলের জন্য উপেন্দ্রনাথ নিজে এবং বল্লভ ও গাইনবাবুরা মোট দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে উৎসাহী ছিলেন বলিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি আস্থা হারান নাই। তাঁহার অর্থ-সাহায্যে ১৩০০ সালে গ্রামে একটি টোল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অদ্যাপি তথায় বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী আহার ও আশ্রয় পাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত উপেন্দ্রনাথ একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রচারেও উপেন্দ্রনাথের উৎসাহ কম ছিল না। তিনি তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত জিউ মন্দিরে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাধুদিগের বাসের জন্যও তথায় ব্যবস্থা আছে। এই সকল কার্য্যে তিনি বহু দেবত্র সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতার নামানুসারে ধান্যকুড়িয়ায় 'শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপন করেন। চিকিৎসালয়ের জন্যও তাঁহাকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

এই সকল দান ছাড়া ও সাউ পরিবারের একটি বিরাট দানের কথা শুনিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ১৩০৩ সালে বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় ২৪পরগণা জেলায় অন্নকষ্ট দেখা দেয়। সেই সময় শ্রীযুত শ্যামাচরণ বল্লভ, উপেন্দ্রনাথ সাউ ও মহেন্দ্রনাথ গাইন একযোগে এক অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় ১৩০৪ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র তিন মাসে প্রত্যহ প্রায় তিন সহস্র লোক অন্ন পাইত, সেজন্য প্রত্যহ পঁয়ত্রিশ মণ চাউল রন্ধন করিতে হইত। হিন্দু ও মুসলমানদিগের পৃথক পৃথক সত্র খোলা হইয়াছিল—হিন্দু বিভাগে তিন জন পাচক ব্রাহ্মণ ও আট জন হিন্দু ভৃত্য এবং মুসলমান বিভাগে বার জন মুসলমান পাচক ও পাঁচ জন মুসলমান ভৃত্য কাজ করিত। আহার করিয়া কাহাকেও স্থান পরিষ্কার করিতে হইত না—সকল কার্য্য ভৃত্যদের দ্বারা করান হইত। প্রত্যহ পুরাতন চাউলের অন্ন, ডাল, একটা ব্যঞ্জন ও অম্ল দেওয়া হইত—সপ্তাহে তিন দিন মৎস্যের ঝোল দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। তাহা ছাড়া ভদ্র ও উচ্চজাতীয় দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিমিত্ত চাল, ডাল ও আবশ্যক মত অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সে সময়ে উপেন্দ্রনাথ প্রত্যেক বস্ত্রহীনকে এক-খানি করিয়া নূতন বস্ত্র দান করিতেন।

উপেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতা শ্যামাসুন্দরীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী জীবনে উপেন্দ্রনাথকে নিজেদের ব্যবসায়-কার্য্যে ও সাধারণের হিতকর কতকগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্তু সে সময়েও তিনি গ্রামের কথা ভুলেন নাই। তিনি প্রায়ই গ্রামে যাইতেন ও গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলির রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতেন। এই পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে উপেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার সৎকর্ম্মের জন্য তিনি শুধু নিজ গ্রামবাসী বা দেশবাসীদিগের শ্রদ্ধা লাভ করেন নাই—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ ও তাঁহার ভাগিনেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে বসিরহাটে একটি সুবৃহৎ টাউনহল প্রতিষ্ঠা করিয়া উপেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

সাময়িকী

নববর্ষ—

১৩৪৮ সালের আষাঢ়ে 'ভারতবর্ষ' উনত্রিংশবর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহার কৃপায় এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ তাহার গৌরব রক্ষা করিয়া ও তাহার জনপ্রিয়তা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানাইয়া আমরা নববর্ষে নব উদ্যম লইয়া কার্য্যারম্ভ করিলাম। আজ আমরা শ্রদ্ধার সহিত আমাদের পূর্ব্বগামীদিগকে—স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রায় বাহাদুর জলধর সেন ও সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি। অন্যান্য যাঁহাদের অনুগ্রহে ও আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সকলকে আমরা যথাযোগ্য অভিনন্দনাদি জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা দরবার—

রবীন্দ্রনাথের একাশিতম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২৫শে বৈশাখ ত্রিপুরার মহারাজের আদেশে একটি বিশেষ জয়ন্তী-দরবারের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা দরবার কবিকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কবিবর শুধু ভারতবর্ষেই নহে, ভারতের বাহিরেও ভারতের প্রজ্ঞার মহিমা প্রচার করিয়া সূর্য্যের মতই জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি দেওয়া সমীচীনই হইয়াছে। আমরা ত্রিপুরা দরবারের—তথা ভারতের অগণিত অনুরাগীর সহিত একযোগে প্রার্থনা জানাই—কবি শতায়ু হইয়া পরাধীন ভারতের মহিমা প্রোজ্জ্বল রাখিতে থাকুন।

শোক-সংবাদ—

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী প্রীতি দেবী গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি ১১টার সময় টাইফয়েড রোগে মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা নিদারুণ মর্ম্মাহত হইলাম। প্রীতি দেবী এ বৎসর প্রথম বিভাগে আই-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। সতীশবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। শ্রীভগবান তাঁহাদের এই শোক সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুন ও তাঁহাদিগের মনে শান্তি দিন—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলরদের প্রতিকৃতি—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলরদের কৃতিত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কৃতকার্য্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিগত ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে যে ছাব্বিশজন চ্যান্সেলর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কার্য্যরত ছিলেন ও আছেন তাঁহাদের আলোক চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল প্রতিকৃতি দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসের বিরাট সোপানাবলীর দক্ষিণ প্রাচীর গাত্রে স্থাপন করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও ফলিত রসায়ন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের পক্ষ হইতে ফলিত রসায়ন সংক্রান্ত বিভাগটিকে বাড়ানো হইতেছে। এই বিভাগে গবেষণাকারীর সংখ্যা কম হইলেও সরকারী ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানই এখানে শিক্ষার্থী পাঠাইতে চাহেন এবং তাহাদের চাহিদা মিটানোই প্রধানত এই ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ প্রচেষ্টা যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য তাহা বলাই বাহুল্য। এ দেশে রসায়নশাস্ত্র অনেকেই পড়েন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের অভাবে তাঁহাদের অধীত বিদ্যা কোন কাজেই লাগে না। তাই এতকাল আমরা পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম। গ্যাস্, য়্যাসিড ইত্যাদি যাহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সবই আসে বাহির হইতে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য বাহির

হইতে ঐ সব দ্রব্যাদি নিয়মিত আমদানি হইতে পারিতেছে না, ফলে আমাদের অশেষ অসুবিধার কারণ হইতেছে। এমন দিনে দেশে রসায়নচর্চ্চা বৃদ্ধির সুযোগ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির—

স্বামী বিবেকানন্দের সংকল্পিত একটি বিদ্যামন্দির বেলুড়-মঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আগামী জুলাই মাস হইতে তথায় শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমানে ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস্ কোর্সে ইংরেজী, ইতিহাস, সিভিক্স্, লজিক, গণিত, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া বৃত্তি-মূলক শিক্ষা, দেহচর্চ্চা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাও শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা, মঠের আদর্শ অনুযায়ী একদিন এই বিদ্যামন্দিরকেই একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন। আমরা এই বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ভারতে গ্রেট বৃটেনের দান—

গ্রেট বৃটেনের প্রচার বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর হইতে ভারতীয় বক্তাদের সাহায্যের জন্য মধ্যে মধ্যে কতকগুলি মন্তব্য সরবরাহ করা হয়। ভারত সম্পর্কে বক্তৃতার বিষয়-মধ্যে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয় ভারতে বৃটিশ শাসনের মহিমার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃটিশের চেষ্টায় নাকি ভারতের ঘরে-বাইরে শান্তি বিরাজ করিতেছে। মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও পাকিস্থানী আন্দোলন ইত্যাদি কি ভারতের ভিতরকার শান্তির পরিচায়ক?

হাইলে-সেলাশির রাজ্য পুনরুদ্ধার—

বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেন আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা হাইলে সেলাশিকে তাঁহার সিংহাসন অধিকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। বছর কয়েক আগে ইতালীর হস্তে পরাভূত সম্রাট হাইলে সেলাশি জাতিসংঘের নিকট যখন হৃত-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন তখন জাতিসংঘ তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। ফ্রান্স সেদিন বুঝিতে পারেন নাই যে একদিন তাহাকে ফাসিস্ত শক্তির হাতের পুতুল হইতে হইবে। এমন কি, বৃটেনও সেদিন কল্পনা করিতে পারেন নাই যে একদা নিজের স্বার্থের জন্যই তাঁহাকে আবিসিনিয়া সম্পর্কে মত বদলাইতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আবিসিনিয়াকে পরাধীনতার পঙ্ক হইতে ঠেলিয়া তুলিতে বৃটেনকে হাত বাড়াইতে হইল। সম্রাট হাইলে সেলাশি সিংহাসনে পুনঃ আরোহণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে—রাজ্যে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক উন্নতির প্রতি তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিবেন। আমরা তাঁহার কামনা ফলবতী হইতে দেখিলে তৃপ্ত হইব।

পাকিস্থান উপঢৌকন—

মাদ্রাজ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ এস্, এম্, ফাসিল পাকিস্থান প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য ডাকযোগে একজোড়া ছেঁড়া চর্ম্মপাদুকা উপঢৌকন লাভ করিয়াছেন। পাদুকার সঙ্গে একখানি পত্রে তাঁহাকে হত্যার ভয়ও দেখান হইয়াছে। পত্রান্তরে এই সম্পর্কে মিঃ ফাসিল এক বিবৃতি দিয়াছেন; তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে আমার বিপথ-চালিত স্বধর্ম্মীদের এই উপঢৌকন আমি যত্নের সহিত রক্ষা করিব। মূর্খের ভয়ে ভীত হইবার মত লোক আমি নহি। আমার মনে হয়, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতার যাঁহারা উপাসক, তাঁহারা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত পাকিস্থানে থাকিতে সম্মত হইবেন না। পাকিস্থানে বিশ্বাস করেন না, এমন শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা নেহাৎ অল্প নহে।

যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য—

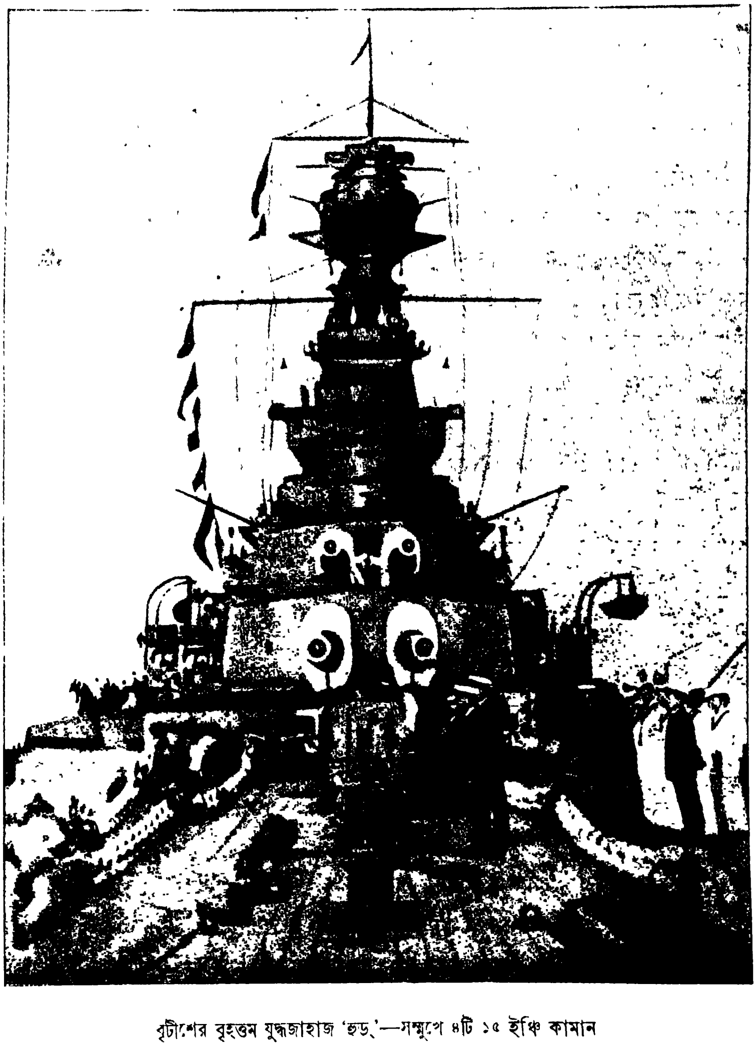
বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য কি—সে সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রীরা কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই। তবে সম্প্রতি ক্যাণ্টারবারীর আর্ক-বিশপ বলিয়াছেন, এই যুদ্ধে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য জার্মানীর অনিষ্টকর শক্তির ধ্বংস এবং শৃঙ্খলিত জাতিগুলির মুক্তি। ইহাই যদি ইংলণ্ডের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য যে খুবই সাধু, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন মনে আসে—'শৃঙ্খলিত জাতি' বলিতে কি তিনি শুধু জার্মান-পদদলিত ইউরোপীয় জাতিদেরই বুঝিয়াছেন, না ইউরোপের বাহিরের জাতিগুলিকেও বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—

বাঙ্গালার পর বোম্বাই, বোম্বাই হইতে বিহার, বিহার হইতে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। সম্প্রতি পাঞ্জাবের হিসার জিলার ভিয়ানী নামক স্থানে স্কুলের ছাত্রেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে ব্যবহার করে, তাহাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। গত ৮ই মে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে সেই তারিখ পর্য্যন্ত ৮ জন হত ও ৪৩ জন আহত হইয়াছে। কারণটা অবশ্য তুচ্ছ; কিন্তু তুচ্ছ কারণকেই যাঁহারা মূলধন করিয়া এ যুগে কারবার চালান ইহা তাঁহাদেরই কাজ। সুতরাং বিস্মিত হইবার কিছু না থাকিলেও ইহা বলা চলে যে, এ খেলা তাঁহাদের থামাইবার সময় কি এখনও আসে নাই?

দার্জ্জিলিংয়ে মন্ত্রীদের জন্য প্রাসাদ—

প্রকাশ, এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায় দার্জ্জিলিংয়ের উডল্যাণ্ডস নামক বাড়ীটি ক্রয় করিয়া বাঙ্গালা সরকার সেখানে মন্ত্রীদের শৈলাবাসের জন্য স্থায়ী বাংলো নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। যুদ্ধের ওজুহাতে দিনের পর দিন বাঙ্গালার স্কন্ধে ট্যাক্সের গুরুভার চাপানো হইতেছে, অর্থাভাবে দেশের জনকল্যাণে যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া সম্ভব হইতেছে না, এমন সময় মন্ত্রীদের জন্য নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের পরিকল্পনাটা সত্যই হাস্যজনক বলিয়া মনে হয়।



বৃটিশের বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ 'হুড'—সম্মুখে ৪টি ১৫ ইঞ্চি কামান

বাঙ্গালী বনাম অবাঙ্গালী মুসলমান—

কলিকাতা কর্পোরেশনে কিছুদিন হইতে অবাঙ্গালী মুসলমানগণের প্রাধান্য দেখিয়া কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী মুসলমানগণ বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছেন। কয়েকবার চাকরী বিতরণের সময়েও বাঙ্গালী মুসলমানদিগের দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় এই অসন্তোষ ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছিল। সম্প্রতি মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও মিঃ এস-এ-হবিব নামক দুইজন বাঙ্গালী মুসলমান কাউন্সিলার জানাইয়াছেন যে তাঁহারা আর কর্পোরেশনে অবাঙ্গালী মুসলমানদিগের নেতৃত্ব মানিয়া

চলিবেন না। বিষয়টি লইয়া এখন বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। সত্যই যদি বাঙ্গালা দেশের প্রধান সহর কলিকাতায় বাঙ্গালী মুসলমানগণকে কোনঠাসা হইয়া থাকিতে হয়, তবে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, এখন হইতে বাঙ্গালী মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান হইবেন।

বেতার প্রতিষ্ঠান ও বাঙ্গালা ভাষা—

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য প্রচার সমিতি হইতে ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল সহরে বহু বাঙ্গালীর বাস তথায় যেন স্থানীয় বেতার প্রতিষ্ঠান হইতে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় গান বক্তৃতা প্রভৃতি শুনাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বেতার কর্ত্তৃপক্ষ এই অনুরোধ রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কলিকাতা সহর বাঙ্গালী-প্রধান হইলেও কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র হইতে হিন্দী, উর্দ্দু, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বক্তৃতা গান প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে—তাহা যখন সম্ভব, তখন বাঙ্গালার বাহিরে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ও ঐরূপ সপ্তাহে ২।১ দিন বাঙ্গালায় বক্তৃতা বা গান দিলে কিছু ক্ষতি হইবে না। আমরা বিষয়টি বেতার কর্ত্তৃপক্ষকে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যন্ত্রশিল্প ও হস্তশিল্প সমস্যা—

সম্প্রতি বোম্বায়ে প্রায় দুইশত ক্ষৌরকার নাপিত এক সভায় সমবেত হইয়া 'সেফ্‌টি ব্লেড' ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টকে ব্লেড ব্যবহার নিষেধ করিয়া আদেশ জারি করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে। সংবাদটি অবশ্য রহস্যজনক। একদিকে বহু লোক ব্লেডের সাহায্যে নিজেরা নিজেদের ক্ষৌরকার্য্য করার ফলে নাপিতগণ ক্রমে বৃত্তিহীন হইতেছে, অন্যদিকে লোক আত্মনির্ভর হওয়ায় তাহাদের সুবিধা হইতেছে। এ অবস্থায় ক্ষৌরকারদের অভিযোগ সত্য হইলেও কেহই তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। নাপিতরা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যন্ত্রশিল্পের সহিত হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতায় যিনি অধিক শক্তিশালী তিনিই বাঁচিয়া যাইবেন। আইন করিয়া বা সভা করিয়া ইহার কোন প্রতিকার করা যাইবে না।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি—

নানা কারণে ইউরোপে যুদ্ধারম্ভের পর হইতেই এ দেশে কাগজের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। অবশ্য যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে কাগজের আমদানী কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাই কাগজের মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ নহে। ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীরাও কাগজ ধরিয়া রাখিয়া বাজারে কাগজের মূল্য অত্যধিকভাবে বাড়িতে দিতেছেন। এ অবস্থায়ও যদি এদেশে ২।৫টি নূতন কাগজের কল প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যাইত, তাহা হইলে আমরা ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে পারিতাম। গত ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পর বাঙ্গালায় কাগজের কল প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই। এবারের যুদ্ধের সুযোগ লইয়াও যদি আমরা এদেশে কাগজের কল প্রতিষ্ঠা না করি, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার কোন দিন শেষ হইবে না। আমরা বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগকে বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

নোংরা কলিকাতা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কলিকাতা সহরের বহু স্থান এখনও বিশেষ অপরিস্কৃত বা নোংরা অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। ইহা যে কোন পথিকের পক্ষেই কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। কর্পোরেশন সহরকে পরিস্কৃত রাখিবার চেষ্টা করেন বটে কিন্তু করদাতারা এ বিষয়ে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আবশ্যক সহযোগিতা করেন না! আমরা অর্থাৎ করদাতারা নিজেরা যে সময়ে অসময়ে পথঘাট প্রভৃতি অপরিষ্কার করিয়া থাকি, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে করদাতাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানেরও বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ অপরিচ্ছন্নতা বর্জ্জন সম্বন্ধে যদি নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সুফল ফলিতে পারে। আসল কথা—আমাদের শিক্ষার অভাব।

আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব। সঙ্গে সঙ্গে সহরকে অধিকতর পরিষ্কার রাখিবার জন্য কর্পোরেশনকেও ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মজার কথা—

যে সময়ে ইউরোপের মহাযুদ্ধের ফলে দেশে নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় দেশের লোকের জীবন রক্ষার উপায় লইয়া সকলে বিব্রত, সেই সময়ে আমাদের বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে বন্য পশু রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী লোক লইয়া একটি কমিটী গঠিত করিয়াছেন। এই সংবাদটি বাঙ্গালা দেশের লোককে সত্যই চমৎকৃত করিয়াছে। হইতে পারে, কয়েকটি কারণে বাঙ্গালার বন-জঙ্গল ক্রমে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং বাঙ্গালায় শিকারের সুবিধা থাকায় বন্য-জন্তুর সংখ্যা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের চিন্তিত হইবার কি কারণ ঘটিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যদি কর্তৃপক্ষ সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া আমাদের বিষয়টি বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।

পরলোকে দীনেশরঞ্জন—

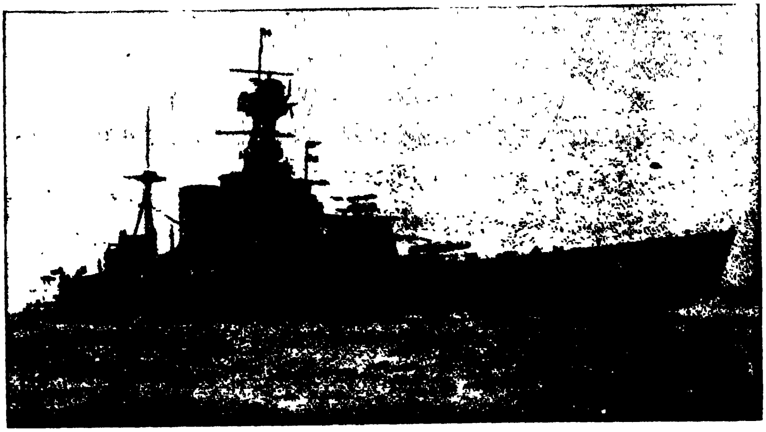
অধুনালুপ্ত 'কল্লোল' মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৪ বৎসর। তিনি নিজে ছিলেন সুলেখক ও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। 'কল্লোল' উঠিয়া যাওয়ায় তিনি ছায়াচিত্র জগতে পরিচালকরূপে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। দীনেশরঞ্জন ছিলেন চিরকুমার, বন্ধুবৎসল ও দরদী সাহিত্যসেবী। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডাঃ বারিদবরণের পাঠাগার—

সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শেষ ইচ্ছাক্রমে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কলিকাতার রামকৃষ্ণমিশন সংস্কৃতি পরিষদকে দান করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ব্যক্তিগত পাঠাগারগুলি এইভাবে দেশের ও দশের ব্যবহারের উপযোগী হইতে দেখিলে আমরা প্রীত হইব।

পরলোকে সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—

প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল-বিয়োগে আমরা ব্যথিত হইলাম। জাপানে যাইয়া শিক্ষা লাভের পর স্বদেশে ফিরিয়া কিছুদিন তিনি সাহিত্য সেবা করেন। পরে তিনি বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসে কাজ করিতেন। সারাজীবন তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত বিধবা ও সন্তানদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।



বৃটিশের যুদ্ধজাহাজ 'হুড'—সম্মুখে বিমান অবতরণের প্ল্যাট্‌ফরম্

রুশিয়ার মন্ত্রিসভায় পরিবর্ত্তন—

ইউরোপের মহাসমরে প্রত্যেক রাষ্ট্রই কোন না কো পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিয়াছে, একমা রুশিয়াই এই বিরাট রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গাগড়ার বি সংগ্রামে যোগ না দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের গতি নিরী করিতেছিল; কিন্তু অতঃপর আর সেটা সম্ভব নয় বলি হয় ত স্টালিন আবার রুশিয়ার রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভ দেখা দিলেন। মলোটভের জায়গায় তিনি সোভি রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এত

মলোটভ একাই পররাষ্ট্রসচিব ও প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠায় তিনি স্বেচ্ছায় এই দুই দায়িত্বের একটি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। স্টালিনকে সোভিয়েট রুশিয়ার পুরোভাগে রাখিয়া তিনি সহকারী প্রধানমন্ত্রী হইলেন এবং পররাষ্ট্র সচিবের পদটিতেও আগের মতই বহাল রহিলেন। এই পরিবর্ত্তনে রুশিয়ার সরকারী নীতির নাকি কোন পরিবর্ত্তনই হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এতদিন স্টালিন বেনামীতে যাহা করিয়া আসিয়াছেন অতঃপর স্বনামেই তাহা করিবেন। কিন্তু তবু সন্দেহ দূর হয় না—তাঁহাদের আচরণে কোন প্রকার নূতনত্ব দেখা দেয় কি-না, তাহা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বাঙ্গালায় সরকারী চিকিৎসা—

বাঙ্গালা দেশের চিকিৎসা বিভাগে সরকারী সাহায্যের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে গতানুগতিকভাবে প্রচার করা হইয়াছে যে আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালায় চিকিৎসার কাজে খুব উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আসলে সত্যকার উন্নতি কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ব বৎসরে সমগ্র বাঙ্গালায় ১৬২৬টি হাসপাতাল ছিল, আলোচ্য বর্ষে এই সংখ্যা বাড়িয়া ১৬৯৫টি হইয়াছে। এই হাসপাতালগুলিতে মোট ৬৫৫৫ জনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মধ্যে ৪৬৫২জন পুরুষ এবং ১৯০৩ জন স্ত্রীলোক। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যে দেশের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য আদৌ ভাল বলা যায় না, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা ইত্যাদি রোগে যে দেশের লোক প্রতি বৎসর মশামাছির মত মরিয়া থাকে, যে দেশে গরমের দিনে পানীয় জলের একান্ত অভাবে মানুষ খাল-ডোবার অপরিষ্কার জল পান করিতে বাধ্য হয় সেই দেশে মাত্র কিঞ্চিদধিক সাড়ে ছয় হাজার রোগীর চিকিৎসার জন্য সরকারী ব্যবস্থা করিয়া উন্নতির স্বপ্ন দেখা ও তাহা প্রচার করা কেবল এ দেশেই সম্ভব।

ঝড়ের তাণ্ডব লীলা—

গত ২৫শে মে বরিশাল, নোয়াখালী ও ফরিদপুর জেলায় যে প্রচণ্ড ঝড় হইয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কে প্রতিদিনই হৃদয়-বিদারক সংবাদ আসিতেছে। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিবার জন্য বরিশাল গমন করিয়াছেন। হাজার হাজার নরনারী প্রকৃতির এই তাণ্ডবে জীবন বলি দিয়াছে। গৃহপালিত পশু যে কত মারা গিয়াছে তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন হইয়া সকাতরে ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিতেছে। দোকানপাট, বৃক্ষলতা অনেক স্থানেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহের দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। মানুষের জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবোধ আছে, আজ সেই কর্ত্তব্যবোধ আর্ত্ত দুর্গতদের রক্ষায় অগ্রসর। সাহায্য-দানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে সাহায্যের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। আমাদের বিশ্বাস সাহায্যদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং দেশের নরনারী প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী সাহায্যদান করিয়া দুর্গতদের রক্ষায় নিজেদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে কার্পণ্য করিবেন না।

আইন-রক্ষকের কীর্ত্তি—

ফৌজদারী মামলার অভিযুক্তের নিকট হইতে স্বীকার উক্তি আদায় করিবার জন্য এ দেশের পুলিশ বিভাগ যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহা বর্ব্বরোচিত বলিলে বেশী বলা হয় না। সম্প্রতি লাহোর হাইকোর্টের একটি মামলায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সিঁদ চুরির অভিযোগের সন্দেহে ধৃত একটি লোকের উপর মারপিঠ করিবার অভিযোগে একজন দারোগা ও দুই জন কনেস্টবল গুরুদাসপুরের ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হয়। হাকিমের বিচারে আসামীরা বেকসুর খালাস পায় কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল রুজু করা হয়। আপীলের বিচারে দারোগার সাত বৎসর ও হেড কনেস্টবলের তিন বৎসর এবং দুইজন কনেষ্টবলের এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। মৃত লোকটির উপর যে অত্যাচার চলে তাহার নমুনা—"বেড়ী পায়ে পাঁচ শত বৈঠক করানো, কপালে বালু ঘষা, গলায় শিকল বাঁধিয়া সেই শিকল ধরিয়া আর একজনের ঝুলিতে থাকা, সেই অবস্থায় তাহাকে হাঁটানো, জুতাপেটা করিয়া উপুড় করিয়া শোয়াইয়া জন কয়েক কনেস্টবল তাহার পিঠের উপর উঠিয়া তাহার পিঠে

জুতার গোড়ালী দিয়া ঠোকর মারা প্রভৃতি।" ফলে বেচারী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং দিন কয়েকের মধ্যে মারা যায়।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মিলন—

গত ২০শে ও ২১শে বৈশাখ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধি সোসাইটী হলে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কুমার শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ মূল-সভাপতি এবং শ্রীযুত সুধীরকুমার মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ৬টি বিভিন্ন বিভাগে ৬টি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল এবং সাহিত্য বিভাগে শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, বিজ্ঞান বিভাগে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, জনশিক্ষা বিভাগে শ্রীসুকুমার ঘোষ, জনস্বাস্থ্য বিভাগে শ্রীমুরারীমোহন ঘোষ, শিশু সাহিত্য বিভাগে শ্রীসুনির্ম্মল বসু ও কাব্য বিভাগে শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এরূপ সম্মিলনের সার্থকতা আছে এবং যে সকল বিষয় সম্মিলনে আলোচিত হইয়াছিল, সেই বিষয়গুলির ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

এবারের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল—

এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩১৭৫ পরীক্ষার্থী ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১৮৪৬৫ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৯১৫ ছাত্র প্রথম বিভাগে, ৪৪২৯ দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১২০৯০ তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে এবারে শতকরা ৫৫·৫৬ ভাগ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে।

গল্প প্রভৃতি নাম, কাল, পাত্র সমস্যা—

'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত উপন্যাস, গল্প ও নাটকাদিতে ব্যবহৃত নাম, কাল, স্থান, পাত্র প্রভৃতি সমস্তই সম্পূর্ণ কাল্পনিক—একথা বোধ হয় বলিযা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। গল্প চিরদিনই গল্প, তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই; কাজেই যদি দৈবক্রমে কোন গল্পাদির নাম প্রভৃতির সহিত কাহারও নামাদির মিল হইয়া যায় তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত বলিয়াই ধরিয়া লওয়া উচিত। গল্পের মধ্যে কাহারও চরিত্র-চিত্রণ বা কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত আমাদের উদ্দেশ্য বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না।

উপাধি লাভ—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক, ভারতবর্ষের লেখক শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস-সি উপাধি লাভ



শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

করিয়াছেন জানিয়া আমরা প্রীত হইলাম। ক্ষিতীন্দ্রবাবু রসায়নের নানা বিভাগে মৌলিক গবেষণা করিয়া ইতিপূর্ব্বেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

মিঃ কে-বি-দত্ত—

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ কে-বি-দত্ত গত ২২শে মে রাত্রিতে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার জামাতা কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে-সি-মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতা ২৮ ক্যামাক্ ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মেদিনীপুরে বাল্যে শিক্ষালাভের পর তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াও মেদিনীপুরেই আইন ব্যবসা করিতেন। মেদিনীপুর বোমার মামলায় তাঁহার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং ১৯১১ সাল হইতে তিনি কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সাল হইতে তিনি পাটনায় ব্যারিষ্টারী করিতে থাকেন ও

তথায় তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল। মিঃ দত্ত স্বর্গত সিভিলিয়ান ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিন পুত্র ও ছয় কন্যা বর্ত্তমান। মিঃ দত্ত রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিতেন এবং সার সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত একযোগে কাজ করিয়াছিলেন।

কুমারী বাণী ঘোষের কৃতিত্ব—

নেপাল গভর্ণমেণ্টের ডাক্তার কাপ্তেন জে-এন-ঘোষের কন্যা কুমারী বাণী ঘোষ ১৯৩৯ সালে মাত্র ১০ বৎসর ৭ মাস বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। তিনি এবার আবার ১২ বৎসর ৭ মাস বয়সে আই-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। তাঁহার মত এত অল্প বয়সে আর কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করেন নাই।



কুমারী বাণী ঘোষ

যুদ্ধের সময়ের সুযোগ উপেক্ষা—

বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে এদেশে যে সকল শিল্পের উন্নতি-বিধান সম্ভব হইত, এ দেশের গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের অভাবে তাহার কিছুই হইল না—ইহা দেশবাসীর পক্ষে বিষম পরিতাপের বিষয়! অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে এই সুযোগে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে অনেক নূতন শিল্প বড় হইয়া উঠিতেছে। ১৯৪০ সালের জুলাই হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৫ মাসে অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট এজন্য ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ঐ সময়ে তথায় শিল্পোন্নতির জন্য ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট এখনও পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই করেন নাই। বরং আমাদের দেশে যুদ্ধের জন্য কাঁচা মালের অভাবে বহু দেশীয় শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার—

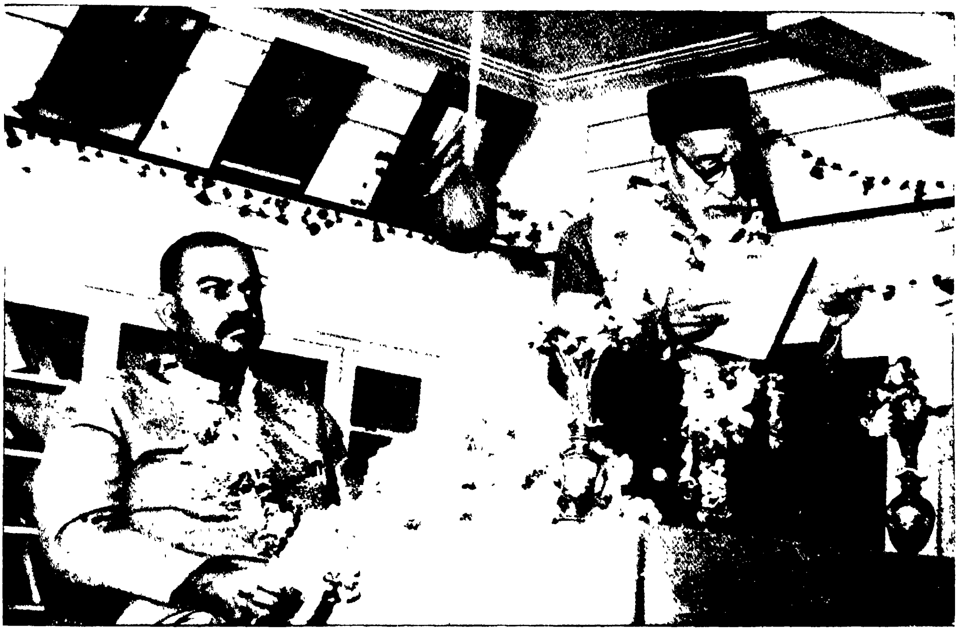
মাদ্রাজের খ্যাতনামা নেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সম্প্রতি ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১৬ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেলের কার্য্য করার পর তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ১৯২৬ সালে গৌহাটীতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। পরে কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত মতের অমিল হওয়ায় তিনি কংগ্রেসের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন স্বাধীনচেতা দেশসেবকের অভাব হইল।

যক্ষ্মা প্রতীকারে সরকারের ব্যবস্থা—

বাঙ্গালায় যক্ষ্মা রোগের বিরাট এবং ব্যাপক সংক্রমণের প্রতীকারার্থ বাঙ্গালা সরকার একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে বর্ত্তমানে যতগুলি রোগীর স্থান আছে তদতিরিক্ত আরও তিনশত রোগীর জন্য স্থান সঙ্কুলনের একটি পরিকল্পনা বাঙ্গালা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এইজন্য সরকার প্রাথমিক ব্যয় বাবদ এককালীন প্রায় এক লক্ষ টাকা বহন করিবেন এবং পরিচালনা বাবদ বরাবর যে ব্যয় হইবে তাহারও কতক অংশ বহন করিবেন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানে যে সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহাও চলিতে থাকিবে। শহরে শহরে যে সকল হাসপাতাল আছে তাহাদের মারফতে প্রাথমিক সাহায্য দান, যক্ষ্মা রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। প্রস্তাবটি খুব সমীচীন, ইতিপূর্ব্বেই ইহা কার্য্যে পরিণত করা উচিত ছিল। তবে বিলম্বে হইলেও শেষ পর্য্যন্ত যে সরকার এই দারুণ ব্যাধির প্রতীকারে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সাধুবাদ দেওয়া অন্যায় হইবে না।

পরলোকে কাইজার—

গত মহাযুদ্ধের প্রধান নায়ক জার্মাণীর কাইজার দ্বিতীয় উইল্‌হেল্ম সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর সিংহাসনচ্যুত হইয়া ডুর্ণে বাস করিতেছিলেন, সম্প্রতি বিরাশী বৎসর বয়সে তিনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি যৌবনে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অল্পকালমধ্যেই জার্মাণীকে সামরিক শক্তিতে, নৌবলে,



সম্মিলন-সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ



কলিকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের বার্ষিক উৎসব—(দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয়) বিচারপতি লর্ট উইলিয়ম—সভাপতি ও
(দক্ষিণ হইতে তৃতীয়) লেডী ডার্বিশায়ার—পুরস্কার বিতরণকারী



ইরাক-বসরার বিমান ঘাঁটি—বর্তমানে বৃটিশ সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত



ইরাক-বাগদাদের একটি দৃশ্য

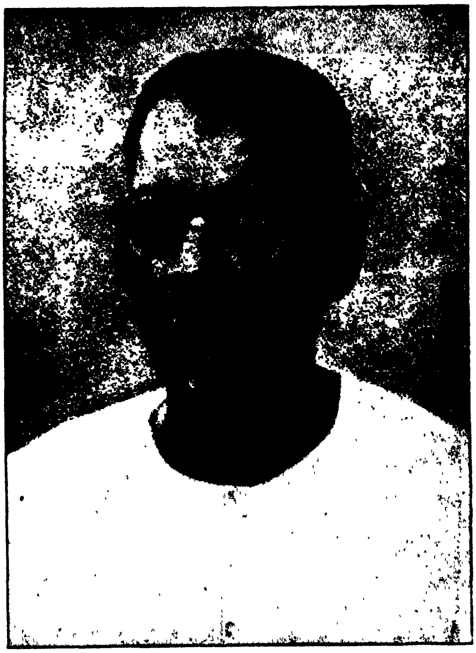


বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত ফরাসী সৈন্যদল

শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে ও শৌর্য্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে উন্নীত করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধারণা হইল—পৃথিবীর কোথাও এমন কোন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার ঘটিতে পারিবে না—যাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ যোগ থাকিবে না। কাজেই নেপোলিয়নের মত দম্ভভরে ইউরোপকে পদানত করিবার মতলবে ১৯১৪ সালে আগুন জ্বালাইলেন এবং ১৯১৮ সালে সেই আগুনে নিজে ও নিজের জাতিকে দগ্ধ করিলেন। অবশেষে স্বদেশের ও স্বজাতির জনগণের বিপ্লবের মুখে পড়িয়া মহাযুদ্ধে পরাজয় মানিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাইজারের মধ্যে যে অধিকার-প্রমত্ত স্বৈরাচারী দাম্ভিক নরপতির প্রভাব ছিল, সেই কাইজারের পতনের কারণ হইয়াছিল। তিনি নিজের চারিপাশের শক্তিমান লোকদের সহ্য করিতে রাজী হইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে জাতির স্বতন্ত্র অভিমতকেও স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না। তিনি কঠোর হস্তে সকলকে দাবাইয়া রাখিতেন কিন্তু অদৃষ্টের চাকা যখন ঘুরিল তখন জনগণ তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার অস্বীকার করিয়া বিপ্লবের মধ্যে জার্মাণীকে রাজাশূন্য 'রাষ্ট্রে' পরিণত করিল। আজ জার্মাণীর পরাজয়হীন সাফল্যের সংবাদ শুনিতে শুনিতে তিনি পরলোকগমন করিলেন; জার্মাণী তাহার জন্য শোক করিবে কি না বলা কঠিন, কিন্তু শক্তিমান মানুষের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহারা শক্তিমান কাইজারের ব্যক্তিত্বকে অন্তত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

ইণ্ডিয়ান টি-মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ড—

সম্প্রতি এই বোর্ডের যে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভারতীয় কল-কারখানাসমূহের শ্রমিকগণকে একটানা কঠোর শ্রমের মধ্যে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি ও আরাম দিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ইঁহারা যে সকল চা বিতরণের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলি চালু করিয়া মিল কর্তৃপক্ষের হস্তে এই সর্ত্তে তুলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা কর্ম্মলিপ্ত শ্রমিক-দিগকে যে কোন সময় নামমাত্র এক পয়সা মূল্যে এমনভাবে এক পেয়ালা উৎকৃষ্ট চা তৈয়ারী করাইয়া পান করিতে দিবেন—যাহাতে তাহাদিগকে কাজ ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে হইবে না এবং মূল্যের ঐ পয়সাটি কুপনের সাহায্যে পরে আদায় করা হইবে। এই ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষেরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বোর্ড তাঁহাদের রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে, এই ব্যবস্থায় মজুরদের ক্লান্তি, দ্রব্যোৎ-পাদনের হার এবং কর্ম্মক্ষমতা মিল-মালিকদের নিকট যে সমস্যাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও অবসান হইয়াছে।



ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক
৺বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—

চাউল বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য; ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গম, যব, জোয়ার, বাজরা, রাগি প্রভৃতি তণ্ডুলের প্রচলন আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা নাই। খুব কম লোকই আটা ময়দা নিত্য ভোজ্যরূপে ব্যবহার করে। সুতরাং চাউলের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইলে বাঙ্গালীর যতটা অসুবিধা, এত আর কাহারও নহে। যুদ্ধের অজুহাতে বাঙ্গালা দেশে এখন যে দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে তাহা মন্বন্তর-এর লক্ষণ বলিলে চলে। সাধারণতঃ মণ প্রতি চার টাকা মূল্যের চাউল সাত টাকা পার হইয়া গিয়াছে;

অন্যান্য চাউলের দাম ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু লোকের আয় কোনও রূপে বাড়ে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংসারে দারুণ কষ্ট উপস্থিত। অনাহারজনিত কষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লোকের উপায় কি? নানাস্থানে অনাহারে মৃত্যু ঘটিতেছে। উদরের জ্বালায় তিলে তিলে লোকের দেহক্ষয় হইয়া যাইতেছে। সরকারী মতে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ মণ কম চাউল উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্ম হইতে চাউল রপ্তানীতে নূতন শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় এবং যুদ্ধের জন্য মালবাহী জাহাজে স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় চাউলের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে, সুতরাং চাউলের দাম হইতেছে, তাহা অপেক্ষা বহু চাষী নিত্য চাউল কিনিতেছে। সে দিকটাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু কোনও কারণে যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যাহাতে প্রচুর চাউল আমদানী করা যায় তাহার চেষ্টা করা এখনই কর্ত্তব্য। দেশরক্ষা ও প্রজারক্ষার জন্য যুদ্ধ; কিন্তু যুদ্ধের কাজে জাহাজ লিপ্ত থাকায় যদি দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং মহামারি ঘটে, তাহা হইলে যুদ্ধের জন্য লড়িবে কে, কাহার স্বার্থেই বা যুদ্ধ! আমরা মনে করি, যুদ্ধোপকরণ বহনরত জাহাজে কিছু স্থান সঙ্কুলান করিয়া চাউল আনা হউক, ভিন্ন প্রদেশ হইতে গম প্রভৃতি পাইলে রেলে ভাড়ার সুবিধা করিয়া দিয়া সত্বর বাঙ্গালার বাজার পূর্ণ করা হউক।



শিক্ষার্থী ভারতীয় সৈন্যগণ (দেহের ওজন বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের প্রত্যহ এক পাউণ্ড দুধ খাইতে দেওয়া হয়)

এইভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণগুলি যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইলেও লোকের অনাহারের কষ্ট বা চাউল ক্রয় করিবার অর্থ সংগ্রহ করিবার বিপদ হ্রাস পাইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় যাহা, তাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারের হাতে। তাঁহারা এই সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় এ বিষয়ে তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না—তাহাতে চাষীর লাভে হস্তক্ষেপ করা হইবে। এই লাভ চাষীর হাতে আর নাই—আড়তদারদের ঘরে জমা চাউল বিক্রীত হইতেছে; অর্থাভাবে চাষী বহুদিন গোলা উজাড় করিয়া দিয়াছে। তাহার উপর যে কয়জন "চাষী" লাভবান তাহা না হইলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুটপাট চলিতে থাকিবে। যাহারা দুমুঠা পেটের অন্ন পাইলে শান্ত শিষ্ট ভদ্র এবং অতি প্রয়োজনীয় দেশবাসী থাকে, তাহারাই পেটের জালায় মাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টায় চোর, ডাকাত, বাটপাড় আখ্যা লাভ করিবে এবং কারাগারে বসিয়া দিনপাত করিতে বাধ্য হইবে। আর সময় নাই, এ বিষয়ে সরকার অবহিত হউন।

কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি—

প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য কোনও দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য চড়ে, ইহা

স্বতঃসিদ্ধ। চাউলের সঙ্গে বস্ত্রের এই ঘনিষ্ঠতার কথা বিচার করিয়া বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে লোকে অনেক দিন চুপ করিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা তাহা অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হয় এবং ইহার মধ্যে ব্যবসায়ী মহলের কিছু "হাত" আছে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। চাউলের ন্যায় তূলার উৎপাদন পূর্ব্ববৎসর হইতে হ্রাস পায় নাই, উপরন্তু জাপান অনেক কম পরিমাণ ভারতীয় তূলা গ্রহণ করাতে দেশে যথেষ্ট তূলা জমিয়া আছে। বাহির হইতে তূলার আমদানী গত বৎসর হ্রাস পায় নাই; এখন আমদানীর কিছু অসুবিধা হইতেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস, বুননের উপযুক্ত সূতা প্রস্তুত করিতে যে সকল মাড় (শ্বেতসার) প্রভৃতি বস্তু লাগে তাহার, পাড় ও কাপড়ের রং এবং কয়লা প্রভৃতি অন্যান্য জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় কাপড়ের দাম বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সকল দিক বিচার করিলে মনে হয় দুই টাকা মূল্যের কাপড় আড়াই টাকা, দুই টাকা দশ আনা হওয়া উচিত নয়। বর্ত্তমানে বস্ত্রাদি ভারতীয় কাঁচা মাল হইতে (রঞ্জনের বস্তু ব্যতিরেকে) প্রস্তুত হইতে পারে। বিদেশী দীর্ঘ-তন্তু কার্পাস না হইলে মিহি কাপড় পাইবার অসুবিধা, কিন্তু যাহারা মোটা কাপড় পরিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চায় তাহাদের কাপড়ের দাম এত বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। এখন লোকের যেরূপ অভাব তাহাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের কাপড় প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ভারত সরকার বহু টাকার বস্ত্রের তাগিদ দেওয়ায় এবং মালগাড়ীতে স্থানাভাব-প্রযুক্ত মাল চলাচলের সুবিধা হেতু যে দর বাড়িয়াছে, তাহার প্রতিবিধান করা একান্ত প্রয়োজন। কোনও বিশেষজ্ঞ দ্বারা কাপড় তৈয়ারী করিবার সমস্ত খরচের পড়্তার হিসাব করাইয়া, মিল মালিকদের সস্তায় কাপড় তৈয়ারী করাইবার উৎসাহ বা চাপ দিয়া কাপড়ের দাম হ্রাস করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব—অন্যান্য নানা অভাবের কথা বর্ত্তমানে ছাড়িয়া দিলেও—লোককে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবে। মাতা ভগ্নী স্ত্রী কন্যাকে অনাবৃত অবস্থায় দেখিয়া পেটের জ্বালায় মরিয়া লোক আরও দুঃসাহসিক হইয়া উঠিবে। এ সকল কথা কি কেহ গুরুতরভাবে চিন্তা করিতেছেন? আমরা ত তাহার কোনও লক্ষণই পাই না।

মায়ের চেয়ে দরদী—

বৃটিশ পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্য মিস রাথবোন সম্প্রতি 'কতিপয় ভারতীয় বন্ধুদের উদ্দেশ্যে'—এই শিরোনামা দিয়া কংগ্রেসকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। কংগ্রেস কেন বৃটিশ সরকারের সমরোদ্যমে সহযোগিতা করিতেছেন না ইহাই তাঁহার আক্ষেপের কারণ। আক্ষেপটা জহরলালজীর উপর দিয়াই বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত। পণ্ডিতজীর অপরাধ তিনি ইংলণ্ডকে অখণ্ডভাবে ভালবাসেন বলিয়া একবার প্রচার করিয়াছিলেন এবং এখন সেই 'ভালবাসা'র ইংলণ্ডকে এই দারুণ দুর্দ্দিনে তিনি কেন সাহায্যের জন্য হাত বাড়াইয়া দিতেছেন না। ইংরেজ ভারতের কত উপকারই না করিয়াছে, নহিলে ভারতীয়েরা আজও বর্ব্বরই থাকিয়া যাইত। শুধু ইহাই



ইরিত্রিয়ায় প্রহরীর কার্য্যে রত সুদান রক্ষীসৈন্যদলের ভারতীয় সৈন্যগণ

এই দরদী ইংরেজ মহিলার একমাত্র বক্তব্য নহে। তিনি তাঁহার এই বিবৃতিতে আরও শাসাইয়াছেন যে, ভারতের সাহায্য না পাইলেও ইংরেজ এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবেই; আর শত্রু পক্ষ যখন একদিন অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করিবে তখন যে নৃশংসতার অনুষ্ঠান করিবে তাহা জালিয়ানালাবাগের নৃশংসতাকেও হার মানাইবে। কিন্তু ইংরেজের জয় যখন সুনিশ্চিত তখন শত্রুর আক্রমণের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। আর সত্যই যদি ভারত আক্রান্ত হয় ও নৃশংসতার বন্যা বহিয়া যায় তাহা হইলে সেই জন্যও কি



আগ্রায় তাজমহলের সংস্কার—পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক নির্মিত বংশমঞ্চ

বৃটিশের কোন দায়িত্ব নাই। দুইশত বৎসরের শাসনের ফলে তাহারা আমাদের এমন সভ্য বানাইয়াছেন যে আত্মরক্ষার জন্য একখানা লাঠিও আমাদের বহিতে হয় না। কাজেই কুমারী রাথবোন পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিজের মস্তিষ্কের অসুস্থতার পরিচয় দিলেও ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর রাজনীতিকের যে মনোভাব আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপকারই হইবে।

কবির জবাব—

রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা হইতে মিস রাথবোনের নির্লজ্জ দম্ভোক্তির যে জবাব দিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহাতেই সম্ভব। মিস রাথবোনের উক্তিকে কবি ব্যক্তিবিশেষের অভিমত বলিয়া মনে করিলে কখনই তাহার জবাব দিয়া পত্র লেখিকাকে গৌরবান্বিত করিতেন না। আসলে ইহার পশ্চাতে তথাকথিত একদল ভারতহিতৈষী সাধারণ ইংরেজের মনোভাবই উঁকি মারিতেছে। কেন না, বহু ইংরেজই বিভিন্ন সময়ে গর্ব্বভরে বিশ্ববাসীকে জানাইয়া আসিয়াছেন যে, ভারতে বৃটিশ-শাসন ভারতের অবিমিশ্র উন্নতি কারণ। কিন্তু এই দুই শত বৎসরের দাক্ষিণ্যের ফলে ভারতের শতকরা কয়জনের উপর শিক্ষার আলোকপাত হইয়াছে? অথচ যেখানে মাত্র পনর বৎসরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা আটানব্বই জন বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে, সেখানে বৃটিশ শাসনে ভারতে পৌনে দুইশত বৎসরে শতকরা মাত্র একজনের ইংরেজী অক্ষর পরিচয় হইয়া থাকিলে তাহার জন্য গর্ব্বের কি আছে? ইহারই মধ্যে 'আমাদের যে সকল স্বদেশবাসী ইহার দ্বারা লাভবান হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কুশিক্ষাদানের সরকারী বৃটিশ প্রয়াস সত্ত্বেও লাভবান হইয়াছেন'—ইহাই কবির অভিজ্ঞতা। চীন, জাপান এবং আরও যেসব দেশ বৃটিশ পতাকাতলে জমায়েত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই, ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার কি তাহাদের জন্য রুদ্ধ হইয়া আছে? সেসব দেশে কি রেল-ষ্টীমার-ডাকঘর-তার-বেতার-টেলিফোন বসে নাই? তাহাদের কেহ কি শিক্ষায় শক্তিতে সুসভ্যতম রাষ্ট্রের সমকক্ষ হইয়া ওঠে নাই? পৌনে দুইশত বৎসরের সুশাসনে ভারত অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, দুর্ব্বলতার যে পাঁকে ডুবিয়া আছে, কবি সেই সব চিত্রও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, পানীয় নাই, শান্তি নাই, সততা নাই।

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তদন্ত কমিটী—

ঢাকা শহরে ও পল্লী অঞ্চলে সম্প্রতি যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গেল তাহার তদন্ত করিবার জন্য

সরকার একটি তদন্ত কমিটি বসাইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ম্যাক্‌নায়ার এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও সিভিলিয়ান মিঃ ম্যাক্ শার্প ইহার সদস্য। গত ২রা জুন সোমবার হইতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আরম্ভেই মিঃ ম্যাকনায়ার দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশে সংবাদপত্রের উপর যে বিধিনিষেধ ছিল তাহা তুলিয়া লইয়া বলিয়াছেন যে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইতে দিলেই বরং জনগণ আশ্বস্ত হইবে। তবে যাহাতে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটে এমন কিছু প্রকাশ না হওয়াই ভাল বলিয়া মনে হয়। হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি বিষয় তদন্ত কমিটির নিকট পেশ করিয়াছেন, কমিটিও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; পুলিশের কাজের বিচার করিতে হইবে এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন সেগুলি সঙ্গত এবং ঠিক ঠিক হইয়াছিল কি না এ সিদ্ধান্তও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে লোকে সাহস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং জনগণ যাহাতে মনের কথা নির্ভয়ে বলিতে পারে সে সম্পর্কে কমিটির আশ্বাস দেওয়া দরকার। আর এক কথা, আশা করি এবারে সনাতন ভাবে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ধামা চাপা না পড়ে।

খাক্‌সার দল বে-আইনী—

অবশেষে ভারত সরকারের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র খাকসার দল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারগুলিও অনুরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। কয় বৎসরে খাকসার দল দেখিতে দেখিতে শশীকলার মত এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে বর্ত্তমানে তাহাদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাও অনুভূত হইয়াছে। কিছুদিন আগে খাকসার নেতা আলামা ইনায়েতুল্লা খান মাশারিককে ভারতরক্ষা আইনের বলে আটক করা হয়। কারাগার হইতেও তিনি রাজবিদ্বেষ প্রচারে ব্রতী ছিলেন এবং প্রকাশ, জেল হইতে যেসব চিঠি প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহার কয়েকখানি বর্ত্তমানে সরকারের হেপাজতে আছে। খাকসারদলকে আবশ্যকমত দমন করিবার সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে প্রদান করিয়া ভারতহিতৈষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। বিলম্বে হইলেও আমরা সরকারী শুভবুদ্ধির প্রশংসা করি।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত। কংগ্রেস যখন হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন তখন হইতেই প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ের সম্পাদনায় পত্রিকাখানি কর্পোরেশন সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণকে জানিবার সুযোগ দিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশী বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া উপলক্ষে 'গেজেট' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া একদিকে যেমন বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর পক্ষে ছবিতে প্রবন্ধে সংখ্যাটি এমন মনোজ্ঞ করিয়াছেন যে সে জন্য সম্পাদক হোম মহাশয়ের সংগ্রহ-নৈপুণ্য ও রুচির জন্য প্রশংসা করিতে হয়।

আলো-নিকেতন—

জন্ম হইতে যাহারা অন্ধ বা ভাগ্যবিড়ম্বনায় যাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায় ভারতবর্ষে তাহাদের সংখ্যা তেমন কম নহে, প্রায় ছয় লক্ষ। অথচ ভগবানের এমনই মার যে, তাহা-দিগকে অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। অন্যান্য দেশে অবশ্য বিজ্ঞানের দৌলতে অন্ধদের স্বাবলম্বী হইবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইতেছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাইয়া তাহারা জীবিকার্জ্জনও করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভূত খ্যাতিও অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশ যেমন আর সব বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া আছে, এদিক দিয়াও তেমনই অগ্রসর হইতে পারে নাই। সম্প্রতি সেই অভাব দূরীকরণের জন্য 'আলো নিকেতন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি এমন পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে যাহাতে আশা করা যায় দেশের এই মহৎ অভাব দূরীভূত হইবে।

কবি রবীন্দ্রনাথ

"The Spiritual Ambassador of Asia to Europe"

শ্রীসুব্রত রায় চৌধুরী

পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে উপনিষদ্ বলেছেন—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ—

মস্নাবিরম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃস্বয়ম্ভূঃ···

তিনি জ্যোতির্ম্ময়- তিনি দেহহীন—তিনি শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ—তিনি কবি — তিনি মনীষী—তিনি পরিভূ—তিনি স্বয়ম্ভূ।

উপনিষদের ঋষি পরমাত্মাকে বলেছেন কবি। শঙ্কর কবির অর্থ করেছেন—ক্রান্তদর্শী—সর্ব্বদৃক্—যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকে দেখতে—যার দৃষ্টির সুমুখে বিশ্বভুবনের সমস্ত রহস্য—সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব—স্বতঃ উদ্ভাসিত—পূর্ণপরিস্ফুট।

সুদূর অতীতের সেই স্মরণাতীত গৌরবময় দিনগুলি হ'তে আরম্ভ করে ভারত আজিও 'কবি'র এই পরিকল্পনাই নানাভাবে নানাছন্দে প্রকাশ করে আসছে। কবির মাঝে ভারত দেখেছে পরমাত্মার প্রকাশ। কবিত্বের উন্মুক্ত উৎসকে ভারত তাই বরণ করেছে "অলৌকিক আনন্দের ভার" বলে। কবি প্রতিভাকে ভারত তাই সম্ভ্রমভরে স্বীকার করে নিয়েছে "অগ্নিসম দেবতার দানের" মতন—যে দান "ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।" ভারত তাই কবিকে দেখেছে "বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ" দিব্যদর্শীরূপে। মানুষের যে "ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে, ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে"—যে ভাষা পৃথিবীর "ধূলি ছাড়ি, একেবারে উর্দ্ধমুখে অনন্ত গগনে

উড়িতে সে নাহি পারে"—

সেই ভাষাকে—"অনন্ত আভাষে, অর্থভেদী, অভ্রভেদী সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে—আত্মবিদারণকারী মর্ম্মান্তিক মহান্ নিশ্বাসে"—অনুপ্রাণিত করে তুলবার অসীম গৌরব ভারত দিয়েছে তার 'কবি'কে। ভারতের কবি চেয়েছে মানবের 'জীর্ণবাক্যে' নব নব সুর দিতে—'গুরুভার পৃথিবীরে' তার স্বর্গ হতে নেমে আসা ছন্দের স্যন্দনে চড়িয়ে উর্দ্ধপানে টেনে নিয়ে যেতে —'কথা'রে নিয়ে যেতে 'ভাবের স্বর্গে'—মানবেরে প্রতিষ্ঠিত করতে দেব-পীঠ স্থানে। ভারত তাই কবিকে বলেছে—ক্রান্তদর্শী—সর্ব্বদৃক্—"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা।"

"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা!"—যা কিছু দেখবার সবই খুলে যায় কবির দৃষ্টির সুমুখে—যা কিছু জানবার সবই প্রতিভাত হয়ে ওঠে কবির মানসপটে, —মানুষের অন্তরের অজ্ঞাত রহস্য—তার হৃদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব—মানুষের আনন্দ-নিরানন্দ—তার প্রেম-বৈচিত্র্য—তার বিরহের ব্যথা—তার মিলনের মাধুর্য্য—তার প্রণয়স্বপন—তার 'পূর্ব্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান!' শুধু কি তাই?—ক্রান্তদর্শী কবির মুগ্ধ নয়নসুমুখে উদ্ভাসিত হয়ে যায় 'যত গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে!' সে যেন মিশে যায় 'লতা-পাতা-চাঁদ-মেঘের সহিতে' একেবারে এক হয়ে! তার স্বপনমাখা নয়নে যেন ভেসে ওঠে—চাঁদের মতন স্নিগ্ধ চাহনি! সে যেন তার 'অলক্ষ্য মনোরথে' ঘুরে ফিরে বেড়ায়—বায়ুর মতন—বিশ্বপ্রকৃতির শ্যামল বুকে!—তার অফুরন্ত রহস্যরাশির মাঝে! ভোরের গগনে সূর্য্য যেমনি তার অরুণ নয়ন মেলে চায়, কবি বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে দেখে মাটির সরোবরের বুকে ফোটা প্রেমমুগ্ধা কমলিনীর পানে—কেমন করে সে তার স্নিগ্ধ পরাণখানি মেলে দেয়—কেমন করে সে বিলিয়ে দেয় আকাশে বাতাসে তার মধুর সৌরভ—কেমন করে সে ছড়িয়ে দেয়—সরোবরের তলতল ছলছল জলরাশির বুকে তার জেগে-ওঠা প্রাণের হাসির মাধুর্য্য! উদ্বেলিতপ্রাণে কবি গেয়ে ওঠে তার আনন্দ-সঙ্গীত—বিস্ময় ছড়িয়ে দেয় তার অমৃতবার্ত্তা—বলে—

"নরনারী, শুন সবে,

কতকাল ধ'রে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে।

এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত—আকাশের চাঁদ চাহি'

পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ্ নাহি।

উদয় অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে

এতকাল ধ'রে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন ছলে।

এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে

বড়ো বড়ো যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে।"

এই যে ভুবনজোড়া গোপন মনের মিলন—'বড়ো বড়ো যত পণ্ডিতজনা' তাঁদের ধীশক্তির তীব্রোজ্জ্বল আলোক সম্পাতে যে মিলনের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন নি—সে মিলন মাধুর্য্যের সুধাস্নিগ্ধ অনুভূতি প্রথম যার ভাবমুগ্ধ হৃদয়ে জেগে ওঠে—সে ভারতের কবি! কিন্তু সে কি শুধু ভারতের কবি? ভূমানন্দে রোমাঞ্চিত সে কবির কণ্ঠ হ'তে যে উদাত্ত বাণী উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সে অমৃতবাণী তো কোন সীমার মাঝে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না!—সে বাণী ওঠে 'আদি অন্তবিহীনের অখণ্ড অমৃতলোকপানে'—সে বাণী প্রচার করে সীমার মাঝে অসীমের বিকাশ—মানবের হৃদয়ে ভূমার প্রকাশ—সে বাণী ব্যক্ত করে বিশ্বপ্রকৃতির গোপন হৃদয়ের 'কলমর্ম্মর' কথা—সে বাণী খুলে দেয় মানবের নিগূঢ় মর্ম্মের রুদ্ধ উৎসমুখ—সে বাণী ভাষা দেয় প্রকৃতির নিবিড় মিলন মাধুর্য্যে—মানবের চিরন্তন পূর্ণপ্রকাশের প্রার্থনায়! তাই সে কবি শুধু ভারতের কবি নয়—সে কবি বিশ্বভুবনের কবি!—ভূলোকের কবি!—দ্যুলোকের কবি!

'কবি'র এই সুমহান্ পরিকল্পনা মহর্ষি বাল্মীকি হ'তে আরম্ভ করে বাণীর যে সব বরপুত্রগণের মাঝে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—বর্ত্তমান যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ আপনার মহিমময় আসনখানি পেতেছেন তাদেরই মাঝে—

সগৌরবে। তাঁর কবিত্বের অফুরন্ত উৎস ছড়িয়ে গেছে দূর হ'তে দূরে—দেশ হ'তে দেশান্তরে—পৃথিবীর বুকে—অনন্ত গগনে—কোন সীমার বাঁধন মানে নি—যেন উড়ে চলেছে 'মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ'—'জগতের মর্ম্মদ্বার করি উদ্‌ঘাটন !'

কবি রবীন্দ্রনাথ মানুষের বুকের কাছে কান পেতে শুন্‌তে পেয়েছেন তার মনের আড়ালে সচ্চিদানন্দময়ের মধুর সঙ্গীত !—তাঁর আনন্দ-উদ্বেলিত প্রাণ তাই গেয়ে উঠেছে—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর !"

—সে সুর কবিকে উতলা করে তুলেছে—তাঁর সত্যান্বেষী প্রাণে জাগিয়ে তুলেছে 'আবি'র অন্বেষণ—তাঁর মনের গহন হ'তে যেন প্রশান্তমন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে মানবের সেই চিরন্তন প্রার্থনা—পূর্ণপ্রকাশের প্রার্থনা—'আবিরাবীর্ম্ম এধি !'—ক্রান্তদর্শী কবি তাঁর সর্ব্বদর্শী দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেয়েছেন মাটির মানুষের মাঝে পরমজ্যোতির্ম্ময়ের পূর্ণ বিকাশ !—তাঁর পুলকস্পন্দিত কণ্ঠে অমনি বেজে উঠেছে মিলনের মহাগীতি—

'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর !'

—সেই মাধুর্য্যের বিপুল প্লাবনে কবির চিত্ত আনন্দে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে—কবি আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত বিশ্বভুবনে—কবি আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন বিশ্বমানবের মহাসাগরে !—মিলনের সে আনন্দ-লহরী লীলায় দুলে দুলে ভাবমুগ্ধ কবি পরিপূর্ণ হরষেভরে তাই গেয়েছেন—

— 'তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে !'—

—মুগ্ধ কবি তাঁর বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করে দেখ্‌তে পেয়েছেন তারই অন্তরলোকে 'আবি'র প্রকাশ। সে 'আবি' তাঁর জ্যোতিস্নাত অন্তরকে উদ্ভাসিত করে যেমনি মিলিয়ে দিয়েছে তাঁর সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, আনন্দ নিরানন্দকে একই নিবিড় পুলক প্লাবনে—আত্মহারা কবি অমনি গেয়ে উঠেছেন—"হেসে-কেঁদে"—

"তোমার আলোয় নাই ত ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর !"

—আত্মানুসন্ধী কবির এ গানে বেজে উঠেছে সেই চিরন্তন মহামন্ত্র, যে মন্ত্র উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন সেই বৈদান্তিক যুগের দিব্যজ্ঞানদীপ্ত ঋষি :—

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥"

—অন্তর্দর্শী কবির এই গানে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সেই সুদূর অতীতের স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষির আনন্দাপ্লুত মহাসঙ্গীত :—

—একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।—

—অন্তর্দর্শী কবি মানুষের বহির্মুখী দৃষ্টিকে তার অন্তরের অভিমুখে ফিরিয়ে দিয়ে এম্‌নি করে তাকে শাশ্বত সুখের সন্ধান বলে দিয়েছেন—মানবের হৃদয়-'গুহাহিত' অন্তরাত্মার সাথে নিবিড়তম মিলনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এই মিলনই যে মানবের চিরবাঞ্ছিত মিলন !—এই মিলনের সুধাস্রোতেই যে মানুষ পৌঁছুবে তার অন্তরের অমৃতলোকে !—এই মিলনই যে মুক্ত করে দেবে তার হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার—মেলে দেবে তার নয়ন সুমুখে ভূমানন্দের অমৃত ভাণ্ডার !—কবির সুরে সুর মিলিয়ে মানুষ ভাবমুগ্ধ কণ্ঠে গেয়ে উঠ্‌বে :—

—"যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে !"—

মানুষ মিলে যাবে মানুষের সাথে !—মানুষ মিলে যাবে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে—মানুষ মিলে যাবে সেই দেবতার সাথে—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যঃ বিশ্বভুবনম্ আবিবেশ
যঃ ওষধিষু যঃ বনস্পতিষু……!"

—মানুষ তার আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে আপনাকে ছড়িয়ে দেবে—

"সমস্ত ভূলোকে—প্রান্ত হ'তে প্রান্ত ভাগে
উত্তরে, দক্ষিণে, পূরবে, পশ্চিমে !"—

মানুষ তার উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল 'মানস-সুরধুনি' পার হয়ে "ঝলকে ঝলকে" ছুটে যাবে মিলনের মহাসাগর পানে—তার সঙ্কীর্ণ কামনা বাসনার তরঙ্গ-মালাকে উপেক্ষা করে, আশা আকাঙ্ক্ষায় অবিচলিত থেকে, হতাশা ব্যর্থতার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন না হয়ে, ব্যথা বেদনার অশনি সম্পাতকে তুচ্ছ করে ! মানুষ নিজেকে ব্যাপ্ত করে দেবে বিশ্বময়—

"বিদারিয়া এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার !……"

যে কবির গানে এমনি করে বেজে উঠেছে মানুষের সাথে মানুষের এই নিবিড় মিলন—"লতা-পাতা-চাঁদ-মেঘের সহিতে" মানুষের এই এক হয়ে মিশে যাওয়া—সে কবি তো কোন দেশের কবি নয়, সে কবি তো কোন জাতির কবি নয়, সে কবি তো কোন কালের কবি নয়। দেশ, কাল, জাতির সীমারেখাকে ছাপিয়ে সে কবি আপনাকে প্রসারিত করে দিয়েছে সমস্ত দেশে, সমস্ত কালে—আপনাকে মিশিয়ে দিয়েছে সমস্ত জাতির মাঝে। তাই আমাদের রবীন্দ্রনাথ আজ আর শুধু আমাদেরই কবি ন'ন—তিনি বিশ্বের কবি। ভারতের রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতেরই কবি ন'ন—তিনি পৃথিবীর সর্ব্বমানবের কবি। বাঙ্গালার শ্যামল বুকে সস্নেহে-বর্দ্ধিত রবীন্দ্রনাথ শুধু বঙ্গ-প্রকৃতিরই কবি ন'ন—তিনি বিশ্ব-

প্রকৃতির কবি। এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু এ যুগেরই কবি ন'ন—তিনি সর্ব্বযুগের কবি। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আজ সমস্ত জাতির কবি—সর্ব্বমানবের কবি—ভূলোকের কবি—দ্যুলোকের কবি!

কবির এই মহামানবতার যাদুদণ্ডস্পর্শে সমস্ত পৃথিবী যেন পুলকময় বিস্ময়ে চকিত হয়ে উঠেছে—পৃথিবীর সুধীবৃন্দ যেন বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন কেমন করে কবি তাঁর অভিনব কবিত্ব-তরণীখানি বেয়ে

—"কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!"—

প্রতীচীর পূজ্যপাদ সুধী Romain Rollandর মুগ্ধকণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—"In Tagore we have intelligence, free-born, serene and broad, seeking to unite aspirations of all humanity in sympathy and understanding."

তাই Romain Rolland রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে সম্ভ্রমভরে বলেছেন—"Tagore is intellectually universal"—যাঁর বিরাট মন, যাঁর অফুরন্ত ধীশক্তি "had been nourished on all the cultures of the world." বিশ্ববরেণ্য Romain Rolland তাঁর জ্ঞানদীপ্ত নয়নের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের পানে চেয়ে বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখ্‌তে পেয়েছেন—"The Spiritual Ambassador of Asia to Europe!"—যে Spiritual Ambassadorএর বিরাট গম্ভীর বক্ষ হ'তে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনোৎসবের মহাবাণী উথলিত হয়ে উঠেছে—যিনি অপূর্ব্ব আশ্বাসভরে গেয়েছেন :—

"নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন অনাগত বরষে
তব মঙ্গল শঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার
ভেদি' বণিকের ধন ঝঙ্কার
মহাকাশ তলে উঠে ওঙ্কার
কোন বাধা নাহি মানি।"

প্রতীচ্যজগতের আর একজন প্রখ্যাতনামা সুধী—Ernest Rhys—এই মিলন-সঙ্গীতকে শ্রদ্ধাবনত শিরে সংবর্দ্ধিত করে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলেছেন—

"Blake might have imagined that and St. Francis thought it, and it is a message that is welcome whenever it comes. It may come by the saints and it may come by the poets; and if it with the latter kind that Rabindra Nath Tagore is ranged, it is because, through his lyric power, he is most likely in the end to prove its messenger."

কবির সুধাস্নিগ্ধ গানের ঝঙ্কারে বিশ্বমৈত্রীর যে আনন্দ মন্ত্র বেজে উঠেছে সে মন্ত্র জাতির সঙ্কীর্ণতা, দেশের সীমারেখা সব লঙ্ঘন করে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করেছে বিশ্ববাসী সমস্ত মানবকে—বলেছে—

"আনন্দেরি সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বস্‌রে সবাই
টান্‌রে সবাই টান্!"

আবছায়া

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

কল্পনা স্রোতে হাজার হাজার ফুল
নিত্য ভাসিয়া যায়
স্বপন বিলাসে নর্ম্মলীলায় তারা
কত কি কহিতে চায়।
কান পাতি যবে ব্যাকুল বাসনালয়ে'
চির মৌনতা রাজে—
রক্তিম হয় প্রাণের বলাকা মোর
আশাহতদের লাজে।

এলায় দেহটী অলস ঘুমেতে
মায়ার সমাধিতলে
সিন্ধু-শকুন ক্ষুধিত সাগরবুকে
ভাসে দেখি দলে দলে;
দুঃসাহসেতে তাদের ধরিতে যাই
কুয়াশা ঘনায়ে আসে
বিরহ-বিধুরা ক্রুর নাগিনীর
অকরুণ নিশ্বাসে।

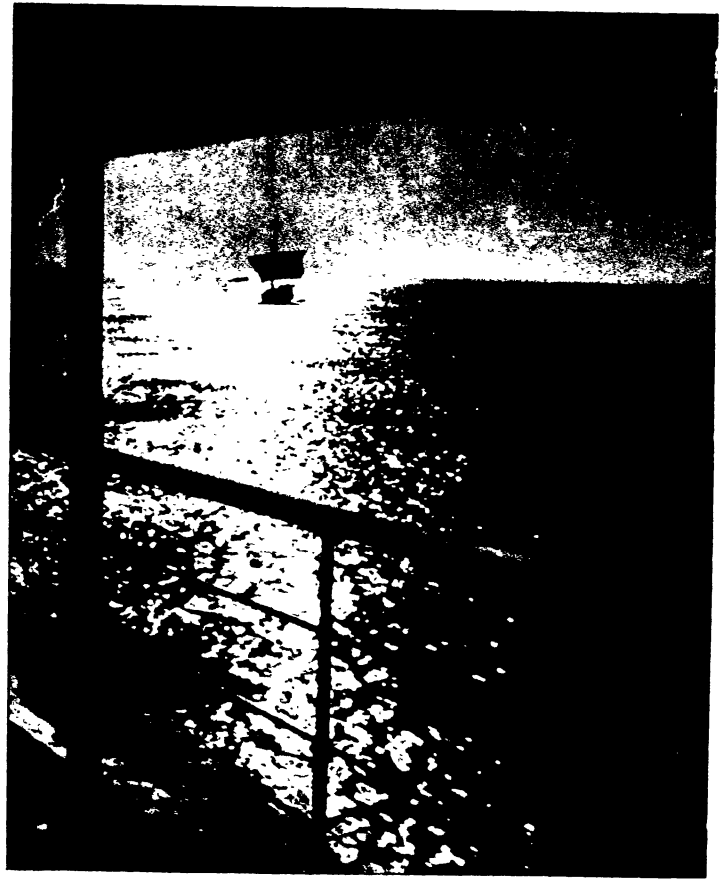


লাহোরে করাচী কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুত লালজী মেহোত্রা। মধ্যস্থলে



গুরু রামদাসের জন্মদিনে অমৃতসরে স্নানার্থী পাঞ্জাবী জনতা





রায়, গৌহাটি

১ ৫ ৮



খাম্বাজ—একতালা

ধীরে ধীরে ধীরে কাল-স্রোত-নীরে বরষ ভাসিয়া যায়,
ফিরিবে না আর অনিবার গতি, জানিনা কোথায় ধায়।
ফুটেছিল কত কুসুম সুবাস, বিতরি সমীরে সুরভী নিশ্বাস,
শুকায়েছে সব গিয়েছে গৌরব, চিরতরে তারা গিয়েছে হায়।
আশার লহরী নব নব রঙ্গে ফুটিয়াছে কত সুধীর তরঙ্গে,
না হ'তে নিরাশ প্রাণের পিয়াস, মিশিয়ে গিয়েছে অনন্ত কায়।
যত্ন পরিশ্রম সুখ দুখ-ভার, হরষ বিষাদ আলোক আঁধার,
তাঁর চিত্রখানি স্মৃতিপটে আনি, বিগত বরষে দাও বিদায়॥

কথা ঃ—
স্বর্গত বলীন্দ্র সিংহ দেব বাহাদুর

সুর ও স্বরলিপি ঃ—
সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
{ গা মা পা | ধা র্সা ণা | ধা পধা পা | মা গরা গা | গা মা পা | ধা পা র্সা |
ধী রে ধী রে ধী রে কা ল স্রো ত নী০ রে ব র ষ ভা সি য়া

২ ৩ ॥ ০ ১ ২
না র্সা ণা | ধা া া } | পা ধা ণা | র্রা র্সনা র্সা | র্সা ণা ধা | পা মা গা |
যা ০ ০ য়্-- ফি রি বে না আ০ র্ অ নি বা র্ গ তি

০ ১ ২´ ৩
সা মা গা | মা পা -া | গমা পধা:নর্সা | ণধা পমা গরা ॥
জা নি না কো থা য়্ ধা০ ০০০০ ০০ ০০ ০য়্

	০	১	২´	৩	০	১
{	গা মা মা	ণা ধপা ধা	না না র্সা	না র্সা র্সা	না র্সা র্রা	র্রা র্সা র্সা
(১)	ফু টে ছি	ল ক ০ ত	কু সু ম	সু বা স	বি ত রি	স মী রে
(২)	আ শা র	ল হ ০ রী	ন ব ন	ব র ঙ্গে	ফু টি য়া	ছে ক ত
(৩)	য ত্ন প	রি শ্র ০ ম	সু খ দু	খ ভা র	হ র ষ	বি ষা দ

	২´	৩	০	১	২´	৩
	না র্সর্রা র্সা	ণা ধা ধা }	র্সা ণা ধা	পা মা গা	মা ধপা ধা	না র্সা র্সা
(১)	সু র ০ ভী	নি শ্বা স্	শু কা য়ে	ছে স ব্	গি য়ে ০ ছে	গৌ র ব্
(২)	সু ধী০ র	ত র ঙ্গে	না হ তে	নি রা শ	প্রা ণে ০ র	পি য়া স্
(৩)	আ লো০ ক	আঁ ধা র	তাঁ র চি	ত্র খা নি	স্ম তি ০ প	টে আ নি

	০	১	২´	৩
	পা র্সা না	র্সা র্রা র্সা	না র্সা ণা	ধধা পনা গা ‖
(১)	চি র ত	রে তা রা	গি য়ে ছে	হা০ ০ য়্
(২)	মি শি য়ে	গি য়ে ছে	অ ন ন্ত	কা০ ০ য়্
(৩)	বি গ ত	ব র ষে	দা ও বি	দা০ ০ য়্

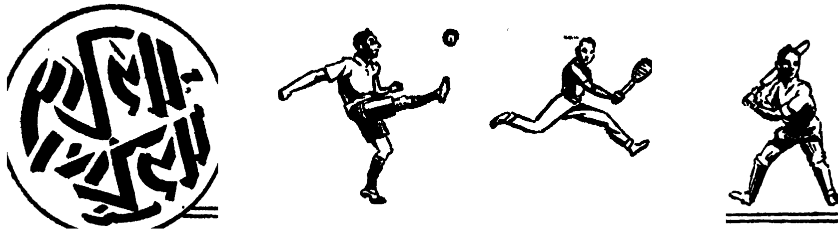
বাপীতটে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গন্ধবহে তালাবন আন্দোলিত পল্লীপ্রান্তভাগে,
দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে দিগঙ্গনা হোলো পথহারা।
ঝঙ্কার মঞ্জীর বাজে, দূর হ'তে কেকাধ্বনি জাগে,
এখনি নামিবে ঘাটে বরষার বরিষণধারা।
সন্ধ্যার আঁধারে এল মসীকৃষ্ণ নব ঘনবীথি—
অন্ধকারে মিশে গেছে বাঁকাচোরা ধূলি পথরেখা।
বাপীতটে শ্যামা মেয়ে নিরালায় জাগে না কি ভীতি!
গুরু গুরু ডাকে মেঘ—তুমি মেয়ে কেন ঘাটে একা?

কে জানে কখন কোথা নভ হ'তে পড়িবে কুলীশ,
বিহঙ্গের ক্ষুদ্র নীড় ভেঙ্গে যাবে দুরন্ত বাতাসে;
হয়তো উড়িয়া যাবে বনানীর উন্নত উষ্ণীষ
কেমনে রহিবে হেথা রজনীতে গভীর হতাশে!
ধরার উত্তরী হ'তে কেতকীর গন্ধ ওঠে জেগে,
কাজলজলদবেণী লুটায়েছে আষাঢ়ের বুকে।
সীমাহীন নীলাকাশ চন্দ্র-তারা-ছায়া পথ ঢেকে
মনের আকাশে তব কি বেদনা আঁকিতেছে দুখে!

বাপীর বিটপী শাখে ত্রস্ত হয়ে' ডাকে সন্ধ্যাপাখী,
তুমি কি গো শ্যামা মেয়ে বাদলেরে আনিতেছ ডাকি!





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল লীগ ঃ

খেলার মাঠের প্রধান আকর্ষণ ফুটবল মরসুম বাঙ্গলা দেশে আবার ফিরে এসেছে। ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা বাঙ্গলা দেশেই অধিক এবং সে জনপ্রিয়তার ষোল আনাই ক'লকাতার মাঠে। ক'লকাতার ফুটবল মরসুম খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদিদের বহু দূরবর্ত্তী দেশ থেকেও আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ উপেক্ষার নয়। খেলা আরম্ভ হবার বহু পূর্ব্বেই ছেলের দল স্কুল কলেজ পালিয়ে, কাজের লোক কাজ উপেক্ষা ক'রে এবং অফিসের চাকুরে বাবুরাও কেহ অনুমতি কেহ বা অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই খেলার মাঠে হাজিরা দেন। প্রখর রৌদ্রে এবং শ্রাবণের অবিরাম বরিষণেও দর্শককুল নিরস্ত হ'ন না। বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার এ আকর্ষণ একদিন কর্পূরের মত যে উপে যেতে পারে এ ভয়ঙ্কর কল্পনা কেহ হয়ত করতে ভরসা পান নি। কিন্তু ফুটবল খেলার আকর্ষণ যে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে তা কয়েক বছরের হিসাবেই বেশ বুঝতে পারা যায়। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড পূর্ব্বে যে ভাবে বজায় ছিল তা আজ আর নেই। মাত্র কোন বিশেষ ক্লাবের খেলার মধ্যেই ফুটবলের যা কিছু উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুশীলন খেলা ব্যতীত খেলোয়াড়দের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ফুটবল খেলার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের এখানে নেই। কোন কোন ফুটবল প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এবং কষ্ট স্বীকারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ভাল খেলোয়াড় সংগ্রহের চেষ্টা করেন সে পরিমাণ উদ্যম যদি ক্লাবের তরুণ খেলোয়াড়দের ফুটবল শিক্ষার উপর নিয়োজিত করতেন তাহ'লে বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার ইতিহাস সত্য সত্যই এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ লাভ করত, আর বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলা যে সম্পূর্ণ অবাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়েই অদূর ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রিত হবে সে দুর্ভাবনাও আজ দূর হ'ত।



টি চৌধুরী



এ রায় চৌধুরী



এস মিত্র

এবৎসর ক'লকাতার মাঠে বিভিন্ন বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার খেলাগুলি আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু পূর্ব্বের আকর্ষণ আর নেই। প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে কোন কোন দল লীগ কোঠায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে আর কোন দলই বা শোচনীয় খেলার পরিচয় দিয়ে লীগ তালিকার সর্ব্ব নিম্ন স্থান অধিকার ক'রে নিম্ন বিভাগে নেমে যাবে এ গবেষণায় আজ আর কাহারও উৎসাহ নেই। যাঁরা ক্লাবের স্থায়ী সভ্য তাঁরাই ক্লাবের নির্দ্দিষ্ট সভ্যদের আসনগুলি কোন রকমে ভর্ত্তি রেখে খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত ক'রছেন। কিন্তু সে 'চিয়ার আপ'-এর স্বর যেমনই অনুচ্চ তেমনি নিরুৎসাহজনক। সাধারণ দর্শকদের আসনগুলি থেকে যে উচ্ছ্বাস ধ্বনি

খেলোয়াড়দের খেলায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনত তার অভাব আজ সকলেই অনুভব করছেন। খেলার মাঠে



এস গুঁই



রসিদ খাঁ

গত কয় বৎসরে যে পরিমাণ দর্শক সংখ্যার সমাগম হ'ত তার কিছুই নেই। চ্যাম্পিয়ানসীপের সম্মান থাকলেও লীগ তালিকায় এতদিনের প্রচলিত উঠা নামা এবৎসর স্থগিত রাখার জন্য খেলোয়াড়দের খেলায় উৎসাহ যে অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে তা স্বাভাবিক। ফলে খেলার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব সর্ব্বক্ষণেই বেশ অনুভব করা যায়। এ অভাব যেমন খেলোয়াড়দের উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় থেকে বঞ্চিত করে তেমনি দর্শকদের প্রবল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে মাঠে উপস্থিত থাকতে নিরস্ত করে। সমস্তক্ষণের একঘেয়েমী সকলের এমনই পীড়া-দায়ক হয় যে, এতদিনের খেলার মাঠে হাজিরা দেওয়ার অভ্যাসকে ক্রীড়ামোদীরা স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করতে রাজী হ'ন। এবৎসর যতগুলি খেলা হয়েছে তার দু' একটি খেলা ব্যতীত সমস্তগুলিই একরকম দর্শকশূন্য ঘেরা মাঠের মধ্যে শেষ হয়েছে। দর্শক সংখ্যা হ্রাসের আর যে সব কারণ রয়েছে তার মধ্যে আর্থিক কারণও প্রধান। ইউরোপে যুদ্ধ চলেছে। বহু দূরবর্ত্তী স্থানে থেকেও তার প্রতিক্রিয়া হতে আমরা রক্ষা পাই নি। সে প্রতিক্রিয়ার প্রবলতাকে উপেক্ষা ক'রে অর্থ ব্যয়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য খেলার মাঠে উপস্থিত হওয়া আমাদের দেশের অনেকের ইচ্ছা থাকলেও সকলের সামর্থ্যে কুলায় না। অন্ন চিন্তাকে উপেক্ষা ক'রে অন্যদিকে চিত্ত বিনোদনের জন্য অর্থ ব্যয় আজ খুব কম দর্শককে খেলার মাঠে প্রলুব্ধ করে। যারা অমিতব্যয়ী তাদের কথা স্বতন্ত্র।

এ পর্য্যন্ত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যতগুলি খেলা হয়েছে তাতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের পথে এবৎসর যে কোন দল বাধা দিতে পারবে এমন শক্তিশালী দলের পরিচয় লীগ খেলায় বিভিন্ন দলের খেলা দেখে পাওয়া যায় নি। ত'বে খেলায় অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা স্বতন্ত্র।

প্রতিযোগিতায় এরূপ প্রহসন মর্ম্মন্তুদ হলেও বিরল নয়। পৃথিবীর বহু শক্তিশালী দলকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দলের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে দুর্দ্ধর্ষ মহমেডান দলকে ইষ্টবেঙ্গল দল কয়েকবারই পরাজিত করেছিল। ইষ্টবেঙ্গলের সে জয়লাভ অপ্রত্যাশিত নয়, মহমেডান দলের কাছে বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হওয়ায় ইষ্টবেঙ্গল মহমেডান দলের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বৎসরের লীগের প্রথমভাগে মহমেডান দল ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় জয়ী হয়ে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তাদের খেলা বাকি আছে। মোহনবাগান বর্ত্তমান লীগ তালিকায় সমান খেলে মহমেডান দলের চেয়ে এক পয়েন্ট কম পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এ বৎসর কয়েকজন নূতন খেলোয়াড় যোগ দিয়ে এই দলের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এস মিত্র ও এস গুঁইয়ের গুরুতর আঘাত লাগায় তাঁরা খেলায় যোগদান করছেন না। আক্রমণ ভাগের খেলার গতি তাঁদের অভাবে অনেকখানি ধীর হয়েছে। এস গুঁই পরে যোগদান করলেও তাঁর খেলার স্বাভাবিক গতিবেগ থাকবে কিনা সন্দেহ। এস মিত্রের



পি দাশগুপ্ত



জুম্মা খাঁ

পুনরায় এ বৎসরের খেলায় যোগদান করার কোন রকম সম্ভাবনা নেই। সুতরাং মহমেডান দলের সঙ্গে লীগের

প্রথম খেলার ফলাফল কি দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু ধারণা করা যায় না। এ বৎসরের প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় একমাত্র মোহনবাগান এবং মহমেডান দলই কোন দলের কাছে এ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নি। ইষ্টবেঙ্গল একটা কম খেলে তৃতীয় স্থানে এখনও রয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তা'হ'লে এই তিনটি ক্লাবের মধ্যেই চলবে। অপরাপর দলগুলির খেলা সে রকম উল্লেখযোগ্য নয়। কোন কোন দলের খেলা এমনই নৈরাশ্যজনক অবস্থায় এসে পড়েছে যে, তাদের প্রথম বিভাগের প্রতিযোগিতায় যোগদান করার ফলে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নস্তরে নেমে এসেছে। চতুর্থ বিভাগের খেলার সঙ্গেই তাদের তুলনা চলে। গত বৎসরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্সকে ৬-১ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দল পরাজিত কোনদিন শেষরক্ষা করতে পারল না। এরিয়ান্স ৫-০ গোলে মহমেডান দলের কাছে হেরেছে। লীগে ইতিমধ্যে ৬টী খেলায় তাদের হার হয়েছে। পর পর হেরেছে পাঁচটায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মিলিটারী এবং ইউরোপীয়ান দলের কাছে ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের যেভাবে বিপর্য্যস্ত হ'তে



পৃথিবী বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জোলুই 'checker game' খেলছেন



খেলাধূলায় অনুশীলনরত পাঞ্জাবের 'এ্যাথলেট'গণ

ক'রে এবারের লীগ প্রতিযোগিতায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। দল হিসাবে ইষ্টবেঙ্গলের নাম আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হয়েছিল এবার তার পুনরাবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নেই। শক্তিশালী মিলিটারী দলের যেমন অভাব, সবুট ইউরোপীয়ান

খেলোয়াড়দের দলের পূর্ব্ব গৌরব, জাতির সম্মান রক্ষার তেমনি ব্যর্থ প্রয়াস। ইউরোপের যুদ্ধের ফলাফলের উপর



পাঞ্জাব লন টেনিসের সিঙ্গলস ডবল ও মিক্সড ডবলসে বিজয়িনী মিসেস্ মাস্কি

তাঁদের দুশ্চিন্তা যতখানি, ততখানি ক'লকাতার ফুটবল লীগের লীগচ্যাম্পিয়ানের উপর নেই। তার উপর আই এফ এ লীগে উঠা নামার ব্যবস্থা উচ্ছেদ ক'রে সকলের মত তাঁদের সম্মানও রক্ষা করেছেন। এর পরও প্রথম স্থান দখলের উৎসাহ কার থাকে!

রৌদ্রদগ্ধ ধরিত্রীর উপর বর্ষা নেমেছে। খেলার মাঠে খেলোয়াড়দেরও সবুট আবির্ভাব হ'তে হবে। যে দল কর্দ্দমাক্ত মাঠের উপর ঠিকমত দাঁড়াতে পারবে তারাই উপরে যাবার সম্মান পাবে আর অনভ্যস্ত খেলোয়াড়ের মত বুট পায়ে দিয়েও পিচ্ছিল লীগ তালিকার উপর অপর দলের পদস্খলন হবে। সে ছত্রভঙ্গের ইতিহাস ক্রীড়ামোদীদের অজানা নেই। তবে এ বৎসরের খবর যন্ত্রস্থ।

ফুটবল লীগের অন্যান্য বিভাগ ঃ

দ্বিতীয় বিভাগের খেলায় ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল এ পর্য্যন্ত প্রথম যাচ্ছে। সমান খেলে দ্বিতীয় স্থানে আছে মেজারার্স। তৃতীয় বিভাগে পয়েণ্ট পেয়ে খেলে রবার্ট হাডসন এবং মারোয়াড়ী ক্লাব একত্রে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে। চতুর্থ বিভাগে বেশী খেলে প্রথমে এখনও রয়েছে উত্তরপাড়া ক্লাব। তার চেয়ে কম খেলে দ্বিতীয় আছে রোণাল্ডসে হাট।

ফুটবল লীগের নূতন ব্যবস্থা ঃ

ফুটবল লীগ খেলা সম্বন্ধে আই এফ এ সম্প্রতি যে নূতন ব্যবস্থা করেছেন তাতে প্রথম বিভাগে ১৪টি বিভিন্ন দল এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১৩টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। পূর্ব্বে প্রথম বিভাগে ১৩টি এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১২টি দল বহুদিন থেকে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে আসছিল। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রথম বিভাগে ক্যালকাটা এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের কে স্থায়ী থাকবে সে সমস্যারও সমাধান হয়েছে। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী দু'টি দলই প্রথম বিভাগে খেলতে পারছে। গত বৎসরের তৃতীয় বিভাগের লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সালখিয়া ফ্রেণ্ডস দল দ্বিতীয় বিভাগের অতিরিক্ত দলের শূন্য স্থানটিতে খেলছে। এইভাবে বিভিন্ন



লেক ক্লাব স্প্রিং রেগাটার 'Pair oars' বিজয়ী রবি দত্ত এবং পারেখ ফটো ঃ বি বি মৈত্র

বিভাগের শূন্য স্থানে বিভিন্ন দলকে প্রমোশন দিয়ে লীগ খেলা নিয়মিত ভাবে চালান হচ্ছে।

জো লুই'য়ের সাফল্য ঃ

সম্প্রতি আমেরিকাতে পৃথিবীর হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান জোলুইয়ের সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব চ্যাম্পিয়ান বুড্ডি বেয়ারের ছ' রাউণ্ড বক্সিং খেলা হয়েছে। প্রতিযোগিতাটিতে ১৪ রাউণ্ড লড়াইয়ের কথা ছিল। কিন্তু ৬ রাউণ্ডেই জোলুইকে রেফারী বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। বুড্ডি বেয়ারের ম্যানেজার লড়াইয়ের পর প্রতিবাদে জানান যে, জোলুই খেলার বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে বুড্ডিকে পরাজিত করেছেন। রেফারী ঘোষণা করেছেন, তাঁর নির্দ্দেশ উপেক্ষা করার জন্য বেয়ারের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ানসীপ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য জোলুইকে এ পর্য্যন্ত পনের জন খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। আর তিনি প্রতি জনকেই পরাজিত ক'রে নিজের সম্মান রক্ষা করেছেন। মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে জোলুই যে সম্মান লাভ করেছেন তা অপর কোন মুষ্টিযোদ্ধার ভাগ্যে জুটে নি।

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ তালিকা

(প্রথম তিনটি ক্লাব)

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মহমেডান স্পোর্টিং	১১	১০	১	০	২৬	৪	২১
মোহনবাগান	১১	৯	২	০	১৭	৩	২০
ইষ্টবেঙ্গল	৯	৬	০	৩	১৪	৫	১২

লীগে সর্ব্বোচ্চ গোলদাতা

আর লামসডন (রেঞ্জার্স)	৮
সাবু (মহঃ স্পোর্টিং)	৭
সোমানা (ইষ্টবেঙ্গল)	৭
ডি ব্যানার্জি (এরিয়ান্স)	৭

৫।৬।৪১



আর লামসন



ফ্রেড প্যারী

ডোনাল্ড বাজ ও পেরীর সাফল্য ঃ

চিকাগোতে পেশাদার ডবলস প্রতিযোগিতায় পৃথিবী বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ এবং তাঁর জুটী



ডোনাল্ড বাজ

পেরী ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩ গেমে ষ্টোফেন এবং গ্রেডহিলকে পরাজিত করেছেন। বিজয়ীদ্বয়ের খেলা উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

ওবেদুল্লা খাঁ হকি ঃ

ভূপালের ওবেদুল্লা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে শ্যামলা ক্লাব ১-০ গোলে আলেকজেণ্ডার হাইস্কুল 'বি'কে

পরাজিত ক'রে কাপ বিজয়ী হয়েছে। বিখ্যাত ভূপাল ওয়াণ্ডারার্সদলের প্রায় সব খেলোয়াড়ই শ্যামলা ক্লাবের হ'য়ে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ছিল। এইবার নিয়ে পর পর চার বার শ্যামলা ক্লাব উক্ত কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।



নিখিল বঙ্গ পঞ্চাশ মাইল সাইকেল রেস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তিনজন

নিখিল বঙ্গ ৫০ মাইল সাইকেল রেস ঃ

সরুগুনা স্পোর্টিং ইউনিয়ন পরিচালিত চতুর্থ বার্ষিক নিখিল বঙ্গ ৫০ মাইল সাইকেল রেস প্রতিযোগিতা বেঙ্গল অলিম্পিক য়্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ডায়মণ্ড হারবার্ রোডে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

ফলাফল :

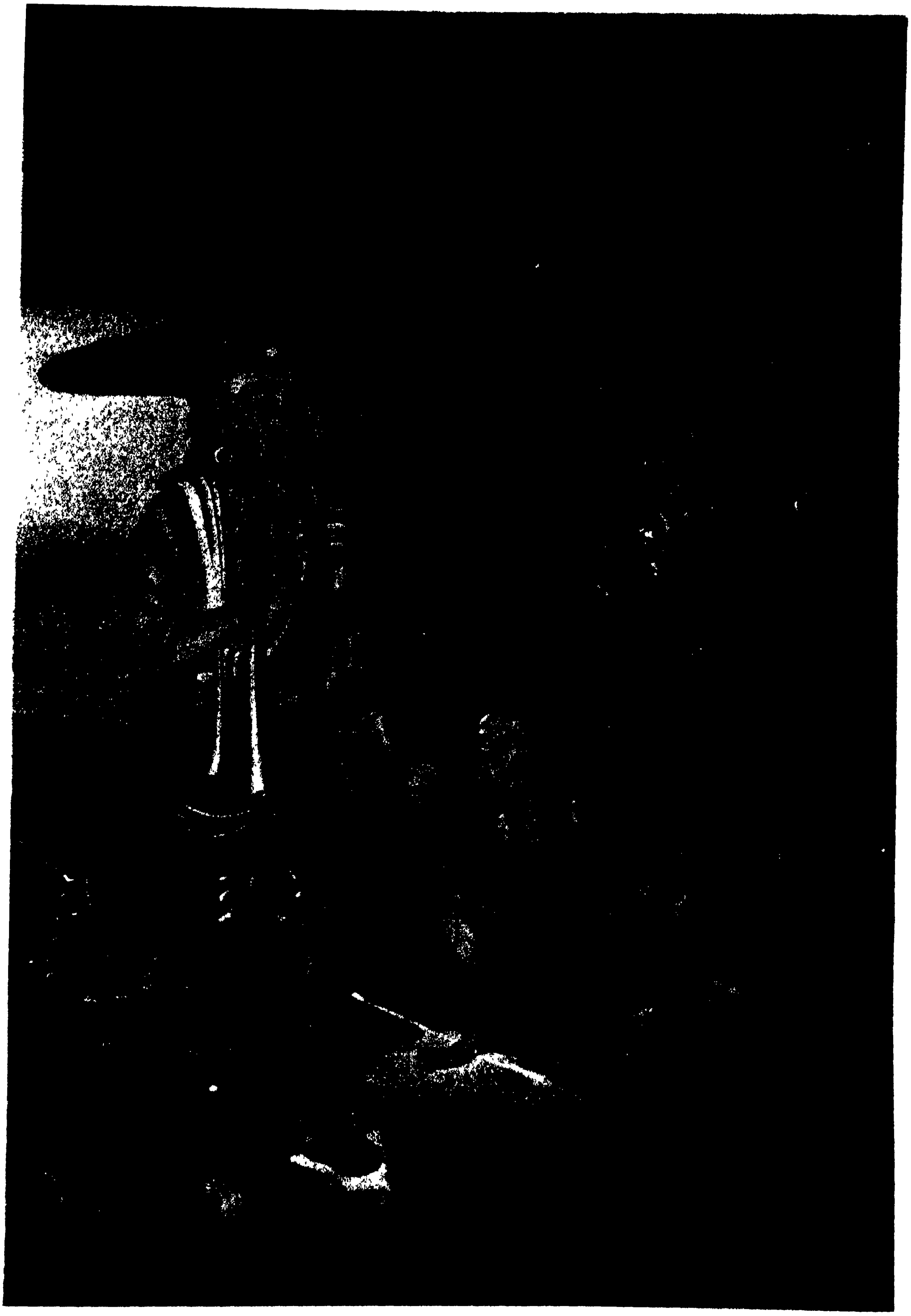
(১) মিঃ বিশ্বনাথ শীল (আই. এ. ক্যাম্প) ২ ঘঃ ৩৫ মিঃ ২৯ সেঃ (২) মিঃ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস (আই. এ. ক্যাম্প) ২ ঘঃ ৩৫ মিঃ ২৯½ সেঃ (৩) মিঃ সেখ্ আমিন (এস্. এস্. ইউ) ২ ঘঃ ৩৫ মিঃ ২৯¼ সেঃ (৪) মিঃ কানাইলাল দাস (এস্. এস্. ইউ) ২ ঘঃ ৩৫ মিঃ ২৯¾ সেঃ।

সাহিত্য সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

'বনফুল' প্রণীত উপন্যাস "রাত্রি"—২৲
কালীপ্রসন্ন দাশ প্রণীত উপন্যাস "স্থিতি ও গতি"—২॥•
সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "ডাঃ সেন"—১৲
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "ত্রিশক্তি"—১॥•
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "জয়ন্তী"—১৲
সুধাকান্ত দে প্রণীত উপন্যাস "প্রেম নহে মোর মৃদু ফুল হার"—৩৲
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আপ্-টু-ডেট্"—২৲
গৌতম সেন প্রণীত "ধূসর ধরণী"—১৷•
জ্যোতির্ম্মালা দেবী প্রণীত উপন্যাস "সন্ধানে"—২৸•
স্বামী দুর্গা চৈতন্ত ভারতী প্রণীত "শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত"—৸•
" " "বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব"—॥৵•
আনোয়ার হোসেন প্রণীত "আধুনিক জাপান"—১॥•
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "দ্রষ্টার চোখে"—৵•
" " "ঝটিকার ঊর্দ্ধে"—৵•
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "ইতিহাসে নেই"—॥•
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "ভারতবর্ষ"—১৷•
যামিনীমোহন কর প্রণীত নাটক "প্রহেলিকা"—৸•
ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য ও রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "শরৎচন্দ্রের শিল্পচাতুর্য্য"—২৲
রাধারমণ দাস সম্পাদিত "ফিফ্থ কলম্"—৸•
খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "তাতারের বন্দী"—৸•
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের কিশোর নাট্য "মহারণ"—।৵•
সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "সোনার পাখী"—।৵•
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষা"—১॥•
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "প্রহেলিকা"—১৸•
রেজাউল করীম প্রণীত "মুস্লিমস্ এণ্ড দি কংগ্রেস"—২॥•
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী ও শিশির সেনগুপ্ত অনুদিত "দি পাওয়ার অব এ লাই"—২॥•
শশধর দত্ত প্রণীত "রেঙ্গুন জাহাজে তিন রাত্তির"—১॥•
সতীশচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা শাস্ত্রী প্রণীত "গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী শ্রীযুক্ত রতন গাঙ্গুলী

বুদ্ধ ও জরা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



ভারতবর্ষ

শ্রাবণ—১৩৪৮

প্রথম খণ্ড | ঊনত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

স্বামী বিবেকানন্দ ও মায়াবাদ

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

মায়াবাদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মত লইয়া একটা অস্পষ্ট ধারণা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেকেই মনে করেন তিনি শংকরপন্থী সন্যাসী ছিলেন অতএব শংকরের মায়াবাদই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রচারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধারণা যে নির্ভুল নহে, তাহা তাঁহার জীবন, আচরণ ও উক্তিসমূহ একটু গভীরভাবে ভাবিয়া ও বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতাগুলিও এত প্রাঞ্জল যে, তাহা হইতে তাঁহার মতামত বুঝিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হয় না। স্বামিজী বলিয়াছেন, "বেদান্ত প্রকৃত পক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর কোথায়ও তদ্রূপ নাই; কিন্তু এই বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে।" (জ্ঞানযোগ, ২৬১ পৃঃ)। "বেদান্ত জগৎকে উড়াইয়া দেয় না, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যা করে।" (জ্ঞানযোগ, ৩৭০ পৃঃ)। বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "মায়াবাদ বুঝা চিরকালই একটি কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষে বাদ বা মতবিশেষ নহে; উহা দেশ-কালনিমিত্তের নাম—আরো সংক্ষেপে উহাকে নাম-রূপ বলে। সমুদ্রের তরঙ্গের সমুদ্র হইতে প্রভেদ কেবল নাম ও রূপে, আর তরঙ্গ হইতে এই নাম-রূপের কোন পৃথক সত্তা নাই; নাম-রূপ তরঙ্গের সহিত বর্ত্তমান।" (ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৪৯ পৃঃ)। অর্থাৎ তরঙ্গ ও তরঙ্গের নাম-রূপের সহিত সমুদ্রের যেমন কোন পার্থক্য নাই, তেমনি তুমি, আমি, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মেরও কোন পার্থক্য নাই। সমুদ্র হইতে তরঙ্গকে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি তুমি, আমি, ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম হইতে ব্রহ্মকেও পৃথক করা যায় না।

তিনি আরও স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন, "ব্রহ্ম এক হিসাবে এই টেবিল নহে, আবার অন্য হিসাবে উহা এই টেবিলও বটে।" (ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৫৩ পৃঃ)। অর্থাৎ টেবিলকে ব্রহ্ম হইতে যদি পৃথক ভাবা যায় তবে ব্রহ্ম এই টেবিল নহে, কিন্তু ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে যদি দেখা যায় তবে এই টেবিলের আকারে ব্রহ্মই বর্ত্তমান। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ ইহার বিশেষ রূপ ও বিশেষ নামের জন্য ইহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক ভাবিয়া থাকি। এই অজ্ঞানতার নামই মায়া।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের এই অনুভূতি, মায়াবাদ সম্বন্ধে তাঁহার এই মত এবং জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত বা স্বকপোলকল্পিত নহে, বেদান্ত কর্ত্তৃক ইহা সমর্থিত এবং বেদান্তের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিতেছেন—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"

'তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ—দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমিই সমগ্র জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।' ব্রহ্মই যদি স্ত্রী ও পুরুষ হন, তিনিই যদি জীবরূপে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে মিথ্যা বলা যায় কি করিয়া ?

কঠোপনিষদে আছে—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

'এক, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ—যিনি এক হইয়াও আপনাকে বহু প্রকার (লতাগুল্ম, পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদি) করিয়া থাকেন।'

মুণ্ডকোপনিষদ বলিতেছেন—

"তদেতৎ সত্যং, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥"

'সেই অক্ষর পুরুষই সত্যস্বরূপ, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, হে সৌম্য! তেমনি অক্ষর হইতে বিবিধপদার্থসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়।'

পুনশ্চ—

"পুরুষ এবেদং বিশ্বম্।"

'পুরুষই (ব্রহ্ম) এই সমস্ত জগৎ।'

দেখা গেল—বিভিন্ন উপনিষদ একই কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন সেই ব্রহ্মই পুরুষ ও স্ত্রী, চলমান বৃদ্ধ এবং জগতের সমস্ত জাত পদার্থ, অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ বাহির হয় তেমনি ব্রহ্ম হইতে এই জীব ও জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ যেমন সমধর্ম্মী, তেমনি ব্রহ্ম ও তজ্জাত পদার্থও সমধর্ম্মী। এক্ষেত্রে জীব ও জগৎকে ভ্রম ও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা আরও পরিষ্কার বুঝা যাইবে বলিয়া মুণ্ডক উপনিষদের অন্য একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকও এখানে উল্লেখ করিতেছি—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"

'উর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা যেরূপ স্বশরীর হইতে তন্তুরাশি সৃষ্টি করে ও পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যেরূপ ধান্য যব প্রভৃতি ওষধিসমূহ প্রাদুর্ভূত হয় এবং প্রাণবন্ত মানুষের দেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোমসমূহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই শ্লোকের অর্থ এতই সুস্পষ্ট যে, ভাষ্যকার শ্রীশংকরও এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ও জগৎকে সেই অক্ষর ব্রহ্মে আরোপিত বা অধ্যস্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। ইহার ব্যাখ্যায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন—'লোকপ্রসিদ্ধ উর্ণনাভি যেরূপ অপর কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সৃষ্টি করে অর্থাৎ স্বশরীর হইতে অপৃথক তন্তুরাশি বাহিরে প্রসারিত করে, আবার সেই সমস্তকেই গ্রহণও করে অর্থাৎ স্বদেহভাবে পরিণত করে এবং পৃথিবী হইতে অপৃথগ্‌ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবর পর্য্যন্ত ওষধিসমূহ যেরূপ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়; জীবৎ পুরুষ (দেহ) হইতে যেরূপ তদ্বিলক্ষণ কেশ ও

লোম সম্ভূত হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত যেরূপ, সেইরূপ এই সংসারমণ্ডলে কারণের অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্তনিরপেক্ষ পূর্ব্বোক্ত প্রকার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।' মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম শ্রীশংকর যেখানে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন সেখানে রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। বলিয়াছেন—'রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় তেমনি ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে।' রজ্জুর গুণ ও ধর্ম্ম সর্পের গুণ ও ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহা ছাড়া সর্প রজ্জুর অংশও নহে। কিন্তু উপনিষদের উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অনুসারে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জগৎ ব্রহ্মের অংশস্বরূপ। যেমন—উর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা ও তৎসৃষ্ট জাল, জাল মাকড়সার শরীর হইতেই সৃষ্ট সুতরাং তাহার অংশস্বরূপ; যেমন অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ, স্ফুলিঙ্গ অগ্নিরই অংশস্বরূপ, এবং অগ্নির গুণ ও ধর্ম্মবিশিষ্ট। অগ্নি যেমন দগ্ধ করিতে পারে, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গও দাহ্য পদার্থের সংযোগে আসিলে তাহা দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, মাকড়সার জাল ও অগ্নির স্ফুলিঙ্গ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অধ্যস্ত নহে, সুতরাং ভ্রমাত্মক বা মিথ্যাও নহে। কিন্তু শ্রীশংকরের যুক্তি মানিয়া লইলে বলিতে হয়, মাকড়সার জাল রজ্জুতে সর্পের ন্যায় মাকড়সার উপর অধ্যস্ত। সুখের বিষয় উপনিষদের অর্থ এখানে এতই স্পষ্ট যে, শংকর নিজেও তাহার ঐরূপ অর্থ করিতে পারেন নাই; তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে—"স্বশরীরাব্যতিরিক্তান্ তন্তূন্" অর্থাৎ '(মাকড়সার) স্বশরীর হইতে অপৃথক তন্তুরাশি।' সুতরাং তন্তুরাশি মাকড়সা হইতে যেমন অপৃথক, জগৎও সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে তেমনি অপৃথক। অতএব ব্রহ্ম যেমন সত্য, জগৎও তেমনি সত্য।

জগৎ যে সত্য—অসৎ বা মিথ্যা নহে, তাহা ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদান্ত দর্শনের ২য় অধ্যায়, ১ম পাদের ৭ সূত্রে আছে—

"অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥"

শ্রীশংকরাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ। প্রতিষেধমাত্রং হীদম্, নাস্য প্রতিষেধ্যমস্তি।"

অর্থাৎ 'অসৎ=সৎ নহে'—এ নিষেধ কেবল 'বাক্যতঃ' নিষেধ। নিষেধ্য না থাকায় উহা 'বাস্তব' নিষেধ নহে। অতএব এই জগৎ অসৎ নহে। "যথৈব হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ এবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে।" অর্থাৎ "স্থিতিকালে এই সকল কার্য্য (জগৎ) যেমন কারণরূপে সৎ, তেমনি উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইহারা কারণরূপে সৎ (অস্তিত্ববান)।' সৎ বস্তু হইতে অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অসৎ বা মিথ্যা জগতেরও উদ্ভব হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মও সৎ, জগতও সৎ। পুনশ্চ—"অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।" (বেদান্তসূত্র ২।১।১৭)। বেদে স্থান বিশেষে জগৎকে সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎরূপে উল্লেখ করিয়া বাক্যশেষে বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ সৎ ছিল অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল, এখনও ব্রহ্মাশ্রয়ে জগৎ সত্যরূপেই প্রকাশ পাইতেছে।

উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের যে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া শ্রীশংকরাচার্য্যের 'মায়াবাদ'কে অস্বীকার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে না"—তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইল। শংকরের 'মায়াবাদ'কে অস্বীকার করিলেও তিনি 'মায়া'কে অস্বীকার করেন নাই। 'মায়া' তিনি যেমন মানিয়া লইয়াছেন, জগতের 'বাস্তবতা'ও তেমনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, জগতের 'বাস্তবতা' তিনি স্বীকার করিলেও হেগেলের মত তিনি গ্রহণ করেন নাই। হেগেলের মতে—'কুজ্ঝটিকাময় এক নিরপেক্ষ সত্তা হইতে সাকার ব্যষ্টি শ্রেষ্ঠ, অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মুক্তি হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ।' স্বামিজীর মতে—জগৎ সত্য; ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বলিয়াই জগৎ সত্য। জীবও সেই ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ, তাঁহারই মত সে নিষ্কলুষ, পবিত্র ও বীর্য্যবান। ইহা জানে না বলিয়াই সে দুর্ব্বল, সে পরাধীন। যে মোহবশতঃ নিজের স্বরূপ সে জানিতে পারে না, তাহাই মায়া। 'আমি ব্রহ্ম' এই ধ্যানের দ্বারা—স্বরূপ চিন্তাদ্বারা এই মোহ—এই মায়া কাটিয়া যাইবে। তখনই মানুষ বুঝিতে পারিবে—সর্ব্বশক্তিমান, বিরাট ব্রহ্মের ন্যায় সেও অনন্ত শক্তিমান ও বিরাট্। উপলব্ধি করিবে—এক বিরাটের অংশ বলিয়া অন্য সকল হইতে সে অপৃথক, সকলের আনন্দেই তাহার আনন্দ, সকলের কল্যাণেই তাহার কল্যাণ, সকলের মুক্তিতেই তাহার মুক্তি। ক্ষুদ্র স্বার্থ চলিয়া গিয়া সে

তখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবে, প্রয়োজন হইলে দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্ত সে তখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও পারিবে। কারণ ব্রহ্মদৃষ্টি দ্বারা মৃত্যু তখন আর তাহার নিকট ভয়ের বস্তু নহে।

জগৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিয়া অনেকেরই মনে এই কৌতূহল হইতে পারে যে, এ বিষয়ে তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত কি! এইরূপ কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক এবং ইহা চরিতার্থ করাও উচিত, কেন-না এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতামত জানিতে না পারিলে অনেকেই হয় ত নিঃসংশয় হইতে পারিবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' ক'রে, বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী —যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিষে তৈয়ারী—সেই ইট, চুন, সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারী। 'নেতি' 'নেতি' ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নিগুর্ণ তিনিই সগুণ।" (কথামৃত, ৩য় ভাগ, ১১ পৃঃ)। পুনরায় বলিয়াছেন, "যা কিছু দেখছো এ সব তিনি হয়েছেন। যেমন বেল—বিচি, খোলা, শাঁস, তিন জড়িয়ে এক। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আছে বলেই, ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌছান যায়। অহংবুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'নেতি', 'নেতি' ক'রে ধ্যান যোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পৌছান যেতে পারে। কিন্তু ছাড়বার যো নাই। যেমন বল্লাম—বেল। কচ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধিভঙ্গ হচ্ছে, একজন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন কি দেখছো? কচ বল্লেন, দেখছি যে জগৎ যেন তাঁতে জ'রে রয়েছে! তিনিই পরিপূর্ণ! যা কিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভেতর কোন্‌টি ফেলবো, কোনটি লব, ঠিক পাচ্ছি না।" (কথামৃত, ৩য় ভাগ, ২৪৪-৪৫ পৃঃ)। যে বিজ্ঞানের অবস্থায় ব্রহ্মকে জীবজগৎ বলিয়া উপলব্ধি হয় সেই অবস্থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানের অবস্থা হইতেও উচ্চতর অবস্থা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, "ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।...জীব জগৎ তিনি হয়েছেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।" (কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৬১,৬২ পৃঃ)। তিনি এই বিজ্ঞান অবস্থায় উপনীত হইয়া যাহা দেখিয়াছেন ও উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই শোনাইতেছি—"কালীঘরে পূজা করতাম্। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়! তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম্।—যা দেখি তাই পূজা করি।" (কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৭৫ পৃঃ)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন পদার্থকে ঐরূপ যে চিন্ময়রূপে দেখিয়াছিলেন তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই বোঝা যাইবে; যেমন—প্রস্তরময় ঘটি, প্রস্তরময় বাটি ইত্যাদি। প্রস্তরময় ঘটি অর্থে—ঘটির বিশেষ নাম আছে, ঘটির বিশেষ রূপ আছে, কিন্তু উহার অন্তরে ও বাহিরে এক প্রস্তর ছাড়া আর কিছুই নাই, তেমনি চিন্ময় কোশাকুশী, চিন্ময় বেদী মানে—কোশাকুশী ও বেদী বিভিন্ন নাম-রূপে প্রতীয়মান হইলেও উহাদের অন্তরে ও বাহিরে এক ব্রহ্মস্বরূপ চিন্ময় বস্তু ছাড়া আর কিছুই নাই এবং নাম-রূপও চিন্ময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অদ্বৈত উপলব্ধির কথা বলিতে গিয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ"কার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন—"ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল সাধন শেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈত বুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহাপবিত্র বস্তু সকলের সহিত তুল্য দেখিতেন। বলিতেন—'তুলসী ও সজিনা গাছের পত্র সমভাবে পবিত্র বোধ হইত'।" (সাধক ভাগ, ২১০ পৃঃ)। দেখা যাইতেছে—অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ স্বপ্নবৎ উড়িয়া যায় না, উহার অস্তিত্ব থাকে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং তিনি দেখেন—ত্যাজ্য ও ভোগ্য সবই এক। তাই পরমহংসদেব বলিয়াছেন—"কি ত্যাগ করবে, কি বা গ্রহণ করবে। তিনি ছাড়া কিছুই নাই।" (কথামৃত, ৫ম ভাগ, ১০০ পৃঃ)। যেমন কচ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখছি যে জগৎ যেন তাঁতে (ব্রহ্মে) জ'রে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ। যা কিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্‌টা ফেলবো, কোনটা লব, ঠিক পাচ্ছি না।"

(কথামৃত, ৩য় ভাগ, ২৪৫ পৃঃ)। জীব ও জগৎ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপলব্ধি ও মত কি—তাহা উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতেই বোধগম্য হইবে, তথাপি অধিকতর নিঃশংসয়তার জন্য এ সম্বন্ধে তাঁহার আরও একটি স্পষ্টতর উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"জগৎ মিথ্যা কেন হবে ? ওসব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।" (কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ৪২ পৃঃ)। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে—সত্যবস্তু যতক্ষণ উপলব্ধি না হয় মানুষ ততক্ষণই বিচার করে। বিচার—সাধন অবস্থা। সিদ্ধ অবস্থা তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে। এই সিদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্ম দর্শন হয়। ব্রহ্ম "দর্শন হইলে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীবজগৎ হইয়াছেন।" সেই অবস্থা হইতেই দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"জগৎ মিথ্যা হবে কেন ?"

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ের একজন মনীষীর মতও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। করা প্রয়োজন বোধ করিয়াই করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—

"First, as a rule, in the process of knowledge one comes to see pervading all space and time one divine impersonal existence, 'Sad Atman (সদ্ আত্মন্) without movement, distinction or feature, 'Shantam Alakshanam' (শান্তং অলক্ষণম্), in which all names and forms seem to stand with a very doubtful or a very minor reality. In this realisation the one may seem to be the only reality and everything else Maya (মায়া), a purposeless and inexplicable illusion. But afterwards, if you do not stop short and limit yourself by the impersonal realisation, you will come to see the same Atman (আত্মন্) not only containing and supporting all created things, but informing and filling them, and eventually you will be able to understand that even the names and forms are Brahman." (The Yoga and its Objects, Pp. 19, 20.).

উপরের কথাগুলি শ্রীঅরবিন্দের। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাক্য উদ্ধৃত করিবার পর শ্রীঅরবিন্দের কথা উদ্ধৃত না করিলেও চলিত, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান কালের একজন মনীষী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনসমূহে সুপণ্ডিত এবং নিজেও একজন সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেক পণ্ডিত ও সাধক তাঁহার কথায় উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার কথা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীঅরবিন্দের উদ্ধৃত বাক্য হইতে দুই শ্রেণীর উপলব্ধির কথা পাওয়া যায়। জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের। প্রথমটি দ্বিতীয়টির পরিপোষক। বিজ্ঞানের অবস্থায় উপলব্ধি হয়—"Even the names and forms are Brahman."—এমন কি নাম-রূপও ব্রহ্ম। এ বিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।...জীব জগৎ তিনি হয়েছেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।" (কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৬১।৬২ পৃঃ)।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক। না করিলে অন্যে আমাদের ভুল বুঝিতে পারেন। কেহ যেন মনে না করেন—এ সমস্ত আলোচনায় শংকরের মতবাদের সহিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতের তুলনা করিয়া আমরা তাঁহার মতকে ছোট করিতেছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি গুরুপরম্পরা যে উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবস্তুকে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই অভ্রান্ত সত্য জ্ঞান করিয়া যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইয়াছেন এবং অন্যের মতকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ বাগ্মিতার সম্মুখে কেহই তখন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই এবং এখনও অনেকে পারিতেছে না। কিন্তু তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা রাখিয়াও এবং অদ্বৈত ব্রহ্মে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহার মতবাদকেই আমরা 'একমাত্র সত্য' বলিতে পারি না। আমরা বলিতে চাই—ব্রহ্ম যেমন অনন্ত, তাঁহার উপলব্ধিও তেমনি অনন্ত ; ব্রহ্মের যেমন শেষ নাই, তাঁহার উপলব্ধিরও তেমনি শেষ নাই। যে সাধক যে ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, যে আচার্য্য যে ভাবে তাঁহাকে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সেই সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য শংকর সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে।

যে সকল আলোচনা উপরে করা হইল তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে—স্বামী বিবেকানন্দের মতে ব্রহ্ম ও জগৎ অভেদ। জগৎ ব্রহ্মেরই রূপ। ইহা ভ্রম নহে, অধ্যাসও নহে। তাঁহার এই মত প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র বেদান্ত দর্শনের দ্বারা সমর্থিত এবং সকল সাধনায় সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার নিজের উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

জঙ্গম

বনফুল

১৮

বাবাজি ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী কুমারিকা অন্তরীপে বেশী দিন বাস করিতে পারিলেন না। নির্ঝঞ্ঝাটে ভগবদুপাসনা করিবার পক্ষে স্থানটি উপযোগী হইলেও বাবাজি একটি মহা অসুবিধায় পড়িলেন। মনের মতো তেমন কোন বাঙালী কাছে-পিঠে নাই! একেবারে বাঙালী-বর্জ্জিত স্থানে কি থাকা যায়! শুধু সমুদ্র দেখিয়া মন ভরে না। কাছাকাছি কথা বলিবার মতো একজনও লোক না থাকিলে প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে যে! সেখানকার ভাষা বাবাজির পক্ষে দুর্ব্বোধ্য, ইংরেজী ও ভাঙাভাঙা হিন্দি বলিয়া কতদিন চালানো যায়। তাছাড়া আর একটা কথাও বাবাজির বারবার মনে হইতে লাগিল। স্বদেশ হইতে এতদূরে আসিয়া বস-বাস করাটা কি ঠিক? হাজার হোক স্বদেশ! আত্মীয় স্বজনও আছে, ভনুটুও আছে, তাছাড়া ঠাকুরও ওই দেশেই থাকেন—সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এতদূরে থাকিতে মুক্তানন্দ স্বামীর অন্তরাত্মা রাজি হইল না। দেশের কাছাকাছি নির্জ্জন স্থান দুর্লভ নয়। গঙ্গার ধারে অমন ঢের জায়গা পড়িয়া আছে। এই গঙ্গা-হীন বিদেশ বিভুঁয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সংসারের জালে অবশ্য তিনি নিজেকে জড়াইবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া এখানে পড়িয়া থাকিবারও প্রয়োজনও নাই। আর একটা কথা, টাকাও ফুরাইয়া আসিতেছিল। অর্থাভাবে প'ড়লে এই অচেনা অজানা জায়গায় কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে! নিজের অতবড় বিষয়টা বাঁধা দিয়া বন্ধুর নিকট হইতে তিনি মাত্র পাঁচশত টাকা আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিনশত টাকা শেষ হইয়া গিয়াছিল। আরও টাকা পাঠাইবার জন্য বন্ধুকে পত্র দিয়াছিলেন, কোন উত্তর আসে নাই। এ বিষয়েও উদাসীন থাকা তাঁহার উচিত বলিয়া মনে হইল না। ভনুটুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে। ভনুটু লিখিয়াছে যে, সে মেজকাকার বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে চাহে না। মেজকাকার বিষয়ের ব্যবস্থা মেজকাকা নিজেই করুন। বাবাজির মনে হইল চিঠিতে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইতেছে। হইবেই না বা কেন। হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো। এই বয়সেই সমস্ত সংসারের বোঝাটা তাহার উপর পড়িয়াছে। বিষ্টুটা এক পাল ছেলে মেয়ের জন্ম দিয়া তুচ্ছ একটা অসুখের ছুতায় দিব্য সমুদ্রের ধারে গিয়া বায়ু-সেবন করিতেছে। ভনুটুর অগ্রজ বিষ্ণুবাবুর প্রতি পুরাতন ক্রোধ বাবাজির অন্তরে নূতন করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া তিনি ঠিক করিয়া ফেলিলেন কুমারিকায় আর থাকা চলিবে না। তল্পি-তল্পা গুটাইয়া তিনি স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৯

মোটরের দালাল অচিনবাবুর অদম্য অনুসন্ধিৎসার ফলেই একদিন প্রিয়নাথ মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বেলাকে কিছুতেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়া অচিনবাবু অবশেষে প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং হিতৈষীর ছদ্মবেশে তাঁহার চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়া অচিনবাবু বুঝিয়াছিলেন যে, ভগ্নীর উপর বিরূপ হইলেও প্রিয়নাথ ভগ্নীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য এখনও সমুৎসুক। এই ঔৎসুক্যকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার বাসনায় অচিনবাবু প্রিয়নাথের বিরক্তির অনলে ইন্ধন জোগাইতে সুরু করিলেন। প্রতিদিন আসিয়া প্রিয়নাথকে বেলার গতিবিধির অতিরঞ্জিত নানা কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। বেলার বাসায় শঙ্করের অভ্যাগমে তাঁহার আরও সুবিধা হইয়া গেল, বেলা যে সত্য সত্যই কি ভাবে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে তাহা উদাহরণ সম্বলিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন। এমন কি মোটরে চড়াইয়া একদিন রাত্রে তিনি প্রিয়নাথ মল্লিককে বেলার-বাসায়-প্রবেশোন্মুখ শঙ্করকে দেখাইয়া পর্য্যন্ত দিলেন। স্বচক্ষে

ইহা দেখিয়া প্রিয়নাথের আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল, তখনই মোটর হইতে নামিয়া তিনি একটা অনর্থ সৃষ্টি করিতেন, অচিনবাবু অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরদিনই প্রিয়বাবু বেলাকে যে পত্রাঘাত করিয়াছিলেন তাহা অচিনবাবু জানিতেন না। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

"আপনি চিঠি লিখে দিয়েছেন ?"

"নিশ্চয়—"

"কি লিখলেন ?"

"সোজা সত্যি কথা, লিখে দিলাম তোমার স্বাধীনতার মর্ম্ম সব বুঝতে পেরেছি, ভাল চাও তো এখনও ফিরে এস—"

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হাস্যময় হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "অত সোজায় আসবেন না তিনি—"

প্রিয়নাথ মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একদৃষ্টে অচিনবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ইজি চেয়ারে ঠেস দিয়া শুইয়াছিলেন, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

"আমার কি ইচ্ছে করছে জানেন ?"

অচিনবাবুর মুখে এতটুকু হাসি নাই, কেবল চোখ দুইটি হাসিতেছে।

"কি বলুন—"

"ইচ্ছে করছে চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে ওকে এখানে নিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ করে আটকে রেখে দিই—"

অচিনবাবুর চোখের হাসি মুহূর্ত্তে প্রখর হইয়া উঠিল। একটা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইয়া চক্ষুর দৃষ্টি যেন জলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টির প্রাখর্য্য কণ্ঠস্বরে সংক্রামিত হইল না। অতিশয় ধীরভাবেই যেন একটা নিঃসংশয় মত তিনি ব্যক্ত করিতেছেন, তিনি বলিলেন, "মিস্ মল্লিককে যদি আনতে চান, জোর করেই আনতে হবে। কেবল মুখের কথায় উনি আসবেন না—"

প্রিয়নাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার খানিকক্ষণ অচিনবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, "ভাবছেন কি ?"

"ভাবছি সত্যিই কি জোর করে ওকে আনা যায় না কোন রকমে ?"

"তা, যাবে না কেন, তবে একটু 'রিস্কি' ব্যাপার।"

তাহার পরই অচিনবাবু বানাইয়া একটি গল্প বলিলেন। যশোরে একবার নাকি এক স্বামীগৃহবিমুখা বধূকে তিনি জোর করিয়া মোটরে তুলিয়া স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং সে ক্রমশ নাকি পোষ মানিয়াছিল।

"একে আনতে পারেন আপনি ?"

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি চকচক্ করিতে লাগিল। এই প্রশ্নটির জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে। কারণ পুলিশ কেস হলে আমি একা হাঙ্গামায় পড়তে চাই না। আপনি হলেন ওঁর ন্যাচারাল গার্জেন, এ রকম জোরজবরদস্তি করবার খানিকটা অধিকার আছে আপনার—"

"নিশ্চয়ই আছে! পুলিশকে সব কথা খুলে বললে—দে উইল্ সি মাই পয়েণ্ট। এ তো মগের মুলুক নয়, বৃটিশ রাজত্ব!"

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি পুনরায় হাস্যময় হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ আবার কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনি যদি বন্দোবস্ত করতে পারেন করুন। চোখের সামনে বোনটাকে এমনভাবে উচ্ছন্ন যেতে দিতে পারি না। পুলিশ কেস হয় হোক, কুচ পরোয়া নেই, I shall risk it!"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি—"

অচিনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার ভাবিয়া দেখিবার বেশী কিছু ছিল না। এই সম্ভাবনাটা মনে উদিত হইবামাত্র বিদ্যুৎগতিতে তিনি সমস্তটা ভাবিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের ওজুহাতে এবং প্রিয়নাথকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বেলাকে জোর করিয়া কি ভাবে অপহরণ করা সম্ভব তাহা অচিনবাবু অবিলম্বে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। গোলেমালে প্রিয়নাথকে ফাঁকি দিয়া কি করিয়া বেলাকে অন্যত্র সরাইয়া ফেলা যাইবে এই অংশটুকু এখনও তাঁহার ভাবা হয় নাই। এই অংশটুকু পরিপাটিরূপে চিন্তা করিতে হইবে এবং পরিপাটিরূপে চিন্তা না করিয়া অচিনবাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই জাতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অচিনবাবু অঙ্কের মতো সমস্ত জিনিসটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কষিয়া লইয়া তবে কার্য্য আরম্ভ করেন। মনে মনে সমস্ত জটিলতার সমাধান করিয়া এবং পূর্ব্বাহ্নেই

তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তবে অচিনবাবু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই অংশটুকুর সমাধানও যে তিনি সুচারুরূপে করিতে পারিবেন সে বিশ্বাস তাঁহার আছে। তাহার পর—অর্থাৎ বেলা দেবীকে একবার আয়ত্তাধীনে পাইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। অচিনবাবুর ধারণা, মেয়েমানুষ অনেকটা বুনো জানোয়ারের মতো। সহজে ধরা দেয় না, ধরা দিলেও প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করে, কিন্তু কিছুদিন খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিলে ক্রমশ পোষ মানে এবং অবশেষে খেলা দেখায়।

অচিনবাবুর মোটরকার নিঃশব্দ গতিতে কড়েয়ার দিকে ছুটিতে লাগিল। ম্যানেজারবাবু সম্প্রতি যে নূতন বাসাটায় উঠিয়া আসিয়াছেন তাহা কড়েয়াতে একটা গলির মধ্যে। ম্যানেজারবাবু যদি মোটারকম দক্ষিণা দিতে রাজি হন তাহা হইলেই এই বিপজ্জনক ব্যাপারে অচিনবাবু হাত দিবেন, নতুবা নয়। সম্প্রতি তাঁহার কিছু টাকারও প্রয়োজন ঘটিয়াছে, মেয়েটার জন্য একটা ভাল পাত্রের সন্ধান মিলিয়াছে, কিন্তু তাহারা নগদ দশ হাজার টাকা চায়। অত টাকা অচিনবাবুর হাতে নাই। অচিনবাবুর মোটর একটা গলি পার হইয়া সার্কুলার রোডে পড়িল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। সার্কুলার রোড নির্জ্জন। অচিনবাবু মোটরের স্পীড্ বাড়াইয়া দিলেন।

২০

ম্যানেজারবাবুকে ঘন ঘন বাসা পরিবর্ত্তন করিতে হয় বটে, কিন্তু কখনও কোন ছোট বাসায় তিনি যান না। প্রকাণ্ড দু-তিন মহলা বাড়ি না লইলে তাঁহার চলে না। কড়েয়ার বাড়িটাও প্রকাণ্ড। এই প্রকাণ্ড বাড়ির একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে ম্যানেজার একা বসিয়াছিলেন। ঘরের এক কোণে একটি ছোট ইলেকট্রিক পাখা নিঃশব্দে ঘুরিতেছিল এবং আর এক কোণে একটি ঘন বেগুনি রঙের ছোট বাল্ব অন্ধকারকে যৎসামান্য আলোকিত করিয়া পারিপার্শ্বিককে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানেজারবাবু প্রখর আলোক সহ্য করিতে পারেন না। দিবসেও তিনি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে পরদা ফেলিয়া সূর্য্যালোককে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিয়া রাখেন। অন্ধকার-বিলাসী তাঁহার মন অন্ধকারেই নিশাচরের মত সঞ্চরণ করিতে চায়। বহুকাল ধরিয়া তাঁহার ক্ষুধিত বাসনা অতৃপ্ত আবেগে নিবিড় অন্ধকার যে জটিল রহস্যময় পথে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, অন্ধকারে যে পথ অফুরন্ত বলিয়া মনে হইতেছে, আলোকপাত করিয়া সে পথের সীমা-রেখা দেখিয়া কি হইবে। সীমা তো আছেই, কিন্তু তাহা দেখিয়া লাভ কি! অতলস্পর্শী যে গহ্বরটা সুনিশ্চিত ভাবেই একদিন তাঁহাকে গ্রাস করিবে তাহার বিভীষিকাকে যতদূর সম্ভব তিনি আড়াল করিয়া রাখিতে চান অথবা একা অন্ধকারে বসিয়া এই সবই তিনি কল্পনা করেন তাহা বলা শক্ত। ম্যানেজারবাবুর মনের খবর কেহ জানে না। কিন্তু ইহা তাঁহার অনুচরবর্গেরা সকলেই জানে যে অন্ধকার, বড় জোর ঈষৎ আলোকিত অন্ধকার, তাঁহার প্রিয় আবেষ্টনী। ··· বাহিরের ঘরে ইলেকট্রিক বেল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ম্যানেজারবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। খুব সম্ভবত অচিনবাবু আসিয়াছেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য তিনি খবর পাঠাইয়াছিলেন। অচিনবাবুকে দিয়া চিঠিখানা লিখাইয়া খগেশ্বরকে পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে নূতন মালটিকে হস্তগত করা যাইবে না। অচিনবাবু চিঠিখানা লিখিতে রাজি হইবে তো? কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবুর জরা-শিথিল মুখমণ্ডল নীরব হাস্যে আরও কদাকার হইয়া উঠিল। রাজি হইবে না! কিছু টাকা কবুল করিলেই রাজি হইবে!

বেঁটে গ্যাট্টাগোঁট্টা চাকরটি নিঃশব্দে আসিয়া ছায়া-মূর্ত্তির মতো দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

"কি?"

"নীচে মোটর-কারের দালাল-বাবুটি এসেছেন—"

"বেশ, সিঁড়ির দরজাটা খুলে দাও"

ছায়া-মূর্ত্তি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

নীচে প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে সিঁড়িটা সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল। অচিনবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। দ্বার উন্মুক্তই ছিল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবুর ঘরের বেগুনি বাল্ব নিবিয়া গিয়া সাধারণ একটি আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

অচিনবাবু প্রবেশ করিতেই ম্যানেজারবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আপনার ভাগ্য ভাল, মুফতে কিছু টাকা লাভ হয়ে যাবে আপনার আজ। সেই জন্যেই ডেকে পাঠিয়ে-

ছিলাম আজ আপনাকে। মাত্র দু'টি লাইন একটি চিঠি লিখে দিতে হবে, এর জন্যে কর্তা মশাই নগদ একশো টাকা স্যাংশান করেছেন। আসুন, বসুন—"

"কিসের চিঠি ?"

"আরে মশাই বসুনই না আগে—"

অচিনবাবু উপবেশন করিলেন।

ম্যানেজারবাবু সত্য মিথ্যা মিশাইয়া একটি গল্পের অবতারণা করিলেন।

"কিছুদিন আগে, মনে আছে, যমুনা বলে একটি মেয়ের সন্ধান এনেছিলেন আপনি—"

গল্পের এই অংশটুকু সত্য।

অচিনবাবু বলিলেন, "মনে আছে, তাকে তো কোন রকমেই বাগাতে না পেরে শেষটা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম—"

"দিয়েছিলেন তো ? কর্ত্তার আর একটি এজেন্ট কিন্তু তার নাগাল পেয়েছে—"

ম্যানেজারবাবু সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষণকাল অচিনবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "কিন্তু মুস্কিলেও পড়েছেন তিনি। মেয়েটির এখনও আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। মেয়েটা বলছে যে অচিনবাবু যদি আমাকে যেতে লেখেন তাহলে আমি কোলকাতা যেতে পারি—"

অচিনবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "কিন্তু আমি যখন তাকে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চেয়েছিলুম তখন তো সে আসতে চায় নি ! এই এজেন্টটি কে !"

"জানেন তো কর্ত্তার কড়া হুকুম একজন এজেন্টের নাম আর একজনের কাছে করা চলবে না—"

"যমুনা মেয়েটা আবার আসতে চাইছে ? আশ্চর্য্য !"

স্মিতমুখে ম্যানেজার বলিলেন, "তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন !"

তাহার পর বলিলেন, "আরে মশাই, আপনি ও নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। দিন না দুলাইন লিখে, আমারও হুকুম তামিল করা হোক আপনারও কিছু লাভ হোক। তারপর কর্ত্তা তার এজেন্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে—আপনারই বা কি, আমারই বা কি—"

ম্যানেজার আর কাল বিলম্ব করিলেন না, কুব্জ দেহটাকে সোজা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; গৃহকোণে অবস্থিত লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া একশত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া আনিলেন, তাক হইতে চিঠি লিখিবার প্যাড এবং ফাউণ্টেন পেন পাড়িয়া আনিয়া বলিলেন—"নিন, লিখে দিন চিঠিখানা—"

"কি লিখব ?"

"লিখুন না—'কল্যাণীয়াসু, তুমি লোকটির সহিত অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমিই ইহাকে পাঠাইয়াছি। বিশেষ দরকার আছে।—' বাস্ নামটা সই ক'রে দিন—ঠিকানাটাও দিয়ে দিন—"

অচিনবাবু যথাযথ লিখিয়া দিলেন।

ম্যানেজার পত্রখানি হস্তগত করিয়া একশত টাকার নোটখানি অচিনবাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই নিন আপনার পারিশ্রমিক। তারপর আর সব খবর কি বলুন—"

অচিনবাবু খবর বলিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

নোটটি পকেটস্থ করিয়া বলিলেন, "ভাল খবর আছে একটা—"

"কি বলুন তো—"

"খুব ভাল জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, কায়দা করে' সাপটে নিতে পারলে মালের মতো মাল একখানা—"

"বলুন, বলুন—"

ম্যানেজারবাবু কুব্জ দেহটাকে উন্নমিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন। অচিনবাবু রঙ এবং রস দিয়া বেলা মল্লিকের বর্ণনা সুরু করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সমস্ত শুনিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন, "আপনি যেমন বলছেন তেমন জিনিস যদি হয়, টাকার জন্যে কর্ত্তামশাই পেছপাও হবেন না। মেয়েমানুষের পেছনে অনেক টাকা উড়িয়েছেন তিনি, আরও ওড়াবার তাকতও আছে তাঁর। তবে জিনিসটি সরেস হওয়া চাই—"

"জিনিস খুব সরেস—"

"তা হলে টাকার জন্যে ভাবনা নেই—"

"হাজার দশেক খরচ হতে পারে—"

"হাজার বিশেক হলেও কর্ত্তা ভ্রূক্ষেপ করবেন না—জিনিস যদি ভাল হয়—"

"আমি বলছি, জিনিস খুবই ভাল—"

"তা হলে লেগে পড়ুন, টাকার জন্যে ভাববেন না।"

অচিনবাবু উঠিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাঁহার মোটরখানি নিঃশব্দগতিতে গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। অচিনবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারবাবুর ঘরে পুনরায় বেগুনি বাল্‌ব জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অচিনবাবু-বর্ণিত বেলা মল্লিকের কাল্পনিক মূর্তিটি ঘিরিয়া তাহার লেলিহান বাসনা ক্রমশ উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল। স্ফীতনাসারন্ধ্র মুদিতচক্ষু তিনি নিস্পন্দ হইয়া এককোণে বসিয়া ছিলেন। দ্বারে আবার শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলেন—বেঁটে গ্যাঁট্টাগোঁট্টা সেই ছায়ামূর্ত্তি পুনরায় দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"কি আবার—"

"সেই জু মেয়েটি মরে গেল।"

"ও। আচ্ছা, প্যাক করে ফেল্‌ তা হলে। বড় প্যাকিং কেস আছে তো?"

"আছে।"

"প্যাক করে সেই বুড়ো জু-টার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস। ডাক্তারবাবু সার্টিফিকেটও একখানা দিয়ে গেছেন, সেটাও নিয়ে যেও। সেই বুড়ো জু-ই মড়ার ব্যবস্থা করবে। তার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে কাল। এখুনি সরিয়ে ফেল তার বাড়িতে, দেরি কোরো না—"

ম্যানেজার এমন অনাকুলিত চিত্তে আদেশ দিলেন যেন একটা কাচের পাত্র অসাবধানে ভাঙিয়া গিয়াছে, টুকরাগুলা সরাইয়া ফেলিতে বলিতেছেন।

ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ঘন বেগুনী রঙের নিবিড় পরিবেষ্টনীতে নিষ্ঠুর নীরবতা পুনরায় ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

২১

মৃন্ময় ছিল না।

অতিশয় তুচ্ছ একটি ওজুহাত দেখাইয়া হাসির নিকট চলিয়া গিয়াছিল। ওজুহাতটার তুচ্ছতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও মুকুজ্যেমশাই আপত্তি করেন নাই, বরং সস্নেহ কৌতুকভরে তাহার যাওয়াটার সমর্থনই করিয়াছিলেন। সত্যই তো, মৃন্ময় কি রকম ধরণের চাকরি লইবে সে সম্বন্ধে হাসির সহিত একটা পরামর্শ করা কর্ত্তব্য বই কি! মৃন্ময়ের অবিলম্বে চলিয়া যাওয়া উচিত। মৃন্ময় চলিয়া গেলে মুকুজ্যে মশাই অনুকম্পাভরে ভাবিয়াছিলেন আহা বেচারা, একটা বলিষ্ঠ রকম ওজুহাতও খাড়া করিতে পারে নাই, চাকরি সম্বন্ধে হাসির মতামত লইতে গিয়াছে। যেন বহু মনিব আসিয়া চাকরির জন্য তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে, কোন্‌টা গ্রহণ করিবে সে ঠিক করিতে পারিতেছে না!

মুকুজ্যে মশাই আরও একটা কারণে মৃন্ময়কে ছুটি দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, মৃন্ময় ক্রমশ কেমন যেন ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে। এমনিই সে বড় একটা হাসে না, কিন্তু এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। হাসি বাপের বাড়ি যাইবার পর সেই গাম্ভীর্য্যের উপর একটা বিষাদের কালিমাও যেন দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। মুকুজ্যে মশাই ভাবিলেন, যাক দিনকতক হাসির নিকট ঘুরিয়া আসুক, আমি একাই যতটা পারি করি।

মৃন্ময় কিন্তু হাসির নিকট গিয়াছিল সেই চিঠিগুলির সন্ধানে। মুকুজ্যে মশাই এবং হাসির অভিভাবক ভদ্রলোক যদিও মৃন্ময়ের গৃহত্যাগিনী পত্নীর কথা জানিতেন, কিন্তু হাসিকে সেকথা তাঁহারা বলেন নাই। সে পত্নীর নামও তাঁহারা জানিতেন না এবং তাহাকে ঘিরিয়া মৃন্ময়ের অন্তরলোকে যে সব অসাধারণ কাণ্ড ঘটিতেছিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও তাঁহারা কোন দিন পান নাই। সুতরাং স্বর্ণলতাকে লিখিত চিঠিগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছিল, মুকুজ্যেমশাই বাসায় একা ছিলেন। বেশ ভালই ছিলেন। সমস্ত সকাল বিজ্ঞাপন দেখিয়া, সমস্ত দুপুর পূর্ব্বলিখিত দরখাস্তগুলির সম্বন্ধে তদ্বির করিয়া এবং সমস্ত নূতন বিজ্ঞাপন অনুযায়ী দরখাস্ত লিখিয়া তাঁহার ভালই কাটিতেছিল। প্রতিদিন দুপুরে বাহির হইবার মুখে রাত্রের লেখা দরখাস্তগুলি টাইপ করাইবার জন্য দিয়া আসিতেন। শিরিষবাবুর নিকট হইতে শঙ্করের নূতন ঠিকানাও তিনি পাইয়াছেন, শঙ্করের সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছেন। সে একটা ছোটখাটো টিউশনি জোগাড় করিয়াছে এবং কি করিয়া প্রুফ দেখিতে হয় অধ্যবসায় সহকারে তাহাই শিক্ষা করিতেছে। বিকাশ নামক এম্‌. এ. পরীক্ষার্থী যুবকটি মুকুজ্যেমশায়ের মধ্যে অপ্রত্যাশিতরূপে

একজন বিদ্বান অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়া পুলকোচ্ছ্বাসের আতিশয্যবশত মুকুজ্যেমশায়ের কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু মুকুজ্যেমশাই তাঁহার উৎসাহ-অনলে শীতল বারি সিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। অতিশয় নিরীহভাবে তিনি বিকাশবাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি নিজে ফিলজফির 'ক'ও জানেন না, অন্তত্র তিনি একজন এম. এ. পরীক্ষার্থীকে ওই প্রশ্নগুলি পড়িতে দেখিয়াছিলেন এবং সেগুলি তাঁহার মনে ছিল বলিয়াই আকস্মিকভাবে বিকাশবাবুকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিজে মূর্খ মানুষ, ফিলজফির কিছুই বোঝেন না। এই কথায় মুকুজ্যে মশায়ের সৌভাগ্যক্রমে বিকাশবাবু নিরস্ত হইয়াছেন এবং মুকুজ্যেমশায়ের নিকট আসা কমাইয়া দিয়া সদ্যদত্ত পরীক্ষার খবরাখবর করিতে ব্যস্ত হইয়া আছেন। একা একা নিজের আরব্ধ কার্য্যে মশগুল হইয়া মুকুজ্যেমশায়ের দিনগুলি সুন্দর কাটিতেছিল।

এমন সময় একদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেদিন রবিবার, মুকুজ্যেমশাই বাসায় ছিলেন। অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে কোন খবর না দিয়া রাজমহল হইতে মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে কেহ নাই, একাই আসিয়াছে।

"এ কি, তুমি যে হঠাৎ!"

মনোরমার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, "এমনি এলুম, ওখানে আর ভাল লাগছিল না—"

মুকুজ্যেমশাই ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চক্ষু দুইটি কৌতুক-দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"একা চলে এলে, ভয় করল না?"

"না।"

"এ বাসার ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারলে কি করে!"

"ঠিকানা খুঁজতে গিয়েই দেরি হল, আমি হাওড়ায় এসে পৌঁছেচি সকালের ট্রেণে—"

"তার পর?"

"হাওড়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে আর জিজ্ঞেস করতে করতে আসছি।"

"হাওড়া থেকে হেঁটে আসছ!"

"পয়সা ছিল না—"

মুকুজ্যেমশাই অবাক হইয়া গেলেন।

"এমন করে আসবার মানেটা কি?"

"ওখানে আর ভাল লাগছিল না।"

এইটুকু বলিয়া মনোরমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মুকুজ্যেমশাই বুঝিলেন হাজার প্রশ্ন করিলেও ইহার বেশী আর সে কিছুই বলিবে না।

"যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধোও গিয়ে। উঠোনের ওপাশেই কল আছে। কলে বোধ হয় জল এসেছে এতক্ষণ—"

মনোরমা ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুকুজ্যেমশাই মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন মনোরমার এ আচরণের অর্থ কি। অর্থ যাহাই থাকুক, আন্দাজ করিয়া লইতে হইবে। স্বল্পভাষিণী মনোরমা যাহা বলিয়াছে তাহার বেশী আর কিছু বলিবে না। মাত্র চার-পাঁচ দিন পূর্ব্বে মুকুজ্যেমশাই ভবেশকে কুড়ি টাকা, মনোরমার হাত-খরচ পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই পাঁচ টাকা সম্বল করিয়াই মনোরমা এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়াছে তো, কিন্তু এখন তাঁহাকে লইয়া কি করা যায়! ভবেশের কাছে মনোরমাকে রাখিয়া মুকুজ্যেমশাই বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। হঠাৎ মনোরমার হইল কি? ভবেশকে মুকুজ্যে-মশাই ভাল করিয়াই চেনেন, মনোরমার সহিত সে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিবে ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। সহসা মুকুজ্যে-মশায়ের মনে হইল, মনোরমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে হয় তো অনেকক্ষণ কিছুই খায় নাই। মুকুজ্যে-মশাই উঠিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন না। উঠানে নামিয়া দেখিলেন, কলের কাছেও কেহ নাই, কল হইতে জল পড়িতেছে। মনোরমা গেল কোথায়? মৃন্ময় যে ঘরটায় শুইত, দেখিলেন তাহার দরজাটা খোলা রহিয়াছে। বারান্দায় উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া মুকুজ্যে-মশাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। চৌকির উপর মনোরমা উপুড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! মুকুজ্যেমশাই

খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ যে কিছু একটা ঘটিবে তাহা তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অনাথার প্রতি করুণাবশত। কর্ত্তব্য ক্রমশ কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। আরও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুকুজ্যেমশাইকে অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।

"কি হল তোমার?"

মনোরমা নীরব।

মুকুজ্যেমশাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"ওঠ, ওঠ, কি ব্যাপার সব খুলে বল তো—"

মনোরমা উঠিয়া বসিল এবং বেশবাস সম্বৃত করিয়া মুকুজ্যেমশায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

"হ'ল কি তোমার! এরকম করার মানে কি?"

মনোরমা খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া ক্রন্দন-কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি আর সহ্য করতে পারি না—"

"কি সহ্য করতে পার না?"

"আপনার দয়া—"

"তার মানে?"

মনোরমা সহসা ঘুরিয়া বসিল। অশ্রুবাষ্পাকুল আরক্ত নয়ন দুইটি মুকুজ্যেমশায়ের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আপনি কি মনে করেন আমি মানুষ নই, আমার প্রাণ বলে কোন জিনিস নেই, আপনি চিরকাল দয়া করে যাবেন আর আমি তা চিরকাল সহ্য করব? আপনার দয়া পাবার কি যোগ্যতা আছে আমার, কেন শুধু শুধু আপনি এমন করে চিরকাল আমার ভার বয়ে বেড়াবেন! কাশীর একটা আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে কেন সকলের কাছে আত্মীয় বলে পরিচয় দেবেন, আপনার ওপর যখন সত্যিকার কোন দাবীই নেই আমার?"

"কে বললে দাবী নেই?"

উৎসুক-নয়নে মনোরমা প্রশ্ন করিল, "কিসের দাবী?"

"প্রত্যেক মানুষের ওপরই প্রত্যেক মানুষের দাবী আছে—"

"কেন?"

"কারণ মানুষ পশু নয়—"

"আপনি কি যেখানে যত অসহায় আছে সকলকেই এমনি করে সাহায্য করেন?"

"ক্ষমতায় কুলোলে নিশ্চয়ই করতাম, সকলকে সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

মনোরমা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "আরও কত লোক তো আছে যারা আমার চেয়ে আপনার দয়া পাবার ঢের বেশী যোগ্য, আপনি আমাকেই বা বেছে নিলেন কেন?"

"কে যোগ্য কে অযোগ্য তা বিচার করবার অধিকার আমার নেই। যে আমার সামনে পড়ে যথাসাধ্য তারই উপকার করবার চেষ্টা করি। তখন কাশীতে ছিলুম, হঠাৎ একজনের মুখে তোমার খবর পেলুম, তোমার কাছে গিয়ে তোমার মুখে সমস্ত শুনে কষ্ট হ'ল, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চাইলাম, তুমিও স্বেচ্ছায় চলে এলে—এর বেশী তো আর কিছু নয়। তারপর থেকে আমি যথাসাধ্য তোমার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছি—"

মনোরমা চৌকি হইতে নামিয়া কাপড়-চোপড় আর একবার সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না—"

"কি সহ্য করতে পারছ না?"

"বললাম তো, আপনার দয়া।"

"সহ্য করতে পারছ না কেন?"

"কারণ আমি পশু নই, মানুষ—"

নিজের উত্তরটাই এমন তির্য্যকভাবে নিজের কাছে ফিরিয়া আসায় মুকুজ্যেমশাই ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিলেন। কিন্তু বিস্মিত হইলেন যখন দেখিলেন—মনোরমা নিজের ছোট পুঁটুলিটি লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

"ও কি, কোথা যাচ্ছ?"

"যেদিকে দু চক্ষু যায়, এমনভাবে কারো দয়ার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো—"

মুকুজ্যে কিছু বলিলেন না, স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা দ্রুত-বেগে বাহির হইয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তেই গুরুভার পতনের শব্দে সচকিত হইয়া মুকুজ্যেমশাই বাহিরে গিয়া দেখিলেন মনোরমা সিঁড়ির উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মুকুজ্যেমশাই ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন; অজ্ঞান

মনোরমাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন।

গভীর রাত্রে মনোরমা চক্ষু মেলিয়া দেখিল একজন অপরিচিতা নারী তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে।

"আপনি কে ?"

"আমি নার্স।"

"আপনি কি ক'রে এলেন ?"

"আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম, তিনিই আমাকে রেখে গেছেন—"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "ওই যে সন্ন্যাসী মতন কে একজন ছিলেন তিনিই ডেকেছিলেন ডাক্তারবাবুকে—"

"তিনি কোথায় ?"

"তিনি আপনার সব ব্যবস্থা করে' দিয়ে কোথায় যেন গেলেন। কাল সকালে আসবেন বলে গেছেন। আপনি বেশী কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবু নিষেধ করে গেছেন—"

মুকুজ্যেমশাই বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল চীৎকার করিয়া বলে—"চাই না, চাই না, তোমার এত দয়া চাই না আমি—"

কিন্তু সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

কবরী বেঁধো না আজ

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

কবরী বেঁধো না আজ, ভুল যদি হয়ে থাকে হোক।
বাতায়নে চেয়ে দেখো ওই চুলে চেয়ে আছে
দূর মেঘলোক।
বিজলী-চমকে থাকি থাকি
ভীরু বুক যদি কাঁপে
সচকিত মুদে আসে আঁখি,
পালাতে যেয়ো না যেন বিভোল অমন।
এলো চুল খোলা থাক, থাক খোলা মেঘের মতন।

দ্বার যদি রুধি দাও, বাতায়ন তাও দাও তবে।
আঁধার ঘিরিয়া থাক, সেই ভালো সেই ভালো হবে।
ঘন হয়ে এসো কাছে বসি,
মরালের মত তব
বাঁকা গ্রীবা যদি পড়ে খসি
আমার কাঁধের পরে সরায়ো না আর।
বহিতে পারিব আমি সুকোমল ওই লঘুভার।
মেঘেরা করেছে ভিড় শ্যাম মনোহর,
নেমে আসে বাদল-নিঝর।
বাহিরে শ্বসিছে শন্ বাদল-বাতাস,
আমার কানের কাছে মৃদু তব পড়িছে নিশাস;
ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্ বরষার সুর—
বাজিছে তোমার যেন চরণ-নূপুর!
বাদলে মাতাল হই, মোর চোখে ডোবে চরাচর,
মনের গহনে খুঁজি কোথা কোন্ মণি মনোহর;
দেখি সেথা তুমি আছ, আছ তুমি চির অমলিন
প্রবাল নবীন।
বরষার বরিষণে মোহ যেন আছে মদিরার
বাহিরে মেঘল মায়া
হৃদয়ে শ্যামলী ছায়া
করিছে বিথার।
আরো ঘন হয়ে বসো, মুদে রাখো হরিণ-নয়ন
খোলা চুল থাক খোলা পিঠ ছেয়ে মেঘের মতন।

থির হয়ে বসো তুমি, আজ নহে কথোপকথন;
আজ শুধু খুলে দাও মন খুলে দাও।
নিচল তনুর তীর ছাড়ি মন হউক উধাও।
চলো সেথা যাই যেথা কলরব করে না কো কেউ,
ঝড় যেথা বহে না কো থেমে আছে সাগরের ঢেউ,
যেখানে নাহিকো তাপ, নাহি কোন বেদনার সুর,
উতল আবেগ নাই—সবি যেন মোহন মেদুর!
আরো দূরে চলো আরো যাই
মনে হবে বুঝি নাই, বুঝি বা চেতনা তব নাই!
কোন্ সেই পরিবেশ কিবা তার নাম
জানি না কো তবু ভালো লাগে অবিরাম
তারি মাঝে সমাহিত হতে অচপল।
মুকুলিত হয় আশ,
অপরূপ রসাভাষ—
তাহাতেই মোরা যেন করি টলমল।

ভাগবত জীবন

(৩)

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস্ (অবসর প্রাপ্ত)

বড় বড় কথা যে মানুষে বলে না, তাহা নহে। কিন্তু যে ভাবের কথা শোনা যায় তাহা ভেদ ও অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মনের কল্পনা মাত্র, তাহার দ্বারা সমস্যার যথার্থ সমাধান কখনই সম্ভবপর নয়। অতীত কালে মানব তাহার জীবনে আংশিক সামঞ্জস্য সাধিয়াছে খণ্ড খণ্ড সংঘটন দ্বারা—by ideation and limitation এবং সেই প্রচেষ্টার ফলে সে নানা লক্ষ্য, নানা ভাবনা,নানা কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘর্ষ, তাহার অবসান হইতে পারে না; সমস্ত খণ্ডধারা মিলিয়া এক বিশাল স্রোতস্বতী সৃষ্টি করিতে পারে না, যতদিন না মানব তাহার অন্তরে উচ্চতম চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞান একাজ করিতে পারিবে না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, Reason and Science can only help by standardising. * * A greater whole being, whole knowledge, whole-power is needed to weld all into a greater unity of whole life. বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞান পারে শুধু বাহির হইতে মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করিতে। সমগ্র সত্তা, সমগ্র জ্ঞান, সমশক্তির প্রয়োজন যথার্থ একত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু এই সমগ্রের অনুভূতি আসিবে কোথা হইতে? মহত্তর গভীরতর সত্যের উপলব্ধিই শুধু দিতে পারে সেই অনুভূতি, সেই সঙ্গতি। সে উপলব্ধি আসিলেই অপূর্ণ মানবমনের অপূর্ণ জোড়াতালির কাজ শেষ হইবে—ধ্রুব সত্যের ভিত্তির উপর সর্ব্বথা পরিপূর্ণ হইবে মানবের জীবন। আজ মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে কিরূপ জীবন-মরণ সঙ্কট তাহার সম্মুখে আসিয়াছে। উচ্চতর জীবনের পানে সে অন্ধভাবে তাহার হস্ত বাড়াইতেছে। মিটমাটের দ্বারা আজিকার ঘোর সমস্যার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, কেন না সমস্যা মূলগত। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী বিবর্ত্তনের বেগ সহ্য করিতে পারে, এরূপ মানবের আজ প্রয়োজন। সে মানবের একান্ত আবশ্যক বৃহত্তর প্রাণ ও বৃহত্তর মন এবং সেই প্রাণ-মনের পশ্চাতে জাগ্রত প্রবুদ্ধ আত্মাপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—A greater wider more conscious unanimised Life-Soul.

আমাদের যুক্তিবাদী মন সমস্যা সমাধানের যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা মোটামুটি গণতন্ত্র ও উদার অর্থ-নীতিক ভিত্তির উপর গঠিত মানবসমাজ। কিন্তু এই পন্থার অনুসরণ করিয়া মানুষ কি প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির দাবী মিটাইতে পারিবে, প্রকৃতি দেবী কি এইটুকু পাইয়া তুষ্ট থাকিবেন? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে মানবকে যদি বাঁচিতে হয় ত তাহাকে বিবর্ত্তনের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইতে হইবে। মানুষের আপন মনেও এই সংশয় জাগিয়াছে যে জাতির ধ্বংস নিবারণ করিতে হইলে তাহাকে নূতন পথ ধরিতে হইবে, নূতন প্রেরণাতে নূতন করিয়া মানব সমাজ গড়িতে হইবে—যথার্থ ধ্যেয় কি, কাম্য কি, তাহা নূতন করিয়া ধার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এদিকে মানুষের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই; কেন না—the means adopted have been the forcible and successful materialisation of a few restricted ideas and slogans to the exclusion of all thought. অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তা বন্ধ করিয়া দিয়া মানুষকে বলপূর্ব্বক প্রবলের আদেশমত নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করা হইয়াছে। ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থের সম্মুখে পূর্ণভাবে বলি দেওয়া হইয়াছে, ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নাই; আমরা চিন্তাকারীরা যাহা কিছু বলিব তোমরা তাহা কলের মত করিয়া যাইবে। ইহাতে জগতের কিছু মঙ্গল হয় নাই। সমষ্টিগত স্বার্থ, সমষ্টিগত অহংকার, এরূপ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে যে জগতে সুখশান্তি বলিয়া কোন পদার্থ আর থাকিতেছে না। সমষ্টির ইচ্ছা, সমষ্টির মঙ্গলামঙ্গল কি—তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন দুই একজন শক্তিশালী পুরুষ, বাকী যাহা দেখা যাইতেছে তাহা গড্ডলিকাপ্রবাহ। The communal ego is

idealised as the soul of the nation, the race, the community. সমষ্টিগত অহমিকা রোমক, নর্ডিক, খৃষ্টীয়, ইউরোপীয় ইত্যাদি নানা নামে মানবের আত্মাকে, তাহার যথার্থ সত্তাকে, পেষিত করিতেছে। এরূপ অহমিকাকে মানবের আত্মা কিরূপে বলা যাইতে পারে। আত্মাপুরুষ যে ভেদজ্ঞানের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত! শ্রীঅরবিন্দ সমষ্টিগত অহংকারকে obscure collective being বলিতেছেন—অবচেতনা হইতে উত্থিত—উচ্চতর বৃহত্তর চেতনার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা উত্তরণের পথ নয়; অবতরণের লক্ষণ এখানে সুস্পষ্ট— It is a reversion towards something Nature has left behind her.

একতাসাধনের আর এক প্রকার চেষ্টা মানব করিয়াছে অর্থনীতিক ভিত্তির উপর, কিন্তু তাহারও ধারা একই, জোর-জবরদস্তী, বাহির হইতে চাপ দিয়া মানুষকে একপ্রাণ করা, তাহার কর্ম্মকে একমুখী করা। এরূপ কৃত্রিম একতা কয়দিন টিকিতে পারে! ব্যক্তিগত চেতনার প্রসার না আসিলে সমষ্টিগত মন-প্রাণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না। মনপ্রাণের অবাধ স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া না আসিলে চেতনার প্রসারও আসিতে পারে না। যতদিন না উচ্চতর সূক্ষ্মতর বৃত্তি জাগিয়া উঠে ততদিন মনপ্রাণই আত্মার আজ্ঞাকারী ভৃত্য, তাহাদের নমনীয়তা ও কার্য্যকরী শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতার ঔষধ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যনাশ নয়, ঔষধ তাহার চেতনার প্রসার, তাহার ব্যক্তিগত মনে বিশ্বজনীন ভাবের উদ্বোধন।

এরূপ মনে হইতে পারে যে ব্যক্তিকে স্বার্থত্যাগে অনুপ্রাণিত করিয়া সমাজকে সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত করিলেই নরজাতির চরম উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল। কিন্তু মন-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিলেও ত আত্মার উন্নতি সাধিত হইল না! আত্মা কৃত্রিম শাসন নিয়মনকে মানিয়া লইবে কেন, সে বিদ্রোহী হইয়া উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। গুরুবর বলিতেছেন, Man's true way is to discover his soul and its self-force and instrumentative অর্থাৎ যথার্থ ক্রমোত্তরণ সাধিত হইবে অন্তরস্থ আত্মাপুরুষের দ্বারা, তাহার শক্তির দ্বারা, মনোবুদ্ধির দ্বারা নয়।

আর এক বিপদ আছে। মানুষের মন সমাজের ও জীবনের যান্ত্রিক আদর্শের উপর বিরক্ত হইয়া কেবল ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আদর্শের দিকে ফিরিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম-সংঘটনের দ্বারা ত সমগ্র মানব সমাজকে পুনর্গঠিত করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ কতকটা সূক্ষ্ম অনুভূতি পাইতে পারে—can provide a means of inner uplift for the individual—কিন্তু সমাজের আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। হয়ত মানুষ সেই ধর্ম্মের মূলনীতিগুলিকে মোটামুটি মানিয়া লইবে, সেই নীতিদ্বারা আপন গার্হস্থ্য ও ও সমবেত জীবনের নিয়মন করিবে, ধর্ম্মের বিধান অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম্ম করিবে, কিন্তু সমগ্র জীবন ধারার অভিব্যক্তি পড়িয়া থাকিবে। বার বার পৃথিবীতে এইরূপ হইয়াছে। It does not transform the race, it cannot create a new principle of existence—এরূপে সমগ্র জাতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে না, জীবনে একটা নবীন নীতির প্রবর্তন হয় না। তাহা হইলে চাই কি? শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় —A total spiritual direction given to the whole life and the whole nature can alone lift humanity beyond itself—আমাদের সমগ্র প্রাণ ও সমগ্র স্বভাবকে পূর্ণভাবে চালিত করিতে হইবে আধ্যাত্মিক পথে, তবেই মানব তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে।

এই ধর্ম্মসংঘটনেরই অনুরূপ আর এক উপায় মানুষ অবলম্বন করিয়াছে আপন উত্তরণের জন্য। তাহা ধার্ম্মিক সাধুপুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িক জীবন। কিন্তু এ উপায়ও ব্যর্থ হইয়াছে। এখানেও মন দেহপ্রাণকে বাগ মানাইতে পারে নাই। মন অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বৃত্তিকে মনের স্থানে অধিষ্ঠিত না করিলে, অন্তঃপুরুষের পূর্ণ অধিকার স্থাপিত না হইলে, মানুষ প্রকৃতির নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট অভিব্যক্তির সহিত তাল রাখিতে পারিবে না। তাহার বর্ত্তমান সসীম মনপ্রাণ পদে পদে তাহার গতি ব্যাহত করিবে। আমাদের সত্তার, আমাদের অন্তরের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। হয়ত মনে হইবে যে এরূপ পরিবর্ত্তন, দিব্যমানসের প্রতিষ্ঠা, সুদূরপরাহত। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক—কেন না যে বিজ্ঞান, যে দিব্যচেতনা এই পরিবর্ত্তন সাধিবে তাহা আমাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদের কাজ সেই সুপ্ত চেতনা, সুপ্ত জ্ঞানকে জাগান। কাজ কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু

অসম্ভব বা সুদূরপরাহত নয়। উপরন্তু প্রথমাবধি, নিশ্চেতন জড়ের অবস্থা হইতেই, ক্রমোত্তরণের গতি এই দিকে, পৃথিবীর সমস্ত অতীত জীবন আমাদিগকে উত্তরণের এই ধাপ চড়িবার জন্য প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে। তথাপি এ ধাপ মানুষকে চড়িতে হইবে স্বেচ্ছায়, জানিয়া বুঝিয়া। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, What is necessary is that there should be a turn in humanity felt by some or many towards the vision of this change, a feeling of its imperative need, the sense of its possibility, the will to make it possible in themselves and to find the way, অর্থাৎ মানুষের অনেককে এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও যত্নপূর্ব্বক উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই কথাটী খুব ভাল করিয়া বোঝা চাই। ক্রমোন্নতির প্রথম ধাপগুলি জীবজগৎ চড়িয়া আসিয়াছে আপন প্রবৃত্তিবশে ও আবেষ্টনের প্রভাবে। সে সমস্ত জীবের বুদ্ধিবৃত্তি ছিল না। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী তাহাকে উঠিতে হইবে জ্ঞানতঃ, স্বেচ্ছায়। সে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বুঝিবে, পরিবর্ত্তন সম্ভবপর মনে করিবে, তাহার পরিবর্ত্তনের একান্ত ইচ্ছা হইবে, তবে সে উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবে। সকল মানুষ যে একসঙ্গে এই কাজ সাধিবে তাহা নয়। যাহারা বুঝিবে, ইচ্ছা করিবে, তাহারাই যাত্রারম্ভ করিবে। জাতির মহা সঙ্কটকাল যতই নিকটে আসিতেছে, ততই আমূল পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইচ্ছা একান্ত ও একাগ্র হইলে তাহার উত্তর নিশ্চয়ই আসিবে দিব্যলোক হইতে।

তবে উত্তর ব্যক্তিগতভাবে আসিতে পারে। এখানে সেখানে দুই-চারিজন মানুষ বিজ্ঞানময় জীবনে উন্নীত হইতে পারে। এইরূপ প্রবুদ্ধ মানব, শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, must either withdraw into their secret divine kingdom and guard themselves in a spiritual solitude or act from their inner light on mankind for what can be prepared in such conditions for a happier future. অর্থাৎ তাহাদিগকে গোপনে রভসে আপন দিব্য রাজ্যে বাস করিতে হইবে এবং আপনার শুচিতা বাঁচাইয়া যতটুকু সম্ভব জাতির উত্তরণের জন্য কাজ করিতে হইবে। সমষ্টিগতভাবে কাজ তখনই হইতে পারিবে যখন এইরূপ কয়েকজন মানুষ, সমভাবাপন্ন, সমমতাবলম্বী, আপন স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া অন্তরের প্রেরণা অনুযায়ী জীবন যাপন করিবে। অতীত কালে মঠ আশ্রম ইত্যাদি এইরূপেই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মঠ মানে মুক্তিকামী সংসারত্যাগী বিরক্তজনের সংঘটন। অভিব্যক্তির পথে সমাজকে সংসারকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাতে ইঁহাদের কি উৎসাহ থাকিতে পারে! যতদিন অবিদ্যা, অজ্ঞান, সাধারণ মানবের দেহপ্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ততদিন জনকয়েক সন্ন্যাসীর আশ্রমজীবন জাতির উদ্ধার সাধিতে পারিবে না। সম্প্রদায়ের ক্রমিক অধঃপতন হইবে, বাহিরের অসঙ্গতি, অপূর্ণতা, অবশেষে মঠজীবনকেও অভিভূত করিবে। ইতিহাসে ইহা বহুবার দেখা গিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে একসঙ্গে অনেকগুলি লোকের অন্তরে মানসের স্থানে অতিমানস, চেতনার স্থানে প্রচেতনার অধিষ্ঠান না ঘটিলে, তাহাদের দেহপ্রাণ রূপান্তরপ্রাপ্ত না হইলে জগতে নবজীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে না—an entirely new conciousness in many individuals transforming their whole being, transforming their mental vital and physical nature self, is needed for the new life to appear.

শ্রীঅরবিন্দ পর পর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে নবজীবনের পূর্ণ অভ্যুদয় কিছু সর্ব্বত্র একসাথে হইবে না। প্রথম প্রথম নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া নবীন সমাজকে চলিতে হইবে। সাধারণ জীবনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সময়সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত উত্তরণ দ্রুত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জগতের বিশেষ লাভ নাই। কেন না কয়েকজন এইরূপে ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত মানুষ একত্র মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র আদর্শ সমাজ স্থাপিত করিলেও তাহা টিকিবে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি সেই সমাজে তাহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আনিবে বহুগুণ পরিবর্দ্ধিত রূপে, তাহার পূর্ব্বতন প্রকৃতির যত সমস্যা, যত কিছু বিরোধ, অসঙ্গতি, অপূর্ণতা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, would bring in not only his capacities but his difficulties and the oppositions of the old nature and mixed together in the restricted circle of a small and close common life, these might assume a considerably enhanced force of

obstruction. এইভাবে মানবের পূর্ব্বতন বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু যদি প্রকৃতি উত্তরণের জন্ম প্রস্তুত থাকেন, যদি ঊর্দ্ধ হইতে অবতীর্ণ দিব্যশক্তির সহায়তা মিলে ত উপরি-উক্ত বাধাসমূহ সরিয়া যাইবে, মানব জাতির ক্রমোন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে।

এখন দেখিতে হইবে যে বিজ্ঞানে জাগ্রত মানব সমাজ চারিদিকে তমসাচ্ছন্ন মনোময় মানবের জীবনের মাঝে কিরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারিবে। এই দুই জীবনধারা যে পরস্পরবিরোধী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশাপাশি দুই ধারা চলিলে তাহারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই। বিজ্ঞানময়ের প্রভাব বেশী হইবে, মনোময়ের প্রভাব কম, কিন্তু উভয়ের সংস্পর্শের ফলে কতকটা আদান-প্রদান মিটমাট ঘটিতে বাধ্য। সংঘর্ষ ও ঝগড়াঝাটি লাগার খুব সম্ভাবনা, কেন না নিম্নতর মনোময় মানবের স্বভাবই বিবাদ-বিসংবাদ। তবে এ ক্ষেত্রে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কেন না প্রতিপক্ষের শক্তি তাহার শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে বিজ্ঞানময় সমাজের একেবারে পৃথক থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। It might establish itself in so many islets and from there spread through the old life, throwing out upon it its own influence and filtrations, gaining upon it, bringing to it help and illumination. অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ পুরাতন জীবন ধারার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবে, নবীন আলোকে পুরাতনকে উদ্ভাসিত করিবে। ধীরে ধীরে সাধারণ মানবসমাজ এই নূতন শক্তির প্রভাব, তাহার আলোক, তাহার সামর্থ্যকে চিনিতে শিখিবে।

মধ্যবর্ত্তী কালে এইরূপ সব গণ্ডগোল হইবে, কিন্তু পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। অভিব্যক্তির জয়-জয়কার হইবেই, জগতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট। এই উচ্চতর চেতনার শক্তি ও জ্ঞান উভয়ই এমন যে সে নবীন gnostic সমাজে অন্তরের একত্ব ত আনিবেই, উপরন্তু জীবনের প্রাচীন ও নবীন, দুই ধারারও সামঞ্জস্য বিধান করিবে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় it would be sufficient to ensure a dominating harmony and reconciliation between the two types of life—অতি মানসের দিব্যভাতি মানসের অন্ধকার দূর করিবে। বিজ্ঞানময় মানবের জীবন পৃথক থাকিলেও তাহার মধ্যে অপরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ থাকিবে না। যে পারিবে সে প্রবেশ করিবে, কিন্তু যে বাহিরে থাকিবে সেও দিব্য-মানসের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইবে না, দিব্যজ্যোতির আলোকে সে আপন মনোময় জীবনেই পূর্ণতর সঙ্গতি সাধিতে শিখিবে। মনের শক্তির সীমা আছে, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না দিব্য অতিমানস আমাদের এই সসীম মনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। এই প্রসুপ্ত দিব্যচেতনাই নবীন জগতে নবীন জীবনের স্বরূপ ও চিন্তার সত্যের আলোকে নির্দ্ধারিত করিবে। গুরুদেবের ভাষায়—The supramental principle in Super nature would itself determine according to the truth of things the balance of a new world-order. মনের অহংজ্ঞান গেলেই মানুষ ঊর্দ্ধে উঠিবে, দিব্য-জ্যোতির প্রকাশে তাহার দিব্য-চেতনা ফুটিয়া উঠিবে। দিব্য-চেতনাতে বিরোধ অসঙ্গতি নাই, জ্ঞান সেখানে অভিন্ন আত্মজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞান—unified self-knowledge, প্রবুদ্ধ মানবের জীবন নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্য নয়, রাষ্ট্রের জন্য নয়, মানবজাতির জন্যও নয়, শুধু পরম সত্যের জন্য, বিশ্বাতীতের ইচ্ছার প্রকাশের জন্য। তাহার মনে আপন পরের দ্বন্দ্ব নাই, কেন না তাহার অখণ্ড একত্বের অনুভূতি হইয়াছে। একের ও বহুর মধ্যে অসঙ্গতি নাই, কেন না সে জানে যে উভয়ই বিশ্বাতীত চরম সত্যের বিকাশ। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন—A gnostic super-nature transcends all the values of our normal ignorant nature—অর্থাৎ বিজ্ঞানময় জীবনের পরা-প্রকৃতিতে আমাদের সাধারণ অজ্ঞান প্রকৃতির মোহ-অন্ধকারের কোন চিহ্নই থাকে না। তথাপি এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে নিম্নপ্রকৃতি উচ্চপ্রকৃতিরই রূপান্তর, বিকৃতি। তাই ইহা পূর্ণ অজ্ঞান নয়, অর্দ্ধ জ্ঞান। ইহার নিম্নতর প্রকট ধারার পশ্চাতে যে আধ্যাত্মিক সত্য প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই দিব্য চেতনাতে প্রকাশ হইবে। তখন অবিদ্যার আবরণ থাকিবে না, পূর্ণ সত্যের জ্যোতিতে মনপ্রাণ আলোকিত হইবে, তাহার চিন্তাধারা ও কার্য্যধারা পরিপূর্ণ সঙ্গতি পরম জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে।

ভাগবত জীবন ত নিষ্ক্রিয় হইবে না! বিরোধ-দ্বন্দ্ব

অসঙ্গতি থাকিবে না সত্য, কিন্তু দিব্য মানবের কর্ম্মধারা অব্যাহত থাকিবে। মোহাচ্ছন্ন মনের অস্পষ্ট উপলব্ধি, অস্পষ্ট চিন্তাধারা, অতিমানসে পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার কার্য্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, The affirmation of the Divine in himself and sense of the Divine in others and the sense of oneness with humanity, with all other beings, with all the world because of the Divine in them and a lead towards a greater and the better affirmation of the growing Reality in them will be part of his life-action—অর্থাৎ সে আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বভূতে অবস্থিত ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করিবে এবং অন্তরের ক্রমবর্দ্ধমান সত্যানুভূতির প্রেরণায় সকল কার্য্য করিবে।

দিব্য মানবের সমস্ত প্রেরণা আসিবে চরম সত্যের উপলব্ধি হইতে। সেই উপলব্ধির সহিত অসমঞ্জস যাহা কিছু মনে আছে, তাহা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। Much that is normal to human life would disappear—কত মানসী প্রতিমা, কত আদর্শ, কত নীতি, কত ভাবধারা যাহা আজ আমাদের সর্ব্বস্ব, তাহার অনেক কিছু দিব্য মানসে একেবারে বাতিল হইয়া যাইবে। যাহা থাকিবে, তাহারও বিস্তর রূপান্তর ঘটিবে। হিংসা দ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, অত্যাচার অনাচার, নির্ম্মমতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, অজ্ঞান, অক্ষমতা, বিশৃঙ্খলা—এসব নবমানবের জীবনে থাকিতে পারিবে না। শিল্পকলাদি থাকিবে কিন্তু মানুষের মানসিক বা দৈহিক সুখের জন্য নয়, সত্যসুন্দরের প্রকাশ বলিয়া। মানুষের দেহপ্রাণের অন্যায় অসঙ্গত আব্দার, দাবীদাওয়া, শেষ হইয়া যাইবে। তাহারা থাকিবে আজ্ঞাকারী ভৃত্যরূপে সত্যের প্রকাশের জন্য। জড় পদার্থও সেইরূপ থাকিবে জগতে অচল ধ্রুব সত্তার প্রকাশ রূপে—The control and the right use of physical things would be a part of the realised life of the spirit in the manifestation in earth-nature.

এই যে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত মানবের নবজীবন, ইহা কি সন্ন্যাসী তপস্বীর জীবনের মত হইবে! ইহার মূল নীতি কি হইবে কৃচ্ছ্র সাধনা? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে ইহা ভ্রান্তধারণা, এ ধারণার মূলে রহিয়াছে অজ্ঞান ও কামনার বশবর্ত্তিতা—a standard based on the law of ignorance of which desire is the motive. দিব্য জীবনে যে গুণ অবশ্য থাকিবে তাহা শুচিতা ও আত্ম-সংযম। এ গুণ দরিদ্রেরও থাকিতে পারে, শ্রীমন্তেরও থাকিতে পারে।

Self-expression of the spirit, the will of the Divine Being—আত্মাপুরুষের আত্মপ্রকাশ, ভগবানের ইচ্ছা—এই দুইটী জিনিস দিব্য-জীবনে ফুটিয়া উঠিবে। তাহা অত্যন্ত সরল সাদাসিধে জীবনেও হইতে পারে, ভোগের আবেষ্টনে বড়মানুষী জীবনেও হইতে পারে। তিনটী প্রধান লক্ষণ মনে রাখিতে হইবে দিব্য জীবন ধারার—বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য ও সঙ্গতি—তিনেরই মূলে অখণ্ড একত্ববোধ।

ভবিষ্যতের বিজ্ঞানে প্রবুদ্ধ মানব ও আজিকার বা আগেকার দিনের তথাকথিত অতিমানব, ইহাদের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতিমানব বলিলে বোঝায় অসীম শক্তি, নির্ম্মমতা, প্রচণ্ড অহমিকা ও জগৎকে আপন আয়ত্তাধীন করিবার আগ্রহ ও সামর্থ্য। ইহা ত মানবের অভিব্যক্তি নয়, ইহা আদিম বর্ব্বরতায় প্রত্যাগমন। কালের গতিতে একদিকে যেমন দেবমানবের উদ্ভব হইতে পারে, অপরদিকে তেমন অসুর বা রাক্ষস মানবের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু রাক্ষস ত উত্তরণের পথে দেখা দিবে না, দিবে অবনতির পথে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে পৃথিবীর আর অসুর যুগে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিবে না—ভবিষ্যতের মানব হইবে দেবোপম, তাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে দিব্যজ্ঞানের উপর। ইহা নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট। অজ্ঞানে অবিদ্যায় ভেদে এতাবৎ কাল জগতের ক্রমোত্তরণ চলিয়াছে। ভবিষ্যতে তাহা চলিবে জ্ঞানের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে, অবিদ্যাও জ্ঞানে দূরে অপসারিত হইবে।



কলঙ্কিনীর খাল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পূজা আসিয়া গেল। কুমোর প্রতিমা গড়িতে লাগিল। দত্ত-বাড়ীর প্রতিমার একমাটি শেষ হইয়া গেল, তবুও সুন্দরের মনে কেন জানি কোন উৎসাহ-উদ্যম কিছুই দেখা দিল না। প্রতি বৎসর যে অপরিমিত উৎসাহ-উদ্যম-আনন্দ বৎসরের এই সময়টায় তাহার অন্তরে জাগিয়া থাকিত তাহা এ-বৎসর সহসা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেছে। শ্রীমন্তই তাহা সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করিল, কিন্তু কারণ তাহার জানাই ছিল, কাজেই সে আর সুন্দরকে এ-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিয়া উত্যক্ত করিল না। সুন্দর তাহার কর্ত্তব্য কাজ সমস্তই করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কোন কিছুতেই তাহার তেমন আন্তরিকতা ছিল না। এমন কি এ-বৎসরে পার্ব্বতীচরণ যে কেমন প্রতিমা গড়িতেছে তাহাও সে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিল না। একটিবারও সে আর আর বৎসরের মত পার্ব্বতীচরণকে প্রতিমা যাহাতে দু-দশ গ্রামের মধ্যে সেরা প্রতিমা বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে সে-সম্বন্ধে কোনপ্রকার অনুরোধ করিল না, একটা কথাও বলিল না।

শেষে পার্ব্বতীচরণই একদিন বলিল, হ্যাঁগো দাদাবাবু, এবারতো কই একবারটিও আমার পাশে বসলে না। এটা হ'লো না, সেটা হ'লো না, ভাল-মন্দ কই একটা কথাও তো এবার বললে না। এবার বুঝি আর সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমার সঙ্গে কোন আড়াআড়ি নেই, ভাল-মন্দ যাহোক্ একটা হ'লেই হ'লো বুঝি?

সুন্দর বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িল। তাই তো, এবার তো সে একবারও পার্ব্বতীচরণকে স্মরণ করাইয়া দেয় নাই যে, তাহাদের প্রতিমা যেন সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমা অপেক্ষা ভাল হয়, নহিলে দত্ত-বাড়ীর মান-কান আর থাকিবে না। তাড়াতাড়ি কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সুন্দর বলিল, পার্ব্বতী-দা, সেকথা কি আবার নতুন ক'রে তোমাকে ব'লে দিতে হবে নাকি? আর সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমা তো গড়ছে শশী কুমোর—সে আবার নাকি পাল্লা দেবে তোমার গড়া প্রতিমার সঙ্গে। কাজেই বলার কিছু প্রয়োজন দেখিনে।

সুন্দরের কথায় পার্ব্বতীচরণ খুশী হইয়া গেল। প্রতি বৎসর সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমা শশী কুমোরই গড়িয়া থাকে এবং পার্ব্বতীচরণের সঙ্গে সে পাল্লা দিতে প্রাণান্ত পরিশ্রমও করে, কিন্তু কোন বৎসরই প্রতিমা তাহার পার্ব্বতীচরণের গড়া প্রতিমার সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। এ অঞ্চলে পার্ব্বতীচরণের গড়া প্রতিমার খ্যাতি আছে। পার্ব্বতীচরণ সুন্দরের কথায় তাই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া বলিল, হ্যাঁ, শশী গড়বে প্রতিমা—আর সেই প্রতিমা কি-না পাল্লা দেবে আমার গড়া প্রতিমার সঙ্গে! তা যা বলেচো দাদাবাবু! আর আমরা হলেম সাতপুরুষে-কুমোর দাদাবাবু—নূপুরগঞ্জের আদি কুমোর হ'লেম আমরা! আর শশী তো তা নয়—ওর সাত পুরুষে কেউ কখনও রং-মাটি এক করেনি। খেতে পেতো না ওর বাবা—ফ্যাঁ ফ্যাঁ ক'রে ঘুরে বেড়াতো—তাই দাদাম'শার আমার হাতে ধ'রে—তাকে কাজ শিখিয়ে গেচ্‌লো - সেই সূত্রে ও হ'লো কুমোর। তবেই বোঝো দাদাবাবু ···

বলিয়া পার্ব্বতীচরণ খুব প্রগল্‌ভ হাসি হাসিতে লাগিল। সুন্দর একথা ইতিপূর্ব্বে আরও বহুবার পার্ব্বতীচরণের মুখেই শুনিয়াছে, কাজেই ইহার মধ্যে আর নূতনত্ব কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না। তথাপি পার্ব্বতীচরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে বলিল, তাই না পার্ব্বতী-দা, তোমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রতিমা গড়া! কথায় বলে না বংশের ধারা! সে আর শশী পাবে কোথায়! কিন্তু শশীরও হাত দিন দিন পাকচে তো?

পার্ব্বতীচরণ মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, লোহার ছুরিতে যতই কেন না শাণ দেওয়া যাক্, ইস্পাতের ছুরির কাছে কি আর সে কিছু?

সুন্দর বলিল, কিছু নয়ই তো। সেজন্যেই তো আমি নিশ্চিন্ত আছি পার্ব্বতী-দা।

পার্ব্বতীচরণ খুশী হইয়াই বলিল, হ্যাঁ, তা নিশ্চিন্তই থাকো দাদাবাবু।

সুন্দর যথাসম্ভব অল্প কথায় পার্ব্বতীচরণকে বিদায় করিয়া দিয়া খালের ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। আজ সুন্দরের পিতা ভৈরব দত্তের পূজার বাজার লইয়া বাড়ী আসার কথা আছে এবং সময়ও প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রতি বৎসর ভৈরব দত্ত তাহার ব্যবসার স্থল হইতে এই সময় পূজার যাবতীয় বাজার সারিয়া একটি বৃহৎ নৌকায় সমস্ত জিনিষপত্র চাপাইয়া বাড়ী ফেরে। পিতার নৌকার আগমন প্রতীক্ষায় খালের ঘাটে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল যেন কতকটা পার্ব্বতীচরণের কথার সত্য অপ্রমাণ করিতেই, কিন্তু অপর পারের ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মন তাহার কেমন একপ্রকার ভীরু শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। মনে তাহার একবিন্দু উৎসাহ-আনন্দ নাই, আর সেকথা যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই জানিয়া ফেলিয়াছে; এমন কি, পার্ব্বতীচরণও জানিয়াছে। সুন্দর কি যে করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময় ওপারের ঘাটের লেবু গাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—রূপসী।

সুন্দর দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

আবার দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেই সে দেখিল, রূপসীর ঠিক পশ্চাতেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—টিয়া ও বাব্‌লি। তিন-জনেরই সদ্য-স্নাত মূর্ত্তি। সুন্দর সহজেই বুঝিল যে, পূজার কোন কাজেই হয় তো তাহারা ঘাটে আসিয়াছে। অল্প পরেই দেখা দিল মনোহর। সুন্দর আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়াই বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু কেন যে চলিয়া গেল তাহা নিজেও সে ভাল করিয়া বুঝিল না।

আবার মনোহরের কণ্ঠ।

টিয়া চম্‌কাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। রূপসী ও বাব্‌লি ফিরিয়া দাঁড়াইল। মনোহর এইমাত্র আসিয়াছে এবং বাড়ীতে কেহ নাই দেখিয়া ঘাটেই সোজা একেবারে চলিয়া আসিয়াছে।

মনোহর বলিল, পুজো তো তা হলে লেগেই গেল দেখতে পাই। আজ থেকেই তো প্রতিমার রং চড়বে শুনে এলাম শশীকুমোরের মুখ থেকে। ব্যস্, এইবার বাজনা বেজে উঠলেই তো পুরো পুজো লেগে ওঠে আর কি! কেমন কি-না দিদি? ভাবলাম তাই, দু'টো দিন গিয়ে থেকেই আসি শিখিপুচ্ছে, পুজোর ক'দিন তো আবার নানা ঠাঁই পালা গেয়ে বেড়াতে হবে কি-না, ছুটি আর মিলবে না।

রূপসী বলিল, তা বেশ। তুই এখন ঘরে গিয়ে বোস্, আমরা ঘাট থেকে কাজ সেরে আসচি।

রূপসীর কণ্ঠে আজ এই প্রথম কেন জানি একটু দরদ দেখা দিল। মনোহর কিন্তু তাহা লক্ষ্যও করিল না। সে অপলক দৃষ্টিতে টিয়ার দিকে চাহিয়া ছিল—চাহিয়াই রহিল এবং বলিল—টিয়া, তুমি যে দেখতে পাই ভীষণ রোগা হ'য়ে গেচো, অসুখ-বিসুখ করেছিল বুঝি?

এইবার রূপসী মনোহরের উপর চটিল। তাহার দরদ দেখানো তবে বৃথা হইয়া গেল! মনোহরের চক্ষে তাহার কোন সমাদর হইল না। সে টিয়াকে লক্ষ্য করিতেই ব্যস্ত। কাজেই রূপসী এবার একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলিল, যা দিকি বাপু এখন এখান থেকে, আমাদের হাতে অনেক কাজ। গাল-গল্প যা করতে হয় সেজন্যে তো সারাদিনই প'ড়ে রয়েচে। ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠে বোস্—আমরা কাজ সেরেই আসচি।

মনোহরের আর দাঁড়াইয়া থাকা ভাল দেখায় না, কাজেই সে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। টিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তেই আবার সে দুর্ভাবনায় কাতর হইয়া উঠিল। একে তো মন তাহার ভাল নয়, তাহাতে আবার মনোহর—সেই বিরক্তিকর মনোহর আসিয়া জুটিল। সারা দিন হয় তো পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইবে, এককথাই হয় তো বিনাইয়া বিনাইয়া পঞ্চাশ বার বলিবে এবং সর্ব্বশেষে সেই চরম বিরক্তিকর কথাই হয় তো কহিবে—আমাকে তুমি যাত্রার দলের ছেলে ব'লে মোটেই দেখতে পারো না টিয়া।

টিয়ার আর ভাল লাগে না। মনোহরকে সত্যই তাহার ভাল লাগে না। মনোহর যাত্রার দলের ছেলে বলিয়া টিয়ার কোন বিদ্বেষ নাই, কিন্তু মনোহরের অকারণ অন্তরঙ্গতা তাহাকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তোলে, তাহার বিশ্রী লাগে। মনোহরকে সেকথা বুঝাইয়া বলাও চলে না। কাজেই মনোহরের প্রতি টিয়ার ব্যবহারে অধুনা কেমন একটা জড়তা আসিয়া গেছে। সে-কারণে মনোহরের

আগমন টিয়ার কাছে আরও বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপায় নাই, মনোহরকে ক্ষুণ্ণ করাও চলে না। টিয়াকে অনেক কিছুই সহ্য করিতে হয়, মনোহরের অসঙ্গত অন্তরঙ্গতাই বা সে সহ্য করিবে না কেন। টিয়া তাই যথাসাধ্য নিজের মনোভাব অপ্রকাশ রাখিতেই চেষ্টা পায়, মনোহরকে সম্ভব হইলে মুখের কথায় ও ব্যবহারে খুশী রাখিতেই চেষ্টা করে।

ঘাট হইতে মনোহর ফিরিয়া পূজামণ্ডপে যেখানে শশী কুমোর প্রতিমায় রং চাপাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সেখানে গিয়া বসিল। শশীর বয়স মনোহরের চাইতে সামান্য বেশী হইলেও হইতে পারে। দুইজনে কথা বেশ জমিয়া উঠিল। মনোহর উৎসাহী শ্রোতা পাইয়া অনর্গল কবে কোথায় কি পালা কেমন গাহিয়াছিল, কাহার অসুখ হইয়া পড়ায় তাহাকে কি আসুরিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, কোথায় কোন্ জমিদারের অন্দরমহল হইতে তাহার ডাক আসিয়াছিল—টাকাটা-সিকেটা বকশিশ মিলিয়াছিল, কবে কোথায় কে কি হাস্যকর কাণ্ড করিয়াছিল, কোথায় কেমন আদর-যত্ন খাওয়া-দাওয়া মিলিয়াছিল ··· ইত্যাদি অফুরন্ত কত কথা! শশীও নিজের কথা দুই-একবার বলিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু মনোহরের কাছে তাহা তেমন আমল পায় নাই। তেমন শুনাইবার মত কোন ঘটনাও শশীর জীবনে ঘটে নাই। কাজেই সে থামিয়াছিল। মনোহর অনেক দেখিয়াছে, অনেক কিছু বলিবার অধিকারও তাহার আছে, কাজেই সে প্রায় এক-তরফাই বলিয়া চলিয়াছিল। শশী তাহাকে কোথাও বাধা দিতেছিল না। একান্ত মুগ্ধ শ্রোতার মত সে শুধু শুনিয়া যাইতেছিল এবং প্রয়োজন হইলে একটু মাথাটা দোলাইয়া, চক্ষু নাচাইয়া বা হাসিয়া মনোহরের বলার উৎসাহ জোগাইয়া চলিয়াছিল। মনোহরকে পাইয়া শশী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অতি বাল্যকাল হইতেই শশীর যাত্রা শোনার ভারি ঝোঁক ছিল এবং বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ঝোঁক তাহার বাড়িয়াই চলিতেছে। আশেপাশে পনেরো-ষোল মাইলের মধ্যে যে-কোন গ্রামেই যাত্রা হউক না কেন, শশী সেখানে সংবাদ পাইলে উপস্থিত থাকেই। যাত্রা শোনার তাহার এমন নেশা। যাত্রার দলের লোকেদের প্রতি তাহার একান্ত শ্রদ্ধা। তাহাদের সে অসাধারণ মানুষ বলিয়াই জ্ঞান করে। জীবনে তাহার যাত্রার দলের ছেলেদের কাহারও সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আজ সে-সৌভাগ্য হওয়ায় সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শশীর একটা দিনের কথা আজিও মনে পড়ে। সে দিনটি জীবনে তাহার স্মরণীয় দিন। নূপুরগঞ্জের হাটে শ্যামানন্দপুরের প্রহ্লাদ সামন্তের দল যাত্রা গাহিতে আসিয়াছিল। প্রহ্লাদ সামন্তের মস্ত দল—লোক-লস্কর ছেলে-ছোকরা তাহার দলে বহু। শশীর বয়স তখন ষোল-সতেরো হইবে। শশীর কেমন জানি যাত্রার দলের সাজঘরের প্রতি একটা দুর্ব্বলতা ছিল। সেখানে সে দুই-একবার উঁকি-ঝুঁকি না মারিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। সেদিনও সে সাজঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পালা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। প্রহ্লাদ সামন্তের দলের যে লোকটি ভীম সাজিয়াছে সে খুব নাম করা 'অ্যাক্টর'—গলার জোরে আসর কাঁপাইয়া ছাড়িতেছে। হঠাৎ আসর হইতে বেগে সে একবার সাজঘরের দিকে আসিতে গিয়া প্রায় শশীর গায়ের উপর আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নিজেকে খুব সামলাইয়া লইয়া শশীর একটা হাত ধরিল। ধরিয়াই বলিল, একটা কাজ করতে পারো হে ছোকরা? ঐ যে পান-বিড়ির দোকান—ওখান থেকে এক পয়সার বিড়ি এনে দিতে পারো?

শশী পয়সা চাহিয়া লইতে ভুলিয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া এক পয়সার বিড়ি কিনিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল। ভীম উচ্চবংশের সন্তান—কাজেই সামান্য একটা পয়সার কথা কানেই তুলিলই না। সে কারণে শশীর কোন ক্ষোভ নাই। পয়সা সেদিন তাহার সার্থক হইয়াছে সে মনে করে। ভীম তাহার নিকট বিড়ি চাহিয়া খাইয়াছে—এ কি কম গৌরব তাহার! শশীর মুখে তাহার এই কৃতিত্ব বা গৌরবময় কাহিনী এযাবৎ বহু লোকেই শুনিয়াছে এবং বহুবার শুনিয়াছে। কাজেই শশীর কাছে মনোহর যে অপার্থিব বস্তুর সামিল হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। শশী মুগ্ধ বিস্ময়ে মনোহরের সকল কথা শুনিয়া চলিয়াছিল। শেষে মনোহর উঠিতে চায় তো শশী আর ছাড়ে না। মনোহরের মহা বিপদ দেখা দিল।

টিয়া কিন্তু ঘাট হইতে ফিরিয়াই মনোহরকে এড়াইবার

জন্য কাজের অছিলায় বাবলির সঙ্গে তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেল। বাব্‌লিদের বাড়ী গিয়া বাব্‌লিকে সে সকল কথা খুলিয়াই বলিল। একান্ত না ফিরিলেই আর যখন নয় তখন সে বাড়ী ফিরিল—মুখে দুঃস্বপ্ন আর দুশ্চিন্তায় গভীর ছায়া লইয়া।

মনোহর যেদিন আসিল তাহার ঠিক পরের দিনই নিশি সজ্জন দুইজন অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। তাহাদের আহারাদির জন্য একটু বিশেষ রকম ব্যবস্থা করিল। নিশি সজ্জনের মনের কথা মনেই ছিল। অতিথিদ্বয়—একজন প্রৌঢ় এবং আর একজন যুবক—আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখনই প্রথম লোকে জানিল যে তাহারা টিয়াকে দেখিতে আসিয়াছে। এমন কি রূপসীও এসম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই।

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাম চন্দ্রনাথ। টিয়াকে দেখিয়া সে নিশি সজ্জনকে বলিল, মা যেন আমার ঘরে যাবার জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিল। বলেন তো বে'ই, এখনই আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তারপরে টিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, যাবে তো মা আমার ঘরে?

টিয়ার বুকের ভিতরটা ধড়াস্‌ ধড়াস করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এ-ধরণের কথাবার্ত্তা জীবনে সে এই প্রথম শুনিতেছে।

চন্দ্রনাথ দু-তিন মিনিটে ক'নে দেখা পর্ব্ব শেষ করিয়া উঠিল। টিয়াকে কেন জানি একটা প্রশ্ন করাও সে প্রয়োজন বোধ করিল না। টিয়া মস্ত ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা আমার সাক্ষাৎ প্রতিমে—এ আর দেখবো কি! ওঠ্‌রে গোবিন্দ।

চন্দ্রনাথের সঙ্গের যুবকটির নাম গোবিন্দ। টিয়ার দিকে একটা তীক্ষ্ণ সচেতন দৃষ্টি ফেলিয়া গোবিন্দ চন্দ্রনাথের সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইল। অতিথিদ্বয় বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে পর সকলে জানিল যে, শিখীপুচ্ছ হইতে মাইল সাতেক দূরে এবং বকফুলীর অপরপারের ডাহুকদীঘি গ্রাম হইতে তাহারা আসিয়াছিল। চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র মোহনের সঙ্গে টিয়ার সম্বন্ধ হইতেছে। চন্দ্রনাথ একজন ধনী ব্যবসায়ী—রেঙ্গুনে তাহার মশলার মস্ত কারবার আছে এবং পুরুষানুক্রমে তাহাদের সেই কারবার। একমাত্র অসুবিধার কথা এই যে, গ্রামে তাহাদের আসা-যাওয়া খুব কম। তাহারা একপ্রকার রেঙ্গুনের মানুষই হইয়া গিয়াছে। তবে বিবাহাদি এখনও দেশেই হইতেছে, পরে হয়তো তাহাও হইবে না। কিন্তু মেয়ে এমন ঘরে পড়িলে সুখেই থাকিবে বলিয়া নিশি সজ্জনের ধারণা। এখানে বিবাহ হইলে অগ্রহায়ণের মধ্যেই বিবাহ-কার্য্য শেষ করিতে হইবে, কেন না চন্দ্রনাথের পক্ষে ইহার বেশী আর একদিনও দেশে থাকা চলিবে না এবং আবার কবে সুবিধা করিয়া যে দেশে আসিয়া পুত্রের বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে তাহারও কিছু ঠিক নাই। নিশি সজ্জনেরও ইচ্ছা, অগ্রহায়ণের মধ্যেই টিয়ার বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়।

চন্দ্রনাথ টিয়াকে পছন্দ করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ চলিয়া যাওয়ার পরই টিয়া সহসা অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিল। মন তাহার আশঙ্কায় দুর্ভাবনায় নিপীড়িত হইতে লাগিল। একান্তে তাই সে নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে তাহার হঠাৎ মনে পড়িল—সুন্দরের কথা। ততক্ষণ কিন্তু সুন্দরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার কোন চেতনা ছিল না। কি যে তাহার হইতে যাইতেছে তাহা সঠিক ধারণায় সে আনিতে পারিতেছিল না। শুধু তাহার মনে হইল, বনপলাশীর দত্ত-বাড়ীর সুন্দর যদি বংশানুক্রমে তাহাদের শত্রু না হইত তাহা হইলে তাহাকে হয় তো এমন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। তাহা হইলে জীবনে হয় তো কোন জটিলতাই দেখা দিত না। টিয়ার মন বড় খারাপ হইয়া গেল। কেমন একটা অলস আত্ম-বিস্মৃতি সর্ব্ব দেহ-মনের উপর চাপিয়া বসিল। শেষ পর্য্যন্ত অকারণে তাহার চোখে জল দেখা দিল। চোখে জল দেখা দিতেই মনে পড়িল, মায়ের কথা। নিজের মনের কথা বলিবার মত যে একজন ছিল সেও আজ নাই। একটা সামান্য আব্দার জানাইবার মত লোকের তাহার আজ অভাব ঘটিয়াছে। অভিযোগ জানাইবার মত একজনও লোক দুনিয়ায় তাহার নাই। আজ নিজেকে তাই টিয়া নিতান্ত নিঃস্ব বলিয়া বোধ করিল।

মনোহর কিন্তু টিয়াকে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জনের বিশেষ সুযোগ দিল না। খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিল। মনোহর কাছে আসিতেই টিয়া নিজেকে কোনরকমে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোহর টিয়ার এই লোকচক্ষুর

অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ভুল বুঝিয়াছিল। টিয়া যে লজ্জায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাই মনোহরের মনে হইয়াছিল। কাজেই মনোহর বলিল, তোমার বুঝি লজ্জা করচে টিয়া ?

এমন কথার কি যে উত্তর দেওয়া চলিতে পারে তাহা টিয়া ভাবিয়া পাইল না এবং মনোহরের কথার পরে সত্যই কেমন জানি তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। সে নীরবেই তাই দৃষ্টি নত করিয়া রহিল।

মনোহর ক্ষণিক নীরব থাকিয়া আবার বলিল, আর কখনও শিখিপুচ্ছে আমি আসবো না টিয়া। আর আসবোই বা কার জন্যে। শিখীপুচ্ছে আসতে আর আমার ভালও লাগবে না।

টিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল, কেন আসবে না শুনি মনোহর মামা? তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করতে আসবে তো মাঝে মাঝে ?

মনোহর মৃদু একটু হাসিল, তারপরে বলিল—না, আর কখনও আসবো না। আজকেই চ'লে যাবো ভাবচি।

টিয়া কি যে বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। মনোহরের জন্য কেন জানি তাহার আজ সহানুভূতি জাগিল। কিন্তু মনোহরকে দুই দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেও সে পারিল না।

বৈকালের দিকে মনোহর চলিয়া গেল। কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়াই সে চলিয়া গেল। আজ এই প্রথম টিয়া মনোহরের বিদায় গ্রহণে কেমন যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। এতদিন যে মনোহরকে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলিয়া টিয়ার মনে হইয়াছে সেই মনোহরও আজ তাহার মনে ব্যথার দাগ বুলাইয়া সহানুভূতি জাগাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। টিয়ার মনে এতদিন যে বিদ্বেষ বা বিরুদ্ধভাব মনোহরের প্রতি বর্ত্তমান ছিল তাহা মনোহর বিদায়ের গুরুভার নিশ্বাস দিয়া চিরদিনের মত চাপা দিয়া চলিয়া গেল। টিয়া কেমন যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল মনোহরের বিদায় গ্রহণে।

ভৈরব দত্ত পুজার বাজার সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সে এক নূতন সংবাদ আনিয়াছে। সংবাদটি এই—মধু-মালতীর অন্নদা ঘোষ ভৈরব দত্তের কাছে হাঁটাহাঁটি সুরু করিয়াছে এবং অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছে তাহার কন্যা ইন্দুমতীর সহিত সুন্দরের বিবাহ দিবার জন্য। কন্যা তাহার পরমা সুন্দরী—নিতান্ত শত্রু যে সেও নাকি তাহা স্বীকার করিবে। অর্থবল তাহার তেমন নাই, তবে সাধারণভাবে সে সমস্তই দিতে প্রস্তুত আছে এবং সাধ্যমত ত্রুটি করিবে না। এখন ভৈরব দত্ত কন্যা দেখিয়া মত দিলেই নাকি সব কিছু পাকাপাকিরূপে ঠিক হইয়া যায়। ভৈরব দত্ত তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে, এবার পূজা শেষ করিয়া আসিয়াই সে কন্যা দেখিতে যাইবে এবং কন্যা যদি পরমা সুন্দরী হয় তাহা হইলে অন্য কিছুর জন্য আর আটকাইবে না।

কথাটা সুন্দরের কানেও গেল। সুন্দর শুনিয়া প্রথম ভ্রু-কুটি করিল, পরে নিজের মনে মনেই বলিয়া উঠিল—হুঁ, অন্নদা ঘোষের মেয়ে বিয়ে করবো, না আরও কিছু! বাবার যেমন—এসে ধরেচেন, আর গ'লে গেচেন!

শ্রীমন্তও আসিয়া ঠিক এই একই কথাই তুলিল। সুন্দর কি যে বলা উচিত হইবে ভাবিয়া না পাইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়াই বলিল, চুপ্ কর তো শ্রীমন্ত। আর ওকথার আমি উত্তর দিতে পারি না। বিয়ে এখন আমি করবো না, কিছুতেই করবো না। রোজগার করি না এক পয়সা, তার বিয়ে করবো আবার কি শুনি ?

শ্রীমন্ত উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—যাক্, একটা ছল-ছুতো তবু যা-হোক্ বের করেচিস্, কিন্তু এ যে টি'কবে না। তোর আবার রোজগার করবার দরকারটা কি শুনি? ওদিকে অঘ্রাণে যে শত্রুর বাড়ীতে সানাই বাজবে শুনতে পাই। যাতে এক তারিখেই দু'টো লাগে তার চেষ্টা দেখ্ না।

সুন্দর ক্ষণিকের জন্য মাত্র বিচলিত হইল এবং পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযম শাসনে বাঁধিয়া উত্তর দিল, সে তো ভালই। এ-বাড়ীতে সানাই আর না বাজলে হ'লো।

শ্রীমন্ত মুখ টিপিয়া এবার হাসিল।

শ্রীমন্তর কি যেন বিশেষ কাজ ছিল, সে তাই বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কি প্রকারে নিজের বিবাহে কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া যে বাধা জন্মানো সম্ভব হইতে পারে তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। শ্রীমন্ত যে টিয়ার বিবাহের কথা বলিয়া গেল তাহার সত্য-মিথ্যাই বা কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? সুন্দর মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। কিছুই তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না।

বাড়ীতে পূজার হৈ চৈ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সুন্দর ক্রমেই যেন তাহা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। প্রয়োজনের সময় পর্য্যন্ত তাহাকে কেহ ডাকিয়া পাইতেছিল না। সুন্দর নৌকা লইয়া সময়ে-অসময়ে হাজারখুনীর বিলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল নিতান্ত উদাসীর মত। এ কয়দিন সে নৌকা লইয়া ঘাট হইতে খালে পড়িয়া হাজার-খুনীর বিলে গেছে, কিন্তু একবারও সে ভুল করিয়া পর্য্যন্ত সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহে নাই। টিয়া তাহার নিজের বিবাহ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ জানিয়াও এবং শ্রীমন্তের কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই না করা সত্ত্বেও অভি-মান জাগিল তাহার টিয়ার 'পরে। টিয়ার উপর অভিমান করিবার অধিকার যেন তাহার আছে বলিয়া সে মনে করিল। কিন্তু টিয়া এসব ব্যাপারে যে তাহার চাইতেও শক্তিহীন তাহা সে একবারও ভাবিয়া দেখিল না। বিবাহে বাধা জন্মাইলে একমাত্র সে-ই হয় তো নিজের বিবাহে বাধা দিতে পারে, কিন্তু টিয়া কিছুতেই পারে না। আশ্চর্য্য, সুন্দর কিন্তু ভাবিতে লাগিল, যদি কেহ পারে তো সে যেন টিয়া। সেই টিয়াই যখন বাধা জন্মাইতে চেষ্টা পাইতেছে না—অগ্রহায়ণেই যখন তাহার বিবাহ তখন সুন্দর নিঃসন্দেহ হইতে চেষ্টা করিল যে টিয়া তাহাকে কোন দিন ভালবাসে নাই—বাসিতেও পারে না—এতকালের শত্রুতা ভুলিয়া ভালবাসা সম্ভবও নয়। আবার সে ভাবে, শত্রুর সঙ্গে পরম শত্রুতা সাধনই তাহার উচিত হইবে। একদিন জোর করিয়া টিয়াকে সবলে শত্রুদুর্গ হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিরুদ্দেশ হইলেই যেন উপযুক্ত শত্রুতা সাধন হয় বলিয়াই তাহার মনে হয়। এমনই আরও কত ঘোর দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া তাহার দিবারাত্র কাটিতেছে। মন তাহার বিষণ্ণ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে। গভীর রাত্রিতে হাজারখুনীর বিলে নৌকার 'পরে বসিয়া সে তাহার জীবনে যে দুর্য্যোগময়ী নিশির সূচনা দেখিতে পাইয়াছে তাহারই পূর্ণরূপ পরিকল্পনায় মত্ত হইয়া ওঠে—বাঁশীটি বাজাইয়া নিশীথের নিথর নিস্পন্দ অন্তরাত্মায় চেতনা সঞ্চারের বাসনা মনে আর জাগে না - বাঁশীটি অনাদর অবহেলায় নৌকার পাটাতনের 'পরেই লুটাইতে থাকে। সুন্দর বাঁশীটির প্রয়োজন আর অনুভব করে না—সঙ্গে লইয়া যায় মাত্র। পরম নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে বাঁশীর প্রয়োজন অনুভব করিলেও করিতে পারে হয় তো, কিন্তু গভীর নির্জ্জনেও এখন নিজেকে সে আর নিঃসঙ্গ ভাবিতে পারে না। টিয়ার তুচ্ছ কথার কণিকা, হাসির টুকরা, চলার ভঙ্গিমা যেন প্রাণবন্ত সজীব চিত্রাবলীর মত জাগিয়া থাকে তাহার চোখের সম্মুখে এবং বিষ ঢালিয়া দেয় তাহার কর্ণকুহরে। নিরন্তর এ জ্বালা লইয়া মানুষ নিজেকে কিছুতেই নিঃসঙ্গ ভাবিতে পারে না।

কিছুদিন যাবৎ তাই গভীর রাত্রে আর চমকিয়া উঠিয়া কলঙ্কিনীর খাল সুন্দরের মোহন বাঁশী শুনিবার জন্য কান পাতে নাই, হাজারখুনীর বিলেও শিহরণ জাগে নাই। সুন্দরের বাঁশী না জানি সুর হারাইয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীমন্ত সুন্দরের বাঁশী শুনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

উপহার

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আমার পরাণখানি তোমারে যে দিতে চাই
তোমারে দিবার মোর আজি আর কিছু নাই;
একদিন জেগেছিল আশার আলোকে প্রাণ
ভেবেছিনু ভালবাসি রাখিব তোমার মান,
তোমারে রাখিব আমি, সুকোমল স্নেহে ঘিরে
বাঁধিব তোমারে সখী আমার বাহুর ডোরে।
ফিরাইয়া দিলে তাহা, আজি আর দুখ নাই,
আমার সকল দিয়া, রিক্ত যে হ'তে চাই!

মিটিল না সেই আশা মিছে হ'ল ভালবাসা
তোমারে পেলাম না ত প্রেম যে হারাল দিশা,
আজি এই বিশ্বমাঝে আমার যে কেহ নাই
রিক্ত আমার প্রাণ উপহার দিতে চাই—
তোমারি কোমল করে যাহারে বাসিনু ভালো
ভেবেছিনু যেবা হ'বে, আমার নয়ন আলো!

জ্যোতিষের চোখে চিকিৎসাতত্ত্ব

জ্যোতি বাচস্পতি

মানুষের চোখে রোগ একটা প্রধান সমস্যা। রোগ কেন হয় এবং রোগের প্রতীকার ও প্রতিষেধক কি তা নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বযুগে সর্ব্ব সময়ে কম বেশী চেষ্টা হয়ে আসছে এবং এই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে নানা ধরণের চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত হয়েছে। চিকিৎসা তত্ত্ব এখনও যে মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়নি তার প্রমাণ নানা ধরণের চিকিৎসা-প্রণালীর প্রচলন থেকেই বোঝা যায়। সেকালের ঝাড়-ফুঁক ও টোটকা-টাটকা থেকে সুরু ক'রে আয়ুর্ব্বেদীয়, ইউনানী, এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইলেকট্রো-প্যাথিক, হিপ্‌নটিক, সাইকোপ্যাথিক, ইত্যাদি কত বিচিত্র চিকিৎসা-প্রণালী যে মানবসমাজে প্রচলিত তার ঠিকানা নেই। এই সব প্রণালীর প্রত্যেকটির সমর্থকও বহু আছেন, আবার নিন্দক-অপবাদকের সংখ্যাও কম নয়।

এই বহু চিকিৎসা-প্রণালীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী প্রচার এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর এবং আমাদের দেশে অন্ততঃ একমাত্র এই মতে চিকিৎসাই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত এবং বেশীর ভাগ লোকই পীড়িত হ'লে এই মতের চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকেন অথবা করতে বাধ্য হন। কেন না, এখানকার অধিকাংশ হাসপাতালেই এই মতে চিকিৎসা হয় এবং এই মতে চিকিৎসা শেখবার জন্য যে রকম সুব্যবস্থা আছে অন্যমতে চিকিৎসা শেখবার সে রকম কোন ব্যবস্থা নেই—কাজেই, এ মতে শিক্ষিত, উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য যত চিকিৎসক পাওয়া যায় অন্য কোন মতে চিকিৎসার বেলায় তা পাওয়া যায় না, অন্ততঃ লোকের তাই বিশ্বাস।

অন্য মতে চিকিৎসার মধ্যে এখানে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসারও যথেষ্ট প্রচলন আছে এবং তার পরেই ইউনানী বা হেকিমি। এইসব বিভিন্ন মতের চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই নিজের অবলম্বিত প্রণালী ছাড়া অপর সমস্ত মতের প্রতি যেন একটা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন, দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁরা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন পন্থীকে তীক্ষ্ণশ্লেষপূর্ণ উপহাস দিয়ে বিদ্ধ করতেও পশ্চাৎপদ হন না। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় পরশুরাম তাঁর রস-চিত্র 'চিকিৎসা সঙ্কট'-এ আসল ব্যাপারটি সামান্য কিছু অতিরঞ্জিত হ'লেও ঠিকই ব্যক্ত করেছেন। চিকিৎসার প্রকৃত তত্ত্ব এখনও গুহায় নিহিত—রোগের চিকিৎসায় সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার সংখ্যাই বেশী, তবু এক এক চিকিৎসাপন্থীদের অহমিকাপূর্ণ গোঁড়ামির অন্ত নেই। প্রত্যেক পন্থীরা বলতে চান তাঁরা এবং একমাত্র তাঁরাই সত্যপথে চলেছেন অন্য সকল পন্থীরাই ভ্রান্ত। অন্ধেরা যেমন হাতীকে স্পর্শ দ্বারা অনুভব ক'রে তার স্বরূপ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিতণ্ডার সৃষ্টি করে, এ-ও কতকটা সেই রকম। প্রাণের আসল তত্ত্ব, মানুষের দেহের সঙ্গে মন ও প্রাণের সম্বন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট ও পরিষ্কার না হ'লে, রোগের নিদান, তার প্রতিষেধ ও চিকিৎসার বিধান কখনই ঠিক হবে না। বিভিন্ন পন্থীদের মধ্যে এই যে ভেদ ও বিবাদ এর মীমাংসা ও সমন্বয় হ'তে পারে ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে। আজ যদি ফলিত জ্যোতিষ চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য থাকত, আমার মনে হয়, তা হ'লে ভিন্ন পন্থীদের পরস্পরের মধ্যে এত বিরোধ ও বিসম্বাদের অবকাশ থাকত না। জ্যোতিষ দিয়ে মানুষের প্রাণতত্ত্বের উপর কি আলোকপাত করা যায়, তা আলোচনার আগে, বিভিন্ন চিকিৎসা-প্রণালীগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া দরকার।

এ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি ও ইউনানী চিকিৎসা-প্রণালীর ভিতর প্রয়োগের বিষয় ও ঔষধ প্রস্তুতাদির ব্যাপারে পার্থক্য ও মতভেদ থাকলেও মূলত তাদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এই চিকিৎসা-প্রণালীগুলির উৎপত্তি হয়েছে এই ধারণা থেকে যে, দেহে কোন রস, গুণ বা দেহ-চালনে ও দেহ-গঠনে আবশ্যক কোন মূল পদার্থের ন্যূনতা বা আতিশয্য হ'লেই দেহে ব্যাধির সৃষ্টি হয়—তা ছাড়া, বাইরে থেকে দেহের পক্ষে ক্ষতিকর ও অনাবশ্যক কোন বস্তু দেহে প্রবিষ্ট হ'লেও তা দেহে বিপর্য্যয় নিয়ে আসে। এঁদের মতে দেহকে সুস্থ রাখতে হ'লে সুপথ্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া যেমন দরকার,

বাইরে থেকে কোন বিষ দেহে প্রবেশ করতে না পারে সে সম্বন্ধেও তেমনি যথোচিত সতর্কতা আবশ্যক। দেহে যদি পীড়া হয়, তা হ'লে এঁদের মতে তার চিকিৎসাবিধি হবে, দেহের যে যে যন্ত্রের দুর্ব্বলতা ঘটেছে, সেই সেই যন্ত্রের সবলতা উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ, যে যে রসের বৃদ্ধি হয়েছে তার বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ (যেমন, অম্ল বৃদ্ধি হ'লে অম্লনাশক ক্ষায়ের প্রয়োগ), বাইরের থেকে যে বিষ দেহে প্রবিষ্ট হয়েছে তার প্রতিবিষ (antidote) প্রয়োগ, ইত্যাদি। এখানে কবিরাজি প্রণালীর বায়ু-পিত্ত-কফ এবং এ্যালোপ্যাথির জীবাণু, গ্রন্থিরস (Hormones of Endocrene glands), ইত্যাদি দর্শন-ভঙ্গীর যে তারতম্য আছে, তার আলোচনা অসম্ভব এবং তার কোন প্রয়োজনও নেই। মূলতঃ, এই চিকিৎসা-প্রণালী দেহ ও দেহের উপর প্রাণের ক্রিয়া যা বাইরে অভিব্যক্ত তাই নিয়েই ব্যাপৃত। এই চিকিৎসা-প্রণালীর যে মোটেই কোন সার্থকতা বা উপযোগিতা নেই এ কথা বলা চলে না, কিন্তু, এঁরাই যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শেষ কথা বলেছেন—তা-ও নয়। সে কথা যাক্—এঁরা রোগের তত্ত্ব যে ভাবে ঠিক করেছেন তাতে দেহের উপর বাইরের প্রভাব ও দেহে তার প্রতিক্রিয়াটাকেই বড় ক'রে দেখেছেন এবং সেই হিসাবেই এঁদের চিকিৎসা-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

হোমিওপ্যাথিক রোগের নিদান কিন্তু এ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁরা বলেন যে, যে-কোন রোগই হোক্, তা দূর করবার শক্তি দেহের মধ্যেই আছে—রোগ যখন হয় তখন, যে কোন কারণেই হোক্, সে শক্তি সুপ্ত হয়ে পড়ে। সে শক্তিকে যদি কোন রকমে জাগ্রত করা যায়, তা হ'লে দেহ নিজেই নিজের রোগ দূর করবে। এঁদের চিকিৎসা-প্রণালী হচ্ছে, এই শক্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টা। এঁরা বলেন যে, যে-রোগ দেহে হয়েছে যদি তারই অনুরূপ একটি নূতন রোগ দেহে সৃষ্টি করা যায়, তা হ'লে দেহের শক্তি জাগরিত হ'য়ে নূতন রোগটিকে তাড়াবার চেষ্টা করবে এবং তার ফলে নূতন রোগের সঙ্গে সঙ্গে আসল রোগটিকেও দেহ থেকে তাড়াবে। একেই তাঁরা বলেছেন *Similia Similibus Curantura*—অর্থাৎ সমঃ সমং শময়তি। এই মতের প্রবর্ত্তক হ্যানিমান বলেছেন যে, দেহের একটি সূক্ষ্ম স্তর আছে, যেখানে আসল রোগটির সৃষ্টি হয় এবং তা স্থূলদেহে ভিন্ন ভিন্ন রোগলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়—সূক্ষ্ম স্তরের সেই রোগটিকে দূর করতে না পারলে, রোগটির বাইরের লক্ষণ উপশমিত হ'লেও রোগটি প্রকৃতপক্ষে দূর হয় না—অন্য রোগের আকারে অন্য লক্ষণ নিয়ে দেহে আবার প্রকাশ পায়। হোমিওপ্যাথির এই রোগ-তত্ত্ব এবং রোগের জটিলতা-বিধায়ক সোরা, সাইকোসিস্, সিফিলিস্, টিউবারকিউলোসিস প্রভৃতি দৈহিক অবস্থার তত্ত্ব সম্বন্ধেও এখানে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। এ চিকিৎসারও যথেষ্ট উপযোগিতা আছে, কিন্তু এঁরাও একদেশদর্শী এবং এঁরাও শেষ কথা বলেন নি।

উপরে যে চিকিৎসা-প্রণালীগুলির কথা বলা হ'ল, এ ছাড়া অন্য যে সকল চিকিৎসা-প্রণালী আছে, সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কেন না, এক সাইকোপ্যাথি ছাড়া অন্য সকল চিকিৎসা-প্রণালীগুলি এমন সব অদ্ভুত মতবাদ দিয়ে গঠিত যে, সেগুলি কখনই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। যেমন হাইড্রোপ্যাথি বলে—জল দিয়ে সব রোগের চিকিৎসা করা যায়; ক্রোমোপ্যাথি বলে—ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলো দিয়ে সব রোগের চিকিৎসা সম্ভব; বাইওকেমিক প্রণালী বলে—দেহে বারটি যৌগিক লবণ আছে, তার যে-কোন একটি বা ততোধিক লবণের অভাব ঘটলেই দেহ অসুস্থ হয় এবং সেই অভাব পূরণ করতে পারলেই, রোগ দূর হয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলির যে কোন উপযোগিতা নেই, এমন কথা বলি না, কিন্তু, এর কোনটিই যে রোগের প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় করতে পারে নি, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

জ্যোতিষ দিয়ে রোগের তত্ত্ব বুঝতে হ'লে প্রথমেই মানুষের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দরকার। মানুষ শুধু অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংসের সমষ্টি প্রাণবন্ত জীবমাত্র নয়—তার যেমন দেহ ও প্রাণ আছে, তেমনি আছে মন ও বুদ্ধি। তার বহির্দ্দেহ হচ্ছে দেহ-প্রাণের সমষ্টি এবং অন্তর্দ্দেহ হচ্ছে মন ও বুদ্ধির সংযোগ। চৈতন্য মানুষের দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই চার স্তরেই বিচরণ করে। বস্তুতঃ, তার চারটি দেহ আছে—এই দেহগুলিকে দর্শনের ভাষায় কোষ ব'লে উল্লেখ করা হয়। এদের নাম স্থূলদেহ বা অন্নময় কোষ, জীবদেহ বা প্রাণময় কোষ, অনুভূতি-দেহ বা মনোময় কোষ এবং চিন্তাময় দেহ বা বিজ্ঞানময় কোষ। এই চারটি কোষ স্বভাবতঃ এমনি ভাবে সংবদ্ধ যে তার একটি কোষে তরঙ্গ উঠলেই অপর কোষগুলিতেও তার সাড়া পড়ে যায়। এই তরঙ্গের শক্তি ও

প্রকৃতি হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন কোষে সাড়ারও তারতম্য হয়। এই কোষ বা দেহগুলির মধ্যে অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহটিই অপরের প্রত্যক্ষ-গোচর, অন্য দেহগুলি সূক্ষ্ম। সেগুলি নিজের নিজের বোধগম্য হ'লেও অপরের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়—কিন্তু অপরে তাদের অস্তিত্ব স্থূলদেহের ভাব-পরিবর্ত্তন দিয়ে অনুমান করতে পারে—যেমন আলো জ্বলা, পাখা চলা, ইত্যাদি দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব বুঝতে পারা যায়।

এই সূক্ষ্ম কোষগুলির মধ্যে প্রাণময়ের চেয়ে মনোময় সূক্ষ্মতর এবং মনোময়ের চেয়ে বিজ্ঞানময় আরও সূক্ষ্ম। প্রত্যেক দেহে বা কোষে অপর তিনটি দেহ ব' কোষের কাজ যাতে অভিব্যক্ত হ'তে পারে, তার জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। কাজেই, মানুষের স্থূলদেহে অন্য সূক্ষ্ম দেহগুলির প্রত্যেকটির তরঙ্গ বহন করার উপযোগী নাড়ীচক্র ও ইন্দ্রিয়াদি দেখা যায়। যেমন—প্রাণময়ের জন্য পিঙ্গলা নাড়ীচক্র (সঞ্চালক বা মোটর নার্ভ) এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি, মনোময়ের জন্য ইড়া নাড়ীচক্র (অনুভূতি বাহক বা সেন্সরি নার্ভ) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি, বিজ্ঞানময়ের জন্য সুষুম্না (অটোনিমিক নার্ভ) ও মস্তিষ্কের উচ্চ কেন্দ্রগুলি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকেরা স্থূল দেহের মধ্যে বিভিন্ন কোষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই স্থূল যন্ত্রগুলি দেখে মনে করেন যে, এই স্থূল যন্ত্রগুলিই বুঝি আমাদের প্রাণময় ক্রিয়া (যেমন চলা-ফেরা, কথা বলা, ইত্যাদি), মনোময় ক্রিয়া (যেমন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের সঙ্গে জড়িত ও বিচিত্র সুখ দুঃখ মূলক নানা রকমের অনুভূতি) ও বিজ্ঞানময় ক্রিয়া (বিচার, বিতর্ক, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ,) ইত্যাদির কারণ। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের যে স্থূল দেহাতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে একথা তাঁরা ভাবতেও পারেন না। একজন অজ্ঞ লোক যদি ইলেকট্রিকের তার, সুইচ, কাট-আউট, ইত্যাদিকে আলো জ্বলা ও পাখা চলার জন্য আবশ্যক তড়িৎ-প্রবাহের কারণ ব'লে মনে করে, তা হ'লে সে যে ভুল করবে, এই বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সেই ভুলই ক'রে থাকেন। যেহেতু প্রত্যেক কোষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রগুলি বিকল হ'লে দেহে সেই কোষের ক্রিয়ার বৈকল্য দেখা যায়, অতএব যন্ত্রগুলিই সেই ক্রিয়ার কারণ—এ কাকতালীয় (*Post hoc propter hoc*) যুক্তির হেত্বাভাসটুকুও তাঁরা লক্ষ্য করেন না। আসল কথা, এই স্থূল দেহটিই যে একমাত্র দেহ নয়, এর সঙ্গে জড়িত যে আরও তিনটি সূক্ষ্ম দেহ আছে, এই তত্ত্বটুকু না জানলে রোগের প্রকৃত নিদান জানা সম্ভব নয়। জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগবিদ্যার সাহায্য ভিন্ন এ তত্ত্ব কোন মতেই স্পষ্টীকৃত হ'তে পারে না।

জ্যোতিষের কাছ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, রোগের অভিব্যক্তি হয় যদিও স্থূল দেহে, তার কারণ কিন্তু সব সময় স্থূল দেহের মধ্যে থাকে না। বৈদ্যুতিক ব্যাপারের উপমা দিয়ে এখানে বলা চলে, এও তেমনি, যেমন কোন পাখা বা মোটর যদি না চলে তা হ'লে তা সব সময়ে সেই পাখা বা মোটরের গঠনের দোষ নয়—অনেক সময় অন্যত্রও তার কারণ ঘ'টে থাকে। ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, রোগের মূল উপরে বলা চারটি দেহের যে কোন দেহে থাকতে পারে এবং যে কোন দেহে রোগের উৎপত্তি হোক, সেই দেহ থেকে তা অন্য দেহগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই, রোগের যদি চিকিৎসা করতে হয়, তা হ'লে যে-দেহে রোগের অঙ্কুর—সেই দেহের চিকিৎসা না ক'রে শুধু স্থূল দেহে অভিব্যক্ত তার লক্ষণ বা উপসর্গগুলি ধ'রে চিকিৎসা করলে কোন ফলই পাওয়া যাবে না। আমি একথা বলছি না যে, যত রকমের রোগ আছে তার নিদান এবং কোন্ দেহে রোগ হ'লে কি চিকিৎসা হওয়া উচিত, তার সম্যক বিধান জ্যোতিষের গ্রন্থগুলিতে দেওয়া আছে—কিম্বা তার সব ব্যাপারগুলি জ্যোতিষ, তন্ত্র ও রোগের সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, রোগের মূলতত্ত্ব জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে যা পাওয়া যায়, তার সাহায্য নিয়ে গবেষণা করলে চিকিৎসা-জগতে একটা যুগান্তর উপস্থিত হ'তে পারে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য-ভাবে উচ্চ-শিক্ষিত চিকিৎসকগণ যদি ভারতের সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ জ্যোতিষ, যোগ, মন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতিকে উপেক্ষা না ক'রে তাদের শিক্ষা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং চিকিৎসার ব্যাপারে তাদের প্রয়োগ করতে পারেন, তা হ'লে পৃথিবীর চিকিৎসা-প্রণালী যে একটা নূতন রূপ নিয়ে গ'ড়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ সম্বন্ধে ফলিত জ্যোতিষ কি বলে, তার সামান্য আভাস-মাত্র এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব—বিস্তারিত

আলোচনা করবার মত স্থান ও সময় এখন নেই। জ্যোতিষের মতে ভিন্ন ভিন্ন রাশি, ভাব ও গ্রহ মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কোষ বা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—যেমন, মেষ, সিংহ ও ধনুরাশি, রবি, বুধ ও বৃহস্পতি গ্রহ এবং লগ্ন, পঞ্চম ও নবম ভাব চিন্তাময় দেহ বা বিজ্ঞানময় কোষকে নির্দ্দেশ করে। তেমনি কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন রাশি, চন্দ্র, রাহু ও কেতু গ্রহ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ ভাব অনুভূতি দেহ বা মনোময়ের নির্দ্দেশক। মিথুন, তুলা ও কুম্ভ রাশি, মঙ্গল, প্রজাপতি ও বরুণ গ্রহ এবং তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ ভাব জীবদেহ বা প্রাণময়ের দ্যোতক। বৃষ, কন্যা ও মকর রাশি, শুক্র, শনি ও রুদ্রগ্রহ এবং দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশমভাব স্থূল-দেহ বা অন্নময়ের সূচক। পীড়াদায়ক গ্রহগুলি যে কোষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যে শ্রেণীর রাশি ও ভাবের মধ্য দিয়ে তারা ক্রিয়া করে, তা থেকে কোন্ দেহে বা কোষে রোগের উৎপত্তি এবং তার কি রকম চিকিৎসা হওয়া উচিত তার বিধান নির্ণীত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটা রোগ যা এ্যালোপ্যাথি বা কবিরাজি চিকিৎসায় আরোগ্য হ'ল না, তা সহজেই হোমিওপ্যাথ চিকিৎসায় আরোগ্য হ'য়ে গেল। আবার এও দেখা যে, যে রোগ হয়ত এ্যালোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিক, হেকিমি, ইত্যাদি কোন চিকিৎসাতেই বাগ মানছে না, তা সামান্য একটা মাদুলি ধারণ ক'রেই সেরে গেল। এর কারণ আর কিছুই নয়—রোগের উৎপত্তি যে কোষে সেই কোষের উপযোগী ভেষজ যতক্ষণ না প্রযুক্ত হয়, ততক্ষণ রোগ সারবে না। অন্নময় কোষে রোগের উৎপত্তি হয় সাধারণতঃ দেহের নিয়মের ব্যতিক্রমে। বাইরে থেকে দেহে আঘাতাদি প্রাপ্তির ফলে কিম্বা বাইরে থেকে দেহের মধ্যে কোন বিষ প্রবেশের দরুন। এখানে, এ্যালোপ্যাথি বা কবিরাজি চিকিৎসা অবলম্বন করতে হবে, যাতে প্রতিবিষ, প্রতিষেধক প্রয়োগ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য দৈহিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রাণময় কোষে যে সকল রোগের উৎপত্তি, তার দৈহিক নানা রকম লক্ষণ প্রকাশ পেলেও সেগুলির প্রতিকার কিন্তু দৈহিক চিকিৎসার দ্বারা হবে না—সেখানে প্রয়োজন হবে প্রাণময় ঔষধ—এক্ষেত্রে এ্যালোপ্যাথির চেয়ে হোমিও-প্যাথির উপযোগিতা বেশী—কেন-না, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তৈরীই এমনভাবে যে তার ক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রাণের ক্ষেত্রেই হ'য়ে থাকে। তেমনি মনোময় যদি কোন ব্যাধি হ'য়ে থাকে তার ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে মনোময় ক্ষেত্রে—এখানে প্রত্যক্ষভাবে কোন ভেষজ বা শক্তি প্রয়োগ করা চলবে না—এখানে মন্ত্র-শক্তি ইত্যাদির প্রয়োগ আবশ্যক। বিজ্ঞানময় কোষে যদি কোন ব্যাধি হয়, তা হ'লে মনঃসমীক্ষা, ধ্যানশক্তি ইত্যাদি ভিন্ন তার নিরাকরণ হবে না। মনোময়ে ও বিজ্ঞানময়ে যে সব রোগের উৎপত্তি হয়, তার ঠিক কারণ অনেক সময় দেওয়া যায় না। তার কারণ আবিষ্কার করতে হ'লে বহু গবেষণার প্রয়োজন। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অধিকাংশ বংশগত রোগের মূল থাকে বিজ্ঞানময়ে—রবি, বুধ বা বৃহস্পতির সঙ্গে চন্দ্র, রাহু অথবা কেতুর অশুভ সংযোগ অনেক ক্ষেত্রেই বংশগত রোগ সূচনা করে। তা-ছাড়া অপরের অশুভ ইচ্ছা বা অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারাও মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে রোগের উদ্ভব হ'তে পারে, যা তার বিপরীত প্রয়োগ সদিচ্ছা ও শান্তিমন্ত্রাদির উচ্চারণ ভিন্ন নিরাকৃত হবে না।

অনেকে হয়ত ইচ্ছাশক্তি ও মন্ত্রশক্তির এই প্রভাবের কথা শুনে নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন—কিন্তু, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যদি এর সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব হয়, তা হ'লে কারো কিছু বলবার থাকবে না। এ যে সম্ভব, তার কিছু কিছু প্রমাণ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—বেদ ও তন্ত্রের গ্রন্থের মধ্যে বহুবিধ প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ক'রে—বর্ত্তমানের ঘটনাও এর সত্যতার প্রমাণ সমেত এই মন্ত্রশক্তির প্রভাবকে আজ পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয় নি। ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগের সম্বন্ধে হিপ্‌নটিজ্‌ম্-এর বহু গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রশক্তির প্রয়োগের সম্বন্ধে সে রকম কোন সাহিত্য আজ পর্য্যন্ত গ'ড়ে ওঠে নি। আমাদের ষড়্দর্শনের মধ্যে মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা অন্যতম—এর ভিত্তি বেদের কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞ ও মন্ত্রাদির উপর। মন্ত্রশক্তিকে অবজ্ঞা ক'রে উড়িয়ে দেবার পূর্ব্বে একবার চিন্তা ক'রে দেখা উচিত যে, যার মধ্যে কিছুই সত্য নেই, তাকে আশ্রয় ক'রে এ রকম একটা দর্শন-শাস্ত্র গ'ড়ে উঠতে পারে কি-না। বস্তুতঃ, অপরের অসদিচ্ছা, অভিশাপ, ইত্যাদিও সূক্ষ্মদেহে এমন বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতে

পারে, যা স্থূলদেহে রোগ ও অন্যান্য দুর্ঘটনারূপে প্রকাশ পায়। জ্যোতিষের গ্রন্থগুলি পিতৃশাপ, ব্রহ্মশাপ প্রভৃতি কারণে রোগ, আয়ুহানি, সন্তানহানি, প্রভৃতি অরিষ্ট যোগের উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে পরীক্ষা না ক'রে, এগুলিকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া আমার সমীচীন মনে হয় না।

তা হ'লে জ্যোতিষের দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, রোগের প্রকাশ স্থূলদেহে হ'লেও তার উৎপত্তি সব সময়ে স্থূলদেহে হয় না। প্রাণময়, মনোময় অথবা বিজ্ঞানময়েও তার উৎপত্তি হ'তে পারে—স্থূল সূক্ষ্ম সকল দেহগুলিতেই যেমন ভিতরের গঠন ইত্যাদির জন্য ভিতর থেকেও রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে, তেমনি বাইরের অনিষ্টকর প্রভাবেও রোগ জন্মাতে পারে। রোগ কোন্ দেহে কি ভাবে জন্মেছে—ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে তা যত সহজে জানা যেতে পারে এবং প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করা যেতে পারে, অন্য কোন উপায়ে এখন অন্ততঃ তা সম্ভব নয়।

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইত্যাদির সহযোগে যেমন চিকিৎসা-বিদ্যার আলোচনা হ'য়ে থাকে তেমনি যদি জ্যোতিষ, তন্ত্র, যোগ, ইত্যাদি শাস্ত্রের সহযোগেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যয়ন চলে, তা হ'লে পৃথিবীর মানবসমাজ যে কত বেশী উপকৃত হ'তে পারে তা বলা যায় না।

ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা কিছুদিন আগেও কুসংস্কার ব'লে গণ্য হ'ত কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন অনেক মনীষীই স্বীকার করছেন যে, ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে সত্য আছে—কিন্তু তার বিজ্ঞানটি এখনও ঠিক বিজ্ঞানের আকারে গ'ড়ে ওঠে নি। তা সত্ত্বেও, এখন পর্য্যন্ত তা যে রূপ পেয়েছে, যদি সেইটুকুও সম্যক আলোচিত হয়, তাহ'লে খুব শীঘ্রই তা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করবে। বিশেষতঃ, চিকিৎসা-বিদ্যায় সহযোগে এর চর্চ্চা যদি চলে, তা হ'লে চিকিৎসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষেরও সত্যতা প্রমাণিত হবে।

কতকগুলি ব্যাপারে আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা—জ্যোতিষের দিকে একটু-আধটু লক্ষ্য রাখেন। যেমন, জ্বর-রোগীকে অন্নপথ্য দেবার সময় হ'লেও, দিনটি যদি পূর্ণিমা বা অমাবস্যার কোটালের কাছাকাছি হয়, তা হ'লে কোটালের পর তার ব্যবস্থা করেন—বাত, রোগীকে একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা পালনের উপদেশ দেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই তিথি-গুলির মধ্য দিয়ে রবি ও চন্দ্র গ্রহের প্রভাব অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু, এছাড়া আর বেশীদূর অগ্রসর তাঁরা বড় একটা হন না।

গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৪০, অমাবস্যা ছিল, সেদিন গ্রহ-সমাবেশ এরকম হয়েছিল যে, পৃথিবীর উপর একটা জোর আকর্ষণ এসেছিল। এর ফলে ঐ দিন হঠাৎ মাথা ঘুরে ওঠা বা দেহের মধ্যে একটা টান বোধ অনেকেরই হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকেরা ঐ সময় খবরের কাগজ মারফৎ সাধারণ পাঠককে প্রশ্ন করেছিলেন—"আপনি কি গতকাল (অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বর) দেহে একটা টান ভাব কিম্বা মাথার মধ্যে একটুখানি খালি খালি ভাব অনুভব করেছিলেন?" এ জিজ্ঞাসার অর্থ কি এই নয় যে, বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেছিলেন যে সেদিন গ্রহের প্রভাব জীবদেহে অনুভব করা সম্ভব? তবু, জীবদেহের উপর যে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব আছে, এ কথা তাঁরা সহজে মানতে চাইবেন না।

লণ্ডনের 'অবজারভার' কাগজে একটি পত্র প্রকাশিত হয়—পত্রলেখক রেলওয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং রেলওয়ের স্লীপারের জন্য পর্ত্তুগাল থেকে কাঠ খরিদ করতেন—তিনি লেখেন—পর্ত্তুগালের একটা নিয়ম এই যে, গাছ যদি কৃষ্ণ পক্ষে কাটা না হয়, তা হ'লে সে কাঠ কোন ব্যবসায়ী কিনতে চায় না। কেন-না, এটা অনেকবার পরীক্ষিত হয়ে গেছে যে, শুক্লপক্ষে কাটা গাছের স্লীপার এক বৎসরের মধ্যেই পচে ওঠে, অথচ কৃষ্ণপক্ষে কাটা গাছের স্লীপার ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। আয়ুর্ব্বেদে ভিন্ন ভিন্ন তিথি-নক্ষত্রের যোগে ভেষজ সংগ্রহের যে বিধি আছে, তার মূলেও এই রকম একটা অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। বর্ত্তমানে উন্নত বিজ্ঞানের যুগে যদি পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা এর তথ্য উদ্ঘাটিত করা যায়, তা হ'লে চিকিৎসার অনুগামী ভেষজ-বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হ'তে পারে।

এ প্রবন্ধে জ্যোতিষের সাহায্যে কিভাবে রোগ নির্ণীত হ'তে পারে এবং রোগের প্রতিষেধ বা আরোগ্যের জন্য জ্যোতিষ কিভাবে সাহায্য করতে পারে, তার খুঁটি-নাটি আলোচনা সম্ভব নয়। তবে, এ সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা সাধারণভাবে এখানে বলব।

সাধারণতঃ বুধ, শনি, রাহু ও প্রজাপতির প্রভাবে যে সকল রোগের সৃষ্টি হয়, তা আসে বাইরে থেকে—বিশেষতঃ,

তাদের সঙ্গে যদি দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ ভাবের সম্বন্ধ থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে, স্থূলদেহে বিষ প্রবেশ, রক্তদুষ্টি, কদন্ন ভোজন, দূষিত আবহাওয়া প্রভৃতিই রোগের প্রধান কারণ হয়। প্রাণময় দেহে এই গ্রহগুলি রোগ সৃষ্টি করে বাইরের বৈদ্যুতিক, চৌম্বক, অদৃশ্য রশ্মি প্রভৃতির ক্রিয়া প্রাণময়ের উপর অভিব্যক্ত ক'রে। অসচ্ছন্দ পারিপার্শ্বিক, প্রভৃতির দ্বারা এবং অপরের বিরুদ্ধ উপদেশ, suggestion, ইত্যাদির দ্বারা মনোময় দেহে বিক্ষোভ উপস্থিত হ'য়ে যখন রোগের উদ্ভব হয় তখন এই গ্রহগুলিরই বিরুদ্ধ প্রভাব দেখা যায়।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও রুদ্র রোগ সৃষ্টি করে নিজের আচরণ এবং বংশগত বা জন্মগত ত্রুটি থেকে। এদের দ্বারা যখন রোগোৎপত্তি হয়, তখন ভিতর বাইরে উভয়ত্রই তার কারণ দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই, এই সব গ্রহের বিরুদ্ধতায় যে সব রোগ উৎপন্ন হয়, তাদের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক দু'রকম চিকিৎসাই প্রয়োজন হয়।

সবচেয়ে শক্ত ও জটিল হয় সেই সব রোগ যা বৃহস্পতি শুক্র, কেতু ও বরুণ গ্রহের বিরুদ্ধতায় জন্মায়। এই রোগগুলি জন্মায় ভিতরের গূঢ় কারণে এবং অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা বা মন্ত্র-শক্তির প্রয়োগে তা দূর করা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না। এ রকম ক্ষেত্রে গ্রহগুলি যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশে থাকে, তা হ'লে তারা যে পঙ্গুত্ব বা অক্ষমতা সৃষ্টি করে তা প্রায়ই চিরস্থায়ী হয়। এদের দ্বারা সৃষ্ট রোগ এক দৈব কৃপা ছাড়া দূর হয় না।

রোগের তত্ত্ব একটা সহজ বা সামান্য ব্যাপার নয়। মানুষের জীবনের একটা বড় দুঃখ ব্যাধি। এই ব্যাধির দুঃখ থেকে মানুষকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, তার জন্য যুগ যুগ ধরে নানাদিক দিয়ে চেষ্টা চলে আসছে। রকফেলার ধনকুবের হ'য়েও চিররোগী ছিলেন। তাই রোগ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বহু কোটি টাকা তিনি দান ক'রে গেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দু-চারটি কথা দিয়ে যে তার সব তথ্য এবং প্রতিষেধ ও আরোগ্যের উপায় জলের মত পরিষ্কার করে দেব তা কখনই সম্ভব নয়। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, রোগের প্রতিষেধ ও প্রতিকারের গবেষণা যদি যোগ, তন্ত্র ও জ্যোতিষের সহযোগে চলে, তা হ'লে রোগের ব্যাপারে অনেক নূতন আলোক পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে প্রতিকার ও প্রতিষেধ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হ'য়ে উঠবে। জ্যোতিষ, তন্ত্র বা যোগের সাহায্যে যে পৃথিবী একেবারে ব্যাধিশূন্য হয়ে উঠবে, এমন অসম্ভব কথা আমি বলি না—কিন্তু এই শাস্ত্রগুলির সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রের সংযোগ ঘটলে পৃথিবীর বুকে ব্যাধির দুঃখ-ভার যে অনেকটা লঘু হ'য়ে উঠবে একথা আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

হে ধরণি নমো নমঃ

শ্রীনীলরতন দাস, বি-এ

এই ধরণীর ধূলিকণা 'পরে আছে দেবতার মায়া,
যুগে যুগে তারা এসেছে ধরায় ধরি' মানুষের কায়া।
স্বরগের সুখশান্তি ত্যজিয়া এই ধরাতলে নেমে
আসে অবতার দেবতার লীলা ঢালি' মানুষের প্রেমে!
এই ধরণীর মাঠে ঘাটে বাটে রাখাল বলেক সনে
ব্রজের দুলাল গো-চারণ করি' ফিরেছিল বনে বনে।
বিরহিণী রাধা কাঁদিয়াছে হেথা বসিয়া যমুনাকূলে,
মিলনকুঞ্জে দয়িত তাহারে লইয়াছে বুকে তুলে!
নির্ম্মান করি' পর্ণকুটীর ধরণীর নদীতীরে
বসতি করেছে রঘুপতি রাম সাথে ল'য়ে জানকীরে।
জনমদুখিনী চির-অভাগিনী সীতার অশ্রুজল
তাপিত ধরার প্রতি রেণুকণা করিয়াছে সুশীতল!

এই ধরণীর শৈলশিখরে গিরিরাজ-নন্দিনী
শৈশবে কত করিয়াছে খেলা সাথে ল'য়ে সঙ্গিনী।
সতীদেহ ভাগে ধরণীর পীঠে চিরপবিত্র ধূলি
সাধু মহাজন ভকত প্রবীণ লইয়াছে শিরে তুলি'!
এই ধরণীর পথে পথে মাতা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া
কেঁদেছিল খুঁজি' হারানিধি শোকে ব্যথাবিগলিত হিয়া।
ধরণীর ধূলি মেখেছিল গোরা ভগবৎ প্রেমে মজি',—
শুদ্ধ করিল সিন্ধুসলিল কাঞ্চন তনু ত্যজি'!
দেবতার চির-বাঞ্ছিত ভূমি, হে ধরণি নমো নমঃ!
স্বপ্নলোকের স্বর্গে বসতি কাম্য নহে ক' মম।
দেবতার পদচিহ্ন শোভিত এই ধরণীর বুক,
ত্যজিয়া তাহারে জীবনে মরণে চাহি না স্বর্গসুখ!

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

(পনের)

দেবু ঘোষের ডাকে জগন ডাক্তার ভীষণ ক্রুদ্ধ এবং গম্ভীর হইয়াই বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তূণ হইতে বাণ নির্ব্বাচনের মত কতকগুলা অতি কঠিন কথা সে মনে-মনে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াই আসিয়াছিল; প্রথমেই সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল—কি ?

দেবু কাকুতি করিয়াই বলিল—ছিরুর বউ বুঝি বাঁচে না ডাক্তার; একবার এস ভাই!

ডাক্তার চমকিয়া উঠিল—বাঁচে না এমন কি অসুখ? কোন অসুখের কথা তো সে শোনে নাই!

দেবু বলিল—ন'মাস অন্তঃসত্ত্বা, হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে হাত পা খিঁচুছে; রক্তে উঠোনটা একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর দিকে ফিরিল। দেবু কাতরভাবেই বলিল—ডাক্তার!

—আসছি; আসছি! বাড়ীর ভিতর হইতে জামা গায়ে দিয়া কতকগুলা ওষুধ-পত্র লইয়া ডাক্তার তাড়াতাড়িই বাহির হইয়া আসিল।

রক্তাপ্লুত-দেহ চেতনাহীনা স্ত্রীর মাথার শিয়রে বসিয়া শ্রীহরি ছোট ছেলের মত কাঁদিতেছিল। ডাক্তার বলিল—শ্রীহরি, তুমি একটু সরে বস। পণ্ডিত তুমি ধর দেখি; ওগো ছিরুর-মা একটা বিছানা কর দাওয়ায়।

শ্রীহরির-মা প্রবলতর আবেগে কাঁদিয়া উঠিল—ওগো আমার হাত-পা আসছে না যে গো! আমি কি করব মা গো!

বিছানা করিয়া দিল শ্রীহরির বড় ছেলেটি, যে বাপের শাসন হইতে ক্রমাগত মাকে আগলাইয়া ফেরে। সযত্নে বিছানায় শোয়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া জগন বলিল—শ্রীহরি, তুমি বাপু জংসন কি কঙ্কনার হাসপাতালের ডাক্তারকে আন। তোমার পয়সা আছে, কসুর করবে কেন তুমি! আর দাইকে ডেকে কাছেই রেখে দাও; সন্তান শীগ্‌গিরই হয়ে যাবে!

শ্রীহরি এবার হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জগন বলিল—কেঁদ না শ্রীহরি, ছি! লোকে বলবে কি!

শ্রীহরি দেবুর হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিল—খুড়ো আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে খুড়ো—যা হয়—

বাধা দিয়া দেবু বলিল—লোক এতক্ষণ জংসন কঙ্কনা দু জায়গাতেই পৌছে গেল। লোক পাঠিয়ে আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছি।

ডাক্তার একটা ইনজেকসন দিয়া উঠিল, বলিল—ডাক্তার এলে আমাকে খবর দিয়ো।

শ্রীহরি তাহারও দুটি হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল—না তুমি যেতে পাবে না ভাই, তোমাকে থাকতে হবে। তোমার সম্মান আমি করব ডাক্তার। সে তাড়াতাড়ি একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিল—ও তুমি রাখ শ্রীহরি;—ওষুধের দাম ছাড়া আমি ভিজিট তো নোব না। গাঁয়ে ভিজিট তো আমি নিই না। আমি ঘরেই রইলাম, দরকার হলেই ডেকো।

ডাক্তার কিছুতেই থাকিল না, চলিয়া গেল।

না-থাকিবার কারণ ছিল।

পরদিন সকালে শ্রীহরির স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া মারা গেল। জংসন হইতে রেলের ডাক্তার, কঙ্কনা হইতে হাসপাতালের ডাক্তার দু-জনেই আসিয়াছিল, সংবাদ পাইয়া জগনও গিয়াছিল; সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে সন্তান জীবিত অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু প্রসূতি বাঁচিল না। পাস-করা ডাক্তার না হইলেও জগন এটা অনুমান করিয়াছিল, তাই সে থাকে নাই। এবারও ডাক্তারদের সঙ্গেই সে রোগিণীর মৃত্যুর পূর্ব্বে চলিয়া আসিল।

সমস্ত গ্রামের লোকই ভিড় করিয়া আসিয়াছিল। এমন ধারার আকস্মিক মৃত্যু বা দুর্ঘটনার একটা আকর্ষণী কৌতূহল

আছে। লোকজনে ভিড় করিয়া আসে। ইহা ছাড়াও শ্রীহরি এখন আর ছিরু নয়—সে গ্রামের গমস্তা, সম্প্রতি অনেকে তাহার নিকট খতও লিখিয়াছে বাকী-খাজনার দায়ে; সুতরাং আসিবার পক্ষে একটা অজ্ঞাত বাধ্যবাধকতাও আছে। বৃদ্ধ হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্ত্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল, হরেন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি সকলেই আসিয়া নীরবে বিষণ্নমুখে বসিল। গ্রামের বাউড়ী, ডোম, মুচিরাও আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। জগন ডাক্তারও আবার একবার আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী ঠুকঠুক করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীহরি প্রথমটা শিশুর মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়াছিল—এখন এতগুলি লোকের সমাবেশের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, দেবু তাহার কোলের কাছে বসাইয়া দিল তাহার পঙ্গু বোবা মেজ ছেলেটাকে। এতগুলি লোকের মধ্যে সে তাহার চোখের ঝকঝকে দৃষ্টিতে রাজ্যের বিস্ময় পুঞ্জীভূত করিয়া চাহিয়া রহিল। বড় ছেলেটার জ্ঞান হইয়াছে—মৃত্যুর আতঙ্ক সে অনেকটা বুঝিয়াছে, সে কাঁদিতেছে আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া।

গ্রামে কাহারও মৃত্যু হইলে গ্রাম্য চৌকীদারের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, সরকারী চাকরীর অন্তর্ভুক্ত অবশ্য নয়, প্রাচীন প্রথানুযায়ী কর্ত্তব্য। বাঁশ কাটিয়া দড়ি পাকাইয়া শব বহনের মাচান করিতে হয়, কাঠ কাটিয়া দিতে হয়; দেবু নেপালকে লইয়া ওই সব কাজে ব্যস্ত ছিল। সহসা শ্রীহরি দাওয়া হইতে উঠিয়া দেবুর কাছে আসিয়া বলিল—থাক খুড়ো—ও-সব থাক।

থাক, ও-সব থাক! দেবু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—থাকলে কি চলে বাবা, সংসারে কর্ত্তব্য—

—খাট, খুড়ো একখানা খাটের জোগাড় কর! ও পারের জংসনে লোক পাঠাও।

—খাট!

—হ্যাঁ, খাট। যা দাম লাগে লাগুক; তুমি লোক পাঠাও। আমার ঘরের লক্ষ্মীকে আমি বাঁশের মাচানে পাঠাতে পারব না। শ্রীহরির চোখ দিয়া আবার ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

দেবুর মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল—তাহার চোখে জল দেখা দিল। দুঃখের মধ্যেও সে উৎসাহের সঙ্গে আসিয়া হরেন্দ্র ঘোষালকে বলিল—ঘোষাল, একবার জংসনে যেতে হবে ভাই। কাঠের গোলা থেকে—একখানা খাট যা দাম লাগে—তুমি নিয়ে এস।

—খাট?

—হ্যাঁ।

শ্রীহরি বলিল—পাঁচ দশ পনেরো বিশ যা দাম লাগে তুমি নিয়ে এস। ভালো জিনিষ, খেলো এনোনা যেন।

ঘোষাল ফিরিল প্রায় অপরাহ্নে। ভাল খাটই পাওয়া গিয়াছে, দাম লইয়াছে আঠারো টাকা। সেই খাটের উপর শ্রীহরির স্ত্রীর শবদেহ সমারোহের সঙ্গেই শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সংকীর্ত্তন—খই এবং পয়সা ছড়ানো—শ্রীহরি বাদ কিছু রাখিল না।

গ্রামের মেয়েরা আপন-আপন নাচ-দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই শবযাত্রার সমারোহ দেখিবার জন্য। শবযাত্রার সঙ্গে লোক-জন যথেষ্ট, শ্রীহরির জাতি জ্ঞাতির প্রায় সকলেই শবানুগমন করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে পয়সার প্রত্যাশায় শিবপুর, কালিপুর দুইখানা গ্রামের নিম্নজাতীয় দরিদ্রেরা জুটিয়াছে। দেবু ঘোষ পয়সা ছড়াইতেছে—শ্রীহরি অবনতমুখে পথ চলিয়াছে, তাহার খুড়া ভবেশের কোলে তারস্বরে চীৎকার করিতেছে শ্রীহরির বড় ছেলেটি।

কিছুদূর আসিয়া বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী সবিনয়ে বিদায় চাহিল। বাবা শ্রীহরি, আমি বুড়ো মানুষ—

আর অধিক বলিতে হইল না, শ্রীহরি নিজেই বলিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আপনি ফিরুন চৌধুরী মশায়; এতেই আপনার অনেক কষ্ট হ'ল।

—না-না বাবা এ আর কষ্ট কি! যাওয়াই উচিত আমার—কিন্তু—

শ্রীহরি বলিল—এই আমার চিরদিন মনে থাকবে; আপনি ফিরুন।

চৌধুরী ফিরিল।

এতক্ষণে শ্রীহরি পথ হইতে চোখ তুলিয়া আশ-পাশের দিকে চাহিল।

অনিরুদ্ধ কর্ম্মকারের ঘরের সম্মুখে তখন শবযাত্রা চলিয়াছে। অনিরুদ্ধের গৃহদ্বার রুদ্ধ, নাচ দুয়ারেও কেহ দাঁড়াইয়া নাই।

শ্রীহরি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—আহত অজগরের

মত্ত, ক্রুদ্ধ এবং মর্ম্মান্তিক। সহসা তাহার নজরে পড়িল কর্ম্মকারের খিড়কী ডোবার ধারে পদ্ম দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে পায়ে পাঁকের চিহ্ন, মুখে কপালে—পরণের কাপড়েও পাঁকের দাগ, স্থির দৃষ্টিতে সে শবযাত্রার দিকে চাহিয়া আছে।

শ্রীহরি আপনার অজ্ঞাতসারেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দেবু ঘোষ পিছন হইতে পিঠে হাত দিয়া বলিল—চল, চল। বলিয়াই সে ধ্বনি দিয়া উঠিল—বল—হরি—

শবযাত্রীর দল—হরিধ্বনি দিয়া উঠিল—হরিবোল!

* * * *

পদ্ম ডোবায় নামিয়া পাঁক ঘাঁটিয়া মাছের সন্ধান করিতেছিল। পল্লীগ্রামের খিড়কী ডোবার চারিদিকে কিনারার পাশে পাশে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া রাখে, পাঁকাল মাছগুলি অভ্যাস বশতঃ তাহারই মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া বসিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে গর্ত্ত ও ডোবার শীর্ণ সংযোগ প্রণালীগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া গর্ত্তগুলি হইতে জল সেচিয়া ফেলিয়া—পাঁক ঘাঁটিয়া মাছ ধরা হয়। গত কাল পদ্ম সমস্ত দিন কিছু খায় নাই। নিত্যকার মত সে দুপুরের শেষ দিকে গালিগালাজ করিতে করিতে অকস্মাৎ যখন শ্রীহরির স্ত্রীর এই দুর্ঘটনার কথা শুনিল—তখন সে স্তম্ভিত হইয়া শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীহরির স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাহার তো কোন আক্রোশই নাই, কোনও দিনই তো সে শ্রীহরির স্ত্রীকে অভিশম্পাত দেয় নাই। ওই মেয়েটির কথা মনে হইলেই তাহার মনে জাগিয়া উঠে সেইদিনের ছবি—শীর্ণ গৌরাঙ্গী মেয়েটির মিনতি-কাতর মুখ; বিনীত, করুণ অনুনয়। নিতান্ত অপরাধিনীর মতই পদ্ম আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। চারিদিকের দরজাগুলিও সযত্নে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। একেই তো বর্ব্বর জানোয়ার ছিরু পালকে বিশ্বাস নাই। তাহার উপর প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া সে না করিতে পারে কি! ডোবার ওপাশে রাস্তার ধারে দণ্ডায়মান ছিরুর বীভৎস হাসি তাহার মনে পড়ে। খিল বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে আতঙ্কে এবং বেদনায় সে সমস্ত রাত্রিটি যাপন করিয়াছে। অনিরুদ্ধ আসেই নাই। কোথায় হয়তো মদ খাইয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। অনিরুদ্ধ এমন করিয়া উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহার জন্য পদ্মের আক্ষেপ নিরুদ্ধ অভিমানের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে—নীরব আত্মনির্য্যাতন এবং বিশ্বসংসারের প্রতি একটি গভীর উদাসীন ভঙ্গির মধ্যেই তাহার প্রকাশ আবদ্ধ। অনুযোগ-অভিযোগ সে একেবারেই করে না। কিন্তু গত রাত্রির আতঙ্কিত বেদনার মধ্যে সে অনিরুদ্ধকে বারবার গাল দিয়াছে। আজ সকালে যখন ছিরুর স্ত্রী মারা গেল—তখন সে কিছুক্ষণ অঝোরঝরে কাঁদিয়াছে। নিজের মৃত্যু-কামনাও করিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—কাল-নাগিনীর বিষাক্ত জিহ্বায়—সে আর কাহারও উপর বিষ-বর্ষণ করিবে না।

প্রাতঃকালে উঠিয়াও সে বাড়ীর বাহির হয় নাই। মাঠ-কোঠার উপরের ঘরে জানালা ঈষৎ ফাঁক করিয়া সমস্ত দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার বাড়ীর পাশ দিয়াই গ্রামের মেটে সড়কটি চলিয়া গিয়াছে, উপরের জানালায় বসিলেই সব কিছু দেখা যায়। পথের যাওয়া-আসা লোকের কথা হইতে সে প্রায় সবই শুনিল, ছিরুপালের ধৈর্য্যের কথা, তাহার নূতন সম্ভ্রান্ত পরিচয়ের কথা সবই শুনিল। জংসন হইতে হরেন্দ্র ঘোষাল কুলির মাথায় দিয়া খাট লইয়া ফিরিল, খোল কাঁধে করিয়া গদাই মোড়ল সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায় লইয়া গেল, পেশাদার খই-মুড়ি ভাজুনী রামার মা—মায়ে-পোয়ে দুই বস্তা খই পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল—সবই দেখিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহার মন খানিকটা শান্ত হইল, মনে হইল—এমন মরণে দুঃখ কি? স্বামী পুত্র রাখিয়া এমন রাজরাণীর মত যাইতে পারে কে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বারবার ছিরুর স্ত্রীকে মনে মনে বলিল—তোমার ছেলেদের আর আমি গাল দোব না, দোব না, দোব না। তুমি বরং আমাকে সঙ্গে নাও। আমার শরীর জুড়োক। তাহার মন অনেকখানি হাল্কা হইয়া গেল। এতক্ষণে সে অনুভব করিল, ক্ষুধায় তাহার পেট পুড়িয়া যেন খাক হইয়া যাইতেছে। এতক্ষণে মনে হইল, অনিরুদ্ধ কাল হইতে আসে নাই। আজ সে অনিরুদ্ধের জন্যও খানিকটা কাঁদিল। একবার ইচ্ছা হইল চুপি চুপি দুর্গা মুচিনীর বাড়ীর অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার বাড়ীটা দেখিয়া আসে। অনিরুদ্ধের দুর্গার বাড়ী যাওয়া-আসার সংবাদ সে জানে। সন্দেহ তাহার সংবাদের চেয়ে অনেক বেশী। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সে ভাত চড়াইয়া দিল।

ভাতের সঙ্গে দুইটা আলু ফেলিয়া দিয়া মনে হইল—মাছ হইলে ভাল হইত। উদরের ক্ষুধার সঙ্গে বহুদিন পর আজ সে রসনার কামনা অনুভব করিল। তাই সে খিড়কীর ডোবায় নামিয়া কিনারার গর্ত্তগুলা খুঁজিয়া মাছ ধরিতেছিল। শ্রীহরির সঙ্গে চোখোচোখী হইতেই সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। পা দুইটা ক্রমাগত নীচে পাঁকের মধ্যে বসিয়া যাইতেছে। দেবুর ইঙ্গিতে শ্রীহরি ফিরিবামাত্র সে কোন ক্রমে পাঁক হইতে উঠিয়া বাড়ী পলাইয়া আসিল।

অনিরুদ্ধ ফিরিল প্রায় সন্ধ্যার সময়।

গত কাল হইতে সে দুই তিন খানা গ্রাম ফিরিয়া আজ এতক্ষণে ফিরিল। কলের কাজটা তাহার গিয়াছে। কামারের কাজ কিছু ছিল বলিয়া কলের মালিক তাহাকে দৈনিক আট আনা মজুরীতে নিযুক্ত করিয়াছিল, সে কাজ শেষ হইয়া যাইতেই জবাব দিয়াছে। তবে সাধারণ মজুর হিসাবে কাজ করিলে কাজ পাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে অনিরুদ্ধকে এখানে আসিয়া কুলিব্যারাকে থাকিতে হইবে। অনিরুদ্ধ তাহাতে রাজী হইতে পারে নাই। আপনার কামারশালায় আসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিয়া সে হেলে বলদের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। চৈত্রমাসের শেষ, বৈশাখে ঝড় বৃষ্টি হইবে—জমিতে চাষ দিতে হইবে। অনিরুদ্ধ ঠিক করিয়াছে, কামারশালা তুলিয়া দিয়া চাষ লইয়া থাকিবে। না থাকিলে উপায় কি? জমি ভাগে দিয়া অর্দ্ধেক ধান ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। নিজে জমি চাষ করিলে ধানটা তো পুরা আসিবেই—তাহা ছাড়াও আলু, কলাই, গুড়, গম, তরকারী এসবও হইতে পারিবে। এই জন্যই সে হেলে গরুর সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। গরুর অভাব নাই—দুই-তিন জোড়া বলদই তাহার পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু অভাব অর্থের। সকলের চেয়ে কমদামের জোড়াটির দাম তাহার সঞ্চয় অপেক্ষা বাইশটাকা বেশী। নিরুপায় হইয়াই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। বারবার সে তাহার ভাগ্যকেই দোষী করিয়াছে, নতুবা দুইটা প্রাণী লইয়া সংসার—সেই সংসার অচল হয়। অভাব অবশ্য সকলেরই বাড়িয়াছে, সেটা কলিকালের মহিমা তাহা সে জানে, কিন্তু তাহার চেয়ে অভাব সে তো পাঁচখানা গ্রামে কাহারও দেখিতে পায় না। কামারশালায় সে হিসাব করিয়া দেখিয়াছে—দৈনিক দুই আনা দশপয়সার বেশী রোজকার হয় না। আশ-পাশ গ্রামের তাহার পরিচিত স্বজাতিদের জমি তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী, সত্য বলিতে কি—তাহারা জাতিতে কামার হইলেও পেশায়-চাষী। চাষের আয় হইতেই তাহারা টিকিয়া আছে। কেহ কামারশালা রাখিয়াছে কেহ রাখে নাই। মহাগ্রামের বিপিন কর্ম্মকারের পয়সা আছে, সে জংসনে দোকান করিয়া, দোন, গুড়ের কড়াই, কোদাল, টামনা তৈয়ারী করিয়া রাখে; বেচেও বেশ দু পয়সা লাভ রাখিয়া। নিজের গরজে তো সে বেচে না, লোকে কেনে তাহাদের গরজে।

ফিরিবার পথে সে খানিকটা মদ খাইয়া—পুরা একটা বোতল লইয়া ফিরিয়াছিল। পুরা বোতলটা দুর্গা মুচিনীর জন্য। ভরসার মধ্যে দুর্গা মুচিনী। দুর্গাকে তাহার ভাল লাগে, দুর্গাও তাহাকে ভালবাসে, সে তাহা জানে। হাস্য-পরিহাস-রসিকতায় দুর্গা অপূর্ব্ব। তাহার যৌবন তাহার রূপ—সেও এ অঞ্চলে বহুজনবাঞ্ছিত। কিন্তু অনিরুদ্ধ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুর্গার জাতির কথা মনে হইলেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। দুর্গা কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতেছে। সহজ অবস্থায় সে হাস্য পরিহাসের গণ্ডীর মধ্যেই ধীর হইয়া থাকে, মদ খাইলেই লালসাতুর হইয়া অধীর হইয়া উঠে। জানিয়া শুনিয়াও অনিরুদ্ধ দুর্গার জন্য মদ লইয়া ফিরিল। বাইশটা টাকা যদি দুর্গা দেয়!

সমস্ত পথটা সে লোকের পাপকাহিনী স্মরণ করিল। বড় মোড়লের মেয়ে দুইটা কলিকাতায় ঝিয়ের কাজ করিতে গিয়াছে। বৎসরে আশ্বিন ও চৈত্র এই দুই মাসে তাহারা গ্রামে আসে—আঁচল ভরিয়া টাকা আনে। বিধবা মেয়ে দুইটার কেশ-বেশের পরিপাট্য কি! ঝিয়ের কাজ করে না আরও কিছু!

কঙ্কনার রমেন্দ্র চাটুজ্জে ভাগাড় বন্দোবস্ত লইয়াছে, ব্রাহ্মণের ছেলে চামড়ার ব্যবসা ধরিয়াছে। চামড়ার ব্যবসায়ীদের বিষ প্রয়োগে গো-হত্যার কথা কে না-জানে?

গদাই মোড়লের ভাইটা—সেহোড়ার শুঁড়িদের পচুই মদের দোকানে চাকরের কাজ করে। পচা ভাত ঘাঁটিয়া মদ তুলিতে হয়।

গদাই মোড়লের ভাইকে দোষ কি! হেম মুখুজ্জের

ছেলে হরিরাম মুখুজ্জে নিজেই পচুই মদের দোকান করে। দেশবিখ্যাত শিববাবুর জামাই মদের দোকান করে।

কঙ্কনার প্রত্যেক বাবুটির বহির্বাটির শয্যা, একা দুর্গা নয়—বহু দুর্গার স্পর্শ চিহ্নিত। ছিরু পালের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

দুর্গার বাড়ীতে ঢুকিয়া সে পরিহাস-সরস কণ্ঠেই ডাকিল—কই হে!

অপরাহ্নে উন্মুক্ত উঠানে দুর্গা বসিয়াছিল, তাহার মা ভাত চড়াইয়াছে; ওদিকে পাতুর দাওয়ায় পাতুর বিড়ালীর মত বউটাও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। চারিদিকে চারটি গুঁজি মাটিতে পুতিয়া পাতু একখানা চামড়া টান দিতে ব্যস্ত। চামড়াটা বেশ বড়, পচা দুর্গন্ধ উঠিতেছে। অনিরুদ্ধের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল, নিশ্চয় গরুর চামড়া। একবার ইচ্ছা হইল পলাইয়া যায়। কিন্তু দুর্গা ততক্ষণে তাহাকে ডাকিয়াছে—এস! সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ। অন্যদিন দুর্গার সম্ভাষণে রসিকতার উচ্ছ্বাস থাকে। অনিরুদ্ধ বুঝিল, গতকাল হইতে আসে নাই বলিয়া দুর্গা রাগ করিয়াছে। তাহার উপর এখন যদি চলিয়া যায় তবে আর রক্ষা থাকিবে না। কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সে হাসিয়া বলিল—এলাম!

—বস।

—কাল থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে জান আমার বেরিয়ে গেল।

একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গা বলিল—ছিরুপালের বউটি মারা গেল।

—মারা গেল! হঠাৎ? অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ।

দুর্গার-মা বলিয়া উঠিল—তোমার বউয়ের জিভে বিষ আছে বাপু। গাল দিয়ে দিয়ে—

দুর্গা ধমক দিয়া উঠিল—থাম বাপু তুই। গাল দিলে যদি মানুষ মরত' তবে আমিও বাঁচতাম না, দাদাও না, বউও না। তোর মুখেও তো বিষ কম নাই। সঙ্গেসঙ্গেই সে উঠিয়া পড়িল, অনিরুদ্ধকে বলিল—এস হে এস, ঘরে এস।

অনিরুদ্ধ বলিল, না, আজ আমি বাড়ী যাই।

—না। আমার মাথা খাবে। দুর্গা তাহার হাত ধরিয়াই ভিতরে লইয়া গেল। দুর্গা সাজ-সজ্জায় যেমন বিলাসিনী, তাহার ঘরের পারিপাট্যও তেমনি ছিমছাম। তাহাদের জাতি-জ্ঞাতির স্বভাবগত মালিন্য সেখানে নাই, তাহার উপর তাহার পয়সা আছে। অনিরুদ্ধকে বসাইয়া একটি চিনামাটির কাপ্‌ নামাইয়া দিল, দুর্গার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনিরুদ্ধের পকেটের বোতল এড়াইয়া যায় নাই।

অনিরুদ্ধ বলিল—তোমার?

—না। আজ থাক।

—তবে, আমারও থাক। তোমার লেগেই আনা আমার।

দুর্গা ম্লান হাসি হাসিয়া নিজের কাপটি আনিয়া বলিল—একটুকুন দিয়ো তবে। অনিরুদ্ধ মদ ঢালিতে ঢালিতে বলিল—কি হয়েছে ভাই—আমাকে সত্যি করে বল।

দুর্গা নীরবে মদটুকু নিঃশেষে গলায় ঢালিয়া দিল—তাহার পর বলিল—দাও তো আর একটুকুন, মা হারামজাদীকে দিয়ে আসি।

দুর্গার-মা বাহিরে বসিয়া ক্রমাগত অনিরুদ্ধ ও দুর্গাকে গাল দিতেছে। অর্থহীন অনিরুদ্ধের আসা-যাওয়া সে পছন্দ করে না। ছিরুর মত অর্থশালী লোককে যে দুর্গা অবহেলা করিয়াছে—তাহার প্রধান কারণ ওই অনিরুদ্ধের প্রতি দুর্গার আসক্তি।

দুর্গা পাত্র ভরিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—লে, হাঁ কর।

—কেনে? পরক্ষণেই গন্ধ অনুভব করিয়া মা বলিল—না—ওতে কাজ নাই আমার! বলিয়াও কিন্তু সে হাঁ করিল। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া দুর্গা মায়ের মুখে মদটুকু ঢালিয়া দিয়া পাতুকে প্রশ্ন করিল—দাদা?

পাতু বউকে হুকুম করিল—বাটীটা নিয়ে যা। এই!

অনিরুদ্ধ যখন বাড়ী ঢুকিয়াছিল—তখন দুর্গা, ছিরুর স্ত্রীর মৃত্যুতে দুঃখে প্রায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। আবার মায়ের মুখে মদ ঢালিয়া দিতে দিতে সে খিল খিল করিয়া হাসিল। কিন্তু কোনটাই তাহার মিথ্যা নয়, তাহার দুঃখও সত্য, তাহার হাসিও সত্য। পাতুকে বউকে মদ বাঁটিয়া দিয়া দুর্গা অনিরুদ্ধকে ছিরুর স্ত্রীর মরণের কথা বলিতে বলিতে আবার ঝর ঝর করিয়া কাঁদিল। ছিরুর স্ত্রীর শবযাত্রার সমারোহের কথা পর্য্যন্ত বলিয়া—চোখ মুছিতে মুছিতে

বলিল—ভাগ্যিমানী, ড্যাং ড্যাং ক'রে চলে গেল। মরণের শোভা কি! সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমরা মলে—পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে ফেলে দেবে; শেয়াল শুকুনিতে ছিঁড়ে খাবে!

অনিরুদ্ধ এতক্ষণে কথা বলিল—আমি গাঁয়ে কি ক'রে মুখ দেখাব ভাই! মাগীর লেগে—

—না—না—না। তার লেগে তোমার লজ্জা কি? গাল-গালাজ শাপ-শাপান্ত সংসারে দেয় না কে? ছিরুর মা দেয় না?

অনিরুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—তোমার কথা বল। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছিলে কেনে?

অনিরুদ্ধ সমস্ত কথা বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—তারপর—দুর্গার হাতখানি ধরিয়া বলিল—এখন তুমি যদি তরাও, তবেই।

—পঁচিশ টাকা? এককুড়ি পাঁচ টাকা? দুর্গা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনিরুদ্ধের দিকে চাহিল; বড়-বড় চোখ দুটি নেশায় গোলাপী রঙের ফুলের পাপড়ির মত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত সংস্কার সত্ত্বেও অনিরুদ্ধের মনে একটা আমেজ ধরিয়া আসিল। অনিরুদ্ধ গভীর আকর্ষণে দুর্গাকে কাছে টানিল। দুর্গা কিন্তু কাছে আসিল না, হাসিয়া বলিল—ছাড়।

—না। অনিরুদ্ধের বুকে তাণ্ডব জাগিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

—ছাড়। দুর্গার স্বর রূঢ় নয়, কিন্তু দৃঢ়। অনিরুদ্ধ আহত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গা একটু হাসিল, বলিল—লাজ মান ভয় তিন থাকতে নয়। ও তিন যে ছাড়তে লারবে—তার সঙ্গে আমার বনবে না ভাই। আমি মলে অমনি ক'রে নিয়ে যেতে হবে। পারবে তুমি?

বিস্ফারিত বিস্ময়ে অনিরুদ্ধ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—তুমি আমার বন্ধু নোক, টাকা তোমাকে আমি দোব। কিন্তু—; সে হাতযোড় করিয়া বাকীটুকু অসমাপ্তই রাখিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ হাঁ—না কিছুই বলিল না; কিছুক্ষণ পর সে উঠিয়া পড়িল—বলিল—আচ্ছা!

—রাগ করলে নাকি বন্ধুনোক?

—নাঃ। অনিরুদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিছুদূর আসিয়া সে নেশার মধ্যেও ভগবানকে বারবার প্রণাম করিল—ভগবান রক্ষা করিয়াছেন।

ষোল

সমস্ত গ্রামের লোক বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইয়া গেল।

দেবু পণ্ডিতও এতটা প্রত্যাশা করে নাই; সেও বিস্মিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে যেন খানিকটা শঙ্কা বোধও করিল। শ্রীহরি যেন তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

জগন ডাক্তার এটাকে ভণ্ডামী বলিয়া ঘোষণা করিতে গিয়াও গলায় জোর পাইল না। শেষ পর্য্যন্ত সে বলিল—শ্মশান বৈরাগ্যে এমন হয়। শ্মশান বৈরাগ্য জানিস? কথাটা বলিল তারা নাপিতকে।

শ্মশান বৈরাগ্য কাহাকে বলে তারা জানে না। সে স্বীকার করিল। ক্ষুরে শান দেওয়া বন্ধ করিয়া সে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ডাক্তার বলিল—শ্মশানে মড়া পোড়াতে গেলে চিতার আগুনের আঁচ লাগে। চিতার আগুন হল—মহাদেবের কপালের আগুন, সেই আঁচে সংসারের মায়া ঝলসে যায়—অজ্ঞান হয়ে থাকে কিছুক্ষণের জন্যে। তখন মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান হয়। দেখিস না—শ্মশান থেকে এসে মন কেমন হয়ে যায়, কেবলই মনে হয়, ধুত্তোর সংসার! ছিরুর হয়েছে তাই। দেখ না, কিছুদিন যাক, তারপর বলিস। ধোপ্—ধোপ, ধোপে টিকুক।

তারা নাপিত কথাটা অস্বীকার করিতে পারিল না, কিন্তু সায়ও দিতে পারিল না; সে নীরবে ক্ষুর শানাইতে আরম্ভ করিল।

শিবপুরের দ্বারিকা চৌধুরী বলিল—লক্ষ্মীর কৃপা সামান্য বস্তু তো নয়। এতদিন শ্রীহরির স্বভাব পাল্টায় নাই এই আশ্চর্য্য। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসিল দ্বারিকা চৌধুরী, হাসিয়া বলিল—বয়সের ধর্ম্ম, রক্তের তেজ—ধরাকে সরা ক'রে তোলে পায়ের তলায়। সেটা কমেছে, মান্য গণ্য হয়েছে এখন শ্রীহরি, তার ওপর—এই আঘাত—; আহা-হা, বড়ই আঘাত পেয়েছে। তা কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে শ্রীহরির।

স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্রীহরি শান্ত গম্ভীর জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বহির্বাটীতে এখন গ্রামের লোক প্রায় অহরহই

আসিয়া বসিয়া থাকে, শ্রীহরি ছেলে দুটিকে দুই পাশে লইয়া একটি কম্বলের উপর বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কথা খুবই কম বলে; জিজ্ঞাসা করিলে সেই কথার জবাব দেয়, আর নিজে হইতে যে কথা বলে—সে কথা তত্ত্ব-কথা।

দিন কয়েক পর শ্রীহরি দেবুকে ডাকিয়া বলিল—খুড়ো, তামাদী তো এসে গেল, আজ তোমার বাইশে চৈত্রি। নালিশ-টালিশগুলো যা করতে হবে—সেগুলো ঠিক ঠাক করে ফেল। আইনের কাছে তো আর সুখ দুঃখ নাই।

দেবু হাসিয়া বলিল—আমি কি আর চুপ ক'রে বসে আছি বাবা! ভার যখন নিয়েছি তখন তুই নিশ্চিন্ত থাক। সে সব আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। নেপালকে জমিদার বাড়ী পাঠিয়েছি—ডেমি ওকালতনামা দস্তখতের জন্যে। কাল একবার নিজেই যাব।

—জগন ডাক্তারের বাকীতে দশটা টাকা উশুল দিয়ে দিয়ো। ও ভিজিট নেয় নাই; কিন্তু আমিই বা ওর কাছে ধেরো হয়ে থাকব কেনে।

—দশ টাকা! দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল—তুই বলছিস আমি দোব, কিন্তু দশটাকা কি হিসেবে বলছিস? দুবার এসেছে— বড় জোর দু টাকা দিতে পারিস। গাঁয়ে ভিজিট নেয় না, না লোকে দেয় না! দিনে আট আনার বেশী পেতে পারে না জগন! কঙ্কনায়, জংসনে পাশ করা ডাক্তারের ভিজিট একটাকা।

শ্রীহরি গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর বলিল—তুমি চার টাকা উশুল দিয়ো খুড়ো।

—চার টাকা।

—হ্যাঁ। দু টাকা না হয় পুরস্কার দেওয়া গেল। মোট কথা বলবার আমি কিছু রাখব না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবু বলিল—আচ্ছা।

অসম্ভব রকমের গম্ভীর হইয়া শ্রীহরি এবার বলিল—কিন্তু দেখো খুড়ো, মামলায় যেন হারতে না হয়। ডাক্তারকে একবার বুঝতে হবে আমাকে। আমি ওর হাতে ধ'রে বললাম—তোমাকে থাকতে হবে ভাই। টাকা দিতে চাইলাম—তা— ; তুমি তো ছিলে—তুমি তো শুনেছ সে কথা। দেবু দেখিল শ্রীহরির কাল বড় মুখখানা কাল-বৈশাখীর মেঘের মত থমথমে হইয়া উঠিয়াছে।

—আর ওই অনিরুদ্ধ কামার! বলিতে বলিতে তাহার ঠোঁট দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল, চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছিয়া সে হাসিল—বলিল—লজ্জাও লাগে, দুঃখও হয়। ঘাস কাটতে কুড়ুল তুলতে হ'ল। অনিরুদ্ধ তো ঘাস। পায়ে থেঁতলে দিলেই হয়। কিন্তু না, অন্যায় আমি করব না। বে-আইনের পথে আমি চলব না। অন্যায় অধর্ম্ম অনেক ক'রেছি খুড়ো, আর না।

পাতু মুচির কথা সে মুখেই আনিল না; তবে ভুলিয়া সে যায় নাই। কিন্তু দুর্গাতে তাহার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে অতীত কথা মনে করিয়া অতি বড় লজ্জায় তাহার মাথা এখন হেঁট হইয়া আসে। একটা মুচির মেয়ে—ছি! ছি!

শ্রীহরি আপন মনেই বলিয়া উঠিল—রাধে! রাধে! রাধে!

ঠিক এই সময়েই শ্রীহরির মা বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দাঁড়াইল, উচ্চৈস্বরে নয়—গুণ গুণ করিয়া সে কাঁদিতেছিল; শ্রীহরি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে ডাকিল—হরিবোল। হরিবোল। গোবিন্দ হে!

দেবু প্রশ্ন করিল—কিছু বলছ বউঠাকরুণ?

শ্রীহরির মায়ের শোক প্রবল হইয়া উঠিল—কণ্ঠস্বরের পর্দ্দা কয়েক ধাপ চড়িয়া গেল—সব্বনাশী আমার বুকে যে শেল গেঁথে দিয়ে গেল ভাইরে, আমি কি করব বলে দাও তোমরা রে।

—কি হল—তাই বল?

—ওরে ভাইরে—হতভাগী মল কিন্তু ছেলেটা যে রেখে গেল রে! কি ক'রে আমি মানুষ করব ভাই রে!

শ্রীহরির ঠোঁট দুইটা অবরুদ্ধ ক্রন্দনে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দেবু শ্রীহরির মাকে বলিল—কেঁদো না বউঠাকরুণ—ছিরুর মন খারাপ হবে।

চোখ মুছিয়া শ্রীহরির মা অনেকটা স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলিল—ক্ষণে ক্ষণে যে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ভাই। ট্যাঁ ট্যাঁ করে দিনরাত কাঁদছে। আঁতুড়ের ছেলে—

বাধা দিয়া দেবু বলিল—তার জন্যে ভাবনা কি? ছেলে মরেছে এমন পোয়াতীর তো অভাব নাই। ছেলে হয়ে মরার তো কামাই নাই। দেখে শুনে আনছি একজনাকে। খাবে-দাবে মাইনে নেবে, ছেলে মানুষ করবে।

শ্রীহরির মা ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—বায়েনদের দুগ্‌গার কাছে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম—

—কার কাছে? শ্রীহরি চমকিয়া উঠিল।

—বায়েনদের দুগ্‌গার কাছে।

—সে তো বাঁজা মেয়ে, তার বুকে দুধ কোথায়?

—ছেলেতে টানলেই হবে বাবা, ছেলেতে টানলেই হবে। সোমথ মেয়ে, রীতকরণও ভদ্দলোকের মতন। তা' হারামজাদীর তেজ কত! বলে—মা গো, ও আমি লারব।

শ্রীহরি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু অভদ্রোচিত চীৎকার সে করিল না, বলিল—দুটো দিন সবুর কর মা, আমি ব্যবস্থা করছি। আমাকে না শুধিয়ে ওসব তুমি যা-তা ক'র না।

মা এবং দেবুকে বিদায় করিয়া শ্রীহরি বারবার চোখের জল মুছিল। বউকে যে সে এত ভালবাসিত এ তাহার কাছেও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ছেলেটাকে লইয়া সত্যই বিপদ হইয়াছে। পয়সা দিলে মায়ের দুধের অভাব হইবে না। মৃতবৎসা কোন মেযে পাওয়া না-গেলেও পয়সা দিলে সন্তানবতী অনেকেই ছেলেটিকে স্তন্য দিতে রাজী হইবে, তাহার ছেলের জন্য কিছু গরুর দুধের ব্যবস্থা করিয়া দিলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু নীচ জাতির স্ত্রীলোকের স্তন্যে সন্তানকে পুষ্ট করিতে শ্রীহরির মন খুঁত খুঁত করিতেছে। কঙ্কনার চণ্ডীদাসবাবুর স্ত্রী এমনি শিশু সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছেন, চণ্ডীবাবু একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকেই রাখিয়াছেন—সন্তান প্রতিপালনের জন্য। মেয়েটির নিজের একটি ছেলে আছে; সেও ওই বাবুর ছেলের সঙ্গে মানুষ হইতেছে।

সহসা শ্রীহরির মনে হইল—ও পাড়ার মৃত বহুবল্লভ পালের কনিষ্ঠা কন্যার কথা। বহুবল্লভের মৃত্যুর পর—সমস্ত জমি নিলাম হইয়া গেছে দেনার দায়ে। বালবিধবা মেয়ে দুইটা কলিকাতায় দাসীবৃত্তি করিতেছে এখন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংসারটা তাহারা বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। লোকে বলে, দাসীবৃত্তি উহাদের একটা বহিরাবরণ মাত্র। সম্প্রতি ছোট মেয়েটা রুগ্ন হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীর—দেহবর্ণ শণ ফুলের মত রক্তহীন হলুদ হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার জলে না কি লোনা ধরিয়াছে। লোনা ধরাটা একটা অজুহাত, বিধবা মেয়েটি সেখানে নাকি একটি সন্তান প্রসব করিয়াছিল অকালে। ওই মেয়েটি যদি সন্তানটিকে প্রতিপালনের ভার লয় তবে বড় ভাল হয়। স্বজাতিও বটে, বুকে স্তন্যও নিশ্চয় আছে, বয়স অল্প, দেহও তাহার সমর্থ। গ্রামে তো কিছুদিন হইতে উহাদের পতিত করিবার ধুয়া উঠিয়াছে, পতিত করা উচিতও বটে; কিন্তু শ্রীহরির আশ্রয়ে থাকিলে সে বিপদ হইতে শ্রীহরি তাহাদের রক্ষা করিবে। কঙ্কনার চণ্ডীবাবুও যা, শিবকালীপুরে শ্রীহরিও তাই। মেয়েটার ভরণ-পোষণের ভার শ্রীহরি লইবে। কিন্তু প্রস্তাবটা পাঠাইবে কাহার মারফৎ? অনেক ভাবিয়া সে নেপালকেই উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিল।

মনে মনে খুসী হইয়া শ্রীহরি হুকায় টান দিল কিন্তু কল্কেটা নিভিয়া গিয়াছে। সে ডাকিল—ছিদাম!

কেহ উত্তর দিল না। ছিদাম বোধ হয় বাড়ী গিয়াছে অথবা কোথাও পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতেছে। চৈত্রের রোদ দুপুরে প্রায় আগুন হইয়া উঠিয়াছে। ঘুমের দোষ নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ, পাখীগুলা পর্য্যন্ত ঝোপে ঝাড়ে ছায়ায় বসিয়া ঝিমাইতেছে। কেবল অদূরে কোন ঝোঁপের তলায় একটা ডাহুক মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছে। শ্রীহরি নিজেই উঠিল। ভিতর বাড়ীর দরজায় সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল; ছেলেটা এখন আর কাঁদিতেছে না। স্ত্রীর জন্য আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এতদিন সেই তাহাকে তামাক সাজিয়া দিয়াছে। ভেজান দরজাটা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই সে ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দাওয়ার উপর মা পড়িয়া ঘুমাইতেছে, পাশে ঘুমাইতেছে বড় এবং মেজ ছেলেটা, অদূরে দাইটাও ঘুমে অচেতন—তাহার পাশেই কচি ছেলেটা—কিন্তু ছেলেটার মুখের উপর ঝুঁকিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা শীর্ণা নারী! ও-কে দাঁড়াইয়া! দরজা খুলিয়া শ্রীহরি ঘরে ঢুকিতেই চকিতের মত খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। যেন মিলাইয়া গেল!

ছেলের মমতায় আবদ্ধ প্রেতলোকবাসিনী—মা। শ্রীহরি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মাকে ডাকিতেও তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইতেছে না। কিছুক্ষণ পর সে আত্মসম্বরণ করিয়া ছুটিয়া খিড়কীর ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার সহিত দুইটা কথা সে বলিবে। কিন্তু কোথায় কে? ফিরিয়া আসিয়া সে ছেলেটার কাছেই দাঁড়াইল,

ছেলেটা তখনও মিটি মিটি চাহিয়া হাতের মুঠা চুষিতেছে; হাসিতে সে এখনও শেখে নাই তবে প্রশান্ত ভাবটি তাহার সর্ব্ব কচি অবয়বে সুপরিস্ফুট।

* * * * *

চোখের ভ্রম নয়, প্রেতলোকবাসিনী মায়াময়ী মায়ের ছায়াও নয়; সন্তানলোভাতুরা রক্তমাংসের মানুষই বটে। এই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সকলের ঘুমের সুযোগে খিড়কীর পথে আসিয়া ছেলেটির কাছে দাঁড়াইয়াছিল। আপনাদের খিড়কীর ঘাটে বসিয়া কচি ছেলের কান্না শুনিতে শুনিতে সে চোরের মত সন্তর্পণে আসিয়া শ্রীহরির খিড়কীপুকুরের বাঁশ-জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। জনশূন্য স্তব্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন চৈত্র দ্বিপ্রহর। সে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া খিড়কীর দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। প্রখর তাপের মধ্যে ঝিরঝিরে চৈত্রের বাতাসে ক্লিষ্ট দেহে সকলে ঘুমে আচ্ছন্ন—কেবল কচি শিশুটা কাঁদিতেছিল ক্লান্ত কণ্ঠে। বারকয়েক উঁকি মারিয়া দেখিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। প্রগাঢ় মমতায় পাশের দুধের বাটী হইতে দুধে ভিজানো ন্যাকড়ার পলিতাটি ছেলেটির মুখে তুলিয়া দিয়া নির্ণিমেষ চোখে দেখিতেছিল।

ঠিক এই সময়েই বাহিরের দরজাটি তৈলহীন কব্জার শব্দ করিয়া খুলিয়া গেল। চকিতে সে কায়াহীন ছায়ার মতই নিঃশব্দ লঘু দ্রুতপদক্ষেপে খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া গেল; ঊর্দ্ধশ্বাসে বাঁশবনের আড়ালে আড়ালে আসিয়া—একেবারে কোঠার উপরে উঠিয়া মাটির উপরেই লুটাইয়া পড়িল। সে হাঁপাইতেছিল—কুকুর-তাড়িতা ক্ষুধাতুরা শৃগালীর মত।

শ্রীহরি ভুল দেখে নাই; দীর্ঘ শীর্ণ দেহ অবগুণ্ঠনে দীর্ঘ অবয়ব ঢাকা—নারীমূর্ত্তি। সে পদ্ম। (ক্রমশঃ)

মায়া

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

ভীরু তৃতীয়ার চাঁদ উঠিয়াছে গগন-পারে,
স্বপ্ন-বিভোল প্রাণ আজ সখি চায় সে কারে?
দখিনা বাতাসে গোলাপ-বধূর
পাপ্‌ড়ি-ভাঙা যে সুরভি মধুর
ফিরিছে বহি,
মন উচাটন, হৃদয়ের বাণী যাবো গো কহি;
সে গেছে কোথায়? কেউ কি জানে না খুঁজিনু যারে?
ভীরু তৃতীয়ার চাঁদ উঠিয়াছে গগন-পারে।

স্মরি কি কাটালে হারানো রাতের একটী গীতি?
কাঁদে যে এখানে পরশ-পাওয়া সে কুঞ্জ-বীথি;
বীণা হাতে নিয়ে কত অভিলাষ
মনে পড়ে তব ভ্রূকুটি-বিলাস,
কণ্ঠ-সুর,
সে নিশি কোথায়? তুমি আজ সখি কত যে দূর!
কি ভেবে কখন কাঁদি অনিবার অশ্রুধারে,
ভীরু তৃতীয়ার চাঁদ উঠিয়াছে গগন-পারে।

কত বসন্ত বৃথা ফিরে গেছে দীপ্তরাগে,
আজিকার রাত ভুলিবার নয়, কি নেশা জাগে!
ফাগুন-যামিনী এলো অসময়
প্রিয়া নাই পাশে কবিতা কি হয়,
স্বপ্ন মিছে,
ভাবি আর মনে প্রীতি ও বিরহ আবর্তিছে;
যদি না রবে গো কেন এ ছলনা মর্ম্ম-দ্বারে?
ভীরু তৃতীয়ার চাঁদ উঠিয়াছে গগন-পারে।

সে ছিল একদা আজিকার মত শুক্লারাতে,
স্মৃতি পড়ে আছে, কুসুম মলিন সে নিশি সাথে;
এত আয়োজন তবু কি অপার
ভুল ক'রে সাধ ভালবাসিবার
—সুখ যে ঢের,
যদিও সে নাই, তবু কত মায়া এ-বিরহের!
প্রেম কিছু নয়, মায়া-মরীচিকা অন্ধকারে,
ভীরু তৃতীয়ার চাঁদ উঠিয়াছে গগন-পারে।



বাংলা গানে আঁখর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সবাই জানেন আমাদের কীর্ত্তনে আঁখর দেবার পদ্ধতি আছে। এ সম্বন্ধে আমার "সাঙ্গীতিকী" পুস্তকে বিশদ ক'রেই লিখেছি। এখানে কেবল একটু পদ্ধতি দেখানোর উদ্দেশে দুকথা বলা শুধু একটু নির্দেশ দিতে।

এ স্বরলিপিটি শ্রীমতী উমা বসু গ্রামোফোনে যে গানটি গেয়েছেন তারই প্রতিরূপ—অনেক শিক্ষার্থীর এতে শিখতে সুবিধা হবে ব'লে। কিন্তু তালফের মিড় তাঁন প্রভৃতি উমা দেবী যেভাবে গেয়েছেন সেগুলির অপরূপ সূক্ষ্মতা কণ্ঠে ছাড়া দেখানো অসম্ভব। আঁখরগুলিও কি ভাবে নিয়েছেন সেটিও শ্রবণীয়। তালফেরের পদ্ধতিও কীর্ত্তনে আছে, তবে আমি কীর্ত্তনের তালফের বা আঁখর দেবার পদ্ধতি সব সময়ে হুবহু নিই না—যখন যে ভাবে গাইলে গানটির ভাব ফুটবে সেই ভাবেই নিই। যাহোক গানটি এই :

শ্রীচরণে নিবেদনে জানাই এ মিনতি :
ছায়ায় আমার জাগাও তোমার আকুলতার জ্যোতি। (১)
অশ্রু সাঁঝে এসো কাছে হ'য়ে ব্যথার ব্যথী (২)
পরে ফুলের বাঁশি বাজিয়ে—নাশি' কাঁটার ক্ষত ক্ষতি।

আঁখর

১) প্রভু ছায়ায় আমার আলো
তোমার আকাশ-আকুল আলো
আমার ঘুচাও সকল কালো
নাথ বাসাও তোমায় ভালো
২) যখন নয়ন ঝুরে থেকো না দূরে হৃদয়পুরে এসো
কূলে কূলে ঢেলে বিলাও অকূল আলো (৩)
সুরে সুরে নীল নূপুরে উধাও শিখা জ্বালো (৪)

গানে গানে উছল বানে বহাও রূপের গতি
তোমার আশায় তোমার ভাষায় জ্বালাও প্রেমারতি।

আঁখর

(৩) নইলে যে মোরা কূল ছাড়ি না
অকূল আলো নইলে যে মোরা কূল ছাড়ি না
(৪) তালে তালে তালে ছন্দ প্রদীপ জ্বালো।
সুরে সুরে সুরে প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।
তোমার আঁখির মিলন মদির বিরহে মোর ঢালো (৫)
তোমায় হিয়া সব সঁপিয়া চায় বাসিতে ভালো
সেই শিহরে ধায় সাগরে আমার হিয়া নদী
সীমা তরি' অসীম বরি' হোক সে নিরবধি।

আঁখর

(৫) তোমার বন্দনে ঢেউ চিরন্তনে ধায় যে মোর আশা নদী



শিল্পী শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার — অবসর — ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

দাদ্রা

\+ ০ + ০

সা সা -া | রা গা মা | র্গা রা গা | পমা গা মা | রা সরা সরা | গা রা গা | সরা রা -া |
শ্রী চ - র ণে - নি বে - দ নে - জা না - ই এ মি ন তি -

গরা গরা সন্ | সা সা -া | রা গা -া | গা গা -া | গমা রগা পমা | মা মা -া | মা মা -া |
\- - - ছা য়া য় আ মা র জা গা ও তো মা ০র আ কু - ল তা র

মগা পমা -া | -া সা সন্ | সা গা রা | গা রগা পা | গপা মগা রগা | -া সা সন্ |
জ্যো তি - - প্র ভু ছা য়া য় আ মা র জা লো - - তো মার

সা গা রা | গা রগা পা | গপা মগা রগা | -া গা পা | পা পা -া | পা পা ক্ষা |
আ কা শ আ কু ল আ লো - - আ মার ঘু চা ও স ক ল

পক্ষা ধপা ক্ষপা | মা গা মা | রগা গা -া | গমা গমধা পক্ষপা | মা মগা রগা | -া -া -া |
কা লো - - না থ বা সা ও তো মা ০০য় ভা লো - - - -

{ সা মা মা | মা মা গা | পক্ষা ধপা ক্ষপা | মা গা মা | গরা রা গা | রা রগা পা |
অ - শ্রু সাঁ ঝে - এ সো - কা ছে - হো য়ে - ব্য থা র

মা মগা রগা | -া (সা সন্ | সা ন্সা রা | রা রগা সরা | রা গরা গা | পমা গা মা |
ব্য থী - - য থ ন ন য় ন ঝু রে - থে কো না দূ রে -

গপা পা -া | গপা ধনা ধনধা | পক্ষা পধা পপা | গপা মগা রগা |) } সা সন্ |
হৃ দ য় পু - রে এ সো - - - - প রে

সা সা রা | রা রগা সরা | রা রা গা | গা গমধা পক্ষপা | মা মগা রগা | রা রা সরা |
ফু লে র বাঁ শি - বা জি য়ে না শি - কাঁ টা র ক্ষ ত -

সা ন্সা রগা | মপা মগা রসা |
ক্ষ তি - - - -

তালফের—আড়কাওয়ালির ছন্দ, কিম্বা কার্ফা

```
 +                 •                +                •
{ধ্ সা -া সা | সা -া সা -া | ধ্ সা -া সা | সা -া সা -া | রা -া রা গা |
 কূ - - লে     কূ - লে -     দু - - লে     দু - লে -     বি - লা -

রা রা -া গা | স্রা -া রা -া | গরা গরা গরা সন্ |
ও অ - কূল     আ - লো -       - - - -
```

দাদ্‌রা

```
 +         •          +           •
(সা পা পা | মা গা সা | সা রা রা | রা রা রগা | সা পা ধপা | মা গা -া | গা পা -া ।
 কূ ল ছা    ড়ি না      ন ই লে     যে মো রা     কূ ল ছা     ড়ি না -    অ কূ ল

গপা ধণা ধণধা | পন্ধা পধা ন্ধপা | মা গা মা | রগা মা ধপা | মা মগা রগা | )}
আ  -  লো       নই  -  লে          যে মো রা    কূ ল ছা      ড়ি না -

 +              •
সা -া -া সা | রা -া গা -া | গা -া -া গা | গা মা রগা পমা | রা মা মা -া |
সু - - রে     সু - রে -     নী - ল নূ     পু - রে -        উ - ধা -

-া -া মা মা | গমা পা মপা মমা | -া -া -া -া | গা পা মা -া | গা রা সা ন্ |
- ও শি খা     জ্বা - লো -       - - - -       তা - লে -     তা লে তা লে

সা গা -া রা | গা -া গা পা | মপা মমা মা -া | -া -া -া -া | গা পা মা -া |
ছ ন্ - দ      প্র - দী প     জ্বা - লো -      - - - -       সু - রে -

গা রা সা ন্ | সা গা গা রা | -া গা -া পা | মপা মমা মা -া | -া -া -া -া |
সু রে সু রে   প্রে - মে র    - প্র - দীপ   জ্বা - লো -      - - - -

{সা মা -া মা | মা -া মা গা | পা ন্ধা ধপা ন্ধপা | ন্ধপা -া মা গমা | রা -া রা গা |
 গা - - নে     গা - নে -     উ - ছ -             - ল বা নে        ব - হা -

রা গা -া পা | গপা মা মগা রগা | -া -া (পা -া | ন্ধধা পমা গরা সরা | ধ্ সা রা গা |
ও রূ - পের    গ - তি -          - - ব -        হা - - -             - - - -
```

সা রা গা পা | পা হ্মা ধপা হ্মপা | মা গা মা রগা | পমা -া গা -া |)} -া -া |

- - - -　- - - -　- - - -　- - - -　- -

দাদ্‌রা

\+　০

সা সা রা | রা রগা সরা | রা রা গা | গা গমধা পহ্মাপা | মা মগা রগা | রা -া সরা |

তো মা র　আ শা য়　তো মা র　ভা ষা ০০ য়　জ্বা লা ও　প্রে ম আ

সা ন্‌সা রগা | মপা মগা রসা |

র তি -　- - -

তালফের—তেওরা

\+　২　৩　+　২　৩

ধ্‌া ধ্‌া সা | সা -া | সা -া ॥ ধ্‌া ধ্‌া সা | সা -া | সা -া ॥ রা রা গা | রা -া |

তো মা র　আঁ -　খি র　মি ল ন　ম -　দি র　বি র -　হে -

গা -া ॥ গরা গরা গরা | গরা সন্‌া | ধন্‌া সরা ॥ সা সা -া | রা -া | গা -া ॥ গা -া গা |

মো র　ঢা - লো　- -　- -　তো মা য়　হি -　য়া -　স ব সঁ

গা মা | রগা পমা ॥ রা মা মা | মা -া | মা -া ॥ গমা পধা পধপা | মগা রগা | সরা গমা ॥

পি -　য়া -　চা য় বা　সি -　তে -　ভা - লো　- -　- -

{সা মা মা | মা -া | মা -া ॥ পা হ্মা ধপা | মা-া | গা মা ॥ রা রা গা | রা -া | গা পা ॥

সে ই শি　হ -　রে -　ধা য় সা　গ -　রে -　আ মা র　হি -　য়া র

মা মগা রগা | গা রা | গা পা ॥ মা মগা রগা | -া -া | া -া ॥ (রসা রসা রসা | রা -া |

ন দী -　বি -　ধু র　ন দী -　- -　- -　তো মা র　ব ন্‌

গা মা ॥ রগা রা রা | গা -া | মা পা ॥ পধা পপা মা | গা রা | গপা গপা ॥ মা মগা রগা |

দ নে　ঢে উ চি　র ন্‌　ত নে　ধা ০য় যে　মো র　আ শা　ন দী -

-া -া | -া -া |)} তাল ফের সা সা রা | রা রগা সরা | রা রা গা | গা গমধা পহ্মাপা |

- -　- -　দাদ্‌রা　সী মা -　ত রি -　অ সী ম　ব রি -

মা গরা গা | রা ন্‌া রা | সা ন্‌সা রগা | মপা মগা রসা |

হো ০ক সে　নি - র　ব ধি -　- - -

কয়লার উৎপত্তি ও গঠন

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে যে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাঠ কয়লার নানা প্রকার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ও পুরাকালে যে ধাতুনিষ্কাষণকার্য্য এই কাঠ-কয়লার সাহায্যেই হইত সে বিষয়ে অনেক প্রমাণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বহু পুরাকালের কর্ম্মকার ও ধাতু-শিল্পীগণ পাথুরে কয়লার ব্যবহার করিত কি-না বা পাথুরে কয়লা ভূগর্ভ হইতে খনন ও উদ্ধার করিয়া ধাতুনিষ্কাষণ-কার্য্যে ব্যবহার করিত কি-না সে বিষয়ে যথাযোগ্য প্রমাণ এখনও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে বাংলা ও বিহার প্রদেশের কতকগুলি গ্রামের, যথা—বরাকর, কালিপাহাড়ী, অঙ্গারপাথরা ইত্যাদি নামকরণ হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, ঐ সকল স্থানে পূর্ব্বে কয়লা খনন-কার্য্য হইত। তবে এ বিষয়ে আমরা ইহার অধিক কোনও সঠিক প্রমাণ বা ঐ সকল স্থানে প্রাচীন খনির ধ্বংসাবশেষ বা কোনও চিহ্ন আবিষ্কার করিতে এখনও সক্ষম হই নাই। পুরাকালে যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি ধাতুমিশ্রিত প্রস্তর (ore) ভূগর্ভ হইতে খনন করিয়া উদ্ধার করা হইত ও ঐ সকল প্রস্তর হইতে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ধাতুনিষ্কাষণ ও শোধনকার্য্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইত সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ বা তথ্য আজ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং পুরাকালে ভারতবর্ষে ধাতু প্রস্তরের খননকার্য্য (mining) সে কিছু প্রচলিত ছিল সে বিষয়ও আজ সুপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে আমরা পাহাড়ের স্থানে স্থানে ও বনজঙ্গলের মধ্যে বহু পরিমাণ ধাতুর মল (slag) পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাই। এই জন্যই অনেকের ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে, পুরাকালে গহন বনজঙ্গল হইতে কাঠ কয়লা সংগ্রহ অতি সহজেই হইত বলিয়া কাঠ কয়লাই সম্ভবত সকল ধাতুনিষ্কাষণ চুল্লীতে ব্যবহৃত হইত। এই কারণেই বোধ হয় ভূগর্ভ হইতে পাথুরে কয়লার খনন ও উত্তোলনকার্য্যে কষ্ট স্বীকার করিতে তাহাদের মনোনিবেশ করিবার সেরূপ আবশ্যক হয় নাই।

বিগত ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সময় হইতে পাথুরে কয়লা খননকার্য্যের সূচনা যে বর্দ্ধমান জিলার সীতারামপুরের নিকট আরম্ভ হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ সরকারের দপ্তরে লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত আছে। ঐ সালে জে. সাম্‌নার ও এস্. জি. হিট্‌লী মহোদয়গণ প্রথম পাথুরে কয়লা খননকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য জমির পত্তনি লইবার আবেদন সরকারের দপ্তরে পেশ করেন। ইহা হইতে সাধারণ পাঠকপাঠিকা যেন মনে না করেন যে, এই সময়ের পূর্ব্বে পাথুরে কয়লার অস্তিত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান মোটেই ছিল না। ইহাও সুপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহার অনেক পূর্ব্বেই পাথুরে কয়লার আবিষ্কার হইয়াছে ও ইহার ব্যবহার অনেক স্থানে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গ্রীক দার্শনিক থিওফ্রাষ্টাস খৃষ্ট জন্মের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে পাথুরে কয়লার অস্তিত্বও ইহার দাহগুণ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং চীনদেশের অধিবাসীগণ খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে কয়লার ব্যবহার জানিতেন তাহা আজ অনেকেই স্বীকার করেন।

পূর্ব্বে কয়লা বলিলে সাধারণতঃ কাঠ কয়লাই বুঝাইত; কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত কয়লাকেই বাংলা ভাষায় "পাথুরে কয়লা" বলা হয় ও অন্যান্য দেশে এই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, যথা—ইংরেজী ভাষায় বর্ত্তমানে "Coal" ও পূর্ব্বের বানান "Cole"; ওয়েল্‌স্ বাসীদের ভাষায় "Glo"; কর্নওয়াল অধিবাসীদের কথায় "Kolhan"; আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রচলিত ভাষায় "Gual"; জার্ম্মান ভাষায় "Kohle"; ওলন্দাজ ভাষায় "Kool"; সুইডেনে প্রচলিত ভাষায় "Kol" ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন দেশের কয়লার নামকরণ হইতে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই শব্দের উৎপত্তি বোধ হয় সংস্কৃত শব্দ 'কাল' হইতেই সম্ভব হইয়াছে।

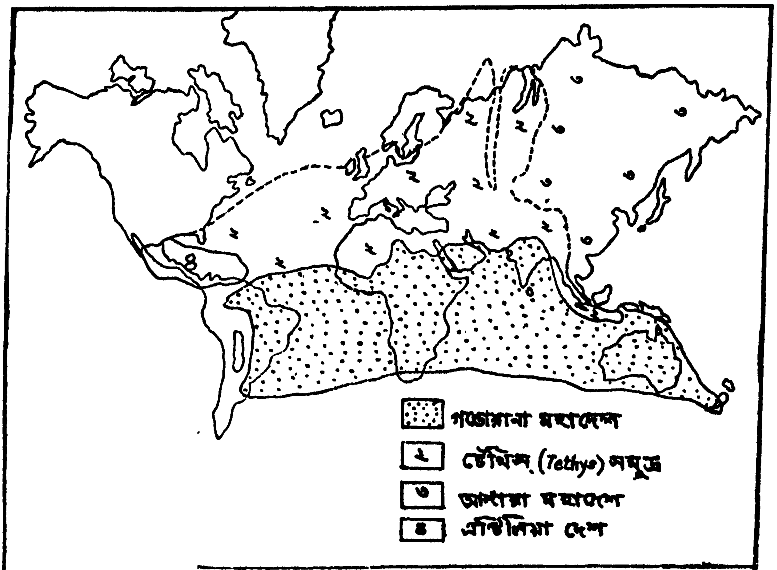
এই পাথুরে কয়লার উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধে কিছু আলোচনার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। পৃথিবীর সৃষ্টির পর ইহার বহিরাবরণ বা ভূপৃষ্ঠে প্রথম জল ও স্থলভাগের সমাবেশ হয় এবং সূর্য্য কিরণের প্রভাবেও বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার অনুকূল অবস্থায় ক্রমশ নানাপ্রকার উদ্ভিদ ও জীবগণের যে উদ্ভব হইতে লাগিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ভূতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর নানাস্থানের প্রাচীন স্তরের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উদ্ভিদরাজি ও জীবগণের ক্রমঃবিকাশের অনেক তথ্যই সংগ্রহ করা হইয়াছে, তবে তাহার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগের বিন্যাস যে প্রাচীনকাল হইতে সমভাবে বিদ্যমান নাই সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ একমত হইয়াছেন। পুরাকালে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির যে যোগাযোগ ছিল তাহাও পণ্ডিতগণ সুপ্রমাণিত করিয়াছেন। কারণ আমরা প্রায় ২০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে গণ্ডোয়ানা যুগে একই জাতীয় উদ্ভিদরাজি হইতে এই সকল দেশের নানাস্থানে কয়লার উৎপত্তি বা জন্ম হইয়াছে দেখিতে পাই। পুরাকালে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম গণ্ডোয়ানা মহাদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ৮।১০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে ঠিক কি ভাবে এই গণ্ডোয়ানা ভূ-ভাগ বিধ্বস্ত হইয়া অন্যান্য মহাদেশগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রথম মতে নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে ও দুর্ঘটনায় বিরাট গণ্ডোয়ানা ভূভাগ স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত হইবার পর ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান মহাদেশের আকার ধারণ করিয়াছে ও যে সকল স্থান ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল তাহাই জলপূর্ণ হইয়া বর্ত্তমান সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। (১নং চিত্র)

দ্বিতীয়তঃ ওয়েগেনার সাহেবের মতে প্রথমে সমস্ত মহাদেশগুলি একত্রে সংলগ্ন ছিল ও পরে ক্রমশ পরস্পর হইতে ধীরে ধীরে পৃথক

হইয়া বর্ত্তমান স্থান অধিকার করিয়া আছে (২নং চিত্র)। এই মতবাদ অনুসারে সুদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যে কোথায় এবং কতদূরে পুনরায় বিক্ষিপ্ত হইবে সে বিষয়ে ওয়েগেনার মহোদয় কোন মত প্রকাশ করিয়া যান নাই।

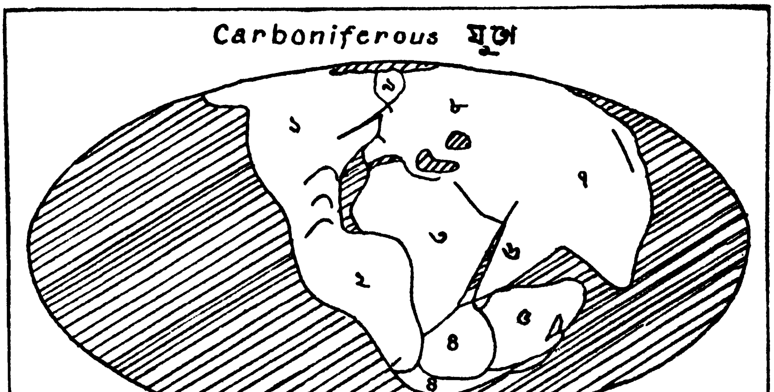
আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে প্রায় ২০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে গণ্ডোয়ানা যুগে ভারতের জল ও স্থলভাগের যেরূপ সমাবেশ ছিল তাহা ৩নং চিত্রে দেখান হইল। এই যুগে ভারতের নানা স্থান কিছুকালের জন্য (Talchir Period) যে বরফাবৃত অবস্থায় ছিল তাহার নিদর্শন আমরা বিহার, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবে কিছু কিছু পাই এবং পরবর্ত্তী যুগে জলবায়ু বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া নাতিশীতোষ্ণ হওয়ার ফলে বহুবিধ উদ্ভিদরাজির যে উদ্ভব হইয়াছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের পলিতে Glossopteris, Gangamopteris, Cordaites, Dadoxylon প্রভৃতি গাছপালার (৪ নং চিত্র) যথেষ্ট ছাপ ও চিহ্ন পাওয়া যায়। ইহার পর পুনরায় আবহাওয়া বিপর্য্যয়ের বা প্রতিকূলের জন্য এই জাতীয় উদ্ভিদরাজির সমূহ বিলোপ হইল এবং কিছুকাল পর উচ্চ গণ্ডোয়ানা যুগে রাজমহল, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে Ptilophyllum, Otozamites প্রভৃতি নানাপ্রকার Conifer জাতীয় উদ্ভিদের উদ্ভব ও পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাই। নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের বনজঙ্গল হইতে এই Glossopteris জাতীয় গাছপালা নদীর স্রোতে ভাসমান হইয়া কোনও জলাশয়ে বা হ্রদে সঞ্চিত ও অচিরে জলমগ্ন হইবার পর তাহার উপর ক্রমশ বালুকা বা কর্দ্দম পলি পড়িতে লাগিল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদরাজি ও বালুকা বা কর্দ্দমাদি বিভিন্ন স্তরের সমাবেশ দেখিতে পাই। ঝরিয়া অঞ্চলে এইরূপে ২২।২৪টী ও রাণীগঞ্জ কয়লার খনিতে প্রায় ২০।২২টী বিভিন্ন কয়লা স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল গাছপালার ধ্বংসাবশেষ চাপ ও উত্তাপের ফলে এবং নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমশ পাথুরে কয়লায় পরিণত হইয়াছে। গাছপালার বিভিন্ন অংশের প্রাচুর্য্যের উপর এবং চাপ, উত্তাপ ও



১ নং চিত্র প্রাচীনকালে জল ও স্থলভাগের সমাবেশ
(২৫ কোটী বৎসর পূর্ব্বে)

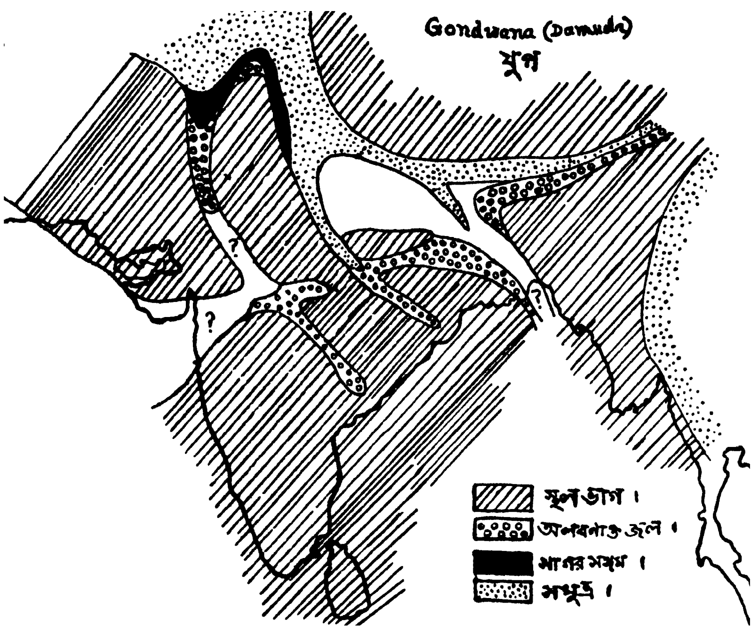
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন মাত্রার উপর নানা শ্রেণীর কয়লার পরিণতি নির্ভর করিতেছে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত।



২নং চিত্র

১—উত্তর আমেরিকা ৪—এণ্টার্কটিকা ৭—উত্তর এসিয়া
২—দক্ষিণ " ৫—অষ্ট্রেলিয়া ৮—ইউরোপ
৩—আফ্রিকা ৬—ভারতবর্ষ ৯—গ্রীনল্যাণ্ড

উদ্ভিদরাজি অল্পাধিক রূপান্তরিত হইলে পীট (Peat) এবং ক্রমশ লিগ্‌নাইট ও ব্রাউন কয়লায় পরিণত হয়। বিভিন্ন অবস্থায় এবং অধিক চাপ ও উত্তাপের ফলে উদ্বায়ী ধূম ক্রমশ অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়ায় যথাক্রমে বিটুমিনাস ও এনথ্রাসাইট্‌ কয়লার উৎপত্তি হয়। উদ্বায়ী ধূম



৩নং চিত্র (২০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে)

সম্পূর্ণরূপে নির্গত হওয়ার ফলে সময় সময় গ্রাফাইট্‌ জাতীয় পদার্থে পরিণত হইতে দেখা যায়। তবে একই প্রকার অবস্থার অনুকূলে যে পীট ও



৪নং চিত্র (গণ্ডোয়ানা যুগের উদ্ভিদ্‌রাজি)

বিটুমিনাস কয়লার উৎপত্তি সম্ভবপর হয় নাই তাহা পরে আলোচিত হইবে।

বর্ত্তমানে ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি, বোকারো, কাবানপুরা, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার নানা স্থানে এবং নিজাম রাজ্যের সিঙ্গারাণী প্রভৃতি স্থানে প্রায় ২০ কোটী বৎসর পূর্ব্বের নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের স্তরের মধ্যে আমরা বিটুমিনাস কয়লা পাইয়া থাকি। এই সকল স্থানে স্থলজাত উদ্ভিদরাজি স্রোত দ্বারা চালিত হইয়া নদী বা হ্রদের পরিষ্কার ও অলবণাক্ত গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া যে বিটুমিনাস কয়লায় পরিণত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাই।

প্রায় ছয় কোটী বৎসর পূর্ব্বে Tertiary যুগের Eocene সময়ে Angiosperm জাতীয় উদ্ভিদরাজি হইতেও ভারতের নানা স্থানে, যথা—আসামের উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে, গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তি পাহাড়ের স্থানে স্থানে, পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান ও কাশ্মীর অঞ্চলে এবং রাজপুতানার বিকানীর রাজ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার উৎপত্তি দেখিতে পাই। ব্রহ্মদেশে ও নানা স্থানে Tertiary যুগের লিগ্‌নাইট কয়লা পাওয়া যায়। কাশ্মীর প্রদেশের জাম্মু প্রভৃতি অঞ্চল ব্যতিরেকে সকল স্থানেই লিগ্‌নাইট কয়লা পাওয়া যায়। তবে এই সকল স্থানের মধ্যে বিকানীর রাজ্যে পালানায় নিম্নশ্রেণীর লিগ্‌নাইট দৃষ্ট হয়। এই সকল স্থানের ভূতত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থলজাত উদ্ভিদরাজি স্রোত দ্বারা চালিত হইয়া নদীর মোহানা বা সাগরসঙ্গমে আবদ্ধ লবণাক্ত উপহ্রদ বা লেগুনে (Lagoon) জলমগ্ন হইয়া পলি দ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থায় কেবলমাত্র লিগ্‌নাইট কয়লায় পরিণত হইয়াছে। তবে এই যুগের বিভিন্ন সময়ে হিমালয় পর্ব্বতের অভ্যুত্থানকালীন অসাধারণ চাপের প্রভাবে কাশ্মীর ও জাম্মুর লিগ্‌নাইট কয়লা পিষ্ট হইয়া এনথ্রাসাইট কয়লায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কারণে ইহাতে উদ্বায়ী ধূম শতকরা মাত্র ১০।১২ ভাগ, কিন্তু পালানা, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানের লিগ্‌নাইট কয়লায় শতকরা ৩০।৪০ ভাগ বর্ত্তমান।

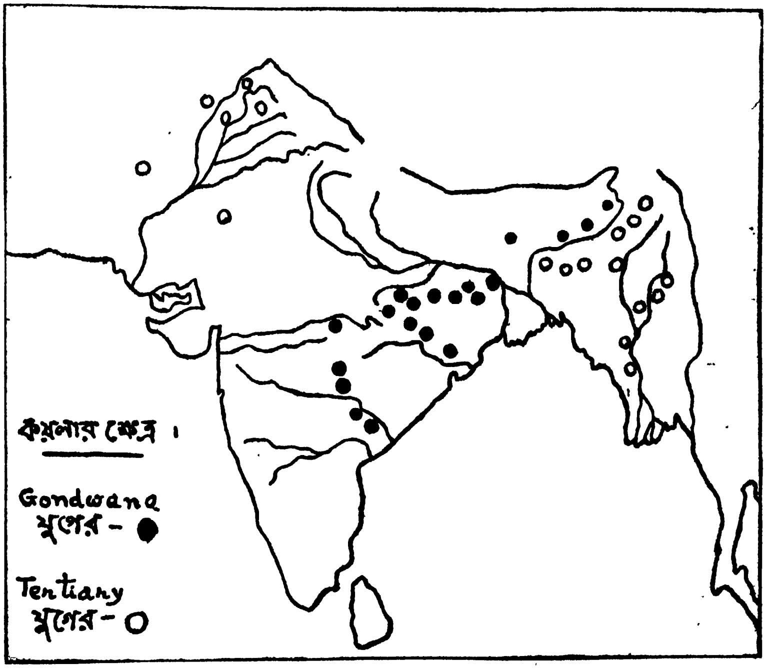
উত্তর বঙ্গের দার্জ্জিলিং, কালিম্পং, জয়ন্তি প্রভৃতি অঞ্চলের গণ্ডোয়ানা যুগের বিটুমিনাস কয়লাও এই হিমালয় সৃষ্টি বা উচ্ছ্বাসকালীন চাপের ফলে উদ্বায়ী ধূম বহির্গত হইয়া এনথ্রাসাইট কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সকল স্থানের কয়লায় উদ্বায়ী ধূম শতকরা মাত্র ৮।১০ ভাগ পাওয়া যায়। ভারতের Gondwana ও Tertiary যুগের কয়লাক্ষেত্রগুলি ৫নং চিত্রে দেখান হইল।

আর্দ্র বা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও স্রোতবিহীন আবদ্ধ জলাশয়ে বা লেগুনের অনতিগভীর জলে পীটজাতীয় কয়লার উৎপত্তি যে বিশেষ অনুকূল তাহা একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে এবং এই জলাময় বিলের

অগভীর জলে কিছু বায়ু বা অক্সিজেন-এর সংমিশ্রণ থাকে বলিয়া উদ্ভিদাদি সহজে উচ্চশ্রেণীর কয়লায় পরিণত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থার অনুকূলে বিটুমিনাস কয়লার সৃষ্টি যে বিশেষ সুবিধাজনক নহে তাহাও পণ্ডিতগণ অনেক অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন। এই পীটজাতীয় কয়লার সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা এস্থলে অবান্তর হইবে না। ভারতবর্ষের মধ্যে দুই স্থানে, যথা—কলিকাতা ও সুন্দরবন অঞ্চলে এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্ব্বতের উপর পীটজাতীয় কয়লার অস্তিত্ব ও প্রাদুর্ভাব বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই। নীলগিরি পর্ব্বতে ৬০০০ ফিট উচ্চে অনতিগভীর ও আবদ্ধ জলাময় বিলে (Peat bog) নানারূপ শৈবাল ও তৃণজাতীয় উদ্ভিদের পচন ও পরিবর্ত্তনের ফলে ক্রমশ পীট হইতেছে দেখিতে পাই। এই জলাশয়ের আবদ্ধ বা স্রোতহীন জলে গাছপালা পচিতে থাকিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে নানারূপ উদ্ভিদজাত humic ও ulmic এসিড-এর সৃষ্টি হয় এবং এই সকল জৈব এসিড ও কিছু বায়ু বা অক্সিজেন মিশ্রিত জল গাছপালার দ্রুত পরিবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিতে থাকে। এই হেতু উদ্ভিদাদির দ্রুত পচনের পরিবর্ত্তে অতি ধীরে ধীরে কেবলমাত্র পীটজাতীয় কয়লায় পরিণতি সম্ভবপর হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থার প্রভাবে থাকাকালীন জলমগ্ন উদ্ভিদরাজি যে উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস কয়লায় পরিণত হইবে না সে বিষয়ে আজ সকলেই একমত। উদ্ভিদরাজি ক্রমশ পীট বা অন্যান্য শ্রেণীর কয়লায় রূপান্তরিত হইবার প্রারম্ভে ব্যাক্টেরিয়া প্রভৃতি জীবাণুর প্রভাব কখনও কখনও কিয়ৎ-পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও ইহা যে বিশেষ কার্য্যকরী বা ফলপ্রদ হয় নাই এরূপ মত বর্ত্তমানে প্রায় সকল পণ্ডিতই পোষণ করেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে নীলগিরি পীটে শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদের প্রাচুর্য্য দেখা যায়; তৎব্যতীত গুল্ম ও তৃণ প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। নীলগিরির জলাময় বিলেই উৎপন্ন এই সকল উদ্ভিদ পচিয়া যে পীট হইতেছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে আবদ্ধ জলাভূমিতে সুন্দরী প্রভৃতি গাছপালা পচিয়া অতি ধীরে ধীরে পীটজাতীয় কয়লায় রূপান্তরিত হইতেছে ও হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে এ প্রদেশের গাছপালা নীলগিরির উদ্ভিদরাজি হইতে ভিন্নজাতীয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ২০ হইতে ৩০ ফুট নীচে পীটজাতীয় কয়লার এক ফুট একটা বা কখন কখনও দুইটা স্তর দেখা যায়। চীৎপুর লকগেট প্রস্তুত সময়ে ঢাকুরিয়া লেক বা বড় বড় পুষ্করিণী খনন কালে বিভিন্ন স্থানে বালুকা ও কর্দ্দম স্তরের মধ্যে এই পীট স্তর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ পরীক্ষার ফলে এই পীট স্তরে শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের চিহ্ন অতি যৎসামান্য পাওয়া গেলেও সুন্দরী গাছের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। দেবদারু ও ঘাসজাতীয় তৃণাদি, ডুমুর জাতীয় উদ্ভিদের পাতাও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত মাখনা (Euryale ferox) জাতীয় বৃক্ষের বীজও পাওয়া গিয়াছে। এই শেষোল্লিখিত মাখনার বীজ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাওয়া যায় নাই, তবে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে পীট, লিগ্‌নাইট্ ও অপরাপর উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস কয়লার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া



৫নং চিত্র

গিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়া কেবল দু-এক কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ক্ষারজাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণ ও তৎসংক্রান্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদাদির অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অবিকৃত অবস্থায় পীট হইতে পৃথক করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু লিগ্‌নাইট্ পদার্থে কখনও কখনও অতি সামান্য পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেও অপরাপর উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস বা এনথ্রাসাইট কয়লা হইতে এরূপ কোন চিহ্নই বিশেষ পাওয়া যায় না। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, পীটে জলীয়ভাগ অতি অধিক মাত্রায় এবং লিগ্‌নাইট ও অন্যান্য কয়লায় অল্প হইতে অল্পতর পরিমাণে থাকে, কিন্তু অঙ্গার ভাগ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। লিগ্‌নাইট সাধারণত বাদামী বা পিঙ্গল বর্ণের, তবে একজাতীয় অতি

উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণের দেখিতে পাওয়া গেলেও চূর্ণীকৃত অবস্থায় ইহা ঘন বাদামী রং ধারণ করে। এই কৃষ্ণবর্ণ লিগ্‌নাইট ও বিটুমিনাস কয়লার



৬ নং চিত্র

মধ্যে রাসায়নিক গুণাবলীর অবশ্য আরও অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সাধারণত প্রাচীন স্তরের কয়লাই অধিকতর সুপরিণত হইয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং অতি আধুনিক যুগের স্তরের মধ্যে কেবলমাত্র পীট বা লিগ্‌নাইট-এর উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এ নিয়মেরও যে ব্যতিক্রম ঘটে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা ভারতের অনেক স্থানেই পাই এবং এ বিষয়ে পূর্ব্বেই কিছু বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্ভিদাদির ও জলাশয়ের অবস্থাবিশেষে এবং উত্তাপ ও চাপের মাত্রাধিক্যে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এই সকল পরিস্থিতির উপর উদ্ভিদাদির পরিবর্ত্তনের মাত্রা ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কয়লার উৎপত্তি বিশেষভাবে নির্ভর করে। উদ্ভিদাদি পদার্থের যখন জলের মধ্যে পচন আরম্ভ হয় তখন নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে carbon ও hydrogen কিছু oxygen-এর সহিত মিলিত হইতে থাকে। Carbon বা অঙ্গার যে গতিতে oxygen-এর সহিত মিশ্রিত হয় তাহা অপেক্ষা hydrogen অধিকতর দ্রুত সংযুক্ত হইয়া বাষ্পাকারে অপসারিত হইতে থাকে। এই কারণে জলমগ্ন পচনশীল উদ্ভিদ হইতে oxygen ও hydrogen অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গারের ভাগ ক্রমশ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং এইরূপে ক্রমান্বয়ে অধিক অঙ্গারযুক্ত উচ্চ শ্রেণীর কয়লায় পরিণতি ঘটিতে থাকে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বিশেষ কি কি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ প্রকৃত কিরূপ ভাবে ক্রমশ কয়লায় পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে সে তথ্য আজও পণ্ডিতগণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

গণ্ডোয়ানা যুগে উৎপন্ন এই শেষোল্লিখিত বিটুমিনাস কয়লা বর্ত্তমানে ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কয়লা বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে ইহাতে অনেকগুলি উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ স্তরের বিন্যাস দেখিতে পাই। এই বিভিন্ন স্তরের বা কয়লাবিশেষের নাম যথাক্রমে ভিট্রেন (Vitrain), ক্লারেন (Clarain), ডিউরেন (Durain) ও ফিউসেন (Fusain) দেওয়া হইয়াছে। ভিট্রেন ও ক্ল্যারেন উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ, ডিউরেন নিষ্প্রভ, ফিউসেন কাঠকয়লার ন্যায়। এই স্তরগুলি সাধারণত অর্দ্ধ বা এক ইঞ্চি পুরু হইয়া থাকে তবে কখন কখনও রাণীগঞ্জ কয়লার মধ্যে দুই ইঞ্চি চওড়া ভিট্রেনও দেখা গিয়াছে। এই প্রকার উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ স্তরের গুণাগুণ একই প্রকার না হওয়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন কয়লার মধ্যে এই সকল স্তরের অনুপাত বিভিন্ন পরিমাণ হওয়ায় বিভিন্ন কয়লার গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ভিট্রেন, ডিউরেন ও ফিউসেন সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ফিউসেন পদার্থ পাথুরে কয়লার মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে ও ইহা দেখিতে কাঠকয়লার ন্যায় এবং স্পর্শ করিলেই সূচীর আকারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে ও হাত অত্যন্ত মলিন হয়। তালচীর, রামপুর ও রাজমহলের স্থানে স্থানে কয়লার মধ্যে ফিউসেন-এর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহা অতিশয় হালকা ও চূর্ণীকৃত অবস্থায় সহজেই বাতাসে বহুক্ষণ ভাসমান থাকিতে পারে।

ফিউসেন যে কাষ্ঠের কঠিন অংশ (wood sclerenchyma) হইতে উৎপন্ন তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা কাঠকয়লার মত দেখিতে বলিয়াই বোধ হয় অতীত যুগের বনজঙ্গল দহনের বা দাবানলের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ ভ্রান্ত মত প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ প্রচার করিতেন।

উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ স্তরের স্বচ্ছ ফালি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে উদ্ভিদের কিছু না কিছু চিহ্ন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই বিভিন্ন



৭ নং চিত্র

স্তর দেখিতে ঘন কৃষ্ণ বর্ণ হইলেও ইহাদের স্বচ্ছ ফালি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। ভিট্রেন অতি স্বচ্ছ ফালি অবস্থায় রক্তবর্ণাভ বা

সোনালী। ইহাতে উদ্ভিদের চিহ্ন অতি অল্পই লক্ষিত হয়। ক্ল্যারেণ স্তর সর্ব্ববিষয়ে ভিট্রেন এর ন্যায় হইলেও ইহার মধ্যে উদ্ভিদের চিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ভারতের কয়লার মধ্যে ক্ল্যারেণ স্তর দু এক স্থান ব্যতীত বিশেষ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ডিউরেন বা নিষ্প্রভ স্তর ভিট্রেন অপেক্ষা কঠিন এবং ইঁহা স্পর্শ করিলে হাত কিছু মলিন হয়। ডিউরেনএর স্বচ্ছফালি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ দেখা গেলেও ইহার মধ্যে রক্ত বা হরিদ্রা বর্ণের উদ্ভিদাংশের যথেষ্ট সংমিশ্রণ দেখা যায়। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে ইহাদের মধ্যে উদ্ভিদের বীজ, রেণু, উপত্বক প্রভৃতি নানা অংশ ও রক্তবর্ণাভ বৃক্ষনির্য্যাস রজন পদার্থ স্থানে স্থানে অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ডিউরেন যে ভিট্রেন ও কিছু কর্দ্দমাদি পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত সে ধারণা বর্ত্তমানে অনেকেই পোষণ করেন। ফিউসেন ফালি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সর্ব্বসময়েই কৃষ্ণবর্ণ অবস্থায় দেখা যায় ও ইহার মধ্যে উদ্ভিদরাজির ধ্বংসাবশেষ অনেক পরিমাণে থাকে, যথা কাষ্ঠের কঠিনাংশ ও তন্নিহিত জলবাহী নালী ইত্যাদি (৬ ও ৭ নং চিত্র)।

রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে এইসকল উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ স্তরের গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে এবং ইহাদের মধ্যে ভিট্রেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন। এ সকল বিষয়ে সবিশেষ তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে পাথুরে কয়লা বলিলে কেবল একরূপ বা সমজাতিক (homogeneous) পদার্থ বুঝায় না। ভিট্রেন, ডিউরেন ও ফিউসেন প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি মাত্র এবং উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ স্তরবহুল। পাথুরে কয়লা সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানিতে হইলে উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ স্তরগুলির পরিমাণ ও তাহাদের গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ করিতে হইবে। এ বিষয়ে খনিবিশেষজ্ঞ ও পরিচালকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে ও বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে ভারতের কয়লা সম্পদের আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার হইবে ও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

জন্মদিন

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

আজি মোর জন্মদিন ; বক্ষ আজি কাঁপে দুরু দুরু।
দুঃখময় জীবনের আরো এক বর্ষ হোল সুরু।
শ্রাবণের ঘনঘোর সূচীভেদ্য অমানিশা প্রায়
এ-মোর জীবন-গ্রন্থে সুরু হোল আরেক অধ্যায়।
জন্মদিন—জন্মদিন ! উৎসবেতে পূর্ণ গৃহ আজি।
আসিছে পিষিতে বক্ষ নব দুঃখ নব-বেশে সাজি'।
সাগরে রচিত শয্যা আজীবন চির-অভাগার ;
একবিন্দু শিশিরেতে কি আর হইবে বল তা'র !
পুরাতন বর্ষ সাথে যোগ দাও হে নব-বরষ।
মুমূর্ষেরে—এস বন্ধু—দাও তব কঠোর পরশ।
আজিকার এ উৎসবে এস সখা—এস তুমি রুখে।
জেলে দাও অগ্নিশিখা শুষ্ক এই সাহারার বুকে।
উৎসবের আলো তাহে শতগুণে হইবে উজ্জ্বল।
আজিকার শুভদিনে বক্ষে মোর জ্বাল হোমানল।

অতুল বিভব মাঝে নাহি জানি কোন্ শুভক্ষণে
প্রথম জনমদিন দেখা দিল আমার জীবনে।
তারপর একে একে কেটে গেল ষা'ট জন্মতিথি।
অভিশপ্ত জীবনের ভুঞ্জিতেছি শাস্তি নিতি নিতি।
নাহি জানি কোন্ 'শনি' তুঙ্গ হোয়ে 'অষ্টমে' পশিয়া
জীবনের পাকা ঘুঁটি একেবারে দিল কাঁচাইয়া !

একটি একটি করি মনে পড়ে আজি কত কথা—
ঘরে-পরে অত্যাচার, হিংসা-দ্বেষ, আঘাতের ব্যথা।
তাপ-দগ্ধ দেহে এবে ব'সে আছি এ পারের ঘাটে।
প্রাণান্ত যন্ত্রণা মাঝে একে-একে দিনগুলি কাটে।
ঝড়-ঝঞ্ঝা, শীতাতপ, বরষার বারিধারা কত
দলিছে দহিছে মোরে জর্জ্জরিত করিছে নিয়ত !
তারি মাঝে আসিতেছে বিধাতার রুদ্র পরিহাস—
উৎসবের মায়ারূপে আসে বহি' বিষাক্ত সুবাস।
তবু যে গো জন্মদিন !—পট্টবস্ত্রে সাজিয়াছি আজ।
দুঃখের রাজত্বে আজি অভিশপ্ত আমি নলরাজ !
কে কোথা পরমাত্মীয় আছ বন্ধু, আছ গো বান্ধবী,
মহোৎসবে মত্ত আজি দেখ এসে তোমাদের কবি।
আনো সবে নব-বস্ত্র, নব শয্যা, অগুরু চন্দন।
সবাকার প্রেম দিয়া বাঁধ আজি শেষের বন্ধন।
তোল সবে মহা-ধ্বনি, যেন তাহা উর্দ্ধপথে ওঠে।
নিষ্পেষিত ফুলদল নবরূপে যেন পুনঃ ফোটে।
আজি এ উৎসবে যদি দুই ফোঁটা ফেল আঁখিজল,
'শান্তিজল'রূপে তাহা হ'বে মোর পথের সম্বল।
চারিপাশে ঘিরি' মোরে প্রার্থনা করহ বার বার—
জন্মদিনে আজি মোর খুলে যাক মৃত্যুর দুয়ার।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষাল এম-এ, পি-এচ-ডি

দেখিতে দেখিতে বিলাত প্রবাসের প্রায় দুই বৎসর শেষ হইতে চলিল। ঠিক 'দেখিতে দেখিতেও' বলিতে পারি না। প্রথম বৎসরে এবং দ্বিতীয় বৎসরেরও অনেকদিন ধরিয়াই মনে হইত—সময় যেন সরে না, আমার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে। কোন দিন যে প্রারব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিতে পারিব এ আশাও সুদূর-পরাহত মনে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যেও যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে সময়ে সময়ে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের দিবাস্বপ্ন দেখিতাম, কেননা দেখিতে ভাল লাগিত। একনিমেষে চলচ্চিত্রের পর্য্যায়ের মতই প্যাসেজ বুক করা হইতে গাড়ী চড়া, জাহাজে ওঠা, নানা বন্দরে আসা, বোম্বাইএ অবতরণ করা—এমন কি হাওড়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত খুঁটিনাটি সমস্তই মনের মধ্যে খেলিয়া যাইত। জানি না এই যে দেশের জন্য মন-কেমন-করা—এটা আমারই নিজস্ব দুর্ব্বলতা অথবা 'ঘরমুখো' বাঙ্গালীদেরই তথা ন্যূনাধিক সকল মানুষেরই বিশেষত্ব কিনা। তবে দেশের মাটীর সঙ্গে যে আমাদের কতটা নাড়ীর টান আছে সেটা এখানে আসার পূর্ব্বে কখনও এমনভাবে উপলব্ধি করি নাই। যাহা হউক শেষের দিকে যেন অপ্রত্যাশিত দ্রুতভাবেই যাবার দিন নিকট হইয়া আসিল। দুইমাস পূর্ব্বেও ভাবিতে পারি নাই এতশীঘ্র সব কায মিটাইয়া যাত্রার আয়োজন করিতে পারিব। মনে হইল যেন কোন অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় আমার কাযের গতির মাত্রা (tempo) হঠাৎ বর্দ্ধিত হইল। একদিন সত্য সত্যই এখানকার কায সমাপ্ত করিয়া পরীক্ষকদের হাতে ও ভগবানের উদ্দেশে ফলের ভার ন্যস্ত করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার আয়োজনে মনঃসংযোগ করিলাম। এখন কিন্তু সময় যেন অত্যন্ত হাল্কা হইয়া অতি ক্ষিপ্রগতিতে চলিতে সুরু করিয়াছে। এও কি আয়েনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদেরই প্রমাণ? তবে এটুকু বুঝি, আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির অনেকখানিই মনের রচনা। অনেক-ক্ষেত্রেই মনের ক্রিয়া আমাদের বাস্তব পরিবেশের চেয়ে বেশী। এটা আরও স্পষ্ট বুঝিলাম আশু প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনায় আমার মনোভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে। আজ মন পূর্ব্বের মতই বাড়ীমুখো, কিন্তু পূর্ব্বে দেশে ফিরিবার স্বপ্নের মধ্যেও যে একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা বোধ করিতাম আজ যেন সেটা নাই। এখন দেশে ফেরাটা এবং তার জন্য উৎকণ্ঠা ও আয়োজন, সব যেন দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ ঘটনার মতই লাগিতেছে। বিলাতের জীবন মোটেই ভাল লাগিতেছে না, পূর্ব্বেও যে লাগিয়াছে এমনও নয়। অথচ দেশে ফিরিবার আসন্ন সম্ভাবনায়ও উৎসাহের আতিশয্য বোধ করিলাম না। কেমন যেন একটা বেসুরো ভাব অনুভব করিতেছি, যেন কিছু হারাইয়া গিয়াছে। অথচ গলদ কোথায় তা যথেষ্ট আত্মবিশ্লেষণের দ্বারাও খুঁজিয়া পাই না। হয়তো সেই সময়কার স্বাস্থ্যভঙ্গ কতকটা দায়ী হইতে পারে, কিম্বা আশপাশে যে প্রলয়লীলা চলিতেছে এবং তার সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে যে একটা অনিশ্চয়তা আসিয়াছে সেটাও একটা কারণ হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত কারণ সব-কিছু মিলাইয়া একটা বিস্বাদ মনোভাবের সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়।

যাহাই হউক, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে যতটা সম্ভব দ্রুত যাত্রার আয়োজন সুরু করিলাম। অতিকষ্টে জাপানী জাহাজ "হারুসা মারু"র তৃতীয় শ্রেণীতে একটা স্থান সংগ্রহ করা গেল। জাহাজ প্রথম ছাড়িবার কথা ছিল ১৩ই জুন, পরে স্থির হইল ২০শে জুন এবং যাত্রার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে খবর পাওয়া গেল ২১শে জুন জাহাজ লিভারপুল হইতে ছাড়িবে। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি যেরূপ অপ্রত্যাশিত দ্রুতভাবে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল তাহাতে বেশ একটু আশঙ্কা হইল যে হয়তো বা ইংলণ্ড আক্রমণ তার পূর্ব্বেও হইতে পারে এবং তাহা হইলে যুদ্ধাবসানের পূর্ব্বে ফেরা হয় তো সম্ভব হইবে না। কিন্তু মানুষের মনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের এমনই শক্তি আছে যে ইহাতেও আতঙ্কগ্রস্ত হই নাই। যুদ্ধ যখন সুরু হয় হয় তখন সেই অনাগত সঙ্কটের নানারূপ বিভীষিকা মনে রচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু মন আপনা হইতেই এমন

তৈরী হইয়া গিয়াছে•যে ইংলণ্ডের কূলে জার্ম্মাণ সৈন্ত অবতরণ করিয়াছে শুনিলেও বা চোখের সম্মুখে বিমান-হানা হইলেও আতঙ্কিত হইব বলিয়া মনে হয় না। অনাগত বিপদকে আমরা সব সময়েই বড় করিয়া দেখি; কিন্তু বিপদ যখন আমাদের দুয়ারে হানা দেয় তখন তাহার বাস্তব মূর্ত্তি দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে তার সম্মুখীন হইবার সাহসও আপনি আসে। যাক—এতদিন অবসর এতই মহার্ঘ ছিল যে তাহার অভাব অহরহ অনুভব করিতাম, সেই অবকাশের এখন এতই প্রাচুর্য্য হইল যে কি করিয়া তাহা কাটাইব বুঝিতে পারি না। তাহার উপর মুস্কিল এই যে নিষ্প্রদীপের জন্ম এবং অনেক দ্রষ্টব্যস্থানে গতিবিধি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সেগুলি পূর্ব্বে সময়াভাবে দেখিতে পারি নাই এখন যে দেখিয়া অবসর বিনোদন করিব তারও সুযোগ-সম্ভাবনা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তবুও যতটুকু সম্ভবপর, তাহারই পূর্ণ সদ্ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু কতিপয় বন্ধুর সংসর্গে আলাপ আলোচনায় অথবা যাত্রার আয়োজনে সঁপিয়া দিলাম। শেষোক্ত ব্যাপারেও খুব অল্প সময় লাগে নাই, যুদ্ধের জন্ম বহির্গামী যাত্রীদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি-বিধান জারি হইয়াছে—যথা বিশেষ ছাড়পত্র নেওয়া, অনুগামী বই কাগজ পত্রাদির পরীক্ষা, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অধিক সঙ্গে লইবার বিশেষ অনুমতি লওয়া ইত্যাদি। যাত্রার প্রায় আট নয়দিন পূর্ব্বেই লিভারপুল যাওয়া স্থির করিলাম। লণ্ডনে আর বিশেষ কোন কাযও নাই, দেখিবারও যা ছিল প্রায় শেষ করিয়াছি। তাই ভাবিলাম কয়টা দিন একটা নতুন যায়গায় থাকিলে হয়তো ভাল লাগিবে। ১২ই জুন প্রাতে ভিক্টোরিয়া মোটর কোচ ষ্টেসন হইতে কোচে লিভারপুল রওনা হইলাম। লিভারপুল কোচে দশ ঘণ্টার পথ। এতদিন পরে লণ্ডন হইতে হয়তো শেষ বিদায় লইলাম। লণ্ডন-জীবনের ভালমন্দ সুখদুঃখে বিজড়িত নানা স্মৃতি একবার মনের মধ্যে জাগিল। ইংলণ্ডের অনেকগুলি কাউন্টি অতিক্রম করিলাম। বিলাতের পল্লী অঞ্চলে বসন্তের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর একবার উপভোগ করিলাম। গতবৎসর ঠিক এই সময় কয়েকজন ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড পর্য্যন্ত মোটরে ভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আজ আবার মোটরে পল্লী অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সেই কয়দিনের মধুর স্মৃতি মনে আসিল। কিন্তু আজ আমি একা—সঙ্গী সবই ওদেশীয়, কাহারও সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করা এদেশের রীতিবিরুদ্ধ। কাযেই নিজের মনের ভাব রোমন্থন করা ভিন্ন উপায় নাই। পথে অক্সফোর্ড ও মহাকবি সেক্সপিয়রের লীলাভূমি 'ষ্ট্রাট্ফোর্ড অন্ এভন' দ্বিতীয়বার দেখিবার সৌভাগ্য হইল। লিভারপুল পৌছিলাম বিকাল প্রায় ৮টায়—বিকাল বলিতেছি কেননা তখনও অনেক বেলা আছে, এসময় বিলাতে সূর্য্যাস্ত হয় প্রায় ৯।০টায়। ষ্টেশনের নিকটেই একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম। লিভারপুলে যে আট নয় দিন ছিলাম একেবারে নিঃসঙ্গভাবে নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে জীবন কাটাইতে হইল। এখানে এক নিম্ন-শ্রেণীর লস্কর ছাড়া অন্য ভারতীয় চোখে পড়ে নাই। সহরের একটা মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা দেখিয়া ও লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া পার্ক, বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, লাইব্রেরী, ডক প্রভৃতি দ্রষ্টব্যস্থান দেখিয়া কোন রকমে সময় কাটিতে লাগিল। লিভারপুল-বাসের এই কয়টা দিনের মধ্যে একটা সন্ধ্যার কথা বিশেষ করিয়া মনে থাকিবে। একটি ছোট ভদ্র-পরিবারের সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচয় হইয়াছিল। সংক্ষেপে ইঁহাদের কথা বলিতেছি। সেদিন রবিবার। রেঁস্তোরায় মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছি। ম্যাপে একটি বড় পার্কের সন্ধান মিলিয়াছে, সেখানেই যাবার ইচ্ছা। কিন্তু কোন্দিক দিয়া বা কি ভাবে যাইলে সুবিধা হইবে ঠিক করিতে পারিতেছি না; এমন সময় একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোককে ফুটপাথে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্রলোক বিশেষ উৎসাহের সহিত আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। আমাকে নির্দ্দিষ্ট ট্রামে তুলিয়া দিবার জন্য আমার সঙ্গে কতকটা পথ চলিলেন। পথে নানাবিষয়ে আলাপও হইল। বিদায় লইবার সময় অনুরোধ করিলেন—একদিন সন্ধ্যায় যেন ভদ্রলোকের বাড়ী যাই ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত আলাপ করি। নির্দ্দিষ্ট দিনে সান্ধ্যভোজনের পর তাঁর গৃহে উপস্থিত হইলাম। দরজায় ঘণ্টা বাজাইতেই ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া আমাকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। তাঁর স্ত্রী, একটি এগার বার বৎসরের মেয়ে ও ছোট ছোট দুটী ছেলে—সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সকলেই বেশ সহৃদয়তার সহিত আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিলেন। ছেলেমেয়ে-

গুলির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের অন্ত নাই। পরিবারটী বেশ ভদ্র ও মার্জ্জিত রুচির। ভদ্রলোকের মুদ্রাসংগ্রহের একটা বাতিক আছে। তাঁর মুদ্রার সংগ্রহ দেখাইলেন। তাঁর বইএর সংগ্রহও দেখিলাম। একজন ব্যবসায়জীবীর পক্ষে নিতান্ত নগণ্য নয়। মেয়েটী তাহার ছবি ও অটোগ্রাফের এলবাম দেখাইল। তাঁর নিজের আঁকা কয়েকটা ছবি বেশ ভালই লাগিল। অটোগ্রাফ এলবামে লিভারপুলে নানা দেশীয় আগন্তুকের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছে। তার মধ্যে একজন বাঙ্গালী মহিলারও লেখা দেখিলাম। মেয়েটী আমার কাছে দু একছত্র বাংলা ও স্বাক্ষর চাহিল। বিমুখ করিতে পারিলাম না। হয়তো লিভারপুলের সঙ্গে এইটাই আমার একমাত্র যোগসূত্র থাকিয়া যাইবে। তারপর ভদ্রলোকের গৃহিণী মিসেস্ এমসন্ বলিলেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে নৈশভোজনে যোগ দিলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। অতি সাদাসিদা ধরণের আয়োজন, কিছু ফল,মিষ্টান্ন ও পানীয়,কিন্তু বেশ পরিপাটী। এমসন্ গৃহিণী বলিলেন, টেবিলে যে টেবলক্লথখানি পাতা আছে সেখানি ভারতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের, এক প্রদর্শনীতে কেনা। নৈশ ভোজনের সময় ভারতীয় খাওয়া দাওয়া, আচার পদ্ধতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলাপ হইল। ছেলেমেয়েদের কৌতূহলের অন্ত নাই। একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম; কয়েক মিনিটের আলাপেই তাহারা এমন সহজ ও সপ্রতিভভাবে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিল যেন আমাদের কত দিনের পরিচয়! তাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন আড়ষ্টভাব নাই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের খুব কমক্ষেত্রেই কোন আগন্তুকের সহিত প্রথম পরিচয়ে এমন সহজভাবে আলাপ করিতে দেখিয়াছি। নৈশভোজনের পর আমরা আবার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। এমসন্ গৃহিণী, তাঁর মেয়ে ও ছোট ছেলেটী পিয়ানো বাজাইয়া গান গাইয়া শুনাইলেন। প্রায় ১০টা বাজিল তখন বিদায় লইলাম। ফিরিবার পথে এই প্রশ্নই বার বার মনে জাগিল, ভারতে যে সব ইংরেজ কর্ম্ম বা ব্যবসায় উপলক্ষে যান তাঁদের অনেকেই হয়ত এই এমসন পরিবারের মতই অনেক পরিবার হইতে গিয়া থাকেন; কিন্তু আজ যাঁহাদের ব্যবহারে এমন স্বচ্ছ সরল প্রাণের স্পর্শ ও মানবতার সাড়া পাইলাম, তাঁহারাই যখন আমাদের দেশে যান, তখন তাঁহাদের মনোবৃত্তির হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তন কেন হয়? অবশ্য প্রশ্নের উত্তর মোটেই কঠিন নয়। আজ আমরা মিলিলাম, মানুষের সহিত মানুষের সহজাত সম্বন্ধে; কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের সম্পর্ক ঘটে প্রভু ভৃত্য, শাসক শাসিত, বিজেতা বিজিত বা শোষক শোষিতের ভাবে। লিভারপুলে ভদ্রপরিবারটীর সহিত সন্ধ্যা যাপনের এই স্মৃতিটি বোধহয় চিরদিন আমার মনে জাগিয়া থাকিবে। লিসবনে পৌছিয়াই আমাদের জাহাজের ছবি ছাপা পিকচার কার্ডে' এই পরিবারটীর উদ্দেশে প্রীতি অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম। দেশে আসিয়া মিঃ এমসনের নিকট হইতে ইহার স্বীকৃতি জ্ঞাপক যে পত্র পাইয়াছি তাহা হইতে কয়েকছত্র এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন:—

"The children were delighted to receive post card written while on board the S. S. "Haruna Maru." * * * *

It was very kind of you to write to them and we often speak of your visit to our little home. I am sure they will always remember it. We hope you arrived safely and enjoyed a pleasant journey without any serious disturbances while en voyage! * * * I expect of course, you will have some changed ideas of the occidental nations who hitherto have professed such a standard of civilization and are now engaged in such bitter struggle of warfare and all its associated barbarism.

My own simple explanation would be that it is the outcome of a selfish policy connected with a great self-indulgence of pleasure on the one hand, whilst on the other it is an attempt at achieving freedom with (?) an overpowering militarism. All the European countries, I think, will suffer severely before the conclusion and such a conclusion will be the outcome of complete exhaustion—financial and physical. What will happen then it is difficult to forecast. Perhaps the lesson learned will bring about a more balanced state of mind. Nations may gather together and standardise a more uniform method of mutual and reciprocal form of trade and government.

However, I am not personally qualified to express a great understanding of these matters and all I would long for is that

"All men should brothers be"
"And form one family"—the wide world o'er.

It would be a happy state if all could meet in that spirit of friendship (as we had met) and at the same time, as I recollect you saying—to preserve one's own individuality.……"

অল্প কিছুদিন হইল মেয়েটীর নিকট হইতেও একখানি পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি লেখা ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে বিমানহানা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে। সুতরাং এখন তাহাদের কি অবস্থা—কোথায় আছে জানিবার উপায় নাই। সংবাদ-পত্রে লিভারপুলে বোমাবর্ষণের সংবাদ দেখিলেই আমার মন স্বতঃই এই পরিবারটীর জন্য উৎকণ্ঠিত হয় এবং সেই সন্ধ্যাটীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

লিভারপুল সহরটী অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। এত অপরিচ্ছন্ন সহর ইংলণ্ডে আমি খুব কমই দেখিয়াছি। বিশেষ করিয়া চোখে পড়িল স্থানীয় মজুর শ্রেণীর দুরবস্থা। এখানকার দরিদ্রপল্লীতে বস্তির অবস্থা দেখিলে বোঝা যায় আজ কেন ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। লণ্ডনের 'ইষ্টএণ্ড' দেখিয়াছি ; কিন্তু এখানকার মজুর পল্লীর তুলনায় লণ্ডনের 'ইষ্টএণ্ড' স্বর্গ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বাসের অযোগ্য অন্ধকার মসীলিপ্ত কুটীরশ্রেণী, একটী বা দুটী কুটুরীতে এক একটী বৃহৎ পরিবারের আবাস। অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট শিশুগুলি পথে পথে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। পরিধানে তাহাদের জীর্ণ মলিন বস্ত্র, কালিঝুল মাখা দেহ। তাহাদের যত্ন করিবার কেহই নাই। বাপ মা হয়তো অন্নসংস্থানের চেষ্টায় গিয়াছে, অথবা দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি ভুলিয়া থাকিতে পানশালায় আশ্রয় লইয়াছে। বাপ মায়েদের পরিধেয় বস্ত্র বা আকার প্রকারও প্রায় অনুরূপ। আমার একটু আশ্চর্য্যই লাগিল এই ভাবিয়া যে ইংলণ্ডের মত ধনী দেশে এরূপ হীন দারিদ্র্য ও দুর্গতি সম্ভব হয় কি করিয়া ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ধনতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার মূলে অনুসন্ধান করিতে হয়। এস্থলে তাহা অবান্তর হইবে ; সুতরাং তাহা করিতে চাই না। সহরের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতা ও জনতার ভিড়ে এবং সর্ব্বোপরি সঙ্গহীনতায় প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিত। সেজন্য প্রায়ই ট্রামে উঠিয়া সহরতলিতে বেড়াইতে যাইতাম। সহরের মধ্যেও কয়েকটী সুবৃহৎ পার্ক আছে সেগুলিও বেশ মনোরম। টেনিস্ খেলিবার, ছুটাছুটী করিবার, পিক্‌নিক্ করিবার, নৌবিহার করিবার এবং এ প্রকার অবসর বিনোদনের আরও নানা ব্যবস্থাই আছে। বলা বাহুল্য, সেগুলি সদ্ব্যবহার করিবার লোকেরও অভাব নাই। সহরতলি অঞ্চলের স্থানগুলিও খুব সুন্দর। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকই এদিকে বাস করে। সহরের মধ্যবর্ত্তী দরিদ্রপল্লীর তুলনায় এসব স্থান যেন সত্যই স্বর্গ !

দেখিতে দেখিতে লিভারপুল বাসের মেয়াদ ফুরাইল। ২১শে জুন শুক্রবার আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা ৩টার কিছু আগেই জাহাজ-ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ডকের মধ্যে যাইবার প্রবেশদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী। প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর তবে প্রবেশের অনুমতি মিলিল। আরও অনেক যাত্রী অপেক্ষা করিতেছে। তার মধ্যে বেশীর ভাগ একদল নিম্নশ্রেণীর পাঞ্জাবী। ইহারা এদেশে ফেরি করিয়া এবং লোকের ভাগ্য গণনা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। বোধ হয় যুদ্ধের দরুণ ব্যবসা মন্দা পড়ায় বা বিপদাশঙ্কা প্রবল হওয়ায় দেশে ফিরিতেছে। মাত্র দুইজন ভদ্রশ্রেণীর ভারতীয় দেখিলাম। একজন পাঞ্জাবী, চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন শেষ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। অন্যজন গোয়ানিজ, দন্ত-বিজ্ঞান পড়িতে আসিয়াছিলেন। যাহাই হউক, অনুমতি পাইবামাত্র আমরা ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটা বড় হলে আমাদের জিনিষপত্র এবং ছাড়পত্র প্রভৃতির পরীক্ষা হইবে। তার মধ্যে যেন hardle race এর মত অবস্থা। hardleএর আর শেষ নাই। স্তরের পর স্তর পার হইতেছি নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষার পর। সর্ব্বত্রই সশস্ত্র প্রহরী। অবশেষে ল্যাণ্ডিং ষ্টেজ বা যে মঞ্চ হইতে জাহাজ ছাড়িবার কথা সেখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। দরজা জানালাগুলি বন্ধ থাকায় এবং দিনটাও বেশ একটু গরম থাকায় ভারি অস্বস্তি লাগিতেছিল। জাহাজ তখনও ভিড়ে নাই, খানিকটা দূরে নোঙ্গর করা। প্রায় এক ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিবার পর তবে ঘাটে লাগিল। ইতিমধ্যে যাঁহারা সরাসরি লণ্ডন হইতে আসিতে-ছিলেন তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তার মধ্যে

কয়েকজন বাঙ্গালী ছিলেন। আমরা সর্ব্বসমেত পাঁচজন বাঙ্গালী হইলাম। মনে আশা হইল, সুদীর্ঘ পথ কোনওরকমে আলাপ আলোচনায় কাটান যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কয়জনেরই একই কেবিনে স্থান হইয়াছিল। কেবিনে নিজ নিজ স্থান দেখিয়া লইয়া—ডেকে আসিলাম মালের সন্ধানে। ভারি মাল সবই রাখিয়া আসিতে হইয়াছে। এখন সেগুলি সব একত্র কপিকলের সাহায্যে জাহাজে উঠিতেছে, বলা বাহুল্য বিশেষ সযত্নে নহে। খুব কম জিনিষই অক্ষতদেহে জাহাজে পৌছিতেছে। সেই ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মালের স্তূপ হইতে নিজেরগুলি উদ্ধার করাও দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক, অতি কষ্টে আমরা নিজ নিজ বাক্স সুটকেশ খুঁজিয়া বাহির করিয়া যেগুলি সঙ্গে থাকা দরকার কেবিনে লইয়া তুলিলাম। প্রায় ৮টার সময় খাবার ঘণ্টা বাজিল। খাবার ঘরের আকৃতি দেখিয়া এবং বিশেষ করিয়া আহার্য্য ও আহার্য্যপরিবেশক ভৃত্যদের দেখিয়া ক্ষুধার তাড়না সত্ত্বেও আহার করিবার প্রবৃত্তি আর রহিল না। একমাসের উপর এই ব্যবস্থায় কি ভাবে চলিবে তাহা ভাবিয়া বেশ একটু চিন্তান্বিত হইলাম। অবশ্য তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর আহার বাসস্থান পাইবার প্রত্যাশা যে সমীচীন না তাহা জানিতাম। কিন্তু এতদূর অপকৃষ্ট হইতে পারে ধারণা করিতে পারি নাই। কিন্তু ভগবান্ মানুষকে যে কোন পরিবেশে খাপ খাওয়াইয়া লইবার শক্তি দিয়াছেন। প্রথম প্রথম অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিলেও ধীরে ধীরে তৃতীয় শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার অসহনীয় অব্যবস্থা বা অপব্যবস্থায়ও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম।

আহারান্তে ডেকে আসিতেই জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টাধ্বনি হইল। একটী একটী করিয়া জাহাজের সব বন্ধনগুলিই মুক্ত হইল। ল্যাণ্ডিং ষ্টেজে অপেক্ষমান সকলেই হাত নাড়িয়া এবং ধ্বনি করিয়া আমাদের বিদায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইল। এই সৌজন্য প্রদর্শন আত্মীয় অনাত্মীয় নির্ব্বিশেষে এদের প্রচলিত রীতি, আমরাও প্রত্যভিনন্দন জ্ঞাপন করিলাম। ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজ পথপ্রদর্শক (pilot) জাহাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শান্ত মার্সি নদীর বক্ষ আলোড়ন করিয়া চলিতে লাগিল। মার্সিনদীর মোহনা লিভারপুল হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে। এই মার্সিনদীর সঙ্গেও এই কয়দিনে বেশ একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। প্রত্যহই কিছুক্ষণ ইহার তীরে বসিয়া থাকিতাম। কাছেই একটী জাহাজঘাট ছিল, দুটী ফেরি সার্ভিস এই ঘাট হইতে যাতায়াত করিত। এই জনপ্রবাহের যাতায়াত, নদীর উপর দিয়া নৌকা জাহাজ প্রভৃতির চলাচল, অপর তীরের লোকালয়—অলসভাবে এইসব দেখিতে বেশ ভাল লাগিত। মার্সিনদীকে আমার আরও ভাল লাগিবার কারণ—ইহার সহিত আমাদের ভাগীরথীর খুব সাদৃশ্য আছে। মার্সির তীরে বসিয়া মনে হইত যেন দেশে চিরাভ্যাসমত ভাগীরথী তীরে সন্ধ্যা যাপন করিতেছি।

ডেকে আমরা ইতস্তত: বিচরণ করিতেছি এমন সময় আমাদের জীবনরক্ষী কটীবন্ধ (life jacket) ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য ডাক পড়িল। প্রত্যেকে নিজ নিজ কটীবন্ধ লইয়া ডেকে উপস্থিত হইলাম। মহলা শেষ হইল। জাহাজে যে কয়খানি জীবনরক্ষী নৌকা আছে বিপৎকালে কোন্ কোন্ যাত্রী কোনটীতে যাইবে তাহার একটী তালিকা নোটিশবোর্ডে দেওয়া হইয়াছিল। সেটীর প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইল। অন্যসময় হইলে এসব ব্যবস্থা একটা নিতান্ত মামুলি প্রথা হিসাবেই করা হইত। কিন্তু এখন এগুলি অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য হিসাবে বিশেষ অবধানসহকারে আমরা সম্পাদন করিলাম। আরও কিছুক্ষণ ডেকে বেড়াইয়া প্রায় ১১টার সময় শ্রান্তদেহে বিশ্রামের জন্য কেবিনে ফিরিলাম। কিন্তু শয্যার অবস্থা দেখিয়া বিশেষ আশান্বিত হইলাম না। মস্তকের উপাধান ইষ্টক বলিয়াই ভ্রম হয়—তলার তথাকথিত 'গদিও' তথৈব চ। নারিকেলের ছোবড়ার আঁসগুলি সর্ব্বাঙ্গে যেন সূচ বিদ্ধ করিতেছে। জাহাজ এখন সমুদ্রে পড়িয়া ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূল ধরিয়া চলিয়াছে। শয়নকালে একবার মনে হইল, আজ দুই বৎসর বাদে ইংলণ্ডের কাছে সত্য সত্যই শেষ বিদায় লইলাম।

পরদিন ২২শে জুন শনিবার। প্রাতরাশ শেষ করিয়া ডেকে আসিলাম। পরিষ্কার রৌদ্রদীপ্ত দিন। আমরা ইংলণ্ডকে বামে রাখিয়া চলিয়াছি। দূরে ইংলণ্ডের বেলাভূমি মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। দুপুরে জাহাজের বেতার বুলেটিনে (সংক্ষিপ্ত সংবাদ পত্রিকা) পাওয়া গেল ফ্রান্সের প্রতিনিধিবর্গ হিটলারের

নিকট হইতে যুদ্ধ বিরতির সর্ত্ত লইয়া ফিরিয়াছেন এবং তাহা ফরাসী সরকারের বিবেচনাধীন। এই সংক্ষিপ্ত বুলেটিনই এখন আমাদের সঙ্গে বহির্জ্জগতের একমাত্র যোগসূত্র। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় আমরা এই ক্ষুদ্র লিপিটির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকি। যখন জাহাজের একদল কর্ম্মচারি ইহার কয়েক খণ্ড লইয়া আসে তখন একখানি পাইবার জন্য আমাদের মধ্যে বালকদের মতই কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। ইহার পরই ঠিক আর একটী বিজ্ঞপ্তি বাহির হয় সেটী জাহাজের গতিবিধি সম্বন্ধে। প্রতিদিন জাহাজ কত দূর চলিতেছে, শেষ বন্দর হইতে কত দূর আসিল এবং পরবর্ত্তী বন্দর হইতে কত দূরে আছে, কি হারে চলিতেছে, আবহাওয়ার অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে খবর থাকে। সেটীর সম্বন্ধেও আমাদের কৌতূহল কম নহে। বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলে—জাহাজ কত দূর আসিয়াছে সে সম্বন্ধে, আবার বাহির হইলে কবে পরবর্ত্তী বন্দরে পৌছান যাইবে সে সম্বন্ধে। সেদিন মধ্যাহ্নে আর একটী বিজ্ঞপ্তি বাহির হইল এবং যাহাতে যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটু উদ্বেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। তাহার মর্ম্ম এই—যাত্রীদের এতদ্বারা অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা যেন যে কোন বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং রাত্রে নিজ নিজ জীবনরক্ষী কটীবন্ধটি যেন নিকটেই রাখেন যাহাতে প্রয়োজন হইলে উহা লইয়া যথাসম্ভব সত্বর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট জীবনরক্ষী নৌকায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। এছাড়া কর্ম্মচারীদের নিকট শোনা গেল যে, ঐদিন এবং পরের দিনও কিছু সময় আমরা অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল স্থান অতিক্রম করিতেছি, কেননা ইংরাজেরা এই সব স্থানে মাইন দিয়াছে। আরও শুনিলাম, একখানি গ্রীক্ এবং একখানি আর্জেন্টাইন জাহাজ নাকি জিব্রালটারের নিকট ডুবি হইয়াছে। সে রাত্রে আমাদের কেবিনে বেশ একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সমুদ্র একটু অশান্ত ছিল। শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ একটা বড় ঢেউ আসিয়া আমাদের কেবিনের গায়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিতে পোর্টহোল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অল্প ফাঁকের মধ্য দিয়া খানিকটা জল মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। জলের শব্দে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে যে যেমন অবস্থায় ছিল বিশৃঙ্খলভাবে বাহিরে যাইবার জন্য ছুটিল। আমি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই অনুমান করিলাম; কেননা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, পোর্টহোলটা খুব ভালভাবে বন্ধ করা হয় নাই এবং নিদ্রাও ভাল না হওয়ায় সমুদ্রের অশান্ত অবস্থা সম্বন্ধে একটু সচেতন ছিলাম। আমি বলিলাম "ব্যাপারটা গুরুতর কিছুই নয়"—। কিন্তু তখন সে কথা কে শোনে। আলো জ্বলিতেই অবশ্য সবই পরিষ্কার হইয়া গেল এবং সমস্ত ব্যাপারটা তখন হাস্যরসে পরিণত হইল।

পরদিন রবিবার ২৩শে জুন। জাহাজ অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। দিনটা কিছু মেঘলা মেঘ্লা। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও পড়িতেছে। সমুদ্র অত্যন্ত অশান্ত। আজ আমরা বিস্কে উপসাগর অতিক্রম করিতেছি। অশান্ত ভাবের জন্য বিস্কে উপসাগরের খ্যাতি বা অখ্যাতির কথা আগেই শুনিয়াছিলাম; এখন প্রত্যক্ষ করিলাম। অবশ্য যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে এর চেয়েও বেশী কিছুর জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। তবুও অভিজ্ঞতা নিতান্ত সুখের হয় নাই। জাহাজের পাটাতনে দাঁড়ান যায় না, মাতালের মত অবস্থা হয়, মাথা ঘোরার ভাব আসে। এখনও পর্য্যন্ত 'Good sailor' এর খ্যাতি দাবী করিতে পারি, কেননা সমুদ্র-পীড়ার অভিজ্ঞতা হয় নাই, বিলাতে যাবার পথেও নয়। কিন্তু পাছে সে খ্যাতি রক্ষা করিতে না পারি এই আশঙ্কায় কেবিনে গিয়া শয্যাশ্রয় করিলাম। পরদিন সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত। বিকালের দিকে মাঝে মাঝেই ডাঙ্গা দেখা যাইতে লাগিল। আমরা এখন বিস্কে উপসাগর অতিক্রম করিয়া পর্ত্তুগীজ উপকূল বাহিয়া চলিয়াছি। জাহাজে নোটিশ দিয়াছে যে জাহাজ রাত্রি দশটার সময় লিসবন্ পৌছাইবে এবং পরের দিনই লিসবন্ ছাড়িয়া যাইবে। তিনদিন সমুদ্র বাসের পর স্থলে নামিব এবং বিশেষ করিয়া একটা নূতন যায়গা দেখিব এ আশাটা ভালই লাগিল। রাত্রি ৮টা নাগাদ পাইলট জাহাজ আসিল। তখন শোনা গেল, সকালের পূর্ব্বে বন্দরে ভিড়িবার হুকুম হয় নাই। সুতরাং হতাশ হইয়া কেবিনে ফিরিলাম।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর ডেকে আসিয়া দেখিলাম জাহাজ বন্দরে ভিড়িতেছে: জাহাজ ডকে লাগিবামাত্র কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী জাহাজে আসিল। যে কয়দিন জাহাজ লিসবনে ছিল ইহারা সর্ব্বদা পাহারায় নিযুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ এটা যুদ্ধের

সময়কার বিশেষ সতর্কতা। পর্ত্তুগীজ যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজন জাহাজ ভিড়িবার পূর্ব্বেই ডকে সমবেত হইয়াছিল প্রিয়জনদের সম্বর্দ্ধনা করিতে। হাত নাড়িয়া উল্লাস করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের পরই ইহারা ও কুলির দল জাহাজ প্রায় অবরোধ করিল। একে একে যাত্রীরা ও তাহাদের আত্মীয়বর্গ, মোটঘাট ও কুলিদের লইয়া সকলেই নামিল। এবার আমাদের পালা। আমরা অধীরভাবে নামিবার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি। প্রায় আধ ঘণ্টা অধীর অপেক্ষার পর অনুমতি মিলিল। আমরা বাঙ্গালী কয়জন একত্র নামিলাম। প্রথমেই পর্ত্তুগীজ মুদ্রার জন্য কোন ব্যাঙ্কে যাওয়া প্রয়োজন। এই কয়দিন জাহাজের শোচনীয় আহার্য্যের ব্যবস্থায় আমরা একরূপ অর্দ্ধাশনে আছি বলিলেই হয়। স্থির হইল ব্যাঙ্কে মুদ্রা বিনিময় করিয়া প্রথমেই কোন রেস্তোঁরায় ভাল করিয়া খাইতে হইবে, তারপর সহরের দ্রষ্টব্য যতদূর সম্ভব দেখিয়া ফিরিবার পথে কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। তীরে নামিতেই একজন ট্যাক্সি চালক ইংরাজীতে আমাদের ডাকিল। ইংরাজী-জানা লোক পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম; সে আমাদের একটী ব্যাঙ্কে লইয়া গেল যাহার সহিত লণ্ডনের লেনদেন আছে, সুতরাং কর্ম্মচারিগণ ইংরাজী বুঝেন। আগন্তুকদের কাছে অজানা দেশের নূতনত্ব সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত আবেদন আছে। সব কিছুই নূতন ঠেকে, যাহা আমরা অহরহঃ দেখিতে অভ্যস্ত এরকম জিনিষও নূতন দেশে দেখিলে যেন বিস্ময় সৃষ্টি করে। মনে হয় যেন আমরা একটা আজব দেশে আসিয়াছি। কিন্তু দুএকদিন পরে এভাবটা কাটিয়া যায়, মনে হয় প্রথম দর্শনে চোখের সুমুখে একটা যে মায়ার ইন্দ্রজাল রচিত হইয়াছিল সেটা যেন মরিয়া গিয়াছে।

প্রথমে লিসবনের সম্বন্ধে দুচার কথা বলা দরকার। লিস্‌বন বন্দরটী তেজো (Tejo) নদীর উপর—মুক্ত সমুদ্র হইতে প্রায় আট দশ মাইল ভিতরে। নদীটি বেশ প্রশস্ত, প্রায় আমাদের দেশের ভাগীরথীর মত। নদীর কিনারা হইতেই একটা পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সহরটী রচিত, দেখিতে অনেকটা দার্জ্জিলিং শিলং প্রভৃতি সহরের মতই। সহরটী বিস্তারে খুব বেশী বলিয়া মনে হইল না। নদীর তীর বাহিয়া দুই তীরেই অনেক দূর পর্য্যন্ত সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। সমস্ত য়ুরোপ খণ্ডে একমাত্র নিরপেক্ষ দেশস্থ বন্দর বলিয়া লিসবনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রসিদ্ধি বর্ত্তমানে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। লিসবন এখন য়ুরোপের সহিত বহির্জগতের সংযোগ রক্ষা করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাই একমাত্র বন্দর—যেখানে যুদ্ধরত এবং নিরপেক্ষ সকল জাতির জাহাজ এখনও অবাধে যাতায়াত করিতেছে। জাপান, জার্ম্মাণ, ইংরাজ, ফরাসী, ইতালীয় সকলেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেছে। আমরা যে যুদ্ধাঞ্চলের বাহিরে আসিয়া পৌছিয়াছি তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিলাম—রাত্রে যখন সহরে এবং নদীর অপেক্ষমান সব জাহাজে আলো জ্বলিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল নিষ্প্রদীপে অভ্যস্ত আমাদের চোখে ইহা একটু নূতন ঠেকিল, মনে হইল একটা নূতন জগতে আসিয়াছি। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সহরের অঙ্গে আলোর মালা ঝলমল করিতেছে। নদীর বেলাভূমি দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

* * * *

যেকথা বলিতেছিলাম। ব্যাঙ্কে পৌছিয়া আমরা ট্যাক্সিকে বিদায় দিলাম। ব্যাঙ্কে শুনিলাম, পাউণ্ডের মূল্য এদেশীয় মুদ্রার তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমরা যে কয়দিন লিসবনে ছিলাম তার মধ্যে পাউণ্ডের দর আরও কমিয়াছিল। কিন্তু আমাদের গরজ বেশী, কাযেই যে দর পাইলাম তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইল। এ স্থানটা ব্যবসার কেন্দ্র স্থল। রাস্তাগুলি তেমন প্রশস্ত নয় এবং তখন কাযের সময়। কাযেই পথে বেশ ভিড়। প্রায় সব রাস্তাই পাথরের তৈরী। সহরের একটু বাইরের দিকে কয়েকটী বেশ প্রশস্ত আস্ফাল্ট্ দেওয়া রাস্তা দেখা গেল। এই রাস্তা-গুলিতে কন্টিনেণ্টের প্রথায় মধ্যস্থল দিয়া পদচারীদের জন্য বৃক্ষচ্ছায়াবীথিবিন্যস্ত ফুটপাথ। মাঝে মাঝে কাফের (Cafe) সুমুখে এই ফুটপাথের মাঝে খাবার জন্য টেবল চেয়ার সাজান; মাথার উপর আচ্ছাদন দেওয়া, কেননা এখানে রৌদ্র বেশ চড়া। এখানে প্রায় সকল রাস্তাতেই ট্রাম চলে, বাস নাই। ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া—আমরা দোকানপাট দেখিতে দেখিতে সন্ধান লইয়া ইংরাজী জানা লোক আছে এমন একটী হোটেলে উপস্থিত হইলাম। হোটেলটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওয়েটার আসিয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু সে ইংরাজী বোঝে না। ইংরাজী

জানা অন্য একজনকে পাঠাইয়া দিল। সেও অবশ্য খুব ভাল বোঝে না। কোন রকমে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে এবং বাকীটা ইসারা ইঙ্গিতের সাহায্যে খাদ্যতালিকা হইতে কয়েকটা দ্রব্য অর্ডার করা হইল। যখন আহার্য্য দ্রব্যগুলি আসিল, দেখিলাম পরিমাণেও বেশ প্রচুর এবং স্বাদেও অনেকটা আমাদের রুচিসম্মত যা ইংলণ্ডে কোনদিন ঘটে নাই। বিশেষতঃ এই কয়দিন জাপানী জাহাজে একপ্রকার অখাদ্য খাওয়া এবং অর্দ্ধাশনের পর পার্থক্যটা একটু বেশীরকমই অনুভব করা গেল। দক্ষিণাও ইংলণ্ডের তুলনায় মোটেই বেশী নহে। হোটেল হইতে বাহির হইয়া আমরা একটী সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণে বাহির হইলাম। এ দিকটা সহরের সম্ভ্রান্ত পল্লী বলিয়া মনে হইল, লণ্ডনের ওয়েষ্টএণ্ড বা কলিকাতার চৌরঙ্গীর মত। এই পথ ধরিয়া কিছুদূর আসিতে আমরা একটী পার্কের সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে জানিলাম যে, ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের নামে এই পার্কটীর নামকরণ হইয়াছে। পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই একটী boating pool (নৌবিহারের জলাশয়) দেখা গেল। সেখানে অনেক তরুণতরুণী নৌকা বাহিয়া অবসর বিনোদন করিতেছে। ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকালে এ দৃশ্য অতি সাধারণ। পার্কটী উচুনীচু ভূমিতে অবস্থিত। নানা স্তরে পরিচ্ছন্ন রাস্তা, রাস্তার দুধারে একজাতীয় অভিনব বৃক্ষশ্রেণী, রাশি রাশি ফুলভারে সমৃদ্ধ। তাছাড়া দুপাশে নানাজাতীয় ফুলের কেয়ারি করা, নানা বর্ণবৈচিত্র্যে মনোরম। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে কেহ একটী ফুল ছেঁড়ে না। আমাদের দেশে হইলে এই সব বাগানের কি দশা হইত ভাবিতে একটু কষ্ট ও লজ্জা বোধ হইল। পার্কে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার পথে পথে ঘুরিতে বাহির হইলাম। কিছু কেনাকাটা সারিয়া জাহাজে ফিরিবার পথে একটী সুদৃশ্য সৌধ চোখে পড়িল। ফটকে সশস্ত্র পাহারা। কোন সরকারি বাটী বলিয়াই অনুমান হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল, এটী পর্ত্তুগীজ কোর্ত্তেজ্ (cortes) বা পার্লামেণ্ট-গৃহ। জাহাজে ফিরিলাম প্রায় বেলা ৫॥০টায়। আসিয়াই যাহা শুনিলাম তাহাতে আমাদের আনন্দ উৎসাহ সব তিরোহিত হইল। এক নোটিশ জারি হইয়াছে জাহাজ জুন মাসের মধ্যে লিসবন্ ছাড়িবে না। অবশ্য কোন বিশেষ অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। পূর্ব্বে ঠিক ছিল পরদিনই জাহাজ ছাড়িয়া যাইবে। জাহাজের কর্ম্মচারিদের মুখে শুনিলাম, জাপান সরকার নাকি লিসবনের জাপানী দূতাবাসে তার করিয়াছেন যে নূতন হুকুম জারি না হওয়া পর্য্যন্ত এই জাহাজ যেন লিসবনেই থাকে। কিন্তু কি কারণে যে এই হুকুম হইয়াছে তাহা কর্ম্মচারিরাও জানে না। সে যে কারণেই হউক, আমাদের কাছে ইহা বিনা-মেঘে বজ্রপাতের মতই আকস্মিক ও ভয়াবহ প্রতীয়মান হইল! আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকা পড়িলাম। এই "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় আমাদের পাঁচ দিন কাটিল। জাহাজে নানাপ্রকারের মাল বোঝাই হইতেছে। আমরা কখনও নিষ্ক্রিয়ভাবে এই মাল বোঝাই কার্য্য দেখি; কখনও সহর বেড়াইতে যাই। একদিন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া ট্যাক্সি লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে পর্ত্তুগীজ-গোয়ার একজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল! তিনি লিসবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র, সুতরাং ইংরাজী এবং পর্ত্তুগীজ বোঝেন। তিনি আমাদের দোভাষী হইলেন। তাঁহার সাহায্যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করিবার অনুমতি পাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ সহরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। আমরা প্রথমে যেখানে গিয়াছিলাম সেটা বিজ্ঞান বিভাগ। সেখানে Chemical, Physical, Geological ল্যাবরেটরি, মানমন্দির ও তৎ-সংলগ্ন বোট্যানিক্যাল উদ্যান দেখিলাম। তারপর সহরের অপরপ্রান্তে অবস্থিত টেকনলজিক্যাল বিভাগ দেখিতে গেলাম। বাড়ীগুলি সম্প্রতি নির্ম্মিত, একেবারে আধুনিক ছাঁদে। কারুকার্য্য খুবই সাদাসিধা অথচ মনোরম, অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। এখান হইতে নদী পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত সহরটার একটা মোটামুটি প্রেক্ষা (view) পাওয়া যায়। পাড়াটা বেশ পরিচ্ছন্ন; সঙ্গতিপন্ন লোকের বসতি বলিয়া মনে হইল। বাড়ীগুলি দুইটি বিভাগে বিভক্ত। একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও এরোনটিক্যাল বিভাগ। অপরটীতে ইকনমিক্স্ ইত্যাদি। তখন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ দেখা হইল না। অর্থনীতিকে এখানে টেকনিক্যাল বিভাগে ফেলা হইয়াছে। অর্থনীতিবেত্তাগণ এ ব্যবস্থা কতটা

অনুমোদন করিবেন জানি না। সেদিনটা ছিল প্রচণ্ড রৌদ্রদীপ্ত, প্রায় আমাদের দেশের চৈত্রবৈশাখেরই মত। এতটা ঘুরিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম। নিকটেই একটা কাফেতে গিয়া ফুটপাথের উপর গাছের ছায়ায় মুক্ত বায়ুতে বসিয়া কিছু পানীয় সেবন করিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। এই সময় সেই পথপ্রদর্শক গোয়ানিজ্ ছাত্রটীর সহিত এখানকার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে আলাপ হইল। ছাত্রটীর সৌজন্যের জন্ম কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা বিদায় লইলাম।

লিসবন্ বন্দরে অবস্থানকালীন আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ব্রিটিশ ও ইতালীয় দৌত্যবিভাগের স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ম জাহাজ পরিবর্ত্তন। বিলাতে থাকিতেই কাগজে দেখিয়াছিলাম ব্রিটিশ দৌত্যবিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহাদের পরিবারবর্গকে লইয়া একটী ইতালীয় জাহাজে লিসবনে আসিতেছেন এবং ইংলণ্ডের ইতালীয় দূতাবাসের কর্ম্মচারিবৃন্দকে লইয়া একটী ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়িতেছে। লিসবনে এই দুই জাহাজের যাত্রীবিনিময় হইবে। এখানে সেই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিলাম। আমাদের জাহাজ এই দুই জাহাজের মধ্যে যেন মধ্যস্থের মত বিরাজ করিতেছিল। ব্রিটিশ জাহাজখানির নাম "মনার্ক অফ্ বারমুডা", আর ইতালীয় জাহাজটীর নাম "কণ্টিরসো"। দুই তিন দিন পরে ইহারা পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিল। পরদিন—বোধ হয় ২৮শে জুন—সকালে পর্ত্তুগীজ সরকারের তত্ত্বাবধানে তাহাদের পরস্পর যাত্রীবিনিময় হইল। 'মনার্ক অফ্ বারমুডা' আগেই ছাড়িয়া গেল। ইতালীয় জাহাজখানি কিছুক্ষণ পরে—আমাদের জাহাজের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। দুই জাহাজের যাত্রী ও কর্ম্মচারিদের মধ্যে বিপুল অভিনন্দন বিনিময় হইল। ইহাকে জাপান এবং ইতালীর মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক সৌহার্দ্দ্যের অভিব্যক্তি মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই—অন্ততঃ এখন তাহা বলা যায়।

পরের দিন শনিবার ২৯শে জুন। নোটিশ বাহির হইল, রবিবার সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়িবে। প্রাতরাশের পর আমরা সহরে বাহির হইলাম। (ক্রমশঃ)

ক্রৌঞ্চীর বেদনা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাংলা হ'তে বহু দূরে গিরিপ্রান্তে নিভৃত নগর
ছোট বাসা তকতকে ঝকঝকে তিনখানি ঘর,
একটি সাজানো তার। বাসা এ যে—নিতান্তই বাসা
কলকাকলীতে ভরা, ভাল-বাসা, অনুদ্ধত আশা
কবোষ্ণ করেছে এরে। আসবাব অতি সাধারণ,
দুখানি কেদারা, বই আলমারি ভরা, গ্রামোফোন,
ঢাকা দুটি বাস্তবস্ত্র, ক'টি শিশি, একটি ক্যামেরা,
কোণে সেলাইএর কল, হাতবাক্স ঘেরাটোপ ঘেরা।
একখানি আর্শি আর মাসপঞ্জী, ছবি গুটি কত
নিজেদেরই আঁকা কিংবা নিজেদেরই তোলা ফোটো যত
দেওয়ালে বিরাজ করে। টেবিলে সুজুনিখানি পাতা,
অঙ্কনের সরঞ্জাম, স্বরলিপি, কবিতার খাতা
ছড়ানো তাহার পরে। নিত্য হেথা হয় চড়িভাতি,
অফুরন্ত গল্পে গানে কোন্ দিকে কেটে যায় রাতি।
দাম্পত্যজীবন নব, অফুরন্ত রসের কল্লোলে
সকল অভাব ত্রুটি ডুবে যায় কোথায় অতলে।
শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া দুটি যেন কপোত-কপোতী
ছিল দেবদারুচূড়ে বাঁধি নীড়, তাহে কার ক্ষতি?
খুঁজে খুঁজে এল ব্যাধ এ নিভৃত আবাসের পাশে,
মায়ামুগ্ধ মিথুনের তৃপ্তি হেরি ক্রূর হাসি হাসে।
হায় রে ব্যাধের দৃষ্টি এড়াল না বিষবাণ তার
বিঁধিল কপোত-বক্ষে। কপোতী করিছে হাহাকার
পাখা ঝটপট করি'। যুগে যুগে এই অভিনয়
ঘরে ঘরে এই চিত্র কাঁদায়েছে কবির হৃদয়।
কবে ক্রৌঞ্চী কেঁদেছিল কান্তহারা, তমসার তীরে
সে ক্রন্দন লুপ্ত নয় - বিস্মৃতির বুক চিরে চিরে
জাগে নব নব সুরে। কভু বনে কভু বা ভবনে,
কভু কাব্যে কল্পনায়, কভু এই বাস্তব জীবনে,
এমনি সহস্র চোখে ঝরায় রে অশ্রুর পাথার,
সরযূ যমুনা তায় উদ্বেলিয়া হয় একাকার।

তিন বোন *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কিউবা কোপিনস্কি পেশায় চাষী, সাকিন পোরোনিন্ গ্রাম। গাঁয়ের লোকে বলত, কিউবার বৃষ্টির জলের দরকার নেই শীতকাল ছাড়া। আসল কথাটা হচ্চে, ওর চাষের জমি জল কি স্থল বলা মুশ্‌কিল। জলের হিসাবে যদি দেখো, তবে ক্ষেতটাকে বলতে হবে নর্দমা, যার উপর দিয়ে কলকল করে ছুটে চলেছে জলস্রোত। আর ডাঙার হিসাবে যদি বলি, তবে বলব জলাভূমি, যা গা ঢাকা দিয়েছে জলে।

চাষীরা বলে, বন্যার জলে কিউবার সাহস বাড়ে। যে নিজেই জল, তার আবার জলাতঙ্ক কি! যখন অঝোরে বাদল নামে, তখন ওরা বলে—কিউবার ইজারা মহল বেড়ে চলল। ও যখন ক্ষেতে লাঙল ঠেলত, ওরা বলত ঠাট্টা ক'রে—দেখিস্, লাঙলের ফলা যেন না ছোঁয় মাটি, অমনি সেটা হবে ভোঁতা! ওরে, কিউবা জলে হাল চালাচ্চে, এইবার ওর ফলবে তিমি মাছের ফসল! কিউবা যখন দাঁতালো হাতল ঘাড়ে নিয়ে চলত, ওরা হাঁকত—এইবার বিদেবাড়ি টেনে কিউবা ধরবে স্যামন্ মাছ, চিরুনি আঁচড়ে মাছ ধরা দেখবি আয়! কোদাল নিয়ে কিউবা যায়, ওরা বলে, কিউবা চলেছে লাউ পাড়তে। কিউবা হাঁকিয়ে চলেছে গরুর গাড়ী। গাঁয়ের লোক হাঁকে, দেখিস্ যেন নৌকোডুবি না হয়। একটা সান্‌কি সঙ্গে নে। ওই রকম আরো কত কি বলে, ওদের মস্করার অন্ত নেই।

পাড়ার লোকে কিউবাকে ডাক-নাম দিল—জোলো কিউবা, কিউবা ভোঁদড়।

ওদের ঠাট্টা তামাসায় কিউবার রাগ দুঃখ দুইই হ'ত। কিন্তু চাষারা চাষা বই ত আর কিছু নয়। কুকুরে অমন ঘেউ ঘেউ ক'রেই থাকে। রাখালের কুকুর যখন শহরে ঢোকে, অমনি শহুরে ডালকুত্তারা মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে—ধর্ বেটাকে, ছুটে আয় যে আছিস যেখানে। একটি কুকুরও নেই সে তল্লাটে যে ওর হ'য়ে লড়বে। যদি কেউ সেই ঝামেলায় যোগ না দেয়, তার বিমুখতা দরদের নন্-কোপারেশন্ নয়, সে কেবল বার্ধক্যের অবসাদ অথবা নিছক আলসেমি। দুঃখও হয় রাগও হয়, কিন্তু উপায় কি! দারিদ্র্যের যাঁতা ওকে পিশ্‌ছে দিনরাত। তার উপর মেয়ে তিনটে বেড়ে চলেছে তাল গাছের মত—রোজা, উল্‌কা আর ভিক্‌তা তিন কন্যার নাম—ওল কচু মান, তিনই সমান। মুখে গুঁজবার নেই এক টুকরো রুটি, লজ্জা নিবারণের মত এক টুক্‌রো ছেঁড়া ন্যাঁকড়া নেই বললেই হয়। ভাগ্‌গিস ওদের মা বেঁচে নেই এই দুঃখ লজ্জা ভোগ করবার জন্যে। ভিক্‌তা জন্মাবার আগেই হয়েছিল তার মৃত্যু। কেমন ক'রে ওরা বেড়ে উঠল তা ভগবানই জানেন। মার মৃত্যুর সময় উল্‌কা দু বছরের মেয়ে, আর রোজার বয়স তখন তিন বৎসর মাত্র। ছাগলের দুধ ছিল ওদের একমাত্র সম্বল, তাও যখন জুটত। শুধু জল বাতাসেই ওদের প্রাণরক্ষা ও পরিপুষ্টি।

হাঁ, তবে জাতের মাহাত্ম্য আছে বটে। কোপিনিস্কিরা হচ্চে বটগাছের ঝাড়। আর কাপ্‌কুলারাও তাই। সে বংশের মেয়ে ওদের গর্ভধারিণী। মেয়েমানুষ নয় ত, যেন খামারবাড়ীর লোহার ফাটক। কোন কাপ্‌কুলানী চামুণ্ডা যদি ফাটক আগলে রুখে দাঁড়ায়, সাধ্য কি কেউ প্রবেশ করবে অন্দরে! যদিই বা কুস্তিতে তোমায় মাথাটা ঢুকলো ওর বগলের তলে, সাধ্য কি তার করভোরুর নাগাল পাও! ওই বংশের মেয়েরা চলে যখন, তাদের ঘাঘ্‌রাগুলি নাচে। তরুণরা বলে প্রাণের প্রাচুর্যে, বৃদ্ধেরা বলে দেহাংশের বাহুল্যে।

ওরা দাঁত দিয়ে কাটে পেরেক কুটকুট্ ক'রে। নিতান্ত ষণ্ডামার্ক না হ'লে কোন চাষার পো'র সাধ্যি নেই ওদের কুস্তিতে এঁটে উঠতে। মানলুম, মল্লযুদ্ধে পুরুষ যতই শিথিল হয়ে পড়ে ওরা ততই হয় কঠিন। কিন্তু ভারী মোট তোলবার সময়ও দেখবে, ওরা অবলীলাক্রমে বোঝাই দেয় মালগাড়ীতে, কিম্বা খামারঘরে কোণ-ঠাঁসা করে গো-ঘাসের পুঞ্জভার। তখন আর সন্দেহ থাকে না কত শক্তিধরে ওই কাপ্‌কুলার পল্লীবালারা।

---

* (পোল্যাণ্ডের একটি গল্পের ইংরাজি অনুবাদ হইতে)

যেমন চতুরা তেমনি রূপসী—একেবারে আদর্শ ঘরণীর ছাঁচে ঢালা। কিন্তু হায়, গরীবের মেয়েকে কে আনবে ঘরে! হয় আহাম্মক, নয় ভিক্ষুক আসে পাত্রীর উমেদার হয়ে বুড়ো কিউবার ঘরে। কথায় বলে—

দুই ভিক্ষুক যখন মেলে,
বুদ্ধিপালায় মগজ ফেলে।

কোপিন্‌স্কির কন্যারত্নরা ছিল খাঁটি কাপ্‌কুলার-ঝি। বলিষ্ঠা, শ্রমশীলা, কর্মকুশলিনী, রূপসী। কিন্তু সম্বলের মধ্যে ছিল একটুকরো পাথুরে জলাভূমি, আর গাছপালা শূন্য বিঘে চারেক টাঁড়, যার মূল্য কাণাকড়িও না। পৈত্রিক ভিটা? হা ভগবান, তুমিই জানো কোথায় সেটা! অভাব নেই কেবল জলের। আর আছে প্রত্যেকের একজোড়া সায়া, দুটো ঘাঘ্‌রা, একটা ক'রে উর্দি ও রুমাল —আর এজ্‌মালি একটা ছাগলের চামড়ার কোট, যেটা ছিল ওদের মার সম্পত্তি। দারুণ শীতের সময় কেবল পালা ক'রে একজন ওই আল্‌খাল্লা মুড়ি দিয়ে ঘরের বার হ'ত। এই রকম বিষয় বিভব যাদের, কে তাদের পাণিপ্রার্থী হবে বল?

পাড়ার লোকে তামাসা ক'রে বলত, জোলো কিউবার ঘরে দু'শো মজা, তাই ওর মেয়েরা চৌকাঠ পার হয় না। তবে শীতের দাপটে ঘরেই করে ঘুরঘুর—আর সেই সঙ্গে জাগে শূন্য জঠরের কলরোল। কেউ ওদের ভুলেও ডাকত না। ভিক্ষুক হচ্চে ভিক্ষুক। গাঁয়ের লোক ওদের দেখলে দূর থেকে পিছন পিছন হাঁকত—হেই ভিখিরির বেটি!

২

নদীর ধারে পোড়ো জমির উপর কিউবার কুঁড়ে। ও তল্লাটে নেই আর কোন বাড়ীর চিহ্নলেশ। জঙ্গল আছে বটে, কিন্তু অন্য কৃষকের এলাকায়। দোরল্লা, চৌয়ানিক, গালিকা আর পারা—ওরা সব জমিদারের গোষ্ঠী। ওদের কারু কারু আছে তিন গণ্ডার উপর গরু, পাচ-দশটা ভেড়া, তিন-চারটে ঘোড়া পর্যন্ত। কোপিন্‌স্কির গরু ছিল না, ছিল কেবল একটা ছাগল। গরমের সময় মেয়েরা 'ব্যাঙের ছাতা' কিম্বা বুনো ফল খেয়ে কাটাত, পাহাড়ের তলায় দু-ই মেলে বিস্তর। কিন্তু শীত আর বসন্ত কালে বিধাতা ওদের ভাগ্যে লিখেছিলেন উপবাস। মাঝে মাঝে দু-তিন দিন কাটত কেবল একটু ময়দা-গোলা জল খেয়ে। উল্‌কা একবার চৌয়ানিক গ্রাম থেকে একটা ছাতুর রুটি চুরি ক'রে এনেছিল। সেদিন ওদের ঘরে যেন মোচ্ছবের ধুম।

জঙ্গলের দেবদারু গাছের মত ওরা শুধু জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠতে লাগল। মাসের পর মাস একটি মানুষের সঙ্গে ওদের দেখা হয় না। রোজার বয়স কুড়ি, উল্‌কার উনিশ আর ভিক্‌তার সতেরো। তবু একটি যুবাও করেনি ওদের প্রেমভিক্ষা। ছেঁড়া ন্যাকড়া পরণে, বিষণ্ণ মুখ, ছিপ্‌ছিপে শরীর, কালিমাখা চেহারা। তবু ওদের ছিল রূপ। রোজার কালো চুল, কালো চোখে জ্বলত যেন আগুনের ফুল্‌কি। উল্‌কা আর ভিক্‌তার ফিকে রঙের চুল, কটা চোখ, তাতে স্ফুরিত হ'ত বহ্নিকণা। সুগঠিত তন্বী ঋজু দেহযষ্টিতে ছিল না মাংসের পেলবতা। কি খেয়ে হাড়ে গজাবে মাস? কারু লোলুপদৃষ্টি পড়ত না ওদের অঙ্গে অঙ্গে।

অবশেষে কিউবার দুর্গতি আর গাঁয়ের লোকের ঠাট্টা-তামাসা পৌঁছল চরম সীমায়। 'জোলো কিউবা' 'জোলো কিউবা' শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। নিপাত যাক্‌ ব্যাটারা!

সেদিন হেমন্তের সন্ধ্যা। সবাই পাহাড়ে গরু চরিয়ে এনে খোঁয়াড়বন্দী করেছে। কিউবা মেয়েদের জিগ্‌গেস করে—তোরা কিছু খেয়েছিস? ওরা বলে, শুধু তুঁত ফল। খিদে আছে? হাঁ বাবা। কিউবা রইল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে। পরে শুধোয়—এই কুঁড়ে ছেড়ে যেতে পারবি তোরা? কষ্ট হবে না?—কেন বাবা?—যদি আমরা আর কোথাও চলে যাই?—কোথায়?—যেখানে হোক এই দুনিয়ার আর এক কোণে।—কেন? খোরাকের চেষ্টায়। কোন চুলোয় যাব? কিউবা আবার চুপ করে। ফের বলে—কি রে?—হাঁ শুনচি, বলো। তোরঙ্‌টায় যা-কিছু আছে একত্তর ক'রে পুঁটলিগুলো বাঁধ্‌।—কোথায় যাব আমরা?—যেখানে পা যায়। দূরে, দূরে, আরো দূরে।

যথাসর্বস্ব বোঁচ্‌কা-বন্দী হ'ল। ভিক্‌তা বলে—বাবা, মার ওই ছোট্ট ছবিখানা সঙ্গে নিয়ে যাই? ঋষি জেনিভিবের ছবিখানি সে খাটের মাথার দেয়াল থেকে নামাল'। কিউবা—আচ্ছা নে ওটা।

রোজা—কুড়োলটা আমি সঙ্গে নেবো।

উল্কা—আর ছাগলটা আমার সঙ্গে যাবে।

ভিকৃতা—কিন্তু যাবে কোথায় ?

কিউবা—যেখানে হোক আমার সঙ্গে চল্।

ওদের যাত্রা সুরু হল। কিউবা কুঁড়ের দরজাটার শিকল টেনে দিয়ে সামনে মস্ত একখানা পাথর চাপা দিল। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে থুথু ফেলে হাত তুলে জানালো বিদায় সম্ভাষণ ওদের বাস্তুভিটাকে।

চল, আমরা যাই।

নদীর তীর-বরাবর কিউবা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলে। নদী ছেড়ে ওরা মাঠে পৌছল। পারদা লাওকার জোত জমি পার হয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাৎরা পাহাড়ের ধারে এসে থামল। সেখান থেকে 'সাদা পাণির' উপত্যকা অতিক্রম করে 'সবুজ দীঘি' পিছনে ফেলে যখন 'লোহার ফাটক' উত্তীর্ণ হ'ল তখন ভোর হয়ে এসেছে। কি অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণা! খাবার কিছু নেই সঙ্গে। পথে চলতে চলতে কেবল সংগ্রহ করেছে বুনো ফল। ভিকৃতা বলে—বাবা গো, না খেয়ে আর ত চলতে পারি না। বাবা বলে—কি খেতে দেব তোদের ?

কোথায় যাব বাবা, ওই পাহাড়ের উপরে ?—উল্কা প্রশ্ন করে। রোজা বলে—ওখানে ত বুনো ফল মিলবে না।

না।

সবাই নীরব।

ছাগলটা ঘাস খায় আর জাওর কাটে।

রোজা ঘাসের উপর ব'সে ছিল। এক লাফে উঠে মারলে ছাগলের মাথায় এক ঘা কুড়োলের পিছন দিয়ে। ছাগলটা নিঃশব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়্ল।

রোজা কুঠারাঘাতে করল তার শিরশ্ছেদ: বলল—বাবা, এবার আগুন জ্বালো।

উল্কা কেঁদে বলে—তুমি আমার ছাগলটাকে খুন করলে ?

রোজা পাহাড়ের চূড়া দেখিয়ে বলে—ওর সাধ্যি ছিল না ওখানে উঠতে।

ভিকৃতা—ওকে যে ভুলতে পারব না।

উল্কা—ছাগলটা আমার।

রোজা—আমারও।

উল্কা—আমি যে ওকে ঘর থেকে এনেছিলুম।

রোজা—ওটা এজ্‌মালি, আমাদের সবারই।

উল্কা—কিন্তু আমিই সঙ্গে নিয়ে এনেছিলুম।

রোজা—আর আমিই ত নিলুম ওর জান্।

সবাই চুপ। রোজার হুঙ্কারটা কি ভীষণ! বাবা যখন ওটাকে ঝল্‌সে দেবে তখন বুঝি তোরা খাবার বেলা মুখে চাবি দিবি ? এই ব'লে রোজা ছাগটার ছাল ছাড়াতে সুরু করল। উল্কা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ ক'রে বসে থাকে। ভিকৃতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কিউবা শুকো ডাল সংগ্রহ করতে করতে বলে—রোজা ঠিকই করেছে। আমারই ওটাকে বধ করা উচিত ছিল। ওর সাধ্যি ছিল না পাহাড় ডিঙিয়ে চলতে। তা ছাড়া, খাবারও যে নেই কিছু।

আমাদের কি ওই চূড়ায় উঠতে হবে ?

হাঁ।

ওপারে কি আছে ?

হাঙ্গেরি, লাপ্‌টভ।

ওখানে গিয়ে যখন পৌছব—?

তখন দেখা যাবে।

ওখানে কি মজুরি মিলবে ? চাকরি জুটবে না ?

আমি ত তোদের দাসীপনা করতে শিখোই নি।

সবাই মিলে ছাগলটার ছাল ছাড়ালে। মাংস পোড়া একটু একটু সবাই খেলো। বাকীটা রইল পথের খোরাক। মেয়েরা বোধ হয় প্রথম আমিষের আস্বাদ পেল। রোজা উল্কাকে জিজ্ঞেস করে—কেমন লাগল খেতে ? উল্কা ঠোঁট চেপে থাকে। ভিকৃতা বলে—আর ওর ডাক শুনতে পাব না। ওর মাংস খেলুম বটে, আবার খাবো, কিন্তু ওর জন্যে দুঃখ ঘুচবে না।

জোলো কিউবা বলে—যেমনটি হওয়া উচিত ছিল সব সময় তাই যদি না হয়, সেজন্যে কাঁদতে হ'লে কোটালের বান নামবে চোখে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে ফেলল থুথু, তারপর চলল অগ্রসর হয়ে।

গুল্মলতা ভেদ ক'রে ওরা পাথরের উপর দিয়ে চলে। আবার ব্যূহভেদ, পুনশ্চ শিলাচারণা। পাহাড়ের গা দিয়ে উপত্যকার গিরিসঙ্কটগুলি অতিক্রম ক'রে ওদের চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রা। প্রতি পদক্ষেপেই মনে হয় বুঝি পায়ের

তলার পাথরগুলো পড়বে ধ্ব'সে, ওদের গ্রাস করবে উপত্যকার গহ্বর।

ভিকৃতা কেঁদে বলে—বাবা, বলছি কিন্তু, আমি তলিয়ে যাব পাহাড়ের তলে।

খবদ্দার, নীচের দিকে তাকাস্‌নি।

বাপ্‌ রে, কি অথই গহ্বর হাঁ-করে রয়েছে পাহাড়ের তলে—রোজা উপত্যকার পানে চেয়ে বলে।

উল্‌কা—আঙুলের ডগাগুলো বুঝি খ'য়ে গিয়ে হাড় বের হবে।

কিউবা—আঁকড়ে ধ'রে থাক্‌ পাহাড়ের গা। হাত ফস্‌কাবি কি পড়বি অতলে, গুঁড়িয়ে যাবি।

ভিকৃতা—মনে হচ্চে আমার আর পা নেই, উড়ছি যেন শূন্যে।

কিউবা—নিব্‌ঘাত মরণ ওই নীচে। চাস্‌ না ওদিক-পানে। রোজা (একটি পাথর স্খলিত ক'রে)—বাপ্‌রে, পাথরটা যেন উড়ে গেল ওই গহ্বরে।

শুনছ শব্দটা!

টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল।

মাটির বৃষ্টি ছুটেছে ওর পিছনে।

শোনো একবার গর্জ্জন।

কি রকম গড়িয়ে চলেছে দেখ।

গড় গড় গড় গড়···

দেখ দেখ সম্মুখে জল!

ওটা লেক।

কি রকম ঝলমল করছে!

কতখানি সূর্য গ'লে গেছে ওই জলে!

বাবা, দেখছ সম্মুখের ওই হ্রদ!

হাঁ।

একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখ'।

ওখানে আর প্রাণ নিয়ে উড়ে যেতে হবে না।

কালোয় আর আলোয় করছে লাফালাফি।

দম্‌কা হাওয়া আসছে ওখান থেকে।

লেক থেকে নয়, চূড়া থেকে।

ওই—ওই ছাখো বাবা, হরিণ!

কই?

ওই হোথা! ওই চূড়ার নীচে পাথরের তাকে—

ছোট্ট একরত্তি কৌটার মত।

হাঁ হাঁ দেখছি বটে!

কোথেকে এল' ওরা? কোথায় থাকে?

ই-ই-ই-হি-য়ো!

ওই দেখ, পাথরের টুক্‌রোগুলো উড়ছে ধূলোর মত!

এক দুই তিন চার···

পাঁচ ছয় সাত আট এগারো···

উঃ, পোনেরোটা!

বাঃ, আমরা ত অনেক গুণেছি।

একশোটা—কিউবা হাঁকে!

ওরা পাথরের ফাটলে ফাটলে লুকালো!

অতগুলো কথ্‌খনো ছিল না।

আচ্ছা, তাই সই! ভগবান ওদের রক্ষে করুন—কিউবা বলে।

সরু আলের উপর দিয়ে প্রশস্ত পাথুরে ঘাটায় পৌছয়, ঝরণার পাশ দিয়ে চলে, ভাঙা পাথরের স্তূপ পার হ'য়ে উত্তীর্ণ হয় অধিত্যকায়।

ভিকৃতা—এখানে আর মাথা ঘুরছে না।

উল্‌কা—একটু আগেই ত বলেছিলি তলিয়ে যাবি!

রোজা—এক জোড়া ডানা থাক্‌লে বড় সুবিধে হত রে! এই পাহাড়ে ওঠার থেকে দেবদারু গাছে চড়া সহজ। অথবা পাইন গাছে।

তা হ'লে একটার উপর একটা পাইন গাছ জুড়ে একশ তলা পাইন গাছ খাড়া করতে হবে।

হাজারটা!

এক লাখ!

এইবার ওরা সব চেয়ে উঁচু শৃঙ্গের উপর পৌছল। বাবা, কি চমৎকার! আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

লিপ্‌টভ।

কি? ওই যে সাদাপানা দেখা যাচ্ছে, ওইটে?

শহরের পর শহর! দেশের পর দেশ!

ওখানে অনেক ক্ষেত, অনেক মাঠ?

কি ঝক্‌ঝকে দিন!

আমাদের দেশে সূর্যের এমন তেজ নেই ত!

কত দেশ ছড়িয়ে আছে আশপাশে?

ওই বাঁ দিকটায় স্পিৎজ্‌ আর ডানদিকে ওরাভা।

কি ঘন জঙ্গল!

আর ওটা?

পাহাড়?

তাৎরার পাহাড়ের খুদে চূড়াগুলি দেখা যাচ্ছে।

এর চেয়ে উঁচু?

না।

পৃথিবীটা কি অদ্ভুত।

কে জানত এমন আশ্চর্য জায়গা রয়েছে পৃথিবীতে!

বাপ্‌রে কি উঁচু!

যেদিকে দেখ না—!

আর কি সুন্দর।

চমৎকার!

কি স্ফূর্তি জাগে মনে!

আমরা কি এবার নীচে নামব?

দেখা যাক।

ই-ই-ই-হী-য়ো!

গলা ভেঙে যায়!

কি ভীষণ স্তব্ধতা চারিদিকে!

কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়ের চূড়োগুলো মাথা খাড়া ক'রে আছে। গির্জার মত।

আমরা ওদিকটাতে নেমে যেতে পারি?

না। পোল্যাণ্ডের সীমানায় এমনি আরো কতগুলো চূড়া আছে!

৩

ওরা আবার খানিকটা ছাগলের মাংস খেল'।

কিউবা জানত বাজিৎজো উপত্যকায় একটা পাহাড়ী কুঁড়ে আছে। বহুকাল আগে ছেলেবেলায় সে ওখানে একটা গ্রীষ্মকাল ভেড়া চরিয়ে কাটিয়েছিল, লিপ্‌টভ্‌ পাহাড়ের এক চাষীর অধীনে। 'লোহার কাটকে'র নীচে, বাজিৎজো চূড়ার ওপারে ঢালু রাস্তা দিয়ে ওরা নেমে গেল কস্‌সিৎস্‌টা পাহাড়ের দিকে 'ছোট দীঘি'র তটে। তারপর কিউবা মেয়েদের সঙ্গে পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর পার হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নামল। লিপ্‌টভ্‌ উপত্যকা যেন রোদের আলোয় ধোয়া সোনালী ফুলে ভ'রে গেছে, কোথাও একটু ফাঁক নেই। পাহাড়ী কুঁড়েঘরটিতে পৌছতে বিলম্ব হল না।

আজ রাত্রিটা এখানে কাটাতে হবে?

হাঁ।

কাল আবার আরো দূরে যেতে হবে?

দেখা যাবে।

একদিন একরাত্রি কিউবা মেয়েদের নিয়ে এখানে বিশ্রাম করল। দ্বিতীয় রাত্রির পর বাজিৎজো গ্রামে তুমুল গণ্ডগোল জাগল ভোর বেলায়। তাৎরা পাহাড়ের কোলে যে গাইবলদগুলি চ'রে বেড়াচ্ছিল তার মাঝ থেকে একটা বলদ নিখোঁজ! গ্রামে গ্রামে একটা আতঙ্কের সাড়া জাগল। ইতিমধ্যে এক ফিরিওয়ালাকে কে যেন বনের মধ্যে খুন ক'রে তার মালপত্র লুঠে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে এই রকম চুরি-ডাকাতির উপদ্রব গ্রামের ভিতরে পর্যন্ত হঠাৎ দেখা দিল। পাল থেকে গরু বলদ ভেড়া দু-একটা ক'রে গুম হ'তে সুরু হয়েছে ইদানীং। কি ব্যাপার! কার কাণ্ড এসব!

পাহাড়ের ওপার থেকে ডাকাতেরা আসে পল্লীর প্রান্তে। সরাইখানা বা খামারবাড়ী লুঠ করে, কিম্বা একটা বলদ চুরি ক'রে পালিয়ে যায়—যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে।

কোথায়?

দিন দিন শীত প'ড়ে আসছে আর সেই সঙ্গে হত্যা ও দস্যুতার দল যেন মাঝে মাঝে নামে পাহাড়ের চূড়া থেকে—আবার পাহাড়ের গুহায় ঘুপিমেরে ব'সে থাকে কিছুদিন। গ্রামে গ্রামে হৃৎকম্পের আবির্ভাব হ'ল অকস্মাৎ।

এদিকে কিউবার তিন কন্যা দিব্যি শাঁসে জলে ভ'রে উঠছে দিন দিন। তাদের পরণে এখন নতুন ঘাঘ্‌রা জাঙিয়া। পাহাড়ে কুঠুরির কাছেই ছিল একটা গুপ্ত গুহা। সেখানে পুঞ্জীত হতে লাগল লুঠের মাল সোনা রূপার স্তূপে।

ভূঁষো কালিমাখা রোমশ গায়ে আগুনের পাশে শুয়ে কিউবা কন্যাদের বলে—হাতে যা জমেছে, তাই দিয়ে এই পাহাড় অঞ্চলে একটা আস্তানা গাড়া যাবে। পাশেই রয়েছে কুড়ুল, ছোরা, চোরাই পিস্তলের সারি।

পল্লীর পথে ঘাটে মাঝে মাঝে গাঁয়ের লোকদের দেখা

হয় এক বুড়ো কৃষকের সাথে। তিনটি ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা যুবতী তার সঙ্গে ফেরে খালি পায়ে।

কোত্থেকে আসছ তোমরা ?

ওই তাৎরা পাহাড়ের ওপার থেকে।

কোথায় চলেছ ?

খেতে পাইনে, তাই হয়েছি ঘরছাড়া।

কাজের সন্ধানে ফিরছ ?

হাঁ।

কারু সন্দেহ হয় না। ছোট ছোট কুড়োলগুলি লুকানো রয়েছে দোলাইএর তলে। পিস্তলগুলি মেয়েদের কাঁচুলির নীচে, চোখে পড়ে না। ওরা দিব্যি ঘুরে ফিরে সব দেখে শুনে নেয়, কোথায় সওদাগরের আড়ত, হোটেলওয়ালার ডেরা, গরু ভেড়ার খোঁয়াড়। বিনা খুনে যেখানে চুরি অসম্ভব সেখানে এরা হত্যা করে অনায়াসে। হঠাৎ মাঝরাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গৃহস্থের বাড়ী বজ্রের মত, তার পরে নিশ্চিহ্ন পলায়ন। যেন একটা ভূতুড়ে কাণ্ড! দ্রুত আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, থাকে কেবল বিভীষিকার ছায়াচ্ছবি আর হৃৎকম্প!

কিউবা রোজ রাতে আগুনের পাশে শুয়ে থাকে। ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে, তার উপর দোলাই। শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবে। মেয়েরা অঘোরে ঘুমায়, কিন্তু বুড়ার ঘুম চোখের পাতায় ভাসে, চেতনায় পৌঁছায় না। ভবিষ্যতের চিন্তা ওকে আকুল করে। এখন দিন কাটছে বটে, কিন্তু আর কদিন ? শীত আস্‌ছে ঘনিয়ে, মাঝে মাঝে বরফ পড়ে। বেশীদিন আর এই পাহাড়ের বুকে এই অন্ধকূপে বাস করা চলবে না। গাঁয়ের লোকেরাও ডাকাতির তথ্য আবিষ্কার ক'রে ফেলবে অবিলম্বে। একটি বৃদ্ধ, সঙ্গে তিনটি তরুণী, ভাল কথা। তবু সন্দেহ জাগবে বই কি। বারবার ডাকাতি হয়ে গেছে। খুনও হয়েছে তিন-চারটি। বেশ খানিকটা ধনরত্ন হাতে এসেছে। এইবার ভালোয় ভালোয় ঘরে ফেরা যাক, আর ভালোতে কাজ নেই। শীতকালটা দেশে কাটিয়ে আবার বসন্তের আরম্ভে বেরিয়ে পড়া যাবে, যেন কাজের ধান্দায়। আসলে কিন্তু কোথাও একটুকরো জমি নিয়ে নতুন ভিটা পাতা যাবে। তারপর দেশে আর ফিরছি না। মোভিটার্গ পার হয়ে একেবারে ওবিডোয়া পাহাড়ের ওপারে গিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। মেয়েগুলোর বিয়ে হয়ে যাবে। ওরা এর মধ্যেই দিব্যি মুটিয়েছে। রাঙা গাল, সর্বাঙ্গে লাবণ্য ও স্বাস্থ্য উছলে পড়ে। জোলো কিউবা ওরফে কিউবা ভোঁদড় এবার হবে ডাঙার পাট্টাদার। ভগবানের আশীর্বাদে অদৃষ্টের চক্র ফেরে বই কি।

মেয়ে তিনটি যেন বহ্নিশিখা। মশালের মত জ্বলে রূপের আগুনে। পাহাড়ে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়ায়, যেন হরিণছানা। বনে বনে ঘোরে নেকড়ে বাঘের মত। পাহাড়ে হাওয়ায় ঝলসে উঠেছে ওদের মুখ। রোদে পোড়া ঘোরালো চামড়া ভেদ ক'রে যেন রক্তের আগুন ওদের সর্বাঙ্গে উত্তাপ মাখিয়ে দেয়। পয়লা নম্বরের ডাকাতিটা দিব্যি মোলায়েম রকমেই হয়েছিল। প্রথম রাজপথের উপর রাহাজানিটা নির্বিঘ্নেই লাভ করেছিল সফলতা। তারপরে চুরি আর খুনের ভূত চাপল যেন রোজার ঘাড়ে। পাহাড়ের উপর থেকে ওরা পল্লী-শহরের উপর তাকাত' যেন বাজপাখীর মত। কদিন বিশ্রাম করার পর রোজার মন অস্থির হয়ে উঠত হিংস্র চাঞ্চল্যে।

সে-ই ছিল ডাকাতের সর্দারণী, বুড়ো বাপ নয়। সে-ই আগ্‌বাড়িয়ে যেত আগুয়ার মাঝে পিস্তল আর মোটা ওড়নার তলে কুড়োল লুকিয়ে। সে সর্বদাই থাকত হাতিয়ার-বন্দী হয়ে। একদিন গভীর রাতে সে পপ্‌রাড্‌ গ্রামে এক মুদির দোকানে ঢুকেছিল, কুড়োলের চাড়ে জানালার দুটি গরাদের ফাঁক ফাঁদালো ক'রে। এই দোকানে অস্ত্রশস্ত্রও বিক্রি হ'ত। কেউ তাকে দেখতে পেলে আর রক্ষা ছিল না। প্রাণ হাতে ক'রেই রোজা নেমেছিল এই দস্যুতায়। তার বাপ আর বোনেরা সামনের বাড়ীর এক কোণে লুকিয়ে ছিল, হয় পলায়ন—নয় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে। যদি হার মানতেই হয় তবে সব শুদ্ধ ঘায়েল না হয়ে একজনের মাথার উপর দিয়ে সে পরাজয় বরণ করাই ভাল, হোক না সে জ্যেষ্ঠা কন্যা বা ভগিনী। টিপ্‌ টিপ ক'রে যেন ঢেঁকি পড়ছিল বুকের ভিতর। এই ডাকাতিটাই ওদের সব ডাকাতির সেরা।

আচ্ছা রোজা, তোর ধরা পড়বার ভয় হয়নি একটুও ? —ভিক্তা প্রশ্ন করে।

ছেৎ, ভয় পেলে কি আর গরাদের ফাঁকে ঢুকতে পারতাম ? হ্রদের পাশে অথবা বনের মধ্যে লুণ্ঠনরাজের সময় মনে হ'ত রোজা যেন বিপুল দেহ ধারণ করেছে।

গ্রামের পথে চলত যখন, সে যেন গুটিয়ে আধখানা হয়ে যেত। লোকালয়ে ওর জাগত মানুষের ভয়। মানুষের দৃষ্টি ছিল ওর অসহ্য। মানুষ দেখলেই আমার কামড়াতে ইচ্ছা করে, দাঁত গুলোয় যেন—এই ছিল রোজার বুলি।

চুরিতে সব চেয়ে হাত সাফাই ছিল উল্কার। চোরাই মালের বেশীভাগ হাতে আসত ওর কৃতিত্বে, বিশেষত কাঁচা পয়সার অংশটা। কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াতো না। সব খুঁটিনাটি একবার চোখ বুলিয়েই মনে মনে টুকে নিত। ওর বোনেরা হাসতে হাসতে বলত—তোর আঙুলের ডগায় টর্চ বাতি জ্বলে। যত অন্ধকারই হোক, দোকানের আনাচে কানাচে ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে পড়ত ওর গৃধ্নু কর।

পাহাড়ী চোরা-কাম্‌রায় ঘরকন্নার ভার ছিল উল্কার হাতে। রান্নাবান্না সে একাই করত। চোরাই মালের গুপ্ত ভাণ্ডার ছিল ওরই হেপাজতে। সযত্নে সাজিয়ে রাখত মালপত্র, জলের ফোঁটাটি লাগত না তাদের গায়ে। প্লেট ধোয়া, কাপড়কাচা, আগুন জ্বালা—সবই করত এক হাতে। কাজকর্ম সেরে দিব্যি আরামে ঘুমাত'।

সব ছোট ভিক্‌তা পাহাড়ে একলা থাকতে ভয় পেত, তাই ওদের সঙ্গে ফিরত বটে কিন্তু বড় একটা কাজে লাগত না। তার বাবা আর দিদিরা যা তার ঘাড়ে চাপাত' তাই সে ব'য়ে আনত ঘরে, কিন্তু নিজে বেশী কিছু হাতাতে পারত না। বুড়ো কোপিন্‌স্কি আগুনের পাশে ব'সে পাইপ টানত আর ভবিষ্যতের জন্যে মনে মনে ফন্দি ফিকির আঁটত, রোজা তখন ব্যস্ত থাকত ছুরি শান দিতে অথবা বারুদ শুকোতে, আর উল্কার সময় কাটত কাপড় কেচে আর টাকা পয়সা গুণে। পয়সার হিসাবে তার ছিল না ভ্রান্তির লেশ। থরে থরে সব রাখত সাজিয়ে, গোণা-গাঁথার সুবিধা হ'ত তাতে! ভিক্‌তা ফিরত হরিণ আর পাহাড়ে ইঁদুরের সন্ধানে। কিম্বা লেকের ধারে বড় বড় ধূসর পাখীরা যেখানে পাথরের অলিগলিতে চরে বেড়াত, ও চুপি চুপি যেত সেখানে। ছোটপাখীর ঝাঁকের কিচিরমিচির শুনত আড়ালে দাঁড়িয়ে। ওর বড় সাধ গলা খুলে গান গায়, কিন্তু কিউবার নিষেধ ছিল, পাছে কেউ শুনতে পায়। নিবিড় জঙ্গলের ঘেরে বাস করেও সে আতঙ্ক দূর হয়নি। ভিক্‌তা তাই গুন গুন ক'রে গাইত যা খুশী, কখনও শিস দিত বাঁশির সুরে। তার বড় সাধ পাহাড়ের ঘাসে ঘাসে যদি মেষ চরিয়ে বেড়াতে পারত। বোনদের মধ্যে সে-ই সব চেয়ে সুন্দরী, কিন্তু কোমল দুর্বল।

দিব্যি নির্ভাবনায় দিন কাটছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন ওরা উপত্যকায় নামল দস্যুতার লোভে গ্রামের খুব কাছে। সেদিন আকাশ পরিষ্কার, আব্‌হাওয়া চমৎকার। এমন সময় হঠাৎ নামল তুষারপাত, বরফের উপর রইল পড়ে ওদের পদচিহ্ন।

পল্লীর লোকেরা বাহির হ'ল সেই পদচিহ্ন ধ'রে ওদের অনুসন্ধানে। এল প্রবল ঝড়, দুড়দাড় ক'রে ভেঙে পড়ে গাছের ডাল। সবাই ফিরে গেল। কেবল একজন শিকারী (তার নাম ষ্টাওকাও) চলল এগিয়ে পায়ের ছাপ লক্ষ্য ক'রে। অবাক হয়ে দেখে সেই পদচিহ্নগুলি। একজন পুরুষ মানুষের পদচিহ্ন, সেই সঙ্গে কতকগুলি ছোট ছোট পায়ের ছাপ, নিঃসন্দেহ স্ত্রীলোকের। একটি পুরুষ আর তিনটি নারী। আশ্চর্য্য, মেয়ে-ডাকাত! কোপিনস্কি আর তার মেয়েরা কোথায় থাকে ঘুণাক্ষরেও জানত না সে। তবে তার বিশ্বাস, এই দম্‌কা ঝড়ে নিশ্চয় তারাও পথের মধ্যে কোথাও আটকে পড়েছে। সে বন্দুক আর কুড়োল নিয়ে তাদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হ'ল। ঝোড়ো হাওয়ায় তার চোখে মুখে তুষারের ঝাপ্‌টা লাগে, তবু সে পদাঙ্ক রেখা ধ'রে এগিয়ে যায়, যেন ভালুকের বা বনবরার পাছ নিয়েছে। কিন্তু ডাকাতরা পথে কোথাও থামেনি। তারা একদৌড়ে পাহাড়ের উপর এক চড়াই থেকে আর এক চড়াইয়ে উঠতে ব্যস্ত। আর এমনি সেয়ানা যে একসঙ্গে না চ'লে ঝোপঝাপের এপাশ ওপাশ দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানা স্বতন্ত্র পথে উত্তীর্ণ হবে নিজেদের আখ্‌ড়ায়।

তুষার আমাদের ধরিয়ে দেবে—কিউবা সভয়ে বলে। চল পাত্তাড়ি গুটিয়ে সটাং চম্পট দিই দেশের দিকে।

কি ক'রে তুষার পার হ'বে—সেই দুর্ভাবনা কিউবাকে উদ্বিগ্ন করল। যে রাস্তা ধ'রে এ অঞ্চলে এসেছিল সে পথে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। গাম্বলুচের কাছে একটা গিরি-শকট তার জানা আছে, সে পথটা দুর্গম নয়। কিন্তু তাদের পর্বতচূড়া প্রদক্ষিণ ক'রে বড় উপত্যকায় নেমে যেতে হবে। যারা তাড়া ক'রে এসেছিল তারা যদি ফিরে না গিয়ে থাকে,

তবে পথে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

রোজা বলে—আমরা যুদ্ধ করব।

ওরা জঙ্গলের মধ্যে ভিন্ন পথে পৃথক হয়ে গেল। আবার একত্র হবে ওদের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে। আর সেখানে রাত কাটানো নয়। যা থাকে কপালে সেই রাত্রেই রওনা হ'তে হবে। যদি সম্ভব হয় তবে বড় উপত্যকার পথে। খুব সাবধানে নীচের জঙ্গলের ভিতর নেমে, জঙ্গল পার হয়ে তাৎরার কাছ ঘেঁষে নীচু পাহাড়গুলি পার হয়ে যেতে হবে, ওরাভা গিরিমালার দিকে, ক্রাৎসিওয়ানের অভিমুখে। যারা তাড়া ক'রে এসেছিল, রাতের বেলায় তারা ক্ষান্ত হবে। কেবল জঙ্গলে যেন দিশাহারা হতে না হয়। এ বিষয়ে রোজার উপর কিউবার অসীম নির্ভর। রোজা সব সামলে নেবে এই ভরসায় কিউবা নিশ্চিন্ত হ'ল।

রোজা ত একাই তিনজনের দফা রফা করতে পারবে। দুই গুলিতে ধরাশায়ী করবে দুটিকে, তৃতীয়টি দুখানা হবে ওর কুঠারাঘাতে।

হয়ত বিপক্ষেরও অস্ত্রশস্ত্র আছে। থাক্ গে, কোন ভয় নেই। ওদের হাতিয়ার ভ্রূক্ষেপ করি না, আমার নির্ভর আমার অস্ত্রে।

৪

ওদিকে শিকারী স্টাওকাও দস্যুদের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হয়ে চলেছে। হ্রদের কাছে এসে সে একটা সমতল পাথুরে ঘাটায় এসে দাঁড়াল'। কিউবা কোপিন্স্কি আর তার মেয়েরা শিকারীকে দেখতে পেল'। ওরা এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে আর কেউ এই লোকটার সঙ্গে আসছে কি না। ওরা প্রতিজ্ঞা করেছে প্রাণপণে লুঠের মাল রক্ষা করবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা অর্জন করা গেছে তা কি সহজে ছাড়া যায়? রক্তাক্ত হাতপায়ে হিংস্র পশুর মত এতদিন কাটল এই পাহাড়ের বুকে। কতবার ধরা পড়তে পড়তে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। এত দুঃখ কষ্টের ধন, দস্যুতার পুরস্কার, স্বেদাসক্ত সম্পদ—সবই তুলে দিতে হবে তাদের হাতে—যারা পার্বত্য কৃষক, মেটো চাষা, গালিকা চৌয়ানিক পাড়ার অধিবাসী। এত পরিশ্রম করেছে, এত বোঝা বয়েছে শুধু এই জন্যে? ভিকৃতা পর্য্যন্ত দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়াল'। ওই অস্ত্রটার সম্বন্ধে ওর এতদিন আতঙ্ক ছিল।

লেকের কাছে কাউকে দেখা গেল না। যে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল তাকে খুবই পরিশ্রান্ত মনে হ'ল। কেবল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চারিদিকে তাকাচ্চে, কিছুই পড়ছে না তার চোখে। মস্ত একটা পাথরের পাশে ব'সে এদিক ওদিক তাকায়, পাইপ ধরায়, টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়ে। ওরা তিন বোনে ওকে নজরবন্দী রাখল।

তারপর রোজা ও উল্কা ছোরা নিয়ে পা টিপে টিপে ওর কাছে এগিয়ে গেল। সে তখন অঘোরে ঘুমুচ্চে।

খুন কর্ ওকে—রোজা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে।

না না, বাঁধ্ ওকে। ওর কাছে জানা যাবে আর কেউ পিছনে আছে কি না।

ঠিক বলেছিস্, কিন্তু কি দিয়ে বাঁধব ওকে?

আমাদের পেটিকোট দিয়ে।

ওরা চট ক'রে উপরের পেটিকোটটা খুলে ফেলল, পাকিয়ে করল দড়ি।

আমি ওর গলার উপর ছোরা ধরে থাকব, আর তুই ওকে বাঁধবি—রোজা বলে।

ছোরার ছুঁচলো ডগাটা ঠেকল শিকারীর গলায়। সে জাগে কিন্তু নড়ে না। কেবল চোখ মেলে চেয়ে রয়। বেশ টের পায় ছোরার মুখটা তার কণ্ঠনালীতে লেগে আছে।

উল্কা পিছমোড়া ক'রে ওর হাত দুটো বাঁধে পাকানো পেটিকোটের হাতকড়িতে।

তোমরা কি পেত্নী?—সে প্রশ্ন করল, রোজা যখন সরিয়ে নিলে ছোরাখানা।

হাঁ, আমরা পেত্নীই বটে। আমাদের সঙ্গে চল।

আমি গাঁয়ে ফিরে যাব।

দেখ না চেষ্টা ক'রে!—এই ব'লে রোজা আবার ধরল ছোরাটা তার গলার উপর।

খবরদার, দেরি ক'র না। আমাদের সঙ্গে এস।

দুই বোনে ওকে তাদের ঝুপড়িতে নিয়ে গেল।

লোকটা অবাক্!

একটা বুড়ো চাষা তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল'।

যেন জঙ্গলের জমাট আঁধি, ঝোপে-ঘেরা ডোবার মত কালো। কেবল মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো কাশফুলের

মত সাদা। তার পাশেই একটি যুবতী দাঁড়িয়ে, হাতে পিস্তল। আর একটু দূরেই ওই পেত্‌নী দুটি দণ্ডায়মানা। পূর্ণযৌবনা, দীর্ঘাঙ্গী, উদ্যতফণা নাগিনীর মত তনু ভঙ্গিমায় ভীষণ মধুর। ওরাই ত ওকে বেঁধেছে ভুজঙ্গবন্ধনে, নিদ্রা-শিথিল দৌর্বল্যের আনুকূল্যে, তারপর এনেছে এই বন্দি-শালায়। ওরাই এ বাড়ীর কুটীরলক্ষ্মী। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে ঘরকন্নার তৈজসাদি। সন্ত্রস্ত বিস্ময় অভিভূত করল শিকারীকে।

বুড়ো কিউবা ভাবে—ওর কাছে ছল ধরা যাক আমরা ডাকাত নই। কি লাভ তাতে? কথ্‌খনো বিশ্বাস করবে না। যাই হোক, ওরে আর জ্যান্ত ফিরতে দিচ্ছি না।

তোমার পিছনের দল কি এগিয়ে আসছে?

সত্যি বল—রোজা হাঁকে, ওর মুখের কাছে ছোরা ধরে।

ওরা এগতে পারে নি। ঝড়ে ওদের ফিরিয়েছে।

কি দিয়ে ওকে বেঁধেছিস? অ্যাঁ, পেটিকোট দিয়ে!

হাঁ।

বেশ, এবার ভাল ক'রে বাঁধা যাক।

শিকারীর হাত পা দড়ি দিয়ে ক'ষে বাঁধা হ'ল। মুখটাও কাপড়ে গ্রন্থিবদ্ধ হ'ল, যাতে না আর চেঁচাতে পারে।

কিউবা ভাবে—কি করি? এখুনি খুন করব, না, লুঠের মাল ঘাড়ে চাপিয়ে যতদূরে পারি এখান থেকে স'রে পড়ি, তারপরে ওকে কতল করা যাবে। এইটেই সুবিধার হবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। অন্ধকার রাতে কেউ আর ফোঁপ্‌রা পিছল বরফের উপর দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠছে না। তা ছাড়া ঝোড়ো হাওয়ায় নিশ্চয়ই তাদের পায়ের ছাপ মুছে গেছে। উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপার থেকে ঘন কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন হ'ল।

কিউবার মনে হ'ল গান্নলুচ্‌ পার হয়ে পদ্‌হেলের দিকে প্রথমে গিয়ে তারপর ছোট পাহাড়গুলি ডিঙিয়ে লিপটভের কাছে অগ্রসর হ'তে পারা যায়। কিন্তু কোন্ পথে গান্নলুচ পার হ'লে আবার খাড়া পাহাড়ের সামনে পড়তে হবে না, সে রাস্তাটা মনে আসছে না।

ওর উপর চোখ রাখিস। কোন্ পথ ধরতে হবে আমি একবার দেখে আসি। অন্ধকার খুব বেশী না হ'লে আজ রাত্রেই রওনা হ'ব। আর যদি খুব আঁধার হয় তবে ভোরেই যাত্রা করা যাবে। মহামুশ্‌কিল, কুয়াশা যে আরও ঘনিয়ে আসছে!

দেখো বাবা, অন্ধকারে পথ হারিয়ো না।

আমি বরাবর পথের উপর পাথর ছড়াতে ছড়াতে যাব, ঘনঘটায় পথ হারানো অসম্ভব নয়।

যত শিগগির পারো ফিরো।

আমি একবার এদিক ওদিক চেয়ে বেয়ে দেখে আসি। ওকে নজরবন্দী রাখিস কিন্তু।

সে কথা আর বলতে হবে না।

প্রাণপণে ছুটে যেয়ো।

হাঁ হাঁ, চুপ কর্।

কিউবা দৌড় মারল।

মেয়েরা দিব্যি পেট ভ'রে খেয়ে নিল। ভিকৃতা বন্দীর মুখ খুলে দিলে, তাকেও কিছু খাওয়াল'। লোকটা বেপরোয়া। ওদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা জুড়ে দিলে। মেয়েদের হাতে ধরা পড়েছে তাই নিয়ে নিজেকে দিল দুয়ো।

আমাকে নিয়ে কি করবে তোমরা?

তোমার পায়ের দড়ি খুলে দেব। আমাদের মোট ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর তোমাকে খুন করা হবে। এই হচ্ছে বাবার মতলব।

না না, তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে বধ করবে না।

তুমি যে আমাদের ধরিয়ে দেবে।

দিব্যি গাল্‌ছি, কথ্‌খনো ধরাবো না।

বাবার যা ইচ্ছে।

৫

কুয়াশা গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসে। ওরা তিন বোনে একে একে বাইরে যতদূর চোখ যায় তন্ন তন্ন ক'রে দেখে, বুড়োর কোন চিহ্নই নাই। প্রতীক্ষায় থাকে ব'সে, নিঃশব্দে আঁধার রাত্রি আসে।

চেলাকাঠ রাশীকৃত ক'রে আগুন ধরায়। বেশ নিশ্চিন্ত এখন। নিশ্চয় জানে, কেউ ওদের সন্ধানে আসবে না এই রাতে। কুয়াশা এমন ঘনিয়েছে যে, বাইরে থেকে আগুনের ধোঁয়া চোখে পড়ে না। বন্দীর পায়ের বাঁধনটা পরখ ক'রে দেখে ওরা আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল, লোকটাকে মাঝখানে

রেখে। বাপের কথামত ওরা শিকারীর মুখটা বেঁধে রেখেছিল।

রোজা জেগে দেখে কুয়াশা একেবারে কেটে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। লেকের পাশের পাহাড়গুলো জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে আধখানি চাঁদ। চারিদিক নিস্তব্ধ। রোজা মাথা উঁচু ক'রে চেয়ে দেখে। শিকারীর এক পাশে আগুন, আর একদিকে উল্কা, পায়ের কাছে ভিকৃতা, রোজা মাথার কাছে। ওর মনে হ'ল উল্কা ঘুমের ভান ক'রে আছে।

রোজা মাথা তুলতেই ভিকৃতা ঘাড় ঘুরোলো। রোজার সন্দেহ হয় ওরা দুই বোন শিকারীর খুব কাছে স'রে এসেছে। প্রথম শোবার সময় এত কাছ ঘেঁষে শোয়নি। রোজাও শিকারীর কাছে স'রে এল, খুব আস্তে আস্তে। উল্কাও সেই চেষ্টায় ছিল। দুজনে লাগল ধাক্কা, রোজার হাঁটুটা উল্কার মাথার কাছে।

ঠেল্‌ছিস কেন, স'রে যা—এই ব'লে সে উল্কার হাতে মারল একটা চড়।

তুমি স'রে যাও না, আমি যেখানে ছিলুম সেখানেই আছি।

মিছে কথা বল্‌ছিস। আমার শীত লাগছে।

আমারও লাগ্‌ছে।

কতকগুলো কাঠ গুঁজে দে না।

তুমি দাও না!

বটে! মারব এক লাথি।

আমিও মারব।

রোজা এক লাফে উঠে বসল। উল্কাও সেই সঙ্গে শিকারীর উপর ঝুঁকে পড়ল, ওর গায়ের উপর হাতখানা রেখে।

ভিকৃতাও উঠে বসল। বললে—কি করছিস উল্কা?

উল্কা! রোজা গর্জিয়ে ওঠে।

কেন?—উল্কার গলার স্বর কাঁপে।

বটে?

কি?

স'রে যা এক্ষুণি।

আর তুমি?

আমি ওকে ধরেছিলুম

আমি বেঁধেছিলুম।

তাই বুঝি বাঁধন খুলতে চাস্?

আর তুমি? তুমি কি করতে চাও শুনি? আর যদি ওর বাঁধন খুলেই দিই, তোমার তাতে কি?

ও আমার।

আমারও।

তোর্?

নাও দেখি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে!

ইচ্ছে হ'লেই নেব'।

আমি নেব'।

নিবি? বটে!

ভাবছ বুঝি তুমি নেবে?

এইবার ওরা মুখোমুখী বসেছে। ভিকৃতার ভয় হয়, এখুনি বুঝি ওরা কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি সুরু ক'রে দেবে।

দূর হ!—এই ব'লে রোজা শিকারীর হাত ধরল।

তুমি দূর হও! এই বলে উল্কা জড়িয়ে ধরল ওর কোমর। আগুনের আভায় ভিকৃতাকে দেখে রোজার মুখখানা পাগলের মতন ভীষণ হয়েছে। রোজা তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে উল্কাকে মারল এক লাথি। লাথির চোটে সে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রোজা বন্দীর পিঠের তলায় হাত ঢুকিয়ে তাকে আড়্‌কোলা ক'রে মাটি থেকে তুলে ধরল, যেন তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। উল্কা অমনি তার পা দুখানা জড়িয়ে ধরল হাঁটুর কাছে, আর ভিকৃতা উত্তেজনায় পাগলের মত দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জাপ্‌টে ধরল ওর উরুযুগল। ওরা প্রত্যেকেই ওকে প্রাণপণ বলে নিজের দিকে টানে। শিকারীর বাঁধা মুখ ভেদ করে একটা গোঙ্‌রাণি ফুটে ওঠে। লোকটা ডাক ছেড়ে চীৎকার করতে চায়, বাঁধনের ফাঁকে বার হয় একটা ভীষণ অব্যক্ত স্বর। উল্কার জোর বেশী। সে লোকটার ঠ্যাং দুটো ধ'রে নিজের দিকে টেনে আনে, সেই সঙ্গে ভিকৃতার টানটাও দিব্যি যুৎসই হয়, রোজা এক পা দু পা তিন পা এগোয় হা'রের মুখে। ও কার হবে এবার?—উল্কা বলে গর্জন করে। রোজা একখানা পাথরে ভর রেখে ওদের টান সামলাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারল না। আরও দু পা ওকে ছিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে গেল দুই বোনে। তবে নে ওকে—এই বলে রোজা লোকটাকে উল্কার দিকে ঠেলে

নিয়ে গেল, তারপর ভীষণ জোরে ওর মাথাটা ঠুকে দিল সেই জগদ্দল পাথরের কোণে। একটা বিকট আওয়াজ বার হ'ল বদ্ধমুখ ভেদ ক'রে, ফিন্‌কি দিয়ে বার হ'ল রক্ত স্রোত, সেই সঙ্গে মাথার ঘিলু।

রোজার বাহুমুক্ত শিকারীর ধড়খানা সজোরে গিয়ে পড়ল উল্‌কা আর ভিক্‌তার উপরে। ওরা ভয়ে শিউরে উঠল, মুমূর্ষু শিথিল দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ভিক্‌তা। তুমি ওকে খুন করলে?

উল্‌কা। ওকে খুন করলি তুই?

রোজা। হাঁ করেছি। এখন ও তোর হ'ল ত?

রোজা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল'। হাত দুটো পিছনে, এবার যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

ভিক্‌তা তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে ভূলুণ্ঠিত শিকারীর মুখের বাঁধনটা খুলে দিলে। উল্‌কা এক লাফে ছুরি দিয়ে ওর পায়ের দড়ি কেটে ফেললে।

একটা ক্ষীণ অস্ফুট স্বর বার হ'ল ওর মুখ দিয়ে। নড়ল না আর। প্রাণহীন শবদেহ পড়ে রইল মাটিতে। তুমি ওকে বধ করলে—উল্‌কা আস্তে আস্তে বলল রোজাকে। ওই ত খুন করল—বলে ভিক্‌তা। ওরা নতজানু হয়ে বসেছে শবের পাশে। একজনের হাতে কাপড় আর একজনের হাতে ছুরি। দুজনের গায়েই রক্তের ছিটা।

রোজা স'রে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা চেলাকাঠ দিয়ে আগুন খোঁচায়। কেবল ছাই আর আঙ্‌রা পড়ে আছে। ঘরটা অন্ধকার।

এমন সময়ে শোনা গেল কিউবার গলা।—হে-হে-হিয়ো।

বাবা আসছে—উল্‌কা কম্পিতস্বরে বলে।

তোরা কোথায়? আগুনের ধারে কি করছিস? কাছে এসে কিউবা বলে—কুয়াশায় দিশাহারা হয়েছিলুম। অন্ধকারে পথ হাত্‌ড়ে চলতে চলতে একটা শুকো ঝোরার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। সেইখানে রাত কাটাতে হবে মনে হ'ল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু পড়ে না চোখে, শুধু কুয়াশার আঁধি। পথ হারিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে মরি—ওকি! কিউবা কাছে এসে চাঁদের আলোয় দেখল শিকারীর নিস্পন্দ মৃত দেহ, হাত-পা বাঁধনহীন। ব্যাপার কি! চুপ করে আছিস যে?

একটা শুকো ডাল জেলে উপুড় হয়ে ছাখে।

মাথাটা ত ফেটে চৌচির! কে ফাটাল'? ও কি পালাবার জন্যে হাত-পা'র বাঁধন ছিঁড়েছিল না কি?

আরও খুঁটিয়ে দেখে কিউবা বিড়বিড় ক'রে বলে—কাপড় ছেঁড়া, মাথাটা পাথরে চুরমার, ছুরি দিয়ে কাটা দড়ি ··· লোকটা ত নিজে ছেঁড়েনি ···

তারপর মেয়েদের শুধায়—তোরা কি ওকে ঠুকরেছিস বাজপাখীর মত?

মেয়েদের মুখে রা নেই।

ও করেছিল কি? নিজের মাথা ত নিজে ফাটায় নি, পা পিছলে প'ড়েও যায় নি—কোত্থেকে কোথায় পড়বে? তবে ব্যাপারটা কি?

মেয়েরা নীরব।

কিউবা পারিবারিক শাসনে দোর্দণ্ড। মাটিতে পদাঘাত করে হেঁকে ওঠে—চুপ করে রইলি যে নেড়িকুত্তোরা!

মেয়েরা শিকারীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দ। রোজার অপলক দৃষ্টি বাপের মুখের উপরে। উল্‌কা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিক্‌তা ঘাড় নীচু ক'রে ঝাড়নের খোঁটটা কামড়ায় তার ঝকঝকে দাঁতে। কিউবার যেটুকু ধৈর্য ছিল এইবার শেষ হ'ল। হাতের কাছে ছিল একটা লাঠি। সেটা নিয়ে তেড়ে গেল ভিক্‌তার কাছে। বল্‌বি না? বল্ ডাইনী!—ভিক্‌তা ভয় পেয়ে স'রে যায়, হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে বলে—আমরাই খুন করেছি।

কিউবা থমকে দাঁড়ায়। যেন হঠাৎ মাটি তার পা জড়িয়ে ধরল। তারপর সবিস্ময়ে বলে—তুই খুন করেছিস?

আমরা। একটু পরে আবার ভয়ে ভয়ে বলে—রোজা।

কিউবার তবুও চমক ভাঙে না।

বোবা হলুম নাকি? কি বলব, কথা পাইনে খুঁজে!

(রোজার দিকে তাকিয়ে) তুই মেরেছিস্? কেন? বলি কিসের জন্যে? ও কি ঘুমের ঘোরে দড়ি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল? না, তোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল? ওর হাত পা ত ছিল বাঁধা! তুই বাঁধন কেটেছিলি না কি?

ভিক্‌তা।—আমরাই কেটেছি। কিন্তু সে তখন ম'রে গেছে! কিউবা হতভম্ব হয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

বলি কেন খুন করলি? ··· তা হ'লে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওকে নির্যাতন করলি, ওর মাথা ফাটালি?

মেয়েরা আবার নিশ্চুপ।

কেন, কেন বল্ ত?

রোজা মাটির দিকে চায়। উল্কা মুখ ফিরোয়। ভিকৃতা ঘাড় হেঁট করে আবার ঝাড়ন চিবোয়।

কিউবার মুখে কথা নেই। সে একে একে ওদের প্রত্যেকের পানে চায়। মেঘভাঙা চাঁদের আলো ঘরে আসে। বাত্তিৎসোর চূড়া তুষারাবৃত পাথরে পাথরে করে ঝলমল। কেন? তোরা ওকে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিলি বুঝি? না, আর কিছু? খানিকক্ষণ ওদের দিকে চেয়ে থাকে, তারপরে বলে হুঁ। বলি এত লজ্জা কিসের? ঘাড় হেঁট করে রয়েছিস, চোখ তুলে চাইতে পারিস্ না ···

বলি হয়েছে কি? আবার দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে ক্রোধাগ্নি। বজ্ররবে বলে—বল্ সব খুলে, নইলে শয়তানের দিব্যি, তোদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলব!

উন্মত্তের মত কুড়োলটা হাতে নিল। ভিকৃতা আর উল্কা ত আঁত্‌কে উঠে লাফ দিয়ে সরল তফাতে, যদিও কিউবা স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। রোজা এইবার ভাঙা গলায় বলে—ওরা ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। ··· ও যে আমার ··· তাই ···

কিউবার বিস্ময় আর ঘোচে না। কেড়ে নিতে চেয়েছিল?—তার মানে কি? কই, কিছুই ত বুঝলুম না ··· অ্যাঁ, কাড়্‌বে কেন, কিসের জন্যে?

উল্কা ওর গা ঘেঁষে শুয়েছিল।

ভিকৃতাও—উল্কা ফস্ করে বললে।

রোজাও—ভিকৃতা নালিশ করে খোঁচা খেয়ে।

ওরা দুজনেই ওর গায়ে গা ঠেকিয়েছিল—রোজা বলে পাল্টা জবাবে।

কিউবা চুপ করে সব শুনল, রইল মৌন কিছুক্ষণ। হঠাৎ মাথা তুলে মুখ খুলে নিল একটা দীর্ঘশ্বাস। তারপরে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল মাটিতে, আর যেন ফেটে চুরমার হ'ল হাসির দমকে। হাঃ হাঃ হাঃ! সেই অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি হ্রদ পার হয়ে উপত্যকায় গড়িয়ে চলে দূর থেকে দূরান্তরে।

হাঃ হাঃ হাঃ! কিউবা হাসে। ওরে শয়তানও হেসে কুটিকাটা হবে! হাঃ হাঃ হাঃ! তা হ'লে তোরা ওকে টুক্‌রো করে বক্‌রা করার চেষ্টায় ছিলি? কে আছিস আমাকে ধর্, আমি দেখছি হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরব। উঃ, পেটে খিল ধরে গেল! হাঃ হাঃ হাঃ!

কিউবা একটা পাথরের উপর উঠে বসে। আর সেই দুলে দুলে অট্টহাস্য—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

রোজা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে কিউবার মুখে, তার চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। উল্কা আবার মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিন্তু বাপের এই হাসির ছোঁয়াচ লাগে ভিকৃতার মুখে। সেও খিল খিল ক'রে হাসতে আরম্ভ করে, এক অদ্ভুত হাসির কোঁকানি—এ হাসি ত তার নয়।

কিউবার হাসি যখন ফুরোলো, তখন সে চোখের জল মুছে কোমরবন্ধটা এঁটে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। এখনও হাসির জের মেটেনি।

আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে। চল্ বেটিরা, ভোর হয়ে এল। আর মুহূর্ত বিলম্বে কাজ নেই। গোয়েন্দারা আমাদের খোঁজে বার হবে এখনি। ওরা আমাদের সন্ধান পেয়েছে এতদিন পরে। শিকারীর পায়ের ছাপও ওরা ধরতে পারবে অনায়াসে। কেউ এসে পড়বার আগেই পালাতে হবে।

শিকারীর দিকে তাকিয়ে বলে—লোকটা বেঁচে থাকলে মোট বইবার সুবিধা হ'ত। যা হোক, আমরা কোন মতে মাল সরাতে পারব। আর দেরি নয়, এবার ঝটপট গা তোল সব জমিদারের বেটিরা!

মেয়েরা ঝড়ের মত লেগে গেল পাত্তাড়ি গোটাতে। শিকারীর ব্যাপারটা যে বাপের মন থেকে স'রে গেছে তাতে মেয়েরা খুশীই হ'ল। মালপত্র গোছানো শেষ হ'লে কিউবা আবার ঠাট্টা জুড়ে দিলে।

আর একটু ধৈর্য ধ'রে থাক্ তোরা। তোদের গায়ে মামাবাড়ীর রক্ত আছে বটে, নিট কাপ্‌কুলার রক্ত। কাপ্‌কুলার মেয়ে যখন বর পাকড়ায়, তখন বিড়ালী যেন ধরে চড়াই পাখী। তাই বলি, আর একটু সবুর কর্ তোরা। একটু চেপে থাক্, একবার দেশে গিয়ে পৌছই। তা এখন তোরা দিব্যি নাদুস্ নুদুস্ হয়েছিস, শ্রী ফিরেছে ··· হাঃ হাঃ হাঃ! আবার সেই হাসির ফোয়ারা ··· মুহূর্তের জন্যে গাঁঠ্‌রি বাঁধায় ঢিলা পড়ে।

অনেক গল্পই শুনেছি বটে; এর জুড়ি আর নেই। সব প্রস্তুত, এইবার যাত্রারম্ভ।

সঙ্গে খাবার পুঁটলিটা নিস্। ওরে উল্কা, তোর ভাগটা একটু কোল টেনে রাখিস্, তোর খিদেটা বেশী। এইবার উঠাও পাল্কি। বোঝার ভারে সবাই কাবু। পরস্পরের পিঠে লুঠের মাল তুলে দেয় ওরা। যাত্রার সময় কিউবা হঠাৎ একটু থেমে বলে—তা ভালই হয়েছে। শুধু একজন হ'লে ফ্যাসাদে পড়তে হ'ত বই কি! তারপর তাড়াতাড়ি পিঠের ঝুলিটা নামিয়ে শিকারীর শবের কাছে গেল। তাকে উপুড় ক'রে ছুরি বসিয়ে দিলে কাঁধ থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত।

চল্ এইবার যত শিগ্‌গির পারিস্।

দেবদাসী

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

দেবী আমি নই, দেবদাসী শুধু,
দাবী নাই মোর অমৃত পানে,
মানস-মোহিনী এ-দেহ আমার
লাগে দেবতার ভোগেরি দানে।
ওগো দেব তুমি চাহ কি কেবল
এ-বর তনুর বিমল শোভা?
শুধু নিশিদিন পুত্তলি সম
হ'য়ে রবো তব মানস-লোভা?
আমি চির-নটী উৎসব-দাসী,
তোমারি সেবায় দিয়েছি দেহ,
রূপেরি বিভায় রেখেছ উজল
দাও না কখনও হৃদয়-স্নেহ!
তুমি নটনাথ, কনক-আসনে
নেহারিছ শুধু দিবস-যামী—
সঙ্গীত-সুর-তাল বিভ্রমে
নাচের ছন্দ যায় কি থামি'!
তব বাসরের সঙ্গিনী যেবা
আমি সেবি তায় কেবলি নিতি,
মোর পানে হায় ফিরে সে চাহে না
দেয় না ক্ষণিকো প্রাণের প্রীতি।

*

বধির শ্রবণে অন্ধ নয়নে
নেচে যাই শুধু পুতলী সম,
নাচের ছন্দে পরমানন্দে
জাগে না কিছুতে এ-প্রাণ মম।
ধূপ-গুগ্‌গুলে সুবাসিত গৃহে
লুটাই যখন চরণ 'পরে—
নয়নের পরে ঘনায় কুহেলি
হু-হু করে হিয়া মাটীর তরে।
আঁখি যুগলের তৃপ্তির লাগি
বুকের নিগূঢ় সুবাস হরি,'—
গড়িলে কি হায় একটি কমল
দিয়ে শুধু শোভা এমন করি?
পাষাণের মত কনকাভরণ
বেড়াবো কি বহি' দিবস-যামী?
ওগো দেব! তব দেউল-দুয়ারে
চির-বন্দিনী রবো কি আমি?

*

ফুরায় আরতি, পূজা হয় শেষ,
জলে ওঠে শত প্রদীপমালা,
বাঁশরীর তানে নাচি তালে তালে
মুখরিত করি নাট্যশালা!
ললিত-পেলব ভুজ-ভঙ্গীতে,
কবরীর নব মোহন ছাঁদে—
শত শত হিয়া হ'য়ে নিই চুপে,
কামনা তাদের গুমরি' কাঁদে!
তবু যেন প্রাণ করে আনচান
বুকের বেদনা পায় না দিশা,
যত গান দিয়া চেপে রাখি হিয়া
বেড়ে ওঠে জ্বালা—মেটে না তৃষা।
এই কি কেবল চাহ তুমি দেব?
আমার সকল জীবন ভরি'—
রূপের বিভায় রাখিবে উজল
যৌবন সম নিবেনা হরি'?
ওগো সুন্দর! চিরদিন তুমি
এমনি আসনে রবে কি বসি'?
কণ্ঠ আমার হ'বে নাকি ক্ষীণ
বলয়-নূপুর যাবে না খসি'?

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কম্বল *

কম্বল একপ্রকার গীত-বিশেষ। ভগবান মহেশ্বর স্বীয় কুণ্ডল-স্থানীয় কম্বল নামক নাগের প্রতি প্রীত হইয়া এই জাতীয় গীত তাহাকে দান করেন; সেই অবধি উক্ত কম্বল নাগের নাম অনুসারে এই শ্রেণীর গীত কম্বল নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে, ভগবান মহেশ্বর স্বীয় বর-প্রভাবে এখনও এই গীত শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

কম্বল গীতের গ্রহ অংশ ও অপন্যাস স্বর পঞ্চম। ঋষভ স্বর এই গীতে বহুল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার ন্যাস স্বর ষড়জ ও মধ্যম। ধৈবত ও গান্ধার এই গীতে অল্প। এই গীত পঞ্চমী জাতি হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলেন—অল্পত্ব, বহুত্ব, ঈষৎ, স্পর্শ ইত্যাদি ভেদে বহু প্রকার স্বর এই শ্রেণীর গীতে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে কোন স্বরের প্রয়োগ অল্প, কোন কোন স্বরের প্রয়োগ অধিক।

গীতি

বর্ণ ও অলঙ্কারে মণ্ডিত পদ ও লয়যুক্ত গানকে গীতি বলে। এই গীতি চারি প্রকার, যথা—(১) মাগধী (২) অর্দ্ধ মাগধী (৩) সম্ভাবিতা (৪) পৃথুলা। ইহাদের লক্ষণ যথাক্রমে নিম্নে বলা যাইতেছে—

মাগধী গীতি

মগধ দেশে উৎপন্ন বলিয়া এই গীতিকে মাগধী গীতি বলে। এই গীতিতে তিনটি কলা ব্যবহৃত হয়। এই তিনটি কলাই চারি মাত্রা-বিশিষ্ট। নিম্নলিখিত উদাহরণে প্রথম কলার 'দেবং' দুই অক্ষরযুক্ত এই পদটি বিলম্বিত লয়ে গান করিতে হইবে। বিলম্বিত লয়ে বিশ্রাম কাল চতুর্গুণ। প্রথম কলার 'দে' এই অক্ষরে দুই মাত্রা 'বং' এই অক্ষরে দুই মাত্রা মোট চারি মাত্রা যোজনা করিবে। দ্বিতীয় কলার পদ 'দেবং রুদ্রম্'। মধ্য লয়ে ইহা গান করিতে হইবে। মধ্যলয়ে বিশ্রান্তি-কাল বিলম্বিত লয়ের অর্দ্ধ পরিমাণ, চতুর্গুণের অর্দ্ধেক দ্বিগুণ। দ্বিতীয় কলা 'দে' একমাত্রা, 'বং' একমাত্রা, 'রু' একমাত্রা, 'দ্রুম্' একমাত্রা—এইরূপে চারিমাত্রা যোজনা করিতে হয় অথবা 'দেবম্' পদে দুই মাত্রা 'রুদ্রম্'পদে দুই মাত্রা এইরূপে চারি মাত্রা যোজনা করিবে। তৃতীয় কলায় পদ 'দেবং রুদ্রং বন্দে'। এই কলায় 'দেবং' একমাত্রা 'রুদ্রং' একমাত্রা 'বং' একমাত্রা 'দে' একমাত্রা এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ চারি মাত্রা যোজনা করিবে।

মাগধী গীতিতে প্রথম পদটির তিনবার আবৃত্তি হয়, দ্বিতীয় পদটির দুইবার আবৃত্তি হইয়া থাকে। নিম্নে স্বরযোগে মাগধী গীতির উদাহরণ চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে —

মাগা	মাধা	ধনি	ধনি	সনি	ধা
দে০	বং০	দে০	বং০	রু০	দ্রং০
	রিগ	রিগ	মগ	বিস	
	দেবং	রুদ্রং	বং০	দে০	

অর্দ্ধ-মাগধী গীতি

অর্দ্ধ-মাগধী গীতি ও মাগধী গীতির ন্যায় তিন কলায় পরিসমাপ্ত হয়। তন্মধ্যে প্রথম কলার অর্দ্ধ ভাগ দ্বিতীয় কলার আদিতে যুক্ত হয়, এইরূপ দ্বিতীয় কলার অর্দ্ধভাগ (অর্থাৎ শেষ অক্ষরটি) তৃতীয় কলার আদিতে প্রযুক্ত হয়—ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় কলার দুইটি অর্দ্ধেক দুইবার আবৃত্তি হয় তবে এইরূপ গীতিকেই মাগধী গীতি বলে। স্বরযোগে অর্দ্ধ-মাগধীর উদাহরণ—চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে—

মা	রী	গা	সা	সা	সা	ধা	নী	পা	ধা	পা	মা
দে	০	বং	০	বং	রু	দ্রং	০	দ্রং	বং	দে	০

কেহ কেহ বলেন—পদার্দ্ধের দুইবার আবৃত্তি নহে। প্রথম ও দ্বিতীয় কলার দুইটি পদেরই দুইবার আবৃত্তি হইলে তাহাকে অর্দ্ধ-মাগধী বলে। এই মতে অর্দ্ধ-মাগধীর উদাহরণ নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

* ১৩৪৭ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় যে প্রবন্ধাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই পরবর্ত্তী অংশ।

মা	মা	মা	মা	ধা	.সা	ধা	নী	পা	নিধ	পা	মা
দে	০	বং	০	দে	বং	রু	দ্রং	রু	দ্রং০	ব	ন্দে

এই উদাহরণে দ্বিতীয় কলায় 'বং' অংশের পুনরাবৃত্তি না হইয়া 'দেবম্' এই পদেরই আবৃত্তি হইয়াছে, এইরূপ তৃতীয় কলায়ও 'দ্রং' এই অংশের আবৃত্তি না হইয়া 'রুদ্রং' এই পদেরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার চতুর কল্লিনাথ এই প্রসঙ্গে প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্য মতঙ্গের মত উল্লেখে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়টি এই—

প্রশ্ন তুলিয়াছেন—অর্দ্ধমাগধী গীতিতে এই যে 'দেবং' এই একটি পদেরই দুই তিনবার আবৃত্তি করা হইতেছে, ইহাতে পুনরাবৃত্তি দোষ কেন হইবে না, কেনই বা দেবং এই পদের 'বং' এই অংশ 'বন্দে' এই পদের সহিত সংযুক্ত করিয়া যখন 'বং বন্দে' রূপে পরিণত করা হইল তখন 'বং' এই অংশের অর্থ-শূন্যতা দোষ হইবে না? ইহার উত্তরে মতঙ্গ বলিয়াছেন—"সামবেদে গীত-প্রধানে আবৃত্তির্ধর্মা নাদ্রিয়ন্তে" অর্থাৎ সামবেদ গীত-প্রধান, সামবেদের শব্দরাশি মুখ্যভাবে সুসংবদ্ধ স্বরলহরীর মাধুর্য্যেই দেবতাগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া থাকে। অর্থ সেখানে গৌণ সুতরাং অর্থানুসন্ধান কালে যে পুনরুক্ততা দোষ ও অর্থশূন্যতা দোষ পরিলক্ষিত হয়, গীতি-প্রধান সামবেদে তাহা উপেক্ষণীয়; এই নিয়মে লৌকিক গীতিতেও পুনরুক্তি দোষ ও অর্থশূন্যতা দোষ ধর্ত্তব্য নহে।

সম্ভাবিতা গীতি

স রি গ ম ইত্যাদি যতগুলি স্বর গীতিতে প্রযুক্ত হয়, ততগুলি অক্ষরের বিন্যাসকেই পদের 'বিস্তর' বলা হয়। এই বিস্তরের অভাব বা স্বর অপেক্ষা পদের সঙ্কোচ বা অল্পতাই সংক্ষেপ। যে গীতিতে স্বর অপেক্ষা পদের এইরূপ সংক্ষেপ করা হয় এবং যাহাতে বহুল পরিমাণে গুরু অক্ষর যোজনা করা হয় তাহাকেই সম্ভাবিতা গীতি বলে। স্বর অপেক্ষা পদের এইরূপ সংক্ষেপ ইহাতে সম্ভাবিত বলিয়াই এই গীতির নাম—সম্ভাবিতা। এই গীতির কলা চারিটি। প্রত্যেকটি কলায় চারিটি করিয়া মাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়। এই গীতির উদাহরণ-চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

মা	রী	গা		রী	গা	সা	সা
ভ	০	ত্যা	০	দে	০	বং	০
নী	ধা	সা	নী	ধা	নী	মা	মা
রু	০	দ্রং	০	বং	০	দে	০

কলায় স্বর-যোজনা যে-কোন একটি জাতি অবলম্বনে করিতে হয়। প্রদর্শিত উদাহরণের নিয়মে অন্য উদাহরণে স্বর ও পদের যোজনা করিতে হইবে।

পৃথুলা গীতি

যে গীতি বহু পরিমাণে লঘু অক্ষর যোজনায় রচিত, তাহাকে পৃথুলা গীতি বলে। এই গীতিরও কলা চারিটি। প্রতি কলায় মাত্রাও চারিটি। স্বর-সংযোগে ইহার উদাহরণ-চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

মা	গা	রী	গা	সা	ধনি	ধা	ধা
সু	র	ন	ত	হ	র০	প	দ
ধা	মা	ধা	নি	পা	নধপ	মা	মা
যু	গ	লং	০	প্র	ণ০০	ম	ত

এই গীতিতে প্রায় প্রত্যেক স্বরেই এক একটি অক্ষর যোজনা করা হয়; সুতরাং অন্য তিন প্রকার গীতি অপেক্ষা এই গীতিতে পদবিন্যাস সমধিক, এই জন্যই ইহার নাম 'পৃথুলা'। প্রত্যেকটি কলায় স্বর-যোজনা করিতে হয়—যে জাতির আশ্রয়ে গীতিটি রচিত, সেই জাতির নিয়মে। এই চারি প্রকার গীতি পুনরায় দুই প্রকার, যথা—পদাশ্রিত ও তালাশ্রিত। ইতিপূর্ব্বে যে গীতির লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহা পদাশ্রিত গীতি। তালাশ্রিত গীতির লক্ষণ নিম্নে বলা যাইতেছে।

তালাশ্রিত মাগধী গীতি

তালাশ্রিত মাগধী গীতি বুঝিতে হইলে মার্গতাল সম্বন্ধে মোটামোটি পরিচয় আবশ্যক। সুতরাং আমরা মার্গতাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া তালাশ্রিত মাগধী গীতির পরিচয় দিতে প্রয়াস করিব।

লঘু গুরু ও প্লুত এই তিন প্রকার স্বর উচ্চারণের জন্য

যে পরিমাণ কাল আবশ্যক, সেই পরিমাণ কাল এক একটি হস্তাদি ক্রিয়া দ্বারা পরিমিত হইয়া যখন নৃত্য গীত ও বাদ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন সেই কালভাগকেই তাল বলে। এই তাল দুই প্রকার ;—মার্গতাল ও দেশীতাল। এই হস্তাদি-ক্রিয়া দুই প্রকার—(১) নিঃশব্দ ক্রিয়া ও (২) সশব্দ ক্রিয়া। নিঃশব্দ ক্রিয়া চারি প্রকার—আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক। সশব্দ ক্রিয়া ধ্রুব, শম্পা, তাল ও সন্নিপাত নামে চারিপ্রকার।

আবাপ—উত্তান বা চিৎকরা হাতের অঙ্গুলি কুঞ্চনকে আবাপ বলে। নিষ্ক্রাম—অধোমুখ হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণকে নিষ্ক্রাম বলে। বিক্ষেপ—উত্তান ও প্রসারিত অঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণ হস্তটিকে দক্ষিণ পার্শ্বে নিক্ষেপ করাকে বিক্ষেপ বলে। প্রবেশক—অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি কুঞ্চনকে প্রবেশক বলে। সশব্দ ক্রিয়া—ধ্রুব—ছোটিকা (তুড়ী) শব্দপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত নিম্নে অবতরণ করাকে ধ্রুব বলে। শম্পা—কেবল দক্ষিণ হস্তের নিম্নে অবতরণ করাকে শম্পা বলে। তাল—কেবল বাম হস্তের পাতনকে তাল বলে। যুগপৎ দুই হস্তের অধঃপাতনকে সন্নিপাত বলে। এইরূপ হস্তক্রিয়া নিম্নলিখিত বিভিন্ন মার্গে তিন প্রকার। তালের মার্গ চারি প্রকার—(১) ধ্রুব মার্গ, (২) চিত্রমার্গ, (৩) বার্ত্তিক মার্গ ও (৪) দক্ষিণ মার্গ। ধ্রুব মার্গের কলা একমাত্রা-বিশিষ্ট। চিত্র মার্গের কলা দুই মাত্রাযুক্ত, বার্ত্তিক মার্গের কলা চারিমাত্রা-বিশিষ্ট ও দক্ষিণ মার্গের কলা আটমাত্রা-যুক্ত। আটটি-মাত্রার যথাক্রমে নাম, (১) ধ্রুবকা, (২) সর্পিণী, (৩) কৃষ্ণা, (৪) পদ্মিনী, (৫) বিসর্জ্জিতা, (৬) বিক্ষিপ্তা, (৭) পতাকা, (৮) পতিতা।

ধ্রুবমার্গে একটিমাত্র ধ্রুবকা নামক কলা প্রযোজ্য। চিত্রমার্গে ধ্রুবকা, পতিতা, পতাকা ও সর্পিণী এই চারিটি কলা প্রযোজ্য। বার্ত্তিক মার্গে ধ্রুবকা ও পতিতা এই দুইটি কলা আর দক্ষিণ মার্গে পূর্ব্বোক্ত আটটি কলাই প্রয়োগ করিতে হয়। পাঁচটি লঘুস্বর উচ্চারণে যে পরিমাণ কাল আবশ্যক হয় সেই পরিমাণ কাল আবশ্যক হয় একটি মাত্রা উচ্চারণ করিতে। তাল-প্রকরণে এইরূপ একমাত্রা লইয়া লঘু, দুই মাত্রায় গুরু ও তিন মাত্রায় প্লুত প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

চতুরস্র ও ত্র্যস্র নামে তাল দুই প্রকার। যথাক্রমে এই দুইটি তালের নামান্তর চঞ্চৎপুট ও চাচপুট। এই দুইটি তালের প্রত্যেকটি আবার যথাক্ষর, দ্বিকল ও চতুষ্কল নামে তিন প্রকার। চঞ্চৎপুট এই নামের লঘু গুরু অক্ষর লইয়া SSIS´ এইরূপ আট মাত্রা-বিশিষ্ট তালকে যথাক্ষর 'চঞ্চৎপুট' তাল বলে। এইরূপ 'চাচপুট' এই নামের লঘু-গুরু সন্নিবেশ অনুসারে SIIS এইরূপ ছয়মাত্রা বিশিষ্ট তালকে যথাক্ষর 'চাচপুট' তাল বলে। ইহাই এক কল তাল, দ্বিকল তাল ইহার দ্বিগুণ ষোল ও বার মাত্রা-বিশিষ্ট, চতুষ্কল তাল চতুর্গুণ মাত্রা-বিশিষ্ট। তাল সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা স্মরণ থাকিলে তালাশ্রিত গীতি বুঝিবার সুবিধা হইবে। এইবার আমরা তালাশ্রিত গীতির আলোচনায় প্রথমতঃ তালাশ্রিত মাগধী গীতির স্বরূপ বুঝিতে প্রয়াস করিব।

যথাক্ষর চঞ্চৎপুট (SSIS´) এইরূপ আট মাত্রা-বিশিষ্ট। তালের প্রথম যে দুইটি গুরু (S) মাত্রা আছে, তাহার প্রত্যেকটি গুরুমাত্রায় পূর্ব্বোক্ত চিত্রমার্গের নিয়মে ধ্রুবকা (ছোটিকা শব্দপূর্ব্বক হস্ত পাতন) ও পতিতা (কেবল কর পাতন) নামক দুইটি মাত্রা প্রয়োগ করিবে। তৎপর বার্ত্তিক মার্গের নিয়মে চগণ স্বরূপ চারিটি মাত্রা ধ্রুবকা, সর্পিণী, পতাকা ও পতিতা নামক চারি প্রকার হস্ত-ক্রিয়া দ্বারা প্রয়োগ করিবে। তৎপর দক্ষিণ মার্গের নিয়মে ধ্রুবকা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার করক্রিয়াদ্বারা ঐ চগণের চারি মাত্রাকে আট কলায় পরিণত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাই মাগধী গীতি।

তালাশ্রিত অর্দ্ধ মাগধী

যথাক্ষর চঞ্চৎপুট (SSIS´) এই আটমাত্রা-বিশিষ্ট। তালের তৃতীয় লঘু (এক) মাত্রাটি 'ছগণ' নামক ছয়মাত্রা বিশিষ্ট গণের অর্দ্ধ পরিমাণ (তিন) মাত্রার সহিত যুক্ত হইয়া চারি মাত্রায় পরিণত হয়। এই চারিটি মাত্রাকে ধ্রুবকা, সর্পিণী, পতাকা ও পতিতা এই চারি প্রকার হস্তক্রিয়া দ্বারা প্রথমতঃ প্রয়োগ করিবে। তৎপর চঞ্চৎপুট তালের শেষ প্লুত বা তিন মাত্রাকে সার্দ্ধ ছগণ অর্থাৎ নয় মাত্রার সহিত যোগ করিয়া মোট বার মাত্রায় পরিণত করিবে। তৎপর এই বারটি মাত্রার মধ্যে প্রথমোক্ত আটটি মাত্রাকে ধ্রুবকা হইতে আরম্ভ করিয়া পতিতা পর্য্যন্ত যে আট প্রকার হস্ত-

ক্রিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রয়োগ করিয়া অবশিষ্ট চারিটি মাত্রাকে পতাকা ও পতিতা এই দুই প্রকার হস্তক্রিয়ার ক্রমিক দুইবার দ্বিগুণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাকেই তালাশ্রিত অর্দ্ধমাগধী গীতি বলে। চঞ্চৎপুট তালে যেমন এই দুইটি গীতি প্রদর্শিত হইল, এইরূপ অন্য তালেও এই গীতিগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সম্ভাবিতা ও পৃথুলা গীতি

বহুগুরু মাত্রা রচিত গীতি যেখানে দ্বিকল চঞ্চৎপুটাদি তালে ও বার্ত্তিকমার্গের নিয়মে প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই তালাশ্রিত সম্ভাবিতা গীতি বলে।

আর বহু লঘুমাত্রা রচিত গীতি যদি চতুষ্কল চঞ্চৎপুট তালে দক্ষিণ মার্গের নিয়মে প্রযুক্ত হয় তবে তাহাকে তালাশ্রিত পৃথুলা গীতি বলে।

কোকিলের ব্যথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মনে পড়ে রে—সেই দূর বনভূম,
প্রিয় কাক-কাকীদের কাকলির ধুম।
　সেই সুখময় ভোর—
　আজ মনে পড়ে মোর,
শাখে শাখে জল্‌সার মহা মরশুম।

২

আমি যে পরের ছেলে, আমি এত পর,
ভাবি নাই, লভিয়াছি মায়ের আদর।
　হায় কি সুখের নীড়,
　সে কি পুলক নিবিড়,
জননীর পাখা ঢাকা নির্ভয়ে ঘুম।

৩

কণ্ঠে ও দেহে মনে মাখা মমতা,
ভুলিব কি? ভুলিবার নাহি ক্ষমতা।
　স্মৃতি তাদেরি শুধু—
　বুকে জোগায় মধু,
যেথা যাই পথে পথে ফোটায় কুসুম।

৪

এ জীবনে হায় আমি আর পাব না,
স্নেহ চঞ্চুর সেই শস্য কণা।
　কোথা কোথারে তারা?
　ডাকি আপনা হারা,
সাড়া নাই, সারা বন রয়েছে নিঝুম।

৫

ফাল্গুনে হেরি নিতি নূতন শোভা,
ধাত্রী সে কোথা? জগধাত্রী রূপা।
　সেই ভোলা ভাই বোন—
　সদা টানে মোর মন,
সেথা কার ধূলি মোর রেণু কুঙ্কুম।

৬

মোর ডাকে মাধবীরা ফোটাইছে ফুল,
থরে থরে জাগিতেছে আম্রমুকুল,
　মোর সকল এ গান—
　জানি তাহাদেরি দান,
তাহাদেরি ছেলে, আজ বিদেশে কুটুম।



ছায়া

শ্রীসুশীল জানা

মফঃস্বল শহরের স্কুল—ছাত্রী-সংখ্যাও অল্প, অবস্থাও ভাল নয়। সম্প্রতি কোন ধনী সদাশয় ভদ্রলোক সমস্ত ব্যয়-ভার নিতে রাজী হয়েছেন এবং মোটা টাকাও তিনি দান করছেন। স্কুলের পুরানো নাম বদলে নতুন নাম হবে। ভাল ভাল মাস্টারণী আসবে কয়েকজন—তবে হেড মিস-ট্রেস্‌-হিসেবে সুযোগ্যা অরুন্ধতীর জায়গায় নতুন কেউ আর আসচে না। শুনে অরুন্ধতী নিশ্চিন্ত হ'ল বই কি।

সেদিন বিকেলের দিকে একটি প্রিয়দর্শন যুবক এল অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা করতে। যুবকটির দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতী চম্‌কে উঠল—কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল সে। অত্যন্ত পরিচিত মুখ। কথার ভঙ্গি, কথার মাঝখানে মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ অকারণ নিঃশব্দ সুন্দর হাসি—ভয়ানক পরিচিত অরুন্ধতীর। কথার মাঝখানে অরুন্ধতী বার বার অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল, ভাল ক'রে সহজভাবে কথা কইতে পারল না সে, ভাল ক'রে তাকাতে পারল না যুবকটির দিকে। যুবকটি কিন্তু দিব্যি কথা কয়ে গেল সহজে। কোন পরিচয়, কোন বিস্ময়—কোন কিছু নেই তার চোখে।

অরুন্ধতী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, আপনিই তা হ'লে ইস্কুলের ভার নিচ্ছেন ?

যুবকটি আস্তে আস্তে বললে, ওকথা বললে ভুল হবে একটু! বাবার টাকা—আমি সেটার সদ্ব্যবহার করতে এসেছি এবং তার মধ্যে আপনার সহযোগিতা খুব বেশী দরকার। কিসে ভাল হয়—আপনিই বুঝবেন ভাল সেটা। দীর্ঘ দিন আছেন এর মধ্যে আপনি—

তারপর যুবকটি দু-এক কথার পর বিদায় নিল। অরুন্ধতী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল একা। অন্ধকার হ'য়ে এল আকাশ, অন্ধকার ভিড় ক'রে এল ঘরের মধ্যে। চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। দুটি নাম শুধু তার মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। স্কুলের নতুন নাম হবে—তরুর নামে হবে স্কুল—আর সে তার হেড মিস্‌ট্রেস্‌! কি ক'রবে সে! ভাবতে লাগল অরুন্ধতী। অনেকের কথা—অনেকের মুখ মনে পড়ল তার; সেই বিষাদ, তরু—তার বিপত্নীক নিঃসন্তান মামা, তাদের ব্যারাকপুরের মস্ত বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা বাংলো-ধরণের বাড়ী—টেনিস খেলা আর অনেক যুবক।

তরুর বুড়ো মামা তাঁর লাইব্রেরী-ঘরে থাকতেন বাইরের জগতের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে। টেনিস লনে তরুকে ঘিরে তার যে সব বন্ধু বান্ধবীরা জড়ো হ'ত—তাদের সঙ্গে মৌখিক দু-একটি কথা ছাড়া আর বিশেষ কোন পরিচয় বা সম্বন্ধ ছিল না তাঁর। শুধু বিষাদ ছিল তাঁর ভয়ানক অন্তরঙ্গ। বিষাদকে পাওয়া যেত না টেনিস লনে, পাওয়া যেত না ঘাসের ওপরে পাতা চায়ের টেবিলে। সে আসত আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তরুর মামার সঙ্গে অনেক আলোচনা—অনেক তর্কে কাটিয়ে দিয়ে চলে যেত। তরুর বন্ধু-বান্ধবীদের চাপল্য কোন দিনই স্পর্শ করত না তাকে। তাই তাদের অনুযোগ ছিল বিষাদের বিরুদ্ধে—বগত: দাম্ভিক-অহঙ্কারী-অসামাজিক।

তরুর মারফৎ যেদিন এই কথাটা বিষাদের কানে উঠল—সেদিন উত্তর দিয়েছিল সে: ওদের হ্যাংলামি আমি সহ্য করতে পারিনে। দুঃখ হয়—তুমিও ওদের সঙ্গে মিশে গিয়েছ।

কথাটা তরুকে আঘাত দিয়েছিল বড়। তরু রাগ ক'রে—হয় ত বা কতকটা অপমানেই বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে আরও বেশী ক'রে হৈ হৈ সুরু করল। বিষাদ আসত—তরু যেন এড়িয়ে চলত তাকে। ক্রমশ তারপর বিষাদের আসা-যাওয়া কমতে সুরু করল।

একদিন সে তাই জিজ্ঞেস করেছিল তরুকে, সকলেই আসে, বিষাদবাবু আর আসেন না কেন তরু ?

তরু জবাব দিয়েছিল, আমাদের হ্যাংলামি পছন্দ করেন না উনি।

সে বলেছিল—বেশ ত—তোমার বাড়াবাড়ি না হয় কমালেই একটু।

তরু চটে ব'লেছিল, তুমিও একে বাড়াবাড়ি বলছ!

বিষাদ ভালবাসত তরুকে এবং তার স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিল না তরু। ওদের ভবিষ্যতের নিবিড় একটি সম্বন্ধের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছিল সে একথা। কিন্তু তরু বলেছিল, সকলে ওকে বলে দাম্ভিক-অহঙ্কারী। কথাটা বুঝতে পারিনি এতদিনে—এখন বেশ বুঝিচি, সেটা মিথ্যে নয়।

সে বলেছিল, মিথ্যে বই-কি। উনি একটু অসাধারণ, অহঙ্কারী ব'ল না।

তরু বলেছিল, বাস্‌রে—এত শ্রদ্ধা! বিষাদবাবু শুনলে ভারি আপ্যায়িত হবেন অরুন্ধতী। বল ত তোমাদের একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলি। তোমার মত মেয়ে পেলে কৃতার্থ হ'য়ে যাবেন উনি। তুমিও খুশী হবে।

তীব্র শ্লেষের আঘাত লেগেছিল তার বাষ্পীয় আবেগে, আন্তরিক কোমল চেতনায়—বলেছিল, খুশী হ'ব বই-কি—ভাগ্য ব'লে মানব—কিন্তু আমার অভাবের সংসারে আমি বাঁধা—সব ভার, সব অভাব আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। শুধু নিজেকে নিয়ে যে ভাববার সময় আমার নেই—আমার সব ভাবনার মুখ আগলে ব'সে আছে ছোট ভাই-বোনগুলা। তবু উনি যদি ডাক দেন কোন দিন—সব কর্ত্তব্য হয় ত আমার গোলমাল হ'য়ে যাবে।

তরু ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিল, তাই ত বলছি গো—মিলবে ভাল। মেয়েদের হ্যাংলামি ভয়ানক ঘৃণা করেন তোমার বিষাদবাবু—তুমিও হ্যাংলা নও আমার মত; কোন ভদ্রলোকের নেমন্তন্ন রাখবার জন্যে ছুটোছুটি করতে হয় না তোমাকে, গলির সুমুখেও তোমার সারি সারি মোটরকার দাঁড়ায় না—

এত অপমান কেউ করেনি তাকে আগে। রাগে আর দুঃখে চোখ ঝাপসা হ'য়ে এসেছিল—বলেছিল সে, আমি গরীব, তরু—তোমার মত সুন্দরীও নই। কারুর নেমন্তন্নও তাই পাইনে—মোটরও দাঁড়ায় না আমাদের কাণা গলিটার সুমুখে। সংসার আছে—আর এত অভাব—কিন্তু তার ভার নেওয়ার মত আমি ছাড়া কেউ নেই আর। সেইটে সব সময়ে মনে থাকে ব'লেই তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওই হ্যাংলামি করতে পারিনে।

এর কিছুদিন পরেই চাকরি নিয়ে কলকাতা ছাড়ল সে। তারপর নিরবচ্ছিন্নভাবে অনেক কাজের মধ্যে আস্তে আস্তে আত্মসাৎ হ'য়ে গেল সে। স্কুল, ট্যুসনি, সংসার—অভাব, এমনিতরো হাজার প্রয়োজন। বেশ ছিল সে এর মধ্যে—হঠাৎ বিষাদের চিঠি এল, তারপর তরুর চিঠি এল, তার আর একটি বান্ধবীর চিঠি এল সুদূর ক'লকাতা থেকে। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দিন হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠল তার। তার অবর্ত্তমানে বিষাদকে জড়িয়ে কতক-গুলা বিশ্রী কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে তাকে নিয়ে—রূপ নিয়েছে জঘন্য সত্যের। অনুতপ্ত তরু লিখেছিল: দোষ আমারই। শেষ পর্য্যন্ত মুখে মুখে ব্যাপারটা অত বিশ্রী হবে—ধারণা ছিল না। তুমি বিষাদবাবুকে ভালবাস—শ্রদ্ধা কর—এটুকু বলেছিলুম আমি তোমার স্বীকারোক্তি থেকেই। এখান থেকে তোমার চলে যাওয়ার পর বিষাদবাবু একেবারেই আসতেন না আর। ফলে তোমাদের দু'জনের অবর্ত্তমানের সুযোগে ব্যাপারটা এতখানি বিশ্রী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

চিঠি পেয়ে সে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল: কি কথা রটেছে তাকে নিয়ে! রাগ হ'ল তার, ভাল লাগল তার, দুঃখে চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল তার। কয়েকটা দিন বিশ্রী মন খারাপের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল তার। তারপর আবার নিরবচ্ছিন্ন বিলুপ্তি।

দীর্ঘদিন পরে আবার চিঠি পেল সে তরুর—দীর্ঘ চিঠি। তরু লিখেছিল:

…তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করতেও পারনি। কোন খবরই নাওনা—কোন খবরই দাও না তোমার। এতদূরে চলে গেলে—কবে আবার দেখা হবে কে জানে। আজ আমার জন্মদিনের উৎসব গেল—এত মনে পড়ছিল তোমাকে। আজ মনে হচ্ছে কি জান!—জিতে গেলে তুমিই। আমি হেরেছি, কিন্তু দুঃখ নেই তাতে আমার। বেশ আছি। তুমি যাকে অসাধারণ বলেছিলে—যাকে অহঙ্কারী আর দাম্ভিক ব'লে গাল দিয়েছিলুম একদিন আমি—তার কাছে হেরে গিয়েছি আমি, তাকে অবহেলায় এড়িয়ে যেতে পারলুম না শেষ পর্য্যন্ত। ও অসাধারণ কি-না জানিনে—তবে অদ্ভুত আর দুর্ব্বোধ্য। এত বড় ওর চাওয়া!—তার কাছে নিজেকে এক এক সময়ে বড় ছোট মনে হয়। ওর নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য—বাইরের নিস্পৃহ

অভিমান : যেন কিছু পায়নি ও—এতে সর্ব্বাঙ্গে আমার আগুন ধরে যায়, পাগল ক'রে দেয় আমাকে। ও যদি গাটা পার্চারের পুতুল হ'ত তা হ'লে একদিন ভোরে হয়ত দেখতুম, ও দুমড়ে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে।

তোমার এখান থেকে চলে যাওয়ার পর ওর আসাও বন্ধ হ'ল একেবারে। বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে হৈ হৈ রীতিমত চলতে লাগল। মাঝে মাঝে মনে পড়ত ওকে —আর রাগ হ'ত, বেশী ক'রে হৈ হৈ করতুম। কিন্তু হট্টগোল দিয়ে এড়াতে পারলুম না ওকে। আমার জন্মদিন ক্রমশ ঘনিয়ে এল। মামা দু-একদিন বললেন নিমন্ত্রিতদের লিস্ট তৈরি করবার জন্তে। তারপর নিজেই তিনি একদিন ব'সে গেলেন কাগজ-কলম নিয়ে—আর প্রথমেই লিখলেন ওর নাম। কি জানি কেন, সেদিন নামটার দিকে তাকিয়ে শুধু মনে হয়েছিল—ও আসবে না—কোন দিনই আসবে না আর। দীর্ঘ দিন খবর পাইনি—হয় ত কলকাতাতেই নেই। কোনদিন হয় ত আর দেখাই হবে না।

এত মন খারাপ হ'য়ে গেল সেদিন। ওর দু-তিন বছরের উপহার দেওয়া জিনিষগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করলুম। ইচ্ছে হ'ল সব টেনে দিই ফেলে। কি দরকার আর এসবের! আমার জন্মদিনের ভোর বেলায় একটি লোক এল একখানি খাম নিয়ে। ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে। হঠাৎ এত আনন্দ হ'ল! ও যে কলকাতাতেই আছে—শুধু এই খবরটুকু পেয়ে মনে হ'ল—ও আমার অনেক কাছে।

বেলা বাড়তে লাগল। এক একবার ইচ্ছে হ'ল—যাই ওদের বাড়ী। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে কোন ছলে যাব! ওর মা আমাকে ভয়ানক ভালবাসতেন—একবার মনে হ'ল, যাই তাঁর কাছে—যে-কোন ছলে—যে-কোন অজুহাতে। ভাবতে ভাবতে দুপুর গড়িয়ে এল। এক সময়ে বেরিয়ে পড়লুম। হয় ত ও কথাই কইবে না—নিজেও হয় ত পারব না কইতে—এত আত্মসচেতন হ'য়ে যাচ্ছি। তবু ওর সুমুখ দিয়ে শুধু ঘুরে আসবার লোভটুকু সামলাতে পারলুম না।

ওর বাড়ী যখন গিয়ে পৌছলুম তখন ও দেখি কোথায় বেরুচ্ছে। ও চলে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, ওকে শুনিয়ে ওর মাকে বললুম, আজ আমার জন্ম দিন।

ও গম্ভীর হ'য়ে চলে গেল। ওর মাকে বললুম, আমাদের গাড়ীটা এনগেজ্‌ড্‌ বড্ড বেশী—আপনাদের গাড়ীটা যদি পাই তা হ'লে শিবপুর থেকে পিসীমাকে নিয়ে আসতুম।

ওর মা বললেন, বেশ ত-তার জন্তে তোমার না আসলেই চল্‌ত। একটা ফোন করলেই পারতে।

হঠাৎ মনে হ'ল, ধরা পড়ে গিয়েছি—মায়েদের চোখে সত্যিই ফাঁকি দেওয়া যায় না বোধ হয়। মায়ের হুকুম—তারপর ওর গাড়ীতে উঠে বসলুম—চোখ কান বুজে একেবারে ওর পাশে। চৌরঙ্গীর পথ ধ'রে গাড়ী ছুটল—ও নির্ব্বিকার। গাড়ী যখন নিউমার্কেটের কাছে—তখন আর থাকতে পারলুম না। মনে মনে যা বলব ব'লে ভাবছিলুম—হঠাৎ তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। বললুম, কিছু ফুল কিনতুম।—

ও গাড়ী থামাল মার্কেটের সুমুখে। আমি নামলুম—কিন্তু ও নামল না। ওর দিকে আমি তাকিয়ে রইলুম শক্ত হ'য়ে। আমার জন্মদিনে ও ফুল নিয়ে যেত—আজ সব ভুলে গেল ও! এত রাগ হচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, আমি টাকা নিয়ে আসিনি।

ও শুধু ওর পার্স বের ক'রে দিলে। নেমেও এল না—একটি কথাও কইল না। আর সামলাতে পারলুম না—চোখে জল উপ্‌চে এল। ছুঁড়ে দিলুম ওর পার্স। গাড়ীতে উঠে ব'সে বললুম, চাইনে ফুল।

তারপর ও নেমে গেল। আমি বসে রইলুম গাড়ীতে। ও ফুল কিনে নিয়ে এল।

তারপর শিবপুর। ও নীরব নির্ব্বিকার। সাজ-গোজ ক'রে আসিনি, চুলগুলা ছিল এমনি খোঁপা ক'রে জড়ানো—গেল হঠাৎ খুলে! চুলের বোঝা ওর মুখে উড়ে পড়ল—ইচ্ছে ক'রেই আর জড়ালুম না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম, কতক্ষণে ও কথা বলবে। এক সময়ে আঁচল উড়তে উড়তে পড়ল ওর মুখে চাপা। গাড়ীও থামল সঙ্গে সঙ্গে। তবু কথা কইলে না ও—মুখ থেকে আঁচলটা সরিয়ে দিলে শুধু। আমি আর থাকতে পারলুম না—বললুম, আমি একটু চালাতুম। রাস্তা ত ফাঁকা—

ও নীরবে জায়গা ছেড়ে দিলে।

গাড়ী হু হু ক'রে ছুটেছে। আমি শুধু ভাবছিলুম—

ওকে ছাড়া আমার চলবে না—কোন রকমেই চলবে না। তবু কথা কইবে না ও—এত দূরে সরে যাবে ও! চোখ ঝাপসা হ'য়ে এল। একটা মোড় ফিরতেই দেখলুম—একটা মোটর একেবারে সুমুখে। দু চোখ বুজোলুম। চোখ বুজে শুধু একটা ঝাঁকানি অনুভব করলুম।

তারপর চোখ খুলে দেখি—ও আমাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসেছে ষ্টিয়ারিং হুইলের কাছে। সুমুখের গাড়ীখানা নেমে গিয়েছে রাস্তার পাশে। য়্যাক্‌সিড্যাণ্ট হয়নি। সুমুখের গাড়ীতে ছিল তিন জন। সাহেবী পোষাকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ড্রাইভ করছিলেন—পেছনে বসেছিল একটি আধাবয়সী মহিলা, সঙ্গে ছোট ছেলে একটি। প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমাদের কারের দিকে। বিশ্বাসদের টিপার্টিতে দেখেছিলুম ওঁকে—জষ্টিস মিষ্টার রায়। গাড়ীতে ওঁর স্ত্রী ব'সেছিলেন—তাঁকেও চিনলুম। কিন্তু কোন চেনাই খাটল না। মিস্টার রায় নিরস গলায় আমার লাইসেন্স দেখতে চাইলেন। বিব্রত হ'য়ে বোকার মত তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে। এই অবস্থায় আমার দাম্ভিক অহঙ্কারী লোকটি পাশ থেকে লাইসেন্স দেখিয়ে উদ্ধার করলে আমাকে। মিস্টার রায় লাইসেন্সে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এত আপনার লাইসেন্স। যিনি ড্রাইভ করছিলেন—আমি তাঁরই লাইসেন্স দেখতে চাই।

আমার দাম্ভিক লোকটি দম্ভ ভরে বললেন—গাড়ী আমিই চালাচ্ছিলুম—এই দেখুন লাইসেন্স।

সে এক বিশ্রী কথা কাটাকাটির ব্যাপার। একে রাস্তার ভুল দিকে মোটর নিয়ে গিয়েছিলুম, তার ওপরে বিনা লাইসেন্সে চালাচ্ছিলুম—এর পরেও আবার এমন একটা লোকের সঙ্গে দাম্ভিক লোকটি আমার কথা কাটাকাটি করছে—ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলুম। মিস্টার রায়ের দিকে তাকিয়ে ব'লে ফেললুম, হ্যাঁ—আমিই চালাচ্ছিলুম।

কপালে অনেক দুঃখু আছে—উপায় কি! আমার দাম্ভিক পুরুষ জোর গলায় প্রতিবাদ করলে আমার কথার। আমাদের পরস্পরের গাড়ী চালানো নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ সুরু হ'ল—সে এমন ব্যাপার যে, মিস্টার রায়ও আমাদের কথার মাঝে পড়ে বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন বোধ হ'ল। গাড়ী থেকে মিসেস্ রায় নেমে এলেন শেষকালে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তোমাকে যেন কোথায় দেখেছিলুম। প্রণববাবু তোমার মামা না?

বললুম, হ্যাঁ।

মামার পরিচয় নিয়ে নিস্কৃতি পেলুম শেষকালে। মিস্টার রায়ের মুখে হাসি দেখে বাঁচলুম। কিন্তু আবার বিপদে পড়ে গেলুম যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার দাম্ভিক পুরুষের পরিচয়, উনি তোমার কে হন?

মিসেস্ রায়ের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসি ছাড়া উপায় কি! মিস্টার রায়ের বদনাম আছে—বিশ্রী বেখাপ্পা কথা ব'লে বসেন। মিসেস্ রায় হেসে বললেন, এই রোববার তোমার মামা যাবেন আমাদের ওখানে—সঙ্গে যেয়ো আর ওকেও সঙ্গে নেবে—নইলে তোমার নামে কেশ করব কিন্তু।

ফিরে দেখি—দাম্ভিক লোকটা মোটরে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে আছে। তারপর ওঁরা চলে গেলেন। আমি ওর পাশে উঠে বসলুম। মোটরে স্টার্ট দিতে গেল ও—হ'ল না। মোটর বিগড়েছে। ও নেমে কিছুক্ষণ ধ'রে যন্ত্রপাতি কি সব সারালে—কিন্তু মোটরের প্রাণ আর ফিরে এল না। মুখ দেখে বুঝলুম: ভয়ানক চটেছে। ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল আমার। কি জানি কেন, মিস্টার রায়রা আমার মন যেন ভয়ানক হাল্‌কা ক'রে দিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, একটু ঠেলতে পারবে?

যাক, প্রথম কথা। আনন্দে ওর মোটর ঠেলতে নামলুম। তবু মোটর চলে না। তারপর যন্ত্রপাতি খুলে পুরো দু ঘণ্টা ধরে মিস্ত্রীর কাজ। গাড়ীতে যখন উঠে বসলুম তখন নিজের দিকে তাকিয়ে হাসি পেল। সাড়ীতে লেগেছে চট্‌চটে তেল-কালি, মুখ হাতও বাদ যায় নি—ওর অবস্থা আরও শোচনীয়। ব'ললুম, আর যেতে হবে না পিসীমার বাড়ী।

বাড়ী ফিরলুম নীরবে। গাড়ী থেকে নেমে ওকে বললুম, নেমে এস।

গম্ভীর হ'য়ে বললে ও, না।

ব'ললুম, তার মানে! কি চাও তুমি!

ও বললে, কিছুই না।

মনে হ'ল—কিছুই যদি চায় না ও তবে আসত কেন—

আর এখন আসে নাই বা কেন! রাগে দুঃখে আর অপমানে নিজেকে সামলাতে পারলুম না—মারলুম ঠাস্ ক'রে এক চড়। ও শুধু অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল মুখের দিকে। হঠাৎ আমার কেমন ভয় হ'ল। গাড়ীতে আবার উঠে বসলুম—বললুম, যাব না আমি। কান্না সামলাতে পারলুম না।

ও নীরবে আবার গাড়ী হাঁকিয়ে চলল। নিরুদ্দেশ-ভাবে খানিকটা ঘোরার পর ও বললে, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তোমার?

কি জবাব দেব! চুপ ক'রে রইলুম। মনে মনে ভাবলুম—ও ছাড়া আমার চলবে না।

ও বললে, মা'র স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়েছে—কিছুদিনের জন্যে ওঁকে বাইরে নিয়ে যাব। তোমাকে উনি সঙ্গে নিতে চান। কিন্তু তুমি কি যেতে পারবে?

শুধু বললুম, যাব।

ও হেসে বললে, যাবে ত বুঝলুম কিন্তু অসুবিধের কথাগুলাও ভেবে দেখ। মার চেয়ে মিলিয়ে চলতে হবে আমার সঙ্গেই বেশী এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে। মা তোমাকে সেই ভাবেই নিয়ে যেতে চান।

বললুম, তোমার আপত্তি আছে?

ও বললে, না—গেলে সুখী হব।

বললুম, আমি যাব।

আমাকে এমন ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে ও। সেদিন সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করলুম ওর কাছে। অনেক জন্মদিন আমার এসেছে—গিয়েছে, শুধু সেই দিনের জন্মদিনটিতে আমি যেন নতুন ক'রে জন্মালুম। সারারাত্রি সেদিন ঘুমাতে পারিনি—সারা দুপুরটা শুধু মনের মধ্যে ঘুরেছে স্বপ্নের মত। আজও আমার জন্মদিনের উৎসব গেল—মনে পড়ছে শুধু তোমাকে আর দু'বছর আগের একটি জন্মদিনকে।

একটা বাচ্ছা হয়েছে—ঠিক ওর শিশু-সংস্করণ। বাচ্ছা এখন দিব্যি ঘুমাচ্ছে—গাল ফুলো মুখের গাম্ভীর্য্য একেবারে হুবহু পৈতৃক। দেখলে তুমি বাস্তবিক অবাক হ'য়ে যাবে। কিন্তু কবে যে দেখা হবে আবার তোমার সঙ্গে! জান? —হিংসে হয় তোমার ওপরে আর নিজের ওপরে হয় রাগ। দাম্ভিক লোকটাকে পারলুম না আয়ত্ত করতে—সব সময়ে ও আমার সীমানার বাইরে। ওকে অবহেলা ক'রে যাওয়া যায় না। শুধু পারলে তুমি। তোমার কাছে ওর হয়েছে হার—ওকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছ তুমি। সত্যি, তোমাকে হিংসে হয়।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক। ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিছানা হাতড়াচ্ছে—আর নয়। রাত একটা বাজল।...

রাত একটা বাজল থানার ঘড়িতে ঢং ক'রে। তরুর বহুদিনকার বিবর্ণ চিঠিখানি নিয়ে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ ব'সে রইলো অরুন্ধতী। নিজের শূন্য বিছানার দিকে একবার তাকাল—তারপর তাকাল ঘরময় ছড়ানো জিনিষ-পত্রের দিকে। স্যুটকেশগুলা খোলা পড়ে রইল—জিনিষ-পত্র, কাপড়-চোপড় আর গুছাতে মন উঠল না তার। আলো নিভিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। জানালা দিয়ে আকাশের অনেকখানি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে—বহুদূর দিগন্তে একটি তারা দপ্ দপ্ করছে। রাত একটা। বহু দূরদিনের একটি রাত্রি তার ঘরে নিঃশব্দে এসে ঢুকল। স্বপ্নের মত রাত্রি—অনেক রাত্রি—অনেক দিন। একটি একটি ক'রে কত দিন কেটে গিয়েছে অরুন্ধতীর—কত দীর্ঘ বছরের পর বছর—কত বছর! বোনগুলির বিয়ে হ'ল, ভাইয়েরা মানুষ হ'ল—তারা চাকরি করছে, বিয়ে হয়েছে সকলের, কেবল ছোট ভাইটির বাকী। দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে—কাঁচাপাকা চুলে মাথা হয়েছে ভর্ত্তি, নাকের দুপাশ দিয়ে গালের ওপরে পড়েছে রেখা।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানালার গরাদ ধরে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়াল অরুন্ধতী। তারপর ক্লান্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। ঘুম নেমে এল তার চোখে। টেনিস লন—বিষাদ—তরু আর অনেকগুলি দিন ঘুরতে লাগল অস্পষ্ট ছায়ার মত।

ভোর ভোর উঠে পড়ল অরুন্ধতী। জিনিষ-পত্র এখনও তার গোছানো হ'য়ে ওঠেনি—সেই সব গোছানো নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল সে। পুরানো চিঠি কতকগুলা পড়েছিল সুটকেসের এককোণে—বিষাদের চিঠি একখানা, কতকগুলা তরুর চিঠি—বাকীগুলা ভাই-বোনদের। কতকগুলা মনিঅর্ডারের কুপন। সব টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল অরুন্ধতী। বাজে অপ্রয়োজনীয় কাগজগুলো রেখে

লাভ নেই আর। সুটকেস খালি করতে হবে। হঠাৎ একটা মোটা থাম টেনে ছিঁড়তে গিয়ে ছিঁড়তে পারলে না অরুন্ধতী। বেশ ভারী খাম—কি আছে এতে! কৌতূহল হ'ল তার, খুলে দেখল খান কয়েক ফটো—বহুদিন আগের ছবি, কোনটা তার একার, কোনটা তরুর সঙ্গে; ছাত্রীজীবনের ফটো। ছেঁড়বার জন্যে হাত টানল অরুন্ধতী।

অরুন্ধতীর সহ-শিক্ষয়িত্রী সুমুখে একখানি কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললে, কাল বিকেলের সেই ভদ্রলোকটি এসেছেন।

অরুন্ধতী ফটোগুলি রেখে কার্ডখানির ওপরে আস্তে আস্তে আঙুল বুলাতে লাগল। কাল বিকেলে অমিতাভকে দেখে সে চমকে উঠেছিল—হুবহু বিষাদের মত দেখতে। কার্ডটার দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতী বললে, আমি আসচি এক্ষুণি—তুমি ভাই কাপড়গুলো সুটকেশে ভরে দাও না।

অরুন্ধতী নীচে নেমে গেল। তারপর কিছুক্ষণ পরেই ফিরল সে।

সহ-শিক্ষয়িত্রীটি বললে, কি বললেন ভদ্রলোক?

—কি আর বলবে—স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসেছিল। বলে দিলুম—আমি পারব না, চলে যাচ্ছি আজ। আর ভাল লাগে না। ব'লে ম্লানমুখে হাসল।

অরুন্ধতী সুটকেস গোছানো দেখতে লাগল পাশে বসে। হঠাৎ বললে, আহা—ও ফটোগুলো আবার ঢোকাচ্ছ কেন, ছিঁড়ে ফেল।

—ছিঁড়ব কেন! থাক্ না একপাশে পড়ে।

সুটকেস বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়াল শিক্ষয়িত্রীটি।

অরুন্ধতী নীরবে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, যাওয়ার দিনে আজ ভারী নতুন লাগছে জায়গাটা। কাল থেকে আর দাঁড়াব না এখানে। ব'লে হাসলে একটু ম্লানমুখে। আবার বললে, তোমাদের ছেড়ে যেতে ভারী কষ্ট হচ্ছে।

—নাই বা গেলে।

—নাঃ—হয় না।

চোখে জল ভরে এল অরুন্ধতীর। ঘরময় ছেঁড়া টুকরা চিঠিগুলার দিকে ফিরে তাকাল একবার সে। অনেক দিনের চিঠি—বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে।

শেষ চিঠি

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

মেঘ্‌লা আকাশ মনে পড়ে তোমা এই বাদলের বেলা—
একদা দুজনে খেলেছি কত না আশার রঙীণ খেলা।
তোমার লাগিয়া রহিতাম চেয়ে আনমনে বাতায়নে—
হারাণো দিনের স্মরণের মধু আজি কি পড়িছে মনে?
তুমি আজো আছ আমিও রয়েছি তবু যেন কতদূর—
হারাণোর সুরে ঝুরিছে দোঁহার হিয়ার গোপনপুর।
যাবার বেলায় শেষ চিঠিখানা তবু তোমা লিখে যাই—
যদি এতে তুমি ব্যথা পাও বুকে আমারে ভুলিয়ো ভাই।
হিয়ার গোপনে আছে কত জমা বেদনার ইতিকথা—
জানিল না কেউ বুঝিল না কেউ ইহার অমূল্যতা।
আমার জীবনে ধন্য হইল সুরভিত পরিমল—
মরণের বুকে চেয়ে দেখি তারে বেদনায় উজ্জ্বল।
আজি মনে হয় জীবন ভরিয়া কতখানি মোর ছিলে—
আপনার হিয়া বেদনায় ভরি আমারে বেদনা দিলে।
তুমি যে আমার এতখানি প্রিয় সে কথা কি জানিতাম—
তিলে তিলে মরি তা হলে কভু কি দিতাম ইহার দাম?
একটা না-বলা কথায় হইল দুটি প্রাণ মরুভূমি—
না কেউ জানুক মনে হয় ইহা নিশ্চয়ই জানো তুমি।

একা পড়ে থাকি মৃত্যুর পথে হেথায় যাদবপুরে—
বিগত দিনের বেদনার স্মৃতি সব হিয়াখানি জুড়ে।
বড় অসহায় বড়ই করুণ মরণের বেদনা যে—
জীবনের খেলা ভাঙ্গিবার ক্ষণ কি ব্যথা পরাণে বাজে।
ক লাইন্ লিখে বন্ধু তোমায় করিব না দিশেহারা—
একটি জীবন নিভিবার পরে তোমার জীবনধারা,
জীবন-প্রবাহে সফল হইয়া যেন হয় বহমান—
সেই মহিমার স্বপনপুরীতে করিয়ো জীবন পান।
একথা লিখিতে বড় বাজে বুকে মৃত্যুর মুখোমুখী—
জীবনের পারে তবু চাই প্রিয় তুমি হইয়াছ সুখী।
আজ তিন দিন রক্ত ক্ষরণে হইতেছি প্রায় ক্ষয়—
ডাক্তার বলে, 'হোপ্‌লেস্ কেস্ আর বেশীদিন নয়।'
রক্তবমনে কেসে কেসে আজ শুয়ে কাঁদি বিছানায়—
শেষ সাধ ছিল তোমা শেষ দেখি আপনার মহিমায়।
বিদায়ের গানে কাঁদিছে ধরণী ফুকারে বিদায় বাঁশী—
বন্ধু তোমায় হয়নিক বলা প্রাণ দিয়া ভালোবাসি।
এই ধরণীর খেলাঘরে মোর আজি বিদায়ের পালা—
চিরবিদায়ের বিদায় বন্ধু মাগিছে নীহারবালা।

মুর্শিদাবাদে তিনদিন

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী

কয়েকদিন হইতেই শুনিতেছিলাম—শীঘ্রই মুর্শিদাবাদে সরকারী শিক্ষাবিভাগের জিলাস্কুলের শিক্ষক ও পরিদর্শক কর্ম্মচারীদের এক সম্মেলন হইবে; প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার খান বাহাদুর ক্যাপটেন মির্জ্জা আবু জাফর সাহেব এই সম্মেলনের পরিকল্পনা করিতেছেন এবং তাঁহার যোগ্য সহকারী মিঃ এস, কে, ঘোষ (প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্যতম সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টার) এই পরিকল্পিত সম্মেলনের সমস্ত ভারগ্রহণ করিয়াছেন। কথাটা এতদিন কেবল বাতাসেই উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সংশয় দোলায় দুলিতেছিল—কিন্তু সেদিন হঠাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া মনটা উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। সম্মেলনের অধিবেশন অবধারিত এবং ১৭ই, ১৮ই এবং ১৯শে মে দিন স্থির হইয়া গিয়াছে।

সম্মেলনের কর্ম্মসূচীটা ভাল করিয়া আর একবার পড়িয়া দেখিলাম। ১৭ই ও ১৯শে সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন, আর ১৮ই রবিবার সারাদিন প্রমোদ-ভ্রমণের আয়োজন করা হইয়াছে; প্রমোদ-ভ্রমণের স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যথা—হাজারদুয়ারী প্রাসাদ, কদমশরীফ, তোপখানা, মুবারক মঞ্জিল, মতিঝিল, কাটরা মস্‌জিদ, জাফরাগঞ্জ, খোস্‌বাগ, রোশ্‌নিবাগ প্রভৃতি।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী এই মুর্শিদাবাদের কথা ইতিহাসে পড়িয়াছি, চক্ষে দেখি নাই। মুর্শিদাবাদ একাধারে দুই মহাজাতির অস্তগিরি ও উদয়গিরি। একের গৌরবরবি এখানে চিরতরে অস্ত গিয়াছে, অন্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য ইহারই "উদয়-শৈল" উজ্জ্বল করিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মালায় ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; বাংলার এই মুর্শিদাবাদ ঘরের কাছে বলিয়া বড় একটা কেহ দেখে না, বাঙ্গালী যায় দিল্লী, যায় আগ্রা, যায় লক্ষ্ণৌ; আগ্রার তাজমহল দেখিয়া বাঙ্গালী-কবি কবিতা লেখে, দিল্লীর শ্মশান দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, হৃতসর্ব্বস্ব মর্ত্ত্যের নন্দনকানন লক্ষ্ণৌর অতীত স্মৃতি অন্তরে লইয়া মন্থরপদে গৃহে ফিরিয়া আসে। কিন্তু বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালীর মুর্শিদাবাদ—বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালার কলঙ্ক এই মুর্শিদাবাদের কথা ইতিহাসের জীর্ণ পাতায়ই আজ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। বাঙ্গালী ভাল করিয়া মুর্শিদাবাদ দেখিল না; চিনিল না; বাঙ্গালী জানিল না অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বাঙ্গালারই ইতিহাস। যে মনীষী বলিয়াছেন—বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি—তিনি মিথ্যাকথা বলেন নাই।

সম্মেলনের ধার্য্য দিন যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল মনটা ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং অবশেষে আমরা সদলবলে ১৬ই মে সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইয়া পলাশী, বহরমপুর, কাশিমবাজার অতিক্রম করিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় মুর্শিদাবাদ ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি, যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণা, কলিকাতা হইতে অনেকেই এই গাড়ীতে আসিয়াছেন। শুনিলাম, শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডাইরেক্টার খান বাহাদুর আব্দুর রহমন খাঁ সাহেবও নামিয়াছেন। তিনিই সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন। স্বল্পালোকিত ষ্টেশন—ভাল করিয়া দেখা যায় না—পরিচিত বন্ধুদিগকে এই প্রায়ান্ধকারেও চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না, অনেক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ হইল। বাকী আলাপ পরদিনের জন্য মুলতুবী রাখিয়া আমরা ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখি যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা আগেই নিজেদের মালপত্র উঠাইয়া ঘোড়ারগাড়ী ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। সুখের বিষয় গাড়ীর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের যত্নে গাড়ীর সন্ধানে মোটেই কাহাকেও বিব্রত হইতে হয় নাই। তথাপি এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্যেও বাঙ্গালীর একান্ত বৈশিষ্ট্য—কল-কোলাহলে ষ্টেশনটি অতিমাত্রায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচুর হাঁকডাকের মধ্যে গাড়ীগুলি একে একে চলিতে লাগিল, আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এবার মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ ষ্টেশন হইতে শহরের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। গাড়ী চলিতে লাগিল কিন্তু অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। অনেকে চলমান গাড়ীর দুইদিকে টর্চ্চের আলো ফেলিতেছেন—এই ক্ষণিক দীপ্তির মধ্যে অত্যুৎসাহীরা কেবল দেখিলেন—বনজঙ্গল, ভগ্ন বাড়ী, কুঁড়েঘর। অনেকেরই মন হয়ত বিকল

হইয়া গেল। আমার মনে পড়িল বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের মর্ম্মস্পর্শী কয়েকটি কথা—"দিল্লী, আগরা, এমন কি প্রাচীনতম গৌড় পর্য্যন্ত ভগ্ন-অট্টালিকাস্তূপ বক্ষে ধারণ করিয়া আপন আপন পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু তাহাদের বহু পরে নির্ম্মিত মুর্শিদাবাদ শ্রীহীন, চিহ্নহীন, গৌরবহীন হইয়া ধ্বংসের শেষ আঘাত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।" পরদিন দিনের আলোয় শহর দেখিয়া বুঝিলাম, ঐতিহাসিক তাঁহার বর্ণনায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নাই।

আহারের ব্যবস্থা ও আশ্রয়নীড় পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। অমরা নবাব বাহাদুর ইনিষ্টিটিউশনের সংলগ্ন হিন্দু হোস্টেলে আসিয়া উঠিলাম। কেহ কেহ নিজামত হোস্টেলে চলিয়া গেলেন। নিজামত হোষ্টেল ও স্কুল একই বাড়ীতে।

সেইদিন রাত্রিতে আর ঘুমাইতে পারা গেল না, হাঁক-ডাক চীৎকারের মধ্যে রজনীর প্রহর নির্দ্দেশক দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি গণিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রির দিকে সবে মাত্র চক্ষের পাতা বুজিয়া আসিয়াছে, ঠিক এই সময়ে নবীন আগন্তুকদের অতর্কিত আবির্ভাবে নিদ্রার শেষ চেষ্টাটুকুও ক্ষুণ্ণমনে পরিত্যাগ করিতে হইল।

১৭ই মে শনিবার সকাল নয় ঘটিকার সময় সম্মেলনের প্রাথমিক অধিবেশন। সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই শহরের খানিকটা অংশ দেখিয়া লইবার জন্য আমরা কয়েকজন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। নগরের প্রান্তে প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী—বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ এই ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। কিন্তু ইতিহাসে দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদ ভাগীরথীর উভয়তীর বেড়িয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা হাজারদুয়ারী প্রাসাদ ও ইমামবারার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অতীত সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন মাত্রও আজ আর বিদ্যমান নাই—শুধু মাঠের পর মাঠ—মাঠের মাঝে মাঝে বনজঙ্গল, বনজঙ্গলের বুকে বুকে কোথাও ভগ্ন মন্দির, জীর্ণ মসজিদ। স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত ঐশ্বর্য্যের এই শ্মশান হইতে ছবি আপনিই ফিরিয়া আসিল।

আমরা ইমামবারার কাছাকাছিই দাঁড়াইয়া ছিলাম—এই ইমামবারা সিরাজ-নির্ম্মিত ইমামবারা নহে, সে ইমামবারার চিহ্নমাত্রও আজ নাই। সিরাজের ইমামবারা তৎকালে মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি সুন্দর অট্টালিকা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বহু যত্নে, বহু ব্যয়ে সিরাজ এই ইমামবারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার ভিত্তিতে প্রোথিত ছিল মদিনার পবিত্র মৃত্তিকা। বর্ত্তমান ইমামবারাও প্রায় একশত বৎসরের পুরাতন অট্টালিকা।



মতিঝিলের সম্মুখের মসজিদ

বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলি খাঁর সময়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইমামবারার বিপরীতদিকে রহস্যপুরী হাজারদুয়ারী—নবাব প্রাসাদ—বিপুল বিরাট সুরম্য অট্টালিকা—মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় জিনিস। শুনিলাম এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ছয় বৎসর লাগে এবং প্রায় পনের লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। একজন বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার ইহার পরিকল্পনা করেন। প্রাসাদের গঠনরীতিতে প্রতীচ্যের প্রভাব অধিকমাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই হাজারদুয়ারী প্রাসাদও খুব বেশী পুরাতন নয়। ইমামবারা নির্ম্মাণের মাত্র দশবৎসর পূর্ব্বে নবাব নাজিম হুমায়ুঁজার আমলে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

অধিবেশনের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল। আমরা ধীরে ধীরে ভাগীরথীর তীর ধরিয়া নবাব বাহাদুর ইনষ্টিটিউশনের দিকে যাত্রা করিলাম। রহস্যপুরী আমাদের কাছে আপাতত রহস্যমণ্ডিতই রহিয়া গেল।

ঠিক নয়টার সময় নবাব বাহাদুর ইনষ্টিটিউশনের দ্বিতলের এক সুসজ্জিত কক্ষে খান বাহাদুর আব্দুর রহমান খাঁ সাহেব একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়া সম্মেলন উদ্বোধন করিলেন; মাঝে দুই ঘণ্টা বিশ্রামের পর অপরাহ্ন চারিটা পর্য্যন্ত অধিবেশন চলিল। প্রবন্ধের সংখ্যা কম ছিল না—বক্তায়

সমিতিতে প্রবন্ধপাঠ শ্রবণ করা একরকম ভীতিজনক ব্যাপার। ঢাকের বাদ্য থামিলেই যেমন মিষ্টি লাগে, প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলেই শ্রোতারা তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে; অবশ্য শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বাসের বিশেষ কোন স্থান নাই, স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয়তায় নীরস তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণই এই জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য বস্তু। যাঁহারা এই নীতি মানিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্বাধীন পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর নূতন তত্ত্ব খাড়া করিয়া প্রচলিত শিক্ষারীতি ও নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া শিক্ষায় নববিধানের দাবী করিয়াছেন; আর যাঁহারা তাহা করেন নাই তাঁহারাও উচ্ছ্বসিত আবেগময়ী ভাষায় নীরস বিষয়বস্তুতে অপূর্ব্ব রসসঞ্চার করিয়া শ্রোতৃবর্গকে পরম পুলকিত করিয়া গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন চাহিয়াছেন। শিক্ষাসম্মেলন এইখানেই সার্থক হইয়াছে এবং এই স্বাধীনচিন্তা, বিভিন্ন শিক্ষাব্রতীদের ভাববিনিময়ের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশে একদিন শিক্ষার নববিধানের পত্তন হইবে।

সে যাহাই হউক, বিকালের দিকে দেখিলাম প্রবন্ধের ঘটা একটু বেশী। শ্রোতৃবর্গ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু নড়িবার যো নাই। অপরাহ্ণ-অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন—খান বাহাদুর মির্জ্জা আবু জাফর সাহেব। তাঁহার গুরুগম্ভীর কঠিন কঠোর মূর্ত্তির সাম্নে



ইমামবারা মুর্শিদাবাদ

কেহ আসন ত্যাগ করে কিংবা বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে এমন সাহস কাহারও নাই। সকলেই স্কুলের ভাল ছেলের মত যে যাহার আসনে বসিয়া আছেন। আমি মনে মনে হাসিয়া জিলা স্কুলের প্রধান-শিক্ষক মহাশয়গণের দিকে চকিতে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইলাম। তাঁহাদের ছদ্মগাম্ভীর্য্য যেমনই করুণ তেমনিই হাস্যকর। হায় রে, আজ যদি স্কুলের ছেলেরা এখানে থাকিত!

প্রায় চারিটার পর অধিবেশন শেষ হইল। যাঁহারা অতিমাত্রায় উৎসাহী তাঁহারা ভাগীরথীর জলে প্রফুল্ল ঘোষের সন্তরণ কৌশল দেখিতে গেলেন, আমরা পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য আশ্রয়নীড়ে ফিরিয়া আসিলাম।

১৮ই মে রবিবার; সকাল বেলাই সকলে একসঙ্গে প্রাসাদ-ভ্রমণে বাহির হইলাম। প্রথমেই হাজারদুয়ারা দেখিবার পালা—এই ত্রিতল অট্টালিকাকে এখন আর প্রাসাদ বলা যায় না, ইহা এখন দামী আসবাবের ও মূল্যবান বহু প্রাচীন ছবির যাদুঘরে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ ছবিই বিদেশী চিত্রকরের অঙ্কিত, এখানে নবাব নাজিমগণের এবং বর্ত্তমান নবাববাহাদুরবংশীয়গণের অনেক চিত্র আছে। রবিবার বলিয়া গ্রন্থাগার ও অস্ত্রাগার দেখিবার অনুমতি পাওয়া গেল না।

হাজারদুয়ারী হইতে বাহির হইয়া শুনিলাম—এবার মতিঝিলে যাইতে হইবে। গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী চলিতে লাগিল। দূরের—বহুদূরের তমিস্র যবনিকা ভেদ করিয়া আমার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল কত অপরূপ ছবি, অশ্বপদাকৃতি ঝিল, ঝিলের পার্শ্বে প্রাসাদোপম প্রমোদভবন, মর্ম্মরমণ্ডিত চত্বরে চত্বরে বিভক্ত ভবনের কক্ষে কক্ষে কুট্টিমে কুট্টিমে বিলাসের ঐশ্বর্য্য, প্রাসাদের অগণিত সোপানাবলী ঝিল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে—প্রাসাদ ঘেরিয়া চতুর্দ্দিকে ফলফুলে শোভিত অপূর্ব্ববিলাসকুঞ্জ লতানিকুঞ্জ, লতানিকুঞ্জে সারি সারি মর্ম্মরমণ্ডিত শীতল শিলাখণ্ড—কানে ভাসিয়া আসিল বীণার তান, সুন্দরী নর্ত্তকীগণের চটুল চরণের নূপুরধ্বনি; যেন দেখিতে পাইলাম অগণিত সুন্দরী নর্ত্তকী পরিবেষ্টিত বিলাসী নওয়াজেস খাঁ, অর্থ-লিপ্সু সিরাজের কৌশলে বন্দী মাতামহ আলিবর্দ্দী, ভীত ত্রাস্ত ঘসেটী বেগম, হতভাগ্য হোসেনকুলি, কুচক্রী রাজবল্লভ।

গাড়ী মতিঝিলে আসিয়া পৌছিল কিন্তু কোথায় সেই মতিঝিল! ঝিল এখন বদ্ধ জলায় পরিণত, ভগ্ন তোরণদ্বার—প্রাসাদের চিহ্নমাত্রও নাই—শুধু নওয়াজেস খাঁ ও এক্রামোদ্দৌলার সমাধি অতীত দিনের স্মৃতি বহন করিতেছে। সমাধি দুইটি শ্বেত মর্ম্মরমণ্ডিত। পার্শ্বে

আর একটি কৃষ্ণমর্ম্মরমণ্ডিত সমাধি আছে। উহা এক্রামোদ্দলার শিক্ষকের সমাধি। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভেও মতিঝিলের সমারোহ কম ছিল না। বাঙ্গালা,



কাঠগোলা বাগান ও প্রাসাদ

বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণের পর নবাব নিজমদ্দৌলাকে নবাবনাজিমরূপে মসনদে বসাইয়া ক্লাইব প্রথম পুণ্যাহ করেন; দু-চার বৎসর নবাব সৈফ-উদ্দৌলাকে মসনদে বসাইয়া গবর্ণর জেনেরেল পুণ্যাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন। তৎপরে ছয় বৎসর মাত্র মতিঝিলে পুণ্যাহ হইয়াছিল। পুণ্যাহ উঠিয়া যাওয়ায় মতিঝিল ক্রমশ জলশূন্য হইয়া পড়ে এবং প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের মধ্যেই সৌন্দর্য্যের এই নন্দনকানন ধ্বংসদেবতার কুক্ষীগত হইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে একরকম নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল!

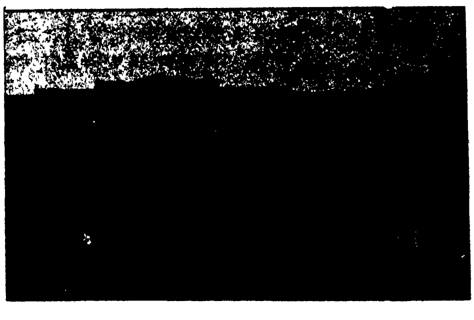
মতিঝিল হইতে বাহির হইয়া আমরা তোপখানা হইয়া কাটরার মসজিদ দেখিতে যাই। তোপখানায় নাকি নগর-রক্ষার জন্য মুর্শিদকুলি খাঁর কামানাদি রক্ষিত হইত। বর্ত্তমানে এক জাহানকোষা কামান ভিন্ন তোপখানার চিহ্ন মাত্রও নাই। এই তোপখানা এখন কয়েকটি কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি মাত্র। বাঙ্গালী কর্ম্মকার জনার্দ্দন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই জগৎজয়ী মারণাস্ত্র আজ বোধ হয় দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, কারণ এখন ইহাকে সিন্দুরাদি লেপন করিয়া পূজা করা হইয়া থাকে।

কাটরার বিরাট মস্‌জিদ এখন ধ্বংসোন্মুখ। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ মসজিদের অনুকরণে ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে প্রস্তুত মিনার, চৌবাচ্চা ও ইন্দারা এখন চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত। এই মসজিদ নির্ম্মাণের একবৎসর পরে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁহারই অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁহার নশ্বর দেহ মস্‌জিদের প্রবেশ দ্বারের সোপানাবলীর নিম্নস্থ একটি প্রকোষ্ঠে সমাহিত করা হয়।

ভগ্নোন্মুখ এই মসজিদের মধ্যে এখন প্রবেশ করিতে ভয় হয়। এককালে যাহা নয়নাভিরাম ছিল, মনোরম ছিল, আজ তাহাই ভীতিজনক হইয়া উঠিয়াছে। তবুও মুর্শিদকুলি খাঁর এই বিরাট কীর্ত্তির দিকে অপরিসীম বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসে বক্ষ মথিত হইয়া ওঠে।

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছে, রৌদ্র প্রখরতর হইতেছে—কিন্তু জাফরাগঞ্জ না দেখিয়া ফিরিতে পারিতেছিলাম না। জাফরাগঞ্জের নাম শুনিলেই মনে একটা বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। জাফরাগঞ্জ—সিরাজের বধ্যভূমি জাফরাগঞ্জ—কুচক্রীর লীলাভূমি জাফরাগঞ্জ—বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতার সমাধিক্ষেত্র জাফরাগঞ্জ! এই জাফরাগঞ্জেই একদিন মীরজাফর কুর্‌রাণ লইয়া শপথ করিয়া পুত্র মীরণের মস্তক স্পর্শ করিয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের সূচনা করিয়াছিল; এইখানেই কাশীমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেব সিরাজের ভয়ে স্ত্রীলোকের বেশে গুপ্ত মন্ত্রণার জন্য নীত হইয়াছিল; পলাশীর যুদ্ধের পর পলাতক সিরাজ রাজমহলের নিকট ধৃত হইয়া এই জাফরাগঞ্জেরই কোন গৃহে বন্দী হইয়া ছিলেন এবং এই জাফরাগঞ্জেরই কোন অজ্ঞাত অধুনাবিলুপ্ত কক্ষ সিরাজের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। নিমকহারাম মহম্মদী বেগ সিরাজকে নৃশংসভাবে এইখানেই হত্যা করিয়াছিল বলিয়া মুর্শিদাবাদ-বাসিগণ এখনও ইহাকে "নিমকহারামী দেউড়ি" বলে।

জাফরাগঞ্জে আসিয়া দেখিলাম, মীরজাফরের পূর্ব্বতন



নবাব বাহাদুরের প্রাসাদ

প্রাসাদ—মীরণের লীলাভূমি জাফরাগঞ্জ ধ্বংসপ্রায়—আর বেশী দিন বোধ হয় মুর্শিদাবাদের বুকে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা

করিতে পারিবে না। কে একজন আমাদিগকে একটা স্থান দেখাইয়া বলিল, এইখানেই হতভাগ্য সিরাজকে হত্যা করা হইয়াছিল। নিম্ববৃক্ষের নীচে স্থানটি তৃণাচ্ছাদিত, কিন্তু যে কক্ষে সিরাজকে হত্যা করা হইয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের অনতিদূরেই রাজপথের পার্শ্বে নবাববংশীয়দিগের সমাধি-ভবন। এইখানে মীরজাফরের সমাধি আছে, মীরজাফরের পিতা সৈয়দ আহম্মদ নজফীও এইখানে সমাহিত, মীরজাফরের ভ্রাতা রাজমহলের নবাব কাজম আলি খাঁর সমাধিও এইখানে। এই সমাধি-ভবন নৌকার ব্যবস্থা ছিল। নৌকা ধীরে ধীরে ভাগীরথী বহিয়া চলিল। লালবাগের কিছু দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে খোশবাগ—প্রাচীর বেষ্টিত একটি উদ্যান-বাটিকা। এইখানেই সিরাজের খণ্ডিত দেহ সমাহিত, এইখানেই মুর্শিদাবাদের অলঙ্কার বাঙ্গালার আদর্শ-নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ চিরনিদ্রায় শায়িত। এইখানেই রমণীকুলতিলক সতী-সাধ্বী দুঃখিনী লুফৎ-উন্নেশা স্বামীর পদতলে মহাশান্তিতে নিমগ্না। খোশবাগে পৌছিয়াই দেখিলাম গ্রামোফনের রেকর্ডে সিরাজোদ্দৌলা নাটকের অভিনয় হইতেছে। সমাধি-ভবনের পটভূমিকায় হতভাগ্য সিরাজোদ্দৌলার কাহিনী



সমবেত শিক্ষাব্রতীবৃন্দ—(বসিয়া) মিঃ খলিলুল্লাহ, মিঃ সোভান, মিঃ ঘোষ, লালবাগের এস্, ডি, ও মিঃ এস্, কে, ঘোষ (ডি, এম্—মুর্শিদাবাদ), প্রিন্স কাজিম আলি মীর্জা, খান বাহাদুর জা'ফর, মিঃ আফ্জল, মিঃ গুহ ও মিঃ মুখার্জ্জি

বিস্তৃত হইলেও সমাধি-সমাচ্ছন্ন হইয়া এখানে আর তিলমাত্র স্থান নাই। সমাধি দেখিতে দেখিতে মনটা বিরূপ হইয়া গেল। বেলাও প্রায় বারোটা বাজে। আমরা হোষ্টেলের দিকে রওনা হইলাম। বিকালের দিকে আবার খোশবাগ যাইতে হইবে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় সংবাদ আসিল—তরণী প্রস্তুত। খোশবাগ যাইবার জন্য এখনই রওনা হইতে হইবে। সেদিন আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। চারিটি শুনিতে শুনিতে মনটা উদাস হইয়া গেল, অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্ররূপ মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল।

সমাধি-ভবনটি এখন সুসংস্কৃত হইয়া মনোরম হইয়া উঠিয়াছে, বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন ছায়াশীতল স্থানটি সত্যই বৈরাগ্যোদ্দীপক, করুণ, মধুর।

আকাশ ক্রমশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে, কতকটা ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ, বৃষ্টি ত অবশ্যম্ভাবী। খোশবাগে প্রচুর আহার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। তাড়াতাড়ি চা পান করিয়া রসগোল্লা সন্দেশের সদ্ব্যবহার করিয়া নৌকায় আসিয়া

উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। আমরা হোস্টেলে যখন আসিয়া পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

১৯শে সোমবার—সম্মেলনের শেষদিন। বাড়ী ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। বেলা চারিটার মধ্যে সম্মেলনের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স কাজিম আলি মির্জ্জাসাহেব অতিথিদিগকে সবিনয়ে বিদায়-অভিনন্দন জানাইলেন। হাজারদুয়ারী ও ইমামবারার মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে সমাগত অতিথিগণের ফটো তোলা হইল। অনেকে সেইদিনই চলিয়া গেলেন। আমরা কয়েকজন ২০শে মঙ্গলবার ভোরের গাড়ীতে এই তিনটি দিনের করুণ মধুর স্মৃতি অন্তরে বহন করিয়া বাড়ী দিকে রওনা হইয়া পড়িলাম। মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদাবাদের কথা মনে হইলে কবির কথাই মনে পড়ে—

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন—অম্বরতলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লেখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে হায় লক্ষ লক্ষ রাগ-রক্ত ছবি।

বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাং

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

বলো আজি কোন্ ছন্দে গাহি তব স্তব,
তুমি যে এ তৃষিতের
দিবসের নিশীথের
প্রেমের অমিয়-ধারা, সোহাগ-আসব ;
বিরচিয়া যে কথার মালা
সাজাইব মরমের ডালা
নিবেদিতে রাঙা পায়ে, মরণ-হরণ
সুচিরশরণ,
সে বাণীর সকলি তোমার,
বীণাপাণি, তুমি যে আমার।

স্পর্শে তব, মনোবীণা সুরে সুরে বাজে,
ত্রিভুবন কাঁপে তার,
শুনি মধু ঝঙ্কার,
অবিরল ক্ষরে সুধা অবনীর মাঝে,
গ্রহে গ্রহে, রবি তারা সোমে
গীতরবে স্পন্দমান ব্যোমে
অপরূপ ধ্বনি জাগে মীড়ে, মূর্চ্ছনায়—
আনন্দে, আশায়
নরনারী হয় সঞ্জীবিত,
ওগো দেবি! ওগো অভাবিত।

জীবনের সব সাধ, সব সাধনার
অহরহ তুমি লক্ষ্য,
অনুরাগ, স্নেহ, সখ্য
সকলেরি তুমি কেন্দ্র, তুমি-ই আধার,
পরাণের পূজা পুষ্পহারে
বিভূষিয়া তব প্রতিমারে,
নিখিলের যত ব্যথা ভুলি যে পলকে,
অসীম পুলকে
যাতনার জ্বালাময় দাহ
ঘুচি, বহে সুখের প্রবাহ।

জীবন-পাবন হাসি ওই শ্রীমুখের,
তোমারি করুণা স্মরি'
ভারতি! রেখেছি ধরি'
ভকতির পুণ্যপাত্রে আমার বুকের,
কিছু মোর রাখিনি আপন,
কিছু মোর করিনি গোপন,
দিয়াছি ত সরবস্ব অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়,
সঁপিয়া তোমায়,
নত শিরে মিনতি কেবল,
থেকো বাণি হৃদে অচঞ্চল।

কমল-ঝরা চা বাগান

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

চোরবাগানের রাজবাড়ীর বিবাহ উপলক্ষে যেদিন হাতী ঘোড়া সাজাইয়া মিছিল বাহির হইল পূর্ণেন্দুর রাশি-চক্রে গ্রহতারাগুলি না জানি সেদিন কোন্ মহাসঙ্কটের সম্মুখে হা হা করিয়া উঠিয়াছিল। গোরার বাদ্যের ঢক্কা নিনাদে বে-সামাল হইয়া কয়েকটা অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, চারিদিকে সামাল-সামাল রব, ভীত ত্রস্ত দর্শকের দল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। রাস্তার মাঝে দৌড়িতে গিয়া পূর্ণেন্দু ধরাশায়ী হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলি একটির পর একটি তাহার অবলুণ্ঠিত দেহ ডিঙাইয়া জোর কদমে উড়িয়া গেল।

জনতার মধ্যে বিলক্ষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। সকলেই মনে করিল, লোকটার কিম্ভূতকিমাকার রক্তাক্ত কীচকপিণ্ড চোখে পড়িবে। কিন্তু যখন দেখিল, সে একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে, তখন নৈরাশ্যের উদ্বেগ সমস্বরে কলরব তুলিয়া দিল, বেঁচে আছে রে, বেঁচে আছে!

কয়েকজন ঝুঁকিয়া পড়িয়া আগ্রহের প্রাচুর্য্যে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে বেদম টানিতে আরম্ভ করিল। সহানুভূতি মুখর হইয়া ছুটিল—জল ··· য়্যাম্বুল্যান্স্ ··· ডাক্তার ··· টিন্চার আইওডিন ···

ধূলিকর্দ্দমের সহিত দর্শকবৃন্দের সহানুভূতি ঝাড়িতে ঝাড়িতে পূর্ণেন্দু কোনোমতে নিজেকে খাড়া করিল। কহিল, তেমন কিছু হয়নি।

হয়নি, বলেন কি? খুব বেঁচে গেছেন।

যমপুরীর দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিবার মন্ত্রটি ভদ্রলোকের জানা আছে, এমনি ভাবে এক কৌতূহলী ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা মশায়, আপনি বাঁচলেন কেমন করে বলুন ত।

মর্গে পাঠানো চলিবে না—এক কর্ম্মবীর উৎসাহের সহিত তাহাকে ট্যাক্সি করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। পূর্ণেন্দু করজোড়ে নিবেদন করিল, বহু মূল্য সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া অনায়াসে তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পারেন।

তখন অনেকে নিরাশ মনে চলিয়া গেল। কিন্তু কয়েকজন পরহিতব্রতী কোনমতে সঙ্গ ছাড়িল না, পূর্ণেন্দুর পিছে-পিছে ট্রামে চড়িয়া বাড়ি পৌছাইয়া দিল।

বাহিরে শান্তভাব বজায় রাখিবার জন্য পূর্ণেন্দু তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল, অতিরিক্ত জোরের সহিত গা ঝাড়া দিয়া বলিয়াছিল, ও কিছু নয়। কিন্তু এই ক্ষণিক উত্তেজনা কাটিয়া গেলে সে বেশ বুঝিল যে অন্তত কয়েকটা মুহূর্ত্তের জন্য সে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সার্কাসের খেলাড়ুর মত সূক্ষ্ম তারের উপর দুলিতেছিল। অতগুলি হৃষ্টপুষ্ট তরতাজা ঘোড়া পর পর তাহাকে টপকাইয়া গেল, উহার যে-কোন একটির খুরের আঘাতে প্রাণবায়ুটি তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শূন্যে মিশিতে পারিত।

কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু ঘটিল না কেন? জীবনের মূল্য ত তাহার কাণাকড়িও নহে। সুদূর পল্লীগ্রামে পিতৃকুলের দারিদ্র্যভার লঘু করিবার জন্য বড় মামা তাহাকে আপন বাড়ীতে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। সম্প্রতি সে গ্র্যাজুয়েট উপাধি লাভ করিয়াছে, একটি চাকরির সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরিয়া পরিশেষে বেকার-সমিতির দ্বারে মাথা কুটিয়া মরিতেছে। সে মরিলে জগতের এমন কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইত?

ইতিহাস দর্শনতত্ত্ব প্রশ্নটির একটি সমীচীন মীমাংসা করিয়া দিল। মাদ্রাজে ছন্নছাড়া উড়নচণ্ডী ক্লাইভ একাধিকবার চেষ্টা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করিতে পারে নাই, কাহার অদৃশ্য হস্ত সকল বিঘ্ন নিরাকরণ করিয়া ভবিষ্যত পরিণতির জন্য তাহাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছিল। এরূপ কোন পরিপূর্ণ সার্থকতার দিকে সে কি আজ অগ্রসর হইতে চলিয়াছে? সে স্বচ্ছন্দে ভাবিয়া ফেলিল, সেদিন যে ডার্বি-সুইপের টিকিটখানি সে খরিদ করিয়াছিল, এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সহিত নিশ্চয় তাহার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। মৃত ব্যক্তির নামে ডার্বি প্রাইজ উঠিবে এমন হাস্যকর ব্যাপার আর যে হোক, বিধাতা সহিতে পারেন না।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী

পাশা খেলা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

হতাশার বেদনায় কাতর হইয়া একদিন শুভ মুহূর্ত্তে সে ঐ টিকিটখানি সংগ্রহ করিয়াছিল। কথাটা ছিল অত্যন্ত গোপন। এমন কি, অন্তরঙ্গ বন্ধুরা—যাহাদের সহিত প্রতিদিন হেদোর ধারে বসিয়া সিনেমা-তারকাদের চটকদার অভিনয়, হিটলার-মুসোলিনীর রাষ্ট্রনীতি, ইস্তক—ধর্ম্মতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমানে আলোচনা চলিত, তাহারাও পূর্ণেন্দুর এই অসম-সাহসিক অদৃষ্ট-পরীক্ষার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারে নাই।

এক অদৃশ্য শক্তি মানব-জীবনকে অদৃষ্টের পথে পরিচালিত করিতেছে, এই সহজ সত্যে পূর্ণেন্দুর সহসা গভীর বিশ্বাস জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদেবতার প্রতি ভক্তিও যেন প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। তর্ক-বিতর্কে পশুবলিকে সে কোনদিন সমর্থন করে নাই, এক্ষণে অদৃশ্য শক্তির কঠোর তাড়নায় কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানত করিয়া বসিল। শুধু তাই নয়, একদিন সকলের অজ্ঞাতে তারকেশ্বরে গিয়া ধন্না দিয়া পড়িল। দেখো বাবা, ছোট মামীর হিষ্টিরিয়া সেরে গেছে—

মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য উপবাসের শাস্ত্রীয় বিধানকে সে আর অস্বীকার করিতে পারিল না। সুস্থ সবল যুবা পুরুষ, ডাম্বেলমুগুর ভাঁজিয়া শরীরকে তোফা বানাইয়া তুলিয়াছে, অনশন কেমন তাহা জানে না, বরঞ্চ বড়মামার ভোজপুরী দারোয়ানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়া দাল রুটি সেবা করে। কিন্তু দেবতা শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করেন রীতিমত যাচাই করিয়া, ওখানে মেকি চলিবে না, সুতরাং কৃচ্ছ্রসাধনকে জামিন না রাখিয়া উপায় কি?

বিকাল বেলা উপবাস-খিন্ন বপুটিকে এক চক্কর টহল দিয়া সতেজ করিয়া আনিয়া পূর্ণেন্দু দেখিল, চাকর ও সহিসের মধ্যে মস্ত ঝগড়া বাধিয়া গেছে। ছোলার বস্তাটা সহিস লইয়া যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু অপর ব্যক্তি ঐ প্রস্তাবে আদৌ সম্মত নহে।

ভৃত্যটি ওড্র-দেশীয়, বড়মামার ভারি পেয়ারের। নাম কিছু লেখা-জোখা নাই, সহস্রাক্ষ বা বিরূপাক্ষ হইতে পারে। সংক্ষেপে ডাকা হয়, অক্ষ।

অক্ষ বাংলা ভাষার অপভ্রংশ শব্দমালা যোজনা করিয়া বুঝাইয়া দিল, বড়বাবু তাহাকে হুকুম দিয়াছেন. ছোলার বস্তা যেন আপন জিম্মায় রাখিয়া দেয়, নহিলে সহিসটা চুরি করিয়া অর্দ্ধেক সাবাড় করিবে। সহিস বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। জয়ের গর্ব্বে তাহার বদন বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

সারা দিনের অনাহার—বেড়াইয়া আসিয়া জঠর মধ্যে অগ্নি যেন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছিল। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা চলে না, মর্ম্মের ভিতর গোপন আশা আকাঙ্খাগুলি কাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশের পথ খুঁজিতে লাগিল। অক্ষকে সম্বোধন করিয়া সে কহিল, ডাব্বি। ডাব্বি কি তা জানিস?

হুঁ।

ঘোড়ার ডিম জানিস্। লটারি, বাজি জিতলে অনেক টাকা, দু দু লাখ। লাখ কি বুঝিস্ ত?

অক্ষ ঘাড় নাড়িল। বাবুদের কথার দাম লাখ টাকা তাহা সে শুনিয়াছে।

পূর্ণেন্দু হঠাৎ প্রশ্ন করিল, বাড়িতে তোর কে আছে?

তিরি, দুই সন্তান।

পেটের মধ্যে অদৃশ্য শক্তি বুঝি একটু খোঁচা মারিয়া দিল। সোজা উঠিয়া বসিয়া সে বলিল, দ্যাখ্, তোকে আর কোথাও চাকরি করতে হবে না। আমি তোকে পাঁচ হাজার টাকা দেব।

পাঁচ হাজার টাকা! অক্ষ দন্তপাতি বিকশিত করিল।

প্রতিশ্রুতির পরিমাণ মাপের দাগ ছাড়াইতে চলিয়াছে, এমনি উদ্বিগ্নভাবে নিজেকে ঝাঁকি দিয়া সে আবার কহিল, দ্যাখ্ অক্ষ, অতগুলো টাকা হাতে পেলে তুই হয় তো উড়িয়ে দিবি, নয় লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে। তার চেয়ে আমি তোর একটা মাসোহারা ব্যবস্থা করবো'খন।

অক্ষের তাহাতেও আপত্তি নাই।

পূর্ণেন্দু কহিল, টাকা পাবই, তুই কিছু ভাবিস না। দেখবি কোন্ দিন একখানা টেলিগ্রাম এসে পৌছবে। দরোয়ানের কাছ থেকে টেলিগ্রামখানা নিয়ে রেখে দিবি, কাউকে দেখাবি না, এমন কি আমায়ও না। বুঝ্লি?

হুঁ।

ঘোড়ার ডিম বুঝ্লি। আমায় না দেখালে বুঝ্ব কেমন ক'রে যে বাজি জিতেছি? তা দ্যাখ্, একটা কাজ করবি। টেলিগ্রামখানা খুঁটে বেঁধে কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে রাখ্বি। আর যেমনি আমায় একা এই ঘরে

দেখ্‌তে পাবি, যে-অবস্থায় থাকি—যেমন থাকি, অমনি এসে কিছু না বলে, বুঝ্‌লি কি না—দমাদম্‌।

পিঠের উপর কিল চাপড়্‌ ঘুষি, বাপ্‌রে। অক্ষ জিব কাটিল, মু সে পারিব না দাদাবাবু।

পারবি না কি রে? ওরে মুখ্যু, অমন তার পেয়ে কত লোক পাগল হয়ে গিয়েচে তা জানিস্‌? আমারও তেমনি মাথা বিগ্‌ড়ে যাক আর কি! ···

রাত্রি অনেক হইতে চলিল। বই ছবি আরসি এমন কত কি সামগ্রীর এলো-মেলো অব্যবস্থার মধ্যে ছোট একটি খাটের উপর সে অঙ্গ বিস্তার করিয়া পড়িয়া রহিল। পাশের ঘরে মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া অক্ষ শুইয়াই অম্‌নি নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈঠকখানা ঘরের ঘড়িটা টিক টিক শব্দে করাল অনশনক্লিষ্ট রজনীর গাঢ় অন্ধকার নির্ব্বিকার চিত্তে মাপিয়া চলিয়াছে। মূর্দ্ধণ্যের উর্দ্ধ টানের মত একটা তীব্র জ্বালা জঠর ছাড়িয়া একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিল। পূর্ণেন্দুর চক্ষে নিদ্রা আসিল না। সে এপাশ ওপাশ ফিরিয়া দাঁতে দাঁত চাপিতে লাগিল।

বন্ধ ভাঁড়ার ঘরে সঞ্চিত খাদ্য-সম্ভার চোখে ভাসিতে লাগিল। কিন্তু চাবিকাটিটা যে ছোটমামীর কাছে, কাহাকেও সে চাবি দিয়া বিশ্বাস করে না। উপায়? সে উঠিয়া আলো জ্বালিল। দেখিল, অক্ষ দিব্য নিদ্রা যাইতেছে, মাথার কাছে ছোলার বস্তা আর বাল্‌তি।

না, অক্ষকে জাগাইয়া কাজ নাই। ··· বাবা তারকনাথ, অপরাধ লইও না বাবা ··· বালতি হইতে ভিজানো এক মুঠা ছোলা লইয়া সে মুখে পুরিল। ··· কটর মটর ···

ছে, ছে।

ওরে আমি, আমি—

কে, দাদাবাবু?

অক্ষ আশ্বস্ত হইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। ঘুমের ঘোরে সে ভাবিয়াছিল, বদ্‌মাস সহিসটা তাহাকে জব্দ করিবার মানসে দরোয়ানজীর রাম ছাগলটিকে ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে!

গুটিপোকার মত নিজের চারি ধারে কল্পনার রেশমি জাল বুনিয়া অবিকৃত সত্য অপ্রত্যাশিতরূপে একদিন হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল। টেলিগ্রাম আসিল, কিন্তু—সর্ব্বত্র যেমন হয়, গোল বাধিল ঐ কিন্তু লইয়া।

সৌভাগ্যের ইসারা চোখে ঠারিয়া অক্ষ বার বার তাহাকে প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিল। টেলিগ্রামখানা তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া পূর্ণেন্দু তাহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া ফেলিল। কিন্তু কোথায় ভারবি? লক্ষ্ণৌ হইতে প্রভাদিদি তার করিয়াছে, অবিলম্বে চলে এসো, বিশেষ জরুরি।

আগ্রহের সহিত অক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, দাদাবাবু, লাখ তঙ্কা পাইলা?

যাঃ পালা।

বুকটা তখনও ধড়াস ধড়াস করিতেছিল। সাম্যের অবস্থা কথঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিলে প্রভাদিদির উপর ভারি রাগ হইল, যেন তাহার গোপন অভীপ্সাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য সে অমন করিয়াছে। আবার তখনই মনে হইল, কাহারও অসুখ বিসুখ করে নাই ত? প্রভা তাহার বড়মাসীর মেয়ে, বয়সে কিছু বড়, তাহাকে সে যথেষ্ট স্নেহ করে। ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষার পর পূর্ণেন্দু লক্ষ্ণৌ গিয়া কয়েক মাস কাটাইয়া আসিয়াছে। কেমন প্রকাণ্ড বাড়ি, সুন্দর বাগান, দু-তিনখানা মোটর—আসবাবপত্র চাল-চলন সব বিলাতি ধরণের। কিন্তু দূর দেশে আত্মীয়-স্বজন কোথায় যে ব্যারাম হইলে সেবা যত্ন করিবে? সন্ধ্যার গাড়ী ধরিবার জন্য অগত্যা তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইল।

বাগিচার ফটক পার হইয়া একখানি টাঙা গাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতে প্রভা ছুটিয়া আসিল। হাসি-মুখে কহিল, তারটা তা হ'লে ঠিক সময়ে পেয়েছিলি?

ড্রইং রুমে কোচের উপর বসিয়া পূর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এমন জরুরি তলব হ'ল কেন বল ত?

প্রভা হাসিতে লাগিল, সুখবর আছে। বলব'খন।

ঘরের কোণে টেলিফোন তুলিয়া লইয়া সে ডাকিল, হেল্লো, টু থ্রি ফাইভ্‌, থ্যাঙ্ক ইউ। হেল্লো ··· কে, মিসেস্‌ চৌধুরী? ··· হ্যাঁ পূর্ণেন্দু এসে পড়েছে, এইমাত্র ··· বলেছিলাম না? ... তা হ'লে আর দেরী নয়, আজই সব ঠিক ক'রে ফেলব ·· সন্ধ্যেবেলা আসবেন মিষ্টার চৌধুরীকে

সঙ্গে নিয়ে ··· আর মীনারও আসা দরকার ··· বেশ বেশ ··· নমস্কার ···

শঙ্কিত হইয়া পূর্ণেন্দু কহিল, আমায় নিয়ে কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্চে ?

প্রভা আবার হাসিয়া উঠিল, বলেচি না, সুখবর। তোর একটা বিয়ে ঠিক করে ফেলেচি।

বিস্ময়ের ধাক্কায় পূর্ণেন্দু তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। চোক দুটা ডাগর করিয়া বলিল—বল কি, আমার বিয়ে ? চালচুলো নেই, বেকার—

ওরে অর্দ্ধেক রাজত্ব সঙ্গে না নিয়ে রাজকন্যা আসে না। মস্ত বড়লোক ওঁরা, এখানে চেঞ্জে এসেছেন। কয়লা খনির মালিক, কমল-ঝরা চা-বাগান, আরও কত কি। তোর একটা গতি হয়ে যাবে রে, বুঝলি ? ···

প্রভার স্বামী ডাক্তার রত্নেশ্বর সান্ন্যাল নির্ব্বিকার মানুষ, কাহারও সাতে-পাঁচে নাই, গৃহের চেয়ে রোগের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় অধিক ; জীবাণুতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার সম্বন্ধে এমনই পারদর্শী যে মানব-চরিত্রের বিশাল ফাটলগুলি স্বচ্ছন্দে দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। গৃহকর্ত্রী বলেন, তিনি না থাকিলে কর্ণধারহীন তরীর মত অথই সমুদ্রে বেচারী হাবুডুবু খাইয়া মরিত।

পত্নীর হুকুমে রত্নেশ্বরকে সন্ধ্যাকালে বাড়ী থাকিয়া চৌধুরী-পরিবারের সম্বর্দ্ধনা করিতে হইল। মিষ্টার চৌধুরী প্রৌঢ়, থলথলে চেহারা, টাক-পড়া মাথায় কেশের অভাব একজোড়া মস্ত পাকানো গোঁফের গোছা দিয়া পূরণ করিয়াছেন। পত্নী উষারাণী, ওরফে মিসেস চৌধুরী একজন 'সোসাইটি লেডি', কেতা-দোরস্ত। রুজ ও ক্রিমের পলি দিয়া বয়সের কাঁকরগুলিকে ঢাকিয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মুখখানির উপর পরিব্যক্ত। কথার মাঝে হরদম কন্যা মীনার দিকে ফিরিয়া চোখের সতর্ক ইঙ্গিতে শাসন করেন।

রত্নেশ্বর উৎসাহের সহিত বলিয়া গেল, দেখলেন ত মিঃ চৌধুরী পূর্ণেন্দুকে। কী মাস্‌ল্, যেন লোহা। কোন ব্যামো-স্যামো নেই। আমি সার্টিফাই করচি।

কুশান-মোড়া চেয়ারে হেলান দিয়া সিগার টানিতে টানিতে মিঃ চৌধুরী বলিলেন, সত্যি ডাঃ সান্ন্যাল, কোষ্ঠী-ঠিকুজির বিধান সভ্যজগতে আর চলে না। সে জায়গায় মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত।

এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বিজ্ঞানের এক ঝুড়ি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া রত্নেশ্বর হঠাৎ উঠিয়া পড়িল। একজন টাইফয়েড রুগী শিকল কাটিবার যোগাড় করিয়াছে, ডিপ্‌থিরিয়া খাবি খাইতেছে। ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বিদায়গ্রহণ করিল।

ও-ঘরে তখন প্রভার বড় মেয়ে ডলি মীনাকে ভূগোলের মানচিত্র দেখাইয়া বলিতেছে, পৃথিবী চেপ্‌টা না হইয়া গোলাকার—এমন অসম্ভব কথা কেহ কখনও শুনিয়াছে কি ?

পূর্ণেন্দুর পানে চাহিয়া মিঃ চৌধুরী কহিলেন, এখন কাজের কথা পাড়া যাক্, যাকে বলে, টু বিজ্‌নেস্। ধরে নিতে পারি কি, মীনাকে বিবাহ করতে তোমার কোন আপত্তি নেই ?

পূর্ণেন্দু গলাটা একটু সাফ করিয়া লইল মাত্র, মুখে কথা ফুটিল না।

মীনার মতামত আমাদের উপর নির্ভর করে। ওকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েচি, বাড়ীতে গভর্নেস রেখে পড়িয়েচি। কিন্তু এমনি নম্র চরিত্র ওর যে কোন দিন নিজের ইচ্ছা মুখ ফুটে বলে না। এবিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাক্‌তে পার।

পূর্ণেন্দু কোনোমতে কহিল, দেখুন আপনার মেয়ে সুশিক্ষিতা। আমি গরীব, রোজগার নেই—

তাহার পিঠে কয়েকটা মৃদু চাপড় দিয়া মিঃ চৌধুরী কহিলেন, That's all right, my boy. দ্যাখো, সারা জীবন উপার্জ্জন করেচি, অর্থের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আমি চাই একজন শিক্ষিত সচ্চরিত্র স্বাস্থ্যবান যুবা। আমার ঐ এক মেয়ে, একটা কয়লার খনি আর কমল-ঝরা চা বাগানটা আমি তাকে লিখে দেব। আর তোমরা যাতে স্বাধীনভাবে থাকতে পার সেজন্য—এই দ্যাখো—

বলিয়া পকেট হইতে একটি নক্‌সা বাহির করিয়া মেলিয়া ধরিলেন। সেটি বালীগঞ্জের কোনো প্রশস্ত রাস্তার উপর বৃহৎ তেতলা বাড়ীর প্ল্যান। ঘরগুলির ব্যবস্থা আয়তন মোটামুটি বুঝাইয়া দিয়া তিনি কহিলেন, ওটি এখন তোমার কাছে থাক। সকলের পছন্দ সমান নয়। যদি কিছু পরিবর্ত্তন করতে চাও, করতে পার।

বাগানে প্রভা এতক্ষণ উষারাণীকে হরেক রকম গোলাপ দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, ও কি মিঃ চৌধুরী। আপনারা বুঝি আপোষে

কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেললেন। কিন্তু ঘটকি বিদায় বাদ দিলে চল্‌বে না ব'লে দিচ্চি।

উষারাণী কহিল, তা ভাই, তুমি শুধু ঘটকালি নয়, দস্তুরিও পাবে। একজন ভালো জুয়েলারের দোকান দেখিয়ে দিও। গয়নাগুলো এখানে গড়াবো। কলকাতায় সব জোচ্চোর। আর দানের জিনিষপত্র—ছি মীনা।

পাশের ঘরে হাসাহাসির মধ্যে মীনার গলা শোনা গিয়াছিল।

রাত্রে আহারের টেবিলে বসিয়া প্রভা পূর্ণেন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন, মীনাকে পছন্দ হ'ল ত?

পূর্ণেন্দু মুখ টিপিয়া হাসিল। তাহার অর্থ, পাকা জহুরির বাছাই কখনও অপছন্দ হইবার নয়।

ডারবির বাজিমাৎ ছাড়া জীবনের যে অনুরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে এতদিন এ-কথা তাহার মনেও জাগে নাই, তাই সেদিন আশাভঙ্গের নিরুদ্যম তাহাকে অমন পাইয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে সে দিব্য উপলব্ধি করিল, কোন বিরাট ভবিষ্যত সম্ভাবনার দ্বারে অদৃশ্য শক্তি তাহাকে চোখে ঠুলি বাঁধিয়া পৌছাইয়া দিয়াছে।

কমল-ঝরা চা বাগান!—কুলি, বাবু, আপিস, অরেঞ্জ, পিকো—মায়, টি সেস্ কমিটির 'ভারতীয়-চা-পান-করুন' —বিজ্ঞাপনটি পর্য্যন্ত তাহার মাথার গিজ গিজ করিতে লাগিল।

কয়েকদিনের মধ্যে মীনার সহিত পরিচয় তাহার ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল। মিস্টার চৌধুরী যথার্থ বলিয়াছেন, মেয়েটির স্বভাব ভারি নম্র, মৃদু। লাবণ্যের কনক উজ্জ্বল দীপ্তি সে যেন কোন যাদু বলে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, চোখে ধরা পড়ে না—পূর্ণেন্দুর মর্ম্মে তাহা বিঁধিল অজানা অচেনা সেই কমল-ঝরা চা বাগানেরই মত। মীনা আর কমল-ঝরা, পরস্পরের সহিত কেমন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত, আলাদা করিবে কে?—এক সঙ্গে দেখা দিয়াছে এবং কমল-ঝরা মীনাকে দিয়াছে যেমন দেহের সৌষ্ঠব, সে-ও তেমনই ঐ চা বাগানের মধ্যে সবুজ প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা বেনারসীবাগের নির্জ্জন অন্ধকার কোণটিতে একটি বেঞ্চের উপর তাহারা বসিয়াছিল। আর সকলে ঘুরিয়া ফিরিয়া চিঁড়িয়াখানা দেখিতেছে।

আচ্ছা মীনা, কমল-ঝরা চা বাগানে তোমার বাবার সঙ্গে কখন গিয়েছিলে কি?

মীনা ঘাড় নাড়িল, না।

একটা ম্লানায়মান সান্ধ্য রাগিণী তাহার কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া গেল, পূর্ণেন্দু তাহা ধরিতে পারিল না। হঠাৎ বলিয়া উঠিল—জান মীনা, আমাদের দুজনের মিলন, এর ভেতর নিয়তির কত বড় গোপন খেলা লুকানো রয়েচে?

সচকিত দৃষ্টি তাহার পানে মুহূর্ত্তের জন্য রাখিয়া মীনা প্রশ্ন করিল, আপনি বুঝি নিয়তি বিশ্বাস করেন?

তা আর করি না? নইলে তুমি আর আমি—কেউ কাউকে চিনি না। আর—এমনই কোন সৌভাগ্য ঘটবে তার আভাস নিয়তি আমায় আগে থেকে জানিয়ে দিয়ে গেছে।

মীনা কহিল, কিন্তু সেটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য তা বুঝলেন কেমন ক'রে? এখনও ত জানবার সময় হয় নি?

মিঃ চৌধুরী উষারাণী ও প্রভাকে লইয়া দেখা দিলেন। উষারাণীর স্বর পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িয়া ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল।·· দ্যাখ ত ভাই কেমন? যত বলি দিন ঠিক ক'রে ফেল, উনি বলেন ব্যস্ত কিসের? কি যে হয়েচেন, কিছুতে গা করেন না। কাজটা কলকাতায় হ'লেই ছিল ভাল, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। ফ্যাসাদ কি কম? জুয়েলার দরজি ময়রা—একা আমি, কোন দিক্ দেখি—

গগনপ্রান্তে দূর নক্ষত্রের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া মিঃ চৌধুরী বলিয়া গেলেন, একমাত্র মেয়ে, ওর বিয়ে হবে কত ধুমধাম ক'রে। তাড়াহুড়ো কেন?

একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। রত্নেশ্বর 'কল্' হইতে ফিরিয়াছে। নামিয়া কহিল, নমস্কার মিঃ চৌধুরী। এই যে মীনা, শালটা গলায় জড়িয়ে ফেল' ত। অদৃশ্য শত্রু চারধারে ঘুরে বেড়াচ্চে, কোন্ দিক থেকে কখন আক্রমণ করে তার ত ঠিক নেই।

শঙ্কার ছায়া মীনার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল। গা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। ত্রস্ত হস্তে শালখানি সে কণ্ঠে জড়াইল।

বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। চৌধুরী-দম্পতি প্রভাকে লইয়া দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়ায়, জিনিসপত্র পছন্দ

করে, ফরমাস দেয়। মীনাকে ধরে সঙ্গে যাইবার জন্য, কিন্তু সে যায় না—বলে, আমার আবার পছন্দ কিসের মা, তুমি যা বেছে দেবে আমার তাতেই পছন্দ। মেয়ের ঔদাসীন্যে মা ঈষৎ বিরক্ত হইয়া পঠে, কিন্তু খুশী হয় তার চেয়ে ঢের বেশি। তাহার উপর মীনার একান্ত নির্ভর মাতৃস্নেহের গুরুভার বর্দ্ধিত করিয়া তোলে।

কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে এই নম্র কম্র মেয়েটির অন্তরে কি যেন দ্বন্দ্ব মাঝে মাঝে নাড়া দিয়া উঠিতেছিল। সে বড় কাহারও সহিত আর মিশিতে চায় না, নীড়ের মধ্যে পাখা গুটাইয়া কি একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় জড়-সড় হইয়া বসিয়া থাকে। বুঝি এখনই কোন বিঘ্ন, মহা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যায়—আর, তাসের ঘরের মত জীবনের সকল সুখ শান্তি নিমেষে ধ্বসিয়া পড়ে।

ড্রইং রুমে বসিয়া সে রুমালে ফুল তুলিতেছিল। অর্দ্ধ-স্ফুট গানের মৃদু গুঞ্জন, সূঁচের নিপুণ টান-ফোঁড়—এক সঙ্গে উহারা বিষাদ-ভরা হৃদয়ের গ্লানি বিচিত্র নমুনার মধ্যে ফুটাইতে লাগিল।

কাহার পদশব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তারপর বিষণ্ণ মুখে হাসি টানিয়া কহিল, ও আপনি? বসুন।

পূর্ণেন্দু চেয়ারে বসিল। হাতে বাড়ির সেই নক্‌সা। সেটি খুলিতে খুলিতে কহিল, প্ল্যানটা তোমার বাবা আমায় দেখ্‌তে দিয়েচেন, যদি কোন পরিবর্ত্তন দরকার হয়। তুমি একবার ভ্যাখো ত। আমি বলছিলাম কি—

সূচিকর্ম্মে আবার মনোনিবেশ করিয়া মীনা বলিল, নক্‌সা দেখা বৃথা। বাড়ি হবে না।

পূর্ণেন্দু একটু থমকিয়া গেল। বলিল, বেশ ত, তুমি যদি কলকাতায় থাক্‌তে না চাও আমারও সেই মত। কলকাতা আমার ভাল লাগে না। আমরা বরঞ্চ কমল-ঝরা চা বাগানে একটি বাংলো তৈরি করে থাক্‌ব।

না, সেখানে থাকা হবে না।

পূর্ণেন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি! তা হ'লে কোথায় থাকবে তুমি?

হাতের কাজ ঠেলিয়া দিয়া মীনা কথা কয়টিতে ঈষৎ জোর দিয়া বলিল, তাই ত, কোথা থাক্‌ব আমি। এ ক'দিন ধরে আমি যে শুধু ঐ কথাই ভাব্‌চি।

উঠিয়া মিনতি করিয়া কহিল, একটু বসুন। আমি এখনি আসচি।

এক তাড়া কাগজ লইয়া সে ফিরিয়া আসিল। একখানা পূর্ণেন্দুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, পড়ে দেখুন।

পড়িতে পড়িতে পূর্ণেন্দুর মুখখানি কেমন আঁধার হইয়া আসিতেছিল, সে তাহা নিবিষ্টমনে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে আর একখানি তুলিয়া দিল—তারপর আর একখানি—

পূর্ণেন্দুর ললাটে ঘর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছিল। রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে সে কহিল, কমল-ঝরা চা বাগান, কয়লার খনি—সবি দেখ্‌চি দেনার দায়ে নিলাম-বিক্রী হয়ে গেছে। এখন আর কিছু নেই। তা হ'লে উনি যা বল্‌চেন সে সব—বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল।

দৃপ্তস্বরে মীনা কহিল, জুচ্চুরি? না। বাবাকে জোচ্চোর প্রতিপন্ন কর্‌তে এসব আমি আপনাকে দেখাই নি। তাঁকে আমি বেশ চিনি, তিনি একজন মহা মানী লোক। তাঁর এই দুরবস্থার কথা তিনি কাউকে জানান নি, মাকেও না। দৈবাৎ একদিন ওই কাগজগুলি আমার চোখে পড়ে গেল—যাক্ সে কথা। আমি জানি, একটি পিস্তল তিনি সব সময় কাছে রাখেন, যে দিন সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেই দিন আত্মহত্যা কর্‌বেন।

পূর্ণেন্দু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মীনার কথাগুলি যেন তাহার মস্তিষ্কের ফাঁক দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না কোনোমতে।

মীনা বলিয়া গেল, হ্যাঁ, বাবা আমার বড় অভিমানী। গরীবের মত আমার বিয়ে দেবেন এ কথা তিনি ভাব্‌তেও পারেন না। অতীত সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি আমায় দেখে থাকেন, বর্ত্তমানটা যেন কিছুই নয়। তাই, বাড়ী যৌতুক দেবেন বলে যে নক্‌সা তিনি বহু আগে তৈরি করে রেখে-ছিলেন, তাই বের করে এখন মনকে চোখ ঠারেন।

পূর্ণেন্দু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এ সব কথা আমায় জানাবার তোমার উদ্দেশ্য?

মীনা কহিল, সেদিন বলছিলেন নিয়তি বিশ্বাস করেন। যখন বুঝবেন, সে আপনাকে কমল-ঝরার দিকে নয়, সর্ব্ব-হারার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে বসেচে, আপনি তখন সাবধান হবেন। আমায় আর বিয়ে কর্‌তে চাইবেন না।

যদি তা সত্বেও চাই ?

কাতর স্বরে মীনা বলিয়া উঠিল, না না, তা হতে পারে না। বাবার দিকে চেয়ে দেখুন। একদিন ত কিছু গোপন থাক্‌বে না। সেদিন তিনি আর বাঁচবেন না। তাঁর কাছে প্রাণের চেয়ে মান যে ঢের বেশি বড়।

একরাশ বাজার লইয়া চৌধুরী-দম্পতি সবে ফিরিয়াছেন—গহনাপত্র সাড়ি ব্লাউস—আরও কত কি। কথাগুলি গোপন রাখিতে পূর্ণেন্দুকে বিশেষভাবে মিনতি জানাইয়া মীনা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এই যে পুর্ণেন্দু, কতক্ষণ ? ছাখো ত বাবা, জিনিসগুলি পছন্দ হয় কি না। ··· এখানকার দোকানদারগুলি ত আচ্ছা বেয়াদব হে। বলে কি না কলকাতার ব্যাঙ্কের ওপর চেক্ চল্‌বে না। ··· কই, মীনা কোথায় ?

উষারাণী আসিয়া জানাইল, মীনা বিছানায় শুইয়া আছে, বেজায় মাথা ধরিয়াছে, উঠিয়া আসিতে পারিবে না।

জতুগৃহের মত কমল-ঝরা পুড়িয়া ছাই হইল সত্য, কিন্তু ঐ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য হইতে মীনা বাহির হইয়া আসিল যেন কষিত কাঞ্চন, পূর্ণেন্দুর সমগ্র চিন্তাধারার উপর তাহাই এক্ষণে মায়া বিস্তার করিয়া দিল।

এইমাত্র মীনার একখানি চিঠি সে পাইয়াছে। লেখা আছে— আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি, তাই বলচি, আমায় বিয়ে করবার সঙ্কল্প আপনি ছাড়ুন—ওতে কারু মঙ্গল নেই! আর এক কথা, এখানে আমার কোনমতে থাকা চল্‌বে না। আজ আমি বড় একা, বড় অসহায়। আমায় একটি শিক্ষয়িত্রীর পদ যোগাড় করে দিতে পারবেন কি ?···

সে আবার অনুভব করিল, নিয়তির অদৃশ্য হস্ত—তাহার জীবনের গতি আর একদিকে ঘুরিতে বসিয়াছে। সে বাঁচিয়া আছে যেন ডারবির জন্য নয়, কমল-ঝরার জন্যও নয়। ঐ যে মেয়েটি নিবিড় হতাশ্বাসে তাহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিতেছে, আবার যাত্রার পথে একা বাহির হইতে চায় তাহারই সাহায্য ভিক্ষা করিয়া। নূতন লক্ষ্য, নূতন ব্রত আসিয়া দেখা দিল। মীনার সকল ব্যথা-বেদনার ভার বলিষ্ঠ দুটি বাহু দিয়া সে অক্লেশে বহন করিয়া চলিবে। অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া ? সে-যে ভারি লজ্জার কথা!

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। ···

সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। চৌধুরীরা বাড়ী নাই, বিবাহের নিমন্ত্রণ লইয়া ব্যস্ত।

রাস্তার উপর একখানি টাঙা আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ণেন্দু ডাকিল, মীনা!

মীনা বাহির হইয়া আসিল। ফিস্ ফিস্ করিয়া পূর্ণেন্দু কহিল, সেই যে শিক্ষয়িত্রীর কাজের কথা বলেছিলে না? যোগাড় হয়েচে, চল।

মীনার চোখ দুটি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, বলেন কি ? এরই মধ্যে ?

সে সব বলবথ’ন। তোমার শিক্ষয়িত্রীর প্রস্তাবটা কিন্তু চমৎকার—আমার মাথায় চট ক’রে একটা প্ল্যান ঢুকিয়ে দিয়েচে। তারপর এ ক’দিন যে কত চিঠি লিখেচি বেকার-সমিতির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আমারও একটা মাস্টারী জুটে গেছে ওখানে। লিখেছিলাম, স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই চাকরি চাই।

স্বামী-স্ত্রী ?

হ্যাঁ মীনা, কাজে যোগ দেবার আগে আমাদের ভিতর ঐ সম্বন্ধই হবে। তবে বিয়েটা হবে গোপনে। তোমার বাবা এর কিছু টের পাবে না, অন্তত এখন।

মীনা তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া সে হাসিতে হাসিতে বলিল, বুঝ্‌তে পারচ না মীনা? আমরা যে পালিয়ে যাচ্ছি, এখ্‌খুনি। টাঙা নিয়ে এসেচি। চল স্টেশনে, গাড়ীর আর বড় দেরী নেই। ···

মিঃ চৌধুরী যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। বেহারা তাহার হাতে একটি চিরকুট দিয়া বলিল, কে এক ছোক্‌রা স্টেশন হইতে আসিয়াছে, এক-জন মেম সাহেব না কি তাহাকে ওটি দিয়া রেলে চলিয়া গিয়াছে!

চিরকুট পড়িয়া তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে উষারাণী আসিয়া কহিল, মীনাকে দেখচি না যে। শোবার ঘর, বাথরুম কোথাও নেই।

হতাশভাবে আকাশে হাত ছুঁড়িয়া মিঃ চৌধুরী কহিলেন, ওরা পালিয়েচে। একেবারে ইলোপ্‌মেণ্ট্।

উষারাণী ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল—অ্যাঁ, বল কি গো?

মিঃ চৌধুরী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, ঐ যে হতভাগা পূর্ণেন্দু। তখনই মনে হয়েছিল, ভ্যাগাবণ্ডটার হাতে মেয়ে দিয়ে ভাল করচি না।

উষারাণী প্রাণ ফিরিয়া পাইল। কহিল, ও তাই বল। তা ওদের এমন ক'রে পালিয়ে যাবার দরকার ছিল কি? আর ক'টা দিন বই ত নয়? অবাক কল্লে যে।

মিস্টার চৌধুরী উঠিয়া পায়চারি করিতেছিলেন। কহিলেন, রোমান্স, বুঝলে কি-না রোমান্স। চমৎকারিত্বের প্রবৃত্তি যুবক-যুবতির অন্তর্নিহিত। আর, সেই জন্ম ব্রহ্মদেশে প্রথা আছে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে বর-ক'নেকে নিয়ে পালিয়ে যায়—বিয়ের পর ফিরে এসে মেয়ের বাপের কাছে মাপ চায়। এ-ও তাই।

ড্রয়ার খুলিয়া বাড়ির প্ল্যানটি বাহির করিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু বলে রাখ্চি, ওদের ক্ষমা আমি কিছুতে করব না। আমার বিষয়-আশয় থেকে ওরা বঞ্চিত। কমল-ঝরা চা বাগান আর যে হোক্—ওরা পাবে না। আর এই বাড়ীর প্ল্যান—

অত্যন্ত বিরক্তিভরে নক্সাটি তিনি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দিলেন।

বিশ্বাসেতে লভিল যা চায়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

আত্মীয়ের দস্যুতায়
ভেঙ্গেছিল বুক্ তার ব্যথা-বেদনায়;

রিক্ততার তিক্ততায় হয়েছিল ভয় ও ভাবনা,
তাইতে সে করেছিল আপনার মরণ-কামনা।

সহসা পশিল কানে করুণার সুর,
সে সুরে ধ্বনিত যেন—
আমি আছি পাশে তোর ভয় কর্ দূর।

শিথিল হৃদয়-বীণা
বাঁধ্ রে কঠোর হস্তে যতন করিয়া,

জয়গান সেই যন্ত্রে
সাধনায় উঠিবেরে পুন ঝঙ্কারিয়া।

আছে কাছে পরশপাথর
খুঁজে তাহা ছোঁয়ারে সত্বর—
বেদনার লোহা যত সোনা হ'য়ে যাবে,

সর্ব্বরিক্ত দস্যু এসে
তোরি পায়ে ক্ষমা-ভিক্ষা চাবে।

আছেরে লক্ষ্মীর দান
তোর তরে ভাণ্ডারেতে ভরা,

ভয় কি সাধক তোর
জেগে ওঠ্ জেগে ওঠ্ ত্বরা।

প্রাণবন্ত রে অজেয়
হস্নেরে বুদ্ধিহীন অগ্নি-পরীক্ষায়,
জয়যাত্রা সুরু তোর জেনে রাখ্ রুদ্র দীনতায়।

আশ্বাসের বাণী শুনে
বিশ্বাসেতে ব্যথাতুর লভিল যা চায়,

চরণে লুটায় দস্যু
লাঞ্ছিতের করুণা, ক্ষমায়।



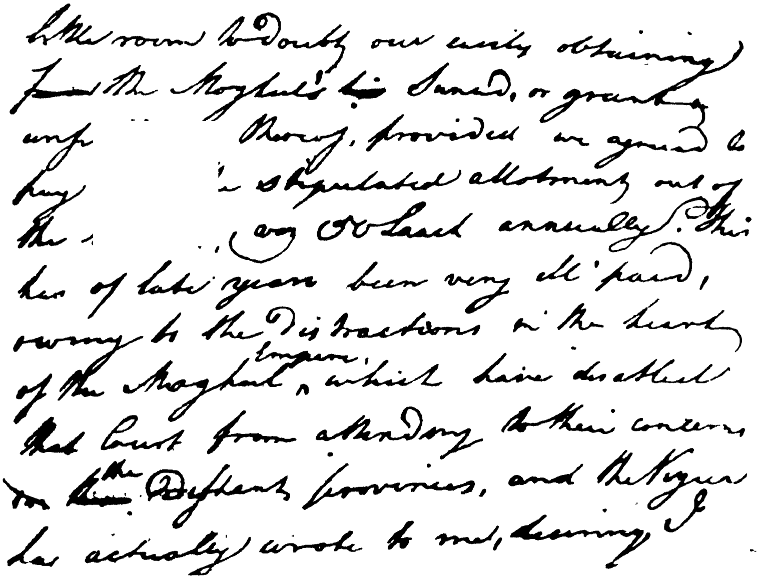
সেকালের ইংরেজ-সমাজ

শ্রীহরিহর শেঠ

(২)

পাঠচর্চ্চা

পুরাতন যুগে পড়াশুনার চর্চ্চা খুব কমই ছিল। তখন কাব্যের ঝঙ্কার টাকার ঝনঝনানির কাছে বড় একটা স্থান পাইত না। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মে জন্ নামে এক ব্যক্তি একটি সাধারণ লাইব্রেরী পরিচালনা করিত। তথায় বৎসরে একবার মাত্র পুস্তক খরিদ হইত। এণ্ড্রু নামে অপর একজন ভদ্রলোক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে একটি সার্কুলেটিং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। হরকারু সার্কুলেটিং লাইব্রেরী নামে আর একটি লাইব্রেরী বহু বৎসর পরিচালিত হইয়াছিল। মুদ্রণ ব্যয় তখন অত্যধিক ছিল, পরবর্ত্তী শতাব্দীর তুলনায় ৫০০ গুণ অপেক্ষাও অধিক ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ১৪২ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক সাধারণ গ্রাহকদিগের জন্য ২৪৲ টাকা মূল্য ধার্য্য হইয়াছিল। সংবাদপত্রও তখন ছিল না। কলিকাতা হইতে প্রথম সংবাদপত্র যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হিকির বেঙ্গল গেজেট। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী শনিবার সাপ্তাহিক আকারে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।



little room to doubt our early obtaining
from the Moghul's [illegible] Sunnd, or grant
unp[illegible] theory, provided we agreed to
pay [illegible] stipulated allotment out of
the [illegible] Lack annually. This
has of late years been very ill paid,
owing to the distractions in the heart
of the Moghul Empire, which have disabled
that Court from attending to their concerns
in the different provinces, and the Mogul
has actually wrote to me, desiring

লর্ড ক্লাইবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

স্থলযান ও জলযান

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন খুব অল্পই ছিল; এমন কি, চিকিৎসক ও ভদ্রমহিলারা পর্য্যন্ত পালকিতেই যাতায়াত করিতেন। তখন চেয়ার-বিশিষ্ট একপ্রকার পালকি দেখা যাইত। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের মধ্যে এমন নিয়ম ছিল যে কেবলমাত্র চুঁচুড়ার ডিরেক্টর ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষে চেয়ার-বিশিষ্ট পালকির ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে অলিফ্যাণ্ট (Oliphant) মাইকেল্ (Mitchell) এবং সিমসন্ (Simpson) নামে গাড়ীওয়ালার নাম পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতা হইতে বাহিরে প্রমোদ ভ্রমণে যাওয়া প্রায় ছিলই না, কারণ কলিকাতার বাহিরে তেমন ভাল রাস্তা ছিল না। শহরের মধ্যেও তখন ভাল রাস্তা বলিতে খুব কমই ছিল। বেনারস যাইবার জন্য তখন গঙ্গার ধার দিয়া রাজমহল হইতে পথ ছিল। পালকি ভাড়া প্রতি মাইলে এক-টাকা দুই আনা হিসাবে লাগিত। বজরা করিয়া নদী-পথে যাতায়াত চলিত কিন্তু তাহাতে সময় অত্যধিক লাগিত। রাজকর্ম্মচারীদের এজন্য বহরমপুর যাইতে একমাস, বেনারস আড়াই মাস ও কানপুর সাড়ে তিন মাস সময় দেওয়া হইত। নদী-পথও তখন ব্যাঘ্র ভীতিতে বিপদসঙ্কুল ছিল। কাশিমবাজার, রাজমহল ও সুন্দরবনের নিকট ব্যাঘ্র সকল সাঁতড়াইয়া বজরা অনুধাবন করিত।

দাসদাসী প্রভৃতি

তখনকার দিনে খানসামা পেয়াদা ভিন্ন ছাতাবরদার, আবদার, মশালচি, হুকাবরদার, যোবদার, সন্তাবর্দ্দার প্রভৃতি বিভিন্ন নামে দেশীয় দাস সকল সাহেবদের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নিযুক্ত থাকিত। ছাতা-বরদারের কাজ ছিল মনিবের মাথায় ছাতা ধরিয়া যাওয়া। মশালচি গাড়ির সহিত মশাল লইয়া দৌড়িত। আবদারের কাজ ছিল পানীয় জলকে শীতল করা। হুকা বা গড়গড়া দ্বারা তাম্রকূট সেবন তখন ইংরেজ-মহলে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল; এমন কি কথিত আছে মহিলাগণও ইহাতে বিশেষভাবে অভ্যস্থ ছিল। কোন পুরুষ বন্ধুকে আপ্যায়িত করিবার তখন একটি শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাহাকে তাঁহার গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতে দেওয়া। তাম্রকূটসম্বন্ধীয় কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত থাকিত এবং আবশ্যকমত প্রভুর সহিত নিমন্ত্রণ মজলিশে গড়গড়া প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া যাইত তাহাদের হুকাবরদার বলিত। যোবদার ও সন্তাবরদার প্রভুর সহিত তাঁহার সম্মান-সূচক রৌপ্যমণ্ডিত আশা-শোঁটা বহনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। পালকি বহনকার্য্য বহুদিন অবধি, এমন কি, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত উড়িয়া বেহারা দ্বারা সম্পাদিত হইত। কথিত আছে এই কার্য্যের দ্বারা বৎসরে তিন-[illegible] টাকা তাহাদের দেশে চলিয়া যাইত। পোর্ত্তুগীজ আয়াও তখন সা[illegible]টিতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত।



লর্ড ওয়েলেস্‌লি বালিগঞ্জে তাঁহার সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন—১৮০৫

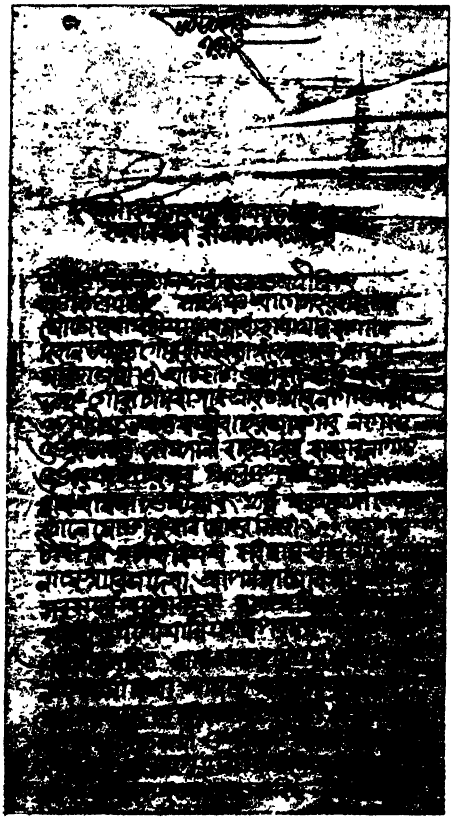


প্রাচীন কলিকাতার একটি দৃশ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত গৃহের ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য লোকজনের বেতনের হার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৭৫৯	১৭৮৭	১৮০১
	আরকট টাকা	সিক্কা টাকা	
যোবদার	৫৲	৫৲	১৫৲ হইতে ৩০৲
প্রধান পাচক	৫৲	৬৲	১০৲ „ ২০৲
পাচকের সহকারী	৩৲	৫৲	৬৲ „ ১০৲
কোচম্যান	৫৲	১০৲	১০৲ „ ১৬৲
প্রধান দাসী	৫৲		৮৲ „ ১৬৲
জমাদার	৪৲	১২৲	৬৲ „ ১০৲
খিদমৎগার	৩৲	৫॥০	৬৲ „ ১২৲
প্রধান বেযারা	৩৲	৫৲	৮৲
সাধারণ দাসী	৩৲		৪৲ „ ৬৲
পিয়ন	২৲	৫॥০	৩॥০ „ ৪৲
রজক (সমগ্র পরিবারের)	৩৲	১০৲	৬৲ „ ৮৲
রজক (একজনের)	১॥০	৪৲	৫৲ „ ৬৲
সহিস	২৲	৪॥০	৪৲ „ ৬৲
চুল ছাঁটা নাপিত	১॥০	৫॥০	৬৲ „ ১৬৲
ক্ষৌরকার নাপিত	১॥০	১॥০	২৲ „ ৪৲

মালি	২৲	২৲		৪৲
খেমুড়ে	১।০	৩৲	২৲ „	৪৲
হাড়ি স্ত্রীলোক (সমগ্র পরিবারের জন্য)	২৲	৫৲		
হাড়ি স্ত্রীলোক (একজনের জন্য)	১৲		৩৲ „	৪৲
ধাত্রী	৪৲	পরিধেয়ও	১২৲ বা ১৬৲	
শিশুকে স্তন্য দানের জন্য ধাত্রী	৪৲	পরিধেয়ও	১৬৲	



সুতানুটীর একখানি পুরাতন বিক্রয় কওলা—১২০২

আতিথেয়তা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা যখন কম ছিল, তখন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও বাড়ী-ভাড়া কমই ছিল এবং বেতনের হার উচ্চ ছিল। সে সময় কলিকাতা আতিথেয়তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। নবাগতগণ সহজেই কোন না কোন সংসারে আশ্রয়লাভ করিত এবং তথায় পরিচর্য্যা ও আহারাদির সুবন্দোবস্ত হইত। সওদাগর-



কাউন্সিল হাউস—১৭৯২

দিগের বাটীতে বন্ধুবান্ধব এমন কি যাঁহারা বিষয়কর্ম্মের জন্য দেখা করিতে আসিতেন তাহাদের সকলের জন্য টাটকা জলযোগের ব্যবস্থা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আগন্তুক ও আহারীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সহিত ক্রমে উক্ত প্রকার আতিথেয়তার হ্রাস পাইতে এবং বোর্ডিং-হাউসের উদ্ভব হইতে লাগিল।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এলাইজা ইম্পের ভূতপূর্ব্ব স্টুয়ার্ড ও স্যার টি, রামবল্ডস্ (Sir T. Rumbolds)-এর ভূতপূর্ব্ব পাচকের দ্বারা পরিচালিত একটি হোটেলের বিজ্ঞাপন পরিদৃষ্ট হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশেও কলিকাতায় হোটেল ছিল না। তৎপূর্ব্বে লালবাজার ও কশাইটোলায় দুইটি সরাই ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলসনের ফলতায় একটি বড় হোটেলের মত প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে সমুদ্র-যাত্রীদের একক অথবা সপরিবারে অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল।

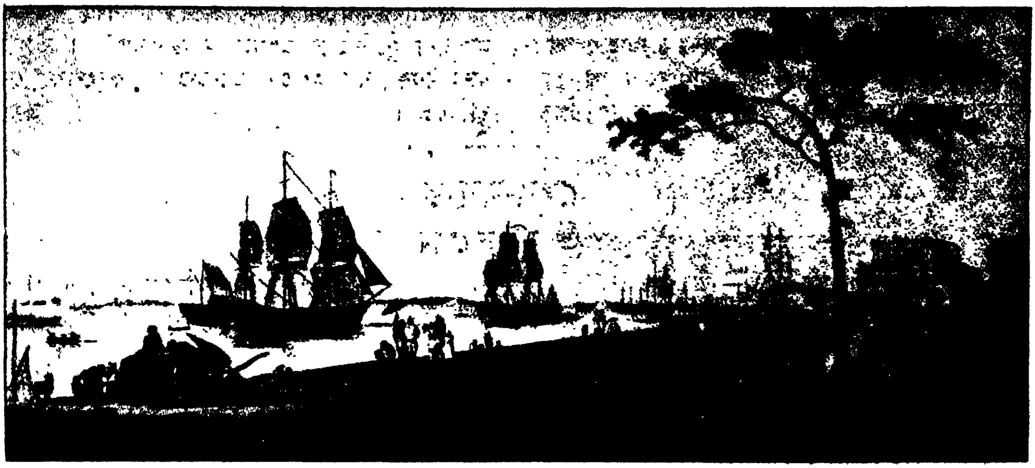
বাড়ী ভাড়া ও আহারীয় দ্রব্যাদি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে একটু ভাল দ্বিতল বাটির ভাড়া অধিক ছিল। দ্বিতলে একটি হল ও দুইটি ছোট ঘর-

গবর্ণমেণ্ট প্রেস—১৮৪০

বিশিষ্ট বাড়ির মাসিক ভাড়া ছিল ১৫০৲ টাকা। ঐরূপ বাড়ি শহরের উৎকৃষ্ট অংশে হইলে ভাড়া তিন হইতে চারিশত

টাকা। বাংলোগুলির ভাড়াও কম ছিল না। কোন কোন খাদ্যসামগ্রীর মূল্য কিন্তু বেশ কম ছিল। নিম্নে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কতকগুলি খাদ্যের দর লিখিত হইতেছে।



বর্ত্তমান ইডেন গার্ডেন যেস্থানে অবস্থিত তথাকার পূর্ব্বেকার দৃশ্য—১৭৯২

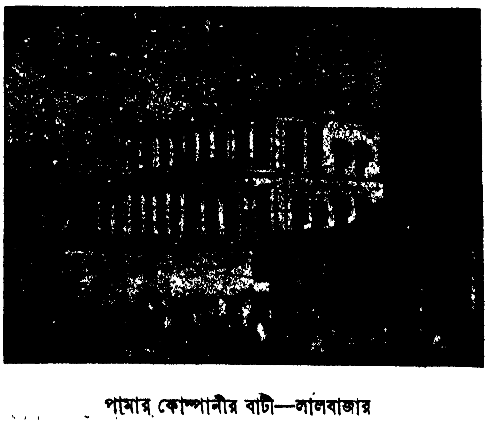
একটি বড় ভেড়া—২৲
একটি মেষ শাবক—১৲
ছয়টি মুরগী—১৲
ছয়টি পাতি হংস—১৲
দুই পাউণ্ড মাখম—১৲
১২ পাউণ্ড রুটি—১৲
উত্তম পনির—১ পাউণ্ড—১৷৹
ইংলিশ ক্লারেট মদ্য ১ ডজন—৬০৲

ক্যাপ্‌টেন্ উইলিয়ম্‌সন্ তখনকার দিনের খাদ্য দ্রব্যাদির যে সব মূল্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অতীব সুলভ ছিল। তখন একটি ভেড়ার দাম গড়ে ১৲ তৎপূর্ব্বে এক কুড়ির দাম ছিল ৬৲ হইতে ৮৲ টাকা। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে লবণের দর ছিল প্রতিমণ ১৲, ব্রাণ্ডি প্রতি গ্যালন্ ২৷৹, রম প্রতি গ্যালন্ ১৷৹, পোর্ট মদ্য প্রতি পিপা ১০০৲, ব্যাণ্ডেল্ চিনি প্রতিমণ ৭৷৹ টাকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শীতকালে কপি মটরশুঁটি, সিম পাওয়া যাইত, কিন্তু গ্রীষ্মকালে একপ্রকার শাক ও শশা ভিন্ন সাহেবদের আহারীয় অন্য কোন ফলমূল বা শাকসব্জী পাওয়া যাইত না। পরবর্ত্তী যুগে আলু, কলাইশুঁটি ও ফ্রেঞ্চবিন্ বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। ওলন্দাজরা তাহাদের উত্তমাসা অন্তরিপ হইতে বীজ আমদানি করিয়া



এসেমব্লি রুম



পামার কোম্পানীর বাটী—লালবাজার

প্রথম এদেশে আলুর চাষ করেন। ইংরেজরা তাঁহাদের নিকট হইতেই সাধারণত সকল প্রকার আবশ্যকীয় শাকসব্জীর বীজ ও বিবিধ প্রকার গাছের চারা পাইত। দ্রাক্ষার চাষও এ প্রদেশে তাহাদের সহায়তায় প্রবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্যানপালনের অভিজ্ঞতা ইংরেজরা ওলন্দাজদের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময় চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের এবং গরুটিতে ফরাসীদের প্রাসাদ সংলগ্ন দুইটি খ্যাতনামা উদ্যান ছিল। উত্তরকালে কলিকাতাতেও কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাগানবাড়ীর কথা জানা যায়, যথা, গার্ডেনরিচে স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের, ভবানীপুরে স্যার আর চেম্বার্সের, বাগবাজারে পেরিন সাহেবের এবং দক্ষিণেশ্বরে জেনারেল্ ডিকেন্সের।

দ্রব্যাদির মূল্য কম থাকিলেও সেকালে পদস্থ ইংরেজদের দাসদাসী প্রভৃতির বেতনে মাসিক বহু ব্যয় হইত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ৩০।৪০ জনেরও অধিকসংখ্যক লোক রাখিতেন। ক্রমশঃ

মেঘ-মল্লার

শ্রীঅজিত ঘোষ

ঘন মেঘজালে গগন গিয়াছে ছেয়ে—
বাদলের ধারা এখনো নামিতে বাকি,
রাত্রিশেষের আকাশের পানে চেয়ে
পিয়াসী চাতক সবে উঠিয়াছে ডাকি।
কভু বা সুদূর অভ্র-মেদুর হ'তে
ভেসে আসে সুর গুরু গুরু গরজনে,
আলোক দীর্ণ আঁধার শূন্যপথে
চকিত চপল করে খেলা ক্ষণে ক্ষণে।
ধূমল মেঘেতে না-জানি কি যেন ব্যথা—
হারানো প্রিয়ের লুকানো মনের বাণী!
গভীর মন্ত্রে ছন্দ যা আছে গাঁথা
এখনি বুঝি-বা হয়ে যাবে জানাজানি!
দিক্‌দিগন্তে আকাশপ্রান্তে বসি
পুঞ্জমেঘের গুঞ্জরণের মাঝে
প্রেমরসে প্রিয় যেন উঠি' উচ্ছ্বসি
সস্মিত মুখে মিলন-ব্যথায় রাজে।
নয়নভোলানো শ্যামল মূরতিখানি—
সুকোমল তনু, অপরূপ অনুপম
মানসলোকেতে মেলে যেন সন্ধানী—
যে রূপমায়ার মেঘে আছে প্রিয়তম।
রাজ-অধিরাজ যেন দূরে রাজবেশে
আসীন মেঘের স্বর্ণসিংহাসনে,
পীত-পরিধেয়ে সোনার চিক্কণ মেশে
সুশোভিত ভূষা সাতসাগরের ধনে।
পূর্ণিমা-চাঁদ মুখকান্তিতে ফোটে,
দেহেতে বোলানো মদনের ভালবাসা,
ভ্রূযুগলে তার রামধনু ভেসে ওঠে,
সুধা-নির্ঝর কণ্ঠে পেয়েছে ভাষা।
ইন্দ্রের মান তারো কাছে যেন ম্লান,
বিষ্ণুর মত যেন চির-যৌবন,
মহিমা তাহার যেন মহা-মহীয়ান্—
যুগযুগান্ত ধ্যানসাধনার ধন।*

* * * *

নিভৃত বিজনে একাকী সজল চোখে
আঁধার রাত্রে অভিসারে বিরহিণী
চলিয়াছে পথে চাহিয়া ঊর্ধ্বলোকে—
বিরহবিধুরা উন্মনা উদাসিনী।
ললিত আননে বিষাদবেদনটীরে
যেন বহু যুগ স্বপন-তুলিতে আঁকা,
তরুণী গৌরী তন্বীর তনু ঘিরে
অরূপ সুষমা মোহন্ মাধুরী মাখা।
মলিন বসন, স্খলিত উত্তরীয়,
শিথিল কবরী এলায়ে পড়েছে পিছে,
দুটী আঁখিতারা অশ্রুতে রমণীয়—
এত যৌবন হেলায় যাবে কি মিছে!
দীর্ঘশ্বাসে কুচযুগ টলমল—
বায়ুহিল্লোলে যেন দুটী কিশলয়,
দেহবল্লরী কামনাতে ঢলঢল—
এ জীবন তার হবে না কি মধুময়!
শিখী বনপথে নাচিয়া উঠেছে সাথে,
হাতে বীণা তার ঝঙ্কারি উঠিয়াছে,
কণ্ঠে তাহার এমন নিশীথ রাতে
কোকিলের সুর যেন বাসা বাঁধিয়াছে।
মনের ভাষা যে কণ্ঠে গিয়াছে ভরি
অতি সুমধুর সকরুণ সঙ্গীতে,
প্রিয়-আবাহনে কি সাধনা, আহা মরি,
চির-মিলনের প্রার্থিত ভঙ্গীতে।
রাগিনী তাহার আকাশ-বাতাস ঘিরে
অসীম শূন্যে ঊর্ধ্বে বাহিয়া চলে—
এখনি বুঝি-বা মেঘের বক্ষ চিরে
শ্রাবণের ধারা নামিবে ধরণী তলে।

---

* সঙ্গীতশাস্ত্র-সম্মত ধ্যান ও রূপ-পরিকল্পনা অবলম্বনে।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

বিগত একমাসে আন্তর্জাতিক রণনীতিক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ ঘাঁটি দ্বারা সুরক্ষিত ক্ষুদ্র দ্বীপ তটে জার্মানগণ যে নূতন সামরিক নীতি ও পদ্ধতির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা ঈপ্সিত সাফল্য লাভ করিয়াছে। আফ্রিকা ও নিকট-প্রাচ্যে বৃটিশ-বাহিনীর বিজয়লাভও যে তাহার কৃতিত্বের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বশেষ রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর অভিযানে কূটনীতিক মহলে কেহ বিস্মিত কেহ বা বিচলিত হইয়া উদ্‌গ্রীব এবং উৎকণ্ঠিত অবস্থায় যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিতেছেন।

আফ্রিকার যুদ্ধ

মিশর-সিরিয়া সীমান্তে সোল্লাম, কোর্ট কাপুজো এবং হালফায়া এই তিনটি স্থানে প্রধানত ত্রিভুজাকারে যুদ্ধ চলে। হাল্‌ফায়ার গিরিপথ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণ শত্রুপক্ষকে বাধা দানের জন্য প্রবল যুদ্ধ চালায়। কাপুজো ও হালফায়া হইতে বৃটিশ-বাহিনী সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইলেও সোল্লামে মিত্রশক্তি যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। কাপুজোর চারিধারে ও যুদ্ধ চলিয়াছে প্রবলভাবে।

গত মাসের ন্যায় বর্ত্তমানেও আবিসিনিয়া অঞ্চলে ইটালীর ক্রম-পরাজয়ের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দক্ষিণ-আবিসিনিয়ার হ্রদ অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সমরসম্ভারসমেত প্রায় ছয় হাজার শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে। জেনারেল প্রালরমো আবিসিনিয়ার সদ্দু এলাকায় দুই হাজার ইটালীয় সৈন্য সহ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। গত ২২এ জুন বৃটিশ-বাহিনী কর্ত্তৃক জিমা শহর অধিকৃত হওয়ায় আবিসিনিয়ার সাম্রাজ্যবাহিনী ইটালীর শক্তিকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত ও নিরাশ করিয়াছে বলা চলে। জিমা দখলের সময় বন্দী সৈন্যদের মধ্যে জেনারেল টি-সি-ও ধরা পড়িয়াছেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকার সহিত এই অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা ইটালীয় বাহিনীর পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নাই বলিয়াই তাহার বিজয়-লাভ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তবে উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাহিনীর শক্তি বর্ত্তমানে আরও সুদৃঢ় করা বিশেষ প্রয়োজন। উত্তর-আফ্রিকার জার্মান-বাহিনীকে সম্প্রতি আমরা নিশ্চেষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু ভূমধ্যসাগর হইতে জলপথে এবং বিমানযোগে স্থলসৈন্যের সহায়তায় একযোগে উত্তর-আফ্রিকার এই জার্মান-বাহিনীর আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজ অভিমুখে অভিযান অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব নাও হইতে পারে।



ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তিস্বাক্ষরে রত মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল ও মার্কিণ দূত মিঃ উইকেট

ভূমধ্যসাগর ও উপকূল

গত ২০এ মে জার্মান প্যারাসুট-বাহিনী ক্রীট আক্রমণ করে। ১২দিন ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বৃটিশ-বাহিনী ক্রীট পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হয়। জার্মানীর পক্ষে এই ক্রীট জয়ের গুরুত্ব যে অত্যন্ত অধিক ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ক্রীটে শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতে পারিলে জার্মানী তথা হইতে আলেকজান্দ্রিয়া, সাইপ্রাস, সুয়েজ প্রভৃতি বিভিন্ন বৃটিশ-ঘাঁটিতে সহজেই বিমান আক্রমণ চালাইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌশক্তিকে বাধা প্রদানও তাহার পক্ষে যথেষ্ট সহজসাধ্য হইবে। সিরিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়োজন ঘটিলে এই ক্রীট দ্বীপ সেইদিক হইতেও সাহায্য করিবে যথেষ্ট। ক্রীটের গুরুত্ব মিঃ চার্চ্চিলও উপেক্ষা করেন নাই। প্রধান মন্ত্রীর মতে—It is a desperate grim battle, এই যুদ্ধ ভয়াবহ ও ঘোরতম। ভূমধ্যসাগরের সমগ্র রণনীতির গতি নির্ভর করিতেছে এই

যুদ্ধের উপর। কিন্তু তবুও সাত মাস ধরিয়া বৃটিশ-বাহিনী যে দ্বীপকে সুরক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে, মাত্র ১২ দিনের যুদ্ধেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল! কারণস্বরূপ সৈন্য ও অস্ত্রবলের অভাবের দোহাই দেওয়া হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে; কিন্তু নিজে পরাজিত হইয়া শত্রুপক্ষের সৈন্য ও অস্ত্রবলের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারিলেই যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জন করা যায় না। শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে মানিয়া লইলেও তাহারা যে তদপেক্ষাও প্রচুর সুবিধা লাভ করিয়াছে ইহা অস্বীকার করা চলে না। স্থিরমস্তিষ্ক "টাইম্‌স্" পর্য্যন্ত এই পরাজয়ে বিচলিত হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন--He (Hitler) can afford conside.able losses and Crete is a prize worth sacrifices; হিটলার যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিলেও ক্রীটের জন্য ত্যাগ স্বীকার সার্থক। ক্রীট লাভের ফলে শুধু যে আলেকজান্দ্রিয়ার নৌশক্তি বিপন্ন হইবে তাহা



যুগোস্লাভিয়ার ১৭ বৎসর বয়স্ক রাজা দ্বিতীয় পিটর ও রিজেণ্ট প্রিন্স পল

নহে, গুরুত্বপূর্ণ নৌবহরের গতিবিধিও ভূমধ্যসাগরে ব্যাহত হইবে এবং য়্যাড্‌মিরাল কানিংহামকেও প্রতিপদে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য স্থান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যায় বিশদ আলোচনা হওয়ায় এবং বর্ত্তমানে সেই সকল অবস্থার আর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন না ঘটায় এখানে আর তাহার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধে করা হইল না।

নাৎসি নৌশক্তি

জার্মানী ভূমধ্যসাগরে সিসিলি, ক্রীট প্রভৃতি দ্বীপে প্রাধান্য স্থাপন করিলেও জার্মানীর নৌশক্তি সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। ফ্রান্সের নৌবহর হস্তগত করা যে জার্মানীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন একথা আমরা পূর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি। বৃটেনকে চরম আঘাত হানিতে হইলে যে জার্মানীর পক্ষে বৃটেনের অজেয় নৌবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে ইটালী ও ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌবহরের সহিত জার্মান নৌশক্তি মিলিত হইলে উহা বৃটেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে এই অভিমত শুধু আমরা নয়, আরও অনেকেই জানাইয়াছেন। কিন্তু জার্মানী কি প্রকৃতই নৌশক্তিতে এতই হীন? বৃটেনের নৌশক্তির সহিত তুলনায় তাহার শক্তি যথেষ্ট অল্প হইলেও উহা কি এতই কম যে বৃটেনের সহিত একক জার্মান নৌবাহিনীর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে করিতে হইবে? বিমান, সামরিক সম্ভার, যান্ত্রিকবাহিনী প্রভৃতির দ্বারা নাৎসী জার্মান আজ সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর যুযুধান শক্তিতে উন্নীত হইল—অথচ নৌশক্তির দিকে সে আদৌ লক্ষ্য রাখিল না ইহা যেন একপ্রকার অবিশ্বাস্য বলিয়াই বোধ হয় নাকি? বিশেষ জার্মান পুঙ্খানুপুঙ্খতা (thoroughness) যখন সকল বিষয়েই লক্ষ্য করা যাইতেছে এবং বৃটেনকে সে যখন আঘাত হানিতে ইচ্ছুক তখন অজেয় বৃটিশ নৌবাহিনীর সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য জার্মানী একেবারেই অবহেলা করিয়াছে ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

গত ১৯৩৮ সালে সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ৩০,৩৩,৫৯১ টন জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র গ্রেটবৃটেনেই নির্ম্মিত হইয়াছিল ১০,৩০,৩৭৫ টন। সমস্ত টনেজের ইহা যে এক বৃহত্তর অংশ ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। কিন্তু ঐ বৎসরেই ফ্রান্সকে বাদ দিলেও জার্মানী ও বর্ত্তমানে জার্মান-অধিকৃত ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে নিম্নলিখিত পরিমাণে জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল:

দেশ	টনের পরিমাণ
জার্মানী	৪,৮০,৭৯৫
হল্যাণ্ড	২,৩৯,৮৪৫
ডেনমার্ক	১,৫৮,৪৩০
নরওয়ে	৫৪,৬৫৪
বেলজিয়াম	৩০,১৯৭
ডান্‌জিগ্‌	২৫,০৮০
মোট	৯,৮৯,০০৩

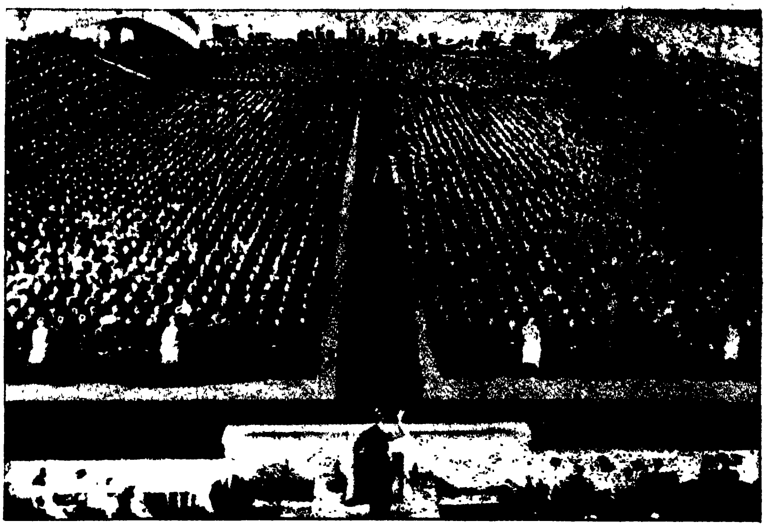
ঐ বৎসরেই ইটালীতে জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল মোট ৯৩,৫০৩ টন। বর্ত্তমানে শত্রু ও শত্রু-অধিকৃত দেশের মোট উৎপন্ন টনেজ ঐ বৎসর হইয়াছিল ১০,৮২,৫০৬, অর্থাৎ গ্রেট বৃটেনে উৎপন্ন জাহাজের পরিমাণ অপেক্ষা ৫২,১৩১ টন অধিক। বর্ত্তমানে ঐ সকল দেশ জার্মানীর অধিকৃত হওয়ায় নাৎসী নিয়ন্ত্রণাধীনে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে। একমাত্র জার্মানীতেই ৫৭টি জাহাজ নির্ম্মাণের ঘাঁটি আছে এবং বৎসরে প্রায় ১০ লাখ টন জাহাজ সেখানে নির্ম্মিত হইতে পারে। বিভিন্ন দলে বিভক্ত ৮০০০ লোক দ্বারা একসঙ্গে ১০,০০০ টনের ৮খানা জাহাজ প্রস্তুত করা সম্ভব। নাৎসি-অধিকৃত দেশগুলিতেও নিশ্চয়ই এই প্রণালী অবলম্বিত হইবে।

একমাত্র হল্যাণ্ডেই জার্মানীর লাভ হইয়াছে যথেষ্ট। হল্যাণ্ডের জাহাজ নির্ম্মাণের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে অন্তত ১২টি ঘাঁটির শ্রমিকেরা যুদ্ধজাহাজ

প্রস্তুত করিবার অভিজ্ঞতা পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছে, এতদ্ব্যতীত অপর পাঁচটি ঘাঁটিতে সাবমেরিণ নির্ম্মিত হয়। জাহাজ নির্ম্মাণ ঘাঁটির মোট সংখ্যা হলাণ্ডে প্রায় ৪০টি। ইহাদের মধ্যে অবশ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র হইলেও সকল ঘাঁটির সম্মিলনে যে কোন মুহূর্ত্তে একমাত্র হল্যাণ্ডেই ১৪০টি ইউ-বোট প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ছাড়াও নরওয়েতে ২০টি বন্দরে জাহাজ প্রস্তুত হয়, বেলজিয়ামে হয় ৯৮টি বন্দরে এবং অন্যান্য শত্রু-অধিকৃত দেশেও কিছু কিছু জাহাজ নির্ম্মাণের ঘাঁটি আছে। ইংরেজ লেখক নোয়েল বারবার-প্রদত্ত নাৎসি নৌশক্তি সম্বন্ধে এই সংবাদ আদৌ উপেক্ষার নয়। সুতরাং ইটালী, জার্মানী ও জার্মান-অধিকৃত দেশের সম্মিলিত নৌবাহিনী বৃটিশ ও আমেরিকার নৌবাহিনীর সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক হইবে, সরাসরি ইহা ধারণা করিয়া লওয়া অযৌক্তিক।

নিকট-প্রাচী

বৃটিশ-বাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করিবার পর গত ৪ঠা জুন তাহারা মসুল অধিকার করে। তাহার পর দেরেজোর বিমান ঘাঁটি বৃটিশ-বাহিনীর হস্তগত হয়। ভিসি সরকার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে দুইবার সিরিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ প্রেরণ করেন তাহার উত্তরে বৃটিশ সরকার জানাইয়াছেন যে, সিরিয়া দখলের ইচ্ছা তাহাদের নাই। সম্প্রতি দামাস্কাসেও সাম্রাজ্য-বাহিনী প্রবেশ করিয়াছে। মিত্র-বাহিনী দামাস্কাস অবরোধ করার পর অপ্রয়োজনীয় রক্তপাতে অনিচ্ছুক হওয়ায় প্রথমে তাঁহারা শত্রু-পক্ষীয়দের সহিত আলোচনা চালাইয়াছিলেন; কিন্তু ভিসি সরকারের বাহিনী কর্ত্তৃক প্রবল বাধা প্রদান আরম্ভ হওয়ায় বৃটিশ ও স্বাধীন ফরাসী-বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয় এবং ইহারই ফলে বৃটিশ-বাহিনীর হস্তে দামাস্কাসের পতন হইয়াছে। ফরাসী সাম্রাজ্যের কোন বিরোধে জার্মান সরকার হস্তক্ষেপ করিবেন না, ফরাসী সরকারের সহিত জার্মানীর এইরূপ চুক্তি থাকায় সিরিয়ার এই যুদ্ধে জার্মানবাহিনী হস্তক্ষেপ করে নাই। সিরিয়ার উপকূলবর্ত্তী সিডন শহর এবং কিমুই ও নাটভা বৃটিশ-বাহিনী অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাহিনী প্যালেষ্টাইন অভিমুখে অভিযান চালাইয়াছে এবং বেইরুৎ অভিমুখে আক্রমণরত মিত্রবাহিনীকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ভিসি গোলন্দাজ বাহিনী গোলা বর্ষণে রত।



বার্লিনস্থ স্পোর্টস্ প্রাসাদে ন্যাশানাল সোসালিষ্ট দলের বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা-রত হিটলার

চক্রশক্তি ও আমেরিকা

গত ২১এ মে সকাল ৬টায় জার্মান সাবমেরিণের আক্রমণে মার্কিন জাহাজ "রবিনমুর" নিমজ্জিত হইয়াছে। ৩৫জন আরোহীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই ঘটনার পর হইতেই জার্মানী ও আমেরিকার সম্পর্ক ক্রমশঃই জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, আমেরিকা এখনও অনাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও আমেরিকাকে যুযুধান শক্তি বলিলে উহা মোটেই অসঙ্গত হইবে না। গত ১৪ই জুন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রে জার্মানী ও ইটালীর ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। নিউ ইয়র্ক বন্দরে মাইন স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ এক ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার একদিন পরেই মার্কিণ সরকার মার্কিণে জার্মান বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করিবার আদেশ জারি করিয়াছেন। তিন লক্ষাধিক প্রবাসী জার্মানের আমেরিকা ত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে জার্মানী এবং জার্মান-অধিকৃত দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বাণিজ্য দূতাবাস ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে বন্ধ করিবার জন্য জার্মানী আদেশ জারী করিয়াছে। ইটালীতেও অনুরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জার্মানী এবং ইটালীতে কত মার্কিন টাকা খাটিতেছে তাহার হিসাব গ্রহণ করা হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম সাবমেরিনের অন্যতম ০-৯ সাবমেরিন জলমগ্ন হইয়াছে। গত মে মাসে যত জাহাজ ডুবি হইয়াছে উহার পরিমাণ মার্চ অথবা এপ্রিল মাসের পরিমাণের তুলনায় অনেক কম। গত মে মাসে মোট ৪,৬১,৩২৮ টনের ৯৮খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরের জাহাজ ডুবিয়াছে ৭৩খানি, (৩,৫৫,০০০ টন মোটামুটি), মিত্রশক্তির জাহাজের সংখ্যা ২০, (৯২,০০০ টন) এবং ৫খানি নিরপেক্ষ শক্তির

জাহাজ (১৪,০০০ টন)। শত্রু পক্ষের জাহাজ ডুবি, বন্দী ও ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২,৯৯,০০০ টন বলিয়া মনে হয়।

গত ২৭এ মে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার স্মরণীয় বক্তৃতায় জানাইয়াছিলেন যে, বৃটেন যত জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারে তদপেক্ষা তিন গুণ জাহাজ নাৎসিরা ডুবাইতেছে—the present rate of Nazi sinking of merchant ships is more than three times as high as the capacity of British shipyards to replace them. সম্প্রতি আবার আমেরিকার কারখানায় শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। বন্ এলুমিনিয়ম ও ব্রাশ কর্পোরেসনের ছয়টি কারখানায় মোটরযান শ্রমিক সঙ্ঘের প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। ফলে আড়াই কোটি ডলারের সরকারী অডার সরবরাহে বাধা পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। নর্থ আমেরিকান বিমান কারখানাতেও শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে। মার্কিন সরকার অবশ্য শীঘ্রই এই ধর্ম্মঘটীদের দমন করেন এবং কারখানাগুলি সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। এই ধর্ম্মঘটের ফলে আমেরিকা হইতে বৃটেনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের মাল প্রেরণে কোন বাধা ঘটিবে না বলিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জানাইয়া দিয়াছেন।



জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ রাজা ইরাকের দ্বিতীয় ফৈজল ও রিজেণ্ট আমির আবদুল ইলাহ

তুর্ক-জার্মান চুক্তি

গত ১৮ই জুন বুধবার রাত্রি ৮টার সময় আঙ্কারায় তুরস্ক ও জার্মানীর মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। জার্মান রাজদূত ফন্ প্যাপেন ও তুরস্কের পররাষ্ট্র সচিব মঃ সারাজগ্লু ঐ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বর্ত্তমানে ইহা অনাক্রমণ চুক্তি হইলেও বার্লিন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ নৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে বলিয়া বার্লিনের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন। এই চুক্তির বিভিন্ন ধারার তাৎপর্য্য :—(১) সংশ্লিষ্ট কোন রাষ্ট্র অপর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন কার্য্যে লিপ্ত হইবে না, (২) উভয়ে পারস্পরিক অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া চলিবে এবং (৩) ভবিষ্যতে এই সমস্ত প্রশ্নে উভয় রাষ্ট্রই বন্ধুত্বে পূর্ণ সহযোগিতা রক্ষা করিবে।

তুর্ক জার্মান চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সংবাদ যেদিন আসে সেইদিনই আমরা বুঝিতে পারি শীঘ্রই মহাযুদ্ধের এক নূতন অঙ্ক সূচিত হইবে। অজগর সর্প যেমন স্বীয় ভক্ষ্য বস্তু গলাধঃকরণের পর তাহাকে হজম করিবার নিমিত্ত কিয়ৎকাল নিশ্চল অবস্থায় অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকে, জার্মানীও সেইরূপ প্রতিটি দেশ জয় করিবার পর কিছুদিন চুপ করিয়া থাকে। নূতন কোন রাষ্ট্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সে এই সময়ে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনীতির খেলা আরম্ভ করে। তুরস্ককে জার্মানী বহুদিন হইতে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং বৃটিশের মিত্র হিসাবে থাকিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তুরস্ক যে ক্রমশ নাৎসি প্রভাবাধীনে চলিয়াছে 'ভারতবর্ষ" এর গত সংখ্যাতেই আমরা তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। বহুদিন হইতেই আমরা তুরস্ককে বলিতে শুনিতেছি যে আক্রান্ত হইলে সে যুদ্ধ করিবে। কিন্তু তুরস্ক যখন নাগপাশের মত নাৎসি বেষ্টনে ক্রমশ বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতেছে তখনও সে ঘোষণা করিয়াছে—'আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ করিব।" বুলগেরিয়া জার্মানী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার উপক্রম হইলে তাহার বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ রাজনীতিক মৃত্যুতুল্য বলিয়া তুরস্ক তাহাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন কি, বুলগেরিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তুরস্ক তাহাকে সাহায্য প্রদান করিবে বলিয়া জানাইতেও ত্রুটি করে নাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে নিষ্ক্রিয় রহিয়া গেল। যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস জার্মানী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তুরস্ক যখন গ্রীসের প্রতি স্বীয় প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া নীরব হইয়া রহিল, তখন ইহা পরিস্ফুট হইতে বিলম্ব হয় নাই যে, বল্কান রাষ্ট্রগুলিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে একত্রিত করিবার চেষ্টায় বৃটেন বিফল হইয়াছে। বর্ত্তমানেও তুরস্ক বৃটেনের সহিত স্বীয় চুক্তি চলিবে বলিয়া জানা গেলেও তুর্ক-বৃটিশ চুক্তি বিশ্লেষণ করিয়া ইহার অযৌক্তিকতা না দেখাইয়াও প্রশ্ন করা চলে,—তুরস্কের পক্ষে দুই শত্রুর সহিত একই ধরণের চুক্তি একই সঙ্গে কিরূপে মানিয়া চলা সম্ভব ?

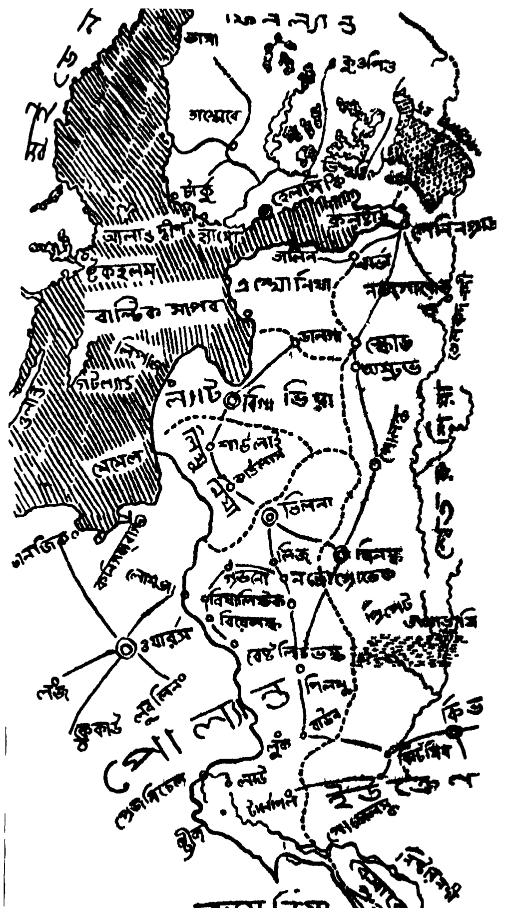
বল্কান অভিযানের পর আমরা বলিয়াছিলাম যে, নিকট-প্রাচীতে আসিতে হইলে জার্মানীর পক্ষে দুইটি পথ আছে—প্রথম তুরস্কের মধ্য দিয়া এবং দ্বিতীয় পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর পথে। তুরস্কের সহিত জার্মানীর আলোচনা তখন ইঙ্গিত সাফল্য লাভ না করায় আমাদের ধারণাতে দ্বিতীয় পথের আশ্রয়ই জার্মানীকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ক্রীট বিজয়ের পর এবং সিরিয়ায় প্রবেশ লাভ করার পরেও যখন জার্মানী মিশর বা ইরাকের

না করিয়া বরং "সুশীল সুবোধ বালকের মত" ঘরে ফিরিয়া গেল তখন তাহার তুরস্কের সহিত চুক্তি করিবার কি অর্থ হয়? এক—নিকট প্রাচীতে আসিতে হইলে তুরস্কের সাহায্য তাহার প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় হইতেছে—যদি রুশিয়ার সহিত কোন সামরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে প্রয়োজন তুরস্কের। কারণ তুরস্ককে স্বীয় প্রভাবাধীনে আনিতে পারিলে রুশিয়াকে বিশেষভাবে পরিবেষ্টন করা চলে এবং কৃষ্ণসাগরে রুশ নৌ বাহিনীর তৎপরতায় বিশেষ বাধা প্রদান করাও সম্ভব হয়।

জার্মানীব রুশিযা-অভিযান

গত ২১এ জুন শনিবার রাত্রি ৪ ৩০ মিনিটে জার্মানী রুশিযার বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করিয়াছে সংবাদ পাইবামাত্র অনেকেই চমকাইযা উঠিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে জার্মান ও রুশিযার মধ্য চুক্তি যেমন বিস্ময়কর বর্ত্তমানে রুশিয়া আক্রমণও তাহাদের নিকট সেইরূপ অপ্রত্যাশিত। বস্তুত জনসাধারণকে ইহার জন্য দোষ দেওয়া চলে না। রুশ জার্মান মিতালীর পর হইতেই আমরা রযটাব মারফৎ বার বার শুনিয়া আসিতেছি যে রুশিযা ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ লাগিল বলিয়া। পোলাণ্ডের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইউক্রেন লইযা উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার গল্প আমাদের পরিবেশন করা হইযাছে। ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের পরও বাল্টিকের কর্ত্তৃত্ব লইয়া মনকষাকষির সংবাদ আমরা পাইযাছি। নরওযে বেলজিযম ফ্রান্স রুমানিযা যুগোশ্লাভিযা গ্রীস—প্রত্যেকটি যুদ্ধের পরই রুশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে মনান্তর ও অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের সংবাদ রযটার আমাদের দিতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। বাস্তবে যখন সত্য সত্যই যুদ্ধের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল তখন জনসাধারণের অবস্থা হইল সেই কথামালার রাখালের গল্পের মত। অনেকেই অকপটচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে ব্যাপারটি সত্যই অপ্রত্যাশিত এবং শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের সংবাদকে তাঁহারা উপযুক্ত মূল্য প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যুদ্ধ সত্যই বাধিয়াছে এবং ইহাকে অপ্রত্যাশিতও বলা চলে না। জার্মান ও রুশিয়ার মধ্যে যে চুক্তি হয় সেই বিষয়ে আমরা বলিয়াছিলাম যে এই চুক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া অসম্ভব। উভয়ের এই চুক্তি ক্ষণস্থায়ী শান্তির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হয় নাই। হইয়াছে আত্মরক্ষার তাগিদে। আর আজ যে হিটলার দেড় হাজার মাইল ব্যাপী সৈন্যসমাবেশ করিয়া রুশিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন ইহাও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, আর কোন উপায় তাঁহার ছিল না বলিয়াই। হিটলার অভিযোগ করিয়াছেন যে, রুশিয়া সন্ধির সকল সর্ত্ত মানিয়া চলে নাই, গোপনে জার্মান আক্রমণের জন্য বৃটিশের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল। এদিকে মিঃ এন্থনি ইডেন জানাইয়াছেন যে, রুশিয়ার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদানের পরেও জার্মানীর সহিত চুক্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ষ্ট্যালিন বৃটিশের সহিত কোন কথাবার্ত্তা চালাইতে সম্মত হন নাই। তুর্ক-জার্মান চুক্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, রুশিয়া [illegible] সেই সময়ে [illegible] সংবাদে [illegible]

হইয়াছিল এবং সর্ত্ত ছিল—(১) বিনা ক্ষতিপূরণে ইরাকের সমস্ত পেট্রোল জার্মানীকে প্রদান করিতে হইবে, (২) রেলপথের দুই পার্শ্বে বিশ কিলোমিটার স্থান জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং (৩) ইরাকের সেনা নিয়ন্ত্রণ ও বিমান ঘাঁটির ভার জার্মান হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে। রয়টার ইহাও জানাইয়াছেন যে, রসীদ আলি এই সর্ত্তে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে জার্মানী রসীদ আলিকে সাহায্য করিবার



রুশিয়ার রণক্ষেত্র

পরিবর্ত্তে সহসা একেবারেই নীরব হইয়া গেল কেন? বল্কান অঞ্চলে জার্মানীর [illegible] বিস্তারের সময় অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, রুশিয়া বোধ হয় জার্মানীকে বাধা দিবে, কারণ দার্দানেলিস্ প্রণালী জার্মান [illegible] ছাড়িয়া দিতে রাজি হইবে না। কিন্তু যখন রুশিয়ার দিক [illegible] যে, বোধ

হয় পারস্য উপসাগরে রুশিয়াকে কোন সুবিধা দিবার সর্ত্তে জার্মানী ষ্ট্যালিনকে রাজি করাইতে পারিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইরাকে জার্মানী যখন সুবিধা লাভ করা সত্বেও হঠাৎ নীরব হইয়া গেল, তখন রুশিয়া হইতে কোন আপত্তি উত্থাপন করা একেবারে অসঙ্গত কি? আমরা ভারতবর্ষ-এ গত সংখ্যাতেই বলিয়াছি যে, নাৎসি-সমুদ্রে পরিবেষ্টিত হইয়া রুশিয়া তরণী ভাসাইয়া দিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

দেড় হাজার মাইল রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে রুশিয়া প্রবলভাবে বাধা প্রদান করিতেছে এ সংবাদ আমরা পাইয়াছি। এই সংবাদে ইহা বেশ সুপরিস্ফুট হয় যে, জার্মানী তাহাকে আক্রমণ করিলেও রুশিয়া এ বিষয়ে একেবারে অন্ধকারে ছিল না। যে-কোন মুহূর্ত্তে শত্রুর আক্রমণে বাধা দিবার জন্য রুশিয়াকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। জার্মানী যে এতদিন পরে উপযুক্ত প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু এই প্রবল প্রতিপক্ষকে তাহার পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায়ও ছিল না। বৃটেনের উপর চরম আঘাত হানিবার পূর্ব্বে জার্মাণ নিজের পূর্ব্বদিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চায়। বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিবও গত ২৪শে জুন জানাইয়াছেন যে, রুশিয়া আক্রমণ হিটলারের চরম উদ্দেশ্য নয়, উহা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা মাত্র।

যুদ্ধ ঘোষণার প্রাক্কালে বার্লিনস্থ রুশদূতের নিকট ভন্ রিবেন্‌ট্রপ যে নোট প্রদান করিয়াছেন উহাতে বলা হইয়াছে যে, বলশেভিজম্ ও মানব-সভ্যতার মধ্যে আপোষ অসম্ভব। হিটলার আশা করিয়াছিলেন যে, সমাজতন্ত্রকে পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত করার উদ্দেশে এই অভিযান করিতেছেন বলিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে তিনি নিরপেক্ষ রাখিতে সক্ষম হইবেন; হয় তো তাহাদের সহানুভূতি পর্য্যন্ত লাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হয় নাই। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, রুশিয়াকে তাহারা সাহায্য করিবেন এবং জার্মানীর উপর তাহাদের আক্রমণও পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে। রুশিয়ায় একটি সামরিক ও একটি অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইবার উদ্যোগ চলিতেছে, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সও মস্কোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। রুশিয়া অবশ্য কোন সাহায্যের জন্য এখনও আবেদন জানায় নাই, বৃটিশ মন্ত্রীরাও যে সমাজ-তন্ত্রবাদের ঘোর বিরোধী একথাও তাঁহারা গোপন করেন নাই; কিন্তু তবুও বৃটিশ আজ স্বেচ্ছায় রুশিয়ায় সাহায্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে এবং সোভিয়েট সরকারও বৃটিশ সাহায্য এবং পরামর্শ গ্রহণে অসম্মত হন নাই। উভয়ের মধ্যে এই যে সহযোগিতা ইহাও প্রয়োজনের তাগিদে। পুঁজিবাদ যাহাদের উদ্দেশ্য; নাৎসিবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ উভয়ই তাহাদের শত্রু। কোনটিকেই বরদাস্ত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তবুও আজ একের বিরুদ্ধে অপরকে সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করিতে হইতেছে। ১৯৩৯ সালেও রুশিয়ার সহিত বৃটিশ সরকারের ছয়মাস ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল, কিন্তু কোন সুব্যবস্থা হইল না, শুধু আন্তরিকতার অভাবে। সেদিন যদি চেম্বারলেন এই মারাত্মক ভুল না করিতেন তাহা হইলে ইয়োরোপে আজ নাৎসিশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। এই সুযোগ হাতের বাহিরে যাইতে না দিয়া হিটলার রুশিয়ার সহিত সন্ধি করিয়া বসিলেন। আজ সমগ্র ইয়োরোপ হইতে অপসৃত এবং মধ্যপ্রাচীর রাজ্য পর্য্যন্ত হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ সরকার জার্মানীকে যে-কোন উপায়ে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রুশিয়ার দিকে স্বেচ্ছায় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। সাময়িক সুরাহা হয় তো ইহাতে হইতে পারে, কিন্তু আদর্শের দ্বন্দ্বের কোন সমাধান ইহা দ্বারা অসম্ভব।

ধনতান্ত্রিক আমেরিকাও হিটলারের বিরুদ্ধে রুশিয়াকে সাহায্য করিবে। যুক্তরাষ্ট্রে রুশিয়ার সঞ্চিত অর্থের উপর যে সকল নিয়ন্ত্রণ ছিল ট্রেজারী তাহা তুলিয়া লইয়াছেন। উক্ত অর্থের পরিমাণ ১০ কোটী ডলার বলিয়া অনুমিত হয়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একটি সাংবাদিক সম্মিলনে বলিয়াছেন যে, রুশিয়ার কি কি বস্তুর প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কোন তালিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এখনও দাখিল করা হয় নাই। ইজারা ও ঋণদান বিল অনুযায়ী রুশিয়া সাহায্য পাইতে পারিবে কি-না প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেকথা বলিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র রুশিয়াকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিবে। মার্কিণ জাহাজগুলিকে ভ্লাডিভষ্টক বন্দরে অস্ত্রাদি লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করা হইবে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। আমেরিকা রুশ-জার্মান যুদ্ধে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রুশিয়াকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা কতদূর কার্য্যকরী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমেরিকার বিশিষ্ট বণিকগণের পক্ষে প্রেসিডেণ্টের এই নীতি সমর্থনযোগ্য হইবে না বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি, যদি রয়টার মারফৎ অদূর ভবিষ্যতে এরূপ সংবাদ পরিবেশন করা হয় যে, আমেরিকা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া রুশিয়াকে সাহায্য না করিবার জন্য বৃটেনকে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাতেও বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তবে আমেরিকার এই সম্ভাবিত প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করিবার পূর্ব্বে বৃটিশ মন্ত্রী-পরিষদের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; কারণ নাৎসি-বিদ্বেষী মিঃ চার্চিল যে জার্মানীর সুবিধাজনক কোন কার্য্য সজ্ঞানে করিবেন না ইহা নিঃসন্দেহ।

গত ২২ হইতে ২৫শে জুন পর্য্যন্ত চার দিনের যুদ্ধে জার্মানীর ৩৮১খানি বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে, রুশিয়ার ধ্বংস হইয়াছে ৩৭৪। প্রায় ৩০০টি ট্যাঙ্ক জার্মানীর নষ্ট বা বন্দী হইয়াছে। ১৮০টি রুশিয়ান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া জার্মানরা দাবী করিতেছে। ব্রেষ্ট-লিটোভাস্ক, লোমজা এবং কোভনা জার্মানীর দখলে। আজ সংবাদ আসিয়াছে যে জার্মান সৈন্য ভিল্‌না প্রবেশ করিয়াছে। বল্‌কানস্থিত জার্মান সৈন্যগণ মোল্‌ডাভিয়া এবং বুকাভিনায় সারনাউটির পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। একদল রুমানিয়ান সৈন্য প্রথ নদী অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া সংবাদ দিলেও লাল ফৌজের ইস্তাহারে এই সংবাদ স্বীকৃত হয় নাই। জার্মান সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া প্যারাসুট সাহায্যে অবতরণ

করিতেছে। অপর পক্ষে সোভিয়েট বিমানের বোমা বর্ষণে কনষ্ট্যাঞ্জা বন্দরে আগুন জ্বলিতেছে। হেলসিঙ্কি, সুলিনা, ওয়ার-শ, লুবলিন ও কলিগসবুর্গে সোভিয়েট বিমান বর্ষণ করিয়াছে। রুমানিয়া-বাহিনীর একাংশ বেসারাভিয়ার মধ্যে ৫০ মাইল প্রবেশ করিয়াছে।

কিন্তু এই চারদিনের যুদ্ধের অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধের শেষ ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। জার্মান-বাহিনী এখনও প্রকৃতপক্ষে রুশিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। রুশিয়ার পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিম দিকে নিজের যে সীমান্ত বিস্তৃত করিতেছিল যুদ্ধ চলিয়াছে সেইখানেই। উভয়পক্ষের শক্তি সম্বন্ধেও কিছু নিঃসংশয়ে বলা চলে না। রুশিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ স্যার বার্ণার্ড প্যারেন্ বলেন যে, রুশিয়ার প্রকৃত শক্তি অনেক কম করিয়া জার্মানী গত যুদ্ধে প্রচার করিয়াছে, এবারেও করিতেছে। যতদূর অনুমান করা যায়, রুশিয়ার সৈন্য আছে—১,১০,০০,০০০, ট্যাঙ্ক ১৪,০০০, বিমান ৯,০০০, রণপোত ১৭৩ এবং সাবমেরিণ ১৬৪। অপর পক্ষে জার্মান সৈন্য হইতেছে—৬০,০০,০০০, ট্যাঙ্ক ১৪,০০০, বিমান ১০,০০০, রণপোত ১২৫, এবং সাবমেরিন ৬৯। রুশিয়া সৈন্য, সমরসম্ভার, কাঁচা মাল, কোন দিক দিয়াই জার্মান অপেক্ষা হীন নয়। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে রুশসৈন্য ও সেনাধ্যক্ষের তৎপরতা সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই। এতৎসত্ত্বেও জার্মানী যে এইবার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়াছে ইহা যথার্থ, এবং তদুপরি বৃটিশ ও মার্কিণ সাহায্য যদি প্রকৃতই উপযুক্ত পরিমাণে এবং উপযুক্ত সময়ে রুশিয়া লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে জার্মানী এইবার স্বীয় অত্যধিক লোভের উপযুক্ত প্রতিদান লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এদিকে জার্মানী রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করার সঙ্গে সঙ্গেই মুসোলিনী ও রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। স্পেনও জানাইয়াছে—আমরা আছি! সম্প্রতি আঙ্কারাস্থিত রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জার্মানী রুশিয়ায় জারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। হোহেন্জোলার রাজবংশের প্রিন্স ফার্দ্দিনাণ্ডকে জার-হিসাবে জার্মানী সিংহাসনে বসাইতে চায়। অষ্ট্রিয়া গ্রাসের পর হাবসবুর্গ বংশ শাসনতন্ত্র ফিরিয়া পায় নাই। অথচ আজ রুশিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মানী আগ্রহান্বিত! এই আগ্রহ ফার্দ্দিনাণ্ডের প্রতি দরদবশত নহে, সমাজ-তন্ত্রবাদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এবং রুশিয়ায় রাজতন্ত্রবাদীদের উত্তেজিত করিয়া রুশিয়ার অভ্যন্তরে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই জার্মানীর এই ষড়যন্ত্র। তবে রুশিয়ার সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী শুধু ফার্দ্দি-নাণ্ড নহেন। সুতরাং এই গোলমালও অতি সহজে মিটিয়া যাইবার আশা নাই।

জাপান

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে সোভিয়েট ও জাপানের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা চলিতেছিল গত ১১ই জুন উভয় পক্ষের মধ্যে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির পর হইতেই জাপান চীন সম্বন্ধে হঠাৎ অতিরিক্ত অবহিত হইয়া উঠিয়াছে। চেকিয়াং উপকূলের নিকটে এক-শতেরও অধিক জাপ রণতরীর সমাবেশ করা হইয়াছে। চুংকিং-এ ২৭ খানি জাপ বিমানের অত্যধিক বোমা বর্ষণের ফলে বহুস্থান ক্ষতিগ্রস্ত। এময়ের নিকটও নাকি ৫৩খানি জাপ রণতরী দেখা গিয়াছে। বৃটিশ সর-কারও এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সম্প্রতি মার্কিন "ক্যাটেলিয়ান" বিমানপোত গুলি যুক্তরাষ্ট্র হইতে সিঙ্গাপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এদিকে রুশ-জার্মান যুদ্ধের ফলে জাপান হঠাৎ একটু অসুবিধায় পড়িয়া গিয়াছে। এখনও ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জাপান স্থির নিশ্চয় হইতে পারে নাই। জাপান মন্ত্রিসভার ঘন ঘন বৈঠক বসিতেছে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকারও চলিয়াছে, কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে এখনও কিছু সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় নাই। জাপান যদি বর্ত্তমানে আমেরিকা আক্রমণ করে তাহা হইলে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আর নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। জাপানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তৈলবাহী জাহাজ প্রেরণ কালে আটক করার ফলে জাপান আমেরিকা সম্বন্ধে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করায় জাপান এখন অক্ষশক্তির অনুকূলে বিশেষ সাহায্য করিবে না বলিয়াই বোধ হয়। জাপান জানাইয়াছে যে, জার্মানী সমগ্র পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তারে উন্মুখ এবং যদি সে রুশিয়া গ্রাস করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে সে জাপানের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় জার্মানীকে বর্ত্তমানে তাহার সাহায্য প্রদান না করাই সম্ভব। সমগ্র এশিয়ায় স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের যে আকাঙ্ক্ষা জাপানের আছে, বর্ত্তমানে তাহারই প্রতি জাপান মনোনিবেশ করিবে বলিয়া বোধ হয়। ইন্দোচীনের সহিত কিছুদিন হইতে জাপান বোঝাপড়ার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঈপ্সিত সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। হল্যাণ্ড জার্মানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিলেও ডাচ্ ঈষ্ট ইণ্ডিস্ স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে মনস্থ করিয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে জার্মানদের সরাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং এ বিষয়ে জাপানও বিশেষ সাহায্য করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। এমতাবস্থায় জাপান স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে জাপান পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর স্বীয় শক্তি পরীক্ষায় উদ্যত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। যদি সত্যই জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহা হইলে বর্মা ও ভারতবর্ষকেও সেই যুদ্ধের তরঙ্গকে বাধা দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

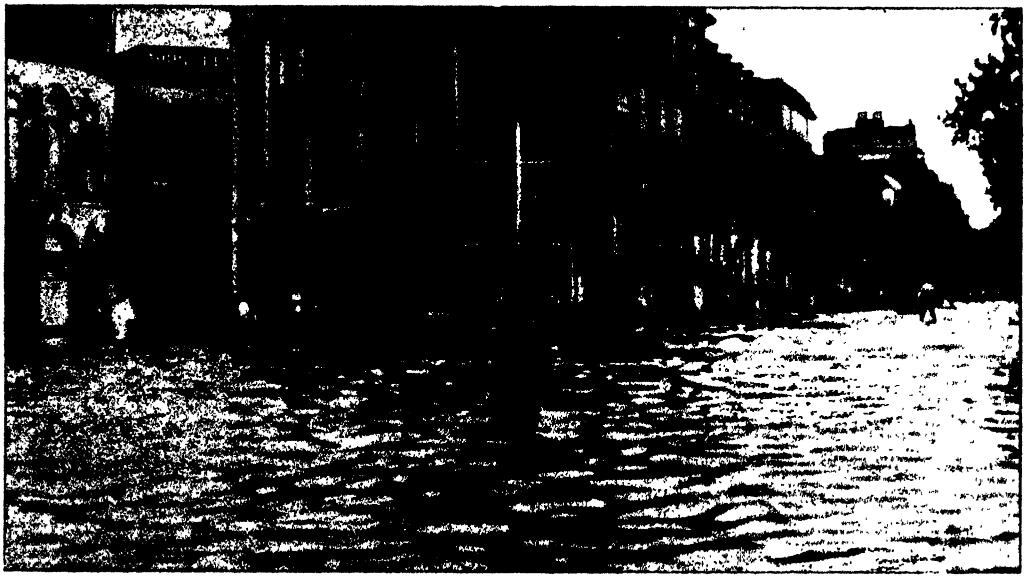
তাং ৩।৭।৪১



সাময়িকী

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ—

প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের একটি বিস্তৃত সমালোচনায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিশদভাবেই দেখাইয়াছেন যে, সিলেক্ট কমিটির হাতে বিলটির কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। হিন্দুসম্প্রদায়ের শিক্ষার দিক হইতে যে সকল অনিষ্টকর সর্ত্ত এই বিলে স্থান পাইয়াছিল তাহা ঠিকই রহিয়া গিয়াছে; শুধু তাহাই নহে, স্থানে স্থানে তাহাদের অনিষ্টকারিতা আরও বাড়িয়াছে। আচার্য্য রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, জনমত সংগ্রহের কোন চেষ্টা না করিয়া অনাবশ্যক তাড়াতাড়ি করিয়া কমিটি গঠন করায় তাহা গণতান্ত্রিক আদর্শে গঠিত হয় নাই। ফলে এমন অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে—অর্থাৎ প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সূচনায় বাঙ্গালার হিন্দু শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গ্রন্থকার, পুস্তক-ব্যবসায়ী—সকলেরই যে ক্ষতি করিতে চাহিয়াছিল, সিলেক্ট কমিটির হাত ঘুরিয়া আসিবার পরেও তাহার সেই উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ আছে। সিলেক্ট কমিটির নিকট ইহার অদল-বদল হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল; তাহা যে একেবারে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, আচার্য্য রায় তাহা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলী এই প্রবীণ মনীষীর সুপরামর্শ মানিয়া লইবেন কি? লইলে তাঁহারাও ধন্য হইতেন, দেশকেও ধন্য করিতে পারিতেন।



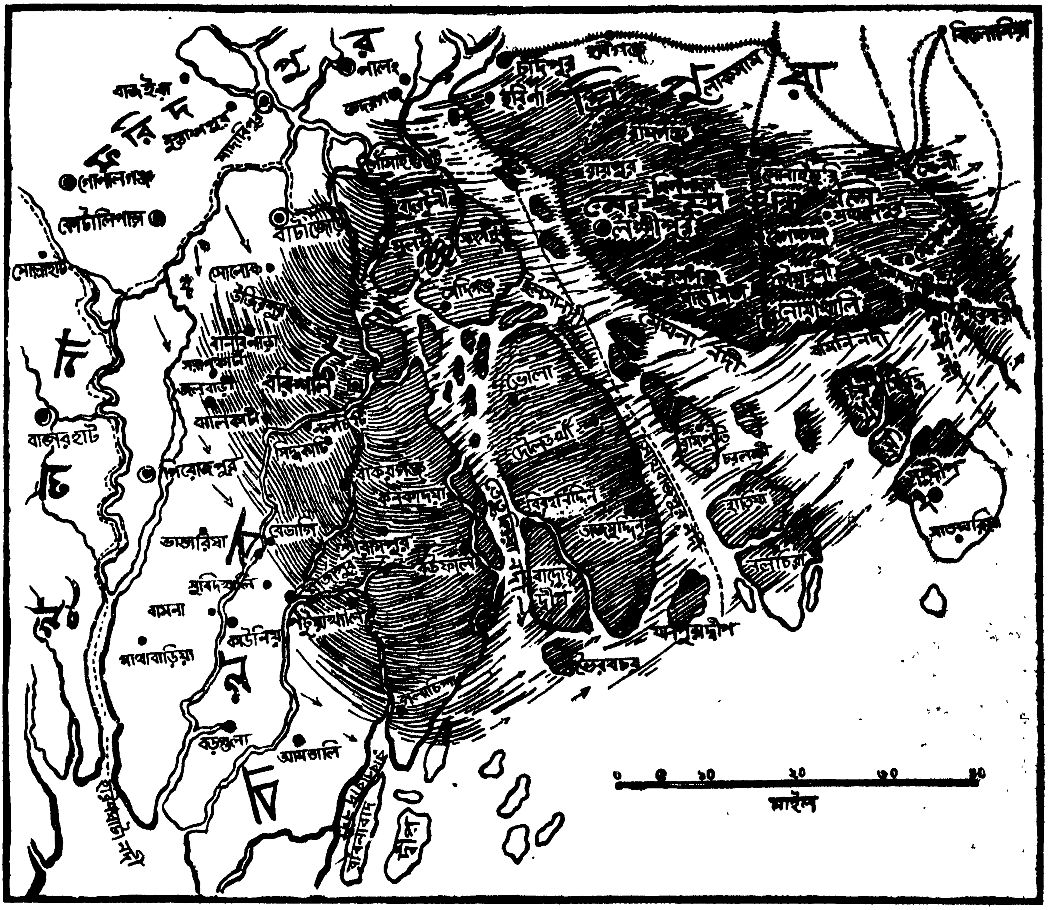
বৃষ্টির পর কলিকাতার একটি প্রশস্ত রাজপথ—ভেনিসের সহিত তুলনার যোগ্য

দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা—

পনর বৎসর পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতি তাঁহার যে বিরাট সমাধিভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে এবার তাঁহার মৃত্যু দিবসে তথায় কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ এ. আর. সিদ্দিকী প্রদত্ত এবং ভাস্কর শ্রীযুক্তক্ষিতীশচন্দ্র রায় নির্ম্মিত

আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা মিঃ সিদ্দিকী মহাশয়ের এই উদারতাকে দেশবন্ধু-

বালাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া বেকসুর মুক্তি দিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। আমরা অতুল্যাবালার এই



বাঙ্গালার ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চল—এই মানচিত্রে বাঙ্গালার বাত্যা ও বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ দেখান হইয়াছে

পরিকল্পিত হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রতীক বলিয়াই গ্রহণ করিব।

নারীর মর্য্যাদাবোধ—

রাজসাহী জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের কুড়ান হালদারের স্ত্রী অতুল্যাবালা দাসীর গৃহে রাত্রিতে প্রবেশ করিয়া হরিচরণ নামক এক ব্যক্তি তাহার মর্য্যাদা নাশে উদ্যত হয়। অতুল্যা-বালা আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হরিচরণকে কুঠারাঘাত করে এবং সেই আঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। বিচারে দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া অতুল্যা-

নির্ভীকতায় তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি। লম্পটদের হাত হইতে আমাদের কুলবালারা এমনিভাবে মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থায় অগ্রণী হইলে বাঙ্গালার চেহারা বদলাইয়া যাইবে। দুর্বৃত্তেরাও সাবধান হইবে, বাঙ্গালার অচেতন পুরুষ সমাজেরও তাহাতে চক্ষু ফুটিবে।

ভিক্ষুক বৈরির অদ্ভুত ফন্দী—

কিছুদিন আগে 'ভারতবর্ষ'এ ভিক্ষুকদের সমস্যা লইয়া একখানি উপন্যাসে লেখক ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার চিত্র আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সব চিত্র যে

স্বকপোলকল্পিত নহে, তাহা সম্প্রতি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার একটি সংবাদে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের মতলবে কেমন করিয়া শিশুদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পঙ্গু ও অন্ধ করিয়া তাহাদের হাত পা বাঁকা করিয়া দেওয়া হয় তাহার বিবরণ এই সংবাদে পাওয়া গিয়াছে। অতিদরিদ্র পিতামাতার অজ্ঞাতসারে বধির শিশুপুত্রকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। বালককে ইচ্ছাপূর্ব্বক পঙ্গু ও খোঁড়া করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার পা দুইটি পিছন দিকে বাঁকাইয়া একটা খাটিয়ার উপর বাঁধিয়া রাখা অবস্থায় বেগমগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বালককে উদ্ধার করে ও আসামীদের বিচারার্থ চালান দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। মামলা বিচারাধীন, সুতরাং এ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা বলিতে চাহি যে, এই ধরণের অপরাধ এ দেশে নূতন নহে; সরকার—বিশেষ করিয়া পুলিশ প্রত্যেক বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক-শিশুর পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে সুফল হইতে পারে।

সিন্ধুপ্রদেশের জনসংখ্যা—

সিন্ধুপ্রদেশের ১৯৪১ সালের লোকগণনার চূড়ান্ত ফলাফলের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, সিন্ধু প্রদেশের জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার ২৯২। ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৬৭; এই প্রদেশের মোট হিন্দুর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৬৭ এবং মুসলমানের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৩৯; মোট লোকসংখ্যার শতকরা ২৪ জন হিন্দু এবং ৭০ জন মুসলমান। করাচী শহরের জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৪৯। গত আদমসুমারিতে করাচী শহরের লোকসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৬৫।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণ চেষ্টা—

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি একটি সুচিন্তিত অভিমত প্রচার করিয়াছেন। আন্তরিকতার সহিত উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বিষয়টি অনুধাবন করিলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। তিনি বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতিভুক্ত; সুতরাং তাহাদের মধ্যে ঐক্য আশা করা অন্যায়—এই ধরণের প্রচারের ফলেই বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও বিরোধ পাকিয়া উঠিতেছে। অথচ উত্তেজনার কারণ নিবারণের কোন চেষ্টাই কোন পক্ষ হইতে হয় না। সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক কারণে যতই মতানৈক্য থাকুক, আলোচনার দ্বারা তাহা মীমাংসা করা উচিত। প্রয়োজন হইলে সালিসী দ্বারা মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তরিকতার সহিত বুঝাইতে চেষ্টা করিলে বিরোধ দূর করা অসাধ্য নহে। কোন কারণেই কোন পক্ষের হিংসার আশ্রয় লওয়া উচিত নহে। শান্তিরক্ষা কাম্য হইলে সম্মিলিত প্রচার দ্বারা আশু ফল পাওয়া যাইবে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। হিংসার প্রশ্রয় দিলে শান্তি ত মিলিবেই না, বরং একটি দুষ্ট আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে এবং তখন প্রত্যেকে পরস্পরের দোষ



বন্যার পর আসাম ট্রাঙ্ক রোডের অবস্থা—নওগাঁ গৌহাটীর পথ

ধরিবার ছলই শুধু খুঁজিবে। কংগ্রেস সকল সময়েই সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সমর্থন করেন এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে তাহার গঠনমূলক কার্য্য-তালিকার একটি মূল বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সুতরাং দেশবাসী কংগ্রেসের পরিকল্পিত 'শান্তিদল'এর সহযোগিতা করিলে কংগ্রেস এ বিষয়ে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।

ব্রহ্মে ভারতীয়দের বসবাসের প্রশ্ন—

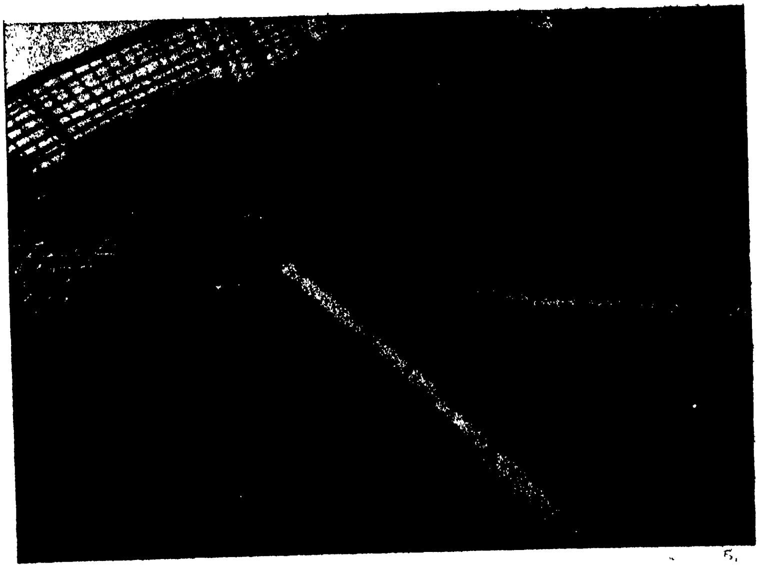
ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রহ্ম-ভারত সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, খাস্ ব্রহ্মবাসীর জীবিকার পথ প্রশস্ত করার জন্য ব্রহ্মপ্রবাসীদের অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা আজ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন—এমন ভারতীয়দের সম্বন্ধে যাহাতে কোন অবিচার না হয় মন্ত্রীমহাশয় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে ব্রহ্মবাসীদের জীবিকার প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠা উচিত নহে এবং তত্রত্য সরকার ন্যায়সঙ্গতভাবেই সে সম্বন্ধে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন ; কিন্তু একদিন যাঁহারা নানা উপলক্ষে ব্রহ্মে গিয়া আজ সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে আজ উদ্বাস্তু করা বা তাঁহাদের স্বার্থ সংকোচ করার চেষ্টা যেন কেহ না করেন।

ভেজাল খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা—

ঘৃত, মাখন, দুগ্ধ ও অন্যান্য আহার্য্য বস্তুর বিশুদ্ধতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা সরকার একটি বিলের প্রস্তাব করিয়াছেন জানিয়া আমরা আশান্বিত হইলাম। ভেজাল খাদ্যের সমস্যা এমন ব্যাপক যে, উহা শুধু বাঙ্গালা দেশেরই সমস্যা নহে, সমগ্র ভারতের ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণের কথাও এই সঙ্গে ভাবিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং বাঙ্গালার ভেজাল খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ বিল আইনে পরিণত করিবার পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা করাই বাঙ্গালা সরকারের কর্ত্তব্য হইবে।

পরলোকে নবকৃষ্ণ ঘোষ—

প্রবীণ সাহিত্যসেবী নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের জীবনী-কার হিসাবে তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। ইহা ছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। সমালোচক হিসাবেও তাঁহার নাম ছিল।



শ্রীহট্ট করিমগঞ্জে বন্যায় বিধ্বস্ত একটি চালাঘরের দৃশ্য

কালীপ্রসাদ চৌধুরী—

লণ্ডনে জার্মান বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া বাঙ্গালী বিমানচালক কালীপ্রসাদ চৌধুরী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কালীপ্রসাদের বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর

হইয়াছিল এবং এই বয়সেই তিনি যুদ্ধে বিমান-চালকের গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়া বাঙ্গালী যুবকের ভীরুতার অপবাদ ক্ষালন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ



কালীপ্রসাদ চৌধুরী

চৌধুরী পরিবারের ৺কুমুদনাথ চৌধুরী ব্যারিস্টার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ডাক্তার ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দৌহিত্র। বছর কয়েক আগে কুমুদনাথ ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়া মধ্যপ্রদেশে প্রাণ হারাণ। আমরা পরলোকগত কালীপ্রসাদের বিধবা মাতা ও অগণিত আত্মীয়স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি। কালীপ্রসাদ আমাদের ভীরুতার অপবাদ দূর করিয়া বীরের গৌরবময় মরণ বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অকালমৃত্যু গভীর দুঃখের কারণ হইলেও বাঙ্গালাজাতি তাঁহার জন্য আজ বিশেষ গৌরবান্বিত।

পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ও ব্যবহারে অসমতা—

ভারতীয় বণিক সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাদা মহাশয় যুদ্ধের দরুণ যে অত্যধিক পণ্যসম্ভার উদ্বৃত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক কাঠামোর অদ্ভুত ব্যবস্থাই এই যে, যখন লক্ষ লক্ষ লোক বহুদিন ধরিয়া অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় তখনই দেখা যায় যে, কোন কোন বিশেষ দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন হইতেছে। যুদ্ধের সময় পণ্য সরবরাহ ব্যাপারে যে কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহার জন্য আহার্য্যের অধিক পরিমাণে কাটতির কথা মনে করিয়া হয় ত বাণিজ্যসচিব আত্মশ্লাঘা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু অভাব ও অনাটনের মধ্যে যে প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহার কারণ খুঁজিতে হইবে। অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োজনীয় আহার্য্যের সরবরাহে কার্পণ্যেরই পরিচায়ক। অতিরিক্ত উৎপাদন কয়েকটি ফসলের বেলায়ই দেখা যায়—পাট, তুলা, তিসি প্রভৃতি। ভারতের কৃষক সম্প্রদায় বিদেশে মাল রপ্তানীর উপরই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ফসল উৎপাদন করে এবং ইহার উপরই তাহাদের সব কিছু নির্ভর করে। কিন্তু বিদেশের বাজারে মাল-বিক্রয়ে এই সব চাষীর কোন হাত নাই। এরূপ ব্যবস্থায় উৎপাদকেরা তাহাদের নিজেদের



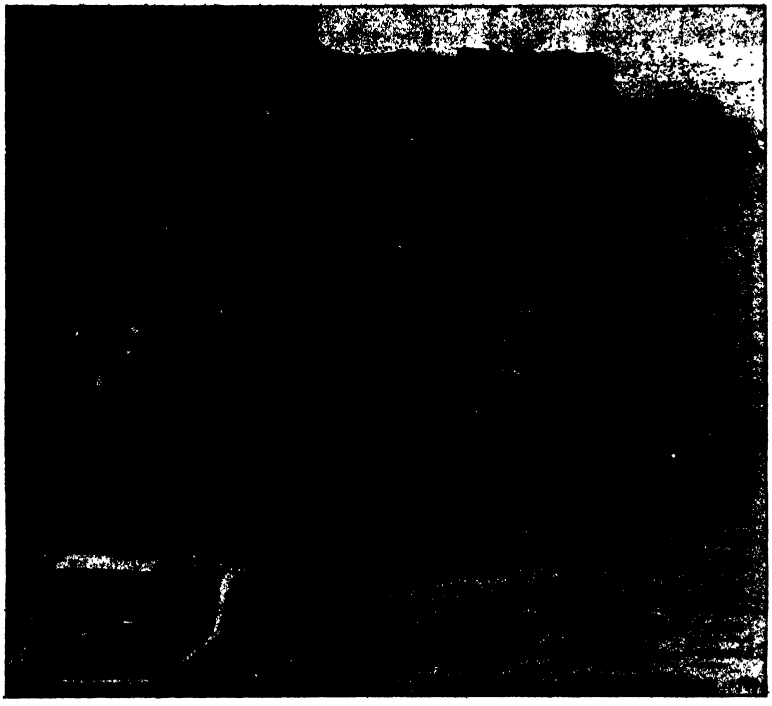
মহীশূরের নূতন দেওয়ান শ্রীযুত এন-আর-মাধব রাও

শ্রমলব্ধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভোগ করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং আর্থিক ব্যাপারে তাহারা একেবারে নিঃস্ব

হইয়া যায়। এরূপ অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য দূর করিতে হইলে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার এবং পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যদি ভারতকে আর্থিক জগতে স্বাবলম্বী করিতে হয় এবং দুঃখদৈন্যের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সমতা আনয়নের বিধান করিতে হইবে।

কংগ্রেসের শুভ প্রচেষ্টা—

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মাগান্ধী যে শান্তি দল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে যেমন অহিংসাব্রতী কংগ্রেস কর্ম্মীগণ নানা স্থানে শুভেচ্ছা-দল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, অন্যদিকে তেমনিই অন্য দল সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ এড়াইবার জন্য প্রচার-কার্য্য চালাইতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদ এই উপলক্ষে ভাগল-পুর, পাটনা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলের জন্য কয়েকজন 'নায়েব-সর্দার' নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট পন্থায় যুক্তপ্রদেশে অনুরূপ একটি শান্তিদল গঠনের আয়োজন চলিতেছে। কংগ্রেসের এই ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকভেদনীতিপীড়িত ভারতের নরনারীকে যে উৎসাহিতই করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।



কলিকাতায় অতিবৃষ্টির পরের অবস্থা—মোটর গাড়ী নৌকায় পরিণত

আদমসুমারি ও বাঙ্গালা সরকার—

বাঙ্গালার আদমসুমারির ফলপ্রকাশে অশোভন বিলম্ব ও ভারপ্রাপ্ত হিন্দু কর্ম্মচারীর রহস্যজনকভাবে পরিবর্ত্তনে হিন্দুদের মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। হিন্দু মহাসভার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং বাঙ্গালার প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই নির্ম্মলচন্দ্রের উক্ত অভিযোগ সমর্থনের ন্যায়সঙ্গত কারণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ধান ভানিতে শিবের গীতের সঙ্গে তুলনা করা চলে। আদমসুমারির গোড়াতেই সাম্প্রদায়িক সমতারক্ষার জন্য বাঙ্গালা সরকারের উদগ্র আগ্রহ ছিল; কিন্তু যথাসময়ে মুসলমান কর্ম্মচারী বাঙ্গালায় না পাওয়া যাওয়ায় একজন হিন্দু কর্ম্মচারী দিয়াই কাজ সুরু করা হইয়াছিল; আড়াইমাস বাদে কাজ যখন অনেকটা অগ্রসর, তখন যোগ্য মুসলমান কর্ম্মচারী মিলিয়া যাওয়ায় তাহাকে নিয়োগ করিয়া কাজ সুসম্পন্ন করাইতে কর্ত্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমতা যখন অপরিহার্য্যই ছিল তখন যেমন করিয়া হৌক একসঙ্গেই লোক নিযুক্ত করা হয় নাই কেন? সে যাহাই হোক, হিন্দুদের ১৩৮টি শ্রেণীর বিস্তারিত বিবরণ আপাতত না পাইলেও চলিবে, অবিলম্বে বাঙ্গালার মোট

জনসংখ্যা এবং হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাটা জানাইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব।

বৃটিশ নারীর আবেদন—

বৃটেনের জনকয়েক নারী ভারতীয় নারীজাতির নিকট একটি আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুদিন আগে মিস রাথবোনও এক আবেদন জারি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ভাষা ছিল উদ্ধত এবং শক্তির মদমত্ততার চোখ-রাঙানি। আলোচ্য আবেদনে আছে নারীসুলভ কিঞ্চিৎ আন্তরিকতা, বক্তব্য—যুদ্ধে সাহায্য কর, সাহায্যের জন্য ভারতীয় পুরুষদের উদ্বোধিত কর। বৃটেনের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন, বৃটেনের সাম্রাজ্যও বিপন্ন। সুতরাং বৃটিশ নারীদের এই আবেদন। প্রত্যেক জাতিরই স্বাধীনতা দরকার এবং থাকা উচিত—একথা বৃটিশের গণতন্ত্রের কেতাবে থাকিলেও ভারতবর্ষকে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময়ও এই আশ্বাসই ভারতীয়েরা পাইয়াছিল যে যুদ্ধান্তে ভারতীয়দের স্বাধীনতা দেওয়া হইবে; কিন্তু এই তেইশ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের বিনিময়ে তাঁহারা কি পাইয়াছেন? আজ ইউরোপীয় যুদ্ধ এশিয়ার পশ্চিম দ্বারে হানা দিয়াছে, হয় ত অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও বজ্রনির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া যাইবে। যে দেশের শতকরা ৯৯ জন দুই-বেলা পেটভরিয়া খাইতে পায় না, সে দেশের লোকে এতবড় যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারিবে?



২৩শে জ্যৈষ্ঠের বানে বিধ্বস্ত কলিকাতা গঙ্গাতীরস্থ জেটির অবস্থা ফটো—মহাদেব সেন

কলিকাতায় ভিক্ষুক সমস্যা—

ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের সম্পর্কে বিবেচনা করার এবং রোটারী ক্লাব পরিকল্পিত 'ভবঘুরে বিলে'র খসড়া সম্পর্কে অভিমত দেওয়ার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন গত বৎসর একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটি একটি রিপোর্টও দাখিল করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কর্পোরেশন, উক্ত রিপোর্টে লিখিত কর্পোরেশনের আর্থিক দায়িত্ব ছাড়া অন্য সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং এই মত প্রকাশ করেন যে, সরকার ও কর্পোরেশনের মধ্যে সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে উক্ত আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। তদন্ত কমিটি বিলের বিভিন্ন ধারার কিছু কিছু সংশোধন করিয়া মোটামুটি প্রায় সমস্ত ধারাই গ্রহণ করেন। আরও সুপারিশ করেন যে, আইন হইবার পর কলিকাতা শহরের ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদিগকে একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে একত্র করিয়া চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করার পর রিফিউজ, ন্যাশানাল ইনফার্ম্মারী, গোবরা কুষ্ঠ হাসপাতাল, মুক্তি ফৌজ প্রতিষ্ঠান, খাদিম্-উল্-ইনসান সোসাইটি ও কেন্দ্রীয় ভবঘুরে হোম—এই ছয়টি প্রতিষ্ঠানে ভাগে ভাগে রাখা যাইতে পারে। প্রারম্ভে রিফিউজকেই উক্ত ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের সংগ্রহ এবং বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ভবঘুরে হোম, বিলে বর্ণিত অভিভাবক বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হইবে ও তাহা কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কলিকাতায় প্রায় ৫ হাজার ভিক্ষুক ভবঘুরে আছে। আইনটি পাশ হইলে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ প্রদেশান্তরে চালান করা হইবে এবং

সমর্থ ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বিভিন্ন কলকারখানা, ডক প্রভৃতিতে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত করা হইবে। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধেকের মত লোকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বাকী অর্দ্ধেকের ভার উক্ত ছয়টি প্রতিষ্ঠান লইবেন। ইহাদের মধ্যে কুষ্ঠ রোগী প্রায় পাঁচশত হইবে, তাহাদের কুষ্ঠাশ্রম ও হাসপাতালে রাখিতে হইবে। আশ্রয় নির্ম্মাণে আনুমানিক একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আবশ্যক। এই ব্যয় ভার সরকার ও কর্পোরেশনের সমান ভাবে গ্রহণ করা উচিত। জনসাধারণের নিকট হইতেও এবিষয়ে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাইবে। সরকার ও কর্পোরেশন অসমর্থদের খাদ্যের ভার বহন করিলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। কমিটি মনে করেন সরকার ও কর্পোরেশন যদি সমান অংশে বার্ষিক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহা হইলে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে।

ইংরেজ মহিলা ও ভারত মহিলার দৃষ্টিকোণ—

কিছুদিন আগে জনকয়েক ইংরেজ মহিলা ভারতীয় মহিলাদের সম্বোধন করিয়া একখানি খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি কয়জন ভারতীয় মহিলা তাহার একটি জবাব দিয়াছেন। প্রসঙ্গত বৃটীশ মহিলারা রুজভেল্টের বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া নিজেদের বক্তব্য বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 'পৃথিবী আজ দাসত্ব ও স্বাধীনতা—এই দুই ভাগে বিভক্ত'—এই উক্তিটি ইংরেজ মহিলারা ভারত সম্পর্কে উল্লেখ না করিলেই ভাল করিতেন। আজিকার দিনে বৃটিশ-শাসিত ভারতীয়েরা উক্ত দুই ভাগের কোন্ ভাগে রহিয়াছে তাহা ভারতীয়েরা বিশেষভাবেই জানেন। আজও কি বৃটেন এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত আছেন যে যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতকে গৃহকলহের অজুহাত না দেখাইয়াই আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হইবে ?

আবার মিস রাথবোন—

মিস রাথবোন আবার পত্রাঘাত করিয়াছেন। এবারে তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ, সেই কারণে তিনি মিস রাথবোনের পূর্ব্বচিঠি ভাল করিয়া না পড়িয়াই জবাব দিয়াছেন। এইরূপ অনুমান উক্ত মহিলারই যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের উত্তরে পরাধীন ভারতের কথাই সুপ্রকাশিত হইয়াছে। অথচ ইংরেজ মহিলাটি ধারণা করিয়া বসিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিঠির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া বৃটিশ-শাসনের অযথা নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য, ইংরেজ শাসনের যত গলদই থাকুক না, সে সবের উল্লেখ মাত্র না করিয়া ভারতীয়গণকে বৃটেনের সহিত মুখ বুজিয়া সহযোগিতা করিতে হইবে। যে বিপন্ন গণতন্ত্রের জন্য বৃটেন এত বড় যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেই গণতন্ত্র কি ভারতের বেলায় প্রয়োজন নাই ?

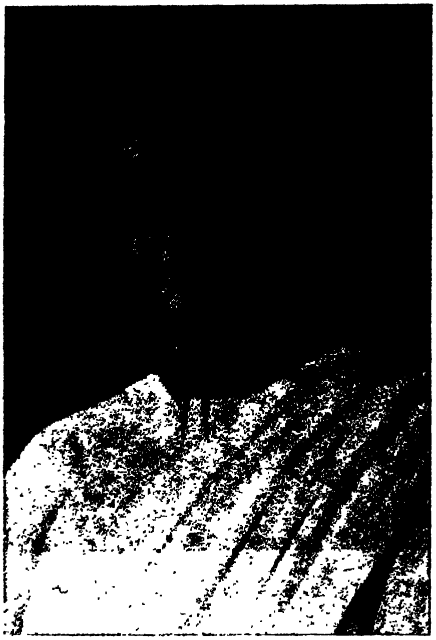


কলিকাতায় গঙ্গার বানে ক্ষতিগ্রস্ত নৌকা ফটো—পান্না সেন

পরলোকে গুরুসদয় দত্ত—

ভারতীয় সিবিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালা একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ও কর্ম্মীকে হারাইল। উচ্চ রাজপদে থাকিয়াও তিনি কখনও ভুলিয়া যান নাই যে তিনি বাঙ্গালী। স্বাধীনচেতা, নির্ভীক গুরুসদয় নানাভাবে দেশের কল্যাণ চিন্তা করিতেন ও নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়া স্বজাতির সেবা করিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার এই 'ঘরমুখো' মনোভাবের জন্য সরকার পক্ষ তাঁহাকে বিশেষ সুনজরে দেখিতেন

না। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি 'সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন; তাহা দেশের নারীকুলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালার প্রায় চারিশত স্থানে ইহার শাখা আছে। 'ব্রতচারী সমিতি'ও তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি। ইহার খ্যাতি বাঙ্গালার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পল্লী-সংস্কার ও পল্লীসংগঠন কার্য্যে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। বাঙ্গালার লোকনৃত্য, ব্রতকথা ও লোক-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং



গুরুসদয় দত্ত

বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশিষ্টতায় গর্ব্ব বোধ করিতেন। গত বৎসর তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালে কর্কটরোগে পরলোকগমন করায় বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষতি হইল।

আদমসুমারির জের—

বাঙ্গালার আদমসুমারি লইয়া হিন্দু-সংখ্যাগণনাকারীদের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় ও কাগজে একাধিক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং কোন কোন বক্তা স্পষ্ট করিয়া শাসাইয়াও দিয়াছেন যে এই সব অসাধু গণনাকারীর বিরুদ্ধে বহু প্রমাণই তাঁহার হাতে আছে এবং তাঁহাদিগকে মামলা সোপর্দ্দ করা হইবে। সম্প্রতি রাজসাহীর সংবাদে প্রকাশ যে, দুইজন হিন্দু গণনাকারীর বিরুদ্ধে ভুল সংবাদ দেওয়ার অভিযোগ আনীত হয়। কিন্তু সদর মহকুমা হাকিম মিঃ করিম উভয়কেই বেকসুর মুক্তি দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আরও দুইটি মামলায় হিন্দু গণনাকারী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অপর পক্ষে বর্দ্ধমানের নূরু শেখের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, সাঁওতালদের গণনা করিতে গিয়া তিনি মাথা পিছু এক আনা হিসাবে ফি আদায় করেন এবং একজন সেই সামান্য ফি দিতে না পারায় তাহাকে পাদুকা প্রহার সহিতে হয়। অবিলম্বে নূরু শেখ মামলা সোপর্দ্দ হয় এবং বিচারে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ত্রিশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বিক্রয়-কর আইন—

বাঙ্গালার ব্যবসায়ী ও জনগণের আপত্তি উপেক্ষা করিয়াই বাঙ্গালা সরকার বিক্রয়কর আইন আগামী অক্টোবর মাস হইতে কার্য্যকরী করিয়াছেন। যে সকল পণ্য-আমদানিকারী, প্রস্তুতকারী ও উৎপন্নকারীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ দশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য যে সকল ব্যবসায়ীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা—তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় এক পয়সা করিয়া এই ট্যাক্স দিতে হইবে। সামান্য কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্যকে এই ট্যাক্স হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। এই ট্যাক্সের ফলে শুধু যে বাঙ্গালার শিল্পবাণিজ্যই বিপন্ন হইবে তাহা নহে, জনগণও বিব্রত হইয়া পড়িবে। ট্যাক্স যিনিই দিন, আসলে তাহা যে জনগণের নিকট হইতে আদায় করা হইয়া থাকে তাহা কে না জানে। অথচ এই দুর্ম্মূল্যের দিনে তাহাদিগকে দ্রব্যের বর্দ্ধিত মূল্যের উপরে আরও অধিক মূল্য জোগাইতে হইবে। ব্যবসায়ে লাভ হউক, আর না-ই-হউক—ট্যাক্স দিতেই হইবে। তাহা ছাড়া, স্বতন্ত্র হিসাবপত্র রাখিবার হাঙ্গামা ও যখনতখন সরকারী পরিদর্শকের উপদ্রবও সহ্য করিতেই হইবে। বাঙ্গালা সরকার যদি মনে করিয়া থাকেন যে ট্যাক্সের পর ট্যাক্স চাপাইলেই তাঁহারা

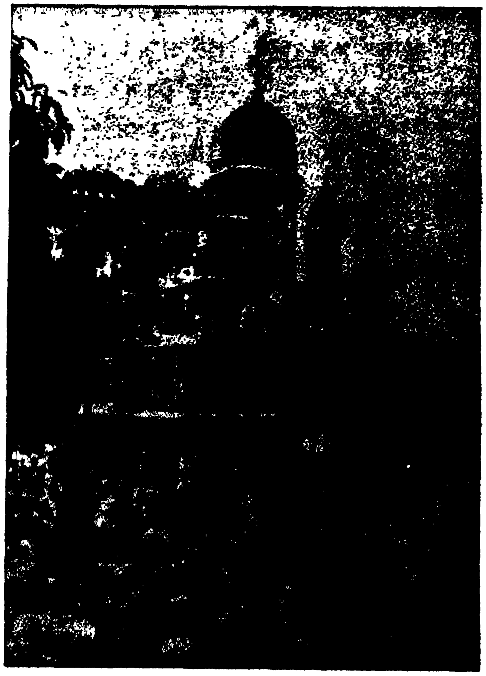
হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবেন, তাহা হইলে আমরা বলিব তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। কেন না, বেহিসাবী ব্যয়-বাহুল্য বন্ধ না করিলে তাঁহারা কোন মতেই ক্রমবর্দ্ধমান অভাবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল—

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষার উন্নতি অপেক্ষা সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার দিকেই বেশী নজর আছে—ইহাই বাঙ্গালার শিক্ষিত হিন্দু সাধারণের ধারণার ফলে এই বিলের বিরুদ্ধে জনমত তীব্র ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালার শিক্ষাব্যবস্থার যে ত্রুটি নাই, ইহা কেহই বলিবে না; কিন্তু ত্রুটি সংস্কারের অবকাশে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার আমদানির ফলে শিক্ষার অন্তরায় হইবে। সুখের বিষয় বাঙ্গালা সরকার জনমতকে একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি যে আকারে গৃহীত হইয়াছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটিতে যেসব সদস্য গৃহীত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল: মিঃ এ. কে. ফজলুল হক (চেয়ারম্যান), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর স্যর আজিজুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ক্যামেরণ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ভূপতিমোহন সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর এম্ আহ্সান, স্যর যদুনাথ সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডক্টর জেঙ্কিন্স। জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান-সমূহের অভিমতও এই কমিটি বিচার করিবেন। শিক্ষা-বিষয়ক এরূপ একটি কমিটির উপযোগিতা আমরা অস্বীকার করি না। কারণ আমাদের বিশ্বাস, সদস্যগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাধীন মত প্রকাশে সাহসী হইবেন। তাই সাগ্রহে ইঁহাদের অভিমত জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিব; এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে ডঃ জেঙ্কিন্স মূল বিলের সমর্থনে যে সব যুক্তি পেশ করিয়াছিলেন তাহার অসারতা যেভাবে দেখানো হইয়াছে তাহাতে তাঁহার এই কমিটিতে থাকার কোন অর্থ হয় না। বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এই কমিটী সদস্য না করাও বিশেষ অশোভন হইয়াছে।

হিন্দি—না বাঙ্গালা ?—

সম্প্রতি কলিকাতায় পূর্ব্বভারত রাষ্ট্রভাষা সম্মিলন হইয়া গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষার খয়রা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আর সভাপতিত্ব করিয়াছেন ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ইঁহারা উভয়েই জ্ঞানী গুণী লোক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন, সুতরাং ইঁহাদের মতামতের মূল্য খুব বেশী। কাজেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া



মহেশের রথ (শ্রীরামপুর) ফটো—পান্না সেন

উচিত এ সম্বন্ধে ইঁহাদের মতামতে যুক্তি ও বিবেচনার সন্ধান করা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়—যে 'মাথার সংখ্যা' আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অরাজকতা আনয়ন করিয়াছে, ইঁহারাও সেই মাথার সংখ্যারই প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন। আমাদের ধারণা, উত্তর ভারতের দশ-বার কোটি লোক হিন্দী ভাষা বলিতে বা কহিতে পারে, অপর পক্ষে বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার প্রায় দশ কোটি লোক বাঙ্গালা জানে

এবং একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে ভাব সম্পদের দিক দিয়াও সাহিত্য-গরিমার দিক দিয়া বাঙ্গালাই রাষ্ট্রভাষার দাবী করিতে পারে এবং করিবেও। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পদে বহাল করিতে যাঁহারা উদগ্র হইয়া উঠিয়াছেন ইহা তাঁহাদের দুঃখের কারণ হইলেও আমরা নাচার। রাষ্ট্রভাষার দাবী তাহারই গ্রাহ্য হওয়া উচিত, 'সংখ্যা' বাদ দিয়া যাহার মধ্যে 'মাথা' অর্থাৎ মগজ আছে বেশী।

প্রাণগোপাল গোস্বামী—

পরমভাগবত শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশসম্ভূত প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ১-৪৫ মিনিটের সময় ৬৫ বৎসর বয়সে পুণ্যধাম নবদ্বীপে সজ্ঞানে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; অত্যধিক পরিশ্রমে ইদানিং তাঁহার শরীর বহুমূত্রাদি রোগে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি একাধারে যেমন রসিক ভক্ত ভাবুক ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, ধর্ম্মগ্রন্থাদি আলোচনায়ও তেমনি সুবক্তা ছিলেন। বাঙ্গালায় বিশদ বিবৃতির সহিত তাঁহার সঙ্কলিত—শ্রীমন্ জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভের "শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ", "ভক্তি সন্দর্ভ" ও "প্রীতি সন্দর্ভ" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "উদ্ধব সংবাদ" পুস্তকগুলি বৈষ্ণবজগতে তাঁহার অপূর্ব্ব দান।



প্রাণগোপাল গোস্বামী

হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন ?—

দৈনিক পত্রিকায় সম্প্রতি পর পর তিনটি খবর প্রকাশিত হইয়াছে। খবর তিনটিকে উপেক্ষা করা চলে না! আমরা বাঙ্গালা সরকারকে খবর তিনটি উপহার দিতেছি :—

'গত ১৪ই জুন শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে প্রায় একশত লোক হাজিগঞ্জ থানার ৬ মাইল দূরস্থ মালিগাঁও গ্রামের দ্বারকানাথ ও অনাথ শর্ম্মার বাড়ী লুঠ করিয়াছে…হিন্দুগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়াছে।'

'প্রকাশ, গত ২০শে জুন ২৫ জন লোক দলবদ্ধভাবে ফরিদগঞ্জ থানার অধীন আলুনিয়া গ্রামের অভয়দাস মজুমদারের বাড়ী চড়াও করে। ঘটনাচক্রে কৃষিঋণ বিতরণ উপলক্ষে সার্কেল অফিসার নিকটে কোথাও উপস্থিত ছিলেন। হল্লা ও হট্টগোল শুনিয়া তিনি কয়েকজন কনেষ্টবল্ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আক্রমণকারীদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু তাহারা দৃঢ়ভাবে তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করে। অবশেষে পুলিস গুলি চালাইলে তবে তাহারা নিবৃত্ত হয়।'

'গত ১৯শে জুন রাত্রি ১২টার পর রায়পুরা থানার অধীন সায়েস্তানগর গ্রামের ধনী জমিদার শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ১৪।১৫ শত লোক হানা দিয়া এক গোলা হইতে সাড়ে চারিশত মণ সুপারি লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। লোকগুলি উক্ত জমিদার মহাশয়ের ভাইপোর ঘর হইতে সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে এবং ১২ মণ ওজনের একটি লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিতে না পারিয়া একশত গজ দূরে এক পুষ্করিণীর পাড়ে ফেলিয়া গিয়াছে।'

পরলোকে রেণুকা বসু—

রেণুকা বসুর আকস্মিক পরলোকগমনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট মহিলা-কর্ম্মীর অভাব ঘটিল। বাঙ্গালার বিপদ-সঙ্কুল রাজনৈতিক আন্দোলনে যে কয়টি মহিলা যোগ দিয়াছিলেন, রেণুকা ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। দেশসেবার পুরস্কার-স্বরূপ কারাবাস, অন্তরীণ, বন্দীশালায় আটক—সবই এই সদাহাস্যময়ী, কঠোর শ্রমশীলা এবং ধৈর্য্যশালিনী মহিলার ভাগ্যে পরপর জুটিয়াছিল। তিনি কিছুদিন 'জয়শ্রী' মাসিক-পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

বিশ্রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা—

কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় ২৪পরগণা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে যক্ষ্মা রোগীদিগকে বিশ্রাম স্থান দিবার জন্য একখণ্ড প্রকাণ্ড জমী লইয়া তথায় বিশ্রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মার্টিন কোম্পানী তাঁহাদের রেললাইনে ঐ স্থানটির নিকট একটি নূতন ষ্টেশন করিয়া দিয়া

ষ্টেসনটির কার্ত্তিকপুর নামকরণও করিয়াছেন। গত ১২ই আষাঢ় বিশ্রাম মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উৎসব হইয়া গিয়াছে। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শ্রীযুত অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ—

ভারতরক্ষা আইন পাশ হওয়ার সময় সরকারপক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, সাধারণ আইনের দ্বারা যে সব অপরাধের বিচার সম্ভব হইবে না সেই সব ক্ষেত্রেই ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ করা হইবে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যে তাহা সর্ব্বত্র অনুসৃত হয় না সম্প্রতি কয়েকটি মামলায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমটি এই—'দেশ দর্পণ' গুরুমুখী ভাষায় প্রকাশিত কলিকাতার একখানি দৈনিক পত্র এবং ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সিং তালিব। সম্প্রতি ভারতরক্ষা আইনের বলে সম্পাদককে বোম্বাই শহরে গ্রেপ্তার করা হয়। বোম্বাইয়ে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দিলে তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় আসিয়া আদালতে হাজির হন; কিন্তু পুলিশ তাঁহার জামিনে আপত্তি করায় ভদ্রলোককে দশদিন জেল হাজতেও বাস করিতে হইয়াছে। বিচারে কিন্তু আলীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া বেকসুর খালাস দিয়াছেন। হাকিম তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, শান্তিরক্ষায় সাহায্য করাই ছিল আসামীর উদ্দেশ্য এবং তাঁহার প্রবন্ধে বিদ্বেষ বা আতঙ্ক বৃদ্ধির কোন কারণই দেখা যায় না। পরন্তু তিনি জনসাধারণের হিতকর কার্য্যই করিয়াছেন। তবু এই মানী ব্যক্তির লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। সরকার বাঙ্গালার প্রেস পরামর্শ বোর্ডের সহিত এই মামলা রুজু করার পূর্ব্বে পরামর্শ করেন নাই বলিয়াই প্রকাশ; অথচ বোর্ড গঠন করিবার সময় ভারতসরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, এই ধরণের ভারতরক্ষা আইনের মামলায় বোর্ডের অভিমত সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিবেন। (২) ভারতরক্ষা আইনানুযায়ী কোন সভাসমিতিতে যোগ না দিবার জন্ম মৈমনসিংহ জেলার জামালপুরের দুইজন ও সেরপুরের একজন যুবকের উপর আদেশ জারি হয়। রবীন্দ্র জয়ন্তীর সভাও যে ভারতরক্ষা আইনের কবলে পড়ে যুবক তিনটি তাহা ভাবিতে পারে নাই; সুতরাং আদেশ অমান্য করায় 'সভাসমিতিতে' যোগদানের অভিযোগে তাহারা মামলা সোপর্দ্দ হয়। বিচারে তাহাদের দুইমাস হইতে চারি মাসের কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা জরিমানা হয়। আপীলে দায়রা জজ তাহাদের নামমাত্র ১৲ টাকা জরিমানা করিয়া মুক্তি দিয়াছেন।

স্থায় ও শৃঙ্খলা রক্ষার ওজুহাতে আইনের এই ধরণের অপপ্রয়োগ হইতে দেশবাসী কবে মুক্ত হইবে এই প্রশ্ন আজ দেশের সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—

শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. ইতিহাস (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম



শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় এই যে, শ্রীমান্ এ বৎসর ইতিহাসের সকল পত্রেই প্রথম শ্রেণীর নম্বর পাইয়াছেন। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বিভাগীয় বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং আই. এ. পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পরলোকে সাংবাদিক চিন্তামণি—

এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র 'লীডার'-এর প্রবীণ সম্পাদক স্যর চিরভূরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণির মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমনে ভারতের সাংবাদিক মহলের অশেষ ক্ষতি হইল। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদারনৈতিক এবং এক সময় কংগ্রেসের বিশিষ্ট সেবকরূপে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মণ্টেগু শাসনসংস্কারের যুগে তিনি

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে ঐ শাসন সংস্কারের অসারতা বুঝিতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে পদ ত্যাগ করেন। নির্ভীক, তেজস্বী ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসাবে তিনি যেমন স্বদেশে তেমনি বিদেশে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেম ছিল অনাবিল এবং যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহা অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতে কখনও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই।



রমা নিয়োগী

রমা নিয়োগী—

কলিকাতা বেনিয়াপুকুর নিবাসী শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ নিয়োগীর চতুর্থা কন্যা রমা নিয়োগী মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে গত ২রা আষাঢ় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি খেলাধূলা ও সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং ভিক্টোরিয়া ইনিষ্টিটিউসনের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন।

বাঙ্গালার ব্যবসায় সঙ্কট—

বাঙ্গালা সরকারের রাজকোষের অবস্থা এক সময়ে বেশ শাঁসালোই ছিল কিন্তু শাসন ব্যবস্থার গণ্ডগোলের ফলে দেখিতে দেখিতে অর্থাভাবে শাসনতন্ত্র অচল হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। দুঃখের বিষয় কেন এই অভাব, কিভাবে শাসন-কার্য্য চালাইলে এই অভাব বিদূরীত হইতে পারে, কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। ফলে দরিদ্র বাঙ্গালীর স্কন্ধে একের পর এক করিয়া অনেকগুলি নূতন ট্যাক্স চাপিয়া গেল। ক্রমবর্দ্ধমান ট্যাক্সের ভারে বাঙ্গালার জনগণ তীব্র প্রতিবাদ সুরু করিল কিন্তু ভোটের জোরে সরকার আইন পাস করিয়া লইলেন। ফলে বাঙ্গালার ব্যবসায় বাণিজ্য আজ অচল হইতে বসিয়াছে। অতিরিক্ত হারে আয়কর, সুপার ট্যাক্স, সারচার্জ, ফাইনান্স ট্যাক্স, বাধ্যতামূলক ওয়ার রিস্ক ইন্সিওরেন্স, দোকান কর্ম্মচারী নিয়ন্ত্রণ আইন, বিক্রয়-কর (ইহা পয়লা অক্টোবর হইতে কার্য্যকরী হইবে)—এই সকল বিধিনিষেধের এবং তাহার উপর আলোক নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসা বাণিজ্য সবই অচল অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে। সময় থাকিতে সরকার এদিকে নজর না দিলে দেশকে করভারপ্রপীড়িত করিয়াও সরকারের কোন লাভ হইবে না। কেননা, অদূর ভবিষ্যতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সমূহ ক্ষতি হইবে, তাহাতে বর্দ্ধিত কর প্রদানের ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বেলিয়াঘাটা তালপুকুর রোড নিবাসী বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৪শে মে মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু কলিকাতা ও দার্জ্জিলিংয়ে সর্ব্বজনপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। বেলিয়াঘাটার স্বনামধন্য অধিবাসী ৺কুঞ্জ-বিহারীবাবুর তিনি তৃতীয় পুত্র। তাঁহার বিধবা মাতা, পত্নী ও তিন নাবালক পুত্র বর্ত্তমান।



নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামগোপাল ঘোষের দান—

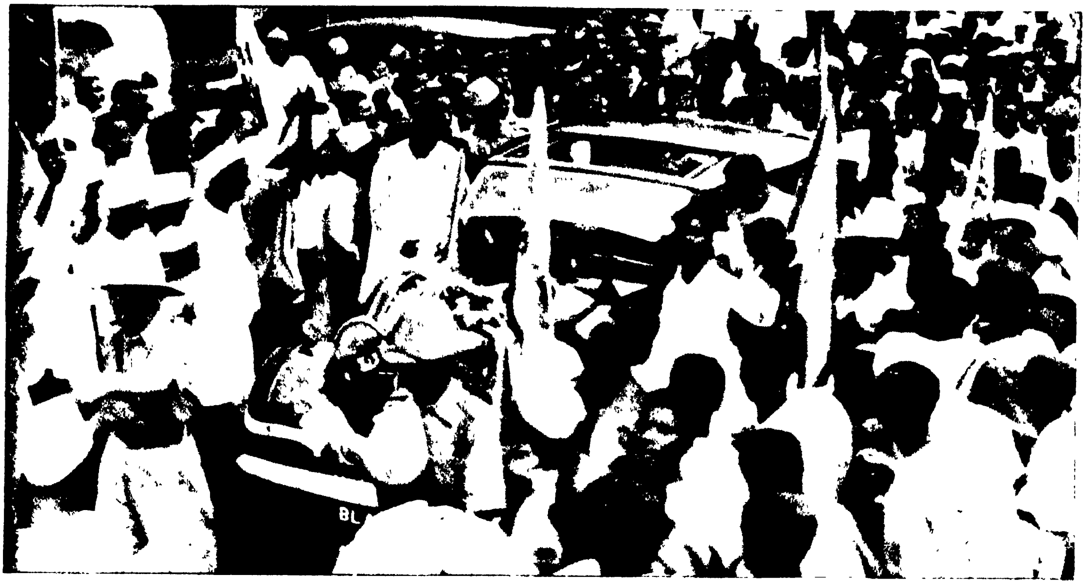
স্বনামখ্যাত বাগ্মী ও সমাজ-সংস্কারক পরলোকগত রাম-গোপাল ঘোষ মহাশয় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দেড় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া যান এবং তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হইবে এইরূপ উইল করিয়া যান। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসর জীবিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করায় বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রাপ্য অংশ পাইবার দাবী জানাইয়াছেন; উইলের সর্ত্তানুযায়ী এই টাকা শিক্ষাকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। ঘোষ মহাশয় জীবিত কালেও লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র ৯ বৎসর পরে তিনি শিক্ষার জন্য অর্থদানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া এইরূপ উইল করিয়াছিলেন।



বরিশাল ভোলায় ঝড়ের পর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল মুসলেম-ছাত্রাবাসের দৃশ্য



ঝড়ের পর নোয়াখালি সহরে ভুলুয়ার জমীদারদের সদর কাছারীর অবস্থা



হাওড়া ষ্টেশনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকরের সম্বর্দ্ধনা



কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে দেশবন্ধু স্মৃতি সভায় সমবেত জনতা

শব্দানুশাসন

শ্রীনারায়ণ রায় এম্-এ

শব্দানুশাসন বিষয়ে আলোচনা বাঙ্গালা ভাষায় হয় নাই বলিলেই চলে। এ বিষয়ে ফরাসী, ইংরেজী ও জার্মান ভাষাই অগ্রণী। এই সকল ভাষার তুলনায় এই বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা লজ্জাকরভাবে পশ্চাৎপদ। অর্থান্তর-কথন, শব্দানুশাসন বা ভাষা-বিজ্ঞানের একটী বিশেষ ও অপরিহার্য্য অঙ্গ। ভাষা-বিজ্ঞানের অন্তর্বর্ত্তী এই উপবিজ্ঞানটীর আলোচনা যিনি করেন নাই, তাঁহাকে আমরা কোনক্রমেই ভাষা-বিজ্ঞানে পণ্ডিত বলিতে পারি না। বস্তুত প্রাণবান ও প্রাণহীন দেহে যে পার্থক্য, সম্পূর্ণাঙ্গ ভাষা-বিজ্ঞান ও অর্থান্তর-বিজ্ঞান বিবর্জ্জিত ভাষা-বিজ্ঞানের মধ্যেও সেইরূপ বা ততোধিক পার্থক্য। ইংরেজী ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভাষায় শব্দের অর্থান্তর, মূল অর্থ বা শব্দগঠন সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে ও এই বিজ্ঞানের সাহায্যে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

আমাদিগের ভাষায় এমন বহু শব্দ রহিয়াছে, যেগুলি বাস্তবিক পক্ষে আমাদিগের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, পরন্তু অপরাপর ভাষা হইতে উহা অপরিহার্য্য প্রয়োজনবোধে ঋণরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য প্রগতিশীল কোনও ভাষাই অপরাপর ভাষা হইতে ঋণগ্রহণে পরাঙ্মুখ হয় না। এই রূপেই ভাষার শব্দভাণ্ডার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। বস্তুত ভাষার এইরূপ ঋণগ্রহণের ক্ষমতা যেদিন লুপ্ত হইবে, সেই দিন হইতে উক্তরূপ অক্ষম ভাষাকে কেহ আর জীবন্ত ভাষা বলিয়া স্বীকার করিবে না। নিত্য নূতন প্রয়োজন-বোধের সহিত তাল রাখিয়া যেরূপ আমাদিগকে প্রতিটি পদক্ষেপ করিতে হয়, ভাষাকেও ঠিক তদ্রূপই করিতে হয়। এইভাবে, প্রয়োজনের খাতিরে এক ভাষা অপর ভাষা হইতে ঋণ গ্রহণ করে অথবা স্থানকাল-হিসাবে তাহার শব্দের অর্থান্তর স্বীকার করে।

কিন্তু এই দুইটী রীতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। ঋণ-গ্রহণের কালে ঋণগ্রহণকারী সজ্ঞানেই তাহা করিয়া থাকে, কেন না এই ঋণ গ্রহণ তাহার না করিলেই নয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটে অর্থান্তরের সময়ে। শব্দের অর্থান্তর যে ঠিক কোন্ সময়ে আরম্ভ হয়, তাহার সম্বন্ধে চেতনা প্রথমারম্ভের দিকে অবর্ত্তমান থাকে। যখন এই অর্থান্তর সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাতিতে থাকে, তখনই হঠাৎ সম্বিৎ পাইয়া আমরা দেখি, যুগের প্রয়োজনে কেমন করিয়া আমাদিগের জ্ঞাতসারে অথবা অর্দ্ধ-জ্ঞাতসারে একটী শব্দ, তাহার পূর্ব্ব অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ত্তমানে আমরা এইরূপ অর্থান্তরিত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

'দায়'। 'দায়' শব্দটীর সহিত এতদ্দেশীয় ব্যক্তি মাত্রেই পরিচিত। কন্যাদায়, মাতৃদায়, পিতৃদায় ইত্যাদি বহুবিধ 'দায়' হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টায় সাধারণ অবস্থার বহু ব্যক্তিই ঋণদায়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। উৎসাহী ব্যক্তিগণকে কোন দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করিলে প্রথম প্রথম চলিত ভাষায়—'আমার ভারী দায় প'ড়েছে, বা 'ভারী দায় ঠেকেছে' বলিলেও শেষ পর্য্যন্ত অনুরোধকারীকে যথাশক্তি সাহায্য করে ও তাহার ক্রিয়া-কর্ম্মে কোনও বিঘ্ন ঘটিলে নিজেকেই 'দায়ী' মনে করে। 'দায়' শব্দের এই যে অর্থ, ইহা অতি অর্ব্বাচীন। ইহার মূল অর্থ—যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাহাই। দায়ভাগ—এই যৌগিক শব্দের প্রথমাংশে 'দায়' শব্দটী এই শেষোক্ত প্রাচীন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

'গ্রামে গ্রামে এই বার্ত্তা রটি গেল ক্রমে' ইত্যাদিতে, বাঙ্গালা রট্ ধাতু বিস্তার বা ব্যাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় রট্ ধাতুর অর্থই ইহা। এই ক্রিয়াপদ 'রট্' আসিয়াছে 'রাষ্ট্র' হইতে। রাজ্য—এই অর্থে রাষ্ট্র শব্দ প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন উভয় কালেই প্রয়োগ-রীতি দৃষ্ট হয়। পরে রাজ্য হইতে রাষ্ট্র শব্দের অপর এক অর্থ হইল—রাজ্যময় বা রাজ্যব্যাপী। বর্ত্তমানে 'রাষ্ট্র' শব্দের (তথা রট্ ধাতুর) অন্যতম অর্থ—বিস্তার। যথা :—সেই ভয়াবহ সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে দিকে দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে আমরা 'জানালা' বুঝাইতে শুদ্ধ ভাষায় 'গবাক্ষ' শব্দের প্রয়োগ করি। প্রাচীনকালের ভারতীয়—আর্য্য ভাষার সাহিত্যেও দেখি, সম-অর্থে গবাক্ষ শব্দের ব্যবহার-রীতি। গবাক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, গোরুর অক্ষি। কিন্তু জানালাকে গরুর চক্ষু বলা হইয়াছে কেন? এতদস্থলে গোরুর চক্ষু অর্থে বুঝিতে হইবে গোরুর চক্ষু সদৃশ বা ঐরূপ আকার বিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান কালের প্রথায় 'জানালা' নির্ম্মাণের রীতি এতদ্দেশে ছিল না। গোরুর চক্ষুর আকার বিশিষ্ট শূন্য-স্থানের মধ্য দিয়াই কক্ষ মধ্যে আলোক বা বাতাসের সঞ্চার ঘটিত। সেই কারণেই প্রাচীনকালে জানালাকে গবাক্ষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কালক্রমে আমাদিগের দেশে গৃহনির্ম্মাণ-কৌশলের সহিত জানালার আকারের ও প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিন্তু গবাক্ষ শব্দ যেমন ছিল ঠিক তেমনই রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইত কালক্রমে তাহাই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

'কিছুতেই ইহার হদিশ পাইলাম না'—এতদস্থলে 'হদিশ' শব্দের অর্থ সন্ধান বা সমাধান। কিন্তু আসলে 'হদিশ' শব্দের অর্থ ইহা নহে। হদিশ—মুসলমানগণের ধর্ম্ম-গ্রন্থ। ইহাতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু সমস্যার সমাধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিতর্কের উত্থাপন হইলে, সেই বিতর্কের সমাধান করিবার জন্য, কিম্বা উক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাত হইতে হইলে এই হদিশ সন্ধান করিতে হইত। বিশিষ্টার্থক শব্দ হদিশ এই সকল কারণেই পরবর্ত্তীকালে সাধারণভাবে সন্ধান, সমাধান ইত্যাদি অর্থে অর্থান্তরিত হইয়াছে।

ঠাকুর বলিতে আমরা দেবতা ও রন্ধনকারী দুই-ই বুঝিয়া থাকি। আসলে ঠাকুর দেব-বিজ্ঞাপক হইলেও পরে উহা সম্মানার্থে ব্যবহার হইতে থাকাকালে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যেও ইহার প্রয়োগ ঘটিত। পাচক নির্ব্বাচনকালে হিন্দুগণ স্বজাতীয় অথবা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। ইহার ফলে ব্রাহ্মণঠাকুর পাচক নিযুক্ত হইলে মাত্র ঠাকুর নামে অভিহিত হইয়া ঠাকুর শব্দটীকে স্থান-

বিশেষে পাচক-জ্ঞাপক করিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর-বিহারে সম-অর্থে 'বাবাজী' শব্দ ব্যবহৃত হয়, উহার ইতিহাসও প্রায় একই প্রকার।

ভয়ঙ্কর, ভয়ানক প্রভৃতি শব্দে ভীতির ভাব রহিয়াছে। সুতরাং ব্যাকরণগত বিচারে ভয়ানক বা ভয়ঙ্কর আনন্দ অসিদ্ধ। কিন্তু সাধারণে ভয়ানক বা ভয়ঙ্কর শব্দ 'অত্যন্ত' অর্থে গ্রহণ করিয়াছে ও নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে 'ভয়ানক আনন্দ' উপভোগ করিতেছে।

প্রাচীনকালে 'ইতর' শব্দের অর্থ বর্ত্তমান অর্থ হইতে পৃথক ছিল। ইহার অর্থ ছিল ভিন্ন বা অপর। ব্রাহ্মণেতর জাতির অর্থ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ ইতর জাতি—ইহা নহে। এতদস্থলে ইতর শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতি। আসলে ইতর শব্দের অর্থ আপেক্ষিক। অপর বা ভিন্নতা জ্ঞাপক এই ইতর শব্দের সাহায্যে, ক্রমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ জ্ঞাপনের ফলেই ইতর শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে সমাজের নিম্নশ্রেণীর বা নিম্ন স্তরের জীব। বিশেষণ পদের 'ইতরামি' ত নীরবেই সহ্য করিতে হইতেছে।

'ইতিহাস' শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ—যাহাতে পরম্পরাগত উপদেশ রহিয়াছে। পুরাকাহিনী বিবৃত করিয়া তাহার সাহায্যেও প্রাচীনকালে উপদেশাদি দেওয়া হইত। তৎকালে পুরাকাহিনী ছিল উপায় মাত্র, উপদেশই ছিল উপেয়; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে পুরাকাহিনীকেই আমরা ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, উপদেশ আর মুখ্য নহে।

'মৃগ' শব্দ এককালে সাধারণ অর্থে যে কোন পশু বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। সিংহকে মৃগরাজ নামে অভিহিত করা হয়। এতদস্থলে মৃগ প্রাচীন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কেন না, মৃগরাজ শব্দের অর্থ পশুদিগের রাজা। বর্ত্তমানে মৃগ শব্দের অর্থ—হরিণ। সিংহ নিশ্চয়ই মাত্র হরিণদিগের রাজা নহে। শাখামৃগ শব্দের অর্থও বৃক্ষশাখায় বিচরণকারী হরিণ নহে। এতদস্থলেও মৃগ সাধারণ ভাবে পশু অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কালক্রমে মৃগ সাধারণ অর্থ হারাইয়া বিশিষ্টার্থে হরিণ জ্ঞাপক শব্দে পরিণত হইয়াছে।

'মৃগয়া' সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। "লুব্ধকাৎ গীতলোভেন মৃগো মৃগয়তে বধম্"—ইহাতে মৃগয়া শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই পশু হনন বা পশু অন্বেষণ নহে। এই স্থলে ইহার অর্থ সাধারণভাবে অন্বেষণ। পরে মৃগ শব্দের ন্যায় মৃগয়া শব্দও বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে লিখিবার কালী যে একমাত্র কৃষ্ণ বর্ণই ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এই 'কালী' শব্দ হইতে। 'কালী' শব্দের অর্থই হইতেছে কৃষ্ণবর্ণ। পরে কালী শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে ও লিখিবার যে কোনও রং এই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। সেই কারণেই কালী শব্দের পূর্ব্বে বর্ণজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগ বর্ত্তমানে করিতে হয়, যথা—লাল কালী, কালো কালী, সবুজ কালী ইত্যাদি। পশ্চিম ভারতের 'সিয়াই' শব্দের পশ্চাতেও একই ইতিহাস রহিয়াছে।

পূর্ব্বকালে 'দ্রব্য' শব্দ দ্বারা একমাত্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত বস্তুই বুঝাইত, বর্ত্তমানে যে কোন বস্তু বুঝায়। এতৎ সম্পর্কে আমরা দ্রব্য শব্দটীকেই প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে পারি। √দ্রু হইতে দ্রব্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই √দ্রু-র অর্থ বৃক্ষ (দ্রুম), কাষ্ঠ (দারু) ইত্যাদি সম্পর্কিত। সুতরাং দ্রব্য শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ হইতেছে কাষ্ঠজাত।

গেঁয়ার গোবিন্দের সংস্পর্শে হয়ত অনেকেই আসিয়াছেন ও নিঃসঙ্কোচে অনেকেই অপর পক্ষীয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভৃতি একগুঁয়েমির জন্য সেই ব্যক্তিকে গেঁয়ার আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, তা সে ব্যক্তি কলিকাতা শহরেরই অথবা ভারতের রাজধানী দিল্লী শহরের অধিবাসীই হউন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে কিন্তু শহরবাসীর সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। কেন না, গেঁয়ার শব্দের মূল অর্থ গ্রামবাসী। তবে নগরবাসীর চক্ষে গ্রামবাসীগণ চিরকালই—সভ্যতা-ভব্যতা, শিক্ষা-দীক্ষায়, বুদ্ধিতে, তুলনামূলকভাবে নগরবাসিগণ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ক্রমে এই শব্দ উক্ত গ্রামবাসিগণের সদৃশ সভ্যতা ইত্যাদিতে পশ্চাৎপদ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে থাকে ও পরিশেষে ইহা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভৃত একগুঁয়েমি জ্ঞাপক বা তুচ্ছার্থক হইয়া পড়ে।

ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে 'নাগরী' শব্দে। নাগরী শব্দের মূল অর্থ নগরের রমণী। গ্রামবাসিগণকে যেরূপ নগরবাসিগণ হেয় জ্ঞান করিত ও গেঁয়ার বা গাঁওয়ার নামে অভিহিত করিত, গ্রামবাসিগণও সেইরূপ লাস্যময়ী নগররমণীকে সুচক্ষে দেখিতে পারে নাই এবং তাহাদিগকে 'নাগরী' নামে অভিহিত করিয়াছে। নাগরী শব্দের প্রথম দিকে কোনও কিছু আপত্তিজনক না থাকিলেও পরে লাস্যময়ী নগররমণীই বুঝাইয়াছে ও তাহারও পরে সাধারণ ভাবে যে-কোন লাস্যময়ীকে বুঝাইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা কদর্থেই ব্যবহৃত হয়। আরবী 'কসবী' শব্দের অর্থও এইরূপে আসিয়াছে; ইহার মূল কসব্-"নগর।"

'পিরীত' শব্দও কদর্থে বা শ্লেষাত্মক অর্থে পরিণত হইয়াছে। প্রীতির অপব্যবহার ও উক্ত শব্দের অতিরিক্ত লৌকিক ব্যবহারের পরিণতি হইতেছে পিরীত।

শ্রী, শ্রীব্ বা শ্লীল শব্দের আদি অর্থ হইতেছে সুন্দর। সুতরাং অশ্লীল অর্থে হয় অসুন্দর। যাহা অসুন্দর তাহাই কদ্। এইভাবে বহু কদ্-এর একটী দিকমাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া বর্ত্তমানে অশ্লীল শব্দের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঘটিতেছে।

'অধঃ' শব্দের অর্থ নিম্নদেশ। সুতরাং নিম্নোষ্ঠ বুঝাইতে অধরোষ্ঠ বলিতে হইত। পরে মাত্র অধর শব্দের দ্বারাই নিম্নোষ্ঠ জ্ঞাপন করিতে পারা যাইত। বর্ত্তমানে কিন্তু কোনও বিশেষ ওষ্ঠ জ্ঞাপন করিতে অধরের ব্যবহার ঘটে না।

'ওষ্ঠ' শব্দের স্থলেও এইরূপ ঘটিয়াছে। ওষ্ঠ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য—"উপরের ঠোঁট"। বর্ত্তমানে ওষ্ঠ শব্দের ব্যবহার কালে নিম্নোষ্ঠ বা উপরোষ্ঠের পার্থক্য জ্ঞান থাকে না। ফলে বর্ত্তমান যুগের উপন্যাসের নায়ক, নায়িকার 'ওষ্ঠদ্বয়ে'ই চুম্বন করেন।

'পরিবার' অর্থে সমগ্র সংসার, যথা—একান্নবর্ত্তী পরিবার। কিন্তু আমাদিগের মধ্য হইতে পূর্ব্বের মনোভাব চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব্বের সমাজ-ব্যবস্থাও বাতিল হইতেছে। সকলেই আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে ব্যস্ত। সংসারে যাহারা অনাবশ্যক তাহারা ক্রমেই অপসৃত হইতেছে। ক্রমেই সংসারের বৃহত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে। উপরি উক্ত বিবিধ কারণে ও পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদিগের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ

জাগরূক হওয়ার ফলে সংসারের গণ্ডী ছোট করিতে করিতে পারিবারিক জীবনে, একমাত্র স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়াই সংসার করিতে হইতেছে। এমত পরিস্থিতিতে যে ক্রমেই পরিবার শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া শেষে মাত্র স্ত্রীকেই (যথা—অমুকের পরিবার বড় দজ্জাল) বুঝাইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে !

'সংসার' সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছে। 'সংসারে কে কার ?' বা 'সংসার মায়াময়'—ইত্যাদিতে যে অর্থে সংসার শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, "আপনার কয় সংসার ?" ইহাতেও উক্ত শব্দ সেই অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে কি ?

পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা—যাহাকেই হউক না কেন, জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কার্য্য করিতে হইবে ইহা জ্ঞাপন করিতে হইলে তৃতীয় পক্ষকে তাহা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়। কিন্তু স্ত্রীর সহিত পরামর্শের কালে বলিতে হয়—"একবার বাড়ীতে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি"—সুতরাং 'বাড়ী' শব্দও স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। পরিবার বা সংসার শব্দের অর্থান্তরের পশ্চাতে যে মনোভাব বা ইতিহাস রহিয়াছে বাড়ী শব্দের অর্থান্তরে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। (তুলনীয়ঃ—ন গৃহম্ গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।)

'আমীন' শব্দের মূল অর্থ—যাহাকে বিশ্বাস করা যায় (Trustee) বা রাজার বিশ্বস্ত বা খাস কর্ম্মচারী। জায়গা জমি সম্বন্ধে তদন্তের ভার অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর হস্তেই ন্যস্ত হইত। পরে সেই হইতে Settlement officer বা জায়গা-জমি মাপ-জোখকারী রাজকীয় অথবা জমিদারী সেরেস্তার জরিপ সংক্রান্ত কর্ম্মচারী মাত্রকেই আমীন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

'চির' শব্দের পূর্ব্বার্থ ছিল বহু বা দীর্ঘ। 'চিরাচরিত' শব্দের পূর্ব্বার্থ বহুদিন বা দীর্ঘকাল হইতে আচরিত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থে ধরিলে ইহার অর্থ হইবে সৃষ্টির আদি হইতেই আচরিত। "চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর" এতদস্থলে 'চির' পূর্ব্বার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ও এতদ্বারা বহুদিন পরে যে মাধব পুনরায় শ্রীরাধার আলয়ে আসিয়াছেন, তাহাই বলা হইয়াছে।

'নাস্তিক' শব্দ যে ব্যক্তি বেদ মানে না তাহার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত। বেদ হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি সুতরাং পরবর্ত্তী কালে যে বেদ মানে না অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্ম্ম মানে না সে ঈশ্বরকেও মানে না—ইহা ধরিয়া লইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীকে নাস্তিক বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে নাস্তিক শব্দের অধিকতর ব্যাপক অর্থও দৃষ্ট হয়। হিন্দুর দেশাচারের সহিত তাহার ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সংযোগসূত্র বর্ত্তমান, এই হইতে দেশাচার-বিরোধীকেও নাস্তিকরূপে অভিহিত করিতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করেন না।

শব্দবিজ্ঞানের আলোচনায় ঐতিহাসিকও কম উপকৃত হয়েন না।

মিশর দেশকে আরবী ভাষায় মুশর্ বা মিশর্ বলা হইত। এই মিশর্ বা মুশর্ হইতেই পরবর্ত্তীকালে মিশরী বা মিশ্রী বা মিছরী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এককালে আরব দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যগত যোগসূত্র ছিল এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে পারি "মিছরী" প্রস্তুত-প্রণালী ভারতবর্ষীয়গণের পূর্ব্বেও মিশরবাসীগণ জানিত। মিশ্রী শব্দের ব্যবহার ঘটিয়াছে, মিশরে প্রস্তুত অথবা মিশরীয় প্রণালী অনুসরণে প্রস্তুত—এই অর্থে।

আমরা গ্রন্থকে পুঁথি বা পুথি বলিয়া থাকি। আসলে পুস্তক হইতেই পুথি (পুঁথি) শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু যদ্যপি আমরা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব এই পুস্তক শব্দে একটী বিশেষ রহস্য রহিয়াছে। ভারতীয় শব্দ পুস্তক ও মধ্যযুগের পারসীক ভাষার 'পোস্ত'—এতদুভয়ের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। 'পোস্ত' শব্দের অর্থ মধ্য পারসিক ভাষায়—চর্ম্ম। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, চামড়ার উপর লেখনী চালনা করিয়া গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি আমরা ভিন্নদেশীয়গণের নিকটই শিক্ষা করিয়াছি।

গ্রন্থ শব্দটাই বা হইল কিরূপে ? আমরা গ্রন্থি শব্দটার সহিত সকলেই পরিচিত। গ্রন্থ্ + অ—এইভাবে গ্রন্থ শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ যাহাকে গ্রথিত করা হয়। পূর্ব্বকালে পত্রাদিতে বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করিয়া মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া অথবা ছিদ্রাদি না করিয়াও সূত্রবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এই প্রথাই গ্রন্থ শব্দ, পুস্তক (ব্যাপক অর্থে) অর্থে প্রযুক্ত হইবার কারণ।

পুস্তক ও গ্রন্থ উভয় শব্দই বিশিষ্টার্থ হইতে সাধারণ অর্থে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে 'হোরা' শব্দের ব্যবহার পাই, যথা—'হোরা চক্র', 'হোরা বিজ্ঞান' ইত্যাদি। ইহার অর্থ লগ্নের অর্দ্ধভাগ। রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ, অতএব হোরার পরিমাণ ১৫ অংশ। এই হোরা শব্দটী ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে পারিভাষিক শব্দ-হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও মূলে উহা গ্রীক্ হইতে সংগৃহীত। গ্রীক্ ভাষায় এই হোরা শব্দের অর্থ ঘণ্টা। এই তথ্যের আবিষ্কারের ফলে, আমরা যে কেবলমাত্র 'হোরা' শব্দটীর সম্বন্ধেই জ্ঞানলাভ করিলাম তাহা নহে, গ্রীক্‌দিগের নিকট আমাদিগের জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের ঋণ সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞাত হইলাম।

অনেকে হয়ত বলিবেন ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অপরের নিকট ঋণী নহে, উহা ভারতের নিজস্ব। কিন্তু মাত্র 'রোমক-বিজ্ঞান' এই যৌগিক শব্দটীর দ্বারাই তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করা যায়। রোমকদিগের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা না থাকিলে, তাহাদিগের দ্বারা উক্ত শাস্ত্রের উন্নতি ঘটিয়া না থাকিলে এবং তাঁহাদিগের নিকট ভারতীয়গণের ঋণ না থাকিলে ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্রের নাম কোনও কারণেই 'রোমক-বিজ্ঞান' হইত না।

'গ্রাম'। ঋক্‌বেদে গ্রামঃ শব্দের অর্থ বিচরণমান গোষ্ঠী। আধুনিক অর্থে অর্থাৎ—বহু পরিবারের সীমানির্দ্দিষ্ট বাসস্থান অর্থে, ইহার ব্যবহার পরবর্ত্তীকালে ঘটিয়াছে। ইহা হইতেও আমরা একটী ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাই। আদিতে আর্য্যজাতির লোকেরা দল গঠন করিয়া বিচরণ করিত। সেই সময়ে আদি অর্থে গ্রাম শব্দটী ব্যবহৃত হইত। পরে এই আর্য্যজাতি এক এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল এবং তৎকাল হইতে তাহাদিগের একাধিক পরিবারের দলবদ্ধভাবে বসবাসের স্থানের নাম হইল গ্রাম।

শব্দের অর্থান্তরের বিশেষ ধারা আছে। যথেচ্ছভাবে একটী শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটে না। সাধারণত এক ভাষার শব্দ অপর ভাষায় বিকৃত অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ভাষার মধ্যে থাকিয়া শব্দের যে অর্থবিকৃতি বা অর্থ পরিবর্ত্তন, উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি, সাধারণত উহা অজ্ঞতাপ্রসূত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দটী আলঙ্কারিক ভাবে ব্যবহৃত হইতে হইতে একটী বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে। কখনও বা বিশিষ্ট অর্থ হইতে সাধারণ অর্থ কিম্বা সাধারণ অর্থ হইতে বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে। দেশাচার বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনও অর্থান্তরের কারণ ঘটাইয়া থাকে। বহুস্থলেই আপাত-দৃষ্টিতে, শব্দ যে অর্থ সাধারণভাবে প্রকাশ করে, উহার অর্থ তাহা নয়। পীতাম্বর শব্দের অর্থ—যিনি পীতবস্ত্র পরিধান করেন। কিন্তু পীতবস্ত্র পরিধানে থাকিলেই পীতাম্বর বলা চলে না। তদ্রূপ পঙ্কে জন্মগ্রহণ করিলেই পঙ্কজ বলা হয় না। পঙ্কজের বিশেষ অর্থ আছে।

বহুস্থলেই শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থ-ব্যাখ্যায় লক্ষণাবৃত্তির অবলম্বন ত অতি সাধারণ ব্যাপার !

শিল্পজগতে মনোবিদ্যার স্থান

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায় এম-এস্ সি

জড়জগতে নির্জ্জীব বস্তু লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপ্রাণ ও ঐকান্তিক গবেষণার ফলে যে বহু সারগর্ভ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা কে না স্বীকার করিবে? বিজ্ঞানের এই দানের কথা ভাবিলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। শুধু জড়জগতে কেন, প্রাণীজগতেও নানা অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। জড় ও প্রাণীবস্তুর সমন্বয়েই বিশ্বজগতের সংগঠন। দুই ক্ষেত্রেই, বিজ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপকতা ও উন্নতি পৃথিবীতে এমন পরিবর্ত্তন আনিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগকে এক কথায় বৈজ্ঞানিক যুগ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই উন্নতি ও ব্যাপকতার ফলে বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক শাখা নিজ নিজ উদ্ভাবিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তাহাদের কার্য্যকারিতা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে একান্তই অপরিহার্য্য তাহার প্রমাণ দিতেছে। শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের ব্যাপারে বিজ্ঞানের দান যে অসীম তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি। বিজ্ঞান মানুষের মনে জাগাইয়াছে আত্মসংবিৎ (Self-Consciousness), সৃষ্টি করিয়াছে নব নব আকাঙ্ক্ষার, এখন আর অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নাই। বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ না করিয়া যে কোন কিছুর সত্যতা বা যাথার্থ্য প্রমাণ করা যাইতে পারে, তাহা মানিয়া লইতে আমরা আজকাল বাধা অনুভব করি। শিল্পজগতের (industrial world) একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কি ভাবে তাহার সত্তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশ যাহাতে সকল বিষয়ে সমৃদ্ধশালী হয় এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত নানারূপ প্রতিযোগিতা ব্যাপারে যাহাতে সমকক্ষ হইতে পারে, সে বিষয়ে দেশহিতাকাঙ্ক্ষীরা বর্ত্তমানে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। মনোযোগের ফলে তাঁহারা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যে, শিল্পের (industry) সর্ব্বতোভাবে উন্নতি না হইলে দেশকে আর্থিক, রাষ্ট্রিক কোন ব্যাপারেই উন্নত করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত জনসাধারণের মনে বিশেষ সাড়া আনিয়াছে এবং শিল্পের উন্নতিকল্পে তাহাদের সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই চেষ্টা সফল হওয়ার প্রধান অবলম্বন যে বিজ্ঞানের বিভিন্নশাখার সাহচর্য্য তাহা সকলে অনুভব করিতেছেন। বিজ্ঞানের শাখা বলিলেই সাধারণত আমরা পদার্থবিজ্ঞান (Physics), রসায়ন বিদ্যা (Chemistry), যন্ত্রবিদ্যা (Engineering) প্রভৃতির কথাই প্রথম মনে করি। কার্য্যক্ষেত্রেও এই সকল শাখারই প্রয়োগ আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই। শিল্পজগতে এই সকল শাখার দান কেবল অসীম নয় অপরিহার্য্যও বটে, কিন্তু শিল্পব্যাপারে আমরা যদি একমাত্র ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার অপরিহার্য্য দান যদি কাজে না লাগাই, তাহা হইলে শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ উন্নতি যে সম্ভব নহে, তাহা এখনই বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রত্যেক শিল্পকেন্দ্রের (industrial organisation) প্রধান উপাদান কর্ম্মচারী ও নানাজাতীয় অমার্জ্জিত দ্রব্য ('কাঁচা মাল', raw materials). কর্ম্মচারীরা তাহাদের পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দ্বারা বিভিন্ন যন্ত্র ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অমার্জ্জিত দ্রব্যগুলিকে শিল্পজাতদ্রব্যে পরিণত করে। শিল্পকেন্দ্রের স্বত্বাধিকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, যাহাতে লঘিষ্ঠ পরিশ্রমের দ্বারা শিল্পজাত দ্রব্যাদি গরিষ্ঠ পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া তাঁহারা লাভবান হইতে পারেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা নানারূপ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালীর প্রধান ভিত্তি বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতি বটে, কিন্তু সেগুলির প্রয়োগ বেশীর ভাগ সময়ে অমার্জ্জিত দ্রব্যের গণ্ডীতেই যে সীমাবদ্ধ তাহা আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন। অমার্জ্জিত দ্রব্য যাহাতে সুলভে অথচ অল্প সময়ে অভীপ্সিত দ্রব্যাদিতে পরিণত করিতে পারা যায় তাহার জন্য নিত্য নূতন যন্ত্র ও বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর আবিষ্কার এবং আহরণের দিকে সবিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শিল্পজগতে উপাদানের মধ্যে অমার্জ্জিত দ্রব্য ভিন্ন, মানুষ অর্থাৎ কর্ম্মচারীদের ও যে বিশেষ একটি স্থান আছে সে বিষয়ে অধিকাংশ সময়ে কোন মনোযোগই দেওয়া হয় না। দ্রব্য বিষয়ে যেরূপ নজর দেওয়া

হয়, কর্ম্মচারীদের প্রতিও অনুরূপ নজর না দিলে আশানুযায়ী ফল পাওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এই কর্ম্মচারী সম্বন্ধেই আমি এইবার আলোচনা করিব।

আমরা সকলেই জানি মানুষের পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে। ইহা যে কেবল দেহের ব্যাপারে খাটে তাহা নহে, মনের গঠনের বেলাতেও তাহা অনুরূপ সত্য। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে যেমন দেহের সংগঠন, মনেরও সেইরূপ কতকগুলি অবয়ব আছে, যথা—বুদ্ধি (intelligence), বিভিন্ন বিষয়ে সামর্থ্য (Special abilities), মেজাজ (temperament), প্রক্ষোভ (emotion) প্রভৃতি। একজন যে আর একজন অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান, কাহারও মেজাজ রুক্ষ কাহারও ঠাণ্ডা, কেহ ভাল বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারে অপরে পারে না, দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ অনৈক্যের পরিচয় আমরা প্রচুর পাইয়া থাকি। চেষ্টা বা অভ্যাস করিলেই যে সকল সময়ে অভিপ্রেত মানসিক গুণ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা যাইবে, এইরূপ ধারণার অযৌক্তিকতার প্রমাণ বৈজ্ঞানিকগণ দিয়াছেন এবং আমরা তাহা মানিয়া লই। মানুষের কাজ করিবার পদ্ধতি, ক্ষমতা বা প্রবণতা, এই সকল মানসিক গুণাবলীর উপর নির্ভর করে এবং ব্যক্তিবিশেষ কোন বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিবে তাহার সীমা নির্দ্দেশ ইহারাই করিয়া দেয়।

কর্ম্মশীলতা যেরূপ ভিন্নপ্রকারের কর্ম্মক্ষেত্রও সেইরূপ। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য আমরা কোন না কোন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করিয়া থাকি। বিভিন্ন বৃত্তিতে যে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক গুণাবলীর প্রয়োজন হয় তাহা আমরা মোটামুটি কতকটা জানি এবং স্বীকারও করি। একজন মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর বিন্যাসকের (compositor) বুদ্ধি একজন সংবাদ-পত্র-পরিচালকের (journalist) বুদ্ধি অপেক্ষা যে কম হইলেও চলে তাহা মানিয়া লইতে কেহই আপত্তি করিবেন না। সেইরূপ ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃতি বৃত্তিতে সাফল্যলাভ করিতে হইলে, বিভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন মানসিক গুণাবলীর যে প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহার যথাযথ প্রমাণ দিয়াছেন। স্বাধীন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও শিল্পকেন্দ্রে নানাপ্রকার বৃত্তির সংস্থান পরিলক্ষিত হয়। যেমন, নক্সানবিসী (draftsmanship), কেরাণীগিরি, কারিকরের কার্য্য (mechanic's work), ইঞ্জিনীয়ারিং বৃত্তি প্রভৃতি আরও অনেক। আজকাল কয়েকজন খ্যাতনামা মনোবিদ্ বৃত্তির সহিত মানসিক গুণাবলীর যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের গবেষণার ফলে মনোবিদ্যার যে বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে 'বৃত্তীয় মনোবিদ্যা' (Vocational psychology) বলা যাইতে পারে।

সকল ব্যক্তি সকল প্রকার বৃত্তির জন্য উপযুক্ত নহে। তাহার কারণ বৃত্তিবিশেষে সফলকাম হইতে হইলে যে সকল মানসিক গুণাবলী যে মাত্রায় প্রয়োজন হয়, ঠিক সেই গুণাবলী সেই মাত্রায় সকল ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। অথবা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে যে সকল মানসিক গুণাবলী যে মাত্রায় আছে, তাহা সকল বৃত্তিতে সাফল্য আনয়ন করিবার মত সমান উপযোগী নহে। শুধু এই বলিয়াই মনোবিদ্গণ ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, কিরূপভাবে অগ্রসর হইলে বা কি প্রণালী অবলম্বন করিলে বৃত্তিবিশেষের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। মনোবিদ্গণের এই দাবী অনেকের নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা পাশ্চাত্যদেশে এই দাবীর সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী বৃত্তি বা ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচন যে অসম্ভব তাহা নহে।

বৃত্তিবিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত না হইলে যে বহুদিক দিয়া ক্ষতি হয়, একথা বলাই বাহুল্য। ব্যক্তিবিশেষ অনুপযুক্ত বৃত্তিতে নিযুক্ত হইলে তাহার মানসিক গুণাবলী সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না এবং ইহার ফলে সে ভোগ করে তীব্র মানসিক অশান্তি। একজন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যন্ত্রের ন্যায় কাজ করাইলে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা অল্পেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কোন প্রতিষ্ঠানে এইরূপ অনুপযুক্ত ব্যক্তি (misfit) থাকিলে, নিয়োক্তার (employer) ক্ষতিও সামান্য নহে। কারণ ব্যক্তিটির মানসিক গুণাবলীর যদি সমুচিত ব্যবহার (utilisation) না-ই হইল, তাহা হইলে তাহার নিকট আশানুরূপ ফল পাওয়া দুরাশা নহে কি? এ বিষয়ে আমি শিল্পকেন্দ্রের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিয়োক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ব্যক্তি বা বৃত্তি-

স্বাতন্ত্র্য ব্যাপারের দিকে উপযুক্ত মনোযোগ না দিলে 'লঘিষ্ঠ পরিশ্রমে গরিষ্ঠ উৎপাদন (output) তাঁহাদের এই মন্ত্র কখনই ফলপ্রসূ হইবে না। মনোবিদগণ দেখাইয়াছেন শিল্পকেন্দ্রের আরও অনেক ব্যাপার আছে যাহাদের সহিত উৎপাদনের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। আমি একে একে সেই সকল বিষয়ের মোটামুটি আভাস দিব।

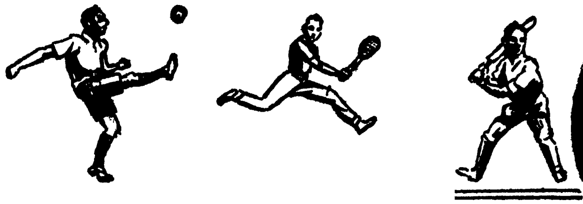
উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়ন্ত্রণের পরেই শিল্পকেন্দ্রের বিভিন্ন কার্য্যপ্রণালীর সঠিক বিন্যাসের (layout) উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। নানাপ্রকার গতির (movement) মধ্য দিয়াই যে প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা আমরা জানি। বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদনে দৈহিক বা মানসিক যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহার নাম পরিশ্রম। এই পরিশ্রমের সহিত গতির সম্বন্ধ অতি নিকট, কারণ গতির প্রকার ও মাত্রা (quality and quantity) ভেদে পরিশ্রমের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। কি ভাবে গতি নিয়ন্ত্রণ করিলে স্বল্প পরিশ্রম হয় তাহা ঠিক করা মোটেই অসম্ভব নহে। কেবল গতিনিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দিলে চলিবে না, কি করিয়া অপ্রয়োজনীয় ক্লান্তি দূর করা যাইতে পারে সেদিকেও মনোযোগ দিতে হইবে। পরিশ্রম করিলেই ক্লান্তি আসে, কিন্তু বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলে পরিশ্রম সত্ত্বেও ক্লান্তি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে! গতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেখা যায় উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবন করিলে বা কার্য্যকাল (working period) কমাইয়া দিলে বা কার্য্যকালের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বিরামের (rest) ব্যবস্থা করিলে ক্লান্তির মাত্রা বিশেষ পরিমাণে উপশম করা যায়।

কর্ম্মচারীদের কথা বলিলাম, কার্য্যপ্রণালীর বিন্যাসের কথা বলা হইল, ইহার পর বলিতে হয়—কর্ম্মক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী প্রীতিজনক না হইলে নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। আবেষ্টনীর উন্নতিসাধন করিতে গেলে, মোটামুটি তিনটি লক্ষণের (factor) উপর মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। প্রথম, স্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত আলোর আয়োজন। কার্য্যের সময়ে অপ্রচুর বা অত্যধিক আলো কর্ম্মচারীদের চক্ষুর পক্ষে যথেষ্টই পীড়াজনক। দ্বিতীয়, কাজ করিবার ঘরে যথাযোগ্য বায়ুচলাচলের (ventilation) ব্যবস্থা না থাকিলে, আশানুরূপ পরিশ্রম করিতে পারা যায় না, অল্পেই ক্লান্তি আসিয়া পড়ে। তৃতীয়, যদি কাজ করিবার ঘরে কোন একটি যন্ত্র হইতে বা অন্য কোন কারণে উচ্চ শব্দ উত্থিত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মচারীদের কার্য্যে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে। শব্দের ফলে অনেকে তাহাদের কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগ দিতে পারে না।

তাহার পর দুর্ঘটনার (accident) কথা। নানাপ্রকার লঘু ও গুরু দুর্ঘটনার ফলে যে কতলোক হত বা আহত হয়, কত অর্থ নষ্ট এবং বিভিন্ন দিক দিয়া ক্ষতি হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য সাধারণত যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তাহা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, ব্যক্তিবিশেষের দুর্ঘটনার দিকে প্রবণতাই (proneness) দুর্ঘটনার মূল কারণ। এই সকল দুর্ঘটনা-প্রবণ (accident-prone) ব্যক্তিকে বিপদসঙ্কুল স্থানে কাজ করিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। ইহা ব্যতীত, ক্রয়বিক্রয়, ধর্ম্মঘট-নিবারণ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার সমাধানে বা তাহার চেষ্টায় মনোবিদ্‌গণ তাঁহাদের বিজ্ঞানের বিশেষ কার্য্যকারিতার প্রমাণ দিয়াছেন।

মনোবিদ্যার যে বিভাগ শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহের সমাধান ব্যাপার লইয়া আলোচনা করে, তাহার নাম শিল্পীয় মনোবিদ্যা (Industrial psychology)। শিল্পকেন্দ্রের যে সকল সমস্যার কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম, বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সেগুলির যে সমাধান হইতে পারে, তাহা আশা করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিল্পোন্নতির ব্যাপারে অন্যান্য শাখার ন্যায় বিজ্ঞানের এই শাখাবিশেষটির দান নিতান্ত অগ্রাহ্যের বিষয় নহে। শিল্পসম্বন্ধীয় ব্যাপারের সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উন্নতির দিকে যাঁহারা মনোযোগী, তাঁহাদের আমি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খেলা-ধূলা





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল লীগ ঃ

আই এফ এ পরিচালিত ক'লকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। প্রথম বিভাগের লীগের তালিকায় মহমেডান দল প্রথম স্থান এখনও অধিকার ক'রে আছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে এ পর্য্যন্ত তারা কোন দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নি। লীগে এখনও তাদের ৪টা খেলা বাকি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ইষ্টবেঙ্গল, রেঞ্জার্স এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে খেলা। খেলায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিরল নয়, তবে সেরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্যে পড়ে মহমেডান দলকে যে তাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে প্রবল বেগ পেতে হবে এরকম কোন আভষ আমরা পাই না। ভাগ্যলক্ষ্মীও তাদের উপর সুপ্রসন্ন; সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে তাদের বহুবার সহায়তাও করেছে। ১৯৩৪ সালে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার পর থেকে কয়েক বৎসর মহমেডান দলের যে ক্রীড়া চাতুর্য্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি এই বৎসরের খেলায় ততখানি আর পাওয়া যায় না। সে সময়ে যে সব খেলোয়াড়দের শক্তি নিয়ে দল গঠন করা হয়েছিল তাঁদের অনেকেই আজ প্রবীণ, তারুণ্যের সে শক্তি আজ লোপ পেয়েছে, অনেকে আবার দল পরিত্যাগ ক'রে অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, দলবদ্ধভাবে বিপক্ষদলের গোলে হানা দিয়ে খেলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভের যে উদ্দাম চেষ্টা তা এতটুকু কমে নি। প্রত্যেক খেলোয়াড়টি তেমনিভাবে প্রাণ দিয়ে খেলে যায়, পূর্ব্বের ক্রীড়াচাতুর্য্য হ্রাস পেয়েছে—কিন্তু বিপক্ষদলের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয় না। বর্ত্তমানে ক'লকাতার ফুটবল দলগুলির খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেকখানি নিম্নস্তরে নেমেছে, সেই সঙ্গে খেলায় জয় লাভের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাও লোপ পেয়েছে। একমাত্র মহমেডানদলকে এ পংক্তিতে ফেলা যায় না। ক'লকাতার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে পর্য্যায়ক্রমে পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়ে ইতিপূর্ব্বে মহমেডান দল ফুটবল খেলার ইতিহাসে যুগান্তর এনেছিল। এরপর ভারতীয়দিগের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ডুরাণ্ড এবং রোভার্স কাপে বিজয়ী হওয়ায় তাদের সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফুটবল খেলায় গৌরবের এ ইতিহাস বহুদিন থেকে যাবে।



লীগের চ্যারিটি ম্যাচে মোহনবাগান বনাম মহমেডান দলের খেলার একটি দৃশ্য ফটো—এইচ এস

বর্ত্তমান বৎসরের লীগ খেলায় মহমেডান দল সব থেকে বেশী ৭—০ গোলে কালীঘাটকে পরাজিত করেছিল।

নিজেদের বোঝাপড়া ভুলের জন্যই কালীঘাটের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। একজন ব্যাক খেলার প্রথম দিকেই আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করে। সে স্থান পূরণ না ক'রে একজন ব্যাক দিয়েই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রক্ষণভাগ খেলান হয়। সমস্ত দলটি সেদিন নিজেদের উপর আস্থা হারিয়েছিল। লীগের প্রথমার্দ্ধে মহমেডান ১—০ গোলে চ্যারিটি ম্যাচে মোহনবাগানকে পরাজিত করে। খেলা বিরতির চার মিনিট পূর্ব্বে তেজ মহম্মদ গোল করেন। টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিপুল দর্শকসমাগম হয়। এ বৎসরের আর কোন লীগের খেলায় এত অধিক সংখ্যক দর্শক যোগদান করেনি। টিকিটের মূল্য উঠেছিল ১৫,৯১৯ টাকা। বর্ত্তমান বৎসরের ফুটবল লীগ খেলা দেখে দর্শকেরা একরকম হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ঐ দিনে এই

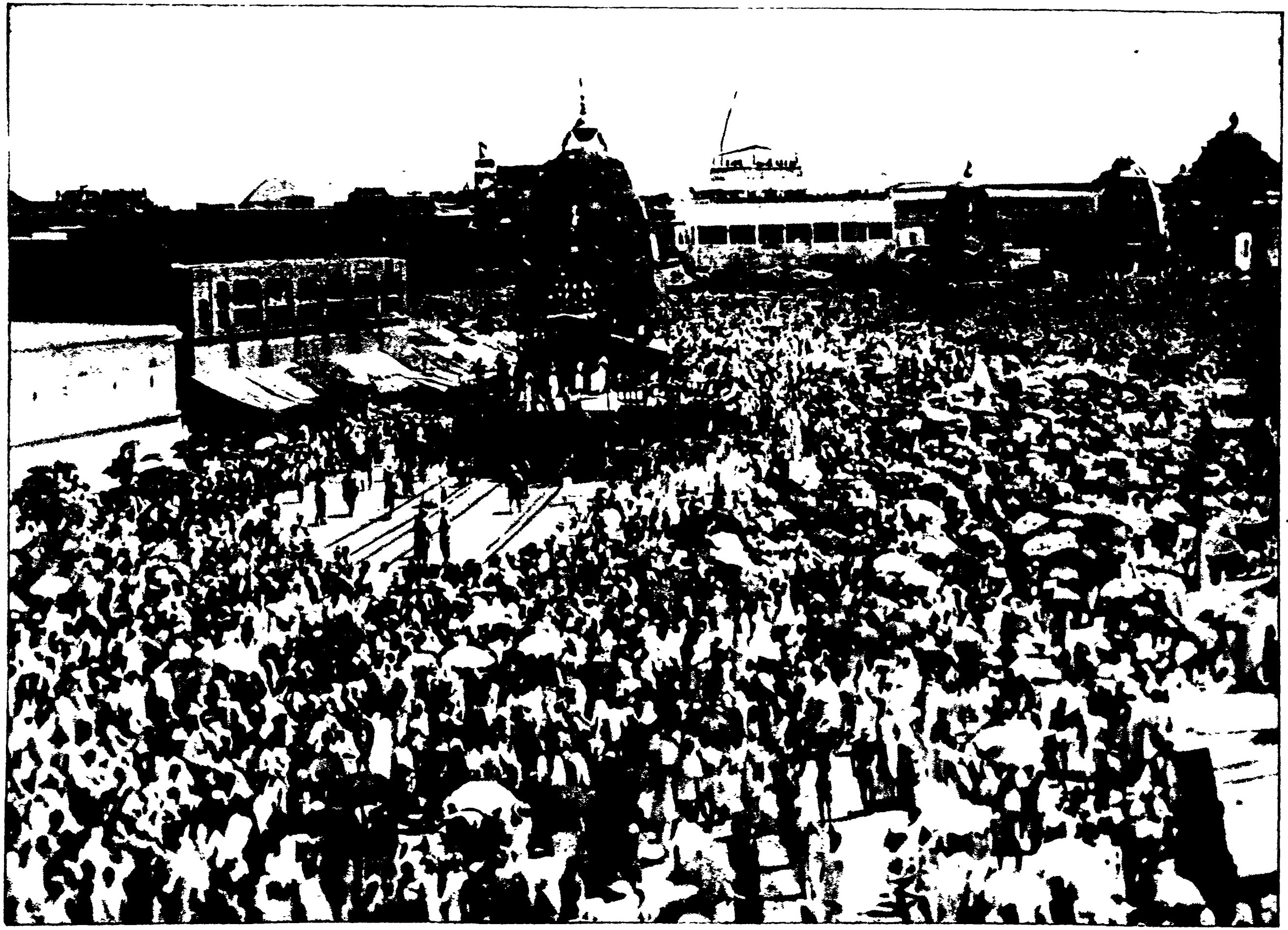


ডি ব্যানার্জি জি কার্ভে

দু'টী পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিজয়ীর সম্মান লাভের জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে প্রথম শ্রেণীর খেলার পরিচয় দিয়েছিল। মাঠের অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও খেলার গতি খুব দ্রুত হ'য়েছিল, গোলের সম্মুখে বলের উপস্থিতি যেমন একদলকে উৎসাহিত করছিল অপর দলকে তেমনি আত্মরক্ষায় বিব্রত ক'রে তুলেছিল। যে পর্য্যন্ত না নিরাপদ স্থানে বলের গতি ফিরেছে সে পর্য্যন্ত দলের সমর্থকেরা সাময়িক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পান নি। মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রাই গোল করবার বেশী সুযোগ পায়। অমিয় ভট্টাচার্য্যের দু'টী দর্শনীয় 'হেড' দুর্ভাগ্য বশতঃ 'ক্রশবার' আঘাত ক'রে ফিরে আসে। আর একবার—গোলের মুখে গোলরক্ষকের অনুপস্থিতিতেও রামচন্দ্র কয়েক গজ দূরের ব্যবধানে লক্ষ্য স্থান পেয়েও গোল ক'রতে পারেন নি। এই সব সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা পূর্ব্বাহ্নেই করতেন তাহ'লে শেষদিকের মাত্র একটি গোলে এমনভাবে তাঁদের নিরাশ হ'তে হ'ত না। তাছাড়া মোহনবাগান সেদিন জয়লাভ করলে কোন অসঙ্গত হ'ত না বা ভাগ্য সুপ্রসন্নের কথা উঠত না। ভাল খেলেও যে কারণে মোহনবাগানকে বহুবার পরাজিত হ'তে হয়েছে এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাহারও ভাগ্যে বহুবারের সুবর্ণ সুযোগ সম্ভব নয়—যারা সে বহুবারের সুযোগ লাভ করেও সময়মত তার সদ্ব্যবহার না করতে পারে তাদের দুর্ভাগ্য!

মহমেডান দলও একবার একটি গোল করবার সুযোগ হারায়। সমর্থক এবং খেলোয়াড়রা সেবার নিরাশ হলেও শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের হতাশ করে নি। খেলা বিরতির পূর্ব্বে এমন সময় তারা গোল দেবার সুযোগ পায় যে, বিপক্ষ দলের তা পরিশোধের সময় রাখে নি। ঐদিনের খেলায় শারীরিক শক্তি প্রয়োগে নীতিবিরুদ্ধ খেলার দরুণ রেফারী মহমেডান দলের তিনজন খেলোয়াড় রসিদ, নূরমহম্মদ এবং মাসুমকে সতর্ক ক'রে দেন। এরূপভাবে মহমেডান দলের কয়েকজন খেলোয়াড় বলের উপর আক্রমণ অপেক্ষা খেলোয়াড়ের উপর আক্রমণ করার ফলে মোহনবাগানের খেলার গতিবেগ যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছিল। খেলা শেষ হবার পূর্ব্বে মোহনবাগানের রাইট ব্যাক তারক চৌধুরীকে অযথা আঘাত করায় দলের অধিনায়ক মাসুমকে রেফারী মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করেন। মহমেডানের খেলায় এ ব্যাপার সে দিনেই নূতন নয়। পূর্ব্বাপর বৎসরের একাধিক খেলায় তাদের কোন কোন খেলোয়াড়কে মাঠ ত্যাগ করতে হয়েছে, আবার কোন খেলোয়াড়ের অপরাধ গুরুতর হওয়ায় শাস্তিস্বরূপ দীর্ঘকাল খেলা থেকে অবসর নিতে হয়েছে।

খেলায় বিজয় লাভ করবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু বিজয়লাভের জন্য খেলার সর্ব্বপ্রকার নিয়ম উপেক্ষা ক'রে বিপক্ষ দলের উপর অযথা শারীরিক আক্রমণ অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয়। যে কোন উপায়ে জয় লাভ করা খেলার উদ্দেশ্য নয়। খেলার নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যে দল



পুরীধামে রথযাত্রা—১২ই আষাঢ়, ১৩৪৮ সাল

ফটো—তারক দাস



দিল্লী সহরে রবীন্দ্র জয়ন্তী—দিল্লী বাঙ্গালী ক্লাবের উদ্যোগে ক্যাপিটাল সিনেমায় নৃত্য



৮ বৎসর সাইকেল ভ্রমণের পর কলিকাতায় প্রত্যাগত পার্শী ভ্রমণকারীদের সম্বর্দ্ধনা—

বিজয়ের গর্ব্ব অনুভব ক'রে তারা কোন দেশেই সম্মানিত হয় না। একথা সর্ব্ব দেশেই প্রযোজ্য। স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদের প্রশ্ন উঠে না।

মোহনবাগানের সঙ্গে খেলায় অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মাসুম লীগ সাব-কমিটি কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সতর্কিত হ'ন।

"In dealing with Masoom's case, however, it is learnt, that Mr. H. R. Norton, President of the I. F. A., wanted to make it abundantly clear through the example of Masoom to the other players of the club, that they should all try and play the game in proper spirit irrespective of the result as rough play and questionable tactics on their part are bound to make the Referee's task much too difficult in view of the blind support they receive from onlookers from the green stands'.

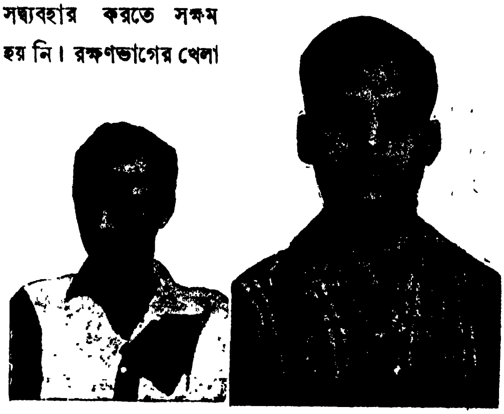
প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যের পর মহামেডান বনাম ভবানীপুরের খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে রেফারী উভয় দলের খেলোয়াড়দের একত্র ক'রে খেলার যথাযথ নিয়ম পালন ক'রে খেলতে নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু সে দিনের খেলায় ক্যালকাটা মাঠে 'Chowdhury dispossessed Bachhi but both fell down and Bachhi, while getting up, knocked Chowdhury badly on the head. Chowdhury was for some time, reeling with pain and took time to recover."—নিরীহ খেলোয়াড়ের উপর বাচ্চির এ শারীরিক শক্তি প্রয়োগে দর্শকেরা অতি মাত্রায় আশ্চর্য্য হয়।

রেফারী কেবলমাত্র সতর্কের নির্দ্দেশ দিয়েই বাচ্চিকে অব্যাহতি দেন। ভবানীপুর ক্লাব দল হিসাবে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, তা সত্ত্বেও দুর্দ্ধর্ষ মহমেডান দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছিল। কিন্তু লীগবিজয়ী দলের ফুটবল খেলার পুরাতন পদ্ধতির বিরুদ্ধে সম্মুখীন হ'তে অতি বড় শক্তিশালী যোদ্ধাকেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সমকক্ষ দলের আক্রমণ ভাগের শক্তিশালী খেলোয়াড়রা যেখানে মহমেডান দলের রক্ষণভাগের বিপজ্জনক ব্যূহ ভেদ করতে ত্রস্ত হ'ন সেখানে দুর্ব্বল দলের আক্রমণের চেষ্টা যে ব্যর্থ হ'বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মোহনবাগানের সঙ্গে লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলাতেও গোলরক্ষককে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করার জন্য জুম্মা খাঁকে এবং প্রেমলালকে ঘুঁসী মারার জন্য রসিদ খাঁকে রেফারী সতর্ক করেন।

লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় কাষ্টমসকে ৪-০ গোলে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয়ার্দ্ধে মাত্র ১-০ গোলে বিজয়ী হ'য়ে ঐ দিন মহমেডান অতি নৈরাশ্যজনক খেলার পরিচয় দেয়। এরূপ খেলা তাদের কাছ থেকে কেউ আশা করতে পারেনি।

এরপর তাদের খেলার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং খেলার ক্ষিপ্রতা দেখা দেয় ই বি আর দলের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের লীগ খেলায়। রেলদল খেলার প্রথম দিকে গোলের কয়েকটি অবধারিত সুযোগ নষ্ট করে। সময় মত বল না মেরে এবং বলের নিকট যথা সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। রক্ষণভাগের খেলা ভাল হয়েছিল। ২-১ গোলে পরাজিত হলেও নিতান্ত মন্দভাগ্যের জন্য গোলরক্ষক একটি বল প্রতিরোধ করেও বিপক্ষ দলের পাল্টা আক্রমণে পরাস্ত হন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রেলদলের খেলা মহমেডান দলের অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ছিল। ঐদিন রেলদলের জয়লাভ অপ্রত্যাশিত হ'ত না।



নিধু মজুমদার নীলু মুখার্জ্জি

মাসুম, নুরমহম্মদ (ছোট), রসিদ খাঁ, তাজ মহম্মদ, সিরাজুদ্দিন দলের সুনাম রক্ষার জন্য ভাল খেলছেন। রক্ষণ ভাগের খেলা পূর্ব্বের থেকে এ বৎসর দুর্ব্বল, কয়েকটি খেলাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

লীগে এখনও পর্য্যন্ত দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে গত বৎসরের লীগ রানার্স্‌ মোহনবাগান দল। এ পর্য্যন্ত

লীগে তারা ২টি খেলায় হেরেছে। প্রথমার্দ্ধের খেলায় পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে ২-০ গোলে হেরে এ বৎসর প্রথম পরাজয় স্বীকার করে।

এর পর লীগে ই বি রেলদলের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় মোহনবাগান ৩-১ গোলে অগ্রবর্ত্তী থেকেও খেলার শেষ দিকে ৩-৩ গোলে 'ড্র' করে। এবারের লীগে এই দিনের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেলদল খেলা আরম্ভ করল আর সেই বল প্রতিরোধ ক'রে অমিয় ভট্টাচার্য্য গুঁইকে চমৎকার 'থ্রু পাস' দিলেন। গুঁই গোলের সম্মুখে বল ফেলে দিলে রায়চৌধুরী 'First-time' সর্ট মেরে নেটের মধ্যে বল ঢুকিয়ে দেন। খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ১-০ গোলে অগ্রবর্ত্তী থেকে শেষ পর্য্যন্ত তারা নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগের খেলা সেদিন আশাতীত ভাল হয়েছিল। একমাত্র রক্ষণভাগের খেলা সকলকে হতাশ করেছে। নীলু মুখার্জ্জি একাই বিপক্ষ দলের আক্রমণকে বহুবার প্রতিরোধ ক'রে সাময়িক দুশ্চিন্তার হাত থেকে দলকে রক্ষা করেছিলেন এবং তৎপরতার সঙ্গে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের বল জুগিয়েছিলেন। ৩—১ গোলে অগ্রগামী থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিজয় লাভে অক্ষমতার দৃষ্টান্ত মোহনবাগানের ইতিহাসে বিরল। সমর্থকদের নিদারুণ হতাশ হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাদের সমর্থকরা সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হ'য়েছেন লীগের সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকারী নর্থ ষ্টাফোর্ড দলের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ২-০ গোলে অগ্রবর্ত্তী থেকে শেষ মুহূর্ত্তে খেলা 'ড্র' করাতে। অথচ এরই কিছুদিন পূর্ব্বে অতিরিক্ত জল কাদা এবং সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম ক'রে ক্যালকাটার কাছে ৩-০ গোলে মোহনবাগানের জয়লাভ ক্রীড়ামোদীদের আশান্বিত করে। মহমেডান দলের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় মোহনবাগান স্বাভাবিক অবস্থায় খানিকটা ফিরে আসে। পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারেনি সত্য কিন্তু জয়লাভের যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে খেলা গোলশূন্য 'ড্র' করেছে। কর্দ্দমাক্ত মাঠেও তাদের খেলা বিপক্ষদলকে বেগ দিয়েছিল। আক্রমণ এবং রক্ষণভাগ উভয় ভাগেরই খেলা ভাল হয়েছিল। রায়চৌধুরীর 'ড্যাসিং' এখনও কার্য্যকরী। তিনি এবং অপরাপর খেলোয়াড়রা সুযোগ সন্ধানী হয়ে খেলে বলগুলি যদি আরও যথাসময়ে আদানপ্রদান ক'রে গোলে সর্ট করতেন তাহলে একাধিক গোল দিতে পারতেন। এদিনেও ভাগ্যলক্ষ্মী মোহনবাগানের উপর বিমুখ ছিল। ভৌমিক গোল লক্ষ্য করে বল সর্ট করেন। চক্ষের পলকের জন্য বলটি দর্শকদের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়। গোলের ভিতরের বারের কোন যায়গায় বাধা পেয়ে ফিরে আসলে মাঠে বলটিকে পুনরায় দেখা যায়। সর্ট, চকিতের জন্য বল অদৃশ্য এবং পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন—এ ঘটনাগুলির পটপরিবর্ত্তন এত দ্রুতবেগে ঘটে যে দর্শকেরা কিছু সময়ের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। যাঁরা বলটিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেন, তাঁরা বলেন, বলটি নিঃসন্দেহে গোলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ভিতরের পোস্টে বাধাপেয়ে পুনরায় মাঠে ফিরে আসে। তাদের এ মত একেবারে অনুমান নয়। কারণ বলটি যে সর্ট করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বলের এ প্রত্যাবর্ত্তন কি কারণে ঘটল। গোলরক্ষক অথবা সামনের গোলপোষ্টে বলটিকে বাধা দিলে তা রেফারী এবং সহস্র সহস্র দর্শকদের চোখে ধরা দিত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। রেফারী ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকায় বলের যথাযথ গতিবেগ অনুসরণ করতে সক্ষম হন নি। যে ক্ষেত্রে রেফারীই একমাত্র বিচারক এবং গোলের পিছন থেকে গোল হওয়া না হওয়া দেখবার কোন গোল-বিচারক নেই সে ক্ষেত্রে ভাগ্যের এরূপ বিড়ম্বনাকে সহজভাবে উপেক্ষা করাই খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয়। মোহনবাগানের সেদিনের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ঘটনাই কেবল একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। একাধিক ফুটবল খেলায় এমন কি ইউরোপীয়ান বনাম ভারতীয় দলের আন্তর্জ্জাতিক খেলাতে ঠিক এমনি ভাবে চকিতের মধ্যে ভারতীয় দলের গোলে বল প্রবেশ ক'রে মাঠে ফিরে এসেছিল। রেফারীর পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। খেলার শেষে সত্যই যে বলটি প্রবেশ করে তা ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শী খেলোয়াড়রা এবং দর্শকেরা স্বীকার করেন। এরূপ দর্শনীয় গোল গোলদাতার কৃতিত্বের পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু রেফারী বিশেষ মনোযোগী না হ'লে তাঁর পক্ষে তা লক্ষ্য করা বেশীর ভাগ সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। এত বড় মাঠের উপর বলের উচ্ছৃঙ্খল গতিবেগ অনুসরণ করতে গিয়ে যাঁরা এরূপ গোলের সন্ধানকে ধরে ফেলতে পারেন তাঁরা নিশ্চয়

তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী এবং সত্যই প্রথম শ্রেণীর রেফারী। বর্ত্তমানে কলকাতায় তাঁর খুব বেশী অভাব।

লীগে মোহনবাগান সমান ম্যাচ খেলে ইষ্টবেঙ্গল দলের থেকে ২ পয়েণ্টে এগিয়ে আছে। এখনও তাদের খেলা বাকি আছে ৪টী। তার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল, রেঞ্জার্স এবং এরিয়ান্সের খেলা প্রধান। টীম মনোনয়ন কমিটি এবং দলের খেলোয়াড়রা খেলার ভবিষ্যত ফলাফলের কথা চিন্তা ক'রে, প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা রক্ষায় সচেতন হবেন বলে আমরা আশা করি। রক্ষণভাগে নীলু মুখার্জ্জির খেলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। একাধিক খেলায় দলের সঙ্কটজনক অবস্থায় আবির্ভাব হয়ে দুশ্চিন্তার হাত থেকে যেমন বহুবার বাঁচিয়েছেন তেমনি পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে দলের সম্মানও রেখেছেন। ব্যাকে টি চৌধুরী এবং সরোজ দাস নির্ভরযোগ্য, যদিও কয়েকটি খেলায় তাঁদের বিচক্ষণতার অভাব ছিল। আক্রমণ ভাগে রায়চৌধুরী, অমিয় ভট্টাচার্য্য এবং ভৌমিকের নিকট থেকে আমরা আরও নিকট ভবিষ্যতে উন্নত ধরণের খেলা আশা করতে পারি। রামচন্দ্র এবং জোসেফকে নিয়েই আপশোষ! ডি সেনের খেলা অনেক পড়ে গেছে। খেলায় বহু ত্রুটী বিচ্যুতি লক্ষিত হয়েছে। তাঁর উপর ভরসা রাখা যায় না; কর্ণার সট প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি বহুবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে শূন্যে মুষ্টি চালনা করেছেন। অনিল দের খেলার স্থিরতা নেই। ভাল খেলা দেখিয়ে হঠাৎ এক একদিন দর্শকদের এমন হতাশ করে দেন যে তাঁর উপর আস্থা হারাতে হয়। অধিনায়ক এস গুঁই এবং এস মিত্র এই দু'জন ভাল খেলোয়াড় আহত হ'য়ে খেলায় যোগদান করতে পাচ্ছেন না। তাঁদের অভাব বেশী ক'রে চোখে পড়ে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে। দল হিসাবে ইষ্টবেঙ্গলের নাম আছে। এ বৎসরের লীগে তাদের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক সাফল্য মোহনবাগানের কাছে ২-০ গোলে জয়লাভ। এ ছাড়া ক্যালকাটার খেলায় ৬-২ গোলে, নর্থ ষ্টাফোর্ডের খেলায় ৪-০ গোলে এবং গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্সের খেলায় ৬-১ গোলে জয়লাভও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এরিয়ান্স এবং ভবানীপুর দলের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় গোলশূন্য 'ড্র' করে। সব থেকে আশ্চর্য্য রিটার্ণ লীগে কালীঘাটের খেলায় প্রথম বার মিনিটে ৩ গোল দিয়ে অগ্রবর্ত্তী থেকেও শেষে ৩-৩ গোলে খেলা 'ড্র' করতে বাধ্য হয়। লীগে রানার্স আপ্ নিয়ে মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের প্রবল প্রতিযোগিতা চলবে। কোন দল সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করবে এ কথা নিশ্চয় ক'রে এখন বলা সম্ভব নয়। ইষ্টবেঙ্গল দলের সোমানা, রাখাল মজুমদার, এস ঘোষ, অজিত নন্দীর খেলা উল্লেখযোগ্য। সোমানা এবৎসরের লীগ খেলায় এ পর্য্যন্ত সব থেকে বেশী গোল দিয়েছেন। কে দত্তের সহযোগিতা তাদের অনেকখানি শক্তি বৃদ্ধি করেছে। মোহনবাগানের খেলায় দিন আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ক্ষিপ্রতা এবং রক্ষণভাগে আত্মরক্ষার তৎপরতা প্রশংসনীয়।



নূরমহম্মদ (ছোট) জে লামসডন

এরিয়ান্স লীগের প্রথম দিকে যে শোচনীয় খেলা দেখিয়েছিল তাতে সমর্থকেরা মোটেই আশান্বিত হ'তে পারেন নি। সুখের বিষয় উন্নত খেলা দেখিয়ে দলটি যথেষ্ট নিরাপদ স্থানে পৌছে গেছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ক্যালকাটার সঙ্গে খেলায় ডি ব্যানার্জি একাই সব কটি গোল দিয়ে ৫—০ গোলে দলকে জয়লাভে যেমন সহায়তা করেছেন তেমনি কি ভাবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয় তার দৃষ্টান্তও খেলোয়াড়দের দেখিয়েছেন।

ই বি রেলদল প্রথম থেকে জোর দিয়ে খেললে লীগের অনেকখানি উপরে উঠতে পারত।

মোহনবাগান এবং মহমেডান দুই শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে তারা যে ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছে তাতে তাদের প্রশংসা লাভের যোগ্যতা স্বীকার্য্য। প্রবীণ খেলোয়াড় জি কার্ভের যথা সময়ে আক্রমণকারীকে বাধা

স্থান এবং বিপদজনক অবস্থার হাত থেকে দলকে উদ্ধার ক'রে খেলোয়াড়দের বল জোগান বিষয়ে তৎপরতা আবার যেন তাঁর খেলায় ফিরে এসেছে। আক্রমণভাগের নিধু মজুমদার, এস বসু, স্পিকের খেলার সঙ্গে আরও অনেকের প্রশংসা করা যায়। রক্ষণভাগের বসিয়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

ভবানীপুর কয়েকটি টিমের মাথার উপর আছে। দু' একটি শক্তিশালীদলের বিরুদ্ধে তারা ভাল খেলেছে। গোলরক্ষক টি দত্ত ভবিষ্যতে নামকরা গোলরক্ষক হবেন বলে আশা করা যায়।

স্পোর্টিং ইউনিয়ান দলের কয়েকজন পুরাতন খেলোয়াড় অন্য দলে যোগ দিলেও এরা অন্য নামকরা দলের তুলনায় একেবারে নিম্নশ্রেণীর খেলা দেখায়নি। একমাত্র এই দলের সকল খেলোয়াড়ই বাঙ্গালী। নামকরা খেলোয়াড় আমদানীর চেষ্টা না ক'রে স্থানীয় খেলোয়াড় নিয়েই প্রতিযোগিতায় নেমেছে দেখে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। ক্রিকেট খেলোয়াড় নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি নিয়মিত ভাবে দলে যোগ দিয়ে ভাল খেলছেন।

কালীঘাট ক্লাব থেকে যেমন খেলোয়াড় চলে গেছেন তেমনি নূতন খেলোয়াড়ও যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তারা আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারে নি। যেসব খ্যাতনামা খেলোয়াড় একদিন কালীঘাট ক্লাবে যোগ দিয়ে ফুটবল খেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা আজ বিভিন্ন ক্লাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছেন, দলের এ অবস্থায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করা ছাড়া আর সব কর্ত্তব্য তাঁদের বোধ হয় শেষ হয়েছে। বিদেশ থেকে নামকরা খেলোয়াড় আমদানীর উদ্যোক্তা কালীঘাটই সর্ব্বপ্রথম। এর পর বহু ক্লাব খেলোয়াড় আমদানী করেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কয়জন ভাল খেলোয়াড় ক্লাব তৈরী করেছে এ খবর আমাদের জানা নেই। খেলোয়াড় তৈরীর জন্য ভাল খেলোয়াড় আমদানী করা প্রশংসনীয়, কিন্তু কেবলমাত্র লীগ কিম্বা শীল্ড বিজয়ের প্রলোভনে খেলোয়াড় সংগ্রহ করা আমরা কোন দিনই সমর্থন করিনি। বাঙ্গালা দেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড পড়ে যাচ্ছে। শক্তিশালী মিলিটারী দলকেও আর ক'লকাতার মাঠে দেখা যায় না। অবাঙ্গালী এসে আজ ফুটবলের সম্মান রেখেছে। তাদের আবির্ভাবে বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়রা খেলার যোগদানের সুযোগ হারিয়েছে।

সুযোগ পেলে স্থানীয় খেলোয়াড়রাই যে ক্রীড়াচাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারে ফুটবল খেলার ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। খেলার সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা দেওয়া যায় তাহলে কি ফল দাঁড়ায় তার অভিজ্ঞতা সত্যই আমাদের অল্প। ফুটবল বিদেশী খেলা। যেখানে ফুটবলের জন্ম এবং যে দেশ ফুটবল খেলায় পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেখানকার ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার প্রতি লক্ষ্য রাখলেই ফুটবল শিক্ষাদানের সাফল্যের পরিচয় পাব। শিক্ষার ফললাভ সময়সাপেক্ষ বলেই আমরা ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে বিদেশী খেলোয়াড় সংগ্রহের চেষ্টা দেখি এবং সেই সব খেলোয়াড় দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার আশা রাখি। অবাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে আমাদের দেশে আমরা কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছি তার অভিজ্ঞতা আজ লাভ করছি। কোন বিশেষ দল হয়ত সাফল্য লাভ করেছে সুতরাং সকলকেই যে তাকে অনুসরণ করতে হবে এমন কোন যুক্তি নেই। অনুসরণ করেও বিপরীত ফল পাওয়া গেছে। বিশেষ দলের সাফল্য যে বিশেষ বিশেষ কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্য সকলের মধ্যে সে সমস্তের অভাব আছে বলেই বহুদিনের চেষ্টাতেও তাদের সাফল্য লাভ হয়নি। ভারতীয় ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বহু দেশহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রয়েছেন; তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন এ বিষয়ে চিন্তা করেন। এটা প্রাদেশিকতার বিষোদগার নয়, আত্মরক্ষার নিবেদন— এতে উভয়েরই মঙ্গল।

রেফারিং ঃ

রেফারিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমাদের বহুদিনের। আমরা একথা স্বীকার করি সম্পূর্ণ ত্রুটীবিচ্যুতিহীন রেফারিংও সম্ভব নয়। দর্শকেরা যা দেখে তা সহস্র সহস্র চোখ দিয়ে সুতরাং খেলার অতি জটীল বিচারেও রেফারিংয়ের ত্রুটী বিচ্যুতি তাদের চোখ অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না। আবার দর্শকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে খেলার বিচার গ্রহণ করতে পারেন না এবং দর্শকদের আসনে দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে সব সময় দূরের খেলার প্রকৃত অবস্থা দেখতেও পান না; সেই কারণে তাঁদের বিচারেরও ভুল

হওয়া স্বাভাবিক। দর্শকের এই ধরণের ভুলকে উপেক্ষা করা যায় কিন্তু রেফারির মারাত্মক ভুলেরও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা অনেক সময়েই স্বেচ্ছাকৃত এবং খেলা পরিচালনায় রেফারির অতি মাত্রায় বিচারবুদ্ধির অভাবের জন্যই সে সব ভুলের পুনরাবৃত্তি অধিকাংশ ফুটবল খেলায় হচ্ছে। আবার অনেক সময় দেখা গেছে অনিচ্ছাকৃত ভুল বুঝে তা সংশোধনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না ক'রে নিজের মিথ্যা সম্মান ও জিদ বজায় রাখবার জন্য পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত রক্ষা করেছেন।

প্রতিবারের মত এবৎসরের লীগেও রেফারির কয়েকটি মারাত্মক ভুল লক্ষিত হয়েছে।

মহমেডান স্পোর্টিং ভবানীপুরের খেলায় রেফারি টি সোম ভবানীপুরের বিরুদ্ধে একটি পেনাল্টি দেন। রেফারীর পেনাল্টির নির্দ্দেশে দর্শক এবং খেলোয়াড়রা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হ'ন। এরূপ একটি অদ্ভুত পেনাল্টির নির্দ্দেশ যে কি কারণে তিনি দিয়েছেন এবং আসল ঘটনাটি বা কি তা খেলা শেষে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লে রেফারী উত্তরে যা বলেছেন, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়—তিনি যে বিচার বিভ্রাট করেছেন তা তাঁর নিজের কথাতেই বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। যে অবস্থায় খেলার ফলাফল ১—১, সেখানে দুর্ব্বল দলকে বিনা দোষে কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া সত্যই মর্ম্মন্তুদ। খেলার বিবরণে "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকা বলছেন,—

'For even admitting that S. Deb Roy really pushed Taj from behind, the question naturally arises as to the respective position of the players. The Referee's version more than points to the fact that Taj was behind Deb Roy and Deb Ray was, in all probability, chasing him for preventing him from getting possession. So, if the Referee was to penalise any body he should have, under the circumstances, penalised first the attacking forward for 'off-side.'

মহমেডান বনাম ডালহৌসীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় সার্জেন্ট ম্যাকব্রিজ খেলাটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে শেষ হবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে বিরতির বংশীধ্বনি করেন। অবশ্য রেফারী তাঁর ভুল স্বীকার করেছেন; ঘড়ির কলকব্জার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই নাকি এভাবের অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছিল। নিজের ভুল স্বীকার করায় সার্জেন্ট ম্যাকব্রিজের উপর আস্থা বেড়েছে বই কমেনি। কেননা সময় রক্ষা ব্যাপারে রেফারীই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। এইরূপ ক্ষেত্রে রেফারী ভুল অস্বীকার করলে অভিযোগকারীদের অভিযোগ নাকোচ হয়ে যায়।

প্রথম বিভাগ লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ই বি রেল দল ক্যালকাটার সঙ্গে খেলায় ৪-১ গোলে জয়ী হয়। কিন্তু রেলদলের শেষের দু'টী গোল সম্বন্ধে রেফারীর যে মারাত্মক ত্রুটী লক্ষিত হয়েছে তা একাধিক সংবাদপত্র আলোচনা করেছেন। একবার ক্যালকাটার গোলরক্ষক একটি লম্বা সর্ট তৎপরতার সঙ্গে প্রতিরোধ ক'রে বলটি ধরলে বিপক্ষ দলের বি কর গোলরক্ষককে অন্যায় ভাবে আক্রমণ ক'রে গোল দেন। রেফারীর বংশীধ্বনিতে সকলেই 'ফ্রি' কিকের অপেক্ষা করেন কিন্তু সেটি রেফারীর বিচারে গোল দেওয়া হয়।

এরপরও ৪র্থ গোলটি সম্পূর্ণ 'অফ্‌সাইড' থেকে দেওয়া হয়। রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়নি। এখানেই শেষ নয়, খেলাও দু'মিনিট কম খেলান হয়েছে। যাঁরা ঘড়িতে সময় নিয়েছিলেন তাঁরা এরূপ মত প্রকাশ করেন। খেলার পরিচালনা করেন মিঃ জি ডি সুর। স্মরণ থাকতে পারে দ্বিতীয় বিভাগের অরোরা বনাম টাউন ক্লাবের খেলাতে এই রেফারী ত্রুটীপূর্ণ খেলা পরিচালনা ক'রে দর্শকদের তীব্র মন্তব্য লাভ করেন।

খেলা পরিচালনা কমিটি এই রেফারীর উপর কি কারণে আস্থা পোষণ করেন তা সকলেরই নিকট বিস্ময়ের কারণ হয়েছে।

ই বি রেলদল বনাম ইষ্টবেঙ্গলের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় রেফারী আর বাগচীর খেলা পরিচালনায় বহু ত্রুটী বিচ্যুতি দেখা যায়। ইষ্টবেঙ্গলের সোমানা সম্পূর্ণ অফ্‌ সাইড থেকে রেলদলকে প্রথম গোলটি দেন। একবার কার্ভেকে ফাউল ক'রে এ গাঙ্গুলি বলটি নিলে কার্ভে ফাউলের জন্য রেফারীকে আবেদন করেন, রক্ষণভাগের অন্যান্য খেলোয়াড়রাও এ ব্যাপারের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে—রক্ষণভাগে একমাত্র জ্যাকব। বলটি গোলে সর্ট করা হ'লে চমৎকার ভাবে তা ধরে শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু আয়ত্বে আনতে পারেন নি। প্রতিবাদ স্বরূপ ই বি রেলদল মাঠ ত্যাগ করতে অগ্রসর হয় কিন্তু অধিনায়ক কার্ভে শেষে খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখিয়ে খেলায় যোগদান

করেন। ইষ্টবেঙ্গল রেলদল অপেক্ষা বহু অংশে ভাল খেলেছিল সত্য, কিন্তু তাদের দু'টি গোলই রেফারীর ত্রুটীর জন্য হয়েছিল।

অনিচ্ছাকৃত ভুল মানুষ মাত্রের হয় এবং তা সংশোধন করতে দায়িত্বশীল ব্যক্তি কিছুমাত্র অসম্মান বোধ করেননা। কিন্তু যাহাদের অপরাধ ইচ্ছাকৃত এবং যাহারা যথাসময়ে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণেও নিজের অনিচ্ছাকৃত ভুলের সংশোধনে কোনরূপ আগ্রহ দেখায় না তাদের শাস্তি কি? ফুটবল খেলা থেকে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছেন এরূপ একাধিক প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় আছেন; তাঁদের উপর খেলার পরিচালনার ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্য পরীক্ষাধীনে রেখে ফল কি দাঁড়ায় তা দেখতে আমরা রেফারিং সাব্‌কমিটিকে অনুরোধ করি। আশা করি ফল ভালই হবে। আনাড়ির কাছে শাস্তি ভোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

পেশাদার ও সখের খেলোয়াড়ঃ

সখের খেলোয়াড় বলতে সাধারণত আমরা বুঝি যাঁরা কোন কিছুর বিনিময় না নিয়ে একমাত্র সখের জন্যই খেলায় যোগদান করেন। এই শ্রেণীর খেলোযাড়দের খেলার মহলে একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। ক্রীড়ামোদী এবং সমর্থকেরা উপযুক্ত সম্মান দিয়ে তাঁদের ক্রীড়াচাতুর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। কিন্তু কাহারও প্রতিভাকে একমাত্র সম্মান দিয়েই তার পরিমাণের বিচার করা যায় না। মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধকে বিচ্ছিন্ন করা অথবা উপেক্ষা করা চলে না। তাই মানুষের প্রতিভার মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে অর্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন মুখী প্রতিভাকে আজ তাই অর্থের বিনিময়ে সম্মানিত ক'রে তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাও আজকার নয়, বহুদিনের। এ ব্যবস্থা না হ'লে প্রতিভার নব নব জন্ম, তার বিকাশের স্ফুরণও সম্ভব হ'ত না। আর্থিক সমস্যার চাপে পড়ে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটত। আজ চারিদিক থেকেই প্রশ্ন উঠেছে আর্থিক সমস্যার নাগপাশে সখের খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্য্য কতদিন আর স্থায়ী থাকবে? সে ক্রীড়াচাতুর্য্যের যাতে অকাল মৃত্যু না ঘটে তার জন্যই শুভানুধ্যায়ীর কল্যাণে পেশাদার খেলোয়াড়ের জন্ম হ'ল। এতে খেলোয়াড়দের সম্মান এতটুকুও ব্যাহত হ'ল না। অথচ প্রতিভাকে সহজভাবে বিকাশের সুযোগ দেওয়া হ'ল। ভাবীকালের সখের খেলোয়াড়রা অনুশীলন দ্বারা ক্রীড়াচাতুর্য্য লাভের একটী আদর্শ সামনে পেল। আদর্শের অভাব এবং বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের জীবন যাত্রায় আর্থিক অসচ্ছলতা দেখে আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা খেলার মধ্যে কোন রকম আশার পথ পাচ্ছে না। আর্থিক কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে প্রতিভার বিকাশ কোথাও কোথাও সম্ভব হয়েছে কিন্তু তার সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

আজ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পেশাদার এবং সখের খেলোয়াড় এই দুই শ্রেণীতে খেলোয়াড়দের বিভাগ করা হয়েছে। খেলায় উৎকর্ষ লাভের জন্য তাদের মধ্যে আজ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। আর আমরা পাশ্চাত্য দেশের খেলাগুলি দীর্ঘদিন অনুশীলন ক'রে তুলনায় অন্যদেশের সমকক্ষ লাভ করা দূরের কথা একটা সাধারণ পর্য্যায়ে (standard) পৌছতে পর্য্যন্ত পারিনি।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ পেশাদার খেলোয়াড় সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, '…সমস্ত দেশ আধা-পেশাদার খেলোয়াড়ে ছেয়ে গেছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের ভাল সখের খেলোয়াড় পাওয়াই যাবে না।' তিনি বলেন, পেশাদার ও সখের খেলোয়াড়দের দুই শ্রেণীভুক্ত করা আবশ্যক, যেমন অন্য দেশে সকল শ্রেণীর খেলায় বিভিন্ন খেলোয়াড়দের মধ্যে আছে। কিন্তু তা এদেশে হবার নয়। ফুটবলেও যেমন গোপনে অর্থ নিয়ে সখের খেলোয়াড়ী চলছে, হকিতেও তাই। এ বিষয়ে ফেডারেশনের নিয়ম কানুন কঠোরতর না হওয়া পর্য্যন্ত ছদ্মবেশী সখের-খেলোয়াড়দের প্রাধান্য থাকবেই।"

একাধিক প্রবন্ধে ফুটবল খেলার পেশাদার খেলোয়াড়ের প্রচলন আমরা সমর্থন করেছি এবং সখের খেলোয়াড় বলে বিজ্ঞাপিত আধা-পেশাদারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। একথাও বলেছি, আমাদের দেশের ফুটবল খেলায় সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড়ের দুই শ্রেণী বিভাগ হ'লে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক উন্নত হবে, খেলার উৎকর্ষ লাভের জন্য দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রবল

প্রতিযোগিতা চলবে, আর্থিক সমস্যা থেকেও খেলোয়াড়রা রক্ষা পাবেন।

ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বাধিক। সুতরাং উন্নত শ্রেণীর খেলার বিনিময়ে ক্রীড়ামোদী এবং দেশহিতৈষীর কাছ থেকে সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি সহজেই লাভ করা যাবে।

বর্ত্তমানের আধা-পেশাদার খেলোয়াড়দের কবল থেকে ফুটবল খেলাকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজন হয়েছে। তা নাহ'লে উৎকৃষ্ট সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড় তৈরী সম্ভব হবে না। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্য্য অল্প দিনেই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং খেলার আকর্ষণ হ্রাস পেয়ে জনবিরল মাঠের মধ্যেই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান চলবে। ফুটবল খেলার এতদিনের জনপ্রিয়তা এমনি ভাবেই কি লোপ পাবে।

লণ্ডনে ফুটবল ঃ

আট হাজার দর্শকের সামনে ইণ্টার এলাইড সার্ভিসেস কাপের ফাইনালে ব্রিটিশ আর্ম্মি ৮২ গোলে আর-এ এফ-কে পরাজিত ক'রে কাপ বিজয়ী হয়েছে।

এ বৎসরের কয়েকটি বিশিষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফলাফল :

প্রতিযোগিতা	বিজয়ী
ওয়ার কাপ	প্রেসটন নর্থ এণ্ড
স্কটিস কাপ	রেঞ্জার্স
নর্থ রেজিন্যাল লীগ	প্রেসটন
সাউথ রেজিন্যাল লীগ	ক্রিসটাল প্যালেস
ফুটবল লীগ সাউথ	ব্রাইটন
লণ্ডন ওয়ার কাপ	রেডিং
সাদার্ণ স্কটিস লীগ	রেঞ্জার্স
ওয়েষ্ট রেজিন্যাল	লাভেলস এথলেটিক
সাউথ ওয়েলস অন সাউথ সায়ার কাপ	কার্ডিভ
হাম্পসায়ার	পোর্টস মাউথ
এলাইড সার্ভিসেস কাপ	বৃটিশ আর্ম্মি
গ্লাসগো কাপ	রেঞ্জার্স
কম্‌বাইণ্ড কাউন্সিল কাপ	মিডল্‌স বার্গ
ল্যাঙ্কাসায়ার কাপ	ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড
মিডল্যাণ্ড কাপ	লিসেষ্টার সিটি

টেনিস ঃ

ইউনিভারসিটি লন টেনিস প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ৮-৭ ম্যাচে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিকে পরাজিত করেছে। লাইট ব্রুশ ৫-১ ম্যাচে সিঙ্গলস বিজয়ী হয় কিন্তু ৩-৬ ম্যাচে ডবলসে পরাজিত হয়।

পেশাদার টেনিস ঃ

ইস্টার্ণ প্রফেশ্যনাল টুর্ণামেন্টের ফাইনালে ফ্রেড পেরী ৬-৩, ৬-৪, ৪-৬, ৬-৩ গেমে রিচার্ড স্কীনকে পরাজিত করেন। সিঙ্গলসের ফাইনালে পেরীর ইহা চতুর্থ বিজয়।

ডোনাল্ড বাজ এবং পেরী উক্ত প্রতিযোগিতার ডবলসে ৬-৩, ৫-৭, ৬-৩, ২-৬, ৬-৪ গেমে বিল টিলডেন এবং ভি রিচার্ডসকে পরাজিত করেন।

পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

কালিফোর্ণিয়ার কম্পটনের এক সংবাদে প্রকাশ, কর্ণেলিয়াস ওয়ার মার্ডাম (Cornelius War merdam) পোলভল্টে ১৫ ফিট ৫¾ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

লিজ ষ্টিরস (Les steers) ৬ ফিট ১৯ ইঞ্চি উচ্চতা লঙ্ঘন ক'রে পৃথিবীর উচ্চ লম্ফনের পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

মুষ্টিযোদ্ধা জো'লুই ঃ

নিউইয়র্কে পৃথিবীর হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধা জো'লুই সম্প্রতি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিলি কনকে প্রতিযোগিতার শেষ মুহূর্ত্তে নক আউট করেন। প্রতিযোগিতাটি ১৫ রাউণ্ড হবার কথা ছিল। বিলি কন ১২ রাউণ্ড পর্য্যন্ত পয়েন্টে জয়লাভ করেছিলেন। জো'লুইয়ের পূর্ব্বাপর প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা বিলি কনই বেশীক্ষণ তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালান। জো'লুইয়ের দেহের ওজন ১৪ স্টোন ৩ পাউণ্ড এবং বিলি কনের ওজন ১২ স্টোন ৬ পাউণ্ড। ওজনে যথেষ্ট কম থেকেও জো'লুইয়ের মত যোদ্ধার সঙ্গে

বহুলোক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিলি কন হুন্ন নামে পরিচিত। তাঁর আসল নাম উইলিয়াম ডেভিড কন। তিনি পূর্ব্বে পৃথিবীর লাইট হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন।

জো' লুইয়ের আর্থিক আয় ঃ

প্রকাশ, বক্সিং লড়ে পৃথিবীর বক্সিং চ্যাম্পিয়ান জো' লুইয়ের আর্থিক আয় ছ'লক্ষ ডলার। কনের সঙ্গে যে লড়াই হয়ে গেল তাতে নেট আয়ের ৩৮৬, ০১২ ডলারের মধ্যে জো' লুই একাই ১৫৪, ৪০৪ ডলার লাভ করেন। কনকে ৭৭, ২০২ ডলার দেওয়া হয়। সরকারী ভাবে ৫৪, ৪৮৭জন দর্শকের উপস্থিতি ঘোষণা করা হয়। গেটে টিকিটের মূল্য উঠে ৪৫১, ৭৪৩ ডলার। ৭।৭।৪১

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মণীন্দ্রলাল বসু ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মীনকেতুর কৌতুক"—২৷৹
শশধর দত্ত প্রণীত "সব্যসাচীর প্রত্যাবর্ত্তন"—২॥৹
দীনেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "প্রথম প্রহর রাতে"—১৷৹
ধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী প্রণীত "অসহায় পান্থ"—২৲
তারাপদ রাহা প্রণীত "সামরি"—১৲
সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত "দোসর"—২৲
প্রতিমা ঘোষ প্রণীত "ঝরা ফুল"—১॥৹, "স্মৃতির আলো'—১৷৹
দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'ইউ'বোটের বোম্বেটে"—১৸৹
নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "বিষের তীর"—॥৹
শিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "বাবুম বুবুম্ বুম্"—॥৹
নৃপেন্দ্র গোস্বামী প্রণীত "অম্বিকাচরণ মজুমদার"—১৷৹
রেজাউল করীম প্রণীত "তুর্কী বীর কামালপাশা"—॥৴৹
ডাঃ কে, চক্রবর্ত্তী এম-বি প্রণীত "আত্মবাণী"—॥৹
অখিল নিয়োগী প্রণীত "শিশু নাটিকা"—॥৹
অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত "পরিণতি"—॥৹
অয়স্কান্ত বক্সী প্রণীত 'রিহার্স্যাল"—১৷৹
স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী প্রণীত "শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটী স্তোত্র"—।৵৹
শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত 'শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন"—॥৹
এন মুখার্জ্জী, এম এ, বি-এল প্রণীত 'বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন"—৵৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১০ আশ্বিন ইংরাজি ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে দুর্গোৎসব। সেজন্য ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ভারতবর্ষ পূজার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গ্রাহকগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। **ভাদ্র** (August) ভারতবর্ষ ২২ শ্রাবণ ইংরাজি ৭ আগষ্ট, **আশ্বিন** (September) সংখ্যা ১৫ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর এবং **কার্ত্তিক** (October) সংখ্যা ৩১ ভাদ্র ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাদ্রের বিজ্ঞাপন কপি ৮ শ্রাবণ, আশ্বিন বিজ্ঞাপন কপি ৩১ শ্রাবণ এবং কার্ত্তিক বিজ্ঞাপন কপি ১৫ ভাদ্র মধ্যে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত বলাইবন্ধু রায় কৃষ্ণানুভূতি ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্




ভারতবর্ষ


ভাদ্র—১৩৪৮

প্রথম খণ্ড | ঊনত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

রাজা রামমোহন রায়ের তিব্বত গমন

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পিএচ-ডি, বি-লিট

ভারত সরকারের মহাফেজখানায় যে সমস্ত বাঙ্গালা চিঠি-পত্র আছে তাহার মধ্যে চারিখানায় রাজা রামমোহনের নাম পাওয়া যায়। ইহার তিনখানা কোচবিহার ও ভুটানের সীমান্ত-ঘটিত বিবাদ-সম্পর্কীয়, একখানি আসামে বরকন্দাজদিগের উপদ্রব-বিষয়ক। যতদূর জানি, এ পর্য্যন্ত কোথায়ও এই চারিখানি পত্রের আলোচনা হয় নাই। রামমোহনের জীবনচরিতের উপাদান-হিসাবে এই চিঠি কয়খানির কিছু মূল্য আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেমন বাঙ্গালাদেশে বর্গীর উৎপাত হইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তেমনই আসামে বাঙ্গালার বরকন্দাজ-দিগের উপদ্রব হইয়াছিল। সরকারী কাগজপত্রে বাঙ্গালার বরকন্দাজ বলিয়া বর্ণিত হইলেও ইহাদের মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালী খুব অল্পই ছিল। বরকন্দাজদিগের জমাদারদিগের মধ্যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের লোক ত ছিলই, বুন্দেলখণ্ড ও পাঞ্জাবের লোকেরও অভাব ছিল না। বলা বাহুল্য, তখনও পাঞ্জাবে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হয় নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন আসামে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে বরকন্দাজদিগের পরিজনদিগকে আটক করিবার আদেশ দেন তখন রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, ঐ দলে তাঁহার জিলার তিন-চারি জনের অধিক লোক ছিল না। অন্তর্বিপ্লবে ও গৃহকলহে আসামের রাজা গৌরীনাথ সিংহ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিকে মোয়ামারিয়া-দিগের উপদ্রব, অন্যদিকে ক্ষমতালিপ্সু মন্ত্রিবর্গের ষড়যন্ত্র। এই সুযোগে দরঙ্গের কৃষ্ণনারায়ণ বাঙ্গালাদেশ হইতে কতকগুলি বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়া আপনার নষ্ট রাজ্য উদ্ধারে উদ্যোগী হইলেন। এই দলে গিরি উপাধিধারী কতকগুলি যুদ্ধব্যবসায়ী সন্ন্যাসীও ছিল। কৃষ্ণনারায়ণ

রঙ্গপুর জেলায় ব্রিটিশ অধিকারে বসিয়া আসাম আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা দেন নাই। সুতরাং আসামের শান্তিভঙ্গের দায়িত্ব বাঙ্গালার ইংরেজ কর্ত্তাদিগের পক্ষে একেবারে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। এই জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস পরিশেষে আসাম হইতে বরকন্দাজদিগকে দূর করিবার জন্য কাপ্তেন ওয়েল্সের অধীনে ফৌজ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আসামে একবার যে অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আর দূর হইল না। সিংহাসনের অধিকার লইয়া আহোম রাজকুমারদিগের মধ্যে অনবরত বিরোধ চলিতেছিল। আহোম-রাজ রাজেশ্বর সিংহের পৌত্র ব্রজনাথ ইংরেজ অধিকারে চিলমারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন রাজা চন্দ্রকান্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্য অধিকার করিবার সঙ্কল্পে তিনি রঙ্গপুর ও কোচবিহারে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবারে কিন্তু ইংরেজ সরকার পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। কুচবিহারের কমিশনর নর্ম্যান্ ম্যাক্লিয়ড্ ব্রজনাথের অবৈধ কার্য্যের সংবাদ পাইয়া রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিড স্কট, জোগিগোফার ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ও কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরকে পত্র লিখিয়া সতর্ক করিয়া দেন। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের নামে লিখিত পত্রখানিতে কোচবিহারের রাজার পিতৃব্য বৈকুণ্ঠনারায়ণ ও দুইজন রাজানুচর ব্রজনাথের কার্য্যের সহায়তা করিতেছিলেন বলিয়া অভিযোগ ছিল। এই পত্রের উত্তরে হরেন্দ্রনারায়ণ যে চিঠি লেখেন তাহাতে রামমোহনের নাম আছে। ব্রজনাথের পক্ষে রামমোহনও যোগ দিয়াছিলেন কি না এই পত্রের উপর নির্ভর করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে না। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শ্রীশ্রীসিব শরণং

স্বস্তি সকল মঙ্গলৈক নিলয়

শ্রীযুত মেস্তর নুরমান মেক লোড সাহেব জিউ সদ্গুনার চরিত্রেষু—আপনার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ ১০ চৈত্রের তরজমা পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম লিখিয়াছেন শ্রীবৈজনাথ কোঙরের চাকর দুইজন ভোটাগুড়ি মোকামে থাকিয়া আসামে জাওার কারণ লোক চাকর রাখিতেছে আমার সরকারের শ্রীরঘুনাথ বকসী ও শ্রীগোপাল সিংহ ঐ কার্য্যের সরিক আছে অতএব আপনকার পত্র পাইবামাত্র ইহার তদারক করাতে মালুম হইলো যে শ্রীরঘুনাথ বকসি করিব একমাস ৺গঙ্গাবগাহন নিমিত্যে গীয়াছে এখানে নাই শ্রীগোপাল সিংহের জবানবন্দি করাতে জানা গেল জে সিংহ মজকুর ঐ বিষয়ের কিছু জানে না ইহারা দুইজনে ঐ মজোরার সরিক এমত জানা গেল না এমত মাজারার সরিক জানিতে পারিলে ইহার বিহিত প্রিতিকার হওার বিসয় রঘুনাথ বকসি ও গোপাল সিংহ ইহারা আমার সরকারের চাকর ইহারা ঐ মাজারায় কি প্রকার সরিক আপনে তাহার খোলাসা লিখিলে জদি ইহারা সরিক হয় এমত সাব্যস্ত হইলে বিহিত প্রতিকার করা জাবেক আর এই বিসয়ের বিহিত তদারক করাতে জানা গেল জে শ্রীবৈজনাথ কোঙরের তরফ শ্রীযুবংশ চক্রবর্ত্তি কোঙর মজকুরের পত্র সমেত শ্রীআলেপ সিংহ কুমেদানের নিকট আসিয়াছিল কুমেদান মজকুর মোকাম রঙ্গপুরের শ্রীযুত কেলকটর সাহেবের দেওান শ্রীরামমোহন রায়ের পাষ আছে ঐ কুমেদান মজকুর হাতিয়ারবন্ধ লোক চাকর রাখার কারণ যুবংশ মজকুরকে পাঠাইয়াছে যুবংশ মজকুর কুমেদান মজকুরের পাঠান মতে চাকর রাখার কথা জারি করাতে উমেদার চারি পাচ জনা লোক তাহার পাষ গিয়াছিল তাহার দিগের হাতিয়ার আদি নাই এবং চাকর মকরর হয় নাই যুবংস চক্রবত্তি মজকুর দিগের জবানবন্দিতে এমত জানা গেল অতএব যুবংস মজকুর ও ঐ উমেদার চারি পাচ জনা লোকেক য়েখান হইতে নেকালিয়া দেওা গেল ও হাতিয়ারবন্দ লোক আমার রাজগীতে জমাএত হইতে না পারে তাহার হুকুম দেওা গেল জে জদি এখানে হাতিয়ারবন্দ লোক জমাএত হয় পাকড়া হইয়া সাজায় পহুছিবেক আপনকার জ্ঞাত কারণ লিখিলাম আমার সরকারের কোন নওাহেক লোক এমত বিসয়ের সরিক হওা ও আমার এখান হইতে অন্য কাহারু মদদ দেওা কোন প্রকার সম্ভবে নহে ও আপনে ও এমত গ্রাহ্য করিবেন না সতত মঙ্গলাক্ষেপে সন্তোস করিবেন জ্ঞাপনমিতি সন ৩০৪ সকা মোতাবেক সন ১২২০ সাল বাঙ্গলা তারিখ ১৭ মাহে চৈত্র।

রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিড স্কট ২১শে মার্চ্চ তারিখে (১৮১৪ খৃস্টাব্দ) ম্যাকলিয়ডের নিকট যে পত্র লেখেন তাহাতে প্রকাশ, যে আলেপ সিংহ যে ব্রজনাথের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। তিনি আলেপ সিংহকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ব্রজনাথের নিকট সিপাহী পাঠাইবার কোন প্রমাণ না পাওয়ায় তাহাকে জামিনে খালাস দিয়াছেন। কিন্তু রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ যে আলেপ সিংহকে রামমোহনের আশ্রিত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার স্বপক্ষে কোন কথা ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠিতে নাই। যদি আলেপ সিংহের সহিত সত্য সত্যই রামমোহনের যোগ থাকিত তবে তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। নিম্নে স্কট সাহেবের ইংরেজী পত্র উদ্ধৃত করিলাম।—

To Norman Macleod, Esq.,
Commissioner at CoochBehar.

Sir,

In reply to your letter of the 19th instant, I beg leave to acquaint you that, from the exact coincidence of the information, contained therein, with that which I had, on the same day, accidentally obtained from a peon, who accompanied me to this place, in hopes of employment, and who had been sent for by Aleef Sing, and offered service under Birj Nath Koonwar, for the purpose of invading Assam, I entertain no doubt of its being correct.

2. On receiving this information, I caused Aleef Sing to be apprehended; but, as I have not yet been able to procure evidence of his having actually despatched any men to Birj Nath Koonwar, I have released him on bail.

3. I have no doubt, that some hints of the British Government being favourable to Birj Nath's cause were thrown out by Aleef Sing, as the peon above mentioned appeared to be impressed with the idea, although, from extreme sickness, was unable to state distinctly what had been said on that head.

4. I have received no information relative to the part, that the Rajah of Cooch Behar may have taken in their measures; but I have some reason to believe that a Mr. Bruce, at Gowalparah, is, in some degree, concerned in Birj Nath's proceedings, and I will be obliged to you to inform me, whether your information leads to the same conclusion.

5. The Commanding Officer at Jaggeegopap has been instructed to disperse or apprehend the body of men, stated to have been assembled by the ex-Rajah, and I have ordered the Police Darogah to secure the person of the latter, should he hesitate in ordering the immediate dispersion of his followers.

I am
Sir,
your most obedient servant,
D. Scott
Magistrate

Zellah Rungpore
The 21st March 1814.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অপর তিনখানি পত্র কোচবিহার ও ভোটানের সীমান্ত-সংক্রান্ত। রামমোহন রঙ্গপুরের দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার মুরুব্বি ডিগবী সাহেব ছিলেন ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। সীমান্তের বিরোধের তদন্ত তাঁহাকেও করিতে হইয়াছিল, সুতরাং এই সম্পর্কে রামমোহনের নাম উল্লেখ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কোচবিহার ও ভোটানের বিরোধ বহুদিন হইতে চলিতেছিল। কোচবিহারের দুই-একটি তালুকে ভোটানের দেবরাজা পত্তনিসূত্রে প্রজা-হিসাবে ভোগ করিতেছিলেন, আবার কতকগুলি জায়গা বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিলেন। কোচবিহারের রাজাও স্বেচ্ছায় আপনার অধিকার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিবার পর ভুটিয়ারা কোচবিহার আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায় ও তাঁহার ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা করে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় কোচবিহার রাজ্যে ভোটানের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর সেনাপতি ও নাজিরদেও বন্দী রাজার পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন। ভুটিয়ারা বন্দী রাজার প্রতি বিরূপ ছিল সুতরাং তাহারা আবার কোচবিহার আক্রমণ করিল। নাজিরদেও খগেন্দ্রনারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শরণ গ্রহণ করেন। কোচবিহারের রাজার অভিভাবক-স্বরূপ তিনি প্রতি বৎসর অর্দ্ধেক রাজস্ব কর-হিসাবে দিবার অঙ্গীকারে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত সন্ধি করেন। কোচবিহার রাজ্য এই সময় হইতে কোম্পানীর অধীনে আইসে। বাঙ্গালার ইংরেজ সরকার কাপ্তেন জোন্সের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইয়া কোচবিহার হইতে ভুটিয়াদিগকে দূর করিয়া দেন। কাপ্তেন জোন্স দেবরাজার অধিকারে প্রবেশ করিয়া জলিমকোটের কেল্লা অধিকার করেন। তখন ভুটান তিব্বতের অধীনস্থ করদ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ভুটানের এই বিপদের সময় তিব্বতের টাসি লামা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন। ফলে যে সন্ধি হয় তাহাতে জলধাকা নদী ইংরেজ রাজ্য ও ভুটানের সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট হয় এবং চিচাকোট, পাগলাহাট, লক্ষ্মীদুয়ার কিরান্তি ও মরাঘাট ভুটানের সম্পত্তি বলিয়া স্থির হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল জায়গায় ভুটানের অবিসম্বাদিত অধিকার ছিল না। সুতরাং এই সকল জায়গার মালিকী স্বত্ব লইয়া বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত, কোচ-বিহারের মহারাজা ও রাঙ্‌বামাটির জমিদারদিগের সহিত ভোটান সরকারের একাধিকবার বিরোধ হইয়াছে। কাশিম-বাজারের মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ কান্তবাবুর বিরুদ্ধেও একবার ভোটান সরকারকে তাঁহাদিগের জমি হইতে অন্যায় পূর্ব্বক বেদখল করিবার অভিযোগ হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজ সরকারকে একাধিক বার এই সকল অভিযোগের বিচার করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইংরেজ সরকার কাপ্তেন জোন্সের অভিযানের পর যে কারণেই হউক সীমান্তের ব্যাপারে ভোটানের ন্যায়-অন্যায় সকল দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে কোচবিহারের প্রতি সর্ব্বদা সুবিচার হয় নাই। আলোচ্য পত্র তিনখানির মধ্যে দুইখানি মরাঘাটের সীমানা-সম্বন্ধীয়, তাহাতে রামমোহনের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। সুতরাং এই পত্র দুইখানি উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম তৃতীয় পত্রখানির সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম পত্রখানি দেবরাজা স্বয়ং কলিকাতার দেওয়ানজী বা লাটসাহেবের সেক্রেটারীর নিকট লিখিয়াছেন। রঙ্গপুরের দেওয়ান রামমোহন যে রামমোহন রায় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না, বিশেষত যখন পত্রখানি ইংরেজী ১৮১২ সালে লেখা হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছেন ভোটানের দেবরাজের পত্রবাহক চিতাটণ্ডু জিনকাপ ও চিতাটাসি জিনকাপ। পত্রখানি লেখা হইয়াছিল রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট স্কট সাহেবকে। ডিগবি ১৮১৪ সালে রঙ্গপুরের কালেক্টরের পদ পরিত্যাগ করেন। এই পত্রে পরিষ্কারভাবে রামমোহন রায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পত্রের লেখক দেবরাজ, পত্রের তারিখ ৩০৬ (রাজশক) সালের ২১শে আশ্বিন, ইংরেজী ১৮১৫ সালের নবেম্বর। এই পত্রখানিও রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে লেখা হইয়াছিল।

(১)

শ্রীশ্রীহরেরাম—

সরণং

৭ সস্তিঃ শ্রীযুত কলিখাতার দেওান জীউ সুচরিতেসু সমাচার আপন মঙ্গল অত্র কুশল সদাএ চাহি তাহাতে অতেব বিসেষ আমার তরফ মরাঘাটের জমীন একখানা আছিল তাহা পালঙ্গ সাহেব আসীবার কালে একবার সিমানা সরহদ বিসএ কাজীয়া হএ। এখানকার উখিল নোপ' পেগা' বুড়া খুড়াকে কলীখাতা সেখানে পচায়া জয়ধরা (জলঢাকা) নদী হৈতে সিম সরহদ হএাছে অর্দ্ধ প্রচার আছে মোকাম রঙ্গপুরের শ্রীযুত কলেকটের সাহেব শ্রীযুত রামমোহন দেএান সাক্ষাত জানা আছে তবে তাহার ডিগীরী-খানা দৈবে ঘর পোরাতে পোরা গেইল ইহাতে অনেক কাজীয়া হবেক হেন বিসএ শ্রীযুত কলীখাতার নবাব সাহেব ডিগীরি বিসএ লিখীআছি আপনে সেখানকার কর্ম্মচারী সদর পত্রে বেহরা জানীয়া নবাব সাহেবত সমজায়া জমীনের ডিগীরি খানা করায়া আমার উখিল মারফত দএা করীয়া দেএাবেন আমার শ্রীরাম নাথ কাএত উখিল জরানিত জানীয়া গৌর করা জাবেক হরেক দফাতে আমার উখিলের ক্ষরাকী তদারত করিবেন সতৎ আপন মঙ্গল আদী লেখায়া পরীতুষ্ট করাইবেন অন্য মত না জানীবেন ইতি সন ৩০৩ মাহে বৈসাখ।

(২)

৮৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

৮৭ আরজ শ্রীচিতাটণ্ডু জিনকাপ ও শ্রীচিতাটাসি জিনকাপ তরফ শ্রীশ্রী৮ দেবমহারাজ বাহাদুর মলুকে ভোটাস্ত গরিব পরওর সেলামত আমার দিগের আর্জ্জাবঃ এহী আমার জে আরজী সাহেব পাশ করিয়াছিলাম তাহার জবাব লিখিয়াছেন জে কোন সন কোন সাহেবের আমলের মরাঘাটের ডিগিরিতে আমরা রাজী আছি তাহার সন ও সাহেবের নাম লিখিতে কারণ লিখিয়াছেন ইহার জবাব এহী পূর্ব্ব জখন কোচবেহারের রাজা আমার দিগের দেবরাজ সহীত

শ্রীচিতাটণ্ডু জিনকাপ

শ্রীচিতাটাসি জিনকাপ

কাজীয়া হইয়া কোম্পানি বাহাদুর সহীত মিলিয়াছিল তাহার পর কোচ বেহারের সাবেক রাজা ও নাজীর খগেন্দ্র নারায়ন সহীত মরাঘাট ও পরগমে বৈকুণ্টজুরের সাবেক রায়কত সহিত জলপেসখর ও গয়রহ কাজীয়া আমার দেবরাজার তরফ বুড়াধুবা কৈলকাতা গীয়াছিল তাহাতে কৌসল হইতে দুই তিন সাহেব মরাঘাট আশীয়া নদিজল সিমানা করিয়া ও জলপেসখর ও গয়রহ আমার বরাজাকে দখল দেওাইয়া ডিগরী ও নকসা সাহেব লোক এক নকল দেবরাজাকে দিয়াছেন এক নকল সিরস্থাতে আছে তাহার সন ও মায ও তারিখ মনে নাই সন ১১৮৬ বাঙ্গলা হবেক কি তাহার পুর্ব্ব দুই তিন সন হবেক ইহা আমারদের মনে নাই পরলেঙ্গ সাহেব ও রোগল সাহেব কি আর কোন সাহেব ডিগীরি করিআছেন নাম মনে নাই সে পুর্ব্ব ডিগীরিতে রাজী আছি তদপর বেহারের রাজা জে ছত্র শাত বৎসর হইলো রঙ্গপূরের কেলেকট্টের ডিগবী সাহবে ও তাহার দেওান রামমোহন রায় ও মুনসি হেমতুর্ল্লা সহীত কারসাজী করিয়া নটখটী করিয়া আমরা হাজীর ছিলাম না এবং উকীল হাজীর না থাকাতে তরফকসি করিয়া জে মিছা ডিগীরি করিয়াছে তাহা আমার দিগের দেবরাজ রাজী নয় জদি তাহাতে রাজী হইলে পুন ২ আপনকার নিকট ও কৈলকাতাতে শ্রীযুত গবনর জানরেল বাহাদুরের হুজুরে কি কারন দেবরাজ পত্র লিখিবেন ও আমার দেক পঠাইবেন আমরা সন ১৮০৯ সনে ডিগবি সাহেবের ডিগিরি রাজী নহী ইহা আরজ করিলাম ইতি ৮ আশীন সন ১২২২ সাল বাঙ্গলা—

(৩)

শ্রীশ্রীহরি

স্মরণং

৭ স্বস্তী ঃ সকল মঙ্গলৈক নিলয় প্রচণ্ড প্রতাব রঙ্গপুরের শ্রীযুত বড় সাহেব মহোগ্র প্রতাবেষু আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপনের ২ আসাড়ের পত্র চিন্থ দোরোখা বানাত ৫ পাচ জামা ও দুরবিন ১ একটা সহিত আপনের তরফ উকিল শ্রীরামমোহন রাএ ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত বশুর মাঃ পাইয়া বহুত খুসি হইলাউ রায় ও বশু মৌখুফের জবানিতে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাতো হইলাউ চিনের তরফ দুইজন আম্বা মোকাম লাসাতে থাকে তাহারাক এক খত লিখিয়াছেন সে খত লাসাতে রওানা করা গেল তাহার দিগের জওাব আসিলে পশ্চাত পঠান জাবেক আপনের তরফ রাএ ও বশু মশুব এখানে আরজ করিল জে দুইজনের মধ্য এক জনেক এথাতে রহিতে হুকুক করিয়াছে একজন এখানের সমস্ত বিস্তারিত ওয়াকিফ হাল হইয়া আপনের নিকট জাহের করিতে চাহিল এ জর্ন্যে রাএ মৌখুবেক আমার এথাকার সমস্ত বিবরণ সাক্ষাতকার কহিয়া বলিয়া নিকট পঠান জাএ রাএ মৌখুফের জবানিত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাতো হবেন তবে চামরচির দুওারের মাটী ও রঙ্গধামালির ঘাট তিস্তানদির মাঝিয়ালি পুর্ব্বহনে আমার সরকারের আমল ও দখলের মাটী হএ তাহার মাল-গুজারির টাকা দিয়া এখানে দেবতা পূজা হইতেছিল তবে সে জাগা কএক সন অবধি বেহারের রাজা ও বৈকণ্ঠপুরের রায়কত এহি দুইজনে ফৌজকসি করিয়া আমার মাটী ছিনিঞা লইয়াছে কারণ কৈল্যকাতার শ্রীশ্রী গবনর জানরেল বাহাদুরের নিকট একখত লিখিয়াছিলাউ তাহাতে সেখানহনে মাটী দেলাইতে আপনের নামে মাদার হইয়াছে এ বিসএ আমার তরফ উকিল নিকট পঠাইয়াছি তবে অখন তক আমার মাটীর খোলাসা হইল না অতএব লিখি জদি যুক্ত তজবিজ করেন তবে রঙ্গধামালির ঘাটের ইসাদ সিলিকাটা মহাজন লোক আপনার দেশেতে য়াছে তাহার দিগেক তলব দিয়া হুকুম করিবেন তাহার দিগের সাক্ষী মওাফিক কাহার ঘাট ঠাহরে তাহা মালুম হবেক চামরচির মাটীর রেয়ান দিগকে পাট্টা ও দাখিলা তলব দিয়া তজবিজ করিলে কাহার মাটী ঠাহরে তাহাক জ্ঞাতো হবেন চামরচির মাটীর দক্ষিনে জরধকা (জলধাকা) নদির কিনারে জুমকার ঘাট আছে সেহি ঘাট দিয়া তোমার দেশের মহাজন লোকে বাঙ্গা ও বাজে জিনিস লইয়া আমদ রপ্ত করিয়াছে তাহার খাজানা পুর্ব্বহনে আমার সরকারে দাখিল করিয়াছে সেহি সকল মহাজন লোকেক তলব দিয়া হুকুম করিবেন তাহার দিগের সাক্ষী মওাফিকে কাহার আমল দখলের মাটী ঠাহয়ে তাহাক জ্ঞাতো হইতে পারেন নতুবা সরেজমিনে আসিয়া তজবিজ করেন তবে তাহার মতে খত লিখিবেন আমার এথাহনে জনেক মাতবর লোক পঠান জাবেক মুকাবিলা তজবিজ জানিঞা আমার মাটীর কএক সনের খাজানা সহিত মাটী আমার আমলে করিয়া দেলাবেন কদিম দুস্তীর দিগে নজর রাখিয়া অতি সিগ্র মাটির খোলাসা করিয়া দিবেন ও বেহারের রাজা ও রায়কত মৌখুফের মিথ্যা কথা ইতিবার করেন তবে খোলাসা জওাব লিখিবেন পুর্ব্বে জানিছিলাউ জে বেহারের রাজা রায়কতে কাজিয়া করে তবে এখন জানা গেলো আপনের সরকারে খাজানা দাখিল করে তবে আমার মাটির কমি নাই ইহাতে আমার অন্ত মত কি য়াছে তবে আমার উকিলক এখানে পাঠাইবেন শতৎ আপনের মঙ্গল আদি লিখিবেন ইতি সন ৩০৬ সাল তারিখ ২১ আশ্বীন—

নীচে ছোট অক্ষরে দস্তখত আছে

ক্রোরক্ষ বিশেষং রায় ও বসু জবানিত জেমত শুনিলাম গোরখার সহীত জে প্রকারে লড়াইর যুদ্ধ ইহাতে মালুম হইলাম গোরখা হরুযুদ্ধতে গোরখা তোমার দিগের পর জুলুম বদিয়ত করিয়াছে জদী এহী লড়াইর বিসয় জদি গোরখা অর্ব্ব ২ কোন প্রকারে আমার এখানে লিখে তবে তাহার কখনো গোউর হবেক না আপনের সহীত কদিম দুস্তী বহাল থাকিলে গোরোখা কী করিতে পারে আর আপনে জদি সরে জমিনে আশীতে না পারেন তবে আমার মাটীর খোলাসা করিয়া দিয়া শ্রীরাম-মোহন রায়কে পুনরাএ এখানে পাঠাইবেন শ্রীরাম প্রসাদ বাশীকে হুকুম করিলাম তিনি আমার দিগের কথা কথন কহীবেক তাহাতে গৌর হবেক সাবেক দুস্তী নজর রাখীয়া হর ২ যুদ্ধতে অনুগ্রহ মর্য্যাতা রাখীবেন ইতি সন ৩০৬—

তৃতীয় পত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় ইংরাজ সরকারের কার্য্যের জন্য রঙ্গপুর হইতে ভোটান গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে অনেকেরই ধারণা যে, ডিগবি সাহেব রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই

রামমোহন কলিকাতা চলিয়া আসেন। কিন্তু এই পত্র হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ডিগবি চলিয়া যাইবার পরও তিনি উত্তরবঙ্গে ছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই রামমোহনই যে ডিগবির দেওয়ান রামমোহন তাহার প্রমাণ কি? আলোচ্য পত্র চারিখানির মধ্যে দুইখানিতে দেওয়ান রামমোহনের নাম পাই, একখানিতে ডিগবির দেওয়ান রামমোহনের নাম আছে। চতুর্থ পত্রের রামমোহন যে অন্য ব্যক্তি নহেন তাহার প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও এই চারিখানি পত্রেই যে এক রামমোহনের কথাই বলা হইয়াছে ইহাই অধিকতর সম্ভব। ইংরেজ সরকার ভোটানের বিবাদ মিটাইবার জন্য যাহাকে তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন এমন কথা সহসা বিশ্বাস হয় না এবং একই সময়ে রঙ্গপুরে দুইজন সমপদস্থ, সমান প্রতিপত্তিশালী রামমোহন রায় ছিলেন, অথচ একজনের বিষয় আমরা কিছুই জানি না, ইহাও সম্ভব নহে। সুতরাং তৃতীয় পত্রের রামমোহন ও রাজা রামমোহন রায় যে অভিন্ন ব্যক্তি ইহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না।

রামমোহন রায় বালক কালে একবার তিব্বতে গিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল একজন খ্যাতনামা লেখক আপত্তি করিয়াছেন যে, এই ধারণা প্রমাণসহ নহে। রামমোহন যে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিব্বত ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার ত কোন লিখিত প্রমাণ নাইই, পরবর্ত্তী কালে যে তিনি ঐ দেশে গিয়াছিলেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পত্রখানি পড়িলে রামমোহনের তিব্বত গমন একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তিনি যখন দেবরাজার দরবারে গমন করেন তখন রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট চীনের আম্বানদিগের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্র দেবরাজা লাসায় পাঠাইয়াছিলেন। পরে ঐ উপলক্ষে রামমোহনের লাসা যাত্রা অসম্ভব নহে। বিশেষত পত্রের শেষে দেবরাজা রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিতেছেন—"আপনে জদি সরে জমিনে আশীতে না পারেন তবে আমার মাটির খোলাসা করিয়া দিয়া শ্রীরামমোহন রায়কে পুনরাএ এথানে পাঠাইবেন।" সুতরাং রামমোহনের দ্বিতীয় বার সেখানে এবং তথা হইতে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে লাসা গমনের যে কোনও সম্ভাবনাই ছিল না এরূপ নহে। অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, এখন পর্য্যন্ত তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সে সময়ের বহু চিঠি পত্র একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক বাঙ্গালা ও পারশী পত্রের ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু মূল পত্র পাওয়া যায় নাই, আবার অনেক সময় মূল বা অনুবাদ কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ইংরেজ সরকার দেবরাজার দরবারে দুইজন উকিল পাঠাইয়াছিলেন, কৃষ্ণকান্ত বসু ও রামমোহন রায়। কৃষ্ণকান্ত রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ স্কট সাহেবের সেরেস্তায় চাকুরী করিতেন। তিনি ভোটানের যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন স্কট সাহেব স্বয়ং তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাঙ্গালা অথবা পারশী কোন্ ভাষায় ভোটানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এখন তাহা জানিবার উপায় নাই। পরবর্ত্তী কালে স্যার অ্যাসলে ইডেন ও কাপ্তেন পেম্বারটন কৃষ্ণকান্তের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রিপোর্টে রামমোহনের নাম নাই। ইহার কারণ কি? রামমোহন যে কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে ভোটানে গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। দেবরাজা যখন সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য রামমোহনকেই রঙ্গপুরে ফিরাইয়া পাঠাইলেন এবং বিবাদীয় জমির মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাকেই পুনরায় ভোটানে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন তখন মনে হইতে পারে যে, দুইজন উকিলের মধ্যে তিনিই প্রধান ছিলেন অথচ ইডেন বা পেম্বারটন তাহার নাম করিলেন না কেন? হইতে পারে যে ভোটানের বিবরণের লেখক-হিসাবে তাঁহারা কৃষ্ণকান্তের কথাই জানিতেন। সেকালে ভোটান, কোচবিহার প্রভৃতি রাজ্যের সহিত রঙ্গপুরের ইংরেজ কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালা ভাষায়ই পত্রালাপ করিতেন। ইডেন বা পেম্বারটন হয়ত এই সকল বাঙ্গালা চিঠি পড়েন নাই, অপর পক্ষে স্কটের ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে কৃষ্ণকান্তের রচনার সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল, তাই তাঁহারা কৃষ্ণকান্তের নাম করিয়াছেন, রামমোহনের নাম করেন নাই।

ইহাতে কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হইল না। ১৮১৫ সালে রঙ্গপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডেভিড স্কট। দেবরাজার দরবারে তিনিই দূত বা উকিল পাঠাইয়াছিলেন।

রঙ্গপুর হইতে কয়জন উকিল ভোটানে গিয়াছিল তাহা তাহারই ভাল করিয়া জানিবার কথা। ইংরেজী ১৮১৫ সালের ২৬শে তারিখে তিনি কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লিখিতেছেন—The Deb Rajah mentions in his letter that he had sent passports and people to conduct the Vakeel deputed by me to the capital, but I have not yet heard of his arrival here (*sic.*), and from the very great delay which he has experienced in obtaining admission into Bhootkn… there seems to be reason to believe that his progress has been intentioally obstructed." ইহার মধ্যে কোথাও দুইজন উকিলের কথা নাই। ৩০৮ শকের ই১৭ কার্ত্তিক দেবরাজা কুচবিহারের কমিশনরের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতেও রামমোহনের নাম নাই, কৃষ্ণকান্তের নাম আছে। অথচ ১৮১৫ সালের নবেম্বরের পত্রে রামমোহনের নাম এতবার এমনভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে তিনি যে কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে ভোটানের রাজধানীতে গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। যদি তিনি কেবল দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সরকারের অজ্ঞাতে কৃষ্ণকান্তের সঙ্গী হইয়া থাকিতেন তবে সকল কথা বুঝাইয়া তাঁহাকে রঙ্গপুরে পাঠাইবার কোন অর্থ হয় না। ডিগবীর দেওয়ান বলিয়া ভোটানের কর্ত্তৃপক্ষের রামমোহনের প্রতি বিশ্বাস না থাকিবার কথা, অথচ সীমান্ত সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। এই জন্যই কি কৃষ্ণকান্তকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে ভোটানে পাঠান হইয়াছিল? এই অনুসন্ধান সত্য হইলে কৃষ্ণকান্তই ইংরেজ দূত ছিলেন। রামমোহন তাঁহার সহকারী ছিলেন মাত্র। সুতরাং স্কট সাহেব তাঁহার চিঠিতে একজন উকিলের কথাই বলিয়াছেন, উকীলের সঙ্গীয় লোকদিগের কথা বলেন নাই। আর যদি রামমোহন ব্যক্তিগতভাবে কেবল দেশ ভ্রমণের অভিপ্রায়েই ইংরেজ দূতের সঙ্গে গিয়া থাকেন, যদিও তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, তবে হয়ত কৃষ্ণকান্তের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার পর অন্যত্র ভ্রমণ করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু এই অনুমান প্রমাণ সাপেক্ষ।

রামমোহনের ভোটান যাত্রাও তথনকার দিনে তিব্বত ভ্রমণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিতে পারে। ভোটান তখন রাজনৈতিক-হিসাবে তিব্বতের অধীন অথবা তিব্বতের অংশ। সাধারণের নিকট ভোটানও যে তখন লামা রাজ্যের অংশবিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইত তাহার প্রমাণ আছে। ইংরেজী ১৭৭৯ সালে ভোটানের দেবরাজার দূত নিরপুর পিয়াগা একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—'পূর্ব্বে লাসার রাজ্য ও বাঙ্গালা দেশের লোকের মধ্যে প্রচুর ব্যবসা বাণিজ্য হইত এবং হিন্দু ও মুসলমানগণ বিনা বাধায় দুই রাজ্যে যাতায়াত করিত। মধ্যে লড়াইর জন্য যাতায়াতের বাধা হয় সম্প্রতি দেবধর্ম্ম লামা রিম্বোচে ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছে, দেবরাজা আর হিন্দু ও মুসলমান-গণের ব্যবসায়ে এবং ভ্রমণে কোনরূপ বাধা দিবেন না।' বলা বাহুল্য যে লাসায় কখনও বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের অবাধ যাতায়াত ছিল না। বাঙ্গালী বণিকেরা ভোটানে যাইত এবং ভুটিয়ারা উত্তর বাঙ্গালায় ব্যবসায়-সূত্রে যাতায়াত করিত; সুতরাং নিরপুরে পিয়াগা এখানে ভোটানকেই লাসার রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত ভোটানের দৌত্যের পর এই কারণেই সাধারণে রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণের কথা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। চীনের আম্বানদিগের নিকট যে পত্র লেখা হইয়াছিল ঐ সম্পর্কে কোন দেশীয় কর্ম্মচারীকে লাসায় পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়া থাকিলে রামমোহনের ন্যায় ভোটান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বহু ভাষাবিদ ব্যক্তিরই ঐ কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হওয়া অধিকতর সম্ভব।

রামমোহন কোন্ পথে ভোটানে গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সহযোগী কৃষ্ণকান্তের বিবরণ হইতে জানা যায়। কৃষ্ণকান্ত গোয়ালপারা, বিজনী, সিডলি ও চেরঙ্গের পথে পুনখে দেব রাজার দরবারে পৌছিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহযাত্রী রামমোহনও ঐ পথে ভোটান গিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি কবে কোন্ পথে রঙ্গপুরে ফিরিয়াছিলেন, পুনরায় ভোটান গিয়াছিলেন কি-না তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের এই অধ্যায় বাস্তবিকই রহস্যাবৃত।

জঙ্গম

বনফুল

২২

চুনচুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল নাতিসাধারণ প্রকৃতির মহিলা। বলিষ্ঠ চওড়া-চওড়া গড়ন, শক্তিব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, একটু লক্ষ্য করিলে গোঁফের রেখা পর্য্যন্ত দেখা যায়। মনোবৃত্তিও পরুষভাবাপন্ন, নির্ভীক বলিষ্ঠ। নারীসুলভ কমনীয়তা হয় তো তাঁহার এককালে ছিল (না থাকিলে অধুনামৃত মিস্টার স্যানিয়াল কি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ?), এখন কিন্তু তাঁহার মধ্যে নারীসুলভ কোন প্রকার মাধুর্য্য নাই। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমানে তিনি মাধুর্য্য-বিরোধী, রূপসজ্জার কোন প্রকার আতিশয্য তিনি সহ্য করিতে পারেন না। কমনীয়তা এবং মাধুর্য্য লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে গিয়াই যে আজকালকার মেয়েরা অধঃপাতে যাইতেছে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। মিস্টার স্যানিয়াল পাঁচ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন এবং মিসেস স্যানিয়াল এই পাঁচ বৎসরকাল সাতিশয় দক্ষতার সহিত নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে নিজের সংসার-তরণীটিকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন কি নিজের দূরসম্পর্কের ভগিনী চুনচুনকে পর্য্যন্ত নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। হাব-ভাব-বিলাসিনী প্রসাধন-কুশলা সাধারণ রমণী হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না, একথা প্রায়ই তিনি পরিচিত মহলে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহার এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে চুনচুন লুকাইয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে তাহা আধুনিক যুগের সর্ব্বসাবধানতা-উল্লঙ্ঘিনী দুষ্টা দক্ষতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নহে। আজকালকার ব্যাপার দেখিয়া মিসেস স্যানিয়ালের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সাবধানতার প্রাচীর যত দুর্ভেদ্য এবং যত উচ্চই হোক আজকালকার মেয়েরা ঠিক তাহা ডিঙাইয়া যাইবে। মিসেস স্যানিয়াল প্রতিদিন কথায় কথায় ভগবানকে ধন্যবাদ দেন যে, ভগবান তাঁহাকে একটিও মেয়ে দেন নাই, তাঁহার দুইটি সন্তানই পুত্র-সন্তান। মেয়েদের উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ, তাঁহার ধারণা আজকালকার মেয়েগুলোই সমাজটাকে উচ্ছন্ন দিতেছে। মেয়েরা আস্কারা না দিলে পুরুষদের সাধ্য কি অগ্রসর হয়! মেয়েদেরই কর্ত্তব্য অবাঞ্ছিত পুরুষসংসর্গ সযত্নে পরিহার করিয়া চলা। আজকাল কি ছেলে কি মেয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান কাহারও নাই। এই যে তিনি চুনচুনকে মানুষ করিয়াছেন, তাহার লুকাইয়া-বিবাহ-করা স্বামীর চিকিৎসার যৎ-কিঞ্চিৎ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও চুনচুনকে দূর করিয়া দেন নাই—সমস্তই কর্ত্তব্যের খাতিরে। মিসেস স্যানিয়ালের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রবল। তিনি যে কর্ত্তব্যপরায়ণা, সৎপথবর্ত্তিনী এবং নিষ্কলুষা একথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা শুধু যে তাঁহার নিজ সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে; তিনি নারীজাতির উন্নতিকল্পে একটি নারীসমিতি স্থাপন করিয়াছেন, পাড়ার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রত্যহ বিনা-বেতনে একঘণ্টা অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, উপযুক্ত পাত্রে যথাসাধ্য দান করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া তাহার বিপন্ন অবস্থা শুনিয়া এবং তাহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মিসেস স্যানিয়াল তাহাকে নিজের ছেলেদের গৃহশিক্ষকরূপে বাহাল করিয়াছেন। তাঁহার একটি ছেলে এবার কলেজে ঢুকিয়াছে, আর একটি স্কুলে পড়ে। মিসেস স্যানিয়াল কিন্তু শঙ্করকে আকার ইঙ্গিতে এই কথাটি বারম্বার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যেহেতু শঙ্কর একটা উচ্চ আদর্শের জন্য লাঞ্ছনাভোগ করিতেছে এবং যেহেতু তিনি চুনচুনের স্বামীর শুশ্রূষা-সম্পর্কে শঙ্করের উদার-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন সেই হেতুই তিনি শঙ্করকে নিজগৃহে স্থান দিতেছেন, অখিল অনিলের জন্য গৃহশিক্ষকের তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ সৎ অথচ সমাজকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত যুবককে সাহায্য করা যে-কোন কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য।

শঙ্কর কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় আসিয়া ঠিক যেন দুইটি উপবাসী মৎকুণের পাল্লায় পড়িয়া গেল। অখিল অনিলের জ্ঞান-স্পৃহা অত্যন্ত তীব্র। তাহারা শঙ্করের বিদ্যাবুদ্ধিকে যেন দোহন করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বড়

না মিলটন বড়, অ্যালজ্যাব্রা শিখিয়া কি উপকার হয়, মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডলের চাপ কি পরিমাণ, মহিলা-কবি তরুদত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্‌টি, জোনাকি আলো দেয় কি উপায়ে, একই মাটি হইতে রস আহরণ করিয়া বিভিন্ন গাছ বিভিন্ন রকম ফুল ফোটায় ও ফল ফলায় কি করিয়া, দুধ এবং ডিমের মধ্যে কোন্‌টি বেশী পুষ্টিকর এবং কেন, মানস সরোবরে নীলপদ্ম ফোটে কি না, ওয়াটার্লু যুদ্ধে কোন্ পক্ষে কত সৈন্য ছিল—ইত্যাকার নানাবিধ জটিল প্রশ্নে তাহারা শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সব সময় সহজ নয়, ছাত্রদের নিকট উত্তর দিতে বারম্বার অপারগ হইলেও কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হয়, সুতরাং উত্যক্ত শঙ্কর যথাসাধ্য তাহাদের এড়াইয়া চলিত, পারতপক্ষে বাড়িতে থাকিত না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সঙ্গতিহীন অসহায় অবস্থায় আশ্রয় পাইয়া শঙ্কর কিছুতেই ইহাদের উপর কৃতজ্ঞ হইতে পারিল না। মিসেস স্যানিয়ালের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জ্ঞানস্পৃহা তাহাকে এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল কোনরকমে কোথাও একটা চাকরি জুটিলে এই উচ্চাদর্শ প্রণোদিত পরিবারের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সে যেন বাঁচে।

প্রুফ রিডিং সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছে এবং প্রকাশবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহার জানা-শোনা একটি প্রেসে তাহাকে ঢুকাইয়া দিতে পারিবেন। মুকুজ্যে মশাই নামক ব্যক্তিটিও একদিন আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি তাহার চাকরির জন্য নানাস্থানে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং যতদিন একটা কিছু না জোটে ততদিন নাকি করিতে থাকিবেন। সেদিন তিনি শঙ্করকে দিয়া চার-পাঁচটি দরখাস্তে সহি করাইয়া লইয়া গেলেন। মুকুজ্যে মশায়ের এই ব্যবহারে শঙ্কর একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। মুকুজ্যে মশাই শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কিত লোক। শ্বশুরবাড়ির তরফ হইতে কোনপ্রকার সাহায্য লইতে তাহার আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হয়। যে আত্মসম্মানের জন্য সে পিতামাতার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছে সেই আত্মসম্মানকে খর্ব্ব করিয়া সে শ্বশুরবাড়ির লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইতে যাইবে কোন লজ্জায়। কাহারও নিকট সে কোন সাহায্য লইবে না, নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ের উপরই তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু এই মুকুজ্যে মশাইকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। লোকটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, তাঁহার নাকি সংসারের কোন বন্ধনই নাই, পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই উপকার করা নাকি তাঁহার পেশা। তিনি বিশেষ কাহারও নন—তিনি সকলের। শিরিষবাবুর সহিতও তাঁহার পরিচয় নাকি আকস্মিক।

শঙ্কর সেদিন যে দরখাস্তগুলিতে সহি করিয়াছিল তাহার একটির ঠিকানা বোম্বাইয়ের একটি পোস্টবক্স। একটি বাংলা মাসিক পত্রিকার জন্য একজন সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। বোম্বাই শহরে কে বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছে! সুরমার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সুরমার চিঠি অনেকদিন পায় নাই, উৎপলও বহুদিন পূর্ব্বে চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে। আর কিছুদিন পূর্ব্বে হইলে শঙ্কর হয় তো সুরমাকে পত্র লিখিত, কিন্তু এখন আর লিখিতে ইচ্ছা হইল না। একদা যে সুরমা তাহার মার্জ্জিত রুচি, সংযত অথচ সাবলীল সৌন্দর্য্য দিয়া তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল সে সুরমা অহরহ নিকটে থাকিলে হয় তো শঙ্করের মানসলোকে বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারিত, কিন্তু সুরমা দূরে চলিয়া গিয়াছে, অন্তরাল ধীরে ধীরে আপন অনিবার্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিস্মৃতির কুহেলিকায় সুরমা কখন যে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে শঙ্কর তাহা বুঝিতেও পারে নাই। দরখাস্ত-প্রসঙ্গে তাহার কথা মনে পড়িল বটে, কিন্তু চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইল না।

এখন শঙ্করের মানসলোক জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে আর একজন। অমিয়া নয়, চুনচুন। মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে আসিয়া এবং চুনচুনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শঙ্কর চুনচুনের ঘনিষ্ঠতর যে পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে সে আরও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত মেয়ে, কিছুতেই বিচলিত হয় না। মিসেস স্যানিয়ালের গৃহের যাবতীয় কর্ম্ম চুনচুন একাই করে, কিন্তু এমন নীরবে এবং এমন হাসিমুখে করে যে শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। কর্ত্তব্যপরায়ণা নিষ্কলুষা মিসেস স্যানিয়াল চুনচুনের দুষ্কৃতির জন্য কথায় কথায় তাহাকে শ্লেষাত্মক উপদেশ দেন, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুইটি যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ফাই-ফরমাস করিয়া করিয়া একদণ্ড চুনচুনকে স্থির থাকিতে দেয় না, মিসেস স্যানিয়ালের দূর-

সম্পর্কের অপুত্রক বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা আসিয়া একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি ও ভ্রূ লইয়া একদৃষ্টে চুনচুনের দিকে চাহিয়া থাকেন (এবং মিসেস স্যানিয়ালের সহিত কর্ত্তব্যদ্যোতক সদালাপ করেন)—কিন্তু চুনচুন এতটুকু বিরক্ত বা বিচলিত হয় না। ইহাদের সহিত অকারণ বাদানুবাদ করিয়া নিজের আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করে না, মুখে অসহায় ভঙ্গি প্রকাশ করিয়া কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে না, নীরবে হাসিমুখে সমস্ত সহ্য করে। শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। তাহার মাঝে মাঝে মনে হয় ওই স্মিতমুখী শান্ত মেয়েটির মনের মধ্যে আর একজন চুনচুন বাস করে, তাহার লক্ষ্য স্থির আছে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিবার জন্য অনিবার্য্য সুনিশ্চিত গতিতে সে পথ অতিবাহন করিতেছে। বাহিরে অকারণে আত্মপ্রকাশ করিয়া সে বিব্রত হইতে চাহে না, বাহিরের জগতকে ফাঁকি দিবার জন্যই সে বাহিরের জগতে অনাড়ম্বরে অতিশয় সাধারণ বেশে থাকে। আসলে সে অসাধারণ, আসলে সে বিদ্রোহিনী, প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে বরণ করে, সামাজিক বা আর্থিক কারণে নয়। যতীন হাজরার যক্ষ্মা-বিধ্বস্ত মুখচ্ছবি শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে পড়ে। চুনচুনের প্রতি সমস্ত মন শ্রদ্ধায় অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। ইচ্ছা করে ওই রহস্যময়ীর অন্তরের রহস্যলোকে প্রবেশ করিয়া দিশাহারা হইয়া যায়।

শঙ্কর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে চুনচুনের কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—একখানা প্রকাণ্ড নীল রঙের মোটর সহসা শঙ্করের পাশেই থামিয়া গেল। মোটরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল শৈল।

"শঙ্করদা, কোথায় চলেছ?"

"শৈল!"

"তবু ভাল, চিনতে পেরেছ—"

"চিনতে পারব না, বলিস কি!"

"কোথা যাচ্ছ তুমি?"

"কোথাও না, এমনি হাঁটছি।"

"আমার সঙ্গে একটু মার্কেটে চল তা হ'লে। অনেক জিনিস কিনতে হবে, তুমি পছন্দ করে দেবে—"

"তার মানে?"

"লক্ষ্মীটি, চল।"

শৈল দ্বার খুলিয়া আহ্বান করিল, শঙ্কর না বলিতে পারিল না।

ঘণ্টা দুই পরে নানারঙের শাড়ি জামা উল, ছিট বাসন, টি সেট এবং টুকিটাকি আরও নানাবিধ জিনিস কিনিয়া শঙ্করকে লইয়া শৈল বাড়ি ফিরিল। মিস্টার বোস বাড়িতে ছিলেন না। তিনি সম্প্রতি যে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহাতে ক্রমাগত 'ট্যুর' করিয়া বেড়াইতে হয়। তিনি 'ট্যুরে' বাহিরে ছিলেন।

শঙ্কর বলিল, "এবার আমি যাই।"

"এখনি যাবে কি, সে হবে না, চল ওপরে চল, কিছুই তো কথা হল না।"

শঙ্করকে উপরে যাইতে হইল।

উপরে গিয়া শৈল বলিল, "এখনও তো আসল কথাই জিগ্যেস করা হয় নি।"

"কি কথা?"

"বউ কেমন হল?"

শঙ্কর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, "কার বউ!"

"তোমার—তোমার গো, লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ভেবেছ কেউ টের পায়নি বুঝি! সব জানি আমি!"

শঙ্কর বুঝিল আর লুকাইবার উপায় নাই।

"কাউকে জানাইনি, তুই খবর পেলি কি ক'রে?"

"কুসমি চিঠি লিখেছে। কুসমিকে মনে পড়ে?"

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো শঙ্করের মনে কুসমির মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। কুসুম শৈলর বাল্যসখী। শৈলর সঙ্গে প্রায় তাহাদের বাড়িতে আসিত, শঙ্করকে দেখিলেই মুচকি হাসিয়া ছুটিয়া পলাইত, কুসুমের কচি মুখখানা তাহার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

"কুসমি খবর পেলে কি করে!"

"সে কপাল পুড়িয়ে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে যে! তোমাদের বাড়ি থেকেই খবর পেয়েছে। তুমি নাকি জ্যাঠামশায়ের অমতে বিয়ে করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন, অমিয়াকে খুব বেশী মনে ধরেছিল?"

"বড্ড"।

উভয়েই মুচকি হাসিয়া পরস্পরের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া

রহিল। তাহার পর শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "বিয়ের আগে তাকে আমি দেখিই নি।"

"তবে ?"

"বিয়ে করবারই ইচ্ছে ছিল না আমার, কিন্তু বাবা যখন পণের জন্যে আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দর-কসাকসি শুরু ক'রে দিলেন তখন আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল, রোখের মাথায় ঠিক ক'রে ফেললুম যে বিনাপণে ওইখানেই বিয়ে করব।"

শৈল ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর ?"

"তাই করলুম—"

"জ্যাঠামশায় কি করলেন ?"

"কি আর করবেন, রেগে আমার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিলেন।"

"ওমা, তাই না কি, তার পর—"

উৎকণ্ঠায় শৈলর দুটি চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"তুমি এখন কি করছ তা হ'লে—"

শঙ্কর গম্ভীর ভাবে মিথ্যা কথা বলিল, "চাকরি করছি।"

"কোথায় ?"

"একটা আপিসে—"

"কোথা থাক ?"

"একটা মেসে।"

"কোন্ মেসে, ঠিকানাটা বল না—"

কিছুদিন আগে শঙ্কর যে মেসটাতে ছিল তাহার ঠিকানাটা বলিয়া দিল। শৈল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একবার তাহার ইচ্ছা হইল শঙ্করকে বলে এখানে আসিয়া থাকিতে, কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হইল, একটু ভয়ও হইল, বলিতে পারিল না। বেয়ারা মোটর হইতে জিনিসপত্রগুলি নামাইয়া আনিয়াছিল, বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, "এগুলো কোন্ ঘরে রাখব মা ?"

"এইখানেই নিয়ে আয়।"

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শৈল বলিল, "ওমা, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। দাদা যে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। চিঠি পাও নি তুমি ?"

"না। কতদিন ফিরেছে ?"

"তা প্রায় মাস দুই হবে। বম্বেতেই শুনছি থাকবে, কি একটা ব্যবসা করবে না কি, শ্বশুর টাকা দিচ্ছে, শ্বশুর খুব বড়লোক তো—"

"ও।"

শঙ্কর আর কিছু বলিল না। সুরমার কথা একবার মনে হইল, উৎপলের মুখটাও মনের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া গেল, কিন্তু মনে তেমন কোন সাড়া জাগিল না। কিছুদিন আগে তাহার যে মন উৎপল এবং সুরমাকে লইয়া মাতিয়াছিল সে মন আর নাই। নূতন মন নূতন জগতে নূতন প্রেরণায় নূতন স্বপ্ন দেখিতেছে। দুইটি ভৃত্য ও বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং জিনিসগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর ইতিপূর্ব্বে একবার বলিয়াছিল আবার বলিল—"অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ করলি তুই—"

"অনর্থক কেন ?"

"শাড়ি, বাসন, টি-সেট নিশ্চয়ই তোর যথেষ্ট আছে, তবু কি দরকার ছিল আবার কেনবার ?"

"কি নিয়ে থাকব তা না হ'লে! ওদের নেড়ে চেড়েই তো সময় কাটে। আঃ, দুলে চুলটা আটকে গেল, ছাড়িয়ে দাও না শঙ্করদা—"

ছাড়াইয়া দিতে দিতে শঙ্কর বলিল, "শাড়ি নেড়ে চেড়ে তোর সময় কাটে ? কি যে বাজে কথা বলিস।"

"সত্যি বলছি।"

"গান বাজনা শিখছিলি যে—"

"শিখেছি কিছু কিছু, কিন্তু শোনাব কাকে, ঘরের দেওয়ালকে! সেইজন্যে আর ভাল লাগে না ওসব।"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল।

শঙ্কর বলিল, "এবার আমি যাই, আমার কাজ আছে।"

"কাজ, কাজ কাজ! সবারই খালি কাজ!"

একটু অস্বাভাবিক ঝাঁজের সহিত কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া ঝাঁজটাকে মোলায়েম করিবার জন্য শৈল হাসিল।

"কাজ না করলে চলে কই।"

"না, তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না, অনেকক্ষণ থাকতে হবে এখানে, তোমার সেই কবিতাগুলো তোমার মুখে শুনব আবার—"

"কোন্ কবিতাগুলো—"

"সেই যেগুলো ইস্কুলে লিখেছিলে।"

"সেগুলো কোথায় ?"

"আমার কাছে আছে। খাতাখানা চুরি করেছিলাম মনে নেই ? বার করে আনি, থাম—তুমি বিছানার ওপর ভাল ক'রে বস।"

একরূপ জোর করিয়া শঙ্করকে বিছানার উপর বসাইয়া শৈল বাহির হইয়া গেল এবং কয়েক মিনিট পরে জীর্ণমলাট একখানা খাতা আনিয়া শঙ্করের হাতে দিয়া বলিল, "পড়।"

নিজের লেখা সমঝদার শ্রোতাকে পড়িয়া শোনাইবার দুর্দ্দমনীয় বাসনা শঙ্করের মনে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। তবু সে বলিল, "সত্যি বলছি, আমার কাজ আছে এখন।"

"লক্ষীটি, তোমার পায়ে পড়ি, এখনি চলে যেও না। চা আনতে বলেছি, চা খেয়ে তবে যেও, ততক্ষণ পড় না একটু শুনি—বড্ড একগুঁয়ে তুমি শঙ্করদা—"

শৈল ঠোঁট উল্টাইয়া অভিমান করিল। শঙ্করের সেই বহুদিন আগেকার কিশোরী শৈলকে মনে পড়িল, সে-ও ঠিক এমনি করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া কথায় কথায় মুখভার করিত।

দুই ঘণ্টা পরে শঙ্কর যখন শৈলর বাড়ি হইতে বাহির হইল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কবিতার খাতাটা সমস্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শৈল তাহাকে ছাড়ে নাই। শৈলর শেষ কথাগুলি শঙ্করের কানে বাজিতেছিল—"মাঝে মাঝে তুমি এসো শঙ্কর-দা, আমার বড্ড একা একা লাগে"—আর বাজিতেছিল শৈলর প্রশ্নটা "বউ কেমন হয়েছে সত্যি বল না, নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী, রং কেমন, আমার চেয়েও ফরসা ?"

আসিবার সময় শৈল একটা কাগজে মুড়িয়া নূতন কেনা একখানা দামী শাড়ি অমিয়ার জন্য দিয়াছে। উপহার ! শৈল কিছুতেই ছাড়িল না, শঙ্করকে লইতেই হইল। প্যাকেটটা বগলে করিয়া শঙ্কর ধর্ম্মতলার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পাশের বারান্দায় সজ্জিত পুরাতন পুস্তকগুলি শঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে সরিয়া গিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। কি চমৎকার চমৎকার সব বই ! লুব্ধ আগ্রহে সে বই বাছিয়া বাছিয়া সাজাইতে লাগিল। এ সব বই সে কোনদিন পড়িবে কি-না, পড়িবার সময় পাইবে কি-না তাহা ভাবিয়া দেখিল না। একগাদা বই বাছিয়া ফেলিল।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্কর যখন বাসায় ফিরিল তখন তাহার বগলে একগাদা বই, কিন্তু শাড়ির প্যাকেটটি নাই। অর্দ্ধমূল্যে শাড়িটা বিক্রয় করিয়া সে বইগুলি কিনিয়া আনিয়াছে।

আরও খানিকক্ষণ পরে স্তূপীকৃত বইগুলি সামনে রাখিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। শাড়িখানা বিক্রয় করিয়া তাহার মনটা কেমন যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিল। শৈল যদি জানিতে পারে কি মনে করিবে, অমিয়া শুনিলেই বা কি ভাবিবে !

চুনচুন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"এত বই কোথা থেকে আনলেন ?"

"কিনে আনলাম।"

"কেন ?"

"পড়ব—"

চুনচুনের দৃষ্টিতে বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। শঙ্করের মনের গ্লানিটুকু কাটিয়া গেল।

ক্রমশঃ



প্রত্যাবর্ত্তনের পথে

ডকৃটর অক্ষয়কুমার ঘোষাল এম-এ, পিএচ্-ডি

(২)

পরের দিন জাহাজ ছাড়িবে এই সংবাদে যে আনন্দ পাইলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যদি কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার যে মনভাব হওয়া সম্ভব আমাদেরও অনেকটা সেইরূপই হইল। মধ্যাহ্নে আহারের পর একবার সহরে যাইয়া আর কয়েকটা জিনিস যাহা কিনিবার প্রয়োজন ছিল শেষ করিয়া ফিরিলাম এবং পরের দিনের যাত্রার সময়ের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু পরদিন ৩০শে জুন রবিবার সকালে যখন আর একটী বিজ্ঞপ্তি বাহির হইল যে জাহাজ ১০টায় না ছাড়িয়া বেলা ২টায় ছাড়িবে তখন এই আগ্রহাতিশয্য নৈরাশ্য ও অধৈর্য্যে পরিণত হইল। আশঙ্কা হইল হয়তো আবার এক বিজ্ঞপ্তি বাহির হইবে আজ জাহাজ ছাড়িবে না। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত বেলা ২টার সময় জাহাজ সত্য সত্যই লিসবন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে তেজো নদী বাহিয়া সমুদ্রের দিকে চলিল। পরদিন বিকালে (১লা জুলাই) আমাদের জাহাজ ফরাসী মরক্কোর বন্দর কাসাব্লাঙ্কা পৌছবার কথা। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সমুদ্রে পড়িলাম, সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত আজ চমৎকার দেখা গেল। পরদিন বেলা একটার সময় কাসাব্লাঙ্কার উপকূল অস্পষ্টভাবে দেখা দিল। দুইটার মধ্যে কাসাব্লাঙ্কার উপকূলে নোঙ্গর করিল। শোনা গেল যদি ডকে স্থান পাওয়া যায় তাহা হইলে জাহাজ কিছু মাল তুলিয়া ঐ রাত্রেই আবার যাত্রা করিবে। কিন্তু বন্দরে অনেক জাহাজ পূর্ব্ব হইতে থাকায় স্থানাভাববশতঃ আমাদের জাহাজকে সমুদ্রেই থাকিতে হইল। আবার সেই অনিশ্চিত প্রতীক্ষার পালা। এই স্থানে আমাদের অবস্থান ও তাহাতে বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা সুরু হইল; কেননা এস্থানটা ফরাসী উপনিবেশ এবং ফরাসী জাতি তখন সম্প্রতি নাৎসী কবলিত, সুতরাং উভয় পক্ষ হইতেই বিপদের আশঙ্কা। এইভাবে দুই দিন কাটিল। সময় কাটান ক্রমশই সমস্যার ব্যাপার দাঁড়াইতেছে এবং দেশে পৌছানর প্রত্যাশিত সময় কেবলই পিছাইতেছে। শুধু যে পিছাইতেছে তাহা নয়, ক্রমেই অনিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে। ৩রা জুলাই বুধবার সকালে জাহাজ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইল শীঘ্রই বন্দরে প্রবেশ করিবে এবং মাল তোলা শেষ হইলেই হয়তো বিকালের দিকে ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু অল্প কিছু দূর যাইয়া ঠিক বন্দরে ঢুকিবার মুখে যখন জাহাজ আবার নোঙ্গর করিয়া বসিল তখন আবার নৈরাশ্যের পালা, যেন আমাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা হইতেছে। সবচেয়ে অধৈর্য্যের কারণ এই যে জাহাজের কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে এই সব রহস্যজনক গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা কোন খবরই পাই না। যাহাকেই জিজ্ঞাসা করা যায় সকলের মুখেই এককথা "I don't know"—"আমি জানি না।" এর পরে আর কথা চলে না। যাহাই হউক বিকালের দিকে জাহাজ আবার চলিতে আরম্ভ করিল এবং অবশেষে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অনেকগুলি ফরাসী রণতরী—"ডেস্ট্রয়ার" এবং "ক্রুজার" এবং কয়েকখানি ফ্রান্স হইতে পলাতক যাত্রীবাহী জাহাজ দেখা গেল। ত্রিবর্ণরঞ্জিত ফরাসী জাতীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত। ইহারা একটা সমৃদ্ধ জাতি ও সাম্রাজ্যের পতনের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিল। সমুদ্র হইতে যতটুকু দেখা গেল তাহাতে কাসাব্লাঙ্কা সহরটী বিশেষ বড় বলিয়া মনে হইল না। চতুর্দ্দিক যে মরুভূমি বেষ্টিত তাহার আভাষ পাওয়া গেল। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই আরবদেশীয় এবং কতক নিগ্রো। প্রায় সন্ধ্যার সময় আমাদের জাহাজ ডকে বাঁধিল। নোটীশ বাহির হইল—পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় ছাড়িয়া যাইবে। বেলা আটটা হইতে নৌকাযোগে যাত্রীরা সহরে যাইতে পারিবে এবং একটার সময় সহর হইতে শেষ নৌকা যাত্রীদিগকে লইয়া ফিরিবে। আমরা নূতন সহর দেখিবার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা দরকার। সর্ন্ধ্যার পর ডেকে ডেক চেয়ার পাতিয়া আমরা অলসভাবে সময় কাটাইতেছি হঠাৎ অদূরে কামানের গর্জ্জনের মত শব্দ শোনা গেল। প্রথম মনে হইল হয়তো

অদূরে কোথাও ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, কেননা আকাশ মেঘলা ছিল। বাজ পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই আবার সেই শব্দ। তখন ভাবিলাম হয়তো নিকটে কোথাও গোলন্দাজ সৈন্যরা কামান ছোঁড়া অভ্যাস করিতেছে। কিন্তু পরদিন কাগজে প্রকৃত বার্ত্তা বাহির হইল।—ওরান্ (Oran) নামক স্থানে বৃটিশ নৌবহর ও ফরাসী নৌবহরএর মধ্যে একটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—যাহার ফলে কয়েকখানি ফরাসীর জাহাজ ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে এবং কাসাব্লাঙ্কার নিকটেই একস্থানে একটা বৃটিশ ক্রুজার দেখা যাওয়াতেই মরক্কোর উপকূলরক্ষী সৈন্যরা গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। বুঝিলাম আমরা এখনও বিপদ-সঙ্কুল স্থানের সীমা অতিক্রম করি নাই। পরদিন দুপুর বেলা আর একটা ঘটনাও এই প্রতীতির আরও প্রমাণ দিল। দুপুর বেলা আহারাদির পর আমরা ডেকে পাদচারণা করিতেছি এমন সময় অল্প দূর দিয়া একখানি বিমানের ঘর্ ঘর্ শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কামানের শব্দ। বোধ হয় বিমানখানি বৃটিশ; ফরাসী এন্টিএয়ারক্রাফ্ট কামান তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া কামান ছুঁড়িয়াছে। এদিকে পরদিন প্রত্যূষে আমরা সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সারিয়া প্রথম ট্রিপে কূলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যাত্রীদের জন্য নৌকাও আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের সঙ্গে চলিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যাহারা ব্রিটিশ প্রজা তাহাদের তীরে নামিতে হইলে ব্রিটিশ কন্‌সালের একটা অনুমতি লাগিবে। কিন্তু ব্রিটিশ কন্‌সাল তখনও পর্য্যন্ত কোন অনুমতি পত্র পাঠান নাই। এদিকে জাপানী যাত্রীদের জন্য জাপানী কন্‌সালের ছাড়পত্র আগেই আসিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহারা দলে দলে নৌকা করিয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া সহরে চলিল, আমরা হতাশ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তবে আমাদের এই হতাশার মধ্যেও একটা সান্ত্বনা, শুধু সান্ত্বনা কেন আনন্দেরও কারণ ছিল। সেটা এই যে অনেকগুলি ইংরাজ যাত্রীও আমাদের সঙ্গে সমান অবস্থায়ই পড়িয়াছিল। ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে ব্যবহারগত বৈষম্যে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়াছি এবং আমাদের কাছে এতটা স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে—যে এ ব্যবস্থা হইতে একটুও বৈচিত্র্য আমাদের চক্ষে নূতন ঠেকে। সুতরাং অন্ততঃ একবারও তাহাদিগকে আমাদের সঙ্গে সমাবস্থায় পাইয়া একটু নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করিলাম—স্বীকার করিতে ক্ষতি নাই। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক খবর আনিলেন যে আমাদের পাশপোর্ট দেখাইয়া তীরে যাইবার অনুমতি হইয়াছে। আশান্বিত হইয়া শাস্ত্রী সৈন্যদের পাশপোর্ট দেখাইয়া নৌকায় গিয়া উঠিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কোম্পানীর নিযুক্ত নৌকা পাইলাম না। একখানি নৌকা শাস্ত্রীর সাহায্যে মাথা পিছু ২॥০ ফ্রাঙ্কে ভাড়া করিয়া আমরা অপর তীরে পৌছিলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিশ নাগরিকদের সহরে যাইবার অনুমতি দিতে নারাজ। স্থানীয় ফরাসী দৈনিকে পূর্ব্বদিনের ব্রিটিশ ও ফরাসী নৌবাহিনীর মধ্যে খণ্ড যুদ্ধের খবর পাওয়া গেল, তাছাড়া নাকি কাসাব্লাঙ্কার অদূরে মার্জাইকবীর নামক একটা স্থানেও কিছু সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা যে কামান গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম তাহার তাৎপর্য্য এখন বুঝিলাম। এই ঘটনার সঙ্গে ব্রিটিশ প্রজাদের সহরে যাইবার অনুমতি না দেওয়ার খুব সম্ভবতঃ কিছু সম্পর্ক থাকিতে পারে, অন্ততঃ অস্বাভাবিক নয়। কাজেই কাসাব্লাঙ্কা পরিদর্শনের বাসনা মনেই পোষণ করিয়া জাহাজে ফিরিতে বাধ্য হইলাম। এদিকে জাহাজে ফিরিয়া দুশ্চিন্তাজনক খবর পাইলাম। জাহাজে তখনও মাল বোঝাইএর কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মাল না লইয়াও জাহাজ ছাড়িবে না। মাল বোঝাই সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে শুনিলাম এবং সে সম্বন্ধে কোম্পানির লণ্ডন ও হেড অফিসের সহিত বেতারে অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছে। মোটের উপর সেদিন দুইটার সময় যে জাহাজ ছাড়িবে না এটা নিশ্চিতই জানা গেল, কিন্তু কবে এবং কখন ছাড়িতে পারে সে সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। বিকালের দিকে দেখা গেল জাহাজে প্রচুর Phosphates বোঝাই হইতেছে; দেখিয়া আশা হইল এখন আর জাহাজ ছাড়িতে দেরী বিলম্ব হইবে না এবং সন্ধ্যার দিকে যাত্রা করিবে। পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার (৫ই জুলাই) সকাল আটটায় জাহাজ কেপ্ টাউনের দিকে যাত্রা করিবে। পরের দিন সকালে জাহাজে যাত্রার আয়োজন দেখিতে ডেকে আসিলাম। উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হইতে প্রায় ৯টা বাজিল, আমাদের ধৈর্য্য

আর যেন বাধা মানে না। অবশেষে পথ-প্রদর্শক জাহাজ ধীরে ধীরে পথ দেখাইয়া আমাদের জাহাজকে বন্দরের বাহিরে লইয়া চলিল। আমরা মুক্ত সমুদ্রে পড়িলাম। পাইলট নামিয়া গেল, তখন কাপ্তেন জাহাজের দায়িত্ব লইলেন। আবার সেই পুরাতন দৃশ্য, কেবল জল আর জল। দিনটা বেশ মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা, হাওয়াও বেশ প্রবল। আমরা মরক্কোর উপকূল বামে রাখিয়া আত্‌লান্তিক মহাসাগরের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়াছি। জাহাজে প্রত্যহ বেলা ১২টায় বেতারবার্ত্তা লইয়া একটা ক্ষুদ্র একপৃষ্ঠা টাইপ করা পত্রিকা বাহির হয়। একমাত্র ইহাই বহির্জ্জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ রক্ষা করে, আমরা ইহার জন্য প্রত্যহ দুপুরবেলা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। সেদিনের পত্রিকায় অনেক নূতন সংবাদ পাওয়া গেল। প্রথম, ব্রিটিশ নৌবাহিনী কর্ত্তৃক ফরাসী নৌবাহিনী আক্রমণ সম্বন্ধে পার্লামেন্টে চার্চ্চিলের বক্তৃতা; দ্বিতীয়, বল্কানে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি, রুমানীযার উপর হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার সম্মিলিত আক্রমণের আশু সম্ভাবনা এবং সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের সতর্কতামূলক নানা উপায় অবলম্বন, যেমন হংকং হইতে নাগরিকদের অপসারণ, সিঙ্গাপুরে বৈদেশিক জাহাজের গতিবিধি সম্বন্ধে কড়াকড়ি ইত্যাদি। এখন হইতে কেপ্‌-টাউন পর্য্যন্ত বৈচিত্র্যহীন একটানা জীবন আরম্ভ হইল। সমস্ত দিন প্রায় ডেকেই কাটে, দিগন্ত বিস্তাবিত জলের দিকে চাহিয়া। কচিৎ এক একটা সামুদ্রিক জীব বা মাছধরা নৌকা চোখে পড়িলে একটা মস্ত বৈচিত্র্য বলিযা মনে হয়। দিনের মধ্যে চারিবার খাওয়া (যদিও আমাদের জাপানী জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর সে'নামটা আদৌ দেওয়া চলে না) আমাদের একটানা দিনগুলি যতি-চিহ্নের মত, ৮টায় প্রাতরাশ, ১২টায় মধ্যাহ্ন-ভোজন, ৩টায় চা ও ৬টায় নৈশভোজন। উপকরণের নাম না হয় নাই করিলাম, কেন না এই সব গালভরা শব্দের তাহা হইলে মর্য্যাদা হানি হইবে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দিনের ঐ সময়গুলি কাছাইয়া আসিলেই আমরা ঘড়ি দেখিতে থাকি ও তাড়াহুড়া করিয়া তথাকথিত খাওয়ার ঘরের দিকে ছুটি। খাদ্যের পরিমাণ ও শ্রেণী যতই হীন, সমুদ্রের প্রকৃতিদত্ত প্রচুর ওজোন সেবন জন্য আমাদের ক্ষুধার মাত্রা ততই প্রবল। চিড়িয়াখানায় খাবার সময় সেখানকার অধিবাসীদের যেমন দেখিয়াছি, আমাদের এই সময়কার অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম; তবে তফাৎ এই—তারা আমাদের মত অর্দ্ধভুক্ত থাকে না। আর একটা উপভোগ্য দৃশ্য হয় স্নানের সময়। স্নানের ঘর খোলে ১০টায় সময়, বন্ধ হয় কোনদিন তিনটায় কোনদিন চারিটায়, বন্দরে অবস্থান কালে বন্ধই থাকে, স্নানের বালাই তখন থাকে না। ১০টা বাজিবার প্রায় আধঘণ্টা আগে থেকেই স্নানের ঘরের কাছে যাত্রীদের হানা পড়ে। তখন হইতে সব সময়ই একজন বা দুইজন সেখানে অপেক্ষায় আছে দেখা যায়। কলিকাতার বস্তিতে সকালবেলার কথা মনে পড়ে, একটী কল তাতে দশ বারটী পরিবারের জল সরবরাহ;—পিছন পিছন সার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে কল পাইবার জন্য—ইহাও তাই। অথবা বিলাতে সিনেমায় নিম্নশ্রেণীর সিটের জন্য ফুটপাথে অপেক্ষমান সারিবদ্ধ জনতার কথাও মনে পড়ে। তাহার উপর দুঃখের বোঝা বাড়াইবার জন্য আমাদের পাঞ্জাবী সহযাত্রীদল যেন ষড়যন্ত্র করে' এসেছেন। তাঁরা যদি একবার প্রবেশ লাভ করলেন তো আর কারও আশা ঘণ্টার পর ঘণ্টার জন্য নির্ম্মূল। তাঁরা একজনের পর একজন ঢুকবেন, প্রাণভরে স্নান তো করবেনই, উপরন্তু এক স্তূপ করে সাবান কাচাও সারবেন। অন্য লোক যে স্নানের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ নাই। এটা অবশ্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা গলদ। আমরা নিজের সুবিধাটা খুব বেশী বুঝি, এতটা বুঝি যে তাতে অপরের অসুবিধার কথা একেবারে মনেই পড়ে না! বিলাতে কিন্তু অশিক্ষিত মুটে মজুর শ্রেণীর লোকেরও অপরের অসুবিধা সম্বন্ধে একটা বেশ সচেতন ভাব দেখিয়াছি, এমন কি ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যেও। এইটাও হইল পৌরদায়িত্ব বোধের (civic sense) ভিত্তি। আমাদের মধ্যে এই পৌর-চেতনা যতদিন না মজ্জাগত হইতেছে ততদিন সত্যিকারের স্বরাজের মূলপত্তন হইতে পারে না।

কাসাব্লাঙ্কা হইতে যাত্রা করিবার পরদিন (৬ই জুলাই শনিবার) দুপুরবেলা আমাদের জাহাজ কানারিজ্‌ (Canarese) দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া চলিল। দুঃখের বিষয় অনেকটা দূর দিয়া যাওয়ায় কিছুই দেখা গেল না; কেবল ধোঁয়ার মত তরঙ্গায়িত একটা সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী চোখে পড়িল। দিনগুলি বেশ চমৎকার, সমুদ্র বেশ প্রশান্ত,

সমুদ্রযাত্রায় কোন গ্লানি নাই। তবে আমরা যতই বিষুব-রেখার নিকটবর্ত্তী হইতেছি ততই গরম বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ায় গরমটা মোটেই অসহনীয় অনুভব করি না। রাত্রে পরিষ্কার আকাশে তারার মালা জ্বলে, শুক্লপক্ষের চাঁদ নিত্যই ক্রমশ কলেবরে বাড়িতেছে। প্রথম কয়দিন জ্যোৎস্না তত খেলে নাই। এই আবছা আলোয় অসংখ্য তারাখচিত অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্রের মিলন—ইহার মধ্যে সসীম বলিতে কেবলমাত্র আমরা কয়টী প্রাণী আর আমাদিগকে বহন করিয়া এই জাহাজখানি—কেমন একটা রহস্যময় (mystic) আবহাওয়ার সৃষ্টি করে—যাহা নিতান্ত গদ্য-প্রকৃতির লোকের মনকেও স্পর্শ না করিয়া পারে না। ক্রমে আমরা আফ্রিকার উপকূল হইতে সরিয়া আতলান্তিকের বক্ষে আসিয়া পড়িলাম। দিন রাতের মধ্যে সুদূর 'দিকচক্ররেখা বিস্তারি নীল জলের মেলা' ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। একাদিক্রমে এতদিন ধরিয়া সমুদ্রের এমন শান্তমূর্ত্তি খুব কম সময়ই পাওয়া যায়। কেবল একদিন কিছু বর্ষণ হওয়াতে আমাদের কেবিনে বন্দী হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাছাড়া আমরা অপ্রত্যাশিত পরিষ্কার আবহাওয়া পাইয়াছি এবং মুক্ত আকাশের তলে ডেকেই দিনগুলি কাটাইয়াছি, প্রচুর আলো ও হাওয়া প্রাণভরিয়া উপভোগ করিয়াছি। আমরা যতই কেপটাউনের নিকটে যাইতেছি রাত্রে ততই জ্যোৎস্না বাড়িতেছে। অনন্ত সমুদ্রের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির এই অপূর্ব্ব রূপ কখন ভুলিব না, আমার পক্ষে তাহার যথাযথ বর্ণনা করাও সাধ্যাতীত। দার্জ্জিলিং ও শিলং পাহাড়ে জ্যোৎস্নার মেলা দেখিয়াছি, পুরীর সমুদ্রতটে জ্যোৎস্না দেখিয়াছি, নিভৃত নিরালা পল্লীপ্রান্তরেও জ্যোৎস্না দেখিয়াছি—আবার অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব লীলা দেখিলাম। এর মধ্যে তুলনামূলক বিচার বোধ হয় সম্ভব নয়; যখন যেটী চোখে পড়িয়াছে তখন তাহাতেই অভিভূত হইয়াছি এবং মনে হইয়াছে বোধ হয় ইহার চেয়ে সুন্দর আর কিছু হইতে পারে না, অথচ প্রত্যেকের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে, তাহাদের আবেদন বিভিন্ন রকমের যেটা অনুভব করা যায় কিন্তু বিশ্লেষণ করা চলে না। উপরতলার ডেক হইতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, অতি মনোরম দৃশ্য; যতদূর দৃষ্টি যায় জ্যোৎস্নাপ্লুত রূপালি ঢেউএর খেলা, তাহার উপর জ্যোৎস্নাদীপ্ত আকাশের চন্দ্রাতপ। বিশ্বপ্রকৃতির গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আমাদের জাহাজ একটানা কল কল শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে, মনে হয় আমরা যেন একটা বিরাট মহান আত্মার সম্মুখীন। নিশীথ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া ও চন্দ্রের অবস্থান মনে করাইয়া দিল যে ঘুমের সময় আসিয়াছে। কেবিনে ফিরিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম।

২১শে জুলাই রবিবার সকাল প্রায় ১০টার সময় আমরা কেপটাউনে পৌছিলাম। দুই একদিন পূর্ব্বেই আভাষ পাইয়াছি যে আমরা ডাঙ্গার নিকট আসিয়াছি, কেননা দুইটী সামুদ্রিক পক্ষী (Sea gull) দিবারাত্রি আমাদের জাহাজের সঙ্গ লইয়া চলিয়াছে। ইহাদের একটা অদ্ভুত বাতিক দেখিলাম, জাহাজ পাইলেই তাহাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলে। যতই ডাঙ্গার কাছে চলিয়াছে ততই ইহাদের দল বৃদ্ধি হইতেছে। সেদিন ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলাম জাহাজ সমুদ্রের কিনারা দিয়া চলিয়াছে, বহুদূর বিস্তৃত একটা পাহাড় শ্রেণী দেখা যাইতেছে। সকাল হইতেই বাদলা, বৃষ্টি বেশ জোরে হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়া, ডেকে যাইবার উপায় নাই। পোর্টহোলের মধ্য দিয়া যতদূর দেখা যায় তাহাতেই ক্ষান্ত হইতে হইল। পর পর কয়েকখানা জাহাজ বিপরীত দিকে যাইতে দেখা গেল। বুঝিলাম বন্দরের কাছেই আসিয়াছি। একটু পরেই দূরে দুই তিনটা পাহাড়ের তলায় সারি সারি ঘর বাড়ী দেখা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা লঞ্চ আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিল এবং একজন সরকারি কর্ম্মচারী জাহাজে উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে লঞ্চ তাঁহাকে লইয়া ফিরিয়া গেল। আমাদের জাহাজ বন্দরের সম্মুখে সমুদ্রের মধ্যেই নোঙ্গর করিয়া বসিল। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, যদিও মেঘলা রহিয়াছে। আমরা ডেকে আসিয়া জটলা করিতেছি এবং জাহাজ কখন বন্দরে প্রবেশ করিবে সে সম্বন্ধে জাহাজের যে কোন কর্ম্মচারীকে দেখি জিজ্ঞাসা করিতেছি কিন্তু যথা-রীতি কোন সন্তোষজনক উত্তরই পাই না। অগত্যা সকলকেই স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইল এবং আবার অপেক্ষার পালা সুরু হইল। এখান হইতে সহরটী খুব সুন্দর দেখাইতেছে। পর পর তিনটী পাহাড়ের গায়ে মেঘ লাগিয়া বৃষ্টি হইতেছে বোঝা যায়। আমাদের দেশে দার্জ্জিলিং বা

শিলং পাহাড়ে এদৃশ্য অতি সাধারণ। পাহাড়গুলির পাদদেশে সমুদ্রের বেলাভূমি বাহিয়া সহরটী গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্যেই বেশী মনে হইল। বাড়ীগুলি আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে তৈয়ারি। আমাদের জাহাজ ঠিক ডকের সামনে আসিয়াছে। এখান হইতে সহর দুই দিকেই প্রায় সমান বিস্তৃত। বৈকাল প্রায় ৪টার সময় জাহাজ হঠাৎ মন্থর-গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল, বুঝিলাম তীরে ভিড়িবার অনুমতি হইয়াছে। ধীরে ধীরে ডকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাহাজ কূলে বাঁধিল। সে'দিন রবিবার, কাজেই সব ছুটি। নিতান্ত যাহাদের জাহাজ সম্পর্কে কোন কাজ আছে তাহারাই কয়েকজন মাত্র লোক আসিয়াছে। আমরা উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতেছি সহরে যাইবার অনুমতি মিলিবে কিনা, কি সিদ্ধান্ত হয় জানিবার জন্য। পূর্ব্বেই ক্যাপ্টেন নোটিশ জারী করিয়াছেন যে যাত্রীদের সহরে যাইবার অনুমতি ইমিগ্রেশন্ অফিসারের সম্মতি সাপেক্ষ। জাহাজ বাঁধিলে ইমিগ্রেশন অফিসার, টমাসকুকের লোক, কুলি ও পুলিশ কর্ম্মচারী জাহাজে উঠিল। এখানে যে সব যাত্রী নামিবে তাছাড়া প্রথমে পাশপোর্ট লইয়া ইমিগ্রেশন্ অফিসারের কাছে উপস্থিত হইল পরীক্ষার জন্য। তাহাদের পরীক্ষা শেষ হইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। তার পর আমাদের অর্থাৎ দূরগামী যাত্রীদের পালা। শুনিলাম আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার হুকুম হইয়াছে যে কেবলমাত্র যাঁহারা শ্বেতাঙ্গ তাহারাই নামিবার অনুমতি পাইবে অন্যের অনুমতি নাই। আমরা এই রকমই আশঙ্কা করিয়াছিলাম। আমরা যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছি সে সম্বন্ধে এই হুকুম আমাদের সচেতন করাইয়া দিল। অগত্যা কেপটাউন দর্শনের আকাঙ্খা সংবরণ করিয়া কেবিনে ফিরিয়া গেলাম।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম আসিল না। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আমার অন্য ভারতীয় বন্ধুরা কেবিনে ফিরিলেন। শুনিলাম তাঁহারা সহরে গিয়াছিলেন। জাহাজের রক্ষী শান্ত্রীর কাছে প্রথমে ডকের মধ্যে বেড়াইবার অনুমতি পান। কিন্তু ডকের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া সেখানকার রক্ষীদের বলিয়া কহিয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে যাইবার অনুমতি পান। তবে একে অজানা জায়গা, তাহার উপর রাত্রি, কাজেই বেশীদূর যাইতে পারেন নাই; তাহা ছাড়া সেদিন রবিবার, দোকান বাজার সমস্ত বন্ধ। তাঁহাদের এই কাহিনী শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলাম যে আমি এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিয়াছি! ভাবিলাম, পরদিন একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব যদি কিছুক্ষণের জন্য সহরে যাওয়া সম্ভব হয়। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না।

প্রত্যুষে উঠিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমরা তিনজনে গেলাম। কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রের রক্ষী বদল হইয়াছে, নূতন রক্ষী কিছু কড়া। সে বলিল—বিশেষ অনুমতি ছাড়া কাহাকেও যাইতে দিবার তাহার উপর হুকুম নাই, যেহেতু জাহাজ ১০টায় ছাড়িয়া যাইবে। আমরা বলিলাম যে আধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব প্রতিশ্রুতি দিতেছি। কিন্তু কোন ফল হইল না। অগত্যা চিরন্তন নিয়মে ডেকে পায়চারি আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম যে একজন পারসী ভদ্রলোককে রক্ষী ছাড়িয়া দিল। তখন আমরা আর একবার চেষ্টা করিব ভাবিলাম। এবারে ফল হইল, কিন্তু বলিল যতশীঘ্র হয় ফিরিতে হইবে। আমরাও প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিলাম। ডকের প্রবেশদ্বারের কাছে আবার এক বাধা। রক্ষীকে পাশপোর্ট দেখাইলাম, তাহারা বিশেষ অনুমতি পত্র চাহিল। বলিলাম এছাড়া কোন অনুমতি পত্র নাই, আমরা জাহাজের যাত্রী, জাহাজ অল্পক্ষণ পরেই ছাড়িয়া যাইবে, আমরা প্রায় একমাস জাহাজে আছি; নিকটের দোকান হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনিয়াই এখনি ফিরিয়া আসিব, ইহা ছাড়া আমাদের অন্যকোন অভিসন্ধি নাই। তখন সে আমাদের পাশপোর্টে ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দিল—অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব এই সর্ত্তে। কিন্তু সেটা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের নিজেদের গরজেই শীঘ্র ফিরিতে হইবে। জাহাজ ছাড়িবে বেলা ১০টায়, তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, এই অতিরিক্ত সাবধানতার দুইটী কারণ, প্রথম যুদ্ধকালীন কড়াকড়ি, দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের ভারতীয় বিদ্বেষ নীতি। এদের ভয়, পাছে কোন ভারতীয় কোন ছলে এখানে বসবাস আরম্ভ করে। সেইজন্য পূর্ব্বদিন ইমিগ্রেশন্ অফিসার শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্য কাহাকেও বিশেষ অনুমতি পত্র দিবার হুকুম দেন নাই। আজিকার প্রগতিশীলযুগেও তথাকথিত পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী জাতিদের মনে এই বর্ণবিদ্বেষের সঙ্কীর্ণতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইয়া ক্ষুব্ধ হইলাম, কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে এদের হৃদয়ের দারিদ্র্যে একটু অনুকম্পাও অনুভব করিলাম। ইংলণ্ডে লোকের মনে যে এই বর্ণবৈষম্য নাই তাহা বলিব না, কিন্তু তাহা এইরূপ প্রকট নয়, এরকম কুৎসিৎ নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতে দেখি নাই। ধূর্ত্ত-ব্যবসাদারের স্বাভাবিক রীতিতে পয়সা পাইলেই হইল, মনের ভাব মনে পোষণ করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমব্যবহার দেখাইতে তাহারা নারাজ নয়। অবশ্য এই জাতীয় কপটাচার অপেক্ষা নগ্ন সত্য ভাল কিনা বিচার্য্য বিষয়। আমার মতে অসুন্দর জিনিসের একটা আবরণ থাকাই ভাল—যদি তাহাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া চলা সম্ভব না হয়। অল্প সময়ের মেয়াদে সহরের বিশেষ কিছুই দেখা হইল না, কয়েকটা রাস্তা একটু ঘুরিয়া একটী ডিপার্টমেণ্ট্যাল ষ্টোরের সন্ধান করিয়া কিছু দ্রব্যাদি কিনিয়া ফিরিয়া আসিলাম। যেটুকু দেখিবার সুযোগ হইল তাহাতে বুঝিলাম সহরটী একেবারে ইংরাজি ছাঁচে ঢালা। দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকসম্প্রদায় শ্বেতাঙ্গ এবং অধিকাংশই ইংরাজ ঔপনিবেশিক। কাজেই তাহারা এদেশে ইংরাজী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, দোকানপাট, ব্যবসায় কেন্দ্র, সিনেমা, থিয়েটার, এমন কি পোষাক পরিচ্ছদও যাহা কিছু নজরে পড়িল সমস্তই ইংরাজী ধরণের, কোথাও একটু বিশেষত্ব নাই। এই ধারণা পরে ডারবান দেখিয়া আরও বদ্ধমূল হইল। সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই মনে হইল। আমরা যেদিকটা দেখিলাম সেদিকটা ব্যবসাকেন্দ্র, যেদিকটা লোকের বসবাস সেদিকটা সময়াভাবে দেখা হইল না। শুনিয়াছি সেখানে বর্ণ বৈষম্য আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ উচ্চভূমিগুলি শ্বেতাঙ্গদের জন্য রক্ষিত। ভারতীয় ও আদিম অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও নিকৃষ্ট স্থানে বাস করিতে পায়; অন্য অনেক বিষয়েও এই প্রকারের বৈষম্য ও দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। যতপ্রকারের হীন ও দৈহিক শ্রমসাধ্যকার্য্য কালা লোকেরাই করে। কতকগুলি হোটেল ও সিনেমায় ইউরোপীয় ভিন্ন অন্যের প্রবেশাধিকার নাই।

দশটার অল্পপূর্ব্বেই জাহাজে ফিরিলাম। দেখিলাম জাহাজে তখন রসদ বোঝাই হইতেছে। তাহাতে একটু আশা হইল হয়তো আমাদের শোচনীয় খাদ্যের কিছু উন্নতি হইতে পারে। আসিয়াই শুনিলাম, জাহাজে কোম্পানীর এজেণ্ট যাত্রীদের চিঠি তার প্রভৃতি লইতেছেন। ঠিক একমাস হইল ইংলণ্ড ছাড়িয়াছি, ইতিমধ্যে বাড়ীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই, এই প্রথম সুযোগ খবর পাঠাইবার। চিঠি ও টেলিগ্রাম আগেই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, এজেণ্টের মারফৎ পাঠাইলাম। এদিকে জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। জাহাজ ছাড়া দেখিতে ডেকে আসিলাম। যথা-রীতি সিঁড়ি নামিল, নোঙর উঠিল, দড়িদড়া খোলা হইল, ধীরে ধীরে জাহাজ পাইলট-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিল। আমরা আশ্বস্ত হইলাম, এখানে আর বিলম্ব হইল না। বোম্বাই পৌছানোর পূর্ব্বে আর এক জায়গায় মাত্র থামা। লিভারপুল হইতে আমরা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাইল আসিয়াছি একমাসে। ডারবান এখান হইতে তিনদিনের পথ। ডারবানে দুই তিনদিন ধরিবার কথা। সেখানে জাহাজ কয়লা ও জল লইবে। তারপরই বোম্বাই বারো দিনের পথ।

জাহাজের জীবন কয়েক দিন পরেই একঘেয়ে হইয়া ওঠে, তার উপর তৃতীয় শ্রেণীর শোচনীয় ব্যবস্থা ক্রমেই অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। আর কয়েক দিন পরে যে দেশে পৌছাতে পারিব এই আশাই আমাদের দুর্গতির মধ্যে একমাত্র সম্বল হইয়াছে। মানুষের দুঃখের দিন শেষ হইতে চায় না, তখন মানুষ যদি এই রকম একটা আশার আলোকের সন্ধান না পায়—জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে। সে রকম কিছু না থাকিলেও মানুষ অন্ততঃ মনে মনে একটা কিছু রচনা করিয়াও লয়; আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা, প্রত্যহই দিনের মধ্যে কতবার যে জাহাজে আর কতদিন থাকিতে হইবে হিসাব করিয়া লই তাহা বলা যায় না; এইটা আমাদের সময় কাটাইবার এবং আলাপ করিবার একটী প্রধান বিষয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যহই সকালে উঠিয়া ভাবি আর কতদিন বাকি রহিল, আবার রাত্রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি এই ভাবিয়া একটা দিন কমিল। এক একটী দিন কমিতেছে, যেন মনে হইতেছে স্কন্ধ হইতে এক একটা জগদ্দল পাথরের ভার নামিতেছে। কেপ্‌টাউন হইতে যেদিন আমরা বাহির হইলাম দিনটী বেশ পরিষ্কার ছিল। আগের দিন মেঘ এবং কুয়াশায় ঢাকা থাকায় কেপ্‌টাউনের পাহাড়গুলির দৃশ্য সমুদ্র হইতে ভাল করিয়া দেখা যায় নাই।

আজ দিন পরিষ্কার থাকায় তিনটী পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তৃত সমুদ্র বেলাভূমির উপর কেপটাউন যখন অল্পে অল্পে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল খুবই সুন্দর লাগিল। আবার সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম।

ডারবানে পৌছিবার পূর্ব্বদিন আমাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটা ঘটনা একটু সাড়া জাগাইল। শিখ-সহযাত্রিগণ তাহাদের গ্রন্থসাহেবের পূজা উপলক্ষে আমাদের সকলকে প্রাতরাশে এবং মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিল। তাহারা গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিসই সঙ্গে আনিয়াছিল এবং প্রত্যহই জাহাজের খাবার ছাড়া নিজেরা কিছু কিছু রান্না করিয়া খাইত, যেমন রুটী, ডাল, তরকারি ইত্যাদি। কিন্তু জাহাজের সমস্ত যাত্রীকে দুইবার খাওয়াইবার মত দ্রব্যসম্ভার যে তাহাদের সঙ্গে আনিয়াছিল তাহার ধারণা ছিল না। ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া রান্নার বন্দোবস্ত করিল। ভোর হইতেই উঠিয়া স্নান সারিয়া রান্না আরম্ভ করিয়াছে। ৮টার সময় ব্রেকফাষ্টের সঙ্গে বহুদিন পরে নিমকি ও হালুয়া পরম পরিতোষ সহকারে খাওয়া গেল। মধ্যাহ্ন ভোজনেও পুরি, নিম্‌কি, ছোলার ডাল, ফুলকপির তরকারি ও সুজির হালুয়া মিলিল। বহুদিন একঘেয়ে জাপানী অখাদ্য খাইবার পর আমাদের দেশী খাওয়া, পাক উচ্চ-শ্রেণীর না হইলেও খুবই ভাল লাগিল। মনে মনে গ্রন্থ-সাহেবকে যথেষ্ট প্রণতি জানাইলাম। সেদিন সকাল হইতেই হাওয়ার বেশ জোর এবং বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়িতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় রীতিমত ঝড় আরম্ভ হইল। ডেকে দাঁড়ানো অসম্ভব। সমুদ্রে ঝড়ের আকৃতি সম্বন্ধে এই প্রথম অভিজ্ঞতা। 'উত্তাল তরঙ্গমালা' শব্দটা এতদিন বইএই পড়িয়াছিলাম কিন্তু আজ তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। সমুদ্র যেন সত্য সত্যই উন্মত্ত ও আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে। ঢেউএর পর ঢেউ ফুলিয়া ফাঁপিয়া পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতেছে, অবশেষে পরস্পরের সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, তাহার ফলে চূর্ণীভূত জলকণাগুলি স্তম্ভের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইতেছে; সমুদ্রের উপর যেন শত শত দানবের কুরুক্ষেত্র অভিনয় হইতেছে। এ যেন নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইয়াছে; প্রকৃতির এরূপ রুদ্র-মূর্ত্তি কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আদিম মানবের মনে ঝঞ্ঝা, বজ্র, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনাগুলি কেন যে অতিমানবীয় শক্তির লীলারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা এই দৃশ্য দেখিলে সহজেই বোঝা যায়। ক্রমেই ঝড়ের তীব্রতা বাড়িতে লাগিল। আমাদের জাহাজের অবস্থা পদ্মার ঝড়ের মুখে ক্ষুদ্র মাছধরা ডিঙ্গির মতই হইল। একবার পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চে উঠিতেছে, আবার তলাইয়া যাইতেছে। সৌভাগ্যবশতঃ হাওয়ার গতি আমাদের অনুকূলে ছিল, সুতরাং কোন ভয়ের কারণ ছিল না, অধিকন্তু জাহাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইল।

কেবিনে ফিরিয়া দেখিলাম পোর্টহোলগুলি কঠিনভাবে বন্ধ করা হইয়াছে। পোর্টহোলের মধ্য দিয়া উন্মত্ত ঢেউএর লীলা দেখিতে কৌতূহল লাগে। তাহারা নিষ্ফল আক্রোশে আমাদের পোর্টহোলে আছ্‌ড়া পিছ্‌ড়ি করিতেছে। প্রকৃতির এই রুদ্র লীলা দেখিতে দেখিতেই নিদ্রা আসিল।

পরদিন ২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার। চমৎকার রৌদ্র-দীপ্ত প্রাতঃকাল। সমুদ্র আবার কখন যে এমন প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল জানি না। জাহাজ উপকূল বাহিয়া চলিয়াছে, অনতিদূরে ধূসর বালুময় অসমতল তটভূমি দেখা যাইতেছে। অপরাহ্ন সাড়ে চারিটার সময় আমরা ডারবান পৌছাইলাম। এখানেও নামিবার অনুমতি সম্বন্ধে কেপ্‌টাউনের মতই অবস্থা। আমাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক বিশেষ অনুমতির জন্য ইমিগ্রেশন্ অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ঠিক ছিল তাঁহাকে এই কথা বলা হইবে যে আমরা কয়েকজন ছাত্র আছি, অনেকের টাকার অভাব হইয়াছে, সঙ্গে বিলাত হইতে যা সব ড্রাফ্‌ট্ নেওয়া হইয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া ভাঙ্গাইবার উপায় ছিল না, সুতরাং এখানে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে এবং কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কেনাকাটার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয় তিনি যাইবার পূর্ব্বেই ইমিগ্রেশন্ অফিসার ফিরিয়া গিয়াছেন। জাহাজের Purser বলিলেন, আপনারা যে কয়জন যাইতে চান তাঁহাদের নাম দিয়া একটা দরখাস্ত করিলে আমরা ইমিগ্রেশন্ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পাঠাইয়া দিতে পারি। তাহাই করা হইল, তবে অনুমতি মিলিবে না এটাই ধরিয়া রাখিলাম।···রাত্রে যখন আলো জ্বলিল সহরটীকে খুব সুন্দর দেখাইল; অনেকটা লিসবনেরই মত ধাপে ধাপে সহর

গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মন এতই অবসন্ন এবং বাড়ীমুখো হইয়াছে যে, নূতন স্থানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবারও আগ্রহ যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। তবুও পরদিন বেলা ৯টার সময় যখন সত্য সত্যই আমাদের কয়েকজনের নামে নামিবার অনুমতি পত্র আসিল, সুপ্ত আগ্রহ আবার যেন জাগ্রত হইল। আমরা যাইবার আয়োজন করিতেছি এমন সময় এক নূতন বিপত্তি। আমাদের শিখ্ সহযাত্রিগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁহাদেরও কেন অনুমতি আসে নাই এবং যখন তাঁহাদের আসে নাই তখন তাঁহারা কাহাকেও যাইতে দিবেন না; আর আমরা যদি জোর করিয়া যাইতে চাই, তাহা হইলে তাঁহারা এমন কি বল প্রয়োগেও বিরত হইবেন না। এই অবস্থায় কি করা যায় জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। এদিকে খাওয়ার সময় হইল। খাওয়ার পর আমরা ডেকে পায়চারি করিতেছি এমন সময় একজন গুজরাটী ভদ্রলোক আমাদেরই মধ্যে একজন বাঙ্গালী বন্ধুকে খোঁজ করিতে আসিলেন। তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে এক গুজরাটী ভদ্রলোকের আলাপ হয়, তাঁর পরিজনবর্গ ডারবানে বাস করেন ব্যবসা উপলক্ষে। তিনি তাঁহাদের ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিলেন যদি আপনাদের জাহাজ ডারবানে থামে তাহা হইলে আমার আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। আমাদের বন্ধু কেপ্‌টাউন হইতে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্র পাইয়াই এই ভদ্রলোক তাঁর খোঁজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'ডকের বাহিরে কার রাখিয়া আসিয়াছি। বেশী সময় নাই, আপনারা এখনই আমার সঙ্গে চলুন। আপনাদের সহর দেখাইয়া একবার আমাদের বাড়ী লইয়া যাইব, সকলে আলাপ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।' ততক্ষণে শিখ বন্ধুদেরও একটু উত্তেজনা কমিয়াছে এবং এমন একটী সুযোগও ছাড়া যুক্তিযুক্ত হইবে না ভাবিয়া সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরা চারিজন বাঙ্গালী রওনা হইলাম। তখন বেলা প্রায় ১২॥০টা, আমাদের জাহাজ ছাড়িবার সময় অপরাহ্ন৪॥০টা। সময় অত্যন্ত অল্প। আমাদের জাহাজ যেখানে থামিয়াছে সে স্থানটা অনেকটা পরিখার মত, সহরটা অপর পারে। ফেরি বোটে পারাপার হইতে হয়। পার হইয়া অপর পারে নামিয়াই তাঁহার গাড়ীতে চড়িলাম—তিনি নিজেই চালাইয়া লইয়া গেলেন। সহরের নানা দিক ঘুরিয়া—অবশেষে একটা পাহাড়ের উপর গাড়ী উঠিতে লাগিল। রাস্তাটা এতই সরল হইয়া উঠিয়াছে যে মনে হইল বোধ হয় সকল গাড়ীর পক্ষে এ রাস্তায় ওঠা সম্ভব নয়। আশে পাশে সুন্দর সুন্দর বাগান সমেত বাংলো বাড়ী। এ দিকটা আইনদ্বারা রক্ষিত শুধু য়ুরোপীয়দের জন্য; এখানে য়ুরোপীয় ছাড়া অন্য কাহারও জমি কিনিবার বা বাস করিবার আইনতঃ অধিকার নাই। এখানকার তীব্র বর্ণবৈষম্য ও শুচিবায়ু সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বলিলেন। য়ুরোপীয়দের বাজার আলাদা, বিদ্যায়তন আলাদা, বাসস্থান আলাদা, প্রমোদভবন আলাদা, ক্লাব আলাদা, এমন কি সমুদ্র বেলা-ভূমিও দুই ভাগে ভাগ করা, য়ুরোপীয়দের স্নান বা ক্রীড়ার অংশটা সযত্নে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষিত। পার্কে, ট্রামে, বাসে য়ুরোপীয়দের বসিবার স্বতন্ত্র আসন, ট্রাম বাসের জন্য অপেক্ষা করিবার স্থানও ভিন্ন। শিক্ষার জন্য এখানে আবার মনুষ্য জাতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—য়ুরোপীয়ন্, নেটিভ্ ও ইণ্ডিয়ান। তিন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই ভাবে যাহাদের সকল সময় শুচিতা রক্ষার জন্য সন্তর্পণে শিহরিয়া থাকিতে হয় তাহাদের মানসিক অবস্থা কি সুস্থ না বিকারগ্রস্ত! তাহারা কি অনুকম্পার পাত্র নহে? আজিকার জগতে এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? বিংশ শতাব্দীতেও সভ্যতাভিমানী মানুষের পক্ষে এরূপ শুচিবায়ুগ্রস্ত ও সঙ্কীর্ণমনা হওয়া যে কিভাবে সম্ভবপর হইতে পারে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। কৌতুকের বিষয় এই যে এই জাতিরই বর্ত্তমান অধিনায়ক জেনারেল স্মাটস্ গত যুদ্ধের সময় বড় বড় আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন, 'লিগ্ অফ্ নেশনস্'এর একজন পাণ্ডা ছিলেন এবং এবারের যুদ্ধেও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে স্বৈরাচারের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া প্রচার করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কপটাচারের এমন দৃষ্টান্ত বোধ হয় খুব বেশী নাই। এই স্থান হইতে সমুদ্রবেষ্টিত সারা সহরটীর দৃশ্য অতীব উপভোগ্য। সহরটীর আকৃতি একেবারে ইংরাজী ছাঁচে ঢালা, কোথাও একটুও তফাৎ নাই, তবে বোধ হয় অনেক ইংরাজী সহরের চেয়েও পরিচ্ছন্ন। সহর বেড়ানো শেষ করিয়া তাঁহার বাসায় ফিরিতে প্রায় ৪টা বাজিল। এই পল্লীটিতে প্রধানতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের বাসস্থান ও দোকান। আমাদিগকে একটী কক্ষে বসান হইল;—খুব

সাধারণ আসবাব পত্র—দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল, সুভাষ বসু প্রভৃতি ভারতীয় নেতাদিগের ছবি। মহাত্মা গান্ধী ইহাদিগের নিকট-আত্মীয়। শুনিলাম দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মার কর্ম্মক্ষেত্র Phoenix settlement এখান হইতে বেশী দূরে নয়; তাঁর এক পুত্র এখনও সেখানে থাকেন এবং মহাত্মা-প্রতিষ্ঠিত কাগজ সম্পাদনা করেন; তিনি এখানেও প্রায়ই আসা যাওয়া করেন।

ইংলণ্ডে যাঁহাদিগের আত্মীয়স্বজন আছেন তাঁহাদের অনেকেই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর সংবাদ পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া সমবেত হইয়াছিলেন। চায়েরও আয়োজন করিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ তাঁহাদিগের সহিত আলাপ আলোচনার পর আমরা বিদায় লইলাম। সেই ভদ্রলোকই—তাঁর নাম কে-পি-দেশাই—আবার আমাদের গাড়ী করিয়া খেয়া ঘাটে পৌঁছাইয়া দিলেন। যখন পার হইতেছি তখন আমাদের জাহাজে ঘণ্টা বাজিতেছে, যাত্রীদিগকে জানাইতেছে যে ছাড়িবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

জাহাজে ফিরিবার অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বিদায় লইয়া ভারত সমুদ্রে পাড়ি দিতে যাত্রা করিলাম। যদিও এখনও প্রায় দুই সপ্তাহের পথ তবুও বেশ একটা স্বস্তির আনন্দ অনুভব করিলাম এই ভাবিয়া যে এর পরই আমাদের গন্তব্য বোম্বাই। খোলা সমুদ্রে পড়িতেই দেখা গেল বেশ জোর হাওয়া আছে এবং সমুদ্র বেশ অশান্ত। ডেকে দাঁড়ান অসম্ভব, কাজেই কেবিনে আশ্রয় লইতে হইল।

ডারবানের পর দুই তিন দিনে আমরা উপকূল বাহিয়াই চলিয়াছি, তার পর জাহাজ ভারত মহাসাগরে পাড়ি দিয়া বোম্বাই অভিমুখে চলিতে সুরু করিল। মধ্যে কয়দিন জোর এবং প্রতিকূল হাওয়ার জন্য জাহাজের গতি একটু কমিয়া গেল। আগে গড়ে যে হারে যাইতেছিল এখন আর সে'হারে যাইতেছে না। পৌঁছাইতে বিলম্বের আশঙ্কায় আমরা একটু অধীর হইলাম। আমরা যতই বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই সমুদ্র শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। এক সপ্তাহ পরে ৩রা আগষ্ট শনিবার দ্বিতীয়বার বিষুবরেখা অতিক্রম করিলাম। ভারতীয় বর্ষাকালীন আবহাওয়ার প্রথম ছোঁয়াচ পাইলাম, ভাদ্রমাসের মতই বায়ুলেশ শূন্য ও গুমট ভাব; দুই একদিন বৃষ্টিও পাওয়া গেল। সকলেরই মুখে আসন্ন নিষ্কৃতি জনিত একটা যেন প্রসন্নতা। বাকি দিন কয়টা কাটিতে লাগিল অধীর আগ্রহ ও আনন্দের মধ্যে। দুই দিন আগে হইতেই সব জিনিসপত্র গোছগাছের ধূম পড়িয়া গেল—যদিও সেটা দুই এক ঘণ্টার ব্যাপার। অবশেষে ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার সুসমাচার বহন করিয়া ক্যাপ্টেনের বিজ্ঞপ্তি বাহির হইল যে আমরা ৮ই তারিখে সকালে বোম্বাই পৌঁছাইব। যেন অকূলে কূল পাইলাম। নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া একটা গন্তব্য স্থানের সন্ধান পাইয়া সকলেই যেন শিশুর মত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন;—অতি নিকটেই আমাদের 'Journey's end'। যদিও উত্তেজনা উদ্দীপনার মধ্যে সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল তবুও মনে হইতে লাগিল যেন এক একটা মিনিট এক এক যুগ। কিন্তু সময় ঠিক আপন গতিতেই চলে কাহারও অপেক্ষায় থাকে না বা কাহারও তাগিদে দ্রুত চলে না। যথা সময়ে ৮ই আগষ্ট বৃহস্পতিবারের প্রভাত আসিল। শিশুর মতই অধীর আগ্রহে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকে গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম এবং কেবল দূরে দেখিতে লাগিলাম ডাঙ্গার কোন সন্ধান মেলে কিনা। অবশেষে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট যেন একটা পাহাড় দূরে দেখা গেল। অল্পে অল্পে সেটা স্পষ্ট হইতে লাগিল। আমাদের তখনকার মানসিক অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, একমাত্র যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সভ্যসমাজে আচার ব্যবহারে কতকগুলি বিধি নিষেধ যদি না মানিয়া চলিতে হইত তাহা হইলে আমাদের সেই আনন্দে নৃত্য করা বা এই রকম কোন উপায়ে তাহার অভিব্যক্তি করা অসঙ্গত হইত না। কানে যেন একটা সুর বাজিতেছিল,—

"বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী।"

দেশের মাটির সঙ্গে আমাদের যে একটা নাড়ীর টান আছে তাহা দেশে থাকিতে কোন দিন অনুভব করি নাই। তবে দুই বৎসর পূর্ব্বে শরতের এক শান্ত রাত্রে যখন আমাদের জাহাজ "ব্যালার্ড পিয়ার" ছাড়িয়া দেশের মাটি হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দুলিতে দুলিতে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিল সেই দিন ইহা আর একবার উপলব্ধি করিয়াছিলাম। মনে পড়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিয়ারের মাথার আলোকিত ঘড়িটী দেখা গিয়াছিল ততক্ষণ ডেকের উপর দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিলাম, চোখ ফিরাইতে পারি নাই। তার পর বিলাতে অবস্থান কালেও মধ্যে মধ্যে প্রাণের মাঝে দেশের মাটির সেই ডাক শুনিয়াছি; আবার আজ এই বর্ষা প্রভাতে সেই পুরাতন 'ব্যালার্ড পিয়ারের' দর্শন পাইয়া আর একবার নূতন করিয়া তাহা অনুভব করিলাম—Home, sweet home, there's no place like home. জীবনে এই আনন্দের মুহূর্ত্তটিকে কোনদিন ভুলিতে পারিব না। আনন্দ যেন আজ কল্পলোক ছাড়িয়া মনের মধ্যে বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরা দিয়াছে। মনে মনে বলিলাম—দেশের মাটি আমি তোমায় প্রণাম করি,—
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কীর্ত্তন

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কলিকাতা শহরের ঠিক মাঝখানে, সাহেবপাড়ার একেবারে মধ্যস্থলে তিনপুরুষে-সাহেব চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ীতে কীর্ত্তনের আসর। কথাটা বিশ্বাস্য নয় বটে; কিন্তু সত্য কথা! আসরও যেমন তেমন অথবা যা তা আসর নয়, মশগুল আসর। বাড়ীর মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড হল। হলের চতুর্দ্দিকে কাচের আলমারিতে তিন পুরুষ-অর্জ্জিত ও অধীত আইনের কেতাবের রাশি। হলের দেওয়ালগুলিতে তিন পুরুষের নানা বয়সের, নানা ভঙ্গির, নানা পোষাকে তোলা ফোটোগ্রাফ হইতে আঁকা বড় বড় তৈল চিত্র। সাহেব, সাহেবের পিতা, পিতামহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নীপতিদ্বয়, মায় দু'টি শ্যালকের ব্যারিস্টারী-বেশের পূর্ণাবয়ব রঙীণ চিত্র প্রায় কড়িকাঠ হইতে বিলম্বিত। হলের চারপাশে চারখানি পর্দ্দাঢাকা ঘর, আজমোটা পর্দ্দাগুলা তোলা আছে বলিয়া সুদৃশ্য সাজসজ্জা দেখা যাইতেছে। একখানি সাহেবের স্টাডি বা কনসাল্টেসন রুম—খাঁটী বিলাতী কায়দায় সাজানো। আর একখানি শয়ন-গৃহ, আধুনিক রুচি লীলায়িত। অপরখানি ডাইনিং রুম। তাহার সাজসজ্জাও বড় কম নয়। দেখিলেই ঢুকিয়া পড়িয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা হওয়া খুব স্বাভাবিক। ছুরি, কাঁটা, চামচ, ন্যাপকিন, মায় সস্-ভিনিগার-মাস্টার্ডের শিশি চক্ চক্চকায়িত। শেষ ঘরখানি বোধ করি মেম্ সাহেবের ড্রেসিং রুম, তাহার শোভাও অপরূপ।

না হইবে কেন? ব্যারিস্টার সমাজে চ্যাটার্জ্জী সাহেব যে মুখ্যি কুলীন, অভঙ্গ। পিতামহ ঐ ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, পিতা লক্ষ লক্ষ না হোক্, সহস্র সহস্র এবং সেদিন পর্য্যন্ত চ্যাটার্জ্জী সাহেবও সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করিয়াছেন। বছর দুই হইল, ক্লান্ত হইয়া ব্যবসায়ে অবসর লইয়া একটা দেশী জাহাজ কোম্পানীর সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন।

হলে পুরু করিয়া আগ্রার সতরঞ্চ বিছানো, তার উপরে বড় বড় জাজিম পড়িয়াছে। দেওয়াল ঘেঁষিয়া কতকগুলি সোফা কৌচ চেয়ার রাখা হইয়াছে, যাঁহারা ডিনার স্যুটে বা 'স্বাভাবিক' বেশে আসিবেন, তাঁহাদের জন্য এই ব্যবস্থা। দেশী ধুতি-চাদরবান ব্যক্তিরা আসরেই বসিতে পারিবেন। আসরের মধ্যস্থলে বৃত্তাকারে কীর্ত্তনীয়ারা বসিয়াছেন। শ্রীখোল হইতে শ্রীকরতাল সবই শোভা পাইতেছে। প্রত্যেকের গলায় বেল ফুলের মালা। যিনি মধ্যস্থলে বসিয়া রূপার রেকাবি হইতে এলাচ লবঙ্গ বাছিয়া শ্রীমুখে দিতেছেন, তাঁহার বেশভূষারও যেমন জমক, মালারও তেমনই বাহার। বেলের খুব মোটা গোড়ে, মাঝে মাঝে গোলাপ যেন সোনার হারের মাঝে মাঝে ডায়মণ্ড সেট্! আসরে ট্রে ট্রে পান, কৌটা কৌটা সিগ্রেট্, দেশলাই যত্রতত্র পড়িয়া। কোচ-সোফাগুলির অধিকাংশই খালি।

ধুতি-চাদর একদিকে বসিয়াছেন, শাড়ী-ব্লাউজ অন্যদিকে। ধুতি-চাদরের সংখ্যাধিক্য হইলেও ঔজ্জ্বল্য ও শোভা অন্যত্র। মুনিজন মন হরে।

কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছিলেন,

> শতেক বরষ পরে
> বঁধুয়া আইল ঘরে
> —রাধিকার অন্তরে উল্লাস।

গায়ক সুকণ্ঠ, সুরূপ, সুবেশ। খোলের বোল্ চমৎকার। তবলার চাঁটি স্পষ্ট। মৃদঙ্গের আওয়াজ গম্ভীর। কীর্ত্তনীয়া এক একটি কলি নানা স্বরে, নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গিতে গাহিয়া যাইতেছেন, কথাগুলা যেন প্রকাণ্ড হলময় ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে; শ্রোতৃবর্গের চোখের উপর কীর্ত্তনীয়া আর নাই—যেন সত্য সত্যই শ্রীমতী রাধা প্রেমাস্পদকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, কোথায় রাখেন, কি করেন, কাঁদেন না হাসেন, আকুলি-বিকুলি ভাব।

কীর্ত্তন খুব শীঘ্রই জমিয়া উঠিল। পান-সিগ্রেটের দিকে কাহারও মন নাই। মাথার পাগড়িতে 'সি' য় আঁটা ব, বেয়ারা চা-সরবতের ট্রেগুলি লইয়া মিছাই আনাগোনা করিতেছে, কেহ লয় না। আগের দিন বিরহ হইয়া

গিয়াছে, আজ মিলন। পূর্ব্বে রাস, মান-ভঞ্জন এ সবও হইয়া গিয়াছে।

দোহার চমৎকার। কীর্ত্তনীয়া যেমন ধরাইয়া দিয়া বসিয়া রেশমী রুমালে মুখের, ঘাড়ের, হাতের ঘাম মুছিতে লাগিলেন—দোহারই আসর জমাইয়া রাখিল। শ্রীখোলের কাটা কাটা বোল্, মুগুর ডালে পেঁয়াজ ফোঁড়নের মত!

ক্রমে কোচ্ সোফাগুলি ভরিয়া উঠিল। 'সাহেব মেম'গণ আফ্টার ডিনার প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে বসিয়া কেহ সিগার টানিতেছেন, কেহ বা সিগ্রেটই ধরাইয়াছেন। কিন্তু চ্যাটার্জ্জী সাহেব কোথা? উঁহু, কৌচ সোফায়ও তিনি নাই! তাঁহার গৃহিণীকে ত দেখিতেছি—মেম্ সাহেব কৌচ সোফায় না বসিয়া ভার্নাকুলার শাড়ীদিগের সঙ্গে বসিয়া নিবিষ্ট মনে গান শুনিতেছেন। কিন্তু সাহেব কোথা?

হরি হরি! এ কি দেখিলাম! দেখিলাম যদি, বিশ্বাস করিতে পারি না কেন? জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, অসম্ভব কিছু দেখিলে প্রকাশ করিবে না; লোকে উপহাস করিবে। বোধ করি সেইজন্য, শেয়ান ঠকিলে বাপকেও বলে না। কিন্তু আমি গোপন করিতে পারিব না। বলিব। ঐ দেখ, সিঁড়ি পার হইয়া হলে ঢুকিবার পথে প্রথম থামটার পাশেই শান্তিপুরে কালাপাড় ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি পরিহিত ঐ যে সুগৌরকান্তি সুশ্রী ব্যক্তি, গলায় বেলের সরু মালা, গোঁফ কামানো, মাথায় মস্ত টাক, খালি পা—উনিই মিঃ চ্যাটার্জ্জী, বার-য়্যাট-ল ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, ভারত ষ্টীম নেভিগেশন। ভারত নেভিগেশন বড় চাট্টিখানি কথা নয়। খাস্ বিলাতী পি-এন্-ওর সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতেছে—দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ। তাহারই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ও সর্ব্বেসর্ব্বা চ্যাটার্জ্জী সাহেব। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা! কড়া মনিব ও দুর্দ্দান্ত সাহেব বলিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জীর নামে সমাজের ঘাটে ও আঘাটে, বাঘ, গরু, হরিণ, ভেড়া—একসঙ্গে জল খায়! এহেন চ্যাটার্জ্জী সাহেব ধুতি, পাঞ্জাবি, খালি পা! সুরেন্দ্র বন্দ্যো বা রবীন্দ্র ঠাকুর দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছেন, পঞ্চানন তর্করত্ন বা ফণী তর্কবাগীশ টিকিহীন হইয়াছেন একথা বিশ্বাস করা যেমন কঠিন, প্রবলপ্রতাপ চ্যাটার্জ্জী সাহেব—লণ্ডনের বণ্ড ষ্ট্রীট-মেক্ স্যুট না পরিয়া ধুতি, পাঞ্জাবি! আবার বলি, হরি! হরি! কি দেখিলাম!

কিন্তু অদৃষ্টে যে অধিকতর বিস্ময় অবলোকন লেখা ছিল, কীর্ত্তনান্তে তাহাও দেখা গেল।

হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্ততে:

বলিয়া কীর্ত্তনীয়া আসরে মস্তক স্পর্শ করিলে, ধুতী-চাদরওলা অনেকের মাথাই নত হইল বটে, সেই সঙ্গে চ্যাটার্জ্জী সাহেবও মস্তক অবনমিত করিলেন। হরি! হরি!

বারান্দায় কীর্ত্তনীয়াদের জন্য জলযোগের প্রচুর আয়োজন ছিল; তাঁহাদের সেখানে বসাইয়া দিয়া চ্যাটার্জ্জী সাহেব অন্তর্হিত হইলেন। জলযোগান্তে কীর্ত্তনীয়ারা যখন বিদায় লইলেন, তখন মিঃ কে, সি, চ্যাটার্জ্জী বার-য়্যাট-ল দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই নহিলে শোভা কি মানায়? তবে কথা এই যে, সুপুরুষ ব্যক্তি যাহা পরে, তাহাই শোভন। ধুতি পাঞ্জাবিতেও তিনি কম সুপুরুষ ছিলেন না!

সাহেব ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পৌনে বারো। ইস্—বলিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, খাবার দিতে বলো। বয় খবর দিল, খানা টেবিল 'পর! সাহেব ডিনারে বসিলেন।

ডিনার টেবিলে দুইটি নবাগত ব্যক্তি ছিলেন। সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তস্য বধূ। তাঁহারা সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছেন, কাকা কীর্ত্তন ও ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রশ্নোত্তরে, গল্পে ডিনার টেবিল খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়ারই কথা।

কীর্ত্তনীয়া সুরেশবাবু। কোন্ একটি বে-সরকারী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। কলেজের অধ্যক্ষ জাপান ভ্রমণে যাইবেন, জাহাজে স্থান পাওয়া দায়। সুরেশবাবু চ্যাটার্জ্জী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবেদন করিতেই অসম্ভব সম্ভব হইয়া গেল, স্থান মিলিল। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক উভয়েই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে গেলেন, সাহেব বড় ব্যস্ত, হাঁ করিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, ছাট্স্ অল্ রাইট! অধ্যক্ষ বেচারী মুখচোরা লোক, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না পাইয়া প্রস্থান করিলেও অধ্যাপক রহিলেন। কৃতজ্ঞতাটা ত তাঁহারই বেশী। কে তিনি, অজেনা অচেনা একটা লোক বই ত নয়; তাঁহার কথাতেই চ্যাটার্জ্জী সাহেব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া কত হাঁক-

ডাক, কত তদ্বির-তল্লাস করিয়া তবে না মৈত্র মহাশয়কে কেবিনে একটু স্থান দিতে পারিয়াছিলেন। সাহেব লাঞ্চে যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন, অধ্যাপক হাত কচলাইতে কচলাইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে আপনি আমার যে রকম সম্মান"—"ইয়েশ্। হোয়াট্ এল্স্?" সুরেশবাবুর হাত কচলানো বন্ধ হইয়া গেল, কথাও বন্ধ। "দেন্ এক্সকিউজ মি।" "কিন্তু আর একটা আবেদন আছে। ইচ্ছে একদিন কীর্ত্তন শোনাই?" সাহেব এক নিমেষ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "কীর্ত্তন? গান? ভেরী ওয়েল্, কাম এণ্ড সি মি ইন্ মাই হাউস—যে কোনদিন।" "যে আজ্ঞে ধন্যবাদ!"

তাহার পর তিন-চার দিন কীর্ত্তন হইয়াছে; সাহেবের যে ভালই লাগিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও অনেকের—যদিচ তাঁহারাও সাহেব—ভাল লাগিতে সুরু করিয়াছে। চ্যাটার্জ্জী সাহেব আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন, সুরেশবাবু, আপনার বেগার বাড়বার ভয় দেখতে পাচ্ছি। সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, তাঁর দয়া!

লোকটি বিনয়ী। বৈষ্ণবের ইহা ধর্ম্ম ও মর্ম্ম।

সুরেশবাবুর গরদের জোড় ধোপদস্ত, চাঁপা ফুলের রং, চক্চকে; কপালে চন্দনের শিখা সুস্পষ্ট ও সুসম্বদ্ধ; কণ্ঠে রসের জোয়ার-ভাঁটার অপরূপ সংমিশ্রণ—ইহার ব্যতিক্রম নাই। কয়দিন কলেজ আফিস আদালত বন্ধ ছিল, সুরেশবাবু দলবল সহ দূর পল্লীগ্রামে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন, পাঁচ-দশখানা গ্রাম ঘুরিয়া আসিতে দিন কুড়ি দেরী হইয়া গেল—প্রায়ই হয়! এবার ফিরিয়া আসিয়া কলেজের চিঠি পড়িয়া দেখিলেন, গবর্ণিং বডি তাঁহার পুনঃ পুনঃ কলেজ কামাইয়ের জন্য দুঃখিত মনে তাঁহাকে—ইত্যাদি।

যাক্, বাঁচা গেল। একটা বন্ধন ঘুচিল।

"ও কুব্জার বন্ধু" ভাঁজিতে ভাঁজিতে সুরেশবাবু স্নানাদি সমাপনান্তে পুনরায় গরদের জোড় পরিধান করিতেছেন, গৃহিণীর প্রবেশ। গৃহিণীর চেহারাখানি নধর, মাংসল; কথাগুলি স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, প্রাঞ্জল।

পনেরো-কুড়িদিন নেচে কুঁদে এসেও সাধ মেটে নি, এখনি আবার বর সজ্জা পরা হচ্ছে যে দেখি! বলি লজ্জা ঘেন্নার মাথা না হয় খেয়েই বসে আছ; ভালই করেছ, আমরা যে ক'টা প্রাণী ঘরে পড়ে রইলুম, তাদের খাওয়া দাওয়ার একটা ছাই পাঁশ বিলি ব্যবস্থা করে গেলে কি তোমার গোবিন্দজী গোঁসা করতেন?

এর অর্থ কি গৃহিণী?

মরণ দশা আর কি! অর্থ যেন জানেন না, ন্যাকা! মাস কাবার হয়ে গিছলো, জানতে না? স্কুল না কলেজ কি বলে পোড়ার দশা, মাইনের টাকা ক'টা এনে ফেলে দিয়ে যে চুলোয় যাবার গেলে ত আমাদেয় বলবার কিছুই থাকতো না।

মাইনের টাকাটা এনেছিলুম গিন্নী, কিন্তু দল নিয়ে নাম-গান করতে যেতে হলো কি-না, ও ক'টা টাকা তাই সঙ্গে নিয়েই যেতে হয়েছিলো। তাতেও কুলোল না, মূলোজোড়ে পাঁচটি টাকা ধার ক'রে রেখে এসেছি।

তিনমিনিট কাল ঘরে কোন সাড়াশব্দ নাই। তার পরই শিরে করাঘাত—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

ভগবান এত লোকের মরণ করেন, পোড়া আমার অদৃষ্টে কি সেটাও লিখতে ভুললেন!

আক্ষেপ বৃথা! তাঁর কোনও কালে এক তিল ভুল হবার যো নেই। দিন ক্ষণ একটা নিশ্চয়ই লিখে রেখেছেন, তুমি জানতে পারছ না, কেউ পারে না।

তোমার পোড়ার মুখে হাসি আসে?…

আসা উচিত নয় জানি, কিন্তু না এসেও উপায় নেই। ঐ ক'টা টাকার জন্য শোক করছিলে, এখন থেকে ও ক'টাও যে আসবে না, এই দেখ তার বিজ্ঞাপন।

গৃহিণী কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন; ভাষা অজ্ঞাত। প্রশ্ন করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

বুঝতে পারলে না? শোন তবে—বলিয়া সুরেশচন্দ্র কীর্ত্তনের সুরে গাহিলেন,

গবর্নিং বডী কয়
—হেসে হেসে কয়
সুরেশ এ তোমার নয়
—ছেলে ঠেঙানো
—আর নোট্ দেওয়া
ওহে তোমার এ নয়,
এ কাজ তোমার নয়!

বলি, এ কাজ তোমার নয়।
তুমি নেচে কুঁদে গান গেয়ে
—তাঁর নাম গেয়ে—নাম গেয়ে—নাম গেয়ে
কর দিনগত পাপ ক্ষয়ঃ!

গিন্নি, এইবার বুঝলে ত!

চাকরি গেছে?

এই তার অভ্রান্ত প্রমাণ, অস্বীকার করে কার সাধ্য।

আপদ গেছে।

গৃহিণী, এতদিন ছিলেন গৃহিণী, এখন হতে সহধর্ম্মিণী! তোমার জয় হোক্‌!

গৃহিণী চোখে দশদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, রাগে বেলুনের মত ফুলিতেছিলেন, মুখে কথা ফুটিল না; নাকে নিশ্বাস পড়িল না। যখন নিশ্বাস পড়িল, যখন মুখ ফুটিল, তখন গরদের জোড় পরিযা 'রতি সুখসারে গতমভিসারে' সুর ভাঁজিয়া কীর্ত্তনীযা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন, কথা কানে পৌছাইয়া দেওযার সম্ভাবনা নাই। কাজেই গৃহিণী তাহাকেই বেশ করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিলেন, যে লোককে দেখা যায় না, অথচ যে দুনিযায সব দেখে, সব কথা শোনে। গৃহিণী ইহাও জানাইয়া রাখিলেন যে, যদি দৈবাৎ দেখা হইয়া যায়, তবে তাহার মুখে নুড়ো জ্বালিয়া দিতে একটি দণ্ড বিলম্ব করিবেন না।

কলিকাতার বাঙালী-সাহেবেরা কত রঙ্গই জানেন!

আজ তাঁহাদিগকে কীর্ত্তন-রঙ্গে পাইয়া বসিয়াছে। ওয়েলিংটনে রায়সাহেবের বাড়ীতে চাকুম চুকুম শুনা যায়; ক্যামাক ষ্ট্রীটের মুখুজ্জে সাহেবও কৈফিয়ৎ দিতেছেন, আমি কি আর তোমাদের রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয়লীলা শুনি? পুরুষ ও প্রকৃতির—! আমরা বলি, যে-আজ্ঞে, তথাস্তু।

কিছুদিন আগে, সাহেবদের গুরু রঙ্গে পাইয়া বসিয়াছিল। ভক্তিগঙ্গার স্রোতে হড় হড় শব্দে কত আজানুলম্বিত জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী যে কত বড় বড় সাহেবসুবার সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে আসিয়া উঠিতেন, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। হাইকোর্টের ব্যারিস্টার-জজ বিশ্বাসসাহেবের বাড়ীতে গিয়া দেখি, তিনহাত দাড়ি নারদবাবা। লেডী বিশ্বাস মটকা কাপড় পরিয়া পূজারতির আয়োজন করিয়া দিতেছেন, পায়ে জুতা দূরে থাক্‌, গায়ে একটা সায়া-সেমিজও নাই, এখান দিয়া খানিকটা মাংস, ওখান দিয়া খানিকটা ফ্রেশ্‌ বাহির হইয়া পড়িতেছে—ভ্রূক্ষেপও নাই। ব্যারিস্টার ব্যানার্জ্জী ও মিসেস ব্যানার্জ্জীকে দেখি, দেওঘরে এক সাধুবাবার আশ্রমে রূপকথার বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর মত বসিয়া থাকিতে। হাইকোর্টের ক্রিমিনাল বারের লীডার সেনসাহেব তাঁহার নবলব্ধ শ্রদ্ধানন্দ বাবাকে লইয়া কৈলাস মানসে যাইবার পথেই অক্ষয় স্বর্গবাস করিলেন! পাঠক-পাঠিকারা শুনিয়া স্তম্ভিত হইতে পারেন; কিন্তু লেখক এই দুটী চামড়ার চোখ দিয়া সুন্দরী-তরুণী লেডী সিন্‌হাকে এই সেদিনও বরানগরে এক সাধুবাবার আশ্রমে যুগ্মকরপদ্ম হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন! সাধুবাবা ঈশ্বরজানিত পুরুষ। ফার্মাকোপিয়া এবং মেটেরিয়া মেডিকা তাঁহার কমণ্ডলুর মধ্যে চিরাবদ্ধ! কিছুদিন রঙ্গ বড় জোর চলিয়াছিল। এখন অন্য রঙ্গ। ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে জানি না; তবে সোডাওয়াটার বট্‌ল্‌ ফাটাফাটির চিরাভ্যস্ত শব্দের অভাবে কাহারও ইনসমনিয়া হয নাই বলিয়াই শুনিয়াছি।

সুরেশবাবুর পশারটা খুবই বাড়িয়াছে। তাহার কারণ ছিল। চাটুজ্জেসাহেব বাঙালী-সাহেব-সমাজের মরকতমণি। তিনি যাহাকে ভাল বলিয়াছেন, তাহাকে ভাল না বলিতে পারার দুর্ভোগ ভীষণ, যেন স্ব স্ব সমাজ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িতে হয়! তারপর সুরেশবাবু সুকণ্ঠ, সুগায়ক, সুদর্শন এবং নির্লোভ। ভুগিবার যা নিজেই ভোগেন, কাহাকেও ভোগান্‌ না। আনন্দ আছে, ব্যয় নাই—সাহেব মহলে সুরেশবাবুর ভারি পশার! সুরেশবাবু (তর্কের খাতিরে, যদি) কোনও সুকোমল সুকরকমলে প্রেম নিবেদন করিয়া বসেন, প্রত্যাখ্যাত হইবার আশঙ্কা নাই; এমন।

সহধর্ম্মিণীর কণ্ঠের নীচে কে যেন চাক-ভাঙ্গা মধুভরা একটা কলসী কাৎ করিয়া দিয়াছে।

হ্যাঁগা, তুমি নাকি জাহাজ আফিসের চাটুয্যে সাহেবের বাড়ীতে গান কর গা?

অপরাধ কবুল।

তাঁর নাকি মস্ত অফিস? দশ-পনেরো হাজার লোক কম্‌মো করে?

সংবাদ সত্য।

এক মিনিট পরে—

বলি হ্যাঁগা। আমাদের নগুর একটা চাকরি ক'রে দিতে বল না গা।

সে হয় না গিন্নী।

কেন হবে না? নগু যে বলে—তিনি মনে করলে সব করতে পারেন, পাশ-টাসের কথাও ওঠে না। আর নগু না হয় পাশই করে নি, বাছা আমার কোন্ কাজটা না জানে? ফুটবল বলো, কিরকেট বলো, সাইকেল বলো, নগু কি-না জানে! নগু ক'দিনই আমায় বলছে বাবা একবার একটি কথা বল্লেই একটা ভাল চাকরি তার হয়ে যায়। সত্যিই ত, অত বড় ছেলে হলো,বসে বসে তারই ভাল লাগে, না আমারই ভাল লাগে! আর সংসারের ত এই দশা। এ মাসটা না-হয় বই-টইগুলো বেচে চললো, তারপর—

গোবিন্দ জানেন!

পোড়ারমুখ গোবিন্দর!

ঐ কথাটি বলো না গৃহিণী, ওর চেয়ে মিথ্যে আর নেই। ঐ ত বসে রয়েছেন, ঐ নবদূর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ, শ্যামনবনীত কোমল আনন, সুচারু নয়ন, দীর্ঘোন্নত ললাট, চাঁচরচিকুর কেশ, রক্তিম পদ্ম অধর—ও কি পোড়ার মুখ হলো?

মধু-ভরা কলসীর মুখে কে একটি ফুটন্ত পদ্ম বসাইয়া দিল। পদ্ম আবার হাসিতেছে।

তা না হয় নাই হলো। কিন্তু ছেলেটার একটি কাজ ক'রে দাও। তোমার চাকরি গেছে, যাক্ গে, সারা জীবনই কি খাটতে হবে? নগু পগু বড় হয়েছে, ওদের দুটোকে কাজে কম্মে লাগিয়ে দিয়ে তুমি যা খুশী ক'রে বেড়াও গে, আমি কথাটি কইবো না।

কত এম্-এ, বি-এ পাশ করা ছেলে পথে পথে ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে গিন্নি, চাকরি জুটছে না, তোমার অকালকুষ্মাণ্ডদের কে দেবে চাকরি?

তুমি একবার বলেই দেখ না চাটুয্যে সাহেবকে।

সে আমি পারবো না।

কেন পারবে না—নিজের ছেলের জন্যে—

নিজের ছেলে বলেই পারবো না, পরের ছেলে হলে বলতুম। আমি নাম গান করি গিন্নি, নাম বেচি নে।

মরণ দশা নামের!

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!"

মধু গাঁজিয়া তাড়ি হইয়া উঠিয়াছে।

সই জুটলো আবার কোন শতেক খোয়ারী!

বড়দিনের দীর্ঘ অবকাশ। সাহেব মেম সাহেবরা জাহাজ চার্টার্ড করিয়া সুন্দরবন ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। অনেকগুলি বন্দুক, রাইফ্ল, বায়নাকুলার আছে—ব্যাঘ্র হরিণ কুম্ভীরদের পরমায়ু নিঃশেষ হইয়াছে। শ্রীখোল, শ্রীকরতাল-সহ কীর্ত্তনের দলও আছে। সন্ধ্যা হইলেই ডেকের উপর আসর বসে, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলে। তারপর সাহেবরা ডিনার টেবিলে বসিয়া কুক্কুটাঙ্গ চর্ব্বণ করেন; কীর্ত্তনীয়ারা লুচি রসগোল্লাতেই সন্তুষ্ট। বলা প্রয়োজন, এই সাহেব দলটি চ্যাটার্জ্জীর দল নয়; তবে তাঁহারই আত্মীয় কুটুম্ব ও পরিজন। আর একটা কথা বলা দরকার। কীর্ত্তনারম্ভে হরির লুট দিবার ব্যবস্থা আছে বলিয়া রে মেম্ সাহেব এক ঝুড়ি বাতাসা কলিকাতা হইতেই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, সস্তা হইল, কিন্তু একটা স্টেশনে বড় বড় বাতাসা দেখিয়া ও দাম অনেক সস্তা শুনিয়া তাঁহার আপশোষের সীমা রহিল না।

রে মেম সাহেবের মেয়ে এই কয়দিনেই কীর্ত্তনের মোহাড়াটা প্রায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আগামী মার্চ্চে রিণা বিলাত যাইবে স্থির আছে। তাহার মাতার ইচ্ছা, রিণা বিলাতের লোকদের কীর্ত্তন শুনায়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, বিলাতের লোক কীর্ত্তনের খুব আদর করিবে। তিনি মেয়েকে খুবই উৎসাহিত করিতেছেন। এমন কি সুরেশবাবু ত দিনের বেলা ঘুমান্ না, সেই সময়টা রিণা যেন ঐ ছোকরাদের সঙ্গে বাজে গল্পে না কাটাইয়া—ইত্যাদি।

প্রায় ষোল দিন জলে ভাসিতে ভাসিতে যাওয়া ও আসা। বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিচার করিলে এবং উপ-ভোগের মানদণ্ডে মাপিলে এ ট্রিপের তুলনা হয় না।

তাঁহারা ভাসিতে থাকুন, ইত্যবসরে কলিকাতায় একটি ছোটখাট ব্যাপার ঘটিল, আমরা সেটার কথা বলি।

নগু চ্যাটার্জ্জী সাহেবের আপিসে গিয়া চাপরাসীর হাতে কার্ড পাঠাইল—নরেশচন্দ্র দত্ত, সান্ অফ সুরেশচন্দ্র দত্ত, ব্র্যাকেটে "Kirtonia" (কীর্ত্তনীয়া)।

ডাক আসিল। নগু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব ইংরেজীতে বলিলেন, বসুন। নগু দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহেব সব কথাই ইংরেজীতে বলিলেন। নণ্ড বাঙলাতেই জবাব দিল। বোধ হয় মাতৃভাষাপ্রীতি অনন্যসাধারণ।

উনি কি ফিরেছেন?

না।

বোধ হয়, আরও দিন পাঁচেক লাগবে ফিরতে।

নণ্ড কাঁপিতেছিল, বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

হ্যাঁ, আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন ত?

নণ্ড বাঙলায় জবাব দেয়। বাঙালীর ছেলে বাঙলাই তাহার ভাষা বলিয়াই যে তাহা করে, তা নয়। তা সে যাক্।

আমাদের দুরবস্থার কথা আপনি বোধ হয় জানেন না। বাবা পার্ক কলেজে চাকরি করতেন, বড্ড কামাই হয় বলে তারা ছাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি শুনি নি। কতদিন?

মাস দুই।

মাস দুই? কই, তার মধ্যে কতবার ত কীর্ত্তন করতে এসেছেন, কিছুই বলেন নিত, আমরা ত কিছুই জানি নে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

মা আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে—

ইয়েস্?—সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন। পাইপে জোর জোর টান! নণ্ডর অন্তরাত্মা খাবি খাইতে লাগিল।

যদি কোন একটা চাকরির সুবিধে হয়—

ওয়েট্! আজই একটা কি পদে লোক নেওয়ার প্রস্তাব এসেছিল যেন। দেখি—সাহেব ঘণ্টা বাজাইলেন। চাপরাসী আসিলে তাহাকে কি বলিলেন। তারপর নণ্ডকে বলিলেন—আপনি ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করুন গে, পরে ডাকবো।

নণ্ড ওয়েটিং রুমে আসিয়া বসিল। আধঘণ্টা পরে সাহেব বলিলেন, কাল দশটার সময় সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করবেন, আমি বলে দিয়েছি।

তবুও লোকটা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, আপনি এখন যেতে পারেন। গুড্-ডে!

তখন জাহাজ ধুবড়ি ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে। সকলেই প্রায় ডাঙায় নামিয়া গিয়াছে, রিণার মা—রে-মেম্ সাহেব ও সুরেশবাবু ডেকে রেলিঙের ধারে চেয়ার টানিয়া বসিয়া কথা কহিতেছেন।

আপনি রোজ এক ঘণ্টা ক'রে শেখান না রিণাকে।

তা বেশ ত! উনি যদি—

আমি পঞ্চাশ টাকা ক'রে মাসে—

মিসেস্ রে, এ ধন ত বেচবার নয়। বেচিও নে। যাঁর গোবিন্দের চরণে মতি আছে—

গোবিন্দ কে? আপনার দলের কোন লোক বুঝি?

আজ্ঞে না, গোবিন্দ পদারবিন্দ—

ঐ বুঝি ওরা ফিরলো, না? না। তা এক কাজ করুন সুরেশবাবু, গোবিন্দ-টোবিন্দর দরকার নেই, আপনিই শেখাবেন। টাকা না নেন্ না নেবেন, ওকে কিন্তু ভাল করে শিখিয়ে আপনাকে দিতেই হবে।

রিণার খুব যত্ন আছে, অবশ্যই শিখবেন। কিন্তু মিসেস রে, গোবিন্দপদে মতি না থাক্‌লে—

না, না, গোবিন্দ-টোবিন্দ পাঁচজন পুরুষের নাম শুনলে উনি আবার রাগ করবেন।

অগত্যা নীরব।

সুরেশবাবু সাজ সজ্জা খুলিয়া ফেলিয়া তক্তপোষে আড়মোড়া ভাঙ্গিতেছিলেন, বেলা ন'টা। ভোর বেলা জাহাজে ফিরিয়াছেন। নণ্ড লম্বা চওড়া সাহেব সাজিয়া ঘরে ঢুকিয়া খামচা করিয়া পায়ের ধূলা তুলিয়া লইল। মনে মনে গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিয়া সুরেশবাবু চক্ষু মুদিলেন। কোন স্কুলের ক্রিকেট খেলায় ক্যাপ্টেনী করিতে যাইতেছে ভাবিয়া তিনি উচ্চবাচ্য করিলেন না। নণ্ড দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে নণ্ডর গর্ভধারিণীর উদয়।

কেমন দেখাচ্ছে আমার নণ্ডকে, তা' বল।

বেড়ে। একটি ময়ূর থাকলে—

ঠিক যেন সাহেব।

হ্যাঁ, ব্ল্যাক্ সি'র।

সে আবার কি?

সাহেব কৃষ্ণ সমুদ্রে পড়ে গেছলেন, রংটা তাই কালো হয়ে গেছে।

ও আবার কালো কোন্‌খানটা? তোমার যেমন কথার ছিরি।

কিন্তু সাহেব গেলেন কোথায়?

গৃহিণীর বয়সটা হঠাৎ পঁচিশ বৎসর কমিয়া গেল। ছিল পঁয়তাল্লিশ, হইল কুড়ি। সোহাগে ভাঙ্গিয়া পড়-পড়। মলয়হিল্লোলে ফুলভারানত রজনীগন্ধাসম।

বল দিকিন কোথায় ?

জ্যোতিষশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

তবু বল না ?

কবি বা লেখক নহি যে অনুমান করি।

তবু ?

জেনে আমার দরকার নেই। এখন ঘুমুবো।

ও যে চাকরি করছে।

কোথায় ?

ঐ যে সেই—তোমার—কি সাহেব গো, সেই যে যার আফিসে অনেক লোক—

আড়মোড়া ভাঙ্গা বন্ধ হইল; সুরেশচন্দ্র খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

নামটা কি ?

তুমিই বল না ছাই।

আমি ত জ্যোতিষ শিখি নি গিন্নী, এই মাত্র বললুম।

সেই যে তুমি মাঝে মাঝে যাও—

মাঝে মাঝে যাই ? শৈলেন সিঙ্গী ? নিমাই মৈত্র ? ফণী মুখুজ্জে ? নেপাল রায় ? ভাস্কর মুখুজ্জে ? হরিদাস চাটুয্যে ? ধীরেন মিত্তির ? শশধর গাঙ্গুলী ? জে-সি মুখুজ্জে, নলিনী সরকার, বেয়াই তুষারকান্তি ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, বাঘা—তাও না। যাক্ গে, নামে আমার দরকার নেই। ভূপেন বাঁড়ুয্যে—

না, না, কীর্ত্তন করতে যাও যে !

কে-সি-চ্যাটার্জ্জি ?

তা হবে—সেই যে জাহাজ আফিস গো !

সুরেশবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া আবার বসিলেন।

সেখানে চাকরি হোল কি ক'রে ?

কি ক'রে আবার হবে ? যেমন ক'রে সকলের হয়। ও গেল, গিয়ে দেখা করলে।

আমার নাম করেছে ?

কার নাম করেছে না করেছে, মেয়েমানুষ আমি, অত খবর রাখি না কি ?

নিশ্চয় করেছে। কত মাইনে ?

আশী টাকা এখন—

ঐ গোমুখ্যুর মাইনে আশী টাকা ? বুঝিছি, আমাকে ডুবিয়ে এসেছে।

তোমাকে ডোবাতে যাবে কোন্ দুঃখে ? সাহেবের ওকে ভাল লেগেছে—

সাহেবের ভাল লাগলে সাহেব তাঁর মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে বিয়ে দিতেন, চাকরি দিতেন না। অকাল কুষ্মাণ্ডটা আমার মুখ পুড়িয়েছে, আমার সে বাড়ীর পথ বন্ধ করেছে।—বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তোমার যত অনাছিষ্টি কথা। কোথায় আহ্লাদ করবে, তা নয়—

সে তুমি বুঝতে পারবে না—

আচ্ছা না পারি, বুঝিয়ে বলো না।

না, উঠে যাও এখান থেকে।

কথার ছিরি দেখ না, বুড়ো হয়ে ভীমরতি হয়েছে।

দেওয়ালের গায়ে গোবিন্দের কান্ত, চিরশান্ত, চিরকোমল, চিরপ্রফুল্ল মূর্ত্তি তেমনই হাসিতেছে। চাহিতে চাহিতে সুরেশের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ী কত ঘন ঘন গিয়াছেন, সাধিয়া যাচিয়া দিনস্থির করিয়া কীর্ত্তন গাহিয়া আসিয়াছেন, আজ সবই তিক্ত বিস্বাদস্মৃতি হইয়া গেল। সে গভীর উদ্দেশ্য লইয়া এই যাতায়াত, কীর্ত্তনের নামে ভণ্ডামীর অভিনয়, চ্যাটার্জ্জী সাহেব তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছেন; মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিয়াছেন—বাড়ীসুদ্ধ সকলে মিলিয়াই রঙ্গ উপভোগ করিয়াছেন। হয়ত ইহাই ভাবিয়াছেন, নিজের বলিতে চক্ষু লজ্জা, তাই সোজা ছেলেকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নিজে ভদ্র ও মহৎ বলিয়া সুযোগ পাইবামাত্রই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ জানেন !

গোবিন্দের জানা-না-জানার কি যে মূল্য, তাহা ত কাহারই অবিদিত নাই। তাহাতে সান্ত্বনা পাওয়া যায়না। তাঁহার অনুরোধেরও অপেক্ষা রাখেন নাই !

চ্যাটার্জ্জী সাহেবের শ্বশুর দিল্লীতে থাকেন, বড় চাকরি করেন। একদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন, কালই চলিয়া যাইবেন; মেয়েকে বলিলেন, কৈ রে পুঁটি, তোর কীর্ত্তন শোনালি নে ?

পুঁটি গিয়া সাহেবকে ধরিলেন। সাহেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আগে ত খবর দেওয়া হয় নি—মুস্কিল।

আচ্ছা দেখি, আফিসের পথে নিজেই একবার না-হয় দেখে যাই। বাবা কি কালই চলে যাবেন ?

কাল দুপুরের মেলেই।

আচ্ছা দেখছি।

ভাঙ্গা বাড়ীটা খুঁজিয়া লইয়া তাহার সামনে গাড়ী থামাইয়া সাহেব নিজেই নামিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর নশুর ভাই পশু আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া সাহেব দেখিয়া ভড়কাইয়া সরিয়া গেল।

সাহেব বলিলেন, সুরেশবাবু বাড়ী আছেন ?

পশু সসম্ভ্রমে কহিল, না।

বাড়ী নেই ? কোথায় গেলেন ?

নশু আফিসের বেশে সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিতেছিল, হঠাৎ মালেকে মুলুক বড় সাহেবকে দেখিবামাত্র একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; মুখ দিয়া কথা সরিল না। সেকালে রামসীতার ছবিতে রামদাস যেভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, সেও দেয়াল ঘেঁসিয়া তদ্রূপ দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহেব পূর্ব্ব-প্রশ্নের জবাব পান নাই। ইহাদের আড়ষ্টতা দেখিয়া একটু অভয়হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কখন্ ফিরবেন ?

নশু বা পশু কি জবাব দিত, বলা যায় না; বোধ হয় জবাব দিত না, কারণ গলার মধ্যে জিভগুলা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বোধ করি-বা ইহা বুঝিয়াই অন্তরীক্ষ হইতে কে জবাব দিল, মুখে তোদের হোল কি ? বল্ না রাগ ক'রে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, আর আসবে না।

সাহেব অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, কি বলিবেন বা কি করিবেন বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না। শেষে দৈব-বাণী যেন শুনেন নাই এই ভাবে বলিলেন, যদি এর মধ্যে এসে পড়েন—আমার নাম মিঃ চ্যাটার্জ্জী—

নশু আরও আড়ষ্ট হইয়া পড়িল।

বলবেন, আমার শ্বশুর মশায় আমার ওখানে এসেছেন, আজ রাত্রে যদি পারেন, আমাদের ওখানে কীর্ত্তন—

বাধা পড়িল। এবারও সেই অন্তরীক্ষ হইতেই জবাব আসিল, পোড়ারমুখোদের মুখের বাক্যি হরে গেল কেন। বল্ না কেত্তন ছেড়ে দিয়েছে। সাহেব দিলে ছেলেকে চাকরী, হতচ্ছাড়া মিনসে বললে কি-না তার গোবিন্দের নাম বেচে ছেলের চাকরী নেওয়া হয়েছে। তাই এ বাড়ীর অন্নজল মুখে তুলবে না বলে চলে গেছে; যাক্, যে চুলোয় খুসী যাক্, থাক্, আমার হাড় জুড়িয়েছে।

নশু মা'কে ধমকাইতে ভিতরের দিকে গেল। সাহেব তাই ত তাই ত করিতে করিতে যেন লজ্জা রাখিবার স্থান অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

যিনি এতক্ষণ অন্তরালে বা অন্তরীক্ষে ছিলেন, এইবারে স্বপ্রকাশ হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া রহিলেন, আ-পোড়ার দশা, আগে বলতে হয়, ঐ-ই চাটুয্যে সাহেব, পশুকে একটা কাজ ক'রে দিতে বলতুম! যেমন হাড়হাভাতে লোক, ছেলেগুলোও কি তেমনই হাভাতে হোল গা! ছিঃ ছিঃ হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলুম গা!

কালিদাস

শ্রীসুবোধ রায়

বিজ্ঞজনে মূঢ় ভাবি, রূঢ় কথা কয়
কবিজনে; বলে,—"কাব্য শুধু স্বপ্নময়!
এ ধরণী কর্ম্মক্ষেত্র—কঠিন, কঠোর,
পলকে হেথায়, হায়, কাব্য-স্বপ্ন-ডোর
যায় টুটে! স্বপন-বিলাসী শুধু কবি,
আঁকে মুগ্ধ কল্পনার রঙে মিথ্যা ছবি!"
হায়, কবি কালিদাস!—এই কথা কহি'
দিঙ্‌নাগাচার্য্যদল দিল গালি,—সহি'
তাহা স্মিতহাস্তে, কবি, তুমি গেয়ে গেলে
অপূর্ব্ব সে কাব্যগাথা মন-প্রাণ ঢেলে।

কোথা সে আচার্য্যদল? কোথা বিজ্ঞজন?
বিস্মৃতির অন্ধকারে হয়েছে মগন!
তাহাদের সত্য আজি স্বপ্ন-মরীচিকা!
তোমার স্বপন,—আজি সত্য-জ্যোতি-শিখা
জীবন-আকাশে যাহা অনির্ব্বাণ জ্ব'লে
রচিতেছে স্বর্গখণ্ড মাটির ভূতলে।

জ্ঞানদাসের কাব্য-প্রতিভা

শ্রীপূর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ

মানব-মনের এমনি একটা ধারা যে—আদিম কাল হইতেই সে সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। ধরণীর আলো যেদিন সে প্রথম দেখিয়াছে সেদিন সে মুগ্ধ হইয়া, বিস্ময়ান্বিত হইয়া, দুই হাত জোড় করিয়া কোন এক অজানা দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছে। কোনদিন বা বন্ধ নির্ঝরিণীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার কল-সঙ্গীতে বিমোহিত হইয়া, অঞ্জলি-ভরা বনকুসুম আনিয়া সেই বন-তোষিণীর বক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছে। এমনি করিয়া সুন্দরের পূজার জন্য মানুষ কত কিই-না করিয়াছে। সে মনে মনে যাহা উপলব্ধি করিয়াছে, যাহা ভাবিয়াছে, যাহা চিন্তা করিয়াছে তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য কখনও সে মূর্ত্তি গড়িয়াছে, আবার কখনও বা নাচিয়াছে, গাহিয়াছে, আঁকিয়াছে, কাব্য-রচনা করিয়াছে, এমন কি, গুহায় গুহায় তাহার মনের ভাব খুদিয়া রাখিয়া তবে শান্তি পাইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানব-মন যাহা নিজে আস্বাদন করিয়াছে, যাহা অনুভব করিয়াছে, তাহার আস্বাদন পরকে না দিয়া তাহার অনুভূতি পরের দ্বারা অনুভূত না করাইয়া পারে নাই। এমনিভাবেই সমগ্র মানবের অন্তরে সৌন্দর্য্যের ও রসোপভোগের অভিলাস বাসা বাঁধিয়াছে। কিন্তু এই যে সৌন্দর্য্য চর্চা ও রসোপলব্ধি, তাহা কি শুধু নাচিয়া, গাহিয়া, আঁকিয়া, খুদিয়া সমাপ্ত করা যায়? মানব-মন চিরদিন চায় যে, সে আজ যাহা ভাবিল তাহা যেন চিরকালের ও চিরন্তনের হইয়া থাকে। সেই জন্যই তাহার অন্তরের অনুভূতিকে সে ভাষায় রূপ দিয়া কাব্য ও সাহিত্য রচনা করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছে। আজও যে আমরা আমাদের সামনে কালিদাসকে পাইতেছি, বিদ্যাপতিকে হারাই নাই, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পদাবলী কীর্ত্তন করি, ইহারও ভিতর সেই একই ইচ্ছা—সেটী আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র আমি আজ যাহা ভাবিলাম, যাহা রচনা করিলাম, তাহা যেন সকল কালের সকল মানবের হইয়া থাকিতে পারে।

অনেকে বলিতে পারেন, এমন ত' অনেক ব্যক্তিই তাঁহাদের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন; তাহা হইলে তাঁহারাও কি ঐ সকল ব্যক্তির ন্যায় অমরত্ব লাভ করিবেন? একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। ইঁহারা ত পৌরাণিক যুগের দেবতাদের ন্যায় অমৃত পান করেন নাই। তবে?—কথা হইল এই যে, পৃথিবীতে প্রতিভা বলিয়া যে জিনিষটা আছে তাহারই দু-এক কণা ইঁহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে এবং সেই প্রতিভা-লক্ষ্মীর প্রসাদই ইঁহাদিগকে এই অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। অনেক কাঁটাল গাছ আছে, যাহাতে 'মুচি' ধরিয়াই পড়িয়া যায়—ফল দৃষ্ট হয় না। ইহাতে এই ধারণাই করা যায় 'মুচি'কেই ফলে লইয়া যাইবার জন্য যে সক্রিয় ও সজীব রসটুকুর দরকার এই গাছের কাছে তাহা নাই, সেজন্যই 'মুচি'টী আর ফলের আকার না পাইয়া পড়িয়া যায়। তদ্রূপ কোন কোন ব্যক্তির রচনাতে এই প্রতিভারূপ জীবন-রসের অভাব থাকে—সেজন্য তাহার লেখা বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, আমাদের জ্ঞানদাসের ভাগ্যে এই প্রতিভা-লক্ষ্মীর প্রসাদকণা পড়িয়াছিল এবং তিনি ইহা কাব্য-জগতে লাগাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কালজয়ী হইতে পারিয়াছেন। হ্যাঁ, অনেকের ধারণা হইতে পারে—সে কালের সব 'দাস'কে ছাড়িয়া দিয়া সহসা জ্ঞানদাসকে লইয়া পড়িয়া গেলাম কেন? ইহার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। চৈতন্যোত্তর যুগে যে কাব্য-প্রবাহ সমগ্র বঙ্গময় প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যে কয়েকটী হৃদয়ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। জ্ঞানদাসের প্রতিভা যে কেবলমাত্র মধুর পদাবলী রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উপরন্তু তিনি যে বর্ণনাত্মক কাব্যও রচনা করিতে পারদর্শী ছিলেন তাহা মদ্‌সংগৃহীত 'যশোদার বাৎসল্য-লীলা' নামক পালা-গানটীতে প্রমাণিত হইয়াছে।

যদিও স্বর্গীয় দীনেশবাবু ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগে আলোক-সম্পাত হইয়াছে, তথাপি অদ্যাপি বহু 'চণ্ডীদাস' 'বলরামদাস' প্রভৃতির সমস্যার সমাধান হয় নাই। 'যশোদার বাৎসল্য লীলা'তেও হয়তো দ্বিতীয় জ্ঞানদাসের কথা উঠিতে পারে। তবে আমার ধারণা, ইহা সেই কাঁদড়া গ্রামনিবাসী পদাবলী-রচয়িতা জ্ঞানদাসেরই রচিত। যাহা হউক, ইহা আমার আলোচ্য বিষয় নহে। জ্ঞানদাসের কাব্য-প্রতিভা এই পালা-গানটীর মধ্যে কতটুকু সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহাই আমার এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু।

বিবাহের কল্পনা করিতে গেলে যেমন বর-বধূর কথা ছাড়াও ভোজের কথাটা আপনা হইতেই মনে আসে, তেমনি জ্ঞানদাসের কাব্যালোচনা করিতে গেলেও তাঁহার রচিত পদাবলীর কথা আসিয়া পড়ে। কারণ বৈষ্ণব কবিদের মনের কথা জানিবার এই একমাত্র উপায়। বাংলা সাহিত্যের যাঁহারা 'ঘুণ' তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য যেমন গোবিন্দদাস, তেমনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস। অতএব ইহা সহজেই অনুমেয়, চণ্ডীদাসের ভাবের দ্বারা জ্ঞানদাস অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাসও সৌন্দর্য্যের কবি। সেইজন্যই তাঁহার রচিত পদাবলীতে আমরা শব্দ ঝঙ্কারের, শব্দৈশ্বর্য্যের ও চিত্রাঙ্কনের পরিচয় পাইয়া থাকি। তাঁহার রচিত 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' প্রভৃতি পদে তিনি শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ আঁকিয়াছেন তাহা জ্ঞানদাস পারেন নাই। আবার তাঁহারই রচিত 'কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল' নামক অভিসারের পদটীতে দেখিতে পাই, গোবিন্দ-

দাসের রাধা অভিসারের জন্য সকল রকম দুঃখ কষ্ট অভ্যাস করিতেছেন—কিন্তু ইহাতে প্রাণের খোঁজ পাই না। পদটীর শব্দবৈচিত্র্য ও ঝঙ্কার আমাদের মনে একটী সঙ্গীতের রচনা করে, একটী পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের মানস চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করে—কিন্তু যাহার জন্য এত সাধনা—তাহার জন্য আবেগ বা আকুলতা কিছুই লক্ষ্য করি না।

মনে হয়, পূজারিণী যেন অনেকগুলি সুন্দর পুষ্প সংগ্রহ করিয়াছেন, মন্দির-দ্বারে বাদ্যভাণ্ডও বাজিতেছে—কিন্তু পূজারিণী যেন আড়ম্বর দেখাইতেই ব্যস্ত। প্রিয়তমের পূজার জন্য যে প্রাণাবেগের প্রয়োজন তাহা যেন এখানে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই অভিসারের পদেই জ্ঞানদাসের রাধা মাধবের জন্য এতই আকুল হইয়াছেন যে, তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিতেছেন না, গুরুজনের শাসনও তাহাকে বাগে আনিতে পারিতেছে না। পদটী পড়িলেই সম্যক উপলব্ধি হইবে :

"কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহে।
গুরু দুরজন ভয় কছু নহি মানয়ে
চির নাহি সম্বরু দেহে ॥" ইত্যাদি

দেখি, জ্ঞানদাসের রাধা যেন উন্মাদিনী! রাধাকে দেখিলে মনে হয়, মাধবের জন্য তিনি সমগ্র সংসার ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিতা নন। প্রাণ-প্রিয়ের পূজার জন্য, তাঁহার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায়, সংসারের সমস্ত বিপদ আজ তাঁহার নিকট তুচ্ছ। তিনি তাঁহার নিজের সব দিয়াও মাধবকে পাইতে চান্। এই জন্যই গোবিন্দদাসে পাই ভোগ—জ্ঞানদাসে পাই ত্যাগ; গোবিন্দদাস বিলাসের কবি, ঐশ্বর্য্যের কবি—কিন্তু জ্ঞানদাস প্রাণের কবি, ব্যথার কবি, বেদনার কবি।

জ্ঞানদাসের পূর্ব্বরাগের পদগুলিতেও দেখিতে পাই—শ্রীরাধিকার প্রতি অঙ্গ শ্রীমাধবের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল। কতক্ষণে পরমানন্দ মাধব তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিবেন তাহার জন্য শ্রীরাধার 'হিয়া' অবিরত কাঁদিতেছে—এমন কি নারীসুলভ লজ্জা-ত্রাস সব কিছুই ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল মিলনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধা যেন পৃথক বস্তু নহেন—এমন কি, তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। এমন করিয়া মিশিয়া যাইতে, আপনার হইতে, গোবিন্দদাসের 'রাধা' পারেন নাই। সেইজন্য আমরা দেখি, গোবিন্দদাসের 'রাধা' উল্লাসময়ী—জ্ঞানদাসের রাধা তপস্বিনী!

গোবিন্দদাস 'ভালে সে চন্দন-চাঁদ, কামিনী-মোহন ফাঁদ' পদটীতে শ্রীকৃষ্ণের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণ ভোগের জন্যই ব্যগ্র, এমন কি সেজন্য শ্রীরাধারও ছলা-কলার অন্ত নাই! তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না ভাব-সম্মিলনের পদে অনেক জায়গায় গোবিন্দদাস—শুধু জ্ঞানদাস কেন বিদ্যাপতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রিয়তমের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগের চিত্র একমাত্র চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসেতেই—পাইয়া থাকি। নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া, অগ্রপশ্চাতের ও ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া, প্রিয়তমকে পাইবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ার চিত্র গোবিন্দদাসের তুলিকা অঙ্কিত করিতে পারে নাই। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের সুরটাকে ভাল করিয়া চিনিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভাবগুরুর প্রকৃত শিষ্য হইতে পারিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পদ-রচনাতে জ্ঞানদাসের যে প্রতিভা ভাবচিত্র আঁকিতে সমর্থ হইয়াছিল—তাহাই আবার 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' নামক বর্ণনাত্মক কাব্যে যে বর্ণন-ভঙ্গিমার পরিচয় দিয়াছে—তাহা সত্যই অতুলনীয়—। ইহাতে হয়তো ভাবুকতার অভাব থাকিতে পারে—কিন্তু হৃদয়াবেগের অভাব নাই। যথা :

"নবনীর ছারে কিরে আছে গিরিধারী।
প্রাণ যদি চায় গোপাল, প্রাণ দিতে পারি ॥"

ইহার চরিত্রগুলিও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আপনা হইতেই পল্লীর অযত্নরক্ষিত ফুলগাছটীর মত বাড়িয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানদাসের অপূর্ব্ব বর্ণনাভঙ্গী আমাদের চোখের সামনে চরিত্রগুলিকে জীবন্তভাবে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। নন্দদুলাল নবনী খাইবেন; স্নেহপ্রবণা যশোদার গৃহে আজ নবনী নাই—সেজন্য তিনি নবনীর সন্ধানে বাহির হইলেন। নয় লক্ষ গোয়ালিনীর গৃহে নবনী চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—কিন্তু কোথাও নবনী আজ মিলিল না, এমন কি শ্রীরাধার নিকটেও নবনীর পুত্রবৎসলা যশোদা আকুল হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে ফিরিতেছেন—এবং সকল স্থানেই নিরাশ হইতেছেন। কবি আমাদিগকে না বলিলেও যশোদার বেদনা-কাতর মুখখানি আমাদের মানস-চক্ষে ভাসিয়া ওঠে।

আবার দেখি, শ্রীরাধিকার ভাণ্ডারে নবনীর অভাব বলিয়া তিনি মনস্থ করিলেন, মন্থন করিয়া নবনী দিবেন। কিন্তু যখনই মন্থনভাণ্ডে মন্থন করিতে লাগিলেন, তিনি দেখিলেন :

'যতবার টানে ধনী মন্থনের ডুরি।
কঙ্কণের শবদে সঘনে বলে হরি ॥
রাধা কানু এক তনু জ্ঞান-এ সংসারে।
শ্যামরূপ দেখে রাই ঘোলের ভিতরে ॥'

জ্ঞানদাস এমন দক্ষতার সহিত চিত্রটী আঁকিয়াছেন, যেন মনে হয়, আমরাও শ্রীরাধার সহিত মন্থনভাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছি। অন্যস্থানে দেখি, যশোদার নবনী আনিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ছল করিয়া নিজে হারাইয়া গেলেন। নবনীর চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া যশোদা গৃহে ফিরিয়া নন্দদুলালকে দেখিতে না পাইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন—মূর্চ্ছা না হয় ভাঙ্গিল—কিন্তু 'নন্দদুলালিঞা'র বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে তিনি যেন পাগলিনীর মত হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভাবে যশোদা উন্মাদিনী, গোপবালকগণ ব্যাকুল, গোপিনীগণ ব্যথিতা! এখানে জ্ঞানদাসকে শুধু রস-শিল্পী বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে একজন নিপুণ চিত্রশিল্পী তাহাই আমরা বারবার উপলব্ধি করি।

আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, জ্ঞানদাসের বর্ণনাগুলি উপযোগী শব্দের ব্যবহারে এমন সাবলীল ও অব্যাহতগতি হইয়াছে যে, তাহা সহজেই পাঠকের মনকে কাব্যের দিকে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে। জ্ঞানদাসের লেখনী যশোদার অসীম বাৎসল্য, গোপবালকগণের অপূর্ব্ব সখ্য ও শ্রীকৃষ্ণের অভিমানবত্তার যে ছবি আঁকিয়াছে তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। আমাদের রসিক কবি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

শ্রীরাধার প্রেমকে একটি ছোট ইঙ্গিতের মধ্যে এমনিভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে তাহা রসিকমাত্রেরই হৃদয়ে রসসঞ্চার করিবে। এই পালা-গানটীতে গভীর দার্শনিক তথ্য নাই থাকুক, মনস্তত্ত্বের কথার অভাব নাই। আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সমগ্র পালা-গানটীতে একটা সাধারণ স্বাভাবিক গ্রাম্যভাব পরিলক্ষিত হয়। কোন স্থানেই কবিকে ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া পাঠককে থামিয়া চিন্তা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে হয় নাই। তাঁহার বর্ণনা-চাতুর্য্য এমন সরল ও স্বচ্ছন্দগতি যে পাঠক আপনা হইতেই কবির পশ্চাদনুসরণ করিয়াছে এবং প্রত্যেকটী চিত্র উজ্জ্বল হইয়া পাঠকের চিত্ত-বিনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে জ্ঞানদাস যে শুধু চিত্রধর্মী এ বলিলে ভুল বলা হইবে, কারণ ভাবের কথাও যে এ কাব্যটীতে মিলিতেছে :

"অসাধনে পাল্যা তোমা মরি বালাই লঞা।
হাসিতে মিলায় শশী চাঁদমুখ দিঞা॥
তোমা ছাড়া নয় কৃষ্ণ তার ছাড়া তুমি।
রাখালে রাখালে প্রেম ইহা আমি জানি॥
পীতধড়া পরিধান শিখি-পুচ্ছ মাথে।
মধুলোভে মাতি অলি উড়্যা পড়ে তাতে॥
গহনে সদাই থাকি ধবলী চরাই।
রাখালে রাখালে খেলা কভু হাসি নাঞি॥"

কবি দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিতে বসেন নাই সত্য, কিন্তু একস্থানে বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও তাহা আসিয়া পড়িয়াছে যথা :

'ব্যাস হৈল্যা মদের হাঁড়ি শুক শুঁড়ি আর।
হরিরস মদিরাতে মাতাল সংসার॥'

কবি চাহিয়াছিলেন যশোদার বাৎসল্যের একটি পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিতে। তাহাতে তিনি কোন ত্রুটিই রাখেন নাই। কাব্যটীর শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে নন্দপুরের যে চিত্রটী আমাদের চোখের সামনে আনিয়াছেন তাহা সত্যই মনোজ্ঞ।

'কালিন্দী যমুনা ধন্য যতেক গোপিকা।
কোকিল ময়ূর কুঞ্জে শুক যে সারিকা॥
ভ্রমর ভ্রমরা ধন্য পুষ্পের উদ্যান।
অহর্নিশি ফুলে যার মধু করে পান॥
ধবলি সাওলি ধন্য আর বৎস ধেনু।
গহনের মধ্যে গেলে পিছা ফিরে কানু॥'

একয়টী পংক্তি পড়িলে মনে হয়, লেখক যেন তাঁহার সম্মুখের অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পল্লীবাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়া ব্যাপারটাকে বুঝাইয়া দিতেছেন। যাহাদের জন্য তাঁহার এই কাব্যরচনা তাহা সার্থক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

জ্ঞানদাসকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিবার সুযোগ এখনও আমাদের হয় নাই। কারণ তাঁহার প্রকাশিত পদাবলী এতই কম এবং অন্যান্য গ্রন্থও এতই মুষ্টিমেয় যে, কবির মনের সঠিক পরিচয়টী অনেক সময় আমাদের নিকট ধরা দেয় না। যে কালে সমগ্র বাংলা দেশে গীতিকাব্য ও পদ রচনার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—ঠিক সেই যুগে জ্ঞানদাসের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কি কেবল কয়েকটী পদ-রচনা ও "নৌকালীলা" "রাসলীলা" ও 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' নামক কয়েকটী পালা গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন? প্রকৃতির লীলাভূমি—কাঁদড়াগ্রামে কোন-দিনই কি দখিন পবন আসিয়া কবির মন-বেতসের কুঞ্জে নাড়া দেয় নাই? কোনদিনই কি কবির হৃদয়-আঙ্গিনা চন্দ্রালোকে ও পল্লীপুষ্পের মৃদু সুবাসে ভরপুর হইয়া ওঠে নাই? কই, তাহার পরিচয় ত আমরা বিশেষ ভাবে পাই না। আশাকরি, বাংলা-সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী সুধীবৃন্দ জ্ঞানদাসের আরও পদ ও গীতিকাব্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের এ অভাব পূরণ করিবেন।

রাজপথ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

জীবনের গান যত হ'ল গাওয়া এই রাজপথ মাঝে;
তাহাদেরই স্মৃতি উজ্জ্বল হ'য়ে মধুময় হয়ে রাজে।
এই রাজপথে আমার মতন যারা গেল গান গেয়ে—
তাদের মধুর স্বপন নেমেছে, আমার এ আঁখি ছেয়ে;
গান গেয়ে চলি তাই;
এই রাজপথ সকল জনার তীর্থ জানিও ভাই।
সাধু হয়ে গেছে কত তস্কর এই রাজপথে থেকে
কত সাধুজন হ'ল তস্কর, কাঞ্চন কাঁচে দেখে।
রাজার দুলাল নিশীথ রাত্রে সকলেরে দিয়া ফাঁকি
মুক্তি পথের পাথেয় লভিতে এই পথে গেছে নাকি!

এই পথে নাকি স্বামী সোহাগিনী কাঁদিয়া হয়েছে সারা
স্বামীর বিরহে বিরহিনী রাই হয়েছে পাগল পারা!
এই পথে যেতে কতজনা সাথে হ'ল কত পরিচয়,
কত বিচ্ছেদ বিরহ-ব্যথায় চিত্তে বেদনা রয়।
এই রাজপথে শ্যামের বাঁশরী বিরহী চিত্তে কত।
শুধু রাধা নয়—সাধা বাঁশীটুকু আশা দিইয়াছে শত,
হেথায় অর্থ, হেথা অনর্থ কত শত ইতিহাস,—
জগৎ-সভায় করিয়াছে বড়, করিয়াছে পরিহাস।
পুণ্য লভিতে কোন্ সে তীর্থে করিতেছ ঘোরাফেরা;
শত সাধুজন চরণ স্পর্শে এ মাটি হয়েছে সেরা।

রাজপথ! রাজপথ!
তুমি জীবনের হে নাটমঞ্চ! পুরাইতে মনোরথ।

কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের শত্রু অগণিত। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। অতর্কিতে ভীষণ জলোচ্ছ্বাস বা ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত ঘরবাড়ী ও মানুষ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া যায়। আবার মাঝে মাঝে প্রভূত অর্থব্যয় ও লোকনষ্ট করিয়া এক জাতি আর এক জাতির সর্ব্বনাশের আয়োজন করে। লক্ষ লক্ষ লোক ধ্বংস হয়; দেশের সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। গোলাগুলিতে লোক মারা যাইবার পর লোক মরিতে আরম্ভ করে অনাহারে। এই সংহারলীলার জাকজমকটা খুব বেশী বলিয়া ইহাদের বিবরণে আমরা স্তম্ভিত হই। কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে কোটি কোটি শত্রু সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহাদের সংহার মূর্ত্তি শেষ পর্য্যন্ত প্রায়ই আমাদের অগোচরে থাকিয়া যায়। নানা রোগের বীজাণু লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ। রোগের আক্রমণে ঘরে ঘরে লোক একের পরে একে মরণের মুখে যায় বলিয়া এই মৃত্যুর ব্যাপকতা আমরা ততটা উপলব্ধি করি না। গত যুদ্ধে মোট ৫০ লক্ষ নিহত ও আহত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার দ্বিগুণ লোক আক্রান্ত হইয়াছিল যুদ্ধের শেষে ইনফ্লুয়েঞ্জায় সারা পৃথিবীময়। বর্ত্তমানে চিকিৎসার উন্নতির ফলে যুদ্ধের পরের মড়ক হইতে অনেক লোক নিষ্কৃতি পাইতেছে। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথমেও আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে (চল্লিশ বৎসর আগে) মোট মৃতের সংখ্যা যাহা ছিল তাহার অর্দ্ধেক মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়াছিল। বাকী লোক বিষাক্ত ঘা ও সান্নিপাতিক জ্বরে মারা পড়ে। ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত বড় বড় রাজ্যের জয়-পরাজয়ও অনেক সময় রোগের আক্রমণে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অচিকিৎসার ফলে জ্বর, প্লেগ, বসন্ত এই সব ব্যাধি প্রাচীন রাজ্যের লোকবল নষ্ট করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। বিভীষণের ষড়যন্ত্র বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের চেয়ে রোগের প্রকোপ দেশবাসীকে নির্বীর্য্য করিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের দমন করিতে আক্রমণকারীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। রোমের পতনের সময় অসহায় ম্যালেরিয়া-জ্বরাক্রান্ত রোমবাসীর পক্ষে শত্রুকে বাধা দিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল না। সুবিখ্যাত গৌড় নগরের ধ্বংসও মহামারীজনিত। প্রায় সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া গৌড়নগর একাদিক্রমে পূর্ব্বভারতের রাজধানী ছিল। পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারীগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। অগণিত প্রাসাদ, মন্দির ও মসজিদে গৌড় নগর ছিল সুশোভিত। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা গৌড় নগর জয় করেন। কিন্তু হঠাৎ মহামারী দেখা দেয়। লক্ষ লক্ষ লোক অল্পদিনের মধ্যেই মহামারীর প্রকোপে কালগ্রস্ত হয়, আর বাকী লোক সহর ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া যায়। এক বৎসরের মধ্যেই মহাসমৃদ্ধিশালী গৌড়নগর জনশূন্য হইয়া পড়ে এবং মহামারীর ভয়ে পরবর্ত্তীকালে কেহ এখানে বাস করিতে না আসায় গৌড়নগর অবশেষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এখনও গৌড়ের ভগ্নাবশেষ বিস্তীর্ণভূমিব্যাপী বন-জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। স্বর্গত প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অষ্টম শতাব্দীতেও সমস্ত বঙ্গদেশময় এক মড়ক দেখা দিয়াছিল এবং উহার ফলে সমস্ত দেশ জনবিরল হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র দেশময় বা জনবহুল শহরে মৃত্যুলীলার এই রকম নজীর প্রাচীন ইতিহাসে আরও অনেক পাওয়া যায়। পুরাকালের বহু প্রসিদ্ধ জনপদ রোগের ফলে জনশূন্য হইয়া আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তখন এই সব মহামারী ভগবানের বিধানে অনিবার্য্য শাস্তি বলিয়া লোকে মানিয়া লইত। এই রকম একপ্রকার মহামারীর সম্পূর্ণ প্রতিকার কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা প্রণালী অবলম্বন করিয়া এখন সহজ হইয়াছে তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বলিব।

পশ্চিমবঙ্গে মড়ক

পুরাতত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া মাত্র দুই বা তিন পুরুষ আগের ইতিহাসে আসা যাউক। পশ্চিম বঙ্গে তখন আমরা এক ভীষণ মড়কের বর্ণনা পাই। ১৮৪০—১৮৫০ সালেও খুব স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বর্দ্ধমান বিভাগের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। বাঙ্গালা দেশের লোকেরা হাওয়া বদলাইতে বর্দ্ধমান যাইত। চণ্ডীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগর চরিতে লেখা আছে যে, ১৮৫০ (আনুমানিক) সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্যলাভার্থে বর্দ্ধমানে কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৮৫০ সালে লেখা এক বইয়ে দেখা যায় যে, সেই সময় বর্দ্ধমানে প্রায় সব গ্রামেই পাঠশালা ছিল এবং গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা সকলেই লেখাপড়া জানিত। চাষের ফসল এত অধিক হইত যে, চারিদিকের তুলনায় বর্দ্ধমানের ক্ষেতগুলি সাজান বাগান বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এই অবস্থা দশ বৎসরের মধ্যেই—১৮৫৯ সাল হইতে একেবারে উল্টাইয়া গেল। এক অদ্ভুত জ্বরে দেশের লোক মরিতে আরম্ভ করিল। দেশের শ্যামলরূপ এক করাল ছায়ায় ঢাকিয়া গেল।

এই বিভীষিকার সূত্রপাত হইল কেমন করিয়া? ১৮৫৮ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তাহাদের রেললাইন পাতিবার সময় নানা জায়গায় বাঁধ বাঁধিয়াছিল। অনেকের মতে ইহাতে জলের স্বাভাবিক গতি বদলাইয়া যায়। কয়েক জায়গায় আবার জলের স্রোত একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বর্দ্ধমান বিভাগে যে সব নদী বহিয়া যায় তাহাদের সবগুলিই ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে নামিয়াছে এবং হুগলী নদীতে মিশিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। সব চেয়ে বড় নদী দামোদর ৬০০ মাইল বহিয়া আসিয়াছে। এই সব নদী শীতকালে শুকাইয়া যায়; কিন্তু আগে বর্ষার জল বহিয়া আনিয়া দুই কূল ছাপাইয়া নদীগুলি চাষের সুবিধা করিত এবং পুঞ্জীভূত সমস্ত আবর্জ্জনা ধুইয়া লইয়া যাইত। চাষীরা বান আটকাইবার জন্য যে বাঁধ দিত তাহা দরকার মত ভাঙ্গিয়া সেচের বন্দোবস্ত করিত; জল কোন এক জায়গায় বদ্ধ অবস্থায় থাকিত না। সারা দেশের উপর দিয়া সমানভাবে স্রোত বহিয়া যাইত। রেল কোম্পানীর বাঁধগুলি এই ব্যবস্থা আমূল বদল করিল এবং সব বাঁধ আইন করিয়া রেল কোম্পানী স্থায়ী করিল। ইহাতে জায়গায় জায়গায় জল দাঁড়াইয়া গেল এবং বৎসর বৎসর যে জলস্রোত সব ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত, তাহা স্থানে স্থানে বিলবাঁওড়ের সৃষ্টি করিল। প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারায় বাধা পড়িল এবং সেই আক্রোশেই বোধ হয় রেলওয়ে লাইন খুলিবার দুই বৎসরের মধ্যে এক ভীষণ রোগে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দশ বৎসর সমানে লোক মরিতে লাগিল।

এই সময়ে অনুমান চল্লিশ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। এক পাণ্ডুয়া গ্রামেই ১৮৬২ সালে প্রথম মড়কের হিড়িকে ছয়মাসে বারশত লোক মারা যায়। ১৮৭২ সালে সৈন্যদের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারের প্রধান ব্যবস্থাপক যে সাহেব ডাক্তার ছিলেন তাঁহার হিসাবে প্রকাশ পায় যে, রোগাক্রান্ত গ্রামে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই শতকরা সত্তর জন করিয়া লোক মারা গিয়াছে। ১৮৭০ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলাকে 'যমের বাড়ী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল। রোগের প্রকোপ তখন এমন ছিল যে দুর্ব্বলই হউক বা বলিষ্ঠই হউক—যে-কেহ এই দুই জেলায় যাইত তাহার জ্বরভোগ নিশ্চিত ছিল। একমাত্র ভাগ্যের জোরেই প্রাণরক্ষা সম্ভব হইত। বস্তুত এই অঞ্চলে কোন লোক তখন জ্বরের ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। জ্বরের কারণ তখন বাহির করা সম্ভব হয় নাই, কারণ নানারকম উপসর্গ ছিল বলিয়া জ্বরের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক স্যার লেনার্ড রজার্স বলেন যে, এই বর্দ্ধমান 'জ্বর' পরবর্ত্তীকালে সুপরিচিত কালাজ্বরের এক ভিন্নরূপ। তখন কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া ইহা স্থির করা সম্ভব হয় নাই। উপসর্গ দেখিয়া জ্বরের পরিচয় ঠিক করা হইত। জ্বরের ফলে গায়ের চামড়া কাল হইত বলিয়া ইহার নাম কালাজ্বর হইয়াছিল। অন্যান্য চিকিৎসকগণের মতে আবার 'বর্দ্ধমান জ্বরের' প্রকারভেদ ছিল। প্রধানত দুই রকমের উপসর্গ বিচার করিয়া তাঁহারা এক প্রকারকে দুষ্ট বিকারী (malignant) ম্যালেরিয়া ও অন্যটিকে কালাজ্বর বলিয়া অনুমান করেন।

১৮৬৪ সালে এই সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে বিধান লইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এক সভা বসান, এই সভা এই জ্বর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দেন। "এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত লোক শীঘ্রই অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের অবসাদ ক্রমশ রোগীকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে এবং রোগী দেড়দিন হইতে পাঁচদিনের মধ্যে মারা যায়। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা সুরু হয়। চোখ ঘোরতর লাল ও বেদনা-ক্লান্ত হয় এবং সমস্ত মুখ ফুলিয়া ওঠে। তাহার পর প্রলাপ আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে গলায় শ্লেষ্মা জমাতে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী মারা যায়।" 'বর্দ্ধমান জ্বরের' এই সব উপসর্গ ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মিলে। তখনকার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার জি, সি, রায় 'বর্দ্ধমান

জ্বরের' অন্যপ্রকার উপসর্গ দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন যে, বেশীর ভাগ রোগীর প্রকাণ্ড বড় প্লীহাই ছিল এই জ্বরের প্রথম নিদর্শন। ইহা সমস্ত উদরময় ছড়াইতে দেখা গিয়াছে। দূর হইতে কলসীপেট ও তাহার উপর শিরাগুলি ফুটিয়া থাকাতে রোগীকে উদরীর রোগী বলিয়া ভ্রম হইত। শেষ অবস্থায় উদরীতেও কোন কোন রোগী মারা যাইত। মৃত্যুমুখী রোগীর শেষ উপসর্গ প্রায়ই উদরীর মত হইত। এই সব স্ফীতোদর শীর্ণকায় পাণ্ডুরমুখ রোগীদের চেহারা অতি বীভৎস ছিল। ঔষধপথ্যের ভাল ব্যবস্থা না হইলে মুখময় ঘা হইয়া রোগী মারা যাইত। অনেক ক্ষেত্রে আমাশয় দ্বিতীয় উপসর্গ হইত। রোগীর রক্তে জলের ভাগ বেশী হইয়া পড়িত এবং সামান্য কোন ক্ষত হইলে অস্বাভাবিক পরিমাণ রক্ত বাহির হইত। মাড়ি ও নাক হইতে এবং মাঝে মাঝে মুখ ও মলদ্বার হইতে বিনা বাহ্যিক কারণে রক্তক্ষরণ হইত। এই বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে অধুনা পরিচিত কালাজ্বরের সাদৃশ্য আছে। অনুমান হয় যে, কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া এই দুই যমদূত তখন বর্দ্ধমানে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিয়া দিয়াছিল। পনর বৎসর পরে ১৮৭৫ সালে ইহাদের উপদ্রব কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই বর্দ্ধমানের জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০ হইতে ৫০০তে নামিয়া গিয়াছিল।

কালাজ্বরের আক্রমণ

পশ্চিম বঙ্গে মড়কের কয়েক বৎসর পর গত শতাব্দীর শেষভাগে কালাজ্বর আসাম প্রদেশে ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এই রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ ছিল প্লীহা ও যকৃতের অত্যধিক স্ফীতি। রক্তাল্পতা ও তজ্জনিত নানাবিধ উপসর্গের ফলে রোগীর শরীরের নানা জায়গা হইতে অস্বাভাবিক রক্ত ক্ষরণ হয়। ক্রমশ মুখে ঘা এবং অন্য এক অসুখে ভুগিয়া জ্বরের রোগীরা একে একে মরিতে থাকে। রোগের প্রকোপ এত ভীষণ ছিল যে, কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত প্রতি ১০০জন রোগীর মধ্যে ৯৮ জনই মারা যাইত। পরে এই রোগ আসাম ও বাঙ্গালা ছাড়া বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজেও দেখা গিয়াছে। আবার ভারতের বাহিরে চীন, গ্রীস, সিসিলি, ইতালী, স্পেন (ভূমধ্যসাগর-তীরস্থ গরম দেশ) এবং দক্ষিণ আমেরিকা—এই সব বিভিন্ন দেশেও কালাজ্বরের রোগী পাওয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের হাওয়ার ও বনজঙ্গলের সঙ্গে এই রোগের একটা নিকট-সম্বন্ধ দেখা যায়। রোগের প্রকোপটা গরম দেশেই বেশী দেখা গিয়াছে। কালাজ্বর-বীজাণুর পরিপোষণকারী জল বায়ু ও বীজাণুবহনকারীদের বাসোপযোগী স্থান এই সব দেশে বর্ত্তমান। ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ এই দশ বৎসরে কালাজ্বরে আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় লক্ষ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। এক নওগাঁ জেলায় রোগের আক্রমণে অনেক পরিবার ও গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন; লোকসংখ্যা ১০০জনের জায়গায় ৬৯ হইয়া গিয়াছে। চা-বাগানের কুলিদের মধ্যে মড়ক হওয়ায় বাহির হইতে কুলী আমদানি করা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছিল। একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর কালাজ্বর সমস্ত দেশে বিভীষিকার জাল ছড়াইয়া রহিল। এক এক বৎসর দশ লক্ষের উপর লোক মারা গিয়াছিল। হাকিম, বৈদ্য, ডাক্তার—সবরকম চিকিৎসক তাহাদের শাস্ত্রানুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ঔষধেই প্রতিশোধকের কাজ হইল না। ওঝাও আসিয়াছিল রোগের ভূত তাড়াইতে, তান্ত্রিক ও পুরোহিত আসিলেন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও নক্ষত্রদোষ দূর করিতে। কিন্তু সবই বৃথায় গেল। কালাজ্বরের রোগীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই পাওয়া গেল না।

এই সময় রোগের চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইতে আরম্ভ হইল। রোগের কারণ নির্ণীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রতিরোধক নানারকম ঔষধের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। কালাজ্বরের বিরুদ্ধে এই বৈজ্ঞানিক অভিযান সুরু হয় ১৯০০ সালে।

কালাজ্বরের বীজাণুসন্ধান

প্রায় ৮০ বৎসর আগে ফরাসী দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাস্তর প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন যে, সমস্ত রোগের মূল কারণ নানা প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতি জীবন্ত বীজাণু। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কালাজ্বরের মূলে কোন ক্ষুদ্র বীজাণু আছে কি-না তাহা বাহির করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের প্রথম চেষ্টা হইল। ইহার ফলে বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়াতে

লাইসম্যান, ডোনাভান, ম্যানসন ইত্যাদি কৃতবিদ্য চিকিৎসকদের সুসংবদ্ধ গবেষণার পর কালাজ্বরের বীজাণুর প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়িয়াছে। কালাজ্বরের এই মূল কারণ নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত দমদম ফিভার, ম্যালেরিয়া ক্যাকেকসিয়া, কালাদুখ, পুশনর, জ্বর বিকার প্রভৃতি নানা নামে এই রোগ পরিচিত ছিল।



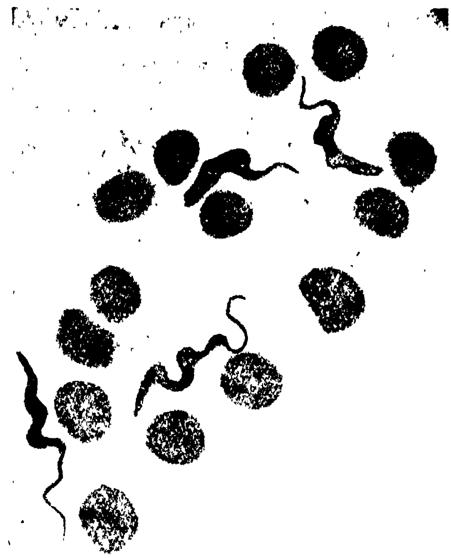
লুই পাস্তুর

কালাজ্বরের মূলে যে বীজাণু আছে তাহা প্রথম বিলাতের ডাক্তার স্যার প্যাটিক ম্যানসন * চিকিৎসক মহলে ব্যক্ত করেন।



সেৎসি মাছি—ঘুমরোগের বীজাণু বাহক

ম্যানসন বলিলেন যে ঘুম রোগের বীজাণুর অনুরূপ কোন বীজাণু শরীরের ভিতর ঢুকিয়া কালাজ্বরের সূত্রপাত করে। ঘুমরোগের বীজাণু সেৎসি নামে একরকম মাছি দ্বারা একদেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। কোন রোগাক্রান্ত মানুষ বা পশুকে কামড়াইবার পর বীজ মাছির শরীরের ভিতরে গিয়া আস্তে আস্তে বিকাশ লাভ করে; তাহার পর পরিণত অবস্থায় পেট হইতে মুখের লালায় আসিয়া



টিপ্যানোসোম ঘুমরোগের বীজাণু

অপেক্ষা করে। এই মাছি যখন কামড়ায় তখন তাহার লালার সঙ্গে বীজ সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে ও রোগ ছড়াইয়া পড়ে।

১৯০০ সালে লণ্ডনের নেটলী হাসপাতালে ভারত হইতে ফিরিয়া গিয়া এক সৈন্য জ্বরে মারা যায়। তাহার রোগ দম্‌দম্ ফিভার বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। এই রোগীর প্লীহা হইতে লাইসম্যান একপ্রকার বীজাণু বাহির করেন এবং দেখান যে, এই বীজাণুর আকৃতি টিপ্যানোসোমের মত। তখন তিনি এ জ্বরকে ঘুমরোগের এক ভিন্নরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। এই রকম বীজ ডোনাভানও কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীর ভিতরে পাইলেন; এই আবিষ্কারের

* ইনি কিছুকাল আগে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির ফলে মশা ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে যোগসম্বন্ধের বিষয় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের (সরকারী চিকিৎসা বিজ্ঞানের) বিখ্যাত গবেষক-চিকিৎসক স্যার রোণাল্ড রসের নিকট বলিয়াছিলেন। রস এই সূত্র অবলম্বন করিয়া দিনের পর দিন গবেষণা করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে মশা এক দেহ হইতে অন্য দেহে ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংক্রমিত করে। মশা যে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের কারণ তাহা প্রথম প্রমাণ করেন ইটালীয়ান ডাক্তার গ্রাসি (Grassi)। রস এনোফেলিস মশার শরীরের ভিতর ম্যালেরিয়ার বীজাণুর বিকাশ দেখান। কালাজ্বরের সঙ্গে আফ্রিকার ঘুম রোগের (sleeping sickness) কোন কোন উপসর্গের মিল আছে। আফ্রিকার জঙ্গল হইতে এখন দক্ষিণ আমেরিকার বনাচ্ছন্ন দেশেও এই রোগ দেখা গিয়াছে। এই রোগের বীজাণু বহনকারী পোকা ঘন জঙ্গলে বিচরণ করে। ঘুম রোগের বীজাণু টিপ্যানোসোম (Trypanosome) আমেরিকান ডাক্তার ডেভিড্ ব্রুস্ প্রথমে আবিষ্কার করেন।

ফলে বীজাণু ও জ্বরের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির হইল। ইহারপর কালাজ্বরের রোগীর ভিতরে এই বীজাণু ম্যানসন দার্জ্জিলিংয়ে এবং কাস্টেলানী সিংহলদ্বীপের রোগীদের মধ্যে পাইলেন। লাইসম্যান ও ডোনাভান প্রথমে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদের নামে কালাজ্বরের বীজাণু এখন লাইসম্যান-ডোনাভান বীজাণু নামে পরিচিত। আসামের উত্তরাঞ্চলে এই সময় কালাজ্বরের ভীষণ প্রকোপ। সেখানেও বাঙ্গালার লোকস্বাস্থ্যবিভাগের বড়কর্ত্তা বেণ্টলী সাহেব অনেক মৃত রোগীর প্লীহাতে একই রকমের বীজাণু খুঁজিয়া পাইলেন। তখন আসামের ঐদিকে ডাক্তার ছিলেন স্যার রিকার্ড ক্রিস্টোফার্স। তিনি নিয়মিত-ভাবে কালাজ্বরের রোগীদের পরীক্ষা সুরু করিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নানাবিধ নামে পরিচিত এই জাতীয় সমস্ত জ্বর কালাজ্বর মাত্র এবং উহাদের সমস্ত রকম বীজাণুর কারণ ঐ লাইসম্যান—ডোনাভান বীজ।

লাইসম্যান-ডোনাভান বীজাণুর জীবনতত্ত্ব

এইসব গবেষকেরা বীজগুলিকে মাত্র এক অবস্থাতে দেখিয়াছিলেন। ইহাদের যে এই অবস্থার নানা রকম পরিবর্ত্তন হইতে পারে এই বিষয় তখন কেহ চিন্তা করেন



স্যার লেনার্ড রজার্স

নাই। বৎসরাধিক কাল পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক রজার্স এইসব বীজাণুর পরিস্ফুটনের বিভিন্ন দশা প্রথমে লক্ষ্য করেন। ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত বীজাণুর যে অবস্থার সহিত গবেষকদের পরিচয় ছিল তাহার মাপ এক একটি রক্তকণিকার মত ও আকৃতি ডিমের মত লম্বা ধরণের ছিল। ইহাদের ভিতর দুইটি করিয়া কেন্দ্রবস্তু ছিল—একটি লম্বা ও একটি গোলাকৃতি।

ইহারা বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করিত বলিয়া অনেক সময় পরিষ্কারভাবে সীমাবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন বীজাণু প্লীহাতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই বিষবীজের অস্তিত্ব ঠিক হইত দুইটী কেন্দ্রকোষ দেখিয়া। কতগুলি বীজ আবার একত্রে অস্পষ্টভাবে জড়াজড়ি করিয়া থাকিত বলিয়া উহাদিগকে কোন জীবকোষের সমষ্টি বলিয়া ভ্রম হইত। প্রকৃতপক্ষে উহা কিন্তু আমাদের দেহের অসংখ্য কোষের উপাদান (protoplasm) এবং এই প্রোটোপ্লাজমের উপরে শিশু-বীজগুলি আশ্রয় লইয়া বাড়িয়া ওঠে। বীজের ক্রমবিকাশ—অর্থাৎ পরিণত অবস্থার আগে ক্রম-বর্দ্ধমান অবস্থাগুলি প্রথমে রজার্স শরীরের বাহিরে আনিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বই 'ফিভার ইন দি ট্রপিকস্'এ এই পরীক্ষার সুন্দর বর্ণনা আছে। তাহার বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল।

"কালাজ্বরের বীজাণু সুনিশ্চিত ভাবে প্রথম আবিষ্কারের এক বৎসর পরে ১৯০৪ সালে আমি শরীরের বাহিরে বীজাণুর বংশবৃদ্ধি ও বিকাশ দেখি। রোগীর প্লীহা হইতে রক্ত টানিয়া বাহির করিয়া প্রথমে রক্তের জমাট বাঁধা বন্ধ করি। শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ বিশুদ্ধ সোডিয়াম নাইট্রেট মিশান সামান্য (১ সি, সি) জল রক্তে মিশাইয়া শরীরের বাহিরে রক্তকে তরল অবস্থায় রাখি। প্রথমে এই রক্তের উত্তাপ আমাদের শরীরের সমান রাখিয়া দেখিলাম যে বীজাণুগুলি দুই একদিনের মধ্যে মরিয়া গেল। আমার আগে যাহারা এইভাবে বীজাণুর বিকাশ দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাদের ভাগ্যেও বীজ শীঘ্র মরিয়া গিয়াছিল সেইজন্য পরীক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ঘুমরোগের বীজাণু ট্রিপ্যানোসোমের সঙ্গে কালাজ্বরের বীজাণুর সাদৃশ্য ছিল। দুইটি কেন্দ্রবস্তু এই বীজাণুরও ছিল। ঘুমরোগের বীজাণু লইয়া যখন লেভেরাণ ও মেসনিল গবেষণা করেন তখন তাহারা চারিদিকের তাপ কমাইয়া ট্রিপ্যানোসোম বীজাণু অনেকদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সূত্রে আমার পরীক্ষার জন্য বীজাণু-দূষিত রক্তের তাপ কমাইয়া



কালাজ্বরের বীজাণুর ক্রমবিকাশ—১। প্লীহার আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন বীজাণুর প্রথম অবস্থা ২। রক্তকণায় দুই-দিনের জীবনের পর আকৃতির পরিবর্ত্তন। '১' ও '২'য়ের আকার ও কেন্দ্রকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। '৩' ও '৪'য়ের এবং '৫' ও '৬'য়ের আকার লম্বা হইয়াছে এবং বিভক্ত হইবার অবস্থায় আসিয়াছে। '৭' ও '৮'য়ে লেজের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ৩। লাঙ্গুলবিশিষ্ট বীজাণুর প্রথম বিভাগের চেষ্টা ৪। যমজ লম্বা সঞ্চরণশীল অবস্থা ৫। সুপরিণত অবস্থার একক বীজাণু ৬। পুনর্ব্বার ভাঙ্গনের অবস্থা ৭। শ্বেত-রক্তকণিকার ভিতরে জীবন ৮। শ্বেত-রক্তকণিকার আশ্রয়ে নূতন পরিবর্ত্তনের আরম্ভ ৯। ফুলের পাপড়ির মত অকৃতির প্রথম পরিবর্ত্তন ১০। বিচ্ছিন্ন সলাঙ্গুল বীজাণুর মিশ্রণ ১১। ফুলের পাপড়ির আকারের পুনর্বিভাগ ১২। ক্ষুদ্রাকৃতি সম্পূর্ণ ফুলের পাপড়ির আকার

দিলাম। ইহাতে বীজাণু-গুলির জীবনীশক্তি ও আয়ু বাড়িয়া গেল। বহু অংশে ভাগ হইয়া ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। সংখ্যাবৃদ্ধি বাদে আর কোন পরিবর্ত্তন ঐ তাপে দেখা গেল না। তাপ আরও কমাইয়া ফেলিলাম; কলিকাতায় এই পরীক্ষার জন্য বরফ ঘেরা বাক্সের দরকার হইয়াছিল (সাধারণ গরমের সময় ৩৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপ কলিকাতায় থাকে।) ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাপ কমাইয়া ফেলার পর দেখা গেল সংখ্যাবৃদ্ধি বাদে প্রতিটি বীজ আয়তনে বাড়িল এবং তাহাদের চারিদিকের প্রোটোপ্লাজমের রং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বদলান সম্ভব হইল। ইহাতে বীজাণু-গুলি চিহ্নিত করিতে সুবিধা হইল। কিছুকাল পরে বীজগুলির লেজ বাহির হইল এবং তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছবিতে এই সব পরিবর্ত্তনের অবস্থা দেখানো হইতেছে। প্রতিটি বীজাণুর পরিবর্ত্তনশীল জীবনের প্রত্যেক ধাপের ছবি এক মাপে বড় করিয়া দেখান হইতেছে। ইহাতে আয়তন বৃদ্ধি ও সংখ্যাবৃদ্ধি

বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। মানুষের শরীরের ভিতর বীজগুলি রক্তকণিকার মত ক্ষুদ্র। সেই জন্য প্রথমে বিশেষ যন্ত্রের ভিতর দিয়া যত্ন সহকারে ইহাদিগকে খুঁজিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু শরীরের বাহিরে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিলে বীজগুলি ফুলের পাপড়ির মত ছড়ায়। বীজগুলিকে সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আধ ইঞ্চি লেন্স দিয়া অস্পষ্ট গোল ছায়ার মত দেখিতে পাওয়া যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ইহারা রং বদলাইয়া বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা দেয়। এই অবস্থা ছবির একেবারে নীচের শ্রেণীতে দেখান হইয়াছে। এই পূর্ণবিকশিত অবস্থায় আসিবার আগে কেন্দ্রবস্তু দুইটাই ভাগ হইয়া বিকাশে সহায়তা করে। সর্ব্বশেষে কেন্দ্রবস্তু দুইটি সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে। এই অবস্থা ঘুমরোগের বীজের সঙ্গে থাপ খায় না। ইহা যে ভিন্নপ্রকারের বীজাণু তাহাতে সন্দেহ রহিল না।”

কালাজ্বরের সংক্রমণ সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন একপ্রকার মাছি কালাজ্বরের বীজাণু ছড়ায়। অনেকে মনে করেন যে খাবারের সঙ্গে মিশিয়াও এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। কোন কোন কালাজ্বরের রোগীর গায়ের চামড়ায় এই বীজাণু দেখা গিয়াছে। কালাজ্বর হইতে ভুগিয়া উঠিয়া কিছু সময় পরে কোন কোন রোগীর গাত্রচর্ম্মে দাগ দেখা যায়। সেই বিকৃত চর্ম্ম হইতে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী লাইসম্যান ডোনাভান বীজাণু পাইয়াছিলেন। যাহা হউক কালাজ্বরের বীজাণুর সন্ধান পাওয়া গেলেও ফলপ্রদ চিকিৎসার সন্ধান আরম্ভ হয় প্রায় দশবৎসর পরে—১৯১৫ সালে। ক্রমশঃ

মুমূর্ষু কৃষক

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দ্যাখো বাপধন, এক থলি টাকা সারাজীবনের পুঁজি
কোথা পাবো আর কিবা হবে ছার যক্ষের ধন খুঁজি ?

হক্কের ধন নহে সাধারণ নাহিক পাওনা দেনা
নাহি মহাজন নহি মহাজন নগদ বেসাতি কেনা।

সুদে বাড়ে নাই, আনি যাহা পাই, খাইতে পরিতে ঘুচে
রিপু করি তাই পুরানো সারাই সেলাই করিয়া ছুঁচে।

দেখো গুণে গুণে তিনশো দুগুণে ছয় শোটি টাকা খাঁটি
তিন রাজা রাণী পার করিলাম দীর্ঘ জীবন খাটি !

গায়ের রক্ত জল করিলাম তিরিশ বছর ধ'রে—
অতি সোজা-সুজি করিলাম পুঁজি বছরে কুড়িটি ক'রে।

পুকুরের মাছ জমি বিঘা পাঁচ খাজনা খরচ দিয়ে—
এই যাহা ছিল তোমার রহিল চলিলাম ছুটি নিয়ে।

বলদ জোড়াটি হ'ল সব ক'টি দাঁতের বয়সে পুরো—
শিরীষের 'পেয়ে' বাঁশের 'ওদল' বাবলা কাঠের 'ধুরো'

লোহার 'লিগে'য় 'কুমীরে'র খাঁজ সুতো সহি ক'রে গড়া
সে গুণের সাজ ছত্রির কাজ নাহি হয় নড়া চড়া।

মরাই গোলায় খড়ের পালায় ঢেঁকি ও গোয়ালঘরে
আপনার হাতে ছাঁচতলা হতে লক্ষ্মীর বেদী পরে।

তুলসীতলাটি আনি গেরিমাটী মাজিয়া রেখেছি নিজে
সেইখানটিতে শোয়াও মাটীতে কেন চোখ আসে ভিজে ?

গুরুদয়াময় দাও এ সময় হরিনাম সুমধুর
এই ঘাটে তরী ভিড়াও হে হরি আর নাহি রহ দূর।



কলঙ্কিনীর খাল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্রি তখনও শেষ হয় নাই। অন্ধকার তরল হইয়া আসিয়াছে। সুন্দর আধ-ঘুম আধ-জাগরণে দূর হইতে ভাসিয়া আসা সানাইয়ের সুর শুনিতে পাইল। ওপারের সজ্জন-বাড়ীতেই সানাই বাজিতেছিল। সুন্দরের সর্ব্ব দেহ-মনে তখনও ঘুমের নিবিড় আবেশ জড়াইয়া ছিল। সানাইয়ের মধুর সুর কিছুমাত্র মাধুর্য্য তাহার বিক্ষুব্ধ বিচলিত হৃদয়-মনে ঢালিয়া দিতে পারিল না। বরং জাগাইয়া তুলিল একপ্রকার অনীপ্সিত অস্বস্তি। সুন্দর কেমন একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব জ্বালায় শয্যা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চাহিল। সানাইয়ের একটানা সুর বাজিয়া চলিতে লাগিল। এ যেন টিয়ার বিবাহের জন্য ভোররাত্রে সানাই বাজিতে সুরু করিয়াছে এবং সুন্দরের মনকে পীড়িত মূর্চ্ছিত করিয়া বাজিবার আগ্রহেই শুধু বাজিতেছে। যেন আর বিরাম বিরতি বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু সুন্দর একবারও ভাবিতে চেষ্টা পাইল না যে, প্রতি বৎসর এমনই সপ্তমীর ভোর রাত্রে সানাই বাজিয়া পূজার সূচনা হয়। অল্প পরেই সানাইয়ের মধুর রাগিণী কাড়া-নাকাড়া সহযোগে বাজিতে লাগিল। ওপারের বাজনা চাপা পড়িয়া গেল সুন্দরের নিজেদের বাড়ীর বাজনার কাছে। সুন্দর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। এতক্ষণে মন তাহার যেন স্বস্তি মানিল। কিন্তু যে ঘোর দুঃস্বপ্ন হইতে সে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাও মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গেল না।

টিয়ার বিবাহের সানাই বাজিয়া ওঠার বিলম্বও আর বড় নাই। তাহার এমন সাধ্য নাই যে সে কোনপ্রকারে তাহাতে বাধা দিতে পারে। ভালবাসিলেই আর অধিকার কিছু জন্মায় না, টিয়ার উপর তাহার কোন অধিকারই তাই নাই। কবেকার কোন্ পূর্ব্বপুরুষের শত্রুরা আজিও শত্রুতা করিতে কসুর করিতেছে না। সার্থক সে শত্রুতা!

সুন্দর উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসার পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত আসিয়া ডাক দিল।

সুন্দর দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শ্রীমন্ত দরজায় বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল। সুন্দরকে চোখ রগ্‌ড়াইতে দেখিয়া শ্রীমন্ত বলিল—বাঃ রে, চোখ থেকে এখনও ঘুম ছাড়ে নি? এতক্ষণ কি বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে সানাই শুনছিলি হতভাগা? সজ্জন-বাড়ী চমৎকার সানাই বাজছিল কিন্তু।

সুন্দর শ্রীমন্তর কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিল এবং লজ্জা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা করিয়াই বলিল, সানাই আবার বাজছিল কখন, কোথায় রে?

শ্রীমন্ত বলিল, কেন, সজ্জন-বাড়ী। তোদের বাড়ীতেও তো বাজছিল।

সুন্দরের দরজা খুলিয়া বাহির হওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই ঠিক উভয় বাড়ীর বাজনাই বন্ধ হইয়াছিল। কাজেই সুন্দর সুবিধা পাইয়া বলিল, তা হবে। ঘুমিয়ে ছিলাম, শুনতে পাইনি তাই হয়তো।

কথাটা শ্রীমন্তর বিশ্বাস হইল না। কেন না, শ্রীমন্ত নিজেদের বাড়ী হইতেই পূজা-বাড়ীর বাজনা শুনিয়া আসিয়াছিল। আর সুন্দর এত কাছে থাকিয়া যে শোনে নাই তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিশ্বাস করা যায়ও না।

শ্রীমন্ত বলিল, হয়েচে! ন্যাকামি আমরাও অনেক জানি রে সুন্দর; কিন্তু এমন জল-জ্যান্ত মিথ্যে কথা তা বলে বলতে পারি না। সজ্জন-বাড়ীর সানাই শুনে তোর ঘুম ভাঙ্গেনি মিথ্যুক?

সুন্দর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ভেঙ্গেচে তো। তা, তুই অত চটচিস্ কেন?

শ্রীমন্ত বলিল, চটচি তুই সত্যি কথা এতক্ষণ বলছিলি না দেখে। যাক্, রাত থাকতে উঠে এই বুঝি তুই আমাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে নূপুরগঞ্জে গেলি? সেখানে না তোর কাজ ছিল অনেক!

সুন্দর বলিল, রাত থাকতে আর উঠতে পারিনি, তা আর তোকে ডাকব কি! কিন্তু যেতেই হবে নূপুরগঞ্জে—কাজ রয়েচে সেখানে অনেক। তুই বোস্, আমি চট্ ক'রে মুখ-চোখ ধুয়ে আসি ঘাট থেকে।

শ্রীমন্ত বসিয়াই রহিল। কিন্তু সুন্দর আর ঘাট হইতে ফিরিয়া আসে না। অনেকক্ষণ সুন্দরের অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া শ্রীমন্তর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। না জানি ওপারে টিয়াকে সুন্দর দেখিতে পাইয়া ঘাটেই সব কাজ ভুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কখন ফিরিবে কে জানে। শ্রীমন্ত উঠিয়া শেষে ঘাটের দিকেই গেল সুন্দরের সন্ধানে। কিন্তু সুন্দর ঘাটে নাই। ওপারের সজ্জন-বাড়ীর ঘাটে মেয়েরা পূজার কি সব জিনিষপত্র যেন ধুইতে আসিয়া জটলা করিতেছে, টিয়াও তাহাদের মধ্যে আছে। শ্রীমন্ত এদিক-সেদিক তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু সুন্দরের দেখা মিলিল না। শ্রীমন্ত বেশ ভাবনায় পড়িয়া গেল। তাই তো, সুন্দর আবার গেলই বা কোথায়? শ্রীমন্ত শেষে বিরক্ত হইয়া বাড়ী চলিয়া যাইতেই মনস্থ করিল এবং ফিরিয়াই দেখিল, সুন্দর তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীমন্ত বলিল, এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

সুন্দর সলাজ হাসিয়া উত্তরে বলিল, কেন, বাড়ীর ভেতর। তিনবার ঘাটে এসে ফিরে গেচি, ওঘাট থেকে ওরা ওঠে না তার আমি কি করব! এতক্ষণ ঘাটে আসতে পারিনি, কাজেই বাসী মুখেই আছি। তোর কাছে ফিরে যেতেও ভরসা হ'ল না, কি জানি হয় তো ঠাট্টা জুড়ে দিবি।

শ্রীমন্ত প্রাণ খুলিয়া হাসিল। না হাসিয়া যেন তাহার নিস্তার ছিল না। সুন্দরের আজিকার এই লজ্জা যতই কেন না অদ্ভুত বলিয়া বোধ হউক—অসঙ্গত নয়। শ্রীমন্ত তাহা বুঝিল, কিন্তু না হাসিলে পাছে সুন্দর আরও বেশী বিব্রত হইয়া পড়ে সেজন্যই যেন তাহার হাসার প্রয়োজন দেখা দিল। সুন্দরও হাসিল। বলিল, কি জানি—সত্যি কথাই তোকে বললাম।

শ্রীমন্ত বলিল, সে আমি জানি। মিথ্যে ব'লে লাভ নেই জেনেই হয় তো এত সহজে সত্যি কথা বললি। কিন্তু আরও আগে বললেই যেন ভাল হ'ত। নূপুরগঞ্জে যাবি আর কখন্ শুনি?

সুন্দর বলিল, এ-বেলা আর যাওয়া হবে না দেখতে পাচ্ছি, ওবেলাই বরং যাওয়া যাবে খন।

শ্রীমন্ত বলিল, তা বেশ, তবে আমি চলি। ও-বেলা পথ থেকে ডেকে নিয়ে যাস্।

সুন্দর তাহাতেই রাজী হইয়া শ্রীমন্তকে বিদায় দিয়া দিল। কিন্তু ঘাটে নামিতে তাহার সর্ব্বশরীরে আজ কেন জানি রোমাঞ্চ জাগিল। ওপারের সব কয়জোড়া চক্ষুই যেন তাহাকে একাগ্রভাবে দেখিতেছে। এমন বিশ্রী অবস্থায় জীবনে সুন্দর আর কখনও পড়িয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। নিজের অপ্রতিভ দৃষ্টি তুলিয়া ওপারের পানে চাহিতে সে লজ্জায় মরিয়া গেল। না পারিল অপাঙ্গে চোরাদৃষ্টিতে চাহিতে পর্য্যন্ত। ভয় হইল, পাছে পা আবার মাটিতে জড়াইয়া, কি ঘাটের পৈঠায় বাধিয়া সে পড়িয়া যায়। সে স্পষ্টই অনুভব করিল, সে যেন আজ পরাজিত শত্রু, বিক্রম তাহার ধূলায় চিরদিনের মত লুটাইয়া গেছে, মুখ তুলিয়া লোকসমক্ষে দাঁড়াইবার পথ যেন আর তাহার নাই। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাহার মনে পড়িল, কি কুক্ষণেই না জানি খেলাচ্ছলে এই ঘাটে দাঁড়াইয়া একদিন ছাতির শিকের মাথায় ফুঁড়িয়া পিটুলি ফল ওপারের ঘাটে দণ্ডায়মানা টিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়াছিল। এতদিনে তাহার অনুতাপ দেখা দিল। সেদিনের এই সামান্য ভুলটা না করিলেই যেন জীবনে তাহার আজিকার এই অর্থহীন শূন্যতার দৈন্য এমন করিয়া হাহাকার করিয়া ফিরিত না।

ওপারের ঘাটে হঠাৎ হাসাহাসি পড়িয়া গেল। সুন্দর চম্‌কাইয়া সেদিকপানে চাহিল। টিয়া কিন্তু নীরব। তাহার মুখে হাসির কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। বরং সেখানে যেন বিরাজ করিতেছে আষাঢ়ের গাঢ়তম মেঘমায়া। টিয়া যেন বড় শুকাইয়া গেছে—সুন্দরের সহসা মনে হইল। সুন্দর চোখে-মুখে কোনরকমে জল ছিটাইয়া ঘাট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মন তাহার সহসা আবার সপ্রশ্ন হইয়া উঠিল। টিয়ার অন্তরতম গোপন কথাটি সে যেন তাহারই মুখে আজ প্রতিভাসিত দেখিতে পাইয়াছে। টিয়া নিজের বিবাহ-ব্যাপারে তাহা হইলে খুশী হয় নাই—দুশ্চিন্তা তাহাকেও তবে পাইয়া বসিয়াছে। এমন অনেক কথাই সুন্দরের মনে হইল। সুখ-কল্পনা হইতে মানুষ নিজেকে কিছুতেই কেন জানি বিরত রাখিতে পারে না। সুন্দরও পারিল না। কত সম্ভব-অসম্ভব কল্পনাই না সে মনে মনে করিল। টিয়াকে পাওয়া তাহার পক্ষে খুব অসম্ভব বলিয়াও বোধ হইল না। কিন্তু পাওয়ার পথটা সে অবশ্য দৈবের উপর ছাড়িয়া দিতেই বাধ্য হইল। কেন না,

শত্রুদুর্গে প্রবেশের পথ শত্রুতার দ্বারাই একমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব—মিত্রতার দ্বারা নয়।

আবার কাড়া-নাকাড়া বাজিতে সুরু করিয়া দিল। সানাই এখন বিশ্রাম লইতেছে। সুন্দরের সুখ ও দুঃখে বিজড়িত কল্পনা-সূত্র সহসা কাটিয়া গেল। সুন্দর ত্রস্তে পূজামণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল। কাজের তাহার আজ অন্ত নাই, কিন্তু কাজে আর তাহার কিছুতেই মন মাতিতেছে না।

দশমীর ভোরে সুন্দরের ঘুম ভাঙ্গিল অদ্ভুত সংকল্পে। আজ সেই বহুশ্রুত প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন—কলঙ্কিনীর খাল নাকি এই দিনে দুই বাড়ীর শত্রুতার সংঘর্ষে বহু হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছে, রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুন্দরের জীবনে কখনও তাহা সংঘটিত হয় নাই। আজ সহসা কেন জানি সুন্দরের মনে বহুকালের স্তিমিত শত্রুতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। আবার সেই শত্রু-সংঘর্ষের মহামুহূর্ত্তটি তাহার মনে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। বৈকালে প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় আবার নূতন করিয়া দুই বাড়ীর শত্রুতা সুরু করিয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি সুন্দর করিবে না এবং সেজন্য প্রস্তুত হইতেও সে লাগিল। নিশি সজ্জন প্রতি বৎসর বহু আড়ম্বরে ও আস্ফালনের সঙ্গে যে নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে প্রতিমা ডুবাইতেছে ভৈরব দত্তের শান্তিপ্রিয় মনের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া—তাহা এ-বৎসর সুন্দর কিছুতেই আর সম্ভব হইতে দিবে না। এ-বৎসর দত্ত বাড়ীর প্রতিমা সুন্দর জোর করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ডুবাইবে। তাহাতে যদি নিশি সজ্জন কোনপ্রকার বাধা জন্মাইতে চেষ্টা পায় তো সুন্দর দেখিয়া লইবে আজ, তাহাদের দুই বাড়ীর শত্রুতার শেষ কোথাও আছে কি না। শত্রুতা করিতে হইলে চরমভাবে শত্রুতা করাই ভাল। সুন্দর আজ আর মনে কোনপ্রকার ক্ষোভ রাখিবে না। বিসর্জ্জনের বাজনা আজ রণ-দামামার তবে পরিণত হউক্। পূর্ব্বপুরুষের ক্ষুব্ধ আত্মায় আজ খুশী ঘনাইয়া উঠুক্। সুন্দর অভিনব সংকল্পে আজ মাতিয়া উঠিল।

ভোরেই উঠিয়া তাই সে একা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া গেল বকফুলী নদীতে। বকফুলীর ওপারে নূপুর-গঞ্জের পাশের নদীসংলগ্ন গ্রাম হুতাশীতে তাহাদের কয়েক ঘর প্রজার বসতি আছে। এককালে নাকি এই হুতাশী হইতেই প্রজারা বিসর্জ্জনের দিন সড়্‌কি-বল্লম লইয়া দলে দলে আসিত মনিবের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে। মধ্যাহ্নেই কলঙ্কিনীর খালে কাতারে কাতারে নৌকা দাঁড়াইয়া যাইত—দুই পাড়ে জন-সমাগম হইত—কলঙ্কিনীর খাল মাতিয়া উঠিত। সুন্দর সেই হুতাশীর প্রজাদের বাড়ী বহিয়া নিজেই সংবাদ দিয়া আসিল, আজ বিসর্জ্জনের সময় গোলমাল বাঁধিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, কাজেই সকলে যেন প্রস্তুত হইয়াই আসে। হুতাশীর কয় ঘর প্রজা মনিব-পুত্রের পদধূলি গ্রহণ করিয়া জানাইয়া দিল যে, যথাসময়ে তাহারা হাজির হইবে এবং মনিবের সম্মান অটুট রাখিতে প্রাণ দিতেও তাহারা কিছুমাত্র কার্পণ্য করিবে না।

সুন্দর হুতাশীতে খবর দিয়া যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেশ বেলা হইয়া গেছে—মুখে তাহার না জানি আবার এই দুঃসংকল্পের ছায়া পড়িয়াছে। সে একটু বিশেষ বিব্রত বিচলিত অবস্থায় তাই বাড়ী ফিরিল এবং সকলকে এড়াইয়া চলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিসর্জ্জনের কালে বহু প্রজার সশস্ত্র আগমনে ভৈরব দত্ত কেমন যেন একটু বিচলিত হইল। তাহার মনে পড়িয়া গেল—অতীতের কথা—বিস্মৃতপ্রায় বহু কাহিনী। কিন্তু প্রজাদের এই সশস্ত্র আগমন সম্বন্ধে সে পূর্ব্বাহ্নে কিছুই জানিতে পারে নাই এবং কি প্রয়োজনে যে তাহারা আসিয়াছে তাহাও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। হুতাশীর শ্রীদাম ও সুদাম দুই ভাই আসিয়া যখন ভৈরব দত্তের পদধূলি গ্রহণ করিল তখন সে বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিল, তোরা কি করতে এলি এখানে? আবার যে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই একেবারে?

—কি রকম! দাদাবাবু যে নিজেই গিয়ে আমাদের খবর দিয়ে নিয়ে এল। বললেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, আসতে হবে। তাই তো দু'ভায়ে চ'লে এলাম।—বলিয়া শ্রীদাম চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সুন্দরকেই সন্ধান করিতে লাগিল।

ভৈরব দত্ত অধিকতর বিস্ময়ে বলিল, তাই নাকি? কিন্তু সুন্দর তো কই আমাকে তার কিছুই বলেনি।

তারপরে ডাক ছাড়িয়া সুন্দরকে ডাকিতে লাগিল। সুন্দর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল এবং শ্রীদাম ও সুদামের পানে চাহিয়া পিতার প্রশ্নের পূর্ব্বেই সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল।

ভৈরব দত্ত বলিল, সুন্দর, এদের সব খবর করেচিস্ কেন ?

সুন্দর উত্তরে বলিল, আজ গোলমাল একটা বাঁধবেই। চতুর্দ্দিকে নিশি সজ্জন তো সেই কথাই গেয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন নূপুরগঞ্জের হাটে দাঁড়িয়ে মধু ঘোষালকে সে এই কথাই শুনিয়েচে। কাজেই খবর করলাম।

ভৈরব দত্ত সস্মিত আননে বলিল, দূর পাগল! গোলমাল আমি কিছুতেই বাঁধতে দেব না। প্রতিমা কলঙ্কিনীর খালে বিসর্জ্জন দেওয়া নিয়ে তো গোলমাল বাঁধবে—তা আমি কিছুতেই বাঁধতে দেব না। দরকার হ'লে প্রতিমা বকফুলীতে নিয়েই বিসর্জ্জন দেব।

সুন্দর দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল, না, এভাবে গাঁয়ের পথে-ঘাটে শত্রুর আস্ফালন অসহ্য! বকফুলীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলে গাঁয়ে আর মুখ দেখাতে পারব না। সবাই একবাক্যে বলবে—ভীরু কাপুরুষ। আর আমাদেরই বংশে একদিন—

ভৈরব দত্ত বাধা দিয়া বলিল, বলে বলুক, তবু যা বহু চেষ্টায় একদিন থেমেচে, তা আর কিছুতেই আমি শুরু হ'তে দেব না। এই অকারণ শত্রুতার ফলে দু বাড়ীর বহু রক্তই কলঙ্কিনীর খালের জলে মিশেচে এপর্য্যন্ত। আর একবিন্দুও আমি সেখানে মিশতে দেব না। তাতে মান-সম্মান সব যদি আমাকে বিসর্জ্জন দিতেই হয় তো আমি প্রস্তুত আছি।

সুন্দর মাথা নীচু রাখিয়াই বলিল, আমরা হ'তে দেব না বললেই তো আর হয় না। ওরা যদি শুরু করে—তখন ?

ভৈরব দত্ত বলিল, সে আমি বুঝব। না না শ্রীদাম, কোন গোলমালের আশঙ্কা আমি করি না। তোমরা দু'ভায়ে এসেচ দেখে আমি ভারি খুশী হয়েচি। বিসর্জ্জনের পর শান্তিজল মাথায় নিয়ে মিষ্টিমুখ ক'রে তবে বাড়ী যেয়ো।

সুন্দর অদূরে শ্রীমন্তকে আসিতে দেখিয়া মুক্তি পাইয়া বাঁচিল এবং শ্রীমন্তকে ডাকিয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতে শুরু করিল। স্ত্রীলোকেরা জোকার দিয়া দশভূজা মায়ের বরণের কাজ সিঁদুর পরাইয়া পান খাওয়াইয়া সারিয়া গেল। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা কলাপাতা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া একশো আটবার—'শ্রীশ্রীদুর্গা' লিখিয়া মায়ের চরণে ছোঁয়াইয়া দিয়া গেল। ঘটা করিয়া মায়ের বিসর্জ্জনের অনুষ্ঠানগুলি একে একে শেষ হইতে লাগিল। সুন্দর ক্রমেই কেন জানি গম্ভীর হইয়া উঠিতে-ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মুখে বিষাদের গভীর ছায়া পড়িয়াছে, কাজেই সুন্দরের মুখের বিকার কেহ লক্ষ্য করিল না, আর করিলেও ধরিতে পারিত না। মুখে তাহার বিষাদের ছায়াও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে লিপ্ত হইয়াছিল। সুন্দরও আর সকলের মত কলাপাতায় দুর্গানাম একশো আটবার লিখিল এবং লিখিতে গিয়াই সে প্রথম বুঝিল যে, কতদূর অন্যমনস্কই সে আজ হইয়া পড়িয়াছে। একবার ভুলক্রমে 'শ্রীশ্রীদুর্গা' স্থানে সে টিয়ার নামটাই লিখিয়া ফেলিল। হয় তো টিয়ার কথা চিন্তা করিতে করিতেই সে এতবড় ভুল করিয়াছে। কিন্তু কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইয়া বাকীগুলি অতি যত্নসহকারে লিখিয়া শেষ করিল। এই ভুলের জন্য মন তাহার সম্পূর্ণ-রূপে বিকল হইয়া গেল। কাজেই প্রতিমায় যখন সকলে আসিয়া কাঁধ দিল তখন সুন্দরও প্রতিমার একদিকে কাঁধ ঠেকাইল, কিন্তু কিছুমাত্র উদ্যম তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইল না। স্ত্রীলোকেরা একসঙ্গে জোকার দিয়া উঠিল। পুরুষেরা কাঁধে করিয়া প্রতিমা পূজামণ্ডপ হইতে বাহিরে নামাইল।

ভৈরব দত্ত সভয় ব্যগ্রতার সঙ্গে সকলকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিল। পাছে, প্রতিমা আবার কোন কিছুর সঙ্গে ঠেকিয়া কোন কিছু ভাঙিয়া গৃহস্থের অমঙ্গল সূচনা করে। ভৈরব দত্ত অত্যন্ত কাতর নিবেদনে সকলকে যথারীতি সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিল। অবশ্য, ভৈরব দত্তের বলার কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়াই সকলে যথাসাধ্য সাবধান হইয়া উঠিয়াছিল। অতি গুরু কর্ত্তব্য সমুপস্থিত দেখিয়া সুন্দরও সমস্ত চিন্তা জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইল। প্রতিমার চালির কম্পমান কল্কায় পর্য্যন্ত যাহাতে সামান্য চিড়্ না খায় সেদিকে সকলেই দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিমা কাঁধে লইয়া কলঙ্কিনীর খালের দিকে অতি ধীরে

ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘাটে আনিয়া যখন সকলে ধরাধরি করিয়া প্রতিমা নৌকায় তুলিল কোন অনর্থ না ঘটাইয়াই, তখন ভৈরব দত্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সানন্দ কৌতুকে বলিয়া উঠিল, মা'র অশেষ কৃপা, তাই বাধা পড়েনি কোন কাজেই। এখন নিরঞ্জঘাটে বিসর্জ্জন শেষ হ'লেই আমার নিস্কৃতি।

সুন্দর খালের জলে এক হাঁটু প্রায় নামিয়া দাঁড়াইয়া নৌকায় প্রতিমা তুলিয়াছিল। সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রতিমার একাংশ ধরিয়া ছিল। পিতার কথা শুনিয়া সে একবার ওপারের ঘাটের দিকে ফিরিয়া চাহিল। এপারের মত ওপারেও আয়োজনের বা লোকসমাগমের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। নিশি সজ্জনের বাড়ীর প্রতিমাও নৌকায় উঠিয়াছিল।

কিন্তু সমস্ত ছাড়াইয়া গিয়া সুন্দরের দৃষ্টি পড়িল ওপারের বাতাবী লেবু গাছটার তলায়—যেখানে আর সকল মেয়েদের মধ্যে টিয়াও দাঁড়াইয়া ছিল। টিয়ার মুখে কোন ভাব-বিপর্য্যয় দেখা গেল না। তবে সে যেন সুন্দরের পানেই দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইয়া আছে। ক্ষণিকের জন্য সুন্দরের মস্তিষ্কে রক্তের চাঞ্চল্য দেখা দিল। শত্রুতা সাধিতে হইলে আজ সেই বহুশ্রুত শুভলগ্ন সমাগত। কিন্তু টিয়া অমন করিয়া ওখানে দাঁড়াইয়া যদি সুন্দরের কীর্ত্তি-কলাপ নিরীক্ষণ করিতে থাকে তো সুন্দরের দ্বারা আর যাহাই কেন না সম্ভব হউক্, কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ একেবারেই সম্ভব নয়।

শ্রীদাম ও সুদাম আর সকলের সঙ্গে প্রতিমায় কাঁধ দিয়াছিল, প্রতিমা-সমেত তাহারা নৌকায় উঠিয়া প্রতিমা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অন্য আর একটি নৌকায় শ্রীদাম ও সুদামের সড়্কি-বল্লম মজুত ছিল। হুতাশীর আরও যে সব লোকজন আসিয়াছিল তাহারাও তাহাদের সড়্কি-বল্লম নৌকার পাটাতনের নীচে মজুত করিয়া রাখিয়াছিল—প্রয়োজনে কাজে লাগাইবার জন্য। কিন্তু ভৈরব দত্ত সকলকে যেভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছে ও সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে তাহাতে ঈপ্সিত দাঙ্গার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়াই কেহ মনে করিতে পারিল না।

চতুর্দ্দিকে কেমন একটা সামাল সামাল রব উঠিয়া গেল। কেহ বলিল, চালি সাম্‌লে। কেহ বলিল, কল্‌কাগুলো গেল বুঝি—সাম্‌লে, সাম্‌লে! কেহ বলিল, কার্ত্তিকের হাতখানা বাঁচিয়ে! ইত্যাদি কত কিছু। সে যেন মহাহট্টগোল শুরু হইয়া গেল। ভয়-ভাবনা আনন্দ-কোলাহল ব্যথা-বেদনা একই কালে সেখানে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল।

দুই বাড়ীর প্রতিমা প্রায় পাশাপাশিই ডুবানো হইতেছিল। কিন্তু যে নির্দ্দিষ্ট স্থান লইয়া এতকাল এই দুই বাড়ীতে বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিরোধ-বিপত্তি ঘটিয়াছে সেই স্থানটিতে সগৌরবে নিশি সজ্জন তাহার বাড়ীর প্রতিমা বিনা বাধায় ডুবাইতে লাগিল। সুন্দর বাধা দিবে বলিয়া এবার ভাবিয়াছিল, কিন্তু কেন জানি তাহা কার্য্যকালে কিছুতেই সম্ভব হইল না। নিমজ্জমান প্রতিমা হইতে তাই সকলে যখন দেবীর চূড়া, চালির কল্‌কা প্রভৃতি খসাইয়া লইয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া কাড়াকাড়ি শুরু করিয়া দিল তখন সুন্দর কিন্তু নিস্পৃহ হইয়া একপাশে জলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের বিক্ষুব্ধ অন্তরের সহিত বোঝাপড়া করিতে লাগিল। ক্ষমতা তাহার নিতান্ত সীমাবদ্ধ—এমন কি, টিয়ার উপস্থিতিতে সামান্য ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার ক্ষমতাও যেন তাহার আর নাই। নিজের মনে মনেই সে তাই আজ চরম পরাজয় মানিয়া লইয়া নীরব হইয়া রহিল।

প্রতিমা বিসর্জ্জনের কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিয়া সকলে খালের জলে স্নান করিয়া পাড়ে উঠিল। সুন্দরও সবার সঙ্গে স্নান-সারিয়া পাড়ে উঠিল, কিন্তু সেখানে সে এক-মুহূর্ত্তও না দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। দেহ ও মনে চরম অবসাদ জড়াইয়া সে বাড়ী ফিরিল। শত্রুর হাতে এতদিনে যেন তাহার চরম অবমাননা হইয়াছে। শত্রুর সহিত শত্রুতা করার অধিকার হইতেও সে আজ বঞ্চিত—এমন নিষ্ঠুর পরাজয়ের আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয়-মন ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিসর্জ্জনান্তে পূজামণ্ডপে সকলেই ফিরিয়া আসিল। পূজামণ্ডপ শূন্য শ্রীহীন বলিয়া সবারই প্রাণে কেমন একটা ব্যথা জাগিয়া উঠিল। সুন্দরও আসিয়া সভামধ্যে একদিকে আসন গ্রহণ করিল শান্তিজল গ্রহণের জন্য। পুরোহিত শান্তিজল আশীর্ব্বচনের সঙ্গে সবার মস্তকোপরি ছিটাইয়া দিল। তারপরে প্রণাম ও আলিঙ্গনের পালা কেমন একটা ব্যথা-কাতরতার মধ্য দিয়া শেষ হইল। সুন্দর এই সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করিয়া গেল যন্ত্রচালিতের মত। সুন্দর

ব্যথা-কাতর হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু পূজা-বাড়ীতে বিজয়া দশমীর রাত্রে বিসর্জ্জনের পরে সবারই অন্তরে যে ব্যথা-কাতরতা বিরাজ করে, তাহা কিন্তু তাহার অন্তরে বিরাজ করিতেছিল না। কেমন একটা পরাজয়ের গ্লানি তাহার সর্ব্বদেহ মনের উপর নিবিড় বেদনার দাগ বুলাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। কাজেই শান্তিজল গ্রহণান্তে কোলাকুলির পালা শেষ করিয়া দলে দলে যখন গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে গেল বিজয়ার প্রণাম ও আলিঙ্গন সারিতে, তখন সুন্দর কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে সবার অনুরোধ এড়াইয়া কলঙ্কিনীর খালের নির্জ্জন অন্ধকার ঘাটে গিয়া নিজেদের নৌকায় উঠিয়া একাকী হাজারখুনীর বিলের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। এমন কি, শ্রীমন্তর অনুরোধও সে এড়াইয়া খালের ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিল।

দুই বাড়ীর প্রতিমা পাশাপাশি বিসর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে—বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া প্রতিমার কাঠামো মাটির সঙ্গে গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। খাল শূন্য নিরালা পড়িয়া আছে। সুন্দরের প্রাণ ডুক্‌রাইয়া আজ কাঁদিয়া উঠিল—প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য নয়—আজ কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই যেন সে প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে নিজ পৌরুষ কলঙ্কিনীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে। প্রেম পৌরুষের পাপ্‌ড়িতে ঘা মারিয়া যেমন তাহাকে জাগাইতে জানে তেমনই আবার ঘা মারিয়া সেই উন্মোচিত পাপ্‌ড়ি ঝরাইয়া দিতেও পারে। সুন্দর আজ চরম ভাবে তাই তাহার পরাজয় মানিয়া লইল। বিসর্জ্জনের পালা শেষ হইয়া গেল।

পাঁচ বৎসর পরের কথা।

টিয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে। সঙ্গে আসিয়াছে তাহার স্বামী মোহন। টিয়ার ক্রোড়ে টিয়ার দেড় বৎসর বয়স্ক শিশু-পুত্র যুবরাজ। যুবরাজ টিয়ার শ্বশুরের দেওয়া নাম—সকলে আদর করিয়া সেই নামেই তাহাকে ডাকে।

শিখীপুচ্ছে পদার্পণ করিয়াই টিয়ার সবকিছু কেমন যেন নূতন লাগিতে লাগিল। বিবাহের পরে এই সে প্রথম বাপের বাড়ী আসিল। বিবাহের পরেই সে রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছিল এবং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাপের বাড়ী আসার সুযোগ তাহার আর হয় নাই। অবশ্য, টিয়ারও শিখীপুচ্ছে আসার জন্য কোন আগ্রহ কোন দিন দেখা দেয় নাই। আর টিয়ার শ্বশুরও টিয়াকে সৎ-মা'র কাছে পাঠাইতে পছন্দ করে না বলিয়াই এতদিন পাঠায় নাই। এবার টিয়ার শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী—সব সদলবলে দেশে আসিয়াছে বহু বৎসর পরে এবং এত কাছে আসা সত্বেও টিয়াকে বাপের বাড়ী যাইতে না দিলে খুব খারাপ দেখায় বলিয়াই হয় তো অনুমতি দিয়াছে। শিখীপুচ্ছে প্রবেশ করিয়া টিয়ার কিন্তু মন্দ লাগিতে-ছিল না। সেই সব পুরাতন পরিচিত স্থান—বহুদিন পরে আবার দেখিতে পাইয়া সে খুশী হইয়া উঠিল।

বাব্‌লি টিয়ার আগমন-সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিল এবং টিয়া কোন ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাব্‌লি যুবরাজকে টিয়ার কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া উঠানেই তাহাকে আদর করিতে মাতিয়া উঠিল। যুবরাজ কিন্তু নূতনমানুষ বলিয়া বাব্‌লির আদরে আপত্তি জানাইল না, হাসিয়া সমস্তই গ্রহণ করিল।

বাব্‌লি টিয়াকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিল, চমৎকার ছেলে হযেচে কিন্তু তোর। একটু আপত্তি করলে না, একটু কান্না জুড়লে না, বেশ্‌ তো চ'লে এলো আমার কোলে। কিন্তু নবদুর্গার মেয়েটা যা হয়েচে—সাধ্য কি কেউ তাকে ছোঁয়। অসম্ভব কান্না জুড়তে পারে বাবা! কি ওর নাম রেখেচিস্‌ টিয়া শুনি?

টিয়া সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, নাম? আমার শ্বশুর ওকে যুবরাজ ব'লেই ডাকেন। আর ও যেন কি একটা নাম রেখেচে, তা আমার মনেই থাকে না।

বাব্‌লি বলিল, বাঃ, যুবরাজ তো চমৎকার নাম, আমরাও ওকে যুবরাজ ব'লেই ডাকব।

বলিয়া বাব্‌লি যুবরাজের গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, কেমন গো যুবরাজ, আপত্তি নেই তো তোমার কিছু?

যুবরাজ খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিল, যেন সমস্তই সে বুঝিয়াছে এবং বড় রঙ্গের কথাই হইয়াছে।

মোহন ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল নিশি সজ্জনের সঙ্গে। টিয়া কিন্তু উঠানে দাঁড়াইয়া বাব্‌লির সঙ্গে কথা কহিতেই লাগিল। কথার যেন তাহাদের আর শেষ নাই—কত কথাই তো বলিবার আছে। বাব্‌লির বিবাহের কোন সংবাদ টিয়া পায় নাই বলিয়া কত অনুযোগ করিল এবং কোথায় বিবাহ হইয়াছে, কেমন লোক তাহারা, কিরূপ তাহার দিন শ্বশুরালয়ে কাটিয়াছে, ইত্যাদি কত কথাই টিয়া

জিজ্ঞাসা করিল। তারপরে আরও যে কত গোপন কথা জিজ্ঞাস্য আছে তাহার তো অন্ত নাই, কিন্তু উঠানে দাঁড়াইয়া সেসব কথা তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না, কাজেই টিয়া বলিল, চ বাব্‌লি, ঘাট থেকে মুখ-হাত-পা ধু'য়ে আসি—পথের কাপড়-চোপড় ছেড়ে খালাস হই।

টিয়া স্যুটকেশ্‌ হইতে কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া বাব্‌লিকে সঙ্গে করিয়া কলঙ্কিনীর খালের ঘাটে চলিল। যুবরাজ বাব্‌লির কোলেই রহিল। পথে টিয়া যুবরাজকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইল, ইটি তোমার মাথিমা যুবরাজ।

ঘাটের কাছে বাতাবী লেবু গাছটার তলায় আসিয়া দাঁড়াইতেই টিয়ার গা কেমন যেন ছম্‌ ছম্‌ করিয়া উঠিল। বাতাবীলেবু গাছটায় আজ অসংখ্য ফল ধরিয়াছে। টিয়ার বুকটা কেন জানি কাঁপিয়া উঠিল, মুখের কথা তাহার সহসা বন্ধ হইয়া আসিল।

ওপারের দত্ত-বাড়ীর ঘাটে কে যেন একটি টিয়ারই সমবয়সী বধূ নিশ্চুপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বধূটি বিধবা—কিন্তু অপরূপা সুন্দরী বলিয়া টিয়ার মনে হইল। টিয়ার মন কেন জানি খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল। এত রূপ ও এতবড় সর্ব্বনাশ একসঙ্গে সে যেন জীবনে কোথাও দেখে নাই।

বাব্‌লিও বিধবা বধূটিকে দেখিয়া মুহূর্ত্তে টিয়ার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, ঐ যে ঘাটে দাঁড়িয়ে না, ঐ হ'ল সুন্দরের স্ত্রী। কি চমৎকার রূপ, কিন্তু …

বাব্‌লি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

টিয়ার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত মহাকালের মহাসর্ব্বনাশের হিমনিশ্বাস যেন বহিয়া গেল। পায়ের তলায় ধরণী যেন টলমল্‌ করিয়া উঠিল।

ওপারের বধূটির কিন্তু কোনদিকেই হুঁস্‌ ছিল না—অপলক দৃষ্টিতে পাষাণ প্রতিমার মত সে যেন কলঙ্কিনীর খালের জলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অপর পার হইতে কেহ যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সে একবারও খেয়াল করিল না।

বাব্‌লি বলিল, ওরই নাম ইন্দুমতী। এত রূপ বড় একটা দেখা যায় না।

টিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল—ভয়ার্ত্তের আর্ত্তনাদের মতই তাহা শুনাইল।

সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের বেড়া এখন আর নাই। টিয়া ঘাটে নামিয়া জলে নাড়া দিতেই ওপারের বধূটির সম্বিত যেন ফিরিয়া আসিল। সে মুহূর্ত্তে চকিতা ভীতা হরিণীর ন্যায় ঘাট হইতে সরিয়া গেল।

বাব্‌লি বলিল, হয় তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরের স্বপ্নই ও দেখ্‌ছিল। সুন্দর এই কলঙ্কিনীর খালেই ডুবে মরেচে কি না!

টিয়া কাতর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, বলিস্‌ কি বাব্‌লি? কেন, সে কি আত্মহত্যা করেছে নাকি?

বাব্‌লিও বেদনাবিধুর কণ্ঠে বলিল, ও, তুই বুঝি তা 'হলে কিছুই শুনিস্‌নি? না, আত্মহত্যা করবে কেন! তবে, তোরই জন্যে ও মরেচে! সত্যি তোকে ও বড় ভাল-বেসেছিল! কলঙ্কিনীর জলে যেদিন ওর লাশ ভেসে উঠল—সে যে কি …

টিয়া খালের জলে হাত ডুবাইয়া বাব্‌লির কথা শুনিয়া চলিয়াছিল, সভয়ে সে জল হইতে হাত তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কলঙ্কিনীর খালের দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিল না, পাড়ে উঠিয়া আসিল।

সেইদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে টিয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া একাকী আবার খালের ঘাটে অকারণে গিয়া দাঁড়াইল।

ওবেলার মত এবেলাও ইন্দুমতী ঠিক সেই একই স্থানে একই ভাবে ওপারে দাঁড়াইয়া আছে। টিয়া প্রথম চম্‌কাইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে স্থির দৃষ্টিতে অপরূপা ইন্দুমতীর রূপ-লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চোখে তাহার জল আসিয়া গেল। এই কলঙ্কিনীর খালের দুই পাশের দুই বাড়ীতে কত পুরুষ ধরিয়াই তো শত্রুতার কত নৃশংস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এতবড় নৃশংসতা আর কখনও কোনও পুরুষে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া টিয়ার জানা নাই। এমন করিয়া শত্রুকে কেহ কখনও পরাজিত করিয়াছে বলিয়া সে ভাবিতে পারিল না। শত্রুতার চরম প্রতিশোধ যেন এতদিনে লওয়া হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকারে শত্রুকে নিঃস্ব রিক্ত নিঃশেষিত করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। এ যেন অভূতপূর্ব্ব নবতম পদ্ধতিতে নিষ্ঠুরতম শত্রুতা সাধিত

হইয়াছে। টিয়া আকুল হইয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। তাড়াতাড়ি চোখে তাই সে কাপড় চাপা দিয়া দাঁড়াইল।

একসময় টিয়া সহসা স্বপ্নোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল।… কিন্তু—না, কই—কেহ তো পিটুলি ফল ছুঁড়িয়া তাহার কপালে মারে নাই! হইবে—হয় তো সে স্বপ্নই দেখিতেছিল।

ভাল করিয়া তাই চোখ মুছিয়া সে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু ইন্দুমতী তখন চলিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত

পত্র-লেখা

শ্রীমতী উমা দেবী

—জীবন-প্রভাতে তুমি প্রথম-অরুণ—
ভালো কি লাগিবে যদি বলি এই কথা?
এরো চেয়ে আরো ভালো জানা আছে মোর
যদিই শুনিতে চাও বলিব তোমারে।
ছোটো আঁকা বাঁকা পথ সূর্য্যের আলোয়
চারিদিকে ফুলগুলি করে ঝলমল—
চলেছিনু চিন্তাহীন অলস আরামে
জীবনে প্রথম তুমি নামিলে আঁধার।
শুনে কি চমক লাগে? মিথ্যা কিছু না
শোনো আরো স্পষ্ট করে বলি তবে আজ
আঁধারে প্রথম আমি হারানু নিজেরে
তবু যেন নিজেরেই ফিরিয়া পেলেম।
সূর্য্য তুমি নও মোর জীবন-আকাশে
ভালো কি লাগিবে যদি বলি এই কথা?
নিভৃতে প্রাণের দীপে জ্বেলেছিনু শিখা
প্রথম প্রেমের শিখা যৌবন-উন্মেষে,
—সে দীপ নিভিয়া গেলো কবে কোন ক্ষণে
তবু জানি এ জীবন হয়নি আঁধার।
বারে বারে ফিরে গেছে পথের পথিক
ছুঁয়ে দিয়ে গেছে মোর প্রাণের প্রদীপ,
বারে বারে শিখা তাই উঠিয়াছে জ্বলে
তাই জানি এ জীবন হয়নি আঁধার।
সে অব্যক্ত কোন জন কী আছে তাহার?
—ফিরে ফিরে তারি স্পর্শ পেয়েছে অন্তর
পঙ্কিল-আবর্ত্তময় জীবনের স্রোত
তাহারি আলোক পেয়ে হ'য়েছে নির্মল।
এক ও বহুর মাঝে শুধু পুণ্যক্ষণে
প্রাণের প্রদীপে মোর জ্বলিয়াছে শিখা।

নাইবা ভুলিলে মোরে! নতুন নয়ন
যদি আঁখিপাতে আনে নতুন আবেশ
বলিতে বলিতে কথা যদি পড়ে মনে
নতুন সুরের রেশ নতুন গলার—
চলিতে পথের মাঝে যদি পথ ছেড়ে
সাধ যায় বনানীর সবুজে হারাতে
—তবু—তবু অনুরোধ এইটুকু শুধু
ভুলিয়া যেওনা মোরে তুমি সেইক্ষণে।
"রয়েছি বাঁচিয়া আমি" এই অনুভূতি
এটুকু তুমিই শুধু দিতে পারো মোরে—
—(বাঁচিবার সাধ মোর অসীম অগাধ—
পূরণের অধিকার শুধুই তোমারি)—
—ভুলে যেতে চাও যদি তবুও ভুলোনা
নতুনের পাশে রেখো পুরাণো আমারে।
—শোনো, ভেবে দেখো মিছে হোয়োনা অধীর-
সত্যই জীবনে যদি ভালোবেসে থাকো—
এ বিচ্ছেদ আনিবেনা কোনো দুঃখ মনে—
বেদনায় গুঁড়া হ'য়ে যাবেনা জীবন—
জলের উপরে ভাসে স্নেহ-পদার্থের
অপরূপ সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনুচ্ছটা,
জলভার ক্লান্তমেঘ-মেদুর-অম্বরে
—সেই বর্ণবৈচিত্র্যের স্পষ্ট-অনুচর।
—তুচ্ছ জল, তুচ্ছ মেঘ, তুচ্ছ বর্ণচ্ছটা
শুধু তুচ্ছ নয় জেনো পূর্ণ-লাবণ্যের
পূর্ণতম-অনুভূতি আনন্দ-মধুর—
—যা পরিপূর্ণতা আনে খণ্ডিত জীবনে।
আমারে ভুলিয়া গেলে ক্ষতি কিছু নাই
সে লাবণ্য-অনুভূতি ভুলিয়োনা শুধু।

আধুনিক সভ্যতার নূতন আদর্শ

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম-এল-সি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্প্রতি উৎকট অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। ইদানীং প্রতীচ্য সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে উৎখাত হয়েছে আগ্নেয় আন্দোলন—তাতে ক'রে কাইজার ও জার প্রভৃতিকে অন্তর্হিত হতে হয়েছে। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রচুর সাবধানতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিপ্লব ইউরোপে এনেছিল ভূকম্প—শ্রমিক ও ধনিকদের ভিতর ঘনিয়ে ওঠে এক বিরাট সংঘর্ষ—অধিকসংখ্যক শ্রমিক তাই ধনিকদের কক্ষ্যচ্যুত ক'রে নানা জায়গায় একটা নূতন ব্যবস্থার পত্তন করে। মার্কস প্রভৃতি ভাবুকেরা রুশিয়ায় দাবাগ্নি জ্বালিয়ে দেয়। ফলে কম্যুনিজম্‌এর যুগকেই স্বর্ণযুগ ভেবে ইউরোপের কোন কোন অঞ্চল উৎফুল্ল হল। রুশিয়া নূতন বিধান ও "পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা" প্রভৃতি তৈরি করেও উৎকট অশান্তি হ'তে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। ফাসিজম নিয়ে এল আর এক প্রেতমূর্ত্তি ইউরোপের মানচিত্রে। তা ক্রমশ জার্মনীর জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ-এর সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করল একটা বিরাট গ্রাসের কল্পনায়—কারণ ক্ষুধা ও আর্ত্তনাদ বেড়েই চলেছিল। অপর দিকে ধনিকদের রাজ্য—আমেরিকায়, রুজভেল্ট অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের জড় ক'রেও বিশ্ববিভ্রাটকে দূর করতে পারল না। ইদানীং ইহুদীদের তাড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে। এসব চালেও বাজিমাৎ হচ্ছে না। ফলকথা, অশান্তি বেড়েই চলেছে এবং আর একটি মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে দুনিয়ার সমগ্র ব্যবস্থাই ওলটপালট হ'তে চলেছে। এই যুদ্ধ একটা নূতন অর্থনৈতিক বোঝাপড়া করবে এবং এই বোঝাপড়াই সমগ্র কলহের মেরুদণ্ড—একথা স্বীকৃত হচ্ছে।

এর সূচনা আরও আগে হয়েছিল। যখন আন্তর্জাতিক বাজার মন্দায় ইউরোপ ও আমেরিকা কাবু হয় এবং নিজেদের ভিতর 'বহুর মধ্যে দারিদ্র্য' দেখে ওরা হতভম্ব হয় তখনই দেখা গেল অর্থবিদ্যার সূত্র জেনেও এ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব নয়। অগণিত বেকার একদিকে, অন্যদিকে পুঞ্জীভূত দ্রব্যসম্ভার ও শূন্য থলি-এতেই সূত্রপাত হয় অগ্নিদাহ। এখনও ইংলণ্ডে বহু লক্ষ বেকার আছে ব'লে ও দেশ ব্যাঙ্কের ব্যাপার হয়েছে। কাজেই শুধু ধন, সমৃদ্ধি ও ভোগকে লক্ষ্য ক'রে যে সভ্যতা অগ্রসর হয়—শেষটা সে সভ্যতাই এসব হ'তে বঞ্চিত হয়। এ অধ্যাত্মিক সত্য বোঝা ইউরোপের পক্ষে সহজ নয়।

কাজেই আমরা যে ভবিষ্যৎ গঠন করব শুধু জড়-ঐশ্বর্য্য স্বার্থসঞ্চয়মূলক ভোগকে লক্ষ্য ক'রে ছুটলেই কি তার সাহায্যে এসব পাব? ইতিহাস ত তা প্রমাণ করছে না। ধন নিয়ে হয় কাড়াকাড়ি—ভিতরে ও বাইরে। কাজেই ধনের মালিকদের ভিতরকার খবরও একবার নেওয়া দরকার। এসব দেখে সহজেই মনে হবে মানুষের মনের রাজ্যে অনেক হের-ফের আছে যা আমাদের সমগ্র ব্যবস্থা ও বিধানকে নিমেষে ভূমিসাৎ করতে পারে। আজ যে রাজা, কাল সে ফকির হ'তে পারে—মননের দুর্ব্বলতায়, চিত্তের খর্ব্বতায় এবং আদর্শের ক্ষুদ্রতায়। কাজেই যুগে যুগে ভারতবর্ষ যেভাবে অগ্রসর হয়ে আত্মরক্ষা করেছে সে পথের একটু খবর নেওয়া এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হয় না।

পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হ'তে প্রিয়, এমন একটি ধনকে ভারতবর্ষ একসময় সম্পদ মনে করেছিল। কাজেই ধনসর্ব্বস্ব আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সেই প্রিয়তম সম্পদের যোগসাধনের আদর্শ এদেশে প্রবর্ত্তন করা কিছুই অস্বাভাবিক ঠেক্‌বে না। বস্তুত এদেশের ভাবুকগণ অধ্যাত্মবিধির সহিত জীবনের কর্ম্মপ্রবাহকে বার বার একটা বোঝাপড়ায় আন্‌তে চেয়েছে সভ্যতার স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য। এজন্যই ভারতীয় সভ্যতা এখনও অমর হয়ে আছে। নৃশংস ব্যবস্থা ও বহিশত্রুর নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডে এই জন্যই এই প্রাচীন সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। বস্তুত অধ্যাত্ম ব্যবস্থার সহিত পার্থিব ক্রিয়াকাণ্ডের যোগসাধন—মানে, প্রাচীন যুগের পুনঃ প্রবর্ত্তন নয়। যা চ'লে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না—তা উচিতও নয়।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভগীরথের সাফল্য

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

প্রাচীন সভ্যতার আবহাওয়াও ছিল অন্যরকম—এজন্য সে সভ্যতার ব্যবস্থাও সেরূপ বিশিষ্টতাকে হিসেব ক'রেই অগ্রসর হয়। এ যুগের নানা কর্ম্মাঙ্গ ও বহু নূতন ঘটনা অভিনব মনন ও সাধনে পরিপূর্ণ হয়েছে—কাজেই বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা একটা কৃত্রিম ও মিথ্যা অভিনয় হবে মাত্র। বস্তুত মূল আদর্শকে নূতনরূপ দান করা খুবই সম্ভব—কারণ তাকে আরও সমৃদ্ধ ও পূর্ণতর করার চেষ্টা ঐতিহাসিক দিক থেকে মিথ্যাচার বা ভ্রান্তিসৃষ্টি নয়। কাজেই নূতন বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ক'রে নূতন বিধানকে প্রবর্ত্তিত করতে হবে। সভ্যতার চরমদান অতীত কালেই হয়ে গেছে—আর কিছু করবার নেই—এরূপ মনে করা ঠিক নয়। যুগে যুগে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে নব নব ঘটনাজালের ভিতর দিয়ে। নূতন প্রশ্ন ও সমস্যা বার বার ঘনীভূত হচ্ছে—যা প্রাচীন কালে কখনও ছিল না। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন যুগের ফতোয়া এ যুগের ব্যাধিকে দূর করতে পারবে না। নূতনতর ঋষির স্বস্তিবাচন প্রয়োজন—নূতনতর বেদ রচনায় অগ্রসর হ'তে হবে। কারণ যে যুগ এসেছে বা আস্‌ছে তা কম সমৃদ্ধ বা কম ঐশ্বর্য্যবান—একথা মনে করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। কাজেই আধুনিক জড়বাদ, স্বার্থবাদ ও ভোগবাদকে রূপান্তরিত ক'রে চিন্তারাজ্যে যা সৃষ্টি করতে হবে তাতে নূতনতর অধ্যাত্ম উপলব্ধির স্থানই প্রধান হবে। শুধু সাময়িক, ভঙ্গুর ও চঞ্চল ভিত্তির উপর বিরাট মননের ইমারত রচনা সম্ভব হয় না। মানুষের মনোজগতের দুর্ভেদ্য গহন অরণ্যে অগ্রসর হয়ে তার শেষ সীমান্ত, এমন কি তারও ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। সদসদের—'being' ও 'non-being'-এর প্রশান্ত ব্যাপ্তির ভিতরই খুঁজতে হবে সৃষ্টির অর্থ। মানুষ কি চায়, কিসে তার তৃপ্তি, কোথা তার জীবনবহার জাগ্রত স্পন্দন তা ঠিক করতে হবে। সীমার হিসাবনিকাশ করতে হবে অসীমের প্রাঙ্গণে। একাজে দুর্ব্বল বা শিথিল হ'লে চল্‌বে না। জড়বাদের সাহায্যে জীবনবাদের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের অসীমের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হবে—না হয়, তৃপ্তি কখনও ঘটবে না—কারণ অসীমের উৎসও আমাদেরই ভিতর। Being ও non-being-এর সন্ধিভূমিও মানুষের সহস্রারেই সম্ভব হচ্ছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রবাদ ইদানীং সমগ্র পৃথিবীতে একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব সম্ভব করেছে। বিজ্ঞান গভীরতর জ্ঞানের পথে অগ্রসর না হয়ে' আজ কর্দ্দমে নিজেকে মলিন করছে। অথচ মানুষের হত্যায় মানবত্বের হত্যা সম্ভব হয় না। এই মানবত্বের সঙ্গেই সমুদয় পার্থিব শক্তির বোঝাপড়া করতে হয়। এই মানবত্ব দেবত্বের অঙ্কেই বিকশিত হচ্ছে। সে দেবত্ব অর্থে প্রলুব্ধ হয় না, বিলাসিতায় আত্মহারা হয় না—অনেক সময় আত্মোৎসর্গেই মহীয়ান হয়ে ওঠে। এজন্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—ভবিষ্য সংশ্লেষণও হবে অধ্যাত্ম অনুভূতিকে বর্জ্জন ক'রে নয়—গ্রহণ ক'রে। শুধু অতীতের দিকে ফিরে যাওয়া বা চাওয়া একটি চিরন্তন দুর্ব্বলতা মাত্র। তিনি বলেছেন—"That would to limit ourselves and to attempt to create our spiritual life out of the being, knowledge and nature of others—of the men of the past, instead of moulding it out of our own being and potentialities. We do not belong to the past dawns but to the noons of the future." অর্থাৎ—"এ রকম করলে আমাদের সীমাবদ্ধ করা হবে মাত্র এবং তাতে ক'রে আমাদের অধ্যাত্ম জীবন তৈরি হবে অন্যের বা অতীতের ফরমায়েসে। বস্তুত আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে এবং আমাদের নিজেদের সুপ্তশক্তি হতেই নূতন অধ্যাত্ম-জীবনের প্রেরণা গ্রহণ প্রয়োজন। আমরা অতীত উষার-সন্তান নই, ভবিষ্যৎ মধ্যাহ্নই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বস্তুতঃ প্রাচীনতাকে রোমন্থন ক'রে অগ্রসর হওয়া কিম্বা প্রাচীনতার ভিতরই একমাত্র সত্য নিহিত আছে মনে করা একটি ভুল। আধুনিকতার অনুপলব্ধ বাণী ও আবেষ্টনকে নিউ রিয়ালিটিস্ বলে বুঝতে হবে—তবেই নূতন পাত্রে কিছু দান সম্ভব হবে। শ্রীঅরবিন্দ একথা স্পষ্টই বলেছেন: "A mass of new materials is flowing into us; we have not only to assimilate the influences of the great theistic religions of India but to take full account of the potent though limited revelations of modern knowledge and seeking." অর্থাৎ—প্রচুর নূতন উপাদান আমাদের ভিতর অহরহ এসে পড়েছে; আমাদের প্রাচীন ভারতের সকল ধর্ম্মগুলির প্রভাব অন্তর্গ্রহণ করা প্রয়োজন; তা ছাড়া,

আধুনিক জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার সকল উপকরণ ও প্রকাশকে সীমাবদ্ধ হলেও বিবেচনা করতে হবে, কারণ সে সবের ভিতরও শক্তির বীজ আছে। এজন্যই একটি মহত্তর ও বিরাটতর সমন্বয় এ যুগে সম্ভব করতে হবে—যা কোন যুগে হয় নি। আধুনিক যুগ এজন্য যে সংশ্লেষণ গঠন করবে তা একটি মহান ব্যাপার হবে। তাতে শুধু অতীত ও বর্ত্তমান মাত্র নয়—সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন ও নব্য চিন্তাধারার সমগ্র গমককে আয়ত্ত ও অন্তর্ভূত করে এ বিধানের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বৈদিক সমন্বয়ে সমগ্র বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল একটা বিশ্বব্যাপী দেববাদে। উপনিষদ এই অভিজ্ঞতা হতে আরও গভীরতর সামঞ্জস্যের রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিল। তন্ত্রবাদ ও পরবর্ত্তীযুগে একটি জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত ক'রে আরও ঐশ্বর্য্যবান তত্ত্ব ও অনুষ্ঠানকে সঞ্জীবিত করে। তন্ত্রের "যোগো ভোগায়তে মোক্ষায়তে চ সংসারঃ" একটা রূপান্তরিত অবস্থার কথা—যা নূতন সাধন ও মনন সম্ভব করেছিল। কিন্তু এ যুগের সমস্যা আরও গুরুতর বল্‌তে হবে। নব্য জড়বাদ যে তুমুল অশান্তি সৃষ্টি ক'রেছে তাতে অধ্যাত্মবাদের আলোক প্রবিষ্ট করাতে অনেকে অগ্রসর হবে না। এক্ষেত্রে স্নায়বিক উত্তেজনা একটা দুঃস্বপ্ন সৃষ্টি করছে অহরহ। জড়বাদ ও যন্ত্রবাদের দাহকরী ক্ষুধা ও অধ্যাত্মবাদের অফুরন্ত শান্তি ও তৃপ্তিকে এক করা যায় রূপান্তরিত অবস্থায়। এ অবস্থা মানুষকে গণ্ডীমুক্ত ক'রে মহীয়ান ও উচ্চ করতে বাধ্য। অখণ্ড মানবত্ব ও বিরাট মানবত্ব মুকুলিত হবে এমনি ক'রে সহজ সৌন্দর্য্যে, আনন্দে ও সেবায়। ভারতবর্ষকে এজন্য অগ্রণী হ'তে হবে, কারণ একটি পরম আনন্দবাদ সৃষ্টি করা কোন ক্ষুদ্র সভ্যতা বা একদেশদর্শী চর্চ্চা সম্ভব করতে পারে না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষ এই বিশিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে একটি বিস্ময়কর সমন্বয়ে উপস্থিত হয়।

একথা নিশ্চিত, ধর্ম্মকে বর্জ্জন ক'রে বা অধ্যাত্ম সত্যকে তুচ্ছ ক'রে যে কর্ম্মপন্থা রচিত হবে তা বার বার ব্যর্থ হবে। মানুষের সকল দিকের আকাঙ্ক্ষা ও আবেদনের তৃপ্তি যে আদর্শে নেই—তা অপ্রচুর হতে বাধ্য। যারা মনে করে জীবনের বা জগতের সমস্যা একটি অর্থনৈতিক সমস্যা মাত্র—তারা সত্যের বহুমুখী রূপ টের পায়নি। মার্কস-এর বিচার একটি খণ্ড সত্যকেই চরম মনে করেছে—এজন্য তার ভিতর ইউরোপে ও ভারতবর্ষে নানা প্রতিক্রিয়া এসেছে। ইউরোপের নব্য চিন্তায় এসিয়ার অভিজ্ঞতা যুক্ত না হলে কোন কর্ম্মপন্থাই স্থায়ী হবে না। কাজেই রুশরাষ্ট্রের প্রাণদান করতে শিল্প-সম্বন্ধীয় বিপ্লবই চরম কথা নয়। একদিকে শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন, অন্যদিকে মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের চরম জিজ্ঞাসা ও ব্যাকুলতার তৃপ্তি—এ দুটি প্রান্তের সামঞ্জস্য করতেই হবে। না হয় 'বহুর মধ্য দারিদ্র্য' মত হলাহল বার বার সভ্যতা-মন্থনে নির্গত হবে। সে সব স্বর্ণমান বর্জ্জন বা কৃত্রিম বাণিজ্য-বিধানের ফিকিরে চিরকাল বা বহুকাল মনোরঞ্জন করতে পারে না। পার্থিব ব্যাপার দিব্য সৃষ্টিরই প্রতিপাদক। অধ্যাত্ম প্রয়োজনকে বর্জ্জন ক'রে অগ্রসর হওয়া ভুলপথে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। বাণিজ্য, ব্যবসা, যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, যন্ত্রপাতি—এসব প্রয়োজন সন্দেহ নেই—এ সবকে ত্যাগ ক'রে শুধু প্রাচীন হাতিয়ার আদিম উপাদানগুলি নিয়ে এ যুগ চল্‌তে পারে না। অপর দিকে ভাগবতী শক্তির প্রেরণা ও অধ্যাত্ম বলিষ্ঠতা অনুভব করতে হয় কর্ম্মের বহুমুখী বিস্তারে। কার্য্যকরী নীতির সঙ্গে ঊর্দ্ধ-চেতনের যোগ প্রয়োজন। শুধু নৈতিক সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা স্বপ্রতিষ্ঠ স্বাবলম্বনের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। তাতে ভগবানের স্থানই যে প্রধান, একথা বিশেষভাবে বল্‌তে হবে। এ যুগের ভগবানকে, কয়লার খনি, অলিগলির আবর্জ্জনা ও অধঃপতিতদের অন্ধকূপে আবির্ভূত হ'তে হবে—শুধু গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনিতে তার বাণী শুন্‌লে চল্‌বে না। রুশিয়া থেকে ভগবানের নির্ব্বাসন জাতীয় চিত্তের শুষ্কতা ও যান্ত্রিকতাকে আরও উৎকট করেছে—তাতে ব্যবহারিক যুক্তিবিদ্যা তৃপ্তি পেয়েছে—তুরীয় অনুভূতি নয়। মানুষ যন্ত্রও নয়, পুত্তলিকাও নয়। এজন্য আধুনিক বহিরঙ্গ সভ্যতাকে অন্তরঙ্গ অবাঙ্‌মনসগোচর সত্যের বিরাট দ্বারে করজোড় হতে হবে—নইলে চল্‌তে থাকবে অশ্রান্ত অশান্তি ও অতৃপ্তি।

শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন—"The use of the body and of mental askesis for the opening up of the divine life on all its planes".—অর্থাৎ অধ্যাত্ম-জীবনের সকল স্তরের অবতরণ ও উন্মুক্তির জন্য শরীর ও মনের সকল বার্ত্তার অকুণ্ঠ প্রয়োগ—এ না হ'লে চল্‌বে না। একে উপেক্ষা ক'রে নূতন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হবে। আধুনিক সভ্যতাকে উদার ও ব্যাপক হতে হবে। সেজন্য হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে আধুনিক আবেষ্টনে একটি নূতন রূপ দান করতে হবে। এই রূপান্তর দানকে যুগোপযোগী সমন্বয়ের বার্ত্তার অনুকূল করতে হবে—তবেই তাতে ইতরতা, ক্ষুদ্রতা ও স্থূলতা থাকবে না।

ফরাসী গণিকা

শ্রীগঙ্গাপদ বসু

—ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ! ...

ফরাসী রণক্ষেত্রের সীমান্তে ছোট একখানি গ্রামের বুকে অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে।

সূর্য্যের আলো দেখা যায় না। দিনের বেলায়ও অমাবস্যার রাত্রির মত সুনীবিড় অন্ধকার। জার্মানবাহিনীর আক্রমণে পর্য্যুদস্ত ছোট্ট গ্রামখানি নিস্তব্ধ নিষ্প্রাণ—অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। সে যেন কোন্ অকালমৃতা রূপসী নারীর সুন্দর অথচ বিভীষিকাময় মৃতদেহ!

বিজয়ী জার্মান সেনাধ্যক্ষ মেজর গ্রাফ ফন্ ফার্লস্‌বার্গ অনুচরমণ্ডল ও কয়েকদল সৈন্য লইয়া গত তিন মাস এই অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উচ্চতম সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই অঞ্চলেই 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাড়ীখানিই ইনি সানুচর নিজের বসবাসের জন্য ব্যবহার করিতেছেন। বাড়ীখানির নাম—'সেটো দ্য উভাইল।'

সেদিন সকালবেলা মেজর নিজের ঘরে একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া জার্মান সংবাদপত্র ও নিজের চিঠিপত্র পড়িতেছিলেন। তাঁহার সাম্‌নে একখানি শ্বেতপাথরের ছোট টেবিলে কফির কাপ হইতে ধোঁয়া উড়িতেছিল—মুখে সুগন্ধী ফরাসী তামাক-ভরা পাইপ। মেজরের সুদীর্ঘ মাংসপেশীবহুল দেহ—আগুনে-পোড়া চওড়া তামাটে রঙের মুখমণ্ডলে ঘনসন্নিবিষ্ট শ্মশ্রু। সে যেন দেবাসুরের যুদ্ধে দৈত্য-সেনাপতি!

চিঠিপত্র পড়া শেষ করিয়া মেজর আগুনের মধ্যে দুইখানি কাঠ ফেলিয়া দিলেন। গ্রামের লোককে দিয়া কাঠ কাটানো হয়—কাজেই সে কাঠ খরচও হয় নিতান্ত অকৃপণভাবে। মেজর কাঁচের জানলা খুলিয়া দিয়া একটি প্রুশিয়ান জাতীয় সঙ্গীতের সুর শিস্ দিয়া বাজাইতে লাগিলেন—বুটের ঠোকার সঙ্গে সঙ্গে তাল দেওয়াও চলিতেছিল অন্যমনস্কভাবে। এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'ভিতরে এস।'

যিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন তিনি মেজরের অন্যতম সহকারী ক্যাপ্টেন ব্যারন ফন কালউইনস্টেন। ক্ষুদ্রাকৃতি লাল-মুখো লোকটির চেহারা দেখিলেই মনে হয়—কোন একটা শয়তানী মতলব ওর মগজের মধ্য দিয়া পাক খাইয়া বেড়াইতেছে। একদিন রাত্রিবেলায় ক্যাপ্টেন নিদ্রিত অবস্থায় কি ভাবে তাঁর সাম্‌নের দুটো দাঁত হারাইয়াছিলেন তার রহস্যজনক ইতিহাস আজও আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু কথা বলিবার সময় ওর ফোকলা দাঁতের মধ্য দিয়া যখন আওয়াজ বাহির হইয়া যায় তখন ওর কথাই ভাল করিয়া বুঝা যায় না। মাথার মাঝখানে মোটেই চুল নাই—কিন্তু চারপাশে ঘন কুঞ্চিত লাল চুল প্রচুর পরিমাণে আছে।

সেনাপতি টেবিলের কাছে আসিয়া সহকারীর সহিত করমর্দ্দন করিলেন। তার পর নিজের কফির কাপটি এক চুমুকে নিঃশেষ করিলেন (সকালবেলায় এই তাঁর ষষ্ঠ কাপ শেষ হইল)। ক্যাপ্টেনের নিকট হইতে তিনি রাত্রিতে কোথায় কি ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ শুনিলেন। ইতিমধ্যে প্রাতরাশের ডাক আসিতেই তাঁহারা উঠিয়া কথা বলিতে বলিতে খাবার-ঘরে গেলেন। সেখানে আরও তিনজন অপেক্ষাকৃত নিম্নতন পদে অবস্থিত সেনাপতিমণ্ডলের কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে একজনের নাম—লেপ্টেন্যাণ্ট অটো ফন গ্রস্‌লিং; অন্য দুইজন সাব লেপ্টেন্যাণ্ট—তাহাদিগের নাম—ফ্রিজ শ্লেবার্গ ও ব্যারন ফন ইরিক।

এই শেষোক্ত ব্যক্তির একটু পরিচয় আবশ্যক। ইহার আকৃতি ও ইহার স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ইহার সুন্দর মুখ—টানা চোখ ও বড় বড় কুঞ্চিত চুল দেখিলে মনে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিয়া ওর কবিতা লেখাই উচিত ছিল। ফ্রান্সে আসিবার পর হইতে ওর সহকর্ম্মীরা উহাকে 'মাদাম ফিফি' বলিয়া অভিহিত করিত। ইরিকের সরু কোমর, মেয়েলী মুখ ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের জন্য তার এই নামটি ক্রমশ

সৈনিক মহলেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাদাম ফিফির স্বভাবটি ছিল ঠিক এক উন্মত্ত বন্য জানোয়ারের মত। কয়েদীদের প্রতি এর মত নির্দ্দয় ব্যবহার সেনানায়কদের মধ্যে আর কেহ করিতে পারিত না—এমন কি সৈনিকদের প্রতিও এর মত নির্দ্দয় ব্যবহার আর কেউ করত না। অল্প উত্তেজনায় ও যেন বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিত। ···

খাবার-ঘরটি সুন্দরভাবে মূল্যবান আস্‌বাব-পত্রে সাজানো ছিল; কিন্তু সামরিক প্রেতদিগের তাণ্ডব ক্ষেত্রে পরিণত হইবার পর এ ঘরের—এ বাড়ীর সে শ্রী আর নাই।

খাবারগুলো নিঃশব্দে গলাঃধকরণ করিয়া সেনাপতিরা মদের বোতলে হাত দিলেন। বিনা পয়সার—লুণ্ঠিত মদ। মায়া-মমতা করবার প্রয়োজন ছিল না। কাজেই গ্লাসের পর গ্লাস উড়িতে লাগিল। হাসি, গল্প, গান, ইয়ার্কি—ক্রমশ ইতরামিতে পরিণত হইল। মদ শেষ হইলে পাঁচজন সেনানায়ক একসঙ্গে পাচটি পাইপে অগ্নি সংযোগ করিয়া যে পরিমাণ ধুম ঘরের মধ্যে উদ্গীরণ করিলেন তাহা দূর হইতে দেখিলে মনে হইত, ওখানে বোধ হয় গোটা দশেক আগুনে-বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

হঠাৎ মাদাম ফিফি বলিয়া উঠিল—'দূর ছাই, এভাবে কাঁহাতক বসে থাকা যায়? একটা কিছু করা দরকার।'

লেপ্টন্যাণ্ট অটো আর ফ্রিজ প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—'কি করা যায় বলো তো? সত্যিই বড় 'ডাল্' লাগছে।'

মাদাম ফিফি বলিল—'মেজরের যদি আপত্তি না থাকে তবে একটু আমোদ-প্রমোদ করবার ব্যবস্থা করলে হয়।'

মুখ থেকে পাইপটা নামাইয়া মেজর বলিলেন—'কি রকম আমোদ-প্রমোদ করতে চাও, ব্যারন?

মাদাম ফিফি উৎসাহের সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আমি সব ব্যবস্থা করব। ল্যা ডেভয়েরকে আমি রাওয়েন পাঠিয়ে দেব—সে আমাদের জন্তে কয়েকজন বাছা-বাছা ফরাসী তরুণী নিয়ে আসবে। সন্ধ্যেটা বেশ কাটবে ভাল।'

মেজরের ঘরে স্ত্রী আছে—তিনি গুটি দশেক সন্তানের জনক। স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে তাঁর ঠিক ততটা আগ্রহ হয়ত ছিল না। তিনি বলিলেন—'তুমি খেপেছ, ব্যারন? জানাজানি হ'লে—'

অন্য সকলে মাদাম ফিফির কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তারা মেজরকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—'আপনি আপত্তি করবেন না, সেনাপতি! এ রকম মারাত্মক একঘেয়েমী আর সহ্য করা যাচ্ছে না। মাদাম ফিফি যা করতে চায় করুক।'

সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেজর আর কিছু বলিলেন না। মৃদু হাস্তে অনুমতি দিলেন।

মাদাম ফিফি ল্যা ডেভয়েরকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইল। এই ল্যা ডেভয়ের একজন পুরাতন নন-কমিশনড্ অফিসার। ইহাকে এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও হাসিতে দেখে নাই। উপরওয়ালার যে-কোন রকমের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে ইহার মত দক্ষ ও হৃদয়হীন সৈনিক সমগ্র সেনাদলের মধ্যে আর কেহ ছিল কি-না সন্দেহ। নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে আসিয়া সে মাদাম ফিফিকে অভিবাদন করিল। তার মুখে কোন প্রকার ভাবব্যঞ্জনা নাই। মাদাম ফিফির আদেশ শুনিয়া পুনরায় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সে তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। তাহার পাঁচ মিনিট পরে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে পাঁচ ঘোড়ার একখানি সামরিক ওয়াগন ঘড় ঘড় শব্দে বাহির হইয়া গেল। সেনাপতিরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কেহ জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিল—কেহ বা শিস্ দিতে আরম্ভ করিল।

মাদাম ফিফি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এদিক ওদিক তাকাইয়া সে যেন কোন কিছু ধ্বংস করিবার জন্য উদ্‌গ্রাব হইয়া উঠিল। ওর উল্লাস প্রকাশ পায় এই ভাবেই। দেওয়ালে কয়েকখানি বড় তৈলচিত্র টাঙান ছিল। একখানি নারীমূর্ত্তির চিত্র লক্ষ্য করিয়া অকস্মাৎ মাদাম ফিফি গুড়ুম গুড়ুম করিয়া দুইবার রিভলবার ছুড়িল। ছবির দুইটি চোখে দুইটি গুলি বিদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—'তোকে কিছুই দেখ্‌তে দেব না।'

সহকর্ম্মীরা ওর এই ব্যবহারে মোটেই বিস্মিত হইল না। তাহারা উহার স্বভাব জানে।

তাহার পর মাদাম ফিফি বলিল—'এস, আমরা একটা মাইন ফাটাই।'

মাইন ফাটান মাদাম্ ফিফির একটা খেলা। অন্তসকলে খেলাটা বেশ উপভোগও করে। এই সেটো দ্য উভাইলের মালিক বেশ বড়লোক ছিলেন। পলায়ন করিবার সময় তিনি টাকা পয়সা ও অলঙ্কার ব্যতীত বাড়ীর মূল্যবান আসবাবপত্রের কিছুই লইয়া যাইতে পারেন নাই। সমস্ত বাড়ীখানি যেন একটা শিল্পকলার প্রদর্শনীর মত ঝকঝক করিত। কিন্তু মাদাম ফিফির মাইন ফাটানো-খেলার দৌরাত্ম্যে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কাজেই মেজর উহার প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন—'যা করবে, ঐ পাশের ঘরে গিয়ে করগে বাপু; আমার বেশ মৌতাত ধরেছে।'

মাদাম ফিফি পাশের ঘরেই গেল। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া একটা কারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য চিনেমাটির টিপট টানিয়া বাহির করিল। সেটার মধ্যে খানিকটা বারুদ ভরিয়া নলের মুখে একখানা পাতলা পেট্রোলমাখা ন্যাকড়া গুঁজিয়া দিল। ন্যাকড়াখানার যে অংশটুকু বাহিরে থাকিল, দূর হইতে সেটুকুকে লক্ষ্য করিয়া একটা রিভলভারের গুলি ছুড়িল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ! সমগ্র বাড়ীখানি যেন এক সাংঘাতিক ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মাদাম ফিফি পৈশাচিক উল্লাসে নাচিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য সেনানায়কেরা একসঙ্গে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—'চমৎকার!'

এই বিস্ফোরণের ফলে ঘরের অবস্থা যাহা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল—কাল ধোঁয়া ও বারুদের গন্ধে সমস্ত বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল।

মেজর উঠিয়া খাবার-ঘরের সবকটি জানালা খুলিয়া দিলে সকলেই উঠিয়া জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, বৃষ্টি পড়িতেছে। অদূরে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে গ্রাম্য গীর্জ্জার চূড়াটি যেন ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জার্মানবাহিনী যে সময় হইতে এই গ্রামখানি অধিকার করিয়াছে সেই সময় হইতে ঐ গীর্জ্জার বড় ঘণ্টাটি আর বাজে নাই। গীর্জ্জার পাদরী মাদাম ফিফির হাতে মদ খাইয়াছে—তাহার বুকের ধুলা ঝাড়িয়া দিয়াছে—সকল রকম অত্যাচার সহ্য করিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই সে ঐ ঘণ্টা বাজাইতে সম্মত হয় নাই। এমন কি, গুলির আঘাতে নিহত হইবার ভীতিও সে মৃদুহাস্যে উপেক্ষা করিয়াছে। এ অঞ্চলে আক্রমণকারীরা কেবল এই ব্যক্তির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মাদাম ফিফি মেজরকে বহুবার অনুরোধ করিয়াছে—উহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হউক। কিন্তু মেজর, কি কারণে জানা যায় নাই, তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। ধার্ম্মিক ফরাসী পুরোহিতের এই নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের সাহসে গ্রামের সকল লোক মনে মনে তাঁহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিল। গীর্জ্জার ঘণ্টা বন্ধ রাখা ব্যতীত এই গ্রামের লোক বিজয়ী জার্মানদিগের আর কোন আদেশ অবহেলা করে নাই। মাদাম ফিফির ইচ্ছা ছিল অন্তত কৌতুক করিবার জন্যও সে একবার ডিং ডং ডিং ডং করিয়া জোরে ঐ ঘণ্টাটি বাজাইয়া দিয়া আসে, কিন্তু মেজর তাহাতেও সম্মত হন নাই।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। জার্মান সেনানায়কেরা সেদিন সন্ধ্যার অল্প পরে খাবার-ঘরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। সকলেরই বেশভূষায় অদ্ভুত চাকচিক্য! প্রসাধনের প্রতিযোগিতায় মাদাম ফিফিই বোধ হয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। বুড়া মেজর পর্য্যন্ত দাড়ি ক্রস করিয়া তাহাতে ফরাসী আতর মাখিয়া খাবার-ঘরে আসিলেন। মাদাম ফিফি বারবার জানলা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সকলেই ল্য ডেভয়েরের আগমন প্রতীক্ষায় যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে সেই মিলিটারী ওয়াগনের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শোনা গেল—দূর হইতে শব্দ নিকটতর হইবামাত্র সেনানায়কেরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া জান্‌লার কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। ল্য ডেভয়ের একে একে পাঁচটি সুবেশা ফরাসী তরুণীকে ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিল।

পাঁচটি নারী যেন পাঁচটি ফুলের একটি তোড়া!

মাখনের মত নরম তাহাদের দেহ ঠাণ্ডায় যেন বরফের মত শীতল হইয়া গিয়াছে। একটি মেয়ের রুজ-রাঙা গালে মৃদু টোকা দিয়া মাদাম ফিফি অভ্যর্থনা করিবার ভঙ্গিতে বলিল—'এই আপেলটিতে আজ আমার ডিনার হ'বে। এস, ডার্লিং—'

লেপ্টেন্যাণ্ট অটো আর ক্যাপ্টেন ক্রিজ দুইজনেই বলিল—

'এটির ওপর লোভ করো না মাদাম ফিফি, না—না—এটি আমার!'

বিবাদ বাধিয়া উঠিবার উপক্রম দেখিয়া মাদাম ফিফি বলিল—'আচ্ছা, আমি পদমর্য্যাদা অনুসারে বণ্টন ক'রে দিচ্চি। গোলমালে কাজ নেই।—'

তারপর তরুণীদের ধরে সে পাশাপাশি সারি দিয়া দাঁড় করাইয়া দিল—যে সব চেয়ে লম্বা তাহাকে প্রথম এবং তার পর উচ্চতা অনুসারে আর চারজনকে দাঁড় করাইয়া দিয়া ফরাসীভাষায় প্রথমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার নাম কি রূপসী?'

গত কয়েকমাস এই সব তরুণী জার্মানদের হাতে যথেচ্ছ ব্যবহৃতা হইয়াছে। কাজেই এইরূপ বিপদ তাহাদের এক প্রকার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। এই সকল কামাতুর সামরিক পিশাচের অবাধ্যতা করিলে তাহার পরিণাম যে কি হয় তাহা ইহারা জানিত। সেই জন্যই তাহারা নীরবে মাদাম ফিফির সকল আদেশ প্রতিপালন করিয়া যাইতে লাগিল।

প্রথমা উত্তর দিল—'আমার নাম প্যামেলা।'

মাদাম ফিফি সামরিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বলিল—'প্যামেলা নাম্নী পহেলা নম্বর তরুণী সেনাপতিকে দেওয়া গেল।'

এইবার দ্বিতীয়া ব্লণ্ডিনাকে সে ব্যারনের হস্তে এবং অপর দুইটিকে অপর দুইজন সহকর্ম্মীকে দিল। পঞ্চমা তরুণীর নাম র‍্যাচেল—সে ইহুদী বালিকা এবং বোধ হয় এই তরুণীদলের মধ্যে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপসী। এটি পড়িল মাদাম ফিফির নিজের ভাগে।

এইভাবে বাঁটোয়ারা সমাপ্ত হইবামাত্র সেনানায়কমণ্ডলের তিনজন যুবক নায়ক লব্ধ বস্তুর উপর মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

প্রবল ইচ্ছাথাকা সত্ত্বেও ওদের আর পলায়নের সুযোগ হইল না। ডিনারে বসিবার পুর্ব্বে মাদাম ফিফি তার র‍্যাচেলকে একগাল তামাকের ধোঁয়া সুদ্ধ মুখে প্রবল আবেগে এক চুম্বন করিল। মেয়েটার কাশিতে কাশিতে চোক দিয়া জল বাহির হইয়া গেল। লেপ্টন্যান্ট অটো তাহার প্রণয়িনীকে পাশে বসাইয়া প্রায় তাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হইয়াছিল। র‍্যাচেলের কাশি শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—'কি করছ, মাদাম ফিফি?'

'মাইন ফাটাচ্ছি—' হাসিতে হাসিতে মাদাম ফিফি উত্তর দিল।

র‍্যাচেল কাশির বেগ প্রশমিত করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে একবার মাত্র মাদাম ফিফির সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইল। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি কথাও সে বলিল না।

অটো আর ক্রিজ সহসা যেন অতিমাত্রায় ভদ্র হইয়া উঠিল। ব্যারন ফন কালউইনস্টেন নেশার ঝোঁকে ফোক্লা দাঁতের ফাঁক দিয়া ইতরের মত অশ্লীল কথা বলিতে লাগিল।

তরুণীরা এদের কথা বুঝিতে পারে না। ক্রমে মদের মাত্রা চড়িয়া উঠিল। উদ্ধতভাবে তাহারা তরুণীদিগকে লইয়া যেন ছিনিমিনি খেলিতে আরম্ভ করিল। মদের বোতল, কাপ, ডিস ভাঙ্গিয়া, টেবিল চেয়ার উল্টাইয়া ঘরখানা যেন নরককুণ্ডে পরিণত হইল। তরুণীরাও তখন মদিরামত্ত হইয়া উঠিয়াছে—অফিসারদের সহিত তাহাদেরও লাল শ্যাম্পেন পান করিতে হইয়াছিল। তাহারাও তখন গণিকাসুলভ কুৎসিত উন্মাদনায় সামরিক কর্ম্মচারীদের কটিবেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাদাম ফিফি ক্ষিপ্ত কুকুরের মত র‍্যাচেলকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে—তাহার নখাঘাতে ও দন্তাঘাতে সুদর্শনা এই তরুণীর গাত্রাবরণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে রক্তপাত হইয়াছে। পুনর্ব্বার সে যখন র‍্যাচেলকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে আসিল তখন র‍্যাচেল চিৎকার করিয়া দশ হাত দূরে ঘরের এক কোনে সরিয়া গেল। মাদাম ফিফি এক লাফে তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া দেওয়ালে তাহার মাথা ঠুকিয়া দিল, তারপর ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িল।

ওদিকে তখন পুনরায় মদ্যপান সুরু হইয়াছে! মাদাম ফিফি র‍্যাচেলকে সেইদিকে টানিয়া লইয়া গেল। সকলে মদের গ্লাস হাতে করিয়া একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল—

"প্রুসিয়া দীর্ঘজীবী হউক!
সমগ্র ফ্রান্স আমাদের পদানত!"

র‍্যাচেলের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—"না—না—না—ফ্রান্স আমাদের। ফ্রান্স অজেয়।"

মাদাম ফিফি তাড়া দিয়া বলিল—"চুপ কর্ শয়তানী!

সমগ্র ফ্রান্স আমাদের—এর নদ-নদী ঘর-বাড়ী ধন-সম্পদ—সব আমাদের। ফরাসী-নারীরাও আমাদের।”

র্যাচেল একলাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেয়ারখানি উল্টাইয়া গেল—হাতের গ্লাস মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—‘মিথ্যা কথা! তুই মিথ্যাবাদী—দাম্ভিক! ফরাসী মহিলারা তোদের কুকুরের মত ঘৃণা করে—”

মাদাম ফিফি এবার উত্তেজিত না হইয়া বিকট শব্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল—‘বেশ—বেশ! সুন্দরী, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ফরাসী নারীরা যদি আমাদের ঘৃণাই করে তবে তোমরা—বিশেষ ক’রে তুমি এখানে এসেছ কেন?”

উত্তেজনার দ্রুত নিঃশ্বাস পতনে র্যাচেলের পীনোন্নত বক্ষ তখন ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে। রাগে, ক্ষোভে অপমানে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিনীর মত সে গর্জ্জিয়া উঠিল—“আমি? আমি? আমি কি? একটা ঘৃণিতা গণিকা—পতিতা—বেশ্যা। প্রুসিয়ান কামাতুর পশুরা যা চায় আমাদের আছে শুধু সেই কীটদষ্ট কুসুমের কৃত্রিম সৌরভ—সেই অত্যাচার পীড়ন সহ্য করবার যোগ্য দেহ—”

র্যাচেলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মাদাম ফিফি তাহার গণ্ডে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল। তারপর মাটি হইতে একটা ভাঙ্গা চেয়ারের হাতল তুলিবার জন্য সে যেমনি মাথা নীচু করিয়াছে অমনি র্যাচেল টেবিলের উপর হইতে একখানা পরিত্যক্ত ছুরিকা তুলিয়া লইয়া একেবারে তাহার ব্রহ্মতালুতে বিদ্ধ করিয়া দিল।

অফিসাররা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কাহাকেও কোন কথা বুঝিতে দিবার পূর্ব্বেই একখানা চেয়ারের আঘাতে একটা জানলার কাঁচ ভাঙ্গিয়া র্যাচেল তাহার মধ্য দিয়া লাফ দিয়া মাটিতে গিয়া পড়িয়া সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঝটিকার বেগে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুই মিনিটের মধ্যেই মাদাম ফিফি ইহলীলা সম্বরণ করিল। ক্রিজ ও অটো তরবারি বাহির করিয়া অন্য চারিটি তরুণীকে খুন করিতে উদ্যত হইল। মেজর তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিলেন। সারারাত্রি বনমধ্যে সৈন্যরা ছুটাছুটি করিল—দূরে পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়া নিজেদের কয়েকজন সহকর্ম্মীকেই হত্যা করিল। কিন্তু র্যাচেলকে আর পাওয়া গেল না।

পরদিন মাদাম ফিফির শব লইয়া সৈন্যরা যখন গীর্জ্জার সন্নিহিত সমাধিক্ষেত্রে আসিতেছিল তখন গীর্জ্জার পাদরীর এক অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। গীর্জ্জার ঘণ্টায় শব সমাধির ধ্বনি শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। কেবল তখনই নহে—তাহার পর হইতে দিনে রাত্রিতে বহুবার অনাবশ্যকভাবে গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। কেহই ইহার কারণ বলিতে পারে না। সর্ব্বত্র প্রবল জনরব রটিয়া গেল—ভূতে ঘণ্টা বাজাইতেছে—গীর্জ্জাটা একটা ভূতের ডেরা হইয়াছে। দিনের বেলায়ও কোন লোক উহার কাছ দিয়া হাঁটিত না।

প্রুসিয়ান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মেজরকে ভর্ৎসনা করিয়া এই ঘটনার তদন্তের আদেশ দিলেন। মেজর তাঁহার নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিলেন এবং বলিলেন—‘বেশ্যাসক্ত হইবার জন্য কেহ যুদ্ধে আসে না, একথা সকলকেই স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে।’

কিছুদিন পরে এই সৈন্যবাহিনীকে এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। গ্রামের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করিয়া চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গীর্জ্জার মধ্য হইতে একখানি গাড়ী বাহির হইল। তাহার চালক সেই বৃদ্ধ পদরী স্বয়ং। গাড়ীর মধ্যে ছিল—র্যাচেল। এই বৃদ্ধই এতদিন ইহাকে লুকাইয়া রাখিয়া ভূতের জনরব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজ র্যাচেলকে তিনি স্বয়ং তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিবার জন্য লইয়া গেলেন।

র্যাচেলের দেশপ্রেমের বিবরণ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার পর একজন উদার মনোভাবসম্পন্ন ফরাসী যুবক তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। গণিকা র্যাচেলকে ফরাসী জাতি ফরাসী মহিলার মর্য্যাদাদানে কার্পণ্য করে নাই।



বুদ্ধের জীবনকাহিনীর চিত্র

শ্রীগুরুদাস সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কলিকাতা যাদুঘরের গান্ধার গৃহে ৭ হইতে ১০৯ নং ফলকে বুদ্ধের জীবনকাহিনীর বিভিন্ন ঘটনা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পারম্পর্য্য অনুসারে এগুলি সাজানো নাই। ৭ হইতে ১০ নং চিত্রে মায়াদেবীর স্বপ্নের কথা চিত্রিত। প্রবাদমতে বোধিসত্ত্ব গৌতম স্বর্গ হইতে শ্বেত হস্তী রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাজা শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েন। চিত্রে দেখিতে পাই রাণী শয্যায় নিদ্রিত। তাঁহার মাথার নিকট দীর্ঘ এক দণ্ড ধারণ করিয়া এক রমণী দাঁড়াইয়া। গান্ধার শিল্পে এইরূপ প্রতিহার রক্ষীর চিত্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভামণ্ডলে বেষ্টিত হস্তীরূপী বোধিসত্ত্ব মায়াদেবীর দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিতেছেন। রাণী এই রূপই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

৯নং ফলকের চিত্র ইহারই অনুরূপ। ১০নং ফলকে একজন দৈবজ্ঞ তপস্বী টুলের উপর বসিয়া রাজা ও রাণীর সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত। ইনি রাণীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিতেছেন।

১১ নং চিত্রে রাণী মায়া নরবাহিত যানে বাহিত হইতেছেন। তাঁহার সহিত একজন অশ্বারোহী, চিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে তিনি কপিলবাস্তু হইতে পিতৃগৃহে যাইতেছেন। পথিমধ্যে লুম্বিনী উদ্যান পড়িয়াছিল।

১২ নং চিত্র বুদ্ধের জন্মের চিত্র, রাণী মায়া শালবৃক্ষতলে একটি শাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার ভগিনী ও সপত্নী মহা-প্রজাপতি তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। নিকটে অপর একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া, তাঁহার এক হস্তে কমণ্ডলুর মত একটি জলাধার—অপর হস্তে একটি তালপত্র—সম্ভবত ব্যজনীরূপে ব্যবহারের জন্য। সদ্যপ্রসূত শিশুকে দেবরাজ শক্র একখণ্ড কাপড়ের উপর ধরিয়া লইয়াছেন। শক্রের পশ্চাদ্ভাগেই ব্রহ্মা। ফলকের উপরি অংশে একটি ঢোলক, দুইটি বাঁশি, ও একটি বীণা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সম্ভবত ইহাতে বুঝান হইয়াছে যে, বুদ্ধের আবির্ভাবে সুরলোকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে আনন্দ জ্ঞাপন করা হইতেছে। চিত্রের উপরিভাগে একটি খিলান অঙ্কিত। তাহার উপরের ফলকে বুদ্ধদেব শিক্ষাদান করিতেছেন। দুই পার্শ্বে দুইজন শিষ্য বা উপাসক। ১৩নং হইতে ১৭ নং ফলকে এই জন্ম কাহিনীরই চিত্র দেখিতে পাই—তবে স্থানে স্থানে সামান্য প্রভেদ আছে। ১৪ নং চিত্রে শিশু-গৌতম মাতার কুক্ষিদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছেন এবং পরক্ষণেই তিনি ভূতলে দণ্ডায়মান। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অভয় মুদ্রায় সন্নিবিষ্ট।

১৬নং ফলকে মহাপ্রজাপতির নিকট যে স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পরিধানে যুনানী (গ্রীক) পরিচ্ছদ। হাতের যে তালপত্র তাহাতেও যুনানী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যোন-রোমক শিল্পতন্ত্রে এরূপ ধাঁধাছাঁচের তালপত্র-ধারিণীর অভাব নাই।

১৪নং চিত্রে হস্তে ধৃত চামরের দ্বারা দেবশিশুর রাজতুল্য" সম্মান সূচিত হইয়াছে।

১৮নং চিত্রের উপরের পিঠের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশে একটি ঘোড়ার মাথা দেখা যায়, নিম্নপিঠে একজন অশ্বপাল একটি ঘোটকীকে খাইতে দিতেছে এবং একটি অশ্বশাবক ঘোটকীর স্তন্য পান করিতেছে। ইহা গৌতমের কণ্টক নামক অশ্বের জন্মের চিত্র। বামদিকের ফলকের উপরিভাগে একটি অশ্বের মাথা খোদাই করা রহিয়াছে এবং নিম্ন পিঠে একজন স্ত্রীলোক একটি শিশুকে টবের মত একটি জলাধারে স্নান করাইতেছে। স্ত্রীলোকটি একটি টুলের উপর উপবিষ্ট। ইহা কণ্টকের সহিস ছন্দকের জন্মের চিত্র। প্রবাদমতে ছন্দ ও কণ্টক উভয়ে বুদ্ধের সমকালজাত ছিলেন।

১৯ ও ২০নং ফলকে বুদ্ধদেব জন্মের পরেই প্রতিদিকে সাতবার করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। যেখানে যেখানে তাঁহার পদ ভূমি-পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল সেই সেই স্থানে এক একটি করিয়া পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ১৯ ও ২০নং ফলক ইহারই চিত্র বলিয়া মনে হয়। ১৯নং ফলকে শিশু ছত্রের তলে দাঁড়াইয়া আছেন। ২০নং ফলকে যে অংশে শিশু-বুদ্ধের চিত্র খোদিত ছিল সে অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

২১নং ও ২২নং ফলকে নবজাতক শিশুর স্নানের চিত্র রহিয়াছে। দেবশিশু অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি একটি টুলের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। ২১নং চিত্রে শক্র ও ব্রহ্মা শিশুকে স্নান করাইতেছেন। তাঁহারা এক একটি জলপূর্ণ কলস হইতে শিশুর মস্তকে জল ঢালিয়া দিতেছেন ইহাই শিশু-বুদ্ধের প্রথম স্নান।

২৩নং ফলকটিতে তিনটি বিভিন্ন পিঠে তিনটি চিত্র; প্রথমটিতে স্নানের চিত্র, মধ্যেরটিতে রাজ্ঞী মায়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া গোশকটে লুম্বিনী হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন; শকটের সম্মুখ ভাগে যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে সে একটি ত্রিশূল আকৃতি দণ্ড ধারণ করিয়া আছে। তৃতীয় পিঠে কপিলবাস্তুর নগরতোরণের সম্মুখে বাদ্যকরগণ শিশু ও মাতাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রাসাদে লইয়া যাইতেছে।

২৪নং ফলকে ডাহিনের পিঠে মায়াদেবীর লুম্বিনী হইতে কপিলবাস্তু প্রত্যাবর্ত্তনের চিত্র। রাজ্ঞী এ চিত্রে শিবিকায় বাহিত হইতেছেন, গো-শকটে নহে। শিশুটি তাঁহার কোলে রহিয়াছে। বামদিকের চিত্রে ঋষি অসিত শিশু-বুদ্ধকে কোলে করিয়া উপবিষ্ট—তাঁহাদের পুত্রই যে ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন একথা তিনি মায়া ও শুদ্ধোদনকে জানাইয়া দিতেছেন।

২৫ নং ফলকেও অসিতের ভবিষ্যদ্বাণীর চিত্র। কিন্তু ২৪নং ফলক অপেক্ষা ইহা আয়তনে বড়। এই চিত্রের একটি স্বতন্ত্র পিঠে অসিতের

ভ্রাতুষ্পুত্র নলক বা নরদত্ত ভিক্ষাপাত্র হস্তে দাঁড়াইয়া। কথিত আছে তিনিও শিশু-বুদ্ধকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং ঋষি অসিতের উপদেশ মত সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুজীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

২৬ ও ২৭নং ফলকে পাঠশালায় বা লিপিশালায় বালক বুদ্ধের প্রথম পাঠ গ্রহণের চিত্র। ২৭নং ফলকে একটি স্বতন্ত্র পিঠে বৃক্ষতলে পদ্মপুষ্পের উপরে দণ্ডায়মান একটি রমণী মূর্ত্তি দেখা যায়। এটি কেবল আলঙ্কারিক চিত্র হিসাবেই খোদিত হইয়াছে, সুপণ্ডিত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীর মূর্ত্তিই এইরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল কি-না তাহা অভিজ্ঞগণের বিচার্য্য। টুলের উপর উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব লিপিফলক হাঁটুর উপর রাখিয়া লিখিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি বীণাবাদনে রত রহিয়াছেন এরূপ চিত্রও সন্নিবেশিত রহিয়াছে। অপর যে সকল রক্ষিত মূর্ত্তি, তাহা যে তাঁহার সহপাঠিগণের, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে একজন লম্বা একখানি তক্তি (লিপিফলক) বহন করিতেছে।

২৮ নং ফলকটি তিনটি বিভিন্ন পিঠে বিভক্ত। ডাহিনের অংশে বোধিসত্ত্বের বিশ্বামিত্রের নিকট বিদ্যাভ্যাসের চিত্র। শিক্ষক হাঁটুর উপর একখানি লিপিফলক রাখিয়া বসিয়া আছেন এবং তিনজন পড়ুয়া এক একখানি তক্তি লইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই আকারের তক্তি যে লিপিফলকরূপে অদ্যাপি পঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা স্বর্গত ননীগোপালবাবু উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্যের পিঠে বুদ্ধদেবের ধনুর্বিদ্যাশিক্ষার এবং তৃতীয় পিঠে তাঁহার মল্ল-ক্রীড়া অভ্যাসের চিত্র।

২৯নং ফলকে বোধিসত্ত্ব টুলে বসিয়া লিখিতেছেন। বিদ্যাশিক্ষা বলিতে যে শুধু লেখাপড়াই বুঝাইত না তাহা বীণা ও ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার ও মল্লক্রীড়া অভ্যাস হইতেই বুঝা যায়।

৩০নং ফলকে বুদ্ধের বিবাহের চিত্র। এরূপ চিত্র কদাচিৎ পাওয়া যায়; হোমাগ্নির দুই পার্শ্বে বর ও বধূ গৌতম ও যশোধরা হাতে হাত মিলাইয়া দাঁড়াইয়া। বরের নিকটেই বাদ্যকর সানাইয়ে ফুঁ দিতেছে। টুলে উপবিষ্ট যে মূর্ত্তিটি, তিনি হয়তো পুরোহিত কিম্বা রাজা শুদ্ধোদনই হইবেন। বধূর পশ্চাতে যিনি দাঁড়াইয়া তিনি যে কে তাহা ঠিক বুঝা যায় না। হয়তো তিনি কন্যার পরিচ্ছদাংশ ধারণের জন্য উপস্থিত রহিয়াছেন।

৩১নং চিত্রটি লাহোর যাদুঘরে রক্ষিত মূল ফলকের ছাপ (replica) মাত্র। ইহাতে যে ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা বুদ্ধের সংসার-ত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে—তাঁহার উনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্তিকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উক্ত হইয়াছে। ফলকের উপর পিঠে বুদ্ধ শয্যায় শায়িত, তাঁহার পত্নী যশোধরা খাটের উপর তাঁহার পার্শ্বেই উপবিষ্ট। কয়েকটি রমণী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে। ইহার নিম্নের পিঠে দেখিতে পাই যশোধরা খাটের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং বাদন-রতা রমণীগণও ক্লান্ত হইয়া নানারূপ কুণ্ডলিত ভঙ্গীতে নিদ্রায় আবিষ্ট। নিদ্রিতা রমণীগণের এইপ্রকার ভঙ্গী দর্শনে বুদ্ধদেবের মনে ভোগবিলাসের প্রতি ঘৃণা জন্মে ও বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং রাজপুরীর এই কদর্য্য আবেষ্টন সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প তাঁহার মনে দৃঢ়ীভূত করে। চিত্রের একাংশে ছন্দক যোড়করে দণ্ডায়মান;—বোধিসত্ত্ব তাঁহার সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার জন্য তাহাকে অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ দিতেছেন। চিত্রে উৎকীর্ণ একটি থিলানের নিম্নভাগে প্রহরায় নিযুক্ত শস্ত্রধারিণী রমণীগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজাদেশে ইহারা বুদ্ধের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল।

৩২নং ফলক পূর্ব্বোক্ত চিত্রেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র।

৩৩নং চিত্রে বোধিসত্ত্ব রাজপুরী ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ধরিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছেন। ছন্দক গৌতমের সম্মুখে নতজানু হইয়া যোড়করে অবস্থিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের বর্ণনায় এই চিত্রে উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। কারণ, উক্ত গ্রন্থাদির বর্ণনামতে সে সময় যশোধরা নিদ্রামগ্না ছিলেন এবং অপর সকলেও মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্যক্‌সম্বোধি লাভের জন্য বুদ্ধদেব যে কপিলবাস্তু ত্যাগ করেন তাহা বৌদ্ধগ্রন্থে মহাভিনিষ্ক্রামণ নামে বর্ণিত।

৩৪ হইতে ৪০নং ফলকে এই মহাভিনিষ্ক্রামণের চিত্র উৎকীর্ণ।

৩৪নং চিত্রে রাজকুমার গৌতম নিজ অশ্ব কণ্টকে আরোহণ করিয়া পুরদ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছেন। ছন্দক তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া আছে। দুইটি যক্ষ ক্ষুরে হাত দিয়া কণ্টককে তুলিয়া ধরিয়াছে যাহাতে তাহার পদক্ষেপণে কোনওরূপ শব্দ না হয়। সম্মুখেই বৌদ্ধদিগের শয়তান মার; সে বোধিসত্ত্বকে তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছে। ইহার প্রতিষেধক স্বরূপ মারের পশ্চাতেই একজন দেবতা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। প্রভামণ্ডল হইতে তাহাকে দেবতা বলিয়া চেনা যায়। উপরে মারের জনৈক অনুচর ছোরা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া, উদ্দেশ্য—বোধিসত্ত্বকে ভয় প্রদর্শন। অপর প্রান্তে বজ্রপাণি দুই হাতে বজ্র ধারণ করিয়া উপস্থিত, যেখানে মুস্কিল সেইখানেই আসান! ঘটনাস্থলে কপিলবাস্তুর পুরদেবতা অভিবাদনের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা। নগরলক্ষ্মীর মস্তকে মুকুট।

৩৫ এবং ৩৭নং চিত্রের বিষয়বস্তু একই। দুয়েরই উপর-পিঠে ৩১নং চিত্রে বর্ণিত রাজপুরীর চিত্র এবং উহারই নিম্নপিঠে মহাভিনিষ্ক্রামণ। ৩৫ এবং ৩৭নং চিত্রে বুদ্ধের মুখাবয়ব, আর ৩৬নং এবং ৩৮নং চিত্রে মুখের পার্শ্বদেশ (PROFILE) মাত্র দেখান হইয়াছে—ইহাই যা তফাৎ।

৩৯ নং চিত্রের তক্ষণকার্য্য মোটেই সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, ইহারও দুইটি পিঠ। ডাহিনের দিকে অশ্বপৃষ্ঠে গৌতম এবং বামদিকে ছন্দক ও কণ্টকের বিদায় গ্রহণ। কথিত আছে যে, পরদিন প্রাতে রাজপুরী হইতে ছয় যোজন দূরে পৌঁছিয়া বুদ্ধ অশ্ব ও অশ্বরক্ষককে বিদায় দিয়াছিলেন।

৪০ নং ফলকেও এই বিদায়েরই চিত্র। গৌতম নিজ গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ছন্দকের হাতে দিতেছেন এবং তাঁহার প্রিয় অশ্ব কণ্টক মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পদকমল চুম্বন করিতেছে। বোধিসত্ত্ব গঙ্গানদী অতিক্রম করিয়া ক্রমে রাজগৃহ নগরে আসিয়া উপস্থিত

হন। এখানে নৃপতি বিম্বিসার তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের দর্শন লাভ করেন এবং সম্যকসম্বোধি লাভের পর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

৪১ নং ফলকে রাজা বিম্বিসারের বুদ্ধ-সম্ভাষণের চিত্র এক অংশে দেখা যায় রাজা উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তাঁহার চিত্র বুদ্ধের ডাহিন পার্শ্বে অবস্থিত। অন্যত্র তিনি গৌতমের বাম পার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট।

৪২ নং চিত্রে বোধিসত্ত্ব কোনও ব্যাধের নিকট হইতে গাত্রবস্ত্র গ্রহণ করিতেছেন এইরূপ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ছন্দক কপিলবাস্তু প্রত্যাবর্তন করিলে এই ব্যাধের সহিত বোধিসত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাহাকে রেশম নির্ম্মিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করেন। ললিতবিস্তার ও বুদ্ধচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই ব্যাধটি একটি ছদ্মবেশী দেবতা; তিনি বোধিসত্ত্বের পরিত্যক্ত ক্ষৌম পরিচ্ছদ পূজার্থ স্বর্গে লইয়া যান।

৪৩ নং চিত্রে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের অস্থিচর্ম্মসার দেহ অতি নিপুণতার সহিত খোদিত হইয়াছে। গয়ায় গমন করিয়া ছয় বৎসর ধরিয়া বুদ্ধদেব যে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহার দেহ এইরূপ কঙ্কালসার হইয়া পড়ে।

৪৪ নং চিত্র কেবল দেহকে কষ্ট দিলে সম্যক সম্বোধি লাভ হইবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্ব সুজাতা নামক বালিকা কর্ত্তৃক প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণ করেন এবং নিরঞ্জনা নদী অতিক্রম করিয়া বোধিবৃক্ষ তলে গমন করেন। যখন তিনি বোধিবৃক্ষতলে গমন মানসে অগ্রসর হইতেছিলেন সেই সময় জল হইতে উঠিয়া কালীয় নামক নাগ ও তাহার পত্নী তাঁহাকে পূজা করেন। চিত্র-ফলকে দেখিতে পাই, নাগ দম্পতি জল হইতে বোধিবত্ত্বের উপাসনায় নিরত রহিয়াছে এবং দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে বরাভয় প্রদান করিতেছেন।

৪৫ নং চিত্রে বোধিসত্ত্ব উচ্চ আসনে স্থাপিত এক আঁটি ঘাসের উপর তাঁহার ডাহিন হাতটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে অনিষ্টকামী মার গদার ন্যায় একটি অস্ত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং বোধিসত্ত্বের বামদিকে রহিয়াছেন স্বয়ং বজ্রপাণি। কথিত আছে, স্বস্তিক নামক একজন ঘাসবিক্রেতার নিকট এক আঁটি কাঁচা ঘাস লইয়া তাহাই বোধিবৃক্ষতলে বিছাইয়া আসন করিয়া বোধিসত্ত্ব সম্যকসম্বোধি লাভের জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্য্যন্ত সে আসন আর ত্যাগ করেন নাই। চিত্রে দেখা যায়, স্বস্তিক নামক সেই ঘাসিয়াড়া বোধিসত্ত্বের ডাহিন দিকে দাঁড়াইয়া আছে।

৪৬ নং চিত্রে বোধিমণ্ডপে বিছানো তৃণাসনের উপর বসিবার জন্য গৌতম অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার আসনের নিম্নেই পৃথ্বীদেবীর অর্দ্ধকায় মূর্ত্তি। গৌতম যে সম্যকসম্বোধি লাভের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারই সাক্ষী হইবার জন্য পৃথীদেবী আহূত হইয়াছিলেন। গৌতমের ডাহিন দিকে একজন উপাসক এবং তাহার পশ্চাতে তরবারি হস্তে মার দাঁড়াইয়া (বামদিকে মারের অনুচরবৃন্দ; তাহার মধ্যে মার ও মার-পত্নীকেও দেখা যাইতেছে।

৪৭ নং হইতে ৫২ নং ফলকে মার-বিজয় ও সম্যকসম্বোধি লাভের চিত্র। বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস মতে মার বাইবেল বর্ণিত শয়তান সদৃশ। মার মনে করিয়াছিল যে, বোধিসত্ত্ব সম্যকসম্বোধি লাভ করিলে ঐহিক জগতে তাহার নিজের প্রতাপ একেবারেই ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। তাই বোধিসত্ত্ব যাহাতে ব্যর্থমনোরথ হন সেই উদ্দেশ্যে সে তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মার প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, অনুনয়বিনয় করিয়া যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন সে সসৈন্যে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল—তাঁহার সম্বোধি লাভ পণ্ড করিবার জন্য তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিল; বোধিসত্ত্ব কিন্তু তাঁহার আসন হইতে একটুও নড়িলেন না এবং তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে মারের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। বোধিসত্ত্ব অবাধে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

গান্ধারশিল্পে এই ঘটনার চিত্র প্রস্তর ফলকে দুইটী বিভিন্ন খণ্ডে উৎকীর্ণ দেখা যায়—পূর্ব্বাংশে মার কর্ত্তৃক সসৈন্যে আক্রমণ, উত্তরাংশে মারের পরাজয়। ৪৭ নং ও ৪৮ নং ফলক খণ্ডিতাবস্থায় রক্ষিত। পূর্ব্বোক্ত ফলকখানিতে দেখিতে পাই বোধিসত্ত্বের আসনের নিম্নভাগে ঢাল-তলোয়ার ধারী মারের দুইজন সৈনিক নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে।

শেষোক্ত ফলকে মারের সৈন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট। দক্ষিণ কোণে মারের রথ। মারের এক সুবুদ্ধি পুত্র তাহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। চিত্রের উপরিভাগে তিনজন ধানুকী, একজন হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ়, অপর দুই জনের বাহন দুইটি কাল্পনিক জন্তু। ফলকের সর্ব্বোচ্চ অংশে প্রভামণ্ডলে বেষ্টিত দেবতার সারি, তাঁহারা বোধিবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। যে অংশে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি ছিল এ ফলকটিতে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

৪৯ নং ফলকটি অপরিসর হইলেও তাহাতে মারের আক্রমণ ও পরাভয় এই উভয় অংশই সন্নিবেশিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব সিংহাসনোপরি ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। এ মুদ্রায় সূচিত হইয়াছে যে পৃথ্বীদেবী তাঁহার সম্যক্ সম্বোধি লাভের সাক্ষ্য দিবেন। সম্বোধি লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই মুদ্রা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে বৌদ্ধ-মূর্ত্তিতত্ত্বের সুপরিচিত ভঙ্গীগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। মার যে সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে বিরত হয় নাই তাহা বুঝা যায় তাহার অসি কোষমুক্ত করিবার প্রচেষ্টা হইতে। নিম্নে তাহার দুইজন সৈনিক ধরাশায়ী। মারের পরাভব দেখান হইয়াছে চিত্রের দক্ষিণাংশে। বোধিসত্ত্ব তখন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিবার ক্ষমতা মারের আর নাই। সে আপনা হইতেই পিছু হটিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনের জন্য তৎপর। ৫০ হইতে ৫২ নং অশুভ দর্শন যে মূর্ত্তি খাপ হইতে তরোয়াল খুলিতেছে, সে মার ছাড়া অন্য কেহই নহে, আর পাশের দিক হইতে যে মূর্ত্তিটি তাহাকে ধরিয়া যেন আটকাইয়া রাখিতে চাহিতেছে সেটি তাহার সেই সুবুদ্ধি পুত্র হওয়াই সম্ভব। পুত্রগণের মধ্যে যে অন্তত একজনেরও সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল মারের পক্ষে ইহা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে!

৫৫ নং চিত্রটি একটি ফলকের বামাংশ ; ইহাতে দেখিতে পাই চারিজন দিক্‌পাল বুদ্ধদেবকে চারিটি পাত্র প্রদান করিতেছেন। বুদ্ধদেব সাত সপ্তাহ কোনও আহার্য্য গ্রহণ করেন নাই। এপুশ ও ভল্লীক নামক দুই জন বণিক এই সময়ে তাঁহাকে পারণের জন্য আহার্য্য সামগ্রী প্রদান করেন। বুদ্ধদেবের মনে হইল, সেগুলিকে কোনও পাত্রে রাখিলে হইত। সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌পালেরা প্রত্যেকে একটি করিয়া চারিটি পাত্র লইয়া উপস্থিত। পাছে দাতাদের মধ্যে কেহ অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভাবিয়া তিনি কোনও পাত্রই প্রত্যাখ্যান করিলেন না, কিন্তু তাঁহার দৈবশক্তি প্রয়োগ করিয়া চারিটিকে মিশাইয়া একটি মাত্র পাত্রে পরিণত করিলেন। ললিত-বিস্তরে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। ইহারই ডাহিনদিকের ফলকটি ৫৪ নং চিত্র। ইহাতে বুদ্ধদেবের দুই পার্শ্বে রাজোচিত বেশধারী দুই মূর্ত্তি টুলের ন্যায় কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া আছে আর সম্পদ মর্য্যাদার অপর দুইজন দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, উভয়েই স্তুতিনিরত। চিত্রের উপরিভাগে, খোদিত বারান্দায় এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি নরনারী স্থান পাইয়াছে—সকলেই যেন রাজবংশোদ্ভব—সকলেই ভক্তিরসে আপ্লুত। এই চিত্রের পরিচিতি স্থির হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত চিত্রের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না।

৫৫ নং হইতে ৫৭ নং চিত্রে বুদ্ধদেবকে দেবগণ নরলোকের মঙ্গলের জন্য তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ৫৬ নং চিত্রে বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন,আর চারিদিকে দেবগণ কেহ-বা পুষ্পার্ঘ লইয়া, কেহ-বা শুধু যোড় করে তাঁহার সান্নিধ্যে আগমন করিতেছেন। এই সকল দেবতার মধ্যে শ্মশ্রুধারী বজ্রপাণিকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। তাঁহার এক হাতে বজ্র অপর হাতে চামর। ৫৫ ও ৫৭ নং চিত্রে দেবগণ বেষ্টিত বুদ্ধদেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত "অভয়" মুদ্রায় সন্নিবিষ্ট। বুদ্ধদেব যেন ধর্ম্মপ্রচার-বিষয়ে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন।

৫৮ নং হইতে ৬১ নং ফলকে বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্মব্যাখ্যান পরিকল্পিত হইয়াছে। বুদ্ধ দেবগণের অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া বারাণসীর ঋষিপত্তনে (আধুনিক সারনাথে) গিয়া প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ইহা "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" নামে উল্লিখিত। চিত্রে সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে উৎকীর্ণ একটি চক্রের দ্বারা ইহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কোনও কোনও চিত্রে এই চক্রটি একটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত দেখা যায়। আবার কোন কোন ফলকে চক্রের দুই পার্শ্বে দুইটি "মৃগ" (হরিণ) পরস্পরের দিকে পিছন করিয়া উপবিষ্ট। ঋষিপত্তনের অপর একটি নাম ছিল "মৃগদাব"। মৃগ দুইটীর চিত্র দ্বারা তাহাই সূচিত হইয়াছে। গান্ধার শিল্পে এই দৃশ্যটিতে বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত প্রায়শ বিন্যস্ত থাকে। ৬১ নং চিত্রে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এখানে তথাগতের (বুদ্ধের) দক্ষিণ হস্ত চক্রের উপর স্থাপিত—যেন তিনি চক্রপ্রবর্ত্তনে নিরত রহিয়াছেন। ৫৯ ও ৬০ নং চিত্রে বুদ্ধ বৃক্ষতলে শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাহাদের মধ্য হইতে বুদ্ধের প্রথম পাঁচটি শিষ্য "পঞ্চবর্গীয়"কে সহজেই চিনিয়া লইতে পারা যায়। ইঁহাদের সকলেরই মুণ্ডিত শির।

৬৩ হইতে ৬৬নং চিত্রগুলি উরুবিল্বে অনুষ্ঠিত একটি অলৌকিক ঘটনার চিত্র। উরুবিল্ব প্রাচীন কালের একটি পল্লীগ্রাম। উহা গয়ার সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। এখানে কাশ্যপ নামে এক ঋষি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই আশ্রমে তিনি বহু শিষ্য লইয়া বাস করিতেন। কথিত আছে যে, বুদ্ধদেব কাশ্যপকে নিজ মতানুবর্ত্তী করার জন্য পাঁচশতটি অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। ইহার শেষোক্ত ঘটনাটি এই চারিখানি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ। কাশ্যপের অগ্নিসরণে অর্থাৎ অগ্নিমন্দিরে একটি ভীষণ সর্প বাস করিত ; এই ভয়ঙ্কর সর্পের ভয়ে কাশ্যপও অগ্নিমন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইতেন না। বুদ্ধ কাশ্যপকে জানাইলেন যে, তিনি এই মন্দিরেই বাস করিবেন। কাশ্যপের নিষেধ সত্ত্বেও বুদ্ধ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন ; তাঁহার দেহপ্রভার তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সর্পটি তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে আশ্রয় লইল ; মন্দির তখন আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। আশ্রমবাসীরা মনে করিলেন সর্পের তেজে বুদ্ধ পুড়িয়া গিয়াছেন এবং মন্দিরে আগুন লাগিয়াছে। তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জলপূর্ণ পাত্র লইয়া অগ্নিনির্ব্বাপণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল। বুদ্ধ তখন ধীর পাদবিক্ষেপে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সর্প কিরূপে তাঁহার শক্তিতে নির্বীর্য্য হইয়া ভিক্ষাপাত্রে প্রবেশ করিয়াছে তাহা কাশ্যপকে দেখাইলেন। এই ঘটনার পর কাশ্যপের মনে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি সপরিবারে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই প্রচারিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করিলেন।

৬৩নং চিত্রে দেখিতে পাই বুদ্ধ বজ্রপাণির সহিত কাশ্যপের কুটীরে উপস্থিত হইয়াছেন। বজ্রপাণি মূর্ত্তির যোনক (গ্রীক) শিল্প ভঙ্গী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৬৪নং ফলকখানির ভগ্নাবস্থা সত্ত্বেও উহাকে মূল কাহিনীর চিত্র বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মন্দিরের সম্মুখেই ভিক্ষাপাত্রে অবস্থিত সর্পটী রহিয়াছে। আর দেখিতে পাই—আগুন লাগিয়াছে মনে করিয়া আশ্রমবাসী মুনিগণ জল ঢালিতেছেন।

৬৫নং চিত্রটি লাহোর যাদুঘরে রক্ষিত আসল খোদিত ফলকের ছাঁচ মাত্র। ইহাতে আশ্রমবাসীদিগের অগ্নিনির্ব্বাপনচেষ্টা বেশ স্পষ্ট করিয়াই দেখানো হইয়াছে।

৬৬নং চিত্রে বুদ্ধদেব মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কাশ্যপকে স্বীয় প্রভাব দেখাইতেছেন ; কাশ্যপ শ্মশ্রুধারী, তাঁহার হাতে এক দীর্ঘ যষ্টি। তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার শিষ্যবর্গ দাঁড়াইয়া আছে।

৬৭ ও ৬৮নং চিত্র বুদ্ধদেবের কপিলবাস্তু গমন এবং তাঁহার পুত্র রাহুলের দীক্ষাগ্রহণের চিত্র। বুদ্ধ যখন কিছুকাল ধরিয়া রাজগৃহে বাস করিতেছেন,সেই সময় রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধকে সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক কপিলবাস্তুতে আনয়ন করিবার জন্য শাক্যবংশসম্ভূত কালোদায়ীকে বুদ্ধ সকাশে প্রেরণ করেন। বুদ্ধ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সশিষ্যে পিতৃরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অবস্থিতির জন্য শাক্যগণ ন্যগ্রোধ নামক উদ্যান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। শাক্যেরা ছিলেন বড়ই গর্ব্বিত ; পাছে তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহার নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এই জন্য বুদ্ধ কয়েকটি অলৌকিক

ক্রিয়া দ্বারা তাহাদের মনে যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি ভূমি স্পর্শ না করিয়াই দীর্ঘ পাদবিক্ষেপে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিলেন। তাহার পর তাঁহার দেহের উপরার্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ দিয়া যথাক্রমে জল ও অগ্নি এবং অগ্নি ও জল যুগপৎ নির্গত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থে ইহা যমক-প্রতিহার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর বুদ্ধ আসন পরিগ্রহ করিলেন। তখন শাক্যেরা সদলবলে আগমন করিলেন। তাঁহাদের পুরোভাগে শুদ্ধোদন। সকলেই মস্তক নমিত করিয়া বুদ্ধকে অভিবাদন করিলেন। কপিলবাস্তুতে অবস্থানকালে যশোধরা তাঁহার পুত্র রাহুলকে বুদ্ধ-সন্নিধানে পিতৃধন যাচ্ঞা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বালক রাহুল বুদ্ধকে দেখিল কিন্তু তাঁহাকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিল না। বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন—দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি তাহাকে পৈতৃক বৈভব অর্পণ করিবেন। রাহুল যখন জানিল যে বুদ্ধই তাহার পিতা, তখন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে বলিয়া সে তাহার নিকট সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিল। অবশেষে বুদ্ধের অনুমতিক্রমে রাহুল শারীপুত্রের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিল।

৬৭নং চিত্রটি দুই ফলকে বিভক্ত ; ডাহিন দিকের ফলকে বুদ্ধ একদল দর্শকের সমক্ষে শূন্যমার্গে বিচরণ করিতেছেন। অপর ফলকে তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। একজন বৌদ্ধ শ্রমণ তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া দিতেছেন এবং রাজকল্প এক ব্যক্তি নিজে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিতেছেন।

৬৮নং চিত্রে চারিটি বিভিন্ন ঘটনা সন্নিবেশিত হইলেও উহা ভিন্ন ভিন্ন ফলকে বিভক্ত নহে। চিত্রের ডাহিন দিকে শাক্যগণ কর্ত্তৃক বুদ্ধের আমন্ত্রণ। মধ্যাংশে বুদ্ধের ব্যোমপথে বিচরণ। শাক্যেরা উপস্থিত রহিয়াছে এবং একজন প্রকৃতই ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে। তৃতীয়াংশে বুদ্ধ তাঁহার ডাহিন পার্শ্বস্থ একজন মহিলার সহিত উপবেশন করিয়া আছেন। সম্মুখে কয়েকজন লোক যেন আজ্ঞাবহ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। রমণী বুদ্ধ-পত্নী যশোধরা বলিয়াই মনে হয় এবং বুদ্ধের সম্মুখ-ভাগে যে বালকটিকে দেখা যায় সে রাহুল ব্যতীত অপর কেহই নহে। চিত্রে রাহুল পুনরায় সন্নিবেশিত হইয়াছে ; কিন্তু এবার পিতার সম্মুখে নহে মাতার পশ্চাদভাগে, শ্রমণের বেশ ধরিয়া। চিত্রের শেষাংশে বুদ্ধদেব দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পার্শ্বে একজন আশ্রম-শ্রমণ, সম্ভবত সারীপুত্র হইবেন। সারীপুত্রের উপস্থিতিতে রাহুল যে সঙ্ঘে প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহাই যেন সূচিত হইয়াছে।

৭২নং ৭৩নং ফলকে কপিলবাস্তুর একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধ কপিলবাস্তু পৌঁছিবার পর তৃতীয় দিবসে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বিবাহ ও রাজটীকা হইবে নির্দ্ধারিত ছিল। যখন সকলেই সমারোহ লইয়া ব্যস্ত সেই সময় বুদ্ধ নন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার হাতে নিজের ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করিলেন। নন্দ অগ্রজের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহার ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া কোনও এক সঙ্ঘারাম পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল। সেখানে নিতান্ত অনিচ্ছায় বুদ্ধের উপদেশমত নন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিল। নন্দের চিত্ত একান্ত নিবিষ্ট ছিল—তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না স্ত্রী সুন্দরীর প্রতি। কি করিয়া সঙ্ঘ হইতে পলাইয়া সে সুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইবে ইহাই হইল তাহার অহরহ একমাত্র চিন্তা। একদিন বুদ্ধের অনুপস্থিতিকালে সে অপর সকলের অজ্ঞাতসারে সঙ্ঘারাম ত্যাগ করিল। বুদ্ধের কিন্তু এসকল কিছুই অগোচর ছিল না। নন্দ যখন গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন-পথে একটি উদ্যানে গিয়া পৌঁছিয়াছে তখন দৈবশক্তিবলে তিনি হঠাৎ নন্দের সান্নিধ্যেই উপস্থিত হইলেন। নন্দ একটি বৃক্ষের অপর পার্শ্বে গিয়া লুক্কায়িত হইল, কিন্তু বৃক্ষকাণ্ডের সে ব্যবধান আর রহিল না। বুদ্ধের প্রভাবে গাছটি মাটি ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া পড়িল। নন্দ ধরা পড়িয়া গেল ; বাগান দিয়া তাহার আর পলাইবার পথ রহিল না। ৭২নং চিত্রে প্রসাধনরতা সুন্দরীকে দেখিতে পাই। ভাগ্যচক্রের অমোঘ বিবর্ত্তনে আশাহত নন্দ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিয়া চিত্রের বামভাগে দণ্ডায়মান। ৭৩নং চিত্রের দুইটি ফলকে যথাক্রমে নন্দের দীক্ষা ও সঙ্ঘত্যাগ জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। নিম্নভাগস্থ ফলকে সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ নন্দের মস্তকে স্বয়ং বারিনিষেকে নিরত, আর জনৈক ক্ষৌরকার সেই সিক্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিতেছে। নিকটে দাঁড়াইয়া বজ্রপাণি বুদ্ধের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। ইহারই উপরের ফলকে নন্দ পলায়নকালে ধরা পড়িয়া বুদ্ধের সমক্ষে জোড়করে নতজানু হইয়া রহিয়াছে। যে বৃক্ষটি মাটি ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহাও চিত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ফলকটির বাকী অংশের মূর্ত্তিগুলি বিনষ্ট হওয়ায় সেগুলিকে আর সনাক্ত করা যায় না।*

ক্রমশঃ

* (স্বর্গগত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের পরিচিতি অবলম্বনে)



শেক্‌সপীয়ারের জন্মভূমিতে

শ্রীমতিলাল দাশ

বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগ। মানুষ উচ্চতমকে অনুকরণ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে যায় না, উচ্চতাকে খর্ব্ব করিয়া সমতা আনিতে চায়। কিন্তু সংসারে বৈষম্য আছে—গণমন মাত্রই সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই কবি-মন হইয়া ওঠে না—প্রতিভা যত্র তত্র অঙ্কুরিত হয় না—নবনবোন্মেষশালিনী মেধা যাহার-তাহার নহে। কাব্যজগতে শেক্সপীয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী—হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি। সত্যই শেক্সপীয়ার জগতের কবি। পৃথিবীর এত অধিক ভাষায় আর কাহারও গ্রন্থ অনূদিত হয় নাই, আর কেহ সাহিত্যে ও জনচিত্তে এমন অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করেন নাই।

এমার্সন বলিয়াছেন, মহত্ত্বের সন্ধান যৌবনের স্বপ্ন, বয়স্কের কর্ত্তব্য। শেক্সপীয়ারের লীলা-নিকেতনে গিয়া সেই স্বপ্ন পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, সেই কথাই আজ বলিব।

অক্সফোর্ড হইতে সকালের গাড়ীতে যাত্রা করিলাম। অক্স-ফোর্ডে যে বুড়ীর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম তাহার গৃহে বর্ত্তমান প্রবেশ করে নাই। তাহার গৃহের আসবাব ও আয়োজনে অতীত বর্ত্তমান। পথে লেমিংটন শহরে একঘণ্টা বসিতে হইল। এই এক ঘণ্টায় শহরটির উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম।

এই নগরের স্নানাগার ইংলণ্ডে অতিশয় প্রসিদ্ধ। লক্ষ লক্ষ লোক এই স্নানাগারে আরোগ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করে। নগরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—রাজপথ সুবিস্তৃত। ইহার সম্বন্ধে স্থানীয় পৌরসভা যাহা বলেন তাহা তুলিতেছি :—

"By reason of its situation in the heart of leafy Warwickshire, Lamington SPA is well sheltered and at all times of the year this pleasant town, with its clean and healthy atmosphere, has hosts of attractions to the visitors. No town was ever planned with greater fore-sight. Its streets are broad and elegant; extensive centrally situated parks, ornamental gardens and river-side walks are among Lamington's many charming features.

The SPA's world-renowned natural saline waters are scientifically applied by a fully qualified staff at the Royal Pump room, whicl is outstanding among Europe's most moder and best equipped bathing establishments The Lamington SPA "Cure" has receive high mark from many eminent medical mer Treatments are taken in an environment exceptional beauty and restfulness."



লেমিংটন পাঠাগার

আমাদের দেশের লোক নিত্যস্নান করে। ে

ত্রিসন্ধ্যা স্নানও করেন। য়ুরোপে মানুষ কালে ভদ্রে স্নান করে। স্নান উহাদের দেশে ব্যয়সাধ্য—সাধারণে সে ব্যয় বহন করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, শীত অধিক বলিয়া স্নানের প্রবৃত্তিও উহাদের কম। জলের গুণাগুণের তারতম্য অনুসারে স্নান নানা রোগ নিরাময় করিতে



লিণ্ডেস তরুবীথি—লেমিংটন

পারে। স্নানকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদময় জলধারার সন্নিকটে য়ুরোপে নানাস্থানে চমৎকার স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। লেমিংটন স্নানাগার দেখিয়া আমি বেশ সুখী হইয়াছিলাম। স্নানাগারের কর্ত্তৃপক্ষ



ঝুলন্ত সেতু—লেমিংটন

সুন্দরভাবে আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। তাহাদের সময়িক ব্যবহার ও সৌজন্য আমার এখনও মনে আছে। আমাদের দেশে এইরূপ সহৃদয় এবং সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার প্রায়ই পাওয়া যায় না। যিনি ব্যবসায় করেন, তিনি ভুলিয়া যান যে, ক্রেতাই তাহার লক্ষ্মী, বিরক্ত করিলেও তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

লেমিংটন দুই অংশে বিভক্ত, লিমনদীর পাশে পুরাতন পল্লী—দক্ষিণভাগে অবস্থিত। বর্ত্তমান আধুনিক নগর লিমের উত্তর দিকে মানুষের যত্ন ও চেষ্টায় সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ন্যাথানিয়েল হথর্ন এই নগরকে পুষ্পহাসিচকিত নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—একথা সত্য বলিয়া মনে হয়। ইহাদের পার্কে বেড়াইতে গেলাম—সেখানে নানাবিধ বিচিত্র পুষ্পের কি সম্মোহনকর সমাবেশ। তৃণ-শ্যাম ক্ষেত্র, রঙীণ পুষ্প, পত্রলবনস্পতি দিকে দিকে পথিককে স্নিগ্ধ করে। এই শ্যাম-শোভা এদেশের মানুষের নিকট খুব ভাল লাগে। অবশ্য আমাদের শ্যামলা জননীর বিকচদ্যুতি এদেশে আশা করা অন্যায়।

লবণাক্ত উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়। বোধ হয় পূর্ব্বে এখানে লবণাক্ত সমুদ্র ছিল। বেঞ্জামিন স্যাবওয়েল এবং জন এবট্‌স্ নামক দুইজন নাগরিক এই উষ্ণ লবণ-প্রস্রবণের আরোগ্যকারী ক্ষমতা অবগত হইয়া এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্নানাগার স্থাপন করেন। তাঁহাদের উদ্যম এই সামান্য তৃণ-কুটীরের পল্লীকে আলোকপুলক সমৃদ্ধ আধুনিক নগরে পরিণত করিয়াছে। ক্যামডেন কূপ নামক একটি প্রস্রবণের জল দরিদ্রের ব্যবহারের জন্য চতুর্থ আর্ল অফ আলিফোর্ড দান করিয়া গিয়াছেন।

এই স্নানাগারের নাম—দি রয়াল পাম্প রুম্—স্থানীয় কর্পোরেশান ইহার পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ করে। এই স্থানে বাত গ্রন্থিবাত প্রভৃতি চিকিৎসার উত্তম ব্যবস্থা আছে। পাম্পরুমের সম্মুখেই সুবিস্তৃত জেপসন উদ্যান—সেখানে খানিকক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম।

বসিবার সময় নাই। আত্মীয়-বন্ধু-হীন দেশ মমতায় আচ্ছন্ন করে না, নির্ব্বান্ধব যাত্রার গতিবেগ নির্ম্মমছন্দে বাঁশী বাজায়। সমস্ত মন মধুরতায় তৃপ্ত হইয়া ওঠে না—

আগ্রহ ও ভয় মিশিয়া বিপ্লব বাধায়। ফিরিলাম, যেপথে আসিয়াছিলাম, সে পথে না গিয়া একটি সোজা পথ দিয়া চলিলাম। পথে ইহাদের সাধারণ পাঠাগার ও চিত্রশালা পড়িল। ছোট শহরের পথে আয়োজন প্রশংসনীয়। রেল স্টেশনে ফিরিয়া ষ্ট্রাটফোর্ড রওনা হইলাম। আভন নদীর সহিত এই নগরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ষ্টাটফোর্ডের অলিতে গলিতে শেক্সপীয়ারের স্মৃতি এই নিতান্ত নগণ্য পল্লীকে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়তায় ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। বনপ্রান্তর-শালিনী এই পল্লীর প্রেরণা কবির লেখায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

অতীতে ইহা মঠবাসী সন্ন্যাসীদের আড্ডা ছিল—শব্দ-গম্ভীর লাটিনভাষায় একদিন ইহার নদীতীর, একদিন ইহার কানন মুখরিত হইয়াছিল। রাজা এথেলরেড যে দানপত্র দেন তাহাতে এই পুরাতন মঠের উল্লেখ আছে—রাজা ওকা এই দানকে স্বীকাব করিয়া নেন।

বিশাল অরণ্যে তখন সমস্ত প্রদেশটি পরিবৃত ছিল—নদীতীরে তাহারা সামান্য একটু স্থান পরিষ্কৃত করিয়া শস্তে, গানে, আনন্দে ও উৎসাহে উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সন্ন্যাসীদের আশ্রম ও মঠের, তাহাদের সদানন্দ জীবনের, তাহাদের প্রার্থনার ও সঙ্গীতের স্মৃতি মাত্র আজ অবশিষ্ট।

তাহার পর বহু শতাব্দী ধরিয়া শান্তির নিরুপদ্রব মাধুর্য্যে এই পল্লী প্রসাদগুণে মণ্ডিত হইয়া প্রকৃতির লীলানিকেতন হইয়া রহিয়াছে। এখানকার পৌর-



লেমিংটন স্নানাগার

সভা যে প্রচারপুস্তিকা ছাপিয়াছেন তাহাতে তাহারা লিখিয়াছেন:—



স্নানাগার

"Out of this unbroken continuity in peac
Stratford took unto itself a serenity, a wonde

ful mellowness which is one of the glories of the English country-side. No wonder wise and beneficent Mother Nature chose this spot as the birthplace of her darling who was to scale the empyrean and flood the ages with his song."

যে অনামা কবি ওই কথা লিখিয়াছেন তাহার কথা সত্য। পল্লীপ্রকৃতির মাধুর্য্য ইহার স্নিগ্ধ নদীতীরে অনুভব করিয়াছিলাম।

শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে য়ুরোপে সহস্র সহস্র পুস্তক লেখা হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু তাঁহার জীবন-কথা যে তিমিরে সেই তিমিরে। আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা যেমন কেবল নামমাত্র সম্বল করিয়া আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন,



স্নানাগারের ঋতুপুষ্পের বাহার

শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে তাহার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী জানি। তাঁহার বাপ ছিলেন স্থানীয় পৌরসভার সদস্য জন শেক্সপীয়ার —মা ছিলেন মেরী আর্ডেন—তিনমাইল দূরে উইলম্ কোট শহরের মেয়ে, স্থানীয় স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক বিদ্যাচর্চ্চা হয় —তাঁহার গুরুদের অনুকৃতি হলোফারনেস এবং স্যর হিউ ইভান্স নামক চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পাঠশালার তিক্ত অভিজ্ঞতাই হয়ত তাঁহার মানুষের সাত অবস্থা নামক কবিতায় পাঠশালা-গমন-অনিচ্ছুক শিশুর শম্বুকগতির বর্ণনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অ্যান হ্যাথওয়ে নামক একটি মেয়ের সহিত তাঁহার প্রথম ভালবাসা হয়। মেয়েটি তাঁহার চেয়ে অনেক বড় ছিল। বিবাহের কিছুদিন পরে শেক্সপীয়ার লণ্ডনে ভাগ্য-অন্বেষণে যান—সেখানে তিনি নটের জীবিকা গ্রহণ করেন এবং পরে একে একে তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত কমেডি ও ট্রাজেডি রচনা করেন—নবরসসমন্বিত এই সমস্ত নাটকের রচনামাধুর্য্য ও কবিত্বরস জগৎবাসীর চিরন্তন বিস্ময়রস হইয়া রহিবে। অর্থ ও যশ লাভ করিয়া শেক্সপীয়ার দেশে ফিরিয়া আসেন। তাহার জন্ম ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে।

বাহিরের এই তুচ্ছতম ঘটনা দিয়া এই অমর কবির কাব্য-প্রতিভার বিচার চলে না। তাঁহার লেখার সাবলীল ভঙ্গী, রসঘন প্রসাদগুণ, স্বাভাবিকতা ও অনুপম শব্দবৈভব অতুলনীয়।

এই নগণ্য পল্লী বহুদিন অনাদৃত পড়িয়াছিল। ডেভিড গ্যারিক শেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি শেক্সপীয়ারের স্মৃতিরক্ষার জন্য জুবিলী উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন এবং ব্যবস্থা করেন যে, তাঁহার নাটকীয় চরিত্রেরা ইহার রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইবে।

চার্লস ফাউলার নামক একজন ভাবুক শেক্সপীয়ারের স্মৃতি-নাটমঞ্চ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। এই রঙ্গমঞ্চে নানা দিকদেশের তীর্থযাত্রী আসিয়া ভিড় করিবে এবং কবির অমর চরিত্রগুলির অভিনয় দেখিবে।

প্রত্যেক বৎসর এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়ারের নানা নাটকের অভিনয় হয়। এই সব অভিনয়ে লণ্ডনের খ্যাতকীর্ত্তি সমস্ত অভিনেতাই যোগ দেন।

এই উৎসবের প্রবর্ত্তন প্রশংসনীয়। কবির জন্মকুটীর, মৃত্যুসমাধি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার আকর্ষণ চিরন্তন নয়। কবির নাটকাবলী চিরন্তন রসের সামগ্রী। বর্ষের পর বর্ষ যাইবে, কিন্তু তাহাতে হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি যে রসের সমাবেশ হইয়াছে তাহাদের আনন্দ নিঃশেষ হইবে না। মানুষের জীবনের সুখের স্মৃতি, দুঃখের অশ্রুজল, তাহার আশার সঙ্গীত, তাহার বিষাদের ব্যথা, তাহার প্রণয়ের নিভৃত গুঞ্জন, কবির ব্যঞ্জনাময় ভাষায় দর্শকের চিত্তে পুলক ও পুষ্টি আনয়ন করিবে। ফাউলারের এই স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে।

প্রতি বৎসর ২৩শে এপ্রিল তাহার জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা

বাজিয়া ওঠে। তাহার পর রাজপথ দিয়া শোভাযাত্রা চলে, তাহাতে দেশের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের এবং সকল দেশের লোকেরা তাহাদের স্বকীয় পতাকা লইয়া কবির জয়গান করেন। আমাদের দেশের কোনও প্রতিনিধি কোনও বৎসর এই মহোৎসবে যোগ দিযাছেন কি-না জানি না। না দিলে দেওয়া উচিত, কারণ শেক্সপীয়ার ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের অনেক রচনা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে তাঁহার অবদানের নিকট ঋণী। তাহার পর এই সব দেশ-দেশান্তরের তীর্থযাত্রী কবির জন্মকুটীরে সমবেত হইযা কবির সমাধির দিকে গমন করেন; সেখানে কবির কবরের উপর শ্রদ্ধার অঞ্জলি পুষ্পস্তবক প্রদান করেন। তাহার পর মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা হয়—এই ভোজসভায় কবির জীবন ও বাণী লইয়া নানা আলাপ আলোচনা চলে। লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ছাড়া গ্রামের মেয়র সমাগত অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা করেন। রাত্রে কবির ছোটখাটো একটি নাটকের অভিনয় হয়। এই দিনের অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতা এবং অনুপম সাজসজ্জার ব্যবস্থা হয়। দুঃখের বিষয়, এখানে অভিনয় দেখিবার সুযোগ হয় নাই। তবে নাট্যশালাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছিলাম। আমাদের দেশের যে সব ছাত্র এবং পান্থ এই সময়ে ইংলণ্ডে থাকেন তাঁহাদিগকে এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে অনুরোধ করি। স্টেশন ছাড়িয়া কোন দিকে যাইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় আর কয়েকজন সহযাত্রী মিলিল, তাঁহাদের সহিত চলিলাম। পথে একটি হাসপাতাল পড়িল, তাহা অতীতের স্মৃতিপূর্ণ নহে। খানিকদূর আসিলে ইয়াঙ্কিদের প্রতিষ্ঠিত নির্ঝর দেখা গেল। ফিলাডেলফিয়া শহরের মিঃ চাইলড্‌স্। ইহা দান করেন।



স্নানাগার



সেখান হইতে হেনলী ষ্ট্রীটে শেক্‌স্‌পীযারের জন্মস্থান দেখিলাম। পাশাপাশি দুইটি বাড়ী, একটি ছিল জন শেকসপীযারের বাসস্থান—অপরটি তাহার কর্ম্মস্থান। প্রথমে বাসগৃহে চলিলাম—ঢুকিতেই বৈঠকখানা পড়ে, উপরতলায় শেকসপীয়ারের জন্ম হয়। ঘরটি কাঠের তৈরী—কেবল চিমনি ইটের তৈরী, সিঁড়িও কাঠের। কর্ম্মস্থানটিতে শেকসপীযার-স্মৃতিভবন, ইহাতে তাঁহার পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র এবং তাঁহার জীবনের ঘটনা-সূচক জিনিষপত্র একত্র করা হইয়াছে।

এই কুটীরে দাঁড়াইয়া কল্পনায় অতীতের স্মৃতি জাগিল। এই সামান্য কাষ্ঠভবনের মাঝে তাঁহার শৈশবের দিন কাটিয়াছে—এইখান হইতেই তিনি পাঠশালায় যাইতেন, গ্রীষ্ম ঋতুতে পাখী ডাকিত, আলো ফুটিত, কবির অন্তর আনন্দোদ্বেল হইত, [illegible] পড়িতে [illegible] শিশু-কবি [illegible] উঠিতেন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া পিতামাতার পশমের কাজে সাহায্য করিতেন এবং হয়ত পরী, ভূত, প্রেত এবং দৈত্যদানার গল্প শুনিতেন। শৈশবের সেই পরীরা তাঁহার মন হইতে হারাইয়া যায় নাই, তাহারা তাঁহার নাটকে মূর্ত্ত হইয়া মানবীয় চরিত্রের পাশে পাশে কামনা এবং কৌতুকের উৎস বহাইয়াছে। কাল্পনিক এই সকল জীব সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের মানুষের মনে রহিয়াছে—নাটকে তাহাদিগকে স্থান দেওয়া অস্বাভাবিক নহে। কবির জন্মভূমিতে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রেরণার কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার নিকট নতি জানাইয়া প্রার্থনা করিলাম, 'হে সর্ব্বকালের কবি! তুমি যে অনবদ্য রচনাসম্ভার রাখিয়াছ, যে রচনা ভাবীকালের সমস্ত লেখক ও কবিকে উদ্বুদ্ধ

করিতেছে তাহার অনুভবনীয় অথচ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ও কলাকৌশলের দীক্ষা তোমার নিকট যাচঞা করি। তুমি যে নিষ্কাম আত্মারাম দ্রষ্টার মত জীবনের ঘটনাকে উদাসীনভাবে দেখিয়াছ, তোমার নিকট সেই অপূর্ব্ব নিরপেক্ষতা প্রার্থনা করি।

সেখান হইতে গ্রামার স্কুলের পাশ দিয়া স্থানীয় গির্জ্জায় চলিলাম। এই বিদ্যালয়ে যখন কবি পড়িতেন, তখন কেহ তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা এবং প্রতিভার কথা বুঝিতে পারে নাই। প্রতিভার রূপ সর্ব্বত্রই এক, রবীন্দ্রনাথের দিব্য লেখনী আমাদের সাধারণ বিদ্যায়তনে আপন শক্তি লাভ করে নাই। প্রজ্ঞাবান্ এবং মনস্বী চিরকালই সাধারণ ব্যবস্থার মধ্য হইতেই অসাধারণতায় দীপ্ত হইয়া ওঠেন।

বক্তৃতা তিনি দিয়াছেন, তাহাতে মরণের পরে কি ঘটে সে সম্বন্ধে কবির দৃঢ় সংশয় দেখিতে পাই। এই জীবনের জ্বালা ও যন্ত্রণা আছে, তথাপি তাহার শেষ করিতে আমরা ভয় পাই—

The undiscover'd country from when bourn
No traveller returns, puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of ?

গির্জ্জাতে যখন স্থান সঙ্কুলন হয় না, তখন পুরাতন কবর তুলিয়া সেখানে নূতন কবর দেওয়া হয়। শেকসপীয়ার সেই দুরদৃষ্ট হইতে মুক্তি চাহিয়াছিল। এই অন্ধ কাতরতা এবং মমতা মানুষের নিকট হয়ত চিরদিন শ্রদ্ধা পাইবে এবং কবির সমাধি ভাবীকালে আর স্থানচ্যুত হইবে না।



শেক্সপীয়ারের স্মৃতি রঙ্গমঞ্চ

এখান হইতে শেকসপীয়ারের কন্যা জুডিথের গৃহের মিউজিয়াম দেখিয়া আভন নদীর উপর নবনির্ম্মিত সুন্দর সুদৃশ্য থিয়েটার-গৃহ দেখিলাম। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত তাহা অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইটের বর্ত্তমান বাড়ী প্রস্তুত হয়। এখানে ১১০০ লোকের বসিবার আসন আছে। দুইটি ঘূর্ণ্যমান মঞ্চ এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক কৌশলময় নানাবিধ আয়োজন এখানকার নাট্যাভিনয়কে অতি প্রসিদ্ধ করিয়াছে। ইহার চারিদিকে সুবিস্তৃত বারান্দা, সেখান হইতে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে বেশ সুন্দর লাগে। এখান হইতে ফিরিয়া একটি হোটেলে লাঞ্চ খাইলাম। আহার শেষে ক্লপ্টন্স ব্রিজ দেখিয়া সটারি গেলাম। এই সেতু সপ্তম হেনরীর রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। সটারি গ্রাম ষ্ট্রাটফোর্ড হইতে এক মাইল দূরে। ইহাই শেকসপীয়ারের প্রিয়তমা পত্নীর শৈশবলীলার নিকেতন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হাথওয়ে পরিবার এইখানেই বাস করিত। এই কুটীরে এলিজাবেথের আমলের খড়ো ঘরের চেহারা অবিকল

হলি ট্রিনিটি চার্চ—এই গির্জ্জায় কবি সপরিবারে ঘুমাইয়াছেন, দূরে সর্পিল আভন কুলু কুলু রবে বহিয়া যায়, নির্জ্জন বনপ্রান্তর নীরব নিস্তব্ধতায় ঘুমায়, আর গির্জ্জার মধ্যে কবি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত। সমাধির উপর প্রস্তরে এই কবিতা লেখা—

Good trend for Jesvs sake forbeare
To digg the dvst encloased heare
Bleste be ye man yt spares the stones
And cvrst be he yt mores new tones.

দেহাবশেষের প্রতি কবির এই মমতা ছেলেমানুষি বলিয়া মনে হয়। তবে পরলোক সম্বন্ধে কবির কোনও সুনিশ্চিত বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয় না। হ্যামলেটের মুখে যে

অবস্থায় রাখা হইয়াছে। সেকালের আসবাবও রক্ষিত আছে।

জনবিরল পথে ফিরিবার সময় ন্যাসপাতি কুড়াইয়া পাইলাম। বাসে আসিয়াছিলাম, মাঠের মধ্য দিয়া ফিরিলাম। বিলাতের সত্যকার পাড়াগাঁ দেখিয়া লইলাম—একটি তেমাথা পথে কোন্ দিকে যাইব স্থির করিতে না পারিয়া পথিপার্শ্বস্থ একটি বাড়ীর রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার কথা বুঝিল কিনা জানি না—অঙ্গুলিসঙ্কেতে গন্তব্য দিক দেখাইয়া দিল। সেখান হইতে ষ্টেসনে আসিয়া উইলেমকোটে নামিলাম। ভুল করিয়া ট্রেনে



ওয়ার উইক প্রাসাদ

টুপি ফেলিয়া হাঁটিতেছিলাম, খানিক দূর গিয়া খেয়াল হইল, ষ্টেশনে আসিলে দেখি গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টারকে বলায় তিনি সন্নিকটস্থ মালখানায় ফোন করিয়া দিলেন—সেখানেই গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, আমি হাঁটিয়া গিয়া যতক্ষণ না টুপি আনিলাম ততক্ষণ গাড়ী ছাড়িল না। এই সহৃদয় ব্যবহার চিরদিন স্মরণে থাকিবে। ইংরেজ ব্যবসায়ী জাতি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সততা সিদ্ধির মূল, ইহা তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝে। আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম, তথাপি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ইহারা ত্রুটি করে নাই। ইহার সহিত আমাদের দেশে রেলওয়ের ব্যবহার তুলনা করিতে লজ্জিত হইতে হয় এবং জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কের গ্লানির জন্য দুঃখিত হইতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতেছিলাম—সঙ্গে পুত্রকলত্র,



য়্যান্ হাথওয়ে কুটীর

যথেষ্ট মাল—আমরা নামিতে না নামিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল; আমার মালপত্র গাড়ীতে পড়িয়া থাকার জন্য চলন্ত ট্রেনে লাফ দিয়া উঠিয়া শিকল টানিতে হইল। গার্ড নামিয়া আসিয়া গালিগালাজ করিলেন। ইহার বিরুদ্ধে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলাম। ফল কিছুই হয় নাই—ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও ভারতে ব্যবহারের এই তারতম্য আমাদের দুরপনেয় কলঙ্কের কারণ।

এখানে শেকসপীয়ারের মায়ের বাড়ী। এটাও সে যুগের গথিক ম্যানর হাউজ—এখানেও সেকালের আসবাবপত্র সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, আমাদের নিকট তাহার

দাম বিশেষ কিছু নাই। এখান হইতে ওয়ারউইক স্টেশনে নামিয়া দুর্গ ও বাগান দেখিলাম। অতীতের ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব তাহার নিস্তব্ধ দুর্গপ্রাকারে, তাহার তোরণদ্বারে যেন ধ্বনিত হয়। আর্ল অব লেস্টার এলিজাবেথের প্রণয়ী ছিলেন, এই দুর্গ তাঁহারই। দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সুন্দর কক্ষ, যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি দেখিয়া প্রাসাদের বহু বিস্তৃত উদ্যানে বেড়াইতে গেলাম।

সেখান হইতে বাহির হইয়া গির্জ্জা দেখিয়া খানিকটা রাস্তা বাহিয়া নদীতীরে গেলাম। একপাশে একটি সুন্দর ময়দান, রাস্তা দিয়া লোক চলে। গ্রাম্য নির্জ্জনতা—ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় গাড়ী চড়িলাম এবং রাত্রি সাড়ে আটটায় বাসায় পৌঁছিলাম। গাড়ীতে লণ্ডনের এক চিত্রকর-দম্পতির সঙ্গে আলাপ হইল।

আমি তাঁহাদের প্রশ্ন করিলাম, "লণ্ডন আপনাদের কেমন লাগে?"

চিত্রকর উত্তর দিল, "লণ্ডনকে চমৎকার লাগে, বৃটিশ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি এটা ···

"কিন্তু তার ধূলি, ধূম, তার প্রাত্যহিক চাঞ্চল্য···"

"তা আছে কিছু কিছু, কিন্তু সব মিলে লণ্ডন অনুপম, অতুলনীয়, অপূর্ব্ব এবং অনিন্দ্য ··"

শেক্সপীয়ার তাঁহার AS YOU LIKE IT নামক নাটকে আর্ডেন বনভূমির যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে এই দেশের রূপ অনেক ফুটিয়াছে।

Under the greenwood tree
Who loves to lie with me,
And tore his merry note
Unto the sweet bird's throat,
Come Hither, come thither, come hither;
Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

এই সঙ্গীত কবির বাল্য-জীবনের দৃষ্ট ছবি দ্বারা অনুপ্রাণিত। শেক্সপীয়ারের জন্মভূমির এই একদিনের ভ্রমণকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। মহৎকে মনন ও ধ্যান করিয়াই আমরা তাঁহার মূল্য বুঝি। বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়ারের যথেষ্ট আলোচনা হয় নাই, আমরা এই কবির কাব্যামৃত বিতরণ করিতে পারিলে দেশকে ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করিব সন্দেহ নাই।

পিছে তব ভরা ভাদ্র

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সহসা বিদায় নিলে নির্বান্ধব সুদূর প্রবাসে,
সহসা আহ্বান এলো ঊর্দ্ধ হ'তে। চাহি চারি পাশে
হেরিলে না একটিও স্নেহভরা প্রিয়জন মুখ,
একটি কথাও হায় ব'লে যেতে হৃদয় উৎসুক
পাইল না কোন শ্রুতি। কি বেদনা নিয়ে তুমি গেলে,
কোন সাধ মিটে নাই। প্রিয়জনে কাছে তুমি পেলে
হয়ত বলিয়া যেতে, জানাইতে অন্তিম কামনা,
অমৃত পথের যাত্রী, হয়ত বা জানাতে সান্ত্বনা।
হয়ত স্নেহের ধনে স'পে দিয়ে যেতে কারো হাতে,
শেষের মিনতি হ'তো চিরস্থায়ী তার আঁখি পাতে।
গেলে না পরশি তুমি সঙ্গিনীর শিরে হাতখানি;
গেলেনা চুমিয়া তুমি শিশুদের শেষ বক্ষে টানি'
মাত্র দুই মাস আগে একদিন আষাঢ়-সন্ধ্যায়
শিশুদের মুখ চুমি টানি বুকে স্নেহের ছায়ায়,
সত্বর ফিরিব, সঙ্গে আনিব খেলানা, ছবি, বাঁশী
বলি—তুমি—তাহাদের ম্লান মুখে ফুটাইয়া হাসি
হাসিয়া বিদায় নিলে। স্মৃতিপটে সেই মুখশশী
যাত্রাপথে হয়ত বা বার বার উঠিল উচ্ছ্বসি'।
আগুলি রয়নি তোমা তাহাদের নয়ন সজল,
তাহাদের অশ্রুবর্ষা তব পন্থা করেনি পিছল।
শুষ্ক পথে যাত্রা তব, উত্তরিয়া স্বর্গের তোরণে
পিছু ফিরে দেখ বৎস, সেই পথ ভাসিছে প্লাবনে।
শরতের পূর্ণচন্দ্র সম্মুখে জাগিছে তব চোখে,
পিছে তব ভরা ভাদ্র আলোড়িছে গুমরিছে শোকে

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

সতেরো

ঘরের মধ্যে বসিয়া পদ্মের উৎকণ্ঠার আর সীমা ছিল না। বাহিরের যত কিছু কথাবার্ত্তার ধ্বনি তাহার কানে আসিয়া পৌছিতেছিল—সবের মধ্যেই সে যেন নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিতেছিল। শ্রীহরি তাহাকে দেখিয়াছে। গ্রামের ঘাটে পথে বাড়ীতে-বাড়ীতে এখন তাহার কথা ছাড়া কথা নাই। মধ্যে-মধ্যে বাহির হইয়া কথাবার্ত্তাগুলি স্পষ্ট শুনিবার ইচ্ছা হইতেছিল—কিন্তু সাহস কিছুতেই হইল না। কতবার দরজার খিলে হাত দিয়াও আবার সে ফিরিয়া আসিল।

—কই হে! কামার-বউ! কোথায় রয়েছ হে?

নীচে কে ডাকিতেছে। বুকের ভিতরটা তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সে পড়িয়া রহিল।

—অ—কামার-বউ! কামার-বউ হে!

কে? কাহার কণ্ঠস্বর? পদ্ম ঠিক ঠাওর করিতে পারিল না। আবার ডাক আসিয়া কানে পৌছিল। এবার সে উঠিয়া অতি সন্তর্পণে খিল খুলিয়া কে ডাকিতেছে দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিস্তব্ধ বাড়ীর মধ্যে ওই ক্ষীণ শব্দটুকুই স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া আহ্বানকারীর মনযোগ আকৃষ্ট করিল।

—ও মা গো! এই বিকেল বেলা—ঘরে খিল দিয়ে কেন হে? অসুখ করেছে না কি?

পদ্মের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। ডাকিতেছে মুচীদের দুর্গা। কি আস্পর্দ্ধা মেয়েটার! দরজা খুলিয়া সে এবার বাহির হইয়া আসিল। অত্যন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠে সে বলিল—কেন? কি বলছ?

হাসিয়া দুর্গা বলিল—একটা কথা আছে ভাই তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে? কি কথা? কিসের কথা?

—বলব বলেই তো এসেছি ভাই। তা নীচে নেমেই এস।

—ওখান থেকেই বল। আমার শরীর ভাল নাই।

—তবে আমিই না হয় ওপরে যাই। একপাশে বসব আমি। দুর্গার মুখে প্রসন্ন হাসি, কণ্ঠস্বরে সহৃদয়তা; তবুও পদ্ম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—ওখান থেকেই বল না কেন? তোমার সঙ্গে আমার কি এমন সম্বন্ধ—

দুর্গা সকৌতুকে ফিক করিয়া একটু হাসিল; হাসিয়া বলিল—যদি বলি সতীন। তোমার কর্ত্তা তো আমাকে ভালবাসে হে!

পদ্ম একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে দুরন্ত ক্রোধে—একগাছা ঝাঁটা কুড়াইয়া লইয়া দ্রুত নামিয়া আসিল। দুর্গা হাসিয়া খানিকটা সরিয়া গেল, বলিল—ছোঁয়া পড়লে অবেলায় চান করতে হবে। বস—আমার কথা শোন—তারপর না হয় ঝাঁটাটা ছুড়েই মেরো। বস।

পদ্ম অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ অবাক হইয়া দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কি বলছ বল। তাহার কপালের সারি সারি কুঞ্চন-রেখা তখনও মিলায় নাই।

—বলছি, তুমি বস। আমি বরং বার-দরজাটা দিয়েই আসি।

—আমার বাড়ী কেউ আসবে না; গণ্ডায় গণ্ডায় বঁধু নাই।

দুর্গা আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল—আমার তো আছে, তারা যদি ভাই গন্ধে গন্ধে এখানে এসে পড়ে!

—আমার বাড়ী ঢুকলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না!

দুর্গা ততক্ষণে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফিরিয়া সে সংস্পর্শ বাঁচাইয়া খানিকটা দুরে বসিয়া বলিল—তোমার কর্ত্তাও তো আসতে পারে ভাই। সেও তো আমার—ওই যে তুমি কি বললে তাই।

পদ্মের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল—ঝাঁটাটা ছুড়িয়া এখনই সে হারামজাদী মুচিনীকে মারে। কিন্তু দুর্গা

তাহার পূর্ব্বেই পরিহাস-বর্জ্জিত সহজ স্বরে মিষ্ট করিয়া বলিল —ভয় নাই ভাই, তোমার জিনিষ আমি নিই নাই, নোব না। ও জিনিষে আমার অরুচি ধরেছে।

পদ্ম অবাক হইয়া দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা কোমরের আঁচলের খুঁট খুলিয়া তিনখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া পদ্মের সম্মুখে নামাইয়া দিল; বলিল—আমার কাছে গিয়েছিল টাকার জন্যে। কিন্তু তখন আমার কাছে ছিল না। কর্ম্মকার এলে তাকে দিয়ো। গরু কিনে আনুক, চাষ করুক।

পদ্ম যেন পাথর হইয়া গিয়াছে।

দুর্গা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—সুদ লাগবে না, যখন হবে আমাকে দেবে। তবে আমি গরীব, টাকাটা যেন দিয়ো ভাই। আর গাঁতোতে আমার দাদাকে নিতে হবে। কর্ম্মকারেরও জমি বেশী নয়, দাদারও সামান্যি। দু'জনায় এক হালে চাষ করবে, একজন হাল ধরবে—অন্যজন কাজ করবে—সুবিধেও হবে।

টপ টপ করিয়া দু'ফোঁটা জল পদ্মের চোখ হইতে এবার ঝরিয়া পড়িল; আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে কোনমতে বলিল—বলব।

দুর্গা বলিল—কর্ম্মকার আমাকে ব'লে এল সেদিন—কামারশাল তুলে দেবে। তুমি বারণ কর'। জাত-ব্যবসা তুলে দিলে চলে! আমার দাদা এমনি ধূয়ো ধরেছে —ভাগাড়ের কাজ করবে না। বায়েনের কাজ করবে না। কত ব'লে তবে তাকে মানালাম আমি।

মৃদুস্বরে পদ্ম বলিল—জাত-ব্যবসায় পেট যে চলছে না, গাঁয়ের লোকে ধান দেয় না। জংসনে গিয়ে দোকান করলে তা গাঁয়ের লোকের অত্যাচার তো দেখলে। এখন আবার জংসনেও কারবার চলছে না।

—আমি বলছি, দুইই করুক। চাষও করুক—জাত-ব্যবসাও করুক। আর তুমি ভাই ঘরে দুটি গাই রাখ, গণ্ডা দুয়েক হাঁস রাখ;—তোমার দুধ ডিম আমি কঙ্কনায় বেচে দোব। বেশ দু পয়সা আসবে, আর আনমনও তোমার হবে একটা। ছেলেপুলেও তো নাই ঘরে, কাজকর্ম্মও তো নাই তোমার।

মুহূর্ত্তে পদ্ম চঞ্চল হইয়া উঠিল; দুর্গার সহিত কথাবার্ত্তার মধ্যে—তাহার আচরণের বিস্ময়কর প্রভাবে—কিছুক্ষণের জন্য সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল; সন্তানের প্রসঙ্গে একমুহূর্ত্তে আবার সব মনে পড়িয়া গেল। স্থির শূন্যদৃষ্টিতে সে দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। দুর্গা শঙ্কিত হইয়া ডাকিল—কামার-বউ, কামার-বউ! অ কামার-বউ!

বিহ্বলের মত পদ্ম উত্তর দিল—এঁ্যা!

—কি হ'ল, এমন করছ কেনে?

—এঁ্যা।

দুর্গা তাড়াতাড়ি একখানা পাখা দেখিয়া আনিয়া জোরে বাতাস দিতে আরম্ভ করিল। পদ্মও প্রাণপণে আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিতেছিল; কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করিয়া সে লজ্জিতভাবেই বলিল—এমনি করেই ব্যারাম ওঠে ভাই। ভাগ্যে তুমি ছিলে!

উৎকণ্ঠিত স্বরে দুর্গা প্রশ্ন করিল—এখন বেশ ভাল লাগছে?

—হ্যাঁ। থাক—আর বাতাস করতে হবে না।

—তা। তুমি বরং মুখে চোখে জল দাও একটুকুন। মাথায় জল নাও।

—উঠতে পারছি না ভাই, এখনও হাত-পা কাঁপছে। তুমি এনে দেবে একটু জল—ওই ঘটিতে—

—আমি জল এনে দোব!

হাসিয়া পদ্ম বলিল—তা দাও; তুমি না থাকলে হয় তো নর্দ্দামায় পড়ে ময়লা খেতাম। তার চেয়ে কি তোমার ছোঁয়া জল অপবিত্র!

দুর্গা হাসিয়া জলের ঘটিটা আনিয়া নামাইয়া দিল, বলিল—পুরুষমানুষ, সে তোমার বামুন থেকে চণ্ডাল— সবাইকেই আমার হাতে খাওয়াতে পারি ভাই, ভয় লাগে তোমাদিগে—মেয়েদিগে। একবার সাধ আছে—মউ গাঁয়ের ঠাকুর মশাইকে জল দিয়ে দেখব। বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে গড়াইয়া পড়িল।

পদ্ম চোখে মুখে মাথায় জল দিতেছিল, তাহার হাত যেন অবশ হইয়া গেল; সে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দৃষ্টি তুলিয়া দুর্গার দিকে চাহিল, হতভাগিনী মুচিনী বলে কি! মহগ্রামের ঠাকুর মশায় শিবশঙ্কর ন্যায়তীর্থকে তাহার হাতের জল খাওয়াইবে। পাথরের শিবকে খুঁড়িয়া তোলা যায়, পাথরের শিব ভূমিকম্পে ফাটিয়া যায়, কিন্তু ন্যায়তীর্থকে

বিচলিত করা যায় না। পদ্ম মহগ্রামেরই মেয়ে। ন্যায়-তীর্থের একমাত্র পুত্র ছোট ন্যায়তীর্থকেও সে দেখিয়াছে। বয়স অল্প থাকিলেও তাঁহাকে স্পষ্ট মনে পড়ে। সাক্ষাৎ শিবের মত রূপ। বাপের সঙ্গে শাস্ত্র লইয়া মতবিরোধ হওয়ায় সেই ছেলে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়—পথে রাত্রির অন্ধকারে রেল লাইনে কাটা পড়ে। পদ্ম তখন বালিকা—কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে ন্যায়তীর্থের সেদিনের মূর্ত্তি—কম্বলের আসনে বসিয়া গভীর মনঃসংযোগে পুঁথি পড়িতেছিলেন।

পদ্মের মুখ দেখিয়া দুর্গার হাসি স্তব্ধ হইয়া গেল। সে শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিল—আবার কি হ'ল হে?

পদ্ম শুধু বলিল--ছি!

—কি?

—মানুষ বুঝে কথা কইতে হয়। কাকে কি বলছ!

দুর্গা এবার খিল খিল করিয়া হাসিল না, কিন্তু হাসিল—বলিল—বাগ্দীর মেয়ে মাছ ধরছিল, শিবঠাকুর তাকেই দেখে ক্ষেপে গিয়েছিল; পটুয়াদের গান শুনেছ তো? পুরুষদের কথা আর বলো না! বলিয়াই সে উঠিল, বলিল—চললাম ভাই! অগ্রসর হইয়া সে দুয়ারের খিলে হাত দিয়াছে তখন পদ্ম ডাকিল—শোন!

—কি?

— একটি সত্যি কথা বলবে?

—কি? তোমার কত্তার কথা—

—না। আমার কথা।

—তোমার আবার কি কথা?

—গাঁয়ের লোকে কি বলছে আমাকে?

কি বলবে? দুর্গা বিস্মিত হইল!

—ওই ছিরু পালের—; পদ্মের ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল, সে বলিতে পারিল না।

দুর্গা হাসিল, সে হাসি সান্ত্বনার হাসি; হাসিয়া বলিল—তুমি খানিক পাগলও বটে কামার-বউ। বলবে আবার কে কি? গাল দিলে যদি মানুষ মরত, তবে ছিরু পাল নিজেই মরত ওর মায়ের শাপশাপান্ততে।

পদ্ম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তারপর আবার প্রশ্ন করিল—ছেলেটি কেমন আছে হে? কোলেরটি?

—বাঁচবে না। তারপর চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বলিল—তার ওপর শুনলাম ভাই—সে এক আশ্চর্য্যি কাণ্ড।

পদ্ম নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—পালের বউ না কি ভূত হয়েছে। ছেলেটার মাথার শেয়রে দাঁড়িয়ে থাকে। দুপুর বেলায় পাল নিজে দেখেছে। একেবারে নিমেষের মধ্যে খিড়কির দোর দিয়ে বাতাসের মত মিলিয়ে গেল।

পদ্মের বুক হইতে যেন একটা পাষাণের ভার নামিয়া গেল।

প্রথমটা শ্রীহরি কথাটি গুপ্ত মন্ত্রের মতই গোপন করিয়া রাখিবার সংকল্প করিয়াছিল। লজ্জার কথা যে! তাহার স্ত্রীর আত্মা ঊর্দ্ধগতি ভ্রষ্ট হইয়া মাটির পৃথিবীতে চোরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, স্বর্গের দ্বার তাহার সম্মুখে বন্ধ হইয়া গিয়াছে;—এ যে লজ্জার কথা! অপ্রকাশিত কোন পাপের কথা লোকে কল্পনা করিবে। কল্কেতে আগুন তুলিয়া লইয়া সে বাহির বাড়ীতে আসিয়া বসিল। নিস্তব্ধ জনহীন বাড়ীটা খাঁ খাঁ করিতেছে। ছিদামটাও কোথায় পড়িয়া ঘুম দিতেছে। সম্মুখে খিড়কির বাঁশবনের একাংশ দেখা যাইতেছে, এই প্রখর সূর্য্যালোকের মধ্যেও কালো ছায়াচ্ছন্ন। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—ওই বাঁশগাছ ধরিয়া সে যদি দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসে! সে শিহরিয়া উঠিল। বুকের ভিতর দুঃখও তাহার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। বার বার সে মনে মনে বলিল—তোমার গতি আমি করব, করব, করব। তুমি দুঃখ পাবে সে আমার সহ্য হবে না। খুব ঘটা ক'রে আমি শ্রাদ্ধ করব। শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেলেই গয়া যাব।

দুপহর গড়াইয়া গেলে দেবু আসিল। শ্রীহরি আর থাকিতে পারিল না। দেবুকে সমস্ত বলিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে বার বার তাহার চোখে জল আসিল। কথা শেষ করিয়া চোখ মুছিয়া সে বলিল—এখন কি করি বল দেখি খুড়ো?

দেবু বিস্ময়ে প্রায় অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তুই নিজের চোখে দেখলি?

—নিজের চক্ষে।

এবার আর দেবুর মুখে কথা সরিল না।

তাহার গায়ে হাত দিয়া শ্রীহরি বলিল—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি খুড়ো—একেবারে সেই রোগা লম্বা—তেমনি একহাত ঘোমটা। দেখতে দেখতে সাঁ ক'রে খিড়কির দোর দিয়ে মিলিয়ে গেল। আমি ছুটে গেলাম খিড়কির ঘাটে। তা কোথায় কি?

—তাই তো! দেবু আকাশ-পাতাল চিন্তা করিয়া আর কিছু বলিবার পাইল না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীহরি বলিল—কচি ছেলেটা বাঁচবে না, এ আমি নিশ্চয় বুঝেছি। হতভাগী ওরই মায়াতে ঘুরচে। কিন্তু ওকে নিয়ে ক্ষান্ত দেয় তবেই না! এখন বাকী দুটোকে বাদ দিলে যে বাঁচি।

—তা বটে! বার বার ঘাড় নাড়িয়া দেবু স্বীকার করিল—অবশেষে শ্রীহরিকেই সে প্রশ্ন করিল—এখন উপায় কি?

—উপায়? শ্রীহরির কাছে উপায় খুব জটিল নয়; সে বলিল—উপায়, রীতিমত শ্রাদ্ধ-শান্তি, গয়া-দেওয়া, শ্মশানে শান্তি-স্বস্ত্যেন। তবু একবার মহগ্রামের ঠাকুর মশায়ের কাছে যেতে হবে। বিধেনটা নিতে হবে।

এ কথাটা দেবুর মনে ধরিল। সে বলিল—বিধানটা আগে নাও, তারপর যা করতে হয় কর।

শ্রীহরি বলিল—তবে আজই চল। সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসা যাবে। বেলা এখনও, ·· আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। উত্তর-পশ্চিম কোণে একখানা ঘন কালো মেঘ থম-থম করিতেছে। দেবুর দৃষ্টিও আকাশের দিকে পড়িয়াছিল। চাষীর ছেলে—মেঘের গতি প্রকৃতি দেখিয়া বুঝিল ঝড় বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। হয় তো শিলা-বৃষ্টি বজ্রপাতও হইতে পারে। কিন্তু খুশী হইল না। চৈত্র মাসে দু-এক পশলা বৃষ্টি ভাল,চাষের জন্য প্রয়োজনও আছে। তবে বৈশাখের আগেই কাল-বৈশাখী ভাল নয়। চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর, জ্যৈষ্ঠে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে। এ যে চৈত্র মাসেই কালবৈশাখী দেখা দিল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই চারিদিক যেন অন্ধকার হইয়া গেল; দুর্দ্দান্ত ঝড়ের ধূলায় আকাশের মেঘের ঘন ছায়ায়—সে এক বিচিত্র পিঙ্গলাভ অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি নামিল, প্রবল বৃষ্টি! ভাগ্য ভাল—শিল পড়িল না।

আঠারো

প্রবল ঝড় এবং মুষলধারে বর্ষণ।

ঝড়ে ঘরের চালের খড় উড়িয়া গেল, গাছের ডাল ভাঙিল, পাতায় আবর্জ্জনায় পথ ঘাট ভরিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় ষষ্ঠীদেবীর আশ্রয় বকুল গাছটার প্রকাণ্ড বড় ডালটাই ভাঙিয়া গিয়াছে। হরেন্দ্র ঘোষাল একখানা ঘর করিয়াছিল গম্বুজের মত—নিচে একখানি উপরে একখানি ঘর—উঁচুতে প্রায় তালগাছের মত। নিচের ঘরখানা ঘোষালের 'পারলার' (parlour) উপরের খানা স্টাডি (study)। ঘরখানার চালটাকে একেবারে উড়াইয়া হরিশ মণ্ডলের পুকুরের জলে ফেলিয়াছে। চালের খড় সকলেরই উড়িয়াছে। মুচিপাড়ার দুর্দ্দশার আর শেষ নাই। অগ্নিদাহের পর হইতে ঘরগুলি তালপাতা দিয়া ছাওয়ানো ছিল, ঝড়ে সে তালপাতার আর একখানিও অবশিষ্ট নাই। তাহার উপর প্রবল বর্ষণে দেওয়াল গলিয়া মেঝে ভিজিয়া কাদা হইয়া উঠিয়াছে। তবুও লোকে এ বর্ষণে খুশী হইয়া উঠিল। প্রবীণ ব্যক্তিরা চৈত্রমাসে কালবৈশাখীর আবির্ভাবে চিন্তিত হইয়াও—চাষের মরসুম পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পরদিন ভোর না হইতেই সকলকেই দেখা গেল মাঠে, প্রবীণদের প্রত্যেকেরই হাতে হুঁকা—হুঁকা টানিতে টানিতে জমির মাথায় মাথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অল্পবয়সীদের কোঁচড়ে অথবা পকেটে বিড়ি দেশলাই, কানে আধপোড়া বিড়ি। খানা-ডোবায় জল জমিয়াছে, জমিগুলি ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে; সিক্ত বাতাস ভিজামাটির গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। উঁচু ডাঙা জমিতে দুই-চারিজন লাঙ্গলের চাষ দিতেও আরম্ভ করিয়াছে। উঁচু ডাঙা জমিগুলি নিম্ন জোলান জমির মত কাদা হইয়া ওঠে নাই। কাদা একটু না শুকাইলে জোলান জমিতে চাষ চলিবে না। এসময়ের একটা চাষ—পাঁচগাড়ি সারের সমান উপকার দিবে। ধানের গোড়াগুলি উল্টাইয়া মাটির ভিতর পচিয়া সারের কাজ করিবে, রোদে বাতাসে মাটি ফোঁপড়া হইয়া উঠিবে।

ধানের মাঠের শেষে সুদীর্ঘ বন্যারোধী বাঁধ—সেই বাঁধের ওপাশে ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতেই আজকাল শিবকালীপুরের চাষীরা রবিফসল ও তরির চাষ করিয়া থাকে। সেখানে

আলু, গম, সরিষা, ছোলা ইত্যাদি এখন উঠিয়া গিয়াছে—কেবল তরকারীর চারাগুলি মাতৃস্তন্যবঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুর মত কোন মতে বাঁচিয়া আছে। সেগুলি এই বৃষ্টিতে দশদিনে দশমূর্ত্তি হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। মাঠ দেখিয়া শেষ করিয়া চাষীরা একে একে চরভূমিতে গিয়া উঠিল। জোলান জমির কাদা শুকাইতে এখন তিন-চারিদিন যাইবে—এদিকে দুইদিন পরেই নীল সংক্রান্তি, চৈত্রের তিরিশে গাজনের উৎসব, বুড়াশিবের পূজা। এ দুইদিন শিবের বাহন - গরু জুতিয়া হাল বহিতে নাই, সুতরাং এ কয়দিন চরের জমিতেই চাষীরা কাজ করিবে। তরকারীর চারাগুলির গোড়া খুঁড়িয়া সার ভরিয়া দিবে।

পাতু এবং অনিরুদ্ধ দুজনে একসঙ্গেই জমি দেখিয়া বেড়াইতেছিল। গতকাল রাত্রে তাহাদের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। অনিরুদ্ধ হাল করিবে, সেই হালে অনিরুদ্ধ এবং পাতু উভয়ের জমিই চাষ হইবে। অনিরুদ্ধের জমি বারোবিঘা—পাতুর জমি দেবত্র চাকরান তিনবিঘা। অনিরুদ্ধের হালের বিনিময়ে—পাতু অনিরুদ্ধের বারোবিঘা জমিতেই সমানে খাটিয়া যাইবে—চাষের আরম্ভ হইতে চাষের শেষ অর্থাৎ ধানকাটা—ধানমাড়াই পর্য্যন্ত।

গত রাত্রে—সে তখন অনেকটা রাত্রি—অনিরুদ্ধ দুর্গার বাড়ী গিয়াছিল, দিনে সে গ্রামান্তরে গিয়াছিল ঋণ পাইবার প্রত্যাশায়। দুর্গার নিকট হইতে সেদিন সে একটা ধাক্কা খাইয়াই ফিরিয়াছিল। তাহার পৌরুষ অপমানিত হইয়া তাহাকে অভিমানে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। দুর্গার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিল খানিকটা জাতিবিচারের সংস্কার বশে, খানিকটা এই অভিমানের বশে। এ কয়দিন জমি বন্ধক দিয়া সে ঋণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হিসাব করিয়া সে তাহার প্রয়োজন—দেড়শতটাকায় দাঁড় করাইয়াছে। একজোড়া হেলে বলদ সোত্তর টাকা, আগামী অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত আটমাসের খোরাকি ধানের দাম পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, অন্যান্য প্রয়োজন—তাও মাসিক পাঁচটাকা হিসেবে চল্লিশ টাকা, এই তো এক শো চল্লিশ হইয়া গেল। তাহার পর—কাপড় আছে—ঘর মেরামত আছে—আশ্বিন মাসে পূজার খরচ আছে। বাকি দশটাকা এবং তাহার নিজের হাতে যে গোটা তিরিশেক টাকা আছে তাহাতেই কোন রকমে এ সমস্ত চলিয়া যাইবে। ছিরে পাল খাজনার জন্য নালিশ নিশ্চয় করিবে, ডিক্রীও হইবে—সেও অনেক টাকা—চার বছরের খাজনা—একশো টাকা—সুদ টাকায় সিকি—পঁচিশ টাকা; খরচা—সেও গোটা পঁচিশেক—মোট দেড়শো টাকা। কিন্তু সে জন্য অনিরুদ্ধ তেমন চিন্তিত নয়; মকদ্দমা ডিক্রী হইবে, তাহার পর জারি—জারির পর নীলামইস্তাহার হইতে বছর শেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং ও টাকাটা ফসল উঠিলে দেওয়া চলিবে। সদ্য প্রয়োজন দেড়শত টাকার। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অনেক ঘুরিয়া অবশেষে কঙ্কনার স্কুলের মাস্টার চৌধুরীর কাছে সে টাকা ঠিক করিয়াছে। দেড়শত টাকায় ছয়বিঘা জমি বন্ধক দিতে হইবে। চৌধুরীকে লোকে এ অঞ্চলে বলে অজগর—তাহার গ্রাসে পড়িলে বাহির হওয়া যায় না। লোকে নাম করে না। চৌধুরী অঙ্কে বড় পাকা—সে মুখে মুখে হিসাব কষিয়া অনিরুদ্ধকে বলিয়াছে—বিঘাতে পঁচিশ টাকা দিলে—তিন বছরে পচিশ টাকা পঞ্চাশে গিয়া দাঁড়াইবে; তাহার উপর নালিশের খরচ চাপিলে মহাজনের থাকিবে কি?

অনিরুদ্ধ পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিল—আজ্ঞে, এই বছরই আমি শোধ করব মাস্টারমশাই—

পা টানিয়া লইয়া চৌধুরী উত্তর দিয়াছে—পায়ে ধরিস্ না অনিরুদ্ধ, পায়ের ফাটে হাত মুখ ছড়ে যাবে। ছাড়। চৌধুরীর কালো কর্কশ চামড়ায় সর্ব্বাঙ্গে বারমাস ফাট ধরিয়া থাকে—শীতকালে সাদা ফাটগুলা রক্তাভ হইয়া ওঠে; তাহার পায়ের ফাট একেবারে ভয়ানক—শুষ্ক কর্কশ কঠিন চামড়াগুলা ছুরির মত ধারালো। রসিকতা করিলেও চৌধুরী মিথ্যা বলে নাই। তারপর আবার সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছে—এই বছরই যখন শোধ করবি তখন ছ'বিঘে কেন, দশবিঘে বন্ধক দিতেই বা আপত্তি কেন তোর?

ম্লানমুখে অনিরুদ্ধ বলিয়াছিল—যদিই না পারি—দেহের গতিক, দেবতার গতিক—

—কিছু ভয় করিস না। না পারিস তাতেও তুই মরবি না। সুদ আমি বাকি রাখি না, রাখবও না। বাকি তোর আসলই থাকবে। তারপর খানিকটা হাসিয়া

চৌধুরী বলিয়াছিল—লোকে আমাকে গাল দেয়, বলে কাবলেওলা! তাতে ভালোটা কার হয়? আমার, না খাতকের! সুদ বাকি থাকলে লাভ তো আমার, আসলে তুফান হয়ে গোকুলের কেষ্টর মত বাড়বে।

অনিরুদ্ধ অবশেষে চৌধুরীর সকল প্রস্তাবেই রাজী হইয়া ফিরিয়াছিল; জল-ঝড়ের পর অন্ধকার রাত্রে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া মনের আনন্দে গান করিতে করিতেই ফিরিয়াছিল। মাঠে কাদা, খানায় জল, স্থানে স্থানে জলস্রোতবাহিত আবর্জ্জনার স্তূপ, চারিদিকে ব্যাঙের ডাক—মধ্যে মধ্যে বিষধর সরীসৃপের সুদীর্ঘ দেহ লইয়া দ্রুত সরিয়া যাওয়ার শব্দ; মাথার উপরে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু অনিরুদ্ধের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। হাত তিনেক লম্বা একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে সে নির্ভয়ে—ভ্রূক্ষেপহীন পদক্ষেপে চলিয়া আসিয়াছিল। সাপ! সাপের প্রাণের ভয় নাই? নেহাৎ মুখোমুখী না পড়িলে সাপ আক্রমণ করে না। উচ্চকণ্ঠে গান শুধু তাহার মনের আনন্দের অভিব্যক্তি নয়,সরীসৃপদের প্রতি সরিয়া যাইবার নোটিশ। সে নোটিশ সত্ত্বেও যদি কাহারও এমন দুর্মতি হয়, মাথা তুলিয়া গর্জ্জন করে, তবে অনিরুদ্ধের হাতের লোহার ডাণ্ডা খাপখোলা তলোয়ারের মত প্রস্তুত হইয়াই আছে। জানোয়ার সরীসৃপকে জয় করিয়া যে মানুষ পৃথিবীতে অধিকার স্থাপন করিয়াছে—অনিরুদ্ধ সেই মানুষের মানুষ; সে ভয় করে কেবল সেই মানুষকে—যে মানুষ তাহাদের মত মানুষকে জয় করিয়া অধিকারের উপর অধিকার স্থাপন করিয়াছে!

চৌধুরীকে সে ভয় করে।

ছিরু পাল—শ্রীহরি পাল হইয়া ক্রমশ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে।

অন্ধকার দুর্য্যোগ-দুর্গম পথে বাড়ী ফিরিতে তাহার বেশ খানিকটা রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। পদ্ম চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ঝড়ে রান্না-ঘরটার চালের খড় প্রায় সবই উড়িয়া গিয়াছে, কোঠা ঘরটার পশ্চিম দিকের চালটাও বিপর্য্যস্ত—খড়গুলা আতঙ্কিত সজারুর কাঁটার মত উপরের দিকে ঠেলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে। উঠানে রাজ্যের খড় পাতা আসিয়া পড়িয়াছিল, সেগুলি ইতিমধ্যেই পদ্ম উঠানের এক দিকে জড়ো করিয়া উঠানটা যথাসম্ভব সাফ করিয়া ফেলিয়াছে। অনিরুদ্ধের পায়ে এক হাঁটু কাদা, সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত। তাহার এই মূর্ত্তি দেখিয়াও পদ্ম সর্ব্বাগ্রে জল কি শুকনা কাপড় দেয় নাই, দিয়াছিল দুর্গার দেওয়া দশ টাকার তিনখানি নোট।

—টাকা!

—দুগ্‌গা এসেছিল, দিয়ে গিয়েছে।

—দুগ্‌গা?

—হ্যাঁ। বলেছে সুদ লাগবে না, যখন হোক দিলেই হবে। গরু কিনতে বলেছে। আর বলেছে—ওর দাদাকে গাঁতোতে নিতে হবে চাষে।

অনিরুদ্ধ সেই মুহূর্ত্তে সেই অবস্থাতেই বাহির হইয়া গিয়াছিল।

পদ্ম এতক্ষণে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ডাকিয়া বলিয়াছিল—ওগো কাপড় ছাড়, পা-হাত ধোও। ওগো! কিন্তু অনিরুদ্ধ তখন অনেকটা চলিয়া গিয়াছে।

পদ্মের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—গণনা করা দুর্ভাগ্য ফলিয়া গেলে মানুষ যে হাসি হাসে সেই হাসি।

কিন্তু দুর্গার সঙ্গে অনিরুদ্ধের দেখা হয় নাই। দুর্গা শুইয়াছিল—তাহার মাথা ধরিয়াছে। এই সবে মাত্র শুইয়াছে, ডাকিতে বারণ করিয়াছে। অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাতুর সঙ্গে চাষের কথা-বার্ত্তাটা পাকা করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। দুর্গার সঙ্গে দেখা হইল আজ। ভোর বেলায় মাঠে যাইবার জন্য অনিরুদ্ধ পাতুকে ডাকিতে আসিয়াছিল। পাতু বাড়ীতে ছিল না, উঠিয়াই সে বাহিরে গিয়াছে। দেখা হইল দুর্গার সঙ্গে। জনশূন্য বাড়ীটায় দুর্গা দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিল। হাসিয়া সে বলিল—দিন আজ আমার ভালই যাবে। তোমার মুখ দেখলাম।

—লক্ষীছাড়ার মুখ দেখলে কি দিন ভাল যায়। দিন তোমার খারাপই যাবে। নাও, এখন এ-গুলো ধর দেখি!

—কি?

—ধরই না, খারাপ জিনিষ নয়।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—সকাল বেলায় ভাল জিনিষ নিয়ে তুমি সাধাসাধি করছ, আর বলছ—তোমার মুখ দেখে দিন আমার ভাল যাবে না! দাও—এই দেখ দু হাত পেতেছি।

রাত্রি হইতেই মোট তিন খানা অনিরুদ্ধের কোঁচড়ে গোঁজা ছিল, বাহির করিয়া দুর্গার হাতে দিয়া সে হাসিয়া বলিল—তোমারই জিনিষ, কেবল ফিরে পেলে। এতে আর ভাগ্যি ভাল কি ক'রে হবে, বল।

দুর্গার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল।

—টাকার যোগাড় আমার হয়েছে ভাই, আর আমার লাগবে না। পাতু এলে তাকে পাঠিয়ে দিয়ো মাঠে—আমি মাঠ দেখতে চললাম।

—শোন।

—কি, বল!

—দরকার হ'লে আমাকে বল'। যখন দরকার হবে!

অনিরুদ্ধ তাহার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এতটুকু আঘাত—এতটুকু লজ্জা সে পায় নাই। মুখের যে হাসি তাহার মিলাইয়া আসিতেছিল—সে হাসি আবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। কথা আর অগ্রসর হইতে পাইল না, পাতুর বিড়ালীর মত বউটা আসিয়া হাজির হইল। অনিরুদ্ধকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল—ও—মাগো! লাগর যে বিয়েন বেলাতেই! কাল জল বাদল গিয়েছে—আজ সকালেই রঙ হবে না কি?

দুর্গা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—বউ!

পাতুর বউ যুদ্ধোন্মত্তা বিড়ালীর মতই ফুলিয়া উঠিল—কেনে?

সেই মুহূর্তেই আসিয়া পড়িল পাতু।

দুর্গার স্বর ভঙ্গি মুহূর্তে সব পাল্টাইয়া গেল, সে বলিল—বলি বাসীপাট আর সারবি কবে? দাদা মাঠ চল্‌লো। এর পর ঘরের চাল ঢাকতে—তাল-পাতা কাটতে হবে; আমি গাছে উঠব, কেটে দেব, তুই—মা পাতা নিয়ে আসবি মাথায় করে। নে, বাসীপাট সেরে নে।

পাতু কোদালখানা কাঁধে লইয়া বলিল—হারামজাদীর কানে বুঝি কথা যাচ্ছে না। দুগ্‌গা যা বলছে তাই কর্‌। পাতুর স্ত্রী বলিল—আমি লারব। আমি নড়তে পারছি না—বোঝা বইতে আমি পারব না।

পাতুর স্ত্রী পূর্ণগর্ভা—আসন্নপ্রসবা। দুর্গা হাসিয়া বলিল—মরণ। তবে ঘরে বসে ভাত খা! ওদিকে কান না দিয়া পাতু অগ্রসর হইল অনিরুদ্ধকে বলিল—এস কর্ম্মকার।

*　*　*　*

জোলান জমিগুলি জলে একেবারে সপ্‌সপ্‌ করিতেছে, স্থানে স্থানে এখনও জল জমিয়া আছে। মাটির কণাগুলি জলের প্রাচুর্য্যে যেন অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। জলকণাময় ভারী বাতাসে ভিজামাটির সোঁদা গন্ধ। রূপে রসে অনিরুদ্ধের অন্তর আশ্বাসে ভরিয়া উঠিল। তাহার প্রত্যাশা হইল, চাষের উৎপন্ন হইতেই তাহার ঋণ শোধ হইবে, বাকি খাজনা শোধ হইবে, সংসার স্বচ্ছল হইয়া উঠিবে। পাতুও ঠিক এমনি কথাই ভাবিতেছিল, সে বলিল—যে জল হয়েছে কর্ম্মকার, এতেই তামাম জমিতে এক চাষ শেষ হয়ে যাবে।

অনিরুদ্ধ সানন্দে কথাটা স্বীকার করিল—তা খুব।

—এক চাষ যদি হয়ে যায়, তা হ'লে বোশেখে দু-চার বার জল তোমার হবেই। তাতেও ধর তোমার দুটো চাষ হয়ে যাবে।

—এ-হে-হে রে! অনিরুদ্ধ তাহার তিনবিঘা জমির ধারে আসিয়া পড়িয়াছিল, জলের স্রোতে আইলের ভাঙন ভাঙিয়া—খানিকটা বালি জমিয়া গিয়াছে। অনিরুদ্ধ দেখিয়া আফশোষ করিয়া উঠিল।

পাতুও বলিল—কাজের ফের বাড়িয়ে দিয়েছে! ই বালি তুলতে দু'জনাতে গোটা দিন। তার ওপর ভাঙন বাঁধতে হবে। বাঁশের খুঁটো দিয়ে না বাঁধলে হবে না।

অনিরুদ্ধ চিন্তিত ভাবে বলিল—হুঁ।

—দোব না কি ভাঙনে দু কোদাল মাটি?

—থাক। চল এখন জমি দেখে বাড়ী যাই। আমাকে আবার কঙ্কনা যেতে হবে চৌধুরীর কাছে। টাকা চাই। বেরস্পতিবারে পাঁচুন্দীর হাট যেতে হবে—গরু কিনতে।

বেলা প্রায় দশটা বাজে। একটার মধ্যে না গেলে আজ আর দলিল রেজেষ্টি হইবে না। রেজেষ্টি না হইলে চৌধুরী টাকা দিবার লোক নয়। অনিরুদ্ধ হন হন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল। নদীর বাঁধের ধারে 'কয়েত' তলার বাকুড়িটা দেখিলেই হয়। ও-জমিটা না দেখিলেই নয়। বাঁধের ধারের জমি, বাঁধে একটা ফাটল—কি গর্ত্ত দেখা দিলেই সর্ব্বনাশ! ময়ূরাক্ষীর বন্যা সেই ফাটলে ঢুকিয়া—ভাঙন ভাঙিয়া একেবারে জমিকে বালির তলায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। কতকদূর আসিয়া অনিরুদ্ধ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহার জমিতে এত লোক কেন?—তাহারই

জমিতেই তো! আইলের মাথার উপর পুরানো কয়েত বেলের গাছটার গোড়ায়—জন কয়েক মিলিয়া—ও কি করিতেছে!

পাতু বলিয়া উঠিল—গাছ কাটছে।

গাছ কাটিতেছে! তাহার পিতামহের আমলের গাছ। গাছটার ফল এত মিষ্ট যে আজ দুই পুরুষ ধরিয়া গাছটার ছায়ায় ফসলের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তাহারা গাছটা কাটিতে পারে নাই। সেই গাছ কে কাটে? অনিরুদ্ধের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল—তাহার লোহা পেটা কঠিন পেশীগুলি গুণ দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান দিয়া উঠিল; দুরন্ত ক্রোধে অধীর হইয়া সে ছুটিয়া জমির উপর আসিয়া পড়িল।

কে?—কে?

দুইটা সাঁওতাল কুড়ুল চালাইতেছিল, তাহারা কুড়ুল নামাইল। কিন্তু বাঁধের উপর হইতে নামিয়া আসিল—জমিদারের চাপরাসী এবং ভূপাল চৌকিদার।

—আমার গাছ—; অনিরুদ্ধ কথা শেষ করিতে পারিল না, রাগে তাহার ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

জমিদারের চাপরাসী বলিল—বাবুর হুকুম। মালের জমিতে গাছ তো তোমার লয় বাপু, গাছ তো জমিদারের!

—গাছ জমিদারের?

—আইন জান কিছু, আইন? আইন দেখ গিয়ে। গমস্তার পরিবারের ছাদ্ধতে লাগবে। বাবুর হুকুম!

(ক্রমশঃ)

বর্ষাসুখ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

অবিশ্রান্ত বরষার দুরন্ত নর্ত্তন—
ছাদে ছাদে গাছে গাছে, জুড়িয়া প্রাঙ্গণ

লীলা তার সর্ব্বব্যাপী, আঁধারে আবরি'
বিশাল ধরণী চিরে বক্ষে টানি' ধরি'

কি স্নেহে কি মায়া ডোরে তাহারে জুড়ায়!
গ্লানি মুছে তৃপ্ত করে শীতল ধারায়!

বায়স ভিজিছে আর গাভী ভিজে সুখে;
বিদীর্ণ প্রান্তর আজ টানে লক্ষ মুখে

এ জল আপন মাঝে; তৃণসুখে নাচে;
পুকুর এ জল পেয়ে আরও যেন যাচে

দুলে দুলে ফুলে ফুলে; মানুষ হোথায়
ব্যগ্র চোখে করে পান এই বরষায়।

ধরার সকল অঙ্গ, সর্ব্বজীব আজ
পরিপূর্ণ বরষার নর্ত্তনের মাঝ
হরষে বিলাসে মাতে।

সে হর্ষ-বিলাস
দেহে মোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তুলেছে উচ্ছ্বাস

নিবিড় গভীর। চোখে বর্ষা অন্ধকার;
কানে বর্ষাধ্বনি, বুকে বর্ষা-পারাবার!

বিশাল এ ধরণীর বিশাল যে সুখ—
ধরার তনয় আমি—ভরি' মোর বুক
আজি তা বিরাজে।

আজি গেছি মিলে
বরষণ-হরষণে এ বিশ্ব নিখিলে।



আরব জাতীয়তার গোড়ার কথা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

যে-দিন থেকে আরবের জাতীয় জীবনে নব প্রেরণা এলো, সে-দিন থেকেই প্রাচ্যের রাজনৈতিক আকাশে একটি নবগ্রহ দেখা দিল। যে জাতি একদিন ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে বিশ্বসভ্যতায় কারুর পেছনে ছিল না, সে জাতি কেমন ক'রে এতদিন ইতিহাসের গুপ্ত গুহায় লুকিয়ে ছিল—তা ভেবে অবাক হতে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন: "...in the Middle Ages Arabian philosophy and science formed one of the most important forces ushering in the Renaissance and modern Europe..."

যে জাতির এতবড় বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল, সে জাতি কোন কালেও কারুর পদানত বা কারুর প্রভাবে বর্দ্ধিত হতে পারে না। তার ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতি, তার বিগত ইতিহাসই তাকে প্রেরণা জোগায়, ঐতিহাসিকতার যে শক্তি সমাজের ব্যবস্থার মধ্যে গুপ্ত ছিল, তাই একদিন বাইরের প্রবল সংঘাতে জীবনীশক্তি লাভ করল। আরবের জাতীয়তাবোধ তুর্কী বা মিশর দেশ থেকে একটু স্বতন্ত্র। তার কারণ, আরবে দুই ভিন্ন মনোবৃত্তির লোকের বসবাস চলে। মধ্য-আরবে বেদুঈনদের একাধিপত্য থাকায় তার প্রভাবে সেখানকার সামাজিক জীবনে এক ধরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। আবার অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী নগরসমূহের প্রভাবে আরবের আদিম সামাজিক জীবন অনেক পরিমাণে প্রভাব-ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে পরস্পরবিরোধী দ্বৈত মানসিক চিন্তাধারার উৎপত্তি হয়, আরবের ইতিহাসই অনেকটা তাই। কেন না, মধ্য আরবের বেদুঈনরা আর বসতি-আরববাসীদের মধ্যে একটা চিরকেলে দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান ছিল। বেদুঈনেরা চলিষ্ণু পন্থী, তারা কোথাও ঘর বাঁধে না। মোহাম্মদের কাল থেকেই এদের জীবনযাত্রার-প্রণালী এই। তা হ'লেও ক্ষেত্রবিশেষে এর খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। এই যাযাবর জাতির এমন একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনাবোধ আছে যে, তা অনেক সময় স্থিতিশীল জাতিসমূহের সভ্যতা-বোধ বা সৃজনী প্রতিভাকে অতিক্রম ক'রে আপন মহিমায় স্ব-প্রতিষ্ঠ হয়। এদের বেশীর ভাগ সৃজনী প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায় কৃষি-সভ্যতায়। এই বেদুঈনেরা সময় এবং সুযোগ পেলেই উর্ব্বর সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়া আক্রমণ করত। ইস্‌লামের আদিম অবস্থায় এরা সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়া জয় ক'রে অধিকার করেছিল। এদের সামাজিক সভ্যতা ও নাগরিক সংগঠনধারা তখন অনেক উন্নত ছিল। সমগ্র আরবের সংহতির স্বপ্ন তারা তখন থেকেই দেখছিল। কালের বিবর্ত্তনে য়ুরোপের সঙ্গে আদান-প্রদানের সুযোগ এলো। সমস্ত চিন্তাধারায় একটা পরিবর্ত্তনের সাড়া পাওয়া গেল। এলো আরববাসীদের নবীন চেতনার যুগ। ইতিমধ্যে তুর্কী জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াও কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল আরববাসীদের জাতীয় জীবনে। সিরিয়া ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিদেশী ধর্ম্ম-প্রচারকেরা এসে আস্তানা গাড়ল। দামাস্কাস্, জেরুসালেম, বেইরুৎ ও হাইফায় এই বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রচার-কার্য্য চলতে লাগল অপ্রতিহত গতিতে। কাজেই য়ুরোপীয় ভাব-ধারার গোড়া পত্তন এখান থেকেই শুরু হল বলতে হবে। এই য়ুরোপের প্রভাব থেকে শুধু মেসোপোটেমিয়া প্রথমে খানিকটা দূরে থাকলেও শেষাশেষি তাকেও এ প্রভাবের করায়ত্ত হতে হয়েছিল। অবশ্য এই বিদেশী প্রভাবে কিছু সুফলও ছিল।

বর্ত্তমানের আরব-সংহতির, আরব-জাতীয়তার এখান থেকেই পত্তন হয়। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মাঝে যে উগ্র মতানৈক্য ছিল, তা খানিকটা প্রশমিত হয় এই জাতীয়তাবোধের দ্বারা। আরব-জাতীয়তাবোধের আর একটি নূতন অধ্যায় মধ্য-আরবের বেদুঈনেরাও সৃষ্টি করেছিল। তবে তাদের এই জাতীয়তাবোধের পটভূমিকা ছিল ওহাবীয় ধর্ম্মান্দোলন। আহ্বান বা ভ্রাতৃত্ব এই ছিল তাদের মূলমন্ত্র। তোমায় আমায় কোন প্রভেদ নেই, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই—এই চেতনা আরব-বাসীদের প্রাণে বিপুল আশার সঞ্চার করেছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের বিশ্বগ্রাসী করালব্যাদন থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য আরববাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। জাতির অস্তিত্বের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও মোহই তাদের বাধ্য করেছিল অমন অস্তিত্ব-গ্রাস করা দানবের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করতে। এখানেও পাই আরববাসীদের জাতীয়তার আর একটা নিদর্শন। কেবলমাত্র আরবের দক্ষিণের দেশগুলিতে এই জাতীয়তাবোধের নিদর্শন পাওয়া যায় না। গত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের ফলে বিরাট পরিবর্ত্তনের ধারা এলো আরবের মাঝেও। যে জাতীয়তাবোধ এতদিন শৈশবের সীমা অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর জগতের অভিমুখী হতে সাহস পায়নি, সেই জাতীয়তাবোধই পৃথিবীর অমন বিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে পরিণত রূপ ধারণ করে আত্ম-প্রকাশ করল। ফল হল—আরবের সেই লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তারা সবাই চাইল ফিরিয়ে আনতে আরবের সেই খালিফার খালিফত্ব।

আরবের এই নব চেতনা প্রথম বিকাশ লাভ করে সিরিয়ায়। মাত্র একশো বছর আগেও প্রদেশটি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার মাঝে বন্দী ছিল। এর কারুর সঙ্গেই কোন সম্পর্ক ছিল না। এ দেশ ছিল একক বাহ্য প্রভাব-বিহীন; সামন্ত নৃপতি ও উপজাতীয়দের ঝগড়া-ঝাটিতে এদেশের বাতাস হয়ে উঠত বিষাক্ত। তুর্কীর সুলতান ছিল এই দেশের নামে মাত্র রাজা। মিশরের প্রসিদ্ধ সংস্কারক মোহাম্মদ আলী ও তাঁর পুত্র ইব্রাহিম এই দেশের মাঝে নব আলোকের ধারা বয়ে আনেন। তখন সিরিয়ায় মিশরের পাশারা মাত্র কয় বছরের জন্য রাজত্ব করেছিলেন যখন এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ক্রমে ক্রমে বিদেশী খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় এলো। এই খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদের সঙ্গে ইস্‌লামের কোন দিনই সম্পর্ক ভাল ছিল না। আর থাকারও কথা নয়। কারণ তারা হল বিদেশী, আর ইস্‌লাম হল

দেশের ধর্ম্ম। খৃষ্টান ধর্ম্ম খুব প্রভাব বিস্তার করতে না পারায় ইস্লামের ওপর তার বিদ্বেষ গেল বেড়ে।

এই সময় অনেক সিরিয়াবাসী আমেরিকা ও য়ুরোপে যেতে লাগল। তাঁদের সেখানকার অভিজ্ঞতাও অনেক অংশে জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভফলের কারণ হয়েছিল। নানা কারণে বিদেশী খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকেরা এ দেশীয়দের ওপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠল। প্রথমত বিদেশাগত সিরিয়ানরা অভিজ্ঞতা, অর্থ ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকাংশে ধর্ম্মযাজকদের শ্রেষ্ঠ ছিল। বিদেশীদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব এরা খানিকটা পরিমাণে সীমাবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত বিদেশীয়রা দেশী আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সবই ঘৃণা করত। এই সব কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লেবাননে ক্যাথলিক ম্যারনাইটস্ ও ডুরুৎস্দের মধ্যে বিবাদ বাধে। ক্যাথলিক সম্প্রদায় ফরাসী সাহায্য পেয়েছিল, আর ডুরুৎস্রা পেয়েছিল ইংরেজের সাহায্য। বহুদিন ধরে এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ চলেছিল। এই বিবাদের ফলে লেবানন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। তখন প্রদেশটি একজন তুর্কী খৃষ্টান গবর্ণরের অধীনে চলে যায়।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারীরা বেইরুতে এলিস্মিথ্, এবং কর্নিবিসয়াস্ ভ্যানডাইকের সহায়তায় একটি চিকিৎসা কলেজ স্থাপনা করেন। আরবী ভাষার সাহায্যে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। যে সব ছাত্র এই কলেজে অধ্যয়ন করত তারাই আমেরিকার গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ক্রমে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জেস্যুটরা বেইরুতে সেণ্ট-জোসেপ নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবী ছাপাখানা স্থাপন ও সংবাদপত্রপ্রকাশ করেন।

পরে এই বিশ্ববিদ্যালয় ফরাসী প্রচার-কার্য্যের প্রধান যন্ত্রে পরিণত হয়। এই সব কলেজে অধিকাংশ সিরিয়ান খৃষ্টানেরা পড়ত। ইস্লাম ধর্ম্মের লোকেরা বড় একটা এই সব কলেজে পড়ত না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শেখ আহম্মদ আব্বাস্ নামে এক মহানুভব ব্যক্তি ওস্মানিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ কলেজে শুধু ইস্লাম ধর্ম্মের লোকেরাই পড়ত, এই ওস্মানিক কলেজের বিশেষত্ব ছিল এই যে, এ কখনও কোন শিক্ষা সম্বন্ধে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করেনি। মহান ঔদার্য্যের নীতিতে এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা হত। পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হত। যেমন অন্যান্য সব দেশে ঘটে, সিরিয়ায়ও তাই ঘটেছে। জাতীয় জীবনে একটা পরিস্ফুট সত্তা লাভ করার যে ঐকান্তিক ইচ্ছা তা এরা সবই পেয়েছে পৌরাণিক সাহিত্য, দর্শন ও কাব্যের মাঝে। অতীতের যে সব সম্পদ ধ্বংস হয়ে কালের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারই পুনরুদ্ধার চলেছিল এই সময়। সিরিয়ার জীবনকে নবরূপে, সমাজকে নূতন নক্সার ও রাষ্ট্রকে নব বিধান দেওয়ার যে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী—এ সবারই মূলে ছিল একজন নীরব কর্ম্মী, উন্নতমনা পণ্ডিত মহাপুরুষের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম। তাঁর নাম বুৎরোজ এল বোস্তানি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বেইরুতে আমেরিকান মিশনারীদের সঙ্গে কাজ করছিলেন তখন 'নাফির সুরিয়া' (দি সিরিয়ান ট্রাম্পেট্) নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তার ঠিক তিন বছর পরেই ইনি আরবী ভাষার বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরেই আবার 'এল জেনান' (দি শিল্ড) নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল—"Love of our country is an artiole of faith." এই সময়ে অল্প দিনের মধ্যেই একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশ করেন সুলাইমান এল বোস্তানি। সুলাইমান বোস্তানি একজন বিশেষ পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি হোমারের বিখ্যাত কাব্যখানি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। ইনিই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অটোমান পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত বুৎরোজ আরব বিশ্বকোষ সম্পাদনায় হাত দেন। তিনি নিজে জীবিতকালে মাত্র ছয়টি খণ্ড প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও ভ্রাতারা সমাপ্ত করেন। বুৎরোজ এল বোস্তানি শিক্ষা ব্যাপারে উদারনৈতিকপন্থী ছিলেন, তিনি শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। পরন্তু স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারেও তার মতামত উদার ছিল। সিরিয়ায় শিক্ষা ও সংস্কারের এমন উদার ও ব্যাপক প্রয়োগ হওয়ায় তখনকার কর্তৃপক্ষ বড়ই শঙ্কিত হয়ে উঠল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মিদ্হত্ পাশা যখন সিরিয়া প্রদেশে শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি বোস্তানির এইরূপ শিক্ষা প্রচারের বিরোধিতা করেছিলেন।

সিরিয়ার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রমাণ এই যে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা যখন প্রথম পার্লামেণ্ট গঠন করে তখন সিরিয়ায়ও একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। তিনি উদার-নৈতিক ছিলেন, তাঁর নাম খলিল গানেম। দুর্ভাগ্যের প্রকোপে তাঁকেই একদিন আবার দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হতে হয়েছিল।

কেন না তুর্কীরা যে শাসন-সংস্কার একদিন সিরিয়ায় প্রবর্ত্তন করেছিল তা আবার কিছুদিন পরেই স্থগিত করে। রাজনৈতিক শাসন-সংস্কারের এমন এলোমেলো আবহাওয়ার মাঝে পড়ে খলিল গানেমের ভাগ্যে নির্ব্বাসন ঘটে। বুৎরোজ ছাড়াও অন্যান্য মণীষীদের আবির্ভাব এই সময় ঘটে। অলীফ্ এল ওয়াসিজি তাদের মধ্যে একজন—ইনি সংস্কারপন্থী ছিলেন। তাঁর দানও জাতীয় জীবনে কিছু কম নয়। ইউসুফ্ এল দেব্স নামে আর একজন পণ্ডিত একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সেই কলেজটিকে আরব অ্যাকাডমিতে পরিণত করার প্রয়াস পান। তিনি সিরিয়ার একখানি ইতিহাস প্রকাশ করেন। এই ইতিহাসখানি সব শুদ্ধ নয়টি খণ্ডে পূর্ণ। সিরিয়ার যুব সম্প্রদায়দের মধ্যে যাঁরা সেকালে খ্যাতিসম্পন্ন হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আদিব্ ইসাকের নামই উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এল্ টাকাডম্ (প্রোগ্রেস্) নামে একখানি পত্রিকা ইনি সম্পাদনা করেন। তিনি মিশরে যান, সেখানে তিনি জামাল উদ্দীন নামে এক আফগানের সংস্পর্শে আসেন, তারপর সেখান থেকে

তিনি প্যারিসে যান। প্যারিসে গিয়ে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি আরবীপন্থার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সারা জীবন জাতীয়তার বাণী বহন করে এই অক্লান্তকর্ম্মী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি শুধুই রাজনীতি চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করেন নি। আরবি সাহিত্যে কবি ও নাট্যকার হিসাবে তাঁর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এই সর্ব্বব্যাপী জাতীয়তার আন্দোলনে সিরিয়ার নারীদের দানও খুব কম নয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দ নওফেল্ প্রথম একখানি নারীদের পত্রিকা প্রকাশ করেন। পর পর আরো অন্য কতকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঠিক এই সময়ই বেইরুতের দৈনিক নসীর পত্রিকায় একজন নারী সম্পাদনা কার্য্য আরম্ভ করেন। ফাটাল্ এল সার্ক এর 'দি ইয়ং মেইড অব্ দি ঈষ্ট' নামক একখানি পত্রিকা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পত্রিকাখানি লাবিব্ হাসিম সম্পাদনা করেন।

সিরিয়ার জাতীয়তার ক্রমবিবর্ত্তনের মাঝে বাহ্যত মনে হয় যে ফরাসী ক্যাথলিকদের প্রভাবই খুব বেশী। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা নয়। কেন না এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা তাঁদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ নিয়ে খুব বেশী পরিমাণে ব্যস্ত ছিলেন। কোন একটা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির বিষয় তারা মোটেই চিন্তা করার অবসর পান নি। কেমন ক'রে যে নবীন ভাবধারার প্রগতি সিরিয়ার জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা খুঁজতে গিয়ে আমরা পাই ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব, আর ফরাসীর প্রগতিপন্থী রাজনীতিজ্ঞদের প্রভাব। এই দুই প্রভাবের সমন্বয় তাদের বর্ত্তমান কালের জাতীয় জীবনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। ফরাসী প্রচারকরা মনে করেছিল যে, শুধু মাত্র প্রচার-কার্য্য চালিয়েই তারা একটা জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য, ইতিহাস, সভ্যতাকে চাপা দিয়ে রাখবে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদের অর্থ-নৈতিক শোষণের পথ পরিষ্কার করতে পারবে। কিন্তু যে জাতি তার অন্তর-সত্তা থেকে প্রেরণা লাভ করে তাকে বাইরের কোন শক্তি অবনমিত করতে পারে না।

তাই সিরিয়া ভোলেনি তার লুপ্ত গৌরব, তার ক্ষাত্রশক্তি, জাতীয় বদান্যতা, সামাজিক শিক্ষা—উপরন্তু তার ধর্ম্মের ঐক্য বাণী। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলেই দেখা যায় যে. প্রায় প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির আবির্ভাব হয়। কিন্তু তাই বলে সে জাতি তার অন্তরনিহিত সত্তা হারায় না। শুধু কতগুলি বাহ্যশক্তির চক্রে বন্দী হয়ে জাতির জীবন সাময়িকভাবে শৃঙ্খলিত হয় মাত্র। চেতনার নবীন দূত এসে যেদিন এই শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে তখন আর কোন শক্তিই, সে যতই প্রতাপশালী হোক না কেন, তাকে শৃঙ্খলিত রাখতে পারে না। সে জাতির গতি হয় তখন দুর্দ্দমনীয় উল্কার মত। সিরিয়ার বন্দী-জীবন যে একদিন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল তা নীচের কথা কয়টা দিয়ে প্রমাণিত হবে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বেইরুতে একখানি বেনামী ফতোয়া প্রকাশিত হয়। এই ফতোয়াখানি একদিকে যেমন সিরিয়াকে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদ করেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে বিদেশীদের কবল থেকে দেশের আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য জাতিকে আহ্বান করেছে।

"We love France but our affection cannot go so far as to forget ourselves. It is essential in the interests alike of Syria and of France that our countrymen should preserve their national character and their own individuality, whilst driving inspiration from France ideas...

...We will toil and slave, we will exhaust every atom of our strength and energy, our youth and spirit, will scrifice our evry life-blood, if necessary, bnt our own culture will not die···"

পান্থ

শ্রীনীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

কত বসন্ত কেঁদে ফিরে গেল পান্থ
কোথায় তোমার গোপন আহ্বানবাণী ?
আমি গান গেয়ে গেয়ে পথ চলি' শুধু শ্রান্ত
কে ল'বে আমার বরণ-মালিকাখানি !

দূর হ'তে কত ভাসিয়া আসিল গন্ধ
কতবার তব শুনিলাম পদধ্বনি,
বাতাস আসিয়া ক'য়ে গেল' কত ছন্দ
কত না রজনী কাটানু প্রহর গণি'।

তবু এ অজানা পথ নাহি হ'ল শেষ,—
বল প্রিয়তম, দেখা হবে কোথা কবে,
আর কতকাল চলিব নিরুদ্দেশ
এ-দীর্ঘপথ মৌন স-গৌরবে।



গীতারতি

কথা—শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

গানেরে আমার আরতি তোমার
করিব কবে ?
হৃদিপুরে প্রিয় মূরতি অমিয়
রচিত হবে !
কণ্ঠ আমার নিজ অভিমানে
সুর-মূর্ছনা আনে নানা তানে,
সে ক্ষণিকা শিখা, নহে নীহারিকা
তোমার নভে ;
ভুল-ফুলঝুরি, তার সে চাতুরী
মিলায় যবে ।

মোর গানে শুধু অর্ঘ্য রচিব
তোমার তরে
নবীন স্বর্গ নামিবে তখন
ধরার ঘরে ;
সুর-শিখা মোর এ দীন বীণা-রি
গানে হোক্ শুধু তব অভিসারী
সে সূর্যমুখী-সুরটির তুমি
সবিতা হবে ।
গীতির সাধনা, তব আরাধনা
মিলিবে তবে ॥

তাল—দাদ্‌রা

II { না | -া না র্সা | ধনা র্সনা ধপধা | পা -া -া | গপা -া গা | মা পা ধা | না র্সনা ধপধা |
গা - নে রে আ - - মা - - - র আ - র তি তো - -

র্সা -া -া | ধর্সা -া না | র্সা র্রা র্গা | র্না র্রা -া | র্সা -া -া | র্গর্রা র্সা না | ধপা গা রা | সা -া ॥ }
মা - - - র ক - রি ব ক - - বে - - গো - - - - - - -

সা | ন্রা সা সা | ন্রা সা সা | ন্া ধন্া -া | -া -া প্া | ন্া সা রা | গা মগা রা | সা -া -া |
হৃ দি পু রে প্রি - - য় - - - - মূ র তি অ মি - - য় - -

-া -া সা | গা গা মা | গমা পা ধা | মপা -া -া | মগা মা পা | ধপা ধা না | র্সা -া II
- - র - চি ত হ - - বে - - গো - - - - - -

না । -া না র্সা । ধর্সা মা -া । পনা ধা -া । মধা পা গা । মা পা ধা । না র্রা -া । র্রা র্সা -া ।
ক ণ ঠ আ মা - - র - - - - নি জ অ ভি মা - - নে - -
সু র শি খা মো - - র - - - - এ দী ন বী ণা - - - রি - -

-া -া না । র্সা র্রা র্গা । র্রর্মা র্গা -া । র্সর্গা র্রা -া । নর্রা র্সা নর্রা । র্সর্রা নর্সা ধনা ।
- - সু র মু র ছ - - না - - - - আ নে না না
- - গা নে হো ক্ শু - - ধু - - - - ত ব অ ভি

পধা নর্সা নধা । পা -া -া । -া -া মা । মা মা মা । মা -া -া । মধা পা মা । গা -া গা ।
তা - - নে - - - - সে ক্ষ ণি কা শি - - থা - - - - - ন
সা - - রী - - - - সে সু র য মু - - থী - - - - - সু

গা গা মা । রমা গা -া । রমা গা রা । সা -া ন্া । সা রা গা । মা পা ধা । না র্সা র্রা ।
হে নী হা রি - - কা - - - - তো - মা র ন - - ভে - -
র টি র তু - - মি - - - - স - বি তা হ - - বে - -

র্গর্মা র্গা র্রা । র্সনা ধা পা । র্সা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সর্রা র্সনা র্সা । পা -া -া ।
গো - - - - - - - ভু ল ফু ল ঝু - - রি - -
গো - - - - - - - গী তি র সা ধ - - না - -

-া -া পা । পা পা পা । পধা পক্ষা পা । রা -া -া । -া -া মা । -া মা মগা । রগা মগা রসা ।
- - তা র সে চা তু - - রী - - - - মি - লা য় য - -
- - ত ব আ রা ধ - - না - - - - মি - লি বে ত - -

ন্ধ্া ন্া -া । প্ধ্া ন্া রা । ন্রা গা পা । র্সা -া II
বে - - গো - - - - - - - - গাহিয়া
বে - - গো - - - - - - - - "মোর গানে শুধু···ঘরে" পর্যন্ত চতুর্মাত্রিক (কার্ফা বা কাওয়ালী) ছন্দে গেয়

তালফের

সা গা রা গা । সা মা গা -া । মা ধা পা ধা । গা ধা পা -া । পা না ধা না । পা র্সা না -া ।
মো র গা নে শু - ধু - অ ন্ ধ র চি - ব - তো - মা রি ত - রে -

\+ ৩
র্সর্গা র্রর্সা নধা পধা | র্সা -া -া -া | র্সা র্গা র্গা র্গা | র্মর্গা র্রা র্সা -া | পা না না না |
গো - - - - - - - ন বী ন স্ব র - গ - না মি বে ত

র্সনা ধা পা -া | সা গা গা মা | মা পা পা ধা | না র্সনা ধা পধা | পা -া -া -া |
খ - ন - ধ - রা র ঘ - রে - গো - - - - - - -

গাহিয়া "সুরশিখা…" অন্তরায় ত্রিমাত্রিকে প্রত্যাবর্ত্তন

বালীগঞ্জ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নহ পাট পীঠ, নহ মঠ, নহ টোল,
রাজ-অশ্বের নহক পিঁজরাপোল।
বাঙলার তুমি সকল ঠাঁইয়ের সেরা,
বানপ্রস্থ প্রতিভার তুমি ডেরা।
বুকে দেয় বল, চোখে আনে মোর জল,
শত সূর্য্যের এই যে অস্তাচল।
ত্যজি' রণসাজ ফেলি' গাণ্ডীব তূণ,
হেতা থাকে যত বঙ্গের অর্জ্জুন।
নাহি গর্জ্জন—নাহি বারুদের বল,
শান্ত হেতায়—কামান 'দল মাদল।'

২

সপ্তসিন্ধু মথিয়া ঝঞ্ঝা ঝড়ে,
বহিত্র সব ফিরিয়াছে বন্দরে।
আগ্নেয় গিরি আজিকে নির্ব্বাপিত,
'বদরীর' পথ করিছে অলঙ্কৃত।
পিনাক ত্যজিয়া রুদ্র হয়েছে ভোলা,
তাঞ্জাম আজ হইয়াছে হিন্দোলা।
কর্ম্মী আসিয়া ভাবুক হয়েছে হেথা,
যোগের সাধন করিতেছে দেশ-নেতা।
নিমগ্ন কেহ সদা ভাগবৎ পাঠে,
বেদাধ্যয়নে কাহারও দিবস কাটে।

৩

মধুকরদল সমাপন করি গান
বুক ভরি হেথা করিতেছে মধুপান।
বাচাল এখানে আসিয়া হয়েছে মূক,
লভিতেছে নব অনাস্বাদিত সুখ।
প্রদেশ শাসিয়া লভিয়া প্রচুর যশ
আজি আস্বাদে ভক্ত মানের রস।
ত্যজি রাজ সাজ পদের অহঙ্কার
ভগবানে লয়ে পাতিয়াছে সংসার।
প্রভাত মুখর হল যাহাদের ডাকে
হেথা সন্ধ্যায় তাহাদিকে ভাল লাগে।

৪

বর্ম্মেতে আঁটা দেখেছি যে সব বীরে
আজিকে ভিক্ষু নিরঞ্জনার তীরে।
জগাই মাধাই ধৌত করিয়া মন—
রচেছে এ পাট অপরাধ-ভঞ্জন।
বিলাসের পুরী যে বলে বলুক এরে
মুগ্ধ আমি এ তপঃ মূর্ত্তি হেরে।
বধূ হইয়াছে আজিকে ঘোমটা টানি,
হেথা বঙ্গের যে দেবী চৌধুরাণী।
কন্যা ও বধূ শান্ত শুদ্ধ মন
গৃহেতে গড়িয়া উঠিতেছে তপোবন।

৫

যতই বিপথে করুক সে বিচরণ
ব্রাহ্মণ রবে চিরদিন ব্রাহ্মণ।
হিন্দু-তনয় যে ভাবে যেথায় থাক
সকলের কাছে মধুর মায়ের ডাক।
রক্ষা তাহারে করেন রাঘব রাম,
চক্ষেতে বাস করেন রাধাশ্যাম।
বিলাস তাহার কেবল কথার কথা
হিন্দুর প্রাণে জড়িত সাত্ত্বিকতা।
হিন্দুর গৃহ পবিত্রতায় ঘেরা—
রামপ্রসাদের নিজ হাতে দেওয়া বেড়া।

৬

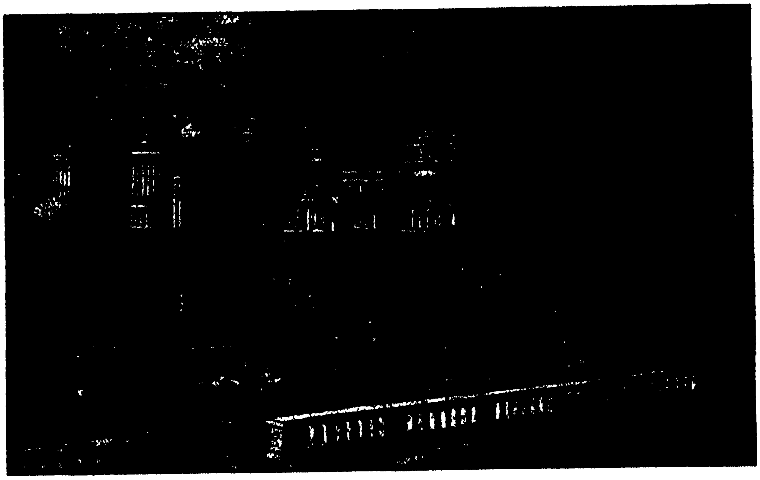
বার বার আমি জানাই নমস্কার
এ তাদের ডেরা—দুর্গ এ দুর্গার।
কাঠ পাথরের বহিরাবরণ মাঝে
নব নৈমিষারণ্য হেথায় রাজে।
শেষ পুণ্যেতে হৃত ভূখণ্ড সম
স্বর্গেরি যেন অংশ এ অনুপম।
পিয়ানো ব্যাঞ্জো মৃদঙ্গে হ'ল হারা
পরাণেতে পাই গরাণহাটির সাড়া।
প্রাসাদে চলুক উৎসব একাকাই
গিরিধারী লালে পূজে হেথা মীরাবাঈ।

সেকালের ইংরেজ-সমাজ

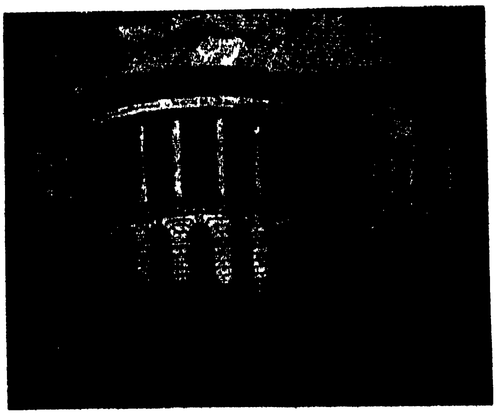
শ্রীহরিহর শেঠ

(৩)

পদমর্য্যাদার তারতম্য অনুসারে চলাফেরা তখনকার কালে ইউরোপীয় সমাজে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত এবং এই বিষয় লইয়া সর্ব্বদা অসমান পক্ষের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত। মহিলাদিগের মধ্যে ইহা আরও অধিক ছিল। অবশ্য তাঁহাদের স্বামীর পদমর্য্যাদা ধরিয়াই তাঁহারা গর্ব্বিতা থাকিতেন। জাতি-বিরোধও সেকালে কম প্রবল ছিল না। ইউরোপীয় ও দেশীয়দের মধ্যে সর্ব্বদাই ব্যবহারের একটা বিসদৃশ ভাব দেখা যাইত। ভারতীয়দিগকে সাহেবেরা তখন হইতেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিযাছিল। দেশীয় ব্যক্তি অশ্বারোহণে যাইবার কালে কোন শ্বেতাঙ্গকে দেখিলে যতক্ষণ না তিনি চলিযা যান সে ব্যক্তি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইত। এ বিষয় চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের ব্যবস্থা আরও গুরুতর ছিল। তাহাদের ডিরেক্টর যখন পথে পাল্কি আরোহণে যাইতেন তখন কোন কোন পল্লীর অধিবাসীদের তাঁহাদের গমনকালে যন্ত্রসঙ্গীত করিতে বাধ্য করা হইত। এই প্রসঙ্গে একটা কথা শুনিতে মন্দ লাগিবে না, তখন হইতেই ইংরেজরা বলিযা আসিতেছেন, তাঁহাদের ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়, আমাদের উদ্ধার করা—"that the English Mission in India was to qualify natives for governing themselves."



গবর্ণরের প্রাসাদের দৃশ্য—কলিকাতা



কলিকাতায় ইউরোপীয়দের বাসভবন

মহিলা ও বিবাহ-ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পুরুষের তুলনায় এখানে ইউরোপীয় মহিলার সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। তখন সমগ্র বাঙ্গালায় মিলিটারি কর্ম্মচারী সমেত সম্রান্ত ভদ্রলোক ছিল প্রায় চারি সহস্র ; কিন্তু মহিলার সংখ্যা আড়াই শতের অধিক ছিল না। মহিলাদের ইউরোপ হইতে বাঙ্গালায় আসার ব্যয়ও ছিল অত্যধিক, ৫০০০৲ টাকার কমে একজনের আসা হইত না। কোম্পানির ব্যবসা একচেটিয়া থাকায় জাহাজ ভাড়া খুবই বেশী ছিল। মালপত্রের ভাড়াও

ছিল যথেষ্ট, প্রতি টনের ভাড়া ২৫ পাউণ্ড। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিকির গেজেটে দেখা যায়, একবার এক জাহাজে একাদশটি ভদ্র মহিলার আগমনে সম্পাদক অনুমান করিয়াছিলেন যে



ওয়ারেন হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিস-এর ডুয়েল

মহিলাদের শিরোবাস প্রভৃতি পরিচ্ছদের মূল্য অন্তত শতকরা পঁচিশ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে।

তখনকার দিনে কোন একজন যুবতী মহিলা স্বদেশ হইতে আসিলেই তাহার সহিত দর্শনার্থী ভদ্রলোকের ভিড় লাগিয়া যাইত। এমন কি, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঐরূপ জনসমাগম হইত। উদ্বাহকার্য্যও তাহাদের অতি সত্বর সম্পন্ন হইত। কখন কখন তাহাদের আগমনের পর তৃতীয় রাত্রের মধ্যেই হইয়া যাইত। উপাসনা-মন্দিরেই সাধারণত পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে মনোনয়নকার্য্য চলিত। বিবাহ ব্যাপারটা তখনকার দিনে উভয় পক্ষের নিকটই বিশেষ আনন্দদায়ক ছিল, বিশেষত যাজকদের পক্ষে; তাঁহারা বিবাহ দেওয়াইয়া দিবার জন্য সচরাচর প্রায় কুড়ি মোহর দক্ষিণা পাইতেন। কিন্তু যেমন তাড়াতাড়ি বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইত, বহু ক্ষেত্রে ইহার ফলও আক্ষেপজনক হইত। প্রায়ই দেখা যাইত, স্বামী বা স্ত্রী কেহ কাহারও প্রতি বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন হইতেন না। প্রায় পাত্র বা পাত্রীর কোন নিকট-আত্মীয়ের বাটীতে সন্ধ্যার সময় বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইত। তথায় উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধবগণ সুন্দর পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া উপস্থিত থাকিত। পান-ভোজনাদির ব্যবস্থাও খুবই আড়ম্বরপূর্ণ হইত। এরূপ একটী বৈবাহিক অনুষ্ঠানে সমগ্র শহরটিতে যেন একটা সাড়া পড়িয়া যাইতে দেখা যাইত।

ব্যবহারজীবী ও চিকিৎসক

কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উকিল এটর্ণিরও আমদানি হয়। দেশীয় অধিবাসীগণ তখন দুইটী কারণে ইহা ভাল চক্ষে দেখেন নাই; প্রথমত ইহার আশ্রয় লওয়া খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল এবং দ্বিতীয়ত ইংরেজের আইন সকলের অপেক্ষা খারাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। উকিলদের ফি তখন অত্যধিক ছিল। কোন একটী প্রশ্নের উত্তর লইতে হইলে তাঁহাদের এক মোহর এবং একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিতে হইলেও ২৮৲ টাকা দিতে হইত। কোন দানপত্র সম্পাদনের জন্য—দানপত্রের আকার অনুসারে পাঁচ মোহর বা ততোধিক দিতে হইত। প্রথম প্রথম এটর্ণির সংখ্যা দ্বাদশটি নির্দ্ধারিত ছিল। কোন এটর্ণির নিকট তিন বৎসর আর্টিকেল্ থাকিলেই তখন এটর্ণি হওয়া চলিত।



সেলাম!

তখনকার দিনে ডাক্তারি চিকিৎসা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ছিল। ডাক্তাররা পালকি করিয়া রোগী দেখিতে যাইত এবং সাধারণ দর্শনী প্রত্যেকবার পাইত এক মোহর করিয়া। এতদ্ভিন্ন তাহাকে কোন কিছু করিতে হইলেই অতিরিক্ত দর্শনী দিতে হইত। ঔষধের দামও অত্যধিক ছিল এবং এই অসুবিধা কতকাংশে দূরীভূত করিবার জন্য লণ্ডনের ডিস্পেন্সারির অনুকরণে কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ মধ্যে একটি ঔষধের দোকান খুলিযাছিলেন। সেখানে মোটামুটি নিম্নলিখিত মত দর নির্দ্ধারিত ছিল, যথা ঔষধার্থে কোন বৃক্ষত্বক প্রতি আউন্স ৩৲ টাকা, সল্ট জাতীয় ঔষধ প্রতি আউন্স ১৲, বেলেস্তাবা প্রত্যেকখানি ২৲, বটিকা প্রতি কৌটা ১৲ ইত্যাদি।

উৎসব-আনন্দ

তখনকার সময়ে বড়দিন, নববর্ষের প্রথম দিন এবং রাজার জন্মদিনেই সাধারণভাবে উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। বড়দিনের সময ইংবেজ অধিবাসীরা তাঁহাদের বাটীর বহির্দ্দেশ খুব মনোরম করিষা সাজাইতেন। প্রবেশ-দ্বার অর্থাৎ ফটকের উভয়পার্শ্বে দুইটি বড় বড় কদলী বৃক্ষ বসাইযা দেওয়া হইত। ফটক ও উভযপার্শ্বের থামগুলি ফুলেব মালা দ্বারা সজ্জিত করিতেন। এ সময় বেনিযন্ হইতে অতি সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত বড়সাহেবকে ফলমূল ও মৎস্য ভেট পাঠাইত। লাটসাহেবের বাড়ীতে সাধারণত দিনের বেলায় সম্ভ্রান্ত লোকদের একটি ভোজের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা হইত এবং সন্ধ্যার সময় বল নাচ ও পরে ভদ্র মহিলাদের নৈশ-ভোজ দিয়া উৎসব শেষ হইত। নববর্ষের প্রথম দিন ও রাজার জন্মদিনের উৎসবও এইভাবে সম্পন্ন হইত।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ও উন্নতির জন্যই জব্ চার্ণক্ কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগীরথীর পশ্চিম-কূল অধিকতর স্বাস্থ্যকর জানিয়াও তন্তুবায়-প্রধান সুতানুটী পল্লীটিই তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠ বা বেনারসের-মল বংশের ন্যায় বিশিষ্ট ধনী



সহিস ও হরকরা বা পিওন

ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সেকালে কলিকাতায় কখন আইসে নাই। পুঁজিওয়ালা তখন অল্পই ছিল। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের অর্থেই তাহাদের ব্যবসা চলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীনের সহিত ব্যবসায-সম্বন্ধ খুব বেশী ছিল। ব্যবসায়ীগণ কলিকাতা বাজারের জন্য পণ্য আমদানি করিতে সর্ব্বদা চীন যাতায়াত করিত। কথিত আছে, সে সময় ইউরোপীয বাণিজ্যের কোন অংশই এখানকার মত এত দ্রুত উন্নতি করে নাই।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জেণ্টল্‌ম্যান্‌স্ ম্যাগাজিনে নিম্নলিখিত বিবরণটী পাওযা যায়। ঐ শতাব্দীর প্রথমে সমগ্র ইউরোপ হইতে ৫০খানিও মালবাহী জাহাজ এখানে আসিত না। সে সময় ইংলণ্ড ১৪, ফ্রান্স ৫, হল্যাণ্ড ১১, ভিনিস ও জেনোসে



জলবিহার—ময়ূরপঙ্খী, লক্ষ্ণৌ

৯, স্পেন্ ৩খানি এবং অন্যান্য দেশ হইতে মোট ৬খানি জাহাজ পাঠাইয়াছিল। [illegible], ভিনিস্ ও

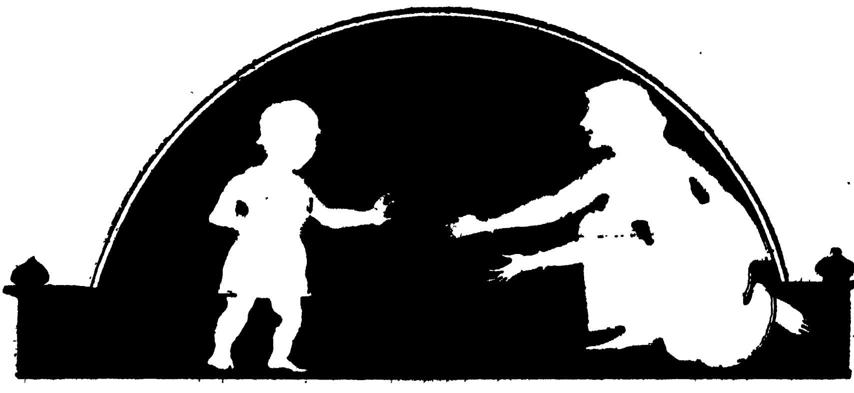
জেনোসে ৪ এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ মোট ৯খানি জাহাজ পাঠাইয়াছিল। যে সময় এই বিষয় লিখিত হইয়াছিল তৎকালে ইউরোপ হইতে মোট ৩০০খানি জাহাজ আসিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল ইংলণ্ড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত অর্থাৎ ৬৮খানি পাঠাইয়াছিল।

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের কথা এখন প্রায়ই দেশীয় সংবাদপত্রসম্পাদকগণ উত্থাপন করিয়া থাকেন। সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবসা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইহা বিশেষভাবে সতেজ হইয়া ওঠে এবং তখন হইতে এ কার্য্যে সেগুন কাঠের ব্যবহার আরম্ভ হয়। খিদিরপুর ডকে কাপ্তেন ওয়াটসন্ একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন এবং যেদিন উহা প্রথম গঙ্গাবক্ষে ভাসান হয়, সেদিন ওয়ারেণ হেস্টিংস্ ও তৎপত্নী তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যাপারের পর হইতে এখানকার জাহাজ প্রস্তুত-ব্যবসায়কে বিলাতের সমব্যবসায়ীগণ ঈর্ষান্বিত চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং ইহার নিবৃত্তির জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত আন্দোলন চালাইয়াছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি বিবরণে প্রকাশ আছে—ইহার দ্বারা জাতির—যাহার নিকট হইতে সনন্দপ্রাপ্তে তাহারা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাহার প্রকৃত অনিষ্ট এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষতি হইতেছে, যদি ইহা রোধ করা না হয় তাহা হইলে বৃটীশ ব্যবসায়ীগণের বৃটীশ মূলধন ভারতে নীত হইয়া ভারতে ডক্ ইয়ার্ড বৃদ্ধির পরিমাণের সহিত বৃটেনের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি, সেগুন কাঠের পরিবর্ত্তে বিলাতি ওক্ কাষ্ঠ যাহাতে ব্যবহৃত হয় সে চেষ্টাও হইয়াছিল।



বাগানবাড়ী হইতে কলিকাতার দৃশ্য

স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায়ের মধ্যে দর্জ্জির কাজ সে সময় বিশেষ লাভজনক ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদ ও টুপির ব্যবসায়েও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইত। আর একটি কাজ ছিল—সাহেবদের সমাধিক্ষেত্রের জন্য খোদিত প্রস্তর প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা। এই কার্য্যে এক একটি বর্ষার পর অর্দ্ধ লক্ষ টাকা দিয়া যাইত।



আখেরী

শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈত্র মাসের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়া তখনও তাহার আত্মমর্য্যাদায় বাধিতেছিল। আকাশ তখনও ধুম্রবর্ণ, কলিকাতার রাজপথে তখনও রীতিমত অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল।

এমন সময় বৃদ্ধ গোপাল নন্দী মাথার ছাতাটি বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার শ্রীমানীবাজারের দোকানে উপস্থিত হইলেন, পুত্র নরেন্দ্র তখন সেখানে ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়াই একজন কর্ম্মচারী হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া নূতন করিয়া হুঁকার জল ফিরাইয়া তামাকু সাজিয়া আনিয়া বৃদ্ধের হাতে দিল এবং নিজেও বিনীতভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

হুঁকা হাতে লইয়া কর্ত্তা সহাস্যে বলিলেন, কি হে নটবর, কাজকর্ম্ম করছো ত মন দিয়ে? নিজের শরীর গতিক—বাড়ীর ছেলেপুলেরা সব ভাল আছে?

নটবর একটু বিনয়ের হাসি হাসিয়া ঘাড়টি কাৎ করিয়া জবাব দিল—আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভাল আছে বাবু।

হরিচরণ পুরাতন লোক। কর্ত্তার হাতেগড়া। সে দোকানের খাতা লেখে। কি কাজে বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া কর্ত্তাকে দেখিয়াই হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা লইল। তারপর বলিল, আপনার ত আর দর্শনই মেলে না বাবু। এবার অনেক দিনের পর দোকানে পা'র ধূলো পড়েছে। আর এদিকেও এমন কাজের তাড়া, একদিন গিয়ে যে সব দেখে-শুনে আসবো, তারও মোটে উপায় নেই। প্রায়ই মনে করি, কিন্তু হ'য়ে আর ওঠে না, বড়বাবু যেন সবার নাকে দড়ি দিয়ে চরকির মত ঘোরাচ্ছে।

গদিতে বসিয়া আরাম করিয়া তামাকু টানিতে টানিতে কর্ত্তা হাসিয়া জবাব দিলেন, সে তো সুখেরই কথা হরিচরণ, দুঃখ কর কেন? কারবারের উন্নতি হ'লে তবে তো তোমাদেরও উন্নতি হবে হে? আমার এ বয়েসে কি আর আমি তোমাদের মত খাটতে পারতাম?

হরিচরণ প্রতিবাদ করিল, আজ্ঞে সেকথা আমি বলবো না; একরত্তি বেলা থেকে আপনার কাছে আছি। আর যা পরিশ্রম করতে দেখেছি আপনাকে!

নটবর কান খাড়া করিয়া আর একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নন্দী মশাই ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না হে না, সে যা করেছি তা করেছি। এখন আর সে শক্তিও নেই, আর বোধ হয় উৎসাহও নেই। এখন তোমরাই হচ্ছ আমার হাত-পা-চোখ-কান। কারবারটা ত খাড়া ক'রে দিইছি, এইবার নরেনের সঙ্গে মিলে-মিশে, যুক্তি-পরামর্শ ক'রে খেটে-খুটে নিজেদের উন্নতি কর, তা হ'লে তোমরাও বাঁচবে—আমরাও বাঁচবো।

লম্বা দোকান-ঘরের শেষ প্রান্তে যুগল কাঁটায় মাপিয়া চাউলের ওজন দিতেছিল। বস্তা বস্তা চাউল কুলিদিগের মাথায় বাহির হইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান দুইখানা প্রকাণ্ড লরীর উপর বোঝাই হইতেছিল।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, ওসব যাচ্ছে কোথায়?

হরিচরণ খাতা লিখিতে লিখিতেই জবাব দিল—আজ্ঞে, জাহাজ-ঘাটে। পাঁচশো বস্তা গেছে—আর এই পাঁচশো বস্তা বোঝাই হচ্ছে—

—জাহাজে? তার মানে?

—গেল বছর থেকে বড়বাবু দুটো জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করেছেন, তাদের সারা বছর যত চালের দরকার হবে, এখান থেকেই নেবে। ঘি-ময়দাও সময়ে সময়ে নেয় তারা। মস্ত বড় কাজ বাবু। অর্ডারটা হাতগত করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। বহুৎ আড়ৎদার এর জন্যে ঘোরাঘুরি করে। তবে বড়বাবু নাকি বড় সেয়ানা—আর ফিকিরে, তাই পেরেছেন। টাকাও সঙ্গে সঙ্গে।

নরেন্দ্র কোনও দিন তাঁহাকে একথা জানায় নাই। তাহা হইলেও তিনি মনে মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কিন্তু বলিলেন, মহাজনদের ঘরে দেনা থাকছে না ত? সেদিকে খাড়া থেকো হরিচরণ। তুমিই ত তাকে একরকম কাজকর্ম্ম শিখিয়ে মানুষ করেছ। তাকে

বলো, কাজ বাড়াক্ তাতে ক্ষতি নেই, সবই ত আমি ওর হাতে ছেড়ে দিইছি। আর দুটো ছেলে ত এখন নেহাৎ নাবালক। কিন্তু হিসেবপত্র যেন ঠিক থাকে। আর মহাজনদের খুশী রাখতে পারলে তবে সব দিক বজায় থাকবে, এটি যেন সে না ভোলে।

নটবর এতক্ষণ কান খাড়া করিয়া কথাগুলা গিলিতেছিল। বলিল, সেদিকে বড়বাবু হুঁসিয়ার কর্ত্তা মশাই। চারিদিকে এত খাতির জমিয়ে ফেলেছেন যে, শুধু একটা মুখের কথায় হাজার হাজার টাকার মাল তারা ছেড়ে দেয়।

কর্ত্তা বলিলেন, বেশ বেশ। দেনা না দাঁড়ালেই হ'ল।

তারপর দোকানের সকল কর্ম্মচারীর সহিত আত্মীয়তা ও গল্পগুজবে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করিয়া আরও দুই ছিলিম তামাকু সেবন করিয়া গোপাল নন্দী উঠিলেন। বলিলেন, তাহ'লে আজ চললুম হরিচরণ। নরেনের ফিরতে বোধ করি সন্ধ্যে হয়ে যাবে। এখনো বেলা আছে। কোলকাতার রাস্তা, তায় বুড়ো মানুষ। এইবেলা যাই আস্তে আস্তে। বাজারেও একটু বরাৎ আছে। তাকে বলো, এবার অনেক দিন সে বাড়ী যায়নি—তার মা ভারি কাতর হয়েছেন। একবার যেন গিয়ে দেখা দিয়ে আসে।

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে তা বলবো বাবু। কিন্তু কদ্দুর হয়ে ওঠে সেকথা বলতে পারি না। আখেরীর জন্যে এবার তিনি বড্ড ব্যস্ত। কথা কইবারই ফুরসুৎ পাই না, সব সময়েই বাইরে আছেন; এখানে দোকানের কাজকর্ম্ম মেটাতে ত'বিল বোঝাতে আমাদেরও অনেক রাত্তির হ'য়ে যায়।

কর্ত্তা বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বৌমাও বলছিলেন সেকথা। আগেই ওখানে গেছলুম কি-না। বেটী আবার জোর করে খাইয়ে দিলে। শুনলুম নরেন সকাল আটটায় খেয়ে বেরোয়, আর বাসায় ফেরে রাত্তির বারোটা-একটায়! তা সে যাই হোক বাবা, আমি ব্যাপারটা বুঝলেও মায়ের প্রাণটা উতলা হয় কি-না, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো, যেন একটি দিন গিয়ে দেখা দিয়ে আসে—

হরিচরণ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

তাহার পর কর্ত্তা তহবিল হইতে পঁচিশটি টাকা চাহিয়া লইয়া পিরাণের উপর আধ-ময়লা উড়ানিখানি গুছাইয়া ছাতাটি বগলে করিয়া ধীরে ধীরে দোকান হইতে বাহির হইলেন। সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল।

২

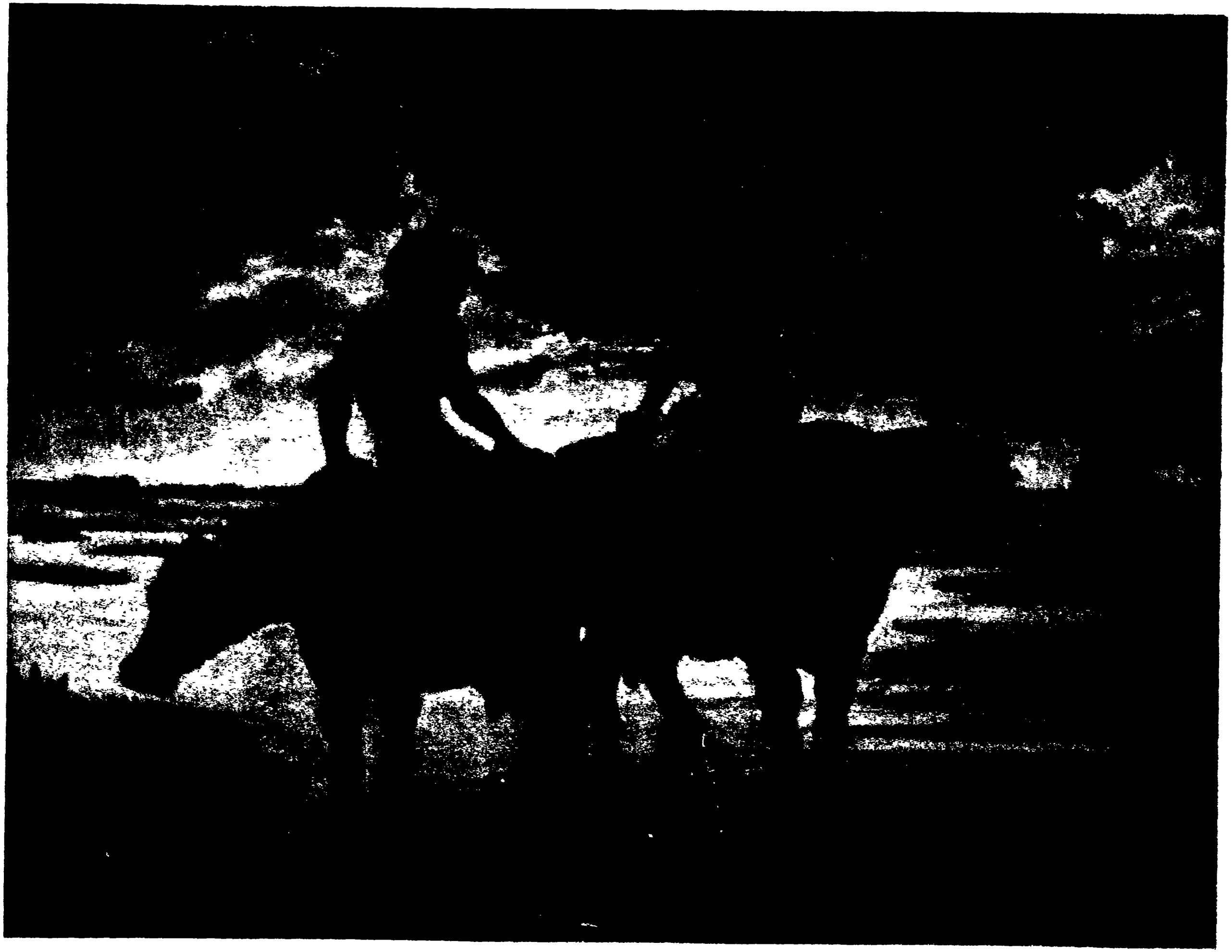
গোপাল নন্দী অনেক দিনের পর কলিকাতায় আসিয়াছেন। উপযুক্ত পুত্রের হাতে সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই গ্রামের বাড়ীতে থাকেন; কাজেই যখন-তখন আসা হইয়া ওঠে না। ইচ্ছা আছে, পাঁচটা জিনিষপত্র কিনিয়া বাড়ী ফিরিবেন। সেজ ছেলে শম্ভু কিছুকাল হইতে আব্দার ধরিয়াছে, তাহার একজোড়া হাপ্ প্যাণ্ট, একজোড়া রঙিন গেঞ্জি, আর একটা ফুটবল চাই। নহিলে স্কুলের ছেলেরা বড় ঠাট্টা তামাসা করে।

ছোট ছেলে দুলাল তার গর্ভধারিণীর মারফত সুপারিশ করিয়াছে—একটা ফাউণ্টেন্ কলম তার না হইলেই চলিবে না। হাতঘড়ি একটা হইলে আরও ভাল হয়। রায়-বাবুদের ছেলেরা প্রায়ই টিট্‌কারি দিয়া বলে—'তোরা সব দোকানদারের জাত কিনা, তাই পয়সা থাকতেও খরচ করিস্ না; তাহাতে দুলালের মাথা হেঁট হইয়া যায়, অথচ তারাই আবার যখন-তখন ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইতেও ছাড়ে না!

বলিয়া আসিয়াছেন এবার দুলালের জন্য কলম কিনিয়া লইয়া যাইবেন। আর আখেরীর হিসাব-নিকাশ মিটিয়া গেলে নরেনকে বলিয়া একটা হাতঘড়িও কিনিয়া দিবেন। কতই বা আর দাম? সত্যই ত। আমাদের যুগে ওসব ছিল না বলিয়াই কি এখনকার দিনে তা চলে? পাঁচজনের দেখে শুনেই ত ইচ্ছা হয় ছেলেদের? আর যখন দেবার মত অবস্থা আছে, তখন না চাইবেই বা কেন?

বাজার হইতে বাহির হইয়া এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতেই বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আসিয়া বড় রাস্তায় পড়িলেন। সোজা ফুটপাথ ধরিয়া আরও খানিক অগ্রসর হইয়া এইবার রাস্তাটা পার না হইলেই নয়। ওদিককার ট্রাম ধরিতে হইবে।

উঃ! প্রতি বছরই যেন শহরের মূর্ত্তি বদ্‌লাচ্ছে! ঘোড়ার গাড়ী ত দেখছি উঠেই গেছে। সতেরখানা মোটর, ট্যাক্সি, আর বাস্ গেলে তবে একখানা ঘোড়ার গাড়ী চোখে পড়ে। দেশের গাড়োয়ানদেরও মাথা খেলে আর কি?



শারদ প্রাতে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ওদিকে ত গরুর আর মোষের গাড়ী জাহান্নমে যেতে বসেছে। মাল বোঝাই বিলিতী লরীগুলো যেন হু-হু-শব্দে ছুটে চলেছে—গরীব বেচারাদের বুকের উপর দিয়ে। এতে আর চুরি ডাকাতি রাহাজানি করবে না ত কি! খেয়ে পরে' বাঁচতে হবে ত? নদীতে আর নৌকো খেলে না! মাঝীমাল্লারা পেটের দায়ে জনমজুর খাটছে!

পর পর সারি সারি ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-লরী ছুটিতে দেখিয়া রাস্তা পার হইবার জন্য নন্দীমশাই ফুটপাথের নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়া আবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তারপর এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অতি সাবধানে পার হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

মাঝখান বরাবর গিয়াই হঠাৎ একসঙ্গে বহু লোকের চীৎকার আর গোলমাল কানে আসিতেই বৃদ্ধের মাথাটা যেন কেমন ঘুলাইয়া গেল, দুর্ব্বল পা দুটাও যেন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কি এমন ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বেই পিছন দিক হইতে একটা ভীষণ নিদারুণ গোছের ধাক্কা খাইয়া বৃদ্ধ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেলেন। এক লহমার জন্য কেবল মাত্র মনে হইল—যেন সমস্ত পৃথিবীটাই দুলিয়া উঠিল—আর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত দুর্ভেদ্য কালো অন্ধকার তাঁহাকে কোথায় তলাইয়া দিল!

বিক্ষুব্ধ জনতার ভিতর হইতে কয়েক ব্যক্তি যখন গোপাল নন্দীর রক্তাপ্লুত সংজ্ঞাহীন দেহটা উদ্ধার করিয়া অপর একখানা চল্‌তি ট্যাক্সিতে চাপাইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত মেডিকেল কলেজে লইয়া গিয়া হাজির করিল, ঠিক সেই সময় নরেন্দ্র তাহার দোকানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে হরিচরণকে বলিতেছিল:

—কেন তুমি আমাকে না বলে কয়ে আজ কর্ত্তাকে টাকা দিলে?

হরিচরণ অতিশয় নম্রভাবেই কৈফিয়ৎ দিল—শহরে এলে যখন তাঁর টাকা-কড়ির দরকার হয়, তখন আপনিও ত এই ত'বিল থেকেই দেন, তাই আমিও দিইছি; এতে দোষটা কি হ'ল বাবু?

নরেন্দ্র মুখ খিঁচাইয়া মেঝের উপর সজোরে একটা লাথি মারিয়া বলিল—সে আমি নিজে যা বুঝি, করি। তোমায় ত কোন দিন দিতে বলিনি। তুমি আমার হুকুমের চাকর, —বার ক'রে দিতে বললে তবে দেবে। এখনও দু'মাস হয় নি আমি একশো টাকা পাঠিয়েছি সংসার খরচের জন্যে, তা জানো? আমার টাকাগুলো কি খোলামকুচি, তাই নয়-ছয় করছো? তার ওপর এটা আখেরীর মাস, মনে নেই? বুড়ো, মরবার বয়স হ'ল, এ বুদ্ধিটুকুও ঘটে নেই?

প্রৌঢ় হরিচরণের কান দু'টা রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু যথাসাধ্য আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল, পঁচিশটে টাকা বইত নয় বাবু, কেন আপনি মিছে রাগারাগি ক'রছেন? কর্ত্তা মুখ ফুটে চাইলেন, আমি কি দেবো না বলতে পারি? আপনিই বেশ ক'রে ভেবে দেখুন না, তিনিই ত আমাদের মনিব, আমরা তাঁরই ত কর্ম্মচারী—

যেন বারুদের স্তূপে অগ্নি-সংযোগ হইল! এক মুহূর্ত্ত-মাত্র চুপ্ করিয়া থাকিয়া দোকান-ঘর প্রকম্পিত করিয়া নরেন্দ্র বলিল—কি বললে? তুমি তা হ'লে আমায় মনিব বলে' মানতে চাও না? আরে গেল! স্পর্দ্ধা ত কম নয়! বেশ, তবে আজই হেস্তনেস্ত হ'য়ে যাক্; তোমার হিসেব-নিকেশ কর;—আমি তোমায় জবাব দিলুম।—বলিয়াই রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল।

যুগল দরজার পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—দাদা, খামোকা বাবুকে চটালে? যা বলছে বলছে, চুপ্ ক'রে থাকলেই হ'ত? বাবুর মেজাজেরও ত এখন ঠিক্ নেই!

নটবর একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ একটু মুচকি হাসিয়া ঘাড়টি ঈষৎ কাৎ করিয়া বলিল—হরিবাবু, এতটা বয়েস হ'ল, এখনো হাওয়া ধ'রে চলতে শিখলে না? আমরা হলাম আদার ব্যাপারী, কাজ কি অত ঝামেলায়? যার হাতে মাইনে পাই, সেই হ'ল মনিব। বুড়ো কর্ত্তা যখন দোকান দেখতো, তখন তার হুকুম তামিল করিছি। এখন বড়বাবুই মালিক—কী বল হে যুগল?

যুগল কোনও জবাব দিল না। কিন্তু হরিচরণ নটবরের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—বল্‌লি কি রে নটবর! তোর মুখ থেকে এই কথা বেরুলো? মালিক যে, সে-ই আছে; বুকের রক্ত দিয়ে যে গোপাল নন্দী এতবড় কারবার খাড়া করেছে—

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একজন ভদ্রলোক হন্তদন্ত ভাবে আসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—এইটাই কি গোপাল নন্দীর গদি মশাই?

সকলেই সচকিত হইয়া লোকটির দিকে চাহিল। নটবর জবাব দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—কি চান্ আপনি ?—

লোকটি হাঁপাইতেছিল। বলিল—চাই না কিছু মশাই। খবর দিতে এলুম, একজন বুড়ো-মতন লোক এই খানিক আগে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ওপর লরী-চাপা পড়েছে। লেগেছে সাংঘাতিক—বাঁচে কি না বাঁচে। সবাই মিলে তাকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেছে। শুনলুম—তার নাম নাকি গোপাল নন্দী। আপনাদের বলে গেলুম—যদি কিছু করতে হয় করুন।—বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

আকস্মিক সংবাদে সকলেরই যেন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। লোকটি চলিয়া যাইবার পর চৈতন্ত ফিরিয়া আসিল। হরিচরণের মুখেই প্রথম কথা বাহির হইল, বলিল—ওরে, বড়বাবু বোধ করি এখন বাসাতেই গেছে। যা-যা শীগ্‌গীর খবর দিগে, সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝি! আমি চললুম কালেজে—তোরা দোকান টোকান বন্ধ কর্।—বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি খাতাপত্র গুছাইয়া, লোহার সিন্দুক বন্ধ করিয়া, চাবির গোছাটা কোমরে গুঁজিতে গুঁজিতে—আর কোনও দিকে না চাহিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

দোকানের মধ্যেও তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল। যুগল ছুটিল বাসায় খবর দিতে। নটবর লোকজন ডাকিয়া চারিদিক্‌কার দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইতে সুরু করিল। দেখিতে দেখিতে আশপাশের সমস্ত দোকানী-পসারী আসিয়া জড় হইল; জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল; কিন্তু তখন কেই বা কাহার কথার জবাব দেয়!

৩

নরেন্দ্রের বাসায় তাহার শ্বশুর আসিয়াছিল। প্রত্যহই সন্ধ্যার পর শ্বশুর মহাশয় কন্তা-জামাতার সংবাদ লইতে আসে। জামাতাকেও নানারূপ সলা-পরামর্শ দেয়। শীলেদের সেরেস্তায় মুহুরির কাজ করে—অনেকদিনকার পুরাতন আর পাকা মুহুরি। নাম রাখাল সামন্ত।

লম্বা একহারা চেহারা। গায়ের রং ফরসাও বলা চলে, ময়লাও বলা চলে। কেমন যেন রোদে পোড়া তামাটে গোছের। মাথার চুলগুলি লালচে—আর চোখ দুটি অত্যন্ত কটা—দাড়ি এবং গোঁফ বেশ নিখুঁতভাবে কামানো—বোধ হয় প্রত্যহই ক্ষৌরকার্য্য করা হয়। মুখের স্থানে স্থানে এবং বুকে পিঠে অসংখ্য ছুলির দাগ। খালি গায়ে একখানি উড়ানি ঠিক পৈতার মত করিয়া ফেলা থাকে বলিয়াই সেগুলি নজরে পড়ে। বারোমাসই পায়ে থাকে একজোড়া সস্তা ক্যাম্বিসের জুতা—তার চারিদিকেই চামড়ার তালি মারা।

যুগল যখন বাসায় উপস্থিত হইল, তখন রোয়াকের এক-ধারে শ্বশুর ও জামাতা মুখোমুখী বসিয়া নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। খানিকটা তফাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের কাছে বসিয়া নরেন্দ্রের স্ত্রী আপনমনে কুটনা কুটিতেছিল।

যুগলকে হঠাৎ এ সময় আসিতে দেখিয়াই শ্বশুর কথা বন্ধ করিল এবং নরেন্দ্রও বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিল। কিন্তু বিপদের বার্ত্তা শুনিয়াই তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাখাল সামন্তর মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না—কেবল তাহার দক্ষিণ চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত হইল মাত্র। এটি তাহার মুদ্রাদোষ বলিলেই চলে; কোনওরূপ বিশেষ ঘটনা ঘটিলেই রাখাল সামন্তর ভ্রূ এবং চক্ষু কুঞ্চিত হইতে দেখা যায়।

নরেন্দ্র উঠিবার উপক্রম করিবামাত্র তাহার শ্বশুর তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—যাও কোথায় ?

আবেগ কম্পিত স্বরে নরেন্দ্র বলিল—কালেজে—অবস্থাটা—

রাখাল ভ্রূকুটি করিল—সে তো যেতেই হ'বে। হরিচরণ যখন আগেই গেছে, তখন অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া নরেন্দ্র কহিল, তবে যাবো না ?—

—পাগল না-কি! মাথা ঠিক কর। মাথা ঠিক কর। যাবো ত বটেই। আগে এদিকের সব বিলি-বন্দেজ্ করি, দাঁড়াও। যুগলকে এখুনি তোমাদের বাড়ী পাঠাও, তোমার মা-ঠাকরুণ আর ভাইদের আগে খবরটা দাও। ক' ক্রোশ হ'বে তোমাদের গ্রাম ? ক্রোশ পনের ষোল—এর বেশী নয়। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ও বেরিয়ে পড়ুক—তাদের এনে ফেলুক। কি হে যুগল, সঙ্গে টাকা-কড়ি কিছু আছে তোমার ?—

—আজ্ঞে না।—তখনও যুগলের কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

—দোকানের সিন্দুকের চাবি কোথায় ?

বিহ্বলভাবেই সে বলিল, আজ্ঞে—চাবি—

প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া রাখাল বলিল—হ্যাঁ, চাবি, লোহার সিন্ধুকের চাবি। কার কাছে আছে?

—আজ্ঞে হরিচরণ সঙ্গে ক'রেই কালেজে নিয়ে গেছে। আমি নটবরকে বলে' এসেছি দোকান বন্ধ করতে। তারাও এলো বলে।

রাখাল বলিল, তা বেশ করেছ। নাও, এখন এই দশটা টাকা কাছে রাখো। চট্ ক'রে একখানা মোটর নিয়ে যাবে, বেয়ানকে আর ছেলেদের—যেমন অবস্থাতেই থাকুক—তাদের সকলকে নিয়ে সরাসরি মেডিকেল কালেজে এনে হাজির করবে। আমরা সেইখানেই থাকবো, বুঝলে? যেতে-আসতে কতটা দেরি হ'বে মনে কর? নাও, চট্ ক'রে কথার জবাব দাও—

মাথা চুলকাইয়া যুগল বলিল, তা কেমন ক'রে জানবো? পাড়া গাঁ, সব জায়গার রাস্তা ত আর ভাল নয়। আর গুছিয়ে গাছিয়ে তাঁদের আসতেও সময় লাগবে—

রাখাল বলিল, আচ্ছা, যাও চট্ ক'রে'—অত বাজে বক্‌তে হ'বে না। যত শীগ্‌গীর পারো, এসো। নটবরকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে যাও, সে এলে তবে আমরা বেরুবো।

যুগল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নরেন্দ্র হতভম্বের মতই দাঁড়াইয়া রহিল—কি যে হইয়াছে, তাহা যেন সে ধারণাই করিতে পারিতেছিল না। আর তাহার স্ত্রী বঁটি ও কুটনার সামগ্রী একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া চোখে আঁচল দিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল।

জামাতাকে একটা ঠেলা দিয়া রাখাল বলিল, এইবার শক্ত হ'তে হবে বাবাজী, এমন মুষড়ে পড়লে এখন চলবে না—

—আজ্ঞে না, কি করবো বলুন?

—বলবো, বলবো বাবাজী, সব বলবো। নটবর এসে পড়লেই তাকে এখানে রেখে আমরা যাই চল।

কন্যা বলিল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো বাবা—

—দূর পাগ্‌লী, তুই কোথায় যাবি? আগে আমরা দেখে আসি।

—না বাবা, যদি আর দেখতে না পাই? আমায় যে তিনি বড্ড ভালবাসেন গো। আজ কোলকেতায় এসে আগেই তিনি আমায় দেখতে এসেছিলেন! একাদশীর দিন দিনের বেলা তিনি ফল খান্, আমি জোর ক'রে লুচি ভেজে খাইয়েছি। আমি যাবো বাবা—আমায় নিয়ে চল।

রাখাল বলিল, বেটীর কথা শুনেছ? আরে পাগলী, ব্যাটার বৌকে কোন্ শশুর না ভালবাসে? এটা আর নতুন কথা কি শোনালি? অবস্থাটা কেমন, আগে আমরা দেখিগে, তারপর এসে তোকে নিয়ে যাবো। এখন যা বলি শোন্, তোকে বাসায় থাকতে হবে—গোলমাল বাধাস্‌নে কাজের সময়।

বাপের কথাগুলি সরল হইলেও বলিবার ভঙ্গি ততটা সরল নয়, বরং রীতিমত কড়া। তাছাড়া, বাপ্‌কে সে বিলক্ষণই চেনে। সুতরাং মনের কষ্ট মনে চাপিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

দুইজন চাকর সঙ্গে করিয়া নটবর আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া রাখাল বলিল, আমি আর তোমার বাবু কর্ত্তাকে দেখতে চল্লাম। তুমি চাকর দুটোকে নিয়ে এখানেই থাকবে। যতক্ষণ না আমরা কেউ ফিরি, বাসা থেকে একটি পা নড়বে না, বুঝলে?

রাখালের সহিত নটবরের অনেক দিনেরই জানা শোনা। একগ্রামের লোক, তাছাড়া সে রাখালের খাতক।

একটু ঘাড় হেলাইয়া নটবর বলিল, আজ্ঞে না, কোথাও যাবো না।

—শুধু তাই নয়, আরও শোন।—বলিয়া রাখাল তাহার একেবারে কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল, আজ সব জায়গায় তাগাদা সেরে জাহাজ কোম্পানির কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা আদায় ক'রে—প্রায় ত্রিশহাজার টাকা নিয়ে তোমার বাবু ফিরছিলো। সব নোট, কাঁচা টাকা মোটে ছিল না, বুঝলে?

নটবর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে।

রাখাল বলিয়া চলিল, এমন সময় পথে বাপের সঙ্গে দেখা। আখেরীর মুখে অনেক টাকারই দরকার হবে; সেই সব ভেবে, নিজের কাছে না রেখে নরেন্দ্র বাপের হাতে টাকাগুলো দিয়ে এখনকার মত বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখতে বলেছিল। পরে সময় মত আনতো। কর্ত্তা সেইসব টাকা নিয়েই ঘরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এই লরী-চাপা পড়ার দুর্ঘটনা, বুঝলে?—মনে থাকবে?

শুনিতে শুনিতে নটবরের প্রকাণ্ড বদন আর দুই চক্ষু ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল। রাখাল থামিতেই সে

তাহার অভ্যাস মত ঘাড়টি কাৎ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া জবাব দিল, যে আজ্ঞে, থাকবে।

—শোন, আরও কথা আছে।

—বলুন।—নটবর কানটি আগাইয়া দিল।

রাখাল বলিল, দোকানের সিন্ধুকে কত টাকা ছিল তা তুমি জান না। তবে লরী-চাপা পড়ার খবর আসা মাত্রই হরিচরণ তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ভেতর থেকে কি যেন সব বা'র ক'রে নিয়ে সিন্দুক বন্ধ ক'রে—মায় চাবির গোছা শুদ্ধু ট্যাঁকে গুঁজে বেরিয়ে গিয়েছিল। এসব তুমি নিজের চোখে দেখেছ, কেমন?

—যে আজ্ঞে।—বলিয়াই নটবর হঠাৎ কি ভাবিয়াই আবার বলিল—বেশ, তা যেন হ'ল, কিন্তু যুগলও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সামন্ত মশাই।

মুখে একটা শব্দ করিয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রাখাল বলিল—সে কথা তোমার ভাববার দরকার নেই। তোমাকে যা যা বললুম, যেন মনে গাঁথা থাকে।

—আজ্ঞে, তা ঠিক্ থাকবে।

তারপর রাখাল সামন্ত নটবরের নিকট হইতে দোকানের চাবি লইয়া কন্যাকে দুই-চারিটি মিষ্ট কথায় খুব সতর্ক থাকিতে বলিয়া নটবর আর চাকর দুইজনকে বাসায় পাহারা থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া জামাতার হাত ধরিয়া পথে বাহির হইল।

কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, দোকানের লোহার সিন্দুকের দোসরা চাবিটা সঙ্গে আছে ত? বাসায় ফেলে আসনি?

জামাতা বলিল, না, কাছেই আছে।

—ও চাবির কথা আর কেউ জানে?—

—আজ্ঞে না, আপনার মেয়েও নয়।

—ভ্যালা মোর বাপ্‌রে! এইত বুদ্ধিমানের কাজ। কতটাকা সিন্দুকে আছে?

একটু ভাবিয়া নরেন্দ্র বলিল, নোট আছে হাজার টাকার, সব দশ টাকার নোট; আর খুচরো আছে সাতার টাকা। আমি জানি তা থেকে আর কিছু খরচ হয়নি।

—বেশ, তবে আগে দোকানে চল।—ওখানকার কাজ মিটিয়ে, কালেজে যাবার জন্যে একখানা গাড়ী করা যাবে—এসো।

৪

পথে ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে জামাতার সঙ্গে রাখালের আর কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কি-না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে গাড়ী যখন মেডিকেল কালেজের ফটক পার হইয়া যথাস্থানে তাহাদিগকে নামাইয়া দিল, তখন নরেন্দ্রর মুখের আগেকার সেই বিষণ্ণ বিবর্ণ ভাবটা অনেকখানি কাটিয়া গেছে।

গাড়ী হইতে নামিয়াই রাখাল সামন্ত আর একবার জামাতার হাতটা নিজের মুঠার মধ্যে লইয়া তাহাতে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া কানের কাছে বলিল, বাবাজী, মুষড়ে পড়ো না। ভগবানকে একমনে ডাকলে তিনি সব দিকেই সুরাহা করে' দেন। কর্ত্তা বেঁচে উঠলেও ভয় পাবার বা চিন্তা করবার কোনও কারণ নেই। 'বোড়ের চাল' আমি দিয়ে রেখেছি। দরকার হ'লে নটবর তোমার জন্যে হাসিমুখে জেল খাটতেও রাজী হ'বে, ভেবো না। কেবল এইটুকু স্মরণ রেখো, জীবনে কদাচিৎ এমন সুযোগ আসে, আর মা-লক্ষ্মীর আগমন গোপনেই হয়, বাঁকা পথ ধরেই; জান ত, লক্ষ্মীপুজোয় কাঁসর-ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাজাতে নেই—

আর অধিক কথা কহিবার সুযোগ মিলিল না। এমারজেন্সি ওয়ার্ড-এর কাছাকাছি হইবামাত্র, হরিচরণ ছুটিয়া আসিয়া নিতান্ত ব্যাকুলভাবে সংবাদ দিল—বাবুগো, কর্ত্তামশাই বুঝি আর রক্ষে পেলে না। একদম জ্ঞান নেই! পাঁজরের ওপর দিয়ে লরীর চাকা চ'লে গেছে! আগের ভাগে এসে পড়েছিলুম বলেই যা একবার লুকিয়ে দেখে নিইছি—সে কি চেহারা! হাড় সব গুঁড়িয়ে গেছে! ডাক্তাররা আর কারুকে যেতে দিচ্ছে না—

শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রের চোখের কোণে একবিন্দু জল দেখা দিয়াই তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরাইয়া লইল।

রাখাল সামন্ত বার দুই গলা ঝাড়িয়া লইয়া তারপর আবেগ রুদ্ধ স্বরে বলিল—বাবাজীর মা আর ভাই দু'টিকে আনতে পাঠিয়েছি। আমরাও এসে পড়েছি, ভয় নেই। কিন্তু তোমাকে যে এখুনি একটি কাজ করতে হ'বে বাবা হরিচরণ।—

হরিচরণ বলিল, আজ্ঞে করুন। আমার প্রাণটা দিলেও যদি কর্ত্তাবাবুকে ফেরানো যায় আমি তাও করবো সামন্ত মশাই।—বলিতে বলিতেই সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাখাল একটা প্রকাণ্ড দমকা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—প্রাণ দিলেই যদি প্রাণ পাওয়া যেতো রে বাবা হরিচরণ, তা হ'লে কর্ত্তার জন্যে প্রাণ দেবার লোকের অভাব হবে না রে! বুকটা নাকি খুলে দেখাবার নয়, তাই; যাক্, সে সব কথা কইবার এখন সময় নয়! আগে তুমি চট্ ক'রে একবার দোকানে যাও দিকি—

আগ্রহের সহিত হরিচরণ বলিল—এখুনি যাচ্ছি, কি ক'রতে হ'বে বলুন?

—সিন্দুকের চাবি কার কাছে আছে?—

—আজ্ঞে, আমার কাছেই আছে, এই যে—

—এখন টাকার ছিনিমিনি খেলতে হ'বে বাবা। মায়া করতে গেলে ত চল্‌বে না। তুমি যতটা পারো, দোকানের ত'বিল থেকে নিয়ে এসো। দাও বাবাজী, দোকানের চাবিটা হরিচরণকে দাও। নটবর বন্ধ ক'রে এসে তোমার হাতেই দিলে যে—বাসায় ফেলে এসোনি ত? আহা! বেচারীর কি মাথার ঠিক আছে! কই, কোথায় রাখলে চাবি?—

নরেন্দ্র নিঃশব্দে হাতটি বাড়াইয়া দিল। কথা সে কহিতেই পারিতেছিল না। হরিচরণ তাহার হাত হইতে চাবি লইয়া আপনা হইতেই বলিল—ত'বিলে মোট হাজার আর সাতান্ন টাকা আছে, বৈকালে দেখে রেখেছি। এখন কত আনবো সামান্ত মশাই?—

রাখাল বলিল—সব—সব—ও আর রাখারাখি নয়, সব নিয়ে এসো। এখানে এখন টাকা ছড়াতে হবে; এর নাম মেডিকেল কালেজ, তবে যদি কিছু সুবিধে করতে পারা যায়! কদ্দিন এখন থাকতে হবে, বলা ত যায় না। যাও বাবা, আর বিলম্ব করো না, আমাদের হাতে একটা পয়সাও নেই। দশটি টাকা আমার কাছে ছিল, যুগলকে দিয়ে দিয়েছি ওদের আনবার জন্যে। এসো বাবাজী, আমরা ততক্ষণ ভেতরে যাই। দেখি চেষ্টা ক'রে; যদি কর্ত্তাকে একবার চোখের দেখাটাও দেখতে দেয়।—এই বলিয়া নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া তাহাকে একরকম টানিয়া লইয়াই রাখাল ভিতরে চলিয়া গেল। আর হরিচরণ উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিল দোকানের দিকে—

৫

রাত্রি বারোটা নাগাৎ যুগলের সঙ্গে নরেন্দ্রর মা আর ভাই দুটি আসিয়া পৌছিল। রাখাল সামন্ত যেন প্রস্তুত হইয়াই ইহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধা গাড়ী হইতে নামিতে না নামিতে রাখাল সামন্ত জামাতাকে পিছনে রাখিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিল, কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—এসেছ বেয়ান? এসো, এসময় তোমায় আর কি বলবো বল! সেই যে কথায় বলে না—কারো সর্ব্বনাশ, আর কারো পৌষ মাস! বরাৎ-ক্রমে তাই হয়েছে। আমরা এদিকে কর্ত্তাকে নিয়ে করছি ছুটোছুটি, মাথায় জ্বলছে আগুন! আর এই সুযোগে কি-না—ওই নেমোখারাম হরিচরণ ব্যাটা—পাজী ব্যাটা—ছুঁচো ব্যাটা, দোকানের লোহার সিন্দুক থেকে দেখাশোনা হাজার টাকা বেমালুম সরিয়ে ফেললে! উঃ! এখনো দিনরাত হচ্ছে, এখনো চন্দর সুয্যি উঠছে! হা রে—বিশ্বাসঘাতক শয়তান!—

যাহার উদ্দেশে এতগুলি কথা রাখাল সামন্ত বলিল—সেই গোপাল নন্দীর স্ত্রী, নরেন্দ্রর মায়ের মুখে কোনও কথাই ফুটিল না। তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বৈবাহিকের মুখের পানে শুধু চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল সামন্ত উস্‌খুস্ করিতেছিল। তাল জুড়াইয়া যায় দেখিয়া রাখাল সামন্ত বলিল—বাবা নরেন, এখানে পাঁচজন রয়েছে, মাকে তোমার ওদিকে নিয়ে গিয়ে বসাওগে। এমন জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না এ সময়। মান-ইজ্জৎ ব'লেও ত একটা আছে? যাও বাবা, শক্ত হও—সাহস সঞ্চয় কর। আমি ততক্ষণ ছুটে গিয়ে একবার ওদিককার খবরটা নিয়ে আসি।—বলিতে বলিতেই মহা ব্যস্ততার সহিত সে ছুটিয়া গেল। তাহার গায়ের চাদরের একটা প্রান্ত সিঁড়ির উপর লুটাইতে লাগিল।

শ্বশুর চলিয়া গেলে নরেন্দ্র তাহার মা ও ভাইদের একটু দূরে—অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল, সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর বাবার সঙ্গে দেখা হ'তেই—

যুগলও পিছনে পিছনে যাইতেছিল। বিস্মিতভাবে

জিজ্ঞাসা করিল, বিপদের আগে কর্ত্তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল বড়বাবু?—

নরেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হয়নি! আমি যে ধনেপ্রাণে গেলাম যুগল! অন্য সব তাগাদা সেরে, তারপর জাহাজ কোম্পানির চেক্ ভাঙ্গিয়ে মবলক তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে আমি ফিরছিলাম। সব নতুন করকরে নোট যুগল, এই এতখানি মোটা বাণ্ডিল! ওরে বাপ্ রে!—

যুগল বলিল, তারপর!

—তারপর আমার মাথা আর মুণ্ডু! বাণ্ডিল শুদ্ধ বাবার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এসেছো যখন এ টাকাটা বাড়ী নিয়ে যাও, আখেরীর মুখে আনবো, গদিতে রাখলে আর কোন বাবদে যদি কিছু খরচা হয়ে যায়, তখন মুশকিলে পড়বো!—তখন কি জানি সব দিক থেকে আমার কপাল ভেঙ্গেছে!

মা এবং ভাইয়েরা শুষ্ক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যুগল আগ্রহের সহিত বলিল, কিছু হদিস্ মিল্লো বাবু টাকাটার?

কপালে করাঘাত করিয়া নরেন্দ্র বলিল—কিছু ত দেখছি না। ডাক্তাররা এত চেষ্টা করেও এখনো বাবার জ্ঞান আনতে পারেনি—তিনি একটা কথা পর্য্যন্ত ক'ননি! আর যারা তাঁকে এখানে এনেছিল, তারা পথের পথিক;—নাম বা ঠিকানা যদিও বা কারো লেখা থাকে, সে এখন অগাধ জলে; কেই বা সন্ধান করে! ততদিনে হজম করে ফেলবে—সব দশটাকার নোট! চেকের নম্বর থাকলেও বা যে সব থেকে আদায় করেছিলুম, তার হিসাব থাকলেও নোটের ত আর নম্বর নেই!

—তাই ত বাবু—

—আমারই পাপের ফল যুগল, আমারই পাপের ফল! যাঁহলে ত্রিশ হাজার টাকা যাঁর হাতে তুলে দিতে পেরেছিলুম, এমনি আমার দুর্ব্বুদ্ধি যে পঁচিশটে টাকা নেয়া তাঁর সহ্য করতে পারিনি—হরিচরণকে জবাব পর্য্যন্ত দিতে গেছলুম! এবার বাজারের লহনা আর আখেরীর ভাবনা আমার পাগল ক'রে দিয়েছে—

—হরিচরণের ব্যাপারটা কি বাবু? আমি ত সন্ধ্যের পরই এঁদের আনতে গেছলুম, কিছুই ত জানি না—

—বলো না, বলো না যুগল, ও নেমোখারামটার নাম মুখে আনলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়! দোকানের সিন্দুকের চাবি নিয়েই ও এখানে ছুটে এসেছিল, তা ত জান তোমরা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত জানি—

—আমরা এখানে এসেই ওকে পাঠালাম, ত'বিল থেকে সব টাকা আনতে, কারণ আমাদের কাছে কিছুই ছিল না; আর এখানেও বিস্তর টাকার দরকার। নিজের মুখে ব'লে গেল—সিন্দুকে একহাজার সাতান্ন টাকা আছে। কিন্তু এই আসে, এই আসে ক'রে আমরা পথ চেয়ে বসে' আছি, দু'টি ঘণ্টা কাটিয়ে ফিরে এসে বললে—মোটে সাতান্ন টাকা ত'বিলে আছে—বাকি হাজার টাকার এক কড়া নেই!—

—নেই!

—না। তা হ'লে তুমিই বল, সিন্দুক খুলে এরই মধ্যে কে সেটাকে নিলে! ওরই হাতে চাবি, ও-ই সব রাখে ঢাকে, আমিও জানতুম কত টাকা সিন্দুকে ছিল। আর চুলোয় যাক্, এত কথা আমার বলবারই বা কি দরকার। তোমরা সকলেই ত জান, ওর হাতেই আমার সর্ব্বস্ব—

যুগল নিঃশব্দে চাহিয়া কেবল ভাবিতে লাগিল, একথা বিশ্বাস করিতেও যেন তাহার বাধিতেছিল, অথচ—

এমন সময় রাখাল সামন্ত আগেকার মতই তেমনই হন্তদন্তভাবে আসিয়া বলিল—মাথা খুঁড়ে ম'লেও ডাক্তারদের কাছ থেকে একটা পেটের কথা বার করবার জো নেই! সকলেই দাঁত খিঁচিয়ে যেন মারতে আসে! এখানকার মেয়েমানুষগুলোই বা কি! সবাই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে' আছে! যেন পাথরে-গড়া মূর্ত্তি! আর যারা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, তাদেরও পায়ের একটা শব্দ হয় না! যেন পালকের ওপর দিয়ে হাঁটছে! এত বড় প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু ভেতরে কোনও সাড়া শব্দ নেই, যেন অপদেবতার আস্তানা!

নরেন্দ্রও যেন আর অভিনয় করিতে পারিতেছিল না। ভিতরে ভিতরে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। শ্বশুরকে দেখিয়াই অতিশয় বিপন্নের মতই বলিল—এদের নিয়ে এখন করি কি, কোথায় সব রাখি?

মাথার উপর হাতটা একবার বুলাইয়া লইয়া রাখাল বলিল—সব এখন বাসায় পাঠিয়ে দাও। যুগল একখানা

ঘোড়ার গাড়ী ডেকে এনে নিয়ে যাক্ সবাইকে। কেবল তুমি আর আমি এখানে থাকি, কখন কি দরকার হয় তাত বলা যায় না। এরা কেন সারা রাত মাঠের মাঝে বসে' কষ্ট পায়। বলিয়াই সে একটা দম্‌কা নিশ্বাস ছাড়িল।

নরেন্দ্রের মা এতক্ষণ যেন বাকশক্তি হারাইয়াছিলেন। স্বামী মোটর চাপা পড়িয়াছে, তাঁহার রক্তমাখা দেহখানিই চোখের উপর শুধু ভাসিতেছিল, কিন্তু আসিয়াই বৈবাহিকের মুখে পুত্রের মুখে যে সব কথা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার স্তব্ধ হইবারই কথা। এরা বলে কি? সবাই কি পাষাণ হইয়া গিয়াছে। যাঁহাকে দেখিবার জন্য শুশ্রূষা করিবার জন্য সে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাঁহার অবস্থার কথা কেহ বলে না, টাকার কথা লইয়াই ইহারা পাগল! কর্ত্তা জানেন—সেও জানে, হরিচরণ তাহাদের চোখে কত বড় বিশ্বাসী, আজ এই বিপদের মুখে তাহার বিরুদ্ধে এ কি অপবাদ! এসব কি? বৈবাহিকের কথা এতক্ষণে যেন বৃদ্ধাকে কথা কহিবার সুযোগ দিল—সে আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ গা, একবারটি কর্ত্তার কাছে যেতে দেবে না? এতখানি পথ তবে ছুটে এলুম কি ক'রতে? না দেখে কোন্ প্রাণে ফিরে যাবো গো! কোথায়—কোন্ ঘরে তাঁকে রেখেছে, একবারটি দেখাবে চল—

রাখাল আরও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল, কোনও উপায়ই ত দেখছি না বেয়ান। আমার কি অসাধ? দোরে পাহারা বসিয়ে রেখেছে, কারুকে ওদিক মাড়াতে দিচ্ছে না! তার চেয়ে তোমরা এখন বাসাতেই যাও, এখানে থেকে কাজ নেই। আর এই কচি ছেলে দুটো! আহা, বাছাদের মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে—আমরি-মরি! ভেবো না বাবা তোমরা, সব ভাল হ'য়ে যাবে; আমরা ত রইলুম? মা'র সঙ্গে এখন বাসায় যাও—একটু বরং ঘুমিয়ে নাওগে, নইলে অসুখ করবে। সেখানে তোমাদের বৌদি আছে, তোমাদের দেখলেও তার প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'বে। বেয়ান! মেয়েটার মুখপানে একবার তাকিও। বেচারা একদানা মিছরীও গালে দেয়নি, কেবল পড়ে' পড়ে' কাঁদছে।

রাখাল সামন্ত একাই একশো। তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা কঠিন। সুতরাং নিরুপায় বৃদ্ধা-নাবালক পুত্র দুইটির হাত ধরিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে যুগলের সঙ্গে বাসাতেই ফিরিয়া গেল।

৬

তাহাদিগকে আর এপথ মাড়াইতে হইল না। ডাক্তারদিগের পরিশ্রম ও সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শেষ রাত্রির দিকে সরল বৃদ্ধ গোপাল নন্দীর প্রাণবায়ু তাহার বার্দ্ধক্যগ্রস্ত জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া কোন্ এক অজানা পথে যাত্রা করিল। লরী চাপা পড়ার পর হইতে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত বারেকের জন্যও বৃদ্ধের চেতনা ফিরিয়া আসে নাই। যথাকালে ডাক্তাররা মৃতদেহ দেখিবার অনুমতি দিলেও শ্বশুর জামাতাকে সে বীভৎস মূর্ত্তির নিকট ঘেঁষিতে দেয় নাই।

ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতেই সকাল হইয়া গেল। তারপর রাখাল সামন্ত তদূর সম্ভব তৎপরতার সহিত নিজের জানাশোনা লোকজন জড় করিয়া বাসা হইতে নরেন্দ্রের ছোট ভাই দুইটিকে আনাইয়া যথারীতি মৃতের অন্তিম কার্য্য সমাধা করিয়া সকলকে লইয়া যখন ফিরিল, তখন মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি আরও দ্বিগুণতর হইয়া চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

আরও দুই-চারি দিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে শহরের অনেকগুলি সংবাদপত্রে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের লরী-চাপা-পড়ার এই লোমহর্ষণ মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইল। সেই সঙ্গে মৃত গোপাল নন্দীর পকেট হইতে অতি রহস্যজনক ভাবে ত্রিশ হাজার টাকা উধাও হইবার কথাও—নিত্য নানা আকার ধারণ করিয়া ছাপার হরপে বাহির হইতে লাগিল। ইহাও প্রকাশ পাইল যে, অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় গোপাল নন্দীকে যখন কলেজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তখন গোটা ছাব্বিশ টাকা—কিছু খুচরা পয়সা—আর কয়েকটা বিড়ি ও দিয়াশলাই ছাড়া তাহার পকেটে আর কিছুই ছিল না এবং মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সে সকল যথাসময়ে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসানকে ফেরত দিয়াছেন।

পাকা-মাথা রাখাল সামন্ত কখনও কাঁচা কাজ করে না। দোকানের কর্ম্মচারী হরিচরণকে ধরাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ আপিসে দরখাস্ত করিয়া সে ত্রিশ হাজার টাকা উধাও হইবার কথাও সবিস্তারে জানাইয়া দিয়াছিল।

কাজে কাজেই গোয়েন্দা বিভাগ হইতে কিছুকাল ধরিয়া শহরে রীতিমত অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। তাহার ফলে গোপাল নন্দী যে লরীতে চাপা পড়িয়াছিল এবং রাস্তার ভদ্রলোকেরা যে ট্যাক্সিতে তুলিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজে লইয়া গিয়াছিল, পুলিশ বিভাগ অনতিবিলম্বেই তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। দুইজন ড্রাইভারই গেপ্তার হইল। তাহা ছাড়া উক্ত ভদ্রলোকদিগের দুই-চার-জনকেও—যাহাদিগের নাম ও ঠিকানা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের প্রতি যথাসময়ে আদালতে হাজির হইবার জন্ত সমনজারি করা হইল।

কিন্তু এত করিয়াও সেই ত্রিশ হাজার টাকার কোনই কিনারা হইল না। বিজ্ঞান অনেক কিছুই করিয়াছে, কেবল মৃত ব্যক্তির দ্বারা হলপ্ পাঠ করাইয়া আজও সে আদালতে সাক্ষী দেওয়াইতে পারে নাই। তাহা সম্ভব হইলে অনেক ক্ষেত্রে রাজার আইনের অপব্যবহার হইত না। যাহা হোক, চাপা দিয়া মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে লরী চালকের পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড হইল! যন্ত্র সভ্যতার দিনে মানুষের জীবনের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া গেছে। নির্দ্দোষ ট্যাক্সি-ড্রাইভার ধৃত হইলেও পুলিশের হাত হইতে অতি সহজেই অব্যাহতি পাইল।

ওদিকে হতভাগ্য হরিচরণের কান্নাকাটিতে উকিল, মোক্তার, হাকিম বা দর্শক, কাহারও মনে করুণার উদ্রেক হইল না। চৌর্য্যাপরাধে তাহার দুই বৎসর সপরিশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। কারণ সে সত্য কথা বলিয়াছিল। নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছিল যে বিপদের সংবাদ পাইয়াই সে যখন পাগলের মত মেডিকেল কলেজে গিয়াছিল, তখন বাস্তবিকই দোকানের সিন্দুকে এক হাজার সাতায় টাকা ছিল। কিন্তু পরে মনিবের হুকুমে টাকা আনিতে গিয়া হাজার টাকা নোটের তাড়া সে খুঁজিয়া পায় নাই। অথচ কেমন করিয়া যে অতগুলা টাকা সিন্দুক হইতে উধাও হইল, তাহা সে বলিতে পারে না! ইহার জন্ত সে তামা, তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল হাতে করিয়া শপথ করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু হাকিম প্রথম হইতেই তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেন—তাহার উপর নটবর, যুগল প্রভৃতি হরিচরণের সহকর্ম্মীদের সাক্ষ্য প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, হরিচরণ সত্যই অপরাধী।

৭

সম্পূর্ণ তলাইয়া না বুঝিলেও হরিচরণের ব্যাপারটি নরেন্দ্রের মায়ের মনে গভীর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। যে লোক কারবারের প্রথম পত্তন হইতেই কর্ত্তার কাছে আছে এবং চিরদিনই পরম বিশ্বাসভাজনের মতই কাজ করিয়া আসিয়াছে, কর্ত্তা যাহার হাতে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিয়াও কোন দিন আফসোস করিতেন না, সেই হরিচরণ যে এমন কুকর্ম্ম করিতে পারে, বৃদ্ধা কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, বিচারে সে খালাস পাইবেই। কিন্তু হতভাগ্য হরিচরণের এইরূপ কঠোর শাস্তির নিদারুণ সংবাদ বৃদ্ধার অন্তরে কর্ত্তার শোক পুনরুদ্দীপিত করিল। কর্ত্তা চলিয়া গেলেন লরী চাপা পড়িয়া, আর তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র হরিচরণ গুরু অপবাদের বোঝা মাথায় করিয়া জেল খাটিতে গেল!

আপেরীর আর্থিক অনটন এবং পারিপার্শ্বিক বহু অন্তরায় দেখাইয়া শশুর রাখাল সামন্তের ব্যবস্থায় কোন রকমে গোপাল নন্দীর শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেল।

দিনের পর দিনও কাটিতে লাগিল কিন্তু কাহারও মনেই শান্তি রহিল না। শশুরের পরামর্শ শুনিতে শুনিতে নরেন অতিষ্ঠ, হরিচরণের স্ত্রীপুত্রের চিন্তায় নরেনের মায়ের চোখে ঘুম নাই। হরিচরণকে উপলক্ষ করিয়া মাতা-পুত্রে বেশ খানিকটা বচসা হইয়া গেল। সেদিন নরেন্দ্র রাগ সামলাইতে পারিল না। বলিল—তুমি দেখ্‌ছি, দিনরাত কেবল তারই কথা ভাবো। সে চুরি করেছে, রাজার আইনে তার জেল হয়েছে। কিন্তু বিনা দোষে দু'দিন বাদে মহাজনেরা যে আমায় ঘর থেকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে, সে কথা ত কই একবারও তোমার মনে আসে না? আমারই যেন সব অপরাধ! তুমি এমনিই মা-ই বটে!—বলিয়াই সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

প্রত্যহ আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া বৃদ্ধা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিলেন। মুখ দিয়া তাঁহার কোনও কথা বাহির হইল না, কেবল হতাশভাবে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল সামন্ত নিকটেই ছিল। সে সর্ব্বদা ছায়ার মতই নরেন্দ্রের কাছে কাছে থাকে। মুখে একটা আওয়াজ করিয়া

বলিল, বাবাজি! দেখে শুনে সংসারে ঘেন্না ধ'রে গেছে। এই জন্যেই সাধু-মহন্তরা বলে, সংসার অসার, এখানে কেউ কারো নয়। নেহাৎ নাকি তোমরা বিপাকে পড়েছ, আর মেয়েটাকে তোমার হাতে দিইছি, তাই ছেড়ে যেতে পারছি না; নইলে সখ ক'রে কে আর ঝঞ্ঝাট মাথায় নেয় বল? বেয়ান মেয়েমানুষ, তাই ফস্ ক'রে যা মুখে আসে ব'লে ফেলে—নিজের সন্তানের দুঃখটাও ভাবে না! হায় রে সংসার—হায় রে কলিকাল! দুত্তোর—

নরেন বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিল—আমিও গাড়ী চাপা পড়ে মলে' এ সব বিপদ থেকে বেঁচে যেতাম!

শিহরিয়া উঠিয়া গৃহিণী বলিলেন—ষাট্—ষাট্! ও কি অলক্ষুণে কথা বাবা? আমার মাথার চুলের মত তোমার প্রমাই হোক্।—তার পর চক্ষের উদ্গত অশ্রু আঁচলে মুছিয়া অতিশয় করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, আমায় সব ভাল ক'রে বুঝিয়েই না হয় দাও না বেয়াই—বিপদটা কিসের। সত্যিই ত আমি মেয়েমানুষ—এতকাল পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম, কিছুই জানি না। সব কথা আমায় খুলে বল—আমি যে তোমাদের মনের কথা ধরতে পারি না। মাথার ওপর তোমরা তবে আছ কি করতে?

রাখাল সামন্ত এইবার জাঁকিয়া বসিল। বলিল, জেনেই বা তুমি করবে কি, আর বুঝিয়েই বা তোমায় দেবো কি বেয়ান? তিরিশ হাজার টাকা ত মাঠেই মারা গেল, ন দেবায়—ন ধর্ম্মায়! কারা যে নিলে, এত চেষ্টা ক'রেও আজও তার নিরাকরণ হ'ল না, আর হবে বলেও বোধ হয় না। কর্ত্তা নিজেও গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকেও মেরে রেখে গেলেন। কিন্তু পাওনাদার বা মহাজনরা ত আর ছেড়ে কথা কইবে না? ওই তোমার সাবালক বড় ছেলে, কার-কারবার দেখা শোনা ক'রে আসছে; ওরই গলাটি টিপে তারা সব আদায় ক'রে নেবে। সতেরো হাজার টাকা বাজার দেনা, সংক্রান্তির আর ক'টা দিনই বা আছে! সতেরো হাজার বেয়ান, মনে রেখো, সতেরোটি হাজার টাকা, এ দিকে ত'বিল ঝেঁটিয়ে সাতশো টাকাও বেরুবে না! ভেবে ভেবে ছোঁড়াটা একেবারে কালি হ'য়ে গেল! রাত ভোর বেচারীর চোখে ঘুম নেই, তা কি জানো?

নরেন্দ্রের মা এতক্ষণে অবস্থাটা যেন কতক বুঝিতে পারিলেন। কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিলেন, তবে দোকানটা না হয় তুলেই দাও—

একটুখানি হাসিয়া রাখাল বলিল—সে ত দিতেই হ'বে। দোকান চালাতে গেলে পুঁজি দরকার, সে টাকা আসবে কোত্থেকে? সে হ'ল পরের কথা। কিন্তু তার আগে সাবেক দেনাপত্র মেটাতে হ'বে ত? গোপাল নন্দীর কারবার, ও-ই ইস্তক নাগাদ দেখে আসছে, ওকেই তারা ধরবে। বড় গাছেই ঝড় লাগে বেয়ান, তোমার আর সব ছেলেরা ত এখন নাবালক। নরেন্ তোমার যে কি বিপদ-সমুদ্রে ভাস্‌ছে—সে কথা ব'লে বোঝানো যায় না!—সঙ্গে সঙ্গে রাখালের একটি প্রকাণ্ড নিশ্বাস পড়িল এবং সে ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

দারুণ সমস্যা। বৃদ্ধা হতবুদ্ধির ন্যায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, এর কি কোনও উপায় নেই বেয়াই? তোমার ত পাকা মাথা, একটা ফিকির-ফন্দি ভেবে চিন্তে বার কর না।

বৃদ্ধার অলক্ষিতে জামাতার পৃষ্ঠে একটা মৃদু রকমের টোকা মারিয়া রাখাল বলিল—উপায় থাকবে না কেন বেয়ান, বেশ সহজ উপায়ই আছে। কিন্তু আমি হলাম গিয়ে কুটুম্ব মানুষ, আমার কি এ সবের মধ্যে জড়িয়ে থাকা উচিত? আজকালকার লোকের মন বড় নোংরা; ভাল পরামর্শ দিলেও সেটাকে মন্দ ব'লে ধ'রে নেবে, বলবে, বুড়োর হয় তো কোনও স্বার্থ আছে—

নরেন্দ্রের মা একটু যেন বিরক্ত হইয়াই বলিলেন—ও সব কথা ছেড়ে দাও বেয়াই, লোকেরা ত এসে কেউ আমাদের রক্ষে করবে না? আমাদের ভাল-মন্দ আমরাই বুঝবো, আমাদেরই প্রতিকার করতে হ'বে।

রাখাল প্রথমেই জবাব দিল না। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইল। তারপর একটু নড়িয়া চড়িয়া বেয়ানের আরও একটু কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে বলিল, এ দায় থেকে উদ্ধার পাবার মাত্র দু'টি রাস্তা আছে। উপস্থিত, দেশের ঘর-বাড়ী জমিজারাৎ—সব বিক্রী ক'রে যা টাকা ওঠে, তাই দিয়ে সব মহাজনের মুখ বন্ধ করা; তারপর বাকি দেনাটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে—কারবারটা টুং টাং ক'রে আপনার নামে চালানো। নইলে এতগুলি লোকের পেটের খোরাক জুটবে কেমন ক'রে?

গোপাল নন্দীর নামে কি তোমার এই সব নাবালক ছেলেদের নামে দোকান থাকলে মহাজনরা মালও দেবে না, অথচ দোকান বজায় রাখতে না পারলে সংসারও চলবে না। তবে প্রথম প্রথম কষ্ট ক'রে এক বেলার ভাত দু'বেলা খেয়ে চালাতে হ'বে, এই আর কি।

কথাবার্ত্তার মাঝখানে এক সময় নরেন্দ্রের স্ত্রী আসিয়া শাশুড়ীর পাশে বসিয়া সব শুনিতেছিল। পিতা চুপ করিতেই সে বলিল, তুমি ত বেশ পরামর্শ দিলে বাবা? ঘর-বাড়ী সব বিক্রী করলে আমরা দাঁড়াবো কোথা? আমার এই বুড়ো শাশুড়ী—এই সব কচি দেওররা রয়েছে, এদের উপায় কি হ'বে? আর শশুর আমার কত দিন ধ'রে—কত কষ্টই না সহ্য ক'রে সে সব ক'রে গেছেন—সে সব গোল্লায় দিতে হবে কিসের আশায় শুনি?

রাখাল সামন্ত একেবারে লাফাইয়া বলিয়া উঠিল—শুনলে বেয়ান! আমার নিজের মেয়ের মুখের কথাটাই শোন! ও-ই যদি এত বড় শক্ত কথাটা বলতে পারলে, তা হ'লে অপর লোক বলবে, তার আর আশ্চয্যি কি? হায় রে কলিকাল—হায় রে কলির ধর্ম্ম!—এরই জন্তে তোমাদের পরামর্শ দিতে চাই নি বেয়ান! আর পোড়া মায়া!—তাই এমন মেয়েরও আবার মুখ চাইতে হয়। তারও ভবিষ্যৎ ভাবতে হয়। ইচ্ছে করে নিজের মাথায় হাতুড়ি মেরে মরি!

নরেন্দ্র কঠোর দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিল।

কিন্তু স্বামীর সেই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি আজ আর বধূটিকে অভিভূত করিতে পারিল না, বরং সে দৃষ্টির আভায় তাহার সুন্দর মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সকল সঙ্কোচ ও লজ্জার আবরণ ছিন্ন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল—চুপ কর বাবা, চেঁচিও না। তোমার কথামত কাজ করতে হ'লে আমাকেই আগে মাথায় হাতুড়ি মেরে মরতে হয়। কিন্তু এখন মরা আমার চলবে না। শশুরের কীর্ত্তি আমায় বজায় রাখতে হবে, এই নাবালক দেবর দুটিকে মানুষ করব আমি। কারবার নিয়ে তোমরা থাকো; মায়ের সঙ্গে আমি যাবো আমাদের দেশের ভিটেয়, তাকে বজায় রাখাই আমাদের আখেরী।

ভালবাসা

শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়

নহ শুধু কথা তুমি,
নও দীপশিখা;
হোমাগ্নি আহুতি নও;
নহ তুমি মেঘমাঝে
বিজলীর লেখা।
পুষ্পের সুরভি নও
নহ মরীচিকা।
শুধু আছ হতাশায়
মানবের উত্তপ্ত নিশ্বাসে।
মাঝে মাঝে ভেদি' বক্ষ,
উথলি উথলি এস
অশ্রুমাখা নীরে।
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তব;
নাই লাভ ক্ষতি।
আপনি আপন ছন্দে,
ভেসে আসা ছিন্ন পুষ্প সম,
আপনারে বিকাতেছ নিতি।
চিন্তার অচিন্ত্য তুমি;
তবু চিন্তা তোমারে ঘিরিয়া
যুগে যুগে রচে ইন্দ্রজাল;
মনের নিভৃত কোণে
মনসিজ তুমি যে উত্তাল।

রুশ-সাহিত্যের দুই জন

শ্রীপ্রভাত হালদার

এন্-ভি-গোগল্ (১৮০৯—৫২)

প্রাচীন রুশিয়ার কল্পনাময়ী লেখনী যাঁহারা ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম। সেই কমের মধ্যেও যাঁহার নাম করা যায়, তিনি এন্-ভি-গোগল্।

পোল্টাভা নামক গ্রামে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। নিজিহিন্ জিম্নাসিয়ামে তিনি প্রাথমিক পাঠ শেষ করেন ও এই পাঠ্যাবস্থায় এই স্থান হইতে একটি হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার নাম ছিল—দি ষ্টার —"তারকা"।

এই পত্রিকাখানি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং এই পত্রিকায় শিক্ষক, ছাত্র, পাঠকের রচনা স্থান লাভ করিত। এই পত্রিকাই হইল গোগলের সাহিত্যের হাতে খড়ি।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি চাকুরির সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহার মনে হয়, অন্য কোন প্রকার চাকুরী না করিয়া যদি তিনি অভিনয় করেন তাহাতে হয় তো তিনি খ্যাতি এবং অর্থ দুই-ই লাভ করিতে পারিবেন। আশার কুহকে তিনি পিটারসবার্গে রওনা হইলেন। পিটারসবার্গে গিয়া তিনি দেখিলেন—পৃথিবীর রূপ অন্য প্রকার। একে একে সমস্ত নাট্যালয়ের দ্বারে ঘুরিয়া কোনও ফল হইল না। নিরাশ হৃদয়ে তিনি এক ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই ভদ্রলোক রুশিয়া সরকারের অধীনে একটি সাধারণ কেরাণীর পদে গোগলকে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর গোগল এই স্থানে কিছু দিন কাজ করেন।

এই কার্য্য করিতে করিতে গোগলের অন্তরে পুনর্ব্বার সাহিত্য-স্পৃহা জাগিয়া ওঠে এবং অল্প দিনের মধ্যে— "হান্স কুচেল গার্টেন" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার অল্প কিছু দিন পরে তাঁহার মনে হয়, পুস্তকখানি বোধ হয় ভাল হয় নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে যতগুলি পুস্তক তিনি ক্রয় করিতে পারিলেন ততগুলিকে লইয়া এক সরাইখানার ঘরে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করেন। এই ঘটনার পর তিনি ভাবিয়াছিলেন, আর সাহিত্যচর্চ্চা করিবেন না। কিন্তু পুস্কিন তাঁহার মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার লিখিতে অনুরোধ করেন। শুধু পুস্কিন নহে—টলষ্টয় পর্য্যন্ত তাঁহাকে লিখিবার অনুরোধ জানান।

গোগল্ এই দুই জন সাহিত্যিকের প্ররোচনায় আবার লিখিতে আরম্ভ করেন। "ইভনিং ইন দি ফার্মহাউজ ডিকাণ্টা" নামক পুস্তকখানি প্রকৃত পক্ষে টলষ্টয়ের প্রেরণায় লিখিত হয়। এই পুস্তকখানি তথাকথিত রুশিয়ার সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন ভাব আনে। পুস্তকখানির উপাদান ছিল—পূর্ব্বকালের রাজাদের বীরত্বের কাহিনী; উপকথা, সামাজিক রীতিনীতির কথা এবং সুন্দর সুন্দর বর্ণনা। এই সকল গল্পের বা উপকথার কথক ছিলেন এক জন মধুমক্ষিকার পালক। প্রকৃত পক্ষে গোগলের এই পুস্তকখানিতে মধুমক্ষিকার পালকের মারফত মধুই বিতরিত হইয়াছিল।

হাস্যকৌতুক ও রহস্যের বিষয়ে গোগল্ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এর পর তিনি "ষ্টরিজ অফ্ মিরগরদ" এবং "তারাস বাল্‌বা" রচনা করেন। শেষের পুস্তকখানি একটি সুবৃহৎ উপন্যাস। ইহার ঘটনা—একজন কসাক্ সেনাধ্যক্ষ এবং তাহার দুই পুত্র পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ইহার পর গোগল্ বাস্তবের সমর্থক হইয়া দাঁড়ান। শুধু তাহাই নহে, রুশিয়ার সাহিত্যের মধ্যে যে বাস্তবতার প্রকাশ বর্ত্তমান তাহারই পথপ্রদর্শক হইতেছেন—এন্-ভি-গোগল্।

তাঁহার শক্তিশালী লেখনীতে যে "ওভারকোট" নামক গল্পটি লিখিয়াছেন তাহা সত্যই অনবদ্য। গল্পের ঘটনাটি এইরূপ—এক দরিদ্র কেরাণী অতি কষ্টে একটি ওভারকোট খরিদ করে এবং অল্প দিন পরে সেইটি চুরি হইয়া যায়— দরিদ্র কেরাণীটি সেই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মারা যায়। কেরাণীর মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহার বর্ণনা অতি সুন্দর।

গোগল্ সাহিত্যের মধ্যে এই প্রকার বাস্তবতার পথ-প্রদর্শক। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে এই প্রকার

বাস্তবতার চলন দাঁড়াইয়া যায়। গোগলের সাহিত্যের মধ্যে সমবেদনা, বাস্তবতা, সহৃদয়তার সহিত রহস্যের আভাষ পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে রুশিয়ার ঔপন্যাসিকেরা সাহিত্যের মধ্যে এত কিছু পরিষ্কারভাবে দিতে পারেন নাই।

গোগলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস ডেড্ সো'ল্স্—এই উপন্যাসের অদ্ভুত চরিত্রের নায়ক গোগলের প্রতিভার নিদর্শন। নায়ক অতি অদ্ভুত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিত। এই সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। গোগলের পূর্ব্বপুরুষ নাকি এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিত। গোগলের অন্তরে সেই কাহিনী রেখাপাত করে এবং তাহারই ফলে এই উপন্যাসের সৃষ্টি। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা কেবলমাত্র এই উপন্যাসের রূপ দিয়াছেন তাহা নহে, গোগলকে যথেষ্ঠ হাসির খোরাকও জোগান দিয়াছেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গোগলের মৃত্যু হয়।

এ-পি-চেকভ (১৮৬০—১৯০৪)

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী; টোগানরোগ—মস্কোর একটি দরিদ্র পল্লী। কয়েকটি দরিদ্র নরনারী উদ্বিগ্নভাবে একটি কুটীরের সম্মুখে ঘোরাফেরা করিতেছিল। ঘরের মধ্য হইতে একটি আসন্নপ্রসবা নারীর কাতরোক্তি ভাসিয়া আসিতেছিল। বাহিরে যাহারা ঘোরা ফেরা করিতেছিল তাহাদের কেহ বলিল—পুত্রসন্তান হইবে, কেহ বলিল—কন্যা হইবে, কিন্তু তাহাদের কথার নিষ্পত্তি হইল না। এক বৃদ্ধ কহিলেন—"আরে, এ যে দেখছি বড় শুভ লগ্নে ছেলে হবে।"

সত্যই সেই বৃদ্ধের কথার সত্যতা আজকার রুশিয়ার সাহিত্যিকেরা বুঝিতেছেন। কারণ সেই শুভলগ্নে দরিদ্র পরিবারে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই রুশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক আন্তন পাব্লোভিচ্ চেকভ।

শিশুকাল হইতে তিনি দারিদ্র্যের কবলে নিষ্পেষিত হইয়াছেন। কেবল মেধাবী ছাত্র বলিয়াই বিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া তিনি মস্কোতে ডাক্তারি পড়িতে যান। (১৮৮০ খৃঃ)। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার মাঝে মাঝে তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, তিনি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা ছাড়িয়া সাহিত্যচর্চ্চা সুরু করিয়াছেন। যদিও তিনি কোনও বিরাট উপন্যাস রচনা করেন নাই তথাপি ছোট গল্পের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা সাহিত্যে বিরল।

প্রথম প্রথম তিনি বেশ সুন্দর কৌতুকাবহ গল্প রচনা করিয়া পাঠকের অন্তরে যথেষ্ট আনন্দ দিতেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী রচনাগুলির মধ্যে মানব-জীবনের ব্যর্থতার সুরই বেশী ঝঙ্কৃত হইত। তাঁহার সকল বিখ্যাত গল্পেই এই বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার রচনার সুর পরিবর্ত্তিত হয়।

মানুষের জীবনের ব্যর্থতার এক করুণ চিত্র। এই ব্যর্থতার জন্য মানুষ আপনার অস্তিত্বকে ভুলিয়া যায়, আপনাকে হারাইয়া ফেলে, সেই কারণেই মানুষকে এত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আন্তন চেকভের এই ধারণা তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মানবজীবন একটা মস্ত ট্র্যাজিডি এবং সেই কারণেই মানুষ যদি তাহার জীবনকে আরও উন্নততর করিবার প্রয়াস পায় তাহাতেই তাহার জীবন আরও কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে। মানুষ তাহার জন্মের পর হইতেই তাহার নির্দ্দিষ্ট অভিশপ্ত পথে চালিত হয়।

আন্তন চেকভের রচিত চরিত্রগুলি এইরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়াই সমালোচকগণ নির্দ্দেশ দেন। কারণ তাঁহার নিজের জীবনই একটি মস্ত ব্যর্থতার জীবন। তাঁহার জীবনের সাধ ছিল তিনি চিকিৎসক হইবেন, কিন্তু তাহা না হইয়া তিনি হইলেন লেখক। তাঁহার জীবনের এই ব্যর্থতা তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় তিনি ব্যর্থতার চিত্রই আঁকিয়াছেন। জীবনের পরিপূর্ণতার চিত্রগুলি কোন দিনই তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই।

চেকভ ছোটগল্প ব্যতীত ছয়খানি সরস নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মস্কোর আর্ট থিয়েটারে সেই নাটকগুলি অতি সমারোহে ও সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। তাঁহার রচনার মধ্যে একটি এমন নিজস্ব ভঙ্গি আছে যাহা পাঠক ও দর্শকের চিত্ত অতি সহজেই হরণ করিতে সমর্থ হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আইভানভ্ নামে যে নাটকখানি প্রকাশিত হয় তাহাতেই চেকভের বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। তবে জীবনের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা থাকার জন্য চেকভের রচনা অনেক স্থলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। প্রকৃত শিল্পীর প্রতিভা ছাই-চাপা আগুনের মত লুকান থাকে না, চেকভের প্রতিভাও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার

রচিত ডার্লিং গল্পের মধ্যে যে একটু হাসির আভাষ ফুটিয়াছে সাহিত্যের মধ্যে সেইটুকুই দুর্লভ।

দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী এত নিপুণভাবে অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা সাহিত্যে টুর্গেনিভ ও চেকভ ছাড়া আর কাহারও নাই। ইঁহাদের পৃথিবীর যে-কোনও শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকের সহিত তুলনা করা চলে।

চেকভের রচনার মধ্যে যেগুলি খ্যাতি লাভ করে তাহার সংখ্যাও কম নহে—

The Chorous Girl (1884), The Deary Story (1889), Ivanoff (1890), Tedious Story (1889), The Duel, Word no. 6 (1892), The Teacher of Literature (1894), Three years, An Artist's Story, The House with Misonette ; My Life (1895), Pasant's (1895) Darling, Ionich, The Lady with the Dog (1898) Uncle Vania ; The New Villa (1899), In the Ravine (1900), The Three Sisters (1901), The Bishop (1902), The Cherry Orchard (1904).

জন্ ড্রিঙ্কওয়াটার-এর মতে ইনিই রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার; ইঁহার নাটকে যে কেবল মাত্র রুশিয়ার অধিবাসীদের চিত্তহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেও চেকভের প্রতিভার আলোক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহারা প্রকৃত রুশিয়ার চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন আন্তন পাব্লোভিচ্ চেকভ্ তাঁহাদের অন্যতম।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই কৃষ্ণারণ্যের ব্যাডেন উইলার নামক স্থানে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে আন্তন পাব্লোভিচ্ চেকভ্ হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন—তাঁহার মৃত্যু হয় ক্ষয়রোগে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মন্ত্রদ্রষ্টা কবি তুমি চিরধন্য ভারতের পুণ্য তপোবনে,
তোমারি উদাত্ত সুরে অনাগত বাণীময় নব জাগরণে!

হোমগন্ধে প্রপূরিত সীমাহীন তরঙ্গিত আকাশ-বাতাস,
অসীমের জ্ঞানালোক তারি মাঝে তব মন্ত্রে সসীমে প্রকাশ।

তোমারি বাণীর সুর রোগ শোক জরা মৃত্যু ব্যথা বেদনায়,
মৃতকল্প ব্যথাতুরে সঞ্জীবিত বলদৃপ্ত করে নিরাশায়।

দেবরূপ, কণ্ঠ-সুধা, কৃষ্টি কলা লভিয়াছ কৃচ্ছ্র সাধনায়,
হৃদয়ের রাজা তাই করিয়াছে হে কবীন্দ্র মানব তোমায়।

ভোগী যোগী ত্যাগী তুমি হে অতুল্য অপরূপ বার্দ্ধক্যে তরুণ,
মসি-স্রোতস্বিনী তব অসিজীবীকেও করে কোমল করুণ।

প্রাচী-প্রতীচির মাঝে হইয়াছে চিরপ্রিয় তব অবদান,
বিশ্বকবি হে ভারতী নিঃশেষে করেছ তুমি আপনারে দান।

কবিগুরু হে রবীন্দ্র হইয়াছ মৃত্যুঞ্জয় দানেতে তোমার,
জয়ন্তীর জয়টীকা লও বিশ্বমানবের—লও নমস্কার!

সোনার হরিণ

শ্রীগোপাল ভৌমিক

স্মৃতির কুয়াশা চিরে' দেখা দেয় সুপ্তি-মৌন দিন,
প্রস্ফুট আলোকে ভরা যৌবনের সুনীল আকাশ,

প্রান্তরে চকিতে দেখা মায়াময় সোনার হরিণ
ফাঁকি দিয়ে গেল কোথা, মিথ্যা হ'ল ধরার প্রয়াস!

অপস্রিয়মান সেই হরিণের পিছনে পিছনে—
ছুটেছি অনেকদিন, বহু দেশ দিক্ দিগন্তর—

বিভোর সোনার স্বপ্নে আনমিত বিচলিত মনে—
সুদূর-স্বপন দেখি' পশ্চাতের রাখি নি খবর!

ধূসর অতীত আজ, ভাবী দিন অন্ধকারে ঘেরা,
মরুভূমিবাসী আত্মা, মেটে নাই জলের পিপাসা,

আঁধার গহ্বর-পথে নিরন্তর করি চলাফেরা—
তবু রক্তে আছে জেগে সুদূরের অনায়ত্ত আশা!

বহুদূরে হ্রদতীরে বিচঞ্চল সোনার হরিণ—
হাতছানি দিয়ে ডাকে, ধীরে করে গ্রীবা প্রদক্ষিণ!

ফল্গু

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় এম-এ

প্রায় দুই বৎসর পরে রমা বাপের বাড়ি আসিয়াছে। আসিয়া পৌছিয়াছে সকালে, এখন মধ্যাহ্ন। কিন্তু এর মধ্যেই বন্ধু অনীতাকে দেখিবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলে কোলে লইয়া পুকুর-ধার দিয়া সে আসিতেছিল। জামরুল গাছটা ছাড়াইয়া যাইতেই কে আসিয়া পিছন হইতে সজোরে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। চমকিয়া উঠিল রমা। কিন্তু নরম হাতের স্পর্শে পরক্ষণেই বুঝিল, অনীতা।

বলিল—আ··হা, জামরুল গাছের পেছনে লুকোন হয়েছিল, জানি না বুঝি! ছাড়্ বলছি শীগ্‌গীর।

অনীতা ছাড়িয়া দিয়া মাতা-পুত্র দুইজনকেই জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তারপর নিজের কোলে খোকাকে ছিনাইয়া লইয়া বলিল—কী সুন্দর তুই হয়েছিস রমি, সত্য বলছি।

—খুব হয়েছে।···দে শীগ্‌গীর খোকাকে, এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে নইলে।

—কই, কাঁদছে না ত!—খোকার মুখের দিকে চাহিল অনীতা।

রমা একটু বিস্মিত হইয়া গেল। অচেনা লোকের কাছে খোকা কিছুতেই যায় না। কি···ন্তু—

—চল্, বসি গে জামরুলতলায়।—বলিয়া রমাকে টানিয়া লইয়া চলিল অনীতা।

—না-না, ওখানে কি, তার চেয়ে চল্ তোদের বাড়ি যাই।

—ওঃ, তুই যে একেবারে পর হয়ে গেছিস রে। বাপের বাড়ির দেশে আবার অত লজ্জা কি।

আপত্তি টিকিল না রমার। দুইজনে বসিল জামরুল-তলায়। তারপর গল্প চলিল যত রাজ্যের। রমার শ্বশুর-বাড়ির গল্প শুনিয়া শুনিয়া অনীতার যেন আর আশ মিটে না। একে একে অনেক কথাই বলিল রমা। হাঁ, তার শ্বশুর-শাশুড়ীর মত সজ্জন সত্যই দুর্লভ। ননদও তাই, এরকম মধুরস্বভাব মেয়ে আর একটি দেখা যায় না। আর স্বামী? ছেলেমানুষীতে সে বোধ হয় সংসারে অদ্বিতীয়। মুখে কিছু আটকায় না, শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনেও একটু জড়তা নাই। দুষ্টামি করিয়া কতদিন যে রমাকে সকলের সামনে বিপদে ফেলিয়াছে, তার ঠিক নাই। একবার ত দুই দিন ধরিয়া রমার আংটিটাই লুকাইয়া রাখিল সে। রমা খুঁজিল—সারা বাড়িময় হৈচৈ। তারপর সে বার করিয়া দেয় আংটি। আর একদিন—দুপুরবেলায় রমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই ফাঁকে রমার গালে, কপালে, চিবুকে আল্‌তা মাখাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছিল সে। রমাকে দেখিয়া সকলের কি হাসি! মাগো, সে এক কাণ্ড হইয়াছিল বটে!

বেলা পড়িয়া আসিলে দুই বন্ধু উঠিল।

অনীতা বলিল—কাল আবার আসিস ভাই।

সম্মতি জানাইয়া রমা বিদায় লইল।

পুকুরটার ওপারে রমাদের বাড়ি, এপারে অনীতার শ্বশুর-বাড়ি। অনীতা এ বাড়ির বড়-বৌ। তের বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া এ বাড়িতে আসে, সে আজ সাত-আট বৎসরের কথা। স্বামী কলিকাতায় থাকিয়া বি-এ পড়িত। কিন্তু হতভাগীর অদৃষ্টের দোষে বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই কলিকাতায় স্বামীর অপমৃত্যু হয়। সেই হইতে সে শ্বশুর-বাড়িতেই আছে। ক্বচিৎ-কখনও বাপের বাড়ি যায় বটে, কিন্তু দু-চার দিন যাইতে না যাইতেই স্বামীর ভিটা যেন তাহাকে কি-একটা অদম্য আকর্ষণে টানিয়া লইয়া আসে।

শ্বশুর-বাড়িতে অনীতার আদরের সীমা নাই। বাড়িতে আর কোন মেয়ে নাই বলিয়াই বোধ হয় তাহার এত আদর। তিনটি দেবর অনীতার। বড়টি কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে। অনীতারই সমবয়সী সে। বৌদিকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে সে। অথচ কলেজের ছুটিতে বাড়ি আসিলে সময়ে-অসময়ে প্রকাণ্ড মান-অভিমানের পালাও চলে, যেন পিঠাপিঠি ভাই-বোন দুটি।···আর দুটি

দেবর ছোট। তাহাদিগকে মাতৃস্নেহে অনীতা লালন-পালন করিয়াছে।

অনীতাকে বাড়ির গিন্নী বলা চলে। বিপদে-সম্পদে তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কেহ কোন কাজ করে না। দাস-দাসী হইতে শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর পর্যন্ত তাহার অখণ্ড প্রতাপ।

সদাহাস্যময়ী অনীতা সহসা যেন একটু গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি এখন তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। আগে যেমন, ছোট হোক বড় হোক, সকলেরই সহিত বসিয়া দুই দণ্ড গল্প করিত, এখন আর তাহা করে না। প্রতিদিনকার স্থূলতম কর্তব্যগুলি এখনও সে যথারীতি পালন করিয়া যায় বটে, কিন্তু সে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা যেন নাই।

বাড়িতে তাহার অসাক্ষাতে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করিল, অনীতার মানসিক বিষাদের কারণ জানিতে, কিন্তু কোনই ফল হইল না। সংসার-চক্রটা অচল হইয়া পড়িবে নাকি! সকলেই বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল।

রমার নিকট হইতে যদি একটু আলোর সন্ধান পাওয়া যায়, এই আশায় অনীতার শাশুড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে রমা, আমাদের অনু কয়েকদিন ধরে কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে পড়েছে। তোর আসার পর থেকেই যেন এরকম। তুই কিছু বলেছিস নাকি?

—না মাসীমা, আমি কি বলব—রমা উত্তর দিল—আমি ত এমন কিছু বলি নি, যাতে ও এরকম হয়ে যেতে পারে। আমার কাছে ত রোজ আসে। হাসে, গল্প করে, খোকার সঙ্গে খুনসুটি করে, আমার শ্বশুর-বাড়ির গল্প শোনে; কই, গম্ভীর-টম্ভীর দেখি না ওকে!

শাশুড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

শেষে একদিন তিনি সাহস করিয়া অনীতাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—অনু, তোর কি হয়েছে বল্ ত? কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছিস, কোন কাজেই—

—কই, না ত মা।—অনীতা হাসিয়া ফেলিল—কোন্ কাজটা না করি বল?

—ও, তোকে বুঝি আমরা সব সময়ই খাটাই, না রে? তুই কাজ না করলেই পারিস। বাড়িতে এত চাকর-বাকর—

—না মা, আমি তা বলি নি।—বলিয়া শাশুড়ীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িল অনীতা। শাশুড়ী হাসিয়া ফেলিলেন।

দিনের পর দিন যায়। অনীতা কিন্তু বিষাদময়ী অনীতাই রহিল।

পূর্বের অনুকে ফিরিয়া পাইতে পুত্র মনীশকে নিয়োগ করিলেন শাশুড়ী। মনীশ গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে মনীশ গিয়া ডাকিল—কি করছ বৌদি?

অনীতা শুইয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিল। খাটের এক পাশে সরিয়া গিয়া বলিল—এস ভাই, বস। আজ যে নিজের পড়ার ঘর ছেড়ে আমার ঘরে বড়?

ঝগড়া করতে।—খাটের উপর বসিয়া মনীশ জবাব দিল।

—সে কি। আমার অপরাধ?

—কলকাতা থেকে পয়সা দিয়ে আমি বই কিনে এনে দিই বৌদি, আর তুমি এমনই অকৃতজ্ঞ যে আমাকে আমলই দিতে চাও না! আমাকে তুমি আর ভালবাস না, আমার সঙ্গে তুমি আর ভাল ক'রে মেশো না।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, দশ-বার বছর বয়সের সময় তোমার মন যেরকম ছিল, এখনো কি সেইরকমই আছে?

—ওরে বাবা, বইয়ের পাতায় সাইকোলজি আমি ঢের পড়ছি বৌদি, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশী জান, তার প্রমাণ এর আগে অনেকবার পেয়েছি। যাক সে কথা। এখন বল ত তোমার কি হয়েছে?

—তোমরা কি আমাকে পাগল পেয়েছ ঠাকুরপো। কথা বলছি, কাজ-কর্ম করছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, তবু তোমাদের এত ভাবনা কেন। সত্যি আমার কিছু হয় নি।

—তা···ত বটে, কিন্তু, আচ্ছা পড়।

কোন জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া মনীশ ফিরিয়া আসিল।

ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে। আজ বিকালে মনীশ রওনা হইবে। বর্তমানে সে-ই বাড়ির বড় ছেলে। তাহার বিদায়ের দিনে তাই সকলেই যেন কেমন একটু ব্যস্ত। সকাল হইতেই গোছ-গাছ চলিতেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে বাপ-মার উপদেশ ও সতর্ক-বাণীর অন্ত নাই।

দুপুরের আহারের পর মনীশ উঠান দিয়া ঘরে চলিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, বৌদি হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়া বৌদির ঘরে উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—কি বৌদি?

সলজ্জ চোখ দুটি মনীশের মুখের উপর তুলিয়া অনীতা মৃদুস্বরে বলিল—ঠাকুরপো, আমার একটা কথা রাখবে ভাই?

—কি বল আগে।

—রাখবে, বল।

—রাখবার হয় ত নিশ্চয় রাখব।

—আমায় তোমার সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যাবে ভাই?

—সে কি বৌদি!—মনীশ যেন আর বিস্মিত হইতে পারিতেছে না।—তীর্থ নয়, কিচ্ছু নয়, হঠাৎ কলকাতায় যাবার এত ইচ্ছে হ'ল?

অনীতা মাথা নিচু করিয়া জবাব দিল—হ্যাঁ ভাই, বড় ইচ্ছে করছে। শুধু একবারটি, একবারটি শুধু তুমি আমায় মেডিক্যাল কলেজ আর নিমতলার শ্মশানটা দেখিয়ে দেবে। ব্যস্, তারপর আর একদণ্ডও থাকতে চাইব না আমি।

মনীশের মনের উপর হইতে যেন একটা কালো পরদা সরিয়া গেল। দেয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিল, দাদার ফটোটায় টাটকা যূঁই ফুলের মালা জড়ান রহিয়াছে। বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া একমুহূর্ত সে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরক্ষণেই মায়ের উদ্দেশে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কলিকাতার রাস্তায় বাস্-এর তলায় চাপা পড়িয়া অনীতার স্বামীর অপমৃত্যু হয়। মেডিক্যাল কলেজে কয়েক-দিন থাকার পর তাহার জীবনবায়ু নির্গত হইলে নিমতলার শ্মশানে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রকাশ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

তখনো তুমি বাসোনি মোরে ভালো,
জিজ্ঞাসার প্রদোষে শুধু ঘনালো ঘোর, জ্বলি' ওঠেনি আলো
আঁধার যত ঘনায়মান হয়,
আলোকে বুঝি শতধা হবে তত যে মনে উপছে প্রত্যয়।
দীপ্ত দিবালোকে
পড়েনি যাহা চোখে,
শ্রবণে যাহা আনেনি কোনো রব,
আব্‌ছায়ার ঘনায় তার কুহেলিময় মূরতি অভিনব।

হঠাৎ সমীরণে
উচ্চকিত মৌন বন এমনি করি পত্র শিহরণে
মর্ম্মরিয়া ওঠে,
স্তব্ধতায় তুলি লহর স্বরঝরণা ছোটে।
চকমকিতে চকমকিতে সহসা সংঘাত
যেমনি হ'ল আঁধার চিরি' আসিল তারি সাথ
আলোক নির্ঝরিণী
সেই নিমেষে চিনিলে মোরে তোমারে আমি চিনি
মোদের ভালবাসা
আঁধার মথি' পেল' আলোক দৃষ্টিভরা, মৌন মথি' ভাষা।

দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতিবাসরে

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আজিকার এই স্মৃতিসভায় আপনারা আমাকে যে আসন দিয়াছেন সেই আসনে বসিবার অধিকার আমার নাই, ইহা আমি অকপটচিত্তে স্বীকার করিতেছি—ইহা বিনয় নয়; এই সভাতেই এমন ব্যক্তিগণ উপস্থিত আছেন যাঁহাদের এ পূজায় পুরোহিত হইবার যোগ্যতা আমা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। তথাপি আপনারা যখন আমার উপরেই এই ভার অর্পণ করিলেন, তখন হইতেই আমার মনে একটি আবেগ অনুভব করিতেছি—বাংলার এক বিগত যুগ এবং আমারই যৌবনকালের স্মৃতি আজ বহুদিন পরে আমাকে আকুল করিয়াছে। আমি যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই যুগের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছি—যে যুগে একদা বাঙালী-জীবনের শীর্ণ খাতে অকস্মাৎ এক বিপুল ভাবধারা উচ্ছল কলরোলে অগণিত তরঙ্গমালায় প্রবাহিত হইয়াছিল; আমি যেন আবার সেই তরঙ্গস্রোতে ভাসিলাম—কত কবি-মনীষীর মন্ত্ররব ও গীতধ্বনি—কত আশা ও উদ্দীপনা—আবার আমাকে ব্যাকুল ও চঞ্চল করিল! আজ দেশে যে ক্লান্তি ও অবসাদ—পথ-ভ্রান্তির যে বিমূঢ়তা, ভাব ও চিন্তার যে দৈন্য—সকল আশা উচ্ছেদ করিয়া, জীবনের সকল স্বাদ লোপ করিয়া আমাদিগকে দুঃস্বপ্নের দীর্ঘরাত্রির মত আবৃত করিয়াছে, হঠাৎ যেন তাহা হইতে জাগিয়া উঠিলাম, বর্ত্তমান হইতে অতীতে পৌছিয়া আমি আবার সেই দিবা-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! আজ আপনাদের এই সভায় আমি সেই ভাব-স্মৃতির মোহাবেশে যে দুই-চারি কথা বলিতে চাই, আশা করি তাহাতে আপনাদেরও হৃদয়ের সাড়া পাইব।

সেই স্মৃতি জাগিয়াছে সেই যুগের এক জন স্মরণীয় পুরুষের সম্পর্কে—আপনারা যাঁহার স্মৃতি-তর্পণ মানসে এই সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই দেশ ও জাতিগত-প্রাণ, আত্মভোলা, উদারহৃদয়—ভাবস্বপ্নাতুর কবি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালকে স্মরণ করিয়া। আমার বয়স যখন সতেরো কি আঠারো, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের একখানি নাটক 'রাণা প্রতাপ' হঠাৎ কেমন করিয়া আমার হাতে আসিয়া পড়ে—অভিনয় দেখি নাই, কেবল কাব্যহিসাবে তাহা পাঠ করিয়া, সেই কালেই তাঁহার রচনা-ভঙ্গি—ভাষার রূপ ও গানের গীতিকৌশল—আমার অপ্রবুদ্ধ চিত্তে একটি নূতনতর রসের সঞ্চার করিয়াছিল। তখন সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পগুলির সহিত পরিচয় হইয়াছে এবং তাহার ফলে এক অপূর্ব্ব সাহিত্যিক উন্মাদনা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু সে কাব্যের সেই খরতর আলোকেও আর একটি আলোকের আভা আমার মানস-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—আজ তাহা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারি। তার পর স্বদেশী-আন্দোলনের সেই উদ্দাম আবেগ সে কালের যুব-সম্প্রদায়কে যেরূপ অধীর করিয়াছিল, তাহাতে কাব্য-সাহিত্যকে ছাপাইয়া অসংখ্য বাগ্মীর বক্তৃতার ঘনঘটা যখন একমাত্র হৃদ্য বস্তু হইয়া উঠিল—যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গানে, আমাদের জাতীয় জীবনের সেই অকাল-বসন্তকে অফুরন্ত রূপে-রঙে, ভাব-স্বপ্নে, স্ফূর্ত্ত ও মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময়ে এক বিরাট সভায় সহসা একটি সদ্য-মুদ্রিত গান বিতরিত ও গীত হইবার কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। উচ্চকিত চমকিত হইয়া সেই গান শুনিয়াছিলাম; সেই স্থান ও কালের নাটকীয় সংস্থানে, সে গানের ভাব ও সুর প্রাণে যে অননুভূতপূর্ব্ব আবেগ সঞ্চার করিয়াছিল, আর কখনও অনুরূপ অবস্থায় তেমন হয় নাই। সেদিন সার্কুলার রোডের সেই ভাবী মিলন-মন্দিরের শূন্য প্রাঙ্গণে, বিপুল জনসভায়, বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিতেছিলেন; সেই বক্তৃতার পূর্ব্বাহ্নে মুদ্রিত গানটি বিতরিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে—'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ'! যে অপূর্ব্ব সুরে, উদাত্ত মধুর দৃপ্ত সুর-সংযোগে গীত হইতে লাগিল এবং সেই বিশাল জনমণ্ডলীর হৃদয়ে তাহার নীরব প্রতিধ্বনি বায়ুমণ্ডলে যে তাড়িত সঞ্চার করিতেছিল, আজও যেন তাহা শুনিতেছি ও অনুভব করিতেছি—সেই আকাশ বাতাস যেন আমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে! সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পরিচয় আরও নিঃসংশয়রূপে পাইলাম। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার হাসির গানের

হাসিতে সারা বাংলাদেশ সাড়া দিয়াছিল, আমার প্রাণও সেই হাসি হাসিতে শিখিয়াছিল; কিন্তু সেদিনের সে পরিচয় অন্তরূপ।

ক্রমে দেশের সেই ভাবপ্লাবন আর এক রূপ ধারণ করিল—১৯০৪।৫ হইতে ১৯০৮।৯-এর মধ্যেই সেই ভাবাবেগ বিপ্লবের গোপন কুটিল পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। নিছক ভাবের উদ্দীপনায় তখন ক্লান্তি আসিয়াছে, তাই একদিকে সেই অতি-স্ফীত ভাব-বাষ্পরাশিকে কোন কর্ম্ম-পন্থায় শক্তিরূপে সার্থক করিবার উদ্যম যেমন চলিতেছে, তেমনই আর একদিকে, গান ও বক্তৃতার ভূরি-ভোজের পরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রসচর্চ্চার আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ততদিনে সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে পক্ষে প্রেরণার অভাব হইল না। জীবন হইতে একটু দূরে সরিয়া বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রসচর্চ্চাকেই বরণীয় মনে করিয়া একটি সাহিত্যিক সমাজ ধীরে ধীরে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল; রবীন্দ্র-প্রতিভার যাহা শ্রেষ্ঠ দান তাহাকেই আদর্শ করিয়া—আমরা সেকালের অধিকাংশ তরুণ সাহিত্যিক—একটা উন্নত ভাব-জীবনের আরাধনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলাম। ঠিক এইকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এক নূতন ব্রতে ব্রতী হইলেন—তিনি জাতি ও সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর যোগ রক্ষা করিয়া প্রেমকেই সাহিত্যের প্রেরণা করিয়া সূক্ষ্ম-ভাবরস-বঞ্চিত মূঢ় মূক জনগণের প্রাণমন জাগ্রত করিবার জন্য ভিন্ন আদর্শের পক্ষপাতী হইলেন। সেদিন আমরাও ইহা বুঝি নাই; সাহিত্যের অতি বিশুদ্ধ আদর্শ নয়, জাতির জীবন-মরণের সমস্যার উপরে ব্যক্তি বা দলগত ভাব-বিলাসকেই স্থান দেওয়ার প্রবৃত্তি নয়—দ্বিজেন্দ্রলাল চাহিয়াছিলেন জাতির কল্যাণ—সাহিত্যকেও মানবসাধারণের ভাবভূমিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিতে। যাহা সর্ব্বজনহৃদয়বেদ্য, যাহা সবল সুস্থ চিত্তের পথ্য, যাহা মনের মোহ সৃষ্টি না করিয়া প্রাণে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার করে, যাহার রস রামায়ণ মহাভারতের কাব্যরসের মত লোকায়ত—দ্বিজেন্দ্র-লাল তাহাকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আদর্শ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিয়াছিলেন এবং নিজ হৃদয়ের সেই দৃঢ় বিশ্বাস-বশে তিনি সেকালে যে ভাবে তাঁহার সেই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার দুই দিকই তাঁহার পক্ষে অতিশয় যথার্থ হইয়াছিল। একদিকে তিনি সেই অত্যুচ্চ সাহিত্যিক অভিযানের বিরুদ্ধে নিজ মত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—তজ্জন্য রবীন্দ্র-শিষ্যগণ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি গঞ্জনা করিয়াছিলেন। সে ঘটনা আমার মনে আর সকল স্মৃতি অপেক্ষা গভীরতর ভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে—কারণ তখন সেই সাহিত্যিক যুদ্ধে যোগ দিবার মত সাবালকত্ব লাভ না করিলেও আমি সেই বিরুদ্ধ দলেরই শিবির-সহচর ছিলাম। আমার মনেও যে সেই মসীযুদ্ধের কলঙ্ক একটুও লাগে নাই তাহা নহে, কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে অস্ত্র-নির্ম্মাণ বা অস্ত্র-নিক্ষেপ—কোনটাতেই আমার ডাক পড়ে নাই এবং আমিও নম্রতাক্রমে সেই সকল রথী ও সারথিগণের পশ্চাতে অবস্থান করিয়াছিলাম। আজ যখন সেই কথা মনে পড়ে, তখন ভাবি—প্রথম হইতেই আমরা কি ভুলই করিয়াছিলাম! জীবনে ও সাহিত্যে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ও নব শিক্ষাবিধির প্রণয়নে—ভাবে ও চিন্তায়, মন্ত্রে ও তন্ত্রে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে—সে বিরোধ আজিও ঘুচিল না! সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ সম্বন্ধে আমি আজিও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সকল বিষয়ে এক মত নহি; কিন্তু আমাদের সমাজের তৎকালীন অবস্থায়, সাহিত্যের নীতি-নিরূপণে তিনি যে প্রেম ও বাস্তববুদ্ধি, সুস্থ চিত্তবৃত্তি ও লিপি-সংযমের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে আজিও সত্য। অপর দিকে, দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে কেবল রসচর্চ্চার বিষয় না করিয়া—ভাবের জীবনোদ্যম-সুলভ রূপ দেখাইবার জন্য, অতঃপর নাটক রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাট্যাদর্শ—তাহার এক দিকের সেই দুর্নীতি-মধুর লঘু-লাস্যের স্রোত এবং অপর দিকের সেই জীবনাবেগবর্জ্জিত মধ্যযুগীয় ভক্তিবিহ্বলতা ও পাপপুণ্য-সংস্কারের তামসিক আদর্শ—সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। নাট্যশিল্পের আদর্শ উন্নত ও রুচি মার্জ্জিত করিয়া এবং নাটকরচনায় কাব্যসঙ্গত কারুকলার দ্বারা শিক্ষিত সমাজকে নাট্যানুরাগী করিয়া তিনি সেই যুগের অবোধ ভাবাতিরেককে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বসাধনার পথে প্রেরিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—জাতির প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা জানি।

আমি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যশিল্প অথবা তাঁহার কাব্য-কীর্ত্তির সম্বন্ধে কোন আলোচনা এ সভায় করিব না—এ

উপলক্ষে সে অবকাশও নাই; কেবল তাঁহার প্রতিভার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তির সম্বন্ধে বহু রসিক ও মনস্বী তাঁহাদের মতামত বহু পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন; আমি আমার ধারণামত তাঁহাদেরই কোন কোন কথার পুনরুল্লেখ করিব মাত্র।

আমার মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ও রচনাশক্তির সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা—বাংলা কবিতার ছন্দে ও বাংলা গানের সুরে তাঁহার ভঙ্গির অভিনবত্ব। হাসির গান-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাহার ভাষা ও ছন্দ—এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহার ব্যক্তিত্ব, ইহাই তাঁহার স্টাইল এবং ইহা তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনাতেই লক্ষ্য করা যাইবে। ইহার মূলে আছে একটি নূতন সুর--বিলাতী ও দেশীয় সুরের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সেই সুর জন্মলাভ করিয়াছিল। হাসির গান-এর অধিকাংশে যেমন, তেমনই 'মেবার পাহাড়' 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি' প্রভৃতি বিখ্যাত গীতগুলিতেও এই মিশ্র সুর, বাংলা ভাষায় এক নূতন ভাবানুভূতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, আমাদের হৃদয়বীণায় এক নূতন তন্ত্রী যুক্ত করিয়াছে। এই সুরকেই তাঁহার স্টাইল বলিয়াছি, তার কারণ ইহাই তাঁহার কবিমানসের প্রতিকৃতি—এই সুরের ছাঁচেই তাঁহার ভাষাও গড়িয়া উঠিয়াছে; এজন্য দ্বিজেন্দ্রলালকে মুখ্যত বাণীশিল্পী না বলিয়া বিশিষ্ট সুরশিল্পী বলাই অধিকতর সঙ্গত। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার যে স্বতন্ত্র ভঙ্গী সহসা একটা ম্যানারিজম্ বলিয়া মনে হয়—আসলে তাহা ঐ সুরেরই বাক্-ভঙ্গি। এই সুরকে বুঝিতে পারিলেই তাঁহার ব্যক্তি-স্বভাব ও কবি-প্রকৃতিকে বুঝিতে পারা যাইবে। জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে যে একটি ঋজুতা ও পৌরুষ তাঁহার উপাস্য ছিল—যে সবল হৃদয়াবেগ ও আত্মপ্রত্যয়মূলক আদর্শপ্রীতি তাঁহার একান্ত স্বধর্ম্ম ছিল—তাহারই প্রকাশ হইয়াছিল ঐ সুরে। ভাবের স্পষ্টতা এবং তাহার অকপট প্রকাশ যেমন তাঁহার কাম্য ছিল, তেমনই সেই বাণী-রচনার ছন্দে ও সুরে, সুস্থ ও দৃপ্ত জীবনাবেগের উৎসার তিনি বড়ই পছন্দ করিতেন। ইংরেজী ছন্দ ও ইংরেজী সুর—এই জন্যই তাঁহার স্বভাবের বড় অনুকূল হইয়াছিল এবং সেই সুর তিনি যে এমন করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অসাধারণ গীতি-প্রতিভার নিদর্শন। মধুসূদন যেমন বিজাতির সাহিত্যিক আদর্শ নিজের আত্মায় আত্মসাৎ করিয়া বাংলা কাব্যকে নব-কলেবর দান করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও, আর একক্ষেত্রে, সেই ধরণের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—বিলাতী গীতি-সুর নিজ প্রাণে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাংলা ছন্দে ও বাংলা সঙ্গীতে রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুরের সেই অভিনবত্বই বাংলা ভাষায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান।

এই সুর তাঁহার হাসির গানের ভাষায় ও ছন্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। মন ও প্রাণের যে স্বাস্থ্য ও স্বভাবের যে ঋজুতা থাকিলে—ভণ্ডামি, ভীরুতা ও নানা কুসংস্কার বিরক্তি উদ্রেক করিলেও তাহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির নিরতিশয় দুর্ব্বলতা ও অক্ষমের নিষ্ফল আত্মাভিমানপ্রসূত বলিয়া, আক্রোশ বা ঘৃণার পরিবর্ত্তে অনুকম্পা, এমন কি, সহানুভূতির উদ্রেক হয়—সেই বিচারশীল সহানুভূতি ও মুক্ত মনের রসপ্রবণতা হইতেই এমন নির্ম্মল উচ্ছল হাস্যাবেগ উৎসারিত হইয়াছিল। ঠিক এইরূপ প্রাণ এমন সাহিত্যিক প্রতিভার সহিত পূর্ব্বে কখনও যুক্ত হয় নাই—আবার, সেই প্রাণে অপর এক প্রাণবন্ত জাতির সহজ স্বাধীন অকপট পৌরুষের সুর এমন করিয়া প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই আমাদের সাহিত্যে ঠিক এই ধরণের হাস্যরস ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও বিকাশ লাভ করে নাই। এমনই দরাজ প্রাণের দরাজ হাসি লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার স্বজাতিকে প্রথম রীতিমত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। তারপর, সেই প্রাণ ও সেই প্রেম, নিজস্ব সুরে ও নিজস্ব ভাষায় নব মনুষ্যত্বের গান গাহিয়াছিল; উনবিংশ শতাব্দীর সেই নব আদর্শে—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত সেই একই সাধনার ধারায়—পাশ্চাত্য আদর্শকে স্বকীয় আদর্শে আত্মসাৎ করিয়া, সেই নবধর্ম্মের দীক্ষামন্ত্রে তাহা একটি নূতন সুর যোজনা করিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকেও আমি তাঁহার সেই এক সুরেরই অন্যতর বাণীরূপ বলিয়া মনে করি। নিছক আর্ট বা নাট্যশিল্পের দিক দিয়া তাহাদের বিচার যেমনই হোক, তিনি সেগুলির মধ্যে জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব-সাধনার যে আকুল উৎকণ্ঠা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন—যে কণ্ঠে তিনি 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া বাঙালীকে ডাকিয়াছিলেন, তাহাতে ভাবের এমন পৌরুষ ও আবেগের এমন আন্তরিকতা ছিল যে, সকলে তাঁহার সেই বাণী মুগ্ধ ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছিল। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সহজ পৌরুষ ও প্রাণশক্তির সুর তাঁহার কণ্ঠে বাজিয়াছিল, তাহাই বাংলা ভাষায় ও বাঙালীর গানে দ্বিজেন্দ্রলালের অবিনশ্বর বাণী-মূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছে।

আজ আমি সেই হাসির সুবর্ণ-কিরণ ও অশ্রুর শিশির-বাষ্পের কাব্যশিল্পী, প্রেম ও সত্যের স্বভাবসাধক, স্ফুটবাক্ ও মুক্তকণ্ঠ, দেশ-প্রেমিক চারণ-কবির উদ্দেশে আমার হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম, —সেই সঙ্গে জাতির জীবনে সেই আকালিক বসন্তাগম এবং আমার যৌবনদিনের সেই সাহিত্যিক উন্মাদনা পুনরায় স্মরণ করিয়া আমি আপনাদের এই পুণ্য অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি। *

* নদীয়া-সম্মেলনের উদ্যোগে আশুতোষ কলেজ-হলে অনুষ্ঠিত স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই অন্যান্য রণাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মানী যে বর্ত্তমান যুদ্ধে এক সঙ্গে একাধিক রণাঙ্গণে যুদ্ধ পরিচালনে একান্ত অনিচ্ছুক, ইহা আমরা যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই লক্ষ্য করিতেছি। গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মান সম্রাট কাইজার যে ভুল করিয়াছিলেন, হিটলার আজ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সেই ভুল এড়াইয়া চলিতে বদ্ধপরিকর। অনিবার্য্য কারণ উপস্থিত না হইলে একাধিক রণাঙ্গণ হিটলার সৃষ্টি করিবেন না। অক্ষশক্তির অপর এক সহযোগী জাপান এখনও যুদ্ধে নামে নাই। সুতরাং অপর কোন রণাঙ্গণে যুদ্ধ চালাইতে হইলে বর্ত্তমানে তাহা মুসোলিনী পরিচালিত করিবেন।



জেনারেল ফ্রাঙ্কো

কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ইটালীর অবস্থা আজ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানীর সহিত নিজের ভাগ্যকে জড়িত করিয়া ইটালী আজ লাভের বদলে লোকসান দিয়াই চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে উত্তর আফ্রিকায় যে সকল স্থান সে দখল করিয়াছিল, আজ তাহার প্রায় সকলগুলিই হস্তচ্যুত। এমন কি ১৯৩৫ সালে যুদ্ধ দ্বারা লব্ধ আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত তাহার হাতের বাহিরে চলিয়া গেল। সম্রাট হাইলে-সেলাসি পুনরায় আবিসিনিয়ার সম্রাট হইয়াছেন। দ্বিলক্ষাধিক সৈন্যসহ ডিউক অফ্ আওষ্টা পূর্ব্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সম্প্রতি বৃটিশ সরকারের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া আবিসিনিয়াস্থিত শেষ ইটালীয় সাম্রাজ্য-বাহিনী পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছে। উপযুক্ত সমরোপকরণ এবং প্রয়োজন মত নূতন বাহিনীর সহযোগিতা যে ইটালীয় সৈন্যগণ পায় নাই ইহা সত্য কথা, কিন্তু তাহা হইলেও মধ্য আফ্রিকায় যে ইটালী কর্ত্তৃক বৃটিশ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা শেষ হইল ইহা অস্বীকার করা চলে না। সৈন্যদলকে সাম্রাজ্য হইতে দূর দেশে যুদ্ধে পাঠাইয়া যথোপযুক্ত সমর-সম্ভার এবং নূতন সাহায্য বাহিনী পাঠাইবার অক্ষমতা যে যুদ্ধ পরিচালনায় উপযুক্ত শক্তি ও পরিচালন দক্ষতার অভাবেই ঘটে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইটালীর ইতিহাসে আফ্রিকার এই যুদ্ধ এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

বর্ত্তমানে একমাত্র উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু তাহাও অতি সামান্য। সল্লাম ও বেন্‌ঘাজিতে উভয়পক্ষে মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি লাগাইয়া যুদ্ধকে পুনরুজ্জীবিত রাখিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে মাত্র। আবিসিনিয়ার উত্তরে বৃটিশ বাহিনীর দখল কার্য্য বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিয়াছে।

সিরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি

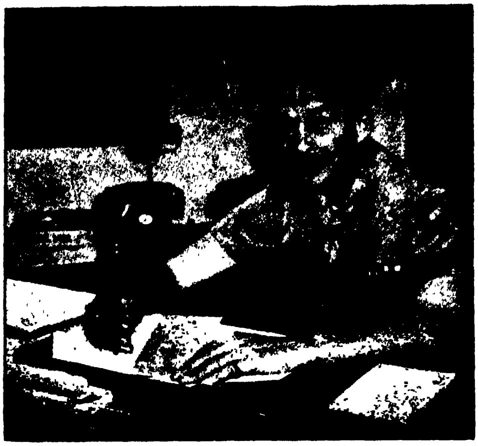
গত ১২ই জুলাই রাত ১০-৪০ মিনিটে ভিসি কমিশন যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর শতাধিক বৎসর পরে



ভারতে নির্ম্মিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ 'ত্রিবাঙ্কুর'

ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে এই প্রথম যুদ্ধ-বিরতি বৈঠক। বৈঠকে আলোচনা ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পর মিত্রশক্তি বাহিনী বেইরুতে প্রবেশ করে এবং ১৫ই জুলাই সোমবার অপরাহ্নে আক্রেতে বৃটিশ ও ভিসি সরকারের পক্ষ হইতে সরকারীভাবে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। মিত্র বাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ জেনারেল স্যর এইচ্, এম্, উইল্‌সন্ এবং জেনারেল ডেন্‌ৎস্-এর প্রতিনিধি জেনারেল ছ ভার্দিলাক এই চুক্তিপত্র

স্বাক্ষর করেন। স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর নেতা জেনারেল কাত্রো স্বাক্ষরকালে উপস্থিত ছিলেন। বৃটিশ সরকার পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন সিরিয়া দখলের উদ্দেশ্যে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেছেন না। যুদ্ধ-বিরতির



বয়স্কাউটের নূতন চিফ্ লর্ড সমার্স (লর্ড বাডেন পাউয়েলের স্থলাভিষিক্ত)

প্রধান সর্ত্তগুলি অনুযায়ী মিত্রশক্তির অধীনে বন্দী সৈন্যদের মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাহারা মিত্রশক্তিতে যোগদান বা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। ফরাসী সৈন্যগণ পূর্ণ সামরিক সম্মান লাভ করিবে। সমর-সম্ভার বৃটিশের রক্ষণাধীনে রাখা হইবে। সৈন্যদিগকে অস্ত্র দিলেও গুলি রাখিতে দেওয়া হইবে না! মিত্রশক্তির বন্দীদিগকেও অবিলম্বে মুক্তিদান করিতে হইবে।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ

রুশ-জার্মান যুদ্ধ বর্ত্তমানে পঞ্চম সপ্তাহে পদার্পণ করিয়াছে। হিটলারের উদ্ধত দম্ভোক্তি সত্ত্বেও এখনও যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ণীত হয় নাই। বরং জার্মান বাহিনীর যে বিশেষত্ব বিদ্যুৎগতি আক্রমণ, তাহাও রুশবাহিনী প্রতিহত করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্মান বাহিনী এই ব্লিজক্রিগেই সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই ব্লিজক্রিগ্ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলেই সমগ্র ইয়োরোপ আজ জার্মান শক্তির নিকট পর্য্যুদস্ত। সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া অতর্কিতে শত্রু বাহিনীর উপর বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপাইয়া পড়াই যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষগণের বিশ্বাস। কিন্তু রুশ সেনাধিনায়কগণ বিপরীত মতাবলম্বী। সমগ্র রণাঙ্গণে শত্রুপক্ষকে বাধা দিয়া ধীরগতি ও সমান শক্তি প্রয়োগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই যুদ্ধ পরিচালনার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া রুশ সমর-বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ পদ্ধতি উৎকৃষ্টতর তাহা বিচারের সময় এখনও আসে নাই। তবে জার্মান বাহিনীর প্রথম আক্রমণ যে প্রতিহত হইয়াছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া যুদ্ধে কে কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রত্যেকেই অপর পক্ষের কতটা ক্ষতি করিয়াছেন তাহার দীর্ঘ ফিরিস্তি প্রদানে কার্পণ্য করেন নাই। যুদ্ধারম্ভের তিন সপ্তাহ পরে যে জার্মান ইস্তাহার বাহির হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা জানাইয়াছেন—চার লক্ষ রুশ সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং প্রচুর রণ-সম্ভার জার্মানীর হাতে আসিয়াছে। একমাত্র বিয়ালিষ্টক্ ও মিনস্কের যুদ্ধে যে সমর-সম্ভার জার্মানী হস্তগত করিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বহু জেনারেল ও ডিভিসনাল্ কমাণ্ডার সহ ৩২৩৮৯৮জন বন্দী হইয়াছে, ৩৩৩২টি ট্যাঙ্ক এবং ১৮০৯ কামান হাতে আসিয়াছে; ঐ তিন সপ্তাহে জার্মানী নাকি রুশিয়ার ৭৬১৫টি ট্যাঙ্ক, ৪৪৩২ কামান ও অন্যান্য সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে এবং তাহারা যে বিমানবাহিনী ধ্বংস করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাকি ৬২৩৩। পক্ষান্তরে রুশ ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, অজস্র জার্মান সমরোপকরণ ধ্বংস ও সোভিয়েট সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে এবং যুদ্ধারম্ভের প্রথম পনের দিনে হতাহত জার্মান সৈন্যদের সংখ্যা ছয় লক্ষ। রুশ বিমানের আক্রমণে রুমানিয়ার



জেনারেল সার আর্চিবল্ড ওয়াভেল (বর্ত্তমানে ভারতের নূতন জঙ্গীলাট)



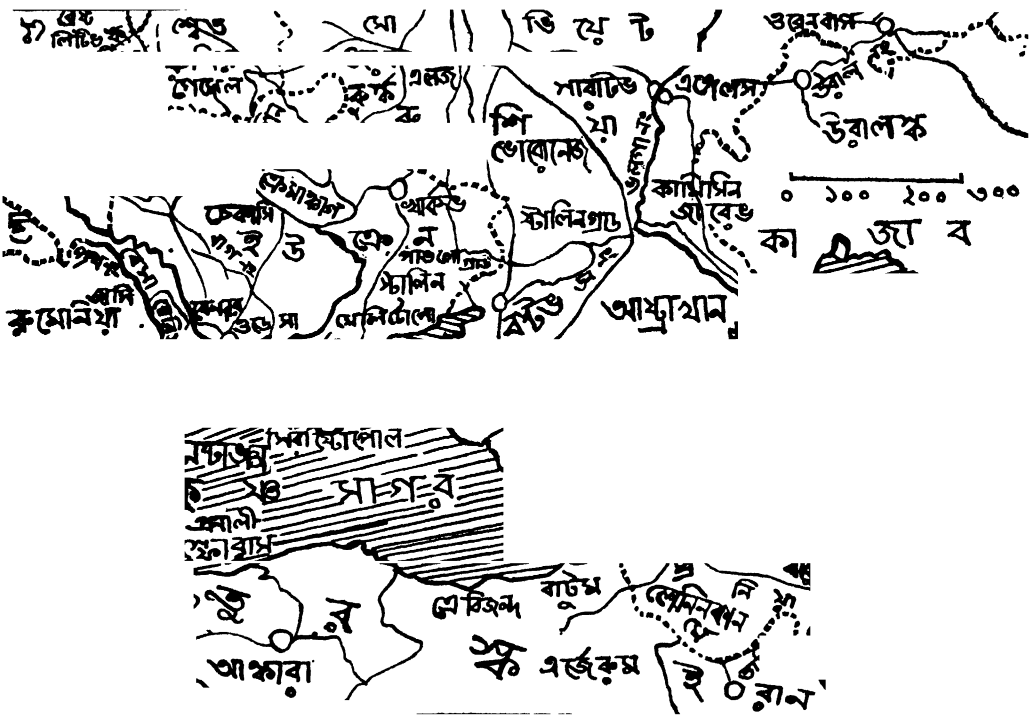
মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পুত্র ক্যাপ্টেন রুজভেল্ট (বর্ত্তমানে মধ্যপ্রাচীর বিমান সৈন্যের অধ্যক্ষ)

কনষ্টাণ্ঠা ও গালাজ বন্দর বিধ্বস্ত, মুলিনা, প্লোয়েষ্টি ও টুলসিয়ার তৈল খনি সোভিয়েট বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত অগ্নি প্রজ্জালক বোমা বর্ষণে প্রজ্জলিত, জার্মান প্যাঞ্জার বাহিনী প্রচণ্ড রুশ আক্রমণে নিশ্চিহ্ন, আবার এক ব্যাটালিয়ন্ রুমানিয়ান সৈন্ত নাকি আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অপর পক্ষে জার্মানগণ বেসারেবিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করিয়াছে বলিয়া জানাইতেছে। মিনস্ক অধিকার করিয়া তাহারা মিনস্ক-মস্কো পথে অগ্রসর ; লেলিন্‌গ্রাড্, কিয়েভ ও স্মলেনস্কের দিকে জার্মান বাহিনী প্রবল চাপ দিতেছে, নভোগ্রাড-ভলিনস্ক এলাকায় যুদ্ধ চলিয়াছে প্রচণ্ড ভাবে। স্থানে স্থানে তাহারা ষ্ট্যালিন লাইনে আক্রমণ চালাইয়া রুশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু এই বিবৃতি সত্ত্বেও উল্লিখিত সংবাদের মধ্যে কতখানি সত্য তাহা সহজে নির্ণয় করা কঠিন। জার্মানীর সরকারী ইস্তাহার আয়তনে —তাহা হইলে লাভের অনুপাতে তাহার ক্ষতির পরিমাণ হয় যথেষ্ট এবং এই বিজয়ের কোন অর্থই থাকে না। বস্তুতঃ জার্মানী যে বর্ত্তমান যুদ্ধে লোকসান দিয়াছে প্রচুর—তাহা অস্বীকারের উপায় নাই, এতদুপরি তাহার প্রথম বিদ্যুৎগতি আক্রমণ যে বিফল হইয়াছে ইহাও স্বীকার্য্য। রুশ জার্মান যুদ্ধের গতিকে আমরা দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করিতে পারি : প্রথম নাৎসী আক্রমণ এবং তাহার অসাফল্য পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় এবং বৃটেন-সোভিয়েট চুক্তি ও জার্মানীর দ্বিতীয় আক্রমণে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্বের আরম্ভ।

সোভিয়েট-বৃটিশ চুক্তি

গত ১৩ই জুলাই আক্রেতে ভিসি কমিশন যখন সিরিয়ায় যুদ্ধ বিরোধী চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিতেছেন, তখন মস্কোতে সোভিয়েট ও বৃটেনের মধ্যে



কৃষ্ণসাগরের তীরের যুদ্ধস্থল

সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্মলেনস্ক, নভোগ্রাড ও ট্যালিনের পতন হইয়াছে বলিয়া জার্মান হাইকম্যাণ্ড যুদ্ধের তৃতীয় সপ্তাহে সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী দুই সপ্তাহে সেই সকল স্থানের পুনরধিকার সম্বন্ধে সংবাদ আসিলে পূর্ব্ব ইস্তাহারের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক নহে কি? জার্মানীর প্রথম বিদ্যুৎগতি আক্রমণও বিফল হইয়াছে। বৃটেনের কূটনীতিক মহলে এরূপও শুনা যাইতেছে যে, জার্মানীর যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে সে যদি আরও যথেষ্ট অগ্রসর হইতে না পারে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার জন্ম আর একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বৃটেনের পক্ষ হইতে মস্কোস্থিত বৃটিশ রাজদূত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং সোভিয়েটের পক্ষ হইতে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকালে মঃ ষ্ট্যালিন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। চুক্তির প্রথম ধারা অনুযায়ী বৃটিশ ও সোভিয়েট সরকার নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্ম পরস্পরকে সাহায্য করিবেন এবং দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন পক্ষ তৃতীয়

পক্ষের সহিত সন্ধি অথবা যুদ্ধ-বিরতি বা সন্ধির আলোচনা করিবেন না। স্বাক্ষরের সময় হইতেই চুক্তিটি কার্য্যকরী হইয়াছে।

বর্ত্তমান চুক্তি যে অন্যান্য চুক্তি হইতে বিভিন্ন, ইহা যে মৈত্রী চুক্তি নয়, তাহা চুক্তির তাৎপর্য্য হইতেই বুঝা যায়। রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদ-দাতাও ইহাকে মৈত্রীচুক্তি বলা চলে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা নিছক সাহায্য চুক্তি, পরস্পরের প্রয়োজনের তাগিদেই ইহা সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তিকে আসলে যে নামে অভিহিত করা সঙ্গত হউক না কেন, চুক্তির গুরুত্ব উহাতে কিছুমাত্র কমে নাই। সোভিয়েট মতবাদ যে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী পছন্দ করেন না একথা তিনি গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তিনি বারংবার দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে নাৎসীবাদের সহিত আপোষ হওয়া অসম্ভব। জার্মানী কর্ত্তৃক রুশিয়া আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছিলেন যে জার্মান বাহিনীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, নিকট-প্রাচীতে বৃটিশ ব্যবস্থাই তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্ব এবং নিকট-প্রাচী

প্রথম বিদ্যুৎগতি আক্রমণ বিফল হওয়ার পর জার্মান বাহিনী দিন দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ৮০ লক্ষের উপর রুশ সৈন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে প্রবল বাধা দানের চেষ্টা করিতেছে। শুনা যাইতেছে একদল জার্মান বাহিনী রুশসৈন্যদের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়া নীষ্টার নদীর পূর্ব্বতীরে পৌঁছিয়াছে জার্মান ও রুমানিয়ান্ সৈন্যরা সেখানে ষ্ট্যালিন লাইন আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ইটালীয় নিউজ্ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু রুশ সৈন্যগণ



মেরী যুদ্ধে আহতদিগের পরিচর্য্যাকারীদের মধ্যে রাজ-মাতা

যে, রুশিয়াকে তাঁহারা সাহায্য করিবেন। কথানুযায়ী কার্য্য করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই। সামরিক ও অর্থনৈতিক কমিশন রুশিয়ায় প্রেরিত হইয়াছে, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ও মস্কোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার পরই এই সাহায্য চুক্তি উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। নাৎসীবাদকে দমন করিতে যেমন প্রধান মন্ত্রী বদ্ধপরিকর, রুশ-জার্মান যুদ্ধের গুরুত্বকেও তেমনই তিনি উপেক্ষা করেন নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের এক ভোজ সভায় মিঃ চার্চিল জানাইয়াছেন যে, আগামী শরৎ এবং শীতকালে গত বৎসর অপেক্ষাও কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত এলাকায় যে বৃটিশ বিমান বহরের আক্রমণ চালান হইবে একথাও প্রধান মন্ত্রী জানাইয়া দিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে বৃটিশ বাহিনী সাময়িক ভাবে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইলেও তাহাতে জার্মানী কতটা লাভ করিবে তাহাই বিচার্য্য। রোমের বেতারে জানান হইয়াছে যে বেসারেবিয়ার রাজধানী কিসিনেভ্ তিন দিন যাবৎ জ্বলিতেছে এবং রুমানিয়ান্ সৈন্যদের অগ্নি নির্ব্বাপনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। এতদুপরি মঃ ষ্ট্যালিন পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে—যদি রুশ সৈন্য কোন স্থানে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় তাহা হইলে সেই সকল স্থান তাহারা এরূপ ভাবে পুড়াইয়া বিধ্বস্ত করিয়া রাখিয়া যাইবে যে অধিকৃত অঞ্চলে জার্মানী বর্ত্তমানে কোন সুবিধাই লাভ করিতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে হিটলারের এই অভিযানে নেপোলিয়নের রুশ আক্রমণের ইতিবৃত্তেরই পুনরাবৃত্তি হইবে। ষ্ট্যালিনের একথা যে মৌখিক মাত্র নয় তাহা এই সংবাদেই প্রকাশ। রুশ সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণের সময় সমস্ত পুড়াইয়া

ছাই করিয়া দিয়াছে। ক্যারেলিয়াতে রুশেরা সহরগুলিকে ধুলার সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। ভাটসেলির প্রসিদ্ধ লৌহের কারখানা সিমেন্স মার্টিন নিশ্চিহ্ন।

নিকট-প্রাচীর পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। বিরাট বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীকে ইরাকে পাঠান হইয়াছে। জার্মানীও বুলগেরিয়া এবং তুরস্ক সীমান্তে তাহার বাহিনী প্রেরণ করিয়াছে। ইটালীও থ্যাস্ দ্বীপে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই ইরাকের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।



রুশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র

জার্মান বাহিনী বাকু তৈলখনির লোভে ককেশসের দিকে অভিযান চালাইতে পারে। সেই সঙ্গে ইরাকের মসুল প্রভৃতি তৈলখনির প্রতিও তাহার দৃষ্টি পড়া কিছুই অস্বাভাবিক নয় এবং অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে উহার প্রতি জার্মানীর আক্রমণেচ্ছা স্বাভাবিক। তবে জার্মানীর এই সৈন্য সমাবেশের অপর একটি কারণও থাকা অসম্ভব নয়। রুশিয়ার নৌশক্তি কৃষ্ণ-সাগরে প্রবল। ককেশাসের দিকে আক্রমণ পরিচালনার পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরে রুশিয়ার নৌশক্তিকে ঘায়েল করা প্রয়োজন। বসফরাস্ ও দার্দানেলিস্ প্রণালীর উপর যদি আজ জার্মানী কোন রকমে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে একদিকে যেমন ভূমধ্যসাগরের নৌশক্তির সহিত জার্মানী কৃষ্ণসাগরের সংযোগ রক্ষায় সমর্থ হইবে, অপর পক্ষে রুশিয়ার নৌশক্তিও তেমনই কৃষ্ণসাগরে আটক হইয়া পড়িবে। এতদুপরি ইরাকের গুরুত্ব ভারতের দিক হইতেও আদৌ উপেক্ষার নয়। সিঙ্গাপুর যেমন ভারতের পূর্ব্বে নৌঘাটি, সেইরূপ ইরাককে ভারতের পশ্চিমে দূরবর্ত্তী ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিলে ভারতের নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতের দূরবর্ত্তী ঘাঁটি হিসাবে ইরাকের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের বিদায়ী প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ অচিন্‌লেক ও বর্ত্তমান সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ওয়াভেলও নিকটপ্রাচীর গুরুত্বকে উপেক্ষা করেন নাই এবং ভারতের নিরাপত্তা সুদৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যেই যে জেনারেল ওয়াভেলকে মধ্য-প্রাচী হইতে সরাইয়া ভারতে আনা হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট।

আমেরিকা

আমেরিকার বিভিন্ন কারখানায় যে শ্রমিক ধর্ম্মঘট চলিতেছিল একথা আমরা ভারতবর্ষের গত সংখ্যাতেই উল্লেখ করিয়াছি। গত ১১ জুলাই ঐ সকল কারখানার পরিচালন ব্যাপারে রুজভেল্টকে কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করা হউক বলিয়া মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে যে প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল তাহা ১৭০-৯১ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা যখন বৃটেনকে সমর সম্ভার পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন সেই সময় এই ধরণের একটি প্রস্তাব বাতিল হওয়া নিতান্ত বিস্ময়ের নহে কি? আমেরিকা হইতে একশত তৈলবাহী জাহাজ বৃটেনে প্রেরণের যে কথা ছিল তাহাও বর্ত্তমানে সম্ভব নয় বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রকাশ এ সম্বন্ধে শীঘ্রই আলোচনা হইবে এবং সম্প্রতি ২৫ খানি জাহাজ প্রেরণ করা চলে কিনা সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। সম্প্রতি আমেরিকা আইসল্যাণ্ডে ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথম আমেরিকা হইতে

বৃটেনে মাল প্রেরিত হইলে তাহা যাহাতে নিরাপদে পৌঁছাইতে পারে আইস্‌ল্যাণ্ড হইতে সে বিষয়ে সাহায্য করা সম্ভব হইবে এবং দ্বিতীয় জার্মানরা গ্রীনল্যাণ্ডে যে উপদ্রব সুরু করিতে সচেষ্ট তাহাও প্রশমিত করা চলিবে। আইস্‌ল্যাণ্ডে সৈন্য প্রেরণে জার্মানী বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছে; হওয়াই স্বাভাবিক। বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযানে আমেরিকা যদি বাদ সাধিয়া দাঁড়ায় তাহাতে জার্মানী যে রুষ্ট হইবে ইহা জানা কথা। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতি শীঘ্র যুদ্ধে নামিয়া পড়িবে কি না বলা কঠিন। আমেরিকা যে যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে ইহা আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি। আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রও যুদ্ধে অবিলম্বে নামিয়া পড়িবার জন্য বলিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন নৌসচিব কর্ণেল নক্স তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় বিদায় গ্রহণ কালে জানান যে, বৃটেনকে সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ করার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়িত হইতে হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি নির্ভর করিতেছে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের ফলাফলের উপর—এ কথা অস্বীকার করা যায় না।



নরওয়ের রাজা
হাক-অন্‌



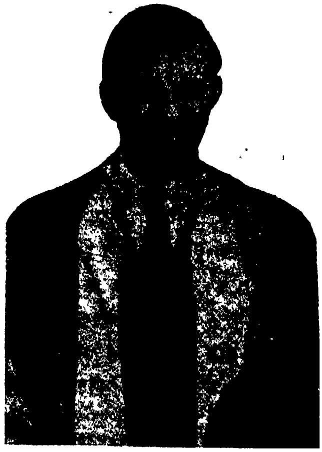
নরওয়ে, বেলজিয়াম, হলাণ্ড ও পোলাণ্ডের
মার্কিণ দূত মিঃ বিডি



মিঃ জে, জি, উইনাণ্ট—
লণ্ডনস্থ মার্কিণ দূত

জাপান

রুশ-জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপান মন্ত্রিসভার যে ঘন ঘন বৈঠক বসিতেছিল এ কথা গত সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ১৬ই জুলাই জাপান মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধিকতর শক্তিশালী মন্ত্রিসভা গঠন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রিন্স কনোয়ে এবার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী হইয়াছেন য়্যাড্‌মিরাল্‌ তয়োডা এবং সমর সচিব হইয়াছেন য়্যাড্‌মিরাল্‌ কশিরো ওইকাওয়া। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় লক্ষ্য করিবার বিষয় মাৎসুকা এবার মন্ত্রিসভার মধ্যেই নাই। যে প্রিন্স কনোয়ে বৎসর দুই পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন যে, চীন জাপান যুদ্ধের জন্য তিনিই ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী, তাঁহাকেই আবার প্রধান মন্ত্রী করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নৌবিভাগকে এইবার মন্ত্রিসভায় বিশেষ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। নৌসচিব য়্যাড্‌মিরাল্‌ কশিরো ব্যতীত পররাষ্ট্র সচিব হইয়াছেন একজন য়্যাড্‌মিরাল্‌। উপরন্তু প্রকাশ, জাপান চীন হইতে অনেক সৈন্য সরাইয়া আনিতেছে। এই সকল ঘটনা একত্রিত করিলে যে অর্থ পরিস্ফুট হয় তাহাতে বোধ হয় জাপান পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ দিকেই শীঘ্র অবহিত হইবে। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপান ইন্দোচীনের সরকারকে ২৪ ঘণ্টার চরমপত্র প্রদান করিয়াছে। ভিসি সরকার অবশ্য এই সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আমেরিকার ওয়াকিবহাল মহল জানাইতেছেন যে, গত ১৯এ জুলাই জাপ-ইন্দোচীন চুক্তি সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। তবে ইন্দোচীন পূর্ব্ব হইতেই জাপ প্রভাবাধীনে ছিল এবং ভিসি সরকারও জার্মানীর প্রভাবে চালিত। সুতরাং অক্ষশক্তির সহযোগী জাপান যে সহজেই ইন্দোচীনের সহিত নিজ খুশীমত ব্যবস্থায় আসিতে পারিবে ইহা স্বাভাবিক। ইন্দোচীনের পরেই বোধ হয় থাইল্যাণ্ডের পালা, এবং তাহার পর ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। তবে যদি জার্মানী আজ রুশিয়াকে কাবু করিতে পারে তাহা হইলে জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ কোন আশা নাই। তবে জাপান ইন্দোচীনে ঘাঁটি স্থাপন করিতে ভারতবর্ষও ব্রহ্মদেশকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়া অধিকতর প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।



মিঃ আর-জি-মেঞ্জিস
—অষ্ট্রেলিয়ার
প্রধান মন্ত্রী

২৫।৭।৪১

বৈচিত্র্য

শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীবনটাই বৈচিত্র্যের সমবায় মাত্র। জীবন-মরণের বিচিত্র গতিই সারা জীবনটাকে আন্দোলিত রাখে। বৈচিত্র্যহীন জীবন অসম্ভব কল্পনা মাত্র। এক কথায়, বৈচিত্র্যই জীবনী-শক্তির এক মাত্র ক্ষেত্র। বিশ্বক্ষেত্র বিচিত্র প্রকৃতির লীলানিকেতন। তাই বিশ্বসংসার বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ। **বৈচিত্র্যই সম্পূর্ণতা। সম্পূর্ণতাই বৈচিত্র্য।**

প্রকৃতির চরিত্রবিশ্লেষণে একমাত্র তত্ত্ব পাই—যাকে বলা যায় একের বৈচিত্র্যলীলা বা বৈচিত্র্যে একের খেলা। একা প্রকৃতি বিচিত্র হয়ে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে চলেছে। একা প্রকৃতির বিচিত্রবিধানেই অগণন বিশ্বাণ্ড প্রচলিত হয়ে অনন্তের অভিমুখে ছুটে চলেছে। এক অনন্তসত্তা বিচিত্র অসংখ্য বিশ্বসৃষ্টি করছে, পালন করছে ও প্রলয় করছে। **ঐক্যে বৈচিত্র্যপ্রতিষ্ঠাই প্রকৃতি পরিণতি বা এক কথায় নিয়তি।**

প্রকৃতির গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে অসংখ্য সৌরচক্র ঘূর্ণায়মান বৈচিত্র্যেরই লীলাপরিচয় জানাচ্চে। প্রকৃতির গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে অসংখ্য জীবজগৎ বিচিত্র আকার প্রকার স্বভাব ও চরিত্র নিয়ে অসীম কর্মতাণ্ডবে মেতে রয়েছে। প্রকৃতির গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে অগণন সত্তাগ্রাম অসংখ্য রূপ-গুণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলেছে। **একের বৈচিত্র্য প্রমাণ করে—বৈচিত্র্যে একেরই প্রতিষ্ঠা।**

প্রকৃতির সন্তান প্রকৃতিরই ছাঁচে গড়া হওয়া স্বাভাবিক মাত্র। প্রকৃতিনিয়ত বৈচিত্র্যকে ভালো না বেসে প্রকৃতির সন্তান বাঁচতেই পারে না। এক বৃত্তির উচ্ছেদ করে অন্য বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করা কি বৈচিত্র্যের মর্মনির্দেশ? কখনই না। এক গুণের লোপ বিধান করে অন্য গুণের একক সাধনা কি বৈচিত্র্য-সংগত? কিছুতেই না। চরিত্রের পূর্ণতা কি একক সাধনার সিদ্ধি মাত্র?—অসম্ভব ও অস্বাভাবিক! প্রকৃতির বিচিত্র চরিত্রকে আদর্শস্থলে খাড়া করে রেখে মনুষ্যচরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃতির বৈচিত্র্যনীতি অনুসারে মনুষ্য চরিত্রটাকে বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ রাখতে হবে। প্রকৃতি সম্মত বৈচিত্র্যাদর্শ চায় চরিত্রের সর্বমুখিতা ও প্রতিভার সর্বদর্শিতা। প্রকৃতিচরিত্রে কোথাও একদর্শিতার স্থান নেই। তবে মানুষ কেন প্রকৃতির সন্তান হয়ে বৈচিত্র্যের শাখাপ্রশাখা কেটে একক ব্রত ও একক সাধনার পথে আত্মহত্যা করতে যাবে? কখনই যেতে পারে না। যদিই বা যায়, প্রাকৃতিক বিধানেই তাকে তার স্বভাবসম্মত বিচিত্রপথে বিচিত্ররথে ফিরে আসতে হবে।—নিশ্চয়ই হবে!

প্রকৃতির রাজ্যে বৈচিত্র্যই তার রাজচ্ছত্র বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মাত্র। বিচিত্র প্রকৃতির অনুসরণে দিকে দিকে ভাবে ভাষায় অনন্তত্বেরই শুধু জীবন্ত প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠিত হচ্চে। ধর্ম বৈচিত্র্যেরই মূলতত্ত্ব বা খাঁটি অদ্বৈতবাদ প্রচার করে আসছে যুগযুগান্তর ধরে! বৈচিত্র্যের মূল সন্ধান করাই ধর্মের পরম ও চরম উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয়, এই বিরাট একীকরণের ধর্মাংগনে বৈষম্যের বিধ্বংস প্রচার হয়ে চলেছে। আর বৈচিত্র্য একের সন্ধান না করে ধর্মধ্বজীরা একের ও সর্বের সর্বনাশ করার ফন্দী আবিষ্কার করে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করচেন! বিচিত্র প্রকৃতির গর্ভে জন্ম নিয়ে মানুষ তার রাষ্ট্রচরিত্রের বৈচিত্র্যলোপ করতে বসেছে। রণবৈশ্বানরের হোমকুণ্ডে রাষ্ট্র নাকি বৈচিত্র্যকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করতে চায়! বিচিত্র প্রকৃতির সন্তান হয়ে নাকি সকলের বাঁচবার অধিকার নেই! বৈচিত্র্যবাদী প্রকৃতিবিধান নাকি মানুষকে তার একক প্রাধান্যে প্রশ্রয় বা আশ্রয় দান করবে? আশ্চর্য আবিষ্কার! ততোধিক অহমিকার আশ্চর্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা মাত্র! বৈচিত্র্যবিলাসে একা প্রকৃতি অসংখ্য সৃষ্টিপ্রকরণে প্রমত্তা! সৃষ্টির উদ্দেশ্য বৈচিত্র্য-উৎপাদন ও বৈচিত্র্য-সংরক্ষণ! কারও সাধ্য নেই একের প্রতিষ্ঠায় বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে! যদি কোনও একক প্রাধান্য বৈচিত্র্যগ্রামকে ধ্বংসের অনলে পুড়িয়ে শেষ করতে চায়, প্রাকৃতিক বিধানে সেই একক প্রতিষ্ঠা বৈচিত্র্য-নিষ্ঠার চাপে ধ্বংসলীন হতে বাধ্য হবে। প্রকৃতির নিয়মই সর্বত্র বলবান থাকবে। সন্তানের সাধ্য নেই সে তার জননীর বিধাননীতি লংঘন করে। মদগর্ব বা প্রাধান্যবাদ কোনও দিনই প্রকৃতির বক্ষে প্রতিষ্ঠা পাবে না। সাম্য ও বৈচিত্র্য পাশাপাশি থেকে প্রকৃতির পরিপূর্ণতা সাধন করবে। হিংসাকে মেরে অহিংসা বড় হবে না। অহিংসাকে চুরমার করে হিংসাও অমর হতে পারবে না। কামকে লুপ্ত রেখে প্রেম বাহবা পাবে না। প্রেমকে অগ্রাহ্য করে কাম প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। ক্রোধকে নির্বাসিত করে দয়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দয়াকে নির্বাপিত রেখে ক্রোধও জয়ী হবে না। থাকবে সবাই। লড়বে সবাই। প্রতিষ্ঠা পাবে সবাই। সমবায়ই শ্রেষ্ঠ। সমন্বয়ই কার্যকরী। **প্রকৃতির অভিপ্রায়ই বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠা!**

ধর্মজগতে একের বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যে একের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রজগতে বৈচিত্র্যের সন্মান ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা রাখতে হবেই। অর্থজগতে বৈচিত্র্যের স্ফূর্তি ও সর্বভাবের জাগরণ প্রয়োজনীয়। নীতিজগতে প্রকৃতির বিচিত্র চরিত্র অনুসরণ কার্যই কর্তব্য মাত্র। সর্বসাধারণ চরিত্রে প্রকৃতি-সংগত বৈচিত্র্যের মহিম অনুষ্ঠান নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করাই নিরাপদ ও মংগলজনক।

সাময়িকী

পাট সমস্যা ও নূতন কর—

বাঙ্গালা সরকার পাট-সমস্যা সম্পর্কে কোন সমাধানেই আসিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে যে, পাটশিল্পের উন্নতি, পাটচাষীদের সন্তোষজনক মূল্য পাইবার ব্যবস্থা এবং পাটের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বাঙ্গালা সরকার পাটের একটা স্থায়ী মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি পরিকল্পনা স্থির করিতেছেন এবং এই পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিতে অন্যূন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই টাকাটা সরকারের সাধারণ তহবিল হইতে সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া সরকার একটি নূতন ট্যাক্স বসাইবার জন্য পরিষদে বিল উপস্থিত করিতে যাইতেছেন। এই বিল আইনে পরিণত হইলে চটকলসমূহ ও রপ্তানিকারীদের নিকট হইতে পাট ক্রয়ের সময় মণ প্রতি দুই আনা হিসাবে কর আদায় করা হইবে। গত তিন বৎসর ধরিয়া পাট লইয়া বহু রকমের পরীক্ষা চলিতেছে কিন্তু তাহার কোনটিতেই পাটচাষীর অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই ; হতভাগ্য পাটচাষীদের ভাগ্য লইয়া এই যে বার বার ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে, ইহাতে কবে যবনিকাপাত হইবে, আমরা সাগ্রহে কেবল সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছি।

ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ—

বাঙ্গালা সরকার ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই যে হাস্যাস্পদ হইতেছেন তাহার প্রমাণ প্রায়ই সংবাদপত্রে পাইতেছি, অতিরিক্ত উৎসাহীদের হাতে পড়িয়া ভারতরক্ষা আইন ও বিধানের যে অপূর্ব্ব সদ্গতি হইতেছে তাহার আর একটি নমুনা দিতেছি।—

শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ এবং অপর তিনজনকে ভারতরক্ষা বিধানের ৫৬(৪) ধারা অনুসারে শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। মহকুমা হাকিম আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু আপীলে হুগলীর দায়রা জজ শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র চন্দ্র অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই বলিয়া আসামীদিগকে মুক্তিদান করেন। বাঙ্গালা সরকার আপীলের বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়ায় হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি হেণ্ডার্সন ও বিচারপতি লজ্ এ বিষয়ে দায়রা জজের সহিত একমত হইয়াছেন। জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটিতে পারে এমন কার্য্যের জন্য কাহাকেও দণ্ডদান করিতে হইলে, সত্যই তেমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল কি না তাহা প্রমাণ করিতে হয়। বিচারপতিরা বলিয়াছেন যে ফরিয়াদীপক্ষ তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে যে বঙ্গীয় বিক্রয়কর বিল পাশ হইয়াছে, বড়লাট তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। এই আইন অনুসারে যেসকল আমদানিকারী, প্রস্তুতকারী ও উৎপাদনকারীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ দশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য যেসকল ব্যবসায়ীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহাদিগকে প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে কর দিতে হইবে। নিম্নের লেখা ৩১ দফা দ্রব্য এই আইনের আমলে আসিবে না।—

(১) সমস্ত খাদ্য শস্য ও ডাল (চাউল সহ), (২) ময়দা (আটা, সুজি ও ভূষি সহ), (৩) রুটি, (৪) সাধারণ মাংস, (৫) টাটকা মাছ, (৬) টিনে ভর্ত্তি নহে এরূপ তরিতরকারি, (৭) কেক, পেষ্ট্রী ও মিষ্টান্ন ছাড়া পক্ব অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যাহা টিনে ভর্ত্তি নহে, (৮) গুড়, চিনি ও ঝোলাগুড়, (৯) লবণ, (১০) সরিষার তৈল ও শ্বেত সরিষার তৈল এবং এই দুইয়ের সংমিশ্রণ, (১১) দুধ, (১২) গবাদি পশু (হাঁস মুরগী নহে), (১৩) কৃষির সরঞ্জাম, (১৪) জমির সার, (১৫) সুতা, (১৬) তাঁতের কাপড় (যে ব্যবসায়ী অন্য প্রকারের কাপড় বিক্রয় করে না), (১৭) কেরোসিন তৈল, (১৮) হুঁকায় সেবনোপযোগী তামাক, (১৯) দিয়াশলাই, (২০) কুইনাইন ও কেমিকিউজ, (২১) ১ম হইতে ৪র্থ শ্রেণী

পর্য্যন্ত প্রাথমিক ক্লাসসমূহের জন্ম অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ এবং যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, (২২) স্বর্ণ ও রৌপ্যের তাল, (২৩) স্বর্ণের অলঙ্কার যে স্থলে প্রস্তুতকারক স্বর্ণের দাম ও মজুরী পৃথক ভাবে লয়, (২৪) কাঁচা কয়লা ও পোড়া কয়লা, (২৫) দেশী মদ (তাড়ি ও পচাইসহ), বিদেশী মদ (ঔষধসংযুক্ত মদ্য সহ), গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ ও চরস, (২৬) জল, যখন বোতলে বা শীলমোহর করা পাত্রে বিক্রয় হয় (কিন্তু এরিটেড ওয়াটার নহে), (২৭) বৈদ্যুতিক-শক্তি, (২৮) কয়লা হইতে উৎপন্ন গ্যাস—যেমন কোন গ্যাস সরবরাহ কোম্পানী গবর্ণমেণ্ট বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্ম বিক্রয় করিবে—বসবাসের বাড়ীতে বা অফিস বাড়ীতে ব্যবহারের জন্ম নহে, (২৯) মোটর স্পিরিট, (৩০) সংবাদপত্র ও (৩১) কাঁচা চামড়া।

১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে এই আইন বলবৎ হইলেও ১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবরের পর যে বিক্রয় হইবে তাহার উপর কর ধার্য্য করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

টিটাগড় কাগজের কলের লাভ—

যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে কাগজের আমদানি একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ফলে খবরের কাগজের কর্ত্তৃপক্ষ ও পুস্তক-প্রকাশকেরা দেশী কলের তৈয়ারি কাগজের উপর বিশেষ নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই লড়াইয়ের ওজুহাতে দেশী কাগজের কলওয়ালারাও কাগজের দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত দিবার জন্ম টিটাগড় পেপার মিল-এর উল্লেখ করা যায়। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে ৬ মাসে সরকারী ট্যাক্স লইয়া টিটাগড় কোম্পানী মোট লাভ করে ১১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। যুদ্ধ হইবার পরে ৬ মাসে অর্থাৎ—১৯৪০ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে ইহা বাড়িয়া গিয়া ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, সরকারী ট্যাক্স বাদেই উক্ত ছয় মাসে কোম্পানীর ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে আয়-কর, সুপার ট্যাক্স, অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী ট্যাক্সের যেরূপ বহর বাড়িয়াছে তাহাতে একথা নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে যে, আলোচ্য ছয় মাসে সরকারী ট্যাক্স সমেত টিটাগড় কোম্পানীর লাভের পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকারও অনেক বেশী হইয়াছে। এবিষয়ে বাঙ্গালা সরকারের পণ্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কি ঘুমাইয়া আছেন?

সরকারী চাকুরিয়াদের বেতন কর্ত্তন—

ব্যয়সংক্ষেপের ওজুহাতে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যদের বেতন কমাইবার যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল, তাহার ফলে সদস্যদের মাসিক বেতন ৬৬৬৬৲ টাকা হইতে কমাইয়া ৫০০০৲ টাকা হইবে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তবে সেই সঙ্গে সদস্যরা বাড়ী ভাড়া খাতে পাঁচশত টাকা করিয়া লইবেন এবং আগের মতই ভাড়া না দিয়াই সরকারী বাড়ীতে বাস করিবেন। ইনকম্ ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্সের ব্যাপারেও তাঁহারা সুবিধা পাইবেন। এই সব মিলিয়া দেখা গেল যে, আসলে মাত্র একশত টাকা করিয়া তাঁহাদের বেতন হইতে কর্ত্তন করা হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। উক্ত বাজেটে আয় ৩৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫ শত ৫৫ টাকা এবং ব্যয় ৪১ লক্ষ ২২ হাজার ৮ শত ৮৪ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্ষের গোড়ায় ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩ শত ৪ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে আছে বলিয়া বাজেটে দেখান হইয়াছে। বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়া ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জন্ম ৪২ হাজার টাকা ও সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগের ব্যয় বাবদ ১৫ হাজার ৬ শত ৫০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। এই বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফি বাবদ ১৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৯০ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। পূর্ব্ববৎসর এই খাতে সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৯ শত ৮ টাকা আয় হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, আগের বৎসর উক্ত খাতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। সরকার গত বৎসরের মত এ বৎসরও ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

গত বৎসর পরীক্ষাদিতে ব্যয় হইয়াছিল ৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৩ শত ৭২ টাকা, এ বৎসর এইরূপ ব্যয় বাবদ ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে।

নৌবিভাগে প্রবেশের যোগ্যতা—

ভারতে বৃটিশ সামরিক নীতি চিরকাল বলিয়া আসিয়াছে যে, ভারতবাসীরা অলস, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত সৈনিকের নিতান্ত অভাব। কিন্তু এ সংবাদ যে মিথ্যা তাহা গত মহাযুদ্ধে পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে। সে সময় ভারতীয় খালাসীরা যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিলেও যে সমস্ত শ্রেণীর লোক হইতে খালাসী সারেঙ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়, তাহাদের জন্য নৌবহরে স্থানের ব্যবস্থা হয় নাই। ইহাদের মধ্য হইতে লোক সংগৃহীত করার ব্যবস্থা থাকিলে ইংলণ্ড আজ এই দুর্দ্দিনে অনেক নৌসৈন্য পাইতে পারিত। বর্ত্তমান যুদ্ধেও জার্মান সাবমেরিনের বিপদ উপেক্ষা করিয়াই যে ভারতীয় খালাসীরা জাহাজ চালাইতেছে শুধু তাহাই নহে, তাহারা সময় সময় যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শনে নিজেদের নৌসৈন্য হইবার যোগ্যতা প্রমাণিত করিতেছে। লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জাফর আলি ও আব্দুল নামক দুইজন খালাসী জাহাজ টর্পেডো-বিদ্ধ হওয়ার পর নির্ভয়ে জাহাজের সকল যাত্রীকে সুশৃঙ্খলায় বোটে নামাইয়া রক্ষা করিবার নিপুণ ব্যবস্থা করার জন্য এবং তাহার পর যাত্রীসহ বোটকে সুন্দরভাবে রক্ষা করিবার জন্য এম্পায়ার মেডেল পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ইহার পরও কি বাঙ্গালী মুসলমানের নৌবহরে প্রবেশের দাবী স্বীকৃত হইবে না ?

আসাম আদমসুমারির বিশেষত্ব—

আসামের আদমসুমারির যে প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই আশঙ্কাই ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে যে, সেখানকার হিন্দুর সংখ্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক কম করা হইয়াছে এবং অনেক হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইতে ইচ্ছুক লোককে 'ট্রাইব্যাল'-শ্রেণী বলিয়া রেকর্ড করা হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, সেখানে হিন্দুর সংখ্যা পূর্ব্বগণনা হইতে ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ১শত ৫৩ জন কম হইয়াছে অথচ আদিম অধিবাসী বা 'ট্রাইব্যাল' সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৬ লক্ষ বাড়িয়াছে। বিগত গণনার ইহাদের সংখ্যা সাড়ে ১১ লক্ষ ছিল। এইবার সেই সংখ্যা দ্বিগুণের উপর হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে কি? পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম বৃদ্ধি দেখা যায় না। তাহা ছাড়া, অন্য প্রদেশ হইতে দলে দলে ট্রাইব্যাল-শ্রেণীর লোক যে আসামে এই দশ বৎসরে বসবাস স্থাপন করিতে গিয়াছে, এমন কোন ঘটনার সংবাদও আমরা পাই নাই। তাই মনে হয়, পূর্ব্ব গণনায় যাহারা হিন্দু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, এবারে তাহাদের অনেকেই আদিম অধিবাসীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সত্য সত্যই এরূপ কিছু হইয়াছে কি-না, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা শুনিবার দাবী আমরা করিতে পারি।

এলোপ্যাথী ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা—

বাঙ্গালাদেশে এলোপ্যাথী ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষাদানের কোন প্রতিষ্ঠান নাই। সম্প্রতি এই অভাব দূরীকরণের জন্য আহম্মদাবাদের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত আঙ্কেলসরিয়া দুই লক্ষ টাকা দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বাঙ্গালা সরকার যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সভাপতি ছিলেন স্যর আর. এন. চোপরা এবং সদস্য ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ আরও কয়জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও রাসায়নিক। অবিলম্বে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার সুপারিশ তাঁহারা দিয়াছেন। কমিটি যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে প্রাথমিক বিধিব্যবস্থার জন্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ও পরে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। আমাদের বিশ্বাস, প্রয়োজনের গুরুত্বের তুলনায়-এই টাকাটা বিশেষ কিছু নহে। সরকারও নাকি এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। অবিলম্বে এই কল্যাণকর প্রচেষ্টা শুরু হইবে ইহাই আমরা আশা করিতে পারি।

সাহিত্যিকের পরলোকগমন—

বাঁকুড়া জেলার সুসাহিত্যিক রামানুজ কর মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস, সামাজিক পরিবর্ত্তন, ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার ও

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কেও অনুশীলন করিয়া বহু নূতন তথ্যের সন্ধান করিয়াছিলেন। সুদূর পল্লীগ্রামে বাস করিয়াও তিনি যেভাবে সাহিত্য ও দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

ভারতে প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণ—

ত্রিবাঙ্কুর মহারাজার অর্থসাহায্যে ভারতীয় নৌবহরের জন্য 'ত্রিবাঙ্কুর' নামক একখানি জাহাজ এ দেশেই নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জাহাজের ইঞ্জিন ও বয়লার ইংলণ্ড হইতে আমদানি করা হইয়াছে, আর সকল অংশই এদেশে তৈয়ারী। শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদজী মনে করেন যে, ইঞ্জিন ও বয়লারও এদেশেই তৈয়ারি হইতে পারিবে। তবু সরকার বাঙ্গালা দেশে জাহাজ নির্ম্মাণের অনুমতি শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদকে দেন নাই এবং কেন দেন নাই তাহার কারণ অজ্ঞাত।

ভারতে প্রথম বিমান নির্ম্মাণ—

হিন্দুস্থান বিমান নির্ম্মাণ কারখানা হইতে প্রথম বিমান নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শীঘ্রই বাঙ্গালোরে বিমানটি পরীক্ষা করা হইবে। কোম্পানী এই বিমানখানা ইংরেজ সরকারকে যুদ্ধে সাহায্য হিসাবে দান করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদজীর পরিকল্পনা এত শীঘ্র সার্থক হইল ইহাতে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হওয়ার কথা। এবিষয়ে পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিতেন।

বাঙ্গালী মহিলার বদান্যতা—

হাওড়ায় সংক্রামক রোগে আক্রান্তদিগের জন্য চিকিৎসার স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই অভাব দূর করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতার শ্রীমতী সত্যবালা দেবী লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। হাওড়া মিউনিসিপালিটির পক্ষে চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন সেই দান গ্রহণ করিয়াছেন। রোগীর সেবার জন্য এই দান সার্থক।

অরণ্যে রোদন—

সম্প্রতি বিলাতের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্র একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে আবার ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটিশ সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। উক্ত পত্রের সাধু প্রস্তাব যে কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিবেন—এরূপ সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবিতে পারি না। উক্ত নিবন্ধে বলা হইয়াছে যে, দুই দিক হইতেই যুদ্ধ ভারতের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বদিক হইতে জাপানীরা সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মের দিকে চাপ দিতেছে এবং উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থান ও ইরানে জার্মান ষড়যন্ত্র বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। জার্মানী যদি রুশিয়া জয় করিতে পারে, তবে ভারতের উপরও বিপদের ছায়া ঘনাইয়া আসিবে—এই সব চিন্তা করিয়া অবিলম্বে ভারতকে তুষ্ট করাই সরকারের কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। 'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান এণ্ড নেশন' পত্রিকাও ভারতের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য বার বার সরকারকে যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা রক্ষিত হইলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইত।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ—

বাঙ্গলা দরিদ্রের দেশ, সেই জন্যই বিগত শতাব্দীর জন কয়েক নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকের চেষ্টায় এ দেশে হোমিওপ্যাথী বিশেষ সমাদর লাভ করে; দিন দিন হোমিওপ্যাথীর প্রসার দেখিয়া সরকার জনস্বাস্থ্যের খাতিরে ইহা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত বিবেচনা করিয়া ইহাকে একটি নূতন স্টেট্ ফেকাল্টির হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথীর সমাদরের সঙ্গে সঙ্গে বহু অপদার্থ বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়া অগণিত অযোগ্য চিকিৎসক তৈয়ার করিতেছে। ইহাদের দ্বারা রোগের উপশম ত হয়ই না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত ফলই দেখা যায়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা যথেষ্ট। উপযুক্ত পাত্রে সেই ভার ন্যস্ত হয় ইহাই আমরা কামনা করি।

শিল্প সংরক্ষণ—

জগতে যখন যে জাতি শিল্পে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে এবং যত দিন বিনা বাধায় অপর দেশে তাহার মাল বিক্রয় করিবার সুবিধা ভোগ করিয়াছে, ততদিন সেই জাতি চাহিয়াছে "সংরক্ষণ" উঠাইয়া দিয়া সকল জাতিকেই নিজেদের শক্তিমত শিল্প প্রসারের সুযোগ দেওয়া হউক। ইংরেজ এই নীতি প্রচারে অগ্রদূত ছিল। ভীষণ

প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ এই মত বজায় রাখিতে পারে নাই। এই মত প্রচলিত থাকায় ভারতবর্ষে ইংরেজের বাণিজ্যের মহা সুযোগ ছিল—কারণ পরাধীন দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে সমস্ত সুযোগহীন ভারতবাসীর পক্ষে বাণিজ্য ব্যাপারে বিদেশীর সমকক্ষতা করা অসম্ভব ছিল। পরে নানা কারণে—বিশেষত ইংরেজ ব্যতীত অপর বিদেশীরা ভারতের বাজার দখল করাতে—সেই নীতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং ইংরেজের অনুমতিক্রমে ভারতে শিল্পবিশেষে ভেদমূলক (descriminating) সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হয়। তাহার ফলে লৌহ, শর্করা ও কাগজ শিল্প গড়িয়া ওঠে। বর্দ্ধিত হারে আয়-শুল্ক (revenue duty) নির্দ্ধারিত হওয়ায় দিয়াশলাই, কার্পাসজাত বস্ত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার শিল্প প্রসার লাভ করে। বর্ত্তমান যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ভারত সরকার তাহাদেরই রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত। দেশের দাবী—যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প বর্ত্তমানে গড়িয়া উঠিবে যুদ্ধশেষে সকলকেই বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি সরকার দিন। যাহারা পরে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদের এই সুযোগ প্রত্যাহার করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের মুখপাত্র বাণিজ্য সচিব বলেন যে তাঁহারা এই সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবেন কি-না তাহা বিচার করিতে পারেন ("Government were prepared to consider giving an assurance") অর্থাৎ সংরক্ষণ-নীতি যে গৃহীত হইয়াছে তাহা বলিতেও প্রস্তুত নহেন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোনও শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ যুদ্ধের পরে হয়ত সেই নীতি ভারতের স্বার্থে নিয়োজিত না হইয়া বিদেশীর মুখ চাহিয়া পালিত হইতে পারে। ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তাহার সফলতার আশা কোথায় ?

ভারতে দুগ্ধের ব্যবহার—

ভারতে দুগ্ধ বিক্রয় সমস্যার উপর ভারত সরকার কর্ত্তৃক যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে (Report on the Marketing of Milk in India) তাহা পাঠ করিলে ভারতে দুগ্ধ সম্পর্কিত বহু বিষয় জানিতে পারা যায়।

ভারতে আন্দাজ ২৩ কোটী গো-মহিষাদি আছে, অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ভারতে বাস করে। ইউরোপ ও রুশিয়ার সম্মিলিত গো-মহিষাদির সহিত সমসংখ্যক হইলেও দুগ্ধের পরিমাণে উহাদের এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র পাওয়া যায়। সাধারণত তিন বৎসর বয়স্ক গাভী হইতে বৎসরে গড়ে ৫২৫ পাউণ্ড এবং মহিষ হইতে ১,২১০ পাউণ্ড দুধ পাওয়া যায়। পঞ্চনদে গাভীর এবং কাথিয়াবাড়ে মহিষের দুগ্ধের পরিমাণ অনেক বেশী ; উহারা বৎসরে যথাক্রমে ১,৪৪৫ ও ২,৫০০ পাউণ্ড দুধ দেয়। ভারতবর্ষে বাৎসরিক উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ ৬১,৯৮ লক্ষ মণ এবং ইহার আনুমানিক মূল্য ১৮০ কোটী টাকা। ইহার মধ্যে মহিষ দুগ্ধ শতকরা ৫০ ভাগ, গো দুগ্ধ ৪৭ এবং ছাগ দুগ্ধ ৩ ভাগ। দুগ্ধ উৎপাদনকারীরা মাত্র শতকরা ৯ ভাগ তরল দুগ্ধ পান করে এবং ৮ ভাগ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে। বাকী ৮৩ ভাগ বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ভারতবাসী মাথাপিছু ৬৬ আউন্স দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি পান ও ভোজন করে। প্রদেশ হিসাবে ইহার তারতম্য আছে, সিন্ধুতে ইহার পরিমাণ লোক পিছু ২২ আউন্স ও পঞ্চনদে ১৯·৭ এবং আসামে সর্ব্বাপেক্ষা কম বা ১২ আউন্স মাত্র। শতকরা ২৭ ভাগ দুধ তরল, ৫৮ ভাগ ঘৃত এবং ৫ ভাগ খোয়া বা ক্ষীর রূপে ব্যবহৃত হয়। আন্দাজ ৩·৫ লক্ষ মণ মাঠা তোলা দুধ হইতে কেসিন (Casein) প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হয়।

বাঙ্গালার হিসাবে ৩৩৭·৬৭ লক্ষ মণ দুধ প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ২০৮·৬৩ লক্ষ মণ তরলরূপে ব্যবহৃত হয়, ১০৬·৪৩ লক্ষ মণ ঘৃতে এবং ১৭·১৬ লক্ষ মণ ক্ষীরে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। কলিকাতা নগরীতে প্রতিদিন ১৭২৭ মণ দুধ কলিকাতায় পালিত গাভী এবং সমপরিমাণ দুধ উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান হইতে আনিয়া লোকের অভাব মিটাইতে হয়।

ডাক্তার ব্রহ্মচারীর দান—

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও বিজ্ঞানতত্ত্ববিদ স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এই অর্থভাণ্ডারটি তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী ননীবালা দেবীর নামে হইবে। স্যর উপেন্দ্রনাথ ভারতে চিকিৎসা বিদ্যা ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ; চিকিৎসা তত্ত্বে গবেষণার জন্য তাঁহার এই দান সেজন্য সার্থক এবং আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার দানের প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবে।

শিল্প সম্পর্কে গবেষণা—

ভ্যাকুয়াম ও কম্প্রেসার পাম্প কারখানায় প্রস্তুত করা সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য ভারত-সরকারের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগবেষণা বোর্ড ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে ডক্টর সাহার অধীনে দুইজন সহকারী গবেষক আট মাস ধরিয়া কার্য্য করিবেন। বোর্ড ডক্টর এস্. সি, রায় ও মিঃ বি. সি. রায়কে ভারতে চশমার গুণাগুণ পরীক্ষার উপায় ও রংশিল্পের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করার জন্যও অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা এই প্রচেষ্টার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতার আদমসুমারি—

আদমসুমারি কর্ত্তৃপক্ষের এক বিবৃতিতে কলিকাতার জনসংখ্যার এক বিবরণ পাওয়া গেল। এবারকার লোক-গণনায় কলিকাতার হিন্দু জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পনর লক্ষ, দশ বৎসর আগে অর্থাৎ—১৯৩১ সালে ছিল আট লক্ষ। মুসলমানের সংখ্যা ছিল গতবারে তিন লক্ষ, এবারে পাঁচ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা শহরে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮৬ এবং মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৬০জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজকাল পল্লীগ্রামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাই শহরের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং চাকরি হইতে শুরু করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য ও সাধারণ শিল্পকার্য্যাদিতে অধিক সংখ্যায় লোক নিযুক্ত হইতেছে। এই শ্রেণীর শহরমুখী লোকদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির ইহা একটি কারণ। প্রদেশান্তর হইতে অধিক সংখ্যায় লোকের আমদানিও ইহার আর একটি কারণ।

অখণ্ড হিন্দুস্থান দল—

অহিংসার আদর্শ সম্পর্কে মতান্তরের ফলে বোম্বাইয়ের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীযুক্ত কে. এম. মুন্সী যে অখণ্ড হিন্দুস্থানদল গড়িয়া তুলিতেছেন, মহীশূর রাজ্যের প্রাক্তন দেওয়ান স্যর মীর্জা ইসমাইল সাহেবও তাহা সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কেবল তিনিই নহেন, প্রসিদ্ধ শিখনেতা মাস্টার তারা সিং—যিনি ইতিপূর্ব্বে জাতীয় মহাসভার বর্তমান নায়ক মৌলানা আজাদের সহিত মতবিরোধের ফলে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিও নাকি অখণ্ড হিন্দুস্থান দলের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত মুন্সীর এই নবগঠিত দলে আরও যে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয় খৃস্টানদলের ডাঃ জন্ অন্যতম। প্রকাশ পুনায় মুন্সীজীর দলের একটি নিখিল ভারতীয় সম্মিলন আহ্বান করার উদ্যোগ চলিতেছে। এই নূতন দলের উদ্ভবে এই কথাই মনে হয় যে, কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি মনোভাব কাজ করিতেছে। একদল রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে পরিপূর্ণ অহিংসার আদর্শ-সমর্থন করেন, আর একদল উক্ত তিনটি বিষয়ের সর্ব্বপ্রকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আবশ্যক মত হিংসার আশ্রয় লইতে সম্মত। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত মুন্সী যে গান্ধীজীর সহিত বিরোধ ঘটাইয়া পুরাদস্তুর হিংস হইয়া উঠিয়াছেন তাহাও সত্য নহে ; বরং অহিংসা কাপুরুষের জন্য নহে—মহাত্মাজীর এই কথায় উদ্বোধিত হইয়াই তিনি নূতন দল গঠনে উদ্যত হইয়াছেন। সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে হিংসা গ্রহণযোগ্য—এই আদর্শই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি অনেকেরই সমর্থন পাইবেন।

আবার কমিটি—

বাঙ্গালা সরকার প্রতি বৎসরই জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কতকগুলি কমিটি গঠন করেন এবং তাহার ফলে সরকারী তহবিলের মোটা টাকা ব্যয় হয়, অথচ কমিটির সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা অনুসৃত হয় না। ফলে এই সকল কমিটির নামে দেশ-বাসীর মধ্যে কিছুমাত্র উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। সম্প্রতি প্রকাশ, সরকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার উন্নতি সাধনের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। অধিক-



আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় (গত ২রা আগষ্ট তাঁহার জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে)



সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ (শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্ম্মিত মর্ম্মর মূর্ত্তি)



বোম্বায়ে বন্যার পর—ডোম্বিভলি ও কল্যাণের মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ে কোয়ার্টার্স



বোম্বায়ের সহরতলী ডিভাতে বন্যার পর নৌকাযোগে নিরাশ্রয়দিগকে অনুসন্ধান

সংখ্যক কৃষি গবেষণাগার স্থাপনের এবং বীজ সরবরাহের সুবিধার কথা বিবেচনার জন্য আরও একটি কমিটি তাঁহারা গঠন করিতেছেন। প্রস্তাব সাধু—ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শুধু সাধু প্রস্তাবের দ্বারা জনকল্যাণ সাধিত হয় না—এ সত্যটা কর্ত্তৃপক্ষের মনে থাকা উচিত নহে কি?

কোচিন রাজ্যের দেওয়ান ও ভারত সরকার—

কোচিন রাজ্যের দেওয়ান নির্ব্বাচন উপলক্ষ করিয়া ভারত সরকারের সহিত মহারাজার মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। প্রাক্তন দেওয়ান সার সম্মুখম্ চেট্টি অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থানে ভারত সরকার মহারাজার মনোনীত ব্যক্তির নিয়োগ উপেক্ষা করিয়া জনৈক শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানকে নির্ব্বাচন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মহারাজার মনোনীত ব্যক্তি কোচিন রাজ্যের আদালতের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মেনন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে মহারাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এবং তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত আস্থাও আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারত সরকার তাঁহার নিয়োগে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। মহারাজের অভিপ্রায় পূর্ণ না হইলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতেও দ্বিধা করিবেন না বলিয়া প্রকাশ। কাজেই অবস্থাটা খুব সহজ সরল নহে বলিয়াই মনে হয়। ভারত সরকারের এইরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এই নূতন নহে; এই কিছুদিন আগেও কোল্হাপুর স্টেটে দত্তক গ্রহণ উপলক্ষে মতবিরোধ দেখা গিয়াছে।

সনাতন ব্রাহ্মণ সভার প্রচেষ্টা—

সম্প্রতি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বিভিন্ন মন্দির প্রবেশ আইন ও শিশু বিবাহ নিরোধ আইন তুলিয়া দিবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, সনাতন ব্রাহ্মণ সভার পরিচালকগণ প্রতিবাদে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। সনাতন হিন্দুগণ নিজেদের আচার-বিচার চাল-চলনের প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কালক্রমে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই তাঁহাদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বপুরুষদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য অনেকখানি এবং তাহা সুস্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়ে। কাজেই সেই পুরাতনকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা যে হাস্যকর হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই অতীতের জন্য অনুশোচনা না করিয়া বর্ত্তমানের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারাই বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন কালে যাহা ছিল তাহার সবই যে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর এরূপ মনে করিবার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং সংস্কার সময় সময় অপরিহার্য্য হইয়া ওঠে, আর পরিবর্ত্তন জীবনেরই লক্ষণ।



২৬শে জুলাই কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদে শ্যামস্কোয়ারে জনসভা　　ফটো—মহাদেব সেন

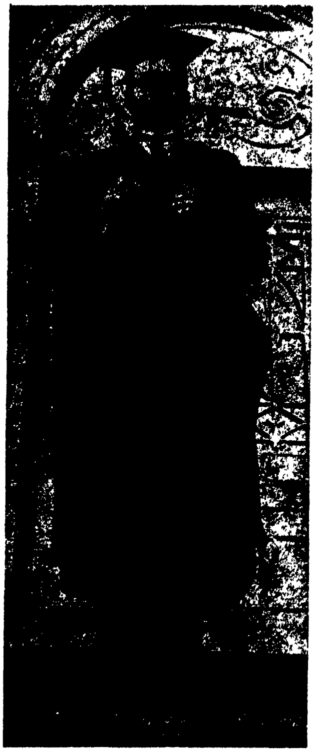
অনাবাদী-জমি চাষের ব্যবস্থা—

অর্থনৈতিক অনুসন্ধান সমিতি বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় যে সব অনাবাদী পতিত জমি পড়িয়া আছে সেগুলিকে কি ভাবে কার্য্যকর করা যায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান সুরু

করিবেন। প্রথমত তাঁহারা মেদিনীপুর ও মৈমনসিংহ জেলায় কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। অনাবাদী ছোট খাট জমি বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই কিছু কিছু আছে, এগুলিকে আবাদ করিয়া কিছু না কিছু ফসল ফলানো সম্ভব এবং তাহা কেমন করিয়া সম্ভব তাহা চাষীদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। এ প্রচেষ্টা যে কল্যাণকর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি অনুসন্ধানেই প্রচেষ্টা শেষ হয় তাহা হইলে শুধু অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। এ দেশের চাষীরা যে অনাবাদী জমিকে কাজে লাগাইতে জানে না—এমন নহে। তবে ব্যাপার যে রকম দাঁড়াইয়াছে তাহাতে চাষের জমি চাষ করাই তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য এবং অত পরিশ্রম করিয়াও যখন আশানুরূপ ফসল ফলাইতে পারে না, তখন নূতন চাষের জমি লইয়া তাহারা করিবে কি। সরকার যদি এই সব অনাবাদী জমিকে ফসলের যোগ্য করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন ত দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। কাগজে কলমে অনেক কিছুই ভাল কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত করাই এদেশে মুস্কিলের ব্যাপার।



সেকেণ্ড লেপ্টেন্যান্ট—
প্রেমেন্দ্র সিং ভাগত



মিঃ অমল কুমার সাহা (অন্ধদিগকে
শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)

অর্থনৈতিক অনুসন্ধান সমিতির আর একটি প্রচেষ্টা—

বাঙ্গালার অর্থনৈতিক অনুসন্ধান সমিতি আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার যে বিপুল পতিত জমি পড়িয়া আছে সেগুলি ও পূর্ব্ববঙ্গের জলাভূমি—যা আরিয়ল বিল ও চলন বিল নামে প্রখ্যাত সেগুলিকে কেমন করিয়া কাজে লাগানো যায় অনুসন্ধান সমিতি তাহা স্থির করিবেন। পল্লী-অঞ্চলের উন্নতিকর প্রচেষ্টা মাত্রেই দেশবাসী ও সরকারের নিকট উৎসাহ দাবী করিতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশের সরকারী রথচক্র জনকল্যাণের পথে এত মন্থর গমনে চলে যে আমরা তাহা অনেক সময়ই অনুভবও করিতে পারি না। অথচ ইতালীতে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত বিরাট জলাভূমি দেখিতে দেখিতে ভরাট হইয়া গিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়াকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অনাবাদী পতিত স্থান আজ দেশবাসীর অশেষ কল্যাণে আসিয়াছে। আমাদের দেশের সরকার এইরূপ কোন কাজে সাফল্যের সহিত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। বড় বড় কথা এতাবৎকাল আমরা বহু শুনিয়াছি কিন্তু কাজের কাজ একটিও হইতে দেখি নাই। যদি কোন মন্ত্রী এই ধরণের কোন কাজ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেন ত দেশের কল্যাণকামী বলিয়া তাঁহার নাম দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে সরকারী হস্তক্ষেপ—

বাঙ্গালা দেশের সরকারের পক্ষ হইতে ইদানীং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অযথা হস্তক্ষেপের সংবাদ শোনা যাইতেছে। সম্প্রতি যশোহর জেলা বোর্ড সম্পর্কে যে হাস্যকর অভিনয় হইয়া গেল তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ঘটনাটি এই—১৯৩৭ সালের ১২ই

ডিসেম্বর যশোহর জিলাবোর্ড পুনর্গঠিত হয় এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মৌ: ওয়ালিয়র রহমান সর্ব্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হইয়াছিল মৌ: ওয়ালিয়র রহমান সাহেব তাহাতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, জেলাবোর্ডের জনকয়েক সদস্যের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সরকার স্বায়ত্ত শাসন আইনের ২৮ ধারা অনুসারে অর্থাৎ—ক্রমাগত কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার অভিযোগে তাঁহাকে জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ হইতে অপসারণের আদেশ দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন মনোনীত সদস্যকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইয়াছে। মৌলবী ওয়ালিয়র রহমান সাহেব সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে আপীল দায়ের করেন। সবজজ খরচা সহ তাঁহার আপীল মঞ্জুর করিয়াছেন। রায় দিতে গিয়া বিচারক বলিয়াছেন যে, জেলা বোর্ডের তথাকথিত সভা, উহার প্রস্তাব এবং আবেদনকারীকে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থানে মৌ: লুৎফর রহমানের নিয়োগ সম্পর্কিত সরকারী আদেশ বিধিবহির্ভূত ও বে-আইনী। আবেদনকারীর চেয়ারম্যান পদ অক্ষুণ্ণ আছে এবং তাঁহার কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য বিবাদীদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। দলগত রাজনীতি স্বায়ত্তশাসনে যে অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।



মানকুণ্ডুতে উন্মাদ চিকিৎসালয়ের নূতন গৃহের উদ্বোধনে সমবেত নেতৃবৃন্দ

বাঙ্গালার জমিদারী ও মধ্যস্বত্বের ভবিষ্যত—

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন বসানো হইয়াছিল। এই কমিশনের চেয়ারম্যান স্যর ফ্রান্সিস ফ্লাউড। কমিশনের রিপোর্টটি বিবেচনা করিবার জন্য কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মিঃ সি. ডব্লিউ গার্ণার-এর উপর ভার ন্যস্ত করা হয়। মিঃ গার্ণার কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশ ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মতামত গতপূর্ব্ব জুলাই মাসেই পেশ করেন; কিন্তু এতদিন সে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই কারণ অবশ্য অজ্ঞাত।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদই প্রস্তাবিত ফ্লাউড কমিশনের প্রধান সুপারিশ। এ সম্পর্কে যে দেশের জনগণের মধ্যে মতান্তর আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া মিঃ গার্ণার বলিয়াছেন যে উভয় পক্ষের মতামতের পার্থক্য এতবেশী যে, দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া কোন ব্যবস্থা স্থিরকরা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কাজেই সরকারের পক্ষেই এই বিষয়ে যাহা-হউক একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। জমিদারী ও সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব তুলিয়া দিবার স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে মিঃ গার্ণার তাঁহার নিজের কোন মতামত দেন নাই, তবে কমিশনের আর্থিক দিকটা পরীক্ষা করিয়া তিনি যেসব মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ বিষয়ে তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। জমিদারী প্রথা ও মধ্যস্বত্ব তুলিয়া দিলে লাভ-লোকসানের যে সম্ভাবনা আছে বলিয়া কমিশন মনে করেন, সে হিসাবটি মিঃ গার্ণারের মতে অর্থহীন। কারণ তিনি মনে করেন, যে-প্রজা সব চাইতে কম খাজনা দেয় (এমন কি, বরগাদার)

তাহার উপর পর্য্যন্ত সমস্ত স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সহিত কমিশনের দেওয়া ব্যয়ের হিসাবের কোন সামঞ্জস্য নাই। দ্বিতীয়ত, রায়তি স্বত্বের উপরও স্বত্বগুলি তুলিয়া দেওয়ায় যে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে তাহার কোন কোন দফা এবং মূল্য ধার্য্য করা ও বাধ্যতামূলক স্বত্বক্রয়ের আনুষঙ্গিক ব্যয়ও উক্ত হিসাব হইতে বাদ পড়িয়াছে। মিঃ গার্ণারের মতে ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব তুলিয়া দেওয়ায় সরকারের আর্থিকলাভের কোন আশাই নাই; এ সম্পর্কে মিঃ গার্ণার বলেন—আর্থিক লাভ করিতে হইলে হয় প্রজার উপর করভার চাপাইতে হয় (তাহা অসম্ভব), নতুবা ক্ষতিপূরণের হার অনেকখানি কমাইয়া বর্ত্তমান মালিকদের বঞ্চিত করিতে হয় এবং সে প্রস্তাব ধোপে টিকানো কঠিন। পনর গুণ হারে ক্ষতিপূরণ দিলে ক্ষেত্রবিশেষে কেহ কেহ লাভবান হইবেন বটে কিন্তু ক্ষতিপূরণের হার তাহাপেক্ষা কম করিলে বেশীর ভাগ মালিকের প্রতিই ভীষণ অবিচার করা হইবে। কাজেই ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব কিনিলে লোকসান সম্বন্ধে অনিশ্চিত হওয়া যখন যাইবে না তখন তাঁহার মতে প্রথমে অল্প জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করিয়া তাহার ফলাফল না দেখিয়া কোনমতেই ব্যাপকভাবে এই কাজে হাত দেওয়া উচিত হইবে না। দিলে আর্থিক গোলযোগ ও অন্যান্য অশেষ অসুবিধা দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

মিঃ গার্ণারের মত যুক্তিসিদ্ধই বটে কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না। ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ মানিয়া লইয়া বাঙ্গালার জমিদারী ও মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন করিলেই যে এ দেশের কৃষক ও কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধিত হইবে—ইহা আমরা মোটেই স্বীকার করি না। বরং তাহাতে দেশের অশেষ দুর্গতি ও অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই মনে করি। যাহাতে জমিদারী ও মধ্যস্বত্বের আয়ের ন্যায্য অংশ কৃষক ও কৃষির উন্নতিতে ব্যয়িত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সরকার প্রকৃত সমস্যা সমাধানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন।



সিষ্টার সরস্বতীর নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-নেতা বীর সাভারকর, ডাঃ মুঞ্জে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি

ঐক্যপ্রতিষ্ঠার একটি উপায়—

সিন্ধু প্রদেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি হইতে সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ জাগানো হইতে পারে, এমন সব অংশ বর্জ্জন করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য সাধু। আগামী কাল যাঁহারা দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন তাঁহারা যাহাতে সম্প্রদায় বিশেষের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ লইয়া বাড়িয়া না ওঠেন, শিক্ষা বিধানে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেই সঙ্গে যাহাতে সত্য ইতিহাসকে মিথ্যার প্রলেপ দিয়া আবৃত করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের গোড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া না হয় তাহাও বিবেচনা করিবার বিষয়। ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং কুতথ্যের আবর্জ্জনা দিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট করার হুজুগ বর্ত্তমানে কোন কোন স্থানে বেশ চলিয়াছে। বলাবাহুল্য, ইহাতে দেশের ঘোর অনিষ্ট হইবে। শিক্ষার্থী ছাত্রজীবনে ভুল বা মিথ্যা ইতিহাস পাঠ করিয়া

বয়সকালে সেই ভুলের সংশোধন করিবে—ইহা আশা করা বাতুলতা।

পরলোকে গণেন মহারাজ—

গত ৭ই শ্রাবণ বুধবার ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ (গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কৈশোরেই ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্রবে আসেন এবং 'উদ্বোধন' ও রামকৃষ্ণ মিশন পুস্তকপ্রকাশ বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক হিসাবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পরদুঃখকাতর, বন্ধুবৎসল, অমায়িক গণেন মহারাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। স্বাভাবিক শিল্পানুরাগ থাকায় পুস্তক প্রকাশে তাহার পারিপাট্য ও অক্ষরবিন্যাসে তিনি একটা নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর আগে মতান্তর হওয়ায় তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ চিত্রশালাধ্যক্ষ হিসাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।



গণেন মহারাজ

ভারতের সম্প্রসারিত শাসনপরিষদ—

ভারত সরকারের শাসন-পরিষদকে অবশেষে সম্প্রসারিত করিয়া স্যর এইচ. পি. মোদি, স্যর আকবর হায়দরী, শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও, সার ফিরোজ খাঁ নুন, শ্রীযুক্ত মাধবশ্রীহরি আনে, স্যর সুলতান আহ্‌মেদ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—এই কয়জনকে নূতন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইল। বলা বাহুল্য যে, এই নবসংস্কারের দ্বারা জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের আস্থা উদ্রেকের কোন সম্ভাবনাই নাই, অপর পক্ষে এই নূতন সদস্য গ্রহণের দ্বারা সরকারী যুদ্ধোদ্যমনীতিও দেশের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করিবে না। বড়লাট এই সঙ্গে তাঁহার "জাতীয় দেশরক্ষা কাউন্সিল" ও গঠন করিয়াছেন। তাহাতেও দেশের জনকয়েক হোমরাচোমরা ভাগ্যবান মনোনীত হইয়াছেন। ইহা ভারতের যে পরিমাণ অর্থব্যয়ে সাহায্য করিবে সেই পরিমাণে তাহার উপকার করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং ইহার জন্য আনন্দ প্রকাশের কোনই কারণ দেখা যায় না। শাসন ব্যবস্থার বড় বড় দফ্‌তরগুলি এখনও ইংরেজ চাকুরীয়াদের হাতেই রহিয়া গিয়াছে। যে কয়টি দফ্‌তর এই নবনিযুক্ত সদস্যের হস্তে আসিল তাহাও প্রকারান্তরে বড় বড় দফ্‌তরের তাঁবেই রহিয়া যাইবে; কাজেই ইঁহারা নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় কোন কালেই দিতে পারিবেন না।

বরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী—

রাণাঘাটের পালচৌধুরী জমিদার বংশের বরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় গত ২৫শে জুলাই তাঁহার একমাত্র পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুত গিরিজানাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাটীতে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ধনী জমিদার হইয়াও বরেন্দ্রনাথ তাঁহার সরল, অনাড়ম্বর, অমায়িক ও সহৃদয় ব্যবহারের জন্য



বরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী

সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন এবং রাণাঘাটের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সাহিত্যালোচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি প্রায়ই তাঁহার রাণাঘাটস্থ গৃহে সাহিত্যসভা আহ্বান করিয়া বহু সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করিতেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্ম্মা—

বেহালা সাহাপুরের শর্ম্মা হাউসের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয় গত ৪ঠা জুলাই ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্বাসারি নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং চরক-সংহিতার বঙ্গানুবাদ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ৪ পুত্র ও ২ কন্যা



কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্ম্মা

বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র আমেরিকার চিকাগোতে চিকিৎসক; অপর তিন পুত্র—কেদারনাথ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক, পরেশনাথ ব্যবসায়ী ও রাজেন্দ্রনাথ এঞ্জিনিয়ার।

স্যর তেজবাহাদুর ও বৃটিশ নীতি—

পুনা শহরে সম্প্রতি যে রাজনৈতিক সম্মিলনী হইয়া গেল তাহার উদ্যোক্তারা বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত না হইলেও তাঁহারা যে সকলেই দেশপ্রেমিক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত সম্মিলনের শেষ বক্তৃতায় স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু যে দুইটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। বৃটিশ সরকার যদি ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেই চাহেন তবে তাঁহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিতে পারেন, তাহারই ইঙ্গিত স্যর তেজবাহাদুরের বক্তৃতায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের যে অংশগুলির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তাহার মধ্যে দুইটি অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা উঠাইয়া দিয়া যৌথনির্ব্বাচন প্রথার প্রচলন করিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রি-পরিষদ সম্পূর্ণভাবে আইন সভার অধীন হইবে অর্থাৎ আইন সভার সমর্থনের উপর তাঁহাদের নিয়োগ নির্ভর করিবে এবং আইন সভা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন। স্যর তেজবাহাদুর বলেন, এই দুই অংশেই পরিবর্ত্তন করিতে বৃটিশ সরকার হয়ত রাজী হইবেন, কিন্তু যাহারা পরিবর্ত্তন দাবী করে তাহাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যর্থ হয় এমনভাবেই সে পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। প্রথমত, যৌথ নির্ব্বাচন প্রথার চলন হইবে বটে কিন্তু ব্যক্তিগত ভোটের অধিকার থাকিবে না; তাহার স্থানে বৃত্তিগত ভোটের অধিকার থাকিবে অর্থাৎ লোকে ব্যক্তিগত যোগ্যতায় ভোটের অধিকার পাইবে না। কতকগুলি বৃত্তি বা পেশা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সেই সব বৃত্তি যাঁহাদের অবলম্বন তাঁহারাই মাত্র ভোটের অধিকার পাইবেন; সুতরাং নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্যতাও মাত্র তাঁহাদেরই থাকিবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে অপসারিত করিবার কোন অধিকার আইনসভার থাকিবে না। স্যর তেজবাহাদুর দূরদর্শী এবং ভিতরের সব কিছু ব্যবস্থা সুপরিজ্ঞাত আছেন। কাজেই তিনি যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা যে সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষত বৃটিশ সরকারের প্রকৃতি ও কার্য্যনীতিও স্যর তেজবাহাদুরকেই সমর্থন করে। বৃটিশ সরকার যতটুকু অধিকার প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেন, কৌশলে আবার তাহা খণ্ডনও করেন। ব্যক্তিগত ভোটাধিকার কায়েম হইলে নির্ব্বাচন যৌথ হইবে বটে, কিন্তু ভোটাধিকারীর সংখ্যা সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণে কমিবে।

বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে কাশীধামে পরলোকগত হইয়াছেন। ১৮৫৭ সালে বাঁকুড়া জেলার মালিয়াড়া নামক গ্রামে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। ছাত্রজীবনে তিনি মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি হাই-কোর্টের জজ ছিলেন। ১৯২৪ সাল হইতে তিনি কাশীবাসী হইয়াছিলেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন।

পরলোকে স্বামী গণেশানন্দ—

ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত সরিষাস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গণেশানন্দ মহারাজ মাত্র ৪৪বৎসর বয়সে অকস্মাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি ১৯১৯ সালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনে যোগ দেন। মাদ্রাজে এক বৎসর থাকিয়া তিনি ১৯২১ সালে সরিষায় মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনশক্তি ছিল তাঁহার অসাধারণ। তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তত্রত্য অঞ্চলে তিনি সকলকার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের ঝড়—

গত ২৫শে মে যে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার বহু অংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমণের ফলে লোক অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়—যদি ঝড়ের পূর্ব্বে ঐসকল স্থানের অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কম হইত! তাহা যে অসম্ভব নহে, আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশে এখনও আবহাওয়াতত্ত্ব (Meteorology) সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নাই। ভারতে মাত্র কয়টি অবজারভেটারী (মানমন্দির) আছে ও অতি অল্পসংখ্যক লোক এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। এবারে ঝড়ের ৯০ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনার খবর পাওয়া গিয়াছিল। সেজন্য আমাদের মনে হয়, যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও দেশে অধিকসংখ্যক লোক এবিষয়ে অভিজ্ঞ হন, তাহা হইলে ঝড়ের সময় লোককে রক্ষা করিবার উপায়ও নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। নানা-ভাবে লোককে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিবার ব্যবস্থাও হইতে পারিবে। বিষয়টি লইয়া যাহাতে বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচনা হয়, সেজন্যই আমরা ইহার উল্লেখমাত্র করিলাম।

পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ—

যুদ্ধের জন্য ভারতে উপযুক্ত পরিমাণে পেট্রল আনয়ন করা ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। সেজন্য গবর্ণমেণ্ট আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে পেট্রল নিয়ন্ত্রণ করিবেন—অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে যতটুকু পেট্রল সরবরাহ করা প্রয়োজন মনে করিবেন, ততটুকু মাত্র পেট্রল দিবেন। ইহার ফলে বহু লোককে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কাজেই এই ব্যবস্থার পর যাহাতে লোক সত্য সত্যই অসুবিধা ভোগ না করে, সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। প্রাইভেট গাড়ীর মালিকগণ শুধু বিলাসিতার জন্য গাড়ী ব্যবহার করেন না—বহু ব্যবসায়ী ব্যবসাকার্য্যের জন্য গাড়ী ব্যবহার করেন—পেট্রল নিয়ন্ত্রণের জন্য যেন তাঁহাদিগকে অযথা অসুবিধা বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম বৎসরের ফাইনালে বাঙ্গলার আই এফ এ দল ৫—১ গোলে দিল্লীকে পরাজিত ক'রে 'সন্তোষ মেমোরিয়াল কাপ' বিজয়ের সর্ব্ব প্রথম সম্মান লাভ করেছে। আই এফ এ-র এই বিজয়লাভ সত্যই গৌরবজনক। বাঙ্গলা দেশ যে প্রতিনিধিমূলক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ফুটবলদল অপেক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী তা প্রমাণ পাওয়া গেল। আই এফ এ-র সাফল্য লাভে আমরা দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঙ্গলা দেশে ফুটবল খেলা সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দেশের যুবকশ্রেণী শরীর চর্চ্চা লাভের জন্য ব্যাপকভাবে ফুটবল খেলায় যোগদান করছেন এবং ক্রীড়ামোদীরাও নির্দ্দোষ আমোদ লাভের জন্য খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ বৃদ্ধি করছেন। ফুটবল খেলার এই উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভের মূলে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গগত মহারাজা সন্তোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফুটবল খেলার এই জনপ্রিয়তা এবং খেলার উৎকর্ষ লাভের মূলে মহারাজা সন্তোষের দান যথেষ্ট ছিল। তাঁর মত একজন শুভানুধ্যায়ীর স্মৃতিরক্ষায় আই এফ এ অগ্রণী হ'য়ে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় মহারাজার নামে একটি কাপ প্রদান ক'রেছে। এ ব্যবস্থায় একজন প্রকৃত ক্রীড়া-অনুরাগীকেই সম্মান দান করা হয়েছে এবং আই এফ এ-রও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফুটবলের গৌরবময় ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম বিজয়ে আমরা গৌরব অনুভব করছি।



'সন্তোষ মেমোরিয়াল কাপ'

আই এফ এ বিহারের সঙ্গে খেলায় প্রথম দিন গোলশূন্য 'ড্র' ক'রে। অবশ্য দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৪—০ গোলে বিজয়ী হয় এবং প্রতিযোগিতার এর পরের খেলায় বোম্বাই দলকে মাত্র ১—০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। বোম্বাই দল পরাজিত হয়েছিল সত্য কিন্তু এ পরাজয়ে তাদের অগৌরবের কিছু নেই। আই এফ এও গোল দেবার একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছিল। সুযোগের সদ্ব্যবহার হলে তারা আরও বেশী গোলের ব্যবধানে খেলায় বিজয়ী হ'তে পারত। বোম্বাই দলের খেলার ধরণ একটু স্বতন্ত্র। কলিকাতার ফুটবল মাঠে ঐ প্রণালীর খেলা আর সচরাচর দেখা যায় না। আগন্তুক দলের খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ Methodical Football খেলার আদর্শ নিয়ে খেলেছিলেন। অপর দিকে দিল্লী ৩—২ গোলে পাঞ্জাবের কাছে বিজয়ী হয়ে কলকাতায় ফাইনাল খেলায় যোগদান করে। ফাইনাল খেলার ফলাফল যেখানে ৫—১ গোলের ব্যবধান সেখানে যে খেলাটি প্রায় একতরফা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙ্গলা ফাইনাল খেলাতেও একাধিক অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে।

দিল্লীদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রাও সময়ে সময়ে চমৎকার সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ চালিয়ে গোল করবার চেষ্টা করে। খেলার প্রথমভাগের পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাঙ্গলা দলের পি ডিমেলো প্রথম গোল করে কিন্তু চার মিনিটের মধ্যে দিল্লীদল গোলটি পরিশোধ করে দেয়। বিশ্রামের সময়ে বাঙ্গলা



রাজসাহীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে কলিকাতার নেতৃবৃন্দ শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, নলিনীরঞ্জন সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি



ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজি সন্দর্শনে নেতৃবৃন্দ

বামে—খান বাহাদুর আবদুল গফুর খান, মধ্যে—মিয়া ইফতিকারউদ্দীন ও দক্ষিণে সিন্ধুদেশের প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্স



বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রাবাস



আবিসিনিয়ায় ভারতীয় সৈন্য (বিশ্রামের দৃশ্য)



আবিসিনিয়ায় ভারতীয় সৈন্য (পর্ব্বত ও জঙ্গলে রণসজ্জা

দল ২—১ গোলে অগ্রগামী থাকে। দুর্ব্বল রক্ষণভাগের জন্যই দিল্লীদল এরূপ বেশী গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। দলের গোলরক্ষকের আত্মরক্ষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। এ ছাড়া দু'টি ব্যাক এবং হাফ্ ব্যাক লাইনের দুর্ব্বলতার সুযোগে বাঙ্গলা গোল দেবার সুযোগ নষ্ট করেও ৫—১ গোলের ব্যবধান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথমার্দ্ধের খেলায় বাঙ্গালা অগ্রগামী থাকলেও আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের খেলা সুবিধাজনক হয়নি তবে বিশ্রামের পর খেলার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। বাঙ্গালাদলের রক্ষণভাগের সকলেই ভাল খেলেছেন। ব্যাক পি চক্রবর্ত্তীর খেলাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোলরক্ষক ওসমানকে বিশেষ উদ্বেগজনক অবস্থায় পড়তে হয়নি। আক্রমণ ভাগের পি ডি' মেলো ২টি, ডি ব্যানার্জি ১টি এবং অমিয় ভট্টাচার্য্য ২টি গোল করেন। অমিয় ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল, একাধিক দর্শনীয় বল জুগিয়ে নিজ দলের খেলোয়াড়দের গোল দেবার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। কর্দ্দমাক্ত মাঠের উপরেও দিল্লীদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ক্ষিপ্রতা লক্ষিত হয়। হামিদুদ্দিন, আত্মারাম এবং সফদার আলি বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; হামিদুদ্দিনের গোলটি বেশ দর্শনীয়। দুর্ব্বল রক্ষণভাগে সয়িদ সা এবং ইউসুফের নাম করা যায়। আফজল রক্ষণভাগে কয়েকবারই বিপক্ষদলের আক্রমণ ব্যর্থ করেছিলেন কিন্তু তাঁর খেলায় শারীরিক



বাঙ্গলার আই এফ এ আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনাল বিজয়ী হয়েছে



আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলার সেমি-ফাইনালে ১-০ গোলে পরাজিত ডবলউ আই এফ এ (বোম্বাই)

শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা বেশী থাকার ফলে রেফারী কর্ত্তৃক সতর্কিত হ'ন।

গোলরক্ষক মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। বাঙ্গলাদলের প্রথম ২টি গোল প্রতিরোধ না করার অক্ষমতা কোন অজুহাতে মার্জ্জনা করা যায় না।

বাঙ্গলা: গোল—ওসমান; ব্যাক—সিরাজুদ্দিন, পি চক্রবর্ত্তী; হাফ্ ব্যাক—অজিত নন্দী, জে লামসডেন (অধিনায়ক) এবং মাসুম; ফরওয়ার্ড—নূরমহম্মদ, অমিয় ভট্টাচার্য্য, ডি ব্যানার্জি, সুনীল ঘোষ এবং পি ডিমেলো।

দিল্লী: গোল—ডালি; ব্যাক—এ এন কাউল এবং মহম্মদ সৈয়দ সা; হাফ্ ব্যাক—মহম্মদ ইউসুফ, মহম্মদ আফজল এবং



আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলার সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দলের গোল সম্মুখের একটি দৃশ্য

সর্দ্দার মির্জ্জা; ফরওয়ার্ড—হাবিব বেগ, বুলাও আফতার, আত্মারাম, হামিদুদ্দিন এবং সফদার আলি।

রেফারী—পি মিশ্র।

খেলায় ৬১৭৪ টাকা ৪ আনার টিকিট বিক্রয় হয়।

প্রতিযোগিতায় উভয়দলের খেলার ফলাফল:—

আই এফ এ—ঢাকার সঙ্গে খেলায় ওয়াক ওভার; বিহারের সঙ্গে পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় প্রথমদিন গোল শূন্য 'ড্র'; দ্বিতীয় দিনে ৪-০ এবং প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বোম্বাইদলকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠে।

দিল্লী—রাজপুতনার সঙ্গে খেলায় ৫-১, পাঞ্জাবের সঙ্গে খেলায় ৩-২ গোলে জয়লাভ ক'রে ফাইনালে বাঙ্গলার কাছে ৫-১ গোলে পরাজিত হয়।

খেলার ফলাফল:

'এ' জোন

এন ডবলউ আই এফ এ (পাঞ্জাব এবং বেলুচিস্থান)

'বি' জোন

দিল্লী এফ এ ০-০, ৫-১ গোলে রাজপুতানাকে পরাজিত করে।

'সি' জোন

আই এফ এ (বাঙ্গলা) ঢাকার সঙ্গে খেলায় ওয়াক ওভার।

বিহার ১ ০ গোলে যুক্তপ্রদেশকে পরাজিত করে।

আই এফ এ (বাঙ্গলা) ০-০, ৪-০ গোলে বিহারকে পরাজিত করে।

'ডি' জোন

মহীশূর ৩-০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে। ডবলউ আই এফ এ (বোম্বাই) ৪-১ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে।

সেমি-ফাইনাল

দিল্লী এফ এ ৩-২ গোলে এন ডবলউ আই এফ এ-কে পরাজিত করে।

আই এফ এ (বাঙ্গলা) ১-০ গোলে ডবলউ আই এফ এ-কে পরাজিত করে।

ফাইনাল

আই এফ এ ৫-১ গোলে দিল্লীকে পরাজিত করে।

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল:

ভারতীয় বনাম ইউরোপীয়দলের আন্তর্জাতিক বাৎসরিক ফুটবল খেলায় ভারতীয় দল ৩—১ গোলে বিজয়ী হয়েছে। ১৯২০ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়। ফুটবল খেলায় জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য উভয় দলই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে এসেছে। ক্রীড়া-

মোদীরাও খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে খেলার ফলাফলের জন্ম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন। প্রতিযোগিতার বিগত ২১ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় দল ১২বার বিজয়ী হয়েছে। অপর দিকে ইউরোপীয় দল ৮বার জয়লাভ করেছে। ২বার খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্ম ১৯৩০ সালে কোন খেলা হয়নি।

বর্ত্তমান বৎসরে খেলার ফলাফলের ব্যবধান দেখে ইউরোপীয়দলের পরাজয় যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে এরূপ ধারণা করা ভুল।

খেলায় সুযোগের সদ্ব্যবহারে গোল হয়। কোন কোন দল বিপক্ষদল অপেক্ষা উন্নত ধরণের খেলা দেখিয়েও সুযোগের অপব্যবহারে গোল করতে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে ঐদলের পরাজয়ে তাদের শক্তিহীনতার পরিচয় বেশী করে মনে হয় না, ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথাই মনকে পীড়া দেয়। ফুটবল খেলায় এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যে বহু শক্তিশালীদলকেও পড়তে হয়েছে।



বরিশাল এফ এ শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডের খেলায় তরুণ সমিতির নিকট ২-১ গোলে পরাজিত

এই দিনের আন্তর্জাতিক খেলার প্রথমার্দ্ধে ইউরোপীয় দলকে সেই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। কয়েকটি গোল দেবার সুযোগ নষ্ট করেও তাদের প্রথমার্দ্ধের খেলা যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে সহযোগিতার অভাব থাকায়, এবং ভারতীয়দলের গোলরক্ষক ওসমানের কৃতিত্বপূর্ণ গোল রক্ষার ফলে তারা শেষ রক্ষা করতে পারে নি। প্রথমার্দ্ধের খেলায় ভারতীয় দল ২টি গোল দিলেও উন্নত ধরণের খেলা দেখাতে পারেনি।

মাঠের অবস্থা ভাল ছিল না। খেলা আরম্ভের দু' মিনিটের মধ্যে সোমানার ফরওয়ার্ড পাশ থেকে বল পেয়ে অমিয় ভট্টাচার্য্য দলের প্রথম গোল করেন।

এরপর প্রথমার্দ্ধের খেলার ২৪ মিনিটে নির্ম্মল চ্যাটার্জির ফরওয়ার্ড পাশ থেকে সোমানা দলের দ্বিতীয় গোলটি দেন। বিশ্রামের সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় দল ২—০ গোলে অগ্রগামী থাকে। কিন্তু ভারতীয় দলের এই ২টি গোল সম্বন্ধে মাঠে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যায়। অনেকের বিশ্বাস ২টি গোলই অফ্‌সাইড থেকে হয়েছিল। ইউরোপীয় দলের ডি' মেলো ককরেফটে, সহযোগিতায় ভারতীয় গোলের সম্মুখে একবার অব্যর্থ গোলের সন্ধান সৃষ্টি করেন কিন্তু মাত্র তিন গজ দূরের ব্যবধানে বল পেয়েও ককরেফটে বলটিকে ওসমানের হাতে তুলে দিয়ে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার ১৫ মিনিটে ককরেফট ভারতীয় দলের গোলে একটি তীব্র 'সর্ট' করলে ওসমান চমৎকার 'ডাইভ' দিয়ে বলটিকে রক্ষা করেন। কিন্তু বলটি রোজারিয়োর পায়ে পড়লে কোন রকম ভুল না ক'রে তিনি কোনাকুনি ভাবে সর্ট মেরে দলের একমাত্র গোল করেন (২—১)। খেলা সমাপ্তির এক মিনিট পূর্ব্বে মোহিনী ব্যানার্জি তৃতীয় অর্থাৎ সর্ব্বশেষ গোলটি দেন।

দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতীয় দলের খেলা উন্নততর হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপীয়দল এবারও গোলের বহু সুযোগ হারিয়েছে। কম পক্ষে তিনবার ইউরোপীয়দলের আক্রমণ ভাগ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের পরাস্ত ক'রে গোলের অতি নিকটে

উপস্থিত হ'য়েও গোলরক্ষককে পরাস্ত ক'রতে পারেনি। হয় তারা সোজা সর্ট মেরে বলটি ওসমানের হাতে তুলেছে না হয় সর্ট এমনভাবে মেরেছে যে তা প্রতিরোধ করতে ওসমানের কোনরকম কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। কর্দ্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল মাঠের জন্য আন্তর্জাতিক খেলাটি যেরূপ উন্নত ধরণের আশা করা যায় সেরকম মোটেই হয় নি। বিজিত দলের কক্‌রেফট এবং ডি' মেলোকে আটকে রাখা ভারতীয় দলের রক্ষণভাগের পক্ষে বহুবার সম্ভব হয় নি। তাঁরা গোলের সম্মুখে একাধিকবার মহা সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিলেন। ওসমানকে এই দিনের খেলায় বিশেষভাবে পরিশ্রম করে খেলতে হয়েছিল। ওসমানের কৃতিত্বপূর্ণ খেলার ফলেও



ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস (হবিগঞ্জ) শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ৪-০ গোলে ভবানীপুর দলের কাছে পরাজিত

ইউরোপীয় দল একাধিক গোল দিতে পারে নি। এ ছাড়া পি চক্রবর্ত্তী এবং মাসুমের খেলাও উল্লেখযোগ্য। আক্রমণ-ভাগে একমাত্র অমিয় ভট্টাচার্য্যের নাম করা যায়। সোমানার খেলা দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু উন্নত হয়েছিল। নির্ম্মল চ্যাটার্জির খেলা মোটেই আশাপ্রদ হয়নি, বহুবার দলের খেলোয়াড়দের দেওয়া বল তিনি ধরতে না পেরে নষ্ট করেছেন। মোহিনীর দেওয়া গোলটি ছাড়া খেলা অতি নৈরাশ্যজনক হয়েছে। খেলাটি চ্যারিটি ছিল, টিকিটের মূল্য উঠেছিল ২,৬৫৯ টাকা ১৪আনা।

ভারতীয় দল : গোল—ওসমান, (এরিয়ান্স); ব্যাক—সিরাজুদ্দিন (মহঃ স্পোর্টিং) এবং পি চক্রবর্ত্তী (কালীঘাট) হাফ্‌ব্যাক—নীলু মুখার্জি (মোহনবাগান), মোহিনী ব্যানার্জি (কালীঘাট) এবং মাসুম (মহঃ স্পোর্টিং); ফরওয়ার্ড—নির্ম্মল চ্যাটার্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) আপ্পারাও (ইষ্টবেঙ্গল), সোমানা (ইষ্টবেঙ্গল), অমিয় ভট্টাচার্য্য (মোহনবাগান) এবং করিম (মহঃ স্পোর্টিং)

ইউরোপীয়ান দল : গোল—কেনেট (পুলিশ); ব্যাক—হজেস (কাষ্টমস) এবং ইয়ার্লি (রেঞ্জার্স); হাফ্ ব্যাক—ফাউলস (পুলিশ), জে লামসডন (রেঞ্জার্স)-ক্যাপটেন এবং ইভান্স (নর্থ স্টাফোর্ডস); ফরওয়ার্ড—টেপলটন (পুলিশ), কক্‌রেফট (ডালহৌসী), পি ডি' মেলো (পুলিস), বিয়ার্ড (ক্যালকাটা) এবং রোজারিও (ই বি রেল)

রেফারী—ইউ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ব্বাপর বৎসরের বিজয়ী দল :

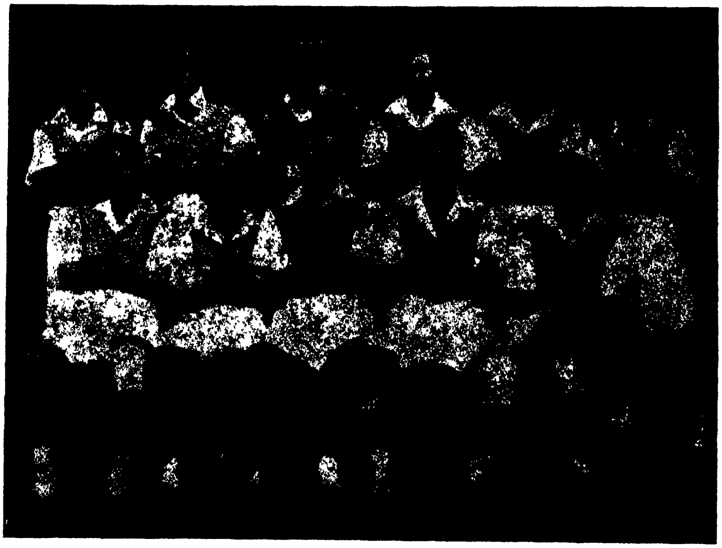
১৯২০	ইউরোপীয় দল	৪-১
১৯২১	ভারতীয় দল	১-০
১৯২২	ইউরোপীয় দল	১-০
১৯২৩	ইউরোপীয় দল	২-১
১৯২৪	ভারতীয় দল	৩-১
১৯২৫	ভারতীয় দল	২-০
১৯২৬	ভারতীয় দল	২-০
১৯২৭	ভারতীয় দল	২-০
১৯২৮	ইউরোপীয় দল	২-০
১৯২৯	ভারতীয় দল	৩-০
১৯৩০	কোন খেলা হয়নি	
১৯৩১	ইউরোপীয় দল	৩-০
১৯৩২	ভারতীয় দল	৫-০
১৯৩৩	ভারতীয় দল	২-১
১৯৩৪	ইউরোপীয় দল	৪-০
১৯৩৫	ইউরোপীয় দল	২-১
১৯৩৬	ড্র'	৩-৩
১৯৩৭	ভারতীয় দল	১-০
১৯৩৮	ইউরোপীয় দল	১-০
১৯৩৯	'ড্র'	২-২
১৯৪০	ভারতীয় দল	৩-২

ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রত্যেক বিভাগের সমস্ত খেলা এখনও শেষ হয়নি। এদিকে শীল্ড খেলা আরম্ভ হয়ে

গেছে, লীগের খেলার উপর ক্রীড়ামোদীদের আকর্ষণও কমে এসেছে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লাগে মহমেডান দল এবারও লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। যদিও এখনও তাদের ২টি খেলা বাকি আছে, রেঞ্জার্স এবং ডালহৌসীর সঙ্গে। কিন্তু এই ২টি খেলার ফলাফলের উপর তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ মোটেই নির্ভর করছে না। দ্বিতীয় স্থান যে দল অধিকার করে রয়েছে তার থেকে এখন ৭ পয়েন্টের ব্যবধান। এবারে লীগে তারা প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায়। ইষ্টবেঙ্গল ৩-২ গোলে মহামেডানকে পরাজিত ক'রে লীগে তাদের অপরাজেয় রেকর্ড ভেঙ্গেছে। ১৯৩৪ সাল থেকে মহমেডান দল প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে খেলছে। এ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে লীগের খেলায় তারা ১৬বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ইষ্টবেঙ্গল ৬টা খেলায় জয়লাভ করেছে, ৭টায় পরাজিত হয়েছে আর ২টা খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ১৯৩৯ সালে লীগের রিটার্ণ ম্যাচ স্থগিত থাকে। সুতরাং ইষ্টবেঙ্গলের জয়লাভ অপ্রত্যাশিত হয়নি। একমাত্র ইষ্টবেঙ্গল ছাড়া অপর কোন দল বোধহয় দুর্দ্ধর্ষ মহমেডান দলকে এতবার পরাস্ত করতে পারেনি।



জলপাইগুড়ি ফুটবল ক্লাব শীল্ডে কাষ্টমসকে এবং গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্সকে ১-০ গোলে পরাজিত করে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে

১৯৩৪ সালে মহমেডান দল ভারতীয় দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লীগ বিজয়ের গৌরব পেয়েছে। তারপর ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে তারা ৫বার লীগ বিজয়ী হয়ে ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান ক্লাব লীগ বিজয়ের সম্মান পায়। ১৯৪০ সালে এবং এ বৎসর মহমেডান দল পুনরায় লীগ বিজয়ী হয়ে সাতবার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত লীগের খেলায় তারা অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করতে পারেনি। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগে মাত্র ৬টি ক্লাব অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করেছে। রয়েল আইরিস, ৯৩ হাইল্যাণ্ডার্স, কিংস ওন, গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স, ব্লাকওয়াচ এবং ক্যালকাটা এফ সি।

লীগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। ২৪টা ম্যাচ খেলে মোহনবাগান দলের থেকে ১ পয়েন্টে এগিয়ে আছে। লীগ খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব যে, রিটার্ণ ম্যাচে ৩-২ গোলে মহামেডান দলকে পরাস্ত ক'রে তাদের অপরাজেয় রেকর্ড ভেঙ্গেছে। ইষ্টবেঙ্গল বিজয়ী দলের মতই খেলেছে। অব্যর্থ গোলের কয়েকটি সুযোগ নষ্ট না করলে তারা খেলায় আরও বেশী গোলে জয়ী হ'তে পারতো। সুনীল ঘোষ, সোমানা এবং আপ্পারাও প্রত্যেকে ১টি ক'রে গোল করেন। আমীন, সুনীল ঘোষ, পি দাসগুপ্ত এবং রাখাল মজুমদার বিশেষ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন। খেলার শেষদিকে মহামেডান দল গোল পরিশোধের জন্য প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে কিন্তু বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের কৃতিত্বপূর্ণ খেলার দরুণ তাদের সর্ব্ব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। লীগে তাদের আর মাত্র দুটি খেলা বাকি আছে; তার মধ্যে মোহনবাগানের খেলাটি প্রধান। লীগের 'রানার্স আপ' নিয়ে উভয় দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। উভয় দলের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য খেলোয়াড়রা কি পরিমাণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিবেন তা ক্রীড়াক্ষেত্রে শীঘ্রই প্রমাণিত হবে।

ইষ্টবেঙ্গল ইতিমধ্যে লীগের রিটার্ণ ম্যাচে ডালহৌসীকে ৭-১ গোলে পরাজিত করেছে। কিন্তু কাষ্টমস দলের সঙ্গে তারা অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করায় সমর্থকেরা হতাশ হয়েছে।

মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে মোহনবাগান ক্লাব তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তাদের খেলা বাকি মাত্র ২টি। লীগের অতি নিম্নস্থান অধিকারী নর্থ ষ্টাফোর্ডের সঙ্গে এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা 'ড্র' করায় তারা ২টি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। খেলায় গুরুত্ব আরোপ ক'রে না খেললে অতি দুর্ব্বল দলের সঙ্গে খেলাতেও যে শক্তিশালী দলকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয় তার ইতিহাস সংগ্রহের জন্য অন্য কোথায় যেতে হবে না। এ অভিজ্ঞতা মোহনবাগান ক্লাবের নিজের আছে। এ বিষয়ে সকল ক্লাবের খেলোয়াড়দেরই সচেতন থাকতে আমরা অনুরোধ করছি। মনের মধ্যে জয়লাভের প্রবল ইচ্ছা পোষণ করা কোন রকম অন্যায় নয়, বরং খেলায় যথেষ্ট সহায়তা করে; কিন্তু অনায়াসেই জয়লাভ করব এরকম ধারণা নিয়ে মাঠে নেমে দুর্ব্বল দলকে উপেক্ষা করা মোটেই নিরাপদ নয়। মনের সঙ্গে খেলার যে সম্বন্ধ রয়েছে সেটা উপেক্ষা করা যায় না; একবার যদি দুর্ব্বল দল সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে প্রথম দিকেই গোল দেয় তাহলে তা পরিশোধ ক'রে খেলায় জয়লাভ করা বিশেষ শক্ত হয়ে পড়ে। তবে যারা শক্তিতে দুর্দ্ধর্ষ তাদের কথা স্বতন্ত্র। যেখানে খেলার জয় পরাজয়ের উপর দলের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে, প্রবল উত্তেজনার মধ্যে যে খেলার সূচনা হয় সেখানে শক্তিশালী দলের খেলোয়াড়দের মনের উদ্বিগ্ন অবস্থা প্রবল আকার নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় দলের শক্তি সমান হলেও অপ্রত্যাশিত ফললাভে শক্তিশালী খেলোয়াড়দেরও উদ্যমহীন হ'তে দেখা যায়। দুর্ব্বলের অপ্রত্যাশিত জয়লাভে শক্তিশালীর উদ্যমহীনতা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এই নির্ম্মম ঘটনার মধ্যে খেলোয়াড়দের যাতে পড়তে না হয় সেজন্য তাদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা পাশ্চাত্যদেশের প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়েছে। ব্যবস্থার কথা শুনলে আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা নিজেদের মন্দভাগ্যের কথা স্মরণ করে অনুশোচনা করবেন, প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ বিস্মিত না হ'ন—আর্থিক অনুকুল্যের কথা তুলে প্রসঙ্গ চাপা দেবার সুবিধা পাবেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা সেখানে বড় কঠোর। পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করার প্রতি প্রত্যেকের একটা সদিচ্ছা আছে। এক্ষেত্রে যাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়। অপরাধ গুরুতর হ'লে কঠোর শাস্তি লাভের হাত থেকে অব্যাহতি নেই।



তরুণ সমিতি (মধুপুর) শীল্ডের দ্বিতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগান ক্লাবের কাছে ৪-১ গোলে পরাজিত

প্রতিযোগিতার মরসুমে খেলোয়াড়দের সেই সব নিয়ম পালনে বিশেষ করে বাধ্য করা হয়। অনুমতি না নিয়ে বিনা প্রয়োজনে সাধারণের সঙ্গে খেলোয়াড়দের আলাপ করা নিষেধ। যেদেশে মদ্যপান দোষের নয়, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে প্রচলিত—সেখানেও প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের মদ্যপান থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমন কি ধূমপানও নিষিদ্ধ। দৈনন্দিন আহার্য্যের পরিমাণ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে নিরূপণ করা হয়। পেশাদার এবং সখের উভয় খেলোয়াড়দের প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা ক'রে চলতে বাধ্য করা হয়। বিখ্যাত ফুটবল প্রতিযোগিতা এফ এ কাপের ফাইনালে খেলোয়াড়রা যাতে উদ্যমহীন (Nurvous) হয়ে না পড়ে সেই জন্যেখেলোয়াড়দের গ্লাণ্ড ইন্‌জেকসন্ দেওয়া হয়। দুর্ঘটনার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব্ব থেকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ, যতখানি সামর্থ্যে সম্ভব হয় সেটুকু উপেক্ষা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

আই এফ এ শীল্ড খেলা আরম্ভ হয়েছে। অতীতের সে

উত্তেজনা নেই। দুর্দ্ধর্ষ গোরাদলকে হারিয়ে দেওয়ার আনন্দ আজ কোথায়! গোরাদল প্রতিযোগিতায় যোগদান করছে কিন্তু তাদের দলে এমন সব খেলোয়াড় নেই, যারা উচ্চাঙ্গের খেলা দেখিয়ে ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে। জোড়াতালি দিয়ে টিম তৈরী, জলকাদার মধ্যেও সুবিধা ক'রতে পারে না। এদিকে শ্রাবণের বারিপাত অপ্রত্যাশিত নয়। দুর্যোগ মাথায় ক'রে বুট পায়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা কর্দ্দমাক্ত মাঠে খেলতে বেশ অভ্যস্ত হয়েছে। অতীতের দুর্ভাবনা কেটে আসছে; বর্ত্তমানে শীল্ড জয়ের উন্মাদনা বিভিন্ন ফুটবল প্রতিষ্ঠানের সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। বেড়ালের মত মানুষের ভাগ্যেও শিকা ছিঁড়ে সে আশায় দুর্ব্বল সবল মিলিয়ে প্রায় ৬৩টি ফুটবল প্রতিষ্ঠান এবৎসরের মত বিদায় নিয়ে নিরাশ করেছে। তাদের আগামী বৎসরের সাফল্যলাভের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে আপাতত খেলার কথাই আলোচনা করা যাক।

শীল্ড খেলার সূচনাতেই স্থানীয় কাষ্টমস দল ২-০ গোলে জলপাইগুড়ি টাউনক্লাবের কাছে হেরে গিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শীল্ড তালিকায় আকর্ষণীয় খেলা ছিল মোহনবাগান প্রবীণ একাদশ বনাম ক্যালকাটা ক্লাবের খেলা। প্রবীণ খেলোয়াড়দের খেলা দেখবার জন্য বিপুল দর্শক সমাগম হয়। ক্যালকাটা ক্লাব ২-০ গোলে প্রবীণদলকে পরাজিত করেছে। প্রবীণদলে পদ্ম ব্যানার্জি, গোষ্ঠ পাল, কে ব্যানার্জি, বিমল মুখার্জি, টি সোম, এস বসু, বলাই চ্যাটার্জি, আর গাঙ্গুলি, পল্টু গাঙ্গুলি, ইউ কুমার এবং এন



প্রবীণ দল (মোহনবাগান) ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে শীল্ডের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে—উপবেশন (বামদিক থেকে ডানদিক)—বি ডালমিয়া (প্রেসিডেণ্ট), বি ডি চ্যাটার্জ্জি, এন গাঙ্গুলি, ডি এন গুঁই (ভাইস-প্রেসিডেণ্ট), জি পাল (অধিনায়ক), ইউ কুমার, সরোজ দত্ত (সেক্রেটারী), দণ্ডায়মান (বামদিক থেকে ডানদিক)—আর গাঙ্গুলি, বি মুখার্জি, কে ব্যানার্জি, আর সেন, সি ব্যানার্জি, টি সোম, সুধাংশু বসু, এ গাঙ্গুলি

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় নাম পাঠিয়েছিল। কিন্তু ৫৮টি টিম শীল্ডে খেলবার অধিকার পেয়েছে। ১১টি টিম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে, ২২টি টিম বিভিন্ন জেলা থেকে শীল্ড খেলায় নাম দেয়। এছাড়া স্থানীয় টিম ২৭টি এবং ৩টি মিলটারি টিমের নামও ছিল। শীল্ডের খেলা অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। যে সব দলের শক্তির উপর ক্রীড়ামোদীরা অখণ্ড বিশ্বাস রেখে শীল্ড ফাইনালের দিকে চেয়ে ছিলেন ইতিমধ্যে তাদের অনেকেই শীল্ড খেলা থেকে গাঙ্গুলী খেলেছিলেন। প্রথমার্দ্ধের খেলায় প্রবীণদল গোল করবার কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেন। সময়ে সময়ে আক্রমণ-ভাগের খেলোয়াড়রা চমৎকার ভাবে বল আদান প্রদান ক'রে বিপক্ষদলের গোল সামলে যেভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করছিলেন তাতে মনে হয় কিছুদিন অভ্যাস ক'রলে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অনেক দলকেই পরাজয় করতে পারেন। রক্ষণভাগে গোষ্ঠ পালের খেলা উল্লেখযোগ্য ছিল। সেই অতীতের 'চাইনিজ ওয়াল' ভেদ করে যেতে বিপক্ষদলকে এখনও বিশেষ বেগ পেতে

হচ্ছিল। বলাই চ্যাটার্জ্জি, কুমার, কে ব্যানার্জ্জির খেলাও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলাইবাবুর বল 'থ্রো' বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। কুমার ও আর গাঙ্গুলী বহুবার তাঁদের পূর্ব্ব খেলার পরিচয় দিয়েছেন।

ভবানীপুর ক্লাব ৪—১ গোলে বোম্বাইয়ের শক্তিশালী ডবলউ আই এফ এ দলকে পরাজিত করে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রথম বিভাগ লীগ তালিকায় ভবানীপুরের স্থান নীচের দিকে। এদিকে বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ক্লাব থেকে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড় নিয়ে ডবলউ আই এফ এ দলটি গঠিত। তাছাড়া আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলায় এই দলের প্রায় সকল খেলোয়াড়ই বাঙ্গলার আই এফ এ দলের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালের আই এফ এ শীল্ডবিজয়ী পুলিশ দল কুচবিহার একাদশের সঙ্গে ১-০ গোলে পরাজিত হয়ে শীল্ড খেলায় আর এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

মোহনবাগান ক্লাব প্রথম রাউণ্ডে ক্যালকাটা এরিয়ান্স ক্লাবকে ১-০ গোলে, দ্বিতীয় রাউণ্ডে তরুণ সমিতিকে ৪-১ গোলে এবং তৃতীয় রাউণ্ডে তিলক স্মৃতি ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে চতুর্থ রাউণ্ডে কে ও এস বি দলের সঙ্গে চ্যারিটি ম্যাচ খেলবে। শীল্ডের প্রত্যেকটি খেলায় তারা বিজয়ী দলের মত খেলেছে, বাকি খেলাগুলিতে যদি খেলোয়াড়রা এভাবে গোলের সুযোগ না নষ্ট করেন তাহলে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়ে তারা যে অপর দিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সম্মান লাভ করবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মোহনবাগানের দিকে শক্তিশালী দল রয়েছে, কে ও এস বি,—ওয়েলচ রেজিমেণ্ট এবং রেঞ্জার্স। আশার কথা তাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়লাভের উদ্দম দেখা যাচ্ছে।

শীল্ডের উপরের দিকে রয়েছে তিনটি শক্তিশালী দল মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, ভবানীপুর এবং জলপাইগুড়ি ভাল খেলছে। মহামেডান স্পোর্টিং শীল্ড খেলায় ইতিমধ্যে নূতন রেকর্ড করেছে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২৪ পরগণা জেলা এসোসিয়েনকে ১০-০ গোলে হারিয়ে। শীল্ড খেলায় দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে এত অধিক গোলে কোন দল জয়ী হয় নি। ৩১।৭।৪১

সাহিত্য-সংবাদ

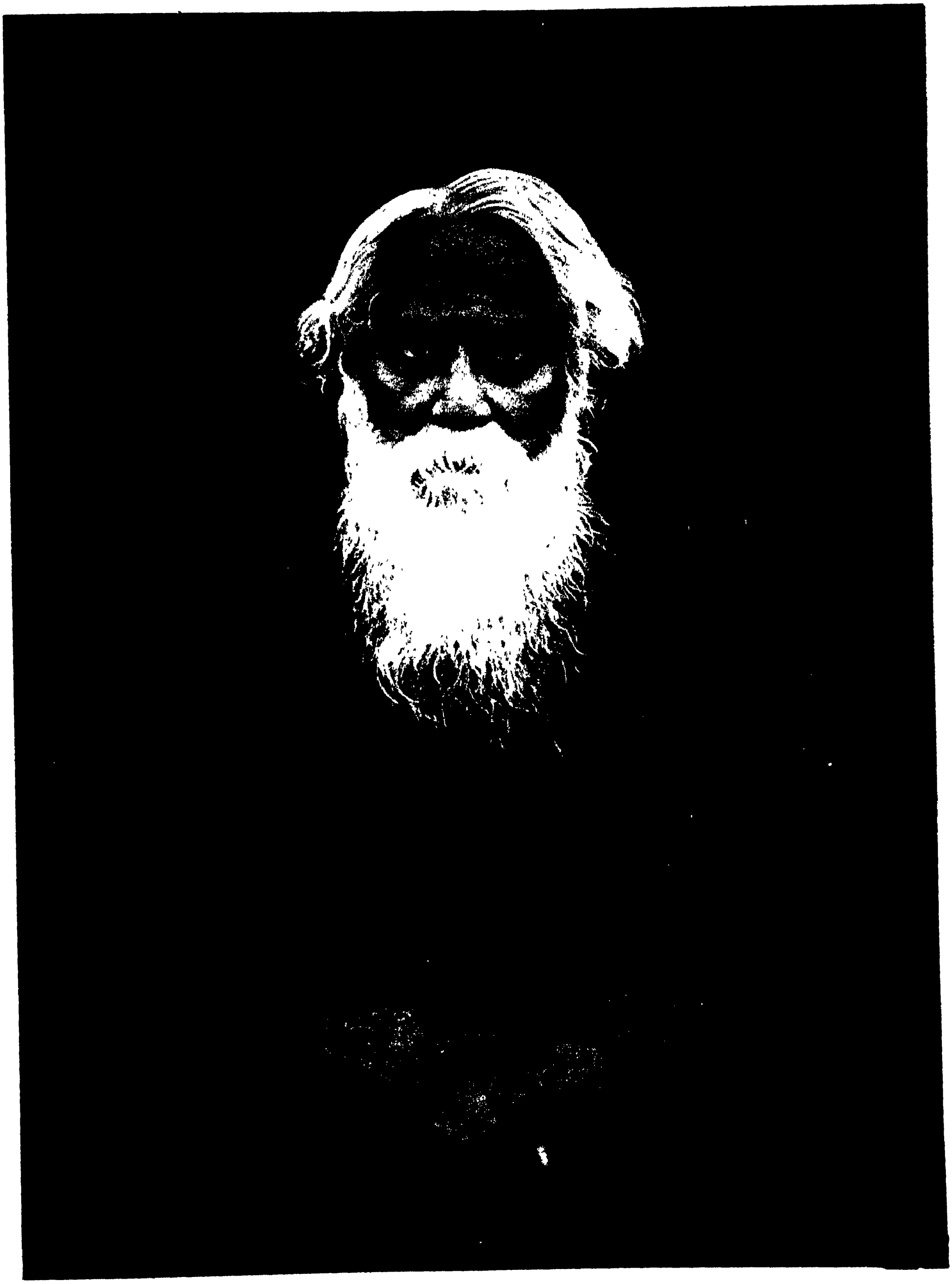
নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কবি কালিদাস"—১৲
সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস 'শতাব্দীর অভিশাপ'—২।০
সৌরীন্দ্র মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "মহামানব সঙ্ঘ"—২৲
খগেন্দ্র মিত্র প্রণীত "আসামের জঙ্গলে"—॥০
জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "রহস্যের ইন্দ্রজাল"—॥০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিপিনের সংসার"—২॥০
প্রমথনাথ বিশী প্রণীত উপন্যাস "কোপবতী"—২॥০
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অহিংসা"—২॥০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "জীবন প্রসঙ্গ"—১৲
স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত "স্তব কুসুমাঞ্জলি"—১॥০
ও উপনিষদ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ—২।০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কালিন্দী"—১।০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'অর্থমনর্থম্'—১॥০
প্রতাপচন্দ্র দত্ত প্রণীত "মধুমক্ষিকা ও তাহার পালন"—৩৲
প্রিয়লাল দাস প্রণীত "গ্রাম্য বালিকা"—১।০
নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত 'সহজ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা—২॥০
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ও জগদানন্দের "শ্রীমদ্ভাগবদগীতা"—৸৹
স্বামী জগদীশ্বরানন্দের "শ্রীশ্রীচণ্ডী"—৸৵০
মোহিতলাল মজুমদারের "হেমন্ত গোধূলি"—২৲
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ"—
শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাহিত্য-সরস্বতী প্রণীত "ছেলেদের টিফিন"—১৲
কালীচরণ ঘোষ প্রণীত "উপহার"—৷০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১০ আশ্বিন ইংরাজি ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে দুর্গোৎসব। সেজন্য আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ভারতবর্ষ পূজার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গ্রাহকগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আশ্বিন ভারতবর্ষ (September) সংখ্যা ১৫ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর এবং কার্ত্তিক (October) সংখ্যা ৩১ ভাদ্র ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্বিন বিজ্ঞাপন কপি ৩১ শ্রাবণ এবং কার্ত্তিক বিজ্ঞাপন কপি ১৫ ভাদ্র মধ্যে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





ভারতবর্ষ



আশ্বিন—১৩৪৮

প্রথম খণ্ড　　ঊনত্রিংশ বর্ষ　　চতুর্থ সংখ্যা

মৃত্যুবিজয়ী

রাধারাণী দেবী

অস্ত গেছেন রবি।
রবির অস্ত হয়না ভূমণ্ডলে।
রবি নিভিলে কি জৈবজগৎ বাঁচে ?

সারা সৃষ্টির সব কিছু অনুভূতি
যাঁর অনুভূতি-দর্পণে দেছে ধরা,
গোটা বিশ্বের কোটী রহস্য কোটী সমস্যা রাশি
ত্রিকাল প্রসারী দৃষ্টি-দীপনে যাঁর
হয়েছে উদ্ভাসিত।
প্রকৃতির সনে যাঁহার নাড়ীর যোগ !
উপলব্ধির পরশ পাথর যাঁর
তৃণ মাটী গাছ সবারি ছুঁয়েচে হিয়া।

নিখিল-জনের বহুবিচিত্র অনুভূতি নিয়ে গড়া
ছিল যে বিরাট প্রাণ,
সে-প্রাণ রহিল নিখিলজনেরই মাঝে।

মনীষা-মহৎ বিরাট জীবননদী
প্রাণ উচ্ছল দুরন্তবেগে ছুটে চলেছিল দ্রুত
লঙ্ঘি' বিপুল পাষাণ-প্রাচীর বাধা
চূর্ণ চূর্ণ করিয়া অনড় শিলা।
মহা মরুভূমি প্লাবি'
ফুলে আর ফলে সোণার শস্যে তৃণে
বর্ণে গন্ধে রসে রূপে ছেয়ে শুষ্ক রুক্ষ মাটী
সে নদী মিশিল মহা কাল-পারাবারে।

* *
*

মরণ তো শুধু জীব-জগতের সাধারণ-পরিণাম।
মৃত্যু নহেতো, মহাতিরোধান এযে!

মাটীর শরীর মিলায় মাটীতে শুধু থাকে তার স্মৃতি।
ধাবমান কাল দিনে দিনে পলে পলে
তারেও লুপ্ত করে।
কারো স্মৃতি মোছে বর্ষে ও যুগে
কারো শতাব্দী চয়ে।
তবু মানুষের কোনো কোনো স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে।
বহু শতাব্দী বুলায়ে বুলায়ে কাল
বিলোপ করিতে পারেনি যাঁদের আতিমানবিক স্মৃতি
তাঁদেরি সভায় তোমার আসন পাতা ;—
—যে-আসন স্বতঃঅতিক্রান্ত বহু শতকের দূর।

*
* *

ঋষির বিনাশ নাই।
এ' লোকোত্তর মহৎজীবন পরিপূর্ণতা শেষে
সৌম্য শান্ত পরিণত-পরিণাম।
এ' গম্ভীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া
কুণ্ঠিত হয় শোকের অশ্রু, বিলাপের হাহাকার।
মৃত্যুঞ্জয়ী মরণের রূপ হেরি
স্তম্ভিত ঘনশ্রদ্ধায় শির নত করিয়াছে কাল।

অস্তান্তে

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের যা গেলো তা জগৎমান্ত যোগ্য সুধী মনীষীরাই অনুভব করবেন ও লিখবেন। আমরা ক্ষুদ্র—আমাদের যা গেলো, আমরা যা খোয়ালুম, তার তুলনা খুঁজে পাই না। তা বুঝতে সময় নেবে। দুঃস্থের কুটীরের যেন শেষ দীপটি নির্বাপিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী নিশিদিন অক্লান্ত সাধনায়, আলোকপ্রাপ্তির যে উপকরণ রেখে গেছেন, ভবিষ্যৎ ভাগ্যবানেরা তা নিয়ে শত দীপালী উৎসব করতে পারবেন, মায়ের মন্দির আলোকোজ্জ্বল হবে। কিন্তু যাঁরা সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির আনন্দমুখর অফুরন্ত উৎসমুখের সহিত সাক্ষাৎপরিচিত, তাঁরা যে তাঁর আকস্মিক নীরবতায় বিমূঢ় ও বাক্‌হত! তাঁরা আজ তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলবার মতো অবস্থায় নাই। উৎসাহ উত্তেজনা আসে না। প্রিয়-বস্তুর আলোচনায় আনন্দ আছে সত্য, কর্তব্য হিসাবে—আবশ্যকও আছে। আমি তাঁর প্রায়-সমবয়সী—জরাজীর্ণ, দুর্বল, ইচ্ছা সত্ত্বেও অপারক।

নিজের অবসানটা সন্নিকট বোধে, গত জানুয়ারী মাসে, তাঁর কাছে পাথেয় বা আশীষ প্রার্থী হই। তাতে তাঁর হাত থেকে যে শেষ দান পাই, তার মধ্যেও রয়েছে—

* *

"আসিছে আসন্ন হ'য়ে রাতি।
আছি দোঁহে দিনান্তের প্রদোষচ্ছায়ার
পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়।"

আমি প্রতীক্ষাপন্নই পড়িয়া আছি।

রবীন্দ্রনাথের কোন্ কথাটার কতটুকুই বা বলতে পারি। সকল বিভাগেই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ যেন জন্মলব্ধ সহজ ঐশ্বর্যের মতই ছিল। কোনো বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসার উত্তরই তাঁকে ভেবে দিতে দেখি নাই।

একটা নিজের কথাই বলি। কার্য হ'তে অবসর গ্রহণান্তে শেষ জীবনটা কাশীতে কাটাবার ইচ্ছায় কাশী যাই। তার পর, যা প্রায় কেহ করেন না, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত জিদ্ এড়াতে না পেরে প্রায় ৫৭ বৎসর বয়সে আমাকে সাহিত্য-

চর্চার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করতে হয়। তাতে কিন্তু নিজের মঞ্জুরি পাইনি। সর্বদা সেটা অপরাধের মতই মনে হোতো।

এই ভাবে দেড় বৎসর কাটে। হঠাৎ এক সন্ধ্যায়, লক্ষ্ণৌ হ'তে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জরুরী টেলিগ্রাম হাজির—"কবি কেদারবাবুকে দেখতে চান, অবিলম্বে আসা চাই।" তিনি দু-চার দিনের জন্য অতুলবাবুর অতিথি। তিনি যে-কয়দিন ছিলেন, আমাকেও থাকতে হয়েছিল এবং সে দিনগুলি ছিল আমার জীবনের অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় সৌভাগ্যের দিন। কবিকে প্রাণ ভ'রে উপভোগের তেমন সুযোগ সহজে ঘটে না। যাক্—সে অনেক কথা।

বড় আদালত পেয়ে আমার দ্বিতীয় অধ্যায়রূপ অশান্তি-কর দ্বিধাটার মীমাংসা-প্রার্থী হই।—সুমধুর-হাসে কবি বলেন—"ওঃ, কাশীতে তুমি মুক্তি পাবার আশায় এসেছো! কিন্তু তার যে মূল্য দিতে হয়। দেবতারা এত মূর্খ নন—লোকশেনে কারবার করেন না, চতুর ব্যবসায়ীদের মত মূল্যটা অগ্রিম নিয়ে নেন্। দেবতারা ঠক্‌বার কেউ নন্। আবার যেটি তোমার বড় প্রিয়, যে তোমার মনে বোসে—"আমি আছি" বলে' সাড়া দেয়, তুমি তাকে জোর কোরে চাপ্‌তে চাও, অথচ ভুলতে পার না, তাকে চোক্ ঠেরে কাজ হাসিল করতে চাও, তার দাবী মেটাও না। অন্তর্যামী অন্ধ নন—তোমাকে মুক্তি দেবে কে? একটি কথা মনে রাখা চাই—মুক্তি পেতে হ'লে—আগে মুক্তি দিতে হয়। একজনকে ধোরে রেখে তুমি কি তা থেকে নিজেকে 'মুক্ত' ভাবতে পারো? তোমার মধ্যে যদি প্রকাশপ্রার্থী বা মুক্তিপ্রার্থী কিছু থাকে, তাকে বন্দী ক'রে রেখে, নিজে মুক্ত হবে কি কোরে? তাকে আগে মুক্তি দেওয়া যে চাই! ফল কথা;—"মুক্তি দিয়ে—মুক্ত হ'তে হয়।"

কী সহজ সত্যই পেলুম। সকল দ্বিধা মুহূর্তে মিটে গেল। নমস্কার করলুম।

পরমহংসদেব বলতেন—যারা নিত্যসিদ্ধের থাক্, তাদের কাছে সবই সহজ, তাদের বেতালে পা পড়ে না।

তাঁর সাহিত্য, তাঁর কবিতা, তাঁর সমালোচনা ও দার্শনিক আভাস-ইঙ্গিৎগুলিই সকলকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। কিন্তু যেটা ছিল তাঁর সর্বকর্ম, সর্বচিন্তার প্রধান ও প্রিয় উৎস—আবাল্য যেটা ছিল তাঁর আপন বস্তু—তাঁর সেই পরমার্থ-প্রীতির দিকটা, এতদিন তাঁরই থেকে গিয়েছে। আমি তাঁর অধিকাংশ দানের মধ্যে তার আভাসই লক্ষ্য করেছি। একদিন সেই অনুচ্চারিত প্রাণ-বস্তুটি—দেশের আলোচনার বস্তু হবে, আমি এই আশাই রেখে যাব। তাঁর ধর্মভাবের কথা বলছি না। বলছি—তাঁর লেখার অঞ্জলিগুলি—পুষ্পাঞ্জলির মত প্রায়ই পরমার্থের লক্ষ্যে নিবেদিত।

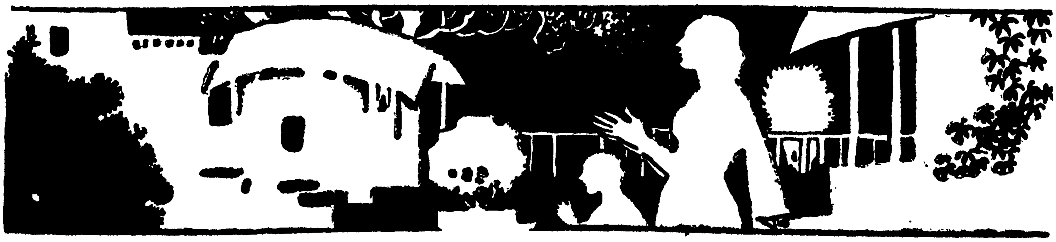
আমি তাঁর সমবয়সী বলেই বোধ হয় একদিন কথাটির উত্থাপন করতে সাহস পেয়েছিলুম, বলেছিলুম—"আপনার দান একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। তার মধ্যে নিজের কাজ সেরেও চলেছেন!"

শুনে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—"সে কি! কেনো বলো দেখি—কি পেলে?"

বলেছিলাম—"যাঁরা আমার মতো লেখক তাঁরা বিষয়বস্তু নিয়েই বিব্রত—বক্তব্যই কুলিয়ে ওঠে না। আপনি কিন্তু নিঃশব্দে তার মধ্যে ভগবানকেও জড়িয়ে চলেন!"

"তাই নাকি! কই আমি তো তা বুঝতে পারি না। দেখছি—তোমাদের কাছে সামান্য ভুল-চুকও ধরা পড়ে!" বলে মৃদু মধুর হাসলেন। সে 'হিউমারের' তুলনা হয় না!—বোধ হয় ফুরিয়ে গেলো।

লেখবার সাধ থাকলেও সাধ্য গিয়েছে, আমি এখন বিদায়ভিক্ষু।



রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আর কেন কলরোল ? বলো হরি, হরিবোল,
চলো ফিরে যাই ;
কালই যে-বা ছিল কাছে, আজ সে কোথায় আছে,
কাহারে শুধাই ?
আশে-পাশে, চারিধারে যত খুঁজে' মর তারে,
চিহ্ন নাহি তার,
যত কাঁদ, যত ডাক, যত চোখ মেলে' থাক,
শুধু অন্ধকার !
প্রাণপণে মিছে চাওয়া, —এ ধরার দাবী-দাওয়া
ফিরাবেনা তারে,
সব বাধা পায়ে দলে' যে জন গিয়াছে চলে'
মরণের পারে।
কেন তবে মিছে গোল ! বলো হরি, হরিবোল,
চলো ফিরে' যাই ;
যত বলো এত, তত— এ দেহের মূল্য যত,—
সে তো ওই ছাই !

* * * *

এই যদি, তাই হোক্, ফিরাইয়া লহ চোখ
এ-পারের দিকে ;
মৃত্যুর কঠিন শিক্ষা জীবনে যা' দিল দীক্ষা,
তাই লহ শিখে'।
ধরার ধূলার 'পরে যে রবি সহস্র করে
লিখে' গেল লিখা,
সে তো কভু ঘুচাবেনা সে তো কভু মুছাবেনা
শ্মশানের শিখা।

সে যে মানবের চোখে যুগে-যুগে লোকে-লোকে
রহিবে অক্ষয়,
মৃত্যু কি করিবে তার, অ-মরার অধিকার
যাহার সঞ্চয় ?
সে শুধু দেহের দ্বারে আঘাত হানিতে পারে
এ মর-জগতে,
কালের 'সোণার তরী' লয় তারে পার করি'
অনন্তের পথে !

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথায় বা কালিদাস ?
কত যুগ গত ;
তাদেরও মরণ এসে নাশিবারে চেয়েছে সে
আজিকারই মতো !
সবারই বুকের কাছে তবু তারা বেঁচে আছে
মানবের ঘরে,
তাদের কিসের ভয় ? তারা যে মরণঞ্জয়
অমৃতের বরে !
তেমনি ধরার পাতে যে রবি আপন হাতে
জ্বালায়ে আলোক
অমর অক্ষরে তার ফুটাইল চারিধার
মানবের চোখ,
তার কি মরণ আছে ? সবার বুকের কাছে,
নয়নের আগে
অতন্দ্রিত দীপ্তি তার হরিবারে অন্ধকার
চিরদিন জাগে !

—কবি নাই ? সে কি হয় ! একথা কথাই নয়,
শাশ্বত সে ধন,—
দেহ-বস্ত্র যত তার করুক্ সে অধিকার
মৃত্যু-দুঃশাসন !



রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন স্মৃতি

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

'মধু-রাতে' না হইলেও শ্রাবণের পূর্ণিমার দিনে কবির জীবনের আনন্দভরা খেলা ভাঙ্গিল। এখন দেশের লোক শোকে, স্নেহ-প্রীতিতে ও ভক্তিভরে কবির অনুধ্যানে মগ্ন। এ সময়ে কেবল অতি অল্পে তাঁহার প্রাচান স্মৃতি লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথা লিখিব; অধিক কিছু লিখিবার শক্তিও আমার নাই।

কবির বয়স যখন আঠার বৎসর পোরে নাই, তখন একদিন কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে তরুণ-বয়স্কদের একটি সমিতিতে রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, আর সেই সঙ্গে গোটা দুই গান গাহিয়াছিলেন। দৈবে সেদিনকার সেই সভার সভাপতি ছিলেন স্বনামখ্যাত পণ্ডিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সুশিক্ষিত গুণগ্রাহী সভাপতি বালক রবীন্দ্রনাথের পাঠ ও গানের শেষে তাঁহাকে সাদরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বালক-কবির প্রতিভায় কবিগুরু বাল্মীকির প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানী কৃষ্ণমোহন কখনও অত্যুক্তি করিতেন না। কাজেই তাঁহার মন্তব্যটুকু শুনিয়া সভার লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। একে ত সে সময় বালক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক খ্যাতি হয় নাই, তাহার পর তাঁহার ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা দুই-একটি গানে সাধারণ শ্রোতারা এমন কিছু পায় নাই যাহাতে কবির ভবিষ্যৎ বিকাশের অত বড় আভাস পাইতে পারে; তাই সুধী কৃষ্ণমোহনের উক্তিতে তাহাদের বিস্ময় জন্মিয়াছিল। পরে ক্রমশ লোকে বুঝিতে পারিল যে, গুণগ্রাহী কৃষ্ণমোহন কত অল্প আভাসে বালকের প্রতিভার অঙ্কুরের অতুল ভবিষ্যৎ বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ অক্রূর দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে একসময় একটি সাহিত্য সভা বসিত। এই সভার এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যখন একটি প্রবন্ধ পড়েন, তখন ইউরোপীয় ও পারস্য-সাহিত্যবিশারদ শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভা ভঙ্গের পর তাঁহার কয়েকজন বিজ্ঞ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তরুণ কবির মুখে যে জ্ঞানের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা বয়স্ক রাজনীতিজ্ঞদের লেখাতেও পান না। আমার ঠিক স্মরণ নাই, তাঁহাদের পাড়ার সেই সভায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার উপস্থিত ছিলেন কি না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম সময়ের রচনাতে অনেক নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার শব্দযোজনার পদ্ধতিতে, কবিতার ছন্দের ভঙ্গিতে আর সাধারণভাবে রচনার রীতিতে যে নূতনত্ব ছিল তাহার প্রভাবে প্রাচীন সাহিত্যিকেরা তাঁহার লেখা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই নূতনত্বকে আদর করিতে পারেন নাই। কবির লেখার প্রথম যুগে প্রাচীন লেখকেরা তাঁহার নূতনত্বকে বরণ করেন নাই বটে কিন্তু কবির লেখার অন্তর্নিহিত অজানা গুণে অতর্কিতে আকৃষ্ট হইয়া কবির লেখাকে উপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদাই পড়িতেন। আমার বেশ মনে আছে, সেকালের একজন প্রসিদ্ধ লেখক মুখে মুখে তামাসা করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন—শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে—ইত্যাদি। যে রচনা প্রাচীন লেখকদের কাছে তামাসা, তাহাও যে তাঁহাদের মুখস্থ থাকিত সেটি লক্ষ্য করিতে হইবে। গুণের প্রভাবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।



"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

চঞ্চলা সৌভাগ্যলক্ষ্মী,—
বীরভোগ্যা বীর্য্যশুল্কা নারী
কাম্য যিনি সমগ্র বিশ্বের,
বিজড়িত বিম্বাধরে যার
রহস্য জড়িত হাস্যরেখা,
একদা সে এসেছিল ভাগীরথী কূলে
স্কন্দগুপ্ত মহীপালে করিতে বরণ
দুর্লভ মন্দার ফুলে
বরমাল্য করি বিরচন !

কতনা শতাব্দী গেল
অন্ধকারে মিশে তারপর,
সেদিনও দেখেছি তারে রাজরাণী বেশে
গৌড় সিংহাসনে হাসে
অসামান্যারূপে।

এ দিনও গিয়াছে চলি,
তারপর এসেছে দুর্দ্দিন—
এসেছে দুর্য্যোগ ;
কীর্ত্তিস্তম্ভ পড়েছে ভাঙিয়া,
প্রাসাদের ধ্বংস শেষ,
ভগ্নস্তূপ স্বর্ণ মন্দিরের,
বিক্ষিপ্ত চৌদিকে।
জীর্ণদীর্ণ কুটীরের সঙ্কীর্ণ অঙ্গন
তৃণগুল্ম আগাছায় গিয়াছে ভরিয়া।
বিশাল গাঙ্গেয় হৃদি শৈবাল সঙ্কুল,
দীর্ঘরাত্রি সমাচ্ছন্ন ছিল অন্ধকারে।
নির্ব্বাক নিস্তব্ধ পল্লী
ছন্দহীন দিবস রজনী,
থেমে গেছে ক্রীড়া কলরব,
থেমে গেছে বৈষ্ণবের বাণী,
নীরব হয়েছে সব
আনন্দ মুখর-হাসিগান।

ধূলায় লুটায় পড়ি বাউলের বীণা,
দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ক্লান্ত নরনারী
অবহেলা অবজ্ঞায়
যাপি কোনও মতে—
উৎসব উল্লাসহীন মুমূর্ষু জীবন,
রোগশীর্ণ কঙ্কালের বোঝা বহি চলে।
তাদের সে সর্ব্বহারা নিঃস্ব গৃহকোণে
বিক্ষিপ্ত দেখেছি ইতস্তত
প্রাচীন পুঁথির ছিন্নপাতা,
খসি পড়ে অপরূপ চিত্র প্রাচীরের,
ঘনায় সন্ধ্যার কালো ছায়া।

হেনকালে দেখা দিল চাঁদ
ভগ্ন গবাক্ষের পথে
উঁকি দিল সহসা জ্যোছনা ;
হাসিয়া উঠিল আচম্বিতে
ঊনবিংশ শতাব্দীর শারদ শর্ব্বরী
সে আলোর আবির্ভাবে উঠিল উদ্ভাসি
সুজলা সুফলা মূর্ত্তি
শ্যামা জন্মদার।

পোহাল রজনী ধীরে,
জাগিল প্রভাত ;
পূর্ব্বাচলে উদিল অরুণ,
জীর্ণ কুটীরের দ্বারে
কোথা হতে পড়িল ঠিকরি
সাতটি রাজার ধন একটি মাণিক !
উদ্ভাসি উঠিল দশদিক।
এ প্রাচী দিগন্ত হতে
বিচ্ছুরিত রশ্মিরেখা যার
বিকীর্ণ করিয়া দিল পশ্চিম গগনে
রবিদ্যুতি হেন জ্যোতি—
অপূর্ব্ব-ভাস্বর !

সে আলোর স্পর্শে হ'ল
　　সঞ্জীবিত নির্জ্জীব জীবন
প্রাণের স্পন্দন পুনঃ
　　জড়তা বন্ধন বাধা ছেদি
　　আনন্দের জাগাইল সাড়া,
শুষ্ক তরু হল মুঞ্জরিত,
　　কুঞ্জবন দিল সে যে ভরি
নব নব কলি ও কুসুমে,
ষড়ৈশ্বর্য্যে ষড় ঋতু হল আবির্ভূত,
উৎসবের বেণু বীণা উঠিল বাজিয়া
　　যৌবনের জয় শঙ্খরবে।
নৃত্য লাস্যে ঝঙ্কারিল নূপুর নিক্কণ
সচকিয়া শত শত হিয়া;
　　জাগিয়া উঠিল তনু মনে,
　　তারুণ্যের উল্লাস হিল্লোল!
　　নবছন্দে বাজিল মাদল,
মৌনমূক কণ্ঠ হ'তে
　　উৎসারিল সঙ্গীত কাকলি,
নিরানন্দ কুটীরের নির্জ্জন অঙ্গনে
　　সহসা লাগিল মহোৎসব
কাব্যের অমরাবতী
এল যেন আচম্বিতে
　　মাটির এ ধরাতলে নামি।
কল্প কথা গল্প গাথা
　　হাস্য লাস্য গান,
নাট্য নৃত্য রঙ্গ রসে
　　ভরিল জীবন;

বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টি মেলি
　　সেদিন দেখিল চাহি বিস্মিত জগৎ
সপ্তবর্ণঅশ্ববাহী কার জয়রথ
　　দিগ্বিজয় অভিযানে চলেছে ছুটিয়া!
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে শির
　　পৃথিবী জানাল নমস্কার,

সেদিন সে ভারতের গৌরবের ধন
　　বিশ্বেরে জানাল আমন্ত্রণ
　　ভারতীর উদার অঙ্গনে।
নবজীবনের মাঝে উত্তরিল মহামানবতা,
অতীতের তপোলব্ধ বিস্মৃত বারতা
বর্ত্তমান সভ্যতারে দিল আলিঙ্গন;
নিমেষে করিল দূর
　　সঙ্কীর্ণ মনের অন্ধকার।
বাঁচিয়া উঠিল যেন মৃতপ্রায় প্রাণ,
নবীন আদিত্যবর্ণে হল দীপ্যমান
　　নশ্বর এ মর্ত্ত্যলোকে মূর্ত্ত অমরতা!
এল আশা—এল ভাষা—
　　এল আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস,
　　চূর্ণ দীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন ভাগীরথী কূলে
　　মানবের সমগ্রতা হল রূপায়িত!

শেষ করি অসমাপ্ত কাজ
উত্তর অয়ন ঘুরি বিদায় অচলে
　　ফিরিয়া চলিল দিনকর,
গোধূলি আকাশে আঁকি
　　অস্তরাগ নবপ্রদোষের
বিদায় লইল রবি
　　নবস্রষ্টা—নবকবি
　　মৃত্যুঞ্জয়, শাশ্বত-তরুণ!
জানাও উদ্দেশে তাঁর
　　সায়াহ্নের শান্ত নমস্কার!
শোকাশ্রু মুছিয়া চিত্ত
　　কবি-তীর্থে কর প্রসারিত।
লোকোত্তর প্রতিভার
　　বিচিত্র বিপুল উপহার
অকৃপণ দাক্ষিণ্যের
　　নব নব ঐশ্বর্য্য সম্ভার,
বিশ্ব মানবের সে যে উত্তরাধিকার!
কাঁদে তবু সমগ্র জগৎ,—
"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!"

ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল নানামুখ, তাঁহার প্রতিভা ও কর্ম উভয়ই নানা ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভাবপ্রবণতা ও জ্ঞাননিষ্ঠা, জাতীয়তা ও বিশ্বমানবিকতা, শান্তি ও সংগ্রাম প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী ধর্ম ও কর্ম তাঁহার চিত্তে ও চরিত্রে অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। সুদক্ষ মণিকারের হাতেকাটা ভাস্বর হীরকখণ্ডের ন্যায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়াছিল নানা ভূমিতে, যে দিক্ হইতেই ইচ্ছা দেখা যাউক না কেন ইহার দীপ্তি ও বর্ণ-বৈচিত্র্য দর্শককে মুগ্ধ করিবে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, তিনি ছিলেন নাট্যকার এবং নাট্যকলার প্রযোজক; তিনি সঙ্গীত ও সুরের শিল্পী ছিলেন, কলাবিৎ এবং কৃতকর্মা রূপকার-ও ছিলেন; আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস তাঁহার কাব্যরচনায় সুপরিস্ফুট এবং সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীল কর্মপ্রচেষ্টা, সামাজিক ও মানসিক জগতে সুধার ও সংস্কার তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। রসানুভূতিময় অন্তর্দৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক অবলোকন ও বিচার-শক্তি, এই উভয়ের এরূপ অদ্ভুত সমাবেশ মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে নিতান্ত বিরল; এই দিক্ দিয়া দেখিলে, চিন্তানেতা ও সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে প্লাতোন্, আরিস্তোতল, পতঞ্জলি, লেওনার্দো দা-ভিঞ্চি ও গ্যেটে প্রমুখ মহামানবদের সঙ্গে সমশ্রেণীর বলিতে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকে পৃথিবীর দশ বারোটী প্রধান বা শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ বা গ্রন্থাবলী অথবা মহাকবি-বিশেষের রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের, সাহিত্যিক ও অন্য নানাবিধ প্রকাশের গভীর ও ব্যাপক আলোচনা বহু রসজ্ঞ এবং দর্শনশীল সমালোচক বহু দিন ধরিয়া করিবেন; রবীন্দ্রনাথ নিজ কৃতি-স্বরূপ একটী বিরাট্ সাহিত্য-রত্নভাণ্ডার চিরন্তন কালের জন্য আমাদের দিয়া গিয়াছেন এবং সেই সাহিত্য ও তাঁহার জীবনের বিচিত্র কার্যাবলীকে অবলম্বন করিয়া ক্রমপ্রবর্ধমান "রবীন্দ্র-সাহিত্য", বাঙ্গালা ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় ইতিমধ্যে যাহার পত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহা গঠিত হইতে থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব তাঁহার জাতিকে ধন্য করিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলা যায়—"কুলং পবিত্রং জননী চ কৃতার্থা।" রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব-গৌরবে তাঁহার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ বিশ্বমানব-সভায় কি পরিমাণে উন্নীত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যাঁহারা ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া ভারতের সংস্কৃতির প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর প্রতি পৃথিবীর নানা দেশের লোকেদের মনে কতটা গভীর শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি জাগিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে এক অমূল্য সম্পৎ। এই সম্পদের সম্বন্ধে বহু বিদেশী সহৃদয় ব্যক্তি সচেতন ছিলেন—আমাদের সকলে হয় তো ইহার মূল্য ততটা বুঝি না বা বুঝিতাম না। আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক উইল্ ডুরান্ট্ রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত একখানি বই একবার পাঠাইয়া দেন, সেই বইয়ের ভিতরে তিনি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের নামে সমর্পণ লিখিয়া দেন—You are the reason why India should be free, অর্থাৎ "তুমি যে আছ, ইহাই ভারতের পক্ষে স্বাধীন হইবার জন্য প্রধান কারণ বা দাবী।" রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২৭ সালে মালয়-উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে বলিদ্বীপের প্রধান ডচ্ রাজপুরুষ শ্রীযুক্ত কারন্ আমায় বলিয়াছিলেন—"আপনারা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আছেন। দেখিবেন, উঁহার স্বাস্থ্যের কোনও হানি যেন না হয়; আপনাদের দায়িত্ব বিশেষ গুরুভার, কারণ রবীন্দ্রনাথ কেবল আপনাদের দেশের নহে, উনি সমগ্র মানবজাতির।" আমার একজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু ফ্রান্সে অবস্থান-কালে আমায় বলিয়াছিলেন—He has been the greatest ambas-

sador any country could have—he has been the greatest ambassador of India whose services have rendered her high and great among nations, অর্থাৎ "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় রাজদূত পৃথিবীর কোনও দেশের ভাগ্যে ঘটে না; ভারতবর্ষের পক্ষে এঁর চেয়ে বড় রাজদূত আর কখনও হয় নি, এঁর উপস্থিতিতে আর কার্যে বিশ্বের তাবৎ জাতির মধ্যে ভারতের স্থান উঁচুতে উঠেছে আর মহৎ হ'য়েছে।" এই কথাটী অতি খাঁটী কথা। ইংলাণ্ড বা আমেরিকার শক্তি আর ঐশ্বর্যের কারণেই ইংরেজ বা মার্কিণ জাতির লোক যেখানে বিশ্ব-জনসভায় খাতির পায়, সেখানে বিজিত, পরাধীন, নিজ বাসভূমেও পরবাসী ভারতবাসী সম্মানের আসন পাইয়াছে,—ইহা বহুবার দেখা গিয়াছে; সম্মান পাইয়াছে জন-সাধারণের কাছ থেকে—রাজনৈতিক দরবারে হয় তো ভারতের স্থান নাই, কিন্তু ভারতবাসী পাইয়াছে জনগণের হৃদয় থেকে স্বত-উৎসারিত প্রীতি ও সম্মাননা। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য, উপন্যাস এবং জ্ঞান ও চিন্তা-গর্ভ প্রবন্ধের মধ্য দিয়া, তাঁহার গীতি-কবিতার এবং নাটকের মানবিকতা ও তাঁহার আনুষঙ্গিক রহস্য-বোধের অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলেশিয়া এই পাঁচটী মহাদেশের বিভিন্ন জাতির মানবের মনের মধ্যে নিজের আসন করিয়া লইয়াছেন; ভারতের সনাতন আকাঙ্ক্ষা তাঁর লেখায় মূর্তি পাইয়াছে এবং তাহার মধ্যে বিশ্বমানব-ও তাহার নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি, তাঁহার ভারতীয় সাধনার আদর্শের প্রতি, তাঁহার জাতির প্রতি, নানা দেশের মানুষের এতখানি দরদ।

আমি নিজের জীবনে বিদেশ-ভ্রমণ কালে ছোট বড় নানা অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি—রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে আমার সমজাতিত্ব আছে বলিয়া, রবীন্দ্র-নাথের দেশেরই মানুষ আমি সেইজন্য, আমার কদর কতটা বাড়িয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই শ্রদ্ধার ভাব জগতে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ১৯২২ সালে ছাত্রাবস্থায় যেমনটী দেখিয়াছিলাম, ১৯৩৮ সালেও সেই ভাবই দেখিয়াছি; এখনও সব দেশে লোকে তাঁহার বই পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, আধ্যাত্মিক ও মানসিক আনন্দ, শক্তি ও শান্তি পায়; তিনি কেবল হুজুগের বা ফ্যাশনের ঢেউয়ের মাথায় দুই দিনের বা দুই বছরের জন্য ইউরোপের আমেরিকার চীন-জাপানের চিত্ত জয় করিয়া পরে চির-বিদায় লন নাই; এখনও তাঁহাকে লোকে মনের নিভৃত কোণে শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছে এবং তাঁহাকে না পাইয়া ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে না পারিয়া, তাঁহার দেশ-বাসীকে পাইয়া তাঁহার প্রতি সেই শ্রদ্ধার নিবেদন যেন ঐ নগণ্য দেশবাসীর মারফৎই করিতে চাহিতেছে। আমি ১৯২২ সালের একটী ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা বলিব; তাহা হইতে বুঝা যাইবে, আমাদের ভারতের সম্মানবর্ধনকারী



রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

কত বড় রাজদূত হইয়া রবীন্দ্রনাথ দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, দেশ হইতে দেশান্তরে তাঁহার বাণী পাঠাইয়াছেন।

১৯২২ সালে মে-জুন-জুলাই মাসে আমি ইটালি ও গ্রীস-দেশে ভ্রমণ করি। জুলাই মাসে ইটালির ভেনিস্ নগরে গ্রীক কন্সাল বা রাষ্ট্র-প্রতিনিধির দপ্তরে গিয়া গ্রীসদেশে অবতরণের ও গ্রীস-ভ্রমণের অনুমতির জন্য উপস্থিত হইব স্থির করি। ইংরেজ সরকারের তরফ হইতে যে পাসপোর্ট অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিচয়-পত্র আমার ছিল, তাহাতে প্রথমতঃ লণ্ডনের ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-বিভাগের নির্দেশ ও ছাপ করাইয়া লই যে, আমায় গ্রীস দেশে ভ্রমণ করিতে দিতে ব্রিটিশ সরকারের আপত্তি

নাই। সেই নির্দেশ দেখাইয়া তবে যে দেশে যাইতেছি সেই দেশের অনুমতি লইতে হইবে। গ্রীক্ কন্সালের আপিসে গিয়া যথানির্দিষ্ট শুল্ক বা মাশুল দিয়া, আমার পাসপোর্টে ছাপ লইতে হইবে, যে আমি অবাধে গ্রীস দেশে ভ্রমণ করিতে পারি; অন্যথায় সে দেশে আমাকে নামিতেই দিবে না। ভেনিস্ শহরে গ্রীক কন্সালের আপিস খুঁজিয়া বাহির করিলাম। একটী পুরাতন ইটালীয় বাড়ীতে দো-তালায় দুই-তিনটী ঘর লইয়া আপিস। গ্রীষ্মকাল, ইটালির সূর্য যেন আমাদের দেশের মতই প্রখর। তখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। এখন ফ্রান্স ইটালি প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় দেশে এইরূপ নিয়ম আছে যে আপিস-আদালত-ইস্কুল-কলেজ প্রভৃতি সকালে নয়টা হইতে বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে, তাহার পরে বারোটায় সব বন্ধ হইয়া যায়, আবার খোলে সেই দুইটায় বা তিনটায়, তার পরে পাঁচটা বা ছয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে। মাঝের এই বন্ধের দুই তিন ঘণ্টা সকলে মাধ্যাহ্নিক ভোজন ও বিশ্রামে অতিবাহিত করে। গ্রীক কন্সালের আপিস তখন বন্ধ হইবার সময়; জানালাগুলি বন্ধ হইতেছে। তখনই আমার কাজটুকু সারিয়া না গেলে সেই রৌদ্রে আমাকে আবার দুই বা আড়াই ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতে হয়। কপাল ঠুকিয়া দোতালায় উঠিয়া আপিস-ঘরের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরের ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া টান দিলাম। ভিতরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে একজন ইটালীয় চাকর বাহিরে আসিয়া বলিল—"দেখিতেছেন না, বারোটা বাজে, আপিস এখন বন্ধ হইতেছে, সেই বিকালে আসিবেন।' আমি তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ জাতির নাম লইলাম—বলিলাম—"কন্সালকে বলো গিয়ে, আমার ইংরেজ সরকারের পাসপোর্ট আছে।" অর্থাৎ ইংরেজ জাতির সম্মাননা গ্রীসকে করিতে হইবে। কন্সালের চাকর ফিরিয়া গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমাদের কন্সাল ইংরেজী বলিতে পারেন না।" আমি নাছোড়বান্দা, বলিলাম, "Parla francese? parla alemana? পার্লা ফ্রাঞ্চেসে? পার্লা আলেমানা? তিনি ফরাসী বলেন? জরমান্ বলেন?" সভ্য ভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী, ফরাসী, জরমান্—এই তিনটার একটাও তো জানা উচিত; —ভৃত্য এবার গিয়া কন্সালকে বলিল, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কন্সাল সাহেবের সামনে হাজির করিল। তখন দেখি, ঘরের জানালা বন্ধ, ঘর অন্ধকার, কন্সাল-ও মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ছড়ি টুপি লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু কি করেন, ইংরেজ সরকারের দোহাই পাওয়ায় অগত্যা কোনও ইংরেজপুঙ্গবের খেদমতের জন্য হাজির রহিয়াছেন, নিতান্ত অ-খুশী মনে। কিন্তু আমাকে দেখিয়াই ফরাসীতে বলিলেন—"ah, mais vous n'êtes pas anglais! আ, মে ভু নেৎ পা্যাঁগ্লে! আঃ, কই, আপনি তো ইংরেজ নন্!" উত্তরে বলিলাম, "না, আমি ভারতীয়।" শুনিয়াই ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিলেন, "ভারতীয়! বসুন মশায়, বসুন! আমি রাবীন্দ্রানাত্ তাগোরের বই প'ড়েছি!"—আমি ভারতীয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশের লোক, এই পরিচয় যেন যথেষ্ট; আমাকে ভদ্রলোক অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করিলেন। ফরাসীতে তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল; দেখিলাম, তিনি আমাদের সংস্কৃত "রামাইয়ানা" আর "মাখাবারাতা"র-ও খবর রাখেন, তাঁহার দেশের একজন বড় কবি আধুনিক গ্রীক ভাষায় "নালাস্" আর "দামাইয়ান্দী"র কাহিনী মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করিয়াছেন সে কথা বলিলেন;—আর রবীন্দ্রনাথের লেখার সম্বন্ধে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবি একজন, ইংরেজী থেকে গ্রীকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, 'গার্ডনার', আর সাধনার অনুবাদ করিয়াছেন। ভদ্রলোক তখনই আমার পাসপোর্ট-এ ছাপ দিয়া দিলেন। আইন-মোতাবেক যথাকর্তব্য তখনই চুকাইয়া দিলেন; উপরন্তু গ্রীসের রাজধানী আথেন্সে দুই একটী শস্তা অথচ ভদ্র হোটেলের ঠিকানা দিলেন, গ্রীসে ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন,আর নানা বিষয়ে খানিক আলাপ করিলেন। প্রায় ৪০ মিনিট এইভাবে সদালাপ ও শিষ্টাচার করিলেন—রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক পাইয়াছেন বলিয়া। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা গেল, রবীন্দ্রনাথের মত দেশগৌরব ভারতসন্তানের কল্যাণে ভারতবর্ষের জনসাধারণ কতটা মর্যাদার এবং হৃদ্যতার অধিকারী হইতে পারে।

এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যায়। যাঁহারাই ইদানীং বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এই প্রকারের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে পারেন। 'বাক্‌পতি' রবীন্দ্রনাথ, 'কবি-গুরু', 'কবি-সম্রাট্', 'কবি-সার্বভৌম' রবীন্দ্রনাথ, 'সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের Poet Laureate বা

রাজকবি' রবীন্দ্রনাথ, 'ভারত-ভাস্কর' রবীন্দ্রনাথ, 'দেশনেতা' বা 'রাষ্ট্রনেতা' রবীন্দ্রনাথ, 'সংস্কারক' রবীন্দ্রনাথ, 'বিশ্ব-মানবিকতার অগ্রদূত' রবীন্দ্রনাথ 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' রবীন্দ্রনাথ, 'কর্ম্মী' রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষাব্রতী' রবীন্দ্রনাথ, 'সঙ্গীত-নায়ক' রবীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বহুবিধ পরিচয় আছে; এগুলির কৃতিত্ব তাঁহার দেশ, সমাজ ও যুগকে উজ্জ্বল করিয়াছে; এগুলির মধ্যে, 'ভারত-রাজদূত' রবীন্দ্রনাথের অবদান ও কৃতিত্ব কিছু কম নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার মধ্যে, তাঁহার কাব্য, গান, গানের সুর, চিত্র, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধাদির মধ্যে, তাঁহার বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের মধ্যে চিরজীবী হইয়া থাকিবেন; কিন্তু জীবৎকালে তাঁহার সাহিত্যময় কৃতিত্বের পার্শ্বে তাঁহার জীবন্ত ব্যক্তিত্ব ভারতকে ও ভারতবাসীকে যে ভাবে বাহিরের জগতে গৌরব ও মর্য্যাদা দিয়া গিয়াছে, ভারত ও ভারতবাসী তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইতে চলিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে আমাদের লাভ-লোকসান-খতানো পাটোয়ারী বুদ্ধি অনুসারে আমরা যেন না দেখি; কিন্তু রবীন্দ্রের অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরবও যে কতটা ম্লান হইল, তাহা মনে করিয়া, এই গুরুতর দুর্ভাগ্যের গুরুত্ব সমগ্র ভারতীয় জাতির দিক্ হইতে কতকটা যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

রবীন্দ্র-মঙ্গল

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আকাশ ও ধরণীর ধূলির ও পর্ব্বতের
যে বুঝেছে গুপ্ত গূঢ় কথা;
সাগর ও তটিনীর মেঘের ও প্রান্তরের
সাথে যার নিরত মিত্রতা;
ফুলের ফোটার ব্যথা কাঁপায় যাহার হিয়া,
উষা-রাগে যে ছড়ায়ে পড়ে;
বরষার মেঘভারে পরাণ আচ্ছন্ন যার,
ধারা সাথে ঝর ঝর ঝরে;
চিলের সুতীক্ষ্ণ সুরে কলাপীর কেকা-রবে
মন যার উঠে গুমরিয়া;
বৈশাখের প্রভঞ্জনে বিদ্যুৎ-বিলাস সাথে
ক্ষিপ্ত আর দীপ্ত যার হিয়া;
দূরগামী পল্লীপথে ছেঁড়া লঘু মেঘ সাথে
যে বা যায় কোথা নাহি জানে;
হিমাদ্রির মহিমায় গহন কান্তার-ছায়ে
যে নির্ব্বাক্ বিমুগ্ধ পরাণে;—
সেই অপরূপ কবি,
সেই বিশ্বরূপ-ছবি,
প্রকৃতির দুলাল সন্তান,
বিশ্বপ্রাণে যার অভিযান,
সেই অভিরাম
আজি মোর লউন প্রণাম।

প্রেম স্নেহ দয়া ক্ষেম মানবের সর্ব্বভাব
যে ভাবিল, ফুটাল অশেষ;
শিশুর সরল হাসি বধূর গোপন ব্যথা,
যে আঁকিল বিরহীর ক্লেশ;
অভিসারিকার ভীতি, নবীনা মাতার প্রেম,
অমর যাহার রেখাপাতে;
অন্যায় কলুষ যত মানব-দলন পাপ
খর্ব্ব হ'ল যার কশাঘাতে;
বুদ্ধের প্রেমের বাণী প্রতাপের শৌর্য্যসুর
যে জানাল নিখিল মানবে;
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা মাঝে মারণ অগ্নির বুকে
শান্তিসুধা যে বিলায় ভবে;
বৈষ্ণবের অনুরাগ, বৈদিক সে সামগান
কণ্ঠে যার ধ্বনিছে উদার;
মানব-তারণ প্রীতি, পরাণ-জাগানো আশা
যে বিলায় নিরত অপার;
সে অদ্ভুত সৌম্য কবি,
সেই সর্ব্বভাব ছবি,
স্বপ্নময়, দীপ্ত রবি,
ধন্য নর যারে লভি'
সেই অভিরাম
আজি মোর লউন প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

এত দিন মাস বর্ষ ধরিয়া কবি যে মোহন বীণানিক্কণ শুনাইয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। বীণাপাণি তাঁহার হস্তে যে বীণাটি তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অপূর্ব স্বরলহরী এখনও গগনে পবনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চিরদিন সে মাধুর্য, সে সৌন্দর্য বাঙ্গালীর সারস্বত প্রাণকে উন্মুখ, মুগ্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীকে তিনি যে সুন্দরের স্বপ্ন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার অলস জড়িমা—বহুদিন পর্যন্ত প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইবে। একদিকে ছিল তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্যানুভূতি, অপর দিকে ছিল অসামান্য প্রকাশভঙ্গী। তাঁহার কবিতাগুলি 'পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি' একটি নিসর্গজাত সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার সঙ্গীতে কোনও অপার্থিব লোকের সুষমা বহন করিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বহু লোকই হয়ত অন্তর্ধান করিয়াছেন। আমরা সে সময়ে ছাত্র, অথবা ছাত্রজীবন অতিক্রম করিয়াছি মাত্র, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমায় গাহিতে বলো না', 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী', 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে' প্রভৃতি গান শুনিয়া সেদিনে আমরা কত আনন্দ পাইতাম, কিরূপ আত্মহারা হইতাম, তাহা এখন কেমন করিয়া বুঝাইব ?

বহুদিন রবীন্দ্রনাথ সভা-সমিতিতে গান করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন সুললিত ছিল যে তাঁহার বক্তৃতাগুলিতেও সঙ্গীতের ঝঙ্কার পাওয়া যাইত। ইয়ুরোপের বিভিন্ন নগরীতে বহু নরনারী তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইত। কোন্ কথা কেমন করিয়া বলিলে ভাল শোনায় তাহা তিনি বুঝিতেন। কাজেই তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছন্দ যতি ও শিল্পচাতুর্য্য



কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের পর তাঁহার বাসভবনে সমবেত জনতা ফটো—[illegible]

থাকিত যে সহজেই তাহা শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে পারিত। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যেমন কবিত্বময়ী ভাষায় মুখে মুখে বক্তৃতা করেন, রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই সেরূপ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার লিখিত বক্তৃতাগুলি ভাবগাম্ভীর্য, ভাষার মাধুর্য এবং প্রকাশশক্তির সূক্ষ্ম বৈদগ্ধিতে এরূপ সরস হইয়া উঠিত যে তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অনায়াসে পরিগণিত হইত।

বৈষ্ণব মহাজনদিগের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছিল সঙ্গীত এবং সঙ্গীত ছিল কবিতা। উভয়ের মধ্য দিয়া ভাব ও সুর পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া বিচিত্র পুষ্পমাল্য রচনা করিত। রবীন্দ্রনাথের গান এত উপভোগ্য হইয়াছে তাহার কারণ ভাবের দরদে প্রত্যেক সুরের প্রতিটি মীড় মূর্চ্ছনা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর কবিতা হইয়াছে গান, তাহার কারণ ছন্দ ও যতির বিন্যাসে এমন একটি যাদুকরীকলা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা সঙ্গীতেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ সুরশিল্পীদের তুলনায় কোন্ স্থানটি অধিকার করেন, সে বিচারে কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি পুরাতন সুরের মধ্যে যে অভিনবত্ব ও মাধুর্য আনিয়া দিয়াছেন তাহার তুলনা কোথায়ও পাই না। এই অভিনবত্ব-সঞ্চারে তাঁহার সাথী হইয়াছিল তাঁহার অনন্যসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতি। সুরের যথাশাস্ত্র আবৃত্তি পাণ্ডিত্যের যতই পরিচয় প্রদান করুক না কেন, মৌলিকতার দাবী তাহার মধ্যে নাই। রবীন্দ্রনাথ সুরের মধ্যে যে নূতন বিলাস আনয়ন করিয়াছেন, যে নূতন কারুকার্য যোজনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গীতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।


১৯৩৪ সালে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র
(রবীন্দ্র মুখার্জ্জির সৌজন্যে)

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুন্দরের যে প্রকাশ দেখিয়াছিলাম, অন্য কোথাও তাহা দেখিতে পাই নাই। তাঁহার দর্শন সুন্দর, গঠন সুন্দর, তাঁহার বচন সুন্দর, রচনা সুন্দর, তাঁহার কণ্ঠ সুন্দর, ভঙ্গী সুন্দর। সুন্দরের তিনি ছিলেন একজন অকৃত্রিম পূজারী। কবিরূপে, নায়করূপে, বক্তারূপে, অভিনেতারূপে তিনি কেবল সুন্দরেরই পূজা করিয়া গিয়াছেন আজীবন। ইহার ফলে বাঙ্গালী সৌন্দর্যের যে অনুভূতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কৃতির ইতিহাস অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কবীন্দ্র শুধু সুন্দর কবিতাই লেখেন নাই, কবিতার রুচি বদলাইয়া দিয়া গিয়াছেন; শুধু উপন্যাস লেখেন নাই, উপন্যাসের ধারা বদলাইয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয়ত সম্ভবপর হইত না।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতায় জগতের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। কিন্তু তাঁহার বাস ছিল না চিন্তার কুহেলিকাময় রাজ্যে, কবিত্বের স্বপ্ন-জগতে। তাঁহার লোকোত্তর প্রকৃতিতে অসীম মননশীলতার সহিত অপ্রমেয় কর্মশক্তির অপূর্ব যোগসাধন হইয়াছিল। তাহারই ফল তাঁহার প্রবর্তিত নানা প্রতিষ্ঠানে দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়িবে বিশ্বভারতীর কথা। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের মানস-সন্তান। এইরূপ একটি বিরাট্ প্রতিষ্ঠান একজনের চেষ্টায় কিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনারও অতীত।

আমার মনে পড়ে ইহার প্রথম অবস্থার কথা। তখন অনেক সময়ে আমি যোড়াসাঁকো যাইতাম (১৯০০) এবং আমি শিক্ষাব্রতী বলিয়াই বোধ হয় কবি আমার সঙ্গে শান্তি-নিকেতনের গঠন-নীতি লইয়া অনেক সময় আলোচনা করিতেন। শিক্ষার যে আদর্শ তাঁহার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেই রূপ দিবার জন্য তিনি তখন চেষ্টা করিতেছিলেন। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা তখনও বোধ হয় কবির চিত্তের সুদূর পরিধির মধ্যেও আসে নাই। কিন্তু তখনই দেখিতাম শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অদম্য

আগ্রহ; বিস্মিত হইতাম তাঁহার ধারণার মৌলিকতা দেখিয়া।

একটি বিষযে তাঁহাব সহিত আমার মতের কিছু অনৈক্য ছিল। সেই কথাটি বলি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালযের সংস্রব-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার বিদ্যায়তন গড়িতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইতে পারি নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল, কাজেই তিনি সেই পন্থাই শ্রেযস্কর ভাবিতেন। আমার ছিল ভিন্নরূপ। কাজেই আমি বলিতাম, 'আপনার শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষ আমি স্বীকার করিলেও আমি মনে করি যে আপনাব বিদ্যায়তনে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে তাহারা যাহাতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায, সে ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত বলিযা মনে হয।'

কবি বলিতেন 'যতদিন আমার এই শিক্ষায়তন উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিতেছে, ততদিন হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ রাখা মন্দ নয়। কিন্তু ঐ সম্বন্ধ রাখিতে গেলেই নানা আইন কানুনের ফাঁস গলায পরিযা আত্মহত্যা করিতে হইবে। সুতরাং আমার অনুসৃত পন্থাই আপাতত ভাল মনে করি।'

তাহাই হইল। কিন্তু কবি অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয যতদিন দেশের উচ্চতর শিক্ষার একমাত্র বাহন, ততদিন বিশ্ববিদ্যালযের দ্বারস্থ হইতেই হইবে। যখনই তিনি তাহা বুঝিলেন, তখনই তিনি তাহা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার স্বীকারের মধ্যেও এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা আজ স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদযের মহত্বের নিকট মস্তক অবনত করি। আমি তখন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক। কবি তাঁহার পুত্র রথীন্দ্র ও শ্রীশবাবুর (মজুমদার) পুত্র সন্তোষকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য আমারই নিকট পাঠাইয়া দিলেন! রথী এবং সন্তোষ কয়েকদিন কৃষ্ণনগর থাকিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলেন।

সেই হইতে শান্তি-নিকেতন শিক্ষালয় ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যায়তনে পরিণত হইতেছে। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ও মনীষী আসিয়া ইহার সারস্বত কুঞ্জের শোভাবর্ধন করিতেছেন। দেশে বিদেশে ইঁহার যশঃসুরভি বিকীর্ণ হইযাছে।

কিন্তু দেশের তরুণদের মানসিক ক্ষুধাই একমাত্র ক্ষুধা নহে। দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার কি উপায় করা যায়? এই চিন্তা হইতে তাঁহার শ্রীনিকেতন জন্মলাভ করিযাছে। যাঁহারা শ্রীনিকেতনের গঠন-প্রকৃতি দেখিয়া আসিযাছেন, তাঁহারা শতমুখে ইহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অর্থনৈতিক সমস্যাব সমাধানে আর কোনও জননায়ক এমন গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই এবং সেই চিন্তাকে সত্যকার মূর্তি দান করিতে এমন কঠোর পরিশ্রমও আর কেহ করেন নাই।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পরিদর্শনে গিয়াছিলাম, তখন দেখি অসুস্থ শরীরেও কবি শ্রীনিকেতনের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। তখন তাঁহার সচিব কালীমোহন ইহজগতে নাই, কাজেই তাঁহার স্কন্ধে দ্বিগুণ পরিশ্রমের দায়িত্ব পড়িয়াছে। কবি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারেরা আমাকে পরিশ্রম করতে নিষেধ করে। কিন্তু পরিশ্রম না করে ত থাকা যায না।'

আমি কবির অবস্থা বুঝিলাম। স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে যে গুরুভার গ্রহণ করিযাছেন, জীবনের শেষ বিন্দু দিয়া তাহার সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার কামনা। আমি বলিলাম, "কাজ না করলে আপনার শরীর টিঁকবে না। আপনি সম্ভবমত পরিশ্রম করলেই ভাল থাকবেন।' জানি না আমার ভুল হইল কি-না। কিন্তু তখন ভাবি নাই যে এত শীঘ্র তিনি আমাদের মধ্য হইতে অবসর লইবেন! ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও তিনি যে পরিশ্রম করিতেন, তাহা একজন সুস্থ সবল যুবকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল।

সকল দিক দিয়া যিনি দেশের সেবায় এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাঁহার বিদায় দিনে দেশবাসী অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিয়া সে ঋণ কথঞ্চিৎ শোধ করিতে চেষ্টা করিবে ইহা স্বাভাবিক।



অস্তোদয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

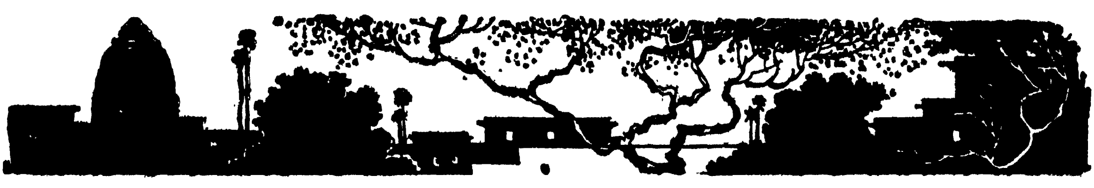
ধরা অনুরাগ রাঙা, বিদায়, বিদায়।
পূর্ব্বপ্রান্তে যুগান্তের রবি অস্ত যায়!
ভাঙি নির্ঝরের স্বপ্ন, আনন্দের কারা,
যে বহালো অফুরন্ত অমৃতের ধারা;
পেয়ে যার কররেখা, সোহাগের ছাপ্—
সব কাঁটা রাঙা করে ফুটিল গোলাপ;
ভাষায় উৎসব এলো—লাবণ্যের বান,
সুরের সোনার তরী বহিল উজান;
হইবে না কালে যার মহিমার ক্ষয়,
সমান গৌরবময় অস্ত ও উদয়;
গর্ব্বিত প্রতীচ্য অর্ঘ্য ঢালে যার পায়,
যুগান্তের সেই রবি আজি অস্ত যায়।

যায় রে দরদী চির-সুখের দুখের,
আত্মীয় সুহৃদ সঙ্গী যুগের যুগের;
যায় মন্ত্রস্রষ্টা ঋষি ভক্ত দার্শনিক
যায় গুরু, শিক্ষাব্রতী, সাধক প্রেমিক।
চিন্তামণি খনি যার বিরাট অন্তর,
বাঙালীরে করে গেল যেই জাতিস্মর।
বাঙালীর দুখ সুখ আপদ বিপদ
করে গেল যেই কবি বিশ্বের সম্পদ।
শ্যাম শ্যামা এক হল, এক ভগবান
বিশ্বরূপ হেরিল যে ব্রাহ্মণ সন্তান
গোটা সৌর পরিবার ভরি গরিমায়
সেই রবি অস্ত যায় অসীম সীমায়।

৩

শোভাময়ী এ ধরিত্রী ছিল যার প্রিয়,
ব্যথিত করিত যারে লীলা দানবীয়,
যে সভ্যতা দেবতার নাগাল না পায়,
সৃষ্টিরে করিয়া খর্ব্ব, ধ্বংসেরে বাড়ায়;
যে সভ্যতা শূন্যগর্ভ দম্ভে উচ্চ শির
আলোকের নামে শুধু জমায় তিমির;
যে সভ্যতা মনুষ্যত্ব রাখে দাবাইয়া
স্বাধীনতা রোধ করে খোঁটা খুঁটি দিয়া;
যে সভ্যতা পঙ্কশয্যা রচে একাজাই
ফুটাতে পঙ্কজ যার চেষ্টা শক্তি নাই;
তাহারে করিতে শান্ত প্রাণ যার চায়
যুগান্তের সেই রবি আজি অস্ত যায়।

নাই সে রবীন্দ্রনাথ—রবির স্মারক
উঠুক দেউল উচ্চ—নব কনারক।
স্থাপুক মর্ম্মরমূর্ত্তি ভুবন উজোর
ফেলুক স্বদেশবাসী সেথা নেত্র লোর।
আমি ভাবি মর্য্যাদক সম্রাটের জাতি
তাঁদেরো কর্ত্তব্য আছে—ঐতিহ্যের খ্যাতি
কবির কি আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ব তাহা জানে
বৃটিশ হউক ধন্য সেই মহাদানে।
দুই মহাজাতি আজ দি'ক হাতে হাত
গ্রহণে ও দানে পুণ্য আমিরী খেলাৎ।
জীবনে যা পান নাই মরণে তা লভি
সাগর তর্পণে তাঁর তৃপ্ত হ'ন কবি।



রবীন্দ্র-প্রয়াণে

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে সমস্ত দেশ আজ বিষাদাচ্ছন্ন। অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রত্যেক বাঙ্গালী আজ প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছেন। আমারও হৃদয় আজ শোকে উদ্বেলিত।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ও ভারতের নবজাগরণের মূর্ত্ত প্রতীক। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার মহিমময় অবদান ঠিক কতখানি



অশীতি বৎসরে রবীন্দ্রনাথ

তাহা নির্ণয় করিবার সময় আজও আসে নাই। সাহিত্যে ও ভাষায়, কর্ম্মে ও চিন্তায় বাঙ্গালীকে যে অমর সম্পদ তিনি দান করিয়া গেলেন তাহার তুলনা নাই। যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বাঙ্গালীর চিত্ত-ক্ষেত্রকে সজীব করিয়া পুষ্পে পল্লবে সমৃদ্ধ করিবে। গল্পে গানে প্রবন্ধে কবিতায় উপন্যাসে নাটকে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উন্মেষ দেখিতে পাই। বঙ্গ জননীর লজ্জানত শিরে তিনি যে বিজয় তিলক পরাইয়া গিয়াছেন চিরদিন তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই—তাঁহার সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া আজ লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে না, কিন্তু তাঁহার সেই কণ্ঠ আজও নীরব হয় নাই। সমগ্র দেশের প্রাণে যে অনুভূতি ও যে প্রেরণা তিনি সঞ্চার করিয়াছেন তাহা চিরগতিশীল ও চিরচলিষ্ণু। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের নির্য্যাতিত জনগণের কণ্ঠে চিরকাল তাঁহারই বাণী ফুটিয়া উঠিবে :

> "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
> সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের পূজারী। বাহিরের সৌন্দর্য্য নিতান্তই বাহিরের বস্তু। ইহা তাঁহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছে কিন্তু চিত্তকে আচ্ছন্ন করে নাই। পৃথিবীর সকল দেশের ছোট বড় সকল কবিই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পূজা করিয়া গিয়াছেন, অকপট স্তুতিতে সৌন্দর্য্যের জয়গান ঘোষণা করিয়াছেন—কিন্তু ভারতের কবি সৌন্দর্য্যের পূজার সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুভূতির চেষ্টা করিয়াছেন। এই আত্মানুভূতির প্রেরণাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সত্য এবং এইখানেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সার্থকতা। ইহাতে আত্মানু-ভূতির যে বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে মাত্র একটি কথায়—রবীন্দ্রনাথ নিজে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বিগত ২৫শে বৈশাখের স্মরণীয় বিবৃতিতে :—"মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে মেনে নেওয়া আমি অপরাধ বলে গণ্য করি।"

আমাদের অভিশপ্ত জাতীয় জীবন তাঁহার অস্তাচল গমনে আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, ভগবানের আশীর্ব্বাদে কবে আবার নূতন উষার অরুণোদয় হইবে!

সেদিন

বনফুল

ভরা দুপুর
কড়া রোদে পুড়ছে চারিদিক,
বসেছিলাম বাতায়নের ধারে।

পিচের রাস্তা হচ্ছে মেরামত,
গলদঘর্ম্ম কুলিরা সব মিলে
গাঁইতি মেরে ফেলছে তুলে পাথরগুলো সব,
প্রকাণ্ড এক লৌহ-কটাহেতে
ফুটছে কালো পিচ।

চলছে জোরে চাবুক
ছুটছে বেগে ছ্যাকড়া গাড়িখানা
মালে এবং মনুষ্যেতে ঠাসা
ছুটছে তবু জোরে।

খঞ্জ ভিখারীটা
ভিক্ষা মেগে ফিরছে দ্বারে দ্বারে
পরে' কাঠের পা।

তালা-বন্ধ ভাঁড়ে
করছে ফেরি দুধ-মেশানো জল
খাঁটি দুধের নামে।

আপিসমুখো কেরাণী এক ছুটছে দ্রুতবেগে
'লেট' হয়েছে তার।
সুদের হিসাব সেরে,
পৈতে-কানে গামছা-কাঁধে খুড়ো
দাঁতন মুখে নিয়ে
ছুটছে ঘাটের পানে
রাখী পূর্ণিমা যে!

তার পিছনে ঠিক
সাইকেল-রিক্‌সাতে
গগল্‌-পরা কালো সাহেব বসে' আছেন খাসা,
বিরাট মোটা দেহ
মুখে চুরুট
কোলে চ্যাপটা ব্যাগ।

বাজিয়ে জোরে ইলেক্‌ট্রিক হর্ন
বেরিয়ে গেল বেগে
দামী মোটরখানা।

খঞ্জ ভিখারীটা
ড্রেণের ধারে নোনা-ধরা দেয়ালটাকে ধরে'
কোনক্রমে রক্ষা পেল অপমৃত্যু থেকে।

পিটিয়ে ঢাক ঢোল
আর একখানা ছ্যাকড়াগাড়ি এল,
পিছনে তার বাঁধা
প্রকাণ্ড এক ছবি-বিজ্ঞাপন,
চুম্বন-উদ্যত
দুটো রঙীন মুখ
সিনেমার যুগ্ম-তারা দু'জন,
ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী দেখছে সব চেয়ে
সারি সারি খুলছে বাতায়ন।

'আইস্‌ক্রীম—চাই আইস্‌ক্রীম'
হাঁকছে দূরে মাড়োয়ারির চাকর।

আধ-ঘোমটা দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে জরা-জীর্ণ গোটা চারেক ছেলে
আসছে কাদম্বিনী,
মান-সম্ভ্রম শিকেয় তুলে রেখে,
ঝি-গিরিতে বাহাল হয়েছে সে;
দিন চলে না আর
স্বামী গেছেন মারা।

হাতকড়ি আর শিকলের ঝনৎকার তুলে
সারি বেঁধে যাচ্ছে কয়েদীরা,

ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে যাচ্ছে সারি বেঁধে
লাল-পাগড়ি পুলিশ।

ছুটছে ঝাঁকা মুটে
ঝুলছে ঝাঁকা থেকে
চর্ম্মহীন মুণ্ডহীন খাসি।
তাড়ির দোকান থেকে
ঈষৎ মত্ত আসছে হরিজন,
কানে-বিঁড়ি হাতে ঝাঁটা নিখুঁত কালো রং
টুকটুকে লাল শালুর কামিজ গায়ে।

দু-চারখানা এঁটো পাতা নিয়ে
করছে কলরব
পাড়ার যত কাক এবং কুকুর।

অনর্গল বেগে
পাশের বাড়ির লুঙ্গি-পরা ছোঁড়া
মারছে রাজা উজির;
বহু রকম চেষ্টা করেও চাকরি মেলে নি তার।

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়াং
ছক ছক ছক ছক
এনজিন্টা আসছে ধীরে ধীরে
সামনে রোলার পিছনেতেও রোলার
আর্ত্তনাদ করছে পাথরগুলো
ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং
দলে' পিষে করছে সমতল
ঢালছে গরম পিচ্
অনিবার্য্য বেগে
এগোচ্ছে এনজিন্।
হঠাৎ এল খবর
মারা গেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রইল এরা সব
মারা গেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!
এদের ফেলে চলে গেলেন কবি?
মনে হল ·········

*   *

চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার
রাত্রি কত নাই তা জানা ঠিক
পূর্ব্বাচলের পানে চেয়ে নীরব প্রতীক্ষায়
বসে আছি বাতায়নের পাশে।

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল

শতাব্দীর সূর্য্য আজি অস্তাচল পারে
ডুবে গেল; বেদনার বিষাদ-আঁধারে
কাঁদিয়া উঠিল বিশ্ব নিরুদ্ধ-রোদনে
মর্ম্মাহত! নিঠুর সে কালের শ্রবণে
পশিল না কোনো কথা—কোনো অনুনয়!
ঘর্ঘরিল রথচক্র—জয়—জয়—জয়
মহাকাল!
মানি নাকো এই জয়ধ্বনি—
যদিও মুখর আজি অম্বর অবনী
মিথ্যা জয় রবে! কালের ভেরীর মাঝে
শুনা যায় এক বাণী নিশিদিন বাজে—
—আমি আছি—আমি আছি!
হৃদয়ে হৃদয়ে
রূপে, রসে, গন্ধে, গানে, ছন্দে, তানে, লয়ে
অনন্ত জ্যোতির কেন্দ্র জাগে অই রবি—
যুগে যুগে নিদ্রাহারা জাগে মহাকবি!

কবি রবি অস্তমিত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

সুদীর্ঘ জীবন ভরি' সম্ভাবিত নানাভাবে
জীবনের নানা দিকে ঢেলে দেছ প্রাণ-রস;
মর্ম্মাহত যেই জাতি দীন একান্ত বিরস
ঘুচায়েছ তাহাদের সব প্রাণের অভাবে।

অন্ধজনে দেছ আলো, মৃতজনে দেছ প্রাণ
আশাহীনে দেছ আশা, ভাষাহীনে দেছ ভাষা
বিশ্বজনে অকুণ্ঠিত দেছ হেসে ভালোবাসা
সাধিয়াছ আমরণ এ বিশ্বের সুকল্যাণ।

গানে গানে ছেয়ে দেছ আকাশ বাতাস ধরা
সুরে সুরে বুনিয়াছ মাধুরীর ইন্দ্রজাল
তোমার প্রতিভালোকে উজল বঙ্গের ভাল
ভাস্বর মহিমা রশ্মি নিখিল ভুবন-ভরা।

কালো মেঘ বঙ্গাকাশ ছেয়ে আসিল আবার
কবি-রবি অস্তমিত—ঝরে পড়ে অশ্রুধার।

মৃত্যুঞ্জয় কবিগুরু

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মৃত্যু কাহার না হয়? যে মানুষ চক্ষুর নিমেষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটাইতে পারে, সেও নিজের মৃত্যুকে রোধ করিতে পারে না। শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণেরও লীলাবসান হইয়াছে—তাঁহাদেরও ভৌতিক দেহের পতন হইয়াছে। আমাদের পুরাণে বলে—স্বয়ং ইন্দ্র ব্রহ্মারও জীবনাবসান আছে। কত চতুরানন মরি মরি যাওত।

অন্যের কাছে মৃত্যুর রূপ রুদ্রভীষণ। মৃত্যুতেই অনেকেরই চির-সমাপ্তি, পূর্ণচ্ছেদ। মৃত্যু তাহাদের ভৌতিক সত্তার সহিত চিন্ময় সত্তারও বিলোপ সাধন করে। হে কবি, তোমার মৃত্যু ত সে মৃত্যু নয়।

তুমি বহুকাল হইতেই মৃত্যুর সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ, তাহার সহিত হাস্যপরিহাসে ও লীলাবিলাসে রসসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলে, দিব্যজ্ঞানের তীক্ষ্ণায়ুধে তুমি তাহার নখদংষ্ট্রা হরণ করিয়াছিলে, তাহার মুখ হইতে ভীষণতার মুখোষ টানিয়া ফেলিয়াছিলে, সে তাহার রুদ্রতা ও বিভীষিকা হারাইয়া তোমার সহিত একযোগে চির-সুন্দরেরই উপাসনা করিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মার শাণযন্ত্রে আরূঢ় আদিত্যের মত মনোমদরূপে সে তোমাকে বার বারই দেখা দিয়াছে। জন্ম-মৃত্যুর গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া তুমি বিশ্ববাসীকে মাভৈঃ বাণী শুনাইয়াছিলে। মৃত্যুর গহনতার মধ্যে গাহন করিয়া তুমি রসের উৎস আবিষ্কার করিয়াছিলে এবং সেই অতীন্দ্রিয় অনির্বচনীয় রসধারা তুমি আকণ্ঠ উপভোগ করিয়া গিয়াছ। মরণ তোমার কৈশোরে 'শ্যাম সমান' হইয়া যৌবনে কপালাভরণকণ্ঠ বিবাহযাত্রী বিলোচনরূপে এবং প্রৌঢ়জীবনে বরেণ্য অতিথির রূপে দেখা দিয়াছে। আজ তোমার সেই বাণী মনে পড়ে—

একে একে চলে যাবে   আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখাতে
তৈলহীন দীপশিখা   নিবিয়া আসিবে ক্রমে
অর্দ্ধ রজনীতে,
উচ্ছ্বসিত সমীরণ   আনিবে সুগন্ধ বহি
অদৃশ্য ফুলের,
অন্ধকার পূর্ণ করি   আসিবে তরঙ্গধ্বনি
অজ্ঞাত কূলের,
ওগো মৃত্যু সেইলগ্নে   নির্জন শয়ন প্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণবধূ   ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিবে তোমার বাহু,   তখন তাহারে তুমি
মন্ত্রপড়ি নিয়ো
রক্তিম অধর তার   নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।



১৯৩৯ সালের নভেম্বরে গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে রবীন্দ্রনাথ ও প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক

ভৌতিক দেহের অনিবার্য্য পরিণামের কথা ভাবিয়া কোন দিন তুমি শোক কর নাই—ভয় করো নাই। তুমি বলিয়াছ—

আমি—ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি—করিব নীরবে তরণ।
সেই—মহাবরষার রাঙা জল
ওগো—মরণ, হে মোর মরণ।

কবি, তুমি মহাবরষার রাঙা জলেই আজ নীরবে নির্ভয়ে অকূলে পাড়ি দিলে। তোমার জন্য মায়ামূঢ় লোকেরাই শোক করিবে। আমরা ভুলিয়া যাই, তুমি মৃত্যুর সঙ্গে মাল্যবদল করিয়াছিলে। তোমার কণ্ঠের চম্পক মাল্য তাহার কণ্ঠে পরাইয়া তাহার কণ্ঠের মহাশঙ্খ হার তুমি নিজ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলে।

মর্ম্মে মর্ম্মে তুমি উপলব্ধি করিয়াছিলে—মৃত্যুতেই তোমার পরিসমাপ্তি নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে তোমার আমন্ত্রণ, লোকে লোকে তোমার বিজয়াভিযান, নব নব উদয়াচলে তোমার পুনরভ্যুদয়। সহস্রশীর্ষ অনন্তদেবের মহামানব রূপ তুমি, মৃত্যু তোমার কাছে যুগান্তের নির্মোকমোচন ছাড়া আর কিছু নয়। মহাপথ তোমার এক জীবন হইতে জীবনান্তরে অভিযাত্রার রহস্যময়ী সরণী মাত্র। ধ্যান-যোগে তুমি এ সত্যের দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছিলে। মৃত্যু তোমার বহিরঙ্গেরই রূপান্তর সাধন করিয়াছে—তাহার বেশি সে কিছু করে না—এ সত্য তুমি জানিতে।

চির-বৈচিত্র্যের অনুরাগী তুমি, অনন্ত জীবনধারার নব নব বৈচিত্র্যের জন্য তুমি মৃত্যুকে বার বারই আমন্ত্রণ করিয়াছ। তুমি তোমার উত্থাপককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছ—

অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে,
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

আমরা মিছে তোমার জন্য শোক করি, কবি। লীলাময়কে তুমিই ত বলিয়াছ—

ডান হাত হতে বাম হাতে লও বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া কি যে কর কেবা জানে।

মৃত্যু তোমার চোখে মহাকালের অজানা অচেনা দূত মাত্র নয়, তুমি তোমার চির-পরিচিত দিশারির সঙ্গে তাহার দাক্ষিণ্যময় দক্ষিণ হস্তে হস্ত রাখিয়া তোমার চির-বাঞ্ছিত 'গৃহহীন গ্রহতারকার পথেই' যাত্রা করিয়াছ। মনে পড়ে তোমার সেই কথা—

হে মৃত্যু করুণাময়, তোমারি হউক জয়
অন্তহীন এ বিশ্বজগৎ,
তুমি চল আগে আগে মোরা যাই পিছে পিছে
নহিলে কে খুঁজে পাবে পথ ?
আমরা খেলায় ভুলে বসি পথ তরুমূলে
উঠে যেতে মন নাহি সরে,
তুমি হেসে কাছে এসে ঢাকিয়া অঞ্চল শেষে
তুলে নিয়ে যাও সাথে ক'রে।

তাই বলি কবি, অন্যের মৃত্যু আর তোমার মৃত্যু এক নয়।

হে কবি, তোমার জরায় পীড়ায় জীর্ণ ভৌতিক অনিত্য দেহ আজ শেষযজ্ঞের আহুতি হইয়া ভস্মীভূত।

তোমার আত্মিক সত্তা চলে গেল অজানা আহ্বানে,
লোকে লোকে নিত্য পথে নব নব উদয়াদ্রি পানে।
তোমার চিন্ময় সত্তা দেহবন্ধ হ'তে মুক্তি লভি',
নিখিলের চিদাকাশে জ্বলে আজ মেঘ মুক্ত রবি।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

আঁধার জীবনে আলোক ছড়ায়ে দিয়ে,
নিরাশ হৃদয়ে শুনালে কতনা গান—
সুপ্ত হৃদয়ে চেতনা জাগায়ে কবি
দিয়ে গেলে তুমি আলোকের-ই সন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ প্রয়াণে

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

ভারতের ভাগ্যাকাশে ওহে তুমি চিরদীপ্ত রবি,
পরাইলে জয়টীকা জননীর মসীলিপ্ত ভালে ;
ছন্দে, গানে, কাহিনীতে এঁকেছ যে ধরণীর ছবি—
মরেও অমর তুমি—মৃত্যু নাই তব কোন কালে।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ফরাসী দেশে একটি নিয়ম আছে, অন্তত কিছুদিন পূর্ব্বে ছিল যে, কোনও বড় কবি অথবা লেখকের মৃত্যু হলে, অপর একজন বড় লেখক তাঁর শব ভূমিগর্ভে নিহিত করবার পূর্ব্বে সমাধিক্ষেত্রে তাঁর বিষয়ে একটি বক্তৃতা করতেন।

সে সব বক্তৃতা চমৎকার এবং তার ভিতর কোনো কোনোটি ফরাসী সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন।

এ সব বক্তৃতায় মৃত ব্যক্তির গুণগান করা হয়। বুদ্ধির খেলাই এ সব বক্তৃতার বিশেষত্ব এবং বক্তারা যে emotion প্রকাশ করেন, সে ব্যক্তিগত emotion নয়।

এ দুই জাতীয় emotion-এর প্রধান প্রভেদ হচ্ছে এই যে, সামাজিক emotion যতটা উদার, ততটা গভীর নয়, আর ব্যক্তিগত emotion যতটা গভীর ততটা উদার নয়।

শোকও একরকম emotion. আমি ইংরেজী শব্দটা ব্যবহার করছি, কেন না ওর বাঙলা পর্য্যায় শব্দ জানিনে।

ব্যক্তিগত শোক ঠিক প্রকাশ করবার বস্তু নয়। কেন না, যিনি চলে যান, তাঁর স্মৃতির অন্তরে কত ছোটখাটো intimate বস্তু থাকে, যা প্রকাশ করতে মানুষের প্রবৃত্তি হয় না। আর সেই রকম intimate ব্যাপারই ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতির প্রধান অবলম্বন। এ শোকের যথার্থ প্রকাশের একমাত্র উপায় হচ্ছে নীরবতা।

অপর পক্ষে সামাজিক শোকই হচ্ছে যথার্থ প্রকাশের বস্তু, আর তা সুন্দর ভাবে ও মর্ম্মস্পর্শী ভাবে তাঁরাই ব্যক্ত করতে পারেন, যাঁদের অন্তরে শোক শ্লোকে পরিণত হয় অর্থাৎ যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে বড় গুণী। আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব, কারণ আমরা লেখক হলেও নগণ্য লেখক।

উপরন্তু ব্যক্তিগত শোকে আমরা যখন অভিভূত, তখন সামাজিক শোক প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়।

আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজীবন যুগপৎ প্রীতি ও ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ, সুতরাং ব্যক্তিগত স্মৃতিই আমার মন জুড়ে আছে।

রামানুজ বলেছেন, আমরা বদ্ধ মুক্ত জীব। এ কথাটি যেমন চমৎকার তেমনি সত্য। মুক্তিতেই আনন্দ ও বন্ধনে ক্লেশ।

লোকোত্তর পুরুষরাই আমাদের মুক্তির পথে অগ্রসর করে দেন্। মহাকবিগণই আমাদের আনন্দলোকের সন্ধান দেন্।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি! তাই তাঁর বাণী আমাদের মনকে আটপৌরে ভাবনা-চিন্তা অতিক্রম করে আনন্দ লোকে তুলে দিয়েছে। তাই তাঁর অভাবে এত লোকের শোকোচ্ছ্বাস।



১৯৩০ সালে বার্লিনে এলবার্ট আইনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

মহাকবির বাণী কিন্তু শুধু সমসাময়িক লোকদের জন্য উচ্চারিত হয়নি। ভবিষ্যতে তাঁর অনেক মহত্ত্ব বহু লোকের হৃদয়ঙ্গম হবে। সে বাণীর বিশেষত্বই এই যে, তা চিরসুন্দর ও চিরসত্য।

যা সুন্দর তাই যে সত্য এ জ্ঞান বাঙ্গালী জাতি এর পরে বহুকাল ধরে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করবে। যা মানব মনের চির-আকাঙ্খার ধন, তা যুগপৎ কাব্য ও দর্শন। তার প্রমাণ আমাদের দেশের উপনিষদ্।

যিনি আমাদের নানারূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করতে প্রয়াস পান, তাঁকেই আমরা মহাপুরুষ বলে গণ্য করি।

আমরা কি রাষ্ট্রে কি সমাজে কি শিক্ষায় অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ, যার ফলে আমাদের মানবজীবন স্ফূর্ত্ত হ'তে

পারছেনা। আমরা একান্ত নির্জীব হয়ে জীবন যাপন করছি।

রবীন্দ্রনাথ স্বজাতিকে এই ক্লেশকর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, সেইজন্য তিনি পেট্রিয়ট, সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাগুরু।

এ সকল বন্ধনই আমাদের মনে ও জীবনে জড়তা আনে। জড়কে চেতন করা অতি দুঃসাধ্য। তাহ'লেও রবীন্দ্রনাথ স্বজাতির প্রতি পরাপ্রীতিবশত চিরজীবন কথায় ও কাজে সর্ব্বপ্রকার জড়তার বিরুদ্ধে বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। তাই তিনি সুধু মহাকবি নন্, মহাপুরুষ।

এ সত্যটি তাঁর অভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছে।

ইংরেজ শাসন ও ইংরেজের শিক্ষায় এ যুগের ভারতবাসীদের অন্তরে নানাপ্রকার নতুন মনোভাব অঙ্কুরিত হয়েছে। তারই ফলে আমরা পেট্রিয়ট হয়েছি, সমাজ সংস্কারক হয়েছি, শিক্ষার মূল্য বুঝতে শিখেছি।

এ সকল নব মনোভাবের অসীম শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—কিন্তু তাই বলে তিনি আমাদের হিন্দু সভ্যতার মহত্ব কখনো বিস্মৃত হননি।

তাঁর পেট্রিয়টিজম্ কিন্তু ইংরেজের শাসনযন্ত্র মেরামত্ করবার পেট্রিয়টিজ্‌ম্ নয়। অধীনতা থেকে মুক্ত করার পেট্রিয়টিজ্‌ম্, যার ভিতর প্রাণ আছে, বীর্য্য আছে।

যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করবার প্রাণপণ চেষ্টা তিনি করেছেন, সে শিক্ষা হিন্দুজাতির সনাতন শিক্ষার অনুরূপ। তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় সমাজসংস্কারক এবং তাঁর কাব্য বাল্মীকি কালিদাসের কাব্যের সগোত্র। তাঁর ধর্ম্ম উপনিষদের এক ধর্ম্ম।

এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতবর্ষের নূতন ও পুরাতনের সম্পূর্ণ মিল ঘটেছিল। নূতনের মোহে তিনি পুরাতনকে প্রত্যাখ্যান করেননি, আর পুরাতনের মায়ায় তিনি নূতনকেও প্রত্যাখ্যান করেননি। এই জন্য তিনি হিন্দুসভ্যতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ প্রতীক্।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি হাজার হাজার কথায় সম্যক্ পরিচয় দিতে পারব না, যা তিনি নৈবেদ্য-র একটি কবিতায় দিয়েছেন।

"একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কি আনন্দ বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে—শোনো বিশ্বজন
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

আর বার এ ভারতে কি দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা?
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয় জাল,
এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্ম্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।
সমস্ত তিমির
ভেদ করি দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধ শির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে।
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে—
"ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত,
মোরা অমৃতের পুত্র, তোমাদের মত।"

—নৈবেদ্য, সংখ্যা ৬০, ৬২

উক্ত কবিতার প্রথম ভাগ একটি বৈদিকমন্ত্রের অনুবাদ, আর দ্বিতীয় ভাগ উক্ত মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা।

ঋষিদের চরমবাণী ভারতবর্ষের মহাকবি ও মহাপুরুষেরা যুগে যুগে উচ্চারণ করেন।

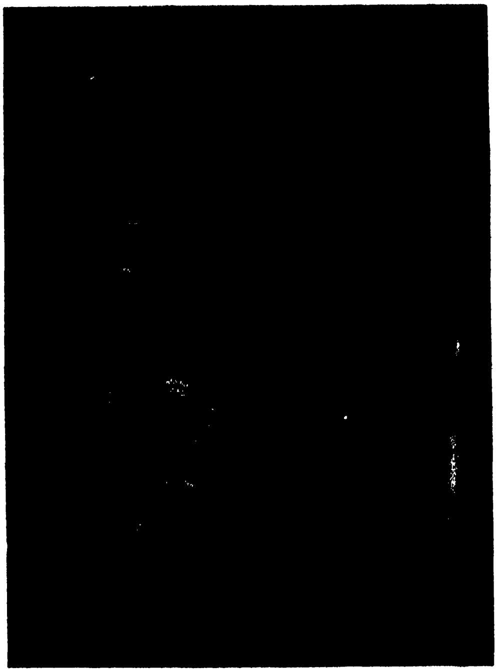
শ্রাদ্ধবাসরে

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আজ রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসর। এমন দিনে অশৌচ দূর হয় এবং মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিদান করিয়া আমরা শোকে সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকি। এদিনে জীবিত ও মৃতের মধ্যে আর এক ধরণের আত্মীয়তা স্থাপন হয়—সে আত্মীয়তা আত্মার। আজ শোকমুক্ত শান্ত প্রসন্ন মনে ঋষিদের সেই মহামন্ত্র আবৃত্তি করিবার কথা—যাহাতে আকাশ, বায়ু, জল, তরুলতা, ধরণী ও সিন্ধু—সৃষ্টির সব কিছুকে মধুমান বলা হইয়াছে। এদিনে মৃত্যুকে অস্বীকার করিয়া আমরা মৃত আত্মীয়ের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অমৃতমূর্ত্তির তর্পণ করিয়া থাকি। দেহের পরিবর্ত্তে আত্মার আত্মীয়তা নিবেদনের এই বিধি—ইহারই নাম শ্রদ্ধা-কর্ম্ম, ইহাই শ্রাদ্ধ, ইহার মধ্যে হিন্দুর অধ্যাত্ম সাধনার একটা মূল তত্ত্ব নিহিত আছে।

আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। হিন্দুর শ্রাদ্ধতত্ত্ব আজিকার এই উপলক্ষের যেন একটা তত্ত্ব মাত্র নয়, তাহা জীবন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনই যেন এই তত্ত্বের একটা সাকার ভাষ্য। সে জীবন আমাদের এই মর্ত্ত্যের অশ্রুসায়রে অমৃতপরাগভরা আলোক শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহার বর্ণ, মধু ও সৌরভ যে জীবনকে আশ্রয় করিয়াছিল, আজ সেই জীবনের ব্যক্তিত্ব-বন্ধন টুটিয়াছে—কিন্তু তাহার সেই বিরাট বিশাল ভাব-বিগ্রহ বাক্-ব্রহ্মের অক্ষয়-বেদিকায় চিরদীপ্যমান হইয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে আজ আমাদিগকে আর কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে না—যে বাণীমন্ত্রে তিনি জীবন ও মৃত্যুকে একই অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের হৃদয়-গোচর করিয়া গিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলেই—শুধু কোন সাময়িক অনুষ্ঠানবিশেষে নয়—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অবকাশে আমরা তাহার সেই সঞ্জীবনী রসধারায় নিত্য নিরাময় হইতে পারিব।

তথাপি আজিকার এই অতি পবিত্র দিনে—এক জ্যোতির্ম্ময় দেহ ত্যাগ করিয়া আর এক জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করার পরে, আমরা সেই অমর কবির অমর আত্মাকে নূতন করিয়া আমাদের প্রাণের প্রণতি জানাইতেছি। আজ দেশ-কালের ব্যবধান লোপ পাইয়াছে—যেটুক দূরত্ব ছিল তাহাও আর নাই, তাই আজ তাঁহার আত্মার সেই ভাবময় সত্তাকেই আমাদের অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত আমাদের নিবিড়তর যোগ উপলব্ধি করিব। জাতির চিত্তে—তাহার গূঢ়তর অনুভূতির মূলে—তিনি যে অভিনব



সার ব্রজেন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ ও সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

সংস্কৃতি ও সাধনার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই চিন্তা করিয়া আজ তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের চিরকৃতজ্ঞতা নিবেদন করিব।

রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী—এই জীবনকেই পূজা করিবার বাণী। তিনি সারা জীবন ধরিয়া অপূর্ব্ব সুরে, গাঢ় গভীর আকুতিময় কণ্ঠে, ইহাই গাহিয়াছেন যে—জীবনের মত আশীর্ব্বাদ আর নাই; মনুষ্য হৃদয়ের মত,

নরনারীর দেহাধিষ্ঠিত প্রাণ-পুরুষের মত, শিব ও সুন্দর-সাধনার এমন সেতু আর নাই। কবি বলিয়াছেন—এই নরজন্মে, নরদেহ ধারণ করিয়াই—যিনি অনন্ত ও অসীম, যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, সেই—

"অপরূপকে দেখে গেলেম দুইটি নয়ন মেলে"

শুধুই দেখা বা জানা নয়—

"পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা !"

তাই, এই যে নরজন্ম, ইহার মত সৌভাগ্য আর নাই। একথা আমাদের দেশে নূতন নয় বটে; ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা জাতির নানা মানুষ মিলিয়া যে যুগযুগব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সাধনার ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে মানবীয় চেতনার কোন উপলব্ধিই বাদ পড়ে নাই। আমাদের এই বাংলাদেশেরই বাঙ্গালী জাতির রক্তে, সেই সাধনার ধারায় যে আর এক বীজমন্ত্র অঙ্কুরিত বিকশিত হইয়াছিল, ইহা সেই বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার দেহতত্ত্বেরই অনুরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকেও এক নূতনতর ব্যাপকতর সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—আরও সহজ করিয়া তাহাকে আলো ও বায়ুর মত আমাদের প্রাণের পথ্য করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার সাধনার এই পরম অনুভূতির চারিপাশে কোন গুহ্য-তান্ত্রিক গণ্ডি নাই; তিনি মানুষের জীবনের সর্ব্বস্তরে, তাহার তুচ্ছতম অভিজ্ঞতার মধ্যে সেই 'মহতো মহীয়ানে'র অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন :—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
—পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে॥

এ বাণী এমনভাবে ভারতবর্ষে আর কেহ তাঁহার পূর্ব্বে কখনও ঘোষণা করে নাই।

এই যে দৃষ্টি—এই যে বিশিষ্ট সাধনার প্রত্যয়-লব্ধ সর্ব্ব-শুচি, সর্ব্ব-সুন্দর ও সর্ব্ব-মঙ্গল-বোধের আশ্বাস, ইহাই রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনায় এমন ভাবে ওতপ্রোত হইয়া আছে যে, তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ভাব-জীবনকে ভিন্নমুখে প্রবাহিত করিয়াছে। জীবনের অনন্ত ঐশ্বর্য্য আজ আমাদের চক্ষে যেমন করিয়া ধরা দিয়াছে এমন আর কখনও দেয় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে ত্যাগ ও ভোগ, আনন্দ ও বিষাদের কত লগ্নভ্রষ্ট হইতেছে মনে করিয়া আমরা সচকিত হইয়া উঠি; পথে একদিনের জন্য যে-পথিকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তাহাকে স্মরণ করিয়া হয়তো ভাবি, কোন্ ছদ্মবেশী দেবতা আমাকে ছলনা করিয়া গিয়াছে—তাহাকে ভাল করিয়া অভিবাদন করি নাই। অতি-পরিচয়ের অবজ্ঞার বশে যে-পরিজনবর্গের দিকে ফিরিয়াও চাহি না—সহসা জানিতে ইচ্ছা হয়, মানবতার কোন্ নিগূঢ় মাধুরী, মানবচরিত্রের কোন্ বিশেষ রূপ তাহার জীবনে মহিমান্বিত করিয়াছে। যাহাদের নিত্যসেবা গ্রহণ করিতেছি, তাহাদের সেই সেবার মধ্যে কি ত্যাগ, কি তপশ্চর্য্যা আছে—কি শক্তি ও সহিষ্ণুতা—স্নেহের ক্ষমা ও প্রেমের আত্মোৎসর্গ তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সে চেতনা, সে বোধশক্তি আমাদের অন্তরে সংক্রামিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই আজ আমরা বুঝি যে, আকাশের চাঁদ পাইলাম না বলিয়া যে দুঃখ, তাহা অপেক্ষা বড় ও সত্যকার দুঃখ আছে। সে দুঃখ এই যে, পৃথিবীর এই ধূলিধূসর অঙ্গনে, এই অতি-সাধারণ জীবনযাত্রার পথেই আমরা প্রাণের কত অমূল্য সম্পদ করতলে পাইয়াও ফেলিয়া দিতেছি, কত অনর্ঘ দান আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে! এমনই কত ভাব, কত চিন্তা আজ আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়াছে—মানুষের মহত্ত্বের কত রূপ, জীবনের তুচ্ছতার মধ্যেই কত ঐশ্বর্য্য আজ আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকটে আমাদের সহস্র ঋণের মধ্যে এই একটি ঋণ আজ আমি বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতি ও জীবন-পূজার সেই সকল বাণীর দুই-একটি উদ্ধৃত করিয়া আজিকার শ্রদ্ধাতর্পণ শেষ করিলাম :

একদিন এই দেখা হ'য়ে যাবে শেষ
পড়িবে নয়ন 'পরে অন্তিম নিমেষ।
সে কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
আমি আজ চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

যা পাইনি তাও থাক, যা পেয়েছি তা'ও
তুচ্ছ ব'লে যা চাইনি তাই মোরে দাও।"

"আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলান এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধূলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ন-নীরে।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি,
আঘাত খেয়ে বাঁচি কিম্বা আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে
নূতন প্রেমে ভালবাসি আবার ধরণীরে॥"

"এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন-চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন, যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছো এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে।

কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে, দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছো প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চ'লে
দেবতার পদ-চিহ্ন রেখে গেছো মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম।
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম॥"

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একটি বৈশিষ্ট্য

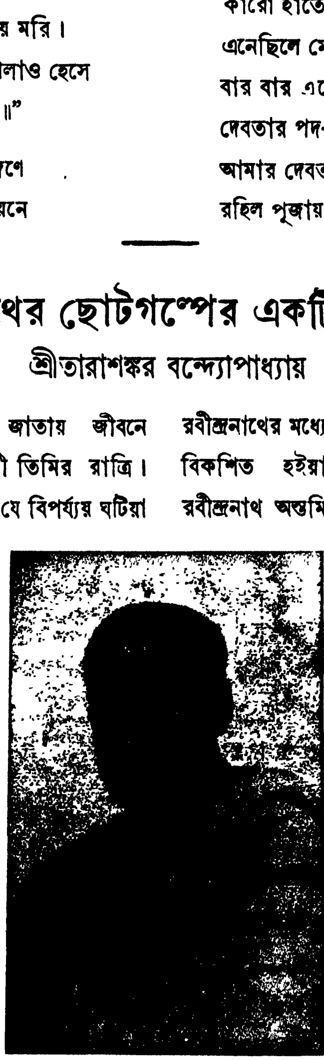
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—বাঙলার জাতীয় জীবনে নামিয়া আসিয়াছিল এক গভীর দুর্য্যোগময়ী তিমির রাত্রি। প্রচণ্ড দুর্য্যোগ এবং গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল—বাঙালী তখন তাহা দেখিতে পায় নাই, বুঝিতে পারে নাই, দুর্য্যোগ-ক্লিষ্ট নিদ্রাতুর বাঙালীর মন অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই শতাব্দী-রাত্রির যখন অবসান হইল, তখন—

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে।"

সর্ব্বনাশ তখন হইয়া গেছে।

নব প্রভাতে নবীন উদ্যমে বাঙালী তপস্যা আরম্ভ করিল। জাতীয় সাধনার তপস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন সেই সাধনার খণ্ড খণ্ড সিদ্ধির প্রকাশ। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড সিদ্ধি এক অখণ্ড সিদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে; রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই এই শতাব্দীর সাধনা পূর্ণতম জ্যোতিতে বিকশিত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই রবীন্দ্রনাথ অস্তমিত হইলেন। আমাদের জাতীয় জীবনের সম্মুখে রাত্রি সমাগত। সে রাত্রি শুক্লা অথবা কৃষ্ণা—তাহা এখনও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সে বিচারের পূর্ব্বে যে আলোকের দেবতা অস্তমিত হইলেন তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে।



পিতার মৃত্যুর পর মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-প্রতিভা লোকোত্তর, অলোক-সামান্য; সার্থকনামা রবীন্দ্রনাথ শতাব্দীর সূর্য্য। বিগত বহুশতাব্দীর মধ্যে আমাদের জীবনে যে শতাব্দীর সূর্য্যসমূহের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি, নিঃসন্দেহে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কল্যাণময় মহাদ্যুতি আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দিকে গিরিশিখর হইতে গহন অরণ্যতল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। কোথাও করিয়াছে কাঞ্চনজঙ্ঘার সৃষ্টি—কোথাও হইয়াছে নূতন

বীজ উপ্ত ভাবী মহাক্রমের জন্ম। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিল্প, জাতিগঠন—এমন কোন বিভাগ আজ বাঙালীর জীবনে নাই—যে বিভাগ রবীন্দ্র-প্রভাবে প্রভাবান্বিত নয়, সে প্রতিভায় সমৃদ্ধ নয়। আমি বাঙালা সাহিত্যের একজন সেবক—গল্প-উপন্যাস লইয়াই আমার কারবার, আমার সাধনক্ষেত্র হইতে এই শতাব্দীর সূর্য্যের এক ভগ্নাংশের যে পরিচয় সেই পরিচয় সম্বল করিয়াই প্রণাম জানাইব। বিশেষ করিয়া ছোটগল্পের কথাই বলিব।

বাংলা সাহিত্যে কাব্য রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেও ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে বাঙালীর কাব্যবৃক্ষ মরণোন্মুখ হইয়াছিল, মহাকবি মাইকেল সে বৃক্ষকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির উত্তাপ এবং বর্ণসম্ভার তাহাতে সঞ্চারিত হইয়া সে বৃক্ষে নবশাখাপল্লবে উদ্গত হইয়াছে, ধরিত্রীর বৃক্ষে স্বর্গের পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সুধাস্বাদী অমৃত ফলে সে বৃক্ষ আজ ফলবান।

উপন্যাস আমাদের দেশে ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র সে বৃক্ষের বীজ, তিনিই এ বৃক্ষের কাণ্ড, রবীন্দ্রনাথ তাহার মূল শাখা। কিন্তু ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথই বীজ, তিনিই কাণ্ড, তিনিই তাহার মূল শাখা—পরবর্ত্তীগণ সে বৃক্ষের পল্লব, পুষ্প এবং ফল। আমাদের দেশে রূপকথা ছিল, জাতকের উপাখ্যান ছিল, পঞ্চতন্ত্রের গল্প ছিল, কিন্তু বাংলা সাহিত্য আজ যে ছোটগল্পের সম্ভারে সমৃদ্ধ, যে সমৃদ্ধি পৃথিবীর যে-কোন দেশের ছোটগল্পের সমৃদ্ধির পাশে কুণ্ঠাহীন গৌরবে স্থান পাইবে—সে ছোটগল্প আমাদের সাহিত্যে ছিল না। রবীন্দ্রনাথই তাহার স্রষ্টা এবং তিনিই তাহাকে পরিপূর্ণ গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট। কোন দেশের কোন ছোটগল্প লেখকের গল্পের মধ্যে সে বৈশিষ্ট্য নাই। সেই বৈশিষ্ট্যকে অনেকে বলেন—কাব্যধর্ম্মী। অবশ্য কবি-দৃষ্টি, সিদ্ধ কবি-দৃষ্টি ভিন্ন এই ধারার সৃষ্টি অসম্ভব; কিন্তু "কাব্যধর্ম্মী" বিশেষণটি যদি ছোটগল্পের গৌরবকে খর্ব্ব করিবার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তবে তাহা একান্ত মিথ্যা এবং স্থূল মনের বিচারসম্ভূত বিশেষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষত্ব—কাব্যে যাহা সীমার সহিত অসীমের যোগ—ছোটগল্পে তাহাই ব্যক্তির সহিত বিশ্বের যোগ সাধন করিয়াছে। আমরা যাহা কল্পনা করিতে পারি না বিশ্বমানব এবং জীবের দুঃখের সমষ্টিভূত যে দুঃখের সুর সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া অহরহ ধ্বনিত হইতেছে যাহা আমরা শুনিতে পাই না অথচ যাহা অতি বাস্তব—এক ঐক্যতান, প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি দুঃখের সহিত যাহার সংযোগ এবং সঙ্গতি রহিয়াছে, তাহারই অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, এ বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর গল্পসাহিত্যে একান্তভাবে দুর্লভ। গল্পের রস বা রূপকে ইহা ক্ষুণ্ণ করে নাই, সমৃদ্ধ করিয়াছে, এ রসোপলব্ধির আনন্দ আমাদের চৈতন্যলোকে সূক্ষ্মতর চেতনার সঞ্চার করে। রসোপলব্ধির আনন্দের মধ্য দিয়া পাঠকের ব্যক্তিগত চিত্তের সহিত মুহূর্ত্তের জন্য নিখিলধরার চিত্তলোকের সংযোগ স্থাপিত হয়।

ছোটগল্পের কলা-কৌশলের দিক দিয়া অনেকে এই সংযোগের সুর ধ্বনিত হওয়ায় রসহানি এবং ব্যাকরণদুষ্টির অভিযোগ করিয়া থাকেন। এই হিসাবেই কাব্যধর্ম্মী গীতিধর্ম্মী বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অথচ রসোপলব্ধির দিক দিয়া এ সুর অপূর্ব্ব—ইহাও অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করেন। সুতরাং ইহা ব্যাকরণদুষ্টির অপরাধে বৈয়াকরণিকের অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই প্রসঙ্গে এযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক এবং কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলালের কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব।

> —"গল্পগুচ্ছের মত সাহিত্য সৃষ্টির কথা মনে করিলে অবাক হইতে হয়, রবীন্দ্র-প্রতিভার যাদুশক্তির এতবড় নিদর্শন আর নাই।... গল্পগুচ্ছের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে—বাহিরের জীবন ও জগতের রসরূপের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কবির যে অন্তঃ মুক্তি ঘটে—সেই মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন।"

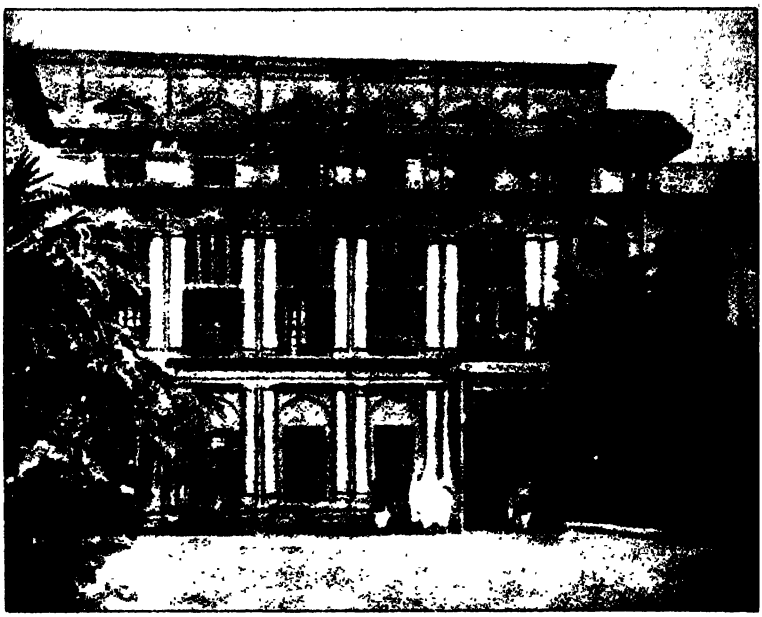
রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে বিশেষ করিয়া গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মধ্যে বাস্তবের গূঢ়তর এবং মহত্তর রূপ চিরন্তন রসরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি যখন এই গল্পগুলি লিখিতেছেন, তখনকার একখানি চিঠিতে আছে—

> "সন্ধ্যাবেলায় যখন ছোট জেলেডিঙ্গি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখনকার সন্ধ্যার নিস্তরঙ্গ পদ্মার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন অন্ধকার অন্তঃপুরের মত মনে হ'ত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক—সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা—ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।"

এই মানসিক অবস্থায় যখন তিনি অসীমকে সীমার মধ্যে ধরিয়াছেন,তথনই '‘পোস্ট মাস্টার’ গল্পের দুঃখিনী মেয়েটির ছোট হৃদয়ের দুঃখকে পৃথিবীর দুঃখের ঐক্যতানের সহিত সংযোগ করা লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। ‘কাবুলীওয়ালা’ গল্পের পাষাণ কারায় বন্দী এক পাঠান পিতার দুঃখের সহিত নিখিল জগতের সকল বিরহী পিতার দুঃখ এক করিয়া দিবার অনুভূতি তথনই অনুভব করা সম্ভবপর হইয়াছে। ‘অতিথি’ গল্পের তারাপদ যে ঘরের স্নেহ মমতা—ভাবী ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে দেখিল—

> সম্মুখে আজ যেন জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে নৌকা চলিয়াছে।"



জোড়াসাঁকোস্থ কবিগুরুর পৈতৃক বাসভবন—তিনি এই গৃহেই জন্মলাভ করিয়া এই গৃহেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন

অসীম বিশ্বপ্রকৃতি চলমান—সেই চলমান প্রকৃতির আহ্বানে চলার প্রেরণা—মানসিক এই স্তরোন্নতি ভিন্ন লাভ করা যায় না, অনুভবও করা যায় না। কিন্তু ইহা তো মিথ্যা নয়, ইহাই বাস্তবের গূঢ়তর এবং মহত্তর রসরূপ।

‘শুভা’ গল্পে—

> "রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখোমুখী বসিয়া থাকিত।...প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি হইলেও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট শুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার।"

‘নিশীথে’ গল্পটির মধ্যেও এই সুর ধ্বনিত হইতেছে! অনেকে এই গল্পটির মধ্যে অতি-প্রাকৃতের শিহরণ অনুভব করিয়াও নায়কের মনোবিকৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেই বড় প্রধানতম করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে কবিচিত্ত ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মনোবিকৃতির উর্দ্ধস্তরের মন—যে-মন পৃথিবীর সকল লালসা এবং কামনাকে জয় করিয়া—কলুষমুক্ত পৃথিবীর সৃষ্টি করিতে চায়—সেই মন। সে মন অপরাধের স্পর্শ সহিবে কেন? তাই সে তাহার অপরাধকে বিশ্বব্যাপ্ত হইতে দেখিতেছে, ইন্দ্রিয়গোচর অপরাধকে অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রকাশমান দেখিতেছে। এইভাবেই সকল সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ব্যক্তি হইতে বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের সংযোগসাধন সুদুর্লভ বলিয়া অবাস্তব নয়, সুতরাং ছোটগল্পে ইহার প্রকাশ ছোটগল্পের মহিমাকে খর্ব্ব তো করে নাই—সুদুর্লভ মহিমাই দান করিয়াছে। ইউরোপের ছোটগল্প এইখানেই ভারতীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং বিশ্বের দরবারে যখন বাংলা ছোটগল্পের বিচার হইবে—তখন এই গুণই বিশ্বকে বাংলা ছোটগল্পের প্রতি আকৃষ্ট করিবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ইহা একটি বিশিষ্ট ধারা হইলেও অতি-প্রাকৃত, খাঁটি সুখ দুঃখের বাস্তব কাহিনীর মধ্যে আরও কয়েকটি ধারা আছে। সমস্ত লইয়া আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। আজ সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহার মহা-প্রয়াণের সময়ে ব্যথিত হৃদয়ের প্রণতি জানাইয়া ধন্য হইলাম।

মর্ত্ত্য হইতে বিদায়

লীলাময় রায়

শান্তি যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তা রবীন্দ্রনাথের। কারণ তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে নিরবচ্ছিন্ন শ্রমে। যে বয়সে লোকে অবসর ভোগ করে, সে বয়সেও তাঁর একদিনও বিরাম ছিল না। লেখনী তুলে রাখলে তুলি তুলে নিতেন, তুলি যদি থামল, গানের আসর কিম্বা নাচের আয়োজন তাঁকে ব্যাপৃত রাখল। গত বছর এমন সময়েও তিনি সাহিত্যের ক্লাস করেছেন। কোনো দিন দিবানিদ্রাকে প্রশ্রয় দেননি, সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত সমানে কাজ করেছেন। রোগশয্যাকেও তিনি কর্ম্মক্ষেত্র করতে পেলে ছাড়তেন না। ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" তো রোগশয্যার কীর্ত্তি। এমন অক্লান্ত ও একাগ্র তপশ্চর্য্যা সব দেশেই সব যুগেই বিরল। আমাকে বলেছিলেন, "আমিও কি লিখতে চাই হে! সম্পাদকরা জোর করে লিখিয়ে নেয়।" এই বলে ছবি আঁকতে বসলেন। আসলে তাঁর স্বভাবটা ছিল শ্রমিকের। অবসর তিনিও চাননি, তাঁকেও কেউ দেয়নি। কোথায় চীন, কোথায় আর্জেণ্টাইনা—কারো মেয়ের বিয়ে, কারো ছেলের নামকরণ—ডাক রবি ঠাকুরকে। রবি ঠাকুরও "না" বলবার পাত্র নন। গত বছর চীনদেশের মন্ত্রী এসে বলে গেলেন, "আপনার জন্যে পুষ্পক বিমান পাঠাব। আপনি যাবেন তো?" ইনিও রাজি হলেন। চীন দেশের কথায় মনে পড়ল কয়েক বছর আগে আমাকে বলছিলেন, "একটা লোভনীয় নিমন্ত্রণ এসেছে হে। চীন দেশ থেকে। কিন্তু কী করে যাই? যুদ্ধ বাধবে শুনছি।" চীন দেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। অন্য কোনো দেশকেই তিনি এত ভালোবাসেননি, ভারতকে বাদ দিলে। চীনা অধ্যাপক যখন প্রস্তাব করলেন গত বছর, "গুরুদেব, খাবার তৈরি করে পাঠাব?" গুরুদেব খুশি হয়ে বললেন, "নিশ্চয়।" কী জানি কী সে খাদ্য! পাঁচশো বছরের পুরানো ডিম না পাখার বাসা!

স্বর্গ যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তা রবীন্দ্রনাথের। কারণ সমস্ত জীবন কেউ এমন সুন্দর ভাবে কাটায়নি। অসুন্দর কাজ, অসুন্দর কথা, অসুন্দর চিন্তাকে তিনি অশুচি জ্ঞান করতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের অভিজাত, ইংরেজীতে যাকে বলে nobleman, তাঁর নোবিলিটি শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকা পর্য্যন্ত। তিনি যখন রাগতেন তখন দারুণ রাগতেন, কিন্তু ভুলেও অশোভন উক্তি করতেন না। মুখের উপরে লেখনীর উপরে তাঁর কঠোর শাসন ছিল। জীবনের



১৯৩১ সালে অকস্‌ফোর্ডে সার মাইকেল স্যাডলার ও রবীন্দ্রনাথ

কোনো অবস্থাতেই তিনি আপনাকে খেলো হতে দেননি। অথচ তিনি বেশ সহজ মানুষ ছিলেন, হাস্য পরিহাসে তাঁর দোসর ছিল না। গান্ধীকে একটি মেয়ে কেমন জব্দ করেছিল সে গল্প তাঁর কাছে দু'বার শুনেছি। অবশ্য

বলতে সাহস হয়নি যে জব্দ হয়েছিল সেই মেয়েটিই—গান্ধী নন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তবে তাঁর নিজের কাজ নিয়ে এতটা তন্ময় থাকতেন যে, সামাজিক মানুষের স্নেহের দাবী মেটাতে সময় পেতেন না। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করলে তবেই তাঁর স্নেহ-পরায়ণতার পরিচয় ধীরে ধীরে প্রকট হতো। তাঁর স্নেহপরায়ণতার অন্যায় সুযোগ নিয়েছেন অনেক প্রিয়পাত্র

রবীন্দ্রনাথ যা সমস্ত জীবন ধরে অর্জ্জন করেছেন এখন তিনি তা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করুন। উপভোগ করুন শান্তি, উপভোগ করুন স্বর্গ। মুক্ত আত্মারা, দেবতারা তাঁকে নিজেদের মধ্যে লাভ করলেন। আমরা মানুষেরা তাঁকে হারিয়েছি বটে, কিন্তু যে পথ দিয়ে তিনি সেখানে গেছেন সেখানকার সেই পথ তো পড়ে রয়েছে। পুনর্দর্শন কি কোনো দিন হবে না যে শোকে মুহ্যমান হব ?



কবিগুরুর শবের শোভাযাত্রা　　ফটো—ডি-রতন

প্রমাণ না পেলে তিনি কাউকে সন্দেহ করতেন না, মানুষের উপরে তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। জীবনে তিনি বহু বঞ্চনা সয়েছেন, অপবাদ তো তাঁর চির-সঙ্গী ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাননি, সেই বিশ্বাস তাঁকে শেষ দিন পর্য্যন্ত তিক্ততা হতে রক্ষা করেছিল। তাঁর কর্ম্মজীবন ছিল যেমন অবসাদহীন, তাঁর মনোজীবন ছিল তেমনি তিক্ততাহীন। সেইজন্যে শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর কায়িক ও মানসিক সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

"দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হলো শেষ
　　বুকে লও তারে।
শান্তি অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
　　অগ্নি উৎস ধারে।
সীমন্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক বিন্দুর
　　তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত সঙ্গীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
　　তরঙ্গের তালে॥"

রবীন্দ্র প্রয়াণে

কবিকঙ্কন শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভোরের বিহঙ্গ-গীতি আর কি শুনিবে কেহ শুচিস্নিগ্ধ পুষ্পবীথি তলে,
ভারতের অমারাত্রি পোহাবে কি ? চিত্ত চিতা নিভিবে কি ভারত শ্মশানে !
ফিরে এস কবিবর, সৌভাগ্যের দিনমণি তুমি কেন গেলে অস্তাচলে ?
আশার কুসুমে নাহি জীবন-স্পন্দন নব আজিকার দিবা অবসানে ।
স্বর্ণযুগ ভস্মীভূত অশীতি বর্ষের পরে জানিনাক কার অভিশাপে !
অরণ্যের অন্তরালে বহিতেছে দীর্ঘশ্বাস আশাহত তরু কিশলয়ে,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা সংসারের পারাবারে ছুটে আসে করুণ বিলাপে,
সময়ের মহাস্রোতে সোনার তরণীখানি ডুবে গেল ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ।

ভূলুণ্ঠিত বনস্পতি, দুর্য্যোগ ঘনায়ে আসে, মধুরিমা নাহি চিত্তপটে,
বজ্রের শিখাটী জাগে মৃত্যুর গর্জ্জনধ্বনি শোনা যায় অদৃষ্ট-গগনে ।
দিনান্তের চিতাভস্মে শ্রাবণের অশ্রুধারা উদ্বেলিত শ্যামশষ্প তটে,
শতাব্দীর গৌরবের গেল রবি অস্তধামে, সন্ধ্যা নামে বিসন্ন লগনে ।
তিমির মন্দিরতলে প্রাণের বিগ্রহ কাঁদে—কে নৈবেদ্য দিবেগো তাহারে !
দুর্ভাগ্যের পথপ্রান্তে বসে আছে বসুন্ধরা, দেবালয়ে দীপ নাহি জ্বালে ।
বিরহের বালুচরে শোকতপ্ত অনাথিনী আর্ত্তনাদ করে হাহাকারে,
জীবন জাহ্নবীকূলে পথহারা মায়ামৃগ চেয়ে আছে দিকচক্র বালে ।

সৃষ্টির প্রথম প্রাতে সাবিত্রীর সাথে তুমি দিলে দেখা নভোরেণু হ'তে,
নব নব পূর্ব্বাচলে যুগ হ'তে যুগান্তরে পরিক্রমা করি' অভিনব—
কালের ললাটে কবি, স্বস্তিকার চিহ্ন দিলে গীতি কাব্য রচি' বিশ্বপথে,
মৃত্যুরে করেছ শব, বক্ষে তার জ্বালায়েছ তপস্যার যজ্ঞকুণ্ড তব ।
এই যন্ত্র-সভ্যতার স্বার্থোদ্ধত স্বেচ্ছাচারে অবিশ্রান্ত ক্ষুব্ধ তব মন
দেখায়েছে রুদ্রতেজ প্রকম্পিত করি' বিশ্ব শঠতার সমাজ-সংসার ;
আরণ্যক সভ্যতার উদ্বোধন করে গেছ পল্লীপ্রান্তে রচি' তপোবন,
পুরাতন বেদীতলে নূতনের মাঙ্গলিকে দিয়ে গেছ বীণার ঝঙ্কার ।

গ্রহে গ্রহে ঐক্যতানে অন্তরের গীতি তব মুখরিত ছন্দের হিল্লোলে
তোমার স্বাক্ষর নিয়া প্রাণের অক্ষরে কত বিরচিত বিশ্ব-ইতিহাস ।
তোমার দাক্ষিণ্য লভি ঋতুদের রঙ্গমঞ্চে বর্ষ-দোলে পুষ্পের হিন্দোলে,
বিবর্ণ বিশীর্ণ পত্রে প্রাণের স্পন্দন দিতে আপনারে করেছ প্রকাশ ।
এ জাতির জীবনের অশ্রুতটে এসেছিলে মহর্ষির পুণ্য তপস্যায়
এ ভারতের ভাগ্যাকাশে উদয় শিখরে আর ফিরিবে কি নব পুষ্পরাগে ?
চলে গেলে কোথা তুমি কোন্ পূর্ব্বাচল পথে রচিবারে নূতন অধ্যায়
কোন জীব জগতের গ্রন্থমাঝে, উদয়ন কোথা তব জাগে !

দেশের শ্মশানে আজি দুর্য্যোগের অন্ধকারে শত শত জ্বলে খদ্যোতিকা,
জ্যোতিষ্ক হারায়ে গেছে, অভাগিনী দেশমাতা বেলাভূমে হের ধূম্রশিখা ।

রবীন্দ্র-তিরোধানে

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বাংলার আকাশে বাতাসে এখনো যাঁর অনীতিতম আবির্ভাবের আনন্দ অভিনন্দন ছড়াচ্ছে, সমস্ত কাগজে কাগজে যাঁর সঙ্গীত যাঁর কাব্য যাঁর অপূর্ব্ব সাহিত্যসৃষ্টির রস আস্বাদন নূতন ক'রে চল্‌ছে ; পাশাপাশি তার সঙ্গে এ কি সংবাদ ভেসে উঠ্‌লো ? তারই সঙ্গে বেজে উঠ্‌লো তাঁর তিরোভাবের নিদারুণ বিষাণ ? বাংলার ভাগ্যে বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস ?

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নাই ? বাঙালীর রবি অস্তাচলে ? বাঙালীর তবে আর কি রহিল ?

সমস্ত ভারত কাঁদ্‌ছে, সমস্ত সভ্য জগৎ বেদনা জানাচ্ছে—কিন্তু বাংলার এ কান্নার কি মাপ আছে—শেষ আছে ? "পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত তাহার ঘরের দ্বারে !" এ মৃত্যু তো অহরহই জগতের "পরাণের ধন" হরণ করছে, কিন্তু আজ যে ধন সে হরণ কর্‌লে এ যে সমস্ত জগতের, সমস্ত দেশের ; সকলের গর্ব্বের ধন, অন্তরের ধন। আজ যে দেশ-মাতা সেই এক পুত্র অভাবে দীনা, ভিখারিণী ! তাহার যে আর কিছুই ছিল না—ছিল কেবল এক রবীন্দ্রনাথ ! এই এক ধনেতেই সে যে জগতের শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিল।

জগতের হাহাকার—দেশের হাহাকার—তার পরে ক্রমে জাগ্রত হয়ে ওঠে মানুষের মধ্যে তার নিজের অন্তরের বেদনা। মনে আস্‌ছে আজ নিজের প্রথম তরুণ জীবনের কথা—যখন সাহিত্য রস ভিন্ন অন্তরের আর কোন অবলম্বন ছিল না ! সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের শত সূর্য্য কিরণের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে ভারতীতে সাধনায় নিত্য নবভাবে নবছন্দে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছিল। দাদা (শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট) কিছুদিন তখন কলিকাতায় এম-এ পড়ার জন্য ছিলেন। সদ্যরচিত রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা গান গল্প আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্য-গৃহে পাঠাইতেন—আর আমরা দূর পশ্চিম মফঃস্বলে সেগুলি পেয়ে কি আনন্দ উত্তেজনায় না অস্থির হ'যে উঠ্‌তাম ! এই ভাবেই আমরা "হাজার হাজার বছর গিয়েছে কেহ তো কহেনি কথা" এই কবিতাটি পেয়ে পরে কাগজে দেখি।

আমরা রবীন্দ্রিয় যুগে জন্মেছি, এই রবির আলোতেই আমাদের মনের বনের যা কিছু ফুল ফুটেছে ! কীর্ত্তনে যেমন "কানু ছাড়া গীত নাই", আমাদের যুগে তেমনি রবীন্দ্রনাথের ছাড়া গীত ছিল না, তাঁর প্রভাবমুক্ত কবিতা ছিল না, ভাব ছিল না, ভাষা ছিল না ! ছন্দের, সুরের আদি কবি ছোট্ট তীরের মত অন্তর-বেঁধা ছোট গল্পের সৃষ্টিকর্ত্তা।



১৯৪০ এর ফেব্রুয়ারীতে রবীন্দ্রনাথ শ্যামলী হইতে উত্তরায়ণে যাইতেছেন। বার্দ্ধক্যের জন্য চলিতে অসমর্থ বলিয়া এই ব্যবস্থা

রবীন্দ্রনাথই তখন একমাত্র সাহিত্য ধুরন্ধর ! বাংলার সেই সঙ্গীত আজ লুপ্ত ? সেই অফুরন্ত ধারাও ফুরালো ? জানি যতদিন বাংলা সাহিত্য বেঁচে থাকবে ততদিন তাঁর আলো

নিভ্‌বে না—ফুরাবে না ফুরাবে না! তিনি '১৪০০ শাল' শীর্ষক কবিতায় লিখে গেছেন—

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

১৪০০ শাল আর কতদিন? অর্দ্ধ শতাব্দী বই তো নয়! কত শতাব্দী ধরে তাঁর রচনা কি কৌতূহলভরেই না জগৎবাসী পড়বে? আর ভাববে, এমন কবিও একদিন জন্মেছিল যে মানুষের অন্তরের সকল অনুভবের শেষ সীমা ছাড়িয়ে লোকের কথাও এমন করে গেয়ে গেছে গো—কতকাল আগে—এমন ভাষায়—এমন সুরে!"

হে দেশকালাতীত কবিগুরু! তুমি এই মৃত্যুকেও আমাদের চক্ষে কত কাল হ'তে কি সুন্দর কি লোভনীয় করেই না এঁকে গেছ!

'মরণ রে
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান
তুঁহু মম শ্যাম সমান॥"

তিনি আজ ঝুলনের দিন "পরাণের সাথে ঝুলন খেলা" খেলিতে খেলিতে সেই 'লেহ'-এর আস্বাদন করিতেছেন, তাই মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্ব্বেও বলে গিয়েছেন—

"মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।"

কিন্তু তাঁর দেশের অবস্থা যে তাঁর আরও একটি 'মরণ' নামে কবিতার শেষে প্রকটিত—যাতে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের মিলনকে 'হরগৌরী' বিবাহ-চিত্রে তুলিত করে গেয়েছেন—

"অতি চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণের মিলনে কবির প্রশ্ন—

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ।
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি' বাঁধা হবে না।
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ র'বে না।
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ।
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

* *

শুনি', শ্মশানবাসীর কল কল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলবরণ।
তাঁর পুলকিত তনু জর জর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
কিন্তু তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি' কর,
খ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

তাঁর দেশ-মাতা আজ যে তার সর্ব্বনাশে 'শিরে কর হানিছে।'

জীবনে তাঁর চাক্ষুষ দর্শন মাত্র একদিন, বাক্যালাপে পরিচয় মাত্র এক দিন—এ বিষয়ে ভাগ্য বড়ই কৃপণ!'—কিন্তু আত্মার দর্শন যে তাঁর সঙ্গে বহুদিন বহুকাল হ'তে! সে দর্শন সে পরিচয় তাঁর অসংখ্য কাব্য কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ হ'তে, তাঁর নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য—তাঁর অসংখ্য সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা হ'তে। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা (যাঁর ডাক নাম বেলারাণী)-র সঙ্গে অনুরূপার কন্যার বিবাহের সময় একবার দেখা হয়েছিল। তিনি লেখার বিষয়ে আমাকে স্নেহ প্রকাশ করে কিছু বেশী বলায় উত্তর দিই যে, "যাঁর আলোয় যাঁর কথায় আজ সমস্ত বাংলা কথা কইতে শিখ্‌লো—তাঁর মেয়ে আপনি, কি বলছেন?" তাতে প্রীতির হাসির সঙ্গে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "বেশী পরিচয়ের নৈকট্যে বুঝি কিছু দোষ ঘটে! তাই সমস্ত বাংলা শিখলো কিন্তু আমরা শিখ্‌লাম না, প্রদীপের নীচেই যেমন অন্ধকার আর কি!" জীবনে একবার মাত্র শান্তি-নিকেতনে গিয়ে তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন ও প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল! কি সৌম্য স্নিগ্ধ হাস্যে আমাদের সম্ভাষণ করলেন! আতিথ্যের সংবাদ সহ শান্তিনিকেতন—তার কলাভবন, তার গ্রন্থাগার কেমন লাগলো—প্রশ্ন করলেন!

জীবনে এই মাত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, কিন্তু তাই কি জগতের বেশী বড় জিনিষ ?—

আর পেয়েছিলাম তাঁর দুই-তিনখানি স্বহস্তে লেখা পত্র। 'দিদি' প্রভৃতি উপহারপ্রাপ্তির পর দুইখানি, আর তাঁহাকে উৎসর্গিত "আমার ডায়েরী" বইখানা পেয়ে স্নেহ প্রকাশের সঙ্গে লিখেছিলেন, "তোমার এই বইখানা আমার গানের আর কবিতার সুরেই গেঁথেছ দেখে, আর আমাকেই এই বই দিয়েছ—এতে আরও সুখী হ'লাম। হরেনের দিদিতে যেন লেখিকারই কল্যাণ-মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে।" মনে পড়ে তাঁর প্রথম 'জ য় ন্তী' র কথা (বোধ হয় পঞ্চাশত্তম জন্মদিনের অভিনন্দনে) তাতে প্রবাসীর বুকে 'জনৈকা বঙ্গ মহিলা' নাম দিয়ে নিজের অন্তরের অভিনন্দন ব্যক্ত করার বৃথা চেষ্টা পেয়েছিলাম—

যেদিন বঙ্গের ভালে উদেছিলে নবীন তপন
বিস্মিত মোহিত ধরা মেলি শত তৃষিত লোচন
চেয়েছিল তব মুখে, শুচি রুচি সুবর্ণ আলোক
প্লাবিয়া অম্বরতল ছেয়েছিল ভূলোক দ্যুলোক !
সচকিত জাগরিত শত প্রাণ পাখী সে আভায়
'একি ছন্দ' 'একি ভাষা' 'একি ভাব' সবে মিলি গায় !
জড়েতে চেতনা জাগে, মূক পাদপের অঙ্গ টুটে
শতবর্ণ গন্ধময় ভাবরাশি ফুল হ'য়ে ফুটে !"

আর আজ ?—এ আঁধার কি বাংলার আর কাটবে ?—কি সান্ত্বনা সে নেবে ? কেবল যা কিছু সান্ত্বনা তাঁরই অন্তরের বাণী তাঁর রচনার সমুদ্রে ডুব দেওয়ার মধ্যেই রইলো। সেইখানেই তাঁর বিরাট রূপ অমর হয়ে যুগ যুগ ধরে বর্ত্তমান থাকবে। যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা তেমনি তাঁরই বাণী স্মরণ ও কীর্ত্তন করেই তাঁর পূজা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ! তিনি যে মৃত্যুকে

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা !
সারা জীবন তোমায় মাগি প্রতিদিন যে আছি জাগি
তোমার তরে বহে' বেড়াই দুঃখ সুখের ব্যথা।"

বলে কতবার কত না ছন্দে আদর করে জীবনের প্রার্থনীয়



শেষ-শয্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ　　ফটো—কাঞ্চন মুখার্জ্জি

সুন্দরতম মূর্ত্তিতে এঁকেছেন সেই মরণের কোলে আজ তিনি

"রাজার বেশে গেলেন হেসে মৃত্যুপারের সে উৎসবে"।

নিজের মৃত্যুর পরে উপাসনার ভাষাও আমাদের জন্য তিনি দিয়ে গেছেন। তাঁর ইচ্ছামত আজ জোড়হাতে আমরাও বলি—

"সম্মুখে শান্তি-পারাবার
　　ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী
লও লও হে ক্রোড় পাতি',
　　অসীমের পথে জ্বলিবে
　　　　জ্যোতির ধ্রুবতারকা !
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
　　হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রায়।"

তিনিই আমাদের শুনিয়ে গেছেন

তাঁহাতে রয়েছে রবি শশী ভানু
কভু না হারায় অণু পরমাণু !"

বাংলা তাঁরই কোলে তার সর্ব্বস্বকে সমর্পণ করে এই সান্ত্বনা নিয়ে এই গানই আজ গাইতে থাক্—চোখের জলে ভিজে ভিজে।

রবি-হারা

শ্রীমানকুমারী বসু

অতি ধীরে ধীরে !
বঙ্গের গৌরব রবি, সায়াহ্নে রক্তিম ছবি,
ডুবিল জন্মের মত কালসিন্ধু নীরে !
সার্থক জনমভূমি, যথা জনমিলে তুমি,
দেশের গৌরব তুমি জাতির গৌরব,
গুণে সারা বিশ্ব ভরা, রূপে ধরা আলো করা,
আজি নাকি সেই দেহ হয়ে গেছে শব !
দেশের হিমাদ্রি চূড়া, আজি হয়ে গেল গুঁড়া
চূর্ণ হল বাঙ্গালীর গর্ব্ব অহঙ্কার,
বঙ্গের আকাশে ভাই, রবি নাই রবি নাই,
ঘিরিয়া ফেলেছে তাই অনন্ত আঁধার !
কোহিনূর দীনামার, পূর্ণমূর্ত্তি প্রতিভার,
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্র অবতার,
পরশ মাণিক তুমি, তোমার চরণ চুমি,
কত লোহা সোনা হয়ে উজলে ভাণ্ডার।
বসুধা মা বুক ফাটি, অনল উগরে খাঁটি,
ঝরিয়া পড়িল ফুল তপ্ত সমীরণে,
আগুন জাহ্নবী জল, অগ্নিময় ভূমণ্ডল,
অলক্ষ্যে পড়েছে বাজ বন উপবনে !

ছাড়িল পূর্ণিমা তিথি, বিহগ থামিল গীতি,
বহিল আগুন মাখা আকুল বাতাস,
আমাদের দিয়া ফাঁকি, তখনি মুদিলা আঁখি,
কবি রাজরাজেশ্বর একি সর্ব্বনাশ !
তাই তো মা বীণাপাণি, ফেলে দিলা বীণাখানি,
তাই তো অনাথারূপা মা বিশ্বভারতী,
আজি যে হয়েছে তারা, আমাদের রবি-হারা,
আমাদের সাথে গেছে তাদেরো শকতি !
আজ মোরা বড় দীন, আজি মোরা রবিহীন,
আজি মোরা জগতের হতভাগ্য প্রাণী,
এ যে কি যে হাহাকার, ভাষায় আসে না আর,
এ দারুণ ব্যথা আর লিখিতে না জানি ;
তুমি তো অমর বেশে, চলি গেলে দেবদেশে,
আমাদের দিয়ে গেলে এ যে শোক ব্যথা,
তবুও তোমার নামে, বেঁচে রব ধরাধামে,
জাগিবে ধরণী ভরি তব অমরতা ;
যতদিন রবি, শশী, রবে এ জগতে,
তুমিও অমর রবে এ মর মরতে।

আমি কাঁদব না

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

পাগলরা কাঁদছে আর বলছে, রবি ডুবে গেছে।

ওরা জানে না—তাই কাঁদছে ; আমি জানি—তাই কাঁদিনি, আমি কাঁদব না।

দেবতাদের এই লীলাভূমি ভারতবর্ষে যখনই হয়েছে ধর্ম্মের গ্লানি তখনই লীলা-কিশোর স্বয়ং নেমে এসেছেন বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণরূপে, আর যখনই এই ধর্ম্মের বাহন সাহিত্যের হয়েছে পতন—তখনও তাঁকে আসতে হয়েছে বাল্মীকি, ব্যাসদেব, কালিদাস ও ভানুসিংহরূপে।

যিনি অব্যয়, যিনি অক্ষয়, যিনি অমর, তাঁর আবার মৃত্যু কি !

ভানুসিংহের মৃত্যু হয় নি। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকবে ততদিন তাঁর মৃত্যু হতে পারে না।

পাগলরা জানে না—তাই কাঁদচে ; আমি জানি—তাই কাঁদিনি, আমি কাঁদব না।

স্তব্ধ বীণা

এস-ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেন্টাব), বার-এট্-ল

স্তব্ধ সেই বীণা যার উদার ঝঙ্কার,
উদ্‌ঘাটিত করেছিল সুন্দরের দ্বার !
স্বর্গলোকে আজ মহা আনন্দের ধ্বনি ;
দেব শিশু গায় সবে মধু আগমনী !
হে কবি, ধন্য তব অতুলন জীবন সাধনা,
মাতৃভূমি সত্যই ধন্য পেয়ে তোমার প্রেরণা !
পৌরহিত্যে তব, সত্য শ্রেয় সুন্দরের সাধনা,
দেশবাসী তব, চিরকাল করিতে যেন পারে,
দেব সভায় সগৌরবে সমাসীন তুমি,
বীণা থেকে আশীর্ব্বাদ তব, সদা যেন ঝরে !

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

কবিগুরুর মৃত্যুর মতো এত বড় দুর্ঘটনা বর্তমান শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আর ঘটেনি। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ নেই, কিন্তু কবির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের হৃদ্‌স্পন্দন যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। সমগ্র ভারতবর্ষ বেদনায় অসাড় ও আড়ষ্ট। আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি, আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই।

ভারতের বিভিন্ন জাতি আর বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গম-তীর্থ ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য। তিনিই ছিলেন ভারতের মানস-মূর্তি, এদেশের আত্মিক শক্তির সংহত রূপ। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা তাঁর মধ্যে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানজাত লৌকিক সভ্যতা নত হয়ে তাঁর কাছে এসে আত্মবিশ্লেষণ খুঁজে ফিরেছিল। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন বিরাট পুরুষের আবির্ভাব বড় বিরল। দৈবাৎ তিনি বাঙ্গালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই বিশেষ সৌভাগ্য লাভ ক'রে বাঙ্গালী জাতি চিরদিনের জন্ম কৃতার্থ হয়ে রইল।

কাব্যলোকে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন, সঙ্গীতে তাঁর দান অপরিমেয়। তাঁর চিন্তা ও কল্পনার বৈচিত্র্য প্রশান্ত মহাসাগরের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গের মতো অশ্রান্ত; তাঁর সাহিত্যাকাশের বিশাল শূন্যপটে কোটি কোটি নক্ষত্র-বিন্দুর মতো তাঁর সৃষ্টিগুলি দীপ্যমান। কালের কল্পে কল্পে, সৃজনের পর্বে পর্বে মানবলোকের এমন মুখপাত্রের আবির্ভাব ঘটে কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রাণগঙ্গাধারায় অবগাহন ক'রে কোটি কোটি মানুষ নিজদিগকে ধন্য মনে করেছে। তিনি গাঙ্গেয় ভারতের মূর্ত বিগ্রহ।



শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য — ফটো—তারক দাস

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের পুরুষানুক্রমিক আশা ও আশ্রয়স্থল। এই বৃদ্ধ বনস্পতির অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ভারতের সকল রাষ্ট্রনায়ক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষানায়ক, জনসেবক, রাজনীতিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, দার্শনিক, পণ্ডিত, শাস্ত্রকার, ধর্মালোচক—সকলেই নিজ নিজ বাসা বেঁধেছিল। তাঁর অলৌকিক প্রতিভার দিব্য

প্রেরণায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্মনীতি জ্যোতির্ময়তা লাভ করেছিল। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও কাব্যের মানসলোকে অপরাজেয় প্রভুত্বের আসনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর আবির্ভাবকালে বাঙ্গলা ভাষা পরিণত ছিল না, নবজন্মলব্ধ ভাষার তখন কাকলী চলছে। সমাজপতিগণের সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসনে শিশু বাঙ্গলা তখন মূঢ়ের মতো হতচকিত। ব্রাহ্মণ্যনীতি আর সমাজশাস্ত্রসংস্কার সেকালের বঙ্গভাষার আত্মবিকাশের পথকে যখন চতুর্দিক থেকে কণ্টকাকীর্ণ ক'রে রেখেছে, সেইকালে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়। শঙ্খে ফুৎকার দিয়ে ভগীরথ ভাবগঙ্গাকে পিছনে পিছনে এনেছিলেন শাপগ্রস্ত অনড় ভাষাকে সগৌরবে মুক্তি দেবার জন্য। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের জীবন আধুনিক সাহিত্যেরই সর্বাঙ্গীন আত্মবিকাশের ইতিহাস। পুরাতন বাঙ্গলা ভাষার বিবর্তনের সহায়তা তিনি পাননি, তাঁর প্রতিভা আপন ভাষাকে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল। তাঁরই ভাষায় একালের প্রত্যেকটি কবি, সাহিত্যিক ও লেখক ভূমিষ্ঠ।

ভারতের বাঙ্ময়তা স্তব্ধ, তার বাণীমূর্তি আজ তিরোহিত। বাইরে থেকে যারা এর পরে ভারত প্রদক্ষিণ করতে আসবে, তারা দুর্ভাগ্য, দেখবে মহাজটের মন্দির পঞ্চভূতে গেছে মিলিয়ে; গৌরীশৃঙ্গ হারিয়ে ভারত কেবল সামান্য ভূ-সীমানার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ। তারা সহস্র প্রশ্ন করবে, কিন্তু ফিরে তাকাবে যখন, দেখতে পাবে, ভারতের কণ্ঠ চিরকালের মতো নীরব। আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, এমন বিরাটকে হারালুম। পক্ষান্তরে, আমরা অতিশয় গর্বিত, এমন মহামানবের জীবনকালে আমরা প্রাণধারণ করেছিলুম। বহু যুগ পরের অনাগত যারা পাঠক ও পাঠিকা, তারা রাত্রির প্রদীপের আলোয় রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ ক'রে কবিগুরুকে স্বপ্ন দেখবে, প্রণাম জানাবে, হয়ত বা পূজাও করবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থাকবেন তাদের কাছে কেবল একটা আইডিয়া, একটা নাম, একটা রূপক—সেই রূপককে ঘিরে থাকবে একটি পৌরাণিক তপোবনী পরিবেশের অবাস্তব ছায়া। আমরা সেদিন থাকবো না, আধিভৌতিকতায় হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবো, কিন্তু যাবার আগে আমাদের অসার্থক ও অকিঞ্চন জীবনের প্রতি তাকিয়ে এই সকরুণ দুর্লভ-সান্ত্বনাটুকু রেখে যাবো, আমরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছি, তাঁর কাছে গল্প শুনেছি, তাঁর পরিহাস-সরস ও কৌতুকভরা কণ্ঠস্বর উপভোগ করেছি; তাঁর তিরস্কার ও পুরস্কার, তাঁর স্নেহ ও শাসন, তাঁর আশা ও আনন্দদান দুই হাত পেতে নিয়েছি; তাঁর দুই চরণকমল স্পর্শ করেছি দুই হাতে। অনাগত কালের নরনারীরা আমাদের এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হবে, সেই গর্ব নিয়ে আমরা চ'লে যাবো।

পূর্ণিমায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু; জীবনের ষোলকলা সম্পূর্ণ ক'রে। আধুনিক সাহিত্যের শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে গেল, এবার তাঁর বিরহের আকাশ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে মৃত্যুর মতো শান্ত। আমাদের জীবন, প্রাণ ও হৃদয় আজ সর্বস্বান্তের বেদনায় সেই অসীম রিক্ততার দিকে কাতর চক্ষু মেলে রয়েছে। সূর্যাস্তের পর অন্ধকারে পথের রেখা হারিয়ে গেছে।

স্মরণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শুনি বিজ্ঞানীর মুখে, কোটিকল্প আগে
যে নক্ষত্র নিভে গেছে তার বিকিরণ
রেখে যায় মহাশূন্যে ইথরকম্পন,
লুপ্ত তারকার দীপ্তি তাই চক্ষে জাগে।
এই ইথরের ঢেউ বিচিত্রিত রাগে
স্থূল চক্ষে উদ্বোধিত করে দরশন,
অসম্পূর্ণ ঊর্মিমালা গাঁথে এ নয়ন,
আর যা রহিল বাকি চক্ষে নাহি লাগে।
প্রাণের সবিত্র লোকে নিভে গেছে রবি
ভঙ্গুর মৃন্ময় কোষে, চিন্ময় ইথর
স্পন্দমান র'বে নিত্য বিশ্বমর্ম মাঝে,
আবির্ময় কেন্দ্র তার তুমি বিশ্বকবি,
স্মৃতিকম্প্র মানবের অন্তরে অমর।
তোমার বীণার রব স্তব্ধ হ'বে না যে!

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গতকল্য অকস্মাৎ যে নিদারুণ সংবাদ ঘোষিত হলো, তা শুনেই সর্ব্বপ্রথম ৺অতুলপ্রসাদ সেনের সেই বিখ্যাত গানটির সুবিখ্যাত প্রথম চরণ আর্ত্তভাবেই মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌লো ;—"ভারত ভানু কোথা লুকালে ?"

কিন্তু সেই সঙ্গে তার দ্বিতীয় চরণটি ত কই মনে করতে পারলাম না। "পুনঃ উদিবে কবে প্রাচীর ভালে ?" না, এতবড় অসঙ্গত আব্দার করবার সাহস অন্তত আমার মনের মধ্যে নেই! এই যে জীবনের সুবর্ণ দীপটি সুদীর্ঘ কাল ধরে —বাঙ্গালীর অন্ধকারময় ঘরে ঘরে তার সমুজ্জ্বল দীপ্তি দিয়ে, তাদের সমুদয় দীনতার মধ্যেও আলো দেখিয়ে এসেছিল, যে সূর্য্য তাদের মাথার উপর ভাস্কর হয়ে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে থেকে, তাদের শুধু নিজের দেশেই নয়, পৃথিবীর সকল প্রদেশেরই সম্মানিত করেছিল। পৃথিবীতে এত বড় বড় ধনী মানী সুসমৃদ্ধ জাতি থাকতেও ভগবান যে তেমন একটা চির-অসাধারণ জীবন, এই দুঃখ দারিদ্র্য অত্যাচার অনাচার অধ্যুষিত বাংলা মায়েরই জীর্ণ বুকে তুলে দিয়েছিলেন, এ কি সহজ পাওয়া ? এ কি একবার হারালে আর পাওয়া যায় ? রবীন্দ্রনাথের চিত্রিত সেই যে ক্ষ্যাপা, যা'কে লক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন, "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর" চিরদিনরাত্রি খুঁজে খুঁজেও সে তার সেই হারান-রতন আজও ত খুঁজে পায়নি! আমাদের সারা বাংলাও তেম্‌নি ক্ষ্যাপা হয়ে, খুঁজে বেড়ালেও আর কখন সে জিনিষ ফিরিয়ে পাবে না।



রবীন্দ্রনাথের শব-শোভাযাত্রা দর্শনের আগ্রহাতিশয্যে মালগাড়ীর উপর আরোহণ ফটো—তারক দাস

রবীন্দ্রনাথ এ জগতে এসেছিলেন—কি অদ্ভুত আশ্চর্য্য জীবন নিয়েই যে এসেছিলেন, তার হিসাব করতে গেলে, যত বড় হিসাবীই হোন, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকতে বাধ্য হবেনই। একজন রক্তমাংসওয়ালা নশ্বর মানুষের মধ্যে, এত রকমের বিভিন্ন প্রকারের অসাধারণ শক্তি যে কেমন করেই

একত্রিত হতে পারে, এ যেন একটা অদ্ভুত প্রহেলিকা! যিনি কবি, তিনি কবিই। কবি হিসাবে ব্যাস বাল্মিকীর সঙ্গে লোকে তার তুলনা দিয়ে থাকে। কালিদাসের সঙ্গে কাব্যে নাট্যেও তুলনীয় করে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে ;—এর সঙ্গে অজস্র ঝর্ণা ধারার মত, অবিরল ধারে ঝরে পড়া, সংখ্যাতীত সঙ্গীতাবলী ; তাই কি যেমন তেমন সে সব গান? যার মত দু একটী মাত্র লিখেই অতীতে ও বর্ত্তমানে লোকে কবির বিজয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করেছে, তেমন গানের পর গান, গানের পর গান রবীন্দ্র সাহিত্যে যে শরৎপ্রাতে আপ্‌নি ঝরা সিউলি ফুলের রাশির মতই বিছিয়ে পড়ে আছে। জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম্ম সঙ্গীত, অন্যান্য সকল বিষয়েরই সর্ব্ব প্রয়োজন সাধনার, শিক্ষিত অশিক্ষিত যে কোন লোকেরই, যে কোন মনোভাব প্রকাশের উপযোগী—রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এতটুকু কি কোথাও অভাব আছে? আজ বাঙ্গালীর একটী গানে, একটী কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে বর্জ্জন কর্ব্বার সাধ্য কি কাহারও আছে? কি ভাবে কি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী সাহিত্য নূতন সৃষ্টি করতে একান্তরূপেই অসমর্থ!

একদিন একদল ধৃষ্ট তরুণ, নিজেদের এই অক্ষমতা লক্ষ্য করেই হয়ত, সখেদে বলেছিল—"পথ ছাড়ো রবীন্দ্র-ঠাকুর!"

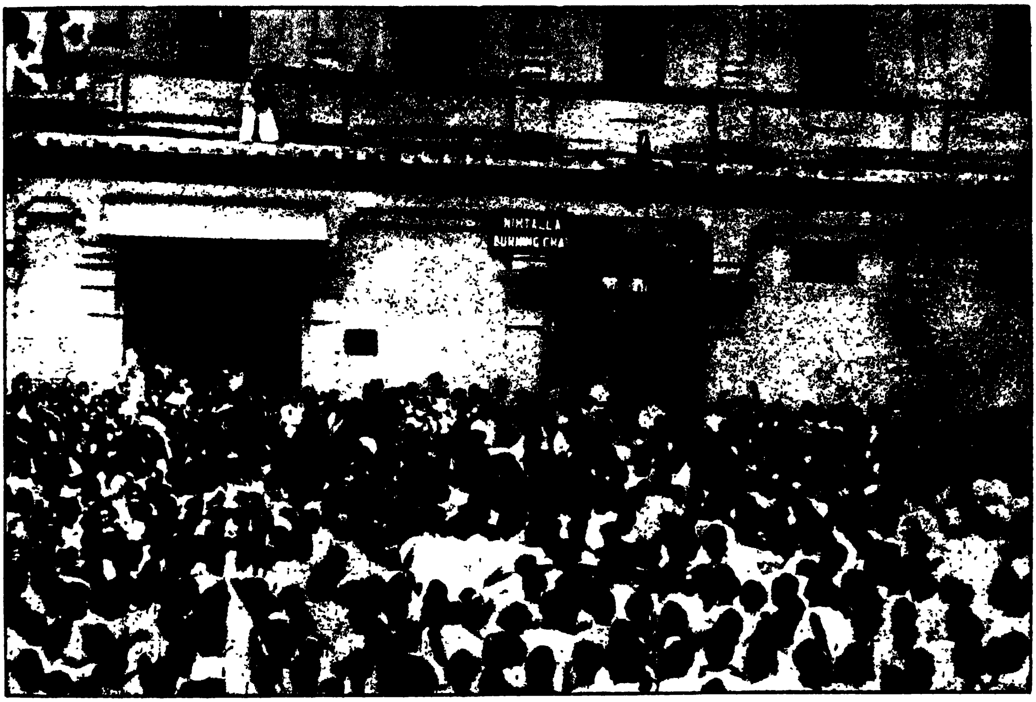
পথ হয় ত এইবার মুক্ত হ'লো, কিন্তু তাঁর যে দুটী পায়ের—পরিচয়-চিহ্ন বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রের সারা পথে পথেই ফুটে রইলো, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সে চিহ্নরেখা কি কেউ মুছে ফেল্‌তে পারবে? কোন কিছু লিখতে গেলে মনে সন্দেহ জাগে, যদি কোন লাইনটা নিজেরই মনে ধরে, তখনই যেন সন্দেহ হয়—এ যেন তাঁর লেখার কোথায় আছে? তা' এ কিছু আর বিচিত্র নয় ; সূর্য্যের তাপ প্রত্যক্ষভাবে গায়ে না লাগ্‌লেও তা' সর্ব্বদাই আমাদের তপ্ত করে রেখেছে। তাঁর অতি-মানুষিক-শক্তিকে আমরা সহ্য করতে পারি না পারি, প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝি না বুঝি, এ রবীন্দ্রীয় যুগে রবীন্দ্রাবদানকে প্রত্যাখ্যান কর্ব্বার সাধ্য কারু নেই।

তাঁর কাব্য নাট্য সঙ্গীত, যাতে তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশও বিদেশ-বাসীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বঘনিষ্ঠ পরিচয়, যে পরিচয়ে তিনি আজ সর্ব্ব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, মহাকবি, তার বাহিরে যে রবীন্দ্রনাথ আছেন—সে সম্বন্ধে কা'র কা'র সঙ্গে, কোন্ কোন্ যুগের মহামহা মনীষীবর্গের সহিত তাঁকে তুলিত করা হবে? তাঁর সাহিত্য তো শুধুই কবিতা বা গানের মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়। তাঁর সর্ব্বতোমুখী বিপুল প্রতিভার দ্বারা উদ্‌ভাষিত হয়ে, অপর যারা জন্মগ্রহণ করেছে, ভাল করে তাদেকে লোকে হয়ত গ্রহণ ক'রে উঠতেও সময় পায় নি। দাতা তাঁর আসমান্ত দান শক্তিতে ঢেলে দিয়েছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন, কুড়োবার অবসরও সাহস তো চাই!—বিশেষ করে তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধ নিয়ে আজও স্বদেশে বিদেশে আলোচনা হ'তে বাকি রয়ে গ্যাছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সংক্রান্ত—আবার, যে কোন শক্তিশালী ব্যক্তির বা ব্যষ্টির অবিচার, অত্যাচার সংক্রান্ত, গভীর গবেষণাপূর্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি-প্রসূত এবং তীব্র নির্ভিকতা ও ওজঃপূর্ণ যে অজস্র প্রবন্ধাবলী, তিনি আমাদের জন্য দান করে গ্যাছেন ; তারই গোটা-কতক মাত্র লিখতে পারলেই সকল দেশের সর্ব্ববিভাগের লেখকদের বাগ্মী বলে গলায় ফুলের মালার ভারে ভারী হয়ে উঠ্‌তে পারে এবং তা ওঠেও। শুধু তাঁর দার্শনিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধমালা, আর সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের 'অনুকরণ'—গত 'বৈভব, হৃতগৌরব'—এই নব্যভারতে, বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠাই তাঁহাকে পূর্ব্ব-ঋষিগণের প্রতিষ্ঠা প্রদান করতে পারতো। নালন্দা মহাবিহারের, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, পাহাড়পুর অথবা সহস্র সহস্র শিষ্যপরিবৃত তপোবনবাসী মহর্ষিবৃন্দের স্মৃতি—তাঁর এই বিশ্বভারতী, আবার এ যুগকে প্রদান করে তাকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছে। সারা বিশ্ববাসীর কাছে ভারতবর্ষের লুপ্ত গৌরবের গুপ্ত উৎসের মুখ যে খুলে দিয়েছে। তা'তে তো কোন সন্দেহই নেই! তাঁর "মহাকবি" "বিশ্বকবি" নামের সঙ্গে তাঁর এদিকের পরিচয় মিলিয়ে নিয়ে কি নাম তাঁকে দেওয়া উচিত ছিল, এ কথা কখন ভাবাই হয় নি! এবং ভেবেও হয় ত তার ঠিক পাওয়া যেত না। অথবা উপনিষদ "কবি শব্দে" যে অর্থ প্রদান করেছেন, সে বিশেষণ তাঁ'তেই সার্থক হয়েছে!

স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথ, যাঁর কণ্ঠে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', "বাংলার মাটী বাংলার জল", "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে," "ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে"—এই সব উদ্দীপনাময়ী সঙ্গীতের মধ্যে, অগ্নিজ্বালাদীপ্ত প্রবন্ধাবলীতে, নিজের জমিদারীতে বিদেশী পণ্যবর্জ্জন ও তাঁত চরকার সহায়তায় স্বদেশী শিল্পের প্রসারে, যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীকে উন্মাদনা

প্রদান করেছিলেন। 'রাখীবন্ধন' উৎসবের মন্ত্রপ্রদাতা সেই রবীন্দ্রনাথের যে আর একটী সুবৃহৎ পরিচয় সতন্ত্র হয়ে বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তাহারই বা সামঞ্জস্য কোথায়? সর্ব্ববিষয়ে এমন পরিপূর্ণ শক্তিরাশির আধার হ'য়ে, পৃথিবীর আর কোন্ দেশে, আর কোন কালে, আর কি কেহ কোথাও জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কোনও দেশের অতীত ইতিহাস, পুরাণ কথা, লোকগাথা এমন পরিচয় ত কই আজ পর্য্যন্ত দিতে পারে নি? জানি না—নিরবধি কাল, ভবিষ্যতে যদি কখনও পারে।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কোন্ কথাটাই বা বল্‌বো? তাঁর



নিমতলা শ্মশানঘাটে কবিগুরুর শব বহনের দৃশ্য ফটো—তারক দাস

সকল কার্য্যের, সকল বিভাগীয় কর্ম্মশক্তির পরিচয় দেওয়াই কি কাহারও পক্ষে সম্ভব? তবে এই কথাটাই আমি সবিস্ময়ে বল্‌তে চাই, তাঁর প্রত্যেক বিভাগীয় শক্তিই এত পূর্ণতর যে এর মধ্যের একটীমাত্র শক্তি থাকলেই লোকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। গোঁড়া ভক্ত বা স্তাবকের দলে যাঁকেই যত বড় করতেই চেষ্টা করুক না কেন, বাংলার আধুনিক উপন্যাস সাহিত্য, (বঙ্কিম যুগের পরের) বিশেষ করেই ছোট গল্প ঐ রবীচ্ছায়াতেই সম্পূর্ণরূপেই ছায়াচ্ছন্ন! এমন কি, চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও স্নিগ্ধতায় ও তেজে, নির্ভরতায় ও বিদ্রোহে, সেই রবীন্দ্র-সৃষ্ট-নারীরাই নানা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুস্পষ্ট দেখা যায়। বাইরে হয়ত ইজ্জতের খাতিরে অস্বীকার ক'রতে পারি, মনে ঠিক সায় দেওয়া যায় কি? অবশ্য আমার মতে এর মধ্যে অপরাধ বা অপমানেরও কিছু নেই! সাহিত্যের প্রজাপতিরূপে তিনি সম্পূর্ণ সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি করে এবং অশেষ বৈচিত্র্যে তাকে মণ্ডিত করে রেখেছেন, আমি যা কিছু গড়বো অথবা অঙ্কিত ক'রবো, তাঁকে এড়িয়ে যা'বো, এমন সাধ্য হবে না, তাই ব'লে সেটা কি আমার অপরাধ? না তা' করায় আমার পক্ষে অপমানের কিছু আছে! সূর্য্যের আলো যে বিশ্বকে প্লাবিত করে রেখেছে, এর জন্যে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তা দ্রষ্টাদের চোখের নয়; সূর্য্যেরই। যুগপতিদের প্রভাব যুগ-জনগণের চিন্তায় ও কর্ম্মে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়ে থাকে; এমন কি সূর্য্যাস্তের পরেও চন্দ্রজ্যোতির মধ্যবর্ত্তী হয়েও তার বর্ত্তমানতা দূরীভূত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ কবি, শিল্পী, দার্শনিক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, স্বদেশভক্ত-দেশসেবক। ভারতীয় কৃষ্টির, ধর্ম্মতত্ত্বের ও নিগূঢ় দর্শন তত্ত্বের প্রচারক। ঔপন্যাসিক ও সমালোচক। বন্ধুবৎসল, ছাত্রপ্রেমিক, দরিদ্র পল্লীবাসীর অকৃত্রিম মিত্র ও হিতকারী। রবীন্দ্রনাথের রূপের তুলনা হয় না! কণ্ঠস্বর ও সুর-সংযোজন শক্তি অনন্যসাধারণ। শিশু যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ সবার সহিত সমান হয়ে মিশে যাবার শক্তিতেও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব! সুসামাজিক, হাস্যরসিক, প্রাণখোলা, নিরহঙ্কার রবীন্দ্রনাথ। একাধারে এত মহা মহা সম্পদের অধিকার লাভ করা যে কত যুগযুগান্তরের কঠোরতর সাধনালব্ধ, তা' না জানলেও অনুমান করা যেতে পারে। আর এই মহামানবের জন্মগৌরবে গৌরবান্বিত ও পবিত্রীভূত যে দেশ, কত যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত তপস্যার ফল ও তার এই প্রাপ্তির মধ্যে বর্ত্তমান রয়েছে, তাই বা কে' বলে দেবে? যে সন্তান অঙ্কে ধারণ করে "ধরণী কৃতার্থা, জননী চ ধন্যা" হয়েছিলেন, সেই সন্তানকে হারাণ যে কতবড় ক্ষতি, তা' দেশ-জননী আজ ভাল করেই বুঝতে পারচেন! আর শুধু বাংলা দেশই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই এতবড় মহাপুরুষকে, বীরপুরুষকে হারিয়ে আজ মর্ম্মাহত কম হয়নি! সে হয় ত ভেবে পাচ্চে না, জালিয়ানা-বাগের পুনরভিনয় হলে, কে' নির্ভীক বিক্রমে অকুতোভয়ে ব্যক্তিগত সম্মানের দানকে, তৃণখণ্ডের মত ছিন্ন করে ফেলে দিয়ে, জাতীয় অবমাননাকারীদের কঠোর ভৎর্সনার কষাঘাত করবে? শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে উত্তেজিত করে তুলে রাজকীয় ভেদনীতির ফলে অখণ্ড ভারত বিখণ্ডিত হতে উদ্যত হলে, মূর্খ জনতাকে গোপন প্রশ্রয় ও উত্তেজনা দানে উন্মত্ত করে তুলে, লুণ্ঠন ও রক্তপাতের রোমহর্ষণ অভিনয়ের বিরুদ্ধে, কোন মহাকবির কল কণ্ঠে বংশীধ্বনির পরিবর্ত্তে আকাশের রজ্রবব প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকবে? বিদেশী নরনারীর মিথ্যা শ্লেষপূর্ণ অভিযোগের,কোন সে আশ্রমনিবাসী শান্তিপ্রিয় মনীষীর শেষ শক্তি অগ্নিবর্ষী বোমার মত ফেটে পড়বে? প্রায় চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্য থেকে আর তো কারুকেই এমন করে এগিয়ে যেতে দেখলুম না! এক বাঙ্গালী বিবেকানন্দ অনন্যসহায় হয়ে, ভারতের বাইরে, তখনকার দিনে, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে গিয়ে, প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রাধান্য সংস্থাপন করেছিলেন। আবার এই বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথই বিশ্বনিন্দিত, পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে অর্দ্ধ-বর্ব্বর ভারতের কলঙ্কভার মোচন করে, সেখানে তার সম্মানপতাকা উড্ডীন করে এসেছেন। বুদ্ধদেবের দেশ বলে একদিন সমগ্র এশিয়া যে দেশকে পূজা পাঠিয়েছিল, আজ আবার "টেগোরে"র দেশ বলে ভারতবর্ষ সেই শ্রদ্ধাই পুনরর্জ্জন করেছে! আজ সারাবিশ্বের মনীষীবৃন্দ বিশ্বভারতীতে সমবেত হওয়াতে সম্মানিত বোধ করে থাকেন, যেমন একদিন হিউয়েন সিয়াং প্রভৃতি করেছিলেন এই ভারতের মাটীতে মাথা ঠেকাতে পেরে।

বিবেকানন্দ পুরাতন ঋষির কণ্ঠ অনুকরণ করে তাঁর অর্দ্ধমৃতজাতিকে জীমূতমন্দ্রে আবাহন করেছিলেন। সোজা বলেছিলেন ;—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—

তাঁদের মনে পড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, "বরপ্রাপ্তি" অক্ষমের জন্য—সুপ্তের জন্য—মূর্চ্ছিতের জন্য নয়!

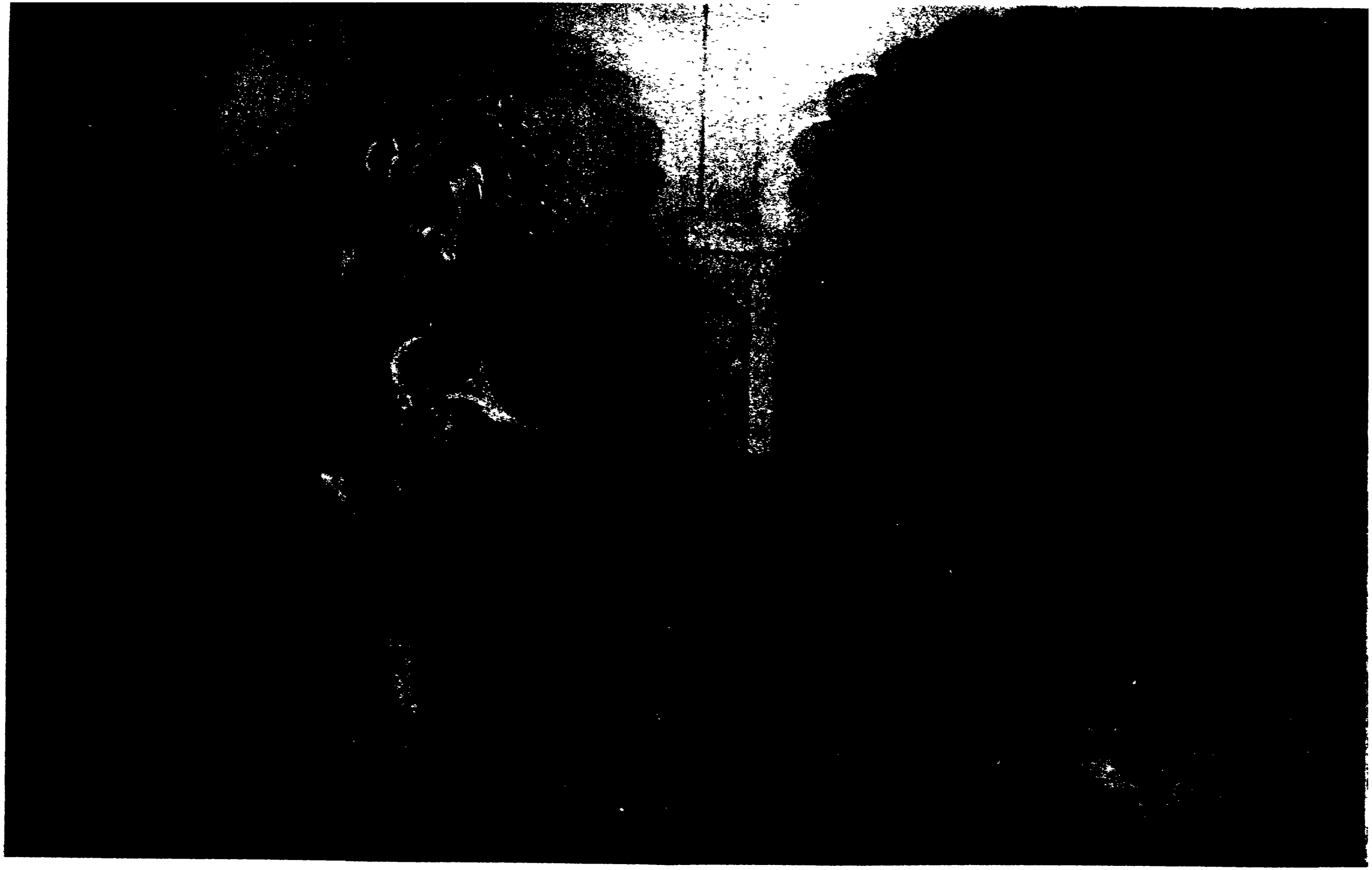
রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশবাসীকে কোমল-কঠোরে বারে বারে এই এক কথাই বলে বলে, তাদের আলস্য হতে, সম্মোহিতাবস্থা হ'তে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কখনও তাঁর কণ্ঠ গভীর বেদনাপূর্ণ লজ্জায় ক্ষীণ হয়ে নিখাদে নেমে পড়েছে, কখনও তা'দের মনুষ্যত্বহীনতার ক্ষোভে কণ্ঠে তাঁর আকাশের বজ্র উদ্যত হয়ে উঠেছে। গভীর দুঃখে অশ্রু আবিলতায় ভরা কণ্ঠে যখন বলেছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হ'বে তাহাদের সবার সমান।"

সে কি জাতির প্রতি অভিসম্পাত? কখনও নয়! এ যে সত্যদ্রষ্টার সত্য-দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত, বাস্তবের নগ্ন মূর্ত্তির প্রকাশ শিহরণ। কার্য্য কারণের সমন্বয় জ্ঞান থাকলে এতো জানা থাকে না।

"সাত কোটী বাঙ্গালীরে হে বঙ্গ জননি!
রেখেছ বাঙ্গালী করে; মানুষ করোনি!"

এ যে কত বড় অরুন্তুদ মর্ম্মজ্বালার আর্ত্ত অভিব্যক্তি, তা' যার মধ্যে স্বাজাত্যবোধ কিছুমাত্র আছে, সেই জানে। আবার ভবিষ্যতের আশাকে উজ্জ্বল করে তুলে, আশাহত প্রাণকে জাগিয়ে দে'বার মন্ত্র—সে ত বারে বারেই পাঠ করেছেন। সেই কিশোর বয়স থেকে এই জরাজর্জ্জরিত বার্দ্ধক্যের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত!



-- জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব-নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে

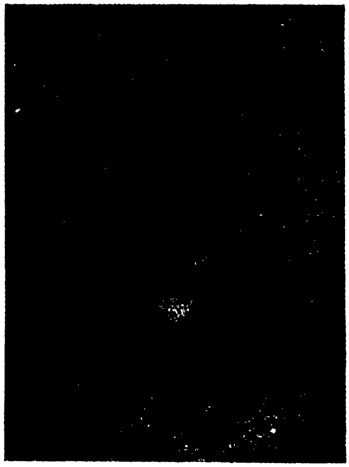
— "শা-জাহান" রবীন্দ্রনাথ

"আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!"

একথা বাঙ্গালীকে যে ভাবতে শিখিয়েছিল, সে ছিল না বাংলার কোন আশ্রম-নিবাসী প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ তপস্বী। সে ছিল বাংলার একজন কিশোর-কুমার মাত্র! তথাপি ঐ ভাষার মধ্যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সেই;

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত:
ক্ষুরস্যধারা নিহিতং দুরত্যয়া ইত্যাদি—ভাব সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

লেখবার, বলবার, ভাববার, ভাবাবার—অজস্র উপকরণ স্তূপাকারে ছড়িয়ে রয়েছে। কি লিখবো? কতটুকু? কত ক্ষুদ্র আমাদের শক্তি! ছাপার কাগজে কত সামান্য স্থান। আজকের দিনের লোকের পড়বার ধৈর্য্যই বা কত? তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, কি দিয়েছিলেন, আজন্ম পেতে অভ্যস্ত বলে, সে আমরা সত্য করে জানতে পারিনি! অপর্য্যাপ্তের মধ্যে মানুষ হওয়া বড় লোকের আদুরে ছেলের মতই প্রাপ্তির অভ্যাসে নিয়ত নিয়েই গিয়েছি। আজ যখন পাওনা ফুরিয়ে গেল—অকস্মাৎ বন্ধ হলো—তখনই যেন ধাক্কা খেয়ে সর্ব্বপ্রথম মনে পড়লো—উ: একটা মানুষের কাছ থেকে এত পাওয়া গেল ত? কি করে এ সম্ভব হলো? এখন প্রাণ যেন হাহা করে বলে উঠলো, আর ত পাবো না! স্বপ্নভাঙ্গা নির্ঝরের মতই যে ধারা কোটী কণ্ঠ রসাভিষিক্ত করে ঝরে চলেছিল, সে আজ আবার তার কোন স্বপ্নপুরে ফিরে চলে গেল! আমরা তাকে ফিরিয়ে কিছু দিই নি; দেবার কোন দাবীও কোনদিন ওঠেনি। দাতার দানে দিনের পর দিন পরিপুষ্টই হয়েছি। আজ সেই মুক্তধারা রুদ্ধ হলে, আমাদের চলবে কি করে? যাঁকে আমরা নিজেদের—একান্ত নিজেদেরই জেনে নিশ্চিন্ত ছিলেম, আজ অনুক্ষণ কেবলই মনে হচ্চে—অতবড় মহাপুরুষকে এত কাছে পেয়েও ত আমরা তাঁর যোগ্য কিছুই দিলাম না! দে'বার চেষ্টাই বা কতটুকু করেছি? এই যে তাঁর জীবনের সাধনার ধন বিশ্বভারতী—তার জন্যও আমাদের অনেক কর্ত্তব্য ছিল। কিছুই করা হয়নিত! "আছেন" জেনেই মন যে কত খানি ভরেছিল, হারিয়ে যাওয়ার এই একান্ত শূন্যতার মধ্য দিয়েই তা' যেন আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে। আমাদের প্রত্যেক মনোভাবটীর সহজ বহি:প্রকাশের জন্যে তিনি ত ভাষার ও ভাবসৃষ্টির



রবীন্দ্রনাথ—ব্রাইটনে ছাত্রাবস্থায়—(বয়স ১৮ বৎসর)

কিছুমাত্রও কার্পণ্য করেন নি। তাই তাঁরই ভাষাতে শুধু এইটুকু বলি:—

"এমন একান্ত করে চাওয়া, এ'ও সত্য যত;
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া, সে'ও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু, কোনখানে আছে কোন মিল;
নহিলে নিখিল;
এতবড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা;
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।"

রবীন্দ্র-বিরহে

শ্রীগণপতি সরকার

নশ্বর শরীর তব মৃত্যু নেছে হরে,
কিন্তু কবি চিরজীবী মানব-অন্তরে।

—অস্তমিত রবি—

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন হ'য়ে গেছে শেষ !
ডুবিয়াছে রবি—
জ্যোতিষ্মান পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ-স্তবক
আচম্বিতে হ'ল লীন সন্ধ্যার চিতায় ;
নিখিল দিনের শিখা।
নামিল তামসী ছায়া অস্তাচল ঘিরে ;
গোধূলি মন্দিরে—
বিলীন হইল ধীরে
দেবতার চিতাভস্ম ;
জাহ্নবীর জলে থেমে গেল কলগান
ক্ষণেকের তরে ;
হয় তো কাঁপিল হিয়া,
ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা স্তব্ধকলস্বনে
বারেক শুনিয়া নিল
মানুষের ব্যর্থ হাহাকার
পথিকের লাগি। সবাকার পথে
আলো হাতে চলেছিল আগে
যে পথিক শুনায়ে পথের গান,
কাকলী কূজন—
পথচারী মানুষের প্রতিপদচ্ছন্দে অনুখন
তুলিয়া প্রাণের সুর—
অসীমের বন্দনা সঙ্গীতে,
ছন্দে ছন্দে রচি' সুরলোক
জীবনের বিচিত্র ভঙ্গীতে।
দিকে দিকে বিকীর্ণ আঁধার !
ধরণীর পথপ্রান্তে বসিয়া একাকী
কাঁদে বুঝি দেবী বসুন্ধরা :
রুদ্ধ বাণী—
ললাটে কঙ্কন হানি'
মূরছিয়া পড়ে বার বার,
চেতনার অসহ লাঞ্ছনা তার
মর্মে মর্মে হানিছে অশনি—
নিবিয়াছে দিনের আলোক শিখা ওরে,
থামিয়াছে বন্দনার ধ্বনি।
ছাতিমের শাখায় শাখায়
কাঁপিছে আকুল মায়া,
মাতৃস্নেহে ব্যথাতুর।
শ্রাবণের মেঘ, জলভারে মন্থর চরণ—
অশ্রুর অঞ্জলি লয়ে তোমারে খুঁজিছে ওগো কবি !
আঁধারের নিবিড় অঞ্চলে,
ভীরু কেতকীর বুকে ঘনায়েছে বেদনার ছায়া !

হয় তো হ'য়েছে জানাজানি—
বনে বনে পল্লবে পল্লবে,
নদীর চঞ্চল জলস্রোতে
ছড়ায়ে প'ড়েছে হাহাকার।
স্বপ্ন হ'য়ে গেছে শেষ—
দিগন্তে নেমেছে অন্ধকার।
বাতাস শ্বসিয়া মরে—
ধরণীর পূর্বদ্বারে অস্তমিত আজি ওরে রবি !
দিনের অঞ্জলি আজি পূর্ণ তমসায় ;
চকিতে মৃদুল ভাষে কানে কানে কে যে ক'য়ে যায়
'নাই নাই, নাই ওরে সে পথিক নাই।'
অন্তরীক্ষে দৈববাণীসম ওঠে প্রতিধ্বনি—
অস্তাচলে রিক্ততায় থেমেছে যে উদাসী পূরবী
জাগিয়া উঠিবে পুনঃ উদয় শিখরে
অভিনব গাহিয়া ভৈরবী ;
মৃত্যুর শীতল অঙ্কে ঘুমাল যে কবি,
প্রভাতের সামগানে—
জাগিয়া উঠিবে ওরে গগনে গগনে
মৃত্যুহীন নব-জন্ম লভি।
তারি গান আকাশে বাতাসে
ছড়াইবে আলোর অঞ্জলি,
তুলিবে ঢেউয়ের সাথে মৃদু গুঞ্জরণে
মন হ'তে মনে, বন হ'তে বনে।
হয় তো সহস্র বর্ষ পরে,
আসিবে নূতন কবি, নব বীণা হাতে ;
লক্ষ শত অচেনা পথিক
গাহিয়া তোমারি গান
পৃথিবীর এই জীর্ণ পথে
কুড়াবে তোমারি গাঁথা মালিকার ছিন্ন পুষ্পদল,
মনের অজানা কোণে তার
শিহরিবে হিম অশ্রুজল—
অজ্ঞাত কি বেদনায় ;
শুধাবে ডাকিয়া এই ধরিত্রীর প্রতিটি ধূলিরে,
খুঁজিবে ফুলের গায়ে
লতায় পাতায়,
কোন প্রাবৃটের মেঘে
নেমেছিল উর্বশীর নূপুর সিঞ্জন—
অলক্ষ্য ঝঙ্কারে তার
তোমার বীণার তারে বেজেছিল অলোক সঙ্গীত।
ছড়াইয়া জটাজাল যেথা বৃদ্ধ বট
জেগে আছে শ্মশানের দ্বারে—

যুগান্তের চলচ্চিত্র আবরিয়া বিশীর্ণ পঞ্জরে,
প্রদোষের প্রচ্ছন্ন ছায়ায়
প্রতিদিন সন্ধ্যা তারাটির সাথে
নিরজনে করে আলাপন—
গোপনে জানিয়া লয় ওপারের অজ্ঞাত কুশল,
জীর্ণ জটাপাশ হ'তে মুক্ত করি মৃত্তিকার করুণ কাহিনী
একে একে দেখে মিলাইয়া,
সেই বটচ্ছায়াতলে—
ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে নীরবে
জিজ্ঞাসু নয়নে
হয় তো চাহিবে তা'রা শুনিবারে তোমার বারতা :
কোন গৃহতলে হ'ল আলোর উৎসব তব,
কোন সে প্রাঙ্গণে
খেলেছিলে লুকোচুরি আলোছায়া সনে,
গানে গানে রচি' কল্পলোক।

বরষার নব মেঘ আসিবে আবার
ছড়াইয়া নীপবনে সজল পরশ,
ঝরাইয়া কদম্ব কেশর
নবাঙ্কুর শ্যাম শস্পদলে ;
ময়ূর মেলিবে পাখা
সিক্ত মাটির গন্ধে আমোদ-বিভোর ;
রূপালি অঞ্চল মেলি রূপবালা সবে
খেলিবে কাশের বনে—
জ্যোছনায় আপন-বিভোলা ;
ধানের মঞ্জরী বাঁধি বেণীর পরতে
গ্রাম পথে গেয়ে গান—আপনার মনে
চলে যাবে কৃশতনু কৃষাণ বালিকা,
কলমী লতার সাথে শাপলা জড়ায়ে
অপরূপ রচিয়া মেখলা ;
আসিবে হেমন্ত রাত্রি দেবদারু শিরে
নিঃশব্দ চরণে ফেলি হিম দীর্ঘশ্বাস ;
বসন্তের মাধবী বিতানে—
জাগিবে বিনিদ্র রাত্রি বনবিহগীরা,
আম্রমুকুলের গন্ধে পৃথিবীর যৌবন মদিরা
হবে তন্দ্রাতুর।
বার বার সাজাইয়া ঋতুর পসরা,
আবার আসিবে কত নব নব মাস—
বর্ষ নব নব ;
শুধু রহিবে না কবি তুমি তাহাদের সাথে
বীণাখানি বাঁধি ল'য়ে তব।
তবু রবে পরশ তোমার,
গানে গানে ছন্দে উতরোল—
মিলাইয়া সবাকার আকাশে বাতাসে।

যতবার সম্মুখের পানে—
নবাগত যাবে পথ বাহি'
তোমারে স্মরিয়া ক্ষণকাল
বিমুগ্ধ নয়নে রবে চাহি ;
তোমার কীর্ত্তির গান হয় তো পড়িয়া লবে
চকিত উল্লাসে, মানুষের মানস পল্লবে ;
মানিবে সান্ত্বনা।
দিনান্তের ক্লান্তি মুছাইতে,
যবে বসুন্ধরা
দুরন্ত শিশুরে টানি বুকে
কানে কানে গেয়ে যাবে 'আয়-ঘুম' গান,
বক্ষে তার ফেনিল উচ্ছ্বাসে
ভাসিয়া উঠিবে তব ছবি ;
আচম্বিতে শিহরি উঠিবে মাতা,
নামিবে নয়নে তার অশ্রুর প্লাবন :
তারে বল কে দিবে সান্ত্বনা ?
বাল্মীকি দেবর্ষি ব্যাস কালিদাস সম,
মৃত্যুরে করিয়া জয়—
মৃত্যুহীন শাশ্বতের অমৃত আস্বাদ লভি'
তুমি চলে' গেলে কোন দূরে,
বসুধার স্নেহপুষ্ট তনুখানি
চিতাভস্মে রেণু রেণু করি'
ছড়াইয়া গেলে তার বনবীথিকায়,
সবার অতীত কোন মহাপূর্ণতায়
আপনারে করিলে বিলীন ;
সে কথা কি মুছে যাবে কোনদিন
মমতার স্মৃতিলেখা হ'তে !

উৎসবের ছন্দ মদিরায়
পুরবালা সবে
সাজাবে নূতন অর্ঘ্য জীবনের মর্মর বেদীতে,
গাহিবে তোমারি গান ;
তুমি সেথা থাকিবে না কবি !
সে গানের সুরে জেগে রবে তব নাম
মানুষের সাথে সাথে সীমাহীন কাল ;
চকিতে পশ্চাতে—
যতবার ফিরিয়া চাহিবে শত মন,
বেদনার্ত্ত করুণ নিঃশ্বাসে
উথলি উঠিবে অশ্রু,
মনে হবে—
কোন অস্তাচলে ডুবিয়াছে রবি !
লুকায়েছে মানুষের কবি
অতীতের কোন অন্ধকারে !

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার ভাব-উৎস

ডক্টর শ্রীসুরেশ দেব ডি-এস্‌সি

এই কথা প্রায়ই শুনিতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যস্রোত মন্থর হইয়া আসিয়াছে। শুনিতে পাই যে তাঁহার লেখনীর গতি রুদ্ধ হইয়া আসে নাই বটে, রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে তাঁহার লেখার পূর্ব্বের অনির্ব্বচনীয়তা—যাহা সমস্ত রসের সমস্ত কাব্যের মূল। যখন বহু লোক এই কথা একসঙ্গে বলিতেছেন তখন তাহার মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তাহা হয়ত চট্ করিয়া অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একথাটা স্বীকার করিয়া লইবার পূর্ব্বে কি কি কারণে এইরূপ কথা উঠিতে পারে তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় খুব অযুক্তিকর হইবে না।

কাব্য বা কবিতা আমাদের ভাল লাগে বা লাগে না, ইহার মধ্যে শুধু কাব্য বা কবিতাই নাই, আমাদের ভাল বা মন্দ লাগা ব্যাপারটাও ইহাতে রহিয়া গিয়াছে। যে রচনা আমাদের মনের মধ্যে ঝঙ্কার তুলিতে পারে, আমাদের চিত্তকে ক্ষণকালের জন্যও তাহার গণ্ডীর তাহার Sphere of Sorrowর বাহিরে লইয়া যাইবার অধিকার রাখে, তাহাই আমাদের আনন্দের কারণ হয়। রবীন্দ্রনাথ এতদিন পর্য্যন্ত যে উপলব্ধিগুলি তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া সাধারণের সামগ্রী করিয়া আনিতেছিলেন সেগুলি ঠিক সেই সুর সেই ছন্দ দিয়া পূর্ণ ছিল মণ্ডিত ছিল; যে সুর যে ছন্দ সকলে নিজের অন্তরের গভীরে লুক্কায়িত ছন্দ ও সুর বলিয়া বুঝিত এবং তাঁহার এই রচনার ভিতর দিয়া যাহাদের পরিচয় তাহারা বাহির করিয়া আনিত। তাই রবীন্দ্রনাথের বিগত যুগের রচনাকে তাহারা এত সুন্দর এত অনবদ্য বলিতে উচ্ছ্বসিত হয়। অপর পক্ষে আধুনিক রচনাগুলির সহিত সাধারণের মনের সহিত সুর-সঙ্গতি ঘটিতেছে না বলিয়া তাহা অপেক্ষাকৃত অগ্রাহ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে বিগত কয়েক বৎসরের রচনার মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক অদ্ভুত ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা এত অসাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। এই অদ্ভুত প্রকাশ-ক্ষমতা সত্যকারের উপলব্ধিবিহীন নহে, ইহার পিছনে গভীর অনুভূতি বর্ত্তমান এবং ইহাও প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই অপ্রকাশের এক অভিনব প্রকাশকে—সেই অনির্ব্বচনীয়কে যাহা থাকিলে অতিশয় গদ্যও কাব্যের আসনে স্থান পায়, যাহা সামান্য মাত্রও না থাকিলে নির্দ্দোষ ছন্দোবদ্ধ খুব ভাল ভাল কথা, খুব ভাল ভাল কথাই থাকিয়া যায়, একটুও কবিতা হইয়া ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য জীবনের ভিতর দিয়া যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া চলিয়াছেন এবং এই চলিবার পথে পথে যে সব অমূল্য রত্নরাজি দুই হাতে ছড়াইয়া চলিয়াছেন—খুব সামান্য দূর পর্য্যন্তই তাহাদের আমরা অনুসরণ করিতে পারি। যেখানে পারি সেখানে বলি ইহা অনবদ্য, ইহা সুন্দর এবং যেখানে তাহা পারি না সেখানে রচনাও হইয়া ওঠে আমাদের কাছে কবিত্বশক্তিহীন।

রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে বহুবার এইকথা বলিয়াছেন যে তাঁহার সমস্ত গান সমস্ত কবিতাই তাঁহার সাধনার নামান্তর মাত্র। গান গাহিয়া, কবিতা লিখিয়া তিনি তাঁহার আপনার ডাকের সাড়া দিয়া উঠেন। যে সব রচনার মূলে এই সাড়া দিবার ভাব নাই সেগুলিকে তিনি তাঁহার কাব্য সাহিত্য হইতে বিদায় দিতে চাহেন। তাঁহার কাব্যের এই বিশেষ প্রকৃতি শুধু তাঁহার পরিণত লেখাতেই আবদ্ধ নাই, ইহার অস্তিত্ব তাঁহার অপরিণত কাঁচা বয়সের লেখার মধ্যেও যথেষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার কাব্যজীবন তাই হইয়া উঠিয়াছে উপলব্ধির এক ক্রমবিবর্ত্তনশীল ধারা। তাঁহার প্রথম বই এবং বর্ত্তমানের শেষ বই সব লইয়া তিনি আমার কাছে তাই একটিমাত্র কাব্যই রচনা করিয়াছেন। এ কাব্য তাঁহার আত্মনিবেদনের মন্ত্র এবং আত্মোপলব্ধির প্রকাশ এবং ইহা আজও সেই আগেকার মতই প্রাণবন্ত। তিনিই লিখিয়াছেন—

তব অধিকার আজ দিনে দিনে ব্যাপ্ত হ'য়ে আসে আমার
আয়ুর ইতিহাসে॥

সেথা তব সৃষ্টির মন্দির দ্বারে, আমার রচনাশালা স্থাপন
করেছি একধারে,

তোমারি বিহার বনে ছায়া বীথিকায়।

রবীন্দ্র-কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যটিকে যদি আমরা প্রথম হইতেই স্বীকার করিয়া লই তাহা হইলে আমি যে কথার অবতারণা আপনাদের নিকট করিতে উপস্থিত হইয়াছি তাহা অতি স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হইবে। নতুবা পদে পদে বোধ হইবে যে আমার কথা শুধু কথা মাত্র সার হইয়া যাইতেছে, তাৎপর্য্য কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। বৈষ্ণবেরা যেমন বলিয়া থাকেন যে "কানু বিনা গীত নাই", রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধেও আমার মনে হয় ঠিক সেই কথাই খাটে এবং বৈষ্ণবের কবিতা যেমন শুধু মাত্র প্রেমের কবিতাই, আর কিছু নহে—রবীন্দ্র কাব্যও তাই শুধু মাত্র প্রেমের কবিতাই। ইহা ছাড়া বৈষ্ণবভাবের সহিত রবীন্দ্রনাথের আরও একটি গভীর সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। বৈষ্ণবেরা বলেন যে ভালবাসিবার শুধু মাত্র একজনই আছেন—তাঁহাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন তিনি একই। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া যাহাকে উদ্দেশ করিয়াই তাহা বলিয়া থাকুন না কেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার গভীরতম উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার প্রতিই—যিনি তাঁহাকে বার বার ডাক দিয়ে গিয়েছেন তাঁহার সেই শিশুকাল থেকে—

দোসর ওগো দোসর আমার কোথা থেকে
কোন শিশুকাল হ'তে আমায় গেলে ডেকে।

এই আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়া উঠিয়াছেন প্রতিবারেই। বার বার তিনি আহ্বান পাইয়াছেন—বার বার তাঁর সাড়া দিয়াছেন, অজস্র কবিতা লিখিয়া অসংখ্য গান গাহিয়া। এইগুলিই তাঁহার কাব্যজীবনে এক একটি যুগ হইয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। আমরা "সোনার তরী"র যুগ দেখিয়াছি, "ক্ষণিকা"র যুগ দেখিয়াছি, "গীতাঞ্জলি"র যুগ দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি "বলাকা"র যুগ। একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার কথা এই যে এই প্রত্যেক যুগের ভাবের সাথে সাথে ছন্দও কেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই কাব্য স্তরগুলির ভাব বৈশিষ্ট্য ও তাহার সহিত সেই সময়কার ছন্দের সম্পর্ক একটি বাস্তবিকই সুন্দর আলোচনা, কিন্তু তাহা করিতে গেলে আশঙ্কা আছে যে আমার প্রধান বক্তব্য বিষয় অত্যুক্তই রহিয়া যাইবে।

রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের আর একটি প্রধান যুগকে বলিতে পারা যায় যে তাহা "পূরবী"র যুগ। এই পূরবীর যুগ সম্বন্ধে বোধহয় কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ তাঁহার শেষ যে কাব্যযুগ চলিতেছে তাহা এই যুগের পরিণতি মাত্র। বলাকার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ঐশ্বর্য্যময় যে প্রচণ্ড গতিশীল লীলা দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যেখানে প্রিয়ের ঐশ্বর্য্যময় বিরাটত্বের নিকট নিজের প্রেমকে অতিশয় সামান্য বোধ হইয়াছিল তাহা এখন তাহার ঐশ্বর্য্যকে প্রেমের অন্তরালে লুকাইয়া ফেলিয়াছে। তাই পূরবীর মধ্যে তিনি চঞ্চলাকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হন নাই, তাহার ডাকে আকুল হইয়াছেন। কাজে কাজেই পূরবীতে পাতায় পাতায় তাঁহার প্রিয়ের জন্য তিনি যে আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বের কোনও যুগের কাব্যে এত নিবিড়ভাবে ধরা পড়ে নাই। এই আকুলতার প্রকাশে এত সুন্দর সুন্দর লাইন পূরবী বইটির মধ্যে পাতায় পাতায় রহিয়াছে যে আমাকে এখানে তাহাদের শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্তরের অন্তরঙ্গ লোকের আহ্বান শোনা, আবার সে আহ্বানে সাড়া দিয়া ওঠা এই হইল রবীন্দ্র গীতিকাব্যের প্রাণ। যে সুর মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে তাহাই তাঁহার পূজার অর্ঘ্য। তাঁহার অন্তর্লোকের বিশ্বাস যে এই দিয়া তিনি তাঁহার প্রিয়ের মনোহরণ করিতে পারিবেন। তাঁহার দুঃখ ও বেদনা তাঁহার দয়িতের হৃদয় বিগলিত করিবে। দুই-জনের মধ্যে যে পরিপূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে এবং যাহার ফলে একের অভাবে অন্যের দুঃখের অন্ত নাই, পূরবীর যুগে তাঁহার বিশ্বাস যে তাহাই তাঁহার সব দুঃখ মোচন করিবে। তিনি তাই আকুল স্বরে নানাভাবে ডাকিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আহ্বানের সাড়া আসে নাই। তাঁহার এতদিনের বিশ্বাস যে তাঁহার ভালবাসা তাঁহার প্রিয়ের নিকট একদিন না একদিন পৌঁছাইবেই—তাহা এই



কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ—(বয়স ১৫ বৎসর)

পূরবীর যুগে গভীর ধাক্কা খাইয়াছে। তিনি তাই পরবর্ত্তীযুগে বলিতেছেন

অদৃষ্টের যে অঞ্জলি এনেছিল সুধা, নিল ফিরে।
সেই যুগ হ'ল গত, চৈত্র শেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মত।

কবি বুঝিলেন তাঁহার প্রেমও তাঁহাকে পথ দেখাইতে পারে না। বৈষ্ণবেরা বলেন ভালবাসার গর্ব্বও কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

এইবার প্রথমে তাঁহার জীবনে অনুভূত হইল harmony বা সঙ্গতির অভাব। তিনি ডাক শোনেন, সে ডাকে সাড়া দিয়া ওঠেন। কিন্তু তাঁহার সাড়া দিয়ে ওঠা গিয়া পড়ে বধিরবৎ কানের ওপর, অন্যমনা মনের ওপর, পাষাণবৎ হৃদয়ে। যাহার ডাক এত মধুর যে সমস্ত চিত্তেন্দ্রিয়কায় তাহাতে সাড়া দিয়া ওঠে সে নিজে হইয়া দাঁড়ায় পাষাণবৎ সাড়াশব্দহীন। তাই কবি লিখিতেছেন, বোধ হয় অভিমানের সঙ্গেই

একদিন শাখান্তরি এল ফল গুচ্ছ
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,

তবু গাহিলেন, সঙ্গে সেই অভিমান

তুমি যার সুর দিয়াছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি,
ওগো সেকি তুমি জান—
সেই যে তোমার বীণা, সে কি বিস্মৃতা
ওগো মিতা, মোর, অনেক দূরের মিতা
কিন্তু না আসিল সাড়া, না আসিল সুর।

দুইজনের মধ্যে যে সহজ সম্বন্ধের সঙ্গতি (harmony) তাঁহার চির জীবনের সমস্ত গানের সমস্ত রচনার মূল সুর ছিল তাহাও জীবনের এই নূতন নিষ্ঠুর উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন রূপ লইল। রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে শেষাশেষি যে গদ্য কবিতা এত অবলীলাক্রমে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার পিছনেও আমার মনে হয় জীবনের এই break of harmonyর হাত রহিয়াছে। একটি চরণের সঙ্গে আর একটি চরণের মিলকে মূলে রাখিয়া যে কবিতা বাহির হইয়া আসে তাহার এই নির্ম্মম অভিজ্ঞতাকে এই গভীর অমিলকে প্রকাশ কারবার ক্ষমতা কোথায়, তাই ইহার প্রকাশের জন্য গদ্যছন্দের আবিষ্কার করতে হয়। ইহার করুণতা তাই পূরবীর যুগকেও হার মানায়। কিন্তু অপ্রকাশের এই নূতন রূপ ত আমাদের কেহ কখনও এমনভাবে দেখায় নাই, তাই ইহাকে আমরা ঠিকমত ধরিতে পারি না। তাই আজ সাধারণভাবে গদ্যকবিতাগুলি যে সকলের খুব মনোহরণ করিতে পারে নাই তাহার কারণও এই। বৈষ্ণব কবিরাও এই harmony-র অভাব যেখানে পাইয়াছেন সেখানে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। ইহার নিদারুণতা প্রকাশের সামর্থ্য বোধহয় তাঁহাদেরও নাগালের বাহিরে ছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। তাহা যেন আরও নিবিড়তর প্রকাশ-ক্ষমতা লাভ করিয়া উঠিয়াছিল, আর যেখানে harmony নাই সেখানেও তিনি সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন। শাপমোচনে বলিতেছেন—

"কুশ্রীর পরম বেদনাতেই ত সুন্দরের" আহ্বান—কমলিকার মুখে যেন নিজের কথা দিয়াই কবি ইহার উত্তর দিতেছেন—কমলিকা বলে "রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে।" সৌরসেন তাহার উত্তরে বলে—"একদিন সইতে পারবে—আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে—কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।"

আবার নবজাতকের "শেষ কথা"য়—

কাছের দেখায় দেখা পূর্ণ হয় নাই
মনে মনে ভাবি তাই
বিচ্ছেদের দূর দিগন্তের ভূমিকায়
পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্তরবি রশ্মির রেখায়।
জানি না বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা যাওয়া
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া॥

রবীন্দ্রনাথ এখানে তাই অসঙ্গতির মধ্যেও সঙ্গতির সন্ধান পাইতেছেন। এই অসঙ্গতিতেও যে সঙ্গতি রহিয়াছে তাহার প্রকাশ যত বেশী তাঁহার গদ্য কবিতায় ফুটিয়াছে তাহা তত তাঁহার ছন্দযুক্ত কবিতাতে ধরা দেয় নাই। শ্যামলী, পত্রপুট ও পুনশ্চ এই যুগের গদ্য কবিতার বই—আর বীথিকা হইল কবিতার বহি। এই দুইটিকে পাশাপাশি পড়িলেই তাহা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িবে।

পত্রপুটে লিখিতেছেন—

চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতরধ্বনি
আকাশের আলোয় আজ মেঠো বাঁশীর সুরে মেলে দেওয়া
সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।
মন বলছে—মধুময়, এই পার্থিব ধূলি
অদ্ভুতেরও সঙ্গতি আছে এইখানে
এও এসেছে হাটের ছবি ভর্ত্তি করতে।

বিচ্ছেদ ও বিরহ যে ভালবাসারই একটি রূপ তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বৈষ্ণব কবিরা। রবীন্দ্রনাথ আরও একটু বেশী করিয়াছেন! অসঙ্গতি, কুশ্রীতা, এমন কি নিষ্ঠুরতাও যে প্রেমেরই আর একটি রূপ—তাহা তিনি এই গদ্য কবিতাগুলিতে দেখাইয়াছেন।

তুমি গেলে কবি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

তুমি চ'লে গেলে, রজনীগন্ধা ম্লানমুখে চেয়ে থাকে,
ঘনবরষণক্লান্ত সন্ধ্যা ঘনালে কে তারে ডাকে ?
চামেলী হেনার বকুল বেলার যূথিকা চাঁপার বনে
উদাস বায়ুর অলস পরশে কে বলো প্রহর গোণে ?
সীমাহীন নদী রৌদ্রে উজল, রূপাগলা ঢেউগুলি,
গতিমন্থর তরণী চলেছে গৈরিক পাল তুলি',
অপরাহ্ণের তন্দ্রাকাতর শ্রান্ত পল্লী-ছায়া,
শব্দবিহীন সমারোহভরা অস্তাচলের মায়া,
দিগন্তে অবলুণ্ঠিত গ্রাম অঞ্চল ধানীরঙ,
মন্দির আরতির নিস্বন ঠং ঠং টঙা ঢং—
সব যেন আজ ব্যর্থই লাগে ! কার তুলিকার টানে
এই ছবিগুলি ঝলমল হবে, বলা হবে গানে গানে ?
পুঞ্জমেঘের আড়ালে নীলের সব আভা যাবে ঢেকে,
ঝর ঝর জল ঝম্ ঝর ঝর ঝ'রে যাবে থেকে থেকে,
সেদিনের মত অন্ধকারেই এ দিন আঁধার হবে,
বেলা ব'য়ে যাবে অকাজের মাঝে, রাত্রি আসিবে যবে
জ্বলিতে জ্বলিতে নিভে যাবে দীপ, বাতায়ন রবে খোলা,
কোথায় সে কবি ? নিখিল ভুবনে ঝঞ্ঝা দোলাবে দোলা !
দূরবিরহিণী দীর্ঘনিশীথ মর্ম্মবেদনা সহে,
গীতবিতানের অন্তরালে কি দুঃসহ কথা রহে !

কোথা সান্ত্বনা ? কোথা ভালোবাসা ? কোথা প্রেমনিবেদন ?
দ্যুলোকে ভূলোকে অন্বেষণের বিফল আকর্ষণ !
ছিঁড়ে যাবে তার বীণা বাঁধিবার পরিশ্রমের সাথে,
অসহ্য মরুভূমির প্রদাহ জ্বলিবে কল্পনাতে,
আশাহীন পথ, ভাষাহীন সেই, অস্থির দুনিয়ায়
মর্ম্মের বাণী কে পাইবে খুঁজে অকরুণ ছলনায় ?
তুমি চ'লে গেলে পান্থশালার নিঃশেষ ক'রে সুখ,
উৎসব গীতি রুদ্ধ করিলে, এ কী তব কৌতুক ?
জীবনকে উপভোগ্য করেছ, দুঃখকে রমণীয়,
বিচ্ছেদে রঙ্ দিয়েছ নূতন, মিলনকে সুপ্রিয়,
মধুবচনের বন্যা এনেছ, দৃষ্টিভঙ্গী নব,
জাগিলনা প্রাণ, ফুরালো যে গান, খেলা ভাঙা হ'ল তব !
তুমি চ'লে গেলে, পরের রাত্রি প্রভাত হয়েছে ফিরে,
আর ত কাকলী জাগিলনা কই জনসাগরের তীরে !
সোনামাখা রোদ অর্থবিহীন, বৃথা জ্যোৎস্নার আলো,
শিশুর হাসিও রমণীর আঁখি আর কি লাগিবে ভালো ?
কিছু বোঝা কিছু না বোঝার মাঝে রহস্য সীমাহারা
আর র'বেনাকো, সুন্দর যারা, শুধু সুন্দর তারা !
মোহমদিরার লগ্ন গিয়েছে, ফুরায়েছে মত্ততা ;
ভালোবাসা হবে হয়ত একদা কেবলি কথার কথা !

চিতার ধূলায়

শ্রীকণকভূষণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গ গগন আঁধার করিয়া রবি ডুবিয়াছে অস্তাচলে—
অগণিত মুখ মৌন ব্যথায় বেদনা ঝরিছে নয়ন জলে।
তেইশে শ্রাবণ জাগে অনুখন ; এই সেদিনের দুপুরবেলা—
বঙ্গবাণীর পরাণের মণি গৌরব-রবি ভাঙিল খেলা।
হারানোর সুরে কাঁদিছে স্বদেশ হানিয়া আঘাত মনের তারে—
শোকের মলিন মৌন-মাধুরী বেদনা দানিল বারম্বারে।
চলিয়া সে গেল অমরার লোকে শাওন ঝরিল নিখিল মনে—
যাদুকর কবি কাহার মায়ায় ভুলিল "শ্যামলী"-কুঞ্জবনে।
* * * *
মানবের মাঝে বাঁচিবার সাধ' শুনাল প্রথম যে মহাকবি—
অমর হইল বাংলার ভাষা যাহার সোনার পরশ লভি।
বিশ্ব-সভায় বঙ্গভাষায় ভারতে যে জন তুলিল ধরি—
সেই বঙ্গের সোনার রবিরে পরাণ ভরিয়া প্রণাম করি !
* * * *

আজিকে সাধের সোনার বাংলা নয়নে ঝরায় অশ্রুরাশি—
যাহার আকাশ মেদুর বাতাস কবির বীণায় বাজাত বাঁশী।
সেই জননীর গঙ্গার নীর শেষের বেলায় লইল কোলে—
যে ছেলে বাড়ালো মাতৃ-গরিমা তারে দিল কোল খুশীর দোলে।
* * * *
আমি দেখিলাম নিমতলা ঘাটে নেমে এলো ধীরে সন্ধ্যারাণী—
লক্ষ লোকের মর্ম্ম ছানিয়া বাতাস শুনাল বিদায় বাণী।
পূর্ণিমা চাঁদ ঝুলন দোলায় দুলিয়া উঠিল গঙ্গাতীরে—
বাংলা মায়ের বুকের মাণিকে দেখিলাম শেষ নয়ন নীরে।
* * * * *
হঠাৎ শাওন ঝরিল আবার প্রিয় লাগি তার অঝোর-ঝরা—
অপরূপ স্নেহে লীলাময়ী যেন মরণের রূপে পাগল করা।
শ্রাবণ বিরহে অন্তর ভরি ফিরিলাম শেষ বর্দ্ধমানে—
যারে হারালাম চিতার ধূলায় সেই বেদনায় পরাণ হানে।

আর্ট ও রবীন্দ্রনাথ

প্রিন্সিপাল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

প্রাচীনেরা বলেন যে বিধাতার যে সৃষ্টি আমাদের চারিদিকে প্রসারিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রলুব্ধ করে ও আমাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কবি-প্রজাপতি এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর উপর একটা অলৌকিক বিশ্ব রচনা করেন। এই সৃষ্টির নিয়ম বিধাতার সৃষ্টিকে অতিবর্ত্তন করিয়া যে নূতন রাজ্য নানা সূত্রজালে বিরচিত করিয়া এই জীবনকে আচ্ছাদিত করে, তাহাই কাব্যলোক বা শিল্পলোক। এই পৃথিবী আমাদের জীবন



রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দীপেন্দ্রনাথ (দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র)
(শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী)

ধারণের ক্ষেত্র। ইহারই নিয়মে সমস্ত প্রাণ পর্য্যায় একই কৌশলে নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে। ইহার সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্বে আমাদের দেহ ও মন বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেহের সহিত দেহরক্ষণ, পোষণ, বিধারণের এমন একটি স্মৃতি জড়িত আছে যে সে তাহার বলে স্বাভাবিক জীবনধারণের উপযোগী ব্যাপারে আপনাকে নিরন্তর দক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এই দেহ উত্তরাধিকার সূত্রে নিম্নতম প্রাণিলোক হইতে পরম্পরাক্রমে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। যে শিরা, যে ধমনী, যে নাড়ি, যে পেশী, যে অস্থি, যে কন্ধরা, যে স্নায়ু, প্রাণি-জগতের ইতিহাসে যে কাজের জন্য উপযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটা নিভৃত স্মৃতি বাসনারূপে তাহার মধ্যে লীন হইয়া রহিয়াছে। যখনই প্রয়োজন ঘটে তখনই আমাদের দেহযন্ত্রের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকারের বাসনা, বিভিন্ন প্রকারের আকৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে জীবনযাত্রার উপযোগী বহু কার্য্য আমাদের দেহযন্ত্র অন্য-নিরপেক্ষভাবে আপনিই করিতে পারে। ইহার সঙ্গে আমাদের মন যখন তাহার নূতন রাজ্য প্রসারিত করে এবং তাহার আপন ব্যবস্থায় আমাদের দেহযন্ত্রকে চালিত করে তখন বহির্লোকের সহিত সংগ্রামে মানুষ অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই মনের মনন শক্তির ফলে প্রকৃতির নানা রহস্য মানুষের নিকট প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে এবং তাহার সুযোগ লইয়া মানুষ নানা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। আদিম মানুষ প্রথম যখন পাথর সূচালু করিয়া কিংবা ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করিয়া কিংবা দূর হইতে পাথর ছুঁড়িবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া প্রথম যন্ত্র আবিষ্কার করে তখন হইতেই পশুলোক মানবের নিকট পরাভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যন্ত্রকৌশলে যে জাতি অধিকতর সুনিপুণ সেই জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। কিন্তু দেহ বা মন এই উভয়ের কোনটিই যথার্থত মানুষকে পশুলোকের উপরে স্থাপিত করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে যে পশুর মধ্যেও এমন একটা বাসনা বা আকৃতি আছে যাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মানুষের মধ্যে বুদ্ধিরূপে দেখা দিয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তির ফলে মানুষ পশু হইতে অধিকতর বলশালী হইয়াছে কিন্তু পশুলোকের সহিত দ্বন্দ্বে এখনও জিতিয়াছে বলিয়া বলা যায় না। মানুষ আপন বুদ্ধিবলে বৃহৎ পশুদের নিরন্তর বধ করিয়া থাকে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ক্ষুদ্র কীটাণুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা

করিবার মন্ত্র মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বলের আধিক্যে বা প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের শক্তির আধিক্যে মানুষের যথার্থ মহত্ব বা উচ্চতা নির্দ্ধারিত হয় না। সাধারণত তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থে দেখা যায় যে বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নিম্নস্তরের বুদ্ধি যে পশুদেরও আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না।

বস্তুতঃ যে বৃত্তি মানুষকে পশু হইতে উচ্চতর করে সে বৃত্তি শক্তি নয়, সে বৃত্তি দেহ-নিরপেক্ষ আনন্দ। পশুজাতি এবং যে পর্য্যন্ত মানুষকে পশুজাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে সে পর্য্যন্ত মানুষও, জগৎকে আপন ভোগের চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। এই ভোগ প্রধানত ইন্দ্রিয়-লালসার অনুগামী। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটী বৃত্তি আছে যাহার ফলে এই ভুবনমোহিনী প্রকৃতির শস্যশ্যামল অঞ্চল, তাহার বিচিত্র পুষ্পরাজির বর্ণচ্ছটা, গন্ধভারমন্থর বায়ুর স্পর্শ, বিহঙ্গকুলের কলকাকলী মানুষের চিত্তকে অনিমিত্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ করিয়া দেয়। এই আনন্দের কোন দেহজ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বুদ্ধির স্পন্দনের মধ্যে ইহার মূল আবিষ্কার করা যায় না এবং আমাদের শক্তি সঞ্চয়েও ইহা কোন আনুকূল্য করে না। কেবলমাত্র মানুষই এই আনন্দের অধিকারী, এইখানেই মানুষের স্বর্গ। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আনন্দের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং আমাদের মধ্যে এমন একটী পৃথক সত্তার সন্ধান লাভ করিয়াছেন যেখান হইতে এই আনন্দ নির্ঝরের ধারার ন্যায় নিরন্তর প্রস্রুত হইতেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অন্তরুৎস ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিতে গিয়া personality বলিয়াছেন।

যেখানে আমরা আমাদের প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ, যেখানে আমরা দেহযন্ত্রের অধীন, যেখানে সুবিধা অসুবিধার পাটোয়ারী চিন্তায় আমাদের বুদ্ধি স্পন্দিত সেখানে এই অধ্যাত্মলোকের আভাস পাওয়া যায় না। কবিগুরু বলেন যে এই অধ্যাত্মলোকের মধ্যে আমরা যে আত্মার স্ফুরণ পাই তাহা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। নরলোকের মধ্যে এবং প্রকৃতিলোকের মধ্যে তাহা নিরন্তর আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তির মধ্যে কোন প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে হয় না। যখন আমরা বুদ্ধির জগতে, বিজ্ঞানের আলোচনায় আমাদিগকে স্পন্দিত করিয়া তুলি, তখন যে সত্য যে শক্তির সহিত আমাদের দ্বন্দ্ব ও বিনিময় চলে, সে লোক ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই লোকের সত্যতা আমরা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিলোকের প্রমাণের দ্বারা ইহাকে আমরা স্থাপন করিতে পারি না। চক্ষুর দ্বারা আমরা যাহা দেখি, ইন্দ্রিয়ান্তরের যোগ্য হইয়াও তাহা যদি ইন্দ্রিয়ান্তরের দ্বারা বেদ্য না হয় তবে তাহাকে আমরা বলি ভ্রম। চক্ষুতে যাহা দেখিলাম সর্প, হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া তাহা যদি দেখি রজ্জু—তবে এই সর্প দেখাকে আমরা বলি ভ্রম। আবার চক্ষুতে যখন দেখি আকাশের সূর্য্য একটী থালার মত—কিন্তু যুক্তিতে যখন দেখি তাহা পৃথিবী অপেক্ষা ৪০ লক্ষ গুণ বড়, তখন আমরা যুক্তিকেই বিশ্বাস করি এবং চাক্ষুষ জ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করি। সাধারণত যখন আমাদের মনে কোন ইন্দ্রিয়জ প্রত্যয় উৎপন্ন হয় এবং


রবীন্দ্রনাথ—(বয়স ২৫ বৎসর) দক্ষিণে ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, বামে ভ্রাতুষ্পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে প্রত্যয় কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা বাধিত না হয় তখন তাহাকে আমরা সত্য বলি। ইহাই বাহ্য বিজ্ঞানের বা scienceএর সত্য নির্দ্ধারণ প্রণালী। কিন্তু অন্তরে, আমাদের অধ্যাত্মলোকে যখন আমাদের কোন একটী বিশেষ প্রকাশ, বিশেষ অনুভব উৎপন্ন হয় তখন তাহার সত্যতার জন্য আমরা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করি না। কাজেই বাহ্যলোকের সত্য নির্দ্ধারণ প্রণালী ও অন্তর্লোকের সত্য নির্দ্ধারণ প্রণালী এক নহে। যে বৃত্তির দ্বারা মানুষ তাহার আপন আনন্দে, আপন অধ্যাত্ম-লোকে শিল্প বা কাব্য রচনা করিয়া থাকে সেই বৃত্তিকে কোন বহির্লোকের প্রমাণপুঞ্জের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া আত্ম সংস্থাপন করিতে হয় না। জীবন যেমন আপন স্বাচ্ছন্দ্যে আপনি প্রবাহিত হয়, সেই স্বাচ্ছন্দ্য আমরা অনুভব করি কিন্তু তাহাকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না, তেমনি যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে রসসৃষ্টি করে সে আপন স্বাচ্ছন্দ্যে আপন রচনা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা আমরা তাহাকে অল্পই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি।

একি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ',
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ' ?
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীত স্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।

* * * *

সে মায়া মূরতি কি কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার,—
দেখে তুমি হাস' বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি।

তাঁহার Personality গ্রন্থে তিনি বলেন, "For Art, like life itself, has grown by its own impulse, and man has taken his pleasure in it without definitely knowing what it is. And we could safely leave it there, in the subsoil of consciousness, where things that are of life are nourished in the dark."

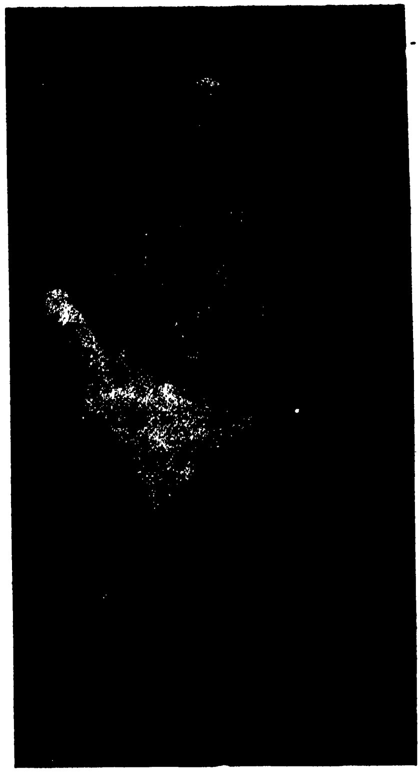
কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যাহা সূক্ষ্ম, যাহা নিভৃতে অন্তর্লীন হইয়া রহিয়াছে, যাহা গোপনে রহস্যপুরে আপন মন্ত্রজাল সৃষ্টি করিতেছে, তাহাকে আমরা বিশ্বাস করিতে চাই না; অন্তঃপুরবাসিনীকে হাটের মাঝে আনিয়া আলো ফেলিয়া সকলের সম্মুখে তাহার ফটোগ্রাফ্ তুলিতে না পারিলে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমাদের সংশয় হয়, কারণ আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি।

শিল্প সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন বিচার উঠিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানা লোকে নানা আদর্শ স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন এবং যাহা আপন স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের গোপনে অন্তর্লোক হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহাকে আমাদের মুঠার মধ্যে আনিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রজাপতির সৃষ্টির ন্যায় কবির সৃষ্টিও যে অলৌকিক এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু

পশ্চিম সাগর হইতে মেঘবিন্দু উত্থিত হইয়া আমাদের দেশে আজ করকাবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলেন যে সর্ব্বহৃদয়-সম্বন্ধ হইলেই তাহাকে আর্ট বলা চলে; কেহ বলেন আর্ট জীবনের ব্যাখ্যা; কেহ বলেন আর্ট, দৈনন্দিন সমস্যার সংশয় দূর করিবে; কেহ বা বলেন আর্ট জাতীয় চিত্তের অভিব্যক্তি। বাহির হইতে শিল্পসৃষ্টির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলেই বিপদ অনিবার্য্য।

শিল্প সৃষ্টির কোন লক্ষণ দিতে গেলেই এই প্রশ্ন উঠে যে কোন্ লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া লক্ষণ রচনা করিব। একটা স্থির রথচক্রকে বর্ণনা করিতে গেলে সেই চক্রের নেমি, অক্ষ প্রভৃতির ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধের বর্ণনা করিতে হয়। কিন্তু ৬০ মাইল বেগে যে রথচক্র ছুটিয়াছে তাহার বর্ণনা দিতে গেলে তাহার গতির পরিমাণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নেমি ও অক্ষের মূল্য ক্ষীণ হইয়া যায়। যে শিল্পসৃষ্টি আপন স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে ছুটিয়াছে, যে ঝরণার জল সানুগাত্র দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঝর্ঝর নিনাদে ফেন ভঙ্গিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কোনও দেশ-কালের ব্যবস্থার মধ্যে, কোনও বিশেষ স্থানীয় প্রয়োজনের বন্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা দুরূহ হইয়া উঠে। কোন প্রাণীর লক্ষণ দেওয়া যায় কিন্তু কোন প্রাণধর্ম্মের লক্ষণ দেওয়া দুষ্কর। এ সমস্ত স্থলে, লক্ষণ দিতে গেলেই তাহার স্ফূর্ত্ত রূপকে তার স্ফূর্ত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মৃত করিয়া লক্ষণ দিতে হয়। এইজন্য আর্টের লক্ষণ মেলা সুলভ নহে।

আর্টের কোন লক্ষণ না দিতে পারিলেও নেতিমুখে তাহার স্বরূপের বর্ণনা দেওয়া চলে। আর্ট আর কোন বস্তুর উপায় নহে; ইহা কোন সামাজিক বা কোন দৈশিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় নহে, কারণ অন্য-নিরপেক্ষভাবে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। দেশে প্রচুর ম্যালেরিয়া, লোকে কুইনাইন খাইতে চাহে না, কবি যে কুইনাইনের গান বাঁধিয়া কুইনাইন খাইতে লোকদের প্ররোচিত করিবেন এমন জবরদস্তি কবির উপর করা চলে না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে Art for Art's sake. অর্থাৎ শিল্প সৃষ্টি আর কাহারও অপেক্ষা রাখে না। এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে একটা মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে যে বিনা প্রয়োজনে আনন্দ অনুভব করিবার আমাদের কোন অধিকার আছে কি না। অন্য কোন প্রমাণ লীলার মধ্যে অবতরণ না করিয়াও আমাদের অধ্যাত্মলোকের শিল্পসৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা এ কথা বলিতে পারি যে হৃদয়-নিস্যন্দী আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইবার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। যদি মানুষের এ অধিকার না থাকিত তবে আমাদের অন্তরাত্মার এই আনন্দ সৃষ্টি ব্যর্থ হইত। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা অকুতোভয়ে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে রসই কাব্যের প্রাণ এবং এই রস কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উপকরণ নয়। এই রসোল্লাস অলৌকিক; লৌকিক কোন বন্ধনের মধ্যে ইহাকে বাঁধা যায় না। এইখানেই কবি ও প্রজাপতির সৃষ্টির



শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী—ইঁহার বিবাহের পর বৎসর রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়—বয়স ৯১ বৎসর)

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

পার্থক্য। এইখানেই পশু ও মানুষের পার্থক্য। পশুর সমস্ত বৃত্তি তাহার প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূলে ধাবিত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে অন্তর্য্যামীর এমন একটা স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বতন্ত্র আনন্দ-সৃষ্টি সম্ভব যাহা কোন দৈহিক বা জৈব প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ নহে। মানুষের মধ্যে তাহার

ইন্দ্রিয় বৃত্তি, তাহার জৈব বৃত্তি, তাহার মনন বৃত্তি অতিক্রম করিয়া আর একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত্তির নির্ঝর আছে, সেইটাই অলৌকিক রসসৃষ্টির নির্ঝর। মনুষ্য জীবনের ইহাই প্রধান রহস্য। মানুষের মধ্যে ভয় আছে, শোক আছে, ক্রোধ আছে, বিস্ময় আছে, জুগুপ্সা আছে, শৃঙ্গার-বৃত্তি আছে এবং সে সমস্ত বৃত্তিগুলি মানুষের আত্মরক্ষার সঙ্গীতে মুখর। আবার এই বৃত্তিগুলিই আর একটা রস-ধারায় এমন করিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে যেখানে ভয়ে ভীতি নাই, ক্রোধে দ্বেষ নাই, শোকে দুঃখ নাই, শৃঙ্গারে আসক্তি নাই। এখানে একটা নূতন মূর্চ্ছনায় রসের অন্তর্লোক এমন করিয়া উদ্ভাসিত হয় যে সকল বৃত্তির মধ্য দিয়াই আনন্দের একটা প্লাবন বহিয়া যায়। এইখানেই মানুষ তাহাকে প্রয়োজনের গণ্ডী হইতে মুক্ত করে। যে যুদ্ধ করিতে যায় সে চায় যে কাড়া-নাকাড়ার বাজনায় তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, যে দেব-পূজা করিতে চায় সে চায় এমন একটা মন্দির করিবে যাহাতে তাহার হৃদয় ঔদাত্ত্য ও মহত্বের ভারে আপনিই অবনত হইয়া পড়ে। সে চায় প্রোদ্ভাসিত ধূপ গন্ধে, বিচিত্রবর্ণের পুষ্প সম্ভারে, তাহার নিভৃত অন্তঃস্থল প্রফুল্ল হইয়া উঠুক। মানুষের সমস্ত বৃত্তির মধ্য দিয়া মানুষ যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহা অনুভব করিয়া হৃষ্ট হইতে চায়। আমাদের যেটুকু ধনের প্রয়োজন শুধু সেইটুকু পাইলেই আমরা সুখী হই না, আমরা চাই ধনী হইতে। যেটুকু জ্ঞানে আমাদের চলে সেইটুকুতেই আমরা সুখী হই না, আমরা চাই জ্ঞানী হইতে। আমরা যে আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বড়, ঐটুকু অনুভব করিতে না পারিলে আমরা আমাদিগকে তুচ্ছ মনে করি। নানাবিধ তথ্যে আমাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিয়া আমরা শান্তি পাই না, আমরা চাই নূতন কিছু করিতে, আমরা চাই সৃষ্টি করিতে। যাহা আছে তাহাতে আমাদের কুলায় না, নিত্য নূতন উপকরণ সৃষ্টি করিলে তবে আমাদের আনন্দ।

এই পৃথিবীর নিকট যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া সন্নিহিত হই, তখন দেখি বর্ণ গন্ধ স্পর্শ, কিন্তু বৈজ্ঞানিকও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই পৃথিবীর সন্নিহিত হন কিন্তু এই বর্ণ গন্ধ স্পর্শের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তিনি ব্যস্ত থাকেন ইহাদের অন্তর্নিহিত স্পন্দন শক্তির পরিচয় নির্ণয়ে। স্পন্দাত্মক যাহা কিছু বহির্জগতে থাকুক না কেন, তাহার সহিত বর্ণ গন্ধ ও সঙ্গীত লোকের কি সম্পর্ক তাহা বিজ্ঞান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে না। বিজ্ঞান বলে, এই পরিচয়ের স্পন্দনকে লোকে দেখে লাল, এই পরিচয়ের স্পন্দনকে লোকে দেখে পীত, কিন্তু পীত ও লাল লইয়া বৈজ্ঞানিকের কোন ব্যস্ততা নাই, তাহার আদর্শ ইহাদের আভ্যন্তরীণ স্পন্দ-সত্তা লইয়া। কিন্তু আমাদের মনোলোক এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা লইয়া, এই বর্ণ গন্ধ গান লইয়া, নিরন্তর ব্যস্ত থাকে। ইহাদের অন্তরালে কি স্পন্দ শক্তি আছে তাহার পরিচয় আমরা সাধারণ ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না। তাহাদের পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিকে যন্ত্রের মধ্য দিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়। এই জগতের রূপ শব্দ গন্ধ প্রভৃতি নিরন্তর আমাদের সম্মুখীন হইয়া আমাদের অন্তরের বীণাকে ঝঙ্কৃত করিয়া, আমাদের মধ্যে নিরন্তর রসসৃষ্টি করিয়া থাকে, সেইজন্য মানুষের সহিত আমাদের পরিচয়ে আমরা যেমন নিরন্তর তাহার সহিত আমাদের প্রীতি ও স্নেহের বিনিময় করিয়া থাকি, এই জগতের সহিত পরিচয়েও আমরা তেমনি আমাদের প্রীতির স্পর্শে এই জগৎকে অভিষিক্ত করিয়া থাকি। আমাদের সহিত এই প্রীতির সম্পর্কে চেতনাবিহীন বৃক্ষ বনস্পতি প্রভৃতি আমাদের প্রতি স্নেহ বিকীরণ করে কিনা, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের ব্যবহারে আমরা তাহাদিগকে যেন মনুষ্যলোকের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করি। শকুন্তলা নাটকে, শকুন্তলা যখন আলবালে জলসেচন করেন তখন তাহার মনে হয় "তুবরাবেদি বিঅ মং কেসর রুক্খও বাদেরিদ পল্লবাঙ্গুলীহিং" বাতেরিত পল্লবাঙ্গুলী দ্বারা কেসর বৃক্ষটা যেন আমাকে আমন্ত্রণ করিতেছে। আবার শকুন্তলা বলিতেছেন, 'হলা রমণীএ কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বদিঅরো সংবুত্তো জং ণবকুসুমজোব্বণা বনজোসিণী বদ্ধ-পল্লবদাএ উবভোঅক্খমো বালসহআরো'। অর্থাৎ অতি রমণীয় সময়ে এই লতাপাদপযুগলের মিলন ঘটিয়াছে, এই বনজ্যোৎস্না লতাটী যেমন নব কুসুমে যৌবনবতী হইয়াছে তেমনি এই তরুণ সহকার বৃক্ষটীও বহু পল্লব বিশিষ্ট হওয়াতে ইহাকে উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কালিদাসের সমস্ত মেঘদূত কাব্যটীতে প্রকৃতি কেমন সচেতন হইয়া প্রকাশ পায় তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতিকে

এমনি আত্মীয় করিয়া দেখিতে গেলে তাহাকে আমরা আমাদের স্বজাতীয় বলিয়া মনে না করিয়া পারি না। আমরা যেমন আমাদের অন্তর্লোকে সুখ ও দুঃখের রসে নিরন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া চলিয়াছি আমাদের সম্মুখস্থ প্রকৃতিও যেন তেমনি আনন্দ-লীলায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। এই দৃষ্টিতে বহির্লোককে দেখাকে কবি বলেন তাহাদের personality স্বীকার করা।

The world appears to us as an individual and not merely as a bundle of invisible forces. For this, every body knows, it is greatly indebted to our senses and our mind. This apparent world is man's world. It has taken its special feature of shape, colour and movement from the peculiar range and quality of our perception. It is what our sense limits have specially acquired and built for us and walled up. Not only the physical and chemical forces but man's perceptual forces are its potent factors—because it is man's world and not an abstract world of physics and meta-physics.

কবি বলেন যে আমাদের অন্তরের জারক রসে আমাদের অনুভূতির অপরোক্ষ চেতনা সিঞ্চনে আমরা বহির্জগৎকে নিরন্তর চেতনাময় করিয়া তুলিয়া তাহাদের সহিত ভাব বিনিময় করি এবং তাহাদের অধ্যাত্মলোকের সামগ্রী করি। যতক্ষণ বহির্জগৎকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করি ততক্ষণ তাহারা অতিথি মাত্র; কিন্তু যখনই আমাদের অন্তরের রসের মন্ত্র আমাদের রসলোকে তাহাদের সঞ্জীবিত করিয়া তোলে তখন তাহারা হয় আমাদের রসের সামগ্রী, আমাদের বন্ধু। বহির্লোকের সহিত অধ্যাত্মলোকের এই রসাভিষিক্ত পরিচয় যত নিবিড় হইয়া উঠে, ততই মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে পারে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে সূর্য্য চন্দ্র তারার সমস্ত গতাগতির বিবরণ সুনিবদ্ধ সত্যরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তথাপি তাহা সাহিত্য নহে, কিন্তু প্রভাতে অরুণোদয় কিংবা সন্ধ্যায় অস্তাচল চূড়াচ্ছটার বর্ণনা সাহিত্য, কারণ তাহাতে সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত আমাদের অন্তরে কি আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে তাহারই পরিচয় দেওয়া হয়। সূর্য্যের সহিত এই বান্ধবতার পরিচয় একটা নূতন সৃষ্টি। ইহা যেন দুইটা অন্তরঙ্গ চেতনের নিবিড় আলিঙ্গন। উপনিষদে লিখিত আছে, ন বা অরে মৈত্রেয়ি বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি—বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় নয়, আমি বিত্তকে চাই বলিয়া বিত্ত প্রিয়। আমাদের ধনের মধ্যে আমরা আমাদের অনুভব করি এবং এই আত্মপ্রীতিই ধনপ্রীতি রূপে প্রকাশ পায়। যখন বাহিরের জগৎ আমাদের অন্তরকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় তখন সেই নাড়ার মধ্যে আমাদের চেতনা উদ্দীপ্ত হইয়া আনন্দরূপে প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিক যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেন



৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র)—শান্তিনিকেতনে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সুর রচনা করিতেন

সেটা রূপরসের আনন্দময় দৃষ্টি নয়, তাহা রূপ ও রসের অন্তর্নিহিত স্পন্দলোকের গাণিতিক পরিমাণ-পরিচয়ের মধ্যে নিবদ্ধ। কবি বা শিল্পী তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তিনি যে বাহিরের জগৎকে কি চোখে দেখিয়াছেন, কি আনন্দে তাঁহার হৃদয় শিহরণময় হইয়াছে তাহারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। একটা গোলাপ কি জিনিষ, তাহার ক'টা পাপড়ি, কি রকম তার রং, তাহার গাছের পাতা কি রকম, এ একজাতীয় পরিচয়, আর গোলাপটা আমার কেমন লাগিয়াছে, তাহা অন্যজাতীয় পরিচয়। এই দ্বিতীয় জাতীয় পরিচয়, কোন ঘটনার পরিচয় নহে, কোন প্রাকৃতিক

নিয়মের পরিচয় নহে, ইহা অনুভূতির পরিচয়। এ সেই জাতীয় পরিচয় যাহাতে বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়া আমরা আমাদের নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকি। এই জন্যই এই পরিচয় অন্য সত্য হইতে এত বিভিন্ন জাতীয়। ইহার প্রামাণ্য স্বতঃ সংবেদ্য। বাহিরের জগতের ঘটনার প্রামাণ্য তাহার অবাধিতত্বের উপর নির্ভর করে এবং সেই জন্য তাহাদের প্রামাণ্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। কিন্তু অনুভবের প্রামাণ্য অন্য কিছুর উপর অপেক্ষা করে না। তাই কবি বলিয়াছেন,

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

আমাদের অন্তরের অনুভূতি তাহার স্বাচ্ছন্দ্যে এবং তাহার লীলায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া আনন্দ অনুভব করে, তাহার পিছনে কোন প্রয়োজনের তাগিদ নাই। মোগলেরা যখন ভারতবর্ষে রাজ্য করিত তখন অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক যুদ্ধ, অনেক প্রিয় অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তথাপি তাহারা ছিল দেশের মানুষ। এই দেশকে তাহারা ভালবাসিত এবং অন্তরের স্বপ্ন শিল্পের ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। কিন্তু ইংরেজ আসিয়াছে এখানে বাণিজ্য করিতে, তাই ইংরেজ যখন দরবারী ঠাট চালাইতে চেষ্টা করে তখন তাহার মধ্যে প্রাচীন বাদশাহী ঔদার্য্যের পরিবর্ত্তে শুষ্ক আফিসের তুচ্ছতা প্রকাশ পায়। ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষের প্রকৃতি আনন্দের ধন নহে, তাহার কাছে ইহা একটী বিরাট ব্যবসার ক্ষেত্র মাত্র। তাই ইংরেজ এদেশে প্রাসাদের পরিবর্ত্তে গুদাম নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

আমাদের অন্তরের অনুভূতিকে আমাদের অধ্যাত্মলোকের রসস্পর্শকে আমাদের আনন্দ পুরুষের স্বচ্ছন্দ ব্যক্তিকে প্রকাশ করার ভঙ্গিকে আর্ট বলা যাইতে পারে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি আর্টের উদ্দেশ্য, কিন্তু কবিগুরুর মতে এ কথা ঠিক নহে। যে উপায়ে বা প্রকারে, যে দ্বার পথে আমাদের অধ্যাত্মলোক আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তি তাহার রসালোড়নের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাই আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সৌন্দর্য্যকে উদ্দেশ্য বা উপেয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না, সৌন্দর্য্য উপায় মাত্র। আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তির অনুভব কোন বিশ্লেষণ নয়; তাহা রসের মূর্ত্ত স্পর্শ। সেই জন্যে কবি আপনাকে ছবিতে ও গানে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবি বলিতেছেন—

The principal object of art being the expressisn of personality and not of that which is abstract and analytical, it necessarily uses the language of picture and music. This has led to a confusion in our thought that the object of art is a production of beauty; whereas beauty in art has been the mere instrument and not its complete and ultimate significance.

সচ্ছিদ্রকুম্ভে জল ঢালিলে যেমন ঢালার শেষ হয় না পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রে মতদ্বন্দ্বের শেষ নাই। কেহ বলেন কবির বক্তব্য বিষয়ই তাহার আর্টের পরিচয়; কেহ বলেন বক্রোক্তিই কাব্যের জীবিত; কেহ বলেন অলঙ্কারবাহুল্যই কাব্যের শিল্পত্বের পরিচায়ক। বস্তুতঃ এই জন্যই এ সমস্ত তর্ক ভিত্তিবিহীন যে, কোনও বহিঃকল্পিত উদ্দেশ্য শিল্পের যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মানুভব যখন আপন স্বাচ্ছন্দ্যে স্বপ্রকাশ হইয়া উঠে তখনই তাহা হয় শিল্প, সেই শিল্পের ভঙ্গির মধ্যেই বক্রোক্তি থাকিতে পারে, অনুপ্রাস থাকিতে পারে। উপমা থাকিতে পারে, বস্তু ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে; কিন্তু সেগুলি আত্মানুভবের স্বপ্রকাশের ভঙ্গি মাত্র; আর্টের আত্মপ্রতিষ্ঠায় উপায় বা অবয়ব মাত্র, তাহারা আর্টের নিয়ামক ধর্ম্ম নহে।

লক্ষণ দিতে গেলেই লক্ষ্য বস্তুর বিশেষ বিশেষ প্রাণপ্রদ ধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক করিতে হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে আর্টের স্বরূপ থাকে না। এইজন্য আর্টের কোন প্রাণপ্রদ ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া আর্টের লক্ষণ দেওয়া চলে না। আর্টের মধ্যে এমন একটী ঐক্য আছে যে বিশ্লেষণ করিতে গেলেই সে ঐক্য ব্যাহত হয়। যখন কোন পানকরস আমরা পান করি তখন সেই তরল দ্রব্যের মধ্যে শর্করা, এলা, মরিচ প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুজাত মিশ্রিতভাবে রহিতে দেখিয়া থাকি কিন্তু পান করিবার সময় তাহাদের পৃথক আস্বাদগুলি একত্র নিমগ্ন হইয়া একটী অখণ্ড অপূর্ব্ব আস্বাদে প্রকাশ পায়। আমরা যখন দুগ্ধ পান করি তখন দুগ্ধের মধ্যে যে বহুবিধ দ্রব্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জড়িত রহিতে দেখি তাহাদের প্রত্যেকের আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, একটী অখণ্ড রসই আমরা আস্বাদ করিয়া থাকি,

তেমনি আর্টকে বিশ্লেষণ করিলে যে যে উপাদান পাওয়া যায়, সেই সেই উপাদানের সমষ্টিতে বা পৃথক্‌গ্রহণে আর্টকে পাওয়া যায় না। আর্ট সমষ্টি নহে, আর্ট একটা অখণ্ড ঐক্য; আর্ট একটা অখণ্ড ঐক্য বলিয়াই তাহার অন্তর্বর্তী বিভিন্ন উপাদানের সঞ্চয়নে আর্টের পরিচয় হয় না।

বাহিরের জগতের সহিত, তরু পুষ্প ও বিহঙ্গের সহিত যখন আমরা একান্ত বন্ধুভাবে সন্নিহিত হই এবং আমাদের অন্তরের রসে বাহিরের জগৎ অভিষিক্ত হইয়া উঠে, তখন বাহিরের জগতের যে প্রাণপ্রদ ধর্ম্মটী আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে সেই আলোড়ন যখন স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশে নির্ঝর-ধারায় নামিয়া আসে তখনই তাহা হয় আর্ট। যে যথার্থ শিল্পী নয়, সে যদি একটী গাছ আঁকিতে যায়, তবে তাহার অনুলিপি মাত্র করিবে, কিন্তু কোন শিল্পী যদি সেই গাছ আঁকে তবে তাহাতে অনুকরণের বাহুল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের চেতনার অনুরণনে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এই জন্যেই আর্টের মধ্যে তথ্যের বাহুল্য নাই অথচ ব্যঞ্জনার প্রাগ্‌ভারে তাহা ভূয়িষ্ঠ। শিল্পীর অন্তরের সহিত বাহ্য জগতের অন্তরের যে সন্নিধান ও প্রসন্নতা আনন্দে প্রচুর হইয়া উঠে তাহারই আবেগ আর্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা যায় না যে, আর্টের অভ্যন্তরে কোন তত্ত্ব নাই বা সত্য নাই। আর্টের মধ্যে যে সত্য আছে তাহা আমাদের জীবনের অনুভবের সত্য। সে অনুভব তথ্য নয়, অনুকৃতি নয়, তাহা আমাদের অন্তরের আলোকে নির্ভাসিত। কবি মধ্য যুগের কোন মহিলা কবির একটী কবিতা ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

I salute the life which is like a sprouting seed,
With its one arm upraised in the air, and the other down in the soil;
The life which is one in its outer form and its inner sap;
The life that ever appears, yet ever eludes.
The life that comes I salute and the life that goes;
I salute the life that is revealed and that is hidden;
I salute the life in suspense, standing still like a mountain,
And the life of the surging sea of fire;
The life that is tender like a lotus, and hard like a thunder-bolt.



রবীন্দ্রনাথ —ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, 'কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' যদি এই আকাশ আনন্দময় না হইত তবে আমরা বাঁচিতাম কি করিয়া? শিল্পীর চক্ষুতে সমস্ত প্রকৃতি আনন্দময়। প্রকৃতিকে আপন আনন্দের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারাই শিল্পীর সার্থকতা।

আমাদের অন্তরের মধ্যে বহির্জ্জগতের যে একটী আনন্দময় পরিচয় আছে, শিল্পী তাহারই আভাষ দিতে চেষ্টা করেন—

There falls the rhythmic beat of life and death :
Rapture wells forth, and all space is radiant with light.
There the unstruck music is sounded ; it is the love music of three worlds.
There millions of lamps of sun and moon are burning ;
There the drum beats and the lover swings in play.
There love songs resound, and light rains in showers.

পাখীও আকাশে ওড়ে এবং বিমানপোতও আকাশে ওড়ে—কিন্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে এ উভয়ের পরিচয় এক নহে।

বিধাতার দান পাখীদের ডানা দুটী।
রঙ্গের রেখায় চিত্র লেখায় আনন্দে উঠে ফুটি ;
তারা যে রঙীন পান্থ মেঘের সাথী।
নীল গগনের মহা পবনের যেন তারা এক জাতি।
তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান আকাশের সুরে সাধা।
তাই প্রতিদিন ধরণীর বনে বনে
আলোক জাগিলে এক তানে মিলে তাহাদের জাগরণে।
মহাকাশ তলে যে মহা শান্তি আছে—
তাহাতে লহরি কাঁপে থরথরি তাদের পাখার নাচে।
আর বিমান-পোতের কথা বলা যায়,
তারে প্রাণ দেব করে নি আশীর্ব্বাদ।
তাহারে আপন করেনি তপন মানেনি তাহারে চাঁদ।
আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি'।
কর্কশ স্বরে গর্জ্জন করে বাতাসেরে জর্জ্জরি'।
আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে,
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ আলোকে হানিছে অট্ট হাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে।
অশান্তি আজ উদ্যত বাজকোথাও না বাধা মানে ;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা,
আকাশে আকাশে বিরাট বিলাসে জাগাইল বিভিষিকা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের হিমালয়ের সানুতলে শালকুঞ্জের ছায়াতলে নীবারক্ষেত্র বেষ্টিত নিভৃত তপোবন-কুঞ্জে মানুষ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মকে চারিদিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু য ওষধীষু যো বনস্পতিষু যো বিশ্বম্ ভুবনম্ আবিবেশ, অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তখন হইতেই ভারতবর্ষীয়দের সাহিত্যে ও শিল্পে এই ভুবনের অন্তর্য্যামী ও মানুষের অন্তর্য্যামী এই উভয়ের মধ্যে চিত্ত বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে। এই যে উভয় জগতের মধ্য দিয়া একই অন্তর্য্যামীর আত্ম-বিনিময়ের প্রকাশভঙ্গি ইহাই আর্টের লীলা নিকুঞ্জ। মানুষ নিরন্তর অনুভব করে যে—যে মুষ্টিমেয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে তাহার জীবনযাত্রার সঙ্গতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহার মহত্ত্ব। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার প্রতি কবিদের কোন লক্ষ্য নাই। তাঁহারা চান ধীরোদাত্ত, ধীরোললিত নায়ক ; বড় বড় রাজাদের জীবন ব্যাপার লইয়া তাহাদের নাট্য ; জীমূতবাহনের ন্যায়, রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষদের অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের চরিত্র অঙ্কন পদ্ধতি। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব এবং ঔদাত্ত্য আছে সকল মানুষকে অতিক্রম করিয়া যে তেজোভিভাবিত্ব, অধৃষ্যত্ব ও অভিগম্যত্ব আছে, যাহার সম্মুখে আসিয়া কবি অনুভব করেন যে তাঁহাদের চরিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা তাঁহার চাপল্য মাত্র—"রঘুণাম অন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্ বিভবোঽপি সন্। তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ॥" সেই মহৎ চরিত্রকে অঙ্কিত করিয়া কবি আপনাকে ধন্য মনে করেন। মানুষের মধ্যে যাহা কেবলমাত্র সর্ব্বজীব-সাধারণ ধর্ম্ম তাহা আমাদের অন্তরকে তেমন স্পর্শ করে না, যেমন স্পর্শ করে তাহাদের অতিমানুষ ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটী বাড়তি মানুষ আছে, একটী অতিমানুষ আছে। বেদের ঋষি বলিয়াছেন

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্ব অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যং
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।

আমাদের এই দশাঙ্গুলি পরিমিত হৃৎপুণ্ডরীকের মধ্যে যিনি বাস করিতেছেন তিনিই সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ। তিনিই এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন

ও জন্মমরণের মধ্য দিয়া আপনার বিচিত্র রূপ প্রদর্শন করিতেছেন এবং তিনিই অমৃতময় হইয়া সকল সত্যের পরম নিদান হইয়া রহিয়াছেন। মানুষ আপনার মধ্যে এই অজর অমরকে প্রত্যক্ষ করে তাই সে প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করিতে চায়, তাই সে এমন বল চায়—যে বলে তার প্রয়োজন নাই, এমন জ্ঞান চায়—যে জ্ঞানে তার কোন আবশ্যকতা নাই—এমন ধন চায় যে ধন সে বিলাইয়াও শেষ করিতে পারিবে না। প্রতিনিয়ত মৃত্যু দেখিয়াও সে চায় সে অমর হইবে। দেহে যদি অমর না হইতে পারে তবে অন্ততঃ কীর্ত্তিতে সে অমর হইবে। অষ্টাদশ বর্ষের রাজস্ব ব্যয় করিয়া সে তোলে সমুদ্র প্রান্তরে কোনারকের অভ্রভেদী মহামন্দির, মিশরের নীল নদীতীরে সে তোলে অভ্রভেদী পিরামিড্, সে লিখিয়া যায় তার ইতিবৃত্ত কোটি কোটি ইষ্টক ফলকে। প্রতিদিনের জনতার মধ্যে গবাক্ষবিহীন মন্দির তুলিয়া সে তাহার আপন পার্থক্যের অনুভব, আপন স্বতন্ত্রতার অনুভব, আপনার নিঃসঙ্গতার অনুভব সূচনা করিতে চায় তার দেবমন্দিরে। মন্দিরের ঘণ্টা-ধ্বনি প্রতিনিয়ত লোককে এই কথা জানাইয়া দেয় যে মহাশূন্যতা পরিপূর্ণ করিয়া এক মহান আহ্বান ধ্বনি তার অন্তরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। মানুষের মধ্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন বৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া এই যে এক মহামানব, মহাদেব, মহা অন্তর্য্যামী অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টিতে নিরন্তর এই বাহ্য জগৎ অলৌকিক জগতে পরিণত হইতেছে। তিক্ত, কটু, কষায়, লবণাম্ল রস মধুর রসের আপ্লাবনে পূর্ণ হইতেছে। এই আপ্লাবন ভূমি আর্টের ভূমি। এই অমৃতময় পুরুষের আস্বাদনই আর্ট। সেই জন্য আর্ট সৃষ্টি করে এবং আর্টের যে আস্বাদ আমরা গ্রহণ করি তাহা অমৃতত্বের রেখায় অভিনন্দিত। তাই যাহা তুচ্ছ, যাহা ক্ষণিক, যাহা মুহূর্ত্তের তাগিদের জিনিষ, যাহা প্রয়োজনের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত্ত, তাহাকে লইয়া আর্ট সফলকাম হইতে পারে না। অমৃতের আস্বাদন শাশ্বতের স্পর্শে দীপ্ত। কোন প্রাচীন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে বিশ্বং তৎপরিবর্ত্ততে।

অপার কাব্য সংসারে কবিই প্রজাপতি, তাহার যাহা স্বানুভূত প্রত্যক্ষ তাহাতেই বিশ্ব পরিবর্ত্তিত হয়। উপনিষদের কবি বলিয়াছেন—

বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভিতরে বাহিরে এই অমৃতময় পুরুষের স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কাব্য, তাঁহার শিল্প, তাঁহার সমস্ত চিত্তস্ফুরণ এই মহা অমৃতের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার বাণী চিরন্তন, অক্ষয় ও শাশ্বত। ভিতরে বাহিরে তিনি এই অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত উচ্ছ্বাস ইহারই আনন্দে উদ্বেলিত। প্রথম যেদিন প্রভাত-উৎসব লেখেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন,

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

এই একটী ভাব সমস্ত জীবন বহিয়া গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিয়াছিল; ইহারই মধ্যে, এই প্রকৃতির মধ্যে, এই মানুষের মধ্যে ভিতরে বাহিরে তিনি অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পরমগুরু রবীন্দ্রনাথের দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়া ভিতরে বাহিরে অন্তর্য্যামীর যে আত্মপ্রকাশ, যে কাব্য সঙ্গীত চিত্র ও ভাবপ্রবাহের আনন্দ লীলা নির্ঝরের ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহাই রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি শরীরী হইয়াও অশরীরী, ক্ষয়িষ্ণু হইয়াও অক্ষয়, মৃত্যুর পাশগত হইয়াও তিনি মৃত্যুঞ্জয়।

রবি-অর্ঘ

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

হে অমৃতলোকযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়ী কবি
প্রাণে তব অক্ষয় আসন
বেদনা-মথিত বুক তবু আজি দেব,
প্রবোধের না মানে শাসন!
এ মহাপ্রয়াণ তব নহে আকস্মিক
ভাবি তাহা, লভি না আশ্বাস।
হইলেও প্রত্যাশিত, তীব্র অশনির
দাহ জ্বালা পায় কভু হ্রাস?

বিশ্বের কি নিধি গেল অঞ্চল টুটিয়া,
কত শূন্য ভারতের হিয়া,
গাঢ় সমবেদনায় পাতায়ে মিতালি
তাহারা তা লউক বুঝিয়া।
আমি শুধু এই জানি, তুমিই মোদের
প্রত্যুত্তর সকল গ্লানির
প্রেম দিয়া, শ্রদ্ধা দিয়া, আঁখি জল দিয়া
গাঁথা মালা, লহ পূজারীর।

অমর রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ভারত গগনে রবি ডুবে গেল ; বাংলার হ'ল ইন্দ্রপাত !
সোণার দেউটি ধীরে নিভে গেল--বাণীমন্দিরে ঘনালো রাত !
আজি শ্রাবণের ঘনঘটা আড়ে ধূর্জ্জটি জটা নৃত্যপর
ডম্বরু ধ্বনি চৌদিকে শুনি, শঙ্কর নাচে ভয়ঙ্কর !
সম্বর তব ত্র্যম্বক জ্বালা, করোটির মালা বাড়ায় ভয়
রবিহীন এই ভারত গগনে এনোনা তোমার বিপর্য্যয় !
পূর্ব্ব তোরণে উঠে রবি, করে সর্ব্ব ভুবনে আলোক দান
বিশ্ব সভায় বাংলার মুখ উজলি' এ কবি গাহিল গান !
জগৎ সভায় ভারতবর্ষ যাঁহাদের নামে আদর পায়
ভারতের সেই মহাকবি আজ চিরতরে যোগ নিদ্রা যায় !
অমিত তেজের বহ্নি জ্বালায়ে অগ্নিহোত্রী তাপসবর
উন্নতদেহে কীর্ত্তি মুকুট ধরিয়া আজিকে লোকান্তর !
এ কবি ছিল না ভাবের বিলাসী, স্বপ্নের লুতা তন্তুবায়—
এই কবি ছিল বজ্রগর্ভা বাণীর জনক ঋষির প্রায়—
কবিতায় শোক করিতে আজিকে দীনতার লাজে যাই যে মরি
কোথা সেই ভাষা ভাষা-যাদুকরে যাহে প্রাণ ভ'রে আরতি করি !
"কবিগুরুদেব" আজিকে নীরব—কত মহা-প্রাণ-বিয়োগে যেবা
অনবদ্য সে বাণী দিয়েছিল—তাঁর তরে বাণী বিতরে কেবা ?
এ মহাকবির বিয়োগের মহা-ক্ষতির, হিসাব আজিকে নহে
আমরা দেখিব কবির বাণীর গর্ভে কি মহা বারতা রহে,
আমরা তাঁহার যোগ্য হইব, নীরবে নিয়ত সাধনা করি
অমর মোদের কবিগুরুদেব চিরদিন যেন একথা স্মরি !

মুক্ত-রবি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ডোবে নাই রবি উঠেছে যে রবি
ফুটেই র'য়েছে আলোর ফুল
অম্লান চির উজ্জ্বল ছবি
উদয়াস্তিমা চোখের ভুল।
নরী নৃত্যতি এই ধরিত্রী
নর্ত্তকী যেন ঘূর্ণি নাচে
সমুখে বাহিয়া পিছনে চাহিয়া
আঁখির সরমে প্রসাদ যাচে।
হেরি ঐ রবি প্রথম চাহিয়া
চক্ষু মেলিয়া বুঝিতে নারি
উদয় অরুণ অথবা করুণ
বিদায় বারতা চক্ষে তা'রি।
জবা কুসুমের তরুণ সোহাগ
রক্ত পরাগ পর্ণে ভরা
সেই পরাগের সুষমার ফাগ
পূর্ণ ক'রেছে বসুন্ধরা।
জলে জলে কত করে ঢল ঢল
লীলার কমল রবির প্রিয়া—
পরিমল ভার দিল সে তাহার
অর্ঘ্য রচিল মাধুরী দিয়া।
উদয়ারুণের পূর্ব্ব আভাস
পরে পশ্চিমে বিতরে আলো
ঘুরি দশদিক আর্দ্ধশতিক
দেশে মহাদেশে বাসিয়া ভালো।
সে রবির দীপ নিবাত প্রদীপ
বিশ্বভারতী দীপের শিখা
আবাহন করি নিখিল ভারতী
জ্বালে সে আলোর আরতি লিখা।
নব ভগীরথ জ্যোতিষ্ক রথ
ভূর্ভুব স্ব আলোকে ভরি
সসাগরা এই পৃথিবী তনয়
মনুজ বংশ ধন্য করি।
ভাস্বর অবিনশ্বর রবি
ভর্গস্বরতি বন্দনীয়
সাতকোটী সুত অভিষেক পূত
বঙ্গমাতার সঙ্গ প্রিয়।
রবিরে ঘুরিয়া রবিরে ঘিরিয়া
বেড়িয়া গভীর মায়ার জাল
মমতা মসীর অমা-তামসীর
পৌর্ণমাসীতে পাতিল কাল।
আঁখির নিমেষে মুক্ত রবির
অভ্র আবীর ছড়ায় ভূমে
রাহুর বাহুর বাঁধন কাটিয়া
স্বর্ণ কিরীট গগন চুমে।
ডোবে নাই রবি রবির কিরণ
ফুটায়ে তুলেছে আলোর ফুল
শাশ্বত সুবি ভাস্বর রবি
উদয়াস্তিমা চোখের ভুল।

চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিন্সিপাল শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

আট দশ বছর আগে প্রথম যখন ভারতবর্ষে সংবাদ এল যে ইংলণ্ডে, প্যারিসে ও জার্ম্মানীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে, তখন আমাদের স্বদেশবাসী অনেকেই খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলেন এবং অনেকেই ভেবেছিলেন যে খবরটা হয়ত ভুল। কেন না তাঁরা শুধুই জান্‌তেন যে গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথই ত ছবি আঁকেন। বোধহয় খবরের কাগজের রিপোর্টে গোল হয়েছে। তাঁরা মোটেই জানতেন না যে তাঁদের প্রিয় জগদ্বিখ্যাত কবি আবার একজন বড় চিত্রকর। তাঁর লেখনীর অমরদান, যা সারা জগৎকে চমৎকৃত করেছে, তাঁর নাটক দেখেও অনেকে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছেন—তাঁর গানে ও কাব্যে সারা বঙ্গদেশ মুগ্ধ হয়েছে—কেবল এই সবেরই সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁরা জান্‌তেন না যে মহাকবি তুলিতে রং চালাতেও পারেন। যাঁরা ভারতের এই ঋষি-কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরা কিন্তু আরও কিছু বেশী জানেন। আমার মত শিল্পকলার একনিষ্ঠ পূজারীদের কাছে তিনি ছিলেন একজন শিল্প-স্রষ্টা। কেবলমাত্র তাঁর গান ও কবিতাই যে আমাদের কল্পনালোকে সাড়া জাগিয়েছে, অন্তরকে স্পর্শ করেছে এবং আনন্দ দিয়ে কবির প্রাণের মানুষটির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে তা নয়। তাঁর আঁকা চিত্রাবলী থেকে তাঁর সৃজনী শক্তির প্রকাশ ও গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা সত্যিকার চিত্রশিল্পীদের কাছে এক নূতন মনের জগতের আবির্ভাব করিয়েছে। যদিও সর্ব্বসাধারণের কাছে এর সত্যিকার ভাব বোঝা একটু কষ্টকর, তবুও একটু নাড়াচাড়া করলে সহজেই ধরা পড়্‌বে, তা আমি জানি।

কবির জীবনী সকলেই জানেন। কলিকাতার একটি বহুশ্রেষ্ঠগুণান্বিত পরিবারে, যেখানে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম্ম অর্থ সবই বিদ্যমান, যে বাড়ী সদাসর্ব্বদা অভিনয়ে গানে মুখরিত, সেইখানে তাঁর জন্ম হয়েছিল। জোড়াশাঁকোর ঠাকুরবাড়ী গত ১৫০ বৎসর হতে সমস্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তীর্থক্ষেত্র। কবিগুরুর বাল্যজীবন ঐ অতিসুন্দর রূপ ও রসের আবহাওয়ার মধ্যে গঠিত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক আনন্দের পূজারীর দল, শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ, দেশ বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চাভিলাষী তরুণদল—সকলেই ঐ জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে মিলিত হতেন এবং পৃথিবীর সমস্ত ভাল ও বড় বিষয়ের চর্চ্চা করতেন। বিদেশের বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও চিত্রামোদী এই গোষ্ঠীতে যোগ দিতেন। কাকুজো ওকাকুরা,য়োকোয়ামা টাইকান্, কুমারস্বামী, রোথেন্‌ষ্টাইন্, রবিবর্ম্মা, স্যার জন্ উডরফ্, লর্ড কারমাইকেল, এড্‌উইন্ মণ্টেগু, লর্ড রোনাল্ডসে, স্যার জন্ হোম্‌উড, কারপ্রেস্, মিঃ ব্লাণ্ট, মিঃ পণ্টেন-মুলার প্রভৃতিও এই বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। বিদেশের চিত্রশিল্পীদের এই জোড়াশাঁকোর বাড়ীই তাঁদের ভারতবর্ষের বাড়ী ছিল এবং ঐখানেই বসে তারা বহু চিত্র এঁকে গিয়েছেন। সেই সব ছবি এই পরিবারের সকলেই খুব ভাল করে দেখ্‌তেন।

১৬ বছরের রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার মিউজিয়ম ও গ্যালারীগুলি তিনি খুব ভাল করে দেখ্‌তেন। তিনি আমায় একবার নিজে বলেছিলেন যে তাঁর ইংরেজ-চিত্রকর টার্ণারের ছবিগুলি সেখানে সব থেকে বেশী ভাল লেগেছিল। এই নিয়ে পরে আমার সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনাও হয়েছিল। এমন কি তিনি বল্‌তেন যে টার্ণারের ছবিতে যেমন নানা সময়ের সূর্য্যের অপূর্ব্ব আলোকরশ্মি দেখা যায় তেমন আর কোথাও তিনি দেখেন নি। এই কচি বয়স হতেই তাঁর চিত্রকলার উপর অনুরাগ বেড়েছিল। বাড়ীতে তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রত্যহ যাকে পেতেন, তাকেই সাম্‌নে বসিয়ে তার ছবি পেন্‌সিলে আঁকতেন। রবীন্দ্রনাথের বহু ছবি তিনি ছেলেবেলা হতেই এঁকে রেখে গিয়েছেন। সেই ছবির খাতায় রবীন্দ্রনাথও বহুবার নিজে আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন। বাল্যকাল হতে পাশের বাড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গভীর হৃদ্যতা ছিল এবং তিনি খুব আগ্রহেই তাঁদের চিত্র দেখে যেতেন ও তাঁদের উৎসাহ দিতেন। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ভাল এসরাজ বাজাতে

পারতেন। নূতন গান তৈরী হলেই পাশের বাড়ীতে এসে অবনীন্দ্রনাথকে বাজাতে বল্‌তেন এবং নিজে গাইতেন।

আমার যখন বয়স ১০ কি ১১, সে ১৯০৫ সালের শেষাশেষির কথা, আমি তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তখন সেখানে মাত্র ১৩।১৪টি ছেলে। গুরুদেবের প্রথম পুত্র রথীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায় গিয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই ঘরে পাশাপাশি থাকৃতাম। আমি তখন হতেই এই মহাকবির শিল্পানুরাগের বিষয় অবগত হই। সে ১৯০৭ কি ১৯০৮ সালের কথা, আশ্রমের হাতে লেখা পত্রিকায় ছবি এঁকে দিতাম। আশ্রমের ছুটির প্রারম্ভে নানা অভিনয়ে, শারদোৎসব, ডাকঘর, রাজা প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের জন্য যবনিকা ও দৃশ্যপট এঁকেছি জান্‌তে পেরে তিনি আমাকে খুব উৎসাহ এবং বাহবা দিয়েছিলেন। তখন হতেই তিনি আমার উপর দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে কবিগুরু আস্তে আস্তে নিঃশব্দে হেঁটে চলাফেরা করতেন। তাঁর আগমন বা আবির্ভাব চোখে না দেখ্‌লে সহজে বোঝা যেত না। আশ্রমে আমরা সব সময়েই সতর্ক থাকতাম, যে কখন তিনি হঠাৎ অজানিতে আমাদের ঘরে এসে পড়েন। ছাত্র ও শিক্ষক আমরা সবাই তখন সদাসর্ব্বদা ঐজন্য সাবধানে থাকতাম। একটি ঘটন আমার চিরকাল মনে থাকবে। তখন ১৯০৯ সালের চৈত্র কি বৈশাখ মাস। মাত্র অল্প কয়দিন গরমের ছুটির বাকী আছে। আশ্রমের বীথিকা ঘরে তখন থাকি। দুপুর বেলা ঝাঁ ঝাঁ রোদ। অসহ্য গরমে অনেকেই ঘুমুচ্ছে। আমি একটি বিলিতি ছবি বড় করে নকল করে তাতে একমনে বসে রং দিচ্ছি। মনে আশা সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল্‌ব। ছুটিতে বাড়ী যাবার পথে কলকাতায় সেটা বাঁধিয়ে একেবারে বাবার কাছে নিয়ে হাজির করব। তিনি চমকে যাবেন এবং ইচ্ছে তাঁর কাছ থেকে একটি ভাল ক্যামেরা আদায় করতে হবে। আঁকায় খুব ব্যস্ত ছিলাম ও এক মনে এঁকে যাচ্ছি, হঠাৎ কাঁধের উপর কার স্পর্শ। মুখ তুলে ফিরে চেয়ে দেখি গুরুদেব। তাঁর মৃদু হাস্যে মুখ উজ্জ্বল। বেশ আনন্দ তাঁর মুখে। আমি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কখন ঘরে ঢুকেছেন জান্‌তেও পারি নি। হয়ত সকলকে তিনি গোল করিতে মানা করেছিলেন। হেসে আমায় বল্লেন, "আয় তুই আমার সঙ্গে আয়। তোকে কিছু দেব।" তখন তিনি গেষ্ট হাউসের উপরের তলায় থাকতেন। আর নীচের তলায় থাকৃতেন দ্বীপুবাবু। আমরা বড় একটা সেদিকে যেতাম না। কেবল গুরুদেব যখন কিছু নূতন লেখা পড়ে শোনাতেন, তখনই যেতাম। আশ্রমে আমরা কেউ ছাতা ও জুতো ব্যবহার করতাম না। আমি সেই রোদের মধ্যে তাঁর পিছন পিছন চল্লুম। মনে মনে ভাবছি কি দেবেন? তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে উপরের ঘরে আসতে বল্লেন। তিনি তখন মাটিতে বসে—সাদা মার্ব্বেল পাথরের জল চৌকি সামনে রেখে লেখাপড়া করতেন। সেখানে বসে দেরাজ খুলে বার করলেন তিনি চমৎকার একটি কাল চামড়ার বাঁধাই সুন্দর ছবি আঁকার বই। তারপর সেখানি আমার হাতে দিলেন। এই খাতায় তাঁরই নিজের হাতের কয়েকটি পেন্‌সিল ও কালিতে আঁকা ছবি। তাতে গুরুদেবের স্ত্রীর একটি ছবিও ছিল। সব ছবিগুলি তাঁরই আঁকা। আর একটি ছিল—নদীর ঢেউয়ের উপর নৌকা ভাস্‌ছে, নৌকায় একটি সুন্দরী মেয়ে শুয়ে আছে। সেটা বোধ হয় "সোনার তরীর"ছবি হবে। আমাকে ঐ ছবিগুলি দেখিয়ে বল্লেন, "এই রকম পরিষ্কার পেন্‌সিলের লাইনে ছবি আঁকৃতে পারিস? ওসব বিলিতি ছবি না নকল করে এই রকম পেন্‌সিলে ও কালি-কলমের ছবি এঁকে এনে আমাকে দিস। যখন কল্‌কাতায় যাব, তখন তোর আঁকা ছবিগুলো আমি অবনের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাব"। বইখানির সঙ্গে দুচারটে পেন্‌সিল ও রবার ইত্যাদি দিলেন। আরো কিছু দেবেন বলে বই খাতা খুঁজলেন। বল্লেন, "আমার কাছে একটা কুমারস্বামীর Indian Drawingএর বই ছিল, সেটা ধীরেন নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয় নি, সেটা এখন কাছে থাকৃলে তোকে দিতাম। তুই দেখতিস্ তাতে ভাল লাইনের ড্রইং কাকে বলে। তুই বিলিতি ছবি কপি করিস নে। কপি করতে হলে দেশী ছবিই কপি কর। যা তুই এখন। আমাকে দেখাস কি আঁকিস, বুঝলি?" আমার যে কি আনন্দ সেদিন হয়েছিল তা বোঝানো কঠিন। আমি যখন আমার সেই বিলিতি ছবি বাবাকে দেখাই, তখন তাঁকে গুরুদেবের দেওয়া এসবও দেখিয়েছিলাম। বাবাও সেই সব দেখে অবাক ও খুসি হয়েছিলেন। এই সময় থেকেই গুরুদেবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা বেড়ে গেল। আমার ছবি তাঁকে

প্রায় রোজই দেখাতে লাগলাম। তিনি খুব খুসী। তিনি আমার ছবি কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রায়ই দেখিয়ে আনতেন। অবনীন্দ্রনাথ আমার সেই ড্রইংগুলির উপর তাঁর মতামত ভালমন্দ লিখে দিতেন। এই রকম করে আমার ছবি শেখা ভাল করেই আরম্ভ হ'ল। এই সব ড্রইং-এর কিছু কিছু এখনো আমি রেখেছি। তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে কোন আঁকার শিক্ষক ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ এই গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে একজন শিক্ষকও পাঠালেন। তারপরের ছুটিতেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতার এই গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে চৌরঙ্গীতে এসে দেখা করলাম এবং ঐ সময় থেকেই অবনীন্দ্রনাথের স্নেহ ও শিষ্যত্বের সৌভাগ্য পাই। আমার দুই গুরু লাভ হল। যথাসময়ে বাবার কাছ থেকে ক্যামেরাও আদায় হল এবং প্রাণভরে ছবি তুলতে লাগলাম। গুরুদেবের, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এবং দ্বীপেন্দ্রনাথ ও আশ্রমের অনেক ফটো তুলেছিলাম। তখন রথীদা আমেরিকা থেকে সবে ফিরে এসে বিয়ে করেছেন। গুরুদেবের সেই আগেকার ছবির নেগেটিভগুলি এখনও বোধ হয় রথীদার কাছেই আছে।

স্যার উইলিয়ম রোথেনষ্টাইন ১৯১০ সালে কলকাতায় এসেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কাছে। শান্তিনিকেতনেও তাঁর যাবার কথা ছিল, আমরা মস্তবড় চিত্রকরের দর্শন পাব মনে করেছিলাম কিন্তু কোন কারণে তাঁর আশ্রমে আসার সুযোগ হয় নি। কেবল তাঁর নামই মাত্র তখন শুনেছিলাম। বড় আর্টিষ্ট যে কেমনতর লোক দেখতে হয়—তা দেখবার আমার তখন বড়ই ইচ্ছে হয়েছিল। আনন্দকুমারস্বামী কিন্তু ঐ সময়ে আশ্রমে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁকে আমরা দেখেছি।

১৯১২ সালে গুরুদেব, রথীদা ও প্রতিমা বৌঠান ইংলণ্ডে যান। তখন সেখানে তিনি স্যার উইলিয়ম রোথেনষ্টাইনকে বন্ধুভাবে পান। এই রোথেনষ্টাইন গুরুদেবকে লণ্ডনে পেয়ে প্রাণভরে গুরুদেবের অনেক ছবি পেন্‌সিলে এঁকেছিলেন। সেগুলো একটা বই আকারে ছাপা হয়েছিল এবং প্রথম ইংরেজি বই "গীতাঞ্জলিতে" রোথেনষ্টাইনের আঁকা গুরুদেবের ছবি আমরা প্রথম দেখলুম। সেই ছবি দেখে তখন কিন্তু আমার ভাল লাগে নি।

১৯১৩ সাল, গুরুদেব আশ্রমে নাই, আমার সেখানে থেকে পড়া আর মোটেই ভাল লাগল না। অনেক কষ্টে বাবাকে রাজি করিয়ে আমি কল্‌কাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে ছবি আঁকা শিখতে চলে এলুম। বাবাই আমাকে আমার শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে এসে সঁপে দিয়ে গেলেন। খুব উঠে পড়ে ছবি আঁক্‌তে লেগে গেলুম। কল্‌কাতায় আমার তখন কিছু কিছু নামও হতে লাগল, এই সময়ে কবি সত্যেন দত্ত তাঁর কবিতায় আমাদের দেশের পাঁচজন প্রধান চিত্রকরের মধ্যে আমার নামও উল্লেখ করেছিলেন। ঐ সময়ে লণ্ডন হতে গুরুদেবের যে সব চিঠি পাই, তার একখানি থেকে বোঝা যাবে যে ছবির বিষয় তিনি কেমন ভাবতেন:—

ওঁ

C/o Messrs Thos Cook & Son
Ludgate Circus
London

কল্যাণীয়েষু

মুকুল, এবারকার Exhibitionএ তোর ছবিগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করেছে এ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই পেয়েছি এবং পেয়ে মনের মধ্যে খুব আনন্দ বোধ করেছি। তোর ছবির যে ফোটোগ্রাফ পাঠিয়েছিস সেটা দেখেও খুসি হলুম— তোর হাত যে পেকে উঠ্‌চে এবং মনের মধ্যে ভাবের বিকাশ হচ্চে তা এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্চে। অবনের কাছে শিক্ষালাভ করে তোর অন্তরের শক্তি পূর্ণভাবে উদ্বোধিত হয়ে উঠ্‌বে এই প্রত্যাশা আমি মনের মধ্যে দৃঢ় করে রাখ্‌লুম।

কিন্তু একটি বিষয়ে তোকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কাজ আরম্ভের মুখেই লোকের কাছে প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা পাওয়া খুব আরামের বটে, কিন্তু তার মত বিপদ্‌জনক আর কিছু নেই। এতে তোর হঠাৎ মনে হতে পারে তোর যা হবার তা হয়ে গেছে বুঝি—সেইটেই হচ্চে অধঃপতনে যাবার পন্থা। যার মধ্যে শক্তি সত্য আছে সে কোনোদিনই মনে করে না যে সে সিদ্ধিলাভ করেছে—এই লক্ষণই প্রতিভার যথার্থ লক্ষণ। যা করতে পারতুম, যা করা উচিত ছিল এখনো তা করে উঠতে পারি নি—এই কথা যতদিন মনের মধ্যে থাকবে ততদিন সরস্বতীর কৃপা আছে এই কথা স্থির জানবি—যখন তিনি পরিত্যাগ করে যান তখনই মানুষ মনে করে আমি একটা কৃষ্ণ বিষ্ণু হয়ে

উঠেছি—আমার আর ভাবনা নেই। এখনো তুই বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস্ অমর সভার মধ্যে এখনো তোর ডাক পড়েনি; একথা নিশ্চয় জানিস্—যে পাঁচজনে তোকে বাহবা দিচ্চে তাদের বাহবার কোনো মূল্য নেই—তারা তোর ছবি কিনে তোকে কিছু টাকা জোগাতে পারে, তার বেশি তাদের কিছু নেই—তারা তোকে পারে উত্তীর্ণ করতে পারবে না। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমি তোর গুরুর পদ গ্রহণ করতে পারি নে, কিন্তু তবু বাইরে থেকে আমি একটু সমালোচনা করতে চাই। আমার মনে হয় নিতান্ত মিষ্টমধুর করে ছবি আঁকবার দিকে যদি তুই লক্ষ্য স্থির করিস্ তাহলে আপাতত তাতে অরসিক লোকের মন ভোলাতে পারবি কিন্তু তাতে সাধনার পথে তোর সদ্গতি হবে না। ইন্দ্রদেব যখন তপস্যা ভঙ্গ করতে চান তখন তিনি সাধকদের কাছে সুন্দরী অপ্সরী পাঠিয়ে দেন—যারা সেইটেকেই তপস্যার ফল বলে গ্রহণ করে তারা চিরন্তন ফলটি হারিয়ে বসে। তোদের চিত্র সাধনাতেও ইন্দ্রদেব তাঁর অপ্সরী পাঠিয়ে সাধকের শক্তি পরীক্ষা করেন—যারা ওতে ভোলে তাদের ঐখানেই সমাপ্তি। তোদের চিত্রবিদ্যার মধ্যে একটা কঠোরতা চাই, পৌরুষ চাই—যথার্থ সৌন্দর্য্য জিনিষটি মোহ নয় মায়া নয়, তা দশজনের চোখ ভোলাবার ফাঁদ নয়—সৌন্দর্য্য হচ্চে সত্য। যতক্ষণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে সত্যের সেই স্বাভাবিক দৃঢ়তা প্রশস্ততা কঠোরতা পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করা যেতে পারবে না। বিশ্বসৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখ্ এর সর্ব্বত্রই খুব একটা জোর আছে, এ ভারি শক্ত—এর সৌন্দর্য্য বাবুয়ানার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—এ আমাদের বাংলা দেশের কার্ত্তিকের মত গোঁফে তা দিয়ে ময়ূরে চড়ে বেড়ায় না। বিশ্বের এই বিশাল সৌন্দর্য্য অসুন্দরকেও অনায়াসে আপনার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে এবং তাতে তার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। তোর তুলি মায়া-সরস্বতীর পায়ের তলায় আল্‌তা দেবার তুলি হলে চল্‌বে না। তোর তুলিতে পৌরুষ দেখ্‌তে চাই—তার বাঁট বজ্রের মত শক্ত হবে এবং সর্ব্বত্রই সে অকুণ্ঠিত প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তোর চারদিকে যা তুচ্ছ জিনিষ আছে, যা অসুন্দর, তার মধ্যেও সুন্দরকে তুই দেখ্‌বার সাধনা কর, তাহলেই বিশ্বসরস্বতী তোর সহায় হবেন। আমি যা বল্লুম তার সব কথা হয়ত স্পষ্ট বুঝতে পারবি নে; এ চিঠি অবনের কাছে নিয়ে যাস্ তিনি তোকে সব কথা বুঝিয়ে দিতে পারবেন। ইতি ২৫শে এপ্রেল ১৯১৩

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৪ সালে গুরুদেব, রথীদা ও প্রতিমা বৌঠান যখন রামগড় পাহাড়ে বেড়াতে যান, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে ছবি আঁকতে দেখ্‌লেই গুরুদেব বড় সুখী হতেন। আমি যখন একমনে বসে ছবি আঁকতুম তখন তিনি আমার পাশে বসে আমার কাজ করা দেখ্‌তেন। একদিন সকালে আমার স্কেচ্ বইটি নিয়ে বল্লেন, দেখ্ তোদের লাইনের ড্রইং খুব সূক্ষ্ম হয় না, পেন্সিলের ড্রইং বেশ পরিস্কার হবে—আমাকে তোর খাতাটা দে আমি এঁকে দেখিয়ে দিই। সেই বইয়ে তিনি পর পর তিনটি স্কেচ্ করেন। একটি স্কেচ্ করলেন প্রতিমা বৌঠানকে একপাশে বসিয়ে—আর দুটি করলেন আমার। এই ড্রইংগুলি তাঁর সই-করা এখনও আমার কাছে আছে। তাঁর রঙিন ছবির উপরেও খুব ঝোঁক ছিল। একদিন সকালবেলা ঐ রামগড়ের পাহাড়ের কেয়া গাছের দিকে চেয়ে বল্লেন যে "ঐ যে গাছের পাতাগুলো রোদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে, ও রং ফলাবি কি করে? আমি যদি ছবি আঁকতুম, তাহলে ছবিতে গাছের পাতায় পাতায় হীরে ঘসে ঘসে দিতুম। তা না হলে কি এ ছবি হয়?" এর থেকে মনে হয় তিনি সব কিছুই খুব ভাবতেন।

গুরুদেব কল্‌কাতায় এলে প্রথমেই পাশের বাড়ীতে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা কি আঁকছেন দেখ্‌তে যেতেন এবং তাঁদের ছবি আঁকার সব খবর রাখ্‌তেন। এই সময়ে ১৯১৫ সালে গগনেন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের জীবনীর ছবি নিয়ে মেতে ছিলেন এবং অবনীন্দ্রনাথ তখন পশু ও পাখীর ছবি নিয়ে ব্যস্ত। রোজ সকালে বিকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বারান্দায় বসে ছবি আঁকা দেখ্‌তেন এবং নানা গল্পগুজব করতেন। সেখানে জগদীশ বসুকেও অনেক সময় আস্‌তে দেখ্‌তুম। এই সময়ে একদিন আমার খেয়াঘাটের ছবিখানি দেখে গুরুদেব এত খুসী হয়েছিলেন যে বল্‌বার নয়। শুনেছি আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসবে মন্দিরে গুরুদেব ঐ ছবির উপরে অনেক কিছু

বলেছিলেন। এই ছবি আঁকবার সময়ে আমাকে তিনি একবার শিলাইদহে বেড়িয়ে আস্‌তে বলেছিলেন। একদিন আমায় ডেকে বল্লেন—"আমি দু একদিনের মধ্যেই শিলাইদহে যাচ্ছি। সেখানে গেলে অনেক ছবি আঁকার খোরাক পাবি, সেত দেখিস্ নি—সেখানে তুই আয়—আর দেখ্ যদি নন্দলাল ও সুরেন করকেও সঙ্গে করে আনতে পারিস ত খুব ভাল হয়। তোদের খরচের টাকা যা লাগে আপিসে বলে যাচ্ছি সেখান থেকে নিবি। আমি শিলাইদহে তোদের জন্যে সব বন্দোবস্ত ঠিক রাখ্‌ব। বুঝলি নিশ্চয়ই আসিস্। ওদেরও আনিস্।" যা বলা তাই কাজ। তাঁর জমীদারীতে আমরা তিনজনে গেলুম। কুষ্টিয়ার ষ্টেশনে আমাদের জন্যে লোক অপেক্ষা করছিল। শিলাইদহে গিয়ে আমরা যেন অন্য জগতে এলাম। কুঠীবাড়ীতে কিছুদিন থেকেই আমরা সকলে বোটে পদ্মার চরে গিয়ে রইলুম। তিনখানি বড় বড় বোট—একটিতে গুরুদেব, আর একটিতে আমরা তিনজন এবং অন্যটিতে চাকর বামুন ও মাঝি-মাল্লারা। সেখানে আমরা একমাসে তিনজনে যে কত শত ছবি এঁকেছি তার ঠিক নাই। এই সব ছবি দেখে গুরুদেব এত খুসী হলেন যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর নিজের লেখবার যত কাগজ যেখানে যা কিছু ছিল সব বের করে দিয়েছিলেন। এখনও এসব ড্রইং আমাদের কাছে কিছু কিছু আছে। তাঁর বড্ড ইচ্ছে ছিল এগুলি তাঁর বইয়ে বের হয়। এই সময় হতেই নন্দলাল ও সুরেনকরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠভাবেই হয়।

১৯১৬ সালের প্রারম্ভে গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর সহযাত্রী হয়ে জাপানে ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছি। আমাদের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের এবং তাঁদের ছাত্রদের আঁকা প্রায় একশত ছবি নিয়ে গিয়েছিলুম। জাপানে গিয়েও তিনি আবার অতিথি হলেন সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী য়োকোয়ামা টাইকানের। জাপানী ও চীনে চিত্র দেখ্‌বার কোনও সুযোগ তিনি হারান নি। য়োকোহামার মিঃ তোমিতারো হারার বাড়ীতে তিনি কেবলমাত্র শনি ও রবিবারের জন্যে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রত্যহ তাঁর অফুরন্ত ছবির ভাণ্ডার দেখে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেখানে তিনি ৩ মাসেরও অধিককাল অতিবাহিত করেছিলেন।

১৯১৭ সালে জাপান ও আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই শান্তিনিকেতনে তিনি একটি শিল্প শিক্ষালয় স্থাপন করতে মনস্থ করলেন এবং ১৯২০ সালে তিনি সেখানে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করলেন। চিত্রকলার সৌন্দর্য্যে তিনি কতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা বেশ বুঝা যায় এই ঘটনায় যে তিনি কলাভবন প্রতিষ্ঠার পরই সেখানে একটা চিত্রপ্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন এবং নিজে একজন বিচারক হিসাবে উপস্থিত রইলেন। তখন আমি বিলাতে। তিনি যতবারই বিলাতে গিয়েছিলেন আমার খোঁজ করেছিলেন এবং আমার খবর রাখ্‌তেন।

১৯২৮ সালে আমি দেশে ফিরে এলুম। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে আমার আর্ট স্কুলের চৌরঙ্গীর বাসায় কিছু দিন তাঁকে অতিথিরূপে রাখার সৌভাগ্য আমি পেয়েছিলুম। যে কয়দিন তিনি আমার এখানে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ছিলেন, বিশেষ মন দিয়ে আর্টের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তির ধারা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এই সময়েই তিনি এচিং, কাঠ খোদাইয়ের ছবি, লিথো ইত্যাদির প্রণালী শিখে নিয়েছিলেন। এগুলির নমুনা আমার কাছে আছে। কবি এখন থেকে সত্যসত্যই চিত্রাঙ্কনে আত্মনিয়োগ করলেন। রেখায়, বর্ণে, পরিকল্পনায় ফুটে উঠ্‌ল তাঁর শিল্পসৃষ্টি। কবির অকস্মাৎ শিল্পীরূপে রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের বন্ধুদের কাছে অনেক সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার মনে হয়েছে, কিন্তু একথা অনেকেই জানেন না যে বিশ্বকবি চিরকালই চারুকলার অনুরাগী ভক্ত এবং খুব আগ্রহশীল শিক্ষার্থী ছিলেন। একথা জানা দরকার যে পৃথিবীর যে কোন দেশে দর্শনযোগ্য এমন চিত্রশালা বা শিল্পীর আস্তানা নেই যা কবির বিদেশ ভ্রমণকালে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সেখানকার শিল্পীদের কাজ তিনি খুব ভাল করে দেখেছেন এবং তার রস গ্রহণ করেছেন। অনেকে হয়ত ভেবেছেন যে বিশ্বকবি তাঁর জীবন-সন্ধ্যায় তাঁর লেখনী একরকম বন্ধ করে তুলি চালনায় রত হয়েছিলেন কেন? নরম মিষ্টিমধুর লতানো ছবি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে আজকের দিনে অজন্তার ধরণের ছবি আঁকার চেষ্টা করাও বৃথা। কবি-শিল্পী তাঁর তুলিতে নিজের ভাব প্রকাশের একটা নূতন পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং তিনি তাতেই খুব আনন্দও পেতেন। সত্তর পঁচাত্তর বয়সেও তাঁর হাত দৃঢ় এবং

নিষ্কম্প। চিত্রগুলি সরল এবং সতেজ। তাঁর কালীকলমের রেখার কাজ সত্যই আশ্চর্য্য। তুলির একটি টানে আঁকা ছবি রবীন্দ্রনাথের আর্টের জীবনীশক্তি ও পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রকাশ করে। তাঁর চিত্রে গতিবেগ ও জোর আছে। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু ও যথাস্থানে সন্নিবেশন অতি সহজেই আপনা আপনিই হয়ে যায়। কোথাও একটু দ্বিধাভাব থাকে না। তুলির আঁচড় দেখে মনে হয় যেন সমস্তই সুনিশ্চিত ও সুসংগত। যেন বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলেই অতি অনায়াসেই ছবিগুলি তৈরী হয়েছে। তাঁর অত্যাধুনিক প্রকাশভঙ্গিমা বর্ণনাতীত এবং ছবির বিষয়বস্তুগুলি তাঁর কল্পলোকের গভীর ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লণ্ডনে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর সময় আমার এক বন্ধু স্যর ফ্রান্‌সিস্ ইয়ং হস্‌ব্যাণ্ড্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে "ডাক্তার টাগোর, আপনি এমন অদ্ভুদ অদ্ভুদ বিদ্‌ঘুটে জন্তু জানোয়ার আঁকেন কেন ?" কবি তার উত্তরে বলেছিলেন—"বিধাতা যদি গণ্ডার, হিপোপটেমাস ইত্যাদি তৈরী করে সুখী থাকতে পারেন, তাহলে আমার এইরূপ সৃষ্টিতে আপত্তি কি ?"

অনেকেরই অভিযোগ যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী সহজে বোধগম্য নয়। সত্যই তাঁর চিত্র প্রথম দৃষ্টিতে প্রহেলিকা বলেই বোধ হবে। একথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ চিত্রেই ভাবের অস্পষ্টতা বিদ্যমান। কিন্তু একবার তার অবগুণ্ঠন খুলে দিলে ছবির অর্থ দিনের আলোর মত স্পষ্ট বোঝা যায় এবং তখন তার রস গ্রহণ করতে দেরী লাগে না। তাঁর তুলি যে কোন রকমের কাগজেই হোক না কেন অতি অনায়াসেই চলে। কোন সময়ে হাতের কাছে কাগজ না পেলে খবরের কাগজের উপরেই ছবি এঁকে রাখ্‌তেন। যে কোন রকম রং পেয়েছেন তাতেই এঁকেছেন, কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কিন্তু জলে বা স্পিরিটে গোলা তরল রংই বিশেষ ভালবাসতেন। কেননা ইচ্ছে হলেই, হঠাৎ ঐ তৈরী রং দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারতেন। তাঁর অঙ্কন পদ্ধতি ছিল তাঁর নিজেরই তৈরী। রং না পেলে হলুদের জল, নানা রকম ফুলের পাঁপড়ির রস দিয়েও ছবি আঁক্‌তে সক্ষম হয়েছেন। দার্জ্জিলিংয়ে থাক্‌তে অনেক ছবিই ফুলের রংএ করেছিলেন। ছবি চক্‌চকে করতে হলে মাথায় মাথবার তেল, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, ডিম—যা কিছু হাতের কাছে পেতেন তাই ছবির উপরে লাগাতেন। ভবিষ্যতে কেবল চিত্রকরদের কাছেই নয়, সকলেরই এই সব ছবি খুব বেশী কাজে লাগ্‌বে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ১৯৩১ সালে ২০শে জুন তিনি আমাকে দার্জ্জিলিং থেকে তাঁর ছবির সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি এখানে দেওয়া গেল।

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

মুকুল, আচ্ছা, শীতের সময় আমার পর্দ্দানশীন ছবির পর্দ্দা খুলে দেব, তার পরে লোকে যা বলে বলুক। কল্‌কাতায় ২।৩ জুলাই নাগাদ ফিরব তখন এসে কথাটা পাকা করা যাবে। এখানেও কিছু কিছু ছবি এঁকেচি। কল্‌কাতায় যখন আমার অভিনন্দন হবে—ছবির প্রদর্শনী সেই সময়ে হলে লোকের চোখে পড়বে। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

কাব্যরঞ্জন শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ

মৃত্যু—সেতো জীবনের সাথী চিরন্তন ;—
তার লাগি' মূঢ়সম কেঁদে কিবা ফল ?
ঘর্ঘরিয়া চলে ছুটে কালের স্যন্দন—
শিহরিয়া ত্রিভুবন করে টলমল !
তবুও মানে না প্রাণ—উঠে আকুলিয়া ;
আঁখিযুগে তবু ঝুরে তপ্ত অশ্রুজল !

হে রবীন্দ্র ! তাই কাঁদি তোমার লাগিয়া,
তোমার বিরহে মোরা ব্যাকুল বিহ্বল !
লীলা তব সাঙ্গ আজ ?—বিশ্বাস না হয় ;—
জরা নাহি ছিল তব হে চিরনবীন !
চির অস্তমিত রবি—কে করে প্রত্যয় ?—
সান্দ্র অন্ধকারে বিশ্ব হবে যে বিলীন !

আমাদেরি মাঝে আছ সূক্ষ্ম দেহ ধরি',
স্থূলনেত্রে নাহি দেখি তাই কেঁদে মরি !



কবিগুরুর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ



কবিগুরুর মাতা সারদা দেবী



রবীন্দ্রনাথ—(বয়স ৪৭ বৎসর) (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম অনুষ্ঠিত
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম সভাপতি



কবিগুরুর পত্নী—মৃণালিনী দেবী



শ্যামলীর সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ



রবীন্দ্রনাথ (বয়স ৫০ বৎসর) (এই সময় প্রথম দেশবাসী কর্ত্তৃক টাউন হলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হয়)





যুবক রবীন্দ্রনাথ (বয়স ২৬ বৎসর)

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকালোক-শৈল-পারে অস্তমিত জ্যোতির মণ্ডল—
অন্ধকারে অভিভূত বিশ্ব-মানবের মর্ম্ম-স্থল।
নমো নমঃ গুরুদেব, আর দেখা হ'বে না তো হায়!
আশার শলিতা শেষ, প্রদীপের বুক পুড়ে' যায়।
যেথা গেছ সে মালঞ্চে ফুটায়েছ আলোর প্রভাতী,
অমর কবির লোকে মিলিয়াছে পরিচিত সাথী।
যাঁহাদের দিব্য স্বপ্নে অতীতের স্মৃতি উদ্‌ভাসিত,
স্বর্ণ-লঙ্কা, ইন্দ্র-প্রস্থ, কীর্ত্তির মেখলা-অলঙ্কৃত,
পেয়েছ তাঁদের সঙ্গ রহস্য-নেপথ্য-অন্তরালে—
চিরন্তনী জয়ন্তীর অজিত তিলক শোভে ভালে।
এ পারে নিবিল চিতা, ভেদিয়া ধূম্রের আবরণ
উত্তরিলে পিতৃধামে, অভয় শান্তির নিকেতন।
উপলব্ধি করিয়াছ তরঙ্গেতে সমুদ্র-আত্মায়,
মানস-প্রয়াগে তব যুক্তবেণী মুক্ত হ'য়ে যায়।
সত্য মহাকাশ-তুল্য, প্রলয়ে যা নিশ্চিহ্ন না হয়,
তুমি তারি তীর্থঙ্কর—কবিতা সে তোমারি হৃদয়।
গৌরবের ধারা ধ্বনি প্রদক্ষিণ করিছে ধরণী,
দিগ্বিজয়ী যশোমূর্ত্তি, রথশীর্ষে সূর্য্য-কান্ত মণি।
উৎসব করিলে সুরু বাঙ্‌লার দখিন বাতাসে,
এই মাটি, এই জলে উচ্ছ্বসিত প্রাণের উল্লাসে।
চম্পকের পীত প্রভা, নীল ছায়া অপরাজিতার,
জবার সে রক্ত-রাগ প্রতিভাত কটাক্ষে তোমার।
বরণ করিল তোমা' উদয়-সুন্দর ঋতুরাজ—
ব্যথাতুর করি' তারে, হে দরদী ছেড়ে গেলে আজ!

ঝরে বিচ্ছেদের অশ্রু তরুলতা-পল্লব-মর্ম্মরে,
সুখের আকুতি-ভরা মানুষের অতৃপ্ত অন্তরে।
কবিদের কবি তুমি, পেলে অনন্তের আলিঙ্গন,
সুপ্রসন্ন অন্তর্যামী, ধন্য গীতাঞ্জলি-নিবেদন।
কল্যাণ-সঙ্কল্প তব, যোগ-দৃষ্টি, অক্ষয় পৌরুষ,
আদর্শ তপস্যা-ফলে মোরা সবে নূতন মানুষ।
ভাষণে ভূষণ দিলে, গানেরে দিয়াছ তুমি প্রাণ,
সুরের পিঞ্জর হ'তে রসের ঐশ্বর্য্য পায় ত্রাণ।
বিতরে অমৃত-বীজ অনবদ্য তব অবদান,
দ্বিতীয় মহাভারত বিরচিলে মহর্ষি-সন্তান।
দর্শন-পরিধি তব বৃহত্তম বৃত্তে মিশে যায়;
ভাস্বর স্বাক্ষর তব নবীন যুগের সংহিতায়।
অসীমের মানচিত্র আঁকিয়াছ সীমারেখাহীন—
জাগিয়াছ যে দিবায়, যে উষায় তিমির বিলীন।
দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিলে মহীয়সী বাঙ্‌লার বাণী,
সার্ব্বভৌম বিদ্যা-পীঠে পাতিয়াছ পদ্মাসনখানি।
তব বাক্‌-স্বাধীনতা দেব-দত্ত শঙ্খের নিনাদ,
উদাত্ত-বিরাট্ কণ্ঠ বিনাশে জাতির অবসাদ।
ডাক দিলে নিরাশ্বাস, পীড়িত, লাঞ্ছিত জনতায়,
উচ্চারি' স্বস্তি-বাচন আশিষিলে মৈত্রী-করুণায়।
উদ্বোধিয়া গণশক্তি ঐক্য-রাখী করিলে বন্ধন,
পুণ্য মন্ত্রে দীক্ষা দিলে।—গঙ্গাজলে করিনু তর্পণ।
যেথানে বিরাজ' তুমি অন্তরের শ্রদ্ধা সেথা যায়,
অচিন্ত্য অ-দ্বয় যিনি জানিয়াছ সেই অজানায়।

সর্ব্ব-রূপ, সর্ব্ব-রস, শব্দ যাঁর না পায় সন্ধান,
চরিতার্থ আজি তুমি, লভিয়াছ সেই আদ্য স্থান।

রবি অস্ত যায়—

বন্দে আলী মিয়া

রবি অস্ত যায়—
শ্রাবণের ম্লান আঁধার গগন কাঁদিতেছে বেদনায়।
তুমি আমাদের প্রাণের দেবতা ছিনু তব ছায়াতলে
তুমি নাই আজ এ-কথা স্মরিয়া আঁখি ভরে আসে জলে।
যে-জাতি আছিল চিরদিন হেয়—দীন ছিলো ভাষা যার
জগৎ-সভায় সেই ভাষা দিয়ে লভিলে বিজয়-হার;
পৃথিবীর তুমি শ্রেষ্ঠ মানব নিখিল বিশ্বকবি
বঙ্গজননী হয়েছে ধন্য তোমারে বক্ষে লভি।
সকল জাতিরে বেসেছিলে ভালো—সবার আপন তুমি—
তাই বিদায়ের মহাক্ষণে দেব চরণ তোমার চুমি।

রবি অস্ত যায়—
নিভে যায় আলো—স্তব্ধ ধরণী শোকে করে হায় হায়।
চলে গেলে তুমি—রেখে গেলে হেথা অমর সিংহাসন
ধরণী তোমার উদয় অস্ত হবে না বিস্মরণ।
অক্ষয় তব মধু ভাণ্ডার—শেষ নাই কভু তার
সকল যুগের জনগণ তরে মুক্ত তাহার দ্বার।
ফিরে এসো দেব আমাদের মাঝে ফিরে এসো বাংলায়
তোমারে হারায়ে আতুর জননী রয়েছে প্রতীক্ষায়।
বিদায় বেলায় অশ্রু অর্ঘ্য নিয়ে যাও তুমি কবি
রাত্রি প্রভাতে বাংলার নভে উদিও নবীন রবি।

প্রণতি

শ্রীবীণা দে

গুরুদেব! তোমায় প্রণাম করি। তুমিই তোমার নিজস্ব সহজ সুরে সহজভাষায় সকলের ভাব প্রকাশ ক'রে আমাদের জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়েছ; তোমার মধ্যে দিয়েই আমরা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার দেখতে পেয়েছি; তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু! তোমায় প্রণাম করি।

সমস্ত পৃথিবী আজ তোমার পায়ের কাছে মাথানত ক'রে দাঁড়িয়েছে, হে বিশ্বপূজিত! তোমায় প্রণাম করি।

তোমার নিজের মধ্যে তুমি সমস্ত জগৎকে একান্ত ক'রে নিয়েছিলে; নিখিলের সুখ, দুঃখ, রূপ, রস তোমার সম্পূর্ণ নিজস্ব—তোমার প্রাণের স্পন্দনে অনুভব করেছি আমরা বিশ্বের প্রাণ-প্রবাহ—তোমার মাঝেই দেখেছি আমরা বিশ্বের রূপ—তাই হে বিশ্বরূপ! তোমায় আমরা প্রণাম করি।

বিশ্বের রাজসভায় তুমিই ভারতকে নিজের অখণ্ড আলোকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছ; আলোক, তাপ, রসদানে বাঁচিয়ে রেখেছ, তাই তুমি ভারত-ভাস্কর! তোমায় প্রণাম করি।

তুমি নিখিল ভারতকে আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছ—হে পথপ্রদর্শক গুরু! তোমায় প্রণাম করি।

সূর্য্যের মতই তুমি, অযাচিতভাবে সকলের প্রতি অজস্র ধারায় আলোক আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিয়েছ—তোমার রচিত গান, গল্প, নাটক, কবিতার মধ্যে দিয়ে—তোমার নাম সার্থক! হে আমাদের সূর্য্যদেব রবীন্দ্রনাথ! তোমায় বার বার প্রণাম করি।

প্রণাম করি আমি তাদের হ'য়ে—যারা রুদ্ধদ্বার গৃহকোণে বদ্ধ বাতায়নের ফাঁকে দীপ্ত রবির এতটুকু আলোকের রেখা পেয়ে সযত্নে সেইটুকুই বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

তাদের হ'য়ে আমি প্রণাম করি—যারা কোন দিন তোমার দর্শন করার চরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করার, তোমার কণ্ঠ শোন্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেনি; অথচ প্রতি প্রভাতে প্রতি সন্ধ্যায় যাদের মন তোমার পূজায় ভরে' ওঠে—প্রতিদিনে সূর্য্যার্ঘ্যের সঙ্গে যারা তোমার চরণে অর্ঘ্য দান করে—প্রতি সাঁঝের প্রদীপ জ্বালার সঙ্গে যাদের মাথা তুলসীমূলে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে, সেই শত শত বাংলার বধূ পল্লীর মেয়েদের হ'য়ে আজ আমি তোমায় প্রণাম করি।

নমস্তে জ্ঞাননেত্রায়, বিশ্বপূজিতে, বিশ্বরূপে!
নমো ভারত-ভাস্করায় শ্রীগুরবে রবীন্দ্রায় নমো নমঃ॥

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, বি-টি, ডিপ্‌-এড

বাল্মীকির গঙ্গার স্তব তিনি পড়তে ভালবাসতেন! গঙ্গাকেও তিনি ভালবাসতেন। তাই সেদিন প্রিয় গঙ্গার কোলে ঋষির পূতদেহ কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল।

জগতের প্রথম কবি অতীতের বাল্মীকি আজ নূতনের রবীন্দ্রনাথরূপে বুঝি প্রতিভাত হয়েছিলেন। অতীত ভারতের প্রোজ্জ্বল প্রতীক, বর্ত্তমানের সুপ্রকাশ রবি ও ভবিষ্য মানবের ধ্রুবতারা এখন আমাদের চোখের আড়াল হয়েছে।

পুরাতনের পাতা-ঝরা ও নবীনের 'গাছে গাছে, পাতায় পাতায় আবীর হানা'র 'কাল-ফাগুনী'র মাঝে সেই যুগ ঋষির আবির্ভাব ও মহাপ্রয়াণ। প্রলয় নাচনের মাঝে মানবীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ধূলিলুণ্ঠিত দেখে সে বিশ্বদরদীর আত্মা যেন আর সইতে না পেরে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র দানবীয় তাণ্ডব অভিযানের সামনে নিজেকে বুঝি বলি দিলেন—ভ্রান্ত মানবকে নিষ্কলঙ্ক করতে, তার পাপ ধুয়ে মুছে ফেলতে; আর বিরাটভাবে আপন মানব কল্যাণ আদর্শকে সত্য করতে আজ বুঝি প্রলয় ঘন অন্তরালে সাময়িকভাবে তাঁর এ লুকান—কাল মেঘ কেটে গেলে আবার বা রবির প্রকাশ হবে, সে বুঝি 'কোটি ভানু জিনি' আভা মণ্ডিত হয়ে। যা আজ সঙ্কীর্ণ স্থূলতার মাঝে ফুটে উঠতে বাধা পেল, তা কোন অলখ্‌ লোক হতে তেজোদ্দীপ্তভাবে সত্যে বিকশিত হয়ে সারা বিশ্বের ওলট পালটের মাঝ দিয়ে নবজাগরণ ও নবজন্মে সার্থক হবে।

স্বর্গদূতের বিদায়ে স্বর্গের ছবি যেন আস্তে আস্তে ধরায় নেমে আসছে, নব ভাবধারা মূঢ় মানুষকে অচিরেই অভিভূত করবে; তাই হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকল জাতিই আজ বিশ্বের দুঃখে দুঃখভারাক্রান্ত—তাঁকে পরম আত্মীয়জ্ঞানে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করছে, বিশ্বের আকাশ বাতাস ভরে যার বিরহগান ধ্বনিত হচ্ছে সেই বিশ্ববিরহীর বিরাট আত্মার তর্পণ হবে বলে। অচিরে বিরহবিধুরা ধরা প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের মঙ্গল গানে সানুভবরসে বিভোর হবে!

মহাপ্রয়াণ

শ্রীসুবোধ রায়

সূর্য্য হ'বে কক্ষচ্যুত—অবলুপ্ত-জ্যোতির তিমিরে,
সর্ব্বত্র জাগিবে মরু গ্রাসি' যত সমুদ্র-নদীরে—
অসম্ভব এ কল্পনা ভয়ঙ্কর, যেমনি দুঃসহ !
তব চির-প্রয়াণের স্বপ্ন দেব, তেমনি অসহ।
ভয়ঙ্কর, সুদুঃসহ সে-কল্পনা সত্য হ'ল আজ,
ভারত-ভাগ্যের বুকে বিঁধিল বিধির মৃত্যু-বাজ।
তোমাহীন এ-ধরণী মনে হয় ধূসর পাণ্ডুর !
তোমাহীন এ-জীবন ছিন্ন তার বীণ—হৃতসুর !

আলো হ'ত জ্যোতির্ম্ময় তোমার চোখের দৃষ্টি পেলে,
আঁধার তোমার কাছে গুণ্ঠন খুলিত অবহেলে।
বৈশাখ ভ্রূকুটি ত্যজি' তব ধ্যানী দৃষ্টির সম্মুখে
আপন তাপসরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে দিত সুখে।
যুগযুগান্তের বর্ষা তব গানে দিত আসি ধরা,
বিরহ-মিলন-মাখা, আলো-ছায়া-হাসি-কান্না-ভরা।
শরৎ তোমার লাগি' বারে বারে পাঠালো সম্বাদ
প্রথম আলোর বাণী নবতম ফুলের প্রসাদ।
হেমন্ত-লক্ষ্মীর ঘরে ভরি তুমি দিলে ধান্যডালা,
গাহিলে নূতন সুরে কত "পোষ ফাগুনের পালা।"
বসন্তের মালাকর তব ত'রে পাঠাতো যে-মালা,
মোদের আঁধারঘর তা'রি সুরভিতে হ'ত আলা।

তোমাহীন ঋতুচক্র এবে হ'বে ব্যর্থ, অর্থহীন,
সূর্য্য যেন দীপ্তিহীন, জ্যোৎস্নাধারা আঁধারমলিন !

তোমার ভাণ্ডার ভরি' রেখে গেছ অফুরন্ত গান,
জানি তাহে স্নিগ্ধ হ'বে যুগযুগান্তের আর্ত্ত প্রাণ।
কিন্তু আমাদের হিয়া তব মূর্ত্তি বাণী সুর লাগি'
দুঃখের শ্মশানমাঝে সর্ব্বহারা সম রবে জাগি'।
যাহারা দেখেনি তোমা, যাহারা পেল না তোমা কাছে,
তাদের ভুলাতে তব মহামূল্য ধনরত্ন আছে।
কিন্তু আমাদের মনে পূরাইবে তব শূন্য ঠাঁই,
স্মৃতির কল্পনাভরা সান্ত্বনার সে-শকতি নাই।
সেই দুঃখভার কভু এ হৃদয় হ'তে নামিবে না,
সে-বিরহকান্না হায়, এ জীবনে কভু থামিবে না।
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে, যুগ হ'তে বহু যুগান্তরে,
তোমার দর্শন লাগি' আবর্ত্তিব তৃষার্ত্ত অন্তরে।

এ বিশ্বাস জাগে মনে—একদিন পাবো দরশন,
যেথা অন্ধকার পারে জাগে নিত্য আলো-হরষণ।
সেথা সপ্তর্ষির সাথে ধ্যানমৌন তব মূর্ত্তিখানি
প্রলয়-আকাশপটে সৃজনের বার্ত্তা দিবে আনি'।

অর্ঘ্য

কাদের নওয়াজ

হায় ভারতীর মন্দিরে আজ
কে দিবে 'গীতাঞ্জলি',
বন্ 'মহুয়া'র শাখায় শাখায়
ফুটাবে কে ফুল কলি ?
দূর বাঁশরীর মদির মন্ত্র,
বকুল হাস্নেহেনার গন্ধ,
আর কি মাতাবে বিপুল বিশ্ব,
'চৈতালি'-সুরে সচঞ্চল—
কহিবে কি হাওয়া—"বেলা পড়ে এল
চল্ বধূ তুই জলকে চল্।"

২

লক্ষ রাজার সঞ্চিত ধন
কল্পনা-মণি মঞ্জুষায়,
রেখেছিলে কবি আমাদেরি তরে
কেন তবে পলাতকার প্রায়—
চলি গেলে তুমি 'শেষ-খেয়ায়'
'পূরবী'র সুরে হায় গো হায় !—

বাজাইলে বাঁশী, 'বলাকা' পাখায়
পাঠাইলে লিপি স্বর্গমাঝ,
কনক তোরণে বরিতে তোমায়
ঐ হুর-পরী মেতেছে আজ।

৩

কোন দুখ নাই, কোন শোক নাই,
আমাদের 'রবি' মরেনি ভাই !
রবির কিরণ মিলাতে হঠাৎ
চন্দ্রালোকের আভাষ পাই।
সত্যি এ কথা মিথ্যা নয়,
সে আজি ব্যাপ্ত বিশ্ব-ময়,
পয়গম্বর নহে গো বন্ধু !
কাব্য-কাননে খোদ্-খোদার—
লভেছিল সে যে অতুল আসন
তাহারে পাঠাই অর্ঘ্য-ভার।

কবি-কথা—উষসী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর ভিতরের দিকে বারান্দার কোন বিশেষ কোণে পাঁচ-ছয় বৎসরের দিব্যকান্তি এক শিশুর অপরূপ পাঠশালা বসিয়াছে। যেমন অদ্ভুত মাষ্টার, ততোধিক অদ্ভুত এই পাঠশালার ছাত্রদল এবং তাহাদের শিশু-শিক্ষকটির শাসনের প্রচণ্ড প্রতাপ।

ছোট একখানি চৌকিতে মাষ্টার বসিয়াছেন, হাতে তাঁর লাঠীর মত একগাছি মোটা বেত, মাষ্টার মহাশয়ের মুখখানা বর্ষার বর্ষণোন্মুখ আকাশের মত গম্ভীর। তাঁর সামনের দিকে ছাত্রদের সারি—বারান্দার একই আকার-বিশিষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি রেলিং! কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে, অদ্ভুত শিক্ষকের প্রাণবন্ত কল্পনা এই দারুময় নির্জ্জীব বস্তুগুলিকেই ছাত্রদলের সামিল করিয়া লইয়া ইহাদের প্রকৃতি পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ ছাত্ররূপী রেলিংগুলির শ্রীর পার্থক্য আমাদের এই শিশু-শিক্ষকটির দৃষ্টিপথে এরূপ সুস্পষ্ট যে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি বুদ্ধিমান, কাহারা বোকা, কোন্‌টি খুব ভাল মানুষ, আর কে কে অত্যন্ত খারাপ বা দুষ্ট—ইহা নির্ণয় করিতে কিছুমাত্র বেগ তাঁহাকে পাইতে হয় না।

বুদ্ধিমান ছেলেদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়রা চিরদিনই সদয় ও প্রসন্ন থাকেন, যাহারা ভাল মানুষ ছেলের দলে—পড়াশুনায় তেমন ভালো না হইলেও শিষ্টতার অনুরোধে তাহাদিগকেও রেহাই পাইতে দেখা যায়; কিন্তু খারাপ বা মন্দ ছেলেদের দুর্গতির আর অন্ত থাকে না। আমাদের এই শিশু-শিক্ষক মহাশয়টির ক্লাসেও এই সনাতন নীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পড়ানো অপেক্ষা পীড়নটাকেই ইনি বেশি মাত্রায় প্রশ্রয় দিতে সচেষ্ট; ফলে চিহ্নিত মন্দ ছেলেগুলির উপর ক্রমাগত তাঁহার হাতের লাঠি পড়িয়া পড়িয়া এমনই তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটাত যে বাকশক্তি এবং প্রাণশক্তি থাকিলে তাহারা চীৎকার তুলিয়া বাড়ী মাথায় করিত, আর প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিত।

এদিনও অপরাহ্ণে শিক্ষক মহাশয় সনাতন ব্যবস্থায় দুষ্ট ছেলে কয়টির উপর অতিশয় নির্দ্দয়ভাবে লাঠি চালাইতেছিলেন। আজ যেন তাঁহার মাথায় খুন চাপিয়া বসিয়াছে। লাঠির চোটে দুর্গতদের দেহের বিকৃতি যতই ঘটিতেছে, ততই তাহাদের উপর শিক্ষক মহাশয়ের রাগ ভীষণভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে; কি করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে তাহা যেন ভাবিয়া ভাবিয়া কুলাইতে পারিতেছেন না।

পীড়ন যখন চরমে উঠিয়াছে তখন ছোট একটি বালিকা অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া সকৌতুকে কহিল—এ আবার কি খেলার ঢং? কাঠের রেলিংগুলোকে অমন ক'রে ঠেঙ্গাচ্ছো কেন?

শিক্ষক মহাশয় অবিচলিত কণ্ঠে জানাইলেন—দেখতে পাচ্ছ না ইস্কুল করে বসেছি। এগুলো হচ্ছে ভারি পাজি ছেলে, তাই শাসন করছি।

কলহাস্যে বালিকা কহিল—বা-রে, ওরা ত গরাদে, ছেলে হতে যাবে কেন?

শিক্ষক উত্তর দিলেন—আমিও ত ছোট্ট ছেলে, মাষ্টারী করছি কেন? আমাদের ইস্কুলে যা হয় দেখি, তাই করছি! এতগুলো জ্যান্ত ছেলে কোথায় পাব বল, তাই বারান্দার রেলিংগুলোকেই ছেলে করে নিয়েছি। আমাদের ইস্কুলেও এমনি হয়।

দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—এমনি করে বেদম ঠেঙ্গায়?

শিক্ষক কহিলেন—শুধু তাই, আরও অনেক শাস্তি দেয়। পড়া বলতে না পারলে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দুহাতে দুগাদা শিলেট দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাড়ুগোপাল ক'রে রাখে। এর উপর যারা দুষ্টুমি করে তাদের পীঠে পড়ে সপাসপ বেত—আমি যেমন করে পিটছিলেম।

বালিকা কি ভাবিয়া প্রশ্ন করিল—তোমাকেও মারে ত?

মুখখানা গম্ভীর করিয়া শিক্ষক উত্তর দিলেন—আমি ত দুষ্টুমি করি না, মারবে কেন? এই ছেলেটির মত আমি

যে একধারে চুপটি করে বসে থাকি। আমি কি এটাকে চাবুক পেটা কোনদিন করেছি ?—বলিয়াই হাতের লাঠিটি দিয়া শিক্ষক মহাশয় তাঁহার ক্লাসের নির্দ্দিষ্ট ভাল মানুষ রেলিং-ছাত্রটিকে নির্দ্দেশ করিলেন।

ঠোঁট দুটি উল্টাইয়া কোমল মুখখানির এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া বালিকা কহিল—ধ্যেৎ! ছাই খেলা। তার চেয়ে চলো না ওদিকে যাই, সব দেখি।

—কোথায় ? কি সব দেখবো শুনি ?

—রাজার বাড়ী গো ? সেখানে কত কি !

মুখখানি ম্লান করিয়া বালক বলিলেন—জান ত, বাইরে বেরুবার যো নেই, আমার যাওয়া হবে না।

বালিকা সহাস্যে জানাইল—বাইরে কেন, রাজার বাড়ী যে এই বাড়ীর ভেতরেই। চল না যাই।

বালকের মন ও দৃষ্টি তাঁহার ছাত্রদের দিকেই নিবদ্ধ, সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনীর একান্ত অনুরোধেও বিক্ষিপ্ত হইল না। অভিমানে বালিকা রাজার বাড়ীর তল্লাসে চলিয়া গেল।

এই শিশু-শিক্ষক জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের দুলাল—রবীন্দ্রনাথ। ভাবী কবির শৈশবের এই আখ্যায়িকাটি অবলম্বন করিয়া আমরা কথা আরম্ভ করিতেছি।

২

কথার পূর্ব্বে ঠাকুরবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অপরিহার্য্য। বংশের দুলালকে চিনিতে হইলে বংশলতাটির গতিধারার সন্ধানটুকুও জানা আবশ্যক। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং রাজধানী কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর পরিবারের ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমান গড়ের মাঠে এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সান্নিধ্যে ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান আমীন জয়রাম ঠাকুরের আমীরোচিত বিশাল বাসভবন তাঁহার সমৃদ্ধির পরিচয় দিত। জয়রামের মৃত্যুর পর ফোর্ট উইলিয়ামের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানী তাঁহার দুই পুত্র নীলমণি ও দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্যে উদ্যান সম্বলিত উক্ত অট্টালিকা ক্রয় করেন। অতঃপর ইহাঁরা পাথুরেঘাটায় সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। ১৭৮৪ অব্দে কলিকাতার এই বিশিষ্ট ঠাকুর বংশটি দ্বিধা বিভক্ত হয়। জয়রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় বহু ব্যয়ে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কনিষ্ঠ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গোষ্ঠী পাথুরিয়াঘাটায় পুরাতন প্রাসাদেই বসবাস করিতে থাকেন। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন, রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর বংশধর। আর স্বনামখ্যাত প্রিন্স দ্বারকানাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জোড়াসাঁকো ঠাকুর গোষ্ঠীর মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান।

শেষোক্ত গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। যেন—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়! দ্বারকানাথের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল সম্মান, অসামান্য ব্যক্তিত্ব এদেশ ও বিদেশের রাজপুরুষ এবং অভিজাতবর্গকে চমৎকৃত করিয়া তুলে। তৎকালে এমন কোন জনহিতকর অনুষ্ঠান ছিল না, দ্বারকানাথের অর্থে যাহা পুষ্ট হইবার সুযোগ না পাইয়াছে। তাঁহারই উদ্যোগে জমিদার সভা (Landholder's society), ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, হিন্দু কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হয়। রাজপুরুষগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন; ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। তখনকার গভর্ণর জেনারেল প্রায়ই জোড়াসাঁকোর প্রাসাদে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। বিদেশেও দ্বারকানাথের সম্মানপ্রতিষ্ঠার অন্ত ছিল না। রোমে মহামান্য পোপের নিকট তিনি সমাদৃত হন, ইটালীর রাজা, ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া দ্বারকানাথের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন; এমন কি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সাম্রাজ্ঞীর সহিত ভোজন করিবার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে রাজার মত বিলাস আড়ম্বরে ও বিপুল জাঁকজমকে থাকিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'প্রিন্স' বলিয়া সম্মানিত করিতেন। সেই সূত্রেই তিনি 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' নামেই পরিচিত হন।

দ্বারকানাথের তিন পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। স্বনামখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনধারা আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করে এবং তাহাতেই তিনি 'মহর্ষি' আখ্যা লাভ করেন।

পিতামহীর অন্ত্যেষ্টিকালে দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রথম বৈরাগ্য-ভাবের সঞ্চার হয়। তখন তিনি নবীন যুবা, বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। এই বয়সেই সত্যতত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ দুর্ব্বার হইয়া ওঠে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহারই উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, উপনিষদের অনুবাদ রচনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। জীবনের শেষভাগে অধিকাংশ কালই তিনি উত্তর ভারতে হিমালয় অঞ্চলে থাকিয়া যোগসাধনা করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী সারদা দেবী যথার্থই রত্নগর্ভা ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত পনেরোটি পুত্রকন্যার মধ্যে অধিকাংশই কৃতী, বিখ্যাত এবং বংশ ও জাতির গৌরবস্বরূপ। জ্যেষ্ঠ ঋষিকল্প সুধী দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ, আর এক পুত্র স্বনামধন্য সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কন্যা সুপ্রসিদ্ধা স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি।

যে শিশুটির কাহিনী আমরা সূচনায় উল্লেখ করিয়াছি, তিনি মহর্ষির সপ্তম পুত্র। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭ মে ১৮৬১) ঠাকুরবংশের সহিত জাতির মুখ উজ্জ্বল করিতে শুভক্ষণে জোড়াসাঁকোর ভবনে অবতীর্ণ হন। তাহার পর এই কয়টি বৎসর কিরূপ ধরা-বাঁধা ব্যবস্থার ভিতর দিয়া শিশুর জীবনযাত্রা চলিয়াছে, নিজের মনেই তাহার চর্চ্চা করিয়া শিশু তুষ্ট থাকেন, এক এক সময় তাঁহার সমবয়স্কা সঙ্গিনীটির কাছে এ সম্বন্ধে এক আধটি কথা ব্যক্ত কয়েন, এই পর্য্যন্ত।

জ্ঞান হইয়া অবধি শিশু দেখিয়া আসিতেছেন, কোন বিষয়েই তাঁহার স্বাধীনতা নাই, সদাসর্ব্বদাই তাঁহাকে চাকরদের শাসনের অধীনে থাকিতে হয়; তাহারাও আবার এ সম্বন্ধে এতই সচেতন যে, নিজেদের কর্ত্তব্যকে সরল করিবার জন্য তাহারা এ বাড়ীর শিশুদের নড়া-চড়া পর্য্যন্ত এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শ্যাম নামে এক চাকরের প্রতাপ ও প্রভাব এতই কড়া যে, শিশু-রবিকে সে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া তাঁহার চারিদিকে গণ্ডি কাটিয়া দিত! আর সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখে তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত—'খবরদার! গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।" কথাটা শুনিয়া শিশুর মনে বড়ো রকমের একটা আশঙ্কা জাগে; কেন না এই বয়সেই তিনি রামায়ণের আখ্যায়িকায় লক্ষ্মণের গণ্ডি পার হইয়া সীতার সর্ব্বনাশের কাহিনীটি শুনিয়াছেন। কাজেই গণ্ডি পার হইতে মনে তাঁর আশঙ্কা জাগিত যদি কোন সর্ব্বনাশই আসিয়া পড়ে!

কিন্তু শিশু-রবির দৃষ্টিকে ত আর গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী করিয়া রাখা সম্ভবপর ছিল না; ডাগর ডাগর দুটি চক্ষুর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ঘরের জানালার মুক্ত খড়খড়ির ভিতর দিয়া সন্নিহিত পুকুরটিকে একখানা ছবির বহির মত করিয়া নিবিষ্ট ভাবে তিনি পড়িয়া লইতেন। তাহাতে কত-কিছুই সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতিপটে রেখা টানিয়া দিত। নানা আকার ও প্রকৃতির যে সব পুরুষ নারী বালক বালিকা বহু বিচিত্র ভঙ্গীতে পুকুরের জলে নামিয়া অবগাহন করে, তাহাদের মধ্যে কাহার স্নান করিবার ধারায় কিরূপ বৈচিত্র্য, স্নানের সঙ্গে সঙ্গে কে কিরূপ সুরে মন্ত্র আওড়াইয়া থাকে—শিশুর দৃষ্টিতে কিছুই এড়াইত না, স্থায়ীভাবে দাগ টানিয়া দিত। শুধু কি এই ভাবে নিরবচ্ছিন্ন দেখাশুনাই চলিত? দেখিতে দেখিতে মনে হইত শিশুর—ঐ পুকুর, তার অথৈ জল, পাড়ের বাগান, মাটি, গাছ-পালা, দূরের আকাশ, প্রত্যেকেই যেন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে, আলাপ করিতেছে, কত কি বলিতেছে; ইহারা যেন ঘরের ভিতরে গণ্ডি-বন্ধনে-আবদ্ধ শিশুর মনটিকে কিছুতেই উদাসীন থাকিতে দিবে না, জগত ও জীবন এই দুটির মধ্যে কি রহস্যময় সম্বন্ধ—ইহারা যেন জোর করিয়াই শিশুর মনে তাহার জট পাকাইয়া দিতে ব্যস্ত।

শিশুর নড়-চড়-সম্বন্ধে ত এরূপ শাসন, খাওয়া পরার ব্যাপারটিও অতিশয় সাদাসিধা এবং সাধারণ। আহারে সৌখিনতার নামগন্ধও নাই, কাপড় চোপড়ও এতই যৎ-সামান্য যে প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশধরের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। অথচ বড়োদের ব্যবস্থা সব দিক দিয়াই সকল রকমে এতই স্বতন্ত্র ছিল যে, শিশু তাহার আভাসই পান মাত্র, নাগাল পান না। এক কথায় শিশুর পক্ষে বাঞ্ছিত কোন জিনিসই সহজে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ আবেষ্টনে শিশু-রবি মানুষ হইতেছিলেন তাঁহার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আর দুইটি বালকের সঙ্গে। তাঁহাদের একজন শিশুর 'জ্যোতিদাদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অন্যটি ভাগিনেয়

সত্যপ্রকাশ। ইঁহাদের তুলনায় শিশু-রবির বয়স অনেক অল্প, তথাপি এই বয়সেই পাঠ্যপুস্তক লইয়া ইঁহাদের সহিত গৃহশিক্ষকের নিকট পড়িতে বসেন, তিনি সুর করিয়া পাঠ দিলেন—জল পড়ে, পাতা নড়ে। শিক্ষকের মুখে সুরের এই প্রথম ঝঙ্কার শিশুর কানে যেন অমিয় বর্ষণ করে, কে যেন তাঁহাকে চুপি চুপি বলিয়া দেয়—আদি কবির ইহাই প্রথম কবিতা! আনন্দে শিশু-মন ভরিয়া ওঠে, মধুর স্বরে বার বার পড়িতে থাকেন সুর করিয়া—জল পড়ে, পাতা নড়ে। পাঠের গতি ক্রমশ অগ্রগামী হইতে থাকে, পরবর্ত্তী পাঠে আনন্দ যেন ছাপাইয়া ওঠে, শিশু সুর করিয়া পড়েন—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান। শিশুর মানস-নদও পুলকের বানে ভাসিয়া যায়।

এই অবস্থায় একদা শিশু-রবি শুনিলেন, তাঁর দুই বয়োজ্যেষ্ঠ পাঠসঙ্গী বাড়ীর পড়া শেষ করিয়া ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হইবেন। শিশুর তখন কি বিক্ষোভ, দুর্জ্জয় জিদ—এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন না কিছুতেই, তিনিও ভর্ত্তি হইবেন। গৃহশিক্ষক বুঝাইলেন, বাধা দিলেন, পীঠে চপেটাঘাত করিলেন, কিন্তু শিশুর জিদ ও দারুণ রোদন সব ব্যর্থ করিয়া দিল। অগত্যা তিনিও ঐ সঙ্গে ভর্ত্তি হইবার অধিকার পাইলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের সংস্রবে গিয়া শিশু শিক্ষক মহাশয়দের শাসনপ্রণালীর যে নিদর্শন পান, ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়া বারান্দার একটি বিশেষ কোণে কিরূপ উৎসাহে তাহার অনুকরণ করেন—প্রথমেই তাহার চিত্র আমরা অঙ্কিত করিয়াছি।

৩

এত অল্প বয়সে কোন ছেলেই বড়ো স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতে যায় না। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর শিক্ষক মহাশয়-গণ সম্ভবত শিশু-রবির প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই শিশু ছাত্রটি যে ছুটির পর বাড়ী গিয়া খেলাধূলার ছলে তাঁহাদেরই অনুষ্ঠিত শাসন-পদ্ধতির অভিনয় করিয়া থাকে, এ সংবাদ সম্ভবত তৎকালে কেহই তাঁহাদের কানে তুলিবার সুযোগ পান নাই। এদিকে শিশুর উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়িল; এই বিদ্যালয়টি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিল না। শিশু-রবি এবার নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

কিন্তু এখানেও গোল বাধিল এবং কতিপয় পদ্ধতি শিশুর মনে প্রচণ্ড দোলা দিল। শিশু দেখেন, ক্লাস বসিবার আগেই স্কুলের ছেলেরা একত্র সারিবদ্ধ হইয়া স্তোত্রের মত করিয়া একটা ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে। কি যে পড়ে, কেহই তাহা ভালো করিয়া বলিতে পারে না, কোনরূপ অর্থবোধও কেহ করে না, শিক্ষক মহাশয়রাও অর্থটা বুঝাইয়া দেন না। শিশুর মন ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। কিন্তু মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া তিনি পাঠাভ্যাসে রত হইলেন।

কিন্তু এখানেও বিঘ্ন উপস্থিত করিল সহপাঠীদের অশিষ্ট ও অসঙ্গত আচরণ এবং একটা ব্যবধান রচিয়া উঠিল—ক্লাসের কোন শিক্ষকের মুখে কদর্য্য ও কুৎসিত ভাষার উচ্চারণে। অশিষ্ট ব্যবহার ও অভদ্র ভাষার প্রতি শিশুর বিদ্বেষ ও বিরাগ এমনই নিবিড় হইয়া উঠিল যে, তিনি সহপাঠীদের সহিত মিশিতেও পারিলেন না এবং অভদ্র সেই শিক্ষকটির সহিতও সহযোগিতা করিলেন না।

শিশুরবির বয়স এ সময় সাত-আট বৎসর, অনুভব শক্তি অতিশয় প্রবল, সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের কত রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়; কিন্তু মুখে তাঁহার কোন কথাই কেহ শুনিতে পায় না, ক্লাসে সবার শেষে তিনি নীরবে বসিয়া থাকেন। বিশেষত, তাঁহার বিদ্বিষ্ট শিক্ষকটি ক্লাসে আসিলে তাঁহাকে একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে দেখা যায়। শত চেষ্টা করিয়াও এই শিক্ষক নির্ব্বাক ছাত্রটির মৌনব্রত ভঙ্গ করিতে পারে না। অগত্যা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে রীতিমত একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। ইঁহার পিরিয়ডে শিশু নির্ব্বাক থাকিলেও ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে তাঁহার উদ্দাম মন। কত তরল সমস্যা, কত উদ্ভট আবিষ্কারের চিন্তা শিশুর মনোরাজ্য তোলপাড় করে! মনে ভাবের আবর্ত্ত ওঠে—আচ্ছা, আমি ত নিরস্ত্র, হাতে কিছু নেই, এ অবস্থায় অসংখ্য শত্রু এসে যদি আমাকে আক্রমণ করে, কি উপায়ে আমি তাদের হারাতে পারি?...পৃথিবীতে কত রকমের লড়াইয়ের কথা ত শুনি, আচ্ছা—যদি সিংহ বাঘ কুকুর ভাল্লুক এদের সব শিখিয়ে ব্যূহের প্রথম লাইনে সাজানো হয়, তারপর লড়াই শুরু হতেই শত্রুর উপর এই সব শিকারী জন্তুগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হয়—তাতে ফল ভাল হবে না? জন্তুগুলোর পরে যোদ্ধারা এগিয়ে যাবে—শত্রুরা তখন কি নাকালেই পড়ে!...ক্লাসে যখন পড়া চলিতে

থাকে, শিশু তাহাতে নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকিয়া এই সব সমস্যার সমাধান করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ছাত্রদের উদ্দেশে শিক্ষক মহাশয়ের রূঢ় অভদ্র বাণী শিশুর ভাবধারা ভাঙ্গিয়া দেয়, তপ্ত কাঞ্চনের মত সুন্দর মুখখানি তাঁর ঘৃণায় উত্তেজনায় রাঙ্গা হইয়া ওঠে।

এই বিদ্রোহী ছাত্রটির সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয়ের মনের মধ্যেও বিদ্বেষ সঞ্চিত হইতেছিল। তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ইহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল হইল বিপরীত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় ছেলেদের পরীক্ষা করেন, সেই পরীক্ষায় শিশু-রবিই সকল ছেলের চেয়ে বেশি নম্বর পাইলেন। শিক্ষক মহাশয়ও অবাক! যে ছেলে ক্লাশের একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে,সে পাইল কি-না সকলের চেয়ে বেশি নম্বর! অমনি কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি জানাইলেন, 'বাচস্পতি মহাশয় ঠাকুরবাড়ীর এই ছেলেটির প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেছেন, এ ছেলে পড়াশুনা কিছুই করে না, এত বেশি নম্বর এর পাবার কথা নয়।' এ অবস্থায় পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইল, এবার স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। কিন্তু শিক্ষকের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শিশু-রবির ভাগ্যদেবতা এবারও তাঁহার গলায় সাফল্যের জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

৪

আর যাহাই হউক না কেন, বাহিরের মুক্ত বাতাস পাইয়া বালক রবির মনের জড়তা ধীরে ধীরে কাটিতেছিল, বয়সের অনুপাতে দেহযষ্টিও বৃদ্ধির দিকে উঠিতেছিল। বালকের অপর দুই বয়োজ্যেষ্ঠ সাথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রকাশ বয়স ও বিদ্যার পথে অনেকটা অগ্রবর্ত্তী হইলেও তাঁহাদের এই অল্পবয়স্ক সাথীটিকে উপেক্ষা না করিয়া অনেক বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। ইহাতে বালকের অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি ছেলে ভৃত্যদের এলাকা পার হইয়া এখন অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়াছেন, সেই সঙ্গে চিত্তবৃত্তিকে অনেকটা সঙ্কোচমুক্তও করিয়া ফেলিয়াছেন। বালক-রবির এ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতাটুকু উভয়ের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে এবং এই লাজুক ছেলেটির সঙ্কোচ কাটাইবার জন্ত ইঁহারা সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

সেদিন বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি জিন-আঁটা সজ্জিত ঘোড়া সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ঘোড়াটি আয়তনে ছোট, টাট্টু জাতীয়, কিন্তু অত্যন্ত তেজী। আমাদের বালক-রবিও নিকটে দাঁড়াইয়া সুশ্রী জন্তুটির গ্রীবাদেশের বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিতেছিলেন। সহসা কোথা হইতে কিশোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিয়া একান্ত অতর্কিত অবস্থায় বালক-রবিকে সেই তেজস্বী বাহনটির পীঠের উপর চড়াইয়া দিয়া জোর গলায় বলিলেন—হুঁসিয়ার রবি, কোসে লাগামটা চেপে ধর্, ঘোড়া এবার ছুটবে।

বালক ইহার পূর্ব্বে কোন দিন ঘোড়ার পীঠে উঠেন নাই; এই সুন্দর জীবটিকে তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার জ্যোতিদাদা যে এ ভাবে তাঁহাকে জবরদস্তি করিয়া ঘোড়াটির পীঠে চড়াইয়া দিবেন, ইহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। দাদার কাণ্ড দেখিয়া সভয়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন—নামিয়ে দাও আমাকে, ঘোড়ার পীঠে আমি চড়বো না—

কিন্তু দাদা তাঁর কথা শুনিবার পাত্রই বটে, ঘোড়ার পীঠে চাবুক লাগাইয়া তিনি তাহাকে তখন দৌড় করাইয়া দিয়াছেন। বালক-রবিকে অগত্যা শক্ত হইয়া ধাবমান ঘোড়ার রাশ চাপিয়া ধরিতে হইল, মনে সাহস জাগিল, পিছনে চাহিয়া দেখেন—বিপুল উৎসাহে দাদাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছেন! খানিকটা ছুটাছুটির পর দাদা স্নেহের ভাইটিকে সাদরে ঘোড়ার পীঠ হইতে নামাইয়া পীঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—কেমন, ভয় সঙ্কোচ তো কেটে গেলো! এর পর নিজের মনেই সখ হবে ঘোড়ার পীঠে চড়ে ছুটতে।

লেখাপড়ার সঙ্গে এ বাড়ীর ছেলেদের গান বাজনা শিখিবারও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বালক-রবি স্বভাবতই লাজুক বলিয়া সাহস করিয়া গানের দিকে ঝুঁকিতেন না—যদিও অন্তরে তাঁহার ঔৎসুক্যবোধ প্রবল হইয়া উঠিত। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অনুজের এ দুর্ব্বলতাটুকুও ধরা পড়িয়া যায় এবং একদা তিনি ভাইটিকে তাঁহার পিয়ানোর কাছে বসাইয়া হুকুম করিলেন—আমি সুর দিচ্ছি, তুই গান ধর্।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সিদ্ধ হাতে পিয়ানোর মধুঢালা সুর গান গাহিবার সঙ্কোচ হইতেও বালকের চিত্তকে মুক্ত করিয়া



'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ (বয়স ২১ বৎসর)



লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় (বয়স ১৯ বৎসর)



রবীন্দ্রনাথ ও তদীয় বন্ধু লোকেন পালিত



রবীন্দ্রনাথ (বয়স ২৯ বৎসর) (দক্ষিণে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা), বামে জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ)



৩৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে বোলপুর শ্রীনিকেতনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও রবীন্দ্রনাথ — ফটো— তারক দাস



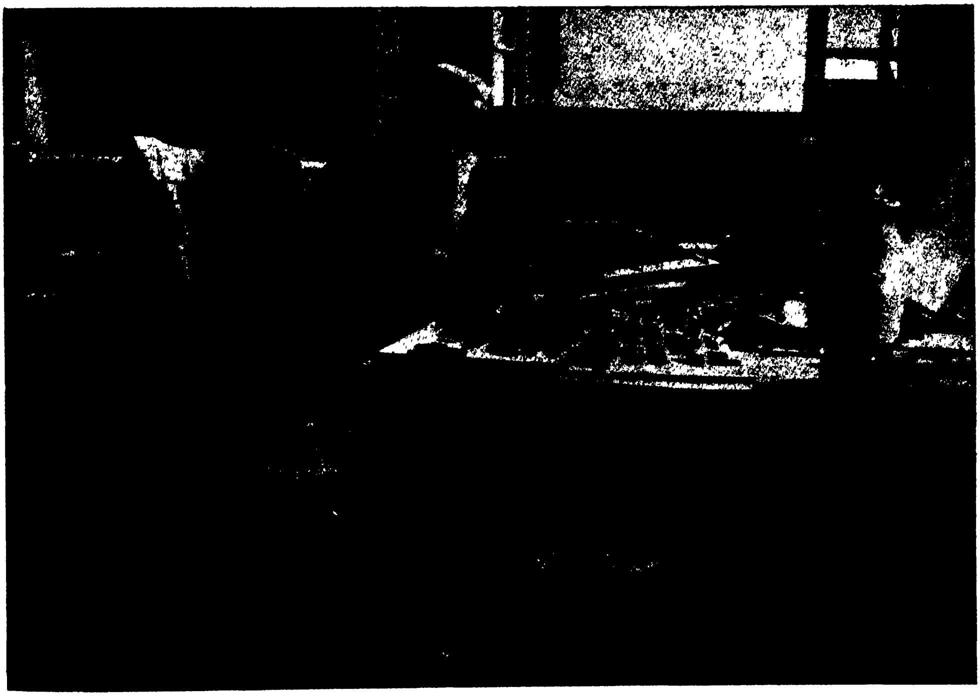
দিল। এই দিন হইতে কিশোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোয় সুর দিতেন, বালক-রবি তাহার সাথে কণ্ঠে মধুবর্ষণ করিতেন। শুধু সুরের ও গানের শিক্ষা নয়, সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চ্চায় এই সময় হইতেই জ্যোতিদাদা বালক-রবির প্রধান সহায় হইয়া ওঠেন, ছোট ভাইটিকে বালক ভাবিয়া ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনা করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হইতেন না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতবিদ্য দৌহিত্র জ্যোতিপ্রকাশ এই সময় এ বাড়ীতে থাকিয়া ইংরেজী কাব্যের চর্চ্চা করিতেছিলেন। বয়সে তিনি বালক-রবির অপেক্ষা অনেক বেশি বড় হইলেও সহসা কিসের আকর্ষণে কে জানে, অল্পবয়স্ক মাতুলটিকে দিয়া কবিতা লেখাইবার উৎসাহ তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। একদিন অসময়ে সহসা তিনি বালক-রবিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গেলেন এবং নীল রঙের একখানা খাতা ও পেনসিল বালকের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—তোমাকে ধরে এনেছি কেন জান, এখানে ব'সে পদ্য লিখবে ব'লে।

এই অদ্ভুত আবদার শুনিয়া বালক ত আকাশ হইতে পড়িলেন। ছাপার অক্ষরেই তিনি এ পর্য্যন্ত কবিতা দেখিয়াছেন, তাহা যে পেনসিল দিয়া খাতায় লেখা যায়—ইহা যে কল্পনারও অতীত। কুণ্ঠিত বালক জানাইলেন—কি সর্ব্বনাশ, আমি পদ্য লিখবো? তুমি কি বলছো?

জ্যোতিপ্রকাশ গম্ভীরভাবে বলিলেন—কেন, পদ্য লেখা কি এমন হাতী-ঘোড়া? অভ্যাস করলেই পারবে।—বলিয়াই তিনি বালক-মাতুলকে পয়ার ছন্দে চোদ্দ অক্ষর মিলাইয়া কবিতা রচনার রীতি-পদ্ধতি বুঝাইয়া দিলেন।

কে যেন চোখের পলকে বালকের চোখের উপর হইতে একটা পরদা সরাইয়া দিল, তাঁহার সহজাত সংস্কারের আলোটি তৎক্ষণাৎ উদ্ভাসিত হইয়া কাব্যকাননের প্রবেশ-পথটি যেন চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। বিপুল উৎসাহে বালক খাতার উপর পেন্‌সিল ঘসিতে লাগিলেন, গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়া-তাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল তখন পদ্য রচনার মহিমা সম্বন্ধে বালকের মনে মোহ আর টিকিল না। একদিনেই বালক একটি পয়ার



চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথ (শ্রীযুত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে—ফেব্রুয়ারী ১৯৩২)

রচনা করিয়া ফেলিলেন, তখন তাঁহার কি উৎসাহ! আর ভয় যখন একবার ভাঙ্গিয়া গেল তখন আর বালক কবিকে ঠেকাইয়া রাখে কাহার সাধ্য!

এখন হইতে আমাদের বালক-কবির প্রধান কাজ হইল নির্জ্জন ঘরে বসিয়া জ্যোতিপ্রকাশের দেওয়া নীল খাতাখানির পাতায় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে পয়ার ছন্দে কবিতা লেখা। যাহা লেখেন কবি, নিজেই মনের আনন্দে সুর করিয়া পড়েন, আনন্দে দেহ মন নৃত্য করিতে থাকে।

ভিতরের দিকের বারান্দার সেই বিশেষ অংশটি—যেখানে আমাদের শিশু রবির বিচিত্র পাঠশালা বসিত, এখন সে পাট উঠিয়া গিয়াছে, বালক এখন সেখানে কবির ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া পদ্যের কথা ভাবেন। ঘরের ভিতরে একদা গণ্ডি-বন্ধনের মধ্যে বসিয়া জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া কবির দৃষ্টি পুকুর পাড় মাটি গাছ আকাশ প্রভৃতির সহিত মিশিয়া যাইত, বালকের কানে তাহাদের কথার সুর ঝঙ্কার দিত, এখন কবির মানসপটে সেগুলি কেতাবের পাতার মত স্পষ্ট হইয়া ওঠে, বালক-কবি ভাবের আবেগে তাহাতে লেখার কত উপাদান দেখিতে পান।

বালকের কলমে যেদিন প্রথম কবিতাটি রূপ পরিগ্রহ করিল, তখন কি অপরিসীম উল্লাস তাঁহার মনে। একবার দুইবার তিনবার উপর্য্যুপরি পড়িয়াও সাধ মিটে না, এ আনন্দ এতদিন কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল?

বালক-কবি যখন এই ভাবে অভিভূত, সেই সময় খেলার সঙ্গিনী সেই বালিকাটি আসিয়া বলিল—কি করছ একলাটি এখানে বসে, রাজার বাড়ী খুঁজে পেয়েছি, দেখবে ত চল।

ভাবাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বালিকার পানে চাহিয়া কবি বলিলেন—রাজার বাড়ী তুমি খুঁজে পেয়েছ, আর আমি পেয়েছি এক নতুন রাজ্য।

চোখ দুটি বড়ো করিয়া বালক-সাথীর দিকে চাহিয়া বালিকা বলে—রাজার বাড়ী পেয়েছি, গিয়েছিলাম আজ, কিন্তু রাজাকে পাই নি, রাজা কোথায় কে জানে!

বালক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন—আমার নতুন রাজ্যটি দেখবে? সে কিন্তু দেখাবার নয়, শোনাবার। শুনবে?—বলিয়াই বালক-কবি তাঁহার নবরচিত প্রথম কবিতাটি সুর করিয়া পড়িতে শুরু করেন—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।
মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জল ক্রীড়া করে।

বালিকার চিত্ত বোধ হয় অন্য কোন তত্ত্বানুসন্ধানে নিবিষ্ট ছিল, তাই বাল্যসাথীর মুখে পদ্যটি শুনিয়া নৈরাশ্যের সুরে বলিয়া উঠিল—কই, এতে তো রাজা নেই!

কথাটা বোধ হয় বালক-কবির চিত্তে আঘাত দিল, ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে কহিলেন—না, রাজা এখনো আসেনি, তবে পরে হয়তো আসতে পারে।

বালিকা বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গি করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলে—সবাই ত তাই বলে, রাজা আসবে। কিন্তু তুমি রাজার বাড়ী দেখবে না? আমি কিন্তু দেখে এসেছি। এসো না আমার সঙ্গে, তোমাকেও দেখিয়ে আনি।

কবির চিত্ত তখন পরবর্ত্তী রচনায় নিবিষ্ট হইয়াছে, বালিকার আগ্রহ তাঁহার মনে কৌতূহল উদ্রিক্ত করে না, গম্ভীর মুখে বলেন—আমার সময় নেই, দেখছো না পদ্য লিখছি।

অভিমানে মুখখানি ফুলাইয়া বালিকা চলিয়া যায়। এইভাবে এক এক সময় বালক-কবি-সকাশে ফুলের সুবাসের মত এই রহস্যময়ী বালিকার আবির্ভাব হয়, তার মুখে শুধু রাজবাড়ী আর রাজার কথা। কিন্তু রাজা যে কে—সে কথা বালক কোনদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই, তাহার সঙ্গ ধরিয়া রাজার বাড়ী দেখিতে যাওয়াও ঘটিয়া ওঠে নাই, কবি তখন নবাবিষ্কৃত রাজ্যের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকেন, অবসর কোথায়?

৫

বালক রবির মনোরাজ্যে যখন এই ভাবে কবিতারাণীর আবাহন চলিয়াছে, সেই সময় ডেঙ্গুজ্বরের প্রচণ্ড প্রতাপ শহরবাসীকে ত্রস্ত ও বিচলিত করিয়া তুলিল। এ অবস্থায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সকলকেই কিছুদিনের জন্য শহরোপকণ্ঠবর্ত্তী পানিহাটির (পেনেটি) এক বাগানবাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইল। বালক-কবিও ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

শহরের আবেষ্টন হইতে কবি এই প্রথম বহির্জগতে পদার্পণ করিলেন। শহরের সহস্র অট্টালিকা, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাজপথ, সুসজ্জিত বিপণি, বিপুল জনস্রোত, বিভিন্নশ্রেণীর

যানবাহনাদি দর্শনে চির অভ্যস্ত ভাবুক বালকের দৃষ্টিপথে এই সর্ব্বপ্রথম প্রতিভাত হইল পল্লীশ্রীর অপূর্ব্ব সুষমা। শহরের লোক পল্লীদর্শনে সাধারণত প্রথম প্রথম তৃপ্তিলাভই করেন, পল্লীর দিগন্তবিসারী প্রান্তর, বিভিন্ন বৃক্ষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, নদীর শোভা তাঁহাদিগকে অভিভূত করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বালক-কবির চিত্তপটে বাঙ্গালার এই পল্লীশ্রী এক স্বপ্নাতুর আলেখ্য রূপায়িত করিয়া তুলিল।

বালক কবির মনে আনন্দ যেন আর ধরে না। বাগান-বাড়ীখানির গায়েই গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়াই কবি বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসেন, পেয়ারা-গাছগুলির অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া থাকেন, দেখিতে দেখিতে বালক-কবির চিত্তে জাগিয়া ওঠে যেন তাঁহার জীবনধারা অদূরবর্ত্তী ঐ গঙ্গার ধারার সহিত এক হইয়া চলিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা হয় ঘরের আবেষ্টন ছাড়িয়া এই ভাবে অহোরাত্র একভাবে বসিয়া শুধু নদীর ঐ অফুরন্ত শোভা দেখেন ; কিন্তু তাহার তো উপায় নাই, সে স্বাধীনতা কোথায় ?

খেলার সাথী বালিকাটিও পানিহাটির বাগান-বাড়ীতে আসিয়াছিল। ভাববিহ্বল কবির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চেয়ে চেয়ে দেখছো কি অমন করে ?

কবি একটু হাসিয়া কহিলেন—জিজ্ঞাসা করছো কেন ? তুমি দেখতে পাচ্ছ না কিছু ?

বালিকা বলিল—কেন দেখবো না, আমি কি কাণা, না বোবা, যে চুপ করে ঠায় বসে থাকি ? সমস্ত বাগানটাই ত ঘুরে এলাম, খালি গাছ আর গাছ ? এত গাছপালা নিয়ে এরা কি করে বল তো ? এত খুঁজলাম, রাজার বাড়ী তো দেখতে পেলাম না এখানে।

কবি বলিলেন—এ যে গাছপালার রাজ্য, বাগানটাই যে রাজার বাড়ী।

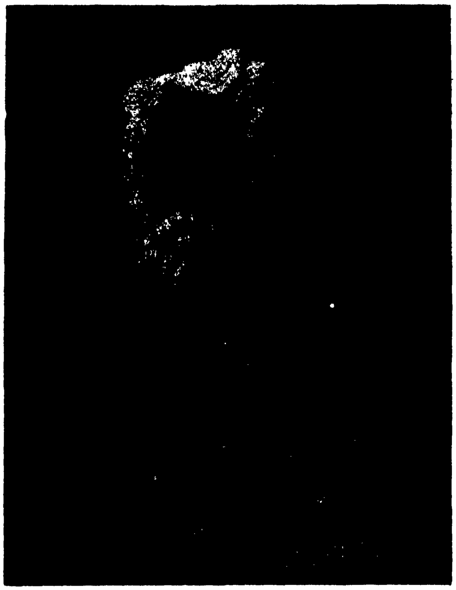
বালিকা অবজ্ঞার সুরে বলিল—ধ্যেৎ! রাজার বাড়ী আমি সেখানে দেখেছি, সে কেমন চমৎকার, কত ভালো—এসব ছাই!

বালিকার কথায় আঘাত পাইয়া কবি বলিলেন—ওকথা বলতে নেই; এখানকার গাছগুলি আমার ভারি ভালো লাগে, আরো ভালো হচ্ছে ঐ নদী।

বালিকা বলিল—ও তো গঙ্গা! মাগো, ওর দিকে চাইলেই ভয়ে বুকখানা আমার ঢিপ ঢিপ করে। জাহাজ একখানা গেলেই যে রকম ফুলে ফুলে ওঠে, আর নৌকোগুলো ডুবুডুবু হয়—

কবি হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু ডোবে না। আমি ত বসে বসে তাই দেখি। ওর চেয়ে আরো ভালো লাগে আকাশ যখন কালো হয়ে আসে, হু হু করে ঝড় ওঠে, চারিদিক ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, আর গঙ্গার ঢেউগুলো উলটেপালটে নাচতে থাকে, দেখে তখন কি আনন্দই যে আমার হয়—

বালিকার মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, আর্ত্তস্বরে বলিল—মাগো, তুমি যেন কি! যত সব অনাসৃষ্টির কথা। ভয় করে না তোমার ? চলনা ওদিকে দুজনে যাই, খুঁজে দেখি এখানে রাজার বাড়ী কোথাও আছে কি না।



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

কবি বলিলেন—রাজার বাড়ী তোমাকে যেমন ডাকে, আমাকেও তেমনি ডাকে ঐ নদীর জল।

কালো কালো ভুরুদুটি নাচাইয়া বালিকা প্রশ্ন করিল—যত সব আজগুবি কথা তোমার মুখে ; জল আবার মানুষকে ডাকে নাকি ? জল বুঝি কথা কয় ?

কবি উত্তর দিলেন—আমি জলের ডাক শুনতে পাই, আমার মনে হয় কি জান—সবাই যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। গঙ্গার ঐ জল, গাছের ঐসব পাতা, উপরের

ঐ আকাশ, এরা সবাই কথা বলে, আমি শুনি শুধু বসে বসে, কিছু বলতে কিছু পারি না, তাই ভাবি।

—তাহলে একলাটি এইখানে বসেই ভাবতে থাকো, আমি দেখি রাজার বাড়ী খুঁজে খুঁজে যদি বার করতে পারি— বলিয়াই বালিকা বাগানের দিকে ছুটিল।

গঙ্গার বুকের উপর এই সময় কতিপয় পাল-তোলা নৌকা বিচিত্র গতিতে গন্তব্য পথে ছুটিতেছিল, বালক কবির মুগ্ধ দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বালকের মনে হইতেছিল—তিনিও যেন গঙ্গাবক্ষে শ্রেণীবদ্ধভাবে গতিশীল নৌকাগুলির কোনটি আশ্রয় করিয়া বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিয়াছেন।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে উত্তেজনা আসিল, সবেগে উঠিয়া তিনি নদীর দিকে চলিলেন। সহসা অদূরবর্ত্তী পথের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠগণ পল্লীভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কবিও যথাসম্ভব তফাতে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তীদের অনুবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইতেই ধরা পড়িয়া গেলেন। বালকের এতটা দুঃসাহস ও স্বাধীনতাস্পৃহা তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং পল্লীভ্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কবিকে পুনরায় বাসায় ফিরিতে হইল।

বারান্দার কাছেই বালিকার সহিত দেখা; কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে কবির দিকে চাহিয়া সে কহিল—ফিরিয়ে দিলে তোমাকে—যাওয়া হল না তাহলে ?

ম্লানমুখে কবি উত্তর দিলেন—চাণক্যপণ্ডিতের শ্লোকটা ভারি সত্যি। তিনি বলেছেন—সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্। বাড়াবাড়িটা কিছুতেই ভাল নয়।

বালিকা প্রশ্ন করিল—একথা বলবার মানে ?

কবি উত্তরে বলিলেন—গঙ্গায় পাল-তোলা নৌকোগুলো দেখে ভাবছিলুম, আমি যেন বিনা ভাড়ায় ওতে চড়ে বসেছি, কত কি দেখছি। এমন সময় ওঁরা গ্রাম দেখতে চলেছেন দেখে ওঁদের পেছু নিই, কিন্তু যাওয়া হল না। ভাবছি, অবস্থার বদল কিছু হয়নি ; তখনো যেমন, এখনো তেমন।

বালিকা বলিল—তা কেন, তখন গণ্ডির ভেতরে থাকতে, সেটা ত উঠে গেছে।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কবি বলিলেন—তা গেছে। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসেছি দাঁড়ে ; পায়ের শিকল কিন্তু ঠিক আছে, কাটে নি।

সহানুভূতির সুরে বালিকা বলিল—সেই জন্যই তো বলি, রাজার বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কথা কি তুমি কানে নিলে ?

গাঢ়স্বরে কবি বলিলেন—আমার রাজবাড়ী ঐ নদীর বুকে, পায়ের শিকল কেটে দিয়ে ও-ই আমাকে কোলে তুলে নেবে।

বলিতে বলিতে কবি নদীর পাড়ের দিকে চলিলেন, অবাকবিস্ময়ে বালিকা এই অদ্ভুত ছেলেটির পানে চাহিয়া রহিল।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম্-এস্-সি

মৌন মানব মুখে যুগে যুগে যাহারা ফুটায় ভাষা
হতাশ হৃদয়ে জাগায় যাহারা নিত্য নবীন আশা—
যাদের ছন্দ-গানের প্রভাবে দেবত্ব লভে নর
তুমি যে তাদের কুলপতি ছিলে হে ভারত ভাস্কর !
কবি কালিদাস কবে কোন্ কালে গেয়ে গেছে তার গান
পণ্ডিত যারা তারাই কেবল করিত সে-রস পান।
তুমি কালিদাসে নিয়ে এলে কবি, বাঙলার ঘরে ঘরে
তাই আজ পথে লোধ্র শিরিষ ফোটে নীপ থরে থরে।
মঞ্জুলিকার কেশের গন্ধে উচাটন করে মন
মালবিকা এসে হাসিমাখা মুখে করে মৃদু আলাপন।
বেদান্ত ছিল প্রাণান্তকর দুর্বোধ ভাষা ঘিরে
তুমি সে উৎস আনিলে বঙ্গে পাষাণের বুক চিরে।
আকাশে বাতাসে একের প্রকাশ প্রচারিলে শত গানে
সুখ দুখ সব মায়ার ছলনা ক'য়ে গেলে কাণে কাণে।
তুমি বুলাইলে চক্ষে মোদের কি-যে মায়া অঞ্জন
আনন্দময় নিখিল বিশ্ব হেরি তাই অনুখন।

সারা পৃথিবীর জীবলোক সাথে আনন্দ রসস্বাদ
লয়েছিলে তুমি নিশিদিন, তবু মেটেনি তোমার সাধ।
তোমার বিরাট হৃদয়ে সতত বাজিত ব্যথিত-দুখ
পথের ভিখারী ফুল্ল দেখিলে তুমি হ'তে হাসি মুখ।
লাঞ্ছিত কোটি নরনারী তরে ক্ষুব্ধ মথিত প্রাণ
তোমার বাক্য আগ্নেয় স্রাবে হইত প্রবহমান্।
তুমি মহাকবি ভাস্বর রবি দীপ্ত রশ্মি তব
কিশলয় সম অচেতন প্রাণে দিল শিহরণ নব।
আদি পৃথিবীর আঁধার প্রভাতে রঙিণ সৌর করে
জাগিল যেমন প্রাণ-উচ্ছাস—তোমার মোহন স্বরে
তেমনি জাগিবে আঁধার বিশ্ব, শোণিত কুটিল কালো,
নবীন উদার রাখীবন্ধনে জ্বালিয়া প্রেমের আলো।
হৃদয় ঢালিয়া বেসেছিলে ভালো সকল জগৎ জনে
ঘর ছাড়ি তাই ঘরে ঘরে ঠাঁই লভিলে তাদের সনে।
অনুরাগে রাঙা বিশ্ববাসীর হৃদয় পদ্মদলে
রচিয়াছ তব পূজার দেউল জীবনের পলে পলে।

মহাপ্রয়াণ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জাতির সৌভাগ্য, দেশের মহাসৌভাগ্য প্রভৃতির ফলেই কোন দেশবিশেষে জাতিবিশেষের মধ্যে একজন মহামানবের জন্ম হয়। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক জন্মিতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহাদের খবর কয়জন রাখে ? কেহই রাখে না। কিন্তু বহু বৎসর অন্তর এক একজন এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাহার কথা যুগযুগান্ত ধরিয়া লোক শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। সেইরূপ মহাপুরুষ একজন বহুশত বৎসর পরে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তাঁহার কথা লোক কত সহস্র বৎসর ধরিয়া মনে রাখিবে তাহার কল্পনা করার শক্তিও আমাদের নাই। আমরা ভাগ্যবান—তাই তেমনই একজন লোকাতীত প্রতিভাবান ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম—আজ তাঁহাকে হারাইয়া ও আবার নূতন করিয়া পাইবার আশায় সেজন্য উৎফুল্ল হইতেছি।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে বৈশাখ—সে শুভদিনের কথা অনেকে বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবারটি লোক বহুকাল মনে রাখিবে। তুলসীদাস বলিয়াছিলেন—আমি যেদিন পৃথিবীতে আসি, সেদিন সকলে আমার আসার আনন্দে হাস্য করিয়াছিল, আর আমি কাঁদিয়াছিলাম—কিন্তু যখন আমি যাইব—তখন সকলে কাঁদিবে, আর আমি হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইব।

৭ই আগস্ট ভারতের গৌরবরবি রবীন্দ্রনাথ অস্তমিত হইয়াছেন—সেদিন সকলে কাঁদিয়াছে। কিন্তু যিনি চলিয়া গিয়াছেন—তিনি বহু পূর্ব্ব হইতেই মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন—তিনি কিছুতেই কাতর না হইয়া—যে পরম পিতার চিন্তায় ও যাঁহাকে পাইবার সাধনায় সারাজীবন রত ছিলেন, হাসিতে হাসিতে সেই পরমপিতার নিকট চলিয়া





শ্রীমুকুলচন্দ্র দে কর্তৃক চকখড়িতে অঙ্কিত ; লণ্ডন, ১৯২৬

গিয়াছেন। মহাপ্রয়াণের কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন—ঐ গান যেন তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর গীত হয়, গানটি সত্যই করুণ—

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী
লও লও হে ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতির ধ্রুবতারকা।
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি ভিন্ন এমন কথা কে বলিতে পারেন? আমরা উপনিষদের যুগের ঋষির কথা শুনিয়াছি, আর আজ রবীন্দ্রনাথের লেখা যতই পড়ি ততই মনে হয়, সেই বাণী ত রবীন্দ্রনাথ অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া সর্ব্বত্র তাহার প্রকাশ হইল কিরূপে?

২৫শে জুলাই অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার চিরপ্রিয় শান্তিনিকেতন হইতে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনয়ন করা হইল। বার্দ্ধক্যবশত তিনি পাকযন্ত্রের রোগে ভুগিতেছিলেন; কবিরাজ শ্রীযুত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের চিকিৎসায় তাহার কথঞ্চিৎ উপশম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ আরোগ্যের কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই। সেজন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্থির করিলেন, অস্ত্রোপচারের দ্বারা তাঁহাকে নীরোগ করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় কাতরতা দেখান নাই—কিন্তু তাঁহার অন্তরের অনুভূত বেদনার কথা চিন্তা করিয়া সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন, ইহাই ছিল বিধিলিপি; সেজন্য এবার রবীন্দ্রনাথকে অন্য কোথাও না লইয়া গিয়া ঐ প্রাসাদেই আনা হইল। চিকিৎসকগণের কয়েকদিন পরামর্শের পর ৩শে জুলাই তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইল। বিশ্বনিয়ন্তা সে দৃশ্য দেখিয়া অন্তরালে হাসিতেছিলেন; যাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণের দিকে চলিয়াছে, তাঁহার উপর অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইল—ফল ভাল হইল না। তাঁহার জীবনীশক্তি ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি লোক নিরাশ হয় নাই। কয়বৎসর পূর্ব্বে বিসর্পরোগে আক্রান্ত হইয়া অস্ত্রোপচারের পর তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন—এবারও লোক মনে করিতে লাগিল—তিনি সারিয়া যাইবেন। প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যুর কথা কি চিন্তা করা যায়! তাই কেহই তাঁহার স্বর্গারোহণের কথা চিন্তাও করেন নাই। ৫ই আগস্ট হইতে ক্রমে তাঁহার দেহ অবশ হইতে লাগিল—তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন এবং ৬ই তারিখে সারাদিন লোক কবিবরের অবস্থার কথা জানিবার জন্য বার বার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল। সারা দিনই সংবাদ পাওয়া গেল—ভয়ের কারণ নাই। ৭ই আগস্ট প্রভাত হইল—ভারতের এমন দুর্দ্দিন বহুকাল হয় নাই—সকালে কেহ তাহা চিন্তাও করে নাই। সকাল হইলে চিকিৎসকগণ রবীন্দ্রনাথকে পরীক্ষার পর ঘোষণা করিলেন - রবীন্দ্রনাথের জীবনীশক্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; তাঁহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগের অধিক বিলম্ব নাই। সকালেই টেলিফোন যোগে কলিকাতার সকল প্রধান ব্যক্তিকে খবর দেওয়া হইল—সকাল ৮টা হইতে তাঁহার গৃহে দলে দলে লোক গিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন, কাহারও মুখে কোন কথা নাই—সমগ্র জগত যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ঝটিকার পূর্ব্বে সমগ্র প্রকৃতি যেমন শান্ত ভাব ধারণ করে—সমগ্র কলিকাতা শহর সেই ভাব ধারণ করিল। কেহ জোর করিয়া কথা বলে না—সকলেই নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করে—কবিগুরুর খবর কি? কলিকাতার গণ্য মান্য সকল প্রধান ব্যক্তিই একে একে কবিগুরুকে শেষ দর্শন করিবার জন্য কবিগৃহে সমবেত হইতে লাগিলেন। সকাল হইতে অক্সিজেন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্য করা হইতেছিল।

কলিকাতাবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খনির্ব্বিশেষে সকলেই সেদিন নিজ নিজ কার্য্যে মন দিতে পারেন নাই—কখন বজ্রপাত হইবে সেই আশঙ্কায় অধীরভাবে সকলেই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বেলা ১২টা ১৩ মিনিটে ধীরে ধীরে কবিগুরু নশ্বর

জগতের সহিত সকল মায়া কাটাইয়া তাঁহার সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিলেন। তাহার ১০ মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার কষ্ট দেখিয়া অক্সিজেন প্রয়োগ বন্ধ করা হইয়াছিল। তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দৈনিক সংবাদপত্রগুলির বিশেষ সংখ্যার মারফতে সংবাদটি শহরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল। স্কুল, কলেজ, দোকানপাট, অফিস, আদালত—সবই সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করা হইল এবং সকলেই ধীরে ধীরে কবিগুরুর শবের শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার জন্য জোড়াসাঁকোর দিকে অগ্রসর হইলেন। রেডিওযোগেও খবরটি তখনই দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল—কোন্ সময়ে শব শোভাযাত্রা আরম্ভ হইবে, কোন্ পথ ধরিয়া তাহা ঘুরিবে এবং কোথায় শেষ কার্য্য সম্পন্ন হইবে—সকল সংবাদই মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক পথে পথে সমবেত হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর চারিদিকে এত জনসমাগম হইল যে, বেলা একটার পর হইতে চিৎপুর রোড দিয়া ট্রাম, বাস ও সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতরের ও বাহিরের উঠানে তিলধারণের স্থান রহিল না। কিভাবে শব দ্বিতল হইতে নীচে নামাইয়া শোভাযাত্রা আরম্ভ করা হইবে, সেই চিন্তায় নেতৃবৃন্দ ব্যাকুল হইলেন।

সে সময়ে কে যে ঠাকুরবাড়ীতে যান নাই, তাহা বলা যায় না। সকলেই কবিগুরুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তবে সকলের পক্ষে ঠাকুরবাড়ী পর্য্যন্ত পৌছান সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা পরিমাপের বস্তু নহে—সে দৃশ্য বাস্তবিকই অসাধারণ—যিনি দেখেন নাই, তাঁহাকে বুঝাইবার উপায় নাই। যথাকালে বেলা ৩টার পর রবীন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক দেহ স্নান ও চন্দনাদি লেপনের পর সুসজ্জিত করিয়া নীচে নামান হইল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ও দেহের কোনরূপ বিকৃতি দেখা যায় নাই। মনে হইতেছিল—কবিগুরু যেন নিদ্রা যাইতেছেন। এই নিদ্রাই যে চিরনিদ্রায় পরিণত হইবে, তাহা যেন তখন ভাবিতেও কষ্ট হইতেছিল।

বিরাট শোভাযাত্রা বেলা সাড়ে তিনটায় ঠাকুর-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আপার চিৎপুর রোড, বিবেকানন্দ রোড, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট ও বটকৃষ্ণ পাল এভেনিউ হইয়া নিমতলা শ্মশানঘাটে গমন করিয়াছিল। এরূপ অপূর্ব্ব জনসমাগম ও বিরাট শোভাযাত্রা কলিকাতায় আর কখনও দেখা যায় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে হুগলী, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, বারাকপুর, নৈহাটী প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু লোক কলিকাতায় আসিয়া পথে দাঁড়াইয়া শোভাযাত্রা দর্শন করিয়াছিল। ঠাকুর-বাড়ীতেই এত অধিক স্থান হইতে এত অধিক পুষ্পমাল্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল যে তাহা বহনের জন্যই ৪।৫খানি গাড়ীর প্রয়োজন হইত। শোভাযাত্রার সমস্ত পথ পুষ্পাস্তীর্ণ হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পথের ধারের গৃহগুলির ছাদসমূহও জনাকীর্ণ হইয়াছিল এবং প্রায় প্রতি গৃহ হইতেই রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহের উপর পুষ্পবর্ষণ করা হইতেছিল। শবাধার ও শোভাযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলের সম্মুখীন হইলে ভাইস-চ্যান্সেলার সার আজিজুল হক, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শবাধারে মাল্যদান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বেলা প্রায় ৬টার সময় শবসহ শোভাযাত্রা নিমতলার শ্মশানঘাটে পৌছিয়াছিল। ঘাটের উত্তর দিকে কর্পোরেশনের একখণ্ড জমির উপর বিশেষভাবে নির্ম্মিত চিতায় রবীন্দ্রনাথের দেহ ভস্মীভূত করা হয়। যে দেহ দেখিবার জন্য একদিন সমগ্র জগতের লোক দলে দলে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হইবার জন্য ব্যাকুল হইত, সেই দেহ যে একদিন এইভাবে পঞ্চভূতের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইবে, সেকথা কে তখন ভাবিয়াছিল। প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের দেহের মত সুন্দর দেহ জগতে অতি অল্পই দেখা যায়। সমগ্র জগতের লোকই তাঁহাকে দেখিয়া দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। অন্ত্যেষ্টির পূর্ব্বে শ্মশানে কিছুক্ষণ এমন ভিড় ছিল যে চিতা সাজাইতে সকলকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য পিতার মুখাগ্নি করেন নাই—কবিগুরুর মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথ খুল্লপিতামহের মুখাগ্নি করিয়াছিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া কবির কথাই মনে হইতেছিল। ১৩০১ সালে 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

যা হবার তাই হোক, ঘুচে যাক সর্ব্বশোক,
সর্ব্বমরীচিকা।

নিবে যাক্ চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ,
মর্ত্ত্যজন্ম শিখা।
সব তর্ক হোক শেষ সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই।
বলো শান্তি বলো শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।

১৩০৯ সালে পত্নীবিয়োগের অল্পদিন পরে রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যুমাধুরী' নামে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মহা-প্রয়াণের পর আজ বারবার তাহা মনে পড়িতেছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

তুমি মোর জীবন-মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যুমাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
নিজ হাতে করিয়াছ, প্রিয়া।
খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইয়াছ টানি,
জন্ম-মরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।
তুমি মোর জীবন-মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।

১৩৩৫ সালে তিনি 'বিদায়' কবিতা লেখেন। তখন কে বুঝিয়াছিল যে তাঁহার জীবন-দেবতা সকলের অলক্ষে ১৩ বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিদায়ের কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিয়া পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে অর্ঘ্যথালা
কৃষ্ণপক্ষ রাতে যে আমারে দেখিবারে পায়,
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু তার, পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার,
হেথা মোর তিলে তিলে দান
করুণ মুহূর্ত্ত গুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয় অঞ্জলি হতে মম, ওগো তুমি নিরুপম
হে ঐশ্বর্য্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু বিদায়॥

প্রশস্তি

৺শরদিন্দুনাথ রায়

তুমি সখা, তুমি গুরু, নহ শুধু কলকণ্ঠ কবি,
ওহে রবি—জগতের রবি।
রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ গন্ধে ভরা সমগ্র সংসার
তবু হিয়া আকুলিয়া ফিরে খুঁজে সৌন্দর্য্য সম্ভার ;
তুমি সেই আঁখিপাতে মাখি দাও সোনালি অঞ্জন
স্বপন সুন্দর বিশ্ব করে হেসে মানস রঞ্জন—।
শিশুর হাসিটী ভরি, প্রেয়সীর নয়নে অধরে
তোমার মোহন মন্ত্রে কি সুষমা উছলিয়া ঝরে,
হিয়ায় না ধরে!
মেঘে ঢাকা চিত্তাকাশে তব স্বর্ণতুলি
ফুটায় বিজলী।
নন্দন-মন্দার শাখে ফুটেছিল বুঝি কোন দিন,
সুধা গন্ধ সরস নবীন—;
উজল দিনের আলো অঙ্গে তব পড়িত ঠিকরি
তোমা ঘিরি দেবকন্যা খেলিত 'বাসন্তী বাস' পরি!
কোমল মৃণালভুজে কেলি ছলে ধরি শাখাটিরে
হাসিয়া মধুর হাসি দোলাইত যবে ধীরে ধীরে
মৃদুল সমীরে।
লুটিতে তাদের অঙ্গে নয়নে অধরে
কত লীলা ভরে।
তারপর কোনদিন আলোকিয়া দেবর্ষির বীণা
মনে কি গো পড়েছিলে কি না?
দেবের সঙ্গীতস্বরে সারা বিশ্ব যেত' ধবে ভরি,
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তব মর্ম্মতন্ত্রী উঠিত শিহরি,
তাই গাঁথা আছে প্রাণে তারই বুঝি কয়েকটা সুর
তাই কি পুলক জাগে—স্মরি কোন পরশ মধুর
অপ্সর বধুর—?
তাই অস্ফুরণ—তব সৌন্দর্য্য কল্পনা
ভাব উন্মাদনা?
পরিয়া বিজয়মাল্য গৌরবের টীকা আসিয়াছ ফিরে
মায়ের স্নেহের কোলে ফিরে?
আজ শুধু বঙ্গ নয়, সারা ধরা করে তোমা নতি—
জননী জনমভূমি সগৌরবে চাহে তোমা প্রতি
তোমার ভকতবৃন্দ অর্ঘ্যকরে আছে দাঁড়াইয়া
ও জগবন্দিত পদে লুটাইতে চাহে সারা হিয়া
ভকতি চন্দনে মাখা লহ এই পূজা উপচার
দীন ফুলহার।

গল্প ও উপন্যাস

নতুন গল্প

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

নদীর ধারে জমিদারদের বাড়ী, কিন্তু প্রবেশ-পথ নদীর দিকে নয়, উল্টোমুখে। ছোট নদী, পাড় ধসিয়া গেছে, স্রোত যেন মরিয়া গেছে, নদী খালের মত বহিয়া গেছে। তবু সে নদী, নদী বলিয়া তার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, গ্রামটির দক্ষিণ সীমানা রচিত হইয়াছে এই নদীতে, সমস্ত পথ আসিয়া এর কূলে থামিয়া গেছে, ওপারে যাইতে হইলে খেয়াঘাটের কাছে যাইতে হয়। নিঃশব্দ অনুশাসনে নদী তার অস্তিত্বের কথা জানাইয়া দেয়, যদিও গ্রামবাসী তাকে স্বীকার করিতে চায় না, তার তীরে বেড়াইবার রাস্তা রাখে নাই, স্নানের জন্য একটা ভালো ঘাট অবধি করিয়া দেয় নাই। বাংলার দিগন্তবিস্তীর্ণ নদীর নিশ্চিহ্ন পরপারের ঐশ্বর্য্য এর নাই, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের রঙীন দিগন্তের পট-ভূমিতে দূরগামী পালতোলা নৌকার সৌন্দর্য্য এ দেখাইতে পারে না; কূলে কূলে তরঙ্গ নাই, ঘোলা কোমর-জলের দারিদ্র্য লইয়া নীরব নিস্পন্দ নদী—এ যেন নদীই নয়, নদীর কলঙ্ক।

তবু ইহারই দিকে চিত্রা চাহিয়া থাকে জমিদার বাড়ীর উঁচু পোতা-থামালের একতলার ঘর হইতে। যে ঘরে সে নববধূ হইয়া আসিয়াছে, সে ঘরের পূর্ব্বগৌরবও নদীর মত অস্তমিত হইয়াছে। ঐ নদীর মতই একদিন এ সংসারের প্রবল প্রতাপ ছিল, অনেকগুলি মহল ও মৌজার অধিপতি কর্ত্তারা চোখ বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়াছে। এখন এই ছোট গ্রামটিতে তিন ঘর জমিদারদের মধ্যে তাহারা একঘর মাত্র। কোনরকমে বসিয়া খাওয়ার মত এখনও সংস্থান আছে, এক পুরুষ পরে সেটুকুও না থাকিবার কথা।

নিস্তব্ধ দুপুরবেলা জানলার গরাদে ধরিয়া সুন্দরী চিত্রা নদীর দিকে চাহিয়া দেখে, অশথ গাছটা ভাঙা পাঁচিলের ধার দিয়া যে নদী উত্তর দিকে বাঁকিয়া গেছে, যে নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একদিন কত কত ডাকাতি হইয়া গেছে—যার ইতিহাস সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বুড়ী পিস্‌শাশুড়ীর কাছে শুনিতে বুক কাঁপিয়া ওঠে।

নদীর জলে পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়া পড়ে, তার ডালে ডালে উড়ে আসা পাখীদের কলরব, জঙ্গলের মধ্যে যে বসতি আছে সেখান হইতে কলহের কোলাহল ভাসিয়া আসে, ক্বচিৎ একটা মাছরাঙা ক্বচিৎ দুইটা বক শান্ত ছবিতে প্রাণসঞ্চার করে—অনাবৃত একখানি ফরসা হাতে আর একখানির চুড়ি ও কঙ্কণ ঢাকিয়া চিত্রা চাহিয়া দেখে আর ভাবে।

চিত্রা বি-এ পাশ করিয়াছে কি এই নগণ্য গ্রামের জমিদারবংশের ছোটপুত্রবধূর অখ্যাত জীবন যাপন করিতে? খাওয়া-পরার কোনও ভাবনা নাই, সংসারের কাজ বিশেষ দেখিতে হয় না, তাহাতেই কি সমস্ত জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়ার স্বস্তি পাওয়া যায়? একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সকাল হইতে সন্ধ্যা যেখানে সঙ্কীর্ণ? আর যে পায় পাক্, চিত্রা এর মধ্যে কোনও তৃপ্তির সন্ধান পায় না। তার যেন মনে হয় বৃহত্তর জগতে বৃহত্তর কাজ তার করিবার ছিল। কিন্তু বাঙালী জমিদার-পুত্রবধূর সংসারের বাহিরে কি কাজ থাকিতে পারে? ঘরের মধ্যেই যার মাথার কাপড় আরও একটু টানিবার কথা, সমস্ত পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া জগতের কাজ করিবার স্বপ্ন সে দেখে কি করিয়া? কলেজের ছাত্রী-জীবন তাহাকে যে বন্ধনহীনতার আস্বাদ দিয়াছে, গ্রামের জমিদারবধূর অন্তঃপুরে তার দূরতম ও ক্ষীণতম কল্পনা মরীচিকামাত্র—একথা সে এখনও ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না—একবৎসর বিবাহ হইবার পরেও? আশ্চর্য্য!

সেদিনও সে তার বন্দিনীদশার কথা ভাবিতেছিল সেই একই জানলার ধারে দাঁড়াইয়া, নজরে পড়িল একটি বামন নদীতে ছিপ ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেড় হাতও নয় মানুষটি, একবার এধারে একবার ওধারে খুর্‌খুর্ করিয়া

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পিছন হইতে প্রকাণ্ড গোঁফের এক দিকটা দেখা যায়, চিত্রার দেখিতে ভারী আমোদ লাগে।

সে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকে। কয়েকটা মাছ বুঝি ওঠে। ঘণ্টা দুয়েক পরে ছিপ্ লইয়া চলিয়া যাইবার সময়ে বামন এই দিকে চাহিতেই চোখোচোখি হইয়া যায়, চিত্রা সরিয়া যায় না, তাহার লজ্জা করে না, বরঞ্চ ডাকিয়া বলে—শুনুন্!

বামন আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া বলে—আমায় কিছু বল্‌ছ?

চিত্রা ঘাড় নাড়িয়া বলে—হ্যাঁ। জিগেস্ করছিলুম, নদীতে ছিপে মাছ ওঠে? স্রোতে বঁড়শি ঠিক থাকে?

থাকে। যেখানটা পড়ে ভেঙে গিয়ে গর্ত্ত-মতন হয়ে গেছে সেইখানে ফেল্‌তে হয়। অনেক মাছ আসে। দেখো না কতগুলো তুলেছি,—বলিয়া ছোট হাঁড়ির ভিতরটা দেখাইয়া বলে—তুমি কিছু চাও?

না। আমার চাই না। আপনি কোথায় থাকেন? আপনার নাম কি?

তাড়াতাড়ির জন্য একসঙ্গে দুই-তিনটা প্রশ্ন করিয়া বসে চিত্রা।

বামন বলে—আমি অন্য গাঁয়ে থাক্‌তুম, সম্প্রতি এখানে এসেছি। আমার নাম—রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়।

রমণীমোহনই বটে! হাসি পায় চিত্রার।

রমণীমোহনবাবুও যেন ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন। বলেন,—আজ তাড়া আছে। কাল তোমাকে এসে বল্‌ব কেন আমার নাম রমণীমোহন হ'ল।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে হেলিয়া দুলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সমস্ত দিন চিত্রার চোখে সেই ছবি ভাসিতে লাগিল।

পরদিন ঠিক সেই সময় চিত্রা সেই জানলায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, রমণীবাবু ছিপ ও চার লইয়া পাঁচিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—এখান থেকে বল্‌ব? অনেক কথা কিন্তু!

চিত্রার কেমন কৌতূহল হইল। ওদিককার দরজাটা কতকাল খোলা হয় নাই, জং ধরিয়া জাম্ হইয়া গেছে, অনেক ধাক্কা দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—আসুন।

তাহার স্বামী সিতাংশু মধ্যাহ্নকালে বারমহলেই আড্ডা দেয়, সেইখানেই ঘুমায়। দুপুরে এধারে কাহারও আনাগোনা নাই। রমণীবাবুকে সে ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইল। একজন বামন ত! ঠিক্ পরপুরুষ কি ইঁহাকে বলা চলে? চিত্রার ত মনে হয় না। সম্ভ্রম কি সঙ্কোচের চেয়ে অনুকম্পাই ত জাগে। সে কোন দোষ দেখিতে পাইলনা, একটা টুল দিয়া বলিল—বসুন। ব'সে বলুন।

রমণীবাবুরও বসিবার দরকার ছিল। এমন সহানুভূতি তাঁহাকে বুঝি কেহ কোন দিন দেখায় নাই। এমন করিয়া কথা শুনিবার আগ্রহ তিনি কাহারও মধ্যে পান নাই। কাজেই প্রবল উৎসাহে আত্মকাহিনী সুরু করিলেন—

আমার বাপ-মা ঠিক্ সহজ মানুষের মতনই ছিলেন। আমি যখন জন্মালুম একটা জড়পিণ্ডের মতন, তখন নাকি তাঁহাদের দুঃখের অবধি ছিল না। যত বড় হই, ততই কুশ্রী হই। মা তাঁহার দুঃখ ভোলবার জন্যে নাম রাখলেন—রমণীমোহন। কত দুঃখে যে রাখ্‌লেন, আজ বুঝ্‌তে পারি। পাড়ার লোকে হাস্‌ত তাঁর আদর দেখে। কিন্তু সে স্নেহময়ী মা আমার চিরদিন রইলেন না। তিনি চলে গেলেন। তারপর বাবা অনেক দিন ছিলেন। পাছে আমার কোন কালে কষ্ট হয় এইজন্যে অনেক জমিজমা অনেক কষ্ট ক'রে ক'রে দিয়ে গেলেন। স্কুলে গেলাম, সেখানে সকলে এত জ্বালাতন করত যে পড়াশুনা ছেড়ে পালিয়ে আস্‌তে হ'ল। আমার ছোটরা সব আমার চেয়ে অনেক বড় হ'য়ে গেল। তাদের সকলের পরিহাসের পাত্র আমি হ'য়ে উঠ্‌লুম। এই দেখো না, তুমি। তোমার বয়স কত?

চিত্রা বলে—একুশ-বাইশ।

একুশ-বাইশ বছর! বেশ। আমার পঁয়তাল্লিশ, অথচ দেখো, তোমার হাঁটু পর্য্যন্ত আমি। তুমি কি ক'রে আমায় মান্‌বে?

খুব মান্‌ব। আপনি বলুন।

বাবা আমায় নিজেই বাড়ীতে পড়াতে লাগ্‌লেন। বিশেষ ক'রে আমায় অন্যমনস্ক রাখ্‌বার জন্যে অনেক বাংলা বই, উপন্যাস গল্প কবিতা যতদূর তাঁর সাধ্য, কিনে কিনে দিতে লাগ্‌লেন। কোন বইয়ে আমার মতন লোকের কথা নেই, যত সুন্দর নায়ক আর সুন্দরী নায়িকা। আমি যেন জগতছাড়া। তবু জগতের শোক দুঃখ আনন্দের অভিজ্ঞতা আমার সকল লোকেরই মতন। আমার মনেও—তুমি হেসো না—মায়া দয়া প্রেম উদারতা হয় ত সাধারণের

মতনই। কিন্তু চিরদিন আমি খাপছাড়া র'য়ে গেলাম। বাবার কাছে একটা কথা শুনেছিলাম—সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স—তোমরা যেন সকলেই আমার চেয়ে বড়—এই ধারণা তোমাদের জেগে ওঠে আমাকে দেখলেই।

চিত্রা চুপ করিয়া শুনিয়া যায়, অস্বীকার করিতে পারে না। ছোট্ট মানুষটির ছোট ছোট হাত-পা নাড়িয়া বৃহৎ গোঁফ দুলাইয়া কথা বলিবার ভঙ্গী হয় ত অদ্ভুত হইতে পারে, কিন্তু বড় মানুষের সঙ্গে কোনখানেও তফাৎ পাওয়া যায় না সে সব কথার অর্থের দিক্ দিয়া, জ্ঞানের দিক্ দিয়া।

তারপর শোন কি হ'ল। বাবা আমার বিয়ে দিলেন বেশ লম্বা সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে। ভয়ানক গরীব তারা, নইলে আমার সঙ্গে দিতে যাবে কোন্ দুঃখে? সে আমাকে একদিনের জন্যেও যত্ন করেনি, দেখলেই ঠেলে সরিয়ে দিত। বাবা এমন বিয়ে দিয়েছিলেন এইজন্যে যে, ভবিষ্যৎ বংশধর সহজ সাধারণ হবে, আমার মতন নয়। কিন্তু পর পর দুটি ছেলে একটি মেয়ে হ'ল ঠিক আমারই মতন, তারা বাঁচলও না। মনের দুঃখে আমার স্ত্রী একদিন আত্মহত্যা করলে। বাবা একেবারে ভেঙে পড়লেন। আমার ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে তিনি বড় কষ্টেই চোখ বুজলেন। যাবার সময় বারবার বলতে লাগলেন, তোর জন্যে আমার মরতে ইচ্ছে করছে না। তোকে কে দেখবে?

রমণীবাবুর চোখ ছলছল করিতেছিল। মুছিয়া বলিতে লাগিলেন—সামান্য জমিজমা যা ছিল, তাতে আমার খাবার পরবার অসুবিধা হবার কথা নয়, কিন্তু প্রজাদের কাছে খাজনা নিতে কি ধান নিতে গেলে তারা আমায় চাঁটি মেরে ভাগাতে লাগল। শেষকালে গ্রামশুদ্ধ ছেলেমেয়েগুলোও যেন মজা পেয়ে গেল—পথে ঘাটে বেরোলেই কেউ জামা ধ'রে টানে, কেউ কাছা ধ'রে টানে। তখন আমি ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করলুম। সে ঢিল তারা আমারই দিকে ফিরিয়ে দেয়, গায়ে মাথায় চোট্ লাগে। সবচেয়ে মজা, ছেলেমেয়েগুলোর বাপমারাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে আর উৎসাহ দেয়।

একদিন সারাদিন খেতে পাইনি, বিকেলের দিকে চাল খুঁজতে বেরিয়েছি, ছেলেমেয়েগুলো এসে আবার লাগল। কষ্টের কথা তাদের খুলে বললুম, তারা শোনে না। শেষকালে সকলে মিলে—তুমি আমার মায়ের মতন বলেই বলছি—আমার কাপড় খুলে দিলে। মাগো, তুমি ভেবে দেখো তখন আমার ছত্রিশ বছর বয়স, তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে-মেয়েদের কাছে ঐ নির্য্যাতনে কি ভীষণ লজ্জা আর অপমান বোধ হয়। কি ভাগ্যি, নারান এসেছিল সেই পথে—আখড়ার সেক্রেটারী—তাড়াতাড়ি তার কাঁধের চাদর আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে কি মার মারলে। সেই নিয়ে তাদের অভিভাবকেরা আবার পুলিশ হাঙ্গাম বাধালে। নারান অনেক কষ্টে নিষ্কৃতি পেয়ে বললে—ভাই, তুমি এ সব্বনেশে গাঁ ছেড়ে চ'লে যাও, তোমাকে কতদিন বাঁচাতে পারব? সে-ই নিজে দাঁড়িয়ে সব জমিজমা বিক্রী করিয়ে দিয়ে আমার সমস্ত টাকা আমার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে এ গ্রামে রেখে গেল আমার বুড়ি মাসীর কাছে। ক'দিন হ'ল এসেছি, এখনও গাঁয়ের লোক বিরক্ত করেনি, মনে হচ্ছে এরা অনেক ভাল। তার মধ্যে তুমি হচ্ছ সকলের চেয়ে ভাল। তোমায় দেখলেই আমার স্নেহময়ী মায়ের কথা মনে পড়ে, মেয়ে বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। আমায় কেউ আজ অবধি 'আপনি' বলেও কথা বলেনি। আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব। আসতে দেবে?

চিত্রারও চোখের কোণ কেন জানি না চিক্ চিক্ করিতেছিল, সে খুব মিষ্টি করিয়া হাসিয়া বলিল—আপনি রোজ আসবেন আমার কাছে।

আপ্যায়িতের হাসি হাসিয়া রমণীবাবু উঠিলেন, বলিলেন—মাছ না হ'লে আমার ভাত ওঠে না। পয়সা নেই যে কিনে খাই, তাই ছিপ্ নিয়ে ঘুরতে হয়। যেটুকু সঞ্চয় আছে, নষ্ট ক'রে ফেললে ত চলবে না, রাখতে হবে। বুড়ো বয়সে খাওয়াবে কে? এখন না হয় মাসী দুটি দুটি খেতে দিচ্ছে, তারও ত কেউ নেই।

পৈতাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, ঠিক করিয়া কাঁধে লাগাইয়া রমণীবাবু টুল হইতে নামিয়া গেলেন অতি কষ্টে। বাহিরের এক একটি সিঁড়ি—কাৎ হইয়া দাঁড়াইয়া এক পা এক পা বাড়াইয়া পার হইয়া গিয়া নদীর ধারে বসিলেন।

চিত্রা গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিন ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া রমণীবাবু আসিলেন। চিত্রা দরজা খুলিয়া দিল। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন—

দেখো, কাল সারারাত ধ'রে ভেবেছি তোমাকে কি ব'লে ডাক্‌ব। মেয়ে ব'লে ডাকা যায় না, অন্য মানে হয়। তার চেয়ে নাতনী বলা যাক্‌। আর তুমি আমায় দাদু বল্‌বে। কেমন?

চিত্রা চোখ বড় করিয়া বলে—চমৎকার হয়!

হ্যাঁ, একটা সম্পর্ক ত দরকার। আলাপ যখন হ'ল! আচ্ছা, নাতনী, বল্‌তে পার, বামনদের লোকে এত ঘেন্না করে কেন? বামনদের লজ্জা নিবারণের জন্যে ভগবান্‌ নারায়ণ নিজে বামন অবতার হয়েছিলেন।

ঘেন্না কেন করবে? আমরা ত খুব ভক্তি করি। বামন দেখ্‌লেই প্রণাম করতে হয়, এই ত জানি।

না, তোমার কথা আলাদা। তুমি অনেকটা দেবী-ক্লাসের। আজ কিন্তু বেশীক্ষণ বস্‌ব না, কাল বেশী মাছ ওঠেনি। বস্‌তে বস্‌তে রোদ্দুর চ'লে গিয়ে মেঘ করল। মেঘ হ'লে মাছ টোপ খায় না। কাল চ'লে যাবার সময় তোমায়ও জানলায় দেখ্‌তে পেলুম না!

আমি ওধারে ছিলাম যে!

এম্‌নি কয়দিন ধরিয়া রোজই আসেন। দু-চার কথা বলিয়া উঠিয়া যান। কথা আর মাছ ধরা যদি একসঙ্গে হইত, তা হইলে বোধ হয় তাঁহার আপত্তি ছিল না।

একদিন আসিয়া বলিলেন—দেখো নাতনী, আমার টাকাকড়ি যা আছে তোমার কাছে রেখে যাই। কবে চোরে মেরে ধ'রে নিয়ে যাবে। আমি ত এই মানুষ।

আমাকে এত বিশ্বাস করেন দাদু? আমি যদি পরে অস্বীকার করি?

তুমি অস্বীকার করতে পারো না নাতনী। হাজার হোক, তোমার ডবল বয়স আমার, অনেক লোক দেখেছি, অনেক ঠকা ঠকেছি। মাথার দু-চার গাছা চুল পাক্‌তে সুরু করেছে। দাঁতও দু-একটা পড়েছে। মেঘে মেঘে বেলা হ'য়ে গেছে দিদি, আমি লোক চিনি।

চিত্রা সম্মতি জানাইল।

ক্যাসবাক্স সন্তর্পণে কাপড়ে ঢাকিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে পরদিন রমণীবাবু যখন ঢুকিতেছেন, পুরাতন উড়িয়া ঠাকুরটি দেখিতে পাইয়া বলিল—কোথায় যাও হে ওদিকে?

সে আজ প্রথম দেখিতেছে, বাড়ীর এদিকটা কেহই প্রায় আসিত না।

রমণীবাবু কথা না বলিয়া ঢুকিয়া গেলেন। ঠাকুরের কথা চিত্রাকে কিছু বলিলেন না, বাক্সটা তাহার জিম্মায় দিয়া তখনই বাহির হইয়া গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পল্লবিত হইয়া ঘটনাটা ছোটবাবু সিতাংশুর কানে উঠিল। সে অন্দরে আসিয়া বলিল—এসব কি শুনছি? বামনটা ঘরে ঢুকেছিল কেন?

একজন বামন ত! তাঁকেও তোমার ভয়? অত্যন্ত নিরীহ ভদ্রলোক, আমার দাদু হন। ওঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তবে আমাকে যা বলবার ব'ল।

তোমার সঙ্গে যোগাযোগ কি ক'রে হ'ল? কর্কশকণ্ঠে সিতাংশু বলে।

ভদ্রভাবে কথা বল্‌তে শেখো। যোগাযোগ বল্‌তে নেই, বল্‌তে হয় পরিচয়। তুমি গ্র্যাজুয়েট নও, কিন্তু আমি গ্র্যাজুয়েট—মুখ্যুর মতন কথা ব'ল না।

সিতাংশু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—আচ্ছা উচ্চ শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা—বল ব্যাপারটা খুলে। শোনাই যাক্‌।

সহজভাবে চিত্রা বলিল, উনি মাছ ধরতে আস্‌তেন নদীতে, আমি ডেকে কথা বলি। বেশ ভাল লাগল ওঁকে। তারপর রোজই একবার ক'রে এসে কিছুক্ষণ কথা ব'লে যান্‌। তোমায় জানাইনি, জানাবার দরকার হয়নি। এতে আমি কিছু দোষের দেখি না। এটুকু স্বাধীনতা আমার আছে ব'লে আমি মনে করি।

তা দেখ্‌বে কেন? উচ্চ শিক্ষিতা কি-না! বাস্তবিক একটা বামন ত! যাক্‌, যা হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে, আর আস্‌তে দিয়ো না।

না, ওঁকে আমি বারণ করতে পারব না।

এইখানেই ত শয়তানী! তা হ'লে কিছু আছে এর মধ্যে। আচ্ছা—বলিয়া এমন দাঁতে দাঁত চাপিল সিতাংশু যে, চিত্রারই বুক কাঁপিয়া উঠিল।

সমস্ত রাত্রি চিত্রার ঘুম হইল না। টাকা রাখিয়া কি করিয়া আসিতে বারণ করা যায়? টাকা ফেরত দিতে গেলেও ত কে কোথায় দেখিয়া ফেলিবে, এখন ত সতর্ক প্রহরী বসিবে। সকলে মনে করিবে চিত্রারই টাকা। ভদ্রলোক আসিলেই অপমানিত হইবেন। তাঁহাকে বাঁচাইতে

গেলেও গ্রাম জুড়িয়া চিত্রার কলঙ্কিনী নাম হইবে। সকলেই সিতাংশুর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিবে—কিছু আছে এর মধ্যে! জিনিষটা এমন বিশ্রীরূপ ধারণ করিবে, সে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সরল বুদ্ধিতে সে মনে করিয়াছিল—সকলেই তার মত স্নেহে সম্মানে ঐ অসহায় নিরীহ বামনকে চিরনিরাপদ মনে করিবে। কিন্তু আজ বিকালেই সারা বাড়ীর কলগুঞ্জনে সে বুঝিয়াছে, তা হইবার নয়, কদর্য্য ইঙ্গিত সুরু হইয়াছে। গভীর রাত্রে সে স্বামীকে জাগাইয়া বলিল, ওগো শোন।

সিতাংশু ঘুমের চোখে জবাব দিল, কি বলো।

চিত্রা উৎসাহের সহিত রমণীবাবুর দুঃখময় জীবনের কথা বর্ণনা করিয়া গেল। তাঁহার অসহ অপমান ও নির্য্যাতনের কথা। তাঁহার দেশ ছাড়িয়া আসার কথা।

শুনিতে শুনিতে সিতাংশু জাগিয়া বসিল, কিন্তু তাহার মধ্যে অনুকম্পার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। শুধু বলিল, যেখানটা সে রয়েছে সেটা অন্য লোকের জমিদারী। তাই কিছু হঠাৎ করা যাবে না। আমার এলাকায় এলে হয়। মাছ ধরা তার ঘুরিয়ে দোব।

গুমোট করিতেছে। বাহিরের গাছপালা যেন স্তব্ধ হইয়া গেছে। চিত্রা ভাবিয়া ভাবিয়া কোন কূলই পাইল না।

সকালবেলা সে ভালো করিয়া খাইতে পারিল না, দুপুরে কি অঘটন ঘটে এই ভাবনায় অধীর।

ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া রমণীবাবু আসিয়া হাজির হইলেন, চিত্রা কিছু বলিবার আগেই দরজা খুলিয়া দিল সিতাংশু, ছোট একটুখানি পিঠের উপর শঙ্কর মাছের চাবুক সশব্দে আস্ফালন করিয়া উঠিল।

রমণীবাবু নড়িলেন না, যন্ত্রণা চাপিয়া চিত্রার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি হ'ল নাতনী, টাকাটা পাওয়া হ'য়ে গেছে ব'লে? আজ আমায় দরজা থেকে তাড়াতে হবে?

চিত্রার কানে একসঙ্গে যেন অনেক মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত কান্নায় সে শুধু বলিল।—না দাদু!

আর কিছু বাহির হইল না।

চাবুকের পর চাবুক পড়িতে লাগিল, কে জানে কেন—রমণীবাবু একটি কথা কহিলেন না, আস্তে আস্তে নামিতে লাগিলেন। ঠাকুরটা তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল, কপাল দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তিনি কপালটা চাপিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সিতাংশু বলিল—নে, ওর কাপড়টা খুলে নে।

এইবার রমণীবাবু ছুটিতে লাগিলেন! ছোট ছোট পায়ে ছুটিয়া কতদূর যাইবেন? সহজেই ধরা পড়িলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চিত্রার মুখ নীল হইয়া গেল। এত ভীরু দৃষ্টি সে জীবনে দেখে নাই।

লোকজন পাড়াপ্রতিবেশীতে চারিধার ভরিয়া গেছে, চিত্রা ছুটিয়া গিয়া রমণীবাবুকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল, ঠাকুর চাকর একটু তফাতে সরিয়া গেল। চিত্রা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাঁহাকে ঢাকিল, পাখী যেমন করিয়া ডানা দিয়া তাহার ছোট শাবকটিকে ঢাকে।

সিতাংশুর চাবুক চিত্রার পিঠে পড়িতে লাগিল—তবু তাহার দৃক্‌পাত নাই।

বধূ-নির্য্যাতনের সময় বয়স্ক লোকেরা আসিয়া সিতাংশুকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া চাবুক কাড়িয়া ভাঙিয়া দিল। অনেক লোকের হাতের মধ্যে বন্দী অবস্থায় সিতাংশু চীৎকার করিয়া উঠিল—ও শালী এখনই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যাক্। ওকে আমি ত্যাগ করলুম।

চিত্রার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন সে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিল। প্রসন্নমনে বলিল—আমি এখনই চ'লে যাচ্ছি। শুধু আমার গয়নাগাটি ও নিজস্ব জিনিষপত্র কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। এঁর ওপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।

তৈরী হইতে বেশী দেরী হইল না। সকলে ছবির মতন দাঁড়াইয়া রহিল। কাপড় বদ্‌লাইয়া হিলউঁচু জুতা পায়ে দিয়া একটা স্যুট্‌কেস্ ও লেডীস্ ছাতা লইয়া চিত্রা বাহির হইয়া আসিল, রমণীবাবুর হাতে তাঁহার বাক্সটা দিয়া বলিল—চলুন দাদু।

ঝাঁ ঝাঁ রোদে সরু নদীর বুকে দূরের নৌকা ছাড়িল, গিয়া পড়িল ওপার-দেখা-যায়-না বড় নদীতে। অনুকূল হাওয়ার পালে আসিয়া লাগিল—তর্ তর্ করিয়া তরী বহিয়া চলিল, অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ আলোয় ভালো করিয়া কাছে সরিয়া গিয়া চিত্রা বলিল—বলুন দাদু, একটা ভালো গল্প, যে গল্প পৃথিবীতে কখনও কেউ বলেনি, কখনও কেউ শোনেনি।

রমণীবাবু কি ভাবিতেছিলেন, বলিলেন—দেখো, বাইশ বছর আগে আমার মেয়ে মারা গেছে, তোমার বয়স বাইশ। তোমাকে নাতনী বলি কি ক'রে?

ছোট পা দুখানির ধূলা মাথায় লইয়া চিত্রা বলিল, না দাদু, আমি আপনার নাতনীই থাকব, বেশ রসিকতা করতে পারব, নইলে খুড়ো জ্যাঠা কিছু বললে কথা বল্‌তেই ভয় করবে।

রমণীবাবুর চোখের উপরে রক্ত জমাট বাঁধিয়া আছে, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা—কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—একটা তৃণও তোমার দৃষ্টি এড়ায় না, আমি ত জড়পিণ্ড হ'লেও মানুষ, আমার ভাবনা এমন ক'রে তুমি ভেবে রেখেছ? আমার আনন্দের জন্যেও এত তোমার আয়োজন?

দশ বৎসর পরে চন্দন নগরের বিরাট্ অনাথ আশ্রমের হর্ত্তাকর্ত্তা শ্বেতশ্মশ্রু সদাহাস্যময় রমণীবাবু ওরফে—সরকারী দাদুকে দেখিয়া লোকের এক্স্‌মাসের স্যাণ্টাক্লসের কথা মনে পড়ে, আর চিত্রা দেবী ত সরকারী মাতাজী। সেই আশ্রমেই সর্ব্বস্বান্ত সিতাংশুর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রকে আসিয়া ভর্ত্তি হইতে হইল—সে ত অন্য কাহিনী।

কিন্তু এখনও দুপুরবেলা ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া রমণীবাবুর কাছে আসিয়া চিত্রা বলিবে—দাদু, একটা গল্প।

আর দাদু বলিবেন—পাগ্‌লী শোন্। একটা বুড়ো একটি বৌকে দেখে কিছুতেই বুঝতে পারে না, সে তার মেয়ে না নাতনী। মা না দিদিমা—

না ও গল্প নয়—একেবারে নতুন গল্প!—চিত্রা খুব ছেলেমানুষের মতন বলিয়া ওঠে, সব ছেলেমেয়ে হাসিয়া যোগ দেয়—হ্যাঁ দাদু হ্যাঁ!

কীর্ত্তন গান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বেশ থাক লয়ে রূপ রস রূপা সোনা,
এ গান তোমারে করে দেয় আনমনা।
মনে হয় এ কি আছ হয়ে দীন,
কোথা করঙ্গ, কোথা কৌপীন?
কে তুমি? কাহার করিতেছ উপাসনা?

২

বন্দী সিংহ পঞ্জর পিঁজারায়
গিরি গহনের কুসুম গন্ধ পায়।
চাতকের মত আছে যে ঈগল,
কাটিতে চাহে সে কঠিন শিকল,
পাহাড়িয়া ঝড় এসে লাগে তার গায়।

৩

ক্ষীণ পল্বলে মুগ্ধ মরাল একা,
মানসোত্থিত হেরে তরঙ্গ-লেখা।
গ্রীবা তুলি ক্ষণে উৎকণ্ঠিত
কমল-কানন হেরে যেন চিত,
সুধার শীকর সাথে চকোরের দেখা।

৪

বদ্ধ হরিণ শুনে বংশীর স্বর—
মনে পড়ে তার ভূর্জ্জবনের ঘর।
নগরেতে ভারবাহী মুলিয়ার—
মনে পড়ে মহাসাগরের পার,
কল-কল্লোলে হয় সে জাতিস্মর

৫

কাছে আনে তব স্রোতবহা রেবা তীর
মালতীগন্ধ সুরভিত সে সমীর।
বেতসকুঞ্জ, কদম্ববন,
লাগি উৎসুক হয় দেহমন
যমুনার ডাকে কাঁপে কলসের নীর।

৬

যে আনে পরশমণির আকর্ষণ
মনে হয় অতি বিকল এ ধন জন।
গীত নয়—প্রিয় কণ্ঠের সাড়া,
উন্মনা হয় যেথা শোনে যারা—
যুগ যুগ ধরি করিছে অন্বেষণ।

বন্ধন

শ্রীপঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নোংরা বস্তী—তার চেয়েও নোংরা তার অধিবাসীরা। বস্তীর কদর্য্যতাকে যেন ঠাট্টা করছে ঘিরে দাঁড়িয়ে কতকগুলো উঁচু উঁচু বাড়ী। কত রকমের লোকই থাকে এখানে —বেশীর ভাগই কলের মজুর, কেউ বা বাস, ট্রামের কন্‌ডাক্‌টার, কারুর উপজীবিকা হ'ল লোকের পকেটকাটা, কারুর কাজ আরম্ভ হয় আর সকলে যখন ঘুমের কোলে ঝিমিয়ে পড়ে। হট্টগোল যেন লেগেই আছে—অশ্রাব্য গালাগালি এদের গা-সওয়া। উৎকট গাঁজার গন্ধ, সস্তা হ'রমোনিয়ামের বেসুরো আওয়াজ, কলহরত স্ত্রীপুরুষের চীৎকার করে তোলে সন্ধ্যাটাকে মুখর।

... ...

রাত তখন দু'টো। গুপী আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাক্‌লে—"মুনিয়া, মুনিয়া, ওঠ্, দরজা খুলে দে।"

মুনিয়া ঘুম চোখে দরজা খুলে দিতে দিতে বল্‌লে—"মিন্‌সের এখন আসবার সময় হ'ল!"

"চুপ্ চুপ্! দেখ্‌না কি এনেছি। আর আমাদের দুঃখু থাক্‌বে না।" এই বলে সে দেখালে কতকগুলো গয়না।

"হ্যাঁ, কত বারই ত আনলি আর কত বারই ত ধরা পড়ে জেল খাট্‌লি।"

"নাঃ, এবার ঠিক করেছি—কালই এখান থেকে চলে যাব। সর্দ্দারকে কিছু ভাগ দেব না।"

... ...

গুপী অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল্ তার ছোট ছেলেটার একঘেয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজে। একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে সে মুনিয়াকে ডাক্‌লে, কিন্তু কোন সাড়া পেলে না। পাশ ফিরে দেখলে মুনিয়া নেই। ছেলেটার মুখে একটা কাঠের চুষি গুঁজে দিয়ে পাশ ফিরে পড়ে রইল সে—মুনিয়া বাইরে গেছে ভেবে।

ভোরের মিঠে রোদ্ তখন ঘরের আনাচে-কানাচে উঁকি মারছে। আর শুয়ে থাকা চলে না, গুপী তাড়াতাড়ি তৈরি হ'য়ে নিলে—আজ যে তার অনেক কাজ। চোরাই মাল কেনে এমন অনেক স্যাকরা তার জানা আছে, গয়নাগুলো বেচে অন্তত শ' তিনেক টাকা পাওয়া যাবে। আজ দুপুরের গাড়ীতেই সে চলে যাবে একটা ছোট-খাট শহরে—মুনিয়া আর ছেলেটাকে নিয়ে একটা চাল ডালের দোকান করলে তার বেশ চলে যাবে। ভাল লাগে না আর এই নোংরা জীবন, পেটের দায়ে পড়েই না আজ পাঁচটা বছর সে এই কাজ করছে!

গয়নাগুলো নিতে এসে সে হতভম্ব হ'য়ে গেল, একখানিও নেই দেখে। মুনিয়ার পেটরাটা খুলে সে দেখ্‌লে খালি। তখন বুঝ্‌তে তার বাকী রইল না এ মুনিয়ার কাণ্ড।

"মাগী নিশ্চয়ই পালিয়েছে। যা মর্‌গে যা, আমার ত বয়েই গেল; চোরের উপর বাট্‌পাড়ি! এখন সর্দ্দারকে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?" গুপীর মেজাজ জ্বলে উঠ্‌ল তেলেবেগুনে, ছেলেটার একটানা ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে। "এখন এই লক্ষীছাড়াটাকে নিয়ে কি করি?"

হঠাৎ কি যেন ভেবে গুপী ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল। সুন্দর শিশু—হাত-পা নেড়ে খেলা করছে—গায়ের ছেঁড়া কাঁথাটা পা দিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছে—কেমন যেন মিষ্টি হেসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কি সুন্দর মুখখানি! এতদিন ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখবার অবসরও সে পায়নি!

গুপী ঘরের দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ ক'রে বেরিয়ে পড়ল, ঢুকল গিয়ে একটা সস্তা চা-রুটির দোকানে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে বসতে পারলে না। খালি মনে পড়তে লাগল ছোট শিশুটার কথা, সে যেন হাত-পা নেড়ে কান্নার ভাষায় জানাচ্ছে কত মিনতি। দরজা খুলে দেখে ছেলেটা দিব্যি খেলছে, মুখখানি হাসিতে ভরা। ছেলেটাকে বুকে তুলে নিয়ে সে চুমোতে চুমোতে মুখখানা তার ভরিয়ে দিলে—অনেকটা মুনিয়ার মত মুখ। কিন্তু কি করবে সে এ ছেলে নিয়ে—তার ত কাজ আছে। সে আবার শুইয়ে দিলে ছেলেটাকে বিছানায়, ঝেঁঝে উঠল—"মরণ হয় না কেন তোর—যা না তোর মা যেখানে গেছে সেখানে।"

গুপী রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু পা যেন চলতে চায় না। ছোট্ট করুণ মুখখানি যেন তাকে ডাক্‌ছে। সত্যি, অবোধ শিশু, তার ত কোন দোষ নেই। হয়ত তার খাওয়ার সময় হয়েছে, সকাল থেকে তাকে ত কিছু দেওয়া হয় নি? গুপীর নিজের উপর লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল—সে কি-না চা-রুটিতে পেট ভরিয়ে একবারও ভাবলে না ছোট শিশুটির কথা! তাড়াতাড়ি পোয়াটাক দুধ নিয়ে ফিরে এল সে তার ঘরে। ছেলেটা চিল চেঁচাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাগজ পুড়িয়ে দুধটুকু গরম ক'রে সে ছেলেটাকে খাওয়াতে বসল। সে কি ছাই এসব পারে? তার অক্ষমতা মনে করিয়ে দিচ্ছিল মুনিয়ার অকৃতজ্ঞতার কথা। "চলে না হয় গেলি, কিন্তু একবারও কি মনে হল না পেটের ছেলেটার কথা?" ছেলেটার গা টা বড় ময়লা বলে মনে হতে লাগল, গুপী গামছা ভিজিয়ে গা মুছে মুনিয়ার হাতে সেলাই করা লাল শালুর জামাটা তাকে পরিয়ে দিলে। ছেলেটার মুখে যেন হাসি লেগেই আছে, কি সুন্দর চাইছে! গুপী তাকে বুকে তুলে নিলে, ছেলেটা তার দিকে চেয়ে আছে, মাথাটি নাড়ছে, কি যেন বলতে চায়। গুপী তাকে মুখের কাছে আনে, চুমো খায়, আদর করে বলে, "লক্ষ্মী, কাঁদে না, আমি তোর মা'র মত নই, আমি তোকে ছেড়ে যাব না।'

ছেলেটাকে কোলে ক'রে গুপী চলল, সর্দ্দারের বাড়ীর দিকে। গুপীর কোলে ছেলে দেখে সর্দ্দার বললে, "এ আবার কার ছেলে নিয়ে এলি? তোর নাকি?" সর্দ্দারের বৌ গুপীর কোল থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে আদর করতে লেগে গেল "বাঃ—খাসা ছেলে ত! তা হবে না কেন, তোর মুনিয়া ত সুন্দরী।"

"সে হতভাগীর নাম ক'র না আমার কাছে। সে মাগী পালিয়েছে আর আমায় মেরে রেখে গেছে একদম। কাল অনেক টাকার গয়না পেয়েছিলাম, সেগুলো সব নিয়ে ভেগেছে।"

"সে কি রে! মাগী ত ভারী বেইমান্‌। আসল জিনিষ নিয়ে ভাগল আর তোর জন্যে রেখে গেল এই ছেলেটা!'

সর্দ্দারের ছেলে কালু বলে, "ভাই, এবার দেখছি তোকে ব্যবসা ছাড়তে হ'ল। ছেলেটা ত মানুষ করতে হবে। মুনিয়া দেখছি মন্দ কায়দা করে নি।"

অনেকে অনেক উপদেশ দেয়। "তোর ভাবনা কি? আর একটা বিয়ে ক'রে ফেল। মেয়ে আমার হাতেই আছে।" "ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দে না—ব্যবসা ত চালাতে হবে।" গুপী অযাচিত উপদেশে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ল। "না ভাই, কোন্‌ শালা আর বিয়ে করে, মেয়েমানুষ জাতটাই বেইমান। আর এতটুকু ছেলেকে আমি বিলিয়ে দিতে পারব না। সর্দ্দার, কটা দিন আমায় ছুটি দে—ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করি।"

ছেলেটাকে নিয়ে গুপী হাঁটতে সুরু করলে—শহর পড়ে রইল পিছনে, নদীর তীর বেয়ে সে চলেছে। সন্ধ্যের সময় সে এসে পড়ল একটা বনের ধারে। বড় ক্লান্ত সে আজ, উদ্দেশহীন তার যাত্রা। ছেলেটাকে একটা পাথরের উপর রেখে সে নদীতে হাত পা ধুয়ে এল। তখন চারিদিকে যেন বিদায়ের আয়োজন পড়ে গেছে, পশ্চিম আকাশ রাঙ্গা হয়ে সূর্য্যদেব তখন নদীর জলে মিশে যাবার আয়োজন করছেন, পাখীরা আকাশ কালো ক'রে বাসায় ফিরে যাচ্ছে, নদী কুলু কুলু রবে ছুটে চলেছে কোন্‌ অজানা সাগরের অভিসারে, গাছের পাতায় পাতায় জেগে উঠেছে মর্ম্মরধ্বনি।

গুপীর মনে ভেসে ওঠে মুনিয়ার মুখখানি, ব্যথায় ভরে ওঠে তার বুক তার অকৃতজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। আচ্ছা, সে ত তার মুনিয়াকে কম ভাল বাসত না—মাঝে মাঝে তাকে মারধর করেছে—কিন্তু আদরও করেছে ত তার চেয়ে ঢের বেশী। এই ত গেল হোলির সময় তার জন্যে পাঁচটাকা দিয়ে সুন্দর শাড়ী এনে দিয়েছে। গুপীর চোখ পড়ে যায় ছেলেটার ওপর—ঠিক যেন মুনিয়ার মুখ বসান, বলে, "তুইও ত হবি তোর মার মতনই নেমকহারাম—বড় হ'য়ে তুইও ত এমনি ক'রেই আমায় ছেড়ে যাবি।" মনে হয় ফেলে রেখে যায় এই বনে, কোথাও কেউ নেই, কেউ সাক্ষী থাকবে না তার দুষ্কর্ম্মের। আবার ছেলেটার দিকে চেয়ে সব যেন গুলিয়ে যায়। এ শিশু—এ যে তারই রক্তমাংস দিয়ে গড়া—প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে সে পায় তারই প্রতিবিম্ব। বুকের ভেতর সে তাকে তুলে নেয়, সুন্দর মুখখানা চুমোয় চুমোয় রাঙা ক'রে দেয়।

সে বুঝে উঠতে পারে না, কি করবে সে এই ক্ষুদ্র শিশুটি নিয়ে। তার মুখের দিকে চেয়ে ভাল করে দেখে।

ভাবে, এও নিশ্চয়ই বড় হয়ে হবে তারই মত একজন ঘৃণ্য পকেটকাটা চোর। হয়ত দুশমনিতে তাকেও ছাড়িয়ে যাবে সে। এমনি ক'রেই হয়ত তারও "মুনিয়া" ফেলে রেখে যাবে একটি অসহায় শিশু। তাকে নিয়ে কি সে দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াবে?

... ...

গুপী ঠিক করে ফেলে, ফেলে যাবে সে এই শিশুকে এই নদীর ধারে বনের মাঝে। মুনিয়া যদি ছেড়ে যেতে পারে তার অসহায় সন্তানকে, কেনই বা পারবে না সে? এ শিশু এ কি শুধু তারই, না, এ ত তাদের দুজনের ভালবাসা দিয়েই গড়া!

শেষবারের মত আদর ক'রে শুইয়ে দিলে সে তাকে মাটির উপর। সে একটু দূরে সরে গেল। ছেলেটার মনে ভয়-ডর যেন কিছুই নেই, আপন মনে খেলে চলেছে। একটু একটু ক'রে দূরে সরে যায় সে—গাছের পর গাছ পড়ে থাকে পেছনে। কিন্তু একটা কান্নার রেশ কানে আসছে না? গুপী প্রাণপণে ছুটে এগিয়ে চলে। ঐ—ঐ ঝপ ক'রে একটা শব্দ হল না? বোধ হয় নদীতে গড়িয়ে পড়ল—যাক, আপদ গেছে! গুপীর মাথা ঘুরতে লাগল—মনে হ'ল হৃৎপিণ্ডটা যেন থেমে আসছে। সে আর এগোতে পারলে না—দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল সে। ছেলেটা কেঁদে চলেছে—সে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিলে। তারপর বেরিয়ে পড়ল কোন্ অজানা পথের উদ্দেশে। *

* Sholom Asch-এর গল্প অবলম্বনে।

মাতৃপূজা

৺অমৃতলাল বসু (নটরাজ)

গোপনে গোপনে এসে,
লুকায়ে হৃদয় দেশে,
দয়া-দীপ জ্বেলে মনে পাতো সিংহাসন।
গোপনেতে দশভুজা,
করিব তোমার পূজা,
গোপনে জুড়াব জ্বালা নিবেদি বেদন॥

আমি সেই বঙ্গবাসী,
পুরাতন ভালবাসি,
পূজায় সাজায় মন উৎসবের রঙ্গে।
তুমি যে মা পুরাতনী,
সতী-সমা সনাতনী,
স্বাধীনী মাতুনি হেরে ভয় পাবে বঙ্গে॥

রসনা দরাজ কোরে,
স্বরাজ গরজে জোরে,
তূর্ণ করে চূর্ণ কর সব পুরাতন।
না হোলে ইংরাজি মন,
পাবনা স্বরাজ ধন,
ঘুচুক সমাজকার্য্য রাজপ্রয়োজন॥

হা অন্ন, হা অন্ন রবে,
ভারত ভরিবে যবে,
উৎসব উঠিয়া যাবে পূজা কি পার্ব্বণ।
মাসে মাসে হরতাল,
শোভাযাত্রা কর চাল,
টাকা ঢাল, টাকা ঢাল, ওরে "গৌরীসেন।"



বিজয় রায় চৌধুরী-চিত্রিত

দীননাথের মা

—শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

দুপুরের সূর্য যখন তালগাছের মাথার আড়ালে গিয়া উঠানে ফেলিয়াছে বিকালের ছায়া, দীননাথ সরকারের পুত্রবধূ অর্থাৎ নরেশের স্ত্রী মায়া তখন গামছা হাতে গা ধুইতে আর কলসী কাঁখে জল আনিতে গিয়াছে বড় পুকুরে। তাহাদের বাড়ির পাশেই যে পোড়ো বাড়িটি, তাহারই পিছনে বড় পুকুর। নরেশদের বাড়ির খিড়কি দুয়ার হইতে নামিলেই বড় পুকুরের কোণ। কাজেই সেখানে একা যাইতে বাধা নাই।

ঘাটের দিকে মুখ করিয়া কোমর জলে দাঁড়াইয়া মায়া গা ধুইতেছে, হঠাৎ জলের ধারের সিঁড়িতে ছায়া পড়িল। মায়া মুখ তুলিয়াই চিৎকার দেওয়ার উপক্রম করিল। অতি কষ্টে সিঁড়ি ধরিয়া-ধরিয়া অক্ষম মন্থরতায় নামিয়া আসিতেছে এক থুত্থুরে বুড়ি। দেহ তাহার কংকাল-সার, গায়ের রঙ ছাইয়ের মত, চাম্‌ড়া কুঞ্চিত, মাথায় কাঁচা-পাকা রুক্ষ চুল, পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কোটরগত দুইচোখে যেন আগুনের দীপ্তি। সে মূর্তি মানুষের বলিয়া মনে করা যায় না।

মায়ার মুখে কথা ফুটিতেছিল না, হাঁ করিয়া সে চাহিয়া রহিল নিশ্চলভাবে—ভয়ে-ভয়ে।

বুড়ির কুশ্রী মুখ স্নেহের হাসিতে আরও বিশ্রী হইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁগা বউ, দীননাথ থাকে তোদের বাড়িতে ?

কি ঝন্‌ঝনে বুড়ির গলার আওয়াজ!

মায়া ঢোক গিলিয়া গলা ভিজাইল, বলিল—তাঁরই তো বাড়ি।

বৃদ্ধার স্বভাব-জলন্ত দুই চোখ আরও উজ্জ্বল হইল। মায়ার মুখে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—দীননাথ কে হয় তোর ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মায়া সংক্ষেপে উত্তর দিল—শ্বশুর।

—ক'টি ছেলে-মেয়ে তার ?—বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল।

—একজন।—মায়ার ছোট্ট উত্তর,—মেয়ে নেই।

—তুই বুঝি সেই একজনেরই বুকজোড়া ধন ?—বুড়ির মুখে দেখা দিল আরও হাসি, চোখে আনন্দের আরও ভয়ালতা।

সেদিকে চাহিয়া মায়ার ভয় হইল। বৃদ্ধার রসিকতায় লজ্জা পাইতে সে ভুলিয়া গেল। হাঁপাইয়া-হাঁপাইয়া কি রকম ধীরে ধীরে কথা বলে বুড়ি! কি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঝন্‌ঝনে কথা। একটু গম্ভীর হইয়া চাপা গলায় বুড়ি জানিতে চাহিল —তোর শ্বশুর এখন কি করছে দেখে এলি ?

—ঘুমোচ্ছেন।—মায়া বলিল।

বৃদ্ধা খুশী হইয়া কহিল—তাকে একবার ডেকে দিবি ? —তারপরেই যেন কি কারণে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, প্রবলবেগে মাথা নাড়াইয়া বলিল—না-না, তোর শ্বশুরকে এখন আমার কথা বলিসনে যেন।—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—হ্যাঁরে, অনেক বয়স হয়েছে তার, কেমন? কত হ'ল বয়স তার ?

মায়া এসব কথার কোন উত্তর দিল না। বিস্ময়ে সে নড়িতে পারিতেছে না, জলের তলায় কাদার ভিতর তাহার পা দুইটি যেন ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে। সাহস করিয়া সে বলিল—আপনাকে তো চিনিনে।

চেহারা যতই তুচ্ছ হোক, কথা-বার্তায় মনে হইতেছে, লোকটি নিঃসম্পর্কেরও নহে—তাচ্ছিল্যেরও নহে। কাজেই ইহার সহিত সসম্মানে কথা বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হইল মায়ার।

মায়ার প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধা খট্‌খট্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল— চিনবি কি ক'রে? দেখিসনি তো কক্‌খনো। তোর বরই দেখেনি আমায়। দীননাথ হয়তো ভুলেই গেছে এদ্দিন। আমি,—বৃদ্ধা পরিচয় দিলেন,—আমি তোর বরের ঠাকুরমা।

মায়া কাঁপিয়া উঠিল। চিৎকার করিতে চাহিল; পারিল না; গলা শুকাইয়া গিয়াছে। নরেশের ঠাকুরমা যে বহুকাল পূর্বে মরিয়াছেন! মায়ার মুখের রক্তিমা নিঃশেষে কোথায় উড়িয়া গেল। সে বুঝি ঢলিয়া পড়িবে! সলিল-সমাধি হইবে বুঝি তাহার!

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন—তোর শ্বশুরের সৎমা আমি, সৎমা। আমার কথা শুনিসনি ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, শুনিয়াছে বই কি—শুনিয়াছে—হ্যাঁ

শুনিয়াছে! মায়া যেন মরিয়া যাইতেছিল, এখন ধীরে ধীরে বাঁচিতেছে।

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ তাহার ভয়ে পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার ছেলেমেয়ে হয়নি নাতবউ? বিয়ে হয়েছে ক'বছর হ'ল?

প্রশ্নটি খেইহারা। মায়া বুঝিতে পারিল, অনেক কথাই বৃদ্ধার বলিবার ছিল, কিন্তু তাহার সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া আর বলা হইল না। কৌতূহল দুঃসহনীয় হইলেও মায়াও আর শুনিতে চাহে না; একান্ত অবাঞ্ছিত এই আকস্মিক আবহাওয়া অসহ হইয়া উঠিয়াছে তাহার নিকট। বুড়ির মুখে আত্মীয়তার পরিচয় না পাইলে এতক্ষণ সে হয় তো পলাইয়া বাঁচিত।

বৃদ্ধার সান্নিধ্যে থাকার সাহসও মায়ার নাই। সে জানে, এই সৎমাটির বিরুদ্ধে তাহার শ্বশুরের মনে সঞ্চিত আছে বিতৃষ্ণার দাবানল। ঘুণাক্ষরে যদি ইঁহার এত নিকটে অবস্থিতির সংবাদ তাঁহার কানে যায়, তবে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে সে আগুন; যাহার মারফত খবরটি যাইবে, তাহাকেই গ্রাস করিতে আসিবে সর্বপ্রথম।

মায়াকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন - ছেলেমেয়ে হয়নি বুঝি এখনও? তা' বয়েস তো তোমার কম হয়নি দিদি। এখনও হয়নি, আর হবে কবে?

নিজের সন্তানহীনতা সম্বন্ধে অপরের মুখে কোন আলোচনা মায়ার অসহ্য। তাহার মুখভাব রুক্ষ হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধা বলিলেন—আমি একটা মাদুলি দিতে পারি তোমায়, নেবে?

মায়া আশান্বিত হইল। বৃদ্ধা বলিলেন—তা হ'লে নিয়ে আসি আমি মাদুলিটা; তুমি যেন চ'লে যেয়ো না।

ধীরে ধীরে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, সিঁড়ি ধরিয়া ধরিয়া উপরে উঠিতে বৃদ্ধার প্রাণান্তিক কষ্ট হইল। উপরে উঠিয়া পোড়ো বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মায়া তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিল, গা মুছিয়া এক কলসী জল ভরিয়া লইল, লইয়া কলসী কাঁখে তুলিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। একবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কি মাদুলি দেয় বুড়ি, দেখাই যাক না। কিন্তু বুড়ি তো চিরদিনই তাহার শ্বশুরের অকল্যাণের চেষ্টাই করিয়াছে। এ মাদুলিকে বিশ্বাস করা যায় না তো! মায়ার ভয় হইল, না, কাজ নাই মাদুলিতে। সে বাড়ির পথে পা ফেলিল।

কিন্তু ততক্ষণে বৃদ্ধা আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার হাতে বৃহৎ আকারের এক মাদুলি অপরাহ্নের রবিকরে ঝকঝক করিতেছে মায়া নিঃসংশয়ে বুঝিল, অত বড়ো মাদুলিটি খাঁটি সোনার তৈয়ারি। সেই মাদুলি আবার বাঁধা রহিয়াছে মোটা একগাছি সোনার শিকলিতে।

নিঃশব্দে, হাসিমুখে বৃদ্ধা মাদুলিটি আঁটিয়া দিলেন মায়ার বাম বাহুতে। মায়া একটি কথাও বলিতে পারিল না, অবাক হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে সন্দেহের ধূলিকণা পর্যন্ত ঝাড়িয়া ফেলার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—এটা কি সোনার?

—হ্যাঁরে পাগলি। বৃদ্ধার মুখে অপরূপ এক তৃপ্তির হাসি—সোনা নয়তো কি পেতল?

—এর জন্যে কি দিতে হবে?—মায়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল।

বৃদ্ধার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; অস্বাভাবিক দীনতায় সে মুখ করুণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—আমায় চারটিখানি চাল দিবি, দিদি, আর কিছু আনাজ-তরকারি? রান্না করবই বা কিসে ক'রে!

বিস্ময়ে মায়া কাঠ হইয়া গেল।

বৃদ্ধা কহিলেন—আজ দু'দিন কিছু খেতে পাইনি, দিদি।

মাদুলি আর শিকলিতে অন্ততপক্ষে চার তোলা সোনা রহিয়াছে। তাহাই হাতে করিয়া কোন্ দুঃখে এই পাগল উপবাস দিয়াছে! সেই সোনা বিলাইয়া দিয়া এ বুড়ি ভিক্ষা চাহিতেছে এক মুঠা চাউল! এত বড় বিস্ময় কেহ কল্পনাও করিতে পারিয়াছে কোন দিন! আর যতটুকু পরিচয় জানা আছে, ভিক্ষা করার মত দীনতা ইঁহার থাকা ত কোন মতেই সম্ভব নহে।

সোনার মাদুলির উপর মায়ার যেন আর মায়া রহিল না। তাহা দেখাইয়া সে বলিল—এত অভাব আপনার, এটা বিক্রী করেননি কেন?

—বিক্রী করব!—দুই চোখ কপালে তুলিয়া বৃদ্ধা বলিলেন—কা'র জিনিস কে বিক্রী করে দিদি? ও যে তোদেরই জিনিস, তোকে দিয়েই আবার ফেরত দিলাম।

এ কথার একবর্ণও মায়া বুঝিতে পারিল না; ঘামিতে ঘামিতে সে বাড়ির দিকে চলিল।

সন্ধ্যার একটু আগে ঘাটে আসার ছল করিয়া মায়া পোড়ো বাড়ির খিড়কি দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে-ভয়ে এদিক-ওদিক চাহিয়া দরজার পাশের ঝোপের ভিতর বড় একটি পুঁটুলি রাখিয়া চলিয়া গেল।

কোন কাজেই মায়ার আর মন বসিতেছিল না। তাড়াতাড়ি কোনমতে আনমনে-আন্‌মনে সে ঘরে-ঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বালানর কর্তব্যটুকু সারিয়াছে। বৃদ্ধার আকস্মিক আবির্ভাবের বিস্ময় সে যেন আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। শ্বশুর-শাশুড়ীকে এ ঘটনা জানানর উপায় নাই। তাঁহারা জানিলে নিশ্চয়ই বুড়ির উপর অত্যাচার হইবে। শ্বশুরের সৎমায়ের বিরুদ্ধে কত কথাই কত প্রসঙ্গে সে শুনিয়াছে, শুনিয়া শুধু বুঝিয়াছে, তাঁহার উপর এ বাড়ির লোকেরা খড়্গহস্ত হইয়া আছে, একবার হাতের কাছে পাইলে আর রক্ষা নাই।

তাহার নিজের মনোভাবও বৃদ্ধার অনুকূল ছিল না। কিন্তু আজ সেই শত্রুর দেখা পাইয়া মায়ার অন্তরের কোণে তাঁহার জন্য করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্বশুরের ঐশ্বর্যময়ী, হিংসা-কুটিলা, ডাকিনী-প্রবৃত্তি বিমাতার বিবরণই এতদিন সে শুনিয়াছে; তাঁহার এমন দীন, নিঃসহায়, অর্ধ-উন্মাদ পরিচয় সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মায়া ভাবিয়া পায় না, সুদূর পশ্চিম দেশের কোন্ অজানা অঞ্চলের ঐশ্বর্যসম্ভার ছাড়িয়া কিসের জন্য এ বৃদ্ধা কংকালসার, মৃতকল্প দেহে এখানে এই জনহীন জীর্ণ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—এক মুষ্টি অন্নের কাঙাল হইয়া! কেন মায়া সকল কথা বৃদ্ধাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইল না? তিনি হয় তো সকল কথা তাহাকে বলিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু মায়া শুনিতে চাহে নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। আকস্মিক সেই ভয়াবহ, চমকপ্রদ পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে স্থির রাখিতে না পারায় আপনাকে মায়া দোষ দিতেও পারিল না। একান্ত অন্নহীনতার দৈন্যেও কেমন করিয়া তিনি সোনার শিকলি শুদ্ধ মাদুলিটি তাহাকে দান করিতে পারিল, তাহা ভাবিয়া মায়া কোনো দিশাই পায় না, মাথা যেন তাহার ঘুরিয়া ওঠে।

এ-ও বুড়ির এক ছলনা নয় তো!

নিজের বিছানায় মায়া শুইয়াছিল; ধড়মড়াইয়া উঠিয়া বসিল। মাদুলি সত্য-সত্যই কি সোনার? নিজের বাহুবদ্ধ মাদুলিটি সাধ্যমতো সে পরীক্ষা করিল; সোনারই তাহা।

কাহাকে এসকল কথা বলা যায়! একমাত্র স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও নয়। স্বামীর মন সে জানে। কিন্তু নরেশও যে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কোথায় বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেল, এখনও ফেরার নামটি নাই। বেকার মানুষ, কাজকর্ম তো নাই কিছু, খালি আড্ডা মারিয়া বেড়ায়। মায়ার বিরক্তি ধরিল। শুইয়া শুইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

স্বামী ঘরে ঢোকা মাত্রই মায়া এমন অস্বাভাবিকভাবে সোজা হইয়া বসিল যে নরেশ তাহাতে হক্‌চকাইয়া গেল। চোখ গোল করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি!



দেখছ কি? সোনার!

বিবরণটির অবতারণা করিতে চাহিল মায়া অত্যন্ত

সহজভাবে। খিল-খিল করিয়া সে হাসিয়া উঠিল, যেন যাহা সে বলিবে এখন, নিতান্তই হাসির কথা তাহা। হাসিতে হাসিতে সে বলিল—ভাল ক'রে একটু চেষ্টা-ফেষ্টা করো এবার, যাহোক একটা চাকুরি-বাকুরি না জুটিয়ে নিলে যে আর নয়।

হাসার মত মুখ করিতে চাহিলেও মায়ার কথার অর্থটি একেবারেই বুঝিতে না পারায় নরেশের হাসি পাইল না বিন্দুমাত্রও। কাছের চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িয়া সে বলিল,—তার মানে ?

মায়ার হাসির বহর অনেকটা কমিয়া গেল। বড় পুকুরের ঘাটে এক ডাইনির দেখা পেয়েছিলাম। একটা মাদুলি দিয়েছে—ছেলে হবার।—কাপড়ের আবরণ সরাইয়া সে তাহার হাত তুলিয়া দেখাইল নরেশকে সেই প্রকাণ্ড মাদুলি, বলিল—দেখ্ছ কি ? সোনার !— সে আবার হাসিয়া ওঠার উপক্রম করিল।

হাজার হাসিয়া বলিলেও ডাইনির কাছে সোনার মাদুলি পাওয়ার সংবাদ হাল্কা হইয়া ওঠে না। অগত্যা হাসি থামাইয়া গম্ভীরভাবেই সমস্ত বৃত্তান্ত সে স্বামীকে শুনাইল। শুনিয়া নরেশও গম্ভীর হইল।

তাহার পিতার সৎমা এমন দীনভাবে কেন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন! তাহার পিতামহ তো বেশ পয়সা রাখিয়া গিয়াছেন। বৎসর ঘুরিতে চলিল, ঠাকুর্দা মারা গিয়াছেন সেই পশ্চিম দেশেই। তবে কি বৃদ্ধাকে ঠকাইয়া কেহ লইয়া গিয়াছে সব সম্পত্তি! তাই কি তিনি আজ একমুষ্টি অন্নের কাঙাল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন সেই সতীন-পুত্রের দুয়ারে, যাঁহার অনিষ্টকামনা করিয়াছেন বৃদ্ধা সারা জীবন—প্রতি কাজে! কিন্তু বৃদ্ধার নিজের পেটের ছেলে তো রহিয়াছে—উপযুক্ত ছেলে!

ভাবিয়া-ভাবিয়া নরেশও কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

ঘণ্টা-দুই পরে। দীননাথ আর নরেশের নৈশ আহার চলিয়াছে খাওয়ার ঘরে।

শ্বশুরের শয়ন-ঘরে দরজার দিকে পিছন করিয়া মায়া বসিয়া হামানদিস্তায় পান ছেঁচিতেছে। তাহার শব্দ চলিতেছে তালে-তালে ঠন্-ঠন্।

—বউমা!

স্বপ্নভরা নিথর ঘুম হইতে মাঝরাতে কালবৈশাখীর যে আকস্মিক গর্জনে মানুষ হঠাৎ জাগিয়া ওঠে, তাহারই রুদ্রতা এই আহ্বানের রবে।

চমকিয়া মায়া পিছন ফিরিয়া চাহিল। খাওয়া সারিয়া ইতিমধ্যেই কখন যে শ্বশুর আসিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়াছেন, সে খেয়ালও ছিল না মায়ার। কিন্তু দীননাথের চোখে-মুখে একি কঠোর ভয়ালতা!

তেমনি গর্জমান কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এ মাদুলি তুমি পেলে কোথায় ?

মায়ার মুখ ভয়ে শাদা হইয়া উঠিল। কি বোকামি সে করিয়াছে! মাদুলিটা একটু ঢাকিয়া রাখিতেও পারে নাই! সে কিছুই বলিতে পারিল না, নত দৃষ্টিতে শুধু কাঁপিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দীননাথ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর সংযত স্বরে কহিলেন—দেখি, এদিকে উঠে এস তো।

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু শ্বশুরের দিকে যাওয়ার সাহস হইল না তাহার। সে দাঁড়াইয়াই রহিল।

দীননাথ তাহার কাছে আসিলেন। আলোটি তুলিয়া ধরিয়া মাদুলিটি ভাল করিয়া দেখিলেন, তারপর আলো নামাইয়া রাখিতে-রাখিতে জানিতে চাহিলেন—কোথায় পেলে এ মাদুলি ?

জিজ্ঞাসার ধরণে মনে হইল, প্রশ্নের উত্তর না দিলে তিনি বুঝি বা একটা অঘটন ঘটাইয়া বসিবেন।

মায়া বলিল—এক বুড়ি দিয়েছে।

—কে সে বুড়ি ?

—তাকে আমি চিনিনে।

—কোথায় দেখা পেলে তার ?

পুকুরঘাটে। মায়া বলিল—জল আন্তে গিয়েছিলাম—

মায়ার ভয়-সংক্ষিপ্ত উত্তর হইতে শুধু এইটুকুই দীননাথ জানিতে পারিলেন যে, আজ বিকালে যখন সে বড়পুকুরের ঘাটে জল আনিতে গিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ এক পাগ্লাটে ধরণের থুত্থুরে বুড়ির আবির্ভাব হয় সেখানে। মায়ার যে ছেলেমেয়ে হয় নাই একথা সে কেমন করিয়া জানিল, কে জানে। কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই হঠাৎ খপ্ করিয়া ধরিয়া বুড়ি তাহাকে এই মাদুলি পরাইয়া

দিয়াছে, বলিয়াছে, ইহা ধারণ করিলে ছেলে হইবে। মায়া ভয় পাইয়াছিল, তাই ছাড়া পাইয়াই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছে। বুড়ি যে কোথায় গেল, তাহা সে দেখে নাই, দেখার মত অবস্থা ছিল না তাহার মনের।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দীননাথ শুইয়া পড়িলে টর্চ লাইটটি হাতে করিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া চুপিসারে নরেশ গিয়া পাশের পোড়ো বাড়িতে প্রবেশ করিল।

চারিদিকে থম্‌থমে অন্ধকার। ঝোপঝাড়ে সারা বাড়ি আচ্ছন্ন। লম্বা-লম্বা ঘাসের বনে মাটি ঢাকা। সোঁদা-সোঁদা গন্ধে গা ঘিন-ঘিন করিয়া উঠিল। পা বাড়াইতে ভয় হইল তাহার। কোথায় কোন্ সর্পরাজ ফোঁস্ করিয়া উঠিবে, কে বলিতে পারে! কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। মাঝে-মাঝে ঝোপের আগার পাতা কাঁপাইয়া বাতাস শির্‌শির্ করিয়া উঠিতেছে। আর থাকিয়া-থাকিয়া শুক্‌না পাতায় উঠিতেছে মচ্-মচ্ শব্দ।

কতক্ষণ দাঁড়াইয়া চারিদিকে নরেশ চাহিতে লাগিল। হঠাৎ দেখিল, দূরে একটি ঘরের ভিতর মিট্‌মিটে আগুনের রক্তাভ ছায়া কাঁপিতেছে। গাছে-গাছে সেই ঘরের দ্বার নিরন্ধ্ররূপে অন্ধকার, তাই সেই আলোর সন্ধান পাইতে এতক্ষণ লাগিল।

নরেশ লম্বা-লম্বা পায়ে ঘাস ডিঙাইয়া দাওয়ায় উঠিল। শেওলা পড়া পিছল দাওয়া, পদে-পদে পড়িয়া যাওয়ার ভয়। হাতের বিজলী মশালের আলোকে পথ দেখিয়া দেওয়াল ধরিয়া-ধরিয়া সে অগ্রসর হইল। সেই ঘরের দরজায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর সেই বৃদ্ধা। তাঁহার চেহারার জীর্ণতা যে এত বীভৎস, মায়ার বর্ণনায় নরেশ তাহা বুঝিতে পারে নাই। এক পাশে ইঁট সাজাইয়া উনুন করা হইয়াছে, তাহাতে কাঠের আগুন এখনো অল্প-অল্প জ্বলিতেছে। বৃদ্ধা বসিয়া আছেন—সাম্‌নে একখানি ধার-উঁচু থালা লইয়া; তাহা হইতে তুলিয়া-তুলিয়া কি খাইতেছেন।

শৈশবে শোনা গল্পের ডাইনির হাড় চিবানোর যে ভয়াবহ দৃশ্য মনে ভাসা-ভাসা রূপ লইয়াছিল, তাহাই যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে আজ নরেশের চর্মচক্ষুর সম্মুখে। ভোজনে তৃপ্তির আনন্দ বুড়ির দুই কোটরগত চোখে ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। নরেশের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ঘামিতে লাগিল।

বুড়ি খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—আমার রূপ তো দেখ্‌লে এত ক'রে, টর্চ্‌টা একবার নিজের দিকে ফেরাও তো দেখি তুমি কে!

নরেশ দাঁড়াইয়াই রহিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন—দীননাথ তোমার কে হয়?

—আমার বাবা।—নরেশ উত্তর দিল।

—ঠিক, যা ভেবেছি।—হি-হি করিয়া বৃদ্ধা আবার



তুলিয়া কি খাইতেছেন

হাসিয়া বলিলেন—নাতি যে! এসো এসো, ভেতরে এসো। তুমি যে আমার নাতি গো, আমি তোমার ঠাকুরমা।

বিস্মিত, অভিভূত এবং যেন কতকটা ভীত দৃষ্টিতে নরেশ ঠাকুরমা-টির চেহারা অভ্যাস করিতে লাগিল। এই লোকটির সংগে সে কথা বলিতে আসিয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত সহজভাবে কথা বলা যাইতে পারে কেমন করিয়া-তাহাই হইল নরেশের ভাবিবার বিষয়।

ঠাকুরমার গলায় আদর ঝন্‌ঝনাইয়া উঠিল—বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবি? সাপ-খোপ কত-কিসের-ভয় আছে···

ভিতরেই বা ভরসা কিসের তাহা তো নরেশ বুঝিল না। সে থতমত খাইয়া ইতস্তত করিতে লাগিল।

ঠাকুরমা বলিলেন—ভেতরে আয়, ওই ইঁটখানার ওপর বোস্।—হাসির কদর্যতা মিলাইয়া তাঁহার মুখে ফুটিয়া

উঠিল বিষাদের করুণতা—কি আর বস্‌তে দেবো, আমি যে দাদু পথের ভিখারী।

ব্যথার ছায়ায় বৃদ্ধার চোখের দীপ্তি গেল ছাইয়া; দুই চোখের কোলে শুধু চক্‌চক্‌ করিতে লাগিল দুইফোঁটা জল।

এবার নরেশ সাহস পাইল। যে মানুষ কাঁদিতে পারে, তাহাকে আবার ভয় কিসের! সে ভিতরে গিয়া ইঁটের উপরই বসিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি তোর কে হই জানিস তো?

নরেশ কোন উত্তর দিল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধা কহিলেন—কেমন ক'রেই বা জান্‌বি! তোর বাপের মুখে শুনিসনি তার সৎমায়ের কথা? তোর বউ বলেনি বাড়ি গিয়ে আমার কথা?

—বলেছে।—নরেশ বলিল—কিন্তু তুমি তো ছিলে আমেদাবাদে, এখানে এলে কেমন ক'রে?

ঠাকুরমা নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন—কেন, হেঁটে-হেঁটে।

'হেঁটে-হেঁটে'! এ পাগল বলে কি! আমেদাবাদ হইতে বাঙ্‌লার এক প্রান্তের এই গ্রামে আসিয়াছে হাঁটিয়া-হাঁটিয়া! হাঁটিয়া আসিয়াছে এক বৃদ্ধা নারী। এমন কথা বিশ্বাস করিবে কে?

বৃদ্ধা বলিলেন—গাড়িতে আসবার মত যে পয়সা ছিল না। আর এতগুলো টাকা নিয়ে এসেছি সঙ্গে ক'রে; গাড়িতে এলে কেউ যদি চুরি-ডাকাতি ক'রে নিয়ে যেত!

নরেশ হাঁ করিয়া রহিল। অনেকগুলি টাকা রহিয়াছে, অথচ গাড়ি ভাড়ার পয়সা নাই, এ কথার কোন অর্থ হয়?

দীননাথের চোখে ঘুম নাই। নিদ্রাহীন শয্যায় পড়িয়া তিনি শুধু ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। অতীত জীবনের দুঃখময় ঘটনাগুলি তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া-ভাসিয়া তালগোল পাকাইতে লাগিল।

দীননাথের বয়স যখন দশ-এগারো বৎসর, তখন তাঁহার মা মারা যান। এক বৎসর যাইতে-না-যাইতে পিতা পুনরায় বিবাহ করিয়া ঘরে আনেন এক কুরূপা নারীকে। শিশুকাল হইতেই দীননাথ অত্যন্ত জেদী। তাহার মায়ের সঙ্গে কোন দিক দিয়া বিন্দুমাত্র মিল যাহার নাই, এমন একজনকে মা বলিয়া ডাকা সেই বালকের পক্ষে অসম্ভব হইল। ইহার জন্য পিতা প্রথমে সাধাসাধি, ক্রমে প্রলোভন, ধমক—শেষ পর্যন্ত উৎপীড়নেরও অবধি রাখিলেন না। দীননাথের ধনুকভাঙা পণ কিন্তু কিছুতেই ভাঙিল না। শেষে একদিন নববিবাহিত স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া পিতা সুদূর আমেদাবাদে চলিয়া যান—বড় দরের এক চাকুরি লইয়া। সেই যে তিনি পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন, তাহার পর আর সেই হতভাগ্যের কোন খবর পর্যন্ত রাখিলেন না।

পাশের এই পোড়ো বাড়িটি ছিল পিতার বসতবাটী। নিজের যৌবনকাল অবধিও না-কি পিতা ছিলেন দরিদ্র। কে এক সন্ন্যাসী তখন দীননাথের মাকে এক কবচ দেন। তাহারই ফলে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের অবস্থা যায় ফিরিয়া। পিতা তাই কবচটিকে সোনার মাদুলিতে পুরিয়া সোনার শিকলিতে আঁটিয়া নেন। দীননাথের জন্মও না-কি সেই কবচেরই ফলে।

মৃত্যুশয্যায় মা সেই মাদুলি পরাইয়া দিয়া যান দীননাথের বাহুতে। পিতা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়ার সময় দীননাথ ছিলেন নিদ্রিত। পরদিন সকালে জাগিয়া দেখেন; মাদুলি তাঁহার বাহুতে নাই, ঘরে নাই জিনিসপত্র আর বাড়িতে নাই বাপ আর বিমাতা। দীননাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিল ওই মাদুলিটি—সে যে মায়ের শেষ চিহ্ন। এই সাতরাজার ধন মাণিক চুরি যাওয়ায় বালকের মনে যে দাগ লাগিয়া রহিল, সারাজীবন আর মোছে নাই তাহা। সৎমা-ই যে মাদুলি চুরি করিয়াছেন, কেহ না বলিয়া দিলেও এ সন্দেহ তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

সেই মাদুলিই আজ দীননাথের এই বৃদ্ধ বয়সে পাওয়া গিয়াছে তাঁহার পুত্রবধূর হাতে।

মাতৃহারা এবং পিতৃপরিত্যক্ত দীননাথ মানুষ হইলেন মামাদের আশ্রয়ে। লেখা-পড়া করিয়া পাশ করিতে করিতে তিনি বড় হইলেন; তাহার পর চাকুরি পাইলেন মোটা মাহিনার। পৈতৃক বাড়িকে স্পষ্ট উপেক্ষা দেখানর জন্যই বাড়ি করিলেন তিনি তাহারই পাশে। মাদুলি হারাইয়াও দিন তাঁহার খারাপভাবে কাটে নাই। মায়ের দানই না-হয় চুরি হইয়াছে; তাহার সাথে ছিল তাঁহার অন্তরের যে আশীর্বাদ, তাহা তো খোয়া যাওয়ার নহে।

তারপর কতকাল কাটিয়া গিয়াছে। দীননাথ বিবাহ

করিয়াছেন, তাঁহার ছেলে হইয়াছে, সেই ছেলেও বড় হইয়াছে, বিদ্বান হইয়াছে—বিবাহ করিয়াছে। দীননাথের এখন প্রৌঢ়ত্বও গিয়াছে চলিয়া; চাকরি হইতে অবসর লইয়া তিনি পেন্সনের টাকা গুণিতেছেন ঘরে বসিয়া।

আমেদাবাদ হইতে উড়িয়া-উড়িয়া যে দুই-চারিটি খবর এই দীর্ঘকালের মধ্যে দীননাথের কানে আসিয়াছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার পিতা সেখানে পরম সুখে আছেন। অনেক টাকা রোজগার করিতেছেন—কোন এক সূতা কলে কি এক উঁচু দরের কাজ করিয়া। অনেক টাকার মালিক হইয়াছেন তিনি। শেষের পক্ষে একটি পুত্র হইয়াছে তাঁহার। দীননাথের সেই বৈমাত্রেয় ভাইটিও প্রৌঢ় বয়সে আসিয়া পৌছিয়াছে।

একবৎসর আগে খবর পাওয়া গিয়াছে, দীননাথের পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন। দীননাথ পিতৃশ্রাদ্ধে কোন ত্রুটি করেন নাই।

তাহার পরে আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। দীননাথ ছিল মন্দ নয়। হঠাৎ আজ এই মাদুলি—তাঁহার মায়ের দেওয়া অপহৃত সেই সোনার মাদুলি সোনার শিকলি সহ অক্ষয়িত অবস্থায় সেই বহুকাল অতীতের আয়তন ও রূপ লইয়া কোন ডাকিনীর হাতে এখানে আসিয়া পৌছিল, সেই ভাবনাতেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার চোখে ঘুম আসিল না। অবশেষে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া ক্লান্ত মস্তিষ্ক তাঁহার অবশ হইয়া আসিল ঘুমের আবেশে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু প্রমাণে নরেশের মনে পিতার সৎমায়ের সম্বন্ধে যে ধারণা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, আজ মধ্য রাত্রির এই ভয়াবহ নীরবতায় পোড়ো বাড়ির এক জীর্ণ কক্ষে বসিয়া হঠাৎ-আবির্ভূতা এই অর্ধ-উন্মাদ বৃদ্ধা সেই ধারণার মূল উৎপাটন করিতে চাহিতেছে!

দীননাথকে ছাড়িয়া যাওয়ার ইচ্ছা না-কি তাঁহার এই বিমাতাটির মনের কোণেও ছিল না কোন দিন। তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারার অক্ষমতার জন্য দীননাথকে বিন্দুমাত্র দোষ তিনি দেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বড় হওয়ার সংগে-সংগে—বুদ্ধি হওয়ার সাথে-সাথে বালকের মন তৈয়ারি হইয়া উঠিবে, অবাধ্যতা কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি যে জেদ চাপিল স্বামীর মাথায়, তিনি বালককে নিঃসহায় করিয়া ছাড়িয়া গেলেন। মহাজেদী স্বামীর ভয়ে, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হইয়াও তিনি যেন মরিয়া থাকিতেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, স্বামীর কাজে বাধা দিয়া ফল যখন হইল না কিছুই, আরও বাধা দিলে একগুঁয়ে সেই লোকটি হয় তো ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারেন। তাহার চেয়ে চুপ্‌চাপ তাঁহার কথা শুনিয়া চলা যাক্, মত তাঁহার একদিন বদ্‌লাইবেই। কিন্তু মত তাঁহার সারা জীবনেও আর বদ্‌লাইল না, নিরপরাধ দীননাথের সংবাদ সত্য-সত্যই তিনি আর কখনও রাখিলেন না।

সৎমায়ের মাতৃচিত্ত চিরদিন হাহাকার করিয়াছে



শাপ দিওনা, মাগো

পরিত্যক্ত, অসহায় এই সন্তানের জন্য; কিন্তু সে বেদনার জ্বালা দহিয়া-দহিয়া তাঁহার বুক পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিয়াছে। মুখ ফুটিয়া দীননাথের কথা যখনই তিনি বলিতে গিয়াছেন, লাভ করিয়াছেন দুঃসহ নির্যাতন। এমনি অশান্তিতে প্রবাস-জীবনের এতগুলি বৎসর তাঁহাদের কাটিয়াছে।

আমেদাবাদ যাওয়ার তিন বছর পরে একটি ছেলে হইয়াছে তাঁহাদের। সে ছেলে বড় হইয়াছে। লেখাপড়ায়

পূর্ণতা পাওয়ার বহু পূর্বেই কারখানা-বহুল স্থানে যেসব বন্ধু সে বাছিয়া লইয়াছে, তাহাদের সংগে উৎসন্ন যাওয়ার পথ লইয়াছে সে পরিষ্কার করিয়া। চল্লিশের উপর বয়স হইল তাহার, সে বিবাহ করে নাই। পিতার চেষ্টায় এক কাপড় কলে মিস্ত্রির কাজ সে পাইয়াছে। মাহিনা নগণ্য নহে। কিন্তু আয়ের সব টাকাই সে উড়াইয়া দেয় নিষিদ্ধ পানীয়ে এবং তাহারই আনুষঙ্গিক পথে।

এক বছরের উপর হইল কর্তা গিয়াছেন পরলোকে। দীননাথের বিরুদ্ধে অকারণ বিদ্বেষ মৃত্যুর মুহূর্তেও তাঁহার নির্মম চিত্ত হইতে বিন্দুমাত্র মুছিয়া যায় নাই। মৃত্যুর আগে তিনি চাহিয়াছিলেন উইল করিতে। উইল করিয়া সব-কিছু দিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার গুণধর পুত্রকে। ছলে-কৌশলে দীননাথের এই বিমাতা সতীনের ছেলের মুখ চাহিয়া তাহা হইতে দেন নাই।

কর্তার শ্রাদ্ধের পরে দেখা গিয়াছে, নগদ জমা আছে ষোলো হাজার টাকা। কি ভাগ্য, সে টাকা জমা ছিল ঘরেই। ব্যাঙ্কে টাকা রাখাকে কেন-না-জানি কর্তা ভয় করিতেন প্রাণের সহিত।

কয়েক মাস নীরবে কাটাইয়া একদিন প্রত্যুষে ছেলে চাহিল সেই টাকা, চাহিল সিন্দুকের চাবি। ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়ে বাজিয়া উঠিল কলের বাঁশি। পুত্র তাই চলিয়া গেল। একটুও দেরি না করিয়া মা গিয়া সেই টাকা বাহির করিলেন। হিসাব করিয়া আট হাজার টাকা—ঠিক অর্ধেক—সরাইয়া রাখিলেন আর সরাইয়া রাখিলেন এই সোনার মাদুলিটি আর নিজের গহনার সব কয়খানি।

পুত্র কিন্তু পিতার সম্পত্তির খবর রাখে। চাহিল সে সব টাকা। মা দিলেন না। পিতার অর্ধেক সম্পত্তির মালিক যে দীননাথ, সে টাকা তিনি কেমন করিয়া দিবেন আর একজনকে। তিনি যে দীননাথেরও মা, সে না-ই বা জানা থাকিল দীননাথের, না-ই বা স্বীকার করিলেন সেকথা তাঁহার নিষ্ঠুর পিতা, মা নিজে তো তাহা জানেন। টাকা তিনি দিলেন না।

পুত্র মিনতি করিল, কাকুতি জানাইল, আত্মহত্যার ভয় দেখাইল, মাকে খাইতে দিল না দুই দিন; শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা কারখানা হইতে বাসায় ফিরিয়া খুব মদ খাইয়া—মাতাল হইয়া গর্ভধারিণীকে প্রহার। তারপর বাহির হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিল অনেক রাত্রে, মদে চুর হইয়া। আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে দীননাথের আট হাজার টাকা, তাহার মাদুলি, নিজের গহনাগুলি আর যে তিরিশটি টাকা ছিল হাতে, তাহা আর দুইখানি কাপড় লইয়া মা বাহির হইয়া পড়িলেন জনহীন রাজপথে। আট হাজার টাকা আর মাদুলিটি ছিল কোমরে বাঁধা, আর সব ছিল একটি পুঁটুলিতে।

একখানি গাড়ি করিয়া তিনি স্টেশনে আসিলেন, একজন লোকের সাহায্যে টিকিট কিনিলেন কলিকাতার। গাড়ির তখনও দেরি ছিল; তাই তিনি বসিয়া রহিলেন বিশ্রাম-ঘরে একটি বেঞ্চিতে। বসিয়া-বসিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ জাগিয়া দেখিলেন, স্টেশনে দাঁড়াইয়া একখানি ট্রেন, হুস্-হুস্ করিয়া ইঞ্জিনের ধোঁয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধা উঠিয়া বসিলেন সেই গাড়িতে।

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল—তবে যে বললে হেঁটে এসেছ?

মাংসহীন, কর্কশ, হাড়জাগা গালের উপর দিয়া অবিরল ধারায় যে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, নিজের মলিন কাপড়ের আঁচলে তাহা মুছিয়া ঠাকুরমা কহিলেন—গাড়িতে আর কতটুকু এলাম! উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে দেখি, পুঁটুলিটা নেই, কে নিয়ে গেছে চুরি ক'রে। তাড়াতাড়ি কোমরে হাত দিয়ে নিশ্বেস ফেলে বাঁচলাম, যাক, কোমরে বাঁধা টাকা ঠিকই আছে। নোট কি-না সব, চোর বুঝ্‌তে পারেনি।

নরেশের উৎকণ্ঠ দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল—তারপর?

—কি যে ভাবনায় পড়্‌লাম দাদু!—একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুরমা বলিলেন—কি আর কব্‌ব! পরের স্টেশনে উঠ্‌ল একজন—বারান্দাওয়ালা টুপি-মাথায়। টিকেট চাইলে। কোত্থেকে দেখাবো? টিকিট যে ছিল পুঁটুলিতে। নামিয়ে দিলে আমায় তার পরের স্টেশনে। অনেকক্ষণ ব'সে-ব'সে কাঁদ্‌লাম সেখানে, তারপর মনে হ'ল, ঠিকই হয়েছে। ভগবানই আমার গাড়িতে আসতে দিলেন না। গাড়িতে যে চোরের ভয়! আমার গয়না গেল, না হয় গেল; কিন্তু দীননাথের টাকা যদি চুরি হয়?…আর কিচ্ছু ভাবলাম না, রেললাইন ধ'রে-ধ'রে হেঁটেই চল্‌লাম।

কথাটি এত সহজকণ্ঠে তিনি বলিলেন, যেন অতদূর হইতে হাঁটিয়া আসা ব্যাপারটি কিছুই নয়। নরেশ বলিল—কিন্তু তাতে যে চুরি হবার ভয় ছিল বেশি।

—পাগল!—একটু হাসিয়া ঠাকুরমা বলিলেন,—ভিখিরির কাছে টাকা আছে, পথের চোরে তা বিশ্বেস করবে কেন?

—ভিখিরি মানে?

—ভিখিরিই তো।—নির্বিকারকণ্ঠে বৃদ্ধা কহিলেন—পথ চল্‌তে চল্‌তে যখনই রাত হয়েছে, গ্রামে ঢু'কে কা'রো বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে ক'রে খেয়েছি। ঘুমোতে তো পারতাম না।—ঠাকুরমা নিচু গলায় বলিলেন—সঙ্গে টাকা রয়েছে যে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—রেলের লাইনে কত বড়-বড় পুল রয়েছে, দাদু—

—কি ক'রে সেগুলো পেরোলে?

—সে যা ক'রে পেরিয়েছি, ওঃ, দুঃসম্ভব সাধনের পরিচিত বিভীষিকা ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল বৃদ্ধার দুই চোখে। কহিলেন—রেলের লাইন ধ'রে ধ'রে, ব'সে ব'সে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কাঠের পর কাঠ পেরিয়েছি। তখনকার কাঁপুনি যদি দেখ্‌তিস্ আমার—

বৃদ্ধার মুখে হাসি খিল্‌খিলাইয়া উঠিল।

বিস্ময়ে নরেশ হতভম্ব হইয়া রহিল। ধীরে ধীরে বেদনা-গলিত কণ্ঠে কহিল—কি অসম্ভব কাজ তুমি ক'রেছ, বুঝ্‌তে পারছ না ঠাকুরমা। মাথার ঠিক থাকলে অমন কাজ তুমি করতে পারতে না। মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

—মাথা?—ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে কতক্ষণ নরেশের দিকে চাহিয়া ঠাকুরমা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাবেই কহিলেন,—না, মাথা খারাপ হয়নি।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া নরেশের যেন ভাবার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পাইয়া গিয়াছে। সে স্তব্ধ হইয়া শুধু অমানুষিক নারীটির দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুরমা কতক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন—আমি আর বাঁচব না, দাদু।

সে বিষয়ে নরেশও নিঃসন্দেহ। যে কংকালসার দেহ, বসিয়া-বসিয়া কথা বলিতেই বুকে তাঁহার কামারের হাঁপরের মত ফুলিয়া ফুলিয়া যে রকম হাঁপ ধরিতেছে, তাহাতে যে কোনো মুহূর্তে এই বৃদ্ধার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যদি অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, তবে বিস্ময়ের কিছু নাই।

—দীননাথ এখন ঘুমোচ্ছে, নয়? ঠাকুরমা কহিলেন—তাকে একবার জাগিয়ে তুলতে পারবিনে?

—কেন?

—কেন কি?—বৃদ্ধা বলিলেন—দীননাথের সঙ্গে দেখা করব না? এদ্দূর তা হ'লে এলাম কি করতে?

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এসেই আমাদের বাড়িতে উঠলে না কেন?

—আমি কি জান্‌তাম যে তোরা আর একটা বাড়ি করেছিস্? এ বাড়িতে তো পৌঁছোলাম এসে আজ ভোরবেলা। ঢুকে দেখলাম বাড়ির এই দশা। ভাবলাম, তা হ'লে দীননাথ বুঝি আর এ গাঁয়ে থাকে না।

নরেশের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কাকুতিভরে কহিলেন—চল্ না, দাদু, তাকে জাগিয়ে দিবি।

দীননাথের গৃহিণী সন্ধ্যারাতেই পুত্রের মুখে মায়ার বর্ণিত বিবরণ শুনিয়াছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে তিনিই পাঠাইয়াছিলেন নরেশকে সৎশাশুড়ীর খবর লইতে। গভীর উৎকণ্ঠায় তিনি এত রাত্রি অবধি জাগিয়াই ছিলেন নিজের বিছানায়। ওদিকের খাটে দীননাথের নাক ডাকিতেছে।

দরজায় ঠুক্ করিয়া একটু শব্দ হইতেই নিঃশব্দে গৃহিণী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। সামনেই দেখিলেন নরেশকে একাকী। সংক্ষেপে সকল কথা সে মাকে বলিল। শুনিয়া তাঁহার মন গলিয়া গেল। ছেলেকে আবার পাঠাইয়া দিয়া তিনি অন্ধকারে দরজা আগ্‌লাইয়া বসিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে নরেশ ফিরিয়া আসিল। তাহার পিছনে যে মূর্তি দেখিলেন, তাহাতে থতমত খাইয়া গেলেন নরেশের মা। বিমূঢ় দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

নরেশ চাপা গলায় কহিল—নিয়ে এসেছি ঠাকু'মাকে সংগে ক'রে।

পুত্রবধূ শাশুড়ীর পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধা ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নরেশ তাহার পিতামহীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে দীননাথের ঘরে লইয়া গেল। ঘর যে অন্ধকার সে খেয়াল

নাই। চুপি-চুপি বলিল - তুমি ব'স, বাবাকে জাগিয়ে নিই আস্তে-আস্তে।

গৃহিণী আলো জ্বালিতেই দীননাথের খাটের অদূরেই যে জলচৌকিটা পাতা ছিল, তাহার উপর বসিয়া বৃদ্ধা এদিক-ওদিক দেখিতে লাগিলেন—চকবক করিয়া।

হঠাৎ-জ্বালা আলোর দীপ্তি ঘুমন্ত চোখে লাগিতেই দীননাথ অপ্রত্যাশিত ভাবে জাগিয়া গেলেন। পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিলেন বৃদ্ধাকে। কি ভাবিয়া—বলা শক্ত, তিনি হঠাৎ 'চোর-চোর' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া উঠিয়া বসিলেন।

ভয়ে বৃদ্ধার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। কি করিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া হঠাৎ যাহা তিনি করিয়া বসিলেন, সহজ অবস্থায় তাহা হাস্যকর। দীননাথের গায়ে যে সুজনিখানা ছিল, তাঁহার আকস্মিক লাফাইয়া উঠার বেগে তাহা ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল মেজেতে—বৃদ্ধার পায়ের কাছে। তাহাই টানিয়া বৃদ্ধা নিজের আপাদমস্তক তাহাতে ঢাকিয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া নরেশ একছুটে উঠানে গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘুমের ঘোরেই দীননাথ বালিশের তলা হাতড়াইয়া চাবি বাহির করিলেন, করিয়া তাহা হাতে লইয়া শঙ্কিতভাবে চলিলেন লোহার সিন্দুকের দিকে। কি পরিমাণ চুরি গেল, দেখিতে হইবে তো।

সেই সুজনির ঢাকার তলাতেই দুই হাত প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—চোর নই, আমায় মারিসনে—চোর নই, আমি মা—তোর মা—আমি তোর মা। পেটের ছেলে মেরেছে আমায়, তাই না ছুটে এসেছি তোর কাছে। মাকে মারতে নেই বাপ আমার; ম'রে যাব যে, তোর অমঙ্গল হবে যে।

গৃহিণী শাশুড়ীর পায়ের তলায় লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—শাপ দিও না মাগো। ক্ষমা কর মা। ও যে বুঝতে পারেনি মা—

এতক্ষণে দীননাথের সম্বিত ফিরিল। অতীতের স্মৃতিতে দুই চোখ তাঁহার ভীষণ হইয়া ওঠার উপক্রম করিল।

কিন্তু বৃদ্ধার দেহটি সেই সময় জলচৌকির উপর হইতে অসহায়ভাবে টলিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। দীননাথ এক লাফে গিয়া ঢাকা খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন, বৃদ্ধার অবসন্ন দুই চক্ষু স্থির হইয়া রহিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ডাক্তার ডাক্‌, ওরে নরা, শীগ্‌গির ডাক্তার ডাক!

শরতের রাণী এসেছে বঙ্গে

শ্রীনীলরতন দাশ বি-এ

মেঘের মাদল বাজে না ক' আর ঝরে না বাদল ধারা;
চখাচখী হাঁস দাদুরী সারস ডাকে না পাগল-পারা।
ধরণী হইতে বরষা বিদায়,—
ভোরের বাতাস করে হায় হায়!
শারদ প্রভাতে আজি নভতলে আলো করে ঝলমল,
হাওয়ায় দুলিছে কাশবন, জলে নাচিছে কমলদল।

শিশিরসিক্ত গন্ধ মদির শেফালি বিছানো পথে
ধরণীতে এলো সোনার শরৎ চড়িয়া অরুণ রথে।
মাঠে মাঠে বাজে রাখালের বাঁশি,
নীলাকাশে রামধনু রাঙা হাসি;
কাকলীমুখর বনভূমি, মাঠ শ্যামল শস্য ভরা;
কান্তারঘেরা প্রান্তরমাঝে শোভিছে বসুন্ধরা!

সজল মেঘের আঁচল সরায়ে নীলাকাশ কারে ডাকে?
নদী সরোবর স্বচ্ছ সলিলে কার ছবি বুকে আঁকে?
কার তরে আজ এত আয়োজন?
প্রকৃতি কাহারে করিছে বরণ?
দোয়েল পাপিয়া চন্দনা শ্যামা বন্দনা করে কার?
শরতের রাণী এসেছে বঙ্গে,—অর্চ্চনা হবে তার!

নিষ্কৃতি

শ্রীযামিনীমোহন কর

বসবার ঘরে শ্রীমতী গার্গী মৈত্র পিয়ানো বাজাচ্ছেন। বাজাতে বাজাতে হঠাৎ সশব্দে ডালাটা বন্ধ ক'রে ঘরে পায়চারী করতে লাগলেন। শেষে যেন ক্লান্ত ভাবে সোফায় বসে পড়লেন। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আলো জ্বালবার পর্য্যন্ত যেন তাঁর শক্তি নেই এভাবে তিনি চুপ ক'রে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে সোফা থেকে উঠে জানলা খুলে ডাকলেন—"বেয়ারা, বেয়ারা !"

গার্গী। বেয়ারা—বেয়ারা—

নেপথ্যে। মেম সাব।

একজন বেয়ারার প্রবেশ

গার্গী। কিষণ, কাল লাইব্রেরী থেকে যে নীল রঙের বইটা এনেছ সেটা কোথায় ?

কিষণ। সাহেবের পড়ার ঘরে।

গার্গী। যাও, গিয়ে নিয়ে এস।

কিষণ। সাহেব একটু আগে বলেছেন যে তিনি ঘরে একটা কাজে ব্যস্ত থাকবেন। ঘণ্টাখানেক কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে।

গার্গী। ওঃ ! আচ্ছা আমি নিজেই নিয়ে আসছি।

গার্গী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ;

কিষণ ঘরের আলো জ্বেলে চেয়ার-টেবিল ঝেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে বই হাতে গার্গী ঢুকলেন। বই বন্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ সোফায় বসে রইলেন। তারপর সে আলোটা নিভিয়ে আর একটা খুব কম পাওয়ারের নীল আলো জ্বাললেন। সোফায় এসে বসলেন। কোলের ওপর বই খোলা, পাতা উল্টোচ্ছেন কিন্তু পড়ছেন না নিশ্চয়ই। কারণ ও আলোতে পড়া যায় না, আর তাঁর চোখও বইয়ের দিকে নয়। উদাসভাবে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। এমন সময় দরজার পর্দ্দায় কার যেন কালো ছায়া পড়ল। তিনি চমকে উঠলেন। ভীতিপূর্ণ অস্বাভাবিককণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—

গার্গী। কে ?

আগন্তুক। (পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে) আমি, জয়ন্ত। তুমি কি আমায় ভূত মনে করেছিলে ? অমন ভয় পেয়ে উঠলে কেন ?

গার্গী। (শুষ্কস্বরে) ভয় ? না। একটু অন্যমনস্ক ছিলুম। তারপর হঠাৎ তুমি ? কোন খবর না দিয়ে—

জয়ন্ত। কেন ? খবর না দিয়ে হঠাৎ আসতে নেই নাকি ?

গার্গী। তা থাকবে না কেন ? তবে দিন পনেরো এমুখো হওনি তাই।

জয়ন্ত। কারণ আছে, তোমায় সব কথাই আজ খুলে বলব। কিন্তু খবর তো তোমায় হিমাদ্রীকে দিয়ে পাঠিয়েছিলুম। কোর্টে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। বলেছিলুম ক্লাব-ফেরতা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব, একথা তোমায় জানাতে। বলেনি কিছু ?

গার্গী। না। কিন্তু তুমিও তো টেলিফোনে আমায় জানাতে পারতে।

জয়ন্ত। তা পারতুম। (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) গার্গী, এ লুকোচুরি আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

গার্গী। (একটা হাই তুলে) কিছু মনে ক'র না। ভয়ানক ক্লান্ত মনে হচ্ছে। গরমের জন্য বোধ হয়। এ কি, তোমার বক্তৃতা থামালে কেন ? বলে যাও। তোমার বাণীর মধ্যে কত উপদেশ থাকতে পারে যা ভবিষ্যত জীবনে হয় ত আমার খুবই কাজে লাগবে। দিন পনেরো এদিকে না আসার, একটা টেলিফোন পর্য্যন্ত না করার গুহ্য কারণটাও মিলতে পারে।

জয়ন্ত। দেখ গার্গী, এই দু'বছর ধরে শুধু প্রবঞ্চনার ওপর ভিত্তি ক'রে আমাদের জীবন গড়ে উঠছে। শুধু মিথ্যা সব মিথ্যা। এ যেন একটা নেশা। জেনে শুনেও অসহায়ের মত—

গার্গী। আমার কাছে এটা নেশা নয়।

জয়ন্ত। (কোমলস্বরে) গার্গী, তুমি আমায় ভালবাস ?

গার্গী। প্রশ্নটা বড্ড মেয়েলী হ'ল। ভালবাসাটা তোমাদের নেশা কিন্তু আমাদের প্রাণ। তা হারালে তোমরা খুব বেশী হ'ল দুচার দিন ছটফট ক'রে আবার নতুন নেশা ধরবে, কিন্তু আমরা—যাক্ সে কথা।

জয়ন্ত। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। উভয়ে উভয়কে ভালবাসি। এই ভালবাসার দোহাই দিয়ে আমি আজ হিমাদ্রীকে সব কথা খুলে জানাতে চাই—

গার্গী। সেইজন্তই বুঝি এ ক'দিন আস নি?

জয়ন্ত। হ্যাঁ। আমি আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এ ক'দিন চিন্তা করছিলুম। হিমাদ্রী আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। না, না, গার্গী, ওকে সব কথা জানাতেই হবে। কে জানে এখনই হয় ত ও আমাদের সন্দেহ করে, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু ওকে কি বলব? কি ক'রে বলব? এ যে ভারী শক্ত—

গার্গী। এসব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

জয়ন্ত। (গার্গীর পাশে বসে) হিমাদ্রীকে যে সব খুলে বলা উচিত এ বিষয় তোমারও মত আছে নিশ্চয়ই?

গার্গী। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) আমার মতামতে কি আসে যায় জয়ন্ত! তুমি আমার পাশে বসে আছ এইটাই সত্য। কিছুক্ষণ নীরবে দু'জনে দু'জনের সম্বন্ধে চিন্তা করি—(একটু থেমে) জয়ন্ত, আমরা দু'জনে যখনই একসঙ্গে মিলিত হয়েছি তখন কেবল কথা কয়েছি। অনর্থক বাজে কথা। সেই কথার আড়ালে ভুলতে চেষ্টা করেছি আমার স্বামীকে, কিন্তু পারি নি। প্রতিকথা, প্রতি তর্কের স্রোত আপনা হতেই ভেসে গিয়েছে তারই দিকে। আমাদের প্রেম যেন তর্কের জাল। অন্তত আজকে কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে আমার স্বামীকে বাদ দিয়ে দু'জনে দু'জনকে অনুভব করি—

জয়ন্ত। কিন্তু হিমাদ্রীর সঙ্গে আজ দেখা করতেই হবে। আসবার সময় কিষণকে বলে এসেছি—

গার্গী। (অধীরভাবে) আঃ চুপ কর। অন্তত আধঘণ্টার জন্য। (কাষ্ঠ হাসি হেসে) নাঃ, আমি যেন আজ হিস্টিরিক হয়ে পড়েছি। গরম, নার্ভস—হ্যাঁ, কিষণকে কি বলেছিলে? আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস কর নি? আমি ওপরে একলা আছি একথা সে বলে নি?

জয়ন্ত। বলেছে। হিমাদ্রী কোথায় আছে প্রশ্ন করতে সে বললে, সাহেব পড়ার ঘরে কাজে ব্যস্ত আছেন। ঘণ্টাখানেক তাঁকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেছেন। আমি 'বেশ, একটু পরে তাঁকে খবর দিও' বলে ওপরে চলে এসেছি।

গার্গী। ওঃ!

জয়ন্ত। কিন্তু এসব কথা বলা—উঃ, ভারী কঠিন ব্যাপার। হিমাদ্রী, অমন সরল, উদার—

কিষণের প্রবেশ। মুখে উদ্বিগ্ন ভীতভাব।

দু'জনে। (চমকে) কে?

কিষণ। হুজুর আমি। আপনি এসেছেন জানাবার জন্য সাহেবের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করে—

জয়ন্ত। তারপর—কি? বল, থেম না।

কিষণ। দেখলুম সাহেব মারা গেছেন।

জয়ন্ত। অ্যাঁ।

কিষণ। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলুম পড়বার টেবিলের ওপর মাথা রেখে তিনি বসে। আর মাথার পাশে একটা খালি শিশি।

জয়ন্ত। মাই গড্।

অস্ফুটস্বরে "মাই গড্" বলে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ক'রে খোলা জানলার কাছে উঠে গিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে যেন তাঁর দম আটকে আসছে

গার্গী। আচ্ছা কিষণ, তুমি এবার যেতে পার। আর দেখ, ডাক্তার রায়কে একবার ডেকে আন। বলবে—"বড্ড দরকারী কাজ। মেমসাহেব ডাকছেন।" আর কিছু না।

মাথা নেড়ে কিষণ চলে গেল

জয়ন্ত। (জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে) আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—

গার্গী। জয়ন্ত!

জয়ন্ত। (ফিরে এগিয়ে এসে) কি ভয়ানক! গার্গী, এ যে কি হ'ল—বেচারা হিমাদ্রী নীচে একলা মৃত আর আমরা দু'জনে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর তার স্ত্রী ওপরে বসে নিরিবিলিতে প্রেম করছি—ছি, ছি! এ যেন একটা পৈশাচিক কাণ্ড!

গার্গী চুপ ক'রে রইলেন

অস্থির ভাবে পদচারণা করতে করতে হঠাৎ থেমে

কতকগুলো অপরাধ আছে যার ক্ষমা নেই। কোন দোহাই দিয়ে তার সাফাই করা যায় না। কিন্তু এ যে সব অপরাধের চেয়ে বড়। কোন শাস্তি, কোন প্রায়শ্চিত্তই এর পক্ষে যথেষ্ট নয়! প্রবঞ্চনা—বন্ধুকে, স্বামীকে প্রবঞ্চনা। (কণ্ঠস্বর কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এল) ওকে আমরা মেরে ফেলেছি। আমরা খুনী—

মুখ দিয়ে আর কথা বার হ'ল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা চেয়ারে জয়ন্ত বসে পড়লেন

গার্গী। আমরা তাকে মেরে ফেলেছি একথা বলা ঠিক হবে না। এ নেহাৎ ছেলেমানুষী। জীবন সংগ্রামে সে পরাজিত, নিহত। তুমিই কি একলা শুধু দুঃখ পেয়েছ, আমি পাইনি? পাছে ওর মনে লাগে—বেচারা আমায় সত্যই ভালবাসত—সেইজন্য এই দু'বছর ধরে তার সঙ্গে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় ক'রে যাচ্ছি—উঃ, আমি আজ শ্রান্ত!

জয়ন্ত। (মুখ তুলে) গার্গী!

গার্গী। তুমি থাকতে দূরে দূরে। দিনে একবার কি দু'বার তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ত। কিন্তু আমি দিন-রাত প্রতিমুহূর্ত্ত নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে আমার স্বামীকে প্রবঞ্চনা করেছি। কাগজের রঙীণ ফুলে সাজিয়ে তার পায়ে প্রেমের ডালি নিবেদন করেছি। সে শুধু রঙ দেখে এতদিন ভুলে ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফাঁকি ধরা পড়ে গেলই। তার মনে যাতে কোন আঘাত না লাগে আমার সে প্রচেষ্টা আজ বৃথা হ'ল। আমি যখন দেখলুম সে মৃত, তখন ভাবলুম তার স্থানে যদি আজ আমি মৃতা হতুম তবে—

জয়ন্ত। কি বলছ তুমি!

গার্গী। ঠিকই বলছি। তুমি আসবার কিছুক্ষণ আগে তার পড়ার ঘর থেকে এই বইটা আনতে গিয়ে দেখি মরে আছে। ওপরে এসে চুপ করে ভাবছিলুম—আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য তুমি যখন ঢুকলে তখন আমি অমন ভাবে চমকে উঠেছিলুম—

জয়ন্ত। কিন্তু আমি যে এসে দেখলুম তুমি পড়ছিলে—

গার্গী। পড়ছিলুম না, পড়ার ভান করছিলুম। এ আলোতে এ মনেতে পড়া যায় না। বসে আছি এমন সময় তুমি এসে বললে তাকে সব খুলে বলা দরকার। আমি উত্তর দিয়েছিলুম এসব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। তোমায় একটু চুপ করে থাকতে বলেছিলুম, কারণ জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন বক্তৃতা সহ্য করা যায় না, বিশেষ ক'রে এরূপ বিপদের মধ্যে।

জয়ন্ত। সব জেনেও এতক্ষণ একথা চেপে ছিলে?

গার্গী। হ্যাঁ। আমরা দু'জনে এতদিন দেয়ালের আড়াল থেকে কথা কইছিলুম। আজ দেয়াল সরে গেছে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারব কি-না—

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামবার দ্রুত পদশব্দ পাওয়া গেল। নীচের দরজা জোরে বন্ধ করার আওয়াজে বোঝা গেল তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। গার্গী ছুটে জানলার কাছে গিয়ে ডাকলেন—"জয়ন্ত, জয়ন্ত!" জয়ন্ত ফিরলেন না। কিন্তু আর একজন নিঃশব্দে পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ছায়া পড়তে গার্গী ফিরে চাইলেন। আগন্তুককে দেখে একটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠলেন

আগন্তুক। জয়ন্তকে ডাকছ শুনে এলুম। কি হ'ল তোমাদের? মান অভিমান, ঝগড়া? জয়ন্ত কি একেবারে চলেই গেল?

গার্গী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়লেন

সত্যই কি চলে গেল? আর আসবে না? আমি যে এই একঘণ্টা ধরে মৃতের অভিনয় করলুম, সবই দেখছি ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল। এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থেকে গা হাত পায় ব্যথা হয়ে গেছে। অভিনয়টা কিন্তু ভালই করেছিলুম, কি বল? তুমি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেছিলে, যে আমার গুরু, যার কাছ থেকে এ অভিনয় শিক্ষা! তোমরা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। আমার বাড়ীতে বসে আমার স্ত্রী ও আমার বন্ধু প্রেমলীলা করছে। হা হা—ভেবেছিলে আমি কিছু জানতে পারিনি। বেশ—তুমি আমায় না চাও আমায় ছেড়ে চলে যাও। নিষ্কৃতি দাও, তোমার মিথ্যা প্রেমাভিনয় থেকে আমায় রেহাই দাও। তোমার স্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা দিয়েছে, তোমার চুম্বন আমাকে নরকের উত্তপ্ত লৌহমূর্ত্তি চুম্বনের যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছে। অথচ আমি যা কিছু সম্ভব তোমাদের দিয়েছি। ভালবাসা, বন্ধুপ্রেম, বিশ্বাস—সবই। আর তোমরা দিলে তার এই প্রতিদান! আমি মৃত্যুর ভান করেছিলুম যাতে তোমরা আপদ গেছে মনে করে দু'জনে মনের সুখে হাত ধরাধরি করে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে হেঁটে গৃহত্যাগ ক'রে তোমাদের নতুন জীবনপথে নিষ্কণ্টক হয়ে এগোতে পার। আমিও এই হৃদয়বিদারক অভিনয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু তা হ'ল না। জয়ন্ত, যতদিন আমি বেঁচেছিলুম ততদিন প্রেম নিবেদন করলে, কারণ তাতে দায় নেই, বোঝা নেই। যেই জানলে যে আমি মৃত অমনি সরে পড়ল। কাপুরুষ! বন্ধুকে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে প্রেম করাটা সোজা, কিন্তু তার স্ত্রীকে নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে ভালবাসার জোরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন। নাঃ নিষ্কৃতি পেলুম না। মৃত্যুর ভান ক'রে আমার নিষ্কৃতি নেই—আছে কেবল সত্যিকারের মৃত্যুতে।

ঘর থেকে হিমাদ্রী বেরিয়ে গেলেন। গার্গী কাষ্ঠপুত্তলিবৎ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

(উনিশ)

জমিদারের চাপরাসীটা তাহাকে যে-কথা স্মরণ করাইয়া দিল—সেই কথাতেই অনিরুদ্ধ যেন পঙ্গু হইয়া গেল। কথাটা তাহার মনে ছিল না। তাহার ঠাকুরদাদা বলিয়া গিয়াছিল তাহার বাবাকে, বাবা বলিয়াছে তাহাকে—কতবার বলিয়াছে; গ্রামের প্রবীণ মাতব্বরেরাও একথা কতবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছে, সে শুনিয়াছে। গাছ জমিদারের—ফলভোগের অধিকার মাত্র প্রজার। পরের সন্তান পালন করিয়া—পালনের মমতার আচ্ছন্নতায় যেমন মানুষ তাহার উপর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব স্থাপন করিতে যায়—তেমনি মোহে—সেই স্বত্বের দাবী লইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কথাটা মনে পড়িতেই সে পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া গেল। তা ছাড়াও—জমিদারের সঙ্গে বিরোধ করিবে কে? একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে নেপালের দিকে হাত বাড়াইল কল্কের জন্য।

ভূপাল হাতের মুঠায় কল্কে পুরিয়া তামাক খাইতেছিল, সে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—একা তোমার গাছ নয় কম্মকার, আরও অনেক জনার গাছ কাটা হবে। আর একটা ক'রে ডাল তামাম লোকের গাছ থেকেই নেওয়া হবে। লাও—খাও। সে কল্কেটি অনিরুদ্ধের দিকে বাড়াইয়া দিল।

অনিরুদ্ধ হাত বাড়াইয়া ছিল, কল্কেটা লইল; সে যেন কেমন উদাসীন হইয়া গিয়াছে এই অল্প সময়ের মধ্যেই। নিরুপায় অক্ষমতায় সমস্ত কিছুর উপর তাহার বৈরাগ্য আসিয়া গিয়াছে। কাটুক, গাছ কাটুক! জাম কাড়িয়া নিক! বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিক! সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, ভিক্ষা করিয়া খাইবে, না হয় গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিবে! বারকয়েক টান মারিয়া কল্কেটা পাতুকে দিয়া সে বলিল—খা।

ভূপাল, খানিকটা সরিয়া গিয়া অনিরুদ্ধকে ডাকিল—শোন। অ কম্মকার!

—কি?

—এইখানে একটুকুন সরেই এস কেনে।

অগ্রসর হইয়া অনিরুদ্ধ অসহিষ্ণুর মত প্রশ্ন করিল—কি?

—অমন ক'রে মুচি-ফুঁচিকে হাতে হাতে কল্কে দিয়ো না। ছি! আর—; কণ্ঠস্বর আরও খানিকটা মৃদু করিয়া ভূপাল বলিল—আর দুগ্‌গার বাড়ী যাও তো লুকিয়ে-ছাপিয়ে যেয়ো। বুঝলে!

স্থিরদৃষ্টিতে অনিরুদ্ধ নেপালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘাড় নাড়িয়া বিশেষ ইঙ্গিত করিয়া ভূপাল আবার বলিল—তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। বুয়েচ!

—ভালো না কচু! অনিরুদ্ধ জানোয়ারের মত দাঁত বাহির করিয়া হাসির একটা ভঙ্গি করিল।—সবাই আমার ভালো করলে, তুই বাকী ছিলি—এইবার ভালো করবি। যা, যা! কোন শালাকে আমি কেয়ার করি না।

ঠিক এই সময়টিতেই গাছটা অল্প শব্দ করিয়া ঈষৎ হেলিয়া পড়িল। প্রায় অর্দ্ধেক কাটা হইয়াছে। বাকি অর্দ্ধেকের সবটা কাটিবার প্রয়োজন হইবে না, আর খানিকটা কাটিলেই মড় মড় করিয়া মাটির উপর আছাড় খাইয়া পড়িবে। সকলেই চকিত হইয়া গাছটার দিকে চাহিল। অনিরুদ্ধও চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল গাছটা যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। গাছটাকে লইয়া কত কথা তাহার মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া গেল। গরু চরাইতে আসিয়া কতদিন এই গাছতলায় বসিয়া থাকিয়াছে। জ্বর-জ্বালার পর কতদিন এখানে আসিয়া কয়েতবেল কুড়াইয়া—নুন দিয়া গোপনে খাইয়াছে। কি চমৎকার ফল গাছটার! মজুর দুইটা আবার কুড়ুল বাগাইয়া ধরিল। এবার অনিরুদ্ধ যাহা করিয়া বসিল—তাহা অপর সকলে দূরে থাক, তাহার নিজেরই কল্পনাতীত। একেবারে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া সে মজুর দুইটার কুড়ুলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার।

জমিদারের চাপরাসীটা ধমক দিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিল—এই! এই অনিরুদ্ধ!

চীৎকার করিয়া অনিরুদ্ধ অস্বীকার করিয়া উঠিল—না—না—না।

ভূপাল আবার স্মরণ করাইয়া দিল—কম্মকার, পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়; খেপামি ক'র না।

—না, আমি কাটতে দেব না—! পাথরে মাথা ঠুঁকেই মরব আমি! ভয়, ভাবনা, ভবিষ্যতের বিবেচনা—সমস্তই অনিরুদ্ধ ভুলিয়া গিয়াছে। হয় তো কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে। দুই হাত প্রসারিত করিয়া অনিরুদ্ধ গাছটাকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, স্থির অকম্পিত ভাবে।

পাতু সভয়ে ডাকিল—কম্মকার! কম্মকার! অচেতন মানুষকে চেতনায় ফিরাইয়া আনিবার জন্ত যে আবেগে ও আকুলতায় মানুষ মানুষকে ডাকে—সেই আবেগে আকুলভাবে সে ডাকিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ একেবারে ভ্রূক্ষেপহীন। মজুর দুইটা হতভম্ভ হইয়া কুড়ুল নামাইয়া খানিকটা সরিয়া আসিল।

চাপরাসীটা আসিয়া এবার অনিরুদ্ধের হাত ধরিয়া টান দিল—হট্, বলছি, হট্!

অনিরুদ্ধ একটু টলিল—কিন্তু সে স্থান হইতে এক পা সরিল না। সে যেন মাটির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। জমিদারের চাপরাসী কঠিন ক্রোধে তাহার হাত আবার সজোরে চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল অনিরুদ্ধের লোহা-পেটা হাতখানা যেন নিরেট পাথরের মত দৃঢ় এবং অনড় হইয়া উঠিয়াছে। সে ভূপালকে ডাকিল—এই বেটা বাগ্দী, এদিকে আয়—ধর শালাকে।

সেই মুহূর্ত্তটিতেই ময়ূরাক্ষীর বন্তারোধী বাঁধের উপর হইতে কে গম্ভীর স্বরে হাঁকিয়া বলিল—এই! কি হয়েছে? কিসের মারামারি?

ভূপাল একেবারে যেন স্থাণুর মত পঙ্গু হইয়া গেল। বাঁধের উপর থানার জমাদার, একজন চৌকিদার, চৌকিদারটার মাথায় একটা স্যুটকেস—স্যুটকেসের উপর একটা বিছানা। তাহাদের পিছনে একটি ছিপছিপে সতের আঠার বছরের ভদ্রলোকের ছেলে। রুক্ষ তৈলহীন চুল, গায়ে মোটা চটের মত কাপড়ের জামা, পরণেও তেমনি মোটা কাপড়, চোখে চশমা!—মুহূর্ত্তে ভূপালের মনে পড়িয়া গেল—একজন 'নজরবন্দী' বাবুর আসিবার কথা আছে। ভূপাল আত্মসম্বরণ করিয়া হেঁট হইয়া তাড়াতাড়ি জমাদারকে প্রণাম জানাইল—সঙ্গে সঙ্গে বাবুটিকেও। ওদিকে জমিদারের চাপরাসীটা অনিরুদ্ধকে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া জমাদারকে প্রণাম করিয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই ঈষৎ হাসিয়া বলিল—দেখেন হুজুর, দেখেন; বেটা কম্মকারের করণ দেখেন। কুড়ুলের ছামুতে এসে দাঁড়াচ্ছে! বলছি সরে যা, তা কিছুতেই সরবে না।

অনিরুদ্ধও এবার আসিয়া জমাদারের পায়ে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল—হুজুর, আমার কত্তাবাবার হাতে লাগানো গাছ! আপনি বিচার করুন হুজুর!

জমাদার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই জমিদারের চাপরাসী সবিনয়ে বলিল—গাছ তো হুজুর জমিদারের। পেজারা কেবল ফল-ভোগ করবার মালিক। তা জমিদার পাঠিয়েছেন গাছ কাটতে, আর ও এসে একেবারে কুড়ুলের ছামুতে দাঁড়িয়ে বলে গাছ কাটতে দোব না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জমাদার বলিল—এই বেটা কামার! কুড়ালের সামনে দাঁড়াচ্ছিস কেন? যা না তুই জমিদারের কাছে। চাপরাসী লগ্দী—ওরা হ'ল চাকর, যেমন হুকুম তেমনি করবে।

—আজ্ঞে হুজুর, সেই কথা ওকে একশো বার বলছি, তা ও কিছুতে শুনবে না। জমিদারের চাপরাসী একেবারে ফুলিয়া উঠিল।

বেশ একটু শাসনের সুরেই ধমক দিয়া জমাদার বলিল—যা তুই জমিদারের কাছে যা। দাঙ্গা-ফাঙ্গা করিস নে।

তরুণ ছেলেটি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—কিন্তু রাজার বাড়ীর ঘর-পোড়া হবে না তো জমাদারবাবু?

—রাজার বাড়ীর ঘর পোড়া?

—একটা গল্প আছে। রাজার বাড়ীতে আগুন লেগেছিল, লোকজন আগুন নেভাতে এসে দেখলে—জল তোলবার পাত্রের অভাব। কিন্তু রাজার হুকুম ভিন্ন কলসী কেনবার পয়সা স্যাংশন হবে না, আর রাজাও নেই রাজধানীতে। তিনি গেছেন দার্জ্জিলিং হাওয়া খেতে। তখন সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটল দার্জ্জিলিং—রাজা বাহাদুরের হুকুমের জন্তে। হুকুমও হ'ল লোকও ফিরল—দু দিন পর। বাকিটা অবশ্য বুঝতেই পারছেন। সে এবার সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

জমাদার সাহেব একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, জমিদারের চাপরাসীটাকেও এবার ধমক দিয়া বলিল—তোরাও এখন গাছে হাত দিবি না। খবরদার!

চাপরাসীটা সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে হুজুর, গমস্তা মশায়ের পরিবারের ছাদ্দের কাঠ—

—ছাদ্দের কাঠ তো আমার কি রে শালা? ভাগ বলছি—নইলে হাতকড়া দিয়ে চালান দোব।

চাপরাসীটা একেবারে অবাক হইয়া গেল। জমাদার সাহেবের তো এমন বলিবার কথা নয়। গমস্তা মহাশয়ের সঙ্গে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব! সে নিজেই তো কতবার বোতলের পর বোতল আনিয়া জোগাইয়াছে! ভূপাল কিন্তু বিস্ময় বোধ করিল না। ওই যে নজরবন্দী বাবুটি, দেখিতে ছোট্ট ছেলেটি হইলে কি হয়—সাংঘাতিক লোক! উহারা বোমা পিস্তল ছুড়িতে পারে, ফাঁসি যাইবার সময় হাসে, উহাদের কলমের খোঁচায় লাট সাহেবের পর্য্যন্ত টনক নড়ে! অনেক গল্পই সে শুনিয়াছে। উহার সম্মুখে জমাদার সাহেব কি বেআইনী কিছু করিতে পারে!

জমাদার বলিল—তোদের গমস্তার বাইরের ঘরটা ঠিক আছে তো রে?

—আজ্ঞে? সে ঘর তো এখনও ঠিক হয় নাই। তা-ছাড়া—সেখানে তো এখন ছাদ্দ কিয়ার ভাঁড়ার হয়েছে।

—কি বিপদ! আমি ব'লে রাখলাম এমন করে! আর এখন ঘর ঠিক নাই! আর কারও ভাল ঘর আছে, ভাড়া দেওয়া হবে।

ছেলেটিকে অনিরুদ্ধের বড় ভাল লাগিয়াছিল। সতেরো আঠারো বছরের কচিমুখ-প্রিয়দর্শন ছেলেটির কথাগুলির ভারী ধার! এক কথায় জমাদার ঘুরিয়া গেল। সে জোড়হাত করিয়া বলিল, হুজুর আমার বাইরের ঘরখানা—যদি পছন্দ হয়—

—চল্ দেখি! জমাদার এখন ঘর পাইলে বাঁচে।

অনিরুদ্ধ তাড়াতাড়ি পাতুকে ডাকিল—পাতু!

কিন্তু কোথায় পাতু? পুলিশ দেখিয়াই সে এক পা এক পা করিয়া সরিয়া—বাঁধের অপর দিকে গিয়া—আড়ালে আড়ালে ছুট দিয়াছে।

*　　*

অনিরুদ্ধের ঘরখানাকে খুব ভাল বলা চলে না, তবে মন্দ নয়। জমাদার বলিল দিন কয়েক থাকুন, ফার্স্ট'ক্লাস ঘর দেব আপনাকে।

শ্রীহরি পাল আজ বাধ্য হইয়া অনিরুদ্ধের বাড়ী আসিয়াছিল। সে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, জমাদারের বন্ধু; কিছুদিন পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে ঘরের কথা জমাদার তাহাকে বলিয়াছিল। কিন্তু সে কথাকে পাকা কথা বলা চলে না; তবুও সে প্রতিবাদ করা যায় না। তাই সে দায়িত্ব এবং অপরাধ মাথা পাতিয়া লইয়া শ্রীহরি বলিল—আজ্ঞে এই মাস খানেক। পনের দিন বাদেই আমার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধ গেলেই দশ দিনের মধ্যে সব কম্‌পিলিট ক'রে দেব।

ছেলেটি অদ্ভুত। কোন কথাই সে বলিল না, চৌকিদারটাকে লইয়া বিছানা-পত্র খুলিয়া সংসার গুছাইতে লাগিয়া গেল।

শ্রীহরি বলিল—আজ তা হ'লে খাওয়া দাওয়া হরেন্দ্র ঘোষালের বাড়ীতেই হোক—

মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া ছেলেটি বলিল—না। আমি নিজেই যা-হোক চারটি ক'রে নেব।

—বেশ, তা হ'লে সিধে পাঠিয়ে দেব আমি। ভূপাল, খিড়কি থেকে একটা মাছ তুই ধ'রে দে দেখি!

—না। সিধে পাঠাবেন না।

—পাঠাব না? শ্রীহরি বিস্মিত হইয়া গেল।

—না। তারপর হাসিয়া বলিল—মাছটা বরং জমাদার বাবুকে দিয়ে দেবেন।

জমাদার হাসিল। বলিল—আমরা হলাম মাছরাঙা, অপবাদে আমরা ভয় পাই না। আমি কি আর শুধু হাতে যাব। কিন্তু আপনার কি হবে?

—লপসী। লপসী বানাব আজ। চালে ডালে আনাজে একসঙ্গে। ভাববেন না।

—তা হ'লে এ বেলা আমি বিদেয় নিলাম যতীনবাবু। ভূপাল থাকল আপনার কাছে।

—ভূপাল?

—হ্যাঁ, এ গাঁয়ের চৌকিদার। এই যে, ইনিই ভূপালচন্দ্র।

—উত্তম ব্যবস্থা। তা হ'লে নমস্কার।

জমাদার চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি। জমাদার তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিয়াছিল। পথে নামিয়া জমাদার মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—সব শুনেছ?

—শুনেছি।

—গাছটা ছেড়ে দাও।

—শুধু গাছ কেনে জমাদারবাবু, গেরামই ছেড়ে দোব আমি। শ্রীহরির কণ্ঠস্বরে অভিমান সুস্পষ্ট।

জমাদার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল—কি করব বল—

বাধা দিয়া অভিমানের আবেগে শ্রীহরি বলিয়া উঠিল—আপনি ওই কামারবেটার কাছে আমার মাথা হেঁট করলেন!

—কামার বেটা নয় ভাই, ওই ছোঁড়াটা, ওই ছোঁড়াটা। ও জাতটাই হ'ল রামপাজীর জাত। কোন্ দিক দিয়ে বেটাচ্ছেলে কি ক'রে দেবে, আমার চাকরিতে টান পড়ে যাবে।

সবিস্ময়ে শ্রীহরি জমাদারের মুখের দিকে চাহিল। ঐ এক ফোঁটা ছেলে—গাল টিপিলে এখনও মাতৃস্তন্যের গন্ধ মেলে—তাহাকে এত ভয়!

জমাদার বলিল—তুমিও বরং একটু সাবধান হবে ভাই। বললাম তো ভয়ঙ্কর জাত ওরা। চোলাই টোলাই—আর—; একটা বিশেষ ইঙ্গিত করিয়া বলিল—ওসব বেশ সাবধান হয়ে করবে। ওদের বিশ্বাস নাই।

শ্রীহরি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এবার একটু হাসিল, বলিল—ও-সব আর ছেড়েই দিয়েছি জমাদারবাবু!

—বল কি?

—হ্যাঁ।

জমাদার মুচকিয়া হাসিয়া বলিল—গোপনে—

—আপনাদের মর্য্যাদার কি আর অভাব হবে! তবে, আমার আর ভালোও লাগে না, শোভাও পায় না। ধরুন, বয়সও হ'ল—আর লোকে বলেই বা কি? বউটা ম'ল, চিরদিন দুঃখ পেয়েই ম'ল। শ্রীহরি আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—আমার মাছটা ভাই—

—এই যে। একবার খেপলা ফেললেই হয়ে যাবে। বিচিত্র মানুষের মন, মুহূর্ত্তের পূর্ব্বের ম্লান বিষণ্ণ শ্রীহরির মুখ মুহূর্ত্তে আত্মপ্রসাদের হাসিতে ভরিয়া উঠিল—আপনার আশীর্ব্বাদে, মাছ আমার হাতে তালি দিলে লাফিয়ে পড়ে ডাঙায়!

মাছ ভালই পাওয়া গেল, আড়াই সের তিন সের কয়েকটা রুই। শ্রীহরি বলিল—আপনি একটা নেবেন। এইটা বড়বাবুকে দেবেন, আমার পেন্নাম জানাবেন, বলবেন—মাছটা পাঠিয়ে দিলাম। আর একটা কথা—শ্রাদ্ধতে কিন্তু পায়ের ধূলো দিতে হবে।

—নিশ্চয় আসব।

গ্রামের প্রায় প্রান্তে আসিয়া শ্রীহরি বিদায় লইল।

জমাদার একটু দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর বলিল—শোন পাল! শ্রীহরি কাছে আসিতেই অতি মৃদু স্বরে বলিল—রাতারাতি লোক লাগিয়ে গাছ কেটে—একেবারে তুলে নিতে পার না?

শ্রীহরি হেঁট হইয়া জমাদারকে প্রণাম করিল।

(কুড়ি)

উনিশ শো চব্বিশ সালের বাঙলা সরকারের বিশেষ ক্ষমতা বলে প্রণয়ন করা আটক-আইনের বন্দী। সতেরো-আঠারো বৎসরের একটি কিশোর। শ্যামবর্ণ রঙ, রুক্ষ বড় বড় চুল, পেশী সবল, ছিপছিপে শরীর, সর্ব্বাঙ্গে একটি কমনীয় লাবণ্য, চোখ দুটি শুধু ঝকঝকে—চশমার অন্তরালে সে দুটিকে আরও আশ্চর্য্য দেখায়। অনিরুদ্ধ অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিল, আর বক বক করিয়া আপনার দুঃখের ইতিহাস বলিয়া যাইতেছিল। আজ যে তাহার কঙ্কনায় কাবুলী চৌধুরীর কাছে যাইবার কথা—সেও পর্য্যন্ত তাহার মনে নাই। জমিদারের কাছে যাইবার তাগিদও ভুলিয়া গিয়াছে। যতীন ছেলেটি জিনিষপত্র বাহির করিয়া ঘরখানার প্রায় অর্দ্ধেকটা মেঝে জুড়িয়া ফেলিল। জিনিষপত্র বাহির করিয়া ডাকিল ভূপাল!

ভূপাল হাজিরই ছিল, চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া বাহিরে বসিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া সে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটি হাসিয়া বলিল—ভূপাল তোমার নাম? ভূপাল মানে কি জান? ভূপাল মানে পৃথিবী—যিনি পালন করেন, অর্থাৎ রাজা। এখন আমাকে একটু পালন কর দেখি! এক সের চিনি—আর খানিকটা দুধ, দুপয়সার মত। একটু চা খেতে হবে।

ভূপাল চলিয়া যাইতেই যতীন অনিরুদ্ধকে বলিল—

তোমার ওই গাছটা সম্বন্ধেই এখন আমি বলি। অন্য কথা ভেবে দেখব। এখন তোমার দুটি পথ। এক মকদ্দমা করা, আর এক যা তুমি করেছিলে তাই। কুড়ুলের সামনেই তোমাকে দাঁড়াতে হবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব কুড়ুলের সামনে?

—মামলা করতে পারবে? উকিল মোক্তারের খরচ লাগবে না। সদরের কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে চিঠি লিখে দেব আমি। তবে অন্য খরচ তো আছে।

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার মনের মধ্যে বিবেচনা ও ক্ষোভে একটা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তুলিল। মনের ক্ষোভ তিলে তিলে প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ কোন মতেই বিবেচনাকে উর্দ্ধে স্থান দিতে পারিল না। কঙ্কনার চৌধুরী ছয় বিঘা জমি বন্ধক রাখিয়া দেড়শো টাকা দিতে চাহিয়াছে, আরও না হয় দুই বিঘা জমি বেশীই বন্ধক দিবে সে। ত্রিশটাকা তো দুর্গার কাছে মজুতই আছে, আজই ফেরত দিয়া আসিয়াছে, এখনই আবার চাহিলেই মিলিবে। অনিরুদ্ধ বলিল—তাই করব, মামলাই আমি করব। দেন আপনি পত্র লিখে, কংগেরেসের সেকেটারী বাবুকে।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনের বিদ্রোহের চারগাছটি আজ ওই আশ্চর্য্য কিশোরটিকে আশ্রয়দণ্ড স্বরূপে পাইয়া যেন উদ্ধত অনমনীয় বিক্রমে এক মুহূর্ত্তে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলিল—আমার একটুকুন কাজ আছে বাবু, আমি সেরে আসি। আপনি চিঠি লিখে রাখুন, ভুলবেন না। টাকার জন্য কাবুলী চৌধুরীর কাছে যাইবার কথাটা তাহার মনে পড়িয়াছে। টাকা চাই।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সে জামাটা টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া পদ্মের সন্ধানে চাহিয়া দেখিতেই দেখিল—একটা থামের আড়ালে জাগিয়া আছে কেবল পদ্মের মুখখানা। তাহার চোখে নিমেষহীন স্থির দৃষ্টি। সে চাহিয়া আছে ওই কিশোর ছেলেটির দিকে। অনিরুদ্ধ কাছে আসিয়া রূঢ় ভাষায় ডাকিল—শুনছিস?

সেই স্থির দৃষ্টি এবার অনিরুদ্ধের মুখের উপর তুলিয়া পদ্ম প্রশ্ন করিল—এ্যাঁ?

—কি—দেখছিস কি এমন ক'রে?

—ওই দুধের ছেলেকে ধ'রে নিয়ে এসেছে পুলিশে?

পদ্মর অসঙ্কোচ প্রশ্নে অনিরুদ্ধের মনের গ্লানি কাটিয়া গেল। সে অল্প একটু হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—গোখরোর বাচ্চা—এতটুকু আর এত বড় নাই। বোমা পিস্তল নিয়ে ওদের কারবার।

সবিস্ময়ে পদ্ম অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনিরুদ্ধ বলিল—ছেলে মানুষ—বেশী লজ্জাটজ্জা করিস না, দরকার-টরকার হ'লে একটু দেখিস। আমি কঙ্কনা চললাম। চৌধুরীর আজ টাকা দেবার কথা।

অনিরুদ্ধ চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ চলিয়া গেল। ভূপালচন্দ্র দুধ ও চিনি আনিতে গিয়াছে। কিশোর ছেলেটি একা দরজার দুটি বাজুতে হাত দিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে পল্লী-পথ, দুদিকে গৃহস্থের ঘর, ঘরগুলির মাথার উপর বাঁশবনের বাঁশগুলি মৃদু মৃদু দুলিতেছে! আম কাঁঠাল জাম তেঁতুলের উঁচু মাথাগুলি বাঁশবনের পিছনে জাগিয়া আছে আকাশের পটে আঁকা ছবির মত। বাঁশবনের দোল-খাওয়া বাঁশের ডগায় বসিয়া কাকের সারি কলরব করিতেছে। কোথায় কোন্ পুকুরধারে মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে একটা ডাহুক। একটা অতি উচ্চ তালগাছের মাথায় পাখা বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে একটা শকুন। পথের উপরেই একঝাঁক শালিক বসিয়া রীতিমত কলহ বাধাইয়া তুলিয়াছে। দরজার বাজুতে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে যতীন আপন মনেই আবৃত্তি করিল—

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই—"

—Good morning Sir! হরেন্দ্র ঘোষাল একমুখ হাসিয়া দুহাত তুলিয়া নমস্কার করিল। ডেটিনিউ আসিয়াছে শুনিয়া সে দেখা করিতে আসিয়াছে।

যতীন হাসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—নমস্কার, আসুন।

—কেমন লাগছে আমাদের গ্রাম?

—বেশ।

—অত্যন্ত অশিক্ষিতের জায়গা। অকাট মুখ্যুর দল। দুজন লোক ছাড়া nobody has passed the matri-

culation examination! একজন তো গ্রামই ছেড়ে দিয়েছে। আমি নিরুপায়ে পড়ে আছি। Worst place in the world!

যতীন হাসিতে লাগিল।

—আমার কাছে বইটই আছে। আমি দেব আপনাকে। Have you read উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা? a wonderful book!

—নমস্কার! আপনিই এলেন আজ?—এবার আসিল জগন ডাক্তার।

যতীন প্রতিনমস্কার করিয়া সম্ভাষণ করিল—নমস্কার! আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই এই ঘণ্টাখানেক হ'ল এসেছি মাত্র।

ডাক্তার বসিয়া বলিল—আপনার অবশ্য কষ্ট যথেষ্টই হবে। অতি উঁছু জায়গা। ইতরের সমাজ। পা-চাটার দল সব। টাকা থাকলেই হ'ল। যতবড় পাষণ্ডই হোক সে, লোকে তারই পা চাটবে।

যতীন মৃদু হাসিল।

ডাক্তার বলিল—হাজার উপকার আপনি করুন, কিন্তু আপনার টাকা না থাকলে কেউ আপনার কথা শুনবে না। ডাক্তারী ব্যবসা আমাদের তিন পুরুষের। বিনা ভিজিটে চিরকাল আমরা গ্রামে দেখি—কিন্তু অনিষ্ট করতে কোন শালা কসুর করে না।

যতীন একটু হাসিল। জগন কিন্তু চটিয়া গেল। বলিল—আপনি হাসছেন! দিনকতক থাকলেই বুঝতে পারবেন। এই আপনার অনিরুদ্ধ, যার বাড়ীতে আপনি রয়েছেন, তাকে নিয়ে কি ব্যাপার যে করছে—

হাসিয়া যতীন বলিল—হ্যাঁ শুনলাম কিছু-কিছু, চোখেও দেখলাম—

—চোখেও দেখলেন? ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

—হ্যাঁ। অনিরুদ্ধের একটা গাছ কাটা হচ্ছিল নদীর ধারে। আসবার সময় দেখে এলাম।

ডাক্তার সুদীর্ঘ বক্তৃতা জুড়িয়া দিল—ছিরুপালের টাকার কথা, তাহার জঘন্য চরিত্রের কথা, অনিরুদ্ধের ধান কাটিয়া লওয়ার কথা, পুলিশের পক্ষপাত-দুষ্ট তদন্তের কথা, অপদার্থ অর্থহীন জমিদারের টাকার জন্য ছিরুপালের কাছে আত্ম-সমর্পণের কথা—অনর্গল বলিয়া গেল। পরিশেষে বলিল—সেই পাষণ্ড আজ টাকার জোরে গমস্তাগিরি নিয়ে—গায়ের মাথা হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক হয়েছে। হাতে মাথা কাটছে লোকের! এর প্রতিকার করা দূরে থাক মশাই, লোকে ওই পাষণ্ডের পায়ের তলায় পড়ে লেজ নাড়ছে। কুত্তা, বুঝলেন—কুত্তার জাত। আর ওর সঙ্গে জুটেছে আর এক ধুরন্ধর—দেবু ঘোষ; পাঠশালার পণ্ডিত; কিন্তু নিজেকে ভাবে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ!

হরেন্দ্র বলিল—দেবু ঘোষ আসছে, দেবু ঘোষ আসছে! দেবু ঘোষ আসছে! ডাক্তার! সে ডাক্তারকে সাবধান করিয়া দিল।

তাহার দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জগন বলিল—আমি লুকিয়ে কোন কথা বলি না। ভয়ও আমি কোনও শালাকে করি না।

ভূপালের সঙ্গে আসিল দেবু ঘোষ। ভূপালের মাথায় একটা চ্যাঙারী, হাতে একটা মাছ। দেবু আসিয়া নমস্কার করিল—শ্রীহরি ঘোষ, এ গায়ের গমস্তা—সে-ই সিধেটা পাঠিয়ে দিলে। না নিলে সে ভারী দুঃখিত হবে। আপনি আজ আমাদের গ্রামে নতুন এসেছেন, অতিথি আমাদের!

যতীন দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—দুঃখিত হবেন?

—হ্যাঁ তা দুঃখিত হবেন বই-কি।

—তবে রাখুন।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বলিল—নমস্কার। তা হ'লে আমি চললাম।

—নমস্কার। আসবেন মাঝে মাঝে দয়া ক'রে!

ডাক্তার তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—গরীব দুঃখী মানুষ, খেটে-খুটে খাই। আপনাদের মত সরকারী তনখা তো নাই! আসবার সময় কোথা আমাদের। জগন ডাক্তার হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

দেবু হাসিয়া বলিল—অদ্ভুত মানুষ। এক নিজে ছাড়া জগতটাই মন্দ ওর কাছে।

ভূপাল সিধার চ্যাঙারীটা নামাইয়া আধুলিটি ফেরৎ দিয়া সবিনয়ে বলিল—দুধ, চিনি সবই আছে হুজুর সিধের মধ্যে।

যতীন চ্যাঙারীটার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। তাচ্ছিল্যের নয়, উপেক্ষার নয়—মুগ্ধ প্রশংসার হাসি।

দেবু সংক্ষেপেই বিদায় লইল! তাহার কাজ অনেক। শ্রীহরির সমস্ত কাজই তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।

যতীন স্টোভটা টানিয়া লইয়া বসিল—ভূপালকে বলিল—একটা ঘটি ক'রে খাবার জল আন দেখি—ভূপাল।

—আমি জল আনব ?

—দোষ কি ?

হরেন্দ্র হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—আমি আনছি, আমি আনছি! সে তড়াক করিয়া লাফ মারিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। যতীন স্পিরিটের বোতল খুঁজিতে খুঁজিতে গুন গুন করিয়া সেই কবিতাটাই আবৃত্তি করিল—

আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপন করিতে,
তারা নিশি দিশি জাগাইছে চিতে বিরহ-বেদনা সঘনে।'

কিন্তু স্পিরিটের বোতল না পাইয়া সে আবৃত্তি বন্ধ করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিল—একটুখানি আগুনের ব্যবস্থা করতে হবে ভূপালচন্দ্র। চা খেতে হবে, জল গরম করব।

ভূপাল কাঠ কুটার সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। যতীন আবার আরম্ভ করিল—

'পাশে আছে যারা তাদেরই হারায়ে ফিরে প্রাণ সারা গগনে।
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা' কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে-যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে."

তাহার আবৃত্তিতে বাধা পড়িল। পিছনের দিকে ঠক করিয়া একটা শব্দ হইতেই সে ফিরিয়া চাহিল। দীর্ঘাঙ্গী অবগুণ্ঠনবতী পদ্ম বড় একটা কাঁসার বাটি নামাইয়া দিল, বাটীটায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ জল, জল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে।

যতীন এবার কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—আপনি এত কষ্ট করলেন কেন মা ?

পদ্ম অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তাহার দিকে কেবল ফিরিয়া চাহিল। আয়ত দুটি ঝকমকে সাদা দীপ্তিময় চোখ, সে চোখে বিচিত্র অকুণ্ঠিত নিষ্পলক দৃষ্টি।

—জল এনেছি স্যার। হরেন্দ্র ফিরিল।

পদ্ম সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

—ওঃ, এ যে আপনার জল গরম পর্য্যন্ত হয়ে গেছে!

হাসিয়া যতীন বলিল—হ্যাঁ বসুন, চা খাবেন একটু!

—বাবু!

যতীন ফিরিয়া দেখিল—যৌবনশ্রীময়ী লাবণ্যবতী একটি মেয়ে, পরণে ছিমছাম পরিচ্ছন্ন কাপড়, গলায় বিছা হার, মণিবন্ধে কয় গাছি সৌখিন কাচের চুড়ি, হাতে একটি ঘটি। সে দুর্গা—দুর্গা নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিশোর ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হরেন্দ্র তাহাকে প্রশ্ন করিল—কি ? তোর আবার কি ?

সবিনয়ে হাসিয়া দুর্গা বলিল—দুধ এনেছি। কন্মকার যাবার সময় বলে গেল আমাকে, বাবুর দুধের রোজ লাগবে।

—আজ তো বাবুর দুধ এসেছে। কাল থেকে সে যা হয় হবে।

দুর্গা আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল। কিন্তু যতীনই তাহাকে ডাকিল—শোন।

দুর্গা ফিরিল।

—হ্যাঁ। দুধ আমার লাগবে। কত ক'রে লাগবে বলুন দেখি মিঃ ঘোষাল ?—এক সের ক'রে, কি বলেন ?

সবিনয়ে হাসিয়া দুর্গা বলিল—কাল থেকে দোব।

—আজ থেকেই দাও তুমি। লোকসান হবে কেন তোমার ? আর দুধ দু'বেলা লাগবে।

দুর্গা বাড়ী না ফিরিয়া অনিরুদ্ধের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল—কই হে, মিতেনী কই!

ক্রমশঃ



স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

শ্রাবণের অবিরল বর্ষণ আজ সকাল হইতেই শুরু হইয়াছে। কলিকাতার একটি মেসে এই নিরানন্দ বর্ষাপিচ্ছিল ম্লান সকালবেলায় কয়েকজন ছাত্র সেইদিনকার খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে চায়ের পেয়ালা হাতে তর্কাতর্কি করিতেছিল। সকলেই এক কলেজে পড়ে। পরস্পরের বিশেষ বন্ধু। কেহ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, কেহ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। সবাই ছাত্র। জীবনের ধূলিমলিন রথ-ঘর্ঘর চক্রমুখরিত বাস্তব পথের অভিজ্ঞতা এখনও কেহই সঞ্চয় করে নাই।

সৌরীন টেবিলে একটা চড় মারিয়া কহিল, শুধু টাকা দিয়েই যে মানুষের মনুষ্যত্ব মাপা যায় একথাটা যে কত বড় মিছে সেটা এবারে প্রমাণ হ'ল ত?

বিনয় সে ঠিক কি বলিতে চায় বুঝিতে না পারিয়া অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিল।

সৌরীন হাতের কাগজটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পাঁচশোর বেশি মাইনে কিছুতেই নেবেন না স্থির করেচেন; আর অন্য প্রদেশের কংগ্রেসের বাইরের মন্ত্রীমণ্ডল নিচ্চেন হয় ত তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মাইনে অনুসারে আর পদমর্য্যাদা মাপা যাচ্চে না। অন্য মাপকাঠি বেরিয়েচে। সে মাপকাঠি হ'ল মনুষ্যত্ব। লোকে এবারে সেটা স্বীকার করচে।

কেশব সায় দিয়া বলিল, নিশ্চয়! শুধু অর্থ দিয়েই যে একজন মানুষের সমস্তটা মাপা যায় এমনতরো বৈশ্যসুলভ মনোবৃত্তি আজকের দিনে যে টিকবে না, এ আমি নিশ্চয় ক'রে তোমাদের বলে দিলুম।

তাহাদের উচ্চধরণের তর্কালাপ চলিতে লাগিল। সে অবিমিশ্র উচ্ছ্বাসে বাধা কেহই দিল না। কারণ ছোটখাট দুই-একটা বিষয়ে সামান্য মতভেদ থাকিলেও সকলেরই মনের সুরটি প্রায় একই তারে বাঁধা। কারণ সকলেই ছাত্র, নানা আদর্শ এবং স্বপ্নের মোহে তাহাদের তরুণ মন সমাচ্ছন্ন। শুধু বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল, ষ্টোভে চায়ের জল ফুটিতে লাগিল এবং এত বৃষ্টিতে কলেজ যাওয়ার সমীচীনতা লইয়া অনেকেই মতামত প্রকাশ করিতে লাগিল।

বিনয় বিশেষ কোন কথায় যোগ না দিয়া একপাশে বসিয়া চুপ করিয়া কাগজ পড়িতেছিল। সে এবারে বি. এ. পরীক্ষা দিবে। চেহারাটি ভারি সৌম্য শান্ত এবং প্রিয়দর্শন। সে কাগজটা মুড়িয়া রাখিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, জীবনে আর যাই করি, আমার দেশকে কখনও ছোট করব না। আমার মধ্যে দিয়ে যেন আমার মাতৃভূমির দৈন্য প্রকাশ না পায়।

সেই সমবেত ছাত্রসভার উদার এবং গভীর মনোভাবের মাঝে এবং বাহিরের বর্ষার মায়ায় রূপান্তরিত প্রকৃতির মাঝে বিনয়ের মুখের উক্তি বেসুর শুনাইল না—কিন্তু বিধাতা আড়ালে বসিয়া পরাধীন জাতির এক ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর মানবের মুখে এহেন স্পর্দ্ধার বাণী শুনিয়া হয় ত স্মিত হাস্য করিয়াছিলেন।

২

পরের দিন বিনয় স্নান করিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছে। ঘড়িতে দশটা যদিও বাজিয়াছে, কলেজ যাইবার এখনই কোন তাড়া নাই। কারণ প্রথম ঘণ্টায় আজ ক্লাস নাই। তাহার রুমমেট্ শরদিন্দু একটা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া হাজির, ওহে রসিদটা সই ক'রে দাও। তোমার নামে একটা তার এসেচে। পিয়ন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্চে।

বাঙালী ঘরে হট্ করিতেই সহজে কেহ টেলিগ্রাম করে না, বিশেষ কোন দুঃসংবাদ দিবার না থাকিলে। বিনয় চিরুনি রাখিয়া কম্পিত হাতে রসিদটা স্বাক্ষর করিয়া দিয়া শরদিন্দুর হাত হইতে টেলিগ্রামটা লইল।

খুলিয়া দেখিল: "তোমার বাবা অত্যন্ত পীড়িত। যত শীঘ্র পার এস।"

তাহার বিবর্ণ মুখ লক্ষ্য করিয়া শরদিন্দু তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল, কোন খারাপ খবর নাকি? কই দেখি …

বিনয়ের হাত হইতে টেলিগ্রামখানা লইয়া সে পড়িল।

ক্রমে আরও সবাই আসিয়া জুটিল। তাহারা সকলে মিলিয়া বিনয়ের বিছানা বাঁধিয়া দিল, বাক্স গুছাইয়া দিল। একজন টাইম টেবিল খুলিয়া গাড়ীর সময় দেখিতে বসিল, বর্দ্ধমানের লোক্যাল্‌-খানা এগারোটা পঞ্চাশে ছাড়ে, তুমি কোথায় নামবে? ...

বিনয়ের বাড়ী পল্লীগ্রামে। সাঁইথিয়ায় নামিয়া পাঁচ-ছ মাইল গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইতে হয়। বর্ষাকাল না হইলে ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সিও মিলে। কিন্তু এখন এই ভরা বর্ষায় ওসকল দ্রুতগামী যান চলিবে না। রাস্তার কাদায় যাইতে পারিবে না।

ট্রেনের তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। একজন গাড়ী ডাকিতে গেল। শরদিন্দু টেলিগ্রামখানা প্রিন্সিপ্যালকে দেখাইয়া ছুটির অনুমতি সংগ্রহ করিল। সকলে মিলিয়া উপরোধ অনুরোধ করিয়া বিনয়কে কিছু খাওয়াইল। বন্ধুদের আন্তরিক সমবেদনায় আর্দ্র হইয়া বিনয় ভারাক্রান্ত চিত্তে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া হাওড়া স্টেশনের অভিমুখে যাত্রা করিল।

৩

বিনয় যখন স্টেশনে নামিল তখন ভোর পাঁচটা। স্টেশনে একখানা গরুর গাড়ী ছিল তাহার জন্য। একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া গরু দু'টা অবিশ্রান্ত ভিজিতেছে, গাড়োয়ান ছইয়ের ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার। আসন্ন প্রভাতের ঈষণ্মাত্র অরুণ রাগ কোথাও নাই। ডাকাডাকিতে গাড়োয়ানটা চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। বিনয় ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, বাবা এখন কেমন আছেন, তুই জানিস?

গাড়োয়ান শির সঞ্চালন করিল, আমি জানি না কর্ত্তা কেমন রইচেন। আমি ব্যাগারে গাড়ী, ভিন্‌গাঁয়ের দাদাবাবু। গাঁয়ের কেউ আসতে চাইলেক না, তাই আমাকে পাঠালেক।

তাহার পর শুরু হইল যাত্রা। পথ মোটে পাঁচ-ছ মাইল, কিন্তু বাঙলা দেশের পল্লীপথ বর্ষার বারিপাতে কর্দ্দমাক্ত হইয়া যে কেমন দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয় হইয়া ওঠে তাহা যাঁহার অভিজ্ঞতা নাই তাঁহার পক্ষে বোঝা শক্ত।

গরু দুইটা প্রাণপণ টানিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বন্ধুর পথ কখনও আলের উপর উঠিয়াছে, কোথাও রাস্তায় খালের মত হইয়া জল জমিয়াছে, কোথাও কাদায় চাকা বসিয়া যাইতেছে। বিস্তর ঠেলাঠেলি হাঙ্গাম হুজ্জুত করিতে মন্থর গতিতে গাড়ী কোনক্রমে অগ্রসর হইল।

বর্ষাকালে বিনয় প্রায় বাড়ী যায় না। মনের উদ্বেগ এবং রাস্তার এই প্রহসন সত্ত্বেও বর্ষার বাঙলার অপরূপ রূপ সে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া আর শেষ করিয়া উঠিতে পারিল না।

চারিদিক স্নিগ্ধ সবুজের ঘন আস্তরণে ভরিয়া গিয়াছে। চাষীরা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই টোকা মাথায় ঈষৎ সুপুষ্ট ধানের চারাগুলি তুলিয়া আবার রোপণ করিতেছে। সিক্ত সজল সবুজের এক অপূর্ব্ব মায়া জলেস্থলে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। একটা পুকুরের ধারে গাছের ছায়ায় গাড়ী বাঁধিয়া গাড়োয়ান জল খাইতে বসিল। চাদরের খুঁটে বাঁধা চিঁড়া মুড়ি বাতাসা। বিনয়কে প্রশ্ন করিল, দাদাবাবু, আপনি কিছু জল টল খাবে না? পৌঁছতে বেলা পহরেক হবে।

অসম্মতি জানাইয়া বিনয় ঈষৎ হাসিল। জল খাইবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি কোনটাই তাহার ছিল না কিন্তু এক-পেয়ালা চায়ের অভাবে সমস্ত সকালটা কেমন বিস্বাদ ঠেকিতেছিল। অথচ এই মাঠের মাঝখানে গরুর গাড়ীর ছইয়ের ভিতর সহসা চা পাইবার কোন উপায় নাই। বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল, আমাদের তুলনায় এই চাষী এই গাড়োয়ান তাহাদের প্রয়োজন কত সরল উপায়ে কত সহজেই না মিটাইতে পারে! চাদরের খুঁটে সামান্য জলপান বাঁধিয়া লইয়া তাহারা সমস্তদিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিবে। চায়ের জন্য জীবনটা বিস্বাদ হইয়া যাইবার কিংবা ক্লিষ্ট ঠেকিবার কোন কারণ নাই। একই কাজ প্রতিদিন একভাবে করিয়া যাইতে হয় বলিয়া কোন দার্শনিকতত্ত্বের জটিলতা নাই মনের মধ্যে বা মাথার মধ্যে।

বিনয় যখন কাদার রাস্তা ঠেলিয়া বাড়ী পৌঁছাইল তখন বেলা একটা-দেড়টা। কলিকাতা হইতে ট্রেনে আসিতে কিছুই হয় নাই, কিন্তু এই পথটা গরুর গাড়ীতে আসিতে তাহার প্রাণ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিবা-মাত্র ছোট বোন নীহারের সঙ্গে দেখা হইল। গরম জল

করিবার জন্য একটি কেট্‌লি হাতে কুয়াতলায় জল তুলিতে আসিয়াছিল, বিনয়কে দেখিয়া সাগ্রহে ছুটিয়া আসিল।

দাদা, তুমি ওখান থেকে কখন বেরিয়েছিলে? তার পেয়েছিলে? … উঃ তুমি আসতে বাঁচলাম! যা ভাবনা হয়েছিল!

বিনয় অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার তক্তপোষটার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, তার পেয়েচি কাল বেলা দশটা সাড়ে দশটা আন্দাজ। বেরিয়েচি বেলা আড়াইটের গাড়ীতে। বাবা এখন কেমন আছেন? কি হয়েচে? তোর হাতে কেট্‌লি দেখচি …

নীহার কুয়ায় জল তুলিতে তুলিতে বলিল, সেকের জল গরম করব। হয়েচে আজ দিন সাত-আট থেকে সর্দ্দি কাশি জ্বর। প্রথমটায় সবাই বলছিল, এদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, তাই হয়েচে নিশ্চয়। কিন্তু গোবর্দ্ধন ডাক্তার বলচে, পরশু থেকে নিউমোনিয়ার প্যাচ্‌ বসেচে। বাবা তবু বারণ করছিলেন তোমাকে খবর দিতে। বলছিলেন, ওর এবার পরীক্ষার বছর। এসেই কি সে আমাকে ভালো ক'রে দেবে? কিন্তু আমরা থাকতে পারলাম না, তাই তোমাকে আসতে তার ক'রে দিলাম। এইবার তুমি এসেচ, যা ভালো বোঝ কর।

৪

ঘরে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা বাতি জ্বলিতেছে। হলদে অস্পষ্ট আলো ঘরের অন্ধকার আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। বাইরে সেই যে সন্ধ্যার পর হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে থামিবার নাম নাই। রোগীর ঘরে একা বিনয় চুপ করিয়া একটি চেয়ারে জাগিয়া বসিয়া আছে। সে আসিয়া পড়ায় তাহার মা বোন সবাই আজ একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বিনয় একা বসিয়া ভাবিতেছিল। এখনও তাহার ভাবনার ধারাটা যে খুব বাস্তব পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে তাহা মনে হয়না। বাবার অসুখ হইয়াছে, সারিয়া যাইবে। আবার সে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া পড়াশোনা শুরু করিবে। বি. এ. দেওয়া হইয়া গেলে একসঙ্গে এম. এ. ও ল পড়িবে। বি. এ.-তে যদি ইংরেজী অনার্সে ফার্স্টক্লাস পায় তাহার পর ল ভালো করিয়া পাশ করিলে মুন্সেফিতে ঢোকা হয় ত শক্ত হইবে না। কল্পনার আকাশে আশার রঙীন্‌ চিত্র চোখের সুমুখে বড় সুন্দর বড় মোহন বলিয়া বোধ হয়। এ বয়সে কাহারই বা না মনে হয়!

বাঙলাদেশের শতকরা নব্বুই জন ছেলের যেমন আপন পরিবারের সত্য অবস্থা এবং সত্য পারিপার্শ্বিকের সহিত কোন যোগবন্ধন নাই, বিনয়েরও তেমনই ছিল না। সে ফোর্থক্লাস হইতে বিদেশে পড়িতেছে, কারণ তাহাদের গ্রামে মাইনর স্কুল ছাড়া আর কোন স্কুল নাই। এতটা বয়স অবধি বেশির ভাগ সময় পড়াশোনার খাতিরে বাহিরে বাহিরেই কাটিল। স্কুল কলেজের ছুটি-ছাটার সময় যা বাড়ী আসিয়াছে। বিদেশ হইতে ছেলে বহুদিন পর বাড়ী আসিলে প্রবাসী সন্তানের সুখ সুবিধার জন্য সবাই ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু বিশ্রাম এবং আদর যত্ন উপভোগ ছাড়া, কি তাহাদের বাড়ীর সত্যকার অবস্থা, তাহার যারা বড় আপনার জন, সুখে দুঃখে তাহাদের জীবন কেমন করিয়া কাটিতেছে—এসকল কথার সহিত তাহার বহুদিনের বিচ্ছেদ। এখন সে যে-জগতের বাসিন্দা সেখানে এসকল তুচ্ছ কথা ভাবিবার প্রবৃত্তি বা অবকাশ কোনটাই নাই।

সেখানে সোশালিজমের প্রয়োজনীয়তা, মঁসিয়ে ডোক্রের নূতন উপন্যাস, গান্ধীর অসহযোগ নীতি, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রভৃতি বড় বড় কথার চাষই অবিরত হইতেছে এবং ততোধিক বড় বড় আকাশ-কুসুম শূন্যমার্গে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কোন এক অখ্যাত গ্রামে যেখানে রাস্তা নাই, স্কুল নাই, পানীয় জল নাই এবং তাহার উপর অহরহ ম্যালেরিয়া ভীতি সকলকে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছে সেখানকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খবর সেই ভাবলোকে প্রবেশ-পথ পায় না। পৌঁছিবার রাস্তা খুঁজিয়া পায় না।

বিনয়ের জীবনে তাই এদিককার জ্ঞান কিছুই ছিল না। যেখানে সে জন্মিয়াছে যেখানে সে এত বড় হইয়াছে, যেখানে তার মা-বাপ ভাই-বোন সুখে দুঃখে দিন কাটাইতেছে সেখানকার সত্য সংবাদ সে এত কম জানিত যে তাহাকে কিছুই না জানা বলিলেও ক্ষতি নাই।

বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়িয়া উঠিল। হাওয়ার প্রচণ্ড গতি রুদ্ধ দরজা জানালায় প্রতিহত হইয়া শব্দ হইতে লাগিল। রোগী সেই সময় তন্দ্রার ঘোরেই পাশ ফিরিয়া অসংবদ্ধ কি



মা ও মেয়ে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

দুই-একটা কথা বলিতে লাগিল। বিনয় ঝুঁকিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, যেটুকু বুঝিল তাহাতে মনে হইল এ সমস্তই অসংবদ্ধ প্রলাপ। গাত্রের তাপ লইয়া দেখিল জ্বর ১০৫ ডিগ্রীর চেয়েও বেশি। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের আধখানা পাশ-করা গোবর্দ্ধন ডাক্তার এবং তাহার ডাক্তারখানা ছাড়া এ অঞ্চলে আর অন্য চিকিৎসার উপায় নাই। সবাই বলে, পাশ হোক বা না হোক গোবর্দ্ধনের হাতযশ আছে। কিন্তু শুধু সেই হাতযশের উপর বরাত দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে বিনয়ের মন সরিল না। সকালে উঠিয়া শহরে গিয়া নিশ্চয়ই বড় ডাক্তার লইয়া আসিবে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া সে একদাগ ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে খাওয়াইতে গেল। কিন্তু খাওয়ানো গেল না, কস্ বাহিয়া ঔষধ পড়িয়া গেল এবং দুই রক্তবর্ণ চক্ষু উন্মিলিত করিয়া রোগী আবার প্রলাপ বকিতে লাগিল। ছোট বোনকে উঠাইয়া দিয়া বাবার কাছে বসিতে বলিয়া সে টর্চ্চটা হাতে করিয়া গোবর্দ্ধন ডাক্তারের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিল। এতখানি রাত্রিতে পল্লী একেবারে গভীর সুষুপ্ত। চৌকিদার রোঁদ্ দিতে বাহির হইয়াছে। এক এক বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতেছে আর হাঁকিতেছে: বাবু মশায় ·· বাবু মশায়! ডাক্তারবাবুর বাড়ীতেও জনপ্রাণীর সাড়া নাই। বিস্তর কড়া নাড়ানাড়ি ও হাঁকাহাঁকির পর তিনি কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

বিনয় ব্যগ্র হইয়া কহিল, ডাক্তারবাবু একবার শীগ্‌গীর চলুন!

ডাক্তার কিন্তু লেশমাত্র অধীরতা না দেখাইয়া ধীরে সুস্থে কহিলেন—কেন, ব্যাপার কি? আসুন, ভিতরে বসুন। তারপর সব শুনে ব্যবস্থা করা যাবে।

বিনয়ের মুখে সব শুনিয়া কিঞ্চিৎ মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, আমি বলি কি বিনয়বাবু, তার চেয়ে শহর থেকে একবার বড় ডাক্তার এনে দেখান। কেস্‌টা সুবিধার বলে ঠেক্‌চে না। আমি? ··· আমি এত রাত্রিতে আর গিয়ে কি করব ··· আমার আবার বাতের ব্যথাটা আজ একটু বেড়েচে ··· ঠাণ্ডা লাগলেই ··· তার চেয়ে আপনি এক কাজ করুন, এই একটা মিক্‌স্‌চার লিখে দিচ্ছি। গিয়েই একদাগ দেবেন, তারপর তিন ঘণ্টা অন্তর চলবে।

ডাক্তারবাবু আর গেলেন না অত রাত্রিতে বিনয়ের অনেক মিনতি সত্ত্বেও। সেইখানেই বসিয়া একটা প্রেসক্রিপসন লিখিয়া হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় বলিলেন, ঐ: যা:, ওষুধই বা এই রাত্তিরে কেমন ক'রে পাবেন শুনি? কম্পাউণ্ডার ব্যাটা ডিস্পেন্‌সারিতে চাবি দিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেছে চাবি নিয়ে। সকাল হ'লেই তা হ'লে ওষুধটা তৈরী করিয়ে নিয়ে যাবেন। আর কাল একবার শহরে গিয়ে শরৎ ডাক্তারকে একটা কল্ দিয়ে আসবেন। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু তাও বলি মশায়, অবশ্য আপনারা একালের ছেলে ওসব মানবেন কি-না জানিনে, আসলে সবই অদৃষ্ট! ·· এই অবধি বলিয়া তামাক খাইবার জন্য টিকে ধরাইতে ধরাইতে পুনশ্চ কহিলেন, হাজার ছটফট ক'রে মরুন আর দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ান—কপাল ছাড়া আর কিছুই গতি নেই বিনয়বাবু!

তামাক খাইতে খাইতে আধ্যাত্মিক উপদেশছলেই বোধ করি-বা পুনরায় বলিলেন, আমরা যথাসাধ্য অবশ্য করি—কিন্তু অদৃষ্ট ত রদ্ করতে পারিনে, আপনি কি বলেন?

বিনয় কিছুই বলিল না। তাঁহার উপদেশবাণী নিঃশব্দে বহন করিয়া শুধু ওষুধ-লেখা কাগজখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

৫

বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব পল্লী-পথের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে কখনও মাঠের আলের উপর উঠিয়া কখনও গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া গিয়া এবং সর্ব্বদাই কাদার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বিনয় যখন বাইকে করিয়া শহরে পৌছাইল তখন বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। শহরের কোন ডাক্তারই ঐ দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করিয়া এই সন্ধ্যার মুখে সহসা যাইতে রাজী হইলেন না।

শরৎবাবু বলিলেন, মশায়, ঐ রাস্তায় কি মোটর যাবে মনে করেন? মোটরের বাবার ক্ষমতা নেই এই শ্রাবণ মাসের কাদা পার হয়ে আপনাদের ঐ দেশে পাড়ি দেয়! আর বাইকে চড়া আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌বে না, মোটামানুষ, তেমন অভ্যেসও নেই। যেখানে যাই মোটরে যাই। গরুর গাড়ীতে যাওয়া মানে, আজকাল দু'টো দিন নষ্ট। ···

তাই ত ভাবিয়ে তুললেন! কি করা যায় ···

বিনয় উত্তেজিত হইয়া কহিল, যেখানে মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি সেখানেও কি আপনারা পথের কষ্ট আর যানবাহনের কথা ভাববেন! এইটুকু কেবল বলচি, অর্থের দিক থেকে দু'দিন কামাই হ'লে আপনার যা ক্ষতি হবে তা যথাসম্ভব পুষিয়ে দেব।

অগত্যা শরৎবাবু স্বীকৃত হইলেন। টাকা পাইলে পথের কষ্টকে না হয় অগ্রাহ্য করা যায়। টাকার জন্য না করা যায় কি।

গরুর গাড়ীতে ডাক্তার যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন রোগীর শেষ অবস্থা। বড় শহর হইলে সে অবস্থায় অক্সিজেনের ব্যবস্থা হইত। কিন্তু এখানে তাহার পরিবর্ত্তে অনুসন্ধিৎসু এবং কৌতূহলী পাড়া-প্রতিবেশী ছেলেবুড়োয় রোগীর কক্ষ ভরিয়া গেছে। বায়ুচলাচলের পথটুকু অবধি হয় ত বন্ধ হইয়া গেছে। শশীবাবুর বৃদ্ধা পিসীমা মুখে গঙ্গাজল দিতেছেন। বিনয়ের ছোট বোন নীহার ও ছোট ভাই অতুল কাঁদিয়া চোখ লাল করিয়াছে। অনেকে অনেক রকম উপদেশ দিতেছেন; সহানুভূতি ও হা-হুতাশও কেহ কেহ করিতেছেন।

বিনয়ের মা ধৈর্য্যময়ীরূপে শেষ কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বিনয়কে দেখিয়া কহিলেন, কেন আর মিথ্যে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চিস বাবা? আয়, কাছে এসে বোস্।

শরৎবাবু একটুখানি দাঁড়াইয়া দেখিয়া কহিলেন, দেখবার আর কি রয়েচে বিনয়বাবু? চামড়ার নীচে একটা স্যালাইন্ দিয়ে একবার দেখা যাক্। লাস্ট স্টেজ! অক্সিজেন দিলে হয় ত আরও কিছুক্ষণ লাস্ট করতে পারত ···

বিনয়ের মা মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, বিনয়, ডাক্তারবাবুকে বারণ ক'রে দে, অনর্থক ফোঁড়াফুঁড়ি করবার আর দরকার নাই।

৬

পিতার মৃত্যুর পর বিনয়ের আর কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া চলিল না। ক্রমশ এমন সব বস্তু আবিষ্কার হইতে লাগিল যে সে বিস্ময়ে বিতৃষ্ণায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যতদিন বাবা বাঁচিয়া ছিলেন কলিকাতায় বিনয়ের নামে মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাঠাইয়াছেন। নিজের লেখাপড়া ফুটবল ম্যাচ্ বন্ধুদের সহিত তর্কবিতর্ক—এছাড়া আর অন্য কিছুই তাহাকে ভাবিতে হয় নাই। কলেজের হোস্টেলে বসিয়া চা খাইতে খাইতে সবচেয়ে গুরুতর ভাবনা ছিল আর্ট ফর আর্টস সেক্, ইহাই একমাত্র সত্য—না আর্ট ফর সাম্‌থিং এলসে'স সেক—ইহার মধ্যেও কিছু সত্যাভাস আছে। কিন্তু উপস্থিত বর্ত্তমান জগতে দেখা যাইতেছে, শেষের দিকে তাহার কলিকাতার পড়ার খরচ চালাইতে বাবা কিছু দেনা করিয়াছেন, বোনের বয়স চৌদ্দ ছাড়ায় কিন্তু বিবাহের কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। ছোট ভাইটি গ্রামের স্কুলে পড়িতেছে, স্কুলটি সম্প্রতি হাইস্কুল হইয়াছে। এই বছর গেলেই তাহার এখানকার পড়া সাঙ্গ হইবে। তারপর যদি তাহাকে আরও লেখাপড়া শিখাইতে হয় কোনই সংস্থান নাই। গ্রামে কিছু জমিজমা আছে, কিন্তু দেখাশোনার ব্যবস্থা না হইলে তাহার অর্দ্ধেক আয়ও পাওয়া যাইবে না। অথচ ভবিষ্যত জীবনের সমস্তটাই এই পাড়াগাঁয়ে বসিয়া জমিজমার তদ্বির করিয়া কাটানো, এ মনে হইলেও সমস্ত অন্তরাত্মা তাহার বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

এতদিন মেসে কেবল রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক লম্বা লম্বা কথা আলোচনা করিত, এখন একটা জগত হইতে সম্পূর্ণ আর একটা জগতে আসিয়া পড়িয়াছে যেন। কোনখানে জানাশোনা তটভূমির একটুখানিও চোখে পড়িতেছে না। আজ সকাল হইতে একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া সেই কথাই আকুলচিত্তে ভাবিতেছিল, কি করা যায়? ··· ভারাক্রান্ত হৃদয় মন সমস্ত অবলম্বন হারাইয়াছে, একটা কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার মত নাই।

এমন সময় প্রতিবেশী বাঁড়ুয্যে মশাই হুঁকা হাতে ঢুকিলেন, কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ এবং স্নেহ ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, এমন একাটি চুপচাপ ব'সে কেন বাবা? কি করবে ব'ল, সংসারের রীতিই যে এই। আজ যে আছে কাল সে নেই। তবুও উঠে ব'সতে হয়, তবুও আবার সেই সংসারের নিত্যকর্ম্ম সবই করতে হয়। তুমি জ্ঞানবান—তোমাকে আর কি বোঝাব। পিতামাতা কার আর চিরদিন থাকে? ··· তা শ্রাদ্ধটা কেমন ধারা করবে ঠিক করলে? ষোড়শ না বৃষোৎসর্গ? আমি বলি কি—

কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে রায়মশায় ও কুণ্ডুমশায় আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একাধারে আশ্বাস, ভরসা, উপদেশ, পরামর্শ—যাহা কিছু দিবার সমস্তই দিলেন। কুণ্ডু মহাশয় এমতও কহিলেন যে, বিনয় ভায়ার অর্থাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভাবনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি দরকার মত ধার দিতে সানন্দে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু এত দেনার উপর বিনয় সানন্দে ধার করিবে কেমন করিয়া সেই কথাই ভাবিয়া বোধ করি একটু বিমনা হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া কুণ্ডুমশায় বলিলেন—ভায়া, এত ভাবচ কেন, শশীদা ছিলেন আমার নিজেরই দাদার মত। তোমরা ঘরের ছেলে, যখন খুশী শোধ দেবে। রায় মহাশয়ও সায় দিয়া বলিলেন, আজ না হয় কাল ধার শোধ হইয়া যাইবে, কিন্তু পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া—সে ত আর শাস্ত্রমত সম্পন্ন না করিয়া ফেলিয়া রাখিবার যো নাই! যেমন করিয়া হোক, করাই চাই।

বিনয় তাঁহাদের সমবেত আক্রমণে দিশাহারা হইয়া বলিল, এখন বাবার কাজের দেরী আছে। মা একটু সুস্থির হোন্, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আপনারা যা বলবেন সেই অনুসারেই সব ঠিক করব। কিন্তু তার আগে মাকে একটু সামলাতে দেন। ক্রমশঃ

জঙ্গম

বনফুল

২৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নিজের শূন্য ঘরে বেলা মল্লিক একা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ঘরের বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না। সকাল হইতে একটা বদখত চেহারার লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। এখনও লোকটা গলির মোড়ে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই বসিয়া আছে। বিগত কয়েকদিনে জানালার ভিতর দিয়া আরও অশ্লীল চিঠি ও চিত্র আসিয়াছে। জনার্দ্দন সিং চলিয়া যাইবার পর অন্য কোন চাকরও জোগাড় করা সম্ভবপর হয় নাই। কয়েকদিন হইতে অবিরত চেষ্টা করিয়াও একটা চাকর জোটে নাই, মনে হইতেছে ষড়যন্ত্র করিয়াই সকলে যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। শূন্য ঘরে একা বসিয়া বেলার নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে হইতেছিল। দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

বেলা দেবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কে!"

মিহি গলায় উত্তর আসিল, "আমি অপূর্ব্ব—"

"ও অপূর্ব্ববাবু, আসুন, আসুন—"

অপূর্ব্ববাবুর মতো লোক আসাতেও বেলা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বার খুলিয়া দিতেই এসেন্সের গন্ধ ছড়াইয়া, পাউডার-মণ্ডিত-মুখে মৃদুহাস্য বিকীর্ণ করিতে করিতে সঙ্কুচিত বিনীত অপূর্ব্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা, পরণে মিহি কোঁচানো ধুতি। চক্ষু দুইটি কিন্তু গর্ত্তস্থ। মুখের মধ্যে কেবল গালের হাড় দুইটি এবং দাঁতগুলি প্রবলভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করিতেছে।

স্মিতহাস্যে নমস্কার করিয়া বেলা বলিলেন, "আসুন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে যে, অসুখ বিসুখ হয়েছিল না কি?"

"হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে ডিস্‌পেপসিয়ায় ভুগছি।"

অপূর্ব্ববাবুর মুখভাব করুণ হইয়া উঠিল।

"আসুন, এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল যে!"

"আমি কতবার এসে ফিরে গেছি, আপনার দেখাই পাই না!"

"তাই না কি?"

"যখনই এসেছি আপনার ওই গোঁফ-ওলা দারোয়ান এক কথায় আমাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছে। আজ তো তাকে দেখতে পেলুম না, মানে লোকটা একটু যেন—"

অপূর্ব্ববাবু থামিয়া গেলেন। পকেট হইতে ফিনফিনে পাতলা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে গোঁফ-ওয়ালা দারোয়ানটির সম্বন্ধে সত্য অথচ অরূঢ় কি বলিবেন নির্ণয় করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বেলা দেবীই প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন।

"হ্যাঁ লোকটা একটু রাফ্‌-গোছের ছিল, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি। ছাড়িয়ে দিয়েও কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি, একটা দারোয়ান না হলে চলছে না। একটা ভাল লোক পেলে এখুনি বাহাল করি।"

আকস্মিক পুলকোচ্ছ্বাসে অপূর্ব্ববাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলা দেবীর এমন একটা উপকারে লাগিতে পারিবেন ইহা যে অভাবনীয় ব্যাপার!

আজই তাঁহার আপিসের নেপালী দারোয়ানটা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিল, দেশ হইতে তাহার ভাই আসিয়াছে, অপূর্ব্ববাবু যদি তাহাকে কোথাও লাগাইয়া দিতে পারেন বড় উপকৃত হয় সে।

"আছে আপনার সন্ধানে কোন লোক?"

আর একবার রুমালে মুখ মুছিয়া অপূর্ব্ববাবু বলিলেন—"নেপালী রাখবেন?"

"কেন রাখব না যদি বিশ্বাসী হয়—"

"আমার জানাশোনা একটি নেপালী আছে। ঠিক জানাশোনা নয়, মানে, আমাদের আপিসের যে নেপালী দারোয়ানটা আছে তারই ভাই—তাকে আমি পারসোনালি অবশ্য—তবে যতদূর মনে হয়—মানে, যদি বলেন আমি নিজে গিয়ে অর্থাৎ—"

নিজের অসংলগ্ন বাক্যজালে বিজড়িত হইয়া অপূর্ব্ববাবু থামিয়া গেলেন।

বেলা প্রশ্ন করিলেন, "কোথা থাকে সে?"

"বড়বাজারে।"

"তার বাসাটা চেনেন আপনি?"

"চিনি।"

"তা হ'লে চলুন এখনি গিয়ে ডেকে আনা যাক তাকে।"

"এখনি?"

"হ্যাঁ, এখনি। আজই বাহাল করব। একা এমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে ভয় করে।"

"এখান থেকে এখন বড়বাজার যাওয়া মানে—"

নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া অপূর্ব্ববাবু পুনরায় বলিলেন, "মানে ন'টা বেজে গেছে কি না, যেতে আসতে প্রায়—"

"চলুন না, ট্যাক্সি ক'রে যাই—"

বেলার সহিত ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসিয়া যাওয়াটা যদিও লোভনীয় ব্যাপার কিন্তু ভাড়াও তো কম লাগিবে না। বেলা যদি নিজে হইতে ভাড়াটা না দেন, তাঁহার কাছে ভাড়াটা দাবী করাও তো শোভন হইবে না। তুচ্ছ এই দুর্ব্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া অকারণে চার-পাচটা টাকা ব্যয় করা—অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত একটু ফাঁপরে পড়িয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

"কি, ভাবছেন কি?"

"ভাবছি এখন কেন ট্যাক্সি করে হাঙ্গামা করতে যাবেন, মানে, টুমরো আমি পজিটিভলি—কথা দিচ্ছি আপনাকে—"

সহসা বেলার নজরে পড়িল ওদিকের জানালাটা হইতে একটা ছায়ামূর্ত্তি যেন সরিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। গলির মোড়ের সেই লোকটার কথাও বেলার মনে হইল।

বেলা বলিলেন, "না, আজ রাত্রেই আমার একজন লোক চাই। ডাকুন একটা ট্যাক্সিই—"

"ট্যাক্সি, মানে—"

অপূর্ব্ববাবু পুনরায় ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

বেলা বলিলেন, "আশ্চর্য্য লোক তো আপনি, আমি ভাড়া দেব, আপনি ইতস্তত করছেন কেন—"

"না না, ভাড়ার কথা নয়, মানে, দেখি ক'টা টাকা আছে আমার কাছে—"

অপূর্ব্ববাবু পকেটে হাত দিয়া মনিব্যাগ হাতড়াইতে লাগিলেন।

"আপনি ভাড়া দিতে যাবেন কেন, কি মুস্কিল, যান একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসুন—"

"বেশ, তাই যাই—"

বাধ্য বালকের মতো অপূর্ব্বকৃষ্ণ যাইতে উদ্যত হইলেন। বেলার হঠাৎ লোকটার প্রতি অনুকম্পা হইল। ভদ্রলোক আসিতে না আসিতে তাহাকে এমন করিয়া ফরমাস করাটা অনুচিত হইতেছে।

"একটু চা খাবেন? চা খেয়ে বরং যান। আসুন, একটু চা-ই করা যাক আগে, আমারও আজ বিকেলে চা খাওয়া হয় নি, চা-টা খেয়ে তারপর বেরোনো যাবে—"

চা পানান্তে কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর ট্যাক্সি খুঁজিতে বাহির হইয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিতকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। বেলা দেবী যদি চায়ের হাঙ্গামাটা না তুলিতেন তাহা হইলে হয়তো অচিন-বাবু-নিয়োজিত চরটি অচিনবাবু-নিয়োজিত ট্যাক্সিখানি ঠিক গলির মোড়টিতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার সুযোগ পাইত না।

অপূর্ব্ববাবু বাহির হইয়া দেখিলেন গলির ঠিক মোড়েই একটি ভাল সিডান-বডি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ডাকিবামাত্রই হর্ন দিতে দিতে সেটি অবিলম্বে আগাইয়া আসিল। বিগত কয়েক দিবস হইতে বেলা দেবীকে কোন উপায়ে আরোহীরূপে পাইবার জন্য ট্যাক্সিখানি অচিনবাবু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আশে-পাশে অপেক্ষা করিতেছিল।

বেলা দেবীর গতি-বিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, তাহার ঘরে অশ্লীল চিঠি ছবি ফেলিয়া উত্যক্ত করিবার জন্য এবং তাহার ঘরের আনাচে-কানাচে আড়ি পাতিবার জন্য একটি চরও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ট্যাক্সির প্রয়োজন হইতে পারে শুনিবামাত্র চরটি গিয়া ট্যাক্সিখানাকে ডাকিয়া আনিয়া মোড়ে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল।

বেলা দেবী এবং অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া বলিলেন, "চল, বড়বাজার—।"

অপূর্ব্ববাবু বেলার সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, "পিয়ানোর সেতারের এস্রাজের অনেক ভাল গৎ জোগাড় করেছি, অনেকদিন থেকে দেব ভাবছি

কিন্তু কিছুতেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে উঠছে না—মানে—”

“আজ আনলেই পারতেন।”

“আজও যে আপনার দেখা পাব তা আশা করিনি; তাছাড়া—”

মোটর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

অপূর্ব্ববাবু এবং বেলা দেবী কেহই লক্ষ্য করিলেন না যে গাড়ি বড়বাজার অভিমুখে যাইতেছে না। সিডান বডি গাড়ির অভ্যন্তরে তাঁহারা কথোপকথনে অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ দ্রুত গতিতে চলিবার পর গাড়িখানা সহসা থামিয়া গেল।

ড্রাইভার বলিল, “আপনারা নামুন, গাড়ির তেল কমে গেছে। আমি আর একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি আপনাদের মোড় থেকে—”

অপূর্ব্ববাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, “সে কি, তেল ফুরিয়ে গেছে, মানে আগেই তোমার—”

এরূপ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছেন বলিয়া অপূর্ব্ববাবু নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হইয়া পড়িলেন এবং মুখভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন।

বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন, “এক পয়সা ভাড়া দেব না তোমাকে—”

এ সংবাদে ড্রাইভার বিচলিত হইল না—অ্যালবার্ট টেড়িতে একবার হাত বুলাইল, বুক খোলা জামার পকেট হইতে সুদৃশ্য একটি সিগারেট কেস বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল এবং একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিল, “বেশ, তাই যদি আপনার ধম্মো হয়, দেবেন না। এখন আমার গাড়িটা ছেড়ে দিন দয়া করে—”

নামিতেই হইল।

ড্রাইভার ভাড়ার জন্য অধিক জেদ না করিয়া গম্ভীর মুখে গাড়ি হাঁকাইয়া গলিটা হইতে বাহির হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর অন্ধকার গলি। কলিকাতা শহরেও যে এমন একটা অন্ধকার গলি থাকিতে পারে তাহা ধারণা করা শক্ত।

বেলা বলিলেন, “চলুন হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যাক, তারপর সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিলেই হবে—”

“বেশ তাই চলুন—উঃ কি ভীষণ অন্ধকার—”

অন্ধকার গলিটার দুই পাশের বাড়িগুলা বিরাটকায় জন্তুর মতো মনে হইতেছে। কোন বাড়িতে যে কোন লোক আছে মনে হয় না, চারিদিক নিস্তব্ধ।

অন্ধকারে দুইজনে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, গলিটা আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদূরে গিয়া বড় রাস্তায় পড়িয়াছে কে জানে। খানিকদূর গিয়া একটা বাঁক ফিরিতেই দেখা গেল হেলিয়া-পড়া একটা থামের উপর একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে।

অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, “যাক বাঁচা গেল, তবু একটা আলো পাওয়া গেল, মানে অন্ধকারে কেমন যেন ক্রমশ ঠিক ভয় নয় একটু যেন গা-ছমছমের মতো—”

অপূর্ব্ব কথা শেষ করিতে পারিলেন না। আচম্বিতে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। “চোর” “চোর” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পাশের আর একটা ক্ষুদ্রতর গলি হইতে বলিষ্ঠ একটা লোক ছুটিয়া আসিল এবং অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিতকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভূশায়ী করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের কয়েকটা বাড়ির কপাট খুলিয়া গেল, দু-একটা ঘরে আলোও জ্বলিয়া উঠিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ভূপতিত অপূর্ব্বকৃষ্ণকে ঘিরিয়া একটা ছোটলোকের জনতা কলরব শুরু করিয়া দিল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় বেলা দেবী ক্ষণিকের জন্য দিশাহারা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ক্ষণপরেই আত্মস্থ হইয়া আগাইয়া গেলেন এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে আদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন, “এই, ছেড়ে দাও ওঁকে, উনি চোর নন—”

জনতা হইতে কে একজন বলিল, “ইস ভারি দরদ যে দেখছি—”

আর একজন ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে সায় দিল, “হ্যাঁ, পীরিত একেবারে উথলে পড়ছে—”

বেলার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, তিনি ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গেলেন এবং ভিড়ের মধ্যস্থলে গিয়া দেখিলেন—বলিষ্ঠ গুণ্ডাটা অপূর্ব্ববাবুর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

“এই কি করছ! ওঠ, ওঠ বলছি, ছেড়ে দাও ওঁকে—”

গুণ্ডাটা ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, “ছেড়ে দেব কি ঠাকরুণ, আমার ঘড়ি চুরি করে ভাগছিল শালা, ওকে আমি ছেড়ে দেব!”

“কই তোমার ঘড়ি?”

"এই যে ছাখেন না—শালার পকেট থেকে টান মেরে বার করলাম—"

রূপার চেনসুদ্ধ একটা নিকেলের ঘড়ি সে তুলিয়া দেখাইল।

"ও ঘড়ি ওঁর কাছে ছিল না, শিগগির ওঠ বলছি তুমি—"

মজা ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া জনতার ভিতর হইতে রোগা গোছের এক ছোকরা আনন্দাতিশয্যে মুখের ভিতর আঙুল পুরিয়া 'সিটি' দিল।

আর একজন বলিল, "নাঃ এমন পীরিত মাইরি নাটক-নবেলেও দেখা যায় না—"

ফতুয়া পরা প্রৌঢ় গোছের একজন ভদ্রলোক বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি, এই মাগীকে সুদ্ধ নিয়ে ওই ব্যাটাকে টানতে টানতে থানায় যাও। ছিছিছিছি ভদ্দরলোকের পোষাক পরে যত ব্যাটা ছিঁচকে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরছে আজকাল। কালে কালে কতই যে দেখব বাবা—"

একটি দ্বিতল বাড়ির জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি যুবকও সবিস্ময়ে সব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। বেলা দৃপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ওকে ছাড়বে কি না?"

জনতার ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "মাইরি আর কি—"

এমন সময় একটা মোটরের হেড্ লাইট্ পড়িয়া সমস্ত স্থানটা আলোকিত হইয়া উঠিল। মোটরখানি নিঃশব্দ-গতিতে আসিয়া হর্ন দিয়া জনতার সম্মুখে থামিয়া গেল, অচিনবাবু স্টিয়ারিং ছাড়িয়া মোটর হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব্ব আয়োজন অনুযায়ী পটভূমিকা ঠিক প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল—এইবার স্বকীয় ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইলেন।

অতীব বিস্মিতকণ্ঠে ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, "এ কি, মিস্ মল্লিক না কি, আপনি হঠাৎ এখানে! বাই জোভ্—"

বেলা মল্লিক যেন অকুলে কূল দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আপনি অপূর্ব্ববাবুকে উদ্ধার করুন আগে—"

"নিশ্চয়—"

অচিনবাবু রুষ্ট ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়া গুণ্ডাটাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন এবং তাহাতে ঠিক যেন যাদু-মন্ত্রের মতো কাজ হইল। গুণ্ডাটা হঠাৎ অপূর্ব্ববাবুকে ছাড়িয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গলিটার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। লোকটার অভিনয়-দক্ষতায় অচিনবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। বেলা দেবী লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতেন অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হইতে একটা চাপা কৌতুকের হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। গুণ্ডাটা পলায়ন করিতেই বেলা পুনরায় অপূর্ব্ববাবুর কাছে গেলেন, দেখিলেন মূর্চ্ছিত অপূর্ব্ববাবুর নিস্পন্দ দেহটা ধূলায় লুটাইতেছে, আদ্দির পাঞ্জাবি ছিন্ন, নাগরা পদচ্যুত হইয়াছে। অপূর্ব্ববাবুর সংজ্ঞাহীন দেহটার উপর ঝুঁকিয়া বেলা ডাকিতে লাগিলেন, "অপূর্ব্ববাবু, অপূর্ব্ব-বাবু, ও অপূর্ব্ববাবু—"

অপূর্ব্ববাবুর তবু জ্ঞান হয় না। অচিনবাবু তখন অপূর্ব্ববাবুর দুই কাঁধ ধরিয়া স-জোরে ঝাঁকানি দিলেন, ঝাঁকানি খাইয়া তাঁহার জ্ঞান হইল এবং জ্ঞান হইতেই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"মিস মল্লিক—অ্যাঁ—আমি কোথায়—মিস মল্লিক—আমি—আপনি—"

প্রিয়নাথ মল্লিক মোটরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া ভগ্নীর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করিতেছিলেন। অচিনবাবু তো তাহা হইলে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। অচিনবাবু আজ-কাল প্রায় প্রতিদিনই বলিতেছেন যে শুধু শঙ্কর নয়, বেলার আজকাল নিত্য নূতন বন্ধু জুটিতেছে। আজ একটু আগেই অচিনবাবু প্রিয়নাথবাবুকে বলিয়াছিলেন, "মিস মল্লিকের পুরাণো গানের মাস্টারের সঙ্গে আজকাল খুব মাখামাখি। আমার এক চর এসে খবর দিলে এখনি ওরা ট্যাক্সি ক'রে বেলগাছিয়া অঞ্চলের এক এঁদো আড্ডায় যাবেন ঠিক করেছেন। শুনে আমার রাগ হয়ে গেল মশাই; আমি একটা গুণ্ডা ঠিক করেছি অপূর্ব্ববাবুকে ধরে বেশ করে উত্তম মধ্যম দিয়ে দেয় যেন। এই সময় আমরাও চলুন যাই, মিস মল্লিককে পাকড়াও করে আনা যাক যদি পারা যায়। বুঝলেন না, এ একটা মস্ত সুযোগ—"

সত্যই তো, অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে বেলা বেলগাছিয়ার এই অন্ধকার গলিটায় আসিয়াছে! এখানে আসিবার তাহার

কি কারণ থাকিতে পারে ! ক্রুদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রিয়নাথ বেলার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বেলা অপূর্ব্ব-বাবুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতেছিলেন।

"না, ন', ভয় কি আপনার, চলুন, উঠুন, এই যে নিন জুতো পায়ে দিন—"

প্রিয়নাথের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল !

গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া তিনি বলিয়া বসিলেন, "ঢের হয়েছে আর সোহাগ জানাতে হবে না, বদমায়েস পাজি কোথাকার "

অগ্রজের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বেলা বিস্মিত হইলেন কিন্তু বিচলিত হইলেন না। অন্তত বাহিরে তাহার কোন অভিব্যক্তি দেখা গেল না। তিনি প্রিয়নাথের দিকে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার পর তাঁহার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অপূর্ব্ববাবুকে বলিলেন, "উঠুন, এই নিন আমার কাঁধে হাত দিন—"

প্রিয়নাথের চক্ষু দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল। স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া শ্বাপদের মতো দন্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বিচ্ বিচ্—এ কমান বিচ্! কুকুরেরও অধম—"

বেলা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

অচিনবাবু কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। এই লোকটা সব মাটি করিল! এত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া আনিলেন যে বেলা মোটরে ওঠার আগে কিছুতেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ না করেন। আত্মপ্রকাশ করিলে বেলা হয়তো মোটরে উঠিতেই চাহিবে না। বেলাকে মোটরে উঠাইয়া স্টার্ট দিয়া তবে আত্মপ্রকাশ করিলেই চলিত। সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল। অচিনবাবুর প্ল্যান ছিল অপূর্ব্ববাবুকে পৌঁছাইয়া দিয়া বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া তিনি সোজা বাহির হইয়া যাইবেন। বেলার দাদাকে বলিবেন যে, তাঁহার একটু কাজ আছে, কাজটুকু সারিয়া তিনি তাঁহাকে এবং বেলাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। কলিকাতার বাহিরে কয়েকজন গুণ্ডা এবং একটা ট্যাক্সি তিনি ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল যে বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া একটি জনবিরল মাঠের কাছাকাছি তিনি মোটর থামাইবেন এবং কাজের ছুতায় নামিয়া গিয়া গুণ্ডাগুলিকে খবর দিবেন। তাহারা অচিনবাবুর অনুপস্থিতিতে আসিয়া বেলাকে হরণ করিবে এবং বেলার দাদাকে অচিনবাবুর মোটরে হাত পা মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যাইবে। প্রিয়নাথের চোখের সম্মুখে গুণ্ডা কর্ত্তৃক বেলা অপহৃত হইলে এবং পরে অচিনবাবু আসিয়া প্রিয়নাথকে উদ্ধার করিলে অচিনবাবুর সহিত বেলা-অপহরণের যে কোন সংস্রব আছে তাহা সহসা আবিষ্কার করা শক্ত হইবে। কিন্তু প্রিয়নাথ সহসা আত্মপ্রকাশ করাতে সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল।

বেলার কাঁধে ভর দিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অচিনবাবু সহাস্য মুখে সহৃদয় ভঙ্গীতে মোটরের দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন, চলুন পৌঁছে দি আপনাদের। আপনি উঠুন প্রিয়নাথবাবু—" বেলার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়নাথবাবু উঠিয়া বসিলেন। অপূর্ব্ববাবুও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

"আপনিও উঠুন—"

"অনেক ধন্যবাদ, আপনি অপূর্ব্ববাবুকে ওঁর বাসায় পৌঁছে দিন, আমি যাব না—"

"চলুন না আপনাকেও আপনার বাসায় নাবিয়ে দিয়ে যাই—"

"না, আমি এখন বাসায় ফিরব না—"

"বেশ তো, কোথায় ফিরবেন বলুন, সেইখানেই নাবিয়ে দিয়ে যাই—"

"না, তার দরকার নেই, আপনারা যান—"

মোটরের ভিতর হইতে প্রিয়নাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। "চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসুন ওকে, সোজা কথায় ও আসবে না—"

অচিনবাবু বলিলেন, "আঃ থামুন আপনি, কি যে বলেন!" তাহার পর বেলার দিকে ফিরিয়া একটু অনুনয় ভরেই বলিলেন, "চলুন, চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না আপনি, চলুন" এবং হাত ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন।

"হাত ছেড়ে দিন আমার।"

"আপনি যাবেন না ?"

"না—"

"কারণটা কি ?"

"আমার খুনী।"

সহসা বেলার নজরে পড়িল আজ সকাল হইতে যে লোকটা তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল জনতার মধ্যে সে-ও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেলার সন্দেহ হইল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন একটা যোগাযোগ রহিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে প্রফেসার গুপ্ত অচিনবাবু সম্বন্ধে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন সে কথাটাও মনে পড়িয়া গেল।

"চলুন, চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না।"

অচিনবাবু পুনরায় অনুরোধ করিলেন।

"আমি যাব না, কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন, অপূর্ব্ব-বাবুকে পৌছে দিন আপনি—"

"জোর ক'রে যদি ধরে নিয়ে যাই, কি করতে পারেন আপনি?"

মোটরের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া প্রিয়নাথ পুনরায় গর্জ্জন করিলেন—"জোর ক'রেই আনুন না আপনি, কি করে ও দেখি একবার—"

"আসুন, কি ছেলেমানুষী করছেন--"

অচিনবাবু এবার একটু জোরেই বেলার হস্তাকর্ষণ করিলেন। বেলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া সহসা অচিনবাবুর গণ্ডে স-জোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান প্রৌঢ়টিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "একজন মহিলাকে এরা সবাই অপমান করছে আর আপনারা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন! কেউ একটু সাহায্য করবেন না আমাকে?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আর পাঁচজনের মতো দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে দেখিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। সহসা এই প্রশ্নে একটু থতমত খাইয়া গেলেন।

"সাহায্য! আরে, বলে কি! আমাকে শুদ্ধ জড়াতে চায়, কি আপদ—"

"আর কিছু না পারেন আমাকে অন্তত সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে থানায় পৌছে দিন। পুলিশের আশ্রয়ে তবু খানিকটা ভরসা পাব—"

দ্বিতলের বাতায়ন হইতে যুবকের মুখটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই স-শরীরে তিনি বাহিরে আসিয়া বেলা মল্লিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি আসুন, আমার এই বাইরের ঘরে এসে বসুন, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করছি আমি—"

সকলেই ফিরিয়া দেখিল—স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি একটি যুবক।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন, "এইবার ঠিক হয়েছে, রতনে রতন চিনেছে—" এবং সমস্ত ঘটনাবলীর উপর যবনিকাপাত করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দিলেন।

বেলা মল্লিক অবিলম্বে গিয়া যুবকের বাহিরের ঘরে বসিলেন। অচিনবাবুর যদিও ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল কিন্তু তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং এখন ইহা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা অনুচিত হইবে ভাবিয়া গম্ভীরভাবে মোটরে উঠিয়া মোটরে স্টার্ট দিলেন। প্রিয়নাথ এবং অপূর্ব্ববাবু বেলার কাণ্ড দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। নিঃশব্দ গতিতে মোটর গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

জনতাও ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

প্রফেসার গুপ্ত খোলা ছাদে বসিয়া কাব্য-আলোচনা করিতেছিলেন। দক্ষিণা বাতাস বহিতেছিল, পাশের তেপায়ার উপর রক্ষিত সুদৃশ্য কাচপাত্রে স্তূপীকৃত বেল ফুলগুলি হইতে মৃদু সৌরভ সমীরিত হইতেছিল, সবুজ রেশমের ঘেরাটোপ-দেওয়া ইলেকট্রিক বাতির আলোকে পরিবেষ্টনী শ্যামস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, একটি আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া আবেশ-বিহ্বল-নয়নে মিষ্টিদিদি বসিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্ত তন্ময়চিত্তে মহাকবি ভাস বিরচিত স্বপ্নবাসবদত্তা নাটক পাঠ করিতেছিলেন।

যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্॥

কাব্যের ছন্দ-মন্ত্রে উভয়েই স্থান কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইহা যে বিংশ শতাব্দী এবং তাঁহারা কলিকাতা শহরে আছেন প্রত্যক্ষভাবে এ চেতনা প্রফেসার গুপ্তের অন্তত ছিল না। অতি-দূর বিগত রূপলোকের আবেষ্টনীতে উদয়ন-বাসবদত্তা-পদ্মাবতীর আনন্দ-শঙ্কা-শিহরণের মধ্যে নিজেকে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হইল।

বাহিরের দুয়ারে কে কড়া নাড়িতেছে!

এখানে আবার কে আসিল! এই সব উপদ্রবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই প্রফেসার গুপ্ত আলাদা এ ছোট বাসাটি ভাড়া করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রকন্যা আলাদা বাসায় থাকে, প্রফেসার গুপ্ত সকালে সেখানে থাকেন রাত্রেও সেখানে ফিরিয়া যান, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সামাজিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে। কলিকাতার নির্জ্জন অংশে এই ছোট বাসাটি তিনি ভাড়া করিয়াছেন—সংসারের কলরব, স্ত্রীর মুখরভাষণ এবং কৌতূহলী প্রতিবেশীগণের আপ্যায়ন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অবসরটুকু বিনোদন করিবার জন্য। নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু-চারিজন বান্ধব-বান্ধবী ভিন্ন এ বাসার ঠিকানাই কেহ জানে না। এত রাত্রে কে আসিল!

প্রফেসার গুপ্ত উৎকীর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

"পাশের বাড়ীতে নয় তো?"

আবার শব্দ হইল।

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "এই বাড়িতেই। যান দেখে আসুন কে এল। আমাকেও এবার পৌঁছে দিয়ে আসুন, রাত অনেক হ'ল! রিণিটা এতদিন ছিল, কোন ভাবনাই ছিল না—"

প্রফেসার গুপ্ত উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "রিণি কি চলে গেছে না কি?"

"হ্যাঁ পরশু দিন ওর স্বামী এসে নিয়ে গেছে ওকে—"

"লক্ষ্ণৌ?"

"হ্যাঁ।

প্রফেসার গুপ্ত নামিয়া গেলেন।

কপাট খুলিয়া যাহাকে তিনি দেখিলেন তাহাকে তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই—মিস বেলা মল্লিক অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া গ্রীবাভঙ্গী সহকারে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রফেসার গুপ্তের মনে পড়িল এই নূতন বাসাটার ঠিকানা দিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বেলাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলা আসে নাই। রাস্তার উপরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়াছিল এবং ট্যাক্সিতে একজন কে যেন বসিয়া ছিলেন।

"হঠাৎ তুমি এ সময় যে!"

"যখন নেমতন্ন করেছিলেন আসতে পারি নি, আজ বিপদে পড়ে এসেছি। আমাকে এক রাত্রির জন্যে আজ আশ্রয় দিতে পারবেন?"

"কেন, ব্যাপার কি?"

"আমি এখনি বাসায় ফিরে দেখলাম আমার ঘরে তালা ভেঙে কে ঢুকেছিল। আমার চাকরবাকর এখন কেউ নেই, একা ও বাসায় থাকতে ভয় করছে।"

"জনার্দ্দন সিং কোথা গেল?"

"সে দেশে গেছে। আশ্রয় দিতে পারবেন একরাত্রের মতো?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়, ভেতরে এসো, মিসেস্ মিত্রও আছেন এখানে।"

"মিষ্টিদি?"

"হ্যাঁ।"

"দাঁড়ান, ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিই—"

ট্যাক্সির নিকট গিয়া বেলা সেই যুবকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিলেন এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন যেন সে তাহাকে আবার বেলগাছিয়ায় পৌঁছাইয়া দেয়, এজন্য তিনি অগ্রিম ভাড়াও দিয়া দিলেন। ট্যাক্সি চলিয়া গেল। প্রফেসার গুপ্ত ও বেলা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কে, বেলা না কি! তারপর হঠাৎ কি মনে করে—"

"এমনি এলাম।"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "আজ থাকব রাত্রে এখানে।"

"তার মানে?"

প্রফেসার গুপ্ত উত্তর দিলেন—

"ওর বাড়িতে তালা ভেঙে কে যেন ঢুকেছিল আজ, সেই ভয়ে ও পালিয়ে এসেছে, এখানে থাকতে চাইছে রাত্রে!"

মিষ্টি দিদির মুখের হাসিটা একটু যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "কি ভীতু মেয়ে বাবা!"

বেলা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত সহসা সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওকি, তোমার কোমরে ওটা কি?"

"ছোরা। এখুনি কিনলাম—"

"কেন ?"

"কাছে একটা থাকা ভাল !"

মিষ্টিদিদিও ক্ষণকাল কুচকুচে কালো থাপটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন এবং পুনরায় আর একটু হাসিয়া পুনরুক্তি করিলেন, "কি ভীতু মেয়ে বাবা !"

বলা বাহুল্য, প্রফেসার গুপ্ত একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। প্রথমত, বেলার এই আকস্মিক আবির্ভাব সত্যই যে আকস্মিক, প্রফেসার গুপ্ত ইহার বিন্দুবিসর্গও যে পূর্ব্বাহ্নে জানিতেন না তাহা হয় তো মিসেস্ মিত্র বিশ্বাস করিবেন না। কারণ তাঁহার হাসির অন্তরালে যাহা বিচ্ছুরিত হইতেছিল তাহা আনন্দজনিত অথবা আনন্দজনক নহে। দ্বিতীয়ত, তিনি ভাবিতেছিলেন বেলাকে লইয়া কোথায় রাখা যায়। এ বাসায় প্রফেসার গুপ্ত থাকেন না, রাত্রে বাড়িতে ফিরিয়া যান, সেখানে বেলাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। অথচ এখানেও বেলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া অসঙ্গত। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। বেলা এবং মিষ্টিদিদি নীরবে পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; প্রফেসার গুপ্ত ভাবিতেছিলেন—কি করা যায়! সহসা মিষ্টিদিদি সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

"বেলা এখানে কোথা থাকবে, তার চেয়ে চলুক আমার সঙ্গে—রিণিটা চলে গিয়ে বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে—"

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে সায় দিলেন।

"বেশ তো, সেই ভাল—"

বেলাও নিশ্চিন্ত হইলেন। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে প্রফেসার গুপ্তের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। মিষ্টিদিদির সাহচর্য্য মনোরম না হইলেও নিরাপদ। একটা রাত্রি কোনরকমে তাঁহার সহিত কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। "বেশ তো, তাই চলুন—"

সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন। (ক্রমশঃ)

জীবন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হে জীবন ! তুমি মম লহ নমস্কার।
মরণের নব নব তোরণ-দুয়ার
পার হ'য়ে চলিয়াছো কোন্ লক্ষ্য পানে ?
ফুল সে ঝরিয়া যায় সন্ধ্যার উদ্যানে !
শূন্যডাল চুপে চুপে দাও পূর্ণ করি !
প্রভাত-পবন ওঠে পুষ্প-গন্ধে ভরি।
ডুবে যায় শ্মশানের করুণ ক্রন্দন
শিশুর কাকলিমাঝে। মেঘ আবরণ
সরে যায় ; ঢালে তারা শুভ্র দীপ্তি তার ;
আঁধার ভরিয়া বাজে প্রাণের ঝঙ্কার।
সেই প্রাণ ডোবে আজি রক্তের প্লাবনে !
মৃত্যুর বন্দনা-গান কামান-গর্জ্জনে !
তবু জানি, হে জীবন ! তুমি চিরন্তন—
মরণের ঊর্দ্ধে জাগে তোমার কেতন।

অস্ত-রবি

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

দুর্য্যোগ ঘনায়ে এলো, কালরাত্রি কাটিবে না আর—
জাতির পাথেয় হ'ল, আজ হ'তে অশ্রুজলধার !

কাঁদ, কাঁদ, যত পার অশ্রু-জলে সিক্ত কর মাটী ;
প্রাণের প্রণাম দিয়া এ মাটীরে করে তোল খাঁটী।

দুঃসহ বেদনা ভারে পাষাণের হিয়া জর জর—
চঞ্চল মাতাল বায়ু মাতামাতি করে চিত্তপর !

ব্যথায় বিকল হিয়া অবিরাম করে দুরু দুরু
আলোড়ন বিলোড়ন ভাঙ্গাঘাটে হ'ল আজ সুরু ;

নয়নের নব-গঙ্গা ভারতের পাদ-পীঠ তলে ;
রচিয়াছে নব-তীর্থ ; স্থলে জলে উপলে উপলে।

'চোখ গেলো' পাখীগুলো কেঁদে কেঁদে হ'ল আজ সারা
'পাপিয়া'র কলকণ্ঠ নহেক মুখর আর ; ভাষাহীন তারা

পথের পাথেয়টুকু হারাইয়া নিঃস্ব মোরা সবে,—
হে কাণ্ডারী ! অস্ত-রবি ! পার করি দিবে নাকি তবে ?

'রাখী'র উৎসবে আর মত্ত ছিনু রাখালিয়া গীতে ;
হেনকালে 'দিনমণি' অস্তমিত হ'ল আচম্বিতে !

রাখাল নাহিক আজ, বাঁশীটিরে ফেলে গেছে ভূমে !
খেলা শেষ ! পালা শেষ ! অস্ত-রবি দিগন্তেরে চুমে !

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

নিশাসাগ—ঝাঁপতাল

ধন্য মহাকবি তুমি, তোমার অসীম গুণে
মোহিত হয়েছে বিশ্বভুবন জনগণে।
মঞ্জু কবিতা তোমার, এ হেন দেখিনা আর,
শুনিয়া অতি আনন্দ, হয় যে সবার মনে।
তব সুন্দর মূরতি, তাই ত সবে প্রতিকৃতি
পূজিবারে সযতনে, রেখেছে ভবনে।
তোমার নাহি প্রয়াণ, হে রবীন্দ্র মহা প্রাণ,
মধুর গীতি শুনাতে কি গেছ হে অমর ভবনে॥

কথা ও সুর—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
{ রগা -া | গা রা সা | গা গা | রা সা ন্‌া | সা সা | গা -া গা | মা মা | পা পা -া } |
ধ - ন্য ম হা ক বি তু মি ০ তো মা র - অ সী ম গু ণে -

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মা গরা | সা গা মা | পা -া | না ধা না | র্সা না | ধা পা ণা | ধা পা | মা গা মা ॥
মো হি০ ত হ য়ে ছে - বি ০ শ্ব ভু ব ন ০ জ ন ০ গ ণে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
{ পা -া | পা নধা না | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | র্সা না | ধা না র্রা | র্সা না | ধা পা -া } |
ম - ঞ্জু ক০ বি তা তো মা র - এ হে ন ০ দে খি না আ র -

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মা গা | গা মা রা | গা পা | পা ধা না | র্সা না | ধা পা ণা | ধা পা | মা গা মা ॥
শু নি য়া অ তি আ ০ ন ০ ন্দ হ য় যে ০ স বা র ম নে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
পা র্সা | না র্সা র্সা | নর্সা ধা | ণা ধা পা | গা মা | ণা ধা পা | পমা পা |
ত ব সু ০ ন্দ র ০ মূ র তি তা ই্‌ ত স বে প্র০ তি

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মা গা -া | গরা গা | মা -া পা | মা গা | মা গা -া | রা গা | রা সা ন্‌া | সা -া | -া -া -া ॥
কৃ তি - পূ জি বা - রে স য ত নে - রে খে ছে ভ ব নে - - - -

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
{ পা পা | না ধা না | র্সা র্সা | র্সা -া র্সা | র্সা না | ধা না র্রা | র্সা না | র্সা ধা পা } |
তো মা র ০ না হি প্র য়া - ণ হে র বী ০ ন্দ্র ম হা প্রা ০ ণ

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
ণা ধা | মা গরা গা | মা পা -া | পা নসা র্রা | র্সা ণা | ধা পা ণা | ধা পা | মা গা মা ॥
ম ধু র গী০ তি শু না - তে কি০ ০ গে ছ হে অ ম র ভ ব নে ০

সাময়িকী

সুতার মূল্য ও তাঁতিদের অবস্থা—

যুদ্ধের ওজুহাতে এদেশে সকল দ্রব্যই অগ্নিমূল্য হইয়াছে এবং সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি—অন্তত এত বৃদ্ধি—কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সুতার মূল্যও অত্যধিক চড়িয়া যাওয়ায় তাঁতের কারিগরদের ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ত্রিপুরা, ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বহু তাঁতি ও জোলার বাস, সেই সকল তাঁতি ও জোলারা বিশেষ কষ্টে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, পূর্ব্ববঙ্গের এই সকল কারিগরের অধিকাংশই গরীব মুসলমান। অতিরিক্ত চড়া দামে সুতা কিনিয়া কাপড় বুনিয়া ইহারা পড়তায় পোষাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। পশ্চিম বঙ্গের তাঁতিদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। এমতাবস্থায় সরকারের অগৌণে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

আসামের আদম সুমারির ফল—

আসামের লোক গণনার যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ দায়ের হইয়াছে। আসামের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ মহাশয় ভারত সরকারের সেন্সাস কমিশনারের নিকট একটি তার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন—

'আসাম সরকার যে লোকগণনায় শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া ধর্ম্মকে সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে তীব্র আপত্তি উঠিয়াছে। এই ব্যবস্থাটি নিছক ভুল এবং ভ্রান্তধারণা উদ্ভূত হইবে। লোকগণনার হিসাবে কারচুবি করিবার অভিযোগ প্রকাশ্যে উঠিয়াছে। বিস্তারিত পত্রে লিখিলাম, তাহা হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত গণনার ফল অনুমোদন করিবেন না।'

শ্রীযুক্ত বরদলৈ মহাশয়ের অভিযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি স্বয়ং একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি; সুতরাং ভারত সরকারের পক্ষে তাঁহার অভিযোগ উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। লোক গণনায় যে রকম অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদলৈ মহাশয়ের অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না।

চার্চ্চিল-রুজভেল্টের মিলন—

বৃটিশ বেতারে মিঃ এটলী জানাইয়াছেন যে, বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ইংলণ্ডে কিছুদিন ছিলেন না। আটলান্টিক মহাসাগরের কোন একস্থানে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মিঃ রুজভেল্টের সহিত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে দুই রাষ্ট্রের মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যে যুক্ত বিবৃতি রচিত হইয়াছে তাহার সংবাদও তিনি বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন। আটটি বিষয়ে বৃটিশ ও আমেরিকার সরকার একমত হইয়াছেন—

(১) ইঁহারা নূতন কোন দেশ অধিকার করিতে ইচ্ছুক নহেন, (২) কোন দেশের অধিবাসীদের স্বাধীন অভিমত উপেক্ষা করিয়া সে দেশের ভৌগলিক সীমার পরিবর্ত্তন তাঁহারা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন না, (৩) প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বাধীন সরকারের রূপ নির্দ্ধারণের অধিকার তাঁহারা স্বীকার করেন এবং যাহাদের স্বাধীনতা গায়ের জোরে হরণ করা হইয়াছে তাহারা যাহাতে হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় ইহা তাঁহারা চাহেন, (৪) ছোট বড়, বিজিত বা বিজয়ী সকল দেশের পক্ষে অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে কাঁচা মাল আহরণের বা বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার তাঁহারা স্বীকার করেন, (৫) শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থ নৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক (৬) নাৎসী দৌরাত্ম্যের অবসানের পর প্রত্যেক জাতি যাহাতে ভয় ও অভাব মুক্ত হইয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বসবাস করিতে পারে, ইহা তাঁহারা দেখিতে চাহেন, (৭) শান্তিতে সকল দেশ সমুদ্রে যাতায়াত করুক ইহা তাঁহারা কামনা করেন, (৮) পৃথিবীর সকল জাতি আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কারণে বলপ্রয়োগ হইতে বিরত হইবে ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করেন।

এই দুই রাষ্ট্রপতির সম্মিলিত সাধু সংকল্প সফল হোক, সার্থক হোক—পরাধীন নির্যাতিত হইয়াও আমরা এই কামনাই করি। নাৎসীদের হাতে যাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের দাবী যেমন ন্যায্য, যাহারা নাৎসী-বর্ব্বরতার পূর্ব্বে স্বাধীনতা হারাইয়াছে

তাহাদের সেই হৃত স্বাধীনতার কি মর্য্যাদা ইঁহারা দিবেন তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেই ইঁহাদের ঘোষণার আন্তরিকতা ভারতবাসী উপলব্ধি করিতে পারিবে।

দেশরক্ষার সুব্যবস্থা—

সম্প্রতি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর নাজিমউদ্দীনের এক বিবৃতি হইতে আমরা সরকারী—তথা মন্ত্রীদের—হাতে রাজ্য রক্ষা কেমন চলিয়াছে তাহার এক ফিরিস্তি উপহার পাইয়াছি। স্যর নাজিম বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক আক্রমণ কালে দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এ পর্য্যন্ত পাঁচ হাজারের উপর সিভিক গার্ড এবং চুয়ান্ন জন অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ইহাদের জন্য এ পর্য্যন্ত ৫৪,৭৬২৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। অন্যদিকে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত ১২১৪ জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে, ২২২ জনকে আটক রাখা হইয়াছে এবং ১২১১ জনকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। বলা অনাবশ্যক যে ইঁহারা প্রায় সকলেই কমবেশী কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভারতরক্ষা আইন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপরই বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিয়া স্যর নাজিম জানাইয়াছেন যে এ পর্য্যন্ত আঠারজন খাকসারকে বাঙ্গালা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশরক্ষা ব্যবস্থার আর কোনই ত্রুটি রহিল না।

শাসন পরিষদের সদস্যদের বেতন—

যুদ্ধের সময় ভারতবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার আশায় বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই সব সদস্যের পূর্ব্বে বেতন ছিল বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাঁহাদিগের বেতন ৬৬ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে সদস্যদের বার্ষিক আয়কর দিতে হইত এবং তাহা বাদে আসলে তাঁহারা বেতন পাইতেন মাত্র ৫৪,৪৬৮৫০ আনা। বর্ত্তমানে তাঁহারা আয়কর ইত্যাদি বাদে পাইবেন ৪৬,৮৮৫।৶৮ পাই। সুতরাং তাঁহাদের আয় খুব বেশী কমিল বলা চলে না।

ঢাকায় পিউনিটিভ ট্যাক্স—

ঢাকা দাঙ্গার ফলে বাঙ্গালা সরকারের যে অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে তাহার জন্য ঢাকাবাসীদের উপর দেড় লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পিউনিটিভ ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে স্থির হইয়াছে। অপর পক্ষে দাঙ্গার ফলে ঢাকার যে সব ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইয়াছে তাঁহারা ভারত-সচিবের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিবেন বলিয়া প্রকাশ। যদি তাহাই হয়, তবে মফঃস্বলের যে সব লোকের ঘরবাড়ী ও জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের পক্ষ হইতেও অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাইতে পারে। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার সরকারের উপর। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারায় প্রজাসাধারণের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের দায়ও সরকারেরই। এমত অবস্থায় তাহাদিগকেই যদি পিউনিটিভ ট্যাক্স দিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে আর যাহাই বলা যাক না—সুব্যবস্থা বলা চলে না।

কলেজ অধ্যক্ষের মতিগতি—

পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর হরিচাঁদ একজন খ্যাত-নামা ব্যক্তি; যে লোকের হাতে হাজার হাজার ভাবী নাগরিক গড়িয়া তোলার দায়িত্ব তিনি যে প্রদেশ-বিশেষ সম্বন্ধে বিদ্বেষের উদাহরণ দেখাইতে পারেন তাহা আমাদের ধারণায়ও ছিল না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ—ভারতের বাহিরেও সর্ব্বত্র—শোক-সভার আয়োজন চলিতেছে; এমন সময় ডক্টর হরিচাঁদ তাঁহার কলেজের ছাত্রদের শোকসভা করিতে দিতে সম্মত হন নাই, কারণ রবীন্দ্রনাথ নাকি ছিলেন বাঙ্গালার কবি! অবশ্য বলা বাহুল্য যে 'বেঙ্গল লিটারেরি সোসাইটি' কর্ত্তৃক শোক-সভার অনুষ্ঠানে দলে দলে ছাত্রেরা যোগ দিয়াছিল। ডক্টর হরিচাঁদের মত লোকের এ আচরণের কোন কারণ আছে কি?

বাঙ্গালায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতা ১৭০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইনিষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল মহাশয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় ভারতীয় মহাবিদ্যালয় নামে বাঙ্গালা-দেশে একটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও এ বিষয়ে উদ্যোগী

হইয়াছেন। ভারতী গার্লস্ কলেজ নামে উহার অধীনে কলিকাতায় বালিকাদের জন্য একটি কলেজ খোলা হইয়াছে। গত জন্মাষ্টমীর দিনও ৫টি বিভিন্ন বিভাগের উদ্বোধন হইয়াছে—(১) সমাজ সেবা শিক্ষা বিভাগ (২) বাণিজ্য শিক্ষা বিভাগ (৩) ধর্ম্মশিক্ষা বিভাগ (৪) শিল্প শিক্ষা বিভাগ ও (৫) পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বাঙ্গালা বিভাগ। শীঘ্রই প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে প্রধান অধ্যাপক করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা বিভাগের অধ্যাপনা আরম্ভ হইবে। তাহা ছাড়া কৃষি, কলাশিল্প, সামরিক বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, ভারতীয় গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা প্রদানের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইবে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিভাগগুলি বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হাওড়া বেলুড়ের নিকট গঙ্গাতীরে পাঁচ শতাধিক বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া তথায় গৃহ নির্ম্মাণেরও ব্যবস্থা চলিতেছে। বাঙ্গালায় আজ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব সকলেই অনুভব করিতেছেন। কাজেই আমাদের বিশ্বাস, এ বিষয়ে কার্য্যারম্ভ হইলে আবশ্যক অর্থের অভাব হইবে না।

যক্ষ্মা রোগী ও সরকার—

সরকারী মহলের জল্পনা কল্পনা হইতে জানা গেল যে বাঙ্গালা সরকার নাকি যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একশত দরিদ্র রোগীর জন্য বিনাব্যয়ে থাকা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন। প্রস্তাবটি সত্য হইলে প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই; কেন না, বিষয়টি এমন গুরুতর যে, ঘরে ঘরে এই রোগের বীজাণু ছড়াইয়া পড়িয়া আজ বাঙ্গালাকে এক ভয়াবহ অবস্থায় রূপান্তরিত করিতেছে। কেন না, এমন রোগীর সংখ্যাই বেশী যাহারা উপযুক্ত ঔষধ—পথ্য ত দূরের কথা—বীজাণু না ছড়াইয়া থাকিবার মত একটু আশ্রয়ও জোগাড় করিতে পারে না। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় একশত রোগীর ব্যবস্থা নেহাতই অপ্রচুর; তবু একশত হতভাগ্যের চিকিৎসার সুব্যবস্থা যদি সত্য সত্যই হয়, তবে বাঙ্গালী তাহার জন্য সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

ভারত সরকারের ঔদার্য্য—

ভারত সরকার নাকি বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে বিশ্বভারতীর জন্য পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য বরাদ্দ করিয়াছেন। সুখবর সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিগুরুর জীবনব্যাপী সাধনার ধন বিশ্বভারতী পরিচালনায় এবং তাহার প্রয়োজনের তুলনায় ও ভারত সরকারের সামর্থ্যের বিবেচনায় এই টাকাটা নিতান্ত অপ্রচুর। আমাদের বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীর জন্য যথাযোগ্য বার্ষিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়া পরলোকগত কবির স্মৃতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।

বাঙ্গালার লোকগণনার ফল—

বাঙ্গালার লোকগণনার ফল প্রকাশিত হইয়াছে, বিস্তারিত ফল অবশ্য এখনও অজ্ঞাত। এই ফল দৃষ্টে জানা গেল যে, বাঙ্গালার মুসলমানদের সংখ্যা ১৯৩১ সালে যাহা ছিল এই দশ বৎসর পরেও ঠিক তাহাই আছে, একটিও বাড়ে কমে নাই, অর্থাৎ সংখ্যানুপাত সেই ৫৪·৮-ই রহিয়া গিয়াছে! অবশ্য দেশের জনসংখ্যা এবারে প্রায় এক কোটি বাড়িয়াছে; কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যানুপাত ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে, একটি বাড়িলও না, কমিলও না; ইহাতে লোকের মনে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি বসাইয়া তদন্তের ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণের মনের ধোকা দূর হইবে না। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন কি?

যুদ্ধের চাঁদা—

যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে নানাস্থান হইতে আপত্তি প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি নদীয়া জেলার খোকসা-জানিপুর অঞ্চলে যেভাবে চাঁদা আদায় করা হইতেছে বা চাঁদা আদায়ের নিরিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক আবেদন পাঠাইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছেন। অপর পক্ষে প্রকাশ, যুদ্ধের চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিবার ওজুহাতে স্থানীয় ১৩ জন ব্যবসায়ীর উপর ভারতরক্ষা আইনের বলে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া নোটিশ জারি করা হইয়াছে। ব্যাপারটি গুরুতর, অবিলম্বে এ বিষয়ে তদন্তের ফল জনসাধারণকে জানাইয়া তাঁহাদের দুশ্চিন্তা দূর করা সরকারের পক্ষে সঙ্গতই হইবে।

গান

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে॥
শুভখনে কাছে ডাকিলে লজ্জা আমার ঢাকিলে গো
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে॥
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে
এ নিরন্তর সংশয়ে হায় পারিনে যুঝিতে—
আমি তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে॥

কথা ও সুর ঃ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরলিপি ঃ—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

|| { রা গা গা | গা গা -া I গা গা মা | পা -হ্মপা পমা I গা -া -া |
যে ছি ল আ মা র্ স্ব প ন চা ০ ০ রি ণী ০ ০

| গা গা -মা I মগা গরা রা | রা -া গা I গরা -া -গমা | গা রা-গা I
তা রে ০ বু ঝি ০ তে পা ০ রি নি ০ ০ ০ তা রে ০

||
I রসা সা রা | গা -রপা পমা I গা -া -া | -া (-সা -রা) } I -া -া I গা -পা পা |
বু০ ঝি তে পা ০ ০ রি নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দি ন্ চ

| পা পা পা I হ্মা পা ধা | -না পা ধা I পা -ধা ধ-পা | মগা রা -গা I
লে গে ছে খুঁ জি তে ০ খুঁ জি তে ০ ০ ও০ গো ০

I রসা রা গা | গা গা -া I গা গা মা | পা -হ্মপা পমা I গা -া -া | -া -া -া I
যে ছি ল আ মা র্ স্ব প ন চা ০ ০ রি ণী ০ ০ ০ ০ ০

I { পা ধা নর্সা | র্সা র্সা র্সা I র্সনা র্রা র্রর্সা | -া -া -া I না -া র্সা | র্সনা নাঃ-র্সাঃ I
শু ভ খ০ নে কা ছে ডা০ কি লে ০ ০ ০ ল জ্ জা আ০ মা র্

I নধা র্সনা ধপা | -া -ধা -নর্সা I নর্সনা ধ-পা -া | -া -া -া } I না নর্সা র্সনা |
ঢা কি০ লে ০ ০ ০ ০ গো০ ০ ০ ০ ০ ০ তো মা০ রে

| ধা ধনা নধা I পা পধা পা | পা -ধা ধপা I মা -গা -া | রগমা -া -গরা I
স হ০ জে পে রে০ ছি বু ০ ঝি তে ০ ০ ০০ ০ ০০

I রা গা গা | গা গা -া I গা গা মা | পা -ন্ধপা পমা I গা -া -া | -া -া -া I
যে ছি ল আ মা র্ স্ব প ন চা ০০ রি ণী ০ ০ ০ ০ ০

I সা রা রা | রা রা গা I রা গা পমা | গা -া গ-রা I সা রা গা | গরা রপা মপা I
কে মো রে ফি রা বে অ না দ রে ০ ০ কে মো রে ডা কি ০ বে ০

I পমা গা -া | -া -া -া I গা গপা পা | পা পা পা I ন্ধপাঃ-ন্ধঃ পা | ধা -না -ধপা I
কা ছে ০ ০ ০ ০ কা হা ০ র প্রে মে র বে ০ দ না ০ ০ য়্

I পা ধা ধপা | পা -া ধপা I পা পমা -া | মগা রা -গা I সা রা গা |
আ মা র০ মূ ০ ল্য০ আ ছে ০ ও গো ০ কে মো রে

| গরা রপা মপা I পমা গা -া | -া -া -া I পা ধা ধা | -র্সা র্সা র্সা I নর্সা র্রগা গর্রা |
ডা কি০ বে০ কা ছে ০ ০ ০ ০ এ নি র ন্ ত র সং০ ০০ শ

| র্রর্সা র্সা -া I -া -া -া | -া -া -পা I পা ধা ধা I র্সা র্সা র্সা I নর্সা -র্রগা গর্রা |
য়ে০ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ এ নি র ন্ ত র সং০ ০০ শ

| র্রর্সা সর্রা র্স-না I না নর্সা র্সনা | ধা -নর্সা র্সনা I ধপা -া -া | ধা ধনা -ধপা I
য়ে০ আ ম্ পা রি০ নে যু ০০ ঝি তে০ ০ ০ আ মি ০ ০

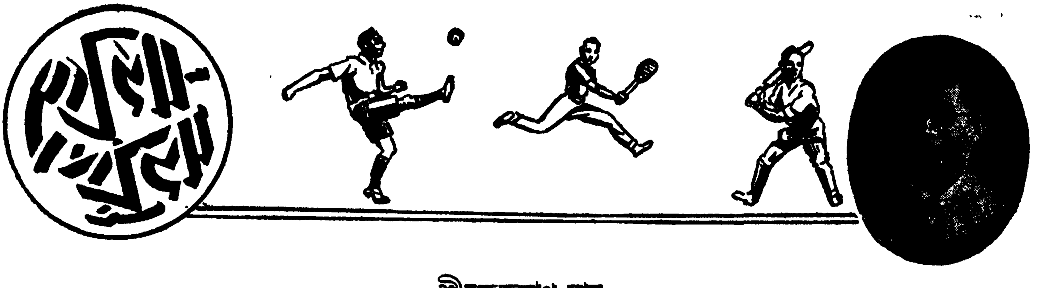
I পা না ধা | -না নধা পা I পা ধা পা | পা -ধা ধপা I মা -গা া | গা রা -গা I
তো মা রে ই শু ধু পে য়ে ছি বু ০ ঝি তে ০ ০ ও গো ০

I রসা রা গা | গা গা -া I গা গা মা | পা -ন্ধপা পমা I গা -া -া |
যে ছি ল আ মা র স্ব প ন চা ০ ০ রি ণী ০ ০

| গা গা -মা I গা গরা রা | রা -া গা | গরা -া -গমা | গা রা -গা I রসা সা রা |
তা রে ০ বু ঝি০ তে পা ০ রি নি ০ ০০ তা রে ০ বু০ ঝি তে

I গা -রপা পমা I গা -া -া | -া -া -া II II
পা ০০ রি নি ০ ০ ০ ০ ০





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রত্যেক বিভাগের সমস্ত খেলা শেষ হয়েছে।

প্রথম ডিভিসন লীগ খেলা ১৮৯৮ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। ঐ বৎসরে ৮টি ইউরোপীয় দল লীগে যোগদান করে; গ্লষ্টারস ২৪ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ১৮৯৯ সালে ক্যালকাটা ক্লাব ১৭ পয়েণ্টে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯০০ সালে রয়েল আইরিস রাইফলস ২৬ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করে। তাদের মাত্র ২টা খেলা 'ড্র' হয়। ১৯০১ সালে তারা পুনরায় লীগে নূতন অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করে। ঐ বৎসরে সকল খেলাতেই জয়ী হয়ে ২৮ পয়েণ্ট পায়। ১৯০৮ সালে গর্ডনস এবং ১৯১২ সালে ব্লাকওয়াচ একটিতেও না হেরে সকল খেলায় জয়লাভ করে। এ ছাড়া অপরাজেয় রেকর্ড করেছে—৯৩ হাইল্যাণ্ডার্স ১৯০৩ সালে, ১টি ড্র; কিংসওন ১৯০৫ সালে, ৪টি খেলা ড্র; ক্যালকাটা ১৯১৬ সালে, ৮টি খেলা ড্র; ক্যালকাটা ১৯২২ সালে, ১টি খেলা ড্র; ১ম নর্থ স্টাফোর্ড ১৯২৭, ৪টি খেলা ড্র।



১৯৪১ সালের লীগচ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং — ফটো—জে কে সান্যাল

১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগে কোন ভারতীয় দলকে প্রতিযোগিতায় খেলতে দেওয়া হ'ত না। ১৯১৪ সালে ৯১ হাইল্যাণ্ডার্স 'বি' দ্বিতীয় বিভাগের লীগে ২৭ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম স্থান পায়। ঐ বৎসর মোহনবাগান

এবং মেজারার্স 'বি' সমান ২২ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলে তাদের মধ্যে পুনরায় খেলা হয় এবং প্রথম দিনের খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়; দ্বিতীয় দিনের খেলাতে মেজারার্স ২—১ গোলে জয়ী হয়ে প্রথম বিভাগে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। ১৯১৫ সালে ৬২ আর জি এ মিলিটারী দল প্রথম ডিভিসন খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করলে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগে খেলতে অনুমতি পায় এবং ঐ বৎসর লীগে ১৫ পয়েণ্টে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। মেজারার্স ৯ পয়েণ্ট ক'রে ষষ্ঠ স্থান পায়। তখনও প্রথম বিভাগে ৮টি দল খেলত। মোহনবাগান ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২১, ১৯২৫, ১৯২৯, ১৯৩৪, ১৯৪০ সালে লীগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে 'রানার্স আপ' পায়। ১৯২০, ২১ সালে চ্যাম্পিয়ান দলের থেকে ২ পয়েণ্টের এবং ১৯২৫ সালে তারা মাত্র ১ পয়েণ্টের ব্যবধানে ছিল। ১৯৩৯ সালে ৩৯ পয়েণ্টে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের গৌরব লাভ করে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৩২ সালে প্রথম বিভাগে খেলবার যোগ্যতা পায়। ১৯৩২-৩৩ সালে চ্যাম্পিয়ান দলের থেকে মাত্র ১ পয়েণ্ট ব্যবধানে রানার্স আপ পায়। এছাড়া ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ সালেও লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৩৭ সালে ভবানীপুর ও ইষ্টবেঙ্গল দল সমান পয়েণ্টে রানার্স আপ্ পেয়েছিল। এবৎসরের লীগে তারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১৯২৮ সাল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে দেখা যায়। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে তারা ১০ ও ৮ পয়েণ্ট করে একেবারে লীগের সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করলেও তৃতীয় বিভাগে নামেনি। ১৯৩৩ সালে কে আর আর 'বি' ৩৭ পয়েণ্ট করে প্রথম হয়। মহমেডান স্পোর্টিং ২৯ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং ২৮ পয়েণ্টে রেঞ্জার্স ও পুলিশ তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মহমেডানদল ১৯৩৪ সালে লীগের প্রথম বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অনুমতি পায় এবং ১৯৩৪-১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ছয় বৎসর পর্য্যায়ক্রমে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছিল। পুনরায় তারা লীগে প্রথম হয় ১৯৪০ সালে এবং ১৯৪১ সালেও লীগে শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রে তাদের পূর্ব্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কিন্তু অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হয় নি।

এ বৎসরের মোট ২৬টা খেলায় তারা ৫৩টা গোল দিয়েছে আর ১২টা গোল খেয়েছে। লীগের পূর্ব্বেকার খেলায় ১৯৩১ সালে ডারহাম ১৮ খেলায় ৫১টা গোল, ১৯১৩ সালে ব্লাকওয়াচ ১৮টা খেলায় ৫৭টা গোল, ১৯০২ সালে কে ও এস 'বি' ১৬টা খেলায় ৫৪টা এবং ১৯০০ সালে ক্যালকাটা ১৪টা খেলায় ৫০টা গোল দেয়। ১৯০০ সালে ক্যালকাটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক গোল দিলেও লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় নি।

এ বৎসরে দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগে প্রথম হয়েছে অরোরা এথেলেটিক এসো:। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সালকিয়া ফ্রেণ্ডস এসো:।

তৃতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে রবার্ট হাডসন। 'রানার্স আপ' পেয়েছে মাড়োয়ারী ক্লাব।

চতুর্থ বিভাগে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। উত্তরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সোমানা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ২৩টি গোল দিয়েছেন।

প্রথম বিভাগ লীগের ফলাফল :

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	প:
মহমেডান	২৬	২০	৩	৩	৫৩	১২	৪৩
ইষ্টবেঙ্গল	২৬	১৮	৪	৪	৫৩	১৫	৪০
মোহনবাগান	২৬	১৫	৭	৪	৩৩	১৭	৩৭
পুলিশ	২৬	১৪	৫	৭	৩৩	১৯	৩৩
রেঞ্জার্স	২৬	১০	১০	৬	৩০	২০	৩০
ভবানীপুর	২৬	১০	৬	১০	২৭	২৬	২৬
ই বি আর	২৬	৯	৬	১১	৪১	৩৭	২৪
এরিয়ান্স	২৬	১০	৪	১২	৩২	২৯	২৪
কাষ্টমস	২৬	৭	১০	৯	২৫	৩৩	২৪
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	২৬	৭	৯	১০	১৭	২৯	২৩
কালীঘাট	২৬	৮	৫	১৩	২৭	৩৮	২১
ডালহৌসী	২৬	৬	৪	১৬	২৩	৫০	১৬
ক্যালকাটা এফ সি	২৬	৫	৪	১৭	১৭	৪৯	১৪
নর্থ স্টাফোর্ড	২৬	৩	৩	২০	২৬	৬৩	৯

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব রেঞ্জার্সের সঙ্গে লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় যোগদান করবে না। রেঞ্জার্স ঐ খেলায় 'ওয়াকওভার' পেল।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা ভারতীয় ফুটবল খেলার প্রধান আকর্ষণ। ফুটবল খেলার ইতিহাসে ইউরোপীয়ানদের দানই প্রধান। ফুটবল খেলা এদেশীয় নয়। কবে যে এই বিজাতীয় খেলা আমাদের দেশে প্রথম আরম্ভ হয় তার কোন প্রামাণিক ইতিহাসও নেই। দেখা যায় ১৮০২ সালে ভারতের বিভিন্ন দেশের মাঠের উপর ফুটবল খেলা চলছে। ফুটবল খেলার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বাঙ্গলা দেশে। ভারতীয় ফুটবল খেলার অগ্রগতির পথে বাঙ্গালী খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদীদের দান সব থেকে বেশী। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ধনী ক্রীড়ামোদীদের আন্তরিক চেষ্টায় এবং দানে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা ১৮৯৩ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসরে কলকাতা এবং লক্ষ্ণৌতে আই-এফ এর পরিচালকমণ্ডলী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ওয়েস্টার্ণ ডিভিসনের সঙ্গে লক্ষ্ণৌর বিজয়ী রয়াল আইরিস দলের প্রথম ফাইনাল খেলা হয়। রয়াল আইরিস দল ফাইনাল বিজয়ী হয়েছিল। শীল্ডের উপর তাদের নামই প্রথম উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। ঐ বৎসর ১৩টি দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার এই ৪৭ বৎসরের ইতিহাসে গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স ১৯০৮-১৯১০ সাল, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ১৯২২-১৯২৪ সাল, সেরউড ফরেষ্টার্স ১৯২৬-১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে তিনবার শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছে। মাত্র তিনটি ভারতীয় দল আই এফ এ শীল্ড বিজয়ের যোগ্যতা পেয়েছে। ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম শীল্ড বিজয়ের সম্মান পায়। এরপর ১৯৩৬ সালে মহমেডান স্পোর্টিং এবং ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স ক্লাব শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় দলের কুমারটুলি ইনঃ ১৯২০ সালে, মোহনবাগান ১৯২৩ সালে এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৮ সালে শীল্ডের ফাইনালে খেলে 'রানার্স আপ' পেয়েছে। মোহনবাগান ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম শীল্ড বিজয়ী হওয়ার পর থেকেই বাঙ্গলা দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ফুটবল খেলার উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে ফুটবল খেলার উদ্দীপনা ঐ সাফল্য লাভের পরই আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ সাফল্যের উপরই যে বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার গৌরবময় ইতিহাস গড়ে উঠেছিল একথা অস্বীকার করবার নয়। আজ শীল্ড প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু বাঙ্গালী ফুটবল প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় যোগদান করে দেশের যুবকদের মধ্যে শরীর চর্চ্চার উৎসাহ এবং নির্দ্দোষ আমোদ প্রদান করছে।



আই এফ এ শীল্ড

শীল্ডের বিগত জীবনের ইতিহাসে মিলিটারী টীম ৪৭বার এবং বে-সামরিক দল ১৪বার শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। এদিকে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব একাই ৯বার শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ ক'রে ফুটবল খেলার ইতিহাসে অদ্বিতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছে।

১৯৪১ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বেশী ৬৩টি ফুটবল

প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্ম নাম পাঠায়। তার মধ্যে ৫৮টি টীম আই এফ এ-র পরিচালক মণ্ডলীর কাছ থেকে শীল্ডে খেলার অনুমতি লাভ করে। এর মধ্যে আবার দুটি টীম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকে। এবৎসরের শীল্ড প্রতিযোগিতা একাধিক কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শীল্ড খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল ভবানীপুর ক্লাব ৪-১ গোলে বোম্বাইয়ের শক্তিশালী ডবলউ এফ এ দলকে পরাজিত ক'রে। কুচবিহার একাদশ ১-০ গোলে ১৯৩৯ সালের শীল্ড বিজয়ী পুলিস দলকে এবং জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব স্থানীয় কাষ্টমস দলকে ২-০ গোলে পরাজিত ক'রে কম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনি। শীল্ডের দ্বিতীয় রাউণ্ডের প্রথম দিনে জলপাইগুড়ি টাউন ২-০ গোলে গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্সকে পরাজিত করে। কিন্তু জলপাইগুড়ির কোন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে খেলায় যোগদান করায় খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হবার জন্ম আই এফ এ নির্দ্দেশ দেয়। অথচ জলপাইগুড়ির সেক্রেটারী উক্ত খেলোয়াড়ের শীল্ড খেলায় যোগদান সম্বন্ধে যে অনুমতি পত্র পেয়েছিলেন তা আই এফ এ-র সভায় দাখিল করেও কোনও সুফল পাননি। দ্বিতীয় দিনের খেলায় এরিয়ান্স ৪-০ গোলে জলপাইগুড়ি টাউন দলকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। খেলোয়াড়কে ভুল সনাক্ত করেই নাকি আই এফ এ ঐরূপ অনুমতি পত্র দিয়েছিল। আই এফ এ নিজের ভুল স্বীকার করেছে কিন্তু তার মত একটি প্রতিষ্ঠাবান ফুটবল প্রতিষ্ঠানের এরূপ ক্রটী মারাত্মক এবং তার ফলেই যে একটি নির্দ্দোষী দল খেলায় প্রথম দিন জয়ী হয়েও পরের দিনের খেলায় হতাশায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে একথা একেবারে মিথ্যা নয়। প্রতিযোগিতায় যোগদান ব্যাপারে যেখানে আই এফ এ-র নির্দ্দেশের উপরই ফুটবল প্রতিষ্ঠান গুলিকে নির্ভর করতে হয় সেখানে নির্ভুল কাজের জন্ম আই এফ এ-র সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। দা মণ্টেমোরেন্সি কাপের ফাইনাল বিজয়ী লাহোরের গভর্ণমেণ্ট কলেজ টীম শীল্ডে শোচনীয় খেলার পরিচয় দিয়েছে। শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই তারা হুগলী স্পোটিং এসোসিয়েশনের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়। দলের শক্তি হিসাবে হুগলীকে দ্বিতীয় বিভাগের লীগ্ তালিকায় ফেলা যায়। খেলার প্রথম দিনেই তারা ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করছিল কিন্তু পূর্ণ সময়ের তিন চার মিনিট পূর্ব্বে রেফারী খেলাটি সমাপ্ত করায় আই এফ এ-র নির্দ্দেশ অনুযায়ী খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। রেফারীর এই মারাত্মক ক্রটীর সুযোগ লাভ করেও কলেজ দল দ্বিতীয় দিনে জয় লাভ করতে পারেনি।

শীল্ড প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থানের ফুটবল প্রতিষ্ঠান এবং ভারতেরও বিভিন্ন প্রাদেশিক দল এ কয়েক বৎসর বেশী সংখ্যায় যোগদান করে আসছে। আই এফ এ শীল্ড খেলার একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উপর লক্ষ্য রেখে এই সব ফুটবল টীমকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয় না এটা আমাদের কল্পনা বা ভ্রান্ত ধারণা নয়। খেলার ফলাফলের উপর দৃষ্টি রাখলেই কোন কোন দলের শক্তির শোচনীয় অক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তরুণ খেলোয়াড়দের খেলায় যোগদানের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থাকে আমরা অস্বীকার করি না। প্রবীণদের অবসর গ্রহণ ক'রে তরুণ যুবক খেলোয়াড়দের বেশী সুযোগ দেওয়া উচিত এটা আমরা বহুবার বলেছি। জাতীয় খেলাধূলার ভবিষ্যত ইতিহাস যুবকদেরই উপর এখন নির্ভর করছে। তাদের পঙ্গু ক'রে যশলাভের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটে যারা বিদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানী দ্বারা দলের গৌরব রক্ষার চেষ্টা করছেন অন্ত কোন দেশে তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের দেশের কথা স্বতন্ত্র। আমরা খেলাধূলার অযোগ্যতাকে যোগ্যতার কতখানি মর্য্যাদা দিয়েছি তার প্রমাণ এক আই এফ এ শীল্ডের অনুষ্ঠিত খেলাতেই পাওয়া যায়।

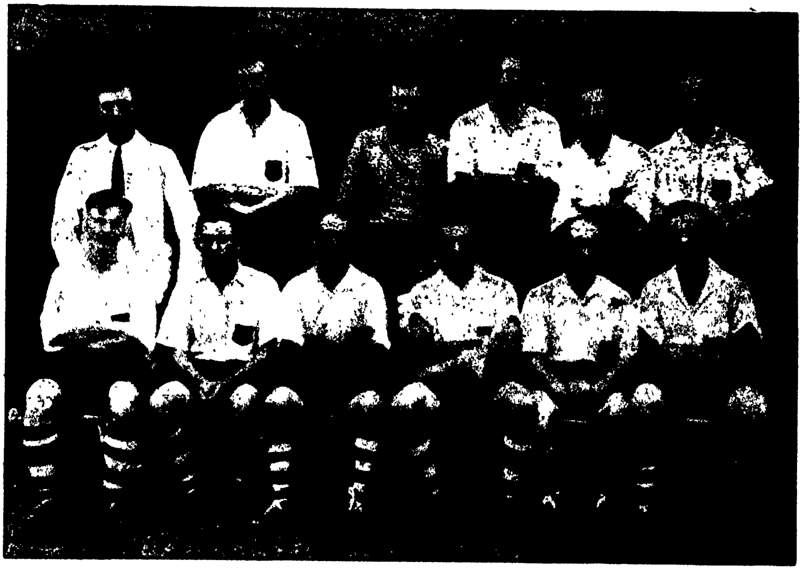
শীল্ডের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় ২৪ পরগণা ১০-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজয় স্বীকার ক'রে যে নিম্নস্তরের খেলার পরিচয় দিয়েছে তাতে আই এফ এ শীল্ডের মত এত দিনের একটি আভিজাত্য-সম্পন্ন প্রতিযোগিতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যথেষ্ট খর্ব্ব হয়েছে। এই শোচনীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছে হাওড়া জিলা দল শীল্ডের তৃতীয় রাউণ্ডে মহমেডান দলের কাছে ১১-০ গোলে পরাজিত হয়ে। মাত্র ২টি খেলায় ২১টি গোল দিয়ে মহমেডান দল শীল্ডের খেলায় নতুন রেকর্ড করেছে। শীল্ডের মোট ৬টা খেলায় তারা ৩২টা গোল দিয়েছে আর মাত্র ২টা গোল খেয়েছে।

এ বৎসরের শীল্ডের চতুর্থ রাউণ্ডে মহমেডান স্পোর্টিং ৪-১ গোলে ক্যালকাটাকে, এরিয়ান্স ১-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে, ওয়েলস্ রেজিমেণ্ট ৪-১ গোলে ক্যালকাটা রেঞ্জার্সকে এবং কে ও এস বি (০-০, ২-২, গোলে দু'দিন খেলা অমীমাংসিত ক'রে) তৃতীয় দিনে মাত্র ১-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। সেমি-ফাইনালের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং মাত্র ১-০ গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত করে এবং কে ও এস বি ২-০ গোলে শক্তিশালী ওয়েলস্ রেজিমেণ্টকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।

শীল্ডের ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ২-০ গোলে কে ও এস বি গোরা দলকে পরাজিত ক'রে শীল্ড বিজয়ের দ্বিতীয় বারের সম্মান লাভ করেছে।

মাঠের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। প্রচুর বারিপাতের ফলে আশানুরূপ দর্শক সমাগমও হয় নি। এ বৎসরের কে ও এস বি দলের খেলার পরিচয় পেয়ে অনেক ক্রীড়ামোদীরই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল গোরা দলই বুঝি শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ করবে। প্রবল বারিপাতে, কর্দমাক্ত মাঠের উপর ভারতীয় দলের দুর্ভাগ্যের কথাও অনেকে কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু খেলার মাঠে মহামেডান দলের খেলোয়াড়দের জয় লাভের অদম্য চেষ্টা দেখে সমর্থক এবং দর্শকগণ আশান্বিত হয়েছিলেন। খেলার প্রথমার্দ্ধে গোরা দলের প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যেই মহমেডান দল দু'টী গোলের সুযোগ গ্রহণ করে। প্রথম গোলটি রসিদ খাঁ 'পেনাল্টি কিক' থেকে দেয়। দ্বিতীয়টি দেয় সাবু। প্রবল ভাবে আক্রমণ চালিয়ে গোল শোধ করবার সকল প্রকার চেষ্টা করেও গোরা দল শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

মহমেডান দলের এ জয়লাভে ভারতীয় দলের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। বাঙ্গলার ফুটবল প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরাও ক্রীড়ামোদীদের সঙ্গে এক হ'য়ে তাদের এ সম্মান লাভে গৌরব বোধ করছি কিন্তু এ গৌরব সকলেই কি সম্পূর্ণ ভাবে নিতে পাচ্ছেন। এই দলের যোগ্যতা সম্বন্ধে কারও সন্দেহ নেই কিন্তু যে দলে মাত্র একটি বাঙ্গালী খেলোয়াড় রয়েছে সেখানে বিদেশী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দলের উপর কতখানি আর আকর্ষণ আছে! এ মনোভাবের পরিচয় প্রাদেশিকতা নয়। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মত শক্তিশালী টীমে কজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় আর খেলবার বেশী সুযোগ পায়! বাঙ্গলা দেশের ফুটবল প্রতিষ্ঠান হিসাবে তারা যদি নতুন বাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে দল গঠনে মন দেয় তাহলে ভবিষ্যতে সুদূর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করবার অর্থ এবং পরিশ্রম বেঁচে যায়। এ অনুরোধ সকল ফুটবল প্রতিষ্ঠানের উপর। আমাদের মনে রাখতে হবে জয়লাভই খেলার প্রধান উদ্দেশ্য নয়।



বার্ণপুর হার্লে: শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডে ইউনাইটেড হাওড়ার কাছে ২-০ গোলে পরাজিত

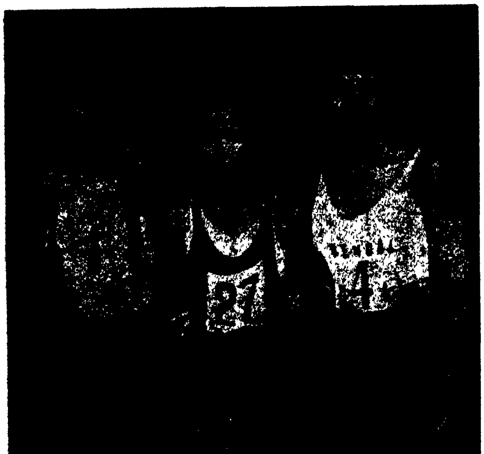
মহমেডান স্পোর্টিং: কালু খাঁ; সিরাজুদ্দিন এবং জুম্মা খাঁ; বাচ্চি খাঁ, রসিদ খাঁ এবং মাসুম; নূরমহম্মদ, তাহের, রসিদ, সাবু এবং তাজ মহম্মদ।

কে ও এস বি: লাভ; টমসন এবং ক্যাম্বেল (বড়) হাণ্টার, ফেগুারসন এবং নিকল; গোওয়ান্স, ক্যাম্বেল (ছোট) সাইম, ফুরী এবং ফস্টার।

রেফারী—সুনীল ঘোষ

নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

নিখিল ভারত সন্তরণ সঙ্ঘের উদ্যোগে যে নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল তাতে মাত্র তিনটি প্রদেশ যোগদান করেছিল। বাঙলা প্রদেশ ৯৯ পয়েণ্টে প্রথম, পাঞ্জাব ১৮ পয়েণ্টে দ্বিতীয় এবং যুক্তপ্রদেশ ১৭ পয়েণ্টে সর্ব্বশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দেশের সাঁতারুগণ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলেও খুব বেশী গর্ব্ব করবার কারণ দেখি না। পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ হতে আগত সাঁতারুগণ এখনও সাঁতারে দক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। বোম্বাই, পাতিয়ালা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁতারুগণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করলে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করা কেন যোগদান করাতেও একটা গৌরব এবং সম্মান আছে। শক্তিশালী



অল ইণ্ডিয়া সুইমিংএ মহিলাদের ১০০ মিটার সাঁতারে ১ম গীতা ব্যানার্জি, ২য় কুন্তী দেবী, ৩য় সুখলতা পাল ফটো—পান্না সেন

সাঁতারুরা যাতে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরূপে প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার সুবিধা পেতে পারেন সে বিষয়ে পরিচালক মণ্ডলীর বিশেষ উৎসাহ এবং দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। আশা করি ভবিষ্যতে এবিষয়ে তাঁরা সচেষ্ট থাকবেন। তা নাহলে এরূপ প্রতিযোগিতার খুব বেশী মূল্য থাকবে না।

বাঙ্গলা প্রদেশের পুরুষ সাঁতারুগণ প্রত্যেক বিভাগেই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। একমাত্র পিঠ সাঁতার ব্যতীত মহিলারাও মহিলাদের সকল বিভাগেই প্রথম হয়েছেন। এছাড়া নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগের নূতন ভারতীয় রেকর্ড বাঙ্গলা প্রদেশের সাঁতারু দ্বারাই স্থাপিত হয়েছে।

নূতন ভারতীয় রেকর্ড ঃ

২০০ মিটার বুক সাঁতার :—হরিহর ব্যানার্জি, (বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি, বাঙ্গলা)। সময় ৩ মিঃ ৬ ২।৫ সেকেণ্ড। উক্ত সমিতিরই সভ্য প্রফুল্ল মল্লিক পূর্ব্বে ৩ মিঃ ৯ সেকেণ্ডে নূতন রেকর্ড করেছিলেন।

৪০০ মিটার রিলে রেস :—বাঙ্গলা প্রদেশ। সময় ৪ মিঃ ৩১ ৩।৫ সেকেণ্ড। পূর্ব্বে ৪ মিঃ ৫৬ ২।৫ সেকেণ্ডের রেকর্ড বাঙ্গলা প্রদেশ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েছিল।

বাঙ্গলা দল :—দিলীপ মিত্র, মনু চ্যাটার্জি, রাজারাম সাহু, শচীন পাল।

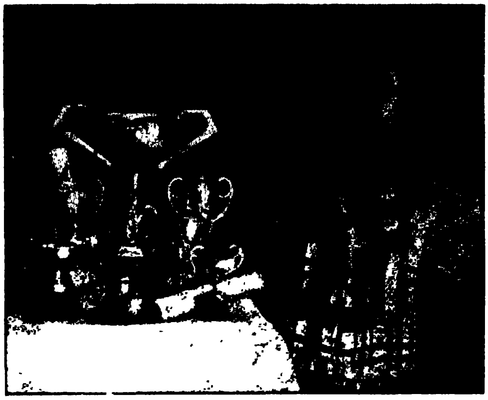
১০০ মিটার পিঠ সাঁতার :—রাজারাম সাহু। বাঙ্গলা প্রদেশের সুইমিং ক্লাবের সভ্য কর্ত্তৃক স্থাপিত। সময় ১ মিঃ ১৬ ৩।৫ সেকেণ্ড। পূর্ব্বের ১ মিঃ ২১ ৩।৫ সেকেণ্ড তাঁরই ভারতীয় রেকর্ড ছিল।

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল :—শচীন নাগ, হাটখোলা ক্লাবের সভ্য, বাঙ্গলাপ্রদেশ কর্ত্তৃক স্থাপিত। সময়—১ মিঃ ৪ ১।৫ সেকেণ্ড। পূর্ব্বেকার রেকর্ড ১ মিঃ ৬ ২।৫ সেকেণ্ড।

রেফারিং ঃ

শীল্ড খেলায় রেফারিংয়ে মারাত্মক ত্রুটী দেখা গিয়েছে। হুগলী স্পোর্টিং এসোঃ বনাম লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রথম রাউণ্ডের খেলাটি নির্দ্ধারিত সময়ের চার মিনিট পূর্ব্বে শেষ করা হয়। লীগের খেলাতেও রেফারী ম্যাকব্রাইড অনুরূপ ভুল ক'রেছিলেন। অথচ তারপরও রেফারি চার মিনিট পূর্ব্বে কি কারণে যে খেলা শেষ করেছিলেন তা জানা যায়নি। একই ধরণের ভুল বারম্বার ঘটে চললে পরিচালক মণ্ডলীর উপর সাধারণ কতদিন আর আস্থা স্থাপন করতে পারে? শীল্ডের চতুর্থ রাউণ্ডে মহমেডান বনাম ক্যালকাটার খেলায় নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উভয় দল ১টি ক'রে গোল দিলে রেফারি অতিরিক্ত সময়ে খেলতে নির্দ্দেশ দেন। অতিরিক্ত সময়ে মহমেডান ৪-১ গোলে ক্যালকাটাকে পরাজিত করে। রেফারির খেলা পরিচালনা ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ দেখা যায়। অনেকের মতে মহমেডান দলের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোলটি 'অফ্ সাইড' আইনের ধারায় বাতিল করা রেফারির উচিত ছিল। লাইন্সম্যানও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে উপেক্ষিত হ'ন। এ ছাড়া মহমেডান গোলের সম্মুখে একটি দৃশ্যমান 'হ্যাণ্ডবল'ও রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। খেলা শেষ হবার তিন মিনিট পূর্ব্বে মহমেডান গোলের পেনাল্টি সীমানায় রসিদ খাঁ ম্যাকসাগল্যানের একটি শক্ত সর্ট হাত দিয়ে প্রতিরোধ করেন। ঐ সময়ে খেলার ফলাফল ছিল ১-১ গোল। কিন্তু বিপক্ষদলের নিয়ম ভঙ্গ করে খেলার দরুণ ক্যালকাটাকে পেনাল্টি সর্টের সুযোগ দেওয়া হয়নি। আরও উল্লেখযোগ্য

যে, দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার শেষভাগে মহমেডান দলের কোন কোন খেলোয়াড় অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয়



কুমারী গোপা দে

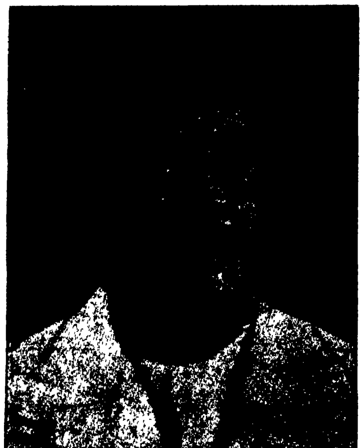
দিয়েছিলেন। সিরাজুদ্দিন ক্যালকাটার জর্জিয়াডিকে অন্যায়ভাবে ভূতলশায়ী করলেও রেফারী সতর্ক করে দেন নি। তাছাড়া রেফারীর সঙ্গে রসিদ খাঁ তর্কযুদ্ধে অবতরণ করে মাঠের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট করেন। এই দিনের খেলায় রেফারি ছিলেন এস ঘোষ। ইতিপূর্ব্বে একাধিক রেফারির খেলা পরিচালনা সম্বন্ধে বহু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু খুঁটির জোর থাকলে খেলায় রেফারিং কেন অনেক অসম্ভব বস্তুকেও হাতের মুঠির মধ্যে আনা যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

রেফারিংয়ে এই সমস্ত ভুল হয় ইচ্ছাকৃত না হয় রেফারিংয়ে তাঁদের প্রাথমিক বুদ্ধির অভাবে ঘটছে। এই ধরণের মারাত্মক ভুলের প্রতিকারের জন্য দর্শকেরা কোথাও কোথাও তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে পড়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মধ্যে আমরা দোষের কিছু দেখিনা; ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলাটা অবশ্য বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে পরিচালক মণ্ডলী এমনি ভাবে চক্ষু বুজে আছেন যে, দর্শক বা সমর্থকদের মধ্যে ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব হয় না। দর্শক এবং সমর্থকদের মধ্যে খেলোয়াড় সুলভ মনোভাবের অভাব বলে আমাদের দেশের অনেকেই আবার অভিযোগ তুলে বিনামূল্যে উপদেশ বিতরণ করেন। অথচ গলদের যেখানে সৃষ্টি সেখানে আঘাত করবার সাহস কিম্বা প্রতিকার করবার চেষ্টা দেখান না। দর্শক এবং সমর্থকদের কেহ কেহ হয় ত ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই শ্রেণীর দর্শক সর্ব্বদেশেই পাওয়া যায়। ইউরোপের মাঠে দর্শক এবং সমর্থকদের তুলনায় আমাদের দেশের দর্শকেরা যথেষ্ট শান্ত এবং কঠিন ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়। ইতিপূর্ব্বে সেখানের মাঠের খবর কিছু কিছু প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানের হাওয়া এখানে এলে মাথার খুলি বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রতিবাদেরও একটা সুষ্ঠ ধারা আছে সেটাকে আমরা কোন দিন অস্বীকার করব না কিন্তু আজকের মাঠের এই অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পিছনে প্রতিযোগিতার পরিচালক-মণ্ডলীর কোন শৈথিল্য প্রকাশ কি পায় নি!

আমাদের দেশে যে পদ্ধতিতে খেলা পরিচালনা করা হয় তাতে সম্পূর্ণ ত্রুটিবিচ্যুতিহীন রেকারিংও সম্ভব নয়। রেফারিংয়ে সংস্কার প্রয়োজন হয়েছে। তবে রেফারিং সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ হচ্ছে ভবিষ্যতে যাতে সেই ধরণের না ঘটে সে বিষয়ে পরিচালকমণ্ডলীর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

পরলোকে মিঃ ডি এন গুঁই ঃ

কলকাতার বিভিন্ন খেলাধূলায় বিশেষ পরিচিত বিশিষ্ট খেলোয়াড় মিঃ ডি এন গুঁই ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেছেন। খেলার মাঠে তিনি 'গাইন বাবু' নামে সুপরিচিত ছিলেন। মিঃ গুঁই দীর্ঘ দিন ব্যাপী মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উক্ত ক্লাবের উন্নতির জন্য নিজের অনেকখানি শক্তি নিয়োজিত করেন। খেলাধূলা তাঁর এত প্রিয় ছিল যে, বিশেষ কারণ ভিন্ন কোন প্রতিযোগিতায় তাঁকে অনুপস্থিত হতে দেখা যেত না। তাঁর সাহচর্য্য লাভের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও তাঁর উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করত, তাঁর উপর খেলা পরিচালনার



মিঃ ডি এন গুঁই

ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হত। বিভিন্ন খেলাধূলায় যেমন তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল তেমনি খেলার আইন সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান

ছিল। তিনি ১৯২৫—১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত আই এফএ-র জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯২৮ সালে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনে অস্থায়ীভাবে সম্পাদনার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বেঙ্গল জিমখানার প্রতিষ্ঠা-সম্পাদক ছিলেন। প্রায় পনের বৎসর যাবত বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। ক্রীড়াজগতে এতগুলি প্রতিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন যে, তার সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ সম্ভব নয়। তাঁর মত একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদীকে হারিয়ে বাঙ্গলাদেশ সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয় যদি না বাঙ্গলা দেশের যুবক শ্রেণী তাঁর আদর্শ নিয়ে এ দেশের খেলাধূলায় নিজেদের দানে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে ক্রীড়াজগতে তাঁর উপস্থিতির অভাব হয়ত ভুলতে পারব কিন্তু খেলাধূলায় তাঁর দান, তাঁর আদর্শ সর্ব্বদিক থেকে তাঁকে অমর করে রাখবে।

হারউড লীগ ঃ

হারউড ফুটবল প্রথম বিভাগের লীগে সিটি পুলিশকে ৭-০ গোলে পরাজিত করে ওয়াই এম সি এ গোল এভারেজে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। ১৯০৯ সালে একবার ওয়াই এম সি এ উক্ত লীগ বিজয়ী হয়েছিল।

লীগের ফলাফল :

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ওয়াই এম সি এ						
৯	৮	০	১	৩৭	৪	১৬
ওয়েলস্ রেজিমেণ্ট						
৯	৮	০	১	৩৬	৬	১৬

২৭।৮।৪১

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত "প্রজাপতয়ে"—২৲
সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন-মৃত্যু"—১।০
জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "র‍্যালে ও ড্রেকের অভিযান"—৷৷০
আশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "অনিলার প্রেম"—১৷৷০
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "অনার্য্য নন্দিনী"—১৷৷০
নৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "মহারণে দুরন্ত মদন"—১৷৷০
বীরেন দাশ প্রণীত—"খেলাঘর"—৷৷০
শচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত "হারানো দিন"—১৲
প্রিয়লাল দাস প্রণীত উপন্যাস "গ্রাম্য বালিকা"—১।০
আশু চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "একটি সকাল"—১৲
সৌরীন্দ্র মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "মহামানব সংঘ"—২৲
চারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত "ভাগবত-জীবন"—৷৷০
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "তীর ও তরঙ্গ"—২৲
নগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত—"কুমড়ো পটাস্"—৷৷০
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "রক্তের ডাক"—১।০
মনোজ বসু প্রণীত নাটক "প্লাবন"—১।০
শশীভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত "এপারে ওপারে"—১৲
সরোজরঞ্জন চৌধুরী প্রণীত "বনযূথী"—১৲
বিধুভূষণ পাল প্রণীত "গীতামৃত"—১৲
পি সি সরকার প্রণীত "ম্যাজিক শিক্ষা"—।০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১০ আশ্বিন ইংরাজি ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে দুর্গোৎসব। সেজন্য কার্ত্তিক মাসের ভারতবর্ষও পূজার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গ্রাহকগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। **কার্ত্তিক** (October) সংখ্যা ৩১ ভাদ্র ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক কার্ত্তিক বিজ্ঞাপন কপি ১৮ ভাদ্র মধ্যে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বেদেনী

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

(শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)





ভারতবর্ষ



কার্ত্তিক—১৩৪৮

প্রথম খণ্ড | ঊনত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বাঙ্গলার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

কালীচরণ ঘোষ

যাহাদের অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখিবার কিছু নাই, তাহারা একপ্রকার সুখী। অতীত যাহাদের মহিমময় ছিল, বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা, দুয়ের তুলনায় তাহাদের বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, স্বাস্থ্য, শৌর্য্য প্রভৃতি লইয়া যাহাদের গর্ব্ব করিবার অনেক কিছু ছিল, তাহারা কালের গতিতে জাতির বিশেষত্ব হারাইয়া আজ দরিদ্রীভূত, অপমানিত; সুতরাং তাহাদের ক্ষোভের পরিমাণ অতিশয় গুরু।

গৌরবের যাহা কিছু নষ্ট হইলেই দুঃখের যথেষ্ট কারণ ঘটে, কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট তাহা অসহনীয় নহে। একদিন ছিল যখন শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান আহরণ করিতে, বংশগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে, অজানার সন্ধানে ছুটিয়া বাহির হইতে লোকে ধনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে, অবহেলায় রাজ্য-সুখ ত্যাগ করিয়াছে, স্পর্শমণি নদী-নীরে ফেলিয়া দিয়া মহা আনন্দ লাভ করিয়াছে। এই অবস্থার অবনতি ঘটায় প্রভূত ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতেও হয়ত জাতির অধঃপতন এত দ্রুত ঘটিত না।

যাহারা "খাইয়া পরিয়া" সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, জাতির ধনাগমের সুযোগ সৃষ্টি করে, তাহাদের ক্ষতি হইলেই সমূহ বিপদ। আর্থিক অভাব ঘটিলে, লোকে জীবনযাত্রার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং যাহাকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অন্ন-বস্ত্রের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহার পক্ষে কোনও গুরুতর চিন্তাশীল কাজ করা সম্ভব নহে। যাহা ব্যষ্টির পক্ষে প্রযোজ্য, সমষ্টিতে তাহাই প্রকাশ পায়।

বাঙ্গলার চারিদিকে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্প ছড়াইয়া থাকায় লোকের অন্নাভাব ত ছিলই না, উপরন্তু অর্থ-স্বচ্ছলতা ছিল। শিল্পী আপন জীবিকার্জ্জন করিয়া, আপনার কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য অপরের সহিত

প্রতিযোগিতা করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়কর চারুকলার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের সকল অভাব দেশের শিল্প দ্বারা মিটাইবার সুবিধা থাকায় সকলেই নানারূপ উন্নতির চেষ্টা করিয়াছে। কাপড়, রেশমী বস্ত্র, নীল, শর্করা, লাক্ষা, লাক্ষা-দ্রব্য, পশমী বস্ত্র, কারু-শিল্পদ্রব্য প্রভৃতির বিরাট পণ্যসম্ভার ইউরোপীয় বণিকেরা রপ্তানী করিয়া চালাইয়াছে।

সেই সকল শিল্প নষ্ট হওয়ায় লোকের দুর্দ্দশা বাড়িয়াছে। তাহা না হইলে ভারতের জাতীয় ঋণ অর্থাৎ ভারতবর্ষকে অপর শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে ইংরাজের যে ব্যয় হইয়াছে এবং ঋণ করিয়া তাহা মিটাইতে হইয়াছে, বিলাতের খরচ (Home Charges), রেলের সুদ (Guaranteed Railway), বাট্টার বিনিময়ে (exchange) ক্ষতি, সামরিক ব্যয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোট রাজস্বের শতকরা ৫৬ ভাগ (এই যুদ্ধের পূর্ব্বে কিছু কম), রাজকর্ম্মচারীর মোটা বেতন, বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্ষতি এবং যুদ্ধাদি ব্যাপারে "স্বেচ্ছায়" দান এবং মুখ্য ও গৌণ বা প্রত্যক্ষ বা গোপন কর দিয়াও ভারতবাসী আজ মরিত না। যে প্রভূত ধনসম্পদ ক্ষেত্রে, খনিতে, জলে, জঙ্গলে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয় বা ছড়াইয়া আছে, তাহার প্রকৃত ব্যবহার করিতে পারিলে, তাহা হইতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া পৃথিবীর বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলে যে অর্থাগম হইত তাহার তুলনায় ন্যায্য ও অন্যায্য যে বিরাট ব্যয় আমরা করিয়া থাকি তাহা কয়টা টাকা! অকাতরে ইহার ভার বহন করিয়া ভারতবাসী সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিত। কিন্তু শিল্পনাশ হওয়ায় আর তাহা সম্ভব হয় নাই।

শিল্পই শিল্পের জনয়িতা। একটী শিল্প গড়িয়া উঠিলে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুত করিবার জন্য আবার ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে হইলে দেশের মধ্যে লৌহ, ধাতব যন্ত্রাদি, কলকব্জা, কাষ্ঠ, রঙ, কয়লা প্রভৃতির কথা স্বতঃই মনে আসে। দেশের তৈল সম্পদ থাকিলে, বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ তৈলের নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিতে পারিলে তাহাও কাজে লাগিবে। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত সংশ্লিষ্ট কত প্রকার ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবল এই সম্পর্কে নূতন তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে কত প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অন্ন সংস্থান করিতে পায় এবং নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশের সুবিধা পায়, তাহার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেবলমাত্র টাটার কারখানা সম্পর্কে ধাতুমাক্ষিক ও কয়লার খনির মজুর হইতে রেল কোম্পানীর কর্ম্মচারী প্রভৃতি লইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিন লক্ষাধিক লোক কাজ পাইয়াছে। আজ ভারতবর্ষে চিনির কল উপলক্ষ করিয়া কেবল যে কারখানা সম্পর্কিত লোক অন্ন পাইতেছে তাহা নহে, ইক্ষু চাষে চাষী লাভবান হইয়াছে এবং কেবল তণ্ডুল ও তন্তু উৎপাদন ছাড়া অন্য কৃষির সন্ধান পাইয়াছে। আবার এই কৃষির উন্নতিকল্পে ইক্ষুর নূতন জাতির উৎপাদন ও অনুসন্ধানে, মৃত্তিকার বিশ্লেষণে, সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপারে লোকের কাজ জুটিয়াছে, খাইতে পাইতেছে।

যখন শিল্প লোপ পায়, যাহারা বংশানুক্রমে একটা ধারায় নিশ্চিত আয়ের পথ ধরিয়া থাকে, তাহারা অন্নহীন হইয়া পড়ে। কাজ জানা থাকিলেও ক্ষেত্রের অভাবে তাহারা বেকার। সূক্ষ্ম শাল জামিয়ার করিয়া যাহারা যশোলাভ করে, তাহারা শিল্পের অভাবে চাষী বা মজুর। দেশের অবস্থা ত এই। বিদেশ হইতে বিদ্যালাভ করিয়া, অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ঘরে আসিয়া, কাজ করিবার ক্ষেত্র না পাইলে তাহাদের বিপদ সমধিক। ইহাদের অনেকেই পঠিত বিদ্যায় পণ্ডিত; কারিগরী বা ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকিলে যে দুর্দ্দশা, তাহাতে ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত, অভিভাবক চিন্তাগ্রস্ত। এ দেশে যে শিক্ষাদান করা হয়, এই অবস্থা তাহাতে আরও প্রস্ফুট। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে, সুতরাং যেখানে সাধারণের জন্য ক্ষেত্র উন্মুক্ত সেখানেও ইহাদের ভিড় হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত কোনও সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাইলে পরম তুষ্ট। কাজের বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ নাই, বিদেশী আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত পুস্তক হইতে অধীত বিদ্যা দেশের মাটীতে অবান্তর। উন্নত কৃষি যেখানে প্রচলিত সেই সম্পর্কে যাহারা ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করিল, তাহারা এই পুস্তক-পঠিত পণ্ডিত অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেয়ঃ। সুতরাং শিল্প হইতে ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করিবার এবং পঠিত বিদ্যালাভ করিবার পর শিল্প ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিবার সুযোগ না থাকায় আজ ভারতবাসীর বিপদের অন্ত নাই। জগতের সভ্য জাতির

সহিত বাধ্য হইয়া "তাল" রাখিতে আমাদের প্রাণান্ত। এই বিপুল ব্যয়বহুল প্রাণঘাতী যুদ্ধের সহিত এই দরিদ্র ভারতবাসীর কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও আজ আমরা যুদ্ধরত।

এই অবস্থায় পড়িলে বুদ্ধি বিকৃত না হইয়া উপায় নাই। "আসন্ন বিপত্তিকালে" পুরুষের ধী মলিন হইয়াই থাকে; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার শক্তি লোপ পায়। যখন বাঙ্গালীর চেতনা ফিরিল, তখন রাজনৈতিক অবিচারের প্রতিবাদে অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। প্রতিবাদ যে আকারই ধারণ করুক, দেশের মধ্যে শিল্প গঠন করিয়া বিদেশী বর্জ্জনের জন্য তখন বাঙ্গালী বদ্ধপরিকর। সেই হাওয়া ভারতের বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় কাপড়ের কল, চামড়ার কারখানা, চীনা মাটীর বাসন প্রস্তুতের কারখানা, সাবান, দিয়াশলাই, কাচ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, প্রসাধন সামগ্রী, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স প্রভৃতি গড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব; আর অসমসাহসিক যুবকগণ "দেশ দেশান্তে নব নব জ্ঞান আনতে" বাহির হইয়া পড়িলেন। বিদেশী বর্জ্জন করিয়া যাহাতে লোকে ব্যবহারের জিনিষ পায়, তাহার ব্যবস্থা হইল এবং দেশের "হাওয়া ফিরিয়া" গেল। আজ একটা স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয় প্রতিষ্ঠান বা প্রদর্শনী দেখিলে লোকে বিস্মিত হয়, কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের ভারতীয় দ্রব্য ভাণ্ডার (Indian Stores) পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোকের তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

যত শিল্প প্রতিষ্ঠান জন্ম নিল, বলা বাহুল্য সকলগুলি টিকে নাই। কিন্তু সেই জাগরণের অনুভূতি বাঙ্গালীর এক বিশেষ সম্পদ; বাঙ্গালীকে আত্মবিশ্বাসী করিয়া তুলিবার সেই এক মহা সন্ধিক্ষণ।

এই গঠন যুগের দারুণ উত্তেজনার পর অবসাদই স্বাভাবিক। "মানুষ" হিসাবে জন্মলাভ করিবার যে যন্ত্রণা বাঙ্গালী ভোগ করিল, পরবর্ত্তীকালে তাহার প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষিত হইল। অনেকগুলি ব্যবসা অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বল্পকালের মধ্যে লোপ পাইল। লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং সাধারণের মনের মধ্যে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তাহা ছাড়া এই উন্মাদনার মূলে যে সকল বাঙ্গালী যুবক কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ রাজনৈতিক অপরাধে বিচারে দণ্ডিত হইলেন, আর বিনাবিচারে তাঁহাদের বহুগুণ সঙ্গী বৎসরের পর বৎসর বন্দী হইয়া রহিলেন। বাঙ্গালীকে যাহারা গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহাদের অভাব বাঙ্গালীকে পঙ্গু করিতে বসিল। এই প্রসঙ্গে আমার আরও একটী কথা মনে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে বহু যুবক রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্য দিয়া সেবাকার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহারা যে দেশের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; কিন্তু সমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত, ত্যাগী, সংযমী, কর্ম্মকুশল যুবকসকল সরিয়া যাওয়াতে যাঁহারা পড়িয়া রহিলেন তাঁহারা ঐ সকল "সন্ন্যাসী"দের নিত্য সাহচর্য্য এবং প্রভাবের অভাবে ঠিকমত নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না।

প্রশ্ন অনেকেই করিয়াছেন, "এই সন্ন্যাসীর সংখ্যা কত? বাঙ্গলার জনসংখ্যার তুলনায় এই আটক বন্দী মাত্র কয় জন? তাঁহারা কয় জন সরিয়া গেলেই জাতি গড়িয়া উঠিবার যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে ভালই হইয়াছে।" তাহাদের উত্তরে বলা যায়, জাতির যখন অধোগতি আরম্ভ হইয়াছে তখন এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা তাহাদের মধ্যে কখনই বেশী থাকে না, সুতরাং যে কয়জন গেলেন তাঁহাদের অভাবই জাতির প্রকাণ্ড ক্ষতি।

অসহযোগ আন্দোলন ও পরে নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন বাঙ্গালীকে মাতাইয়াছে; বাঙ্গলা হইতে বন্দী সংখ্যা সকল প্রদেশ হইতে বেশী। কিন্তু বাঙ্গলা স্বদেশী যুগের পন্থা ছাড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। শিল্প সৃষ্টির দিকে আর মন দিল না, কারণ নেতৃবর্গ তখন বড় কারখানার বিরুদ্ধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিলেন। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী যতটা এই বাণী পালন করিল, আর কেহ করিল না। বোম্বাই, আহম্মদাবাদ, মাদ্রাস, কানপুর, নাগপুর, এমন কি বিহারও ধীরে ধীরে বৃহদাকার শিল্পের দিকে মন দিল। যাঁহারা একেবারেই কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নন, বা বিরুদ্ধমতবাদী, তাঁহারা বাঙ্গলায় কয়েকটী মাত্র মধ্যমাকার শিল্পের অবতারণা করিয়াছেন। একটী এনামেল, একটী মাণ্টেল্ (mantle), একটী বেল্টিং (belting) দুটী সেলুলয়েড, একটী বাঘ প্রভৃতির কারখানা দেখিলে চলে না।

পাট, কাপড়, পশম, লৌহ, চিনি, ষ্টার্চ্চ, সিমেণ্ট, কাগজ প্রভৃতি মিলিয়া যাহা বাঙ্গালার বাহিরে এবং বাঙ্গলাতেও গড়িয়া উঠিল, তাহাতে বাঙ্গালীর স্থান নাই। বড় লৌহের কারখানা, রবার দিয়াশলাই, expanded metal, শিরিষ কাগজ, টার্পিন নিষ্কাসনের কারখানা, সেলায়ের কল (বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত) প্রভৃতি যাহা বর্ত্তমানে উঠিতেছে তাহাতে বাঙ্গালীর স্থান নাই। এরূপ শিল্প ছাড়া অর্থাগমের যে পথ অর্থাৎ দালালী, অভ্রের কাজ, কয়লার খনি, জমি ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি নানা উপায় বাঙ্গালীকে অর্থ দিল না। কেরাণীগিরি, আইন ব্যবসায়, ডাক্তারী, মাষ্টারী প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গালী আত্মভোলা রহিল। আয় যাহাদের নাই বা আয়ের নূতন পথ উন্মুক্ত হইতেছে না, তাহাদের নিকট করভার খুবই বেশী লাগে।

বাঙ্গলায় যে হাওয়া উঠিয়াছিল, জাতি গঠনের জন্য যে উদ্দীপনা বাঙ্গালীকে জগৎ সভায় স্থান দিবার উপযুক্ত করিতেছিল, আজ যেন তাহার কোনই চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। কেমন যেন ভাঙ্গন ধরিয়াছে, চিন্তার ধারা তরল হইয়াছে, কর্ম্মশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, ত্যাগে বিভীষিকা উপস্থিত। মুখর বাঙ্গালী মুখরতর হইয়াছে, “বিবৃতি ব্যাধি” সকলকে পাইয়া বসিয়াছে। যে সকল চিন্তা বা কাজ যুবক সম্প্রদায়কে জাতীয়তার মন্ত্র হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে, দিকে দিকে তাহারই লক্ষণ সুস্পষ্ট।

শুনিতেছি, বাঙ্গালী বাস্তবকে বাদ দিয়া জাতি গড়িতে গিয়াছে, তাহাতে সফলকাম হয় নাই; সাহিত্য বাস্তবতা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল, তাহাতে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু “স্বদেশী” যুগে যে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, যে কবিতা ও কাব্য জাতিকে ভয়লেশহীন করিয়াছিল পরে সে সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আইন আন্দোলন বাঙ্গলার কৃষ্টির সহিত সংযোগ স্থাপিত করিতে পারে নাই বলিয়া উল্লেখযোগ্য একটা গানও সৃষ্টি হয় নাই।

জীবনের সকল দিকে স্ফুর্ত্তির প্রয়োজন কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল নারীর প্রতি আকর্ষণ ও তাহার সাহচর্য্য লাভই কি জীবনের বাস্তবতা? পরার্থে ত্যাগ, কর্ম্মে নিষ্ঠা, লোভে সংযম, বিপদে ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অকপট প্রেম, জননীর স্নেহ, নারীর পতিভক্তি ও সতীত্ব, প্রবলের অত্যাচারে অটলতা, ন্যায় সত্যে বিশ্বাস প্রভৃতি গুণ কি বাস্তব নয়? বহু সহস্র ঘটনা আমাদের অগোচরে নিত্য ঘটিতেছে, নিত্য মানব জয়ী হইতেছে, তাহার সংবাদ কয়জন রাখে?

জাতীয় জীবন গড়িতে হইলে তাহার কোথাও দুর্ব্বলতার স্থান নাই। যে সকল কাজ চিত্ত বিক্ষোভ উপস্থিত করে, তাহাকে দূরে রাখাই এক মাত্র উপায়। নারী বাদ দিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র থাক্, প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল উদ্দেশ্যে, জাতির কল্যাণকর কাজের সুবিধার জন্য যতটুকু মাত্র যোগাযোগ প্রয়োজন তাহাই বাঞ্ছনীয়; আজ মাত্রা পার হইয়া যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা বাঙ্গলার মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্তার কারণ। পুরুষ চায় নারী জীবনের অনুকরণ; চাল-চলন, প্রসাধন সবই এখন ক্লৈব্যের লক্ষণ প্রকাশ করে। “পরশুরামে”র কুঠারাঘাত সহ্য করিয়া “পেলব রায়, লালিমা পাল (পুং)” তাহাদের “সংসদের” সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছে। কঠোর জীবনযাত্রা যেখানে নিত্য সহচর, জাতির মেরুদণ্ড যেখানে শক্তিশালী হওয়া দরকার, সেখানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত “ভবানন্দ” চরিত্রের কথা ভুলিলে চলিবে না। প্রতি যুবককেই “জীবানন্দ” আর “শান্তি” মনে করিলে ভুল করাই হইবে।

বাঙ্গালীর জীবনে বিলাসের প্রতি যে মোহ ফুটিয়াছে, তাহা শুভলক্ষণ নহে। যাঁহারা জাতিকে আবার পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, তাঁহাদের এই বিলাস অশোভনীয়।

সিনেমার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু যেখানে জাতি-গঠনের উপযোগী উপাদানের অভাব, তাহা মহা অনিষ্টকর। বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল করিবার এত বড় সুযোগ পূর্ব্বে ছিল না। আজ কাল দূর পল্লীর মধ্যেও ইহাদের স্থান জুটিয়াছে। অশোক, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, বিজয় সিংহ, আকবর, মীরকাসিম, রাজা গণেশ প্রভৃতির জীবনেতিহাস আলোচনা করিবার ইহাতে সুযোগ আছে কি? যাহাদের অনুকরণে আমরা তরল আনন্দে মত্ত হইতেছি, তাহারা স্বাধীন জাতি; তাহারা যে সিনেমা দেখে, আমাদের দেশে তাহা রাজদ্রোহ। অবনতির সুযোগ যাহাতে ঘটে, আমরা সেই সিনেমাই কেবল দেখিতে পাই।

রেডিওতে মাতিয়াছি, কিন্তু তাহাতে যে গান অনবরত শুনি, তাহাতে ভাববিলাস আছে। তাহারা কি বলিতে দেয় “একলা চল রে”, “কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে এস

কে কেঁদেছ নীরবে", "যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে", "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" ? গানের নিদ্রালুতা আনিবার শক্তি আছে। যে জাতি বহুকাল বাদে জাতীয়তার শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিতেছিল তাহাকে ঘুম পাড়াইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সকাল হইতে গানের সুর স্নায়ু, শিরা, উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করিয়া ভাববিলাসে ক্রমশঃ ডুবাইয়া দেয়।

বাকী আছে সিনেমার ঐ বাঁধাধরা censor ; অধঃপতন পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে ঐটুকু তুলিয়া দেওয়া দরকার। বাস্তব জীবনের যাঁহারা রূপ চান, তাঁহারা এ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন করিতে পারেন।

জাতি কিসে দুর্ব্বল হয়, তাহা জানে জাতির কল্যাণ-কামী যাহারা। যে জাতি বড় হইতে চায়, তাহা জন-সাধারণের মধ্যে দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেয় না। হিটলার নগ্নবাদ (nudism) বন্ধ না করিলে জার্ম্মানী কখনই এত পরাক্রমশীল জাতি হইতে পারিত না। এত দিনের স্বাধীন জাতি ফরাসী, নানা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিয়া, সাত দিনও জার্ম্মান আক্রমণ রোধ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী কি ফরাসী জাতির গুণের শতাংশের একাংশও অধিকার করে ?

নৈতিক চরিত্রের প্রতি অবজ্ঞা আজ বাঙ্গালীর এক মহা সমস্যা। যাঁহারা নৈতিক চরিত্রের কোনও দাম দিতে চান না, ভ্রষ্ট হইয়াও বড় হইতে পারেন, তাঁহাদের আদর্শ জাতির সমস্ত লোকের কাম্য হইতে পারে না। সকল ব্যাপারেই, বিশেষতঃ সাধারণের অর্থ যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে নৈষ্ঠিক সততা পালন করাই শ্রেয়ঃ।

আজ শতকরা দশজন মাত্র "শিক্ষা" লাভ করিয়াছে, তাহাতেই জাতির মঙ্গলের জন্য যে দাবী উঠিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রপারের রাজশক্তির সময় সময় নিদ্রার ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে। যাঁহারা জাতিকে নবরূপ দিতে চান, জনশিক্ষা তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতির তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন ; নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে এবং দৈনিক পত্রিকাদি হইতে ভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা জানিতে পারিলে নিজেরাই আন্দোলন সুরু করিবে, রাজ্যশাসনের ভার লইবার কর্ম্মপন্থা আবিষ্কার করিবে। যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সজীব থাকিবে, তাহারই শক্তি বৃদ্ধি হইবে। যাঁহারা রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া শাসন সংস্কার আনিতে চান, তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অঙ্গ নহে, কিন্তু নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে জনশিক্ষার বিস্তার তাঁহাদের কর্ম্মতালিকায় স্থান থাকা দরকার।

জনসেবার দিক ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। যাঁহারা দেশের কল্যাণ চান, বিপদে আপদে সেবা সাহায্য তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র। "স্বদেশী যুগে" যে সকল যুবক সাধারণের মনে নূতন ভাব ধরাইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা প্রতিপত্তি লাভ করেন। সাধারণ লোকে দেশাত্ম-বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল তাহা নহে। সেবা দ্বারা প্রতিষ্ঠালব্ধ যুবকদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছে। দুঃসময়ে, রোগে সাহায্য ও সেবার কথা লোকে শীঘ্র ভুলিয়া যায় না ; সুতরাং যাহারা রোগে, গৃহদাহে, দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, পর্ব্বাদি উপলক্ষে জনসমাগমে অক্লান্ত সেবাদ্বারা প্রিয় হইয়া উঠে, সমাজে তাহাদের স্থান রাজপুরুষদের উপরে। এখন এই সেবাধর্ম্ম আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ধর্ম্মকার্য্য না হউক, দেশ-সেবার সুবিধা হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

সর্ব্বশেষে আমার প্রথম বক্তব্যের কথা বলিব। অর্থহীন জাতির পক্ষে জীবন এক বিড়ম্বনা। জাতির আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের আবার স্বদেশী যুগের কথা আসিয়া পড়ে। সকলের আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়, তাহার চেষ্টাই এখন প্রধান কাজ। এই সম্পর্কে কুটীর শিল্পের বিষয় আলোচনা চলিতেছে। উপায় করিয়া দিতে পারিলে খুবই শুভ, কিন্তু দেখা দরকার আমরা ভুল পথে চালিত হইতেছি কি না।

পূর্ব্বের দিনের কুটীর শিল্প বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আজ আর চলিতে পারেনা, সুতরাং সম্পূর্ণভাবে তাহা গ্রহণ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আজ কারখানার যুগ, যেখানে তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সেখানে টিকিয়া থাকা কষ্টকর। যে সকল বস্তু স্থানীয় প্রয়োজনে লাগিয়া যাইবে, যে সকল বস্তু বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য, কারু-কার্য্যের জন্য কারখানায় প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নয়, বা রুচি অনুযায়ী সংখ্যায় দু একটী প্রয়োজন সেই সকল জিনিষ কুটীরে প্রস্তুত সম্ভব। শিক্ষা দিতে পারিলে ইহা ছাড়া গুটী পালন, রেশমের কাজ, দড়ি পাকানো, নানাপ্রকার কৃষির যন্ত্রাদি,

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রভৃতি ও আয়ের পন্থাস্বরূপ হইতে পারে। কিন্তু মূল কথা, যে সকল শিল্প বড় কারখানা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ হয় কতক প্রস্তুত দ্রব্য কলে ব্যবহৃত হয় বা কলে প্রস্তুত দ্রব্যাদি কুটীরে বসিয়া সম্পূর্ণ আকার দেওয়া যায়, সেই সকলই টিকিয়া থাকিবে, আয়ের সুযোগ করিয়া দিবে। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে পুরাতন প্রণালীতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত আজিকার দিনে অচল। যথোপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্য না লইলে উৎপন্ন মালের পরিমাণ কম হইবে এবং যেরূপ গুণসম্পন্ন ও দৃষ্টি মধুর হইলে বাজারে চলিবে তাহা হওয়া সম্ভব হইবে না।

সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও কিছু ব্যয়সাধ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব। ইহাদের জন্য বৈদ্যুতিক বা অন্য শক্তি প্রয়োজন এবং প্রধানতঃ কলকারখানায় প্রস্তুত যে মাল হইতে পরে তাহার ভিন্ন রূপ দিয়া ব্যবহারোপযোগী করা যাইবে। কাচ দ্রব্যাদি, কলম পেন্সিল, চামড়ার কাজ, লেস, মোজা গেঞ্জি, রবার, সেলুলয়েড, কাগজ মণ্ড প্রভৃতির খেলনা ও অন্য দ্রব্যাদি, সাবান, কল ও অন্যান্য সংরক্ষিত দ্রব্যাদি প্রভৃতি বহু শিল্পের পথ পড়িয়া আছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এ সকল শিল্প জাতির বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় করিয়া দিবে। যাহা না হইলে জাতি গড়িয়া উঠিবে না, যে আয়ের পথ বিদেশী বণিকের দুরভিসন্ধিতে এবং বাঙ্গালীর ভুল পথ অবলম্বন করায় নষ্ট হইয়াছে, তাহার পুনর্গঠন অচিরে প্রয়োজন।

যাঁহারা দেশের স্বাধীনতাকামী অথচ রাজশক্তির সহিত সঙ্ঘর্ষ করিবার সাহস রাখেন না বা বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তাঁহারা শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠন, বিলাসিতা ও লঘু আমোদ বর্জ্জন ও শিল্প স্থাপন দ্বারা জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে পারেন। তাঁহাদের এ কার্য্যে "বাহবা" নাই, কিন্তু জাতির প্রকৃত মঙ্গল নিহিত আছে।

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বঙ্গমাতায় করিয়াছ তুমি বিশ্বে ভীষ্মজননী,
তোমার কীর্ত্তি-ঘোষণা ঘেরেছে সসাগরা-দ্বীপ-ধরণী।
তব প্রেম-প্রীতি রুদ্র রসায়নে
তাহারই চিন্তা শয়নে-স্বপনে
কর্ম্মই তব ধর্ম্ম জীবনে পরহিতব্রত বীর,
বাণী-সাধনায় উগ্রতাপস তব নামে নত শির !
বিজ্ঞানে তুমি জ্ঞান-সম্রাট্
সাহিত্যেও তব প্রতিভা বিরাট্
দেশাত্মবোধের ধ্যানরত ঋষি দশ ও দেশের প্রাণ,
আপনার ব'লে যাহা কিছু তব করিয়াছ তাহা দান !
তুচ্ছ বিত্তে তুমি বীতরাগ
দেশের সেবায় চির অনুরাগ
শিক্ষাদানের বৃত্তিটুকুও দিয়াছ পরের তরে,
যেতে ভয় পায় তোমার সেবায় কুবের ভক্তিভরে।
তব দ্বারে ফেরে ত্যাগের প্রহরী
ত্যাগেই তোমার আনন্দ-লহরী
চিরানন্দময় পুলকে শিহরি মত্ত দেশের কাজে,
ধনের দ্বারেতে দ্বারবান যার মাথা নত করে লাজে !
দেশকে শিখালে ডেকে ডেকে সবে
আপনার পায়ে দাঁড়াতেই হবে
ভিক্ষায় কভু নাহি পাওয়া যায় পাইবার যাহা ভবে,
মেরুদণ্ড তব ন্যুব্জ হয়ে থাকে ঋজু কর তাহা তবে।
কীর্ত্তিতে তব অনন্ত জীবন
তারি জয়গান গায়িছে চারণ
হে বিদ্যাবিলাসী, হে চির-সন্ন্যাসী চিরায়ু বিজয়ী বীর,
জয়ন্তী-গাথায় ভক্তের তব চরণে নমিত শির।

শাশ্বত যৌবন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

টালিগঞ্জের বিজনপ্রান্তে পাশাপাশি দুইখানা অতি ক্ষুদ্র বাড়ী উঠিতেছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহাদের মালিক বিভিন্ন হইলেও বাড়ী দুইখানি হুবহু একরকম। দুই বাড়ীর ঠিকাদার বিভিন্ন, মালিক বিভিন্ন—অথচ এরূপ কি করিয়া হইতে পারে একথা লইয়া পাড়ার অনেকেই অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন—যুক্তিতে কিছুই হয় নাই, কেবল নূতন প্রতিবেশীদিগের সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়িয়াই গিয়াছে।

বাড়ী সম্পূর্ণ হইবার অল্পকাল পরেই একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন—বয়স তাঁহার প্রায় ষাট, সঙ্গে একটি প্রৌঢ় বিশ্বস্ত চাকর। এইমাত্র—বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নাই। ভদ্রলোকের নাম ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী, চেহারা দেখিলেই বোঝা যায়, সারাজীবনের কর্ম্মান্তে আজ নিরবচ্ছিন্ন অবসর ভোগ করিবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, পক্ক শুভ্রকেশ ও শীর্ণ দেহের মাঝে বাঁচিবার মত প্রাণবস্তু আজিও আছে।

কিছু দিন পরে পাশের বাড়ীতেও প্রতিবেশী আসিলেন। চিরকুমারী, বয়স তাহার পঞ্চাশের উর্দ্ধে সন্দেহ নাই, কাঁচাপাকা চুল ও মুখের শিথিল চর্ম্মের মাঝে সারাজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনের একটা সুস্পষ্ট ছাপ—যৌবনে একদিন তাহার উজ্জ্বল বর্ণ হয়ত অতি সুন্দরই ছিল, কিন্তু আজ তাহা কালের প্রভাবে ম্লান। বিগত দিনের সৌন্দর্য্যের সাক্ষীস্বরূপ দেহখানা আজও ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভের মত সগৌরবেই দাঁড়াইয়া আছে—নাম তাহার মিস্ নীতি মজুমদার। তাঁহারও সঙ্গে বর্ষিয়সী একটি বিশ্বস্ত দাসী।

নূতন বাড়ী দুইখানির অধিবাসী সম্বন্ধে এই সংবাদ পাড়ায় প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশীগণের সমস্ত কৌতূহল নিঃশেষে উবিয়া গেল—কেহ আলাপ করিতেও আসিলেন না।

ভবানীবাবু প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়া ছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া কাগজটির আপাদমস্তক পড়িয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। দূরদিগন্তের গায়ে সঞ্চিত বর্ষণোন্মুখ ঘনশ্যাম মেঘ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুচালিত হইয়া ছিন্নভিন্ন মেঘ সহসা পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়িল। ভবানীবাবু তাহাই দেখিতেছিলেন, সামনের বৃক্ষপত্রে, পথের কঙ্করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া ফাটিয়া যাইতেছে—আজিকার দিনে জীবনের সমগ্র নিঃশব্দতা যেন তাহাকে মেঘের মত ঘিরিয়া ধরিয়াছে। শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া জীবনের অতিক্রান্ত পথ, তাহার সুখ দুঃখ সবই যেন হাস্যকর বলিয়া মনে হয় যৌবনের প্রারম্ভে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিষ্পীড়নে, কৃচ্ছ্রসাধনায় দেহে তাঁহার স্বাভাবিক যৌবনের স্বচ্ছন্দতা আসে নাই—সেদিনের সেই একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা আজিকার মতই নিবিড় বেদনাময়—তাহার পর বিবাহিত জীবনের মাঝে শয্যাপার্শ্বে, নিজের গৃহস্থালীর মাঝে সহধর্ম্মিণীর, প্রীতি শ্রদ্ধা সেবার মাঝেও এই নিঃসঙ্গতা নিবিড়তর হইয়া বার বার তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে—আর আজ বার্দ্ধক্যের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া একাকী তিনি অতিক্রান্ত পথের পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাসই নিক্রান্ত করিতেছেন। তাঁহার মন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত ব্যসনবৃত্তি চিরদিন একাই বহিয়া গিয়াছে। যৌবনের সেই জীবনযুদ্ধের মাঝে পরিচয় হইয়াছিল একটি নারীর সহিত, যাহাকে না-পাওয়াই তাঁহার জীবনকে অতৃপ্ত স্বপ্নময় করিয়া রাখিয়াছিল—কিন্তু তাঁহার সবখানিই অর্থহীন হাস্যকর হইয়া আজ তাঁহাকে আরও একা করিয়া তুলিয়াছে।

অকস্মাৎ চাহিয়া দেখেন, পাশের বাড়ীখানা হুবহু তাহারই বাড়ীর মত, ওই বাড়ীর মালিকের সহিত পরিচয় করিবার কৌতূহল তাঁহার অদম্য হইয়া উঠিল। বৃষ্টি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাতা মাথায় দিয়া তিনি পাশের বাড়ীর কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। ভিতর হইতে দাসী দরজা খুলিয়া প্রশ্ন করিল, কা'কে চাই ?

—বাড়ীর মালিককে ?

—কেন ?

—এমনি, এই পাশের বাড়ীই আমার, আলাপ করব তাই।

ভবানীবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া ছিলেন। মিস্ নীতি আসিয়া নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, পাশের বাড়ী আপনার?

ভবানীবাবু নমস্কার করিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, আপনি? মিস্ নীতি—

—আপনি? ভবানীবাবু।

ভবানীবাবু হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, অদৃষ্টের কি পরিহাস! এমনি ক'রে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আপনারই সঙ্গে দেখা, আর পাশাপাশি একই রকম দু'টি বাড়ীর মালিকরূপে?

মিস্ নীতি বলিলেন, আশ্চর্য্য হবারই কথা। এমনি ক'রে আপনার প্রতিবেশী হ'তে হবে কোন দিন স্বপ্নেও ত ভাবিনি!

মিস্ নীতি বসিয়া বলিলেন, ভালই হ'ল আমি ত একাই এবাড়ীতে থাকি, তবুও—

—আমিও ওই বাড়ীতে নিরম্বু একা।

—সে কি? আপনি ত বিয়ে করেছিলেন, আর—

—একটি ছেলেও হয়েছিল, খোকা এখন বাঁকুড়ায় সাবডেপুটি। তারও একটি ছেলে হয়েছে দেড় বছরের হবে।

—আপনার স্ত্রী?

—বছর দশেক আগেই পাড়ি দিয়েছেন। কেন? আপনি বিয়ে—

—না। বাড়ীর সাম্‌নে নামটা আর তার আগে 'মিস্' লেখা দেখেন নি?

—হয়ত লক্ষ্য করিনি, কিন্তু কেন?

মিস্ নীতি একটু হাসিয়া জবাব দিলেন, কেন বল্‌তে হ'লে অনেক ভাবতে হবে। সম্ভব হয়নি, সুযোগও আসেনি, আর প্রয়োজনও হয়নি। তা আপনি বাঁকুড়ো থাকেন না কেন?

ভবানীবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওই মানুষের মনের জ্বালা, তারা নিজের মনের অতৃপ্তিকে কিছুতেই ভুল্‌তে পারে না। সারাজীবন পরিশ্রম ক'রে যা সঞ্চয় করেছিলাম তা দিয়ে একটা-বাড়ী তৈরি ক'রে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাবো এই ছিল সারাজীবনের আশা—সে আশা আজ সফল হয়েছে, তার আগে ত ভাবিনি এখানেও একাই দিন কাটাতে হবে—

মিস্ নীতি বলিলেন, এমনি ইচ্ছেটা আমারও হ'ল কি ক'রে? সারাজীবনের সঞ্চয় আমি ত একই রূপে অপব্যয় ক'রেছি—

—অপব্যয়?

—হ্যাঁ, এতদিন কর্ম্মের মাঝে নিজের নিঃসঙ্গতা বুঝিনি, আজ একা একা সেটা বেশ বুঝছি—মর্ম্মান্তিক ভাবে।

—একাকীত্ব দূর করতেই কি তা হ'লে আমাদের দেখা—এমনি অকস্মাৎ?

—বয়স যখন অর্দ্ধশতাব্দী পার হ'য়ে গেছে?

—হয় ত তাই।

ভবানীবাবু ও মিস্ নীতি উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন।

বিস্মৃত পরিচয় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নবীন ও নিবিড় হইয়া উঠিল। নিরবচ্ছিন্ন অবসরে একক জীবনের মাঝে উভয়েই উভয়ের নিকট অপরিহার্য্য। সকাল বিকাল ভ্রমণ, সান্ধ্য আড্ডা, সকালের সংবাদ আলোচনা উভয়ে এক সঙ্গেই করেন।

সেদিন সন্ধ্যায় অতীত পরিচয়-প্রসঙ্গে ভবানীবাবু বলিলেন, আপনার যে ভাইকে আমি পড়াতুম, সে কোথায়?

—আজকাল গোরক্ষপুরে চাকুরি করে। বাবা-মা মারা যাওয়ার পরে একা একাই ত এখানে চাকরি করতে হয়েছে, তার আসার সময়ও নেই, প্রয়োজনও হয়নি। আজ বার বৎসর সে বাংলায় আসে না, সম্ভবত আমি বেঁচে আছি কি-না তাও জানে না—

ভবানীবাবু বলিলেন, প্রথম যেদিন আপনাকে দেখ্‌লুম, আপনি বৈঠকখানার দরজা খুলে দিয়ে বল্লেন, 'বসুন, খোকা আস্‌ছে।' সেদিন আপনার মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'য়েছিল—কি সুন্দর! অমনি সুন্দর আর কাউকে কখনও দেখিনি—

মিস্ নীতি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তখন আমি ত বি.-এ. পড়ি, বয়স বোধ হয় কুড়ি, না? একেবারে অসুন্দর ছিলাম একথা বল্‌তে পারবেন না—

ভবানীবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, অসুন্দর দেখ্‌লে ত বিড়ম্বনাই হ'ত না।

—বিড়ম্বনাটা আবার কি?

—রোজই আশা ক'রে যেতুম, আপনি দরজা খুলে দেবেন—একটু দেখ্‌ব চুরি ক'রে, তা হয় সেই শুট্‌কো ঝি টা, না হয় খাজা চাকরটা দরজা খুল্‌ত—যা রাগ হ'ত—

ভবানীবাবু হাসিলেন, মিস্ নীতিও হাসিয়া বলিলেন, বেশ ওরা থাক্‌তেও আমি যে চা দিতে যেতাম সেটা বুঝি দেখলেন না!

ভবানীবাবু কাঁচাপাকা চুলের মাঝে লোলচর্ম্মাচ্ছাদিত নীতির মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন, সেজন্যে আজও ধন্যবাদ জানাই—তখন লজ্জায় দুর্ব্বলতায় জানাতে পারিনি, আপনাকে দেখ্‌লেই কেন. যেন বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করত—

নীতি পরিহাস করিলেন, বাঘ দেখ্‌লে যেমন হয়?

—প্রায়।

ভবানীবাবু আবার হাসিয়া উঠিলেন; নীতি বলিলেন, আজ সেকথা বলতে ভয় ক'রছে না?

—না, আজ আর কি? আপনিও ভাববেন না যে আমি প্রেমে পড়েছি, আমিও ভাবব না যে একটু কিছু বল্‌লেই আপনাকে অসম্মান করা হ'বে। আজ সে বয়স ত আর নেই।

নীতি আবার বলিলেন, সাহসটা আপনার হ'ল এই অসময়ে! চা দিতে গিয়ে ভাবতুম আপনি আলাপ করবেন, গল্প করবেন কিন্তু কেবল বুকই ধড়ফড় করত আপনার—

ভবানীবাবু ব্যঙ্গ করিলেন, কেন আপনার? আপনি ত আলাপ করতে পারতেন ভাল ক'রে—আমি আপনাদের চাকর তখন, কাজেই বেশী স্পর্দ্ধা—

—আমি ত আলাপ করতামই!

—আমিও ত করতাম।

আবার দুইজনে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। নীতি বলিলেন, কলেজে যাবার সময় প্রায়ই আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত।

ভবানীবাবু স্বীকারোক্তি করিলেন, দেখা হ'ত নয়, আপনাকে দেখবার জন্যেই রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম, শুধু তাই রোদ বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রেই—

নীতি বিগত যৌবনের মদির চাহনির অক্ষম অনুকরণ করিয়া কহিলেন, আমাকে ভালবেসেছিলেন?

—বাঃ আজ সে কথা বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি? সেদিন আপনি বোঝেন নি?

—বুঝতাম বটে, আবার মাঝে মাঝে সন্দেহও হ'ত।

—কেন?

—ওই আপনার বুক ধড়ফড়ানির জন্যে, ভাবতাম উপেক্ষা, তাই অভিমান হ'ত।

—হ'ত?

ভবানীবাবু শুভ্রকেশের মাঝে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তা হ'লে ত আপনিও ভালবেসেছিলেন!

নীতি স্মিতহাস্যে বলিলেন, আপনি তা বুঝতেন না?

—ওই আপনার মতই সন্দেহ হ'ত।

নীতি ইজিচেয়ারটায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধ শায়িত হইয়া বলিলেন, ওই ত আপনাদের দোষ, কেন? যেদিন গভীর রাত্রে আপনি ছাতে সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেদিন আমি থাম্‌কা ঝুলা-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, তাতেও বোঝেন নি?

—আমি ভেবেছিলুম, আপনার খুব গরম লেগেছে, তাই—

—আপনি ভারী ভীতু—

—আপনারই বা সাহসটা কোথায়?

পুনরায় দুইজনে হাসিয়া উঠিলেন। ভবানীবাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, তখন কি ভাবতুম দিবারাত্রি জানেন? না, সেকথা বল্‌লে হাস্‌বেন আপনি?

নীতি আগ্রহের সঙ্গেই বলিলেন, আজ আর হাসব কেন? সবই ত ছেলেখেলা—

—তখন ভাবতুম, আমি না হয় যেমন তেমন একটা চাকরি পেলাম, আপনি চাকরি ক'রে পাবেন প্রায় একশো, আমি ধরুন পঞ্চাশ, দু'জনে ছোট্ট এমনি একটি বাড়ীতে থাক্‌ব, দু'জনের দিন যাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে—আমি না হয় কবিতাই লিখ্‌ব দু-চারটে—

নীতি হাসিয়া বলিলেন, আমিও ভাবতুম, চাকরি আজ আপনার নেই, পরে ত হবে, না হয় দু'জনেই চাকরি করব। তা আপনি ত ভীতু—

ভবানীবাবু নীতির কৌতুক বুঝিয়া বলিলেন, বেকার হ'য়ে কেমন ক'রে বি-এ. পড়া মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব করা যায়?

—আর মেয়েমানুষেই বুঝি প্রস্তাব করে—

ভবানীবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, তা যদি হ'ত! কত কষ্টে খোকাকে মানুষ করেছি ওর মা ম'রে গেলে—তা হ'লে আজ ত দু'জনে বাঁকুড়ো থাকতুম—

নীতি হাসিয়া বলিলেন, বর্দ্ধমানেও হ'তে পারত, কিন্তু এ বাড়ীর কি হ'ত—

ভবানীবাবু রসিকতা করিলেন, একটার উপর আর একটা উঠে বড় বাড়ী হ'ত—

সেদিনের সান্ধ্য আড্ডা এখানেই শেষ হইল।

কিছুদিন পরে—

সকালের আড্ডাটা বসিত ভবানীবাবুর ওখানে, আর সন্ধ্যারটা মিস্ নীতির ওখানে। সকালে সেদিন মিস্ নীতির আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ভবানীবাবু চাকরকে আদেশ দিলেন—দ্যাখ ত তাঁর আস্তে দেরী হ'চ্ছে কেন?

চাকর কিছুক্ষণ বাদেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি আস্ছেন।

নীতি আসিলে ভবানীবাবু একটু অভিমানের সুরে বলিলেন, বেশ, আসতে এত দেরী করতে হয়! এতক্ষণ কি কষ্টেই কেটেছে, কেবল রাস্তার দিকে তাকাচ্ছি—

নীতি হাসিয়া বলিলেন—ছিঃ এই বয়সে মানুষে এ সব শুন্‌লে কি বলবে?

ভবানীবাবু তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, কি বলবে? আজ আমরা প্রতিবেশীর সমালোচনার বাইরে, তা না হ'লে আমরা যে আলোচনা করি তা কি করা সম্ভব হ'ত?

—তা কতটুকু দেরী হয়েছে যে একেবারে—

—কতটুকু! একঘণ্টা ত হবেই। আচ্ছা যাক্, কাল সারারাত্রি কি ভেবেছি জানেন?

—না, অতটা জানা সম্ভব নয়।

—আমার আর আপনার বাড়ী একরকম দেখ্‌তে হ'ল কেমন ক'রে! এ বাড়ীর প্ল্যান ত আমি যৌবনের প্রারম্ভে রচনা করেছিলাম। আপনার ঘর কোন্‌টা জানেন? ওই দোতলার দক্ষিণেরটা।

—এ প্ল্যানটা ত আমারও নিজের—তবে একদিন খুব বৃষ্টির রাত্রে আপনি বেরুতে পারলেন না, আমি, বাবা, আপনি, খোকা মিলে একটা আদর্শ বাড়ীর সম্বন্ধে খুব আলোচনা চল্‌ল—

ভবানীবাবু সোৎসাহে বলিলেন, আমারই সেই প্ল্যান চুরি করা হয়েছে, তাই—

—চুরি!

—ওই যাকে না ব'লে নেওয়া বলে।

ভৃত্য চা দিয়া গেল। ভবানীবাবু একটা মোটা চুরুট ধরাইয়া খবরের কাগজটার উপর নির্লিপ্তের মত চোখ বুলাইতে ছিলেন। মিস্ নীতি বলিলেন, ওই ত আপনার দোষ, অত চুরুট খাওয়া কেন? গন্ধে টেঁকা যায় না—

হোঃ হোঃ করিয়া খুব খানিক হাসিয়া লইয়া ভবানীবাবু বলিলেন—ওই জন্যেই খোকার মা'র সঙ্গেও নিত্য ঝগড়া হ'ত।

অকস্মাৎ খবরের কাগজটা মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই দেখুন একটা চমৎকার খবর—খবরটা এই যে—লণ্ডনে হাইড পার্কে একই বেঞ্চে এক বৃদ্ধ (৮২) ও এক বৃদ্ধা (৭৮) নিত্য সান্ধ্য হাওয়া সেবন করিতেন। দুই জনের পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয় ধারাবাহিকভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করায় তাঁহারা বলিয়াছেন, প্রণয় বা আকর্ষণই এই বিবাহের কারণ নয়, আমাদের নিঃসঙ্গতা দূর করিবার জন্যেই এই বিবাহ। আজ এই বয়সে অন্য কোন প্রসঙ্গই ওঠে না, এমন কি বৈধব্য ও স্ত্রীবিয়োগের ভয়ও নেই—

ভবানীবাবু উন্মাদের মত হাসিয়া বলিলেন, বেশ ত এরা!

নীতি বলিলেন, পাগল আর কি? কেন আপনারও আজ সখ হ'চ্ছে নাকি?

—রামচন্দ্র! এদেশে এটা কুকর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়াবে—শেষে কানেস্তারা বাজিয়ে পাড়া থেকে বিদেয় ক'রে দেবে—

মিস্ নীতি মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া বলিলেন, যা হোক্, নিঃসঙ্গতাটা ত নেই—

—তাই আজ ভাবি, আপনার সঙ্গে দেখা না হ'লে কি করতুম!

—তাই ত!

মাথার যেখানটা চুল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে সেই স্থানটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মিস্ নীতি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,

একবার দোলের দিন রাত্রে আপনার সিল্কের জামায় আমরা ম্যাজিক রং ছড়িয়ে দিয়েছিলাম—

—হ্যাঁ, মনে আছে, আমি প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলুম আর কি—কিন্তু যখন রং থাক্‌ল না, তখন ভাবলুম, তাই ত সিল্কের জামা কি কেউ ইচ্ছে ক'রে নষ্ট করে—

প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা হইতেছিল। মিস্ নীতি বলিলেন, খোকা, বৌমা ও নাতিটিকে একবার আনুন না, দেখি তাদের—কয়েকদিন যাবৎ খুবই ইচ্ছে করছে—

—সে ইচ্ছে ত করেই, কিন্তু সরকারী চাকরি, ছুটি পাওয়াই দায়। যাহোক্, বদলি হ'লে ত আস্‌বেই, তখন দেখবেন। আমার বৌমাটি বি. এ পাশ, কিন্তু কি সুন্দর তার ব্যবহার, আর আমাকে নিয়েই সে ব্যস্ত। আমি যতই বলি খোকাকে দেখ, সে ততই আমার কাছে কাছে থাকে—সে মেয়ে পছন্দ করাটাও একটা কাহিনী—এই মেয়েটিকে দেখ্‌তে গিয়েই পছন্দ ক'রে ফেললাম—বি. এ. পড়ত —দেখতে আপনারই মত—

—আমার মত বলেই সুন্দরী—না ?

ভবানীবাবু নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চশমার ভিতর দিয়া নীতির মুখের উপর প্রসারিত করিয়া বলিলেন, মনস্তত্বের বড় কথা, আমার জীবনে আপনাকে পাইনি বলে—একটু লজ্জিত হইয়া পুনরায় বলিলেন, মানে, যৌবনের সেই স্বপ্নটা সফল হয়নি বলে। আধুনিক শিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা হয়নি বলে ছেলের জীবনে সেটা আরোপ করেছি—

নীতি লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়াই ছিলেন। ভবানীবাবু বলিলেন, মেয়েরা কোনদিনই পুরুষকে ভালবাসে না। খোকা যখন হ'ল তার আগে স্ত্রী আমাকে উপেক্ষা করেছেন, লজ্জায়, সখ করে করেছেন খোকার জন্যে অর্থাৎ আমি যে একা সে একাই চিরদিন। আপনার সঙ্গে পরিচয় যেদিন সেদিনও, বিবাহিত জীবনেও, আজও—

নীতি সন্দেহের সঙ্গে বলিলেন, আজও !

—হ্যাঁ, আজও, নইলে আজ সকালে কি দেরি হ'ত ! আর ধরুন, আমাকে ডিঙিয়ে আজ আপনার ইচ্ছে হ'চ্ছে খোকা আর বৌমাকে দেখ্‌তে—অথচ তাদের আপনি দেখেন নি কখনও।

—দেখি নি বলেই ত—

—দেখ্‌লেন, আমার কথা ত মনেই পড়ে না।

নীতি কি যেন ক্ষণিক ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা আজ উঠি, আপনার খাওয়ার সময় হ'ল—

—আজ ত খাওয়াই নেই।

—কেন ?

—একাদশী, বাতটা আবার কয়েকদিন বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে—

নীতি বলিলেন, ওহো, এ বয়সে বাতটা ত বড় কষ্টদায়ক, যখনই দরকার হবে—খবর দেবেন। আপনাকে শুশ্রূষা ক'রে বেশ আনন্দ পাওয়া যাবে।

—অর্থাৎ আমি শুয়েই থাকি, আপনি শুশ্রূষাই করুন, এই ত ?

নীতি হাসিয়া বলিলেন, জীবনটারই একটা কদর্থ আপনি ক'রে ফেলেছেন, এ ত সামান্য—

কয়েকদিন পরে নীতি একদিন সকালে আসিয়া অভিযোগ করিলেন, কই আজ বেড়াতে যান নি, আমি কাপড় ছেড়ে তৈরি হ'য়ে বসে আছি—

ভবানীবাবু একটা টেলিগ্রাম তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, কি ক'রব কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না, আর আমি বুড়ো মানুষ কিই বা করতে পারি ?

—বৌমার অসুখ ? তা খোকা ছেলে নিয়ে রোগী নিয়ে বড়ই বিপন্ন হ'য়ে পড়েছে। চলুন দু'জনেই যাই, নইলে রোগী শুশ্রূষা করবে কে ?

—আপনি যাবেন ?

নীতি ইতস্তত করিয়া জবাব দিলেন, তাই ত! প্রশ্ন করলে আমার কি পরিচয় দেব ? আজ কেবলমাত্র বন্ধু বল্‌লে মানুষে কি বলবে ? ··· না যাওয়া হয় না।

দুইজনে অনেক বাদানুবাদ করিয়া ঠিক করিলেন, সম্ভব হইলে এখানে লইয়া আসিলে ভাল হয়। পরের দিন জবাব আসিল, বৌমা মারা গিয়াছেন, ছেলেকে লইয়া খোকা আসিতেছে।

সকালে খোকার পৌঁছিবার কথা—

দুইজনে অধীর আগ্রহে রাস্তার পানে চাহিয়া আছেন। ট্যাক্সি আসিয়া থামিল, অবুঝ শিশুপুত্রকে লইয়া শোকার্ত্ত খোকা পিতাকে প্রণাম করিল।

ভবানীবাবু বলিলেন, ইনি, তোমার মাতৃস্থানীয়া, এঁকে প্রণাম কর—

খোকা নীতিকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, এস বাবা, বেঁচে থাকো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইতেই ভবানীবাবু বলিলেন, ওর পরিচয় পরে শুনবে, আপাততঃ মাসিমা ব'লেই ডেকো। এস দাদু—

নাতিকে কোলে করিয়া বলিলেন, এস দাদু, ভয় নেই খোকা, আমরা দু'জনে ওর কোন কষ্ট হ'তে দেব না।

মিস্ নীতি আগ্রহে শিশুটিকে ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, কি সুন্দর ছেলেটি—আহা, মা'র কথা ও ভুলবে কেমন ক'রে?

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই শোকার্ত্ত খোকা সান্ত্বনা লাভ করিল, শিশু পুত্র মণ্টু নীতিকে আশ্রয় করিয়াছে। তিনিও আজ যেন বাঁচিয়া থাকিবার মত অবলম্বন পাইয়াছেন। এমনি আগ্রহে মণ্টুকে গ্রহণ করিলেন। খোকা নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেল।

সকালের ভ্রমণটা আজ কাল প্রায়ই হয় অত্যন্ত বিলম্বে। মণ্টুকে সাজাইয়া গোছাইয়া বাহির হইতে দেরি হইয়া যায়—বৈকালে কোন কোন দিন হয়ত বেড়াইতেই যাওয়া হয় না। আড্ডাটা আর তেমন জমে না, মণ্টু এবাড়ী ওবাড়ী ছুটাছুটি করিয়া নীতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, কাজেই স্থির হইয়া দু'দণ্ড কথা বলিবার মত অবসর আর তাহার নাই। মণ্টু বেড়াইতে গিয়া নীতির কোলের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়ে এবং সেইখানেই রাত্রিবাস করে। ভবানীবাবু আগে খোঁজ লইতেন, আজকাল তাহারও প্রয়োজন হয় না। মণ্টু ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহার মা একদিন ছিল, মিস্ নীতিও ভুলিয়া যান্ যে মণ্টু তাহার কেহ নহে—

আজ কয়েকদিন ভবানীবাবুর বাতটা বাড়িয়াছে—বাহির হইবার ক্ষমতা নাই, কাজেই ঘরের মাঝে একাকী বাস করেন। ভৃত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ করে। মিস্ নীতি আসেন বটে কিন্তু তাহার আগমন নিয়মিত নয়, কোন দিন সকালে, কোন দিন বৈকালে আসেন এই পর্য্যন্ত—

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশের পানে চাহিয়া শুইয়াই ছিলেন—দূর দিগন্তে, সামনের বাড়ীর ছাদের উপরে রংএর মেলা বসিয়াছে—ক্রমে তাহা নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার কালো ডানা মেলিয়া পৃথিবীকে দীর্ঘশ্বাসের বেদনা দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর রঙিণ ছবি গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তাহার মাঝে বিরহীর অশ্রুকণা যেন কালো কুয়াশার মত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। ভবানীবাবু ভৃত্যকে বলিলেন, দেখ ত উনি কোথায়।

ভৃত্য অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি মণ্টুকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। ভবানীবাবু অকারণে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কয়েকবার সদর দরজার পানে চাহিয়া দেখিলেন। নিঃসঙ্গ রোগশয্যার পাশে কেহ আসিল না, তিনি নিশ্চিত আলস্যে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া চুরুট ধরাইলেন, কে বলিতে পারে এই তাহার জীবনের শেষ রোগশয্যা কি-না!

তাঁহার মনে পড়িল, যৌবনের প্রারম্ভে ওই নীতিকে ঘিরিয়া তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবশ কল্পনা স্বপ্নের জাল বুনিয়া রঙিণ আশার উন্মাদনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর একদিন নিশীথ রাত্রে, বিদায় কালে, তাহার একক জীবনের একাকীত্ব গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাসে বিদায় ক্ষণ ঘোষণা করিয়া দিল—ব্যথিত বেদনার্ত্ত করুণ দৃষ্টি নিস্তব্ধ বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রুর প্রলেপ মাখাইয়া তাহাকে সুগন্ধি করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সেদিন ওই নিষ্ঠুর বধির নারীর অন্তর একবিন্দু সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া ওঠে নাই—

বিবাহিত জীবনের মাঝে, এমনি রোগ শয্যায় একাকা দরজার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার প্রতিটি মুহূর্ত্ত ব্যাকুল আগ্রহে কাটিয়াছে। খোকার পরিচর্য্যা করিয়া তাহার রোগশয্যার নিঃসঙ্গতাকে দূর করিবার মত অবসর তাহার পত্নীর হয় নাই। স্বপ্নের মাঝে তাহাকে কখনও পাওয়া যায় নাই, বাস্তবের পৃথিবীর মাঝেই অনাকাঙ্ক্ষিতের মত তিনি ছিলেন ব্যবহারিক জীবনের সামগ্রী—অন্তর তাহার একাকীই চলিয়াছিল দূর সুদুর্গম পথে আপনার স্বপ্নের বোঝার নিপীড়িত ভারবাহী পশুর মত—সারাজীবন ধরিয়া নির্ব্বাসিত যক্ষের মত তিনি কেবল অলকা উজ্জয়িনী

ধূপগন্ধামোদিত কেশগুচ্ছ স্নাত মানসী মূর্ত্তির স্বপ্নেই দীর্ঘ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছেন, কুবেরের অভিশাপ তাহার পুরুষ-অন্তরে চিরন্তন হইয়াই রহিয়াছে—

যৌবনের স্বপ্ন জীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া পুনরায় প্রতারণা করিয়া গিয়াছে। সারাজীবনের কর্ম্মাবসানে, দীর্ঘ যুদ্ধে বার বার আহত ক্লান্ত সৈনিকের মত শিথিল স্থবির দেহের মাঝে শরবিদ্ধ রক্তাক্ত অন্তর আজ বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বার বার বলিয়া উঠিতেছে—আসিল না, আর আসিবে না, জড় সুপ্ত বধির অন্তরের দ্বারে শোকার্ত্ত করাঘাত একান্তই নিষ্ফল।

ভবানীবাবুর জ্যোতিহীন, নিষ্প্রভ চোখ দুইটি আর একবার জলে ভরিয়া ওঠে—স্বাধীন একক দুইটি বাড়ীর মাঝে আজও প্রাচীরের ব্যবধান—তাহার মাঝে মণ্টু দুর্ব্বল সংযোগ-সূত্র মাত্র!

বাংলার দীঘি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাংলার দীঘি গভীর শীতল, কবির স্বপ্নে গড়া,
ছল ছল কল জল চঞ্চল মাতৃমমতা ভরা।
তব মাধুরীর নাহি পাই সীমা;
কভু বা বারুণী, কভু তুমি ভীমা,
তুমি গ্রামান্তে স্বাগত-ভাষিকা, দিনান্ত দাহহরা।
গভীর স্বচ্ছ, রবির মুকুর কবির স্বপ্নে গড়া।

ডুবিয়া বিদায় লয় তব গায় পল্লীর দিনগুলি,
তোমা সম্ভাষে প্রতিদিন উষা পূর্ব্বদুয়ার খুলি'।
আধ ঘুমঘোরে প্রভাত তপন,
তোমার নয়নে হেরে কি স্বপন,
বিদায় বেলায় ছলছল চায় করি' তোমা কোলাকুলি,
কুমুদীর সাথে নাচে চাঁদ তব তরঙ্গে দুলি দুলি'।

প্রতিদিন বধূ প্রাণের বার্ত্তা ব'লে যায় তব কানে।
গাগরী ভরণে তব বাণী তারা শুনে যায় কলতানে।
জুড়ায়ে অঙ্গ সোহাগিনী বধূ
রেখে যায় তার হৃদয়ের মধু,
কমলে তাহাই সঞ্চিত কি-না অলিছাড়া কেবা জানে?
কোকনদে বধূ পায়ের আলতা রেখে যায় প্রতিদানে।

তব তরঙ্গ মূরছিয়া পড়ে যুগল হৈম ঘটে,
পিত্তলের ঘট ভেসে গিয়ে ক্ষোভে, লাগে ওপারের তটে।
হেরি তা ব্যোমের কালো পয়োধর,
লোভে জল হায় ঝরে ঝর ঝর।
সারা দেহে তব রোমাঞ্চে নবযৌবন-জয় রটে।
লাল পেড়ে শাড়ী লাল ডোরা টানে তোমার হৃদয়-পটে।

সুন্দর তুমি হরি' তরুণীর লাবণ্য শতদলে
অথবা তোমারি লাবণ্য তার তনুতটে উচ্ছলে?
দেহে মনে দিয়া মুক্তির স্বাদ,
বাঁধ ভাঙ্গি তারে ঝরেছ অবাধ,
ভরা ঘট তাই শূন্য করিয়া সে যে আসে তব জলে।
হৃদয়ের ভার লঘু করে তার তব তরঙ্গতলে।

সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া নামে, দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
মাঠের পথিক তব নীরে হেরে আলো ঝলমল করে।
শঙ্খের ধ্বনি বলাকার রূপে,
তোমার উপরে উড়ে চুপে চুপে।
তরু-ছায়া আঁখিপল্লব সম তব দেহে দাহ হরে।
কমল মৃণাল মরালের গ্রীবা এক সাথে নুয়ে পড়ে।

বাংলার দীঘি শ্যামল শীতল, কবির স্বপ্নে গড়া,
চাঁদে চাঁদমুখে অমল কমলে কমল নয়নে ভরা।
ঘটে ঘটে ভরি সুশীতল প্রীতি
ঘরে ঘরে তুমি পাঠাইছ নিতি,
তোমার সলিল পরম শরণ, বিরহ বেদনা হরা,
চরম শরণ মরণে বরিতে অভাগী স্বয়ংবরা।

‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’ সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপহাররূপে প্রাপ্ত “শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান” * গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার অনেক বক্তব্য আমি পূর্ব্বে (১৩৪৬ আশ্বিন হইতে) ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু পরে পীড়িত হওয়ায় অবশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারি নাই। উপসংহারে যাহা আমার অবশ্য লেখ্য, তাহাও লিখিতে পারি নাই। তাই এবার সংক্ষেপে সেই কথাই কিছু লিখিতেছি।

প্রথম কথা—কোন গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে সমালোচকের কর্ত্তব্যানুরোধে সেই গ্রন্থের যথামতি দোষের বিচারও কর্ত্তব্য। কেবল গুণকীর্ত্তনে গ্রন্থ-সমালোচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কোন গ্রন্থে বস্তুতঃ দোষ থাকিলেও তদ্দ্বারা সেই গ্রন্থ যে অগ্রাহ্য, ইহা কখনই প্রতিপন্ন হয় না। চিরকালই দোষযুক্ত গ্রন্থও গুণ-গৌরবে সুধীসমাজে সমাদৃত হইতেছে। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্য-দর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদে মহাকবি কালিদাসের অনেক শ্লোকেও দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে স্পষ্ট বলিয়াছেন, “সর্ব্বথা নির্দ্দোষস্য একান্তমসম্ভবাৎ!” অর্থাৎ কোন একখানা কাব্য সর্ব্বথা নির্দ্দোষ হওয়া একান্ত অসম্ভব। কিন্তু বিশ্বনাথ কালিদাসের কাব্যে দোষ বলিলেও তাহাতে কালিদাসের মহাকবিত্বের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এইরূপ আরও বহু কবি এবং নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থকারের গ্রন্থে অনেকে অনেক দোষ বলিলেও গুণ-গৌরবে তাহাদিগের গ্রন্থও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’ সম্বন্ধে বক্তব্য লিখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থকারের গুণ-গৌরবের কথাই লেখ্য। তাই আমি প্রথম প্রবন্ধেই (১৩৪৬ আশ্বিন সংখ্যায়) লিখিয়াছিলাম—

“বিমানবাবুর এই নিবন্ধ যিনি কিছু পাঠ করিবেন, তিনিও আলোচ্য বিষয়ে বিমানবাবুর অতি কঠোর সাধনার পরিচয় পাইবেন॥” “বিমানবাবু এই গ্রন্থে এমন অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা অনেকের অজ্ঞাত বা অচিন্তিত” ইত্যাদি।

বিমানবাবুর নিজের কথার দ্বারা জানা যায়—তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ হইতে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় পুঁথি অন্বেষণ করিবার জন্য অনেক দিন উড়িষ্যার বহু পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তখন হইতেই তিনি অবকাশের সময়ে বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, দেনুড়, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, আড়িয়াদহ, বরাহনগর প্রভৃতি বহু স্থানে গিয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বহু পুঁথি ও জ্ঞাতব্য তথ্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ এইরূপ কঠোর সাধনার ফলে তিনি এই গ্রন্থের দ্বারা দেশবাসীকে কি অপূর্ব্ব দান করিয়াছেন,তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া বুঝা আবশ্যক। কোন অংশ বিশেষ পড়িয়া অথবা যে কোন ব্যক্তির মুখে ভাল মন্দ কিছু শুনিয়া এইরূপ বহু বিষয়পূর্ণ বিশাল গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না। পরন্তু কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে প্রথমে তাহার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বুঝা আবশ্যক। তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচনা করিতে প্রথমেই ‘প্রয়োজন’ ও ‘অভিধেয়’ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বিমান-বাবুও তাহা ব্যক্ত করিতে ভূমিকায় প্রথমেই লিখিয়াছেন—

“বাঙ্গালা দেশে বৃটিশ অধিকার স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দী ও অসমীয়া ভাষায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সমসাময়িক পরিকর-গণ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাদের তুলনা-মূলক ঐতিহাসিক বিচার করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।”

“আমি কোন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য মতবাদের (থিওরির) দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের চরিতের বিচার করি নাই। একটি ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলি তুলনা করিয়া পড়িয়া ঘটনাটি সম্বন্ধে যে লেখকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ জানিবার সম্ভাবনা, তাহারই মত গ্রহণ করিয়াছি যথা” ইত্যাদি।

---

* প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, মোয়াট, পদক ও গ্রিফিথ, স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত, পাটনা বি-এন্ কলেজের অধ্যাপক এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো .নানাগ্রন্থকার প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, পি এচ, ডি ভাগবতরত্ন মহোদয় বহু গবেষণা ও বিচার পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় যে বিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ‘ডাক্তর’ উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহার নাম ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’।

এখানে বলা অত্যাবশ্যক যে বিমানবাবু তাঁহার এই গ্রন্থে পূর্ব্বে মুদ্রিত অনেক কথা পরে বর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের তিরোভাবের বিবরণে তাঁহার লিখিত কোন কোন কথা আমাদিগেরও দুঃখের কারণ হওয়ায় তিনি পরে তাহা বর্জ্জন করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বমুদ্রিত কোন অংশ অনেকের অপ্রীতিকর বুঝিয়া তাহারও বর্জ্জনপূর্ব্বক সেখানে অন্য কথা লিখিয়া পরে তিনি ইহাও লিখিয়াছেন—

"ভক্তগণের লীলা আস্বাদনের রীতি তাঁহাদের সাধনার অনুকূল। আর আমি যে রীতিতে শ্রীচৈতন্যচরিতের আকর গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করিব, তাহাতে হয়ত ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কোন পারমার্থিক উপকার হইবে না।" ৬ পৃঃ

বিমানবাবু তাঁহার ঐ শেষোক্ত কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আমি কিন্তু উহা স্বীকার করিতে পারিব না। কারণ আমি এই গ্রন্থে ভক্তগণের জ্ঞাতব্য পারমার্থিক কথাও বহু পাইয়াছি। তদ্দ্বারা পারমার্থিক উপকারই হয়। যদিও শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা ও ভক্তগণের প্রেম প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিচারের বিষয়বস্তু নহে, তথাপি এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সে সমস্ত বিষয়েও অনেক সার কথার আলোচনা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই নবদ্বীপে তাঁহার মহাপ্রকাশের সময়ে কোন দিন অদ্বৈতাদি বৃদ্ধ ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া বুঝিয়া সেইভাবে তাঁহার অভিষেক ও পূজা করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বিমানবাবু এই সত্য অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

"উক্ত ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বম্ভরের বয়োজ্যেষ্ঠ ও ভক্তিশাস্ত্রে পণ্ডিত। ইহারা প্রত্যেকে সেদিন বিশ্বম্ভরকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শুধু যে স্বীকার করিলেন, তাহা নহে। পুরুষসূক্ত পড়িয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন ও দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে পূজা করিলেন—ইহা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর রচনা হইতে পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বম্ভরের বয়স তখন ২৩।২৪। এইরূপ একজন তরুণ যুবককে যে প্রবীণ পণ্ডিতগণ—এমন কি বিশ্বম্ভরের মাতৃদেবী স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।" ৫৯৮ পৃঃ

বিমানবাবু পরে লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যকে যে তাঁহার সমসাময়িকগণ কিরূপে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার ভগবত্তা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সমসাময়িকদের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। এত প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে, শ্রীচৈতন্য তাঁহার সমসাময়িকগণ কর্ত্তৃক ভগবান্ বলিয়া পূজিত হয়েন নাই, তাহা হইলে তাহার উক্তি অজ্ঞতা-প্রসূত বলিতে হইবে।" ৬০৩ পৃঃ

"অনেকের ধারণা আছে যে, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ষোড়শ শতাব্দীতে নিম্নতর জাতির মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণাদি জাতি উহা গ্রহণ করেন নাই।" বিমানবাবু পরে (৬০৮ পৃঃ) এই কথা লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ ধারণাও অজ্ঞতা প্রসূত। কারণ, ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম কেবল নিম্নজাতিই গ্রহণ করেন নাই। তখন "ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ।" তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ২৩৯। বৈদ্য ৩৬। কায়স্থ ২৯।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় সুবিজ্ঞ লেখকও বলেন যে, শ্রীচৈতন্যের সকল ভক্তই বাঙ্গালী ছিলেন—"Himself a Bengali, his associates were all of the same nationality" (J. B. O. R. S., Vol. VI., pt. 1, p. 62). বিমানবাবু পরে (৬১৬ পৃঃ) এই কথা লিখিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের ৪৯০ জন পরিকরের মধ্যে অবাঙ্গালীও ছিলেন। তন্মধ্যে উড়িয়া—৪৪। দ্রাবিড়ী—৭। গুজরাটী—১। মারহাট্টী—৩। রাজপুত—৪।

শ্রীচৈতন্যদেব যে কখনই সহজিয়া হইয়া স্ত্রীলোক লইয়া সহজিয়া বৈষ্ণবের কোন আচরণ করেন নাই, ইহা বুঝা পারমার্থিক মহান্ উপকার। বিমানবাবু সেই মহোপকারের উদ্দেশ্যেও অনেক উপাদেয় কথা লিখিয়াছেন। প্রথমে তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ে "সহজিয়াদের হাতে শ্রীচৈতন্য", "পরকীয়াবাদের ইতিহাস", "শ্রীচৈতন্যে পরকীয়া সাধন আরোপ", "কিশোরী ভজা দল,—আধুনিক সহজিয়া"—এইসমস্ত শিরোনাম লিখিয়া—যে সমস্ত কথা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যে কারণেই হউক, অনেক কথা অনেকের অপ্রীতিকর জানিয়া উহা বর্জ্জনপূর্ব্বক অষ্টাদশ অধ্যায়টি আবার নূতন করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সহজিয়া বৈষ্ণবদিগের অনুচিত পাপ কথার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি সেখানে প্রথমে স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন—

"পরবর্ত্তী যুগের কএকখানি অজ্ঞাত অখ্যাত বইয়ে দেখা যায় যে, সহজিয়ারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও রেহাই দেয় নাই। এই সকল বইয়ের লেখকদের নাম পাওয়া যায় না, ঐ গুলির রচনার তারিখ স্থির করাও অসম্ভব। ভাষা দেখিয়া মনে হয়, ঐগুলি গত একশত বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। এরূপ বইয়ের বর্ণনার সহিত শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক গ্রন্থের বর্ণনার বিরোধ দেখা গেলে উহাকে অবশ্যই অগ্রাহ্য করিতে হয়। শ্রীচৈতন্যের প্রামাণিক জীবনী সমূহে তাঁহার সন্ন্যাসনিষ্ঠা কি ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় দিলেই পূর্ব্বোক্ত অর্ব্বাচীন ও অপ্রামাণিক বইগুলির অশ্লীল ও অনিষ্টকর ইঙ্গিতের প্রকৃষ্ট খণ্ডন হইবে।" ৫৭০ পৃঃ

বস্তুতঃ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেব যে, স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করিতেন না, "স্ত্রীলোকেরা দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতেন"—ইত্যাদি বিষয়ে বিমানবাবু যে সমস্ত পুরাতন প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সর্ব্বসম্মত সত্য। কিন্তু সুবিখ্যাত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সমর্থিত "গোবিন্দদাসের করচা" নামক মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়—শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ কালে একদিন কোন স্থানে সত্যবালা নাম্নী কোন পতিতা রমণীর সম্মুখে—

"নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি" ইত্যাদি।

কএক বৎসর পূর্ব্বে—কলিকাতায় এক বড় সভায় ছায়াচিত্রে গৌরাঙ্গলীলার প্রদর্শক কোন বক্তা বক্তৃতা করেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে বহু বেশ্যাকে সাদরে দীক্ষা দিয়া প্রেম বিতরণ করেন, তিনি এমনই দয়াময় ছিলেন। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—"গোবিন্দদাসের কড়চা।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বে না জানিয়া আমিও সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং ঐরূপ বক্তৃতা শ্রবণের পরেই নিতান্ত ক্ষোভে তখনই উঠিয়া প্রতিবাদ করায় সভাভঙ্গের কারণ হইয়াছিলাম। সুখের কথা, বিমানবাবুও গোবিন্দদাসের কড়চার পূর্ব্বোক্ত কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে কেন ঐ কড়চায় ঐরূপ কথা পাওয়া যায়? ঐ কড়চা কি একেবারেই কাল্পনিক? বিমানবাবু লিখিয়াছেন—

"আমার মনে হয় জয়গোপাল গোস্বামী "গোবিন্দদাসের করচা" নামধেয় যে টুক্‌রা টুকরা নোট্ বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি নিজের ভাবের আবেগে অনবধানতা বশতঃ ঐ পঙ্‌ক্তি কয়টি রচনা করিয়া ঘটনাটির সংযোজনা করিয়াছেন।" ৫৭৫পৃঃ

কিন্তু শান্তিপুরের অদ্বৈত-সন্তান জয়গোপাল গোস্বামীর ন্যায় চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তির ঐ স্থলে 'নিজের ভাবের আবেগ' কিরূপ? যে জন্য তিনিও অনবধান হইয়া ঐরূপ ঘটনার যোজনা করিতে পারেন? আমি কিন্তু ঐরূপ কল্পনা গ্রহণ করিতে পারি না। মুদ্রিত "গোবিন্দদাসের করচা"য় এমন অনেক কথা পাওয়া যায়—যাহা শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে কখনই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তথাপি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ঐ কড়চাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু শান্তিপুরের পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ও যে, ঐরূপ বিশ্বাস করিতেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ শান্তিপুরেও পাওয়া যায় না। বিমানবাবুও পূর্ব্বে (৪২০ পৃঃ) লিখিয়াছেন—

"জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কোন্ স্বার্থবশে এইরূপ একখানি গ্রন্থ জাল করিবেন? তিনি অদ্বৈতবংশীয় ব্রাহ্মণ—কর্ম্মকার নহেন। গোবিন্দ-কর্ম্মকার শ্রীচৈতন্যের যে "খড়ী ও খড়ম" লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা গোস্বামী মহাশয় দৈববলে পাইয়াছেন, এরূপ কথাও তিনি বলেন নাই—বা খড়ী-খড়ম দেখাইয়া পয়সা রোজগারের চেষ্টাও করেন নাই।"… "তিনি অদ্বৈতবংশের লোক ও শান্তিপুরের অধিবাসী, শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বিকৃত করিয়া আঁকিয়া তিনি নাম যশ পাইবার চেষ্টা করিতেন না" ইত্যাদি।

বিমানবাবু এই বিচারের উপসংহারে শেষে আবার লিখিয়াছেন—

"আমার বিশ্বাস যে গোস্বামী মহাশয় হয় ত কোন কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিতে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া 'গোবিন্দদাসের করচা' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।" ৪২৪ পৃঃ

কিন্তু তাহা হইলে কি পরে ইহা স্বীকার করাই হয় না যে—ঐ পুস্তক শান্তিপুরের পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিজের ভাষায় পল্লবিত করিয়া লিখিত, সুতরাং সেই সমস্ত পল্লবিত অংশ তাঁহারই রচিত এবং ঐ পুস্তকের "গোবিন্দদাসের করচা" এই নামও তাঁহারই প্রদত্ত। কিন্তু বিমানবাবু পূর্ব্বে লিখিয়াছেন—"তিনি অদ্বৈতবংশীয় ব্রাহ্মণ, কর্ম্মকার নহেন।" তবে তিনি কেন ঐ কর্ম্ম করিবেন?—কোন কীট-দষ্ট পুঁথিতে—কোন স্থানে শ্রীচৈতন্য চরিত্রে কোন ব্যক্তির কল্পিত কালিমা দেখিতে পাইলে তিনি কি তখন উহা দগ্ধ না করিয়া নিজহস্তে পল্লবিত করিতে পারেন?

যাহা হউক, উক্ত স্থলে বিমানবাবুর পূর্ব্বাপর উক্তির সামঞ্জস্য আমার নিকটে অস্পষ্ট হইলেও উক্ত 'কড়চা' সম্বন্ধে তাঁহার মত সুস্পষ্ট। তিনি **'কড়চা সম্বন্ধে আন্দোলনের ইতিহাস'** লিখিতে বহু জ্ঞাতব্য সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু কড়চার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত যুক্তির বিচার করিয়া তিনিও উহাকে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান রূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তিনি প্রমাণ দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের সুরক্ষিত সন্ন্যাসনিষ্ঠা ও অলৌকিক পবিত্র চরিত্রের সমর্থন করিয়া বর্ত্তমান সময়ে 'পারমার্থিক উপকার'ই করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যে দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ তাঁহার পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরী মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়—এই প্রাচীন মতের সমর্থনেও বিমানবাবু বহু বিচার করিয়াছেন—যাহা অবশ্যপাঠ্য। পরমপ্রীতিভাজন সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহোদয় উক্ত মতের প্রতিবাদে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহাও অবশ্যপাঠ্য ও প্রণিধানযোগ্য। আমাদিগের কিন্তু প্রাচীন মতেই সংস্কার বদ্ধমূল। কারণ, পূর্ব্বে এদেশে পণ্ডিত সমাজে উক্ত বিষয়ে কোন মতভেদ ছিল না, ইহাই আমরা জানি। "শব্দকল্পদ্রুমের" পরিশিষ্ট খণ্ডের প্রারম্ভে মুদ্রিত উনবিংশতি মঙ্গলাচরণ শ্লোকের মধ্যেও দেখা যায়—

"শ্রীমন্ মাধ্বানুযায়ি-শ্রীনিত্যানন্দাদি বংশজাঃ।
গোস্বামিনো নন্দ-সূনুং শ্রীকৃষ্ণং প্রবদন্তি যং॥"

সুতরাং বুঝা যায় যে, তৎকালে বঙ্গে নিত্যানন্দাদি বংশজাত গোস্বামিপণ্ডিতগণও তাঁহাদিগকে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তই বলিতেন। অষ্টাদশশতাব্দীতে শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশাবতংস এবং নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথের বৈষ্ণবদীক্ষা-গুরু নানাশাস্ত্রগ্রন্থকার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য মহাশয়ও ইহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি পঞ্চম কোন বৈষ্ণব সংসম্প্রদায়ের কথাও বলেন নাই। তিনি শ্রীজীবগোস্বামিপাদের "তত্ত্ব-সন্দর্ভে"র টীকায় বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ স্বতন্ত্র পুরুষ। তাই তিনি স্বতন্ত্রভাবে ভক্তগণ মধ্যে বিশিষ্ট সাধনার প্রবর্ত্তন ও ভক্তগণ দ্বারা তাহার প্রচার করিলেও সাধকের কোন সম্প্রদায়ী গুরুর আশ্রয় স্বীকারের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে লোকশিক্ষার্থ তিনি নিজেও বৈষ্ণব গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন সম্প্রদায় গ্রহণের আবশ্যকতাবশতঃ দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরন্তু আমরা বৃদ্ধমুখে উক্ত প্রাচীন মতের মূল বচন শুনিয়াছি—

"ততঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী—ব্রহ্ম—রুদ্র—সনকাঃ"..."সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

অর্থাৎ কলিযুগে চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী হইবেন; (১) শ্রী (২) ব্রহ্ম (৩) রুদ্র ও (৪) সনক। বৈষ্ণবসাধকের রুচি ও অধিকারানুসারে উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়ীর মধ্যে কোন সম্প্রদায়ী গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। কারণ সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র সফল হয় না। তাই শ্রীচৈতন্যদেবও প্রাচীন-সম্প্রদায়ী গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহার গুরু স্বীকারের অন্য কোনই প্রয়োজন ছিল না। পরন্তু পঞ্চম কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায় না।

অবশ্য পূর্ব্বোক্ত "ততঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ"—ইত্যাদি বচনও কোন পুরাণাদি শাস্ত্রে এপর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু অনেককাল হইতে ঐসমস্ত বচন পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত আছে। তাই বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোবিন্দভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে ঐ সমস্ত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বচন অমূলক কল্পিত হইলে উহার রচয়িতা কে এবং তাঁহার ঐ সমস্ত বচন-রচনার উদ্দেশ্য কি, ইহাও বলা আবশ্যক।

পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও কৃপাপাত্র কবিকর্ণপূর কেন মাধ্বসম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও কেন উহাই গ্রহণ করিয়াছেন? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও সন্তোষকর অন্য উত্তর আমরা পাই নাই। কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে পরবর্ত্তী কালে ঐসমস্ত কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীও তাহা জানিতে না পারিয়া "ভক্তিরত্নাকরে" নিঃসন্দেহে ঐসমস্ত কথা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ কাল্পনিক উত্তরের অনেক বাধক আছে।

কোন বহুজ্ঞ ব্যক্তিও লিখিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ মধ্বাচার্যের গুরুত্ব ঘোষণা করিলেও শ্রীরূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য সর্ব্বমান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মধ্বাচার্যের গৌরব-ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার "তত্ত্ব-সন্দর্ভ" গ্রন্থের প্রথম ভাগেই বলিয়াছেন,—"শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যচরণৈঃ" এবং "তত্ত্ববাদ-গুরূণাং...মধ্বাচার্য্য চরণানাং।" শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মধ্বাচার্য্যের প্রতি ঐরূপ গৌরব প্রকাশের কারণ ব্যাখ্যা করিতে সেখানে টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাৎ।" অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরও পূর্ব্বগুরু।

"শ্রীভাগবতসন্দর্ভে"র ভূমিকায় পণ্ডিত সত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি ভিন্ন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতির মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না।"

কিন্তু বহুদর্শী বিমানবাবু যে সমস্ত গ্রন্থে মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ততার কথা পাইয়াছেন, কালানুসারে সেই সমস্ত গ্রন্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, বিমানবাবু উক্ত স্থলে সেই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে দেবকীনন্দনের বৃহদ্ বৈষ্ণববন্দনার উল্লেখ করিলেও শ্রীজীবগোস্বামীর বৈষ্ণববন্দনার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি গ্রন্থশেষে (ঙ) পরিশিষ্টে যে বৈষ্ণববন্দনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা শ্রীজীবগোস্বামীর বৈষ্ণব-বন্দনা বলিয়া স্বীকার করিয়াই তিনি পূর্ব্বে (৫৮১ পৃঃ) লিখিয়াছেন—

"শ্রীজীবগোস্বামীও বৈষ্ণববন্দনার শেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে 'মাধ্বসম্প্রদায় বলিয়াছেন।"

পরে (৫৮৮ পৃঃ) ইহাও লিখিয়াছেন—

"শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করেন না যে শ্রীচৈতন্য মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত।"

কিন্তু পরে পরিশিষ্টে বিমানবাবুর উদ্ধৃত বৈষ্ণববন্দনার শেষোক্ত শ্লোকে দেখা যায়—

"শ্রীমন্ মাধ্বিকসম্প্রদায়-গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রদং।"

তাহা হইলে শ্রীজীবগোস্বামীও যে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তই বলিয়াছেন, ইহা ত স্পষ্টই উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়। বিমানবাবুর উক্ত বিচার্য্য বিষয়ে ইহা তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূল হইলেও তিনি উক্ত শ্লোকে "মাধ্বিকসম্প্রদায়-গণনং" এইরূপ পাঠে লক্ষ্য না করিয়াই উক্ত স্থলে পূর্ব্বে "মাধ্ব-সম্প্রদায়গণনং"—এইরূপ পাঠ লিখিয়াছেন, ইহাই আমি বুঝিতেছি। জানিনা, বিমানবাবুর মাতামহ পরমবৈষ্ণব ৺পণ্ডিত বাবাজীর স্বহস্ত-লিখিত পুথিতে কিরূপ পাঠ আছে।

বস্তুতঃ—'মধ্বস্য অয়ং' এই অর্থে "মধ্ব" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে "মাধ্বিক" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় "মাধ্বিক সম্প্রদায়" বলিলে মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় বুঝা যায়। কিন্তু 'মাধ্ব সম্প্রদায়' বলিলে মাধবেন্দ্রপুরীর সম্প্রদায়—এই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না। পরন্তু কোন প্রাচীন পুথিতে যে ঐরূপ পাঠই আছে—এবিষয়েও বিমানবাবু কোন কথাই বলেন নাই। আর পরিশিষ্টে তাঁহার প্রকাশিত উক্ত বৈষ্ণববন্দনার শেষে—

"ইতি শ্রীজীবগোস্বামিকৃতা মাধ্বসম্প্রদায়ানুসারিণী—চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্তা—ইহা কে লিখিয়াছেন এবং কেনই বা লিখিয়াছেন, এবিষয়েও তিনি কোন কথা বলেন নাই। যাহা হউক শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়-নির্ণয়ে বিমানবাবু বিচারপূর্ব্বক প্রাচীন মতই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই আমার এবিষয়ে মূল বক্তব্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বিমানবাবুর এই গ্রন্থে কত বিষয়ের যে বিস্তৃত প্রকাশ ও কিরূপ নূতনভাবে কত বিচার হইয়াছে, তাহা কএকটি প্রবন্ধ লিখিয়া ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। আমি পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে বিমানবাবুর কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিয়া আবশ্যক বোধে তাহার যথামতি সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া আমি গ্রন্থকারের অতি কঠোর সাধনা, বুদ্ধিমত্তা ও বহুবিজ্ঞতার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছি এবং অনেক নূতন বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া আমিও বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। গুণীর গুণগৌরব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য। আমরা কাহারও গুণের অপলাপ করিয়া কেবল দোষ-কীর্ত্তনে শিক্ষা পাই নাই।

ভারতের মহর্ষি অত্রি ব্রাহ্মণের "অনসূয়া" গুণের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন—

"ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি
("অত্রি সংহিতা")।

অর্থাৎ গুণীর কোন গুণের অপলাপ করিবে না—এবং অল্প গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেও বহু প্রশংসা করিবে। আর আমাদিগের পঞ্চম বেদ মহাভারতের বিরাট পর্ব্বে উপদিষ্ট হইয়াছে—

"শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি
সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥"



প্রৌঢ়ের দু'নম্বর বৌ

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলেই জানে এবং মানে যে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়। অনেকেই করে। নিয়ত কানে আসে; তোমার পরমায়ু একশো বছর হোক। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করার চেয়েও এটা যখন বড় আশীর্ব্বাদ, খবরের কাগজে আর মাসিকপত্রের প্রবন্ধে দেশভাইদের গড়পড়তা আয়ুর ভীতিকর হিসাবটা চোখে পড়িলেও কে না আশা করিয়া পারে যে সে অন্তত ষাটের কোঠা পার হইয়া যাইবে?

এই হিসাবে রসিক অনায়াসেই ভাবিতে পারিত, নতুন বৌটিকে আঠার বছর ধরিয়া স্বামীর আদর যত্ন স্নেহমমতা—ভালবাসা নয়, কারণ যতটুকু ভালবাসা রসিকের ছিল সবটুকুই সে প্রমীলাকে আগেই দিয়া ফেলিয়াছে—ভোগ করিতে দিয়া, ছেলেমেয়ে ঘরবাড়ী টাকা পয়সা আর মেয়েদের পরম কাম্য সংসারের গৃহিণীর পদে স্থায়ী অধিকার দিয়া বিধবা করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলে খুব বেশী অন্যায় করা হইবে না। কিন্তু প্রমীলা মারা যাওয়ার পর হইতে রসিকের কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে, সেও আর বেশী দিন বাঁচিবে না। বেশী দিন—কত দিন? কে জানে কত দিন, রসিক অত বছরগোণা হিসাব লইয়া মাথা ঘামায় না। সে শুধু জানে, এ পৃথিবীতে সে অল্পদিন থাকিবে—অতি অল্পদিন। নূতন করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিতে তুলিতেই সে ক'টা দিন শেষ হইয়া যাইবে।

রসিকের প্রৌঢ়ত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই মৃত্যুভয়। মরণের অবিরাম গুঞ্জন, আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি, শুনিয়াও না শুনিবার সতেজ ঔদ্ধত্য ঝিমাইয়া পড়ায় এই বয়সে মানুষের প্রথম খেয়াল হয়, দূর হইতে মরণ আশ্বাস দিয়া বলিতেছে, এখনও সময় হয় নাই, একটু অপেক্ষা কর। মরণের স্বাদ পাইতে পাইতে বৃদ্ধ ভাবে, দেরী আছে, এখনও দেরী আছে: জীবন বিস্বাদ হওয়ায় প্রৌঢ় ভাবে, হায়, দিন যে আমার ফুরাইয়া আসিল।

তাই রসিক ভাবিত, দু'দিনের জন্য কচি একটা মেয়েকে বৌ করিয়া বাড়ীতে আনা উচিত হইবে না। কেবল তাই নয়, ছেলেমানুষ বৌ নিজে কত ছেলেমানুষী করিবে—আর তার কাছে কত ছেলেমানুষী আশা করিবে ভাবিলেও রসিকের বড় অস্বস্তি বোধ হইত। আর কি তার সে বয়স আছে? প্রতিদান দেওয়া দূরে থাক, অল্পবয়সী বৌয়ের অন্তহীন ন্যাকামি হাসিমুখে সহ্য করিয়া চলাও কি তার পক্ষে সম্ভব হইবে? যে চলিয়া গিয়াছে সে ছিল জননী ও গৃহিণী, আসিবে একটি চঞ্চলা বালিকা। তার সঙ্গে কি বনিবে রসিকের?

প্রয়োজন ছিল না, ইচ্ছা ছিল না, তবু একদিন রসিকের বিবাহ হইয়া গেল।

একদিন অসময়ে তাকে অন্দরে ডাকিয়া সুলোচনা বলিল, 'এই মেয়েটিকে দ্যাখো তো ঠাকুরপো। ওর নাম সুধারাণী।'

রসিক থতমত খাইয়া বলিল, 'তাই নাকি? তা, বেশ তো।'

কচি খুকী নয়, বেশ বড়সড় মেয়েটি। মুখখানা গম্ভীর। মেঝেতে জাঁকিয়া বসিবার ভঙ্গিতে কেমন একটু 'গিন্নি গিন্নি'-ভাব আছে। রসিক তো জানিত না, সুলোচনাই সুধারাণীকে চওড়া কালোপাড় শাড়ীখানি বিশেষ কায়দায় পরাইয়াছে, কানের দুল খুলিয়া ফেলিয়া বালা আর অনন্ত পরাইয়াছে, চুলের জটিল বিন্যাস নষ্ট করিয়া মাঝখানে সিঁথি কাটিয়া পিছন দিকে টানিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে আর ধমক দিয়া বলিয়াছে, মুখ হাঁড়ি ক'রে বসে থাকো বাছা, একটু যদি লজ্জা করবে আমার দ্যাওরকে দেখে, একটু যদি চঞ্চল হবে ···

সুধারাণীকে রসিকের তাই মন্দ লাগিল না।

তারপর সুলোচনার কাছেই শোনা গেল, মেয়েটার নাকি বয়স হইয়াছে অনেক। গরীব বাপ বিবাহ দিতে পারে না, কুড়ি পার হইয়া মেয়ে তাই হইয়া গিয়াছে বুড়ী। —'সময় মত বিয়ে হ'লে এ্যাদ্দিনে তিন ছেলের মা হ'ত, ঠাকুরপো।'

বিবাহ করার জন্য এতদিন সকলের অনুরোধ উপরোধ যথারীতি চলিতেছিল, সুলোচনার ব্যবস্থাতেই বোধ হয় এবার

সেটা দাঁড়াইয়া গেল রীতিমত আক্রমণে। রসিক হার মানিয়া বলিল, তবে তাই হোক।

সুধারাণীকে দেখার জন্য হার মানার ইচ্ছা তার কতটুকু জাগিয়াছিল— বলা কঠিন।

এমনি কপাল সুধারাণীর, প্রথম বারের আলাপে প্রথম শব্দটিতেই সে রসিকের মন বিগড়াইয়া দিল। রসিকের মনে অনুতাপ, আত্মসমর্থন, দ্বিধা সঙ্কোচ ঔৎসুক্যের আলোড়ন চলিতেছিল, কখনও জাগিতেছিল বিষাদ, কখনও প্রত্যাশার আনন্দ। নিজেকে লইয়াই সে বড় ব্যস্ত হইয়া ছিল। একদিন রাত প্রায় এগারটার সময় বাহিরের ঘরে কাজ করার নামে সে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, ধীরে ধীরে সুলোচনা ঘরে আসিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো, একটিও নাকি কথা কওনি বৌয়ের সঙ্গে? একটা দু'টো পর্য্যন্ত নাকি কাজ কয় এখেনে? ছি ঠাকুরপো, ছি, এমন ক'রে কি কষ্ট দিতে আছে ছেলেমানুষের মনে? ঘরে লুকিয়ে চুপি চুপি আজ কাঁদছিল।'

ভাল উদ্দেশ্যেই সুলোচনা বানানো কথাটা বলিয়াছিল, কিন্তু ফলটা হইল বিপরীত। রসিক ভাবিল, ছেলেমানুষ? কাঁদিতেছিল? কি সর্ব্বনাশ! এতটুকু যার ধৈর্য্য নাই, তার কাছে তবে আর কি আশা করা চলিবে?

তবু বিবাহ যখন করিয়াছে, মেয়েটির মনে কষ্ট না দেওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া রসিক আজ প্রথম রাত একটার আগে, সুধারাণীকে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িবার সুযোগ না দিয়াই ঘরে গেল। ভাবিল, সুধারাণীকে বুঝাইয়া দিবে, এসব অবহেলা নয়, আদর যত্ন স্নেহমমতার অভাব তাহার হইবে না। তবে রসিক বুড়া হইয়া পড়িয়াছে কি-না, মানাইয়া চলিতে হইলে সুধারাণীর একটু ধীর স্থির শান্ত না হইলে চলিবে কেন?

খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া সুধারাণী বসিয়া ছিল, আস্তে আস্তে দুলাইতেছিল দু'টি পা। হয় তো আনমনে, নয় তো অভ্যাসের বশে। একে তো তাকে দেখিলেই মনে হয় কার যেন সে প্রতীক্ষা করিতেছে, তার উপর ঠিক তার বড় মেয়েটির মত দু'পাশে হাত রাখিয়া বসিয়া পা দুলাইতে দেখিয়া রসিক হতাশ হইয়া গেল। হয় তো সুলোচনা জানাইয়া দিয়া গিয়াছে এখনই স্বামী ঘরে আসিবে, কিন্তু এমন বেশে প্রেমিকের পথ চাওয়া, এমন অধীর প্রতীক্ষা কেন? হরিণীর মত চঞ্চলা যার দশ বছরের একটি মেয়ে আছে, তার মেয়ের অনুকরণে পা দোলানো কেন?

রসিককে দেখিয়া সুধারাণী একটু জড়সড় হইয়া বসিল— সামান্য একটু। বেশী লজ্জা করিতে সুলোচনা বারণ করিয়া দিয়াছে। রসিক গম্ভীর মুখে হাত দুই তফাতে বসিল, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে তার বাড়ী গিয়া আসন গ্রহণ করার মত আড়ম্বরের সঙ্গে।

কি বলিয়া কথা আরম্ভ করা যায়? এত জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা রসিকের, এত ধীর স্থির শান্ত তার প্রকৃতি, একটি তরুণীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিতে গিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম কি দেখা দিল রসিকের কপালে? হায়রে কপাল, সতর বছর আগে বিবাহের রাত্রেই প্রমীলার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া তার তো কথা খুঁজিতে হয় নাই, ঘর খালি হওয়া মাত্র চাপা গলায় মহাকাব্যের ছন্দে আদরের সুরে আপনা হইতেই যেন উচ্চারিত হইয়াছিল: কেমন লাগছে? এখন থেকে তুমি আমার হয়ে গেলে!

অনিশ্চয়তায় বিপন্ন মানুষের মত চিবুকে আঙ্গুল ঘষিতে ঘষিতে শেষে রসিক বলিল, 'তোমায় ক'টা কথা বলব সুধা।'

সুধা কিছুই বলিল না।

'আমার বয়েস হয়েছে, তোমার হয় তো আমাকে ঠিক পছন্দ হয়নি—'

শুনিয়া চেষ্টা করা গম্ভীর মুখে কি দুষ্টামিভরা হাসিই যে দেখা দিল সুধারাণীর, কানের দুলে আলোর ঝলক তুলিয়া মাথা নীচু করার পলকটির মধ্যে মানুষকে মর্ম্মাহত করা কি তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতেই একবার সে চাহিয়া লইল রসিকের চোখের দিকে। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, 'ধেৎ।'

রসিক নীরবে তার কাজের ঘরে চলিয়া গেল, যখন মনে হইল এতক্ষণ সুধার পক্ষে জাগিয়া থাকা অসম্ভব, তখনও ফিরিয়া গেল না। কাজের ঘরেই শুইয়া রহিল। প্রমীলার আমলেও এঘরে তার জন্য একটি বিছানা প্রস্তুত থাকিত, যদিও তখন এ বিছানায় সে ঘুমাইত কদাচিৎ।

এ ঘরে রাত কাটানোর ব্যবস্থা অবশ্য স্থায়ী করা গেল না, লোকে বলিবে কি? কাজের নামে এখানে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটানো চলে, বিশেষ কাজের নামে মাঝে মাঝে

দু-একটা রাত কাবার করাও চলে, কিন্তু ফাজিল একটা মেয়ে বৌ হইয়া অন্দরে প্রমীলার শয়ন ঘরটি দখল করিয়াছে বলিয়াই সে ঘরটিকে তো জীবন হইতে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা যায় না। প্রৌঢ় রসিকের পক্ষে ওরকম ছেলেমানুষী করা অসম্ভব।

ফাজিল বৌটাকেও একেবারে বাদ দিয়া দিন কাটানো যায় না। বিশেষত সুলোচনা যখন আছে এবং কোমর বাঁধিয়া রসিকের পিছনে লাগিয়াছে। নানা ছুতায় সুলোচনা সুধারাণীকে রসিকের কাছে পাঠায়, এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে রসিকের দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলি খুঁটি-নাটি প্রয়োজন সুধারাণীকে ছাড়া মিটিবার কোন উপায় থাকে না। তার ফলে সুধারাণীর অস্তিত্ব রসিকের কাছে খানিকটা অভ্যস্ত হইয়া যায়, টুকরা টুকরা সান্নিধ্যে বাহিরের একটা সহজ সম্পর্ক তাদের মধ্যে গড়িয়া ওঠে, ছোট-বড় অনেক উপলক্ষে প্রশ্ন আর জবাবের ধাঁচের আলাপ আলোচনাও চলে, কিন্তু আর কিছুই হয় না। মধ্যস্থের চেষ্টায় কবে কোন্ স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল ঘটিয়াছিল, চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, ফাগুনে হাওয়া, রাত জাগা বাজে কথার কাব্য, এই সব চিরকালের মধ্যস্থ ছাড়া?

সুলোচনা বলে, 'ব্যাপারটা কি বলো তো ঠাকুরপো? সুধাকে তোমার পছন্দ হয়নি?'

রসিক বলে, 'বুড়ো বয়সে আবার পছন্দ অপছন্দ!'

'তবু ব্যাপারটা কি শুনি না? না হয় বললেই আমায়?'

'বড় ফাজিল বৌঠান। ফাজিল মেয়ের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার বয়েস কি আমার আছে, আজ বাদে কাল চোখ বুজব আমি?'

সুলোচনা এবার রাগ করিয়া বলে, 'ফাজিল! সুধা ফাজিল! একটা সাত ছেলের মা বুড়ীকে এনে দিলে তুমি খুশী হতে, না? সাত ছেলের মাও কিন্তু একটু আধটু ফাজলামি করে ঠাকুরপো, আর দশটা মানুষের মত। তোমার মত গণেশ ঠাকুর সবাই নয়।'

সুলোচনার রাগ দেখিয়া রসিকের মনের অশান্তি পড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছা তো করে তার সুধারাণীকে বৌ-এর মত আদর করিতে, কিন্তু অনেক দিন আগে প্রমীলার সঙ্গে যে ছেলেমানুষী খেলার আবছা স্মৃতিটুকু শুধু মনে আছে, আজ সে খেলার পুনরাবৃত্তির আরম্ভ করার কথা ভাবিলেই তার যে ভয় হয়, বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয়, দূরে বসিয়া থাকিলে যার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া থাকে, গম্ভীরভাবে তাদের সম্পর্কের গভীর সমস্যার কথা তুলিলে যে দুষ্টামির হাসি হাসে, কাছে গিয়া বসিলেই যার লজ্জা সঙ্কোচ ভীরুতার অসহ্য ন্যাকামি দেখা দেয়, অপটু একটু সেবা যত্নের চেয়ে সর্বাঙ্গের লাবণ্য, মুখের কথা আর চোখের চাহনি দিয়া যে দিবারাত্রি মন ভুলানোর চেষ্টা করে, তাকে আপন করিতে গেলে সং সাজিতে হইবে, অভিনয় করিতে হইবে হাস্যকর। অন্য কিছুতে সুধারাণীর মন উঠিবে না, আর কোন খেলা সে বুঝিবে না। প্রমীলার সঙ্গে যে খেলা তার চলিত শেষের দিকে, তার গাম্ভীর্য গভীরতা আর মাধুর্য্যের খবর তো সুধারাণী জানে না। সাংসারিক সমস্যার আলোচনা যে চটুল প্রেমের কাকলীর চেয়ে প্রীতিকর হইতে পারে, বুঝাইয়া বলিতে গেলে সুধারাণী মুচকি মুচকি হাসে। প্রমীলার প্রথম বয়সের সেই গা-জ্বালানো হাসি, চুম্বন ছাড়া আর কিছু দিয়াই যে হাসি মুছিয়া লওয়া যাইত না।

সুলোচনা যতই চেষ্টা করুক, রসিক তাই মনের বিরাগ জয় করিয়া কোন মতেই নতুন বৌকে কাছে টানিতে পারে না এবং এমনি ভাবে দিন কাটিতে থাকে। সুধারাণীর মুখের বিস্ময় ও বিষাদের ভাব ঢাকিয়া ক্রমে ক্রমে এক দুর্বোধ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে।

কাজের ঘরে প্রতিদিন রাত্রি একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে প্রথম প্রথম রসিকের কষ্ট হইত, মাঝে মাঝে বিছানায় শুইয়া কাজ করিতে গিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িত খেয়ালও থাকিত না। তারপর কি ভাবে তার সে স্বাভাবিক ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর ঘুম আসে না, ঘুমাইতে চাহিলেও নয়। জাগিয়া থাকার জন্ত তাকে আর কোন চেষ্টাই করিতে হয় না। এক সময় মাঝ রাত্রি পার হইয়া যায়, বাড়ী আর পাড়াটা ধীরে ধীরে নিঝুম হইয়া আসে, এই ঘরে শুধু জাগিয়া থাকে রসিক একা। মাথার মধ্যে মৃদু একটা যন্ত্রণা বোধ হয়, দু'চোখ জ্বালা করিতে থাকে কিন্তু ঘুম আসে না। সমস্ত জগৎ চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছে অনুভব করিতে করিতে চিন্তা ও কল্পনার জগৎ যেন স্পষ্ট আর উজ্জল হইয়া উঠিতে থাকে।

প্রমীলার জন্য তখন রসিকের বড় কষ্ট হয়, অবুঝ শিশুর মত তার মন ফিরিয়া চায় প্রমীলাকে। সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে একটা যুক্তিহীন ক্রুদ্ধ অভিযোগ জাগিয়া ওঠার সঙ্গে তার মনে হয়, প্রমীলা থাকিলে এত রাত পর্য্যন্ত তাকে জাগিতে দিত না, জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিত, শুধু কপালে হাত বুলাইয়া ঘুম আনিয়া দিত তার চোখে।

অন্দরের ঘরে গিয়া সুধারাণীকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়া রসিকের সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ধরিয়া যায়। ইচ্ছা হয়, লাথি মারিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেয়। স্বামীর আগে যে ঘুমাইয়া পড়ে, স্বামীকে যে ঘুম পাড়াইতে জানে না, সে কি মেয়েমানুষ, সে কি বৌ?

সেদিন রাত্রি সবে দশটা বাজিয়াছে। পাড়ার একজন গল্প করিতে আসিয়াছিল। হাতের আড়ালে তাকে হাই তুলিতে দেখিয়া রসিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'শরীর খারাপ নাকি হে?'

'না, দুপুরে ঘুমোইনি, ঘুম পাচ্ছে।'

একটু পরে আর একবার হাই তুলিয়া সে চলিয়া গেল। রসিক ভাবিল, কোন ছুতায় মানুষটাকে অনেক রাত পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিতে পারিলে ঘুমের সঙ্গে তার লড়াইটা দেখা যাইত। মাঝ রাত্রে নিদ্রাহীন চোখে তার জাগিয়া থাকার কসরত দেখিয়া একটু কি আমোদ পাওয়া যাইত না? তাছাড়া, ঘুম হয় তো সংক্রামক। চোখের সামনে ঘুমে একজনের দেহ অবশ আর চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তার চোখেও হয় তো একটু আবেশ আসিত ঘুমের।

না, তা আসিত না। সুধারাণীকে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কি একদিনও তার ঘুম আসিয়াছে?

কাজে আর মন বসিল না, উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চেয়ারটা একটু পিছনে ঠেলিয়া দিয়া হেলান দিয়া বসিয়া টেবিলে পা তুলিয়া দিল। ঠিক সামনেই দেয়ালের গায়ে বড় একটি ফটো টাঙ্গানো; দামী ফ্রেমের মধ্যে সাধারণ ঘরোয়া সাজে প্রমীলা দাঁড়াইয়া আছে, মুখে দুষ্টামি ভরা তৃপ্তির হাসি। ফটোখানা ছাড়া এদিকের দেয়ালটি একেবারে ফাঁকা, এখানে ওখানে কতগুলি পেরেকের দাগ শুধু আছে। বুঝা যায়, আরও দু-চারখানা ফটো বা ছবি এ দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে।

গড়গড়ার নল মুখে দিয়া টানিতে গিয়া রসিকের খেয়াল হয়, প্রমীলার ফটো ঘিরিয়া একটা নূতনত্বের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কালও যার অস্তিত্ব ছিল না—টাটকা ফুলের একটি মালা। তাই বটে, সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকিয়া মৃদু একটু ফুলের গন্ধ সে পাইয়াছিল। তারপর তামাকের ধোঁয়ায় কখন সে গন্ধ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, ফ্যানের বাতাসে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রমীলার ফটোতে হঠাৎ টাটকা ফুলের মালা জড়াইল কে? এ বুদ্ধি জাগিল কার? প্রথম কয়েক মাস সে নিজেই বিকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় মোড়ের দোকান হইতে মালা কিনিয়া আনিয়া ফটোতে পরাইয়া দিত, একদিন বাসি মালাটি খুলিয়া নতুন মালা পরাইয়া দিবার সময় হঠাৎ তার মনে হইয়াছিল, ফুলের মালা দিয়া স্মৃতির মর্য্যাদা বজায় রাখিতে চেষ্টা করার মত ছেলেমানুষী আর হয় না। একথা কেন মনে হইয়াছিল কে জানে, সেদিন হইতে আর সে মালা কেনে নাই। এতদিন পরে আবার ফুলের মালা দিয়া প্রমীলার স্মৃতিকে পূজা করিল কে?

অন্দরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া বাড়ীর চাকর নিখিল ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া চলিয়া গেল। রোজ এই সময় এমনি ভাবে সে একবার উঁকি দিয়া যায়। দু-চার মিনিটের মধ্যে প্রমীলা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, মৃদুস্বরে অনুরোধ জানায়, 'খেতে চলো?' আজও সে আসিল, রসিকের টেবিলে তোলা পায়ের কাছেই টেবিলে হাত রাখিয়া সহজভাবে মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টায় চিবুক পর্য্যন্ত চোখ তুলিয়া বলিল, 'খেতে যাবে না?'

পা নামাইয়া রসিক সোজা হইয়া বসিল।

রসিক জানে, এসব সুলোচনার ব্যবস্থা। খাইতে বসিবার সময় হইলে সুলোচনার হুকুমে নিখিল আসিয়া দেখিয়া যায় ঘরে বাহিরের লোক কেউ আছে কি না, তারপর সুলোচনার হুকুমেই সুধারাণী তাকে ডাকিতে আসে। অল্পদিন আগে তার যে বিবাহ হইয়াছে একথা ভুলিয়া গিয়া অনেকদিনের পুরানো বৌ-এর মত একটু গিন্নি গিন্নি ভাব দেখানোর করুণ চেষ্টার মধ্যেও রসিক সুলোচনার

শিক্ষা ও পরামর্শ স্পষ্টই দেখিতে পায়। কোন দিন সে আমোদ পায়, কোন দিন মমতা বোধ করে। আজ কিন্তু মনটা তার বিগড়াইয়া গিয়াছিল।

'তুমি মালা দিয়েছ?'

প্রশ্নে নয়, গলার আওয়াজে সুধারাণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চিরদিন সে বড় ভীরু, তার উপর কুমারী জীবনের অন্তে এই প্রৌঢ় বিপত্নীকের বৌ হইয়া খাপছাড়া অস্বাভাবিক অবস্থায় তার দিন কাটিতেছে।

'এসব ঢং শিখলে কোথায়? যেখানেই শিখে থাকো, আমি ওসব পছন্দ করি না। বুঝলে?'

আঙ্গুলে আঁচলের কোণটা জড়াইয়া যাইতে থাকে আর রসিক নিজের উপর বিরক্ত হইয়া ভাবে যে রাগ না করিয়াও এমন কড়া কথা সে বেচারীকে বলিল কেন? এসব কিছু বলার ইচ্ছাও তো তার ছিল না! প্রমীলার ফটোতে মালাটালা সে যেন আর না দেয় শুধু এই কথাটা সে সুধারাণীকে বলিবে ভাবিয়াছিল। সুধারাণী যদি এখন কাঁদিয়া ফেলে সে কি করিবে?

সুধারাণী কিন্তু কাঁদাকাটা করিল না, একটু কাঁদো কাঁদোও মনে হইল না তার মুখখানা। একটু রাগের ভঙ্গিতেই যেন দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিল। তখন একটা সন্দেহ মনে জাগায় রসিক বলিল, 'যেও না, শোন। বৌঠান তোমাকে মালা দিতে বলেছে নাকি?'

'জানি না। আমিই যদি দিয়ে থাকি, কি করবে তুমি? মারবে?'

জবাব, জবাব দেওয়ার ভঙ্গি, গলার সুর সমস্তই অপ্রত্যাশিত। রসিক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সুধারাণীও যে এতখানি অভিমান করিয়া অন্যায় ভৎ'সনার বিরুদ্ধে এমন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাইতে পারে, এ যেন একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আজ পর্য্যন্ত একবারও সুধারাণীকে সে এমন ভাবে কথা বলিতে শোনে নাই। হয় তো সুযোগ দেয় নাই বলিয়া, সুযোগ পাইলে আগেই হয় তো সে এমনিভাবে ফোঁস করিয়া উঠিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিত—নতুন বৌ হইলেও সে কাপড়-মোড়া তের বছরের ছিঁচকাঁদুনে খুকী নয়। রসিকের মনে হয়, আজ এই মাত্র সে যেন সুধারাণীর অস্তিত্ব প্রথম অনুভব করিয়াছে, এতদিন সে যেন থাকিয়াও ছিল না।

তাই কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন ভুলিয়াই গেল যে সুধারাণী প্রমীলা নয়। প্রমীলা রাগ করিলে যে ভাবে তার রাগ ভাঙ্গানো একরকম অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল রসিকের, আজও তেমনি ভাবে বড় রকম ভূমিকা করিয়া সে রাগ দূর করিতে গেল সুধারাণীর। কিন্তু বেশীদূর এগানো গেল না, হাত ধরিয়া প্রাথমিক আদরের ভোঁতা কয়েকটা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই সে চাহিয়া দেখিল, সুধারাণীর গাল বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

প্রমীলা হইলে কাঁদিত না। আগে হইতে কাঁদিতে থাকিলেও কান্না বন্ধ করিয়া দিত। মুখের মেঘ কাটিয়া হাসি ফুটিতে হয় তো সময় লাগিত অনেকক্ষণ। কিন্তু চোখের জল ফেলিয়া সে ন্যাকামি করিত না।

সুধারাণীর ছেলেমানুষী কান্না সচেতন করিয়া দেওয়ায় রসিক অপ্রস্তুত হইয়া থামিয়া গেল। সোহাগের কথা বন্ধ করিয়া ভদ্রতা করিয়া বলিল, 'খিদে পেয়েছে, চলো খেয়ে আসি। রান্না হয় নি?'

সুধারাণী চোখ মুছিয়া বলিল, 'হয়েছে। রাগ করলে?'

রসিক জবাব দিল না। ক'দিন আগে তার ক্রন্দনশীলা দশ বছরের মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে দিতে হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় সেও এমনিভাবে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'রাগ করেছ বাবা?' বলিয়া বাপের রাগের ভয়ে নিজের কান্না বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

কদিন খুব গরম গিয়াছে। প্রথম বর্ষার গুমোটের সিদ্ধ করা গরম। রসিকের খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বৃষ্টি নামিল। আজ কি সকাল সকাল ঘুম আসিবে, বৃষ্টি নামিয়া ঠাণ্ডা পড়িয়াছে বলিয়া? কাজের ঘরে গিয়া কয়েক মিনিট তামাক টানিয়া রসিক তাড়াতাড়ি আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। বিছানায় উঠিয়া গা এলাইয়া দিলে চিরদিন যেমন আরাম বোধ হইয়াছে, আজও তেমনই আরামে কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকা গেল। তারপর যথারীতি ইচ্ছা জাগিল পাশ ফিরিবার এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সুরু হইয়া গেল এপাশ ওপাশ করা, ছটফটানি।

উঠিয়া আলো জ্বালিয়া রসিক চেয়ারে বসিয়া টেবিলে পা তুলিয়া দিল। বৃষ্টির ঝমঝমানি ইতিমধ্যেই থামিয়া গিয়াছে। ভিতর হইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। কার যেন হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর আসিল ছোট ছেলের কান্না—সব শব্দের চেয়ে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। খোকা কাঁদিতেছে—হয় তো ভয়ে, নয় খিদায়। ওকে দেখিবার তো কেউ নাই।

রাত্রি বাড়ে। ভিতরের আর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। দেয়ালের ঘড়িটা শুধু তার জন্য অবিরাম সেকেণ্ড গুনিয়া চলে। ফ্যানটা চালানো হয় নাই, আবার গরম বোধ হইতেছে। প্রমীলার ছবিতে জড়ানো মালার মৃদু গন্ধ আবার যেন অস্তিত্ব জানাইয়া দিতে চায়। চোখের মত মন জ্বালা করে রসিকের।

তখন অন্তরের শুষ্কতা হইতে ভাসিয়া আসে ফুলের গন্ধের মত এক আশ্চর্য্য মৃদু সুর। কে যেন ঘুম-পাড়ানি গান গাহিতেছে।

উৎকর্ণ হইয়া সে সুর শুনিতে শুনিতে রসিক পা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। চটি ফেলিয়া রাখিয়া খালি পায়ে ভিতরে যায়। তার কেমন ভয় করিতে থাকে, একটু শব্দ হইলেই সুর থামিয়া যাইবে।

ঘরে আজ মেঝেতে আর একটি নূতন বিছানা পাতা হইয়াছে। কাত হইয়া মাথা উঁচু করিয়া পাশে শুইয়া সুধা ঘুম পাড়াইতেছে খোকাকে।

মুখ তুলিয়া সুধা বলিল, 'চুপ্। আস্তে!'

রসিক এতক্ষণ কোন শব্দই করে নাই। আরও সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া সে খাটের বিছানায় গিয়া বসিল। সুধা যেন লজ্জা সঙ্কোচ ভুলিয়া গিয়াছে, আঁচলটা একবার টানিবার চেষ্টাও সে করে না, অসম্বৃত অবস্থাতেই খোকাকে ধীরে ধীরে থাপড়ায় আর মুখে গুন গুন করিয়া গাহিয়া যায় ঘুমপাড়ানি গান।

রসিকের কেমন শ্রান্তি বোধ হয়, সমস্ত শরীর যেন ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসে। বালিশে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়ে। চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়া লাগিয়া সুধা ঝাপসা হইয়া যাইতে থাকে, চোখের পাতা ভারি হইয়া বুজিয়া আসে।

জড়ানো গলায় সে ডাকে, 'প্রমীলা? এসো।'

সুধা চাপা গলায় সাড়া দেয়, 'আসছি। খোকা ঘুমোক।'

রাঙ্গা ফল

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

রাম ও রহিমে বেজায় দোস্তি, একই গাঁয়েতে ঘর।
দু'জনায় ভারি ভালবাসাবাসি—ছিল না মনান্তর।
রামের 'মাচা'র কদু-পুঁইশাক রহিমেরে দিয়া যায়।
রহিমের গাছে পাকিলে কদলী, রামকে দিয়া সে খায়।
পশ্চিমা এক সাধু-দরবেশ একদা নদীর কূলে
গাড়িল তাঁহার আস্তানা সেথা বটবৃক্ষের মূলে।
খবর পাইয়া রাম ও রহিম আসিল উভয়ে ছুটি'।
শ্রদ্ধার ভারে উভয়ে তাঁহার চরণে পড়িল লুটি'।
উঠিয়া-পড়িয়া করে সাধু-সেবা রাম ও রহিম নিত্য।
দুইটি বন্ধু শ্রীচরণে তাঁর যেন অনুগত ভৃত্য।
কয় মাস পরে সাধু-মহারাজ গেল যবে গ্রাম ছাড়ি',
কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইল রাম, রহিম ভিজালো দাড়ি।
দরবেশ কহে—'শোচ্ করো মৎ'—এই বলে ঝুলি ঝেড়ে
এক রাঙ্গা ফল করিয়া বাহির দিয়া গেল উভয়েরে।
সে ফল পাইতে উভয়েরি মন করে ওঠে আন্‌চান্।—
কোন্ স্বরগের কল্পতরুর না-জানি সে মহাদান!
রহিম কহিল—'আমি ল'ব উহা, আমারে করেছে দান।'
রাম কহে তেড়ে—'ও ফল আমার! ভাগ্ বেটা শয়তান!'
এই ল'য়ে ক্রমে বাধিল কলহ, মারা-মারি, লাঠা-লাঠি।
উভয়ের মাথা ফাটিয়া রক্তে ভিজিয়া উঠিল মাটি।
লাঠির আঘাতে ফলও ফাটিল; কিন্তু হায় রে উহা
শস্যহীন শূন্যগর্ভ—একেবারে ভুয়া!
লাজে উভয়ের মাথা হ'ল হেঁট; রাম ব'নে গেল বোবা!
আফসোস ভরে রহিম কহিল—'আরে এ কি! তোবা—তোবা!'
মাথার বাঁধিয়া ব্যাণ্ডেজ দোঁহে ফিরে এল নিজ ঘরে।
সরমের গ্লানি বক্ষে ভরিয়া আবার মিতালি করে!

রবিমামা—না—রবীন্দ্রনাথ ?

শ্রীসরলা দেবী

কার কথা লিখতে অনুরোধ করেছেন আমায় ভারতবর্ষের সম্পাদক মহাশয় ? যিনি জন্মগত রবিমামা আমার—না যিনি আমার দেশগত, জাতিগত, মানবিকতাগত রবীন্দ্রনাথ ?

কোন হিসাবেই তিনি আমার কাছে কম নন। আমাকে মানুষ করেছিলেন—বাইরে থেকে বঙ্কিম—গাছকে যেমন বাইরের আকাশ বাতাস অক্সিজেনাদি দিয়ে বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু মূল থেকে রস দিয়ে আমার শৈশবের কৈশোরের অনু-প্রত্যণুকে যিনি সিক্ত করেছিলেন, আমার মানসিক গঠনের উপাদান প্রচুর হতে প্রচুরতররূপে যাঁর কাছ থেকে সরবরাহ হয়েছিল সেই রবিমামা আমার জীবনে চির-অনুস্যূত, চিরপ্রতিষ্ঠ।

যোড়াসাঁকোয় আমাদের তিন ভাইবোনের পড়ার ঘরে, পণ্ডিতমশায়ের শাসনক্লিষ্ট চড় চাপড়টার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের বাড়ী মারের আতঙ্কে আতঙ্কিত আটবছরের শিশুহৃদয়ে এক একটা বিরামের ছন্দ এনে, ঘরের শেলফে সঞ্চিত এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজের দু একখানা তুলে নেবার জন্যে যাঁর মুখরিমার হঠাৎ উদয়ে আমাদের বুকে একটা আনন্দের ঝাপটা উঠত, পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে দুএকটি সহাস্য কথার বিনিময়ে সূর্য্যোদয়ে জমাট মেঘের ছড়িভঙ্গির মত পড়ার ঘরে জমে ওঠা কঠোরতার হাওয়া ক্ষণিকের মত লঘু করে দিয়ে বেরিয়ে যেতেন যিনি—তিনি ছিলেন আমাদের রবিমামা। প্রথমবারের বিলেত যাত্রা থেকে তখন সবে বাড়ী ফিরেছেন।

বাড়ীতে গান-বাজনা ও অভিনয়াদির দিক থেকে তাঁর প্রাধান্য তখন ক্রমশঃ ফুটছে। এর আগে নতুনমামা —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—সে দিককার কর্ণধার ছিলেন। রবীন্দ্রের বিলেতনিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ী তখন। আমাদের শিশুকণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকত বড় বড় ভাবের বড় বড় কথার বড় বড় রাগ—"চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথে—য়ে য়ে য়ে"—বাগেশ্রীর তানে আমাদের গলা ও মন খেলিয়ে খেলিয়ে উঠত।

ভূমি তৈরি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এসে তাতে নতুন নতুন বীজক্ষেপ করতে থাকলেন। তিনি আসার পর প্রথম যে একটি ছোট্টগী তিনাট্যের অভিনয় হল—যাতে ইন্দ্র ও শচী সাজেন নতুনমামা নতুনমামী এবং বসন্ত সাজেন রবিমামা, তার নাম "মানময়ী", নতুনমামাই তার রচয়িতা।

তারপর হল সরস্বতী পূজার দিন 'সারস্বত সম্মিলনে' ছাদের উপর ষ্টেজ বেঁধে, বাইরের লোক নিমন্ত্রণ করে মহা ধুমধামে 'বাল্মীকি প্রতিভা'। পরে আরো কত কি।

এসব মধুচক্রের রচয়িতা বড়রা হলেও আমরা ছোটরা নিত্য তাঁদের প্রসাদ-মধুপায়ী ছিলুম। কখনো কখনো তাঁদের অনুকরণে নিজেদের দল বেঁধেই আবার ঐ সবের অভিনয়পরায়ণ হতুম। আমাদের নেতা ছিলেন সুধীদাদা—বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। তিনি যাঁর অনুকরণ করে ঠিক ঠিক সেই রকম বাল্মীকি সাজতেন, নিজের হাতের লেখাটিও যাঁর লেখার প্রায় অবিকল প্রতিরূপ করে তুলেছিলেন—তিনি ছিলেন আমাদের রবিমামা। তখনো তিনি সে প্রখ্যাত রবীন্দ্রনাথ হননি—যাঁর হস্তলিপির অনুলিপি দেশের ডজন ডজন ভক্ত ছেলেরা করেছে।

এই রকমে পরোক্ষভাবে সঙ্গীতপ্রাণকতায় আমরা রবিমামার অধিনায়কত্বে আসতে থাকলুম। কিন্তু যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ হল সে ১১ই মাঘের গানে। এর আগে ১১ই মাঘের গানের অভ্যাস বড়মামা, নতুনমামা বা বোম্বাইপ্রবাস প্রত্যাগত মেজমামা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহ-নেতৃত্বাধীনে থাকত। রবিমামা বিলেত থেকে ফেরার পর তিনিই নেতা হলেন। নিজে নতুন নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করা, ওস্তাদের কাছ থেকে সুর নিয়ে সুরভাঙা, কখনো নিজের ধারার সুর তখন থেকেই তৈরি করা ও শেখান—এ সবের কর্তা হলেন রবিমামা। বাড়ীর সব গাইয়ে ছেলেমেয়েদের ডাকও এই সময় থেকে পড়ল। আগে শুধু অক্ষয়বাবুপ্রমুখ ওস্তাদের দল ১১ই মাঘের গায়ক

ছিলেন ; তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রতিভাদিদির—সেজমামার কন্তার—কখনো কখনো স্থান হত।

কর্ম্মজীবনে যে তৎপরতা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা হয়ে দেখা দিয়েছিল এখনি তার একটু আভাষ পাওয়া গেল। আর শেষদিন পর্য্যন্ত ছাপান কাগজের জন্তে অপেক্ষা নয়। দিন দুয়েক হাতে হাতে নকল করা দু একখানা কাগজ ভাগাভাগি করে গান অভ্যাসের পর প্রায় তৃতীয়দিনের মধ্যেই সকাল সন্ধ্যা দুবেলার গানের বইয়ের বিশ পঁচিশখানি প্রুফ আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে তুলিয়ে আনিয়ে প্রত্যেক গায়কের হাতে একখানি করে বই বেঁটে দিয়ে স্বয়ং আসরে বসে শেখান কার্য্যে ব্রতী হতে থাকলেন রবিমামা।

আগেকার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির ভাব অদ্বৈতমূলক, উপনিষদের শ্লোকাবলীর প্রায় অনুবৃত্তি, আমাদের পক্ষে তার মর্ম্মে প্রবেশ দুরূহ ছিল। কিন্তু রবিমামার আমলের সঙ্গীত গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য মিশিয়ে শিশুচিত্তে একটা অব্যক্ত আলোড়ন আনতে থাকল। কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না, কিন্তু হৃদয় যেন কোন সুদূর আনন্দের আঁচল ছুয়ে আসে। এমন কি এই গানটি আমার ন দশবছরের শিশু মনেও কোন্ কবাটে ঘা দিত—"তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা—আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব।"

শুধু ধর্ম্মসঙ্গীতে নয়, এখন থেকে কত ভাবের কত গানে বাড়ী সদাগুঞ্জরিত হতে থাকল। বাড়ীতে শেখা দিশী গানবাজনায় শুধু নয়, মেমেদের কাছে শেখা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের চর্চ্চায়ও আমাদের উৎসাহদাতা যিনি ছিলেন—সে আমার রবিমামা।

আমার একটা নৈসর্গিক কুশলতা বেরিয়ে পড়ল—বাঙ্গলা গানে ইংরিজী রকম কর্ড দিয়ে ইংরিজী 'piece' রচনা করা। একবার রবিমামা আমাদের একটা 'task' দিলেন—তাঁর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাকে পিয়ানোতে প্রকাশ করা। একমাত্র আমিই সেটা করলুম। মনে পড়ে তাতে কি অভিনিবেশ শিক্ষা দিলেন! কি গভীর ভাবে কাব্যের অর্থবোধ ও সঙ্গে সঙ্গে সুরে ও তালে তাকে দেহদান করার অপূর্ব্ব গহন আনন্দকূপে আমায় ডুব দেওয়ালেন।

তখন আমার বয়স বারো বৎসর। হঠাৎ সেই জন্মদিনের সকালে রবিমামা এলেন হাতে একখানি য়ুরোপীয় music লেখার manuscript খাতা নিয়ে। তার উপর সুন্দর করে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"'Socatore'—Composed by Sarola।"

'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে' বলে রবিমামার একটি ব্রহ্মসঙ্গীতকে আমি রীতিমত একটা ইংরেজী বাজনার piece এ পরিণত করেছিলুম। পুরোদস্তুর ইংরিজী piece, পিয়ানোতে বা ব্যাণ্ডে বাজাবার মত।—না জানলে কেউ চিনতে পারবে না এর ভিতরটা দিশী গান, জানলে তারা উদারা মুদারা তিনটে গ্রামে ছড়ান কর্ডের বহুস্বরের বৈচিত্র্যের ভিতর থেকে আসল সুরটির উঁকিঝুঁকি ধরে ফেলে বিস্ময়ামোদিত হবে।

ইংরিজী বিধানে সপ্তাঙ্গে সম্পূর্ণ সেই বাজনাখানি আমার মাথায় স্তরে স্তরে লেখা ছিল। কাউকে শোনাতে গেলেই সবটা মনের থেকে হাতে বেরিয়ে এসে বাজত। রবিমামা খাতাখানি দিয়ে বল্লেন—"এইতে লিখে রাখ, ভুলে যাবি।"

লেখা হল, কিন্তু ভোলাও হল। কেননা সে খাতাখানি গেছে হারিয়ে—আমার জীবনের সবই কিছু যেমন হারানর তহবিলে গেছে চলে।

তারপরেও "চিনি গো চিনি বিদেশিনী" প্রভৃতি অনেকগুলি রবীন্দ্রগান এবং "হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও" প্রভৃতি দুই একটি নিজের গানও আমার হাতে সেই রকমে য়ুরোপীয়ান্বিত হয়েছিল। অন্তরটি এদের একহারা দিশী সুর, বাইরের শরীরটি তাদের উচ্চ নীচ নানা সপ্তকে নানা সুরের অবিসম্বাদী সুমধুর মিলনময় একটি রূপ। এ সব গান শেখান এবং গাওয়ানও হয়েছে অনেকবার অনেক সঙ্গীত সভায়। ইংরেজী স্বরলিপি প্রথায় লেখার শ্রমও করেছেন আমার মেজমামার কন্তা ইন্দিরা দেবী, কিন্তু বই করে কোনদিন ছাপান হয়নি। ছাপাখানার সুযোগের অভাবে, কিম্বা আমার ভিতর থেকে সে বিষয়ে দুর্দ্দমনীয় আগ্রহের ও চেষ্টার অভাবে।

কিশোর বয়স পর্য্যন্ত আমরা থাকি বড়দের হাতে সলতের মত। ভিতরে ভিতরে জ্বলার ধর্ম্ম থাকলেও তাঁরা উস্কে না দিলে সব সময় জ্বলিনে। আর জ্বলাটা যদি অভ্যাসগত না হয়ে যায়—অভ্যাসটা যদি একবার পার হয়ে যাওয়া যায়, পরে আর নিজেকে নিয়ে আবারো উদ্যম আসে না। আমার বিধাতা আমার [illegible] সাহিত্যে কোনদিকে আমার

কাজে নিযুক্ত করেন নি, তাদের মুদ্রাঙ্কনের উদ্যোগ ময়ও করেন নি। তাই আজ পর্য্যন্ত আমার সব লেখাই প্রায় 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ এবং গানগুলি আমার খাতায় বা গায়কদের মুখে মুখে। আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয়নি—মাত্র গুরুদাস চাটুয্যে কোম্পানীর আট আনার এডিশনে ছাপান কতকগুলি ছোট গল্প ও নিতান্ত ইদানীংকার দুয়েকটি আধ্যাত্মিক লেখা ছাড়া। লাহোর থেকে দুএকবার চেষ্টা করে ব্যর্থশ্রম হয়েছি।

তাই প্রাণের গভীরে আমার যে সুরদেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে নিত্য হবিঃ দানে তাঁর পুষ্টিসাধনা করে তাঁর দ্বারা আমারও পুষ্টিবিধানের হোতা যিনি ছিলেন—সে আমার রবিমামা। আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম। যেখান সেখান থেকে নতুন নতুন গান ও গানের সুর কুড়তুম। রাস্তায় গান গেয়ে যাওয়া বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী ভিখারীদের ডেকে ডেকে পয়সা দিয়ে তাদের কাছে তাদের গান শিখে নিতুম। আজও সে ঝোঁক আছে।

কর্ত্তাদাদামহাশয় চুঁচড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁর মত সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম—অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙ্গে, কথনো কথনো কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন। "কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ"—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" "আমার সোনার বাংলা" প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান।

মহীসুরে যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় সে গানের সাজিখানি খালি না করা পর্য্যন্ত মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধ-চিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন—তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল। "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে", "এস হে গৃহদেবতা", "এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ", "চিরবন্ধু চির-নির্ভর"—প্রভৃতি আমার-আনা সুরে বাঁধা গান।

আমার সব সঙ্গীতসঞ্চয়ের মূলে তাঁকে নিবেদনের আগ্রহ লুকিয়ে বাস করত। দিতে তাকেই চায় প্রাণ, যে নিতে জানে। বাড়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রহীতা ছিলেন রবিমামা, তাই আমার দাতৃত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাঁতে।

"বন্দেমাতরম্"এর প্রথম দুটি পদে তিনি সুর দিয়েছিলেন নিজে। তখনকার দিনে শুধু সেই দুটি পদই গাওয়া হত। একদিন আমার উপর ভার দিলেন—"বাকী কথাগুলোতে তুই সুর বসা।" তাই "ত্রিংশকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে" থেকে শেষ পর্য্যন্ত কথায় প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলুম। তিনি শুনে খুসী হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল।

আমার সাহিত্যগত রুচিও গড়ে দিয়েছিলেন রবিমামা। ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীট্‌স্, শেলি প্রভৃতির রসভাণ্ডার যিনি আমার চিত্তে খুলে দেন—সে আমাদের রবিমামা। মনে পড়ে দার্জ্জিলিঙের 'Castleton House'এ যখন মাসকতক রবিমামা, মা, বড়মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম—প্রতি সন্ধ্যাবেলায় Browningএর "Blot in the Scutcheon" মানে করে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ে শোনাতেন। Browningএর সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়। সেই সময়ই পিঠে একটা ফোড়ায় যখন শয্যাশায়ী তখন শুয়ে শুয়ে "মায়ার খেলা" গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রতিদিন একটি দুটি করে গান রচনা করতেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় শিখিয়ে দিতেন।

সুধীদাদা বাড়ীতে 'ভাই বোন সমিতি' খোলেন। তাতে ম্যাথু আর্নল্ডের "Sohrab and Rustum" যিনি আমাদের প্রথম ব্যাখ্যা করে শোনালেন—সে রবিমামা। ম্যাথু আর্নল্ডের 'Appereciations' বলে বইখানি পড়তে যিনি আমায় প্ররোচনা দিলেন—সে রবিমামা।

রবিমামা একবার সপরিবারে সাত আট মাস গাজীপুরে গঙ্গার ধারে বসবাস করেছিলেন। আমরা বাড়ীর কয়েকটি ছেলেমেয়েরা ছুটি পেলেই সেখানে পৌছে যেতুম। তখন আমি এফ-এ পড়ছি। আমার কলেজ-পাঠ্যের চেয়ে অনেক বেশী কিছু ইংরেজী-সাহিত্যে সু-অধীত হবার তিনি নিমিত্তক ছিলেন। একেবারে হাতে ধরিয়ে দিতেন বই, ফাঁকি দেওয়ার যো ছিল না। শুধু সুকুমার সাহিত্য নয়, তখনো ভারি ভারি সাহিত্যেরও রসগ্রহণে আগ্রহ জন্মিয়ে দিয়েছেন।

গাজীপুরে পড়া একখানি বই মনে পড়ে—Gibbon's Rise and Fall of the Roman Empire। চৌদ্দ বছরের মেয়ের পক্ষে গলায় আটকাবার মত। কিন্তু তাঁর এ বিষয়ে কার্পণ্য ছিল না। গাজীপুরেই তাঁর মানসীর অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়।

গাজীপুরে যাবার দিন পনের পরে বোধহয় আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখি। সে চিঠি পেয়ে তিনি লিখলেন—"লক্ষি মেয়ে তুই। ভাবিসনে লক্ষীর বানানটা আমি জানিনে। কিন্তু বিদেশে মামাকে মনে করে চার পাত ধরে সব খবরাখবর দিয়ে যে চিঠি লেখে সে লক্ষি—সুধু লক্ষী নয়।" রবিমামার কত চিঠি, বঙ্কিমের এবং আরো কতজনের চিঠির সঙ্গে সঙ্গে লাহোরের রাজনৈতিক অগ্ন্যুৎপাতে অগ্নিসাৎ হয়েছে। একটি বাক্সে রক্ষিত আমার বাঙ্গালা চিঠি পত্রতে পাছে রাজদ্রোহীদের সঙ্গে আমার কোন সংযোগ ধরে আমার জেলে যেতে হয় এই ভয়ে আমার স্বামীর আত্মীয়স্বজনেরা একদিন রাতারাতি অজ্ঞাতসারে আমার সব হাতের লেখা কাগজ ও চিঠিপত্র পুড়িয়ে ছাই করে আমার অতীত জীবনের সব স্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভে লীন করে দিয়েছিলেন।

যোড়াসাঁকোর বাইরের তেতালার খাবার ঘরের গোল টেবিল ঘিরে বসা বড়দের কত রকম আলোচনায় কান ও মন পেতে রেখে, টেবিল থেকে ঝরা গুঁড়োগাড়া নিয়ে আমার সাহিত্যশরীরের যে পুষ্টিসাধন হত, সে পুষ্টিদানের প্রধান যিনি ছিলেন—তিনি রবিমামা। এখনও মনে আছে একদিন তাঁদের মধ্যে Miltonএর Satan সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। রবিমামা বল্লেন—ঈশ্বরের পরেই অথচ ঈশ্বর নয়, একটা মহোচ্চতম পদের অত্যন্ত সান্নিধ্য অথচ সেই সর্ব্বোচ্চতমতায় পৌছনর আশা কোন কালে নেই—এ রকম বিধির বিধানে Satanএর মত ভগবদ্দ্বেষী মনোভাব হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বরং ঈশ্বরের অনেক নীচে যে সব পার্ষদ Archangels আছে তারা নিরাপদ, কেননা তারা Satanএর মত তাঁর অব্যবহিত পরেই না হওয়ায় একেবারে সেই চরম পদলোভে লুব্ধ নয়।

রবিমামার এই কথাগুলা বড় হয়ে অনেকবার মনে মনে ঘুরেছে। তার সমাধানও পেয়েছি। দোষ হচ্ছে Miltonএর কল্পনায় নয়, Semitic পরিকল্পনায়। আর্য্য ঋষিদের সাধনার দ্বারা জীবাত্মার পরমাত্মায় বিলীনতার তত্ত্বে, সসীম খণ্ড অনীশ্বরের অসীম অনন্ত পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবত্তার পরিণতির যৌগিক প্রত্যক্ষের দ্বারা তাঁরা Satan হোক যে কোন অসুর হোক—তার সুরত্ব বিলোপের পন্থা ঘোষণা করে গেছেন।

রবিমামার প্রথম জন্মদিন-উৎসব আমি করাই। তখন মেজমামা নতুনমামার সঙ্গে তিনি ৪৯নং পার্ক ষ্ট্রীটে থাকেন। অতি ভোরে উল্টাডিঙ্গির কাশিয়াবাগান বাড়ী থেকে পার্ক ষ্ট্রীটে এসে নিঃশব্দে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে নিজের হাতে গাঁথা বকুলফুলের মালা ও বাজার থেকে আনান বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য ফুল ও এক যোড়া ধুতি চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন। "রবির জন্মদিন" বলে একটি সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে পরিজনদের মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল।

'বালকে' প্রকাশিত আমার প্রথম প্রথম রচনা উদ্যমের পর—'ভারতী'তে "প্রেমিক" সভা বলে অম্লাক্ষরিত কিঞ্চিৎ হাস্যরসান্বিত একটি লেখা লিখে Byronএর মত আমি একদিন হঠাৎ জেগে উঠে যখন দেখলুম বড় লেখক হয়ে গেছি, চারদিক থেকে প্রশংসা বর্ষণ হতে থাকল—তখন আর সবাইকে পিছিয়ে রেখে রবিমামা যখন অপ্রত্যাশিত-ভাবে অভিনন্দন করে বললেন—"নাম দিসনি বলে তোর এ লেখার ঠিক যাচাই হল। নতুন হাতের লেখার মত নয়, এ যেন পাকা প্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা। এ যদি আমারই লেখা লোকে বলত আমি লজ্জিত হতুম না।" এত বড় সমাদরে আমি আহ্লাদে লজ্জায় মৌন হয়ে গেলুম।

তখন থেকে আমার কলম খুলে গেল। এর পরই 'ভারতী'তে আমার 'রতিবিলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র সমালোচনা বেরোয়। তা' পড়ে বঙ্কিমের সঙ্গে সঙ্গে রবিমামাও আবার বল্লেন—"তোর মন্তব্য যেন অভিজ্ঞের মন্তব্য, অনভিজ্ঞের টলমলে কথা নয়। পাকা মনের কথা পাকা হাতে ফোটান। ভাষাও তোর সুন্দর সরল অবাধ। লিখে যা।"

এর কিছুদিন পরে মার সঙ্গে সোলাপুরে মেজমামার কাছে যাই। সেখানে থাকতে থাকতে "জ্ঞানাঙ্কুর"খানা

আবার পড়ে তার সমালোচনা করে রবিমামাকে চিঠি লিখি। সে সমালোচনা সম্যক্ আলোচনা—কেবলই প্রশংসা নয়—তাতে এ কাব্যের কয়েকটি ত্রুটি যেমন যেমন আমার মনে ঠেকেছিল তার উল্লেখ করেছিলুম। সে চিঠির উত্তরে লিখলেন—"যদিও আমারি লেখার খুঁৎ ধরেছিস তবু যা বলেছিস ঠিক। এতে তোর বিচারশক্তির আর নিগূঢ় দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে খুসী হলুম।" সেই আমার রবিমামা—যাঁর কাছ থেকে সত্যের অসঙ্কোচ স্বীকৃতির ভরসা থাকাতেই তাঁর লেখায় যা অসত্য পেয়েছিলুম তা অসঙ্কোচে উল্লেখ করেছিলুম।

'ভারতী'র সম্পাদন কার্য্য অনেকদিন ধরে করেছিলুম আমি, আড়াল থেকে বিনা নামে। আর মা একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়লে বচ্ছর দুই সামনাসামনি দিদির সঙ্গে যুক্ত নামে—কিন্তু আসলে দিদিরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তৃত্বে, কেননা, আমি তখন থাকতুম বিদেশে। দু বৎসর পরে দিদি বুদ্ধিপূর্ব্বক রবি-মামার হাতে দিলেন 'ভারতী'। রবিমামা তার বাইরের চেহারা বদলে ফেলে, 'সাধনা'র মত ছোট সাইজে ছেঁটে নিজেরবোধ আনলেন তাতে। বড়মামা, নতুনমামা ও মায়ের সময়কার পূর্ণযৌবনা 'ভারতী'কে বাইরে থেকে 'শিশু ভারতী' দেখাতে লাগল। কিন্তু তার ভিতরটি মধ্যাহ্ন রবির খরতেজে, একমাত্র প্রায় তাঁরই লেখার ছটায় নতুন দীপ্তি পেলে। এত একটানা খাটুনি বেশী দিন চলে না। এক বৎসর পরেই আমি দেশে ফিরে এলে আমায় রবিমামা বল্লেন—আমি আর পারছিনে। তুই যদি নিস তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ছাড়তে পারি, আর কারো উপর ভরসা নেই। তুই এর সম্পাদন ভার নে, লক্ষীটি!

তাঁর বিশ্বাসে ও আশ্বাসে, তাঁর পরেই সম্পাদকীয় নামের বিষম পরীক্ষা মাথায় পেতে নিলুম। নিজস্ব একটি বিশেষ ভাবের শঙ্খ বাজিয়ে ভাসালুম 'ভারতীর' তরী নতুন জাতীয়-সাগর মুখে। জাতীয় জীবনে নতুন পথ কেটে কেটে চলতে লাগল তরণী। কর্ণধার রইলেন তিনি—যিনি সমস্ত বিশ্ব-জাতির পরিচালক। সম্প্রতি রইল রবিমামার। আমার "অতীত গৌরববাহিনী" গানের সব প্রথম শ্রোতা ও সমজদার হলেন রবিমামা। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসে যখন গীত হল—রিহার্সালের সময় গায়কগায়িকাদের দেখিয়ে দিলেন—"মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণী" গাওয়ার সময় সভার দিকে এমনি করে হাত বাড়িও। বঙ্গবেহার অযোধ্যা উৎকলের বেলায় পায়ে এমনি করে তাল রেখো।

আমার এই গানের অনেক পরে তাঁর সর্ব্বদেশবিশ্রুত "জনগণ মন অধিনায়ক" রচিত করেন।

উল্টাডিঙ্গির কাশিয়াবাগানে—আমাদের যে বাগান বাড়ীতে ছিলুম আমরা—বাড়ীর এ পাশে গাছের তলায় তলায় ছড়ান মাড়ান বকুলের বৃক্ষরাজির বীথিকা—তার মধ্যিখানে গাড়ীবারান্দা! ছবির মত বাড়ীখানির ওপাশে সংলগ্ন চাঁদনি, বাঁধান ঘাট, পুকুর, আর ঘাটের শেষ-ধাপে পুকুরের জলের সঙ্গে সংলগ্ন কত রকমের শামুক ও ঝিনুক! পুকুরের এধারে ফুলের বাগান, ওধারে ফল গাছের জঙ্গল। জঙ্গলে সাপ বিছের ভয় কাটিয়ে ঢুকে পড়লে কত টকটকে করমচা, কত চালতা, কত কৎবেল, জামরুল, টোপাকুল, নোয়ার, সফেদা! আর সেই দিকে খিড়কির দরজা দিয়ে একটি ছোট ঘাটে কলসী কাঁখে মল ঝমঝমিয়ে পাড়ার মেয়েদের আনাগোনার ছবি!—এত সব পরমাশ্চর্য্যময় বাড়ীতে যোড়াসাঁকোর আবালবৃদ্ধবনিতার—সব বয়সের আত্মীয়স্বজনের সানন্দ গতাগতির কেন্দ্রস্থলে—মামী, মাসি, দিদি, বৌঠানেরা যখন পুকুরে সাঁতার দিচ্ছেন, ছেলেরা জলে দাপাদাপি করছে—তখন চাঁদনির ধাপে বসে খাতা হাতে যাঁকে কবিতা ও গাননিরত দেখতুম সে রবিমামা। তখনকার একটি গান—"তুমি কোন্ কাননের ফুল, কোন্ গগনের তারা"।

রবিমামা যখন নীচে গান লিখতেন, ঠিক সেই সময়েই বড়মামা ঐ কাশিয়াবাগানের তেতালার ঘরটিতে কি ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন জানি না। আমরা ছোটরা তাঁর দেখা পেতুম না তখন। তাঁর কাছে যেতেও বেশী সাহস করতুম না। কিন্তু রবিমামার কাছাকাছি সদাই ঘুরতুম, কেননা গান তৈরি হলেই আমার শেখাবার ডাক পড়বে এবং আমি শিখলেই সকলের ভোগে আসবে। এই কাশিয়াবাগানে ১০।১১ বৎসর বয়সে জল তুলতে আসা পাড়ার সেই মেয়ে বৌদের নিয়ে দিদির (৺হিরণ্ময়ী দেবী) সহায়তায় আমি একটি স্কুল খুলি। ঘাটের সিঁড়ির ধাপে ধাপে পড়ুয়াদের বসিয়ে আমরা দুইবোনে সখের মাষ্টারী ব্রত আরম্ভ করলাম। ছয়-মাস পরে ছিপুদাদার কাছ থেকে প্রাইজ জোগাড় করে রবিমামার হাত দিয়ে বিতরণ করান হলো।

কতবার দুই একটা নতুন গান তৈরি করেই জোড়াসাঁকো থেকে কাশিয়াবাগানে এসেছেন রবিমামা—আমায় শিখিয়ে

দিতে। অনেক বছর পর্য্যন্ত আমি তাঁর গানের ভাণ্ডারী ছিলুম—তাই মাঝে মাঝে যখন কলকাতার বাইরে যেতুম—ফিরে এসে দেখতুম অগুন্তি নতুন গান তৈরি হয়ে গেছে, অন্যরা শিখে ফেলেছে, আমি পিছিয়ে গেছি—একটা বুকভরা দুঃখ জমে উঠত, যেন বসন্তের কত ফোটা ফুল থেকে বঞ্চিত হলুম—সব বিলান হয়ে গেছে।

সেদিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মণিকা দেবীর একটি কথায় ঐ ঘটনাগুলি মনে পড়ে গেল। মহাপ্রয়াণের দিন গান গাওয়া উপলক্ষে মণিকা বল্লেন—"রবিবাবুর এমন গান আছে কি যা সরলা জানে না? আমরা ত দেখতুম রবিবাবু যা ভুলে যেতেন তা সরলার গলায় ধরা থাকত।"

তাই বটে! সে সময় ছিল তাই।

তাঁর প্রাথমিক কাব্য গ্রন্থগুলি ছাড়া—'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী' যে তখন কতবার পড়েছি—কত জীবনীরস যে সংগ্রহ করেছি তার থেকে বলার নয়। "সবাই বড় হইলে তবে স্বদেশ বড় হবে"—এই রকম কতকগুলি লাইন আমার জীবনের মূল মন্ত্র হয়েছিল।

বছর দুয়েক পরেই তাঁর প্রতিভার আর একদিকের আশ্চর্য্য পরিচয় পেলুম। আমার ষোল বৎসর বয়সে তখন বি-এতে Sully's Psychology ও Sidgwick's Moral Philosophy পাঠ্যপুস্তক ছিল। মনস্তত্বে আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় আর Sullyর ভাষাও সহজ হওয়ায় পড়তে ভাল লাগত। কিন্তু Sidgwickএর ভাষা কটমটে ও জটিল বলে গুরুপাক বোধ হ'ত। সেই দেখে কবিতা ও গান রচনায় বিভোর হয়েও যিনি আমায় প্রতিদিন Sidgwick খানিকটা করে পড়িয়ে নিজের হাতে তার অধ্যায়ক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত সার তৈরি করে দিয়েছিলেন সে রবিমামা।

আমার পঞ্জাব-প্রবাস কালে রবিমামা Nobel Prize পান। সেই সময় সাদা চামড়ার মলাটে সুন্দর করে বাঁধান ইংরিজী 'Gitanjali'র একখানি কপি তিনি বিলেত থেকে আমায় লাহোরে পাঠিয়ে দেন।

পঞ্জাবে আমার অনেক জাতীয় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 'রোলাট আইন' জনিত জালিয়াঁওয়ালাবাগের নৃশংস কাণ্ডকারখানার সময় আমার স্বামী বন্দীকৃত ও অজ্ঞাতবাসে প্রেরিত হয়েছিলেন। তখন ভারতবর্ষের অন্য প্রান্ত থেকে পঞ্জাবে কারো ঢোকা নিষেধ এবং পঞ্জাব থেকে কারো অন্যত্র যাওয়াও বন্ধ। লাহোরের জেনেরল পোষ্টাপিসে শত শত সেন্সর বসে গিয়েছিল। বাঙ্গলাদেশ থেকে বহু বাঙ্গালী পোষ্টাল ক্লার্ক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—বাঙ্গলা চিঠি সব খুলে খুলে পড়ে ছাড়া না ছাড়ার জন্যে। আমাদের মহা সঙ্কট তখন। সব খবর চাপা দেওয়া হচ্ছে। পঞ্জাবের বাইরে কেউ জানতেও পারছে না আমরা কি বিভীষিকার মধ্যে বাস করছি। বাড়ীতে মাকেও কিছু খুলে লিখতে পারছি নে—জানি সে চিঠি মার হাতে পৌছবে না। সেই সময় আমি প্রতিভা দিদি—লেডী আশুতোষ চৌধুরীর আনন্দসঙ্গীত-পত্রিকাতে একটি গানের স্বরলিপি ছাপাতে পাঠানর ছলে কোন রকমে জানালুম যে "অতি ভয়ানক অবস্থা এখানে, সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে বা কারো অতি শীঘ্র আসার দরকার।"

তারপরে কথা ছড়িয়ে পড়ল। তারপরে সমস্ত দেশকে চমৎকৃত করে এল—রবীন্দ্রনাথের "Sir" পদত্যাগ।

কাশ্মীর থেকে নামার পথে রবিমামার সঙ্গে রথীরা ও সত্যেন দত্ত আমার বাড়ীতে দুদিন অতিথি ছিলেন। রবিমামার কড়া নিষেধ ছিল, তাই কাউকে খবর দিইনি; কোন পার্টি উৎসবাদির আয়োজন করিনি। শান্ত পারিবারিক ভাবে দুদিন অতিবাহিত হল। তিনি চলে যাবার পর খবর পেয়ে Civil and Military Gazetteএর সাহেব সম্পাদক দৌড়দৌড়ি করে আমার বাড়ী এসে অভিযোগ করলে কেন তাদের জানান হয়নি, কেন একটা Interviewর অবসর দেওয়া হয়নি। ভাবটা এই যে—আমি যেন আমার মামাকে নিজের possessivenessএ আঁকড়ে লুকিয়ে রেখেছিলুম—রবীন্দ্রনাথকে Exhibited হতে দিইনি। একবার মহাত্মা গান্ধির আশ্রমে আমি যখন যাই, রবিমামা সেই সময় গুজরাট পর্য্যটনে বেরিয়েছিলেন। আমেদাবাদ সহরে গান্ধিজীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্য বিরাট সভা হয়। সভাভঙ্গের পর ভিড়ের ভিতর থেকে বেরোন বিপদসঙ্কুল। সেই ভিড়ে রবিমামা পিছন দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় বল্লেন—"হাত ধর আমার।" তিনি আগে আগে যেতে লাগলেন, তাঁর হাত ধরে আমি পিছনে পিছনে নিরাপদে চলতে লাগলুম। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে ভিড় সরে সরে রাস্তা খুলে যেতে লাগল।

সেই স্মৃতিটি মনে খোদা রয়ে গেছে। কতবার মনে হয়েছে জীবনের কর্ম্ম-ভিড়ে চলতে চলতে যেন তাঁর মহদ্-বাণীর হাতখানি ধরা থাকে আমার।

কিন্তু রবিমামার সঙ্গে সংস্পর্শ ততই হারাতে থাকছিলুম যত তিনি রবীন্দ্রনাথে প্রসারিত হতেছিলেন। তাঁর সীমাময় গণ্ডী যতই অসীমের দিকে হাত বাড়াতে লাগল ততই আমাদের ক্ষুদ্র দুহাতের বেষ্টনে তাঁকে ঘিরে রাখা কঠিন হতে থাকল।

"আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?" যে রবির আলোর সম্পাত একদিন একটি বাড়ীতে বিকীর্ণ হয়ে একটি পরিবারকে ভাবে কর্ম্মে জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ, জীবন্ত, প্রাণবন্ত করে তুলছিল, সে আলোর প্রপাতে সমগ্র বাংলাদেশ প্লাবিত হল। শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যাশ্রম খুললেন তাতে দলে দলে ছেলেমেয়ে ও শিক্ষক ভর্ত্তি হয়ে তাঁর সত্যাকৃত Idealismএর পীযূষপানে বর্দ্ধিত হতে লাগল। ক্রমে তাঁর বিশ্বভারতী সারা বিশ্বকে বাঙ্গলার দুয়ারে টেনে নিয়ে এল।

তাঁর বিস্তারলীলা আরম্ভ হয়েছিল পৈতৃক জমিদারীর তত্ত্বাবধান উপলক্ষে চন্দননগরের পেনেটির গাজীপুরের গঙ্গাতীর ছেড়ে পদ্মার উপকূলে গিয়ে নিবাসে। আর তখন থেকে সেই পদ্মারই মত তাঁর জীবনের প্রবাহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব চিত্তভূমি থেকে একটু একটু করে সরে সরে দূরে সুদূরে বইতে থাকল। স্থানে স্থানে শুকনো চরা রচনা করে ফেলে গেল, স্থানে স্থানে ধ্বংসলীলা ঘটল। যখন যোড়াসাঁকোর নিবাস একেবারেই তুলে দিয়ে শান্তিনিকেতনে উপনিবেশ স্থাপন করলেন তখন থেকেই জন্মগত পরিবারের গণ্ডী থেকে নিষ্ক্রমণ করে কর্ম্মগত বিশ্বপরিবারভুক্ত হতে থাকলেন। যাঁদের সঙ্গে আবাল্য মর্ম্মের যোগ ছিল, যাঁদের ছেড়ে তিনি কখন থাকেন নি, সেই মেজমামা মেজমামী এবং নতুনমামাও রবীন্দ্রনাথের orbitএর বহির্ভূত হয়ে পড়লেন। রাঁচিতে মোরাবাদী মন্দিরের শান্ত শুভ্র অগ্রজদেবদ্বয়ের দর্শনে যাবার অবসর বিশ্বভারতীয় রবীন্দ্রনাথের কোন দিন হয় নি। বিশ্বভারতীর এলাকার উপান্তে পৈতৃক নীচের বাংলায় নিজের নিভৃত নীড়টি রচনা করে বসমান 'বড়দাদার' সঙ্গে ভৌগোলিক অতি সান্নিধ্যে মাত্র সম্বন্ধ বজায় ছিল।

কিন্তু 'বিশ্বভারতী'ও তাঁকে আর একটা গণ্ডীর মধ্যে বাঁধলে। সহজাত স্নেহভক্তির বন্ধনমুক্ত হয়ে কর্ম্মকারাগারে ঢুকে আর একটা মায়াবন্ধনে বদ্ধ হলেন। বিশ্বভারতীতে যে কর্ম্মী রবীন্দ্রের অভিব্যক্তি, সেখানে তাঁর কর্ম্মময় হাতনাড়ায় নড়ে-ওঠা কর্ম্ম ঢেউয়ের কোলাহল, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাত এবং কর্ত্তৃত্ব কাড়াকাড়ির দ্বন্দ্ব ও অশান্ততা অনিবার্য্য। বিশ্বভারতীতে রক্তের দ্বারা যুক্ত বা অযুক্ত গুটিকত সহকর্ম্মীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত, তাদেরই আপনজন। কিন্তু যেখানে তিনি কবি, সেখানে বিশ্বের সর্ব্বলোকের আপন, সর্ব্বানুভূ।

বিশ্বভারতীর অঙ্গনে প্রবেশের বিধিনিষেধ আছে, Chosen fewএর জন্য মাত্র তার দ্বার অবারিত। কিন্তু বিশ্বকবির মানসাঙ্গন বিশ্বের সকলের জন্য চিরমুক্ত, অনর্গল, অবাধ। যে চাইবে তারই চিরন্তন সম্পদ কবির চিত্তসঞ্চিত সুধা, তাঁর অন্তরোত্থিত গীতশ্রী, তাঁর হৃদয়মন্থিত ভাব ও লেখনী-উৎসারিত ভাষা। তাঁর বুদ্ধির আলোকে নির্দ্দেশিত ব্যবহার পন্থায় তিনি স্বজাতির ও বিশ্বজাতির প্রত্যেক মানব মানবীর 'গুরুদেব' পদবাচ্য—শুধু বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর নয়। বিশ্বভারতী তাঁর হাতে গড়া একখানি অপরূপ সুন্দর মর্ত্ত্যকীর্ত্তি। কিন্তু তাঁর কাব্যে গানে প্রবন্ধে, ভাষণে তাঁর অমরত্বের প্রতিষ্ঠা। চিরঞ্জীবী তিনি গ্রন্থাবলীতে, যেমন গ্রন্থসাহেবে শিখগুরুরা।

এই প্রবন্ধটি লিখতে লিখতে দেশে বিদেশে বহু গৃহে, বহু প্রতিষ্ঠানে, বহু সভায় রবীন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ হয়ে গেল। তার কোন কোনটিতে উপস্থিত ও থেকেছি। প্রত্যেক স্থলে তাঁর ছবি বা মূর্ত্তি রেখে তাতে পুষ্পহার পরিয়ে তাঁর অর্চ্চনা করা হয়েছে। আজ তিনি নেই, তাঁর ছবি মাত্র আছে। যে ছবি বা মূর্ত্তি একদিন আমাদের সমালোচনার বিষয় হত, তাঁরই কাছে গিয়ে বলতুম—"একি হয়েছে? চোখ আরও উজ্জ্বল হওয়া উচিত ছিল, নাকটি আরও সরল—ইত্যাদি"—সে ছবির আসল কোথায় আজ? সেই জলজ্যান্ত, সেই চলন্ত বলন্ত, সেই হাসিতে প্রীতিতে ক্ষোভে কৌতুকে বিরক্তিতে ভরা প্রাণের সব রঙগুলা ফেলা মুখখানি সেই জীবন্ত মূর্ত্তি কোথায় আজ?

এ যুগের গগনেই এ দেশে রবি অস্তমিত। কিন্তু রবি কি কোথাও নেই আজ? আজ বিদেহ তিনি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলে—'রবি নেই' এই ভাষা শোকার্ত্ত মূঢ় মানব আমাদের হৃদয় থেকে শুধু উত্থিত হতে থাকবে?

যে প্রথম কারণ, আদিকবি নিজের অংশে তাঁকে সৃজন করে কালরথচক্র চালিয়ে, বুকে একখানি বীণা ভরে তাঁকে অব্যক্ততা থেকে দুদিনের ব্যক্ততায় পাঠিয়েছিলেন, তিনিই তাঁর বীণা বাজান শেষ করিয়ে আবার তাঁকে নিজের অব্যক্ততায় গুটিয়ে নিলেন। "যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি" তাঁরই ভাস্বরতা প্রতিফলিত প্রতিভা আজ আবার সেই অনন্ত ভাস্বর সমুদ্রে মিশে গেল। দেহ খাঁচাখানি ভেঙে গেল। কিন্তু যে পুরুষ এই খাঁচায় ছিল সে বিরাটে প্রাণময় তেজোময় অমৃতময় পুরুষে বিলীন হয়ে রইল, হারাল না। আবার কোন যুগে কোন দেশে কোন লোকে ওই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষ থেকে তাঁরই অল্পাংশী এই ক্ষণজন্মা লগ্নচাঁদ্ পুরুষের আবির্ভাবে সে দেশ সে কাল সে লোক ধন্য হবে।

রবীন্দ্র প্রয়াণে

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এম-এ, বি-টি

রবি গেল অস্তাচলে। সায়াহ্নের আকাশ ভরিয়া
মৃত্যুনীল দিবসের রক্তচিতা জ্বলে সঞ্চারিয়া
দেশ হ'তে দেশান্তর ব্যাপি'। অন্তরীক্ষে, শোনো ধায়,
আলোকের প্রাণপাখী যুগান্তের ব্যাকুল পাখায়,
তমিস্রা রাত্রির কানে বাজে তার মহাপক্ষ ধ্বনি—
"আয়, আয়, আয়।"—কালের সমুদ্রতীরে স্পর্শমণি
গেল সে রাখিয়া। তারি স্পর্শে শর্বরীর নীলাঞ্চলে
নির্নিমেষ লক্ষ কোটি নক্ষত্রের জ্যোতিষ্কণা জ্বলে;
গ্রহে গ্রহে নব নব প্রভাতের আভাসে ঠিকরি'
তাহারি গোপন রশ্মি মানুষের স্বপ্নলোক ভরি
সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ শিখা জ্বালে; জীবন-রহস্যগুলি
বিচিত্র মেদুর বর্ণে দেখা দেয় রুদ্ধ দ্বার খুলি
চকিত প্রকাশে হেসে—বলে, "রবি আছে, আছে, আছে।
তাহারি আলোর গীতে মধুচ্ছন্দা এ ধরণী নাচে
রূপের সম্ভারে; অর্দ্ধস্ফুট জীবনের শতদলে
রঙ লাগে তারি ধ্যানে, মধু জমে অন্তরের তলে।"
রবি গেল অস্তাচলে। এ ধরার হৃদয়-প্রান্তরে
প্রতিপদ-চাঁদ হেসে কৃষ্ণপক্ষ অদৃশ্য অম্বরে
আঁকিল প্রলয়-রেখা অমা-নিশীথের। কালোমেঘে
শ্রাবণের গভীর বিষাদখানি বেদনায় জেগে
দুর্যোগের করিছে ইঙ্গিত।—পশ্চিম দিগন্তে দূরে
ধ্বংসের ভ্রূকুটি কাঁপে বিদ্যুতে বিদ্যুতে ভেঙে চুরে।
মানুষেরা কাব্য নাহি চায়! শুধু মৃত্যু-মহোৎসবে
তাণ্ডবে মত্ত সবে আত্মঘাতী প্রচণ্ড তাণ্ডবে
বিভ্রান্ত কলহে ফুঁসি'।—অন্ধকার কুজ্ঝটিকা মাঝে
লুপ্ত রবি আমাদেরি যবনিকা তলে। ধ্বনি বাজে,
"যাই, যাই, যাই। এ পৃথ্বীর আবর্তন শেষে
আবার উদিব আমি প্রদীপ্ত বহ্নির হাসি হেসে
অনাগত শতাব্দীর মানসের কমলে কমলে
রক্তরুচি দলে দলে সুন্দরের পাদপীঠতলে।"
যুগের রবিরে মোরা ধরিয়া রাখিতে নারি হায়,—
বারংবার রাত্রি নামে সভ্যতার সমাপ্তি সন্ধ্যায়!
পৃথিবীর বহিঃপ্রান্তে রবি গেল অস্তাচলে চলি'।
জীবন-সাগরতটে শিশু খেলে আনন্দে উছলি',
অশ্রান্ত কল্লোল-গানে করতালি দিয়া দিয়া নাচে,
সহজ সত্যের বাণী কহে সে যে, "আছে, আছে, আছে!"
শাশ্বত মানব-মনে নিত্যকাল জেগে আছে কবি—
নির্মল প্রেমের প্রাণে হেরি তার কবিতার ছবি।
জীবনের ছন্দে ছন্দে, গানে গানে, মিলনে, বিরহে,
স্মরণে, বিস্মৃতি-ক্ষণে, হাস্যলাস্যে, সুখে, দুঃখ-দহে
কবি জাগে কাব্য রূপে। অন্তহীন রসের নির্ঝরে
বহে তার প্রাণস্রোত মানুষের নিগূঢ় অন্তরে।
নিখিল মানব-প্রাণ, মানুষের বিশ্ব অনুভূতি
মূর্ত হ'য়ে জেগেছিল কালের সাগরে মহাদ্যুতি
দীপস্তম্ভ সম। তরঙ্গে পড়িল ঢাকা। শুধু তার
অদৃশ্য কিরণমালা উদ্ভাসিয়া রহে পারাবার।
তার কাব্য-সত্য মৃত্যুহীন—মোদের জীবন-বাণী
সেই সত্যে লভিবে প্রকাশ! পৃথিবীর পথখানি
মাধুর্যে ভরিবে অহরহ। প্রত্যহের কর্ম-গান
রবি-প্রেমে ছন্দ লভি' হবে শান্ত উদাত্ত মহান্।

সহজ ম্যাজিক

যাদুকর পি-সি-সরকার

আজ দুইটি সহজ অথচ সুন্দর ম্যাজিকের কৌশল প্রকাশ করিতেছি। পাঠকবর্গ ইহা ভালরূপে করিতে পারিলে



ফুলের খেলা

অনায়াসে তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে চমকিত করিয়া দিতে পারিবেন। প্রথম খেলাটির নাম ইংরেজীতে Magic Button Flower. একবার একজন ইংরেজ যাদুকরকে এই খেলাটি দেখাইতে দেখিয়া আমি খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহাকে শুধু আমি একা নহি, সমস্ত দর্শকই আমার ন্যায় বিস্ময়বিমুগ্ধ চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, যাদুকর যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার কোটের উপর (buttonhole এ) কোন ফুল নাই। অথচ ওয়ান-টু-থ্রি বলিবামাত্র সেখানে একটি ফুল (সাধারণত গোলাপ) মায়ামন্ত্রপ্রভাবে উপস্থিত হইবে। খেলাটি দেখিতে খুবই চমকপ্রদ, কিন্তু ইহার মূল কৌশল অতিশয় সহজ। সাধারণত আসল ফুল দ্বারা এটি দেখান হয় না। ঐটি সেলুলয়েড বা সিল্কের দ্বারা বিশেষ-

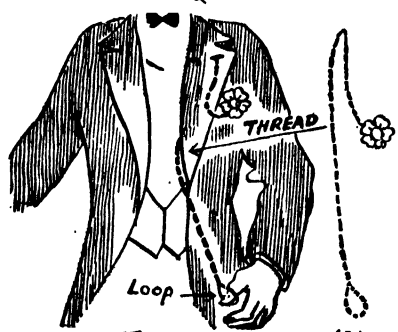


Fig 2. (a). (b)

ফুলের খেলা

ভাবে প্রস্তুত এবং উহার বোঁটা নাই। বিলাতে ম্যাজিকের দোকানে ঐগুলি অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটেও একপ্রকার ফুল



যাদুকর ওকিটো প্রদর্শিত বলের খেলা

কিনিতে পাওয়া যায়। আমি উহা দ্বারা কয়েকবার খেলাটি দেখাইয়াছি। আসল গোলাপ ফুল দ্বারাও করা চলে তবে উহা অনেক সময় সহজেই নষ্ট হইয়া যায় অথবা উহার



ভাসমান বল

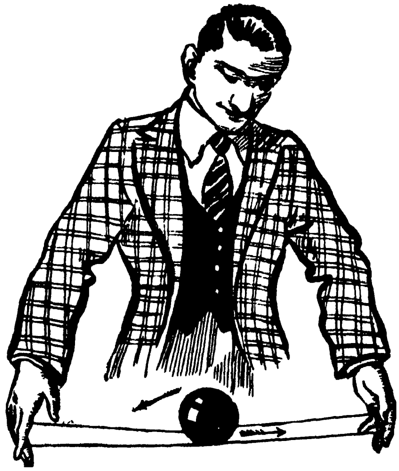
পাপড়িগুলি ঝরিয়া পড়ে। ফুলটির পশ্চাত দিকের সহিত একটি লম্বা কালো রং-এর সিল্কের সরুসুতা বাঁধা থাকে। এইভাবে ফুলটি কোটের পকেটে লুকানো থাকে। সুতাটির অপর প্রান্ত কোটের (buttonhole-এর) মধ্য দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া বাম হাতের কাছে ঝুলিতে থাকে। কোটের রং কালো এবং সুতাটির রং কাল, কাজেই দুইটি মিলিয়া যায়। সুতরাং নীচের দিকে একটি 'লুপ' (loop) তৈয়ার করিয়া রাখিতে হয়—যাহাতে তাহার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা খুবই ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতার নীচের প্রান্তটি ধরিয়া সজোরে টানিয়া দিলেই পকেটস্থ লুক্কায়িত ফুলটি কোটের যথাস্থানে গিয়া হাজির হইবে। এক্ষণে কাল সুতাটির সম্পূর্ণ অংশই কোটের



ভাসমান বলের কৌশল

তলায় চলিয়া গেল, কাজেই দর্শকদের চক্ষুর অতিশয় সন্নিকট-বর্ত্তী হইলেও তাঁহারা ঐটি দেখিতে পারিবেন না। চিত্র হইতে খেলাটি বেশ ভালরূপে বুঝা যাইবে। আমার মনে হয় রবারের সুতা (elastic) দ্বারাও এইটি দেখানো চলে। তাহাতে সুতা টানার হাঙ্গাম করিতে হয় না। খেলাটি অতিশয় সহজ কিন্তু ভালরূপে করিতে পারিলে এরূপ সুন্দর খেলা খুবই কম আছে।

আমার পরবর্ত্তী খেলাটির নাম ভাসমান বল বা floating ball. ভাসমান বলের খেলাটি পৃথিবীবিখ্যাত। আমি নিজেও কয়েকবার এই খেলাটি দেখাইয়াছি। এইটিরই অনুরূপ একটি ভাসমান গোলকের খেলা দেখাইয়া যাদুকর ওকিটো সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হুলস্থুলের সৃষ্টি করেন। ওকিটো ও তাঁহার বলের খেলাটি দেখিবার জন্য সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ হুলস্থুলের সৃষ্টি



ভাসমান বলের অপর কৌশল

হইয়াছিল। সেদিনও চাইনিজ যাদুকর চ্যাঙ্ ওকিটোর বলের খেলাটি দেখাইয়া কলিকাতাবাসীকে অবাক করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিলেন ইহা চুম্বক, কেহ বলিলেন সম্মোহন বিদ্যা! কতরূপ অদ্ভুত আলোচনাই কানে আসিল। এই খেলাটির সময় রঙ্গমঞ্চে তীব্র আলো থাকে না। চ্যাঙ্ অপেক্ষাকৃত অন্ধকার রঙ্গমঞ্চেই ইহা দেখাইতেন। এবারে যে বলের খেলাটির কৌশল বর্ণনা করিতেছি ঐটি চ্যাঙ বা ওকিটো কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বলের খেলাটি নহে। ইহা আমি কয়েকবার দেখাইয়াছি এবং দেখিতে অনেকটা ঐ খেলারই মত। ইহাতে অপেক্ষাকৃত ছোট বল ব্যবহৃত হয় এবং নানাভাবে দেখানো সম্ভবপর।

তবে আমি যে উপায়টি বর্ণনা করিতেছি এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। যাদুকর প্রথমত একটি বল লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবেন। ঐটি উল, কর্ক, কাগজ, সেলুলয়েড বা অনুরূপ কোন হাল্‌কা জিনিষ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। এইবার বলটিকে একটি লোহার রিং-এর মধ্য দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেখান হইল যে উহাতে কোনরূপ সুতা, তার বা স্প্রাং বাঁধা নাই। তারপর বলটি কোন এক অদৃশ্য হস্তদ্বারা চালিত হইয়া শূন্যে ভাসিতে আরম্ভ করিল, উহা আস্তে আস্তে এ হাত ও হাত যাতায়াত আরম্ভ করিল এবং আরও কত। ইহা খুব সরু কাল রং-এর সিল্কের সুতা দ্বারা করিতে হয়। যাদুকরদিগের নিকট ইহা ইন্‌ভিজিব্‌ল্‌ থ্রেড্‌ নামে পরিচিত এবং অতিশয় সন্নিকট হইতেও দেখা যায় না। যাহারা এইরূপ সুতা সংগ্রহ করিতে না পারিবেন তাঁহারা মেয়েদের সরু লম্বা চুল দুই-তিনটি গাঁট বাঁধিয়া লইয়া খেলা দেখাইতে পারেন। রাত্রি বেলায় আধ অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে উহা দ্বারাও কাজ ভালরূপ চালানো যায়। কিরূপে গ্রন্থি তৈয়ার করিয়া দুই হাতের আঙুলে আটকাইয়া রাখিতে হয় এবং কি ভাবে উহার উপর দিয়া বলটি গড়াইয়া গড়াইয়া চলে তাহা প্রদত্ত চিত্র হইতে ভালরূপে বুঝা যাইবে। যাদুকরদের নিকট ইহা ছেলেখেলা বিবেচনা হইলেও দর্শকদের নিকট ইহা একটি মস্তবড় ধাঁধাঁ হইয়াই থাকিবে। অনেকে গ্যাস ব্যবহার করিয়া বা হাওয়ার ভাল্‌ব্‌ (air valve) ব্যবহার করিয়া খেলাটী দেখাইতে বলেন। উহাতে খেলা সুন্দর হয় কিন্তু প্রচুর অভ্যাসের প্রয়োজন। সেইজন্য সেই কঠিন উপায় এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

সেদিন স্বপনে দেখিনু গোপনে কবিরে গভীর রাতে
শ্রাবণ পূর্ণিমাতে,
চিরদিনকার বীণাখানি তাঁর হাতে।
শুধালেম—"কবিগুরু,
অজানার পথে যাত্রা তোমার এবার হোলো কি সুরু?"
কহিলেন কবি—নিখিলের কানে কানে
বাজিল সে বাণী বীণার করুণ তানে,
ভেসে গেল সুর সুদূর পথের শেষে
দিগন্ত যেথা মেশে অনন্তে এসে—
"আমি কবি, আমি র'ব না, তবুও জেনো চিরদিন র'ব।
আমি রবি, চির-গগনে গগনে আমি-যে নিত্য নব॥"

কাঁদিয়া কহিনু—"আকাশে আকাশে আঁকা সে আলোর ছবি,
জানি তুমি সেই রবি,
চিরদিনকার তুমি বীণকার, কবি!
তবু মন মানে না যে,
তোমার বিরহ সে-যে দুঃসহ অহরহ বুকে বাজে।"
কহিলেন কবি—"আবার আসিব ফিরে
এই ধরণীর অশ্রু-নদীর তীরে।
ম্লান মূক মুখে ফুটায়ে তুলিতে ভাষা,
ব্যথাতুর বুকে জাগায়ে তুলিতে আশা,
আমি কবি, আমি যুগে যুগে হেথা নূতন জন্ম ল'ব।
আমি রবি, নিতি উদয়ে বিলয়ে নিত্য নবীন র'ব॥

শিশুর স্বপনে, কিশোরের মনে, চির-তরুণের বুকে,
জননীর হাসিমুখে
চির-দিনযামী জেগে র'ব আমি সুখে।
নীরবে আসিব নেমে
বিরহে-মিলনে হাসি-ক্রন্দনে স্নেহে করুণায় প্রেমে।
বন্ধুর পথে চ'লে যাব কোন্ দূরে,
ফিরে দেখা হ'লে চিনিবে কি বন্ধুরে?
মনে ছিল আশা, ভালোবাসা পাই আরো।
ভুলে যেয়ো, যদি আমারে ভুলিতে পারো।
আমি কবি, আমি মরিতে চাহিনি এ কাহিনী কা'রে ক'ব।
আমি রবি, নিতি নূতন প্রভাতে উজলিব নব নভ॥

আশা তাই মনে আবার স্বপনে কবিরে দেখিবে রাতে
শারদ-পূর্ণিমাতে,
কভু মধুমাসে কুসুম-সুবাসে প্রাতে।
নিখিল-বীণার তানে
শুনিবে কবির যে-বাণী গভীর বেজে ওঠে গানে গানে।
প্রেমের আসনে বরণ করেছ যারে
মরণ কি তারে হরণ করিতে পারে;
চির-স্মরণের অশ্রু-সাগর পারে
সে-যে তরী বেয়ে আসিবেই বারে বারে।
আমি সেই কবি, আঁধারে আলোকে চিরদিন সাথে র'ব।
আমি সেই রবি, নব নব লোকে নিত্য পুনর্নব॥"

অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং লিঃ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী এম্‌-এ

ক্রমান্বয়ে তিনবার আই-এ ফেল করিয়া সাতকড়ি আবিষ্কার করিল—পড়াশুনার লাইন তাহার নয়। বাবা-মা চতুর্থবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। সাতকড়ি যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বুঝাইয়া দিল, সব জিনিষ সকলের ধাতে বরদাস্ত হয় না, অনর্থক ইহার পিছনে অর্থদণ্ড না দিয়া যাহাতে দু'পয়সা ঘরে আসে সেই ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়। পয়সা ঘরে আনা যে অবাঞ্ছনীয় একথা ভ্রমক্রমেও কেহ উচ্চারণ করিল না। কিন্তু তীব্র মতভেদ দেখা দিল উহার পন্থা লইয়া।

বন্ধুরা পরামর্শ দিল—চাকরি কর। বাঁধা মাইনে, কোন হাঙ্গাম নেই। আয় বুঝে ব্যয় করলেই যথেষ্ট।

পৈতৃক জমিদারী আছে। বাবা বলিলেন—যা বাজার, চাকরি করে আর খেতে হবে না। নিজের যেটুকু আছে দেখে শুনে গুছিয়ে নাও।

সাতকড়ি কংগ্রেসের ভক্ত। জমিদারী তার দু'চক্ষের বিষ। বলিল, জমিদারী আর ক'দিন? জানেন, কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে?

রামগতিবাবু কংগ্রেসের নামে আগুন হইয়া উঠিতেন। তাঁর প্রায় সমস্ত মহালের প্রজাই কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের জন্য খেপিয়া উঠিয়াছে। রাগের মাথায় একটা অশিষ্ট মন্তব্য করিয়া বসিলেন—তোমাদের অমুক লীডার মদ খায়।

সাতকড়ি নীরবে প্রস্থান করিল।

কিছুদিন পরের কথা। নানা স্থানে চাকরির উমেদারী করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া সাতকড়ি প্রতিজ্ঞা করিল, বিজনেস করিবে। একেবারে ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট লাইন। ব্যবসা না করিয়াই বাঙালীর অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এখানেও কম সমস্যা নহে। কিসের ব্যবসা করা যায়? বন্ধুরা অগ্রণী হইয়া বলিল, রেষ্টু রেণ্ট খোল্! চা সকলেই খায়, অথচ প্রত্যেক কাপে এক পয়সা খরচ হয় কি-না সন্দেহ। ফিফ্‌টি পারসেণ্ট লাভ।

সাতকড়ি দৈনিক লেকে বেড়াইতে যায়, সেখানে একটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, মাছের ব্যবসায় করুন মশায়, আমিও আপনার সঙ্গে যোগ দেবো। দেখবেন, দু'দিনে ফেঁপে উঠবেন। টাকায় টাকা আসবে।

রামগতিবাবু বলিলেন, বাঙালী কোন দিন ব্যবসা করতে পারবে না, ও দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়। সামনেই আশ্বিন কিস্তি—আমার সঙ্গে মহালে চল।

মা ব্যবসার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। আড়ালে ডাকিয়া সাতকড়িকে অনেক বুঝাইলেন।

—ওসব ভদ্রলোকের কাজ নয় বাবা। সোনার শরীর দু'দিনেই কালি হয়ে যাবে। আমার একটা কথা রাখবি? একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, দেখে শুনে নিজের পছন্দসই একটা বিয়ে কর। ঘরে লক্ষ্মী এলে কোন দিক আর ভাবতে হবে না।

সাতকড়ি রাগিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রায় দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। ব্যবসার সাব্‌জেক্ট এখন অবধি মনোমত পছন্দ হইল্ না। ভাবিতে ভাবিতে সাতকড়ি শুকাইয়া উঠিল। বন্ধুদের পরামর্শে চুল চেরা হিসাব করিয়া এক একবার মনে হয় কয়লার ব্যবসাতেই সর্ব্বাধিক লাভ, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মনটা বিরূপ হইয়া ওঠে। কলিকাতায় হাজার হাজার কয়লার দোকান আছে, তাহার দোকানেই যে সকলে ভিড় করিয়া কিনিতে আসিবে, ইহার কোন অর্থ নাই। অবশেষে অনেক ভাবিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে ব্যবসায়ে নূতনত্ব চাই। সে এমন ব্যবসা আরম্ভ করিবে যাহা পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে হইবে। এখানেও সমস্যা। বন্ধুদের সহিত সবজেক্ট কমিটি—ওয়ারকিং কমিটি ইত্যাদি নানারূপ কমিটি স্থাপন করিয়া ব্যবসায়ের অভিনবত্ব সম্বন্ধে সে দিনরাত মাথা ঘামাইতে লাগিল।

একদিন লেক হইতে ফিরিবার পথে বালীগঞ্জের একটি বাড়ীর জানালা হইতে কি একটা জিনিষ সাতকড়ির মাথার ওপর উড়িয়া পড়িল। হাত দিয়া উঠাইয়া সে দেখিল, কোন মহিলার এক গোছা আঁচড়ানো চুল।

ব্যাপারটা কিছুই নয়। অন্য লোক হইলে হয়তো ভ্রূক্ষেপও করিত না। কিন্তু যাহারা জিনিয়াস তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আঁচড়ানো চুল দেখিয়া সাতকড়ির মাথায় বিদ্যুতের মত একটা ভাবের উদয় হইল।

ভারতবর্ষে লম্বা চুলসম্পন্ন নারীর সংখ্যা অল্প নহে। আশা করা যায় প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যহ চুল বাঁধে এবং চুল বাঁধিবার সময় প্রত্যেকের মাথা হইতেই খানিকটা করিয়া চুল উঠিয়া থাকে। এই ওঠা চুল কি হয়? কিছুই হয় না। রাস্তায় কিংবা বাড়ীতে আবর্জ্জনার ভিতর পড়িয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমগ্র স্থান হইতে যদি এই আঁচড়ানো চুল সংগ্রহ করা যায়—

আনন্দে সাতকড়ি আর ভাবিতে পারে না। একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসায়। কত হাজার হাজার মণ চুল সংগ্রহ হইবে এবং কত রকম প্রয়োজনে সদ্ব্যবহার করা যায়। লেপ, তোষক, বালিশ, গদি, কুশন ইত্যাদি অসংখ্য জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে। তুলা হইতে দামও ঢের সস্তা পড়িবে—কেন না চাষ আবাদের হাঙ্গাম নেই। ইহা ব্যতীত ঐ সকল চুল দিয়া চমৎকার সরু দড়ি হইবে। সে মানস নয়নে দেখিতে লাগিল, সেই সব সরু দড়ি ইউরোপ, আমেরিকায় কিরূপ সাদরে অভ্যর্থিত হইতেছে। সে ইহার নাম দিবে—"ইণ্ডিয়ান হেয়ার রোপ।"

আনন্দের নেশায় একটা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকিয়া সাতকড়ি চা ও ডেভিল খাইয়া ফেলিল।

সেইদিনই গভীর রাত্রে ওয়ারকিং কমিটির জরুরী অধিবেশনে তুমুল জয়ধ্বনি ও ভোটাধিক্যে তাহার প্রস্তাব কার্য্যকরী বলিয়া গৃহীত হইয়া গেল। সে হইল ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর, কারণ মূলধন তাহারই অধিক। ওয়ারকিং কমিটির পাঁচজন সদস্য লইয়া একটা পার্লামেনটরী বোর্ড গঠিত হইল। তাহারা ব্যবসায়ের যাবতীয় হিসাব নিকাশ ও অফিস ওয়ার্ক ইত্যাদি পরিচালনা করিবেন। বড়বাজার ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল ; সেইখানে একটি বড় অফিস ভাড়া লওয়া হইবে এবং ভারতের সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রের মারফৎ উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট অর্গানাইজার আহ্বান করা হইবে—এই মর্ম্মে গুটিকয়েক প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহাদের কর্ত্তব্য হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় নারীর আঁচড়ানো চুল সংগ্রহ করা।

ব্যবসায়ের নামকরণ হইল—"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাসট্রি কোং লিঃ"। অফিস ইত্যাদি উত্তমরূপে সজ্জিত করিতেই সাতদিন কাটিয়া গেল। বাহিরের অন্যান্য খুঁটি নাটি কাজও একরূপ সম্পন্ন হইল। অষ্টম দিবসে উদ্বোধন উৎসব।

বিরাট জাঁকজমকের ভিতর কলিকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক কাঁচি দিয়া দরজায় টান্ করিয়া বাঁধা সূতা কাটিয়া ফেলিলেন। নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি হইল। উদ্বোধনের পর তিনি বক্তৃতায় সমবেত নারীগণকে এই জাতীয় শিল্পকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা যেন প্রত্যহ চুল বাঁধেন। সেই সমস্ত ওঠা চুল নষ্ট না করিয়া হেয়ার ইনডাসট্রি কোং হইতে প্রদত্ত ছোট বেতের ঝুড়ির ভিতর জমাইয়া রাখেন এবং প্রতি রবিবারে মুষ্টি ভিক্ষার মত এজেণ্টদের হাতে ওজন করিয়া দিয়া কোম্পানীর রসিদ লন। একমাস পর সেই সকল রসিদ মিলাইয়া কোম্পানী হইতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা হইবে। রসিদ হারাইয়া গেলে কোম্পানী দায়ী নয়।

জনৈক বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ মানুষের চুলে কাজ হইবে কি-না। উত্তরে সাতকড়ি বলিল, আমাদের যা স্কীম তাতে লম্বা—উস্কো খুস্কো—জট পাকানো চুলেরই প্রয়োজন ; কারণ দড়ি, লেপ, বালিশ ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে সেইটেই সুবিধে। তবে আমাদের কোম্পানীর শীগগীরই একটা রিসার্চ লেবরেটরী করা হবে, তাতে পুরুষের চুল নিয়ে ভবিষ্যতে কার্য্যকরী করবার জন্য উত্তমরূপে গবেষণা করা হবে। সামান্য জিনিষ দিয়ে যে কি অসাধ্য সাধন করা যেতে পারে দেশবাসীকে সেইটেই আমরা দেখাতে চাই।

সমবেত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করিবার পর উৎসবের কার্য্যসূচী সম্পন্ন হইল।

ইহার পর আর মরিবার ফুরসৎ নাই। ইতিমধ্যে বহু এজেণ্টের দরখাস্ত হেড অফিসে পৌঁছিয়াছে। প্রত্যেকেই কমিশনে আঁচড়ানো চুল সংগ্রহ করিতে রাজী আছেন। এজেণ্টদের কমিশন ইত্যাদি স্থির করিবার ভার পার্লামেনটরী বোর্ডের উপর—তাঁহারা সেদিকে মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। সাতকড়ি ওয়ারকিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করিয়া চুলের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া ফেলিল ! সোজা হেড অফিসে জমা দিলে প্রতি সের সাতটাকা এবং এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে পাঁচ টাকা সের দেওয়া হইবে। কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, এইরূপ একটা অভিনব ব্যবসায়ের জন্য মূল্য অধিক রাখাই বাঞ্ছনীয়—নতুবা বহুল প্রচারের সম্ভাবনা কম।

প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নরহরি যথারীতি ভারতের সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলিতে চুলের মূল্য প্রকাশিত করিল।

বড়বাজারে হেড অফিসের পাশেই একটা প্রকাণ্ড গুদামঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছে। প্রাপ্ত চুল বস্তা করিয়া এখানে জমা রাখা হইবে, কারণ কমিটির ধারণা অন্তত পাঁচ শত মণ কাঁচা মাল না হইলে ব্যবসায় আরম্ভ করা সম্ভবপর নয়।

সবই হইল ! কিন্তু সহৃদয় দেশবাসী সাতকড়ির জাতীয় শিল্পকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিল না। ফলে একমাস হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে এজেণ্টগণ মাত্র সাড়ে সাত সের চুল সংগ্রহ করিল।

কমিটির সভ্যরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। কমিটির জরুরী অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইল—বাঙ্গালীর ধৈর্য্য নাই বলিয়াই সকল বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছে, অতএব অদ্য হইতে এজেণ্টগণ অসীম ধৈর্য্যের আদর্শ রবার্ট ব্রুসের প্রতীক স্বরূপ পকেটে কৌটায় করিয়া একটি মৃত মাকড়সা রাখিবে। মন নিরাশ হইবার উপক্রম হইলেই কৌটা খুলিয়া মাকড়সাকে দর্শন করিলে হৃদয়ে নব অনুপ্রেরণার সঞ্চার হইবে। হেড অফিসে রবার্ট ব্রুসের একখানি ছবি টাঙানো হইল—তাহার নিচে ডি-এম-সি সূতা দিয়া একটি মৃত মাকড়সাকে ঝুলাইয়া রাখা হইল। কর্ম্মীদের ভিতর হতাশভাব কোন প্রকারেই যাহাতে না আসে।

ইহাও কমিটির পক্ষে নিরাপদ মনে হইল না। তাহারা হিসাব নিকাশের জোর গবেষণা আরম্ভ করিলেন। ভারতের লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটী। কম করিয়া ধরিলেও অন্তত দশ কোটী নারী হইবে। তাহাদের মধ্যে আড়াই কোটী বিধবা বাদ দিলে—সাড়ে সাত কোটী সধবা ও কুমারী থাকে। পাগল অসুস্থা ইত্যাদিতে আর এক কোটী বাদ পড়িবে ; তবু সাড়ে ছয় কোটী নারী বর্ত্তমান। গড়পড়তায় অনেকে চুল বাঁধে না, এ জন্য আধ কোটী ছাড়িয়া দিলেও ছয় কোটী (নীট) চুলসম্পন্ন নারীর চুল পাওয়া উচিত। প্রত্যেকের মাসে আধ পো করিয়া চুল সংগ্রহ হইলে পঁচাত্তর লক্ষ সের হয় অর্থাৎ মাসে এক লক্ষ সাড়ে সাতাশী হাজার মণ।

ইহার পরিবর্ত্তে সাড়ে সাত সেরের কল্পনা ওয়ারকিং কমিটির কোন সদস্যেরই মাথায় প্রবেশ করিল না। কেন এমন হইল ? এজেণ্টদের তলব দেওয়া হইল। তাহারা যথারীতি বেতের ঝুড়ি সরবরাহ করিয়াছে কি-না তার ষ্টেটমেণ্ট গ্রহণ করা হইল। সকলের মুখেই এক কথা। প্রায় অধিকাংশ বাড়ী হইতে চুল পাওয়া যায় না। ওয়ারকিং কমিটির চক্ষুস্থির ! নারী আছে অথচ চুল পাওয়া যাইবে না—ব্যাপার কী ? রীতিমত তদন্ত হওয়া আবশ্যক, পার্লামেনটরী বোর্ডের অধীনে একটা

এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হইল। সাতকড়ি হইল সভাপতি। এক মাসের ভিতর কমিটির নিকট তাহাকে তদন্তের ফলাফল জানাইতে হইবে।

সাতকড়ি স্থির করিল, প্রথমে কলিকাতায় তদন্ত আরম্ভ করিবে—তাহা হইলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না। ট্রামে—বাসে—ট্যাক্সী, রিক্সায় সে কলিকাতায় ঘুরিতে থাকিবে। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় বারান্দা ও জানালাগুলির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে এবং কোন বাড়ীতে তিন-চারিটি মেয়ে একত্র দেখিলেই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করিবে। জাতীয় শিল্পকে সাহায্য করা হইতেছে না কেন?

পরদিন লীডার পার্কের একটা বাড়ীতে কয়টি মেয়েকে একত্র দেখিয়া সাতকড়ি দরজার কলিং বেল টিপিয়া দিল। দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপুলকায়া মহিলা দর্শন দিলেন।

সাতকড়ি ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল, বাড়ীর মালিক যিনি—তাঁর সঙ্গে একটু—

মহিলাটি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আমারই বাড়ী—কি দরকার বলুন!

সাতকড়ি দু-তিনবার ঢোক গিলিয়া বলিল—আমি বিজ্‌নেসম্যান। আপনি বোধ হয় "অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাসট্রি"র নাম শুনে থাকবেন —আমি তারই—

—ও—বলিয়া মহিলা রিণি—ঝুমু—মিনি—লিলি বলিয়া চারবার ডাকিলেন। পরমুহূর্ত্তে চারিটি সুবেশা তন্বী একরূপ নাচিতে নাচিতেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহিলা সাতকড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, দেখেছেন?

সাতকড়ির গলা শুকাইয়া আসিয়াছে, অস্ফুটস্বরে বলিল—আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারলাম না—

মহিলা কন্যাদের বলিলেন, পেছন ফিরে দাঁড়া তো—

রিণি—ঝুণু—মিনি—লিলি মাতৃ আজ্ঞা পালন করিল।

সর্ব্ব-নাশ! সাতকড়ি দেখিল, সব কয়টিরই চুল ছোট করিয়া ঘাড় অবধি ছাঁটা। আধুনিক মতে বব্‌ড হেয়ার। তবে কি ইহারই জন্য—সে অসহায় ভাবে মহিলার দিকে তাকাইল।

তিনি বলিলেন, এরা চুল বাঁধে না—স্যাম্পু করে! নমস্কার।

প্রতি-নমস্কারের পূর্ব্বেই সশব্দে দরজা বন্ধ হইয়া গেল এবং ভিতরে অদ্ভুত মিহি ধরণের চাপা হাসির শব্দ শুনা গেল।

পকেট হইতে কৌটা বাহির করিয়া মাকড়সাটাকে একবার দেখিয়া লইয়া সাতকড়ি শ্যামবাজারের উদ্দেশ্যে ট্রামে উঠিয়া পড়িল। এই সমস্ত প্রগতিশীল মহিলাদের সে আন্তরিক ঘৃণা করে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটা বারান্দার দিকে নজর পড়িতেই বাঁধকে বলিয়া সে দ্রুতগতিতে ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল।

দরজার কড়া নাড়িতেই নাদুস নুদুস কালো চেহারার একটি ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া কট্‌মট করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ও দৃষ্টির অর্থ—কি চান বা কাকে চান নয়—কেন বিরক্ত করতে এসেছো?

সাতকড়ি বলিল,"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাসট্রি কোং" থেকে আসছি—

ভদ্রলোক বলিলেন, ইন্‌স্যুয়রেন্সের দালাল তো?

সাতকড়ি ভরসা পাইয়া বলিল,—আজ্ঞে না। আমাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান। ভারতের লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার—

থাক্ থাক্! বক্তৃতা থামাও, কি দরকার?

সাতকড়ি অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বলিল, "আজ্ঞে, আপনাদের বাড়ীতে কটি মেয়ে দেখলাম; তাদের আঁচড়ানো চুল আমাদের দরকার, মানে—এই নিয়েই আমরা বিজনেস ষ্টার্ট করেছি—

কি? ভদ্রলোক চোখ পাকাইয়া হাতের মুঠা শক্ত করিয়া বলিলেন, ফকরামির আর জায়গা পাওনি? ভদ্রলোকের মেয়েদের মাথার চুল—গদা—গদা—

কণ্ঠস্বরের বোধ হয় তাৎপর্য্য আছে। পরক্ষণে ষণ্ডা ধরণের একটি লোক বাঁশের লাঠি লইয়া উপস্থিত হইল।

ভদ্রলোক বলিলেন, দেখেছো?

এইবার আর বুঝিতে পারিলাম না বলা চলে না।

সে একরূপ মরিয়া হইয়া বলিল—আমি বিজ্‌নেসমান। সে রকম কোন উদ্দেশ্য নিয়ে—

ব্যস—আর কথা নয়। বেরোও—বেরোও—

গদাও ততক্ষণে লাঠিটা উঁচু করিয়াছে।

বেগতিক বুঝিয়া সাতকড়ি এক লাফে বাহির হইয়া পড়িল।

উঃ—কি লাঞ্ছনা! সে জীবনে এইরূপ অপমানিত হয় নাই। অতবড় বিজনেস কোম্পানীর ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর—তার কি-না এই দুর্ভোগ। পরমুহূর্ত্তে ভাবিল, দেশের কাজে স্বার্থত্যাগ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কংগ্রেস সভাপতি—মহাত্মা গান্ধীও অনেক সময়ে ইষ্টক প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন। ইহা পরাজয়ের গ্লানি নয়—বিজয়ের জয়টীকা।

নিমতলা ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীর জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সাতকড়ি রিক্সা হইতে 'রোখো' 'রোখো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

জনৈক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ী। ছোট্ট একটি মেয়ে দরজা খুলিয়া দিল, নাম বলিতেই বলিল, দাদু নাইছে—আপনি বৈঠকখানায় বসুন।

বৈঠকখানা অর্থাৎ তক্তপোষের ওপর ময়ুর ও বাঘ আঁকা দু'টি জাপানী ছেঁড়া মাদুর এবং তৈলসিক্ত একটি তাকিয়া। সাতকড়ি বসিয়া পড়িল।

পাঁচ মিনিট পর নগ্ন গাত্রে খড়ম পায়ে শীর্ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় দর্শন দিলেন। সাতকড়ি কি ভাবিয়া হঠাৎ পায়ের ধুলা মাথায় লইল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, মশায়ের কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

সে আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিল। গদাধরের কথাও বাদ পড়িল না। শেষে মন্তব্য করিল, বাঙালী জাতের কোন দিন উন্নতি হবে না পণ্ডিত মশায়। বিজনেস এ্যাপ্রিসিয়েট করবার ক্ষমতাই এদের নেই। কিন্তু আপনি ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আপনিই বলুন—বাংলার কি এই অবস্থা পূর্ব্বে ছিল? চাঁদ সদাগর—ধনপতি সদাগর—শ্রীমন্ত সদাগর—এরা তো বাংলারই ছেলে।

বিত্তারত্ন মহাশয় একাগ্রচিত্তে সমস্তই শুনিতেছিলেন। বলিলেন, কাজটা ভাল করনি বাবা। মাতৃজাতির কেশ স্পর্শ করা অত্যন্ত গর্হিত পাপ, এর জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। নারী জাতিকে শক্তি-রূপিণী চণ্ডীর সহিত তুলনা করা হয়—তাদের কেশ নিয়ে কি-না তোমরা ব্যবসা করবে? নরকেও স্থান হবে না তোমাদের। দোষ দিই কাকে? ঘোর কলিকাল উপস্থিত হয়েছে—

সাতকড়ি অধীর হইয়া বলিল, কিন্তু বিজ্‌নেস ইজ বিজ্‌নেস।

বিত্তারত্ন মহাশয় কানে আঙুল দিয়া বলিলেন, থামো—থামো। এসব কথা কানে শোনাও পাপ।—নারায়ণ—নারায়ণ। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের জন্য কৌরবদের সর্ব্বনাশ সাধন হ'ল স্মরণ হয়?

সাতকড়ি রাগিয়া বলিল, ও সব বোগাস্, কোন প্রমাণ নেই। আমার হিষ্ট্রি ছিল, মহাভারত যুগের কোন ইন্‌সক্রিপসন কিংবা কয়েন্‌স এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নি।

বিত্তারত্ন মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন।

তা হ'লে আসি বাবা—পুজোর সময় হোলো। জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সাতকড়ি শুনিতে পাইল ভিতরে চাপা গলায় কাহাদের উদ্দেশ্যে ধমকানো হইতেছে—

ধিঙ্গি মেয়ে সব। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পুরুষ মানুষের দিকে হাঁ করে তাকাতে লজ্জা করে না।

যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়! বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। মাথার উপর রৌদ্র তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুধায় পেটের নাড়িগুলি মোচড় দিয়া পাক খাইতেছে যেন। বিষণ্ণচিত্তে সে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল।

উঃ—জাতির কি অধোগতি। বিংশ শতাব্দীতেও এই সমস্ত কুসংস্কার বর্ত্তমান। এরা থাকিতে জাতীয় শিল্পের কোন দিন উন্নতি হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জিনিয়াসদের কথা স্বতন্ত্র। নিউটন গাছ হইতে ফল পড়িতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জলন্ত উনুনের উপর চায়ের জল গরম করিবার সময় জেমস ওয়াট রেলওয়ে ইঞ্জিনের সন্ধান পান এবং বাঙালী লালাবাবু রজকের গৃহে 'বেলা যায়' শুনিয়া জীবনের ক্ষণিকত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছিলেন।

ভবানীপুরে ট্রাম হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেই ভাসমান সঙ্গীতের মত কয়টি শব্দ সাতকড়ির কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। অদূরে কোন অধ্যয়নরত বালিকা সুর করিয়া পড়িতেছিল—

"মা আমার কত ভালবাসেন আমায়—"

উহাই যথেষ্ট। যে মস্তিষ্কে আঁচড়ানো চুল ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই মস্তিষ্ক ওই কয়টি শব্দে মনোজগতে একটা প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন সংঘটন করিল। সাতকড়ি পকেট হইতে মাকড়সার কৌটাটা টান মারিয়া রাস্তায় নিক্ষেপ করিল। বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বাগ্রে ঘটা করিয়া মাকে প্রণাম করিতেই তিনি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

গদগদস্বরে সাতকড়ি বলিয়া ফেলিল—ভেবে দেখলুম, তোমার কথাই ঠিক মা। ঘরে লক্ষ্মী না এলে বাইরের লক্ষ্মীকে হাত করা যায় না।

পরদিন প্রত্যুষে রামগতিবাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকাইয়া শুভ-কার্য্যের জন্য দিন স্থির করিতে বলিলেন।

ফিরে এস

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

বহু ভাগ্যফলে পেয়েছিলে কোলে শ্রেষ্ঠ সন্তানেরে তব
হে বঙ্গ জননী,
সে মাণিক আজ ফেলেছ হারায়ে, খুঁজে নাহি পাবে
সসাগরাদ্বীপ ধরণী।
কাঁদিয়াছ কত কাঁদিতেই থাক দুর্ভাগা মাগো বঙ্গভারতী
স্মৃতির আসরে রচ বসে আজ রবি-স্মৃতি-মালা আরতি।
অস্তমিত রবি উদিবে কি পুন ভারত ভাগ্য উজলি,
জ্বলিবে কি সেই প্রতিভা—প্রদীপ মরণ-যজ্ঞ উছলি!
মহাতাপসের যে প্রতিভা-স্রোত ছুটেছিল প্লাবি'
পৃথিবীর বুক
সে ঋষি তাপস সে মহাসাধক কেন আজি হায়—
নীরব ও মূক!
মহোমহিয়ান্ যে মহামানব জগৎ-হৃদয় করেছিল জয়
বিতরি বিশ্বে নব নব বাণী মরণে আজি সে মহামৃত্যুঞ্জয়।
ভারতের কৃষ্টি, ত্যাগ ও সাধনা প্রচারি বিশ্বের দ্বার হ'তে দ্বারে,
যে ঋষি সাধক করেছে ঘোষণা, প্রতিনিধি রেখে গেল বা কারে?
সকলই তো আছে নাই শুধু রবি, স্মৃতি মাঝে জাগে
তারি কথা গান;
অমরার পথে জ্যোতির্ম্ময় রথে মরণ-জয়ীর এ কি তিরোধান!

বঙ্গের গৌরব রবি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কিবা তেজে কিবা
গর্ব্বে মহামহিমায়
কবিকুলশিরোমণির দুর্লভ আসনখানি শ্রীমণ্ডিত করেছিল
প্রতিভা-প্রভায়।
শূন্য সে আসন আজি পশ্চাতে পড়িয়া আছে, সীমার বন্ধন টুটি
মুক্ত পক্ষে ধায়
অসীমের ভক্ত সেই ভূমার পূজারী অনন্তের অন্বেষণে
অনন্তে মিলায়।
স্বরগের দ্বারে কাতারে কাতারে মালা হাতে যারা দাঁড়ায়ে রয়েছে
বরণ করিতে মানব-কবিরে স্বগত আহ্বানে আকাশ ভরেছে।
হেথা—ধনীর প্রাসাদে দীনের কুটীরে খর-স্রোত বহে
বিরহ ব্যথার
হোথা—ত্রিদিবে উল্লাস হরিয়া লইয়া বক্ষেরই মণি বঙ্গমাতার।
মুছাতে কালিমা মায়ের মুখের, ঘুচাতে জ্বালা লাঞ্ছনাভার,
পতিত জাতির মর্য্যাদা রাখিতে বাণীর অশনি কে হানে আর!
যেও না যেও না ফের ফের রবি ভারতে আজিকে দুর্য্যোগ রজনী
কাটে নাই ঘোর হয়নি প্রভাত, অসহায় মাগে বীর্য্য তরণী।
ঈশ্বর চিহ্নিত হে মহামানব, নব কলেবরে এস পুন ফিরে
বাংলার কোলে বাঙ্গালীর ঘরে কৃষ্টি কলার শ্যামল তীরে।

স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

(৭)

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেলে বিনয় মাকে বলিল, মা আর তো ব'সে থাকতে পারিনে। পরীক্ষা এবছর আর দেওয়া হ'ল না বোধ হয়—আর হবেও না। যাই একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করি—বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু বিনয়ের মা বিশেষ দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, ক'লকাতায় যাবিই তো। লেখাপড়া অনেক শিখেচিস, আর নাই বা শিখলি। তোর একটি বেশ ভালো চাকরি হ'লে তখন অতুলকেও নিয়ে যাবি তোর কাছে। গাঁয়ের পাশটা হয়ে গেলে ক'লকাতায় তোর কাছে থেকেই পড়বে।

তিনি এমন ভাবে কথা বলিলেন যেন বিনয়ের চাকরি হইয়া গেছে। আজন্ম পল্লীরমণী, কখনও খবরের কাগজও পড়েন না, বেকার সমস্যারও খবর রাখেন না। মনে করেন, ছেলেকে যে বিদ্যা শিখিবার জন্য জমি বাঁধা দিয়া, গয়না বিক্রী করিয়া টাকা জোগাইয়াছেন সে বিদ্যা নিশ্চয়ই একটা বড় রকম কিছু এবং তাহার বলে পৃথিবীতে অনেক অসাধ্য সাধনই করা যায়, সামান্য একটা চাকরি জুটান তো মুখের কথা!

তদনুসারে বিনয়ের মা রত্নময়ী পুরোহিতঠাকুরকে একবার ডাকাইয়া পাঠাইলেন, বিনয়ের যাত্রার একটা শুভদিন ঠিক করিয়া দিতে। পুরোহিত মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া বিনয়ের জন্মপত্রিকার গ্রহনক্ষত্রের সহিত পাঁজি পুঁথি মিলাইয়া এক অতি শুভদিন বাছিতে বসিলেন। নস্যদানি হইতে একটিপ নস্য লইয়া চশমাটা চোখে দিয়া অনেকক্ষণ বিচারান্তে কহিলেন, তাই তো মা, কাছাকাছি ভালো দিন তো পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক ওর পক্ষে শুভ হয় কার্ত্তিকের আটাশে কিংবা উনত্রিশে, শুক্লা একাদশী। সেই দিনটি খুব ভালো। তার এদিকে তেমন তো আর দেখচিনে।

রত্নময়ী বলিলেন, ঐ দিনেই আপনার কথা মত বিনয় যাবে। এত তাড়াই বা কিসের। পুজো বাদে যাবে।

বিনয়কে সে কথা জানাইয়া এবং কোন একটা শুভ কাজে যাত্রা করিতে হইলে দিনক্ষণের উপকারিতা যে কতদূর সে সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়া পুরোহিত শিরোমণি মশায় বিদায় লইলেন। সে তো এখনও প্রায় মাসখানেক দেরী। ইতিমধ্যে শরতের সোনালি রোদটি উঠানের শিউলি গাছে আসিয়া পড়িয়াছে। আকাশের ঘন নীল এবং বর্ষণলঘু শুভ্র মেঘখণ্ড বিনয়ের মনে একটি মধুর মায়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে। জীবন সম্বন্ধে তাহার নিজেরও এখন কোনই বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই। এতদিন একটা অনিশ্চিতের মাঝে পড়িয়া নানারূপ এলোমেলো চিন্তার ভারে তাহার মনটা ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। এখন মা ঠিক করিয়া দিলেন, কলিকাতায় গিয়া একটা চাকরি যাহা-হোক জুটাইয়া লইয়া করিতে হইবে, অতুলও সেখানে থাকিয়া পড়িবে। বাড়ীতে বিষয়-সম্পত্তি সামান্য যাহা কিছু আছে তিনি পুরাতন কর্ম্মচারী মণিদাকে লইয়া দিব্য দেখাশোনা করিবেন। আর মেয়েটার বিয়ে, তা সে দুবছর পরে হইলেও ক্ষতি নাই। আজকাল সতের-আঠারো বছরের ধাড়ি না করিয়া কোথায় আর মেয়ের বিবাহ হইতেছে! কি শহর কি পাড়াগাঁ, সর্ব্বত্রই এই কাণ্ড! নীহার তো এই মোটে চৌদ্দতে পড়িয়াছে। তাঁহার সরল ও সহজ সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিনয়েরও মনে হইয়াছে, সহজেই সব হইয়া যাইবে। তাই কলিকাতা যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার এই সময়টুকু তাহার কাছে আজ অনেকদিন পর ভাবনা-লেশহীন সুমিষ্ট মনে হইতেছে। বিকাল বেলায় বারান্দায় টুলে বসিয়া সে একটা রাশিয়ান নভেল লইয়া পড়িতেছিল, কলিকাতার কলেজ লাইব্রেরী হইতে বন্ধু রমাপতি বই দু'খানা পাঠাইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে সঙ্গীহীন একা নীরস সময় কেমন করিয়া কাটিবে তাই রমাপতিকে লিখিয়া বই দু'খানা আনাইয়াছে। মনটা সেই রাশিয়ান উপন্যাসের পিছনে পিছনে কত রোমান্স, কত বিশ্বমানবতা, কত গহন ভাবলোকের ভিতর বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল। নীহার আসিয়া তাহার টুলের পিছনে দাঁড়াইয়া সসঙ্কোচে কহিল, দাদা কোন ভালো বাংলা বই আছে? আমার সই মালতী চাইছিল।



শিল্পী— শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগচী

প্রতীক্ষা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

বিনয় বলিল, বাংলা বই ? ··· না, কই তেমন কোন বই আমার কাছে নেই তো ! ··· একটুখানি হাসিয়া বলিল, তোর সই-গোছের মেয়েদের যে ধরণের বাংলা বই ভালো লাগবে, সেই চীনের ড্রাগন কিংবা জালের জাহাজ কিংবা প্রাণের ফাঁসী—সে সব তো আমার কাছে থাকে না।

নীহার রাগিয়া উঠিয়া কহিল—মেয়েদের কথা উঠ্‌লেই তোমার তামাসা করা চাই। কিন্তু আমার সইকে তুমি জান ? না জেনে কথা বল কেন ?

বিনয় বই পড়িতে পড়িতেই কহিল, না জানিনে, এবং জানবার জন্যেও ঠিক তেমন ব্যাকুল হয়ে উঠি নি।

নীহার আর কোন কথা না বলিয়া রাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। বোধ হয় এ কথাটা আর কোন পক্ষ হইতেই উঠিত না, কিন্তু সেইদিনই রাত্রিবেলায় নীহারকে কি একটা কাজে ডাকিতে বিনয়ের মা রত্নময়ী বলিলেন, সে ওপাড়ায় তার সই মালতীকে একবার দেখতে গেচে। আহা আজ সন্ধ্যেতে মেয়েটাকে ঘাড়ে ধরে দেয়ালে মাথাটা ঠুকে দিলে ঐ ওর সৎমা মাগী। মেয়েটার কষ্ট দেখলে মনে বড় লাগে।

বিনয় কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, হঠাৎ মাথাঠুকে দেবার এমন কি দরকার পড়লো মা ? কি করেছিল মেয়েটি ?

মা তখন সবিস্তারে পরিচয় দিতে বসিলেন। মালতীর বাবা তাহার মা মারা যাইবার পর দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন। মালতীর বয়স চৌদ্দ-পনের হইতে চলিল, এখনও পয়সার অভাবে বিয়ে হয় নাই। মেয়েটির একটু পড়াশোনার ঝোঁক আছে, তাই সৎমার একরাশ কাচ্চা-বাচ্চা সামলাইয়া গৃহের সমস্ত উঞ্ছ কাজ সারিয়া রাখিয়াও একটুখানি সময় পাইলেই বই লইয়া বসে। আজও ছোটখোকাকে দাওয়ায় খেলিতে দিয়া সইয়ের কাছে চাহিয়া আনা এই মাসের 'প্রবাসী'খানা লইয়া পড়িতেছিল ; বোধ হয় পড়িতে বসিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। ছোটখোকা ইতিমধ্যে সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া সামান্য একটু লাগায় কাঁদিয়া ওঠে। সৎমা অমনি উঠি-তো-পড়ি অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া মালতীর হাত হইতে বইখানা কাড়িয়া লইয়া তাহার মাথাটা ধরিয়া আচ্ছা করিয়া দেয়ালে ঠুকিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার ইতিবৃত্ত শেষ করিয়া রত্নময়ী উঠিয়া গেলেন। পল্লীগ্রামের কাজকর্ম্ম শীঘ্রই সারা হইয়া গেল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ধীরে ঘনাইয়া আসিল।

বিনয় বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিল একটি উৎপীড়িতা মেয়ের কথা। যে বয়সে মনটা স্বভাবতই আদর্শবাদের দিকে ঝোঁকে, অল্পেতেই অনেককিছু কল্পনা করে—সেই বয়স এখন বিনয়ের।

তাহার মনে হইল মেয়েদের নিঃশব্দ সহ্যের ইতিহাস কিছুই সে জানে না। ··· তখন না জানিয়াই সে এই মেয়েটির বই চাহিবার কথা লইয়া নীহারের সহিত ঠাট্টা করিয়াছিল। অন্যায় করিয়াছে।

পরের দিন সকাল বেলায় নীহার চা লইয়া আসিলে সে নিজে হইতেই কথা উত্থাপন করিল। কহিল, তোর সই কি বই চেয়েছিলেন ? আমার কাছে রবিবাবুর কয়েকখানা বই আছে, পড়তে দিস।

নীহার বিষণ্নমুখে বলিল, সই আর বই নিয়ে কি করবে দাদা ? তার মা তাকে যেমন করে কাল মাথা ঠুকে দিয়েচে—আর বাবা তার স্পষ্টই বলে দিয়েচেন, গেরস্তঘরে মেয়েমানুষের অমনি বই মুখে দিয়ে বসে থাকা চলবে না। এবার দেখতে পেলে তিনি হুলুস্থুল করবেন ! সইয়ের বড় কষ্ট দাদা। আহা বেচারা। আমিই তো কাল তোমার টেবিল থেকে প্রবাসীখানা নিয়ে গিয়ে তাকে পড়তে দিয়েছিলেম, না দিলে হয় তো এত কাণ্ড হ'ত না। অনেকটা আমারই দোষ।

দ্বারের অন্তরালে কে যেন দাঁড়াইয়াছিল, বেশ সপ্রতিভভাবেই ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে সে কহিল—না, আপনি ওর কথা শুনবেন না। যদি আপনার কাছে ভালো বই থাকে, দেবেন আমাকে পড়তে। ঘরে অমন এক-আধটু বকুনি শুনতে হয়। তাতে কিই বা হয়েচে ?

বিনয় উৎসাহ দিয়া কহিল, নিশ্চয়। বাধা আসে শুধু আমাদের আগ্রহকে দ্বিগুণ করতে। এই বাধা-বিঘ্নের মাঝেও যে আপনার লেখাপড়ার মত এমন একটা ভালো কাজের উপর এতখানি উৎসাহ আছে, এটা কি কম কথা ?—এতক্ষণ সে মুখ না তুলিয়াই কথা বলিতেছিল, এখন সঙ্কোচ কাটাইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল এলোমেলো

চুলে ঘেরা একটি সুকুমার মুখ। আয়ত দুটি চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি। বাংলাদেশের সমস্ত সরস শ্যামলতা যেন ইহার কালো আঁখিতারায়, গভীর ঘন পক্ষ্মঘেরা দৃষ্টিতে মিশিয়া রহিয়াছে।

মালতী কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, আমি এতদিন মামা-বাড়ীতেই মানুষ হয়েচি কি-না, সেখানে মামা আমাকে স্কুলে দিয়েছিলেন। তিনি মারা যেতেই এখানে এসেচি। এখানে এসে কেমন হাঁপ ধরে। কোথাও কেউ একটা খবরের কাগজ বা একখানা মাসিকপত্র নেয় না। খাবার-দাবার চর্চ্চা ছাড়া আর যে কিছু আছে—যেন ভুলেই যেতে বসেছিলুম, তবু ভাগ্যে সই ছিল। ও মাঝে মাঝে বই-টই আমাকে দেয়।

বাইরে কে একটি ছোট ছেলে হাঁকিতে লাগিল, মালতীদিদি, তোমাকে মা ডাকচে শীগ্‌গীর চলো। এক মিনিটও দেরী না। মালতী ত্রাস্ত ভীত পদে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিনয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনি নীহারের দাদা, আমারও দাদা। বই বই ক'রে যদি মাঝে মাঝে উত্যক্ত করি, কিছু মনে করবেন না যেন। আর সইয়ের কথায় কান দেবেন না। আমায় একটু বকুনি খেতে দেখলেই ওর সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়।

মালতী চলিয়া গেলে বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার শেষ নাই। হঠাৎ জীবনের একটা নূতন দিক যেন তাহার চোখে পড়িয়া গেল। হাতে একখানা আধুনিক বাংলা উপন্যাস ছিল, সেই বইটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনয়ের মনে হইতে লাগিল, কত রকম কাল্পনিক সমস্যা, কত বিরহ-মিলন-কথা, কত অলীক প্রেমের ব্যথার কাহিনী লইয়াই না এই সব বই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অথচ বাংলা দেশের কত কম খবরই না আমরা রাখি। মালতীর ঐ ছোট্ট জীবনটি ঘেরিয়া যে সমস্যাটুকু জটিল হইয়া রহিয়াছে, একদিকে পারিবারিক জীবনের অত্যাচার, সঙ্কীর্ণতা, অন্যদিকে তাহার মনের আকুল ইচ্ছা ঐ বাহিরের বিশ্বজগতের একটুখানি খবর পাইতে। জ্ঞানের আলোর সন্ধান পাইতে। বাংলার পল্লীগ্রামের অসংখ্য মূঢ়তা, অন্ধতা, মূর্খতার মাঝখানে তাহার ঐটুকু একক প্রয়াস কি করুণ! কিন্তু কে তাহার খবর রাখে?

(৮)

কলিকাতায় পৌছিয়া সাবেক মেসটাতেই বিনয় উঠিল। পুরাতন বন্ধুরা—শরদিন্দু, কিরণ, সৌরীন—সবাই ছুটিয়া আসিল, সবাই ঘিরিয়া দাঁড়াইল। নানারূপ প্রশ্ন বর্ষণ হইতে লাগিল; কি হে, একেবারে দু-তিন মাস দেখা নেই। পরীক্ষাটা দেবে তো? ··· তোমার বাবার কি হয়েছিল? ·· দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে ওকে অন্তত এক পেয়ালা চা খেয়ে চাঙ্গা হতে দাও। যতীন তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জ্বালিয়া চা করিতে গেল। সেই আগেকার দিনের ভাবনাচিন্তাহীন অনাবিল জীবন, বন্ধুত্বের সেই উদার বন্ধন ··· এসব হইতে কি নিষ্ঠুরভাবে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে, মনে করিতেই বিনয়ের দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল। এই আনন্দলোকের ভিতরে এই তো কিছুদিন আগেই তাহারও একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল—কিন্তু এখন সে জীবন যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। যতীন ও সৌরীনের এটা পরীক্ষার বছর। তাহারা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উঠিয়া পড়িল। প্রায় রাত ন'টা বাজে। আর গল্প করিলে বিবেকে বাধিবে। নেহাৎ ফেল্‌ করাটা কোন কাজের কথা নয়। তাহাদের এই ব্যস্ততা তীরের মত আসিয়া বুকে বেঁধে, হঠাৎ মনে হয়, তাহারও তো এটা পরীক্ষার বছর। পরক্ষণেই আবার মনে পড়িয়া যায়, না না, সে তো পরীক্ষা দিতে আসে নাই, আসিয়াছে চাকরি খুঁজিতে। চাকরি একটা তাহাকে যেমন করিয়া হোক জুটাইতেই হইবে। শরদিন্দু একটু থামিয়া একটুখানি ইতস্তত করিয়া কহিল, তিনমাস কলেজের মাইনে বাকী; কামাইও হ'ল অনেকদিন, পরীক্ষাটা ··· বিনয় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, সে ভয় আর নেই ভাই। পরীক্ষার পালা চুকিয়ে দিয়ে বসে আছি। ওসব পাট উঠ্‌লো এবার জীবন থেকে। এখন থেকে চাকরির উমেদারি করে বেড়াব ঠিক করেচি। অতুল বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি! পড়া ছেড়ে দেবে? কেন, শুনেচি তোমার বাড়ীর অবস্থা ভালো, বাবা মারা গেলেন, সে তো একদিন সবারই যাবে। উপস্থিত ধাক্কাটাও খুব লাগে মনে স্বীকার করচি। কিন্তু ··· তাই বলে পড়া ছেড়ে দেবে?

বিনয় ম্লান হাস্যে কহিল, বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে কলেজের ছাত্রদের বরাবর একটা ভুল ধারণা থাকে। আমারও এতদিন তাই ছিল। এইটুকু জেনে রাখো।

যতীন প্রশ্ন করিল, তার মানে ?

বিনয় বলিল, তার মানে যে কি, তা ঠিক বলে বোঝান যাবে না, আমিও বুঝতুম না। আমার বাবা মারা যাওয়ার পরের দিন থেকেই আমি যেন আর একটা রাজ্যে এসে পড়েচি। এতদিন শুধু ভেবেচি, শেক্সপীয়রের মীরান্দা বড়, না কালিদাসের শকুন্তলা বড়। কাউন্সিল বর্জ্জন ভালো, না কাউন্সিলে ঢোকা ভালো, ডারহাম্ জিতেছে না মোহনবাগান জিতলো। এখন ভাবচি সম্পূর্ণ অন্য কথা। সে কথার আদি নেই, অন্ত নেই···

যতীন—তোমার সমস্ত কথাই যেন কেমন হেঁয়ালি ঠেকচে বিনয়।

বিনয়—এমনই হেঁযালি ঠেকে ভাই। আমিও প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কাগজে কত রকম প্রবন্ধ পড়তেম, য়ুনিভার্সিটির পড়াশোনার অবাস্তব এবং অসত্য দিকটা নিয়ে। এ শিক্ষা নাকি আমাদের জীবনযাত্রার অনুপযুক্ত করে তোলে কিন্তু তখন অবিশ্বাসের হাসি হেসেচি। আজ যেন সে সব কথার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু থাক ভাই, ও সব কথা। তোমাদের যে ক'দিন সুখের স্বপ্নে কেটে যাচ্ছে, কাটুক না। এখন আপাততঃ এসেছি একটা চাকরির খোঁজে। কাল থেকে বার হব তারই সন্ধানে। পারো তো রাস্তা বলে দিও।

যতীন—বড় দুঃখ হ'ল ভাই, এসব শুনে। ক্লাসের মধ্যে ছিলে তুমিই সবচেয়ে ভালো ছেলে, তুমিই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চাকরির ধান্দায় বার হ'লে। যাক গিয়ে ও কথা। ট্রেনে রাত জেগে এসেচ, দেখি ওদিকে চায়ের কতদূর।

যতীন চায়ের ব্যবস্থা করিতে বাহির হইয়া গেল। বিনয় উঠিয়া একবার ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। কলিকাতার পথে তখন জনস্রোত বহিতেছে। সকাল বেলাকার আলো সবেমাত্র ছাদের একপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। এই আলোকোজ্জ্বল কর্ম্মব্যস্ত পৃথিবীর রূপ তাহার মনেও একটা উৎসাহের রেশ সঞ্চার করিয়াছিল। দুঃখ দুর্ভাবনাগুলাকে আর তেমন বড় কিছু একটা বলিয়া বোধ হইল না।

যতীন আসিয়া তাহাকে চায়ের টেবিলে লইয়া গেল। সেখানে বন্ধুদের সহিত হাস্যগল্পে মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। চেয়ারটা ঠেলিয়া চা পানান্তে যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল তখন ঘড়িতে ন'টা বাজে। বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে কহিল, একবার যোগীনবাবুর ওখানে চললুম। বাবার বিশেষ বন্ধু। একজন হোমরা-চোমরা লোক। দেখি যদি কিছু সুবিধে-টুবিধে করে দিতে পারেন তাঁদের অফিসে।

(৯)

বাস হইতে নামিয়া মিনিট পাঁচের পায়ে চলার রাস্তা অতিবাহিত করিয়া যোগেন্দ্র মল্লিকের সুবৃহৎ চারতলা বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন বিনয় দেখিল বহির্দ্বারে প্রকাণ্ড একখানা মোটর দাঁড়াইয়া। চাপরাশি জানাইল, বাবু অফিসে বাহির হইতেছেন এ সময় তাঁহাকে সে কোনমতেই বিরক্ত করিতে দিতে পারিবে না। বাবুর যাহা বলিবার আছে বরঞ্চ ওবেলা···

বিনয় ফিরিয়া আসিল। মেসের বন্ধুদের অনেকেই তখন কলেজ চলিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সামনের টেবিলের উপর দৈনিক খবরের কাগজ পড়িয়াছিল। বিনয় সেটা টানিয়া লইয়া বসিল।

শরদিন্দু কহিল, ওহে, রাত জেগে এসেচ। নাওয়া খাওয়া সেরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে পারতে। কাগজ তো পালাচ্ছে না।

বিনয় প্রত্যুত্তরে একটু হাসিয়া কাগজখানার ওয়ান্টেড্ পাতাটার উপর আরও মনোযোগ সহকারে ঝুঁকিয়া পড়িল। এই তো কত রকম চাকরি খালি রহিয়াছে, একটা কি তাহার ভাগ্যে লাগিবে না? তখনই সেইখানে বসিয়া সে খান দুই দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল। টিকিট আঁটিয়া নিকটবর্ত্তী পোষ্টাফিসে সে দু'খানা ফেলিয়া আসিয়া সে নিশ্চিন্তমনে স্নান করিতে গেল। স্নানের পর খাওয়া দাওয়া সারিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট তক্তপোষটায় আসিয়া যখন বিনয় বসিল তখন মেস প্রায় নিস্তব্ধ। অনেকেই কলেজে চলিয়া গিয়াছে, যে দুই-একজন যায় নাই – তাহারা ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া হয় পরীক্ষার পড়া করিতেছে কিংবা নোট গলাধঃকরণ করিতেছে। চাকর বামুন কাজকর্ম্ম-অন্তে বাহির হইয়া গিয়াছে। নিরালা নির্জ্জন এই অবকাশে নিজের জীবনের আকস্মিক ওলট্-পালটটা আর একবার মনের মধ্যে ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে গেল কিন্তু শ্রান্ত

বিনয়ের মনে কিছুই আসিল না। অনেক বড় বড় কথা আর তাহার মস্তিষ্ক ভাবিতে পারে না। মনে হয়, একটু শুইয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে। ঘুমাইয়া পড়িতেও দেরী হইল না। ঘুমের ঘোরে তন্দ্রার মধ্যে দেখিল: তাহার ছোট ভাই অতুল একটা ময়লা হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ পরিয়া ম্লানমুখে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে, যেমন সত্যই আসিবার দিনটায় সে দাঁড়াইয়াছিল। একটু ইতস্তত করিয়া ভীতভাবে কহিতেছে, দাদা স্কুলের দু'মাসের মাইনে বাকী। পরীক্ষার আগে না দিলে কিন্তু টেস্ট দিতে দেবে না। মালতীর সেই ব্যগ্র ব্যাকুল অসহায় চোখের দৃষ্টি স্বপ্নের মাঝে যেন ভাসিয়া ওঠে। জগতের চারিদিকে যেন একটা দিশাহারা ক্রন্দন। একটা বিষাদের ভাব। ঘুম ভাঙ্গিয়া যখন উঠিল তখন রোদ পড়িয়া আসিয়াছে। নীচের কলে জল পড়িতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া এক পেয়ালা চা আনিতে বলিয়া সে বাক্স খুলিয়া একটা ফর্সা জামা-কাপড় বাহির করিল। যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এবেলা একবার যাইবে। দেখা যাক কি হয়।

শরদিন্দু, যতীন, নির্ম্মল—তাহারা কলেজ হইতে আসিয়া চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে, তর্ক করিতেছে।

যতীন বলিতেছে, যাই বলো মহাত্মা গান্ধী আর যদি কিছু না-ও করতেন, আমাদের এই মানসিক অধঃপতনের যুগে তাঁর জ্যোতির্ম্ময় জীবন যে শুধু দেখিয়ে গেলেন, এইটুকুর জন্যেই আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে ধন্য হতেম।

নির্ম্মল একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিতেছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি একটা আলাদা কথা—আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিচালনার দায়িত্ব আর একটা আলাদা বস্তু ··· ও দুটো এক করতে গেলে অন্যায় করা হয়।

শরদিন্দু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছে, আঃ—রেখে দাও তোমার ন্যায়-অন্যায়ের বিচার। মনে রেখো পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশে কবি ও কবিতাকে একান্ত বিভিন্ন করে দেখা হয় না। আমরা শিল্পীর সঙ্গে তাঁর জীবন-শিল্পকে, কবির সঙ্গে তার কাব্যকে, কর্ম্মীর সঙ্গে তার নৈতিক জীবনকে অঙ্গাঙ্গীভাবে দেখতে অভ্যস্ত। মনে পড়লো তোমার রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা?—যেখানে বৈষ্ণব কবিতা পড়ে তিনি বৈষ্ণব কবিকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করচেন—

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?
··· ··· এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার আঁখি হতে?" ···

বিনয় কাপড়-জামা ছাড়িয়া আসিয়া চিরুণি চালাইয়া কেশের কিছু পারিপাট্য সাধন করিয়া চেহারাটাকে কথঞ্চিৎ ইম্‌প্রেসিভ্‌ করিবার চেষ্টা সমাপনান্তে যখন সেই চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিল তখন তাহার বন্ধুদের এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে মনে তাহার হঠাৎ যেন হাসি পাইল। হায় রে, দু'দিন আগে সেও তো ঐ রকম রবীন্দ্রনাথ, সুইন্‌বারণ্‌, চণ্ডীদাস লইয়া কত তর্ক কত কথার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। সেই সমস্ত কথা আজও উহাদের কাছে তর্কাতর্কি, উৎসাহ উদ্দীপনার বিষয় হইয়া আছে—কিন্তু তাহার কাছে কেমন করিয়া জানি না কথামাত্র হইয়া গেছে। কখন এবং কি করিয়া ঠিক ঠাহর পায় নাই। কিন্তু আজ যোগীনবাবুর কাছে চাকরির উমেদারি করিতে বাহির হইয়া মনে মনে খোসামোদি এবং মিষ্ট কথার মহলা দিতে দিতে এই প্রভেদটা বড় স্পষ্ট হইয়াই ধরা দিতেছে। তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা গিলিয়া লইয়া আশা এবং নিরাশার দোলায় দুলিতে দুলিতে সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

(১০)

আধ-অন্ধকারময় ঘর। জানালা দরজাগুলি বন্ধ। প্রকাণ্ড এক পালঙ্ক, নরম লেপের তলায় যোগীন্দ্রবাবুর দিবা-নিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নাই। সামনে গুড়গুড়ির নলটা রহিয়াছে। বিনয়কে বেয়ারা অপেক্ষা করিতে বলিয়া নীচের একখানা ঘরে বসাইল। ঘরখানা ছোট, কিন্তু সুসজ্জিত। ক্রেজির কাজ করা। মাথার উপর বিদ্যুৎপাখা। শীতকাল বলিয়া তাহাতে পশমের ঘেরাটোপ্‌ দেওয়া। চেয়ারগুলা গদি-আঁটা। পাশের বারান্দার ঘড়িতে জলতরঙ্গের একটা গৎ বাজিতে লাগিল এবং তৎসহিত তিনটা বাজিবার শব্দ পাওয়া গেল।

বড়লোকের বাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া বিনয় চুপ চাপ

প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মনে একটা দীনতার ভাব জাগিল। আজ অবধি কাহারও কাছে কখনও কোন জিনিষের জন্ম প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায় নাই। জীবনের এই প্রথম যাচনা। মনটা নিমিষে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়ায়। আধ ঘণ্টা ··· এক ঘণ্টা ··· দেড় ঘণ্টা প্রায় কাটিয়া গেল। ঘড়িতে সাড়ে চারিটা বাজিল। পাঁচটা বাজিবারও আর বড় দেরী নাই। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মন অধীর হইয়া উঠিল। একটা চাকর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া উপরে গেল, আধ-খোলা দরজাটা দিয়া দেখা যাইতে লাগিল। খোলা জানালা-পথে সামনের প্রকাণ্ড 'লন' চোখে পড়িতেছে, একটা মালী ঘাস ছাঁটিতেছে। চারিদিকের বাগানে কত রকম ফুলের গাছ। কত রঙ! কত সজ্জা! অলসভাবে সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বিনয়ের মনে আর একটা সম্ভাবিত দৃশ্য সহসা জাগিয়া উঠিল। দু'দিনের পরিচিত মালতী মেয়েটি এখন কি করিতেছে, তাহাদের খড়ে-ছাওয়া বারান্দায় ছোট ভাইটিকে লইয়া খেলা দিতে দিতে হয় তো বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। তার মা এখনই হয় তো দেখিতে পাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সুরু করিবেন, সে ভয়টুকু সারাক্ষণ মনে জাগিয়া আছে, তাই ভীত চকিত দৃষ্টিতে এক-একবার এধার ওধার চাহিতেছে। মালতীদের বাড়ী সে কখনও যায় নাই, নীহারের মুখের বর্ণনা শুনিয়া অনেকটা ঐ রকমই মনে হয়। ধনীর প্রাসাদে বসিয়া বাগানের শোভা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কোন এক অখ্যাত পল্লীপ্রান্তের একটি বালিকার করুণ মুখচ্ছবি কেন যে তাহার মনে পড়িতে লাগিল তাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। সূর্য্য অস্ত গেল, অস্ত সূর্য্যের রাঙা আভায় বাগানের গাছ-পালাগুলি ঝলমল করিতে লাগিল। একজন চাপরাশি ঘরে আসিয়া জানাইল, সময় হইয়াছে। বাবু তাহার সঙ্গে দেখা করিতে পারেন। তিনি দোতালার গাড়ী বারান্দায় আছেন, সেখানে যাইতে হইবে।

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল। চাকরের পিছু পিছু কাঠের পালিশ করা কার্পেট পাতা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া অনেক কক্ষ এবং অনেক অলিন্দ পার হইয়া সে অবশেষে দোতালার গাড়ী-বারান্দায় পৌছিল। যোগীন্দ্রবাবু একখানা পুরু শালে পা অবধি আচ্ছাদিত করিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া-ছিলেন। হাতের কাছে একটা টেবিলে জরুরী কাগজপত্র রক্ষিত ছিল। চশমা চোখে তাহারই একখানা হাতে লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিনয় তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিল, আমার বাবার নাম ছিল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায়। আপনাদের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর মুখে আপনার নাম প্রায় শুনেচি। আজ মাস দু'য়েক হ'ল তিনি স্বর্গে গেছেন।

যোগীন্দ্রবাবু কাগজ হইতে মুখ তুলিলেন, শশী মারা গেছে! আর না যাবেই বা কেন, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চিরটা কাল বাস করলে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে! আরে সেখানে আছে কি, রোগ হ'লে চিকিৎসা হবে? ছেলেপিলে হ'লে তাদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত হবে? কিছু না, কিছু না। রাতদিন তামাক খাও, আর যদি পার পরের হাঁড়ির খবর নিয়ে আলোচনা কর। শশীর কি হ'য়েছিল? বিনয় সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না। তাহার মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। কি উত্তর দিবে। ধনীগৃহে বসিয়া তাহার পিতার মৃত্যুটাও যেন একটা অপরাধের মত বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই গৃহের ঐ মেহগনিনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত পালঙ্ক, ঐ বিজলী বাতি ঐ মখমলের গালিচা; বহুমূল্য আস্তরণশোভিত কেদারা—সমস্তই এক-বাক্যে যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, আজ্ঞে তাঁর ডবল-নিউমোনিয়া হয়েছিল।

হুঁ। আর বোধ করি তেমন চিকিৎসা করানো হয় নাই। ঐ গাঁয়ে ডাক্তার আর কোথায় পাবে? হয় তো একটা হাতুড়ে-গোছের কেউ আছে।

বিনয় অনাবশ্যকবোধে কোন উত্তর করিল না।

দেওয়ালে ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতে লাগিল। যোগীন্দ্র-বাবু কি একটা জরুরী কাগজে দস্তখত করিতে লাগিলেন। দস্তখত হইয়া গেলে কলিং বেলটা বাজাইলেন। আর্দ্দালি আসিয়া কাগজপত্র নীচে ম্যানেজারের নিকট লইয়া গেল। এতক্ষণে যেন একটু অবসর পাইলেন, এইভাবে বিনয়ের দিকে যোগীন্দ্রবাবু বিরক্তিসূচকস্বরে কহিলেন, আঃ রাত-দিন কাজ আর কাজ! এত যে বিরক্ত লাগে এক এক সময় সে আর তোমাকে কি বলব। তারপরে কি পড়ছ তুমি আজকাল?

বিনয় বলিল, আজ্ঞে বি-এ পড়ছিলুম, ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছ! যোগীন্দ্রবাবু যেন বিস্ময়ে আকাশ হইতে পড়িলেন।

আর পড়া চলল না। আর অনেকটা সেই কারণেই আপনার কাছে এসেছি। যদি দয়া করে একটা চাকরি-বাকরি ··· কিছু সুবিধে যদি ··· বিনয় কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না।

যোগীন্দ্রবাবু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিলেন, আজ কালকার চাকরির বাজার নিশ্চয়ই জান। অন্ততঃ বি-এ-টা পাশ না করলে কিছুই হবার আশা নেই। পড়া ছাড়বার দুর্ব্বুদ্ধি তোমাকে দিলে কে? যেমন ক'রে হোক চালিয়ে নাও। আচ্ছা, আজ আবার আমাকে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে, প্রায় সময় হয়ে এল। মাঝে মাঝে এস, যখন সময় পাবে। এখন ওঠা যাক।

অভিভূত বিনয় যখন যোগীন্দ্রবাবুর পিছনে পিছনে মার্ব্বেল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সেই প্রাসাদোপম বাড়ী হইতে বাহির হইল তখন কলিকাতার রাজপথে বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আলোকখচিত রাজপথে ট্রাম বাস ছুটিয়াছে। কত বেশভূষায় সজ্জিত কত নরনারী পথে চলিয়াছে। সমস্তের মাঝখানেই বিনয়ের নিজেকে বড় একা বোধ হইতে লাগিল। জগৎ সংসারে কাহারও সহিত যেন কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। সকলেই বিচ্ছিন্ন। সমস্ত আনাগোনা, পথচারী পথিকদের সমস্ত গতিবিধিই যেন ছায়াছবির মত অলীক, অর্থহীন। মেসে পৌঁছাইয়া এক গ্লাস জল খাইয়া সে নিজের বিছানাটা কোঁচা দিয়া ঝাড়িয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। পাশের ঘরে নির্ম্মল, সুধীর, শরদিন্দু তাহাদের সম্মিলিত গল্প, পাঠাভ্যাস এবং হাসির শব্দ তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ নিষিদ্ধ স্বর্গলোকে যেন আর তাহার প্রবেশাধিকার নাই। সেখান হইতে তাহার নির্ব্বাসন ঘটিয়াছে। (ক্রমশঃ)

তাপস রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

একদা এ ভারতের তপোবন হতে
উঠিল ঋষির কণ্ঠে প্রভাত-আলোতে
মৃত্যুহীন দীপ্ত বাণী—সমস্ত ভুবন
একের চরণ-প্রান্তে পুষ্পের মতন
প্রস্ফুটিত আছে নিত্য; সবার ভিতর
একই অখণ্ড আত্মা জাগে নিরন্তর।
চিরন্তন এই বাণী দিগ্‌দিগন্তরে
ব্যাপ্ত করে দিলে তুমি মেঘমন্দ্র স্বরে।
এ বাণীর জয়ধ্বজা করিয়া বহন
সাগরে সাগরে তুমি করিলে ভ্রমণ।
রক্তপ্লুত ধরণীর ধূলি পরে তুমি
রচিতে চাহিয়াছিলে নব স্বর্গভূমি
মানুষের প্রেম দিয়ে। তপস্যা তোমার
অন্ধকারে আনিবে না আলোর জোয়ার?

হে ধরণী তুমি কাঁদো

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হে ধরণী তুমি কাঁদ আজ আকুল অশ্রুধারে;
সঞ্চিত তব মণিহার বুঝি হারাল অন্ধকারে।
আঁধারের মাঝে আলোর সে গান—
শ্রাবণ দিবসে হ'ল অবসান
বর্ষা-মুখর আকাশে ভরাও বুক ভাঙ্গা হাহাকারে।
নিঠুর নিয়তি কত শতবার
আঘাত হানিল অঙ্গে তোমার;—
প্রতিভারে তবু পারেনি হরিতে অন্ধ অহংকারে!

ক্ষণবসন্ত

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

ঢেউ-এর পর ঢেউ।

অগণিত স্রোতধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—বিরামহীন বিশ্রামহীন গতি তাহাদের। মহাসমুদ্রের মহাঅঙ্কে তাহাদের গতি-তরঙ্গ ঘাত আর প্রতিঘাতে মুখর। কিন্তু বৈশিষ্ট্য কোথায়? বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিবার মতন কিছু আছে কি? থাকিলেও সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ কই।

কিন্তু এ গতির নিবৃত্তি নাই। মাটির বুকেও সৃষ্টির এই আলোড়ন চলিয়াছে। জনতার স্রোতেও এই চঞ্চল তরঙ্গরাশি—ঢেউ-এর পর ঢেউ।

একটি ছোটখাটো সংসার—কিন্তু তাহার মাঝেই কত বৈচিত্র্য! জোয়ার আর ভাঁটা—ইহারই মাঝে যে স্রোতধারা বহিয়া চলিয়াছে শত আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান জীবনে তাহার স্পন্দন কতটুকু জাগে? জাগিলেও সে অনুভূতির মুহূর্ত্তের স্থায়িত্ব কোথায়?

সুরুচি কি আজ সে কথা ভাবিতে পারে?

জীবনের প্রথম বসন্তলগ্নের স্বপ্নমধুর সেই দিনগুলি! ফাল্গুনের দক্ষিণ সমীরণে চিত্তমুকুলে যেদিন প্রথম রঙ্ ধরিয়াছিল—সৃষ্টির সমস্ত কিছুকেই যেদিন সে দেখিয়াছিল সুন্দর—আনন্দকেই আর সার্থকতাকেই যে দিন চিনিয়াছিল প্রাণের সত্যরূপে!

ঘুমন্ত মেয়েটি অত্যন্ত কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাকে আদর করিয়া চাপড়াইয়া গান শোনাইয়া কিছুতেই শান্ত করা গেল না।

উঠিতেই হইল।

সমস্ত দিনের গুরুতর পরিশ্রমের পর সবেমাত্র চোখে ঘুম ধরিয়াছে এবং এলোমেলো কতকগুলো কি সব স্বপ্ন খেলা করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় এই বিপত্তি!

সুরুচির সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া ওঠে। হতভাগা মেয়ে রাতদুপুরে জ্বালানো—মানুষের একটু ঘুমিয়েও শান্তি নেই!

সুরুচিকে উঠিতে হইল এবং আলো জ্বালিতে হইল। ওদিকে কোলের ছেলেটা নোঙরায় পড়িয়া আছে তাহাকে সরাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করা—মেয়েটির হাতে দু'খানি বিস্কুট দিয়া শান্ত করা প্রায় আধ ঘণ্টার মেহনৎ!

রাত্রির মুহূর্ত্ত আগাইয়া চলিয়াছে। ছোট ঘড়িটায় দেখা গেল রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়াছে।

নিদ্রিতা নগরীর বুকে প্রশান্ত নীরবতা। সুরুচির অন্ধকারবদ্ধ কক্ষে কেবল জীবনের স্পন্দন জাগিয়াছে। ছোট ঘরখানি কেরোসিনের ধোঁওয়ার গন্ধে ভারী হইয়া ওঠে। ছেলে মেয়েগুলো এধারে ওধারে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। কাহার মাথায় কাহারও পা।

সুরুচি সকলের তদ্বিরে লাগিয়া গেল।

ওপাশে নিদ্রিত স্বামীর প্রবল নাসিকা গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। সুরুচি দেখিল স্বামীর ঘুমন্ত মুখখানি। দশবৎসর পূর্ব্বের সেই তরুণ ঢল-ঢলে মুখকান্তি—প্রশস্ত ললাট, কিন্তু আজ যেন চিনিবার উপায় নাই। কোটরগত নিষ্প্রভ নয়নে গাঢ় নিদ্রার অবসাদ - ললাটে চিন্তার মসীরেখা —সর্ব্বাঙ্গে ক্লান্তির ছায়া ঘিরিয়া আছে।

সুরুচির অন্তর ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল!

উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া দিতে গেলে মেয়েটি আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। কর্কশ কণ্ঠের সেই একঘেয়ে চীৎকার!

সুধীর জাগিয়া উঠিল।

কেরোসিনের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া গেছে—তাহার মাঝে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি—জীবনের কি নির্ম্মম সত্য উলঙ্গ বৃত্তিতে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে।

সুরুচি খেপিয়া উঠিল।

হতভাগা মেয়ে—সমস্ত দিন খাটনির পর মানুষটা একটু শুয়েছে—তাও পাপ মেয়ের জ্বালায় হয়ে উঠবে না গা—

দুড় দাড় করিয়া কয়েকটি চড়-চাপড় বসাইয়া দিল সুরুচি। মেয়েটি তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। অন্ধকারে সে চীৎকারধ্বনি নির্জ্জনতার শান্ত বক্ষে হাতুড়ির ঘা বসাইতেছে যেন!

আহা মারছো কেন? মারলে কি আর থামবে? বায়না ধরেছে একটু ভোলাও না—

—না, মারবে না, পুজো করবে? রাতদুপুরে একটু ঘুমোবার পর্য্যন্ত উপায় নেই।

তুমি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো—মেয়েটাকে আমার কাছে দাও।

—হ্যাঁ, তোমার তো আর শরীর নয়! সমস্ত রাত জেগে কাল আবার সমস্ত দিন অফিসে হাড়-ভাঙা খাটুনি!

আর তোমার? সুধীর বলিল—তোমার সমস্ত দিনই বিশ্রাম, না?

আমরা মেয়েমানুষ। আমাদের ও গা-সওয়া—

সুধীর আর প্রতিবাদ করিল না। সুরুচি—সুরুচি যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ!

আরও কয়েকখানি বিস্কুট ও লজেন্স দিয়া—গা চুলকাইয়া দিয়া—আদর করিয়া তবে মেয়েটিকে শান্ত করা গেল।

সুধীর পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে।

মনে তাহারও কি কোনও লগ্নপ্রভাতের স্বপ্নকাহিনীর স্মৃতি উদ্ভাসিয়া উঠিতেছে?

ফুলশয্যা রাত্রের সেই স্মরণীয় লগ্ন! সুকোমল শয্যা, অঙ্গে পুষ্প-

স্তবকের মাঝে একটি নারীর অঙ্গস্পর্শ ! শিথিল কবরী হইতে দক্ষিণের বাতাসে ভাসিয়া আসা মৃদু সুবাস !

খুকী তখন আসে নাই—আসিবে যে কল্পনাও মনে স্থান পায় নাই। সংসার-সংগ্রাম—অভাব-অভিযোগ—পুত্র-কন্যা কিছুই ছিল না। মাত্র দশটি বৎসর পূর্ব্বের সে জীবন !

সুধীরের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

খুকী ঘুমাইয়াছে।

গাঢ় রাত্রির মাদকতায় একতলার ছোট ঘরখানি থম্ থম্ করিতেছে।

সুধীরের ঘুম আর আসিল না।

মলিন শয্যা—অপ্রশস্ত স্থান—এপাশে ওপাশে ছেলেমেয়েদের ভীড়, কিন্তু সুধীর আর সে কথা ভাবিতে পারে না।

অন্ধকারে হাতখানি সুরুচির অঙ্গ স্পর্শ করিল। সুরুচিও ঘুমায় নাই।

অনুরাগভরে স্বামীর হাতখানি নিজের মুঠার পর চাপিয়া ধরিল। হাড়গুলা চামড়া ভেদ করিয়া প্রায় ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে—স্থানে স্থানে কড়া পড়িয়া চামড়া উঠিয়া গেছে—তবুও তাহাতে যেন প্রীতির পরশ লাগিয়া আছে।

সুধীর অনুভব করিল সুরুচি এখনও বাঁচিয়া আছে। আবেগ উচ্ছল কণ্ঠে সে ডাকিল—সু—

মৃদুস্বরে সুরুচি উত্তর দিল—কি ?

গভীর রাত্রির তমিস্রা ঘন অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরকে চিনিল।

আদিম কালের সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের সেই নারী ও পুরুষ। জীবনে নিত্য প্রয়োজনের রূঢ় কঠোর বাস্তবতায় যন্ত্র-সভ্যতার লৌহ কারাদণ্ডের মাঝেও তাহারা মরে নাই। সৃষ্টির সেই পবিত্র কুসুম আজও বর্ণে গন্ধে রূপে রসে সমুজ্জ্বল।

সমস্ত অভাব অভিযোগ ক্লান্তি বিরক্তি যেন মরিয়া গেছে। সংসার-সংগ্রাম, পুত্রকন্যা—সব কিছুই যেন ভাসিয়া গেছে।

সুধীরের কণ্ঠের সুসম্ভাষণ-মাঝে জননী সুরুচি—ঘরণী সুরুচির স্থান নাই। আত্মার একান্ত আত্মীয় সলাজবধূরূপিণী সুরুচিই যেন আবার বাঁচিয়া উঠিল। পুষ্পস্তবকের মাঝে বসন্তের দক্ষিণ সমীরণে তাহাদের বাসরশয্যা তাহারই মাঝেই যেন আবার তাহারা ফিরিয়া গেছে।

সকাল হইতে না হইতেই সুরুচি উঠিয়া গেছে। বাসন মাজা, ঘর-দোর পরিষ্কার, ছেলে মেয়েদের তদ্বির, অফিসের ভাত—একসঙ্গে যাবতীয় কাজ। কাজ আর কাজ—অনন্ত কাজের মাঝে ডুবিয়া গেছে রাত্রির লগ্ন মুহূর্ত্ত !

সুরুচি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ছেলেটার প্যান-প্যানানি—দুখানি রুটি লইয়াও শান্ত হইতে চায় না—আরও আরও চাই !

মুখপোড়া ছেলে অতগুলো রুটি গিলে যে মরবে রাক্ষস ! কিন্তু অবাধ্য শিশু এ শাসন মানে না।

বাড়ীওয়ালা গিন্নী আসিলেন।

সকাল বেলাতেই সুপ্রভাত সম্ভাষণ ! সুরুচি অভ্যর্থনা জানাইল, আসুন মাসিমা—এত সকালেই যে উঠেছেন আজ ?

আর মা, বুড়ো বয়সেও তো আর বিশ্রাম নেই। সংসারের যে কাজটি না দেখবো, তাই আর হবার উপায় নেই।

একখানি চটের আসন আগাইয়া দিয়া সুরুচি আমন্ত্রণ জানাইল ; বসুন মাসিমা—এদিকে ছেলেগুলো প্যান প্যান করছে—ওঁর অফিসের ভাত—জিনিষপত্তর কিছুই নেই—এখনও তো উঠ্‌লেন না দেখ্‌ছি।

না মা, বসবার কি আর সময় আছে ? সব সংসারেই এই ঝঞ্ঝাট ! ছেলে বুঝি এখনও ওঠে নি—তা উঠ্‌লে মা ভাড়ার কথাটা একবার বলো তো। দু'মাসের বাকী পড়ে গেছে—কর্ত্তা বড় চটাচটি করছেন। দু-তিনজন এসে তো সাধাসাধি, আরও দুটাকা ভাড়া বেশী দেবে বলছে। আমি বলি, তাই কি আর হয় ? ছাঁপোষা নিয়ে আমারই তো আশ্রয়ে আছে, যেন আপনা আপনিরই মতন ! সংসারের টাকাটাই কি বড় ?

সুরুচির কান দুটি লাল হইয়া উঠিল। তাহার ভিতরের ভদ্র মনটি এখনও একেবারে মরিয়া যায় নাই।

কুণ্ঠিত সুরে সে বলিল—ওমাসে ডাক্তারের খরচে সব বেরিয়ে গেছে মাসিমা—ভাড়ার টাকাটা বাকী পড়ায় আমরাও ভারী লজ্জিত। আচ্ছা, আমি কালকেই যে করে হোক্ একমাসের ভাড়াটা অন্তত দিয়ে দেবো।

তাই দিয়ো মা, জানো তো কর্ত্তার খিটখিটে মেজাজ, আর আমাদেরও এই ভাড়ার টাকাই ভরসা। কিই বা আর থাকে ? ঘরদোর মেরামত টেক্সের টাকা—এতগুলো ছাঁপোষা বুঝতেই তো পারছো মা—বাড়ীওয়ালা গিন্নী আর এক প্রস্থ স্বস্তির বচন শুনাইয়া বিদায় লইলেন।

স্যাঁৎসেঁতে উঠানের মাঝে পাঁচিলের ফাঁক দিয়া একটুক্রা রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। সারাদিনে এইটুকুই স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি।

কিন্তু বেলা অনেক হইয়া গেল। সুরুচি যেন এই দ্রুত গতিশীল মুহূর্ত্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আর চলিতে পারে না।

গুড় নাই, তেল নাই, হলুদ নাই—কেবল অভাব আর অভাব।

কুলুঙ্গীর ভিতর এ কৌটা ও কৌটা নাড়িতে চাড়িতে একটি দোয়ানির সন্ধান মিলিল, তাই দিয়াই কোন রকমে আজকের প্রয়োজনকে মিটাইতে হইবে।

গুড়ের আর তেলের বাটি দিয়া সুরুচি বড় ছেলেকে বলিল—যাও তো বাবা সন্তু—চট্ করে গুড় আধ পো, তেল আধ পো, আর এক পয়সার হলুদ নিয়ে এসো তো—

দোকানে গেলে যে দোকানি পয়সা চায়। ছোট আট বছরের ছেলে সেও সংসারের অভাবের বেদনা অনুভব করিয়াছে।

বেলা নয়টা বাজিতে আর এক দফা তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল।

ব্যস্ত সুধীর বাজারটা নামাইয়া দিয়াই কলতলায় গেল। কোন রকমে কয়েক বালতি জল ঢালিয়াই আহারে বসিতে হইল। শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আসানটা, ভীষণ দেরী হয়ে গেছে। ও মাছ ভাজা এখন থাক।

পাঁচ মিনিটেই আহার শেষ। বসিয়া সুস্থ মনে এটা ওটা দেখিয়া শুনিয়া আহারের মতন সময় নাই।

ঘড়ির কাঁটার দ্রুত গতির তালে তাল রাখিয়া জীবনকে চালাইতে হয় যাহাদের ঈশ্বরের অভিশাপ তাহারা—কেরাণীর দল, অত করিয়া আহার-বিহার ভোগবিলাসের পারিপাট্য তাহাদের জীবনে নাই।

জামার পকেটে টিফিনের কৌটা ভরিয়া দিবার কালে সুরুচি কহিল—আজ তো মাসকাবার—কাল মাইনে পাবে?

হ্যাঁ, সুধীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। এর বেশী কিছু বলিবার অবকাশ এখন আর নাই।

সুরুচি কহিল—দেখ এবারে আগে ভাড়ার টাকাটা আর মুদির দেনাটা দিয়ে দাও—

একসঙ্গে আর অত কি করে হবে? ডাক্তারের বিলটা এবার দিতেই হবে।

সুরুচি কহিল—তবে ওই তাগা জোড়াটা বিক্রি করে দাও। এসময়ে সোনার দরটা চড়া—আর ও অতি পুরোনো হয়ে গেছে।

সুধীর প্রতিবাদ জানাইল—তা কখনও হয়? নিজে একটুকরো সোনা আজ অবধি দিতে পারলুম না—এর পর আবার তোমার বাপের বাড়ীর জিনিষে কখনও হাত দিতে পারি?

কিন্তু না—রোজ রোজ এসে বাড়ীওয়ালা গিন্নী, মুদি তাগাদা দিয়ে যাবে—সে আমি সহ্য করতে পারি নে!

গরীব হলে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয় সুরু: সুধীর ছাতাটি টানিয়া লইয়া আগাইয়া চলে।

ছেলেমেয়ে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—পয়সা—ক্লাবের চাঁদা, স্কুলের মাইনে—

সুরুচি ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে—দুড়দাড় করিয়া কয়েকটি চড়চাপড় বসাইয়া দেয়—হতভাগার দল, পঞ্চাশ দিন না বারণ করেছি অফিসে যাবার সময় আসবি নে।

বাধা দিবার অবকাশ আর সুধীরের নাই। ঘড়িতে সাড়ে নটা বাজিয়া গেছে।

সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া দ্বিপ্রহরে খানিকটা অবকাশ সুরুচির। দুটি ঘণ্টা সুরুচির জীবনের বিলাস-মুহূর্ত্ত। ছেলেমেয়েগুলির ঝঞ্ঝাট তখন বড় নাই। বড়রা স্কুলে, ছোটদের ঘুম পাড়াইয়া খানিকটা আরও সময় সে সংসারের কাজেই লাগাইয়া দেয়। ছেঁড়া জামা কাপড় সেলাই—সাবান দিয়া মলিন সাজশয্যা পরিষ্কার করা—কিছুটা সময় ঘুমাইয়া কিংবা নাটক নভেল পড়িয়া দ্বিপ্রহরের অবকাশ মাধুর্য্য যাপন করে।

বিকাল হইতেই আবার সেই তাড়াহুড়া। ছেলেমেয়েদের জলখাবার, সাজাইয়া গুছাইয়া তাহাদের একটু বেড়াইতে পাঠানো—বাসন মাজা, রান্নাবান্না, ইহা সারিতেই অন্ধকার কক্ষে তাহার সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসে।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইয়া, লক্ষ্মীর ঘটে গলবস্ত্রে প্রণাম জানাইয়া সুরুচি আবার ফিরিয়া আসে সংসার-সমুদ্রের মাঝে।

স্বামী অফিস হইতে বাড়ী ফিরিল।

ছেলেমেয়েরা আবার বায়না ধরিল। সংসারের অভাব অভিযোগ—ইহার আবর্ত্তে জীবনের তরঙ্গ আবার তরঙ্গায়িত হইয়া ওঠে।

শান্ত প্রকৃতির স্বামী তাহার—কিন্তু তবুও তুচ্ছ বাদ-প্রতিবাদে সেখানেও সংগ্রামের মেঘ মাঝে মাঝে ঘনায়িত হইতে দেখা যায়।

তাহার পরই আবার রাত্রির লগ্ন মুহূর্ত্ত। নিশীথের ঘন অন্ধকারে জীবনের ভীরু দীপশিখা অনির্ব্বাণ শিখায় জ্বলিয়া ওঠে। বাহিরের দুর্য্যোগ ঝঞ্ঝার অন্তরালে প্রদীপের এই যে ভীরু কম্পিত দীপ শিখা—ইহাই বুঝি বিধাতার আশীর্ব্বাদ!

সুরুচির জীবনে এই লগ্ন মুহূর্ত্তের মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়!

ব্যবধান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

তীর হ'তে তরী মোর দিল যবে পাড়ী
তখন আসিয়া তুমি দাঁড়ালে যে তীরে
হে মোর চিরায়মানা! আর বার ফিরে
ভিড়াবেনা এ তরণী জানি মাঝি দাঁড়ী
শুনিবেনা বাণী মোর। এই ঘাট ছাড়ি
শেষ খেয়া বাহি তারা সুমন্দ সমীরে
পালখানি প্রসারিয়া আসন্ন তিমিরে
সুদূরের পরপারে চলে তাড়াতাড়ি।

হেরি হাতছানি তব, আবাহন বাণী
কানে আসে বারবার উতলা বাতাসে
নিরাকুল চক্ষে মোর বহে অশ্রুধারা।
দূর হ'তে দূরান্তরে মোরে লয় টানি
তরণীর নির্ম্মমতা; আর নাহি আসে
শ্রবণে তোমার রব, নয়নে ইসারা।

জঙ্গম

বনফুল

২৪

শঙ্করের পক্ষে মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা শ্বাসরোধকর হইয়া উঠিয়াছিল। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুটির অত্যাচার আর সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহারা শঙ্করের অজ্ঞতার কিছু-না-কিছু নিদর্শন প্রায় প্রত্যহই গোপনে মাতৃসমীপে উপস্থাপিত করিত, কর্ত্তব্যপরায়ণা মিসেস স্যানিয়াল তাহা লইয়া শঙ্করকে সোজাসুজি কিছু বলা যদিও অকর্ত্তব্য মনে করিতেন কিন্তু বাঁকাপথে শঙ্করকে সচেতন করিয়া দিতে ইতস্তত করিতেন না। যেমন আজ সকালে বলিতেছিলেন, "দেখুন শঙ্করবাবু, অনিলটার সব বিষয়ে জানবার এমন আগ্রহ! আমাকে কাল থেকে ও বিরক্ত করে মারছে পেঙ্গুইন পাখীদের বিষয় জানবার জন্যে। আপনাকে হয় তো ভয়ে ভয়ে বলতে পারেনি, আপনি তো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যান, পেঙ্গুইন পাখীদের বিষয় দয়া ক'রে দেখে আসবেন তো একটু, আপনারও হয় তো সব জানা নেই ও সম্বন্ধে"—আসল ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। ভয়ে ভয়ে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই এরূপ ভীতু প্রকৃতির বালক অনিলচন্দ্র নয়। সে শঙ্করকে পেঙ্গুইনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে এবং শঙ্কর অজ্ঞতা প্রকাশ করায় মুখ টিপিয়া হাসিয়াছে। কারণ নিজের জ্ঞান-বৃদ্ধি-মানসে তো সে শঙ্করকে প্রশ্ন করে নাই, সে শঙ্করের বিদ্যার দৌড় কত দূর তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য প্রশ্নটা করিয়াছিল এবং তজ্জন্য একজন সহপাঠীর বাড়িতে একটা মাসিক পত্রে পেঙ্গুইন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজে পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে ভালভাবে ওয়াকিব-হাল হইয়া বসিয়াছিল। শঙ্করকে বিব্রত করাই তাহার উদ্দেশ্য। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালকে মৃদু হাসিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে সে যতশীঘ্র সম্ভব পেঙ্গুইন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনিলের জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত করিয়া দিবে, অনিল সম্বন্ধে সত্যসত্যই তাহার যাহা মনে হইতেছিল তাহা সে মিসেস স্যানিয়ালকে বলে নাই। অকস্মাৎ সহায়-সম্পত্তি-বিহীন হইয়া ক্রমশ সে এই সত্যটি উপলব্ধি করিতেছিল যে, জটিল সংসারপথে স্বচ্ছন্দে চলিতে হইলে সব সময় মুখের কথা এবং মনের কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। অনুগৃহীত ব্যক্তির মুখে রূঢ় সত্যভাষণ কেহই শুনিতে চাহে না। প্রফেসার গুপ্ত তাহাকে যে টিউশনিটি জুটাইয়া দিয়াছিলেন একটু মানাইয়া চলিলে তাহা থাকিত এবং তাহাকে এমন দুর্দ্দশায় পড়িতে হইত না। স্পষ্ট ভাষণের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া না আনিলে যে উপায় নাই তাহা সে বুঝিয়াছিল বলিয়াই মিসেস স্যানিয়ালকে বলিতে পারিল না, আপনার পুত্র দুইটি ডেঁপো হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ডেঁপোমির প্রশ্রয় দিলে উহারা উচ্ছন্ন যাইবে। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়কে আদর্শ মানবে পরিণত করিবার দায়িত্ব তাহার নহে। তাহার কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া। যেমন করিয়া হউক নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। যতদিন তাহা না পারিতেছে ততদিন একটা অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানকে উগ্রভাবে আস্ফালিত করিয়া লাভ নাই। যতদিন একটা কিছু না জুটিতেছে ততদিন পেটভাতায় থাকিয়াও অখিল অনিলের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইবে। শঙ্কর ভাবিয়া পাইত না, অখিল অনিল তাহাকে ক্রমাগত এমন জ্বালাতন করে কেন। শঙ্কর না জানিলেও একটা কারণ ছিল। শঙ্কর আসিবার পূর্ব্বে চুনচুন ইহাদের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল—শঙ্কর খুব বিদ্বান, নানা বিষয়ে তাহার প্রচুর জ্ঞান। শঙ্করের বিদ্যাবত্তাকে পদে পদে বিমলিন করিয়া দিয়া তাহারা চুনচুনের উক্তি যে মিথ্যা—মিসেস স্যানিয়ালের নিকট তাহাই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইত। মিসেস স্যানিয়ালের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই সম্ভবত তিনি শঙ্করকে বিদায় করিয়া দেন নাই। শঙ্কর যে প্রতিদিন দুইবেলা অখিল অনিলের পাঠ্যবিষয়গুলি অতিশয় পরিশ্রম সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেয় সে সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া তিনি প্রায় প্রত্যহই বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবুকে বলিয়া থাকেন—"যদিও আমার অখিল অনিলকে পড়াবার মতো বিদ্যে শঙ্করবাবুর নেই, তবু ছেলেটিকে রেখেছি বাড়িতে, ভদ্রলোকের ছেলে,

বিপদে পড়েছে, হাজার .হোক—" কাঁচাপাকা-গোঁফ-দাড়ি-ভ্রূ-সমন্বিত পীতাম্বরবাবু চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটাইয়া তোলেন যাহার অর্থ 'এই তো আপনার মতো মহিয়সী মহিলার উপযুক্ত কথা।' শঙ্কর-সম্পর্কীয় আলোচনা অবশ্য বেশীক্ষণ চলিত না। কারণ পীতাম্বরবাবু আসিলেই মিসেস স্যানিয়াল কোন না কোন ছুতায় চুনচুনকে আহ্বান করিতেন এবং তাহাকে পীতাম্বরবাবুর দৃষ্টির সম্মুখবর্ত্তী করিয়া দিতেন। এই ঈষন্নির্বোধ প্রৌঢ় বিপত্নীক দেবরটির স্কন্ধে চুনচুনকে চাপাইয়া দিবার সুবুদ্ধি সম্ভবত কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্যই তাঁহার মস্তিষ্কে কিছুদিন হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। চুনচুন আবার কখন কি করিয়া বসে সে সম্বন্ধে তাঁহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। পীতাম্বরবাবু শুধু বিপত্নীক নহেন, অপুত্রক এবং শাঁসালো। চুনচুনের সহিত ইঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে সব দিক দিয়াই সুখের হইবে—ইহাই কর্ত্তব্যপরায়ণা মিসেস স্যানিয়ালের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি চলিতেছিলেন। বিধবা-বিবাহ তো আজকাল অনেকেই করিতেছে, ইহারাই বা করিবে না কেন। চুনচুন যদিও কিছু বলে নাই, তবু শঙ্কর দুই-চারি দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। কিন্তু শুধু বুঝিয়া কি করিবে? চুনচুনকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কোন সঙ্গতিই এখন তাহার নাই। নিজের সামর্থ্য থাকিলে সে চুনচুনকে হয় তো সাহায্য করিতে পারিত, কিন্তু এখন সে নিজেই নিরুপায়। চুনচুনের এই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা শঙ্করকে আরও যেন উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছে। যতশীঘ্র সম্ভব একটা চাকরি তাহাকে জোগাড় করিয়া ফেলিতেই হইবে।

অখিল অনিলকে পড়াইয়া রাত্রি প্রায় নয়টার পর শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল। প্রকাশবাবুর সহিত দেখা করিয়া আজই সে ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, ওই প্রুফ-রীডারের চাকরিটা তাহার হইবে কি-না। প্রুফ্ সংশোধন করা বিদ্যাটা সে তো ভালরূপেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আজকাল দুপুরবেলাটা সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটায়। সাহিত্য বিশেষত সাহিত্য-সমালোচনার বইগুলি তাহার বড় ভাল লাগে। আমাদের দেশে সাহিত্য বলিয়া যাহা চলিতেছে তাহা যে কতদূর অসাহিত্য ক্রমশ তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে। বিদেশী সাহিত্যের নকলে মৌলিকতা জাহির করিতে গিয়া যে সব অসুন্দর রচনা ছদ্মবেশে আসর জমাইতেছে তাহাদের ব্যঙ্গ করিয়া সে কয়েকটা কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশবাবুর বাড়ির কাছে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া শঙ্কর সহসা থামিয়া গেল। ঠিক বাহিরের ঘরে প্রকাশবাবু এবং আরও কে একজন বসিয়া তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন। উৎকর্ণ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

"কই মশাই, প্রুফ-রীডার সেই যে ছেলেটির কথা আপনি বলেছিলেন তাকে আনলেন না তো—"

বক্তা সম্ভবত প্রেসের মালিক।

প্রকাশবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তাকে হাতে রেখেছি, একটু অপেক্ষা করুন না মশাই দুদিন—"

"কেন?"

"আরে মশাই ও হ'ল গিয়ে (ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে) পরের ছেলে। একটি নিজেদের ছোকরা যদি পাই তা হ'লে আর ওকে ডাকি কেন, বুঝলেন না। আমাদের মাইতি মশায়ের একটি ভাইপো দেশ থেকে নাকি আসবে শিগগির শুনেছি, সে যদি আসে তা হ'লে আর—" শঙ্কর আর দ্বারে করাঘাত করিল না, দাঁড়াইলও না। বিপরীত মুখে সোজা হন হন করিয়া চলিতে লাগিল।... নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ অনির্দ্দিষ্টভাবে হাঁটিবার পর শঙ্করের খেয়াল হইল এইবার বাড়ী ফেরা দরকার, রাত হইয়াছে। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য একটা গলিতে ঢুকিবামাত্রই একটি দ্রুতগামী সাইকেলের সহিত ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া যাইবার মতো হইল। সাইকেল আরোহী নামিয়া পড়িল।

"একি, চাম প্যান্‌টস্ যে!"

"ভন্টু!"

"কোথাও লাগেনি তো?"

"না—"

"এত জোরে 'বেল' দিচ্ছিলাম তুই শুনতে পাসনি! থিঙ্কিং আপিস খুলতে খুলতে আসছিলি বুঝি, একদিন ডাইং আপিস খুলবি দেখছি! অনেকদিন তোর খবরটবর পাই না—ব্যাপার কি বল্ তো—কোথা যাচ্ছিস?"

"বাসায়।"

"বাসা আবার কোথায় ?"

"গড়পারে।"

যদিও ভন্টু সব জানিত তবু জিজ্ঞাসা করিল, "হস্টেলে থাকিস না আজকাল ?"

"না।"

"চল, আমাদের বাড়ি চল। বিড়ডিকার আজ ফৈশির অ্যাফেয়ারে ঢুকেছে, এতদিন পরে তোকে দেখলে খুশীও হবে—কাল রবিবার, আমার ছুটি আছে—হোল নাইট্ প্রোগ্রামে ঢুকি চল্ আজ—তোর সমস্ত হদিস ইন্ ডিটেল আজ আয়ত্ত করব—"

শঙ্কর দো-টানায় পড়িয়া গেল। দুঃখের দিনে পুরাতন বন্ধু ভন্টুকে দেখিয়া ভালও লাগিতেছিল অথচ তাহার সহিত যাইতেও কেমন যেন ইচ্ছা করিতেছিল না, কেমন যেন সঙ্কোচ হইতেছিল। যে ভন্টুকে সে এতকাল অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়াছে তাহাকে সে নিজের সব কথা খুলিয়া বলিবে কি করিয়া। কোনও একটা অজুহাতে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু ভন্টু কিছুতেই ছাড়িল না।

শঙ্কর তখন বলিল, "তা হ'লে বাসায় একটা খবর দিয়ে যেতে হয়, তা না হলে ওরা ভাববে—"

"বেশ, তাই চল্।"

শঙ্কর যখন ভন্টুর বাসায় পৌঁছিল তখন প্রায় রাত এগারোটা। ভন্টুর বৌদিদি রান্নাবাড়া শেষ করিয়া ভন্টুর অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। ভন্টুর সহিত শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"ওমা, এতদিন পরে পথ ভুলে না কি ?'

শঙ্কর একটু হাসিল।

ভন্টু বলিল, "ও একটা চোর, চেন না ওকে,"

"এস, বস—"

বৌদিদি তাড়াতাড়ি একটা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, "খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছে না কি ?"

ভন্টুই পুনরায় উত্তর দিল, "ভুলে যাও সে সব কথা, মুচ্ছি মুলে খাবে ও এখন—"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "শুনলাম আপনি মাছটাছ অনেক রকম রান্না করেছেন সেই লোভে এলাম—"

"বেশ তো—"

ভন্টু বাইকটা উঠানে রাখিবার জন্য সেটাকে ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

শঙ্কর বৌদিদিকে বলিল, "আমি খবরটবর না দিয়ে অসময়ে এলাম, কম পড়ে যাবে না তো—"

একমুখ হাসিয়া বৌদিদি উত্তর দিলেন, "যা আছে তিনজনে ভাগ ক'রে খাব—"

ঘরের ভিতর হইতে দরাজ গলায় বাকু হাঁক দিলেন, "ও বৌমা, ভন্টু ফিরল, চারদিকে যা দাঙ্গা হচ্ছে—"

বৌদিদি ঘরের ভিতর গেলেন।

"ভন্টু ফিরেছে, বাঁচা গেল, ও তাই না কি, শঙ্করও এসেছে, ভাল ভাল। কিন্তু চারদিকে ভীষণ দাঙ্গা, সব লোক খেপে উঠেছে, শঙ্করকে আজ আর যেতে দিও না এত রাত্রে, এইখানেই খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাক। বঙ্গবাসী যা লিখছে—ভীষণ কাণ্ড—"

বৌদিদি হাস্য-স্নিগ্ধ মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভন্টু বাইক রাখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "লর্ড বাকল্যাণ্ড কি বলছেন ?"

"উনি আজ সন্ধে থেকে নিজের আলোটি জেলে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজে বেরিয়েছে হিন্দু মুসলমানে নাকি দাঙ্গা সুরু হয়েছে, তুমি এতক্ষণ ফিরছিলে না খুব ভাবছিলেন উনি—"

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, "দাঙ্গা তো বড়বাজার অঞ্চলে গত সপ্তাহে হয়েছিল, এখন তো আর কিছু নেই—"

ভন্টু বলিল, "লর্ড বাকল্যাণ্ডের কাণ্ডকারখানাই আলাদা, তুই তার কি বুঝবি—"

বউদিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বাবা যে সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পড়েন, ওঁর কাছে খবরটা আজ এসে পৌঁছেচে। উনি কানে তো একদম কিছু শোনেন না, বঙ্গবাসী পড়েই বাইরের খবর যা কিছু পান—"

ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, "নতুন আলোটা বাকুর পছন্দ হয়েছে ?"

"খুব। কাউকে হাত দিতে দেন না, আমি সন্তর্পণে খালি তেলটি ভরে দিই। উনি নিজের হাতে চিমনি ডোম সমস্ত পরিষ্কার করেন। এ তুমি এক আপদ জুটিয়েছ বাপু—"

"কেন ?"

"ছাইয়ের গুঁড়ো, ফরসা ন্যাকড়া, কাঁচি—ওর বাতি জ্বালার তরিবৎ করতে করতে সমস্ত বিকেলটা যায় আমার—"

ভনুটু শরীরের উপরার্দ্ধ নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, "বা কুর কুর কুর কুর কুর কুর—"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বউয়ের কাছে ওরকম ঢং করলে বউ কাছেও ঘেঁষবে না তা বলে দিচ্ছি।"

"শঙ্করঠাকুরপোকে বলেছ সব কথা ?"

শঙ্কর বলিল, "শুনেছি—"

একমুখ হাসিয়া বৌদিদি বলিলেন, "আপিসের বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, অনেক দেবে থোবে—"

ভনুটু বাকুর ঘরের জানালায় উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। শঙ্করকে বলিল, "দেখ দেখ—লর্ড বাকল্যাণ্ডকে দেখবি আর—"

শঙ্করও উঠিয়া উঁকি দিয়া দেখিল ধপধপে ফরসা বিছানায় বসিয়া পরিষ্কার ওয়াড় দেওয়া এবং দামী তোয়ালে-আবৃত তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া বাকু বঙ্গবাসী পাঠ করিতেছেন। পাশে টুলের উপর প্রকাণ্ড গড়গড়া, রূপালি-জরি-লাগানো জমকালো নল, মাথার দিকে টেবিলে শুভ্র ডোম-সমন্বিত সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্প। চশমার পুরু লেন্স হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছে, শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিহীন ধপধপে ফরসা মুখমণ্ডলে একটা গম্ভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক যেন হাইকোর্টে চীফ জাষ্টিস বসিয়া রহিয়াছেন!

বউদিদি দুইখানি আসন পাতিয়া গ্লাসে জল গড়াইতে গড়াইতে বলিলেন, "আর রাত কোরো না, বস তোমরা—"

উভয়ে আসিয়া উপবেশন করিল।

ভনুটু বলিল, "দাদা বোধ হয় আজ ষ্টার্ট করবেন, না বৌদি ?"

বউদিদি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তাই তো লিখেছিলেন—"

শঙ্কর খবরটা শোনে নাই, বলিল, "দাদা ফিরে আসছেন না কি—"

বউদিদি নিজের আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, শরীর বেশ সেরে গেছে, জ্বরটর আর হয় না—"

জলের গ্লাস দুইটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বৌদিদি ভাত বাড়িবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে যাইতেছিলেন।

ভনুটু বলিল, "বৌদি শোন, মাছের মুড়োটা এই ছোকরাকে দিও। অত্যন্ত সৎকার্য্য করছেন ইনি আজকাল; বিয়ে ক'রে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গ্রে-ট সোল্!"

বিবাহের কথায় বৌদিদি শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

ভনুটু শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, "অমন গোমড়া গোছের মুখ করে কেন বসে আছিস রে রাস্কেল! ভর পেট খেয়ে আজ ঘুমো, কাল জালফিদারিক ব্যাপারে ঢুকবো, দেখি কি করতে পারি—"

"জালফিদারিক, মানে ?"

"জুলফিদার শব্দের উত্তর ষ্ণিক প্রত্যয় করলে জালফি-দারিক হয় না ?"

"তাতে কি!"

"আমাদের আপিসের বড়বাবুকে দেখিস নি কখনও ?"

"না—"

"হি ইজ জুলফিদার দি গ্রেট—মাই প্রসপেকটিভ ফাদার-ইন-ল। কাল তাকে খুজলে দেখব তোর জন্যে যদি কিছু করতে পারি। আজ ভরপেট খেয়ে বাফেলোয়িং কর—"

বাফেলোয়িং শব্দটাও শঙ্কর বুঝিতে পারিল না এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া ভনুটু বলিল, "মোষের মতো ঘুমো—"

বউদিদি দুই হাতে দুইটি থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং উভয়ের সম্মুখে তাহা রাখিয়া বলিলেন, "খাও, নেবু কেটে রেখেছি, নিয়ে আসছি—"

ভনুটু বলিল, "সেটি হচ্ছে না! তোমার যা কিছু আছে পাই পয়সা সমস্ত নিয়ে এস, আর একখানা থালাও নিয়ে এস, যা আছে তিনজনে সমান ভাগ করে খাব। আমরা ইডিয়টের মতো গোগ্রাসে গিলে যাব আর তুমি উপোস করে গ্রেটনেসের লদকালদকি করবে, সেটি হচ্ছে না!"

"বস না তোমরা, বসছি আমিও—"

"আমাদের সামনে বসতে হবে, তোমাকে চিনি শ্রী আমি—থিফ্ কোথাকার—"

"বাবা, বাবা, বড় জ্বালাতন কর তুমি ঠাকুরপো।"

শঙ্কর বলিল, "ভাগ ক'রে খাওয়ারই তো কথা হয়েছিল!"

অগত্যা বৌদিদি আর একটি থালা আনিতে গেলেন।

২৫

পরদিন সকালে শঙ্কর বাসায় ফিরিয়াই শুনিল যে মুকুজ্যে মশাই কাল রাত্রে তাহার চলিয়া যাইবার পর আসিয়াছিলেন এবং শঙ্করকে অবিলম্বে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাও দিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাটা সারপেনটাইন লেনের। মুকুজ্যে মশাই বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় আর তিনি থাকেন না। সংবাদটা শুনিয়াই শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় মিসেস স্যানিয়াল বলিলেন, "আপনি এখনি আবার বেরুচ্ছেন না কি কোথাও—"

"হ্যাঁ—"

"অখিল ডিনামিক্সের কি যেন একটা বুঝতে পারছে না। কাল রাত্রে আপনি চলে যাবার পর থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে ও। ভেবেছিল আপনি ফিরলে সকালেই বুঝিয়ে নেবে, কাল তো আপনি সারারাত বাইরে রইলেন, আজ আবার এসেই বেরিয়ে যাচ্ছেন, ওরে অখিল—"

অখিল পাশের ঘরে বসিয়া ক্যারম খেলিতেছিল। শঙ্করের মেজাজটা ভাল ছিল না, তথাপি যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া উত্তর দিল, "এখন আমাকে যেতেই হবে, আমি ফিরে এসে বুঝিয়ে দেব—"

মিসেস স্যানিয়ালের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল। মিসেস স্যানিয়াল শঙ্করের গমন-পথের দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন এবং তাহার পর চুনচুনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, "ক্রমশ গুণ বেরুচ্ছে ভদ্রলোকের। শুধু শুধু কি আর ভগবান কাউকে বিপদে ফেলেন, তা ফেলেন না। কি ছেলে কি মেয়ে আজকাল কারো কর্ত্তব্যবোধ নেই, সেই জন্যেই এত দুঃখ তাদের।" চুনচুন ঘরের টেবিলটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছিল, নীরবে তাহাই করিতে লাগিল। মিসেস স্যানিয়াল তাহার দিকে একটা রুষ্ট দৃষ্টি হানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর দ্রুত পথ অতিবাহন করিতেছিল। মনটা ভাল ছিল না। সারা মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি। ভন্টু, ভন্টুর বৌদিদি কাল তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছে, ভন্টু তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছে যে, যেমন করিয়া হউক সে তাহার হবু-শ্বশুরকে ধরিয়া তাহাকে তাহাদেরই আপিসে একটা চাকরি জোগাড় করিয়া দিবে। তাহাদের আপিসে শীঘ্রই একজন না কি লোক বাহাল করা হইবে, বেতন পঁচাত্তর টাকা হইতে শুরু, দেড়শ'র গ্রেড। ভন্টু বলিয়াছে, "এখন এইটেতে ঢোক্, তারপর জুলফিদারকে চুমরে লিফ্‌ট্ করিয়ে দেব তোর। একবার সুড়ঙ্গ কেটে ঢোক্ তো। এই দেখ্ না, আমার আড়াই শ'র গ্রেডে লিফ্‌ট্ হয়ে গেছে।" চাকরির এমন একটা আশু এবং সুনিশ্চিত—প্রায় সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিন্তু শঙ্করের চিত্ত আনন্দিত হইয়া ওঠে নাই। মনের ভিতরটা কেমন যেন করকর করিতেছিল। যে ভন্টু বিদ্যায় বুদ্ধিতে সব বিষয়ে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল, সে-ই তাহাকে ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। ধনীর একমাত্র কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, আড়াই শত টাকা বেতনের পদে উন্নীত হইয়াছে, ইতিমধ্যে কিছু লাইফ ইনিশিওর করিয়াছে এবং শীঘ্রই আরও করিবে। অথচ সে আত্মীয়-পরিজন-বিচ্যুত হইয়া অত্যন্ত ঝুটা একটা আদর্শের পতাকা স্কন্ধে বহিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ আদর্শের মূল্য কি। তা ছাড়া, সত্যই কি আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল? সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়, নিজের ক্ষুধিত বাসনা-বহ্নিতে ইন্ধন জোগাইবার জন্য। সে উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই। ওই অতি-সরল হাবা-গোবা অমিয়া ইন্ধনের যোগ্যতাও লাভ করিতে পারে নাই। বাসনা-বহ্নিকে উদ্দীপ্ত করিবার মতো ক্ষমতা ওই ঘোমটা-দেওয়া জড়ভরত প্রকৃতির অমিয়ার মধ্যে নাই। শঙ্করের বারম্বার মনে হইতে লাগিল সে ঠকিয়া গিয়াছে, ভয়ঙ্কর ঠকিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর উপায়ও নাই, এই ভুলটাকে লইয়াই সারা জীবন চলিতে হইবে। ঈর্ষ্যার ক্ষুদ্র কীটটা অন্তরের অন্তস্তলে বসিয়া দংশন করিতেছিল, নিজের দুরবস্থায় এবং ভন্টুর সচ্ছলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ কেমন যেন বিষাইয়া উঠিয়াছিল, মনে এতটুকু স্বস্তি ছিল না।

খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর অনেক খুঁজিয়া সে অবশেষে সারপেনটাইন লেনে মুকুজ্যে মশায়ের নূতন বাসায় আসিয়া পৌছিল। একটি ছোট দ্বিতল বাসা। নীচের বসিবার

ঘরটি খোলাই ছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিয়া দেখিল মুকুজ্যে মশাই নাই, অপর একজন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন।

"মুকুজ্যে মশাই কোথায় ?"

"তিনি একটু বেরিয়েছেন, আপনার নামই কি শঙ্করবাবু ?"

"হ্যাঁ—"

"বসুন, আপনাকে বসতে বলে গেছেন তিনি, এখনি আসবেন।"

শঙ্কর নিকটের বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শঙ্করের মুখের দিকে সস্মিত ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি—নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—"

শঙ্করও হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আপনার মুখটাও চেনা চেনা ঠেকছে—"

ভন্টু থাকিলে আসামি দারজির পিতা নিবারণবাবুকে অবিলম্বে চিনিতে পারিত। শঙ্কর মাত্র একদিন ভন্টুর সহিত নিবারণবাবুর দোকানে চা পান করিতে গিয়াছিল; সুতরাং নিবারণবাবুকে ঠিক কোথায় দেখিয়াছে মনে করিতে পারিল না। এই ছোট দ্বিতল বাড়ীখানি নিবারণবাবুরই, মুকুজ্যে মশাই ভাড়া লইয়াছেন। নিবারণবাবু যে বাড়িতে থাকেন সে বাড়িটিও পাশেই। শুধু ভাড়াটে হিসাবেই নয়, মুকুজ্যে মশাই লোকটি পরোপকার-প্রবণ এবং নানা স্থানে তাঁহার অনেক জানা-শোনা লোক আছে শুনিয়া নিবারণবাবু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। আসমির কোন সন্ধানই এখনও মেলে নাই। পুলিশে সংবাদ দিয়াছেন বটে কিন্তু পুলিশ কিছুই করিতে পারিতেছে না। নিবারণবাবু মনে মনে ঠিক করিয়াছেন মুকুজ্যে মশাইকে সব কথা বলিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

"আপনি বসুন শঙ্করবাবু, আমি উঠি। আপনাকে আটকাবার জন্যেই মুকুজ্যে মশাই আমাকে বসিয়ে রেখে গেলেন। মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে তিনি এই একটু বেরিয়েছেন এখনি এসে পড়বেন।"

"মৃন্ময়বাবু এখানে আছেন না কি ?"

"হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন, ওপরে আছেন। আচ্ছা বসুন তা হ'লে, আমাকে দোকানে বেরুতে হবে—"

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন। মৃন্ময়ের স্ত্রীর কথায় বহুদিন আগেকার একটা ছবি শঙ্করের মনে জাগিয়া উঠিল। মৃন্ময়বাবু মোটর চাপা পড়িয়া হাসপাতালে ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে রাত্রে সেখানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রোরুদ্যমানা হাসির মুখখানা মনে পড়িল। সহসা রিণির মুখখানাও মনে পড়িয়া গেল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে রিণির বিবাহ হইয়াছে। শঙ্করকে কি তাহার এখনও মনে আছে ? শঙ্করকে কি সে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে ? বহুদিন পরে রিণির স্মৃতিকে ঘিরিয়া তাহার কল্পনা স্বপ্নলোক সৃজন করিতে লাগিল।

"শঙ্কর এসে পড়েছ দেখছি—"

অন্যমনস্ক শঙ্কর সচকিত হইয়া দেখিল মুকুজ্যে মশাই আসিয়াছেন, সঙ্গে মৃন্ময়বাবু। মুকুজ্যে মশাই কিন্তু বসিলেন না, বলিলেন, "তুমি এইখানে খেয়ে যেও, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, পালিয়ো না যেন। আমি সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট থেকে আসছি এখনি ঘুরে—"

"ও বাসায় কে আছে ?"

"ও বাসায় একটি রুগী আছে। আমারই চেনা-শোনা একজন, রাজমহল থেকে এসেছে; যে বুড়ি দাইটা রাত্রে শু'ত সেখানে, সে দুদিন থেকে আসছে না। তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসছি আমি এখনি। তুমি যেও না, বম্বে থেকে চিঠি এসেছে, হয় তো হয়ে যেতে পারে কাজটা। ঠিক বুঝতে পারছি না কেন, তারা তোমার ফোটো চেয়েছে একখানা। আমি একজন ফোটোগ্রাফারকে বলে এলাম, সে বিকেলের দিকে আসবে। মৃন্ময়, ও মৃন্ময়, তুমি এসে শঙ্করের সঙ্গে গল্পসল্প কর ততক্ষণ —"

শঙ্কর মৃন্ময়ের দিকে পিছন ফিরিয়া মুকুজ্যে মশায়ের সহিত কথা কহিতেছিল, মৃন্ময় কখন যে উপরে উঠিয়া গিয়াছে তাহা সে টের পায় নাই।

"আপনি যান, আমি বসছি—"

মুকুজ্যে মশাই চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর পুনরায় বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—ফোটো চাহিয়াছে কেন! ফোটো লইয়া তাহারা কি করিবে! সম্ভব-অসম্ভব নানা কল্পনা মনে জাগিতে লাগিল। মনে হইল যিনি মাসিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, হয় তো তিনি একটি কন্যারত্নেরও স্বত্বাধিকারী।

পছন্দসই একটি সহকারী সম্পাদক পাইলে তাহাকে জামাই পদেও বরণ ক'রিবেন। এবার ফোটো চাহিয়াছেন, ফোটো পছন্দ হইলে বোধ হয় কুষ্ঠি চাহিয়া পাঠাইবেন। মনে মনে শঙ্কর এক ব্যক্তিকে জামাই সহকারী-সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া কল্পনায় রঙ চড়াইতে লাগিল। মেয়েটি হয় তো লাবণ্যময়ী পুষ্পিত-যৌবনা তন্বী, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতি মাসে হয় তো একটি করিয়া কবিতা লিখিতে হইবে, হয় তো কবিতা তাহার পছন্দ হইবে না, হয় তো সেই বিম্বাধরোষ্ঠীকে বিচলিত করিবার সাধনায় নব নব ছন্দ উপমার অনুসন্ধানে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইবে। হয় তো—সহসা উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া একটা উচ্চ নারীকণ্ঠস্বর তাহার কল্পনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

"জানি গো জানি, সব জানি—আমার কাছে আর অত ভালবাসা ফলাতে হবে না; তোমার স্বর্ণলতার কাছে ওসব সোহাগ জানাও গে যাও, তোমাকে বুঝতে আর বাকি নেই আমার—"

স্বর্ণলতা! চকিতের মধ্যে শঙ্করের মনে বহুকাল পূর্ব্বের আর একটি রাত্রির কথা মনে পড়িল। স্বর্ণলতার নামাঙ্কিত সেই চিঠিখানি এখনও তাহার কাছে আছে। ... সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর লক্ষ্য করিল তাহার চক্ষু দুইটি হইতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে।

"আমার একটু দেরি হয়ে গেল—"

মৃন্ময় একটু হাসিয়া বলিল—

"তা হ'লই বা। আমি বেশ তো বসে আছি—"

একটু ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় বলিল, "আমার সব কথা শুনেছেন আপনি?"

"না, কিছুই শুনি নি—"

"শোনবার কথা অবশ্য নয়, কারণ কাউকেই আমি জানাই নি, এমন কি ভণ্টুকে পর্য্যন্ত নয়। মুকুজ্যে মশাই অবশ্য জানেন সব কথা, কিন্তু তাঁকেও হাসি, মানে, আমার স্ত্রী বলেছে, আমি বলি নি—"

তাহার পর জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "নিজের দুর্ভাগ্যের কথা পাঁচজনকে বলে বেড়িয়ে লাভ কি বলুন—"

মিনিট খানেক অস্বস্তিকর একটা নীরবতার পর শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি?"

"আমার একটা ছোট ভাই ছিল, চিনতেন তাকে আপনি? আপনাদের কলেজেই পড়ত—"

"কি নাম ছিল বলুন তো—"

"চিন্ময়—"

শঙ্কর মনে করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনে পড়িল না। তথাপি বলিল, "মনে হচ্ছে যেন নামটা শোনা—"

"আমার সেই ভাই, বোমার দলে যোগ দিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে জেলে আছে এখন। আর সেই জন্যেই আমার চাকরিটি গেছে। আমি পুলিশের আই. বি-তে চাকরি করতাম। যার নিজের ভাই রেভলিউশনারি, তাকে আই. বি-তে রাখবে কেন—" মৃন্ময় সহসা চুপ করিয়া গিয়া আবার সহসা বলিল, "দুঃখ তা-ও নয়, আসল দুঃখ—" পুনরায় থামিয়া গেল, আবার তাহার চক্ষু দুটিতে একটা অস্বাভাবিক জ্বালা ফুটিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে হঠাৎ আবার জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আসল দুঃখ—I am a fallen man—আমার পতন হয়েছে, সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে! I have bungled my whole life—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছি—"

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল, মৃন্ময় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এক মিনিট বসুন, আমি বলে আসি যে আপনি খাবেন আজ দুপুরে! আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি—"

শঙ্করকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুত-পদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

২৬

যে দিন মনোরমা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া সীতারাম ঘোষের বাসায় অজ্ঞান হইয়া গেল সেদিন হইতে মুকুজ্যে মশাই ও বাসায় আর রাত্রি-বাস করেন নাই। ডাক্তার, নার্স ডাকিয়া তিনি মনোরমার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রে সেখানে থাকা উচিত মনে করেন নাই। পরদিন গিয়া একজন রাঁধুনি ও একজন চাকরাণি বাহাল করিয়া মনোরমাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "আমি রোজ আসব। বুড়ি রাঁধুনি তার ছেলেকে নিয়ে রাত্রে

থাকবে, চাকরানিও রাত্ত নটা পর্য্যন্ত থাকবে। আমার সঙ্গে আর একটি ছেলে আছে, তাই আমি আর একটা বাসা নিয়েছি—আমি রোজ এসে খবর নিয়ে যাব তোমার, কোন ভাবনা নেই—"

মনোরমা কোন আপত্তি করে নাই, বস্তুত কোন উত্তরই সে দেয় নাই। অজ্ঞান হইয়া যাইবার পর হইতে সে অসম্ভব রকম নীরব হইয়া গিয়াছে। মুকুজ্যে মশাই প্রত্যহ আসেন, খোঁজ খবর করেন, সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার শেষ বক্তব্য যেন সে বলিয়া দিয়াছে, আর যেন তাহার বলিবার কিছু নাই।

আজ মুকুজ্যে মশাই আসিয়া দেখিলেন মনোরমা নাই। রাঁধুনি বলিল, সে-ও সকাল হইতে মনোরমাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঘরের ভিতর মুকুজ্যে মশায়ের নামে একটি পত্র পাওয়া গেল। অতি ক্ষুদ্র পত্র।

শ্রীচরণেষু, আমি চলিলাম। আমাকে খুঁজিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। ইতি

প্রণতা

মনোরমা

২৭

যদিও মিষ্টিদিদির স্বামী অধ্যাপক মিত্রের কিছুদিন হইতে 'হার্ট ট্রাব্‌ল্' বাড়িয়াছিল তথাপি তিনি একটি থিসিস্ লিখিতেছিলেন এবং তাহাতেই তন্ময় হইয়া ছিলেন। অধ্যাপক মিত্রের সহিত মিষ্টিদিদির সম্পর্ক কোন দিনই বেশী রকম ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। থিসিস্ লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি আরও যেন দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। 'ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে গ্রীক নাটকের প্রভাব' লইয়া তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কিছুর খবর রাখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। মিষ্টিদিদি কখন বাড়িতে থাকেন, কখন থাকেন না, কখন আসেন, কখন যান, কাহার সঙ্গে মেশেন, কাহার সঙ্গে মেশেন না—এ সকল খবর রাখিবার কোন প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না, কারণ এ সকল খবরের সহিত তাঁহার থিসিসের কোন সম্পর্ক নাই। গ্রীক নাটকের কোন প্রভাব ইংরেজী নাটকে পড়িয়াছে কি-না এবং পড়িয়া থাকিলে কতটুকু পড়িয়াছে তাহা নির্ণয় করিতেই তিনি ব্যস্ত। ইহা লইয়াই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কলেজে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নিজের বাড়ির লাইব্রেরি-ঘরে অতিবাহিত হয়। পুরাতন ভৃত্য জগদীশ তাঁহার স্নান, আহার, বেশ-পরিবর্ত্তন হইতে সুরু করিয়া কখন তাঁহার কলেজ যাইবার সময় হইল, কবে কোথায় কাহার সহিত এন্‌গেজমেণ্ট আছে, কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় বইগুলি হাতের কাছে রাখিতে হইবে—সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে অর্থাৎ জগদীশ যদি স্ত্রীলোক হইত তাহা হইলে জগদীশকে ব্যাকরণসম্মত-ভাবে প্রফেসার মিত্রের জীবন-সঙ্গিনী বলা চলিতে পারিত। মিষ্টিদিদি সামাজিক আসরে মিসেস মিত্র, মিষ্টার মিত্রের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নাই। রঙ্গমঞ্চের বাহিরে দুইজন দুই জগতের লোক।

মিষ্টিদিদির প্রতি প্রফেসার মিত্রের মনোভাব কিন্তু অদ্ভুত-ধরণের। প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদিকে যেন ভয় করেন। অপরাধী বালক যেমন ভয়ে ভয়ে অভিভাবককে এড়াইয়া চলে এবং অভিভাবক কোন একটা কিছু লইয়া অন্যমনস্ক থাকিলে নিশ্চিন্ত হয়, প্রফেসার মিত্রও ঠিক তেমনি মিষ্টি-দিদিকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন এবং মিষ্টিদিদি যাহোক-একটা-কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিলে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন। প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদিকে যে চেনেন না তাহা নয়, কিন্তু না চিনিবার ভান করেন। মিষ্টিদিদি নিকটে আসিলে সমস্ত দন্তপাতি বিকশিত করিয়া এমন আন্তরিকতার সহিত আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটি হাসেন যে, মনে হয় তিনি কিছুই জানেন না; মনে হয় তিনি মিষ্টিদিদির খোসামোদ করিতেছেন, মনে হয় তিনি মিষ্টিদিদির প্রীত্যর্থে সব-কিছুই করিতে প্রস্তুত। মিষ্টিদিদি সরিয়া গেলেই তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়, জগদীশকে ডাকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিতে বলেন এবং রুদ্ধদ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টিতে দুই-একবার তাকাইয়া পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। শুধু যে মিষ্টিদিদিকে দেখিয়াই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা নয়, মিষ্টিদিদির ঝাঁকড়া লোম-ওয়ালা কুকুরটা তাঁহার পড়ার ঘরে ঢুকিলেও তিনি সমান অস্বস্তি বোধ করেন এবং অনুরূপ আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া তাহার গায়ে মাথায় আলতো আলতো হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। মিষ্টিদিদি অথবা মিষ্টিদিদির কুকুর উভয়ের সম্বন্ধেই প্রফেসার মিত্রের মনোভাব অনেকটা এক রকম, অধ্যয়নের অন্তরায়-হিসাবেই যেন উভয়কেই তিনি ভয় করেন

এবং উহাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেন না বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করেন। তাঁহার নিজের ধারণা অর্থাৎ যে ধারণাটাকে তিনি সচেতন মনের সদরে কিঞ্চিৎ কপটতার সহিত প্রশ্রয় দেন তাহা এই যে, দুর্নিবার অধ্যয়ন-স্পৃহাই একটা নেশার মতো তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং বহুবিধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এই বিচ্যুতির জন্ম তিনি সর্ব্বদাই লজ্জিত। ইহার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই তিনি যেন মিষ্টিদিদির স্বেচ্ছাচারকে সহ্য করেন; শুধুই তাহাই নয়, স্বেচ্ছাচারের আবিলতরঙ্গে গা ভাসাইয়া মিষ্টিদিদি যে দয়া করিয়া তাঁহাকে রেহাই দিয়াছেন এজন্ত তাঁহার প্রতি একটা কৃত্রিম কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। প্রফেসার মিত্র কোন দিন আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই, দেখিতে চাহেন নাই, আসল গলদ কোন্‌খানে। নিজের দুর্ব্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না, এমন কি নিজের কাছেও নহে। সর্ব্বগ্রাসী অধ্যয়ন-স্পৃহার উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া মিত্রমহাশয় সুখে ছিলেন, দোষারোপ করিবার মতো একটা কিছু না পাইলে তিনি পাগল হইয়া যাইতেন।

প্রফেসার মিত্র অ্যারিস্টোফ্যানিস পড়িতেছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে। মিষ্টিদিদি বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। ফিরিলেও তিনি সোজা উপরে চলিয়া যাইবেন, প্রফেসার মিত্রকে বিরক্ত করিবেন না, ইহাই চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু আজ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল, সশব্দে দ্বার ঠেলিয়া মিষ্টিদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বাঙ্গে কমলা রঙের জরিদার শাড়ি ঝলমল করিতেছে, চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখা। মনে মনে বিব্রত হইলেও প্রফেসার মিত্র নাক হইতে চশমাটি কপালে তুলিয়া আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসিটি হাসিয়া বলিলেন, "ও, তুমি! কোথায় গেছলে, সিনেমায়?"

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "কি বই ছিল—"

"সিনেমায় যাইনি, প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি থেকে আসছি—"

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-মিশ্রিত একটি তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া এক হাত কোমরে দিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ঠামে মিষ্টিদিদি দাঁড়াইলেন, টেবিলে স্তূপীকৃত বইগুলির দিকে একবার চাহিয়া প্রফেসার মিত্রের মুখের উপর দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিলেন, তাঁহার দৃষ্টি হইতে ঘৃণা যেন উপচাইয়া পড়িতেছিল। প্রফেসার মিত্র বিচলিত হইলেন না। বলিলেন, "ও, প্রফেসার গুপ্ত, বেশ, বেশ—"

মিষ্টিদিদি কাজের কথা পাড়িলেন।

"আমাকে দুশো টাকার একখানা 'চেক্' দাও দিকি—"

"দুশো টাকার চেক? কেন?"

"কাল আমি দার্জ্জিলিং যাব, এখানে আর ভাল লাগছে না—"

"ও। প্রফেসার গুপ্তও যাবেন না কি?"

"না, একাই যাব।"

প্রফেসার মিত্র আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। ড্রয়ার খুলিয়া 'চেক' বহি বাহির করিলেন এবং দুইশত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। মিষ্টিদিদি চেক লইয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া গেলেন। কাল সত্যই তিনি দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইবেন। প্রফেসার গুপ্তকে উতলা করিবার জন্মই অল্প কিছুদিন সরিয়া থাকা দরকার। বেলা যদিও পরদিন উঠিয়াই নিজের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্ম প্রফেসার গুপ্তের দুর্ভাবনার বহরটা মিষ্টিদিদির নিকট মোটেই উপাদেয় মনে হয় নাই। আজ মিষ্টিদিদি প্রফেসার গুপ্তের সহিত ছদ্ম কলহ করিয়া আসিয়াছেন, কাল ছদ্ম অভিমান করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষ-মানুষকে বশে রাখিতে হইলে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হয়!

ক্রমশঃ



পদকর্ত্তা গোবিন্দ-কবিরাজ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

হেম হিমগিরি দুই তনু ছিরি
আধ নর আধ নারী।
আধক উজর আধ কাজর
তিনই লোচন ধারি॥
দেখ দেখ দুঁহু মিলিত একগাত।
ভকত পূজিত ভুবন বন্দিত
ভুবন মাতরি তাত॥
আধ ফণিময় আধ মণিময়
হৃদয় উজর হার।
আধ বাঘাম্বর আধ পট্টাম্বর
পিন্ধন দুঁহু উজিয়ার॥
না দেবী কামিনী না দেব কামুক
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর চরণে কিঙ্কর
কহই গোবিন্দ দাস॥

(বৃন্দাবনদাসের রস-নির্য্যাস)

ভক্তি-রত্নাকর, প্রেমবিলাস, ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে কবিরাজ গোবিন্দ দাস প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন এবং শক্তি বিষয়ক পদ রচনা করিতেন। পরে মধ্য-জীবনে নিদারুণ গ্রহণী-পীড়ায় জীবনে হতাশ হইয়া দেবী ভগবতীর স্বপ্নাদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। প্রেমবিলাসে শাক্ত গোবিন্দদাসের শক্তি বিষয়ক পদ রচনার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের পংক্তি দুইটী উদ্ধৃত আছে। প্রেমবিলাস প্রণেতা বলিতেছেন—(১৪ বিলাস) "কবিরাজের পূর্ব্ব বাক্য করহ শ্রবণ। পরে যে হইবে তাহা দেখিব সর্ব্বজন॥"

"না দেব কামুক না দেবী কামিনী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণে কিঙ্কর
কহই গোবিন্দ দাস॥"

(বহরমপুর সং ১৯৭-১৯৮ পৃঃ)

সম্পূর্ণ পদটী অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। গত সন ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে আমি এবং বন্ধুবর ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীখণ্ডে গিয়া কতকগুলি পুরাতন পুঁথির মধ্যে শ্রীখণ্ডের কবি বৃন্দাবনদাসের "রসনির্য্যাস" নামক একখানি পদ-সংগ্রহের পুঁথি প্রাপ্ত হই। এই পুঁথির মধ্যেই সম্পূর্ণ পদটী পাওয়া গিয়াছে। রসনির্য্যাসে পরিচ্ছেদের নাম "আস্বাদ"। উনত্রিংশ আস্বাদের পর পুঁথিখানি খণ্ডিত। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সংকলিত ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে পূর্ব্ব রাগাদি রসের ভাবানুরূপ শ্রীমহাপ্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ বিষয়ক পদ বর্ণিত আছে। পদকল্পতরু প্রভৃতি অপরাপর গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভু বিষয়ক পদই "তদুচিত গৌরচন্দ্র" নামে পরিচিত। বৃন্দাবন দাস পূর্ব্বরাগের "গৌরচন্দ্র" স্বরূপ শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের বর্ণনামূলক পৃথক পৃথক তিনটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোবিন্দ দাস ভণিতাযুক্ত শীর্ষোল্লিখিত আমাদের আলোচ্য পদটী শ্রীঅদ্বৈত বিষয়েই উদ্ধৃত হইয়াছে। গৌরগণোদ্দেশ মতে আচার্য্য অদ্বৈত শ্রীসদাশিবের অবতার এবং আচার্য্য-গৃহিণী সীতা দেবী ভগবতী যোগমায়া। বৃন্দাবন দাস এই মতের অনুসরণে হরগৌরী-মিলনাত্মক উক্ত পদটী উদ্ধারের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পদ পদাবলী-সাহিত্যে দ্বিতীয় নাই।

গোবিন্দদাস দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে যে "গীতপদ্যে" ভগবতীরই বর্ণন করিতেন তাহা নহে, তিনি প্রথম যৌবনে দান-খণ্ডাদি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের প্রথম বয়সে রচিত দানখণ্ডের ভণিতা এইরূপ—

"গোবিন্দ দাসের আনন্দ মতি। সখা যার দেব শৈলজাপতি॥ গোবিন্দ দাসেতে বলে চন্দ্রচূড় গতি।" ইত্যাদি। সুতরাং প্রথম জীবনে গোবিন্দ দাসের শক্তি উপাসনা অন্ততঃ শক্তি বিষয়ক পদ রচনার কথা প্রবাদ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ভণিতায় শৈলজাপতি ও চন্দ্রচূড়ের নাম ব্যবহার তাহার অন্যতম প্রমাণ।

গোবিন্দ দাসের পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম সুনন্দা। কবির মাতামহ দামোদর একজন প্রসিদ্ধ

ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার "সঙ্গীত-দামোদর" বিখ্যাত গ্রন্থ। "সঙ্গীত-দামোদর" আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। মূল গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি বর্দ্ধমান জেলার উখরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ-খণ্ডের বৈদ্যঠাকুর মহাশয়দের বাড়ীতে আছে। গোবিন্দ দাস স্বপ্রণীত "সঙ্গীত-মাধব" নাটকে বলিয়াছেন—

"পাতালে বাসুকি বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ ॥"

শ্রীখণ্ডের কবি রামগোপাল দাস "নরহরি রঘুনন্দন" শাখা নির্ণয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—শ্রীখণ্ডের

"শ্রীকবিরঞ্জন দামোদর মহাকবি।
যশোরাজ খান্ আদি সবে রাজ-সেবি ॥"

ছোট বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন, কবিরাজ দামোদর এবং যশোরাজ খান প্রভৃতি যে গৌড়-দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন যশোরাজ খানের একটী পদের ভণিতা হইতেও তাহা অবগত হওয়া যায়। যশোরাজের পদের ভণিতা এইরূপ—

শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সেহ এহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান ॥

হুসন গৌড়ের সুবিখ্যাত বাদশাহ হুসেন শাহ।

জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের পরিচয় প্রসঙ্গে সঙ্গীত-মাধব নাটকে কবিরাজ গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন—

"স্বর্ধুন্যাস্তীর ভূমৌ শরজনি নগরে গৌড় ভূপাধিপাত্রাৎ
ব্রহ্মণ্যাদ্বিষ্ণু ভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীব সেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দু নাম্না সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যে সহি কবি নৃপতিঃ সম্যগাসীদভিন্নঃ।"

"গৌড়ভূপাধিপাত্রাৎ"—ইহা হইতে অনুমিত হয় চিরঞ্জীব সেনের সঙ্গে গৌড়-দরবারের সম্বন্ধ ছিল। কবির বাসভূমি শরজনি নগর—কুমার নগর। ভক্তি-রত্নাকরে বর্ণিত আছে—

ভাগিরথী তীরে গ্রাম কুমার নগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর ॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥

পরবর্ত্তীকালে কবিরাজ রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া কুমার নগরে এবং তথা হইতে তেলিয়া বুধরি গ্রামে গিয়া বাস করেন। তেলিয়া বুধরি গ্রাম রাজসাহী জেলার অন্তর্গত এবং খেতরীর নিকটবর্ত্তী। গোবিন্দ কবিরাজের পত্নীর নাম মহামায়া, পুত্রের নাম দিব্যসিংহ, পৌত্রের নাম ঘনশ্যাম। দিব্য-সিংহের পদ পাওয়া গিয়াছে। ঘনশ্যামও সুকবি ছিলেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাসে ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজের নাম সুপ্রসিদ্ধ। অষ্ট কবিরাজের মধ্যে কবিরাজ রামচন্দ্র ও কবিরাজ গোবিন্দদাস অন্যতম। দুই ভ্রাতাই শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্ত্তৃক কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ ব্রজবনস্থিত বৈষ্ণবগণ গোবিন্দ কবিরাজের গীতাবলীর কিরূপ সমাদর করিতেন, ভক্তিরত্নাকরে তাহার প্রশংসনীয় পরিচয় আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শাখায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চিরঞ্জীব ও সুলোচন সেনের নাম পাওয়া যায়। নরহরি রঘুনন্দন শাখা গণনাতেও রামগোপাল দাস চিরঞ্জীব সুলোচনের নাম করিয়াছেন। রামগোপাল দাস লিখিয়াছেন—

"চিরঞ্জীব সুলোচন খণ্ডবাসী ভাই।
যদিও গ্রন্থে আছেন শাখাতে জানাই ॥
* * * *
পূর্ব্বে কহিয়াছি শাখা চিরঞ্জীব সুলোচন।
খণ্ডবাসী সেন পদ্ধতি দুইজন ॥
চিরঞ্জীব ভার্য্যা সতী বৈষ্ণবী সুশীলা।
শিশুতে পিতামহীকে মোর হরি নাম দিলা ॥
তা সবার পুত্র পৌত্র অনেক হইলা।
সরকার ঠাকুরে সব সমর্পণ কৈলা ॥
উপাধি প্রতিষ্ঠা ভয়ে মহান্ত না জানাইলা।
অদ্যাপিহ সেই গোষ্ঠীর সেবক রহিলা ॥

"অদ্যাপিহ সেই গোষ্ঠীর সেবক রহিলা" রামগোপাল দাস হয় তো সুলোচনের বংশধরগণের উদ্দেশেই এই কথা বলিয়াছেন। কারণ চিরঞ্জীবের দুই পুত্রই রামচন্দ্র ও গোবিন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু রামচন্দ্রের শিষ্য সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। গোবিন্দের বংশধরগণ সেন উপাধি পরিত্যাগ করিয়া কবিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামের পরিচয় দিতে গিয়া পদকল্পতরু সংগ্রহকর্ত্তা

বলিয়াছেন—"কবি-নৃপবংশজ ভূবন-বিদিত-যশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম ॥" এই বলরাম রামচন্দ্র কবিরাজের শাখাভুক্ত এবং বুধরীর অধিবাসী।

রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে বাধ্য হইয়াই শ্রীখণ্ড ও কুমার নগরের বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকর পাঠে এইরূপই অনুমিত হয়। রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব্বে গোবিন্দকে ডাকিয়া—

অতি স্নেহাবেশে তারে কহয়ে নিভৃতে।
যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনী প্রভাতে ॥
এবে হেথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয় ॥
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহুদিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥"

(ভক্তিরত্নাকর নবম তরঙ্গ)

রামচন্দ্রের এই আশঙ্কার কারণ এবং উৎপাতের বিবরণ আজিও জানা যায় নাই। ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা লিখিয়াছেন—

তাহে এই গঙ্গা পদ্মাবতী মধ্য স্থান।
পুণ্য ক্ষেত্র তেলিয়া বুধরী নামে গ্রাম।
অতি গণ্ডগ্রাম শিষ্ট লোকের বসতি।
যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি।

রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলে গোবিন্দ

শ্রীগোবিন্দ দুই চারি দিবস রহিয়া।
কুমার নগর হৈতে গেলেন তেলিয়া ॥

(ভক্তিরত্নাকর নবম তরঙ্গ)

শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী পদাবলী-প্রণেতৃগণের মধ্যে গোবিন্দদাসের মত প্রতিষ্ঠাবান কবি দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। গোবিন্দদাসের কবিতা রসের মাধুর্য্যে এবং ব্যাঞ্জনায়, ভাবের সৌন্দর্য্যে এবং গভীরতায়, ছন্দের ঝঙ্কারে এবং শব্দার্থের অলঙ্কারে পদাবলীর রত্নাবলী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গোবিন্দ কবিরাজের শ্রেষ্ঠ রচনা রূপ, অভিসার, উৎকণ্ঠা, রসোদ্গার এবং মান। অভিসারের পদে রায়-শেখর এবং কবিরঞ্জনের স্থান অনেক উচ্চে, উভয়েরই বর্ষাভিসারের পদ অতি সুন্দর। কিন্তু গোবিন্দদাসের জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভিসার, বর্ষাভিসার, শিশিরাভিসার প্রত্যেকটী পদই চমৎকার। নবোঢ়া মিলনে এবং বিরহে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সমকক্ষ। রসোদ্গারের পদে জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস প্রায় গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দ সে ক্ষেত্রে আপন ঐশ্বর্য্যে একেশ্বর। বিদ্যাপতির পদে নবোঢ়ার লজ্জাললিত নবানুরাগের চারু-চিত্রপট নিপুণ কারুকার্য্যে চিরসমুজ্জ্বল। কিন্তু গোবিন্দ-দাসের প্রৌঢ় প্রেম শ্রীরাধা ও সখীগণের উক্তি প্রত্যুক্তির সালঙ্কার পারিপাট্যে এই শ্রেণীর পদে এক অভিনব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়াছেন। সহচরী পরিবৃতা স্নানার্থিনী শ্রীমতী কালিন্দী-কিনারে মন্থর গমনে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার স্বর্ণ-শিরীষ-কুসুম-সুকুমার দেহকান্তি দিনকর কিরণে ম্লান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সেই সুন্দরী আমার চিত্ত চুরি করিল, সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া মুগ্ধ পথিকের সর্ব্বস্ব চুরি করিতে হয়, বঙ্কিম কটাক্ষে চাহিয়া তাহার প্রণালীটাও দেখাইয়া দিল। কালিন্দীর উত্তপ্ত বালুবেলায় শ্রীমতী কোমল চরণে অতি ধীর গতিতে চলিতেছেন, দেখিয়া আমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। শ্রীমতী যেন তপ্ত বালুকা তাপ হইতে আপন পদ দুইটীকে রক্ষা করিবার জন্যই আমার সজল আঁখি কমলকে পাদুকা করিয়া লইলেন।

শ্রীরাধার সুমধুর গতিভঙ্গীতে নীলবসনের অভ্যন্তর হইতে তাঁহার হেমগৌর তনুদ্যুতি ঈষৎ উছলিত হইতেছে। যেন বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিতেছে। তাঁহার অরুণ চরণক্ষেপে যেন এক একটী স্থলপদ্ম স্খলিত হইতেছে। কে এই সুন্দরী, সহচরীগণের সঙ্গে আমার জীবন লইয়া খেলা করিতেছেন। ইঁহার বিলোল ভ্রূভঙ্গি-বিলাস যেন নীল যমুনার তরঙ্গ-হিল্লোল। ইঁহার তরল নয়নের দৃষ্টি যেন নীলোৎপল বৃষ্টি করিতেছে। তাঁহার মধুর হাস্য যেন কুন্দ-কুমুদের প্রসন্ন প্রকাশ।

কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যায় না। বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব-কবিতা রসিকের আস্বাদনীয়, ভাবুকের অনু-ভবের সামগ্রী। কবির প্রকাশ-ভঙ্গীর সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

সহচরী মেলি, চললি বররঙ্গিনী
কালিন্দী করই সিনান।

কাঞ্চন শিরীষ কুসুম জিনি তনুরুচি
দিনকর কিরণে মৈলান ॥
সজনি, সে ধনি চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর ॥
কোমল চরণে চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল ॥

(২)

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন—দেখিয়াছেন

খঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থলকমলদলারুণ মঞ্জীর রঞ্জিত চরণা ॥

দেখিয়াছেন—

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী শাখী কুল ব্যাকুলিত কালিন্দী বহই উজান ॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন—

সুরপতি ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে। মালতী ঝুরি কি বলাকিনী উড়ে ॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড। করিবর কর কিয়ে ও ভুজ দণ্ড ॥
ও কি শ্যাম নটরাজ। জলদ কলপতরু তরুণি সমাজ ॥
কর কিসলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ। মুরলী খুরলি কিরে চাতক ভাষ ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয় মকরন্দ! হার কি তারক জ্যোতিক ছন্দ ॥
পদতলে কি থলকমল ঘন রাগ। তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ ॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত ॥

ও কি অভিনব সজল জলধর, না তরুণী সমাজের বাঞ্ছিত ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ। ও কি ইন্দ্রধনু, না চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ। (বক্ষে) মালতীর মালা, না বক পংক্তি। ও-কি অলকাবলি-শোভিত ললাট, না মেঘাবৃত অর্দ্ধচন্দ্র। ও তো বাহুদণ্ড নয়, দিগ্‌বারণের শুণ্ড। ও কি কর কিশলয়, না তরুণ অরুণের রক্তরাগ। ও কি মুরলীরব, না চাতকের কলধ্বনি। ও তো হাসি নয়, যেন অমৃত বৃষ্টি। ও তো হার নয়, তারকামালার জ্যোতিপুঞ্জ। ও কি চরণ কমলের অরুণিমা, না স্থলকমলের রক্তিমা। ও কি হংসশ্রেণীর কলরব, না নূপুরের শিঞ্জন। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ওই রূপেই মতিমন্ত বসন্ত রায় ভুলিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের কলহান্তরিতা শ্রীরাধা অনুতাপ করিয়া বলিতেছেন—

কুলবতী কোই নয়নে জসি হেরই হেরত পুন জলি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই প্রেম করই জনি মান ॥
সজনি অতএ মানিয়ে নিজ দোস।
মান দগধ জীউ অব নহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোষ।

কুলবতী কেহ যেন ভ্রমেও কাহাকেও দেখে না। যদিই বা দেখে, যেন কৃষ্ণ দর্শন করে না। দৈবাৎ যদি কানুকে দেখিয়া ফেলে, যেন তাহার অনুরক্ত হয় না, তাহার সঙ্গে প্রেম বাড়ায় না। আর যদিই বা শেষ পর্য্যন্ত কেহ কৃষ্ণকে ভালবাসে, কৃষ্ণানুরাগিণী কেহ যেন কৃষ্ণের প্রতি মান না করে। সখি আমি ইহার সব কিছুই করিয়াছি, অতএব নিজের দোষ স্বীকার করিতেছি। আমার মানদগ্ধ প্রাণ যে এখনো বাহির হইতেছে না। ইহাতে নিজের প্রতি রোষ প্রকাশ না করিয়া কেন কানুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইব।

কাব্য প্রকাশে মম্মট ভট্ট বলিলেন—

যস্যৈব ব্রণ স্তস্যৈব বেদনা ভণতি লোকস্তদলীকম্।
দন্তক্ষতমধরে বধ্বাঃ বেদনা সপত্নীনাম্ ॥

লোকে যে বলে যাহার ব্রণ তাহারই ব্যথা, সেটা মিথ্যা কথা। বধূর অধরে দশনক্ষত দেখিয়া সপত্নীর অন্তর জ্বলিয়া যায়।

কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব বলিতেছেন—

দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়াসহ তববপুরেতদভেদম্ ॥

তোমার অধরে দশন-দংশন চিহ্ন, কিন্তু আমার অন্তর

জ্বলিতেছে, এখনো কি, বলিবে তোমার আমার দেহ অভিন্ন নয়।

কবিরাজ গোবিন্দদাস বলিতেছেন—আমাদের অভিন্নতার লক্ষণ—তোমাতে কারণ আমাতে কার্য্য দেখ।

নখপদ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর॥

আবার দেখ—আমাতে কারণ তোমাতে কার্য্য—

হাম উজাগরি রাতি। তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি॥
হামারি রোদন অভিলাষ। তুঁহুক গদগদ ভাষ॥
কাহে মিনতি করু কান। তুঁহু হাম এক পরাণ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ। হাম গোরি তুঁহু শ্যাম অঙ্গ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন—"কানে শুনিলাম মুরারী মথুরায় যাইবেন, (তখনও এ প্রাণ বাহির হইল না) দু আঁখি মেলিয়া দেখিলাম কৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন, (এ প্রাণ তাহার অনুসরণ করিল না) কৃষ্ণশূন্য-মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম"। এখন—

দেখ সখি নীলজ জীবন মোই।
পিরিতি জনায়ত অব ঘন রোই॥

সাখ দেখ, আমার জীবনের নির্লজ্জতা দেখ, (এখনো এই দেহে থাকিয়া) কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার প্রতি প্রণয় জানাইতেছে। লোকে কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী বলিত, আনন্দে, গর্ব্বে, গৌরবে আমার বক্ষ ভরিয়া উঠিত। মনে হইত ধন্য বিধাতা, আমার কানু পরিবাদের সাধ সফল করিয়াছেন। কিন্তু আজ—

'কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক' কৃষ্ণসঙ্গহীন, কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত এই জীবনটাই কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। লোকে যে বলিত চপলপ্রেম, আমি বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু—

এত দিনে বুঝল বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত॥

এতদিনে সে কথার অর্থ বুঝিলাম। বুঝিলাম প্রেম ক্ষণস্থায়ী, আর জীবন স্থির, অতি দুঃখেও অন্ত হইবার নয়।

যাঁহারা বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদিগকে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যমণি প্রেম। প্রেম পঞ্চম-পুরুষার্থ, প্রেম অবিনশ্বর, প্রেমই অমৃত, ইহাই বৈষ্ণব সাহিত্যের মর্ম্মকথা। অথচ কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন—চপল প্রেম! বলা বাহুল্য ইহা শ্রীরাধার বিরহ দশার আক্ষেপোক্তি, অভিমানের কথা। শ্রীরাধা বলিতেছেন—আমি যেদিন কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া সর্ব্বস্ব বিকাইয়াছিলাম, সেদিন লোকে কত বুঝাইয়াছিল, কত ভৎর্সনা করিয়াছিল। বলিয়াছিল কানুকে ভালবাসিও না, ভালবাসিলে চিরকাল কাঁদিতে হইবে, তখন সে কথায় বিশ্বাস করি নাই। ভাবিয়াছিলাম—লোকে পরের ভাল দেখিতে পারে না, পরের সুখ সহিতে পারে না, তাই একথা বলিতেছে। আজ দেখিতেছি তাহাদের কথাই সত্য। সত্যই তো কৃষ্ণ আমায় ত্যাগ করিলেন। সর্ব্বস্ব সমর্পণের কি এই পরিণাম! দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, স্বজনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, কুলগর্ব্ব, গুরুগৌরব সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া যাহাকে বরণ করিয়াছিলাম, আজ সে হেলায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। লোকের কথাই সত্য হইল -চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত।

গোবিন্দদাসের ভাষা, গোবিন্দদাসের ছন্দ, গোবিন্দ-দাসের অলঙ্কার প্রয়োগ-পদ্ধতি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। পদাবলী-সাহিত্যে গোবিন্দদাস নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কয়েকটী পুরাতন ছন্দ তাঁহার হস্তে অভিনব উৎকর্ষে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

তনু তনু অনুলেপন ঘন চন্দন মৃগমদ কুমকুম্ পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত অবনি বিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক॥

অথবা—

অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জীর আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরম অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল॥

কিম্বা—

অধর সুধাঝর মুরলী তরঙ্গিনী বিগলিত রঙ্গিনী হৃদয় দুকুল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল ফুল॥

এমন কত উদ্ধৃত করিব। গোবিন্দদাসের পদাবলীর পদে পদে এমনই নিরুপম শব্দ ঝঙ্কার, এমনই অপরূপ ধ্বনি-বৈচিত্র্য।

কবি কল্পলোকের সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী—মাধুর্য্যের প্রাণময়ী মূর্ত্তি কবি মানস হইতে শাশ্বত বৃন্দাবনের পথে অভিসার করিয়াছেন। যুগ হইতে যুগান্তরের পথে যাত্রীরও যেমন অন্ত নাই, যাত্রারও তেমনই শেষ নাই। চিরন্তনী

কিশোরী শ্রীরাধা—সেই পুরাতনী দেবীই অনন্ত পথযাত্রীর পথ প্রদর্শনের জন্য নিত্য নব নব রূপে অভিসারিকার বেশে আবির্ভূতা হন। সৃষ্টির প্রথম মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নালোকিত কুসুমিত বনপথে কবি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দন চরচিত রুচির কপুর।
অঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥
চান্দনি রজনী উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভস রসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর॥

কিন্তু সর্ব্বদেশে পথ কুসুমাস্তৃত থাকে না। সর্ব্বকালে রজনী কৌমুদী-বিভূষিতা রহে না। তাই দেশে দেশে কালে কালে বর্ষার ঘন ঘোর দুর্দ্দিনে পথের বাধা বিঘ্ন দু'পায়ে দলিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। কত অসাধ্য-সাধনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কোন্ তপস্যায় অভীষ্টের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, নিজে সহিয়া আপনি আচরণ করিয়া তাঁহাকে সেই ভয়-তরণের উদাহরণ দেখাইতে হয়। আনন্দ-নিকেতনের বার্ত্তা বহিয়া আনিয়া অন্তরঙ্গ-গণের সম্মুখে প্রিয়-দয়িতের গোপন-মুরলী-সঙ্কেতের ইঙ্গিত ঘোষণা করিতে হয়। তবে মানব তাহার আদর্শের উদ্দেশ পায়। অভীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ করে। মানবের সাধনায়, মানবের তপস্যায় এমনই করিয়াই যুগে যুগে দেশে-দেশে প্রাবৃটের সূচীভেদ্য অন্ধকারে কণ্টকময় সঙ্কট বাটেই চির-আকাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে তাহার মিলন ঘটে। প্রিয় দয়িত আসিয়া পথের মাঝখানেই তাহাকে দর্শন দান করে। কবিরাজ গোবিন্দদাস একদিনের এমনই একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জীউ কাঁপ॥
তঁহি দিঠি জারত বিজুরিক জালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলি বনয়ারি।
অন্তর জর জর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমই ভুজঙ্গম নিশি আঁধিয়ার।
তঁহি বরিখত অবিরত জলধার॥
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পঙারব সো সুকুমারি॥
শুণি শুণি আকুল চলত মুরারি।
মীলল আধ পন্থে বর নারী॥
গোবিন্দ দাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ॥

আকাশ-বাঁশী

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

হাতছানি দেয় নীল আকাশে নীল পরীরা
গ্রামের পথে সবুজ বনে—
মনের মাঝে আজকে ঝরে মুক্তহীরা
বুকের মাঝে সঙ্গোপনে।
মেঘ্‌লা আকাশ আজ তাহারে লাগ্‌লো ভালো
ভালোবাসায় রঙীন্ যেন—
উদাস চাওয়া হরলো আমার মনের কালো
জাগ্‌লো বুকে এমন কেন?
চোখ ইসারায় ডাক্‌লে বুঝি আমার প্রিয়া
সে চাওয়াতে ভুবন ভোলে—
অন্ধকারায় আজকে যেন বন্ধ হিয়া
চাওয়ার তালে দোদুল দোলে।
ঘরের পাশে একাই চলি স্বপন পথে
পিয়ায় দেখি পথের ধারে—
মনের কথা পড়ছে যেন নিজন পথে
আপন মেনে আঁখির ধারে।
হাতের মালা দিলাম বাঁধি পিয়ার গলে
দিলাম তারে হাসির রাশি—
আমার স্বপন ভাঙ্‌লো বুঝি চোখের জলে
আকাশ শুনি বাজায় বাঁশী।

আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেই মুহূর্তে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন সেই মুহূর্তে বুঝা গেল কত বড় শূন্যতার মধ্যে এখানে আমরা পড়িয়া রহিলাম। না হারাইলে পৃথিবীতে অনেক জিনিষেরই মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। হারাইলে তখন জাগে আমাদের চেতনা, এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য।

যথার্থভাবে চিনিবার জন্যও দূরত্বের প্রয়োজন আছে। দূর হইতে দেখিতেছি বলিয়াই সূর্য্য চন্দ্র যে গোল তাহা বুঝি। পৃথিবীও তো গোল। কিন্তু আমরা তাহার বুকের মধ্যে এত কাছে থাকি, যে কেবল তাহার উচ্চ নীচ বন্ধুরতাই দেখি, তাহার বর্ত্তুলত্বের অখণ্ড অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাদের চোখে ধরাই পড়ে না। চন্দ্রলোকবাসীরা আমাদের এই পৃথিবীটাকে সেই ভাবেই দেখে, কিন্তু সে সৌভাগ্য আমাদের নাই। হয়তো মহাপুরুষেরা সেই কারণেই স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে এবং জীবিত কালের অপেক্ষা মৃত্যুর পরে বেশি সম্মানিত হন।

সদ্য বিচ্ছেদের বেদনার মধ্যেও সেইরূপ একটি অখণ্ড-স্বরূপ উপলব্ধি করিবার বাধা ঘটে। তাহার জন্যও একটু সময়ের প্রয়োজন আছে। স্থান ও কাল উভয় ক্ষেত্রেই একটু ব্যবধানের প্রয়োজন আছে। অথচ বহু দূরে গেলে আবার আমাদের উপলব্ধির সীমা ছাড়াইয়া যাইবার ভয় থাকে। আকাশের বহু বহু বিশাল জ্যোতিষ্ক কেবল মাত্র দূরত্বের হেতুতে আমাদের অলক্ষ্য।

তবে মৃন্ময় গ্রহ অপেক্ষা জ্যোতির্ময় সৌরলোকগুলি বহু দূর হইতে দৃষ্ট হয়। রাত্রিতে অত্যাসন্নদূরবর্ত্তী বস্তুগুলি অগোচর হইলেও অতিদূরস্থিত দীপগুলি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ আপনার জ্যোতিতে বিশাল সৌর লোকের অপেক্ষাও দীপ্যমান, বহু বহু দূর হইতেও দেশে দেশে মনীষীর দল তাঁহার দীপ্তির কাছে প্রণতি জানাইয়াছেন, বহুকাল পরেও পৃথিবীর উত্তর পুরুষেরা তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। তবু যে ভুলিবার ভয়—সে কেবল আমরা দৃষ্টিহীন বলিয়া।

এইমাত্র তিনি বিদায় লইয়াছেন তাই এখনও তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখার মত অবসর হয় নাই। আর মর্মাহত আমাদের চিত্ত এখন সদ্য বিদায়ের শোকেই মুহ্যমান। এখন ভাল করিয়া আমরা কিছু দেখিতে বা বলিতে অক্ষম। আর এত ত্বরাই বা কিসের? দুইদিন সবুর করিলেও ক্ষতি নাই। বহুকাল আমাদের মানস লোককে পূর্ণ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। বাজার চাহিদা মিটাইবার জন্য যেন কোনো প্রকারের অভব্য তাড়াহুড়ায় আমরা তাঁহার পরলোক-প্রয়াণকে অসম্মানিত না করি।

তাহা ছাড়া মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কিছু লিখিবার যোগ্যতা আমার কি আছে। যদিও তেত্রিশ বৎসরের অধিককাল তাঁহার সঙ্গে একই স্থানে একই ব্রতে জীবন কাটাইয়াছি তবু তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার যোগ্যতা আমার নাই। হয়তো তাঁহার এত কাছাকাছি বাস করিয়াছি যে তাঁহার অখণ্ড পূর্ণ স্বরূপ সব সময়ে অনুভব করিবার মহত্বও অন্তরে ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের সব কাজ যাঁহার দানের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মহামনা এল্‌মহার্ষ্ট সাহেব রবীন্দ্রনাথের একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত। শ্রীনিকেতনে বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা যে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা একমাত্র তাঁহারই দাক্ষিণ্যের গুণে। এল্মহার্ষ্ট সাহেবের মনীষাও অসাধারণ। তিনি মনে করিলেন রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ সেবা করিয়া তাঁহার একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবনী লিখিবেন। নিরন্তর রবীন্দ্রনাথের সেবা করিয়া, তাঁহার চিঠি-পত্র, লেখা-পড়া, কথাবার্ত্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিয়া ছয় বৎসর পরে তিনি একদিন বলিলেন, "তোমার এতবড় সর্বতোমুখী প্রতিভা ও এমন বিরাট মাহাত্ম্য, যে আমি হার মানিলাম। এই কাজের যোগ্যতা আমার নাই। সুকর্ত্তিত হীরকখণ্ডের মত তোমার মহত্বের অগণিত দিক এবং তাহার প্রত্যেকটি দিকের দীপ্তি অতুলনীয়। অতএব এই কাজ হইতে আমি বিদায় লইলাম।" এখনও শ্রীনিকেতনে তাঁহার দান যথারীতিই চলিয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার মত অসম্ভব কাজের দম্ভ তিনি দমন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার পুণ্যনাম কীর্ত্তনে নিজেকে পবিত্র করিতে পারিলেও নিজে ধন্য হই। সামান্য দুই একটি কথা যে বলিব, কোথায় তাহার আরম্ভ এবং কোথায় তাহার অবসান করি তাহাও ভাবিয়া পাইতেছি না।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কাশীতে আমার জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা। কাজেই আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী। তখনকার দিনে কাশীতে এত বাঙ্গালী ছিলেন না। আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দেখিবারও এত সুযোগ ছিল না। আমাদের মধ্যে অনেকে বাংলা অক্ষরও জানিতেন না। আমারও জ্ঞান ছিল সংস্কৃতে ও হিন্দীতে আবদ্ধ। সামান্য বাংলা জানিতাম, তাহাতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পর্য্যন্ত ছিল আমার বাংলা জ্ঞান। ১৮৯৮ কি ১৮৯৯ সালে বাংলা দেশ হইতে আগত একজন সাহিত্য-রসিকের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পরিচয় পাইলাম। খুব সম্ভব উপনিষৎ ও মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর সহিত পরিচয় থাকাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার খুবই ভাল লাগিল। তখন যে রবীন্দ্র কাব্যের টালির আকারের একটি সংস্করণ ছিল তাহা আনাইয়া পড়িতে লাগিলাম। দূর হইতেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি গভীর ভক্তি ও প্রীতি জন্মিল। তখন ভাবি নাই একদিন এই মহাপুরুষেরই আহ্বানে তাঁহারই সাধনাক্ষেত্রে আমার ডাক পড়িবে।

১৯০৮ সালে একদিন পঞ্চনদের উপরে কাশ্মীরের প্রান্তভাগে হিমালয়ের কোলে একটি নির্জন নগরে বসিয়া আছি এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান বহন করিয়া একখানি পত্র আসিল। বুঝিলাম শান্তিনিকেতনের কাজে তিনি আমাকে চাহেন। এই আহ্বানে যদিও নিজে ধন্য হইলাম তবু নিজের অযোগ্যতা জানাইলাম। সাংসারিক অসুবিধাও বিস্তর ছিল। কিন্তু পরিশেষে যোগ দিবার সঙ্কল্প লইয়াই কলিকাতা আসিলাম।

রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তো পরিচয় ঘটে নাই। এত বড় একটি প্রতিভা, তাঁহার সহিত একই স্থানে থাকিয়া একত্রে কাজ করিতে হইবে, এই সব ভাবিয়া মনে মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। কলিকাতায় অনেক পরিচিত লোক আমাকে আরও ভয় দেখাইলেন। কেহ বলিলেন, "তিনি ধনী, অভিজাত, তাঁর কাছে বাস করিবার যোগ্যতা কি তোমাদের আছে?" কেহ বলিলেন, "তাঁহার অশন, বসন, জীবনযাপনপ্রণালী এতদূর ধনাঢ্য-জনোচিত যে সেখানে টিঁকিতেই পারিবে না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। নাগরিক-জীবনযাত্রায় অনভিজ্ঞ আমার মন আরও দমিয়া গেল।

১৯০৮ সালের বর্ষাকালে একদিন প্রভাতে আসিয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তখন এখানে ট্যাক্সী হয় নাই। বৃষ্টির জন্য গরুর গাড়ীও মিলিল না। হাঁটিয়াই আসিলাম। তখন দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতন হইতে ষ্টেশনে গোযানে যাতায়াত করিতেন। গরুর গাড়ীতে অনেক সময় মাত্র জিনিষ পত্র যাইত, তিনি ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া আসিতেন। সে কি দ্রুত হাঁটা! ছোট ছেলেরা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়া দৌড়াইত, তবু তাঁকে ধরিতে পারিত না। তখন প্রচণ্ডবেগে তিনি হাঁটিতেন।

তখন শান্তিনিকেতনে আমার কাশীর আত্মীয় দুইজন ছিলেন। একজন সতীর্থ শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ও অন্যজন শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। "ভূপেনদা" তখন আশ্রমের ব্যবস্থা-বিভাগ বা অফিসের কাজ লইয়া থাকিতেন। আশ্রমে পৌছিতেই নূতন পরিচয় হইল গীতরসিক স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথের ও সুসাহিত্যিক স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর সহিত। গানে দিনুবাবুর আলস্য ছিল না। এমন সুরময় সরল সহজ প্রাণ বড় একটা দেখা যায় না। সহৃদয়তার ও সামাজিকতার তিনি মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। অজিতবাবু ও দিনুবাবু মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধু বনিয়া গেলেন। কাশীতে প্রচলিত আমার ঠাকুর্দ্দা নামটা ভূপেনদার কাছে শুনিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আশ্রমময় তাহা প্রচার করিয়া দিলেন।

তখনও আশ্রমে গুরুদেবকে দেখি নাই। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই তাঁহার গান শুনিতে পাইয়াছিলাম। সঙ্গে কুলী বলিল, "এই গান করিতেছেন 'কাঁচ বাংলার বাবু' অর্থাৎ "রবীন্দ্রনাথ।" আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখি এখন যে বাড়ীটিকে "দেহলী" বলে, তাহারই উপর তলায় ছোট্ট একটুখানি ঘরে তিনি বাস করেন। তিনি নীচে আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার ছোট্ট ঘরখানিতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। এত বড় ছন্দের কবি তিনি, তাঁহার কাব্যে ছন্দপতন হয়না, কিন্তু

দেখিলাম, দেহলীর সিঁড়ীতে ছন্দপতন ঘটিয়াছে। সবগুলি ধাপ সমান উচ্চ নহে। তখন এই সারা মুলুকে একমাত্র রাজমিস্ত্রী ছিল "কুব্জা" মিস্ত্রী। তার রচনানৈপুণ্যে তুষ্ট না হইলে আর কোনো উপায় ছিল না। কবিগুরু, সেইরূপ ঘরেই আনন্দে বাস করিতেন।

বড় ঘরের চেয়ে ছোট ঘরেই বাস করিতে কবি পছন্দ করিতেন। একদিন তাই বলিলেন, "প্রকাণ্ড ঘর-বাড়ীর মধ্যে মানুষ যায় নগণ্য হইয়া, মানুষকে যদি তাহার ঘর বাড়ীই মহিমায় অতিক্রম করে তবে তাহা শোচনীয়।" ঘরে উপকরণের বাহুল্যও তাঁহার ছিল না। এই বিষয়ে জাপানীদের উপকরণহীন সুধু নির্মল মাদুরবিছানো ঘরগুলি দেখিয়া জাপান যাত্রার সময়ে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কবিগুরু তাঁহারা "নৈবেদ্য" গ্রন্থে বারবার উপকরণহীন এই সরলতার কথা ঘোষণা করিয়াছেন,

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক্ বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

(নৈবেদ্য, নং ৯৩)

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত।

(ঐ নং ৯৫)

এইরূপ কথা নৈবেদ্যে ও অন্যত্র আরও বহু আছে। উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

শুনিয়াছিলাম তাঁহার জীবন যাত্রা অতিশয় বিলাসবহুল, কিন্তু এখানে আসিয়া দেখি ঠিক তার বিপরীত। তখন তাঁহার অর্থেরও খুব টানাটানি। কাপড় চোপড় খুব বেশি নাই। কিন্তু তাহাই নিজে ধুইয়া শুকাইয়া ব্যবহার করিতেন—তাঁর "ঠাকুর্দা" গল্পের ঠাকুরদার মত। মনে হইত তাঁহার যেন অনেক আছে।

তখন তাঁহার একটিমাত্র অনুগত ভৃত্য ছিল, উমাচরণ। সে যশোর জেলার লোক, খুব রসিক। কবি আপন ভৃত্যের সঙ্গে রীতিমত ঠাট্টা তামাসা করেন। এটা তাঁহার স্বভাব। তাঁহার ভৃত্য, সেবক, পরিজন সকলের সঙ্গেই তাঁহার একটি সহজ সরল সম্বন্ধ ছিল। উমাচরণ অকালে মারা গেলে "সাধু" নামে একটি গম্ভীরপ্রকৃতির ভৃত্য আসে। সাধু কাজ করিত খুব, কিন্তু তাহার মুখে হাসি ছিল না। একদিন কবিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নূতন ভৃত্যটি কেমন?" কবি বলিলেন, "তা'কে কি আপনি ভৃত্য বলেন? সে যে আমার গার্জেন (অভিভাবক)। বাবা! সে কি গম্ভীর!"

কবির খাদ্য দেখিলাম, খুব সাদাসিধা, নিরামিষ। তাতে ঝাল বা মশলা নাই। তবে ফল ও মিষ্ট তাঁহার প্রিয় ছিল। আমাকেই তিনি ফলের রাজা বলিতেন। চিনি অপেক্ষা গুড়ই ছিল তাঁহার বেশি প্রিয়। মধুও কবির প্রিয় ছিল। মহর্ষি প্রচুর দুগ্ধ পান করিতেন। কবির দুঃখ ছিল যে দুধটা তাঁহার তেমন সহ্য হয় না। তবে নানাভাবে তিনি দুধ খাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিয়া উঠিতেন না।

অতি প্রত্যুষে কবি শয্যাত্যাগ করিতেন। কাশীর অভ্যাস মত বাল্যকাল হইতেই আমি চারিটার সময় ঘুম হইতে উঠিতাম। কিন্তু তখনও দেখিতাম তিনি মুখ হাত ধুইয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। ৩টায় উঠিয়াও দেখি তিনি ধ্যানে নিরত। ৩টার কাছাকাছি তিনি উঠিতেন। অথচ ঘুমাইবার পূর্ব্বেও তাঁহার ধ্যানের অভ্যাস ছিল। আসলে তাঁহার নিদ্রাই ছিল অল্প। তিনি বলিতেন, "অল্প নিদ্রাতেই আমার বেশ চলিয়া যায়, কোনো কষ্ট হয় না।"

প্রভাতের আলোক হইলেই সামান্য একটু দুধ বা ফল খাইয়া তিনি দিনের কাজ আরম্ভ করিতেন। চা খাইলে, ছাঁকনীর মধ্যে চা রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া গরম জল ঢালিতেন। তাহার সামান্য কিছু চায়ের জল দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতেন। বলিতেন, "ইহাতে আমার দুধটা সহজে সহ্য হয়, চায়ের জন্য আমি চা খাই না।"

সেই যে ভোরবেলা দিনের আলো হইলেই কাজে বসিতেন তখন হইতে প্রায় প্রতিদিনই বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন। তখন আশ্রমের কাজ-কর্ম, অধ্যাপনা সব কিছুতেই তিনি প্রচুর শ্রম করিতেন। অধ্যাপকদের লইয়া আশ্রম চালনার বিধি ব্যবস্থা নির্ণীত হইত। তিনি তাহাতে নিজের মতামত কখনও জোর করিয়া চালাইতে চাহিতেন না। আশ্রমে এমন অনেক অধ্যাপক ছিলেন যাঁহাদের মতামত রবীন্দ্রনাথের

মতামতের একেবারে বিপরীত ছিল। কিন্তু দেখিয়াছি অপূর্ব সহিষ্ণুতার সহিত তিনি সেই সব সহিয়া যাইতেন, কখনও মতের অমিলের জন্য কাহাকেও তাড়াইয়া দেন নাই। ভারতবর্ষে আরও বহু প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। কিন্তু আশ্রম-পতিরা কোথাও মতের এতটা স্বাধীনতা সকলকে দিয়াছেন বলিয়া জানি না। তিনি বলিতেন, "মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বের উপর নির্ভর কর, বাধানিষেধের দ্বারা বারবার তাহার গতি ক্ষুণ্ণ করিও না, দেখিবে ক্রমে ক্রমে সব বাধা কাটিয়া যাইতেছে।" দেখিয়াছি, প্রায়ই তাহাতে ফল ভালই হইত। মাঝে মাঝে নিষ্ফলতা যে না আসিত তাহা নহে, তবে কোনো দিন তাহাতে রবীন্দ্রনাথ দমেন নাই। মানব চরিত্রের প্রতি এমনই তাঁহার ছিল একটি সহজ শ্রদ্ধা।

আমি আসিবার পরই অধ্যাপক-সভাতে আমাকে আশ্রম চালনার সব ভার দেওয়া হইল অর্থাৎ আমি সর্বাধ্যক্ষ হইলাম। সব কাজই তো করি। কিন্তু আমার হস্তাক্ষরটা সুবিধার নহে এবং লেখার কাজও বিস্তর। একটি কেরাণী থাকিলে সুবিধা হয়। কিন্তু কেরাণী রাখিবার মত অর্থ কৈ? অধ্যাপক-সভায় অনেক আলাপ আলোচনার পর হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যদি আপনার কেরাণীর কাজ করি, তবে কি আপনার আপত্তি আছে?" সকলেই একবাক্যে তাহাতে প্রতিবাদ জানাইলাম। কিন্তু তিনি দেখিলেন অর্থ নাই, অন্য কোনো অধ্যাপকের অতিরিক্ত কাজের মত অবসরও নাই। তাই অগত্যা তিনি কেরাণীর কাজই করিতে ইচ্ছুক। কোনো মতে বাধা দেওয়া গেল না। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে অবিলম্বে আসিয়া তিনি বসিতেন এবং প্রতিদিনকার পত্র লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া অফিসের তাবৎ লেখার কাজ সারিয়া উঠিতেন। কোনো বাধা মানিতেন না।

এমন চমৎকারভাবে তিনি তাঁহার কেরাণীর কাজটিও করিতেন যে তাহার তুলনা মেলে না। এই ভাবে কিছুকাল চলিল। তারপর আমাদের স্নেহভাজন নবীন অধ্যাপক শ্রীমান জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় নিজেই কেরাণীর সব কাজ স্বীকার করিয়া রবীন্দ্রনাথকে নিষ্কৃতি দিলেন। এখন সেই জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় জামসেদপুরে শিক্ষা চালনার কাজে আছেন। শ্রীযুত অমল হোম যে "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" লিখিয়াছেন, এই ঘটনাটি জানা থাকিলে তাঁহার একটি প্রকাণ্ড নজীর জুটিত।

মধ্যাহ্নে আহারের পরে রবীন্দ্রনাথকে কখনও এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতে দেখি নাই। তখনই লেখাপড়ায় বসিতেন। তাঁহার পড়ার মধ্যে সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের গ্রন্থই বেশি। গ্রন্থের পাশে তাঁহার মূল্যবান নোট বা টিপ্পনীর দ্বারা গ্রন্থগুলি শোভিত। তাঁহার জীবনযাত্রা সরল হইলেও গ্রন্থ কিনিবার সময় তাঁহার কখনও কার্পণ্য দেখি নাই। জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া তিনি পড়াশুনা করিতেন। তাই তাঁহাকে প্রতিদিন প্রচণ্ড শ্রম করিতে হইত। তাঁহার অধীত হাজার হাজার গ্রন্থ দিয়াই বিশ্বভারতীর গ্রন্থালয়ের আরম্ভ হয়।

তাঁহার পড়াশুনার ও আশ্রমের অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি লিখিতেন। যখন তাঁহার প্রসিদ্ধ "গোরা" বাহির হইতেছে, তখন দেখিয়াছি এক এক সময় একেবারে চরম দিনে তাঁহার কাছে কাপির জন্য লোক দাঁড়াইয়া, তিনি তখনই সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া একটি-সংখ্যার মত বস্তু ভরতি করিয়া দিতেন। এই জন্যই দুই এক স্থানে জোড়ের জায়গায় এক আধটুকু অসঙ্গতি থাকিয়া যাইত। পরে তাহা শুদ্ধ করা হইত।

প্রভাত হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া স্নানাহার সারিয়া কবি যে তৎক্ষণাৎ কাজে বসিতেন তাহার জের চলিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। বৈকালের অনেকটা সময় পত্রের উত্তর দিতে ব্যয়িত হইত। পত্রের বাহুল্যে ব্যাকুল হইলেও তখনকার দিনে নিজ হাতেই তিনি সব পত্রের উত্তর দিতেন। যাহা হউক, যতক্ষণ দিনের আলো ততক্ষণ তিনি কাজ করিতেন।

যখন কবিতা বা গানের প্রেরণা আসিত তখন মাঝে মাঝে এই বিধির উলট পালট হইত। এক এক সময় গানের পর গান ও সুর আসিত, তখন বার বার সুরগুলি শিখিয়া লইতে দিনেন্দ্রনাথের ডাক পড়িত। দিনুবাবুরও কখনও ইহাতে আপত্তি দেখি নাই।

সন্ধ্যা হইলে আসিত সামাজিক জীবনের পালা। অর্থাৎ কোনো দিন তিনি ছেলে-পিলেদের লইয়া গল্প করিতেছেন, হেঁয়ালী নাট্য রচনা করিয়া শুনাইতেন বা শিখাইতেছেন, ছোট ছেলেদের যত গান ও শিশুজনোচিত অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। কোনো দিন বা অধ্যাপকদের কাহাকেও কাহাকেও লইয়া উপনিষদাদি গ্রন্থ আলোচনা করিতেছেন।

কখনও বা গান বা অভিনয় লইয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের লইয়া আসর জমাইতেছেন। কখনও বা দেশ-বিদেশের কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনায় সন্ধ্যার মুহূর্ত্তগুলি কাটিত। মোট কথা একটু সময়ও বৃথা যাইবার জো ছিল না। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন প্রায়ই সকলের আলস্যে কাটে। কিন্তু কবির অধিকাংশ ভাল রচনাই গ্রীষ্মকালের দারুণ গরমে। দেহলীর ঘরে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে দরজা জানলা খুলিয়া চলিত তাঁহার কাব্য রচনা।

বুধবার প্রভাতে তিনি এখানে মন্দিরে সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। একবার আমরা তাঁহাকে ধরিলাম, সপ্তাহে একটি দিন মাত্র উপদেশে কিছু হয় না। প্রতিদিন ভোরে যে তিনি ধ্যানে বসেন তাহা হইতে যদি একটু সময়, প্রতিদিন প্রাপ্ত ভাব রসের একটু প্রসাদ, আমাদের তিনি দেন তবে ভাল হয়। ইহাতেই তাঁহার শান্তিনিকেতন উপদেশ-মালার উৎপত্তি। কিছুদিন তাহা চলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মহার্ঘ্য উষার মুহূর্ত্তগুলি তাহার নিজের জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে পরে সেই উপদেশ দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। তবু এই উপলক্ষে বহু উপদেশ আমরা তাঁহার কাছে পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

প্রভাতের ধ্যানে তাঁহার দিনগুলি আরম্ভ হইত এবং সন্ধ্যায় সামাজিক কাজের পরে আবার ধ্যানের সাগরে তিনি আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া গভীর রাত্রিতে শয্যায় যাইতেন। ধ্যানের দ্বারা আরব্ধ এবং ধ্যানের দ্বারা সমাপ্ত এক একটি দিন ছিল তাঁহার সাধনার মালার এক একটি গুটি। এই ভাবে তিনি কর্ম্মে, সেবায়, সাধনায়, ধ্যানে একটি একটি দিনকে একটি একটি প্রসাদের মত ভগবানের হাতে পাইতেন। এইরূপ প্রসাদীকৃত দিনগুলির দ্বারা রচিত অনলস সাধনাময় পরমসুন্দর অশীতিবৎসরব্যাপী একটি তাপস জীবন যাপন করিয়া আপনার সাধনোচিত লোকে আজ তিনি প্রয়াণ করিয়াছেন। বৈদিক ভাষায় আমরাও আজ তাঁহাকে বলি—

তপসা যে অনাধৃষ্যা স্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংচিদেবাপি গচ্ছতাৎ॥

তপোবলে যাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ, তপোবলে যাঁহারা স্বর্গলোকে প্রয়াত, মহতী তপস্যায় যাঁহারা সিদ্ধ, তুমিও তাঁহাদের মধ্যে গমন করো।

যে চেৎ পূর্ব ঋতসাতা ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ॥

যে সকল পূর্বতাপসগণ সাধনাতেই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, সাধনার মধ্যে যাঁহারা নবজন্মপ্রাপ্ত, সাধনাকে যাঁহারা নিত্যই অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন, হে সংযত তাপস, তুমিও তাঁহাদের মধ্যে গমন করো।

সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্য্যম্।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ॥

যে সকল অপার দৃষ্টিসম্পন্ন কবিগণের কাছে সূর্য্যের আলোকও পরিম্লান, সেই সব তপস্বী ঋষিগণের মধ্যে হে পরম তপস্বী, তুমিও গমন করো।

অসময়

শ্রীমতী মাধুরীরাণী ঘোষ

বেলা হ'ল অবসান।
নয়নে আমার নেমেছে অশ্রু
—বেদনা উতল প্রাণ।
খেয়ালী বাঁশীর ঘরছাড়া সুরে
এসেছি চলিয়া দূর হতে দূরে,
আজি গীতহীন অন্তরপুরে
থেমে আসে সব গান।

তন্দ্রার ঘোরে কেটেছে প্রভাত, দেখিনি
উষার হাসি,
মধ্য দিনের দীপ্ত অরুণ ঢেকেছিল মেঘরাশি।
সারাদিন মোর গেল অকারণে,
আজি পৃথিবীর বাঁশী নিঃস্বনে
কে ডাকো বন্ধু! বিদায় লগনে
কী দিব তোমারে দান!

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তের বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে একাশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা দেশকে দিয়েই এসেছেন তাঁর অজস্র দান। এযাবৎকাল আমরা শুধু নিয়েই এসেছি তাঁর কবিতা, তাঁর গান, তাঁর গল্প উপন্যাস, তাঁর নাটক, তাঁর প্রবন্ধ—তাঁর আধ্যাত্মিকতার বাণী। নিপীড়িত, নিরন্ন, নিরস্ত্র ভারতের মুক্তির জন্য তাঁর বজ্রকণ্ঠের দাবী, সে দাবী আবেদন-



জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ

নিবেদনের লজ্জায় ম্লান নয়। ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি, তার সংস্কৃতি ও শিক্ষা, তার আদর্শ ও ভাবধারণা থেকেই তার উদ্ভব। কিন্তু আমরা নিয়েই এসেছি। সারা দেশের মূক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বাজাত্যবোধ তাঁরই মধ্যে আমরা মূর্ত্ত দেখেছি, কত বিচিত্র তার রূপ, কত সুন্দর তার অভিব্যক্তি। সুতরাং যে দান অনন্ত অপরিসীম তার পরিমাপ করবার চেষ্টা করাও মূঢ়তা। আজ রবীন্দ্রনাথ নাই—কিন্তু যে দান তিনি অজস্রভাবে দুই হাতে বিলিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে আমাদের অনেক যুগ কাটবে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক বাঙ্গালার গদ্য ও পদ্যের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের গানের বন্যা পুরান অচলায়তনের গণ্ডী ভেঙ্গে বাঙ্গালা দেশকে প্লাবিত করে দিয়েছে—কত না বিচিত্র তার সুর—কখনো ভাবগম্ভীর গতিতে সংহত, কখনো মদিরোচ্ছল মূর্চ্ছনায় চঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক বাঙ্গালার সকল চিন্তার নায়ক—তিনি তাকে নূতন পথে পরিচালিত করেছেন—নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই আমরা শুনেছি ধ্যান-মৌন ভারতের চিরন্তন বাণী। ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে তিনিই বসিয়েছেন সম্মানের আসনে—তাঁর আদরের বাঙ্গালা ভাষা—তাঁরই লেখনীস্পর্শে প্রাদেশিক ভাষা হ'য়েও সকল সভ্য দেশের মর্য্যাদাসম্পন্ন ভাষার অন্যতম হ'য়ে বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বাড়িয়েছে। কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথ খেয়ালী ছিলেন না, শুধু কল্পনার মিথ্যা বিলাস তাঁকে কোনদিন পেয়ে বসেনি—তাই তিনি দেশের অভ্যুদয়ের পথের প্রথম পথপ্রদর্শক হয়ে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। পরিণত বয়সে তাঁর দেশ সংগঠনের বাণী আশ্রয় পেল শ্রীনিকেতনে। তিনি ছিলেন দেশের সৌন্দর্য্য সম্ভারের ভাণ্ডারী—যেমন তাঁর দেহের গঠন, তেমনি তার রঙ, তেমনি তার দৃষ্টি—দীর্ঘ ঋজু দেহ সুঠাম ও সুন্দর, আজানুলম্বিত যুগ্ম বাহুতে যে দশটি আঙ্গুল—সে যেন অগ্নিশিখা—তেমনি তাঁর কণ্ঠের স্বর—যেমন মধুর, তেমনি কঠোর। তাঁর মধ্যে চলিত অবিরাম সুন্দরের উৎসব—নিত্য নূতন তার ভঙ্গী—অভিনব সে উৎসবের

সূচনা ও সমাধি—বাঙ্গালী' সেই নিত্য উৎসারিত উৎসবের আনন্দ ধারাকে কৃতাঞ্জলিপুটে পান করেছে—এমন যে রবীন্দ্রনাথ কে তাঁর প্রতিভার সমগ্রতাকে অন্তরে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার শক্তি রাখে। কোন্ ভাষা দিয়ে কে তার বর্ণনা করবে—কোন আদর্শ দিয়ে তার পরিমাপ হবে, বিচার হবে? সেটা একান্ত অসম্ভব বলেই মনে হয়; সম্ভব হতে পারত এক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা, কিন্তু তাও ত সম্ভব নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে সম্যক্‌ভাবে তাঁর গুণ ব্যাখ্যান করে শোক প্রকাশ করা অসম্ভব হলেও, সেটা যে সমগ্র জাতির পক্ষে অনিবার্য্য—একথা আজও আমরা সকলেই বুঝছি এবং বুঝছি বলেই অসম্পূর্ণ হলেও, দোষত্রুটী থাকলেও আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি বাঙ্গালী জাতির সেই অনিবার্য্য একান্তকরণীয় ব্রত যাপনের জন্য। একথা রবীন্দ্রনাথের একজন সত্যকার ভক্ত তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছেন—

"No one can mourn the passing of Rabindranath as he mourned the demise of Satyendranata Dutt, nor can any one compose a salutation such as he himself offered to Arabinda Ghosh or Jagadish chandra Bose. To sum up Tagore or give voice to the nations grief at his passing, it would require Tagore's powers, yet no Indian can omit to pay his homage to the memory of



কবিগুরুর ভ্রাতুষ্পুত্র ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' সম্পাদনার সহকারী)

that world's unique man * * * * For over half a century the personality of Rabindranath brooded over Bengals' life like an omnipresence. Fromit radiated into ereery chamber of the country's mind and soul, ceaseless rays of sweetness and light while often, where it was stirred by some social crnelty or stung by some political insult,



রবীন্দ্রনাথের কন্যা মারা দেবী ও তাঁহার কন্যা

there coursed from it a dynamic spirit of Justice or Courage which vivified the people's whole existence. * * * * * Now by his passing a void is created which appears to be at once limitless and bottomless—"

(Calcutta Weekly Notes)

লেখক এই প্রসঙ্গে বলতে ভুলে গিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর স্মৃতিকেও বাঙ্গালা দেশে অমর করে গেছেন—

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

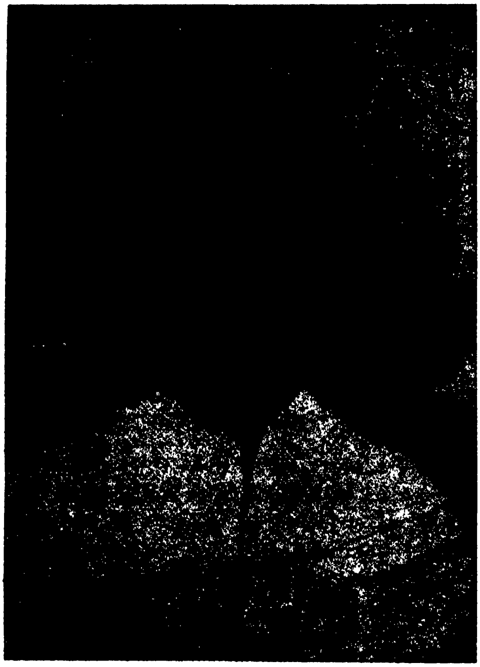
এই অবিস্মরণীয় কয়েকটী ছত্র বাঙ্গালী জাতির সম্পদ, বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ। এমন যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁকে অমর করার যোগ্য ভাষার অধিকারী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের অস্ত্রোপচারের দিন থেকে বাঙ্গালীর মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল—দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও আশঙ্কা ছিল সকলেরই—এবার বুঝি কবি আর বাঁচবেন না। কিন্তু কবি বেঁচে না উঠ্‌লে কি হবে একথা কেউ তখন আমরা ভেবে দেখিনি এবং তার অবকাশও তখন ছিল না—কারণ

সারাটা মন তখন উদগ্রীব হয়ে থাকত—কবি কেমন আছেন সেই খবরের জন্য অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না—যদিও তিনি নিজে চিরদিনই প্রস্তুত হয়েছিলেন।

'মৃত্যুঞ্জয়' নামক কবিতায় তিনি আঘাতের দেবতাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—

তুমি দুর্জ্জয়, তুমি নির্দ্দয়, ভেবেছিলাম—তোমার শাসনে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। দেখ্‌লাম তোমার তরঙ্গিত ভ্রুকুটিভঙ্গ আঘাত নেমে এল আমার



ভ্রাতুষ্পুত্র ৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাধনা সম্পাদনায় সহকারী)

বুকে। কিন্তু আঘাতের সঙ্গে তুমি নেমে এলে আমার কাছে, ভয় ভেঙ্গে গেল। তুমি আমার কাছে গেলে ছোট হয়ে।—কিন্তু

যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর মতো বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো—এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।

সত্যই তিনি সেই শেষ কথা বলে' চলে গেছেন—মৃত্যুকে তিনি যে জয় করে মৃত্যুর চাইতেও বড়ো হয়ে গেছেন তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে—অর্থাৎ ৩০শে জুলাই অস্ত্রোপচারের পরে সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সেদিন মুখে বলে যান।—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু,
কষ্টের বিকৃত ভাল, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার॥
যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥

মৃত্যু তাঁকে ভয় দেখিয়েছে বারে বারে—ভয়ের মুখোস পরে ; কিন্তু হার জিতের খেলা খেলতে খেলতে কবি ছিঁড়ে দিলেন তার মুখোস—কবি হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। "হবে হবে জয়, নাহি নাহি ভয়"—কবির ললাটে মৃত্যুঞ্জয়ের চন্দন তিলক তাঁর জয় ঘোষণাই করে গেল। মৃত্যুর চেয়ে আজ কবি বড় হয়ে আছেন, থাকবেনও চিরকাল, আমাদের 'সম্মুখে'—জগতের সম্মুখে।

রবীন্দ্রনাথ নাই—কিন্তু আমরা যুগ যুগ ধরে তাঁরই ভাষায় কথা কইব, তাঁর চিন্তাধারার আদর্শের সঙ্গে মিশে থাকবে আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাবুকতা, আমাদের আদর্শ। যে প্রতিভার ক্রমিক বিকাশ ও তার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আমরা দেখে এলাম এতদিন ধরে—তার অফুরন্ত সোনার ধান ছড়ান থাকল আমাদের চারিদিকে—যুগের পর যুগ চলে যাবে আমরা সেই শস্যসম্ভারের স্বর্ণকণা আহরণ করে যাব—অনাগত ভবিষ্যতের অক্ষয় ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদরূপে।

চন্দননগরে রবীন্দ্রস্মৃতি

শ্রীহরিহর শেঠ

বাঙ্গালীর মনোমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের হেম-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থেকে হয় ত যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উঠবেন ততদিনই প্রীতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত পুজিত হবেন। তা হলেও সাধারণ মানুষের কাছে আনুষ্ঠানিক বা ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের একটা আবশ্যক ও স্বার্থকতা আছে এবং যুগ যুগ



অধুনা লুপ্ত মোরাণ্ সাহেবের বাগানবাড়ী
গোন্দলপাড়া—চন্দননগর

হতে তা চলে আসবে। তাই আজও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গিয়াছেন --নবদ্বীপধাম ভক্তজনের কাছে পুণ্যভূমি। বিক্রমাদিত্য গিয়াছেন তাঁহার উজ্জয়িনীর রাজসভায় নবরত্নের স্মৃতি আজও জাগরূক রয়েছে। সেক্সপিয়র গিয়াছেন য়্যাভন্‌নদীর তীরে তাঁহার স্মৃতিপুরিত ষ্ট্যাফোর্ড নগরী তীর্থযাত্রি-সমাগমে এখনও মুখরা। জয়দেব গিয়াছেন তাঁহার জন্মভূমি কেন্দুবিল্বগ্রামে আজও জয়দেবের মেলা সমারোহেই অনুষ্ঠিত হয়। এই সব স্মৃতি রক্ষার দরকার হয়ত এখনকার জন্য যত না হোক, পরবর্ত্তী যুগের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য অধিক।

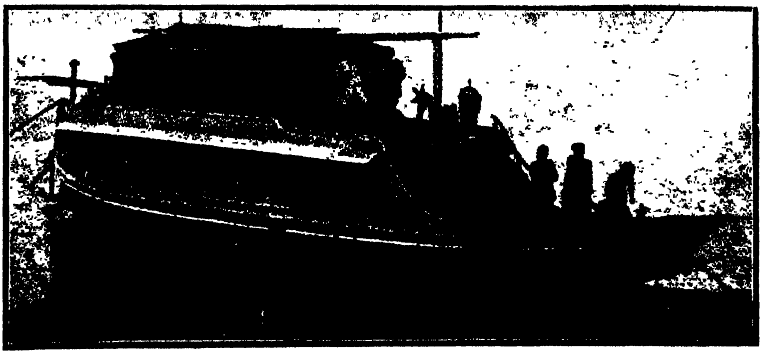
রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার বক্ষে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন এবং তথা হতেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর উদ্ভবে বাঙ্গালা ধন্য, ভারত ধন্য, বিশ্ব ধন্য। তাঁহার প্রতিভালোক-দীপ্তিতে সমগ্র জগন্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত, কিন্তু কলিকাতা যে গৌরবের অধিকারী তা বুঝি আর কারও নাই। কপিলাবস্তুর লুম্বিনির কানন শাক্যসিংহের উদ্ভবে ধন্য হয়ে আছে, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধত্বলাভে বুদ্ধগয়া আজ মহাতীর্থ। শ্রীচৈতন্যের উদ্ভবে নদীয়া গৌরবান্বিত, কিন্তু যে সকল স্থানে একটি বারের জন্যও তাঁর পাদস্পর্শ হয়েছে, ভক্তজনের কাছে আজও তাহা পুত পবিত্র। কবি স্কটসের বর্ণনা-চাতুর্য্যেই কত স্থান আজ তীর্থে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মাতৃক্রোড়ে জন্মলাভ করেছিলেন কলকাতায়—কিন্তু যা নিয়ে তিনি এত বড় মহামানব হয়েছেন, যদি তাঁর প্রথম পরিচয় হয় কবি, তাহলে ধূলিমলিন শত ত্রুটির আধার আমাদের বড় সাধের দীনা চন্দননগর আজ কি দুর্লভ গৌরবের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথই এ গৌরবের টিকা ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রথম কৈশোরেরও কাব্য সাধনার পরিচয় থাকলেও, তাঁর নিজের মুখের কথা—"যখন বালক ছিলেন তখন চন্দননগরে আমার প্রথম আসা। সে আমার জীবনের আরেক যুগ। সেদিন লোকের ভিড়ের 'বাইরে ছিলাম প্রচ্ছন্ন, কোন ব্যক্তি কোন দল আমাকে অভ্যর্থনা করেনি। কেবল আদর পেয়েছিলাম বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে।"

"সেই অতিথি-বৎসলা বিশ্বপ্রকৃতি তার অবারিত আঙিনায় সেদিন যখন বালককে বসালেন, তাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার বাঁশিটি বাজাও।' বালক সে দাবী মেনে ছিল।"

এইখানেই কবি তাঁর মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন,—

"এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।"

তিনি বলেছেন "এই জন্যই এত করে মনে পড়ে চন্দননগরের গঙ্গাতীর, সেই মোরাণের বাগানবাড়ীর উপরতলার খোলা ঘরটি। * * * সেদিনের দান দেবতার প্রত্যক্ষ দান, সে আমি আকাশে বাতাসে, বনের ছায়ায়, গঙ্গার কলস্রোতে পেয়েছি।" (১)



রবীন্দ্রনাথের বজরা

রবীন্দ্রনাথের ভুবনমোহিনী বংশীধ্বনির প্রথম সুর উঠেছিল এইখানেই, এখানকার গঙ্গা, এখানকার আকাশ বাতাস তরুরাজি তাঁকে প্রথম আদর

(১) বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ৪১৭ পৃষ্ঠা।

অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তিনি অন্যত্র আরও বলেছেন—"বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবি জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন।"

"সেটা হল প্রথম বয়স। তখন বাণী ফোটেনি, সুর বেরোয়নি। তার কিছুকাল পরে আমি মোরাণ সাহেবের বাগানে আতিথ্য গ্রহণ



চন্দননগরে কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষামন্দিরে বসিয়া
কবিতা রচনারত রবীন্দ্রনাথ
২১শে বৈশাখ, ১৩৩৪

করেছিলাম। গঙ্গাতীরের উপর সেই হর্ম্মের আলিন্দে ও সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমি অনেক রাত্রি কাটিয়েছিলাম এবং আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেলা। মনে করেছিলাম যেন বিশ্ব কত কাছে নেমে এসেছে। তখনই আমার কবি জীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।" (২)

বিশ্বকবির কাব্য-সাধনার প্রথম সূচনা এখানে, এইখানেই তাঁহার কবিজীবনের উদ্বোধন হয়েছিল এবং তাহাই তাঁহার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন। দেবতার প্রত্যক্ষ দান এখানকার প্রকৃতিই তাঁকে দিয়েছিলেন, কবির একথা চন্দননগরবাসী কোন দিন ভুলতে পারবে না, চিরদিন তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। কালের স্রোতে আজ মোরাণ সাহেবের সেই প্রাসাদসম উচ্চচূড় সম্বলিত সৌধ বিলীন হয়েছে, কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথের গঙ্গা আজও তেমনই কুলু কুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হয়, সমীর নিস্বনে তরুরাজি আজও তেমনই মর্ম্মরিয়া গান গায়, পাখির কূজন আজও নরনারীর হৃদয় তেমনই বিহ্বল করে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রিয় কবি—যাঁর বাঁশির রব ভুবনকে মোহিত করেছে তার প্রথম মূর্চ্ছনা এইখানেই উঠেছিল। সে বাঁশি আজ নীরব। কিন্তু চন্দননগর তাঁর স্মৃতি চিরদিন বুকে ধরে থাকবে। তার এ গৌরব গরিমার অধিকারী আর কেহ কখন হতে পারবে না।

রবীন্দ্রনাথ এই গঙ্গার চির-উপাসক। তিনি বিভোর হয়ে এই গঙ্গার করুণ কলধ্বনি শুনতেন। কৈশোরের চন্দননগরের প্রতি যে আকর্ষণ বার্দ্ধক্যেও তা হ্রাস পায় নাই। এখানে জাহ্নবী তীরে কোন বাটিতে বা জাহ্নবী বক্ষে তাঁহার বজরায় ইদানিং প্রায়ই বৎসরের মধ্যে কিছু দিন কাটাইয়া যাইতেন। তিনি এখানকার গঙ্গার কথায় তাঁর জীবন-স্মৃতিতে বলেছেন,—"এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেষণ হইয়া থাকে।" সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন করতে এসে তিনি আমায় বলেছিলেন—"দিন কতক তোমার গঙ্গার ধারের বাড়ীতে এসে থাকব।" তারপর হতে তাঁর শরীর পর পর প্রায়ই খারাপ হতে থাকায় আমাদের সে সৌভাগ্যলাভ আর ঘটে নাই। আমরা দীন হীন মূঢ়, তাঁর চন্দননগর প্রীতির কথা—তিনি যখন এখানে বাস করতেন, তখন সম্যক উপলব্ধি করে তাঁর সাক্ষাৎ পূজার আয়োজন করতে পারি নাই। আমাদের এ দুঃখও কোন দিন যাবে না। তাঁর চন্দননগর প্রীতির সম্পর্কে এই আলোচনায় হয়ত শক্রর হিংসার উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যায় দীনের কাছে এ যে অমূল্য সম্পদ। আমরা যে দিন শান্তি-নিকেতনে তাঁর কাছে সম্মিলন উদ্বোধনের জন্য নিমন্ত্রণ করতে যাই, সে দিন কতকটা এই সম্পদের বলেই যেতে সাহসী হয়েছিলাম। সেদিন রচনা-নিরত একটি ছোট ঘরে যখন কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাঁর দেশবাসীর উপর অভিমানসঞ্জাত কত মর্ম্মস্পর্শী মৃদু তিরস্কারই না শুনাইলেন! কিন্তু সেই বার্দ্ধক্যপীড়িত দুর্ব্বল দেহেও শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কি নিরাশ করতে পেরেছিলেন! নানা কথার পর পরিশেষে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধীরে কি মধুর কণ্ঠেই না বললেন—"আমি তোমাদের ওখানে যাব, কিন্তু যতদিন না যাচ্চি এখন এ কথা প্রচার কোরো না।"

তাঁর স্বভাব শিশুর মতই ছিল সরল। তিনি কত বড় লোক, যাঁর সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণের জন্য রাজচক্রবর্ত্তীও ব্যাকুল, কিন্তু কি স্নিগ্ধ মধুর ছিল তাঁর প্রকৃতি। তিনি যেখানেই যেতেন, তাঁর হাতের লেখা একটু পাবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদল তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত। মনে পড়ে এক দিনের কথা, ১৩৩৪ সালের ২১শে বৈশাখ, যেদিন তিনি অনুগ্রহ করে এখানকার কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরে পদ-ধূলি দিয়াছিলেন, সে দিনও অনেক ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীকে সভীতি আগ্রহাকুল নয়নে ছোট ছোট খাতাগুলি

(২) চন্দননগর বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন উদ্বোধন—অভিভাষণ।

নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখে তিনি নিজেই সস্নেহে তাঁদের ডেকে একে একে একটী করে স্বাক্ষর করে দিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের আব্দার হল—"শুধু নাম নয় আমাকে দুলাইন কবিতা লিখে দিতে হবে" একটু মৃদু হেসে তৎক্ষণাৎ তাঁর খাতাখানি নিয়ে লিখে দিলেন,—

"বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে
নামুক তাহারি মন্ত্র লেখনীর পরে।"

ভাববার জন্য তিনি পুরা একটি মিনিটও সময় নিয়েছিলেন বলে মনে হচ্চে না।

রবীন্দ্রনাথ অমর, তাঁর মৃত্যু নাই। মাত্র তাঁর নশ্বর দেহ সেদিন জাহ্নবীতটে চিতার আগুনে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। আমরা আর তাহা কোন দিন দেখতে পাব না, কিন্তু বাঙ্গালী গর্ব্বোন্নত হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি চিরদিন বহন করবে, তাঁর মহিমা তাঁরই দেওয়া ছন্দে গাহিবে।

কাছে ও দূরে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

এমন করিয়া না হারা'লে পরে পেতাম কি তব দেখা?
এমন করিয়া না ঠেকিলে কভু হ'ত কি সত্য শেখা!
চোখের সমুখে ছিলে যতদিন, চোখ দু'টো ছিল ভুলে',
আড়ালে সরিয়া একেবারে তুমি দাঁড়ালে মর্ম্মমূলে!

সাক্ষাতে ছিল সঙ্কোচে-ভরা কত সন্দেহ ভয়,—
পলকে-পলকে ঝলকিত মনে পরাজয়-পরিচয়;
গুরুত্ব তব দূরত্ব হয়ে পায়ে-পায়ে দিত বাধা,
চিত্তে যে সুর ফুটিতে চাহিত, সে সুর হ'ত না সাধা।
তোমার মাঝারে, স্বামি,
আপনা ভুলিয়া মূঢ় বিস্ময়ে হারায়ে যেতাম আমি!

আজ তুমি দূরে,—কোন্ সুরপুরে এল তব আহ্বান,—
স্বর্গসভায় শুনা'তে হবে-বা মর্ত্ত্য-ব্যথার গান!
একঘেয়ে সুখে দেবতার বুঝি লাগেনাক আর ভালো,
তাই চাহে তারা ধরার রবির শ্রাবণ-মেঘের আলো!

ভালোই হয়েছে—চিরসুখে সেথা থাকুক ধরার কবি,
"গগনে গগনে নব নব দেশে" জাগুক মোদেরই রবি!
ধরণীর বুক যতই ফাটুক, যতই ঝরুক আঁখি,
সাধ শুধু মনে, শুনিতে গোপনে—সেথাকার কথাটা কি!
তোমারে হারায়ে, স্বামি,
এতদিনে আজি স্বরূপ তোমার চিনেছি জেনেছি আমি।

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

(একুশ)

তরুণ স্বপ্নপ্রবণ ছেলেটির মনে সমস্ত দিনটাই ওই কবিতাটির কয়েকটি লাইন অহরহ গুঞ্জন করিয়া ফিরিল—

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে'
'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়'।

সমগ্র বাংলাদেশ যেন আজ এই পল্লীটির ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে রূপায়িত হইয়া একমুহূর্তে তাহার ঘরে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে—প্রতি মানুষটি হইয়া উঠিয়াছে ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জন—পরমাত্মীয়। সহরের ছেলে সে। শৈশব হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জীবন কাটিয়াছে সহরে; আটক-আইনে গ্রেপ্তার হইয়া প্রথম কিছুদিন ছিল জেলে, তারপর কিছুদিন ছিল বিভিন্ন জেলার সদর অথবা মহকুমা সহরে; সেখানে অবশ্য পল্লীর আভাষ আছে—সে আভাষ—তৈলচিত্রের রঙের প্রলেপের নীচের কাপড়ের মত, ইঙ্গিত আছে কিন্তু কোন প্রভাব নাই। পল্লীতে অন্তরীণ হইবার সংবাদে সে শঙ্কিত হইয়াছিল, প্রতিবাদও জানাইয়াছিল—কিন্তু আজ আসিয়া প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত্তেই সে আশ্বস্ত হইল, পরম স্নেহস্পর্শ অনুভব করিল। নিরুপায় বন্দী-জীবনের দুঃখ যতই হাসিমুখে মানুষ উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করুক, অন্তরতম মনে গোপনে দুঃখ কিন্তু থাকিয়াই যায়। সেই দুঃখের মধ্যে কল্পনাতীত সান্ত্বনা পাইয়া যতীন আজ ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে।

একে একে সমস্ত গ্রামখানির লোক আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গিয়াছে। দেবুর পর প্রৌঢ় হরিশ আসিয়াছিল—ভবেশও তাহার সঙ্গে ছিল, গাঁজাখোর গদাইপাল, কালিপুরের দোকানী বৃন্দাবন দত্ত, তারা নাপিত, গিরীশ ছুতার একে একে আসিয়াছিল সকলেই। গ্রামের বাউরী-পাড়া মুচীপাড়ার লোকগুলি কথা বলিয়া আলাপ করিতে ভরসা পায় নাই, তবে বাড়ীর সম্মুখ দিয়া অকারণে যাওয়া-আসা করিয়া দেখিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য বধূ ও ঝিউড়ী মেয়েগুলিও দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছে। সকলের শেষে অপরাহ্নের দিকে আসিল বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী। অভ্যাসমত ঠুক ঠুক করিয়া লাঠির মৃদু শব্দ করিতে করিতে আসিয়া ঈষৎ হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল—প্রণাম!

যতীন একেবারে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—একি—আপনি একি করছেন? আপনি—

বাধা দিয়া অল্প হাসিয়া চৌধুরী বলিল—শালগ্রামের ছোটবড় নাই বাবা। আপনি ব্রাহ্মণ।

কৈফিয়ৎটা যতীনের পছন্দ হইল না; কিন্তু সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে তাহার বড় ভাল লাগিল। প্রতিনমস্কার করিয়া সে বলিল—না—না—না। ওসব যেকালে চলত সেকাল চলে গেছে। আপনি বয়সে আমার বাপের চেয়েও বড়। আপনার প্রণাম কি আমি নিতে পারি?

হাসিটি চৌধুরীর ঠোঁটের ডগায় লাগিয়াই থাকে। হাসিয়া বলিল—কাল নতুনই বটে বাবা। কিন্তু আমরা যে সে কালের মানুষ—অকালের মত পড়ে আছি একালে; বিপদ যে সেইখানে।

বৃদ্ধের কথা কয়টি যতীনের বড় ভাল লাগিল। যাহাদের সে দেখিয়াছে তাহারা সহরের বৃদ্ধ। তাহাদের সহিত ইহার মিলের চেয়ে অমিলই বেশী, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হাসিয়া যতীন বলিল—সে-কালের গল্প বলুন আপনাদের।

—গল্প? হ্যাঁ, সে-কালের কথা এখন গল্প বৈ কি বাবা। আবার ওপারে গিয়ে যখন কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা হবে—তখন এ-কালের কথা বললে সেও তাঁদের কাছে হবে গল্প। সে-কালে আমরা গাই বিয়োলে দুধ বিলোতাম, ক্রিয়াকর্ম্মে বাসন বিলোতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, সরোবর দীঘি কাটাতাম--সেও আজ আপনাদের কাছে গল্প—আর আজকের আকাশে উড়ো-জাহাজ, জলের তলায় ডুবোজাহাজ, বেতারে খবর আসা, টাকায় আটসের চাল, বছর বছর শুকো, হরেক রকমের ব্যামো—রণজ্বর, পেলেগ—এও সে-কালের লোকের কাছে গল্প। আরও একটু হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল—আমরা আর সে-কালের গল্প ছাড়া বলবই বা কি? আপনি তো রইলেন, শুনবেন সে-কালের গল্প। আপনার কাছে এ-কালের গল্প শুনব।

যতীন চুপ করিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার আজকার ভাব-প্রবণ মন ওই কথা কয়টিতে আবার আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বৃদ্ধ চৌধুরীই আবার হাসিয়া সবিনয়ে বলিল—আমাদের কথা তো আপনারা বুঝবেন গো। কিন্তু আপনাদের কথা আমরা যে বুঝতেই পারি না। আচ্ছা-বাবা, আপনারা যে এত সব হাঙ্গামা করছেন—স্বদেশী হাঙ্গামা, বোমা—পিস্তল, এ সব কেনে করছেন? ইংরেজ রাজত্বকে তো চিরকাল আমরা রাম-রাজত্ব বলে এসেছি গো!

যতীনের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল টর্চলাইটের আলোর মত প্রদীপ্ত তীব্র দীপ্তিতে এক মুহূর্ত্তে। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু সে দীপ্তি নিভিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল—বোমা-পিস্তল আমি দেখিনি। তবে হাঙ্গামা যে করছে—তার কারণ হচ্ছে আপনাদের কালকে ওরা নষ্ট ক'রেছে ব'লে।

ঘরের ভিতর একটা ধাতুপাত্রের শব্দ হইতেই যতীন ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিল—শীর্ণ দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি ধূমায়মান জলপূর্ণ একটা কাঁসার বাটি মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া সকালের মত সেই ঝকমকে চোখের দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাটিটির পাশে একটি এ্যালুমিনিয়মের বাটিতে দুধ, চায়ের কৌটা। চোখে চোখ পড়িতেই পদ্ম ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতীন কিন্তু পরম বিস্ময় বোধ করিল। তাহার চায়ের প্রয়োজন ওই মেয়েটি অনুভব করিল কেমন করিয়া?

চা তৈয়ারী করিয়া সে একটি কাপ চৌধুরীর সম্মুখে নামাইয়া দিল। চৌধুরী হাসিয়া বলিল—চা তো আমি খাই না বাবা। আমরা সে-কালের লোক, আমাদের অভ্যেস ছিল ধারোষ্ণ দুধ খাওয়ার। কিন্তু; চৌধুরী ম্লান হাসিয়া বলিল—এখন কচি-কাঁচাতেই দুধ পাচ্ছে না বাবা—তা' আমরা!

হরেন্দ্র ঘোষাল সেই মুহূর্ত্তেই আসিয়া পৌছিল। চৌধুরী কাপটি তাহাকেই অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—খান গো, ঘোষাল মশায়।

ঘোষাল চায়ের কাপটি তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটা চুমুক দিয়া বলিল—fine! first class! জগন ডাক্তারের বাড়ীতে চা হয় যেন পাঁচন।

চৌধুরী বলিল—ঘোষাল মশায়ও আমাদের ভারী স্বদেশী বুঝলেন! আপনার সে টুপীটা কি হ'ল গো ঘোষাল মশায়? ঘোষাল অত্যন্ত চটিয়া উঠিল ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—দেশটা উচ্ছন্ন দিলে মেয়েতে। বুঝলেন! uneducated স্ত্রীলোক-সব! আমার মা করেছে কি জানেন সেটাকে নিয়ে, হরিনামের ঝোলা ছিঁড়ে গিয়েছিল, তা টুপিটার মুখ সেলাই ক'রে পাশ কেটে ঝোলা বানিয়ে নিয়েছে।

—টুপী কেটে হরিনামের ঝোলা? কি টুপী? সবিস্ময় কৌতুকে যতীন প্রশ্ন করিল।

গম্ভীর হইয়া ঘোষাল উত্তর দিল—গান্ধী ক্যাপ। নন-কো-অপারেশনের সময় আমিও কাজ ক'রেছি মশায়।

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—নেশাখোর দিগে শশব্যস্ত লাগিয়ে দিয়েছিলেন ঘোষাল। ব্রাহ্মণের ছেলে—হাড়ি ডোম চণ্ডালের পায়ে ধরতে কসুর করেন নি।

ঘরের ভিতর হইতে একঝলক আলো দ্বারপথে বাহিরে আসিয়া পড়িল। যতীন ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল—পদ্ম তাহার লণ্ঠনটি জ্বালিয়া আনিয়া দুয়ারের কাছে নামাইয়া দিয়াছে। কাঁচটি মোছা হইয়াছে, পলিতাটি কাটিয়াছে, লণ্ঠনের ফ্রেমটি পর্য্যন্ত সযত্ন মার্জ্জনায় ঝকমক করিতেছে।

চৌধুরী আলোর ঝলক দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল—আবার একটি প্রণাম করিয়া বলিল—চল্‌লাম তা'হ'লে। সন্ধ্যে হয়ে গেল। আপনি এসেছেন, মহাভাগ্যি আমাদের! যাবেন দয়া করে আমার কুঁড়েতে।

যতীন বলিল—যাব, যদি এমন করে প্রণাম না করেন।

একথার কোন জবাব না দিয়া চৌধুরী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। চায়ের কাপটি নামাইয়া দিয়া ঘোষাল বলিল—আপনার কাছে কিন্তু একটি earnest request আছে।

—কি বলুন!

ফিস ফিস করিয়া ঘোষাল বলিল—বোমার ফরমুলাটি আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

যতীন হাসিয়া ফেলিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ঘোষাল বলিল—my earnest request!

যতীন হাসিয়াই উত্তর দিল—আমি জানিনা হরেন্দ্রবাবু।

হরেন কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি উঠলাম তা'হ'লে।

যতীন একা বসিয়া রহিল।

বড় বড় গাছগুলির বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার তলে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লী। মানুষের সাড়া ইহারই মধ্যে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা সাড়া পাওয়া যায়, তাহার পর সব স্তব্ধ। দূরে বাউরী ও মুচিপাড়ায় ঢোল বাজিতেছে, মত্ত জড়িত কণ্ঠে গান জুড়িয়াছে। গত কালের বৃষ্টির পর আকাশ আজ উজ্জ্বল কৃষ্ণাভ নীল; তারাগুলি আজ পূর্ণ দীপ্তিতে ঝকমক করিতেছে। মানুষের সাড়া স্তিমিত, কিন্তু চারিপাশে অসংখ্য কোটী পতঙ্গের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এখানে ওখানে আজও দুই একটা ব্যাঙ থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছে। কোথায় কোন উঁচু গাছের ডালে বসিয়া মধ্যে মধ্যে কর্কশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিতেছে একটা পেঁচা। গাছের কোটরে থাকিয়া অপরিণত কণ্ঠে অবিরাম শিষ দেওয়ার মত শব্দ করিয়া ডাকিতেছে শাবকের দল। অন্ধকার শূন্যপথে কালো ডানা সশব্দে আস্ফালন করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে বাদুড়। চৈত্রশেষের ঝিরঝিরে বাতাসে ফুলের গন্ধের অরূপ সম্ভার!

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে পল্লীটা যেন হারাইয়া যাইতেছে। বাউরী পাড়ার গান বাজনা থামিয়া গেল। এইবার উহাদের ঘুমাইবার সময় হইল। সম্মুখেই রাস্তার ও-পাশে ছোট-বড় গাছের আড়ালে ছোট ডোবাটায় কেরোসিনের ডিবি হাতে দুটি মেয়ে বাসন ধুইতে নামিয়াছে। তাহারা চলিয়া গেল। আকাশে নক্ষত্র, গাছের গায়ে আশে-পাশে সঞ্চরমান জোনাকীর দীপ্তি ও যতীনের পাশের লণ্ঠনটা ছাড়া আর আলো নাই। যতীন নিজের লণ্ঠনটাও একেবারে কমাইয়া আড়ালে রাখিয়া দিল। পল্লী তাহার কাছে নূতন। দিনের পল্লীর সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছে; সে-পরিচয়ের ফলে তাহার কিশোর মন ভাবপ্রবণ হইয়াছিল; সেই ভাবপ্রবণতার আবেগেই সে রাত্রির পল্লীর সঙ্গে পরিচয় করিতে বসিল। এই প্রগাঢ় দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে নিস্তব্ধ নিথর পল্লীটার সমস্ত ভঙ্গির মধ্যে নিতান্ত অসহায় শিশুর মত আত্মসমর্পণের ভঙ্গি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে পড়িয়া গেল নগর। মহানগরী কলিকাতা। দিনের আলো—রাত্রির অন্ধকারের প্রভাব সেখানে মানুষের উপর কতটুকু? দিনে সেখানে আলো জ্বলে। পথের পাশে পাশে আলো—আলো—আলো। মানুষের তপস্যায় ক্রুদ্ধ চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার মহানগরীর দ্বার দেশে অবশ তনুর মত অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মোড়ে মোড়ে বিটের প্রহরী জাগ্রত চক্ষে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করে মানুষ জাগিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ—মোটরের গর্জ্জন জানাইয়া দেয়—চলিয়াছে আমার গতি—স্তব্ধ হয় নাই!

অদ্ভুত পল্লীগ্রাম। সমাজ গঠনের আদিকাল হইতে ঠিক যেন একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, স্থাণুর মত। শহরের পর শহর গড়িয়া জীবন রথে বেগবান অশ্বের মত—একের পর এক অশ্ব নিয়োগ করিয়া চলিয়াছে, তবু কি সে নড়িয়াছে? মাটী যেন চাকাগুলাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মনে পড়িয়া গেল একটা কথা—Indian Economicsএ সে কথাটা পাইয়াছিল—Sir Charles Metcalf বলিয়া গিয়াছেন,—They seem to last where nothing else lasts." অদ্ভুত! Dynasty after dynasty tumbles down; revolution succeeds revolution; Hindu. Pathan, Mogul, Mahratta, Sikh, English are masters in turn, but the village community remains the same." This union—"

সহসা কে ডাকিল। চিন্তায় বাধা পড়িল।

—বাবু!

—কে? যতীন আলোটা বাড়াইয়া দিল। ওবেলার সেই মুচীদের মেয়েটি। এখন আর মুচীর মেয়ে বলিয়া কোন মতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না! পরিচ্ছন্ন প্রসাধনে—বেশভূষায় ভদ্র ঘরের কিশোরী মেয়ে বলিয়া ভ্রম হয়! যতীনের ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ কঠিন স্বরেই প্রশ্ন করিল—কি?

—আজ্ঞে, কামার বউ বলছে, উনোন ধরিয়ে দেবে—রান্না-বান্না—;

—রান্না-বান্না! ও! বল, উনোন ধরাতে বল!

—কি রান্না করবেন?

—রুটি তৈরী করে নেব খানকয়েক।

—ময়দা যদি বার ক'রে দিতেন, তবে মেখে দিত কামার-বউ।

—ময়দা মেখে দেবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

খানিকটা ভাবিয়া লইয়া যতীন বলিল—তবে ওই সিধের ডালায় আছে নিতে বল। পাঁচ-ছ'খানা রুটির মত—আন্দাজ ক'রে নিতে বল।

দুর্গা চলিয়া গেল।

যতীন আবার বসিল। সে ভাবিতে আরম্ভ করিল—এই গৃহের গৃহিণী ওই দীর্ঘাঙ্গী—অবগুণ্ঠনাবৃতা মেয়েটির কথা—পদ্মের কথা। কথা বলে না—অথচ সে আসিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার সকল কাজগুলি করিয়া যাইতেছে। প্রতি কাজের মধ্যে অপূর্ব্ব নিষ্ঠার মাধুর্য্য। সযত্ন অবগুণ্ঠনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, মুখ পর্য্যন্ত দেখা যায় না, দেখা যায় দুটি শুভ্র দীপ্ত আয়ত চোখ—সে চোখে বিচিত্র উজ্জ্বল অসঙ্কোচ দৃষ্টি। দৃষ্টির ওই সঙ্কোচহীনতার মধ্যেই আছে যেন এক পরমস্বস্তি; সেইটাই যতীনের কাছে আশ্চর্য্য অথচ পরম প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। সেবা লইতে অনধিকারের অপরাধ বোধ করা যায় না। গাছ-পালার পল্লব গুণ্ঠনে ঢাকা এই পল্লীটির রূপের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে তাহার যেন মিল আছে।

দুর্গা আবার আসিয়া দাঁড়াইল।

এ মেয়েটিও অদ্ভুত। রহস্যময়ী—কিন্তু এ গৃহের গৃহিণী পদ্মের মত রহস্য তাহার এত গভীর নয়।

দুর্গা ডাকিল—আসুন।

—হয়ে গেছে সব?

দুর্গা যেন আর একটি মানুষ হইয়া গিয়াছে, সে কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।

যতীন উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—তাহার বিছানাটি পরিপাটি করিয়া পাতা, মশারীটি পর্য্যন্ত খাটানো; চারিটি কোন সমান করিয়া চমৎকার খাটানো হইয়াছে।

যতীনের দৃষ্টি বিছানার দিকে দেখিয়া দুর্গা প্রশ্ন করিল—ঠিক হয় নাই?

হাসিয়া যতীন বলিল—বাঃ চমৎকার হয়েছে।

দুর্গা হাসিল। এ কাজটি সে করিয়াছে।

রান্নার স্থানে আসিয়া যতীন দেখিল—রুটিগুলি গড়া পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, তরকারীর জন্যে কিছু আলু পটল কোটা রহিয়াছে, নিকানো পরিষ্কার উনানে আগুন জ্বলিতেছে; পাশে তাওয়া, কড়াই, তেল, নুন, মশলা, হলুদ সব থরে থরে সাজানো।

বাড়ীর চারিদিকে চাহিয়া যতীন দেখিল ওদিকের ঘরখানার দাওয়ার উপর আলোর সম্মুখে বসিয়া আছে অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্ম। সম্মুখের আলোর এক ফালি রশ্মি অবগুণ্ঠনের সঙ্কীর্ণ পথে তাহার মুখের খানিকটা অংশে পড়িয়াছে। তাহার চোখে সেই উজ্জ্বল অসঙ্কোচ দৃষ্টি।

যতীন উনানশালে বসিয়া পড়িল।

দুর্গা অকারণে কতকগুলা কৈফিয়ৎ দিল।—কামার-বউ আমার মিতেনী বাবু। বেচারা একা থাকে, ছেলেপুলে নাই; তার ওপর রোগা মানুষ। তাই আমি আসি।

যতীন কথার জবাব দিল না, দিবার অবসরও ছিল না; উনানের আঁচটা বড় প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

—কাঠখানা বার ক'রে দেন বাবু! একটুকুন জল ছিটিয়ে দেন বরং।

যতীন তাই করিল।

—কত সকালে দুধ চাই বাবু? চা খাবেন তো?

এবার হাসিয়া যতীন বলিল—সকালের চায়ের দুধ আমি রেখে দি। সে প্রায় ভোর বেলা। তোমার গাই যখন দোয়া হবে তখনই দিয়ো।

দুর্গা চলিয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া যতীন বাড়ীর ভিতরের সহিত সংযোগের দরজাটা বন্ধ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। একেবারে দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা মূর্ত্তি। সেও স্থির নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যতীনই কয়েক পা পিছাইয়া আসিল।

মূর্ত্তিটি নত হইল; হেঁট হইয়া অর্দ্ধেকটা দেহ বাড়াইয়া নীরবে একখানি পাখা মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া নীরবে ধীরপদে চলিয়া গেল।

বাইশ

—বাবু!

ভোর বেলাতেই উঠিয়া যতীন ভাবিতেছিল—চা কেমন করিয়া খাইবে! স্পিরিট নাই—ষ্টোভ ধরাইবার উপায় নাই। কেরোসিন দিয়া ষ্টোভটা ধরাইতে গিয়া বার বার তেল উঠিয়া পড়িল। এই সময়েই বাহিরে কে ডাকিল—বাবু!

দরজা খুলিয়া যতীন দেখিল দুর্গা। ছোট একটি বাটিতে খানিকটা সফেন টাটকা দুধ। হাসিয়া নতমুখে দুর্গা

বলিল—ছাগলের দুধ। কেউ তো খায় না। আপনার চায়ের জন্তে নিয়ে এলাম।

যতীন খুসী না হইয়া পারিল না। বলিল—বাঃ চমৎকার হবে। এর জন্তে তোমায় একটা ক'রে পয়সা দেব। এখন এক কাজ করতে পার? বাড়ীর ভেতর থেকে কাঠ কুটো দেখে উনোনটা ধরিয়ে দিতে পার?

—কামার বউ এখনও ওঠে নাই বুঝি? দুর্গা ঘর খুলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। উনানটি ধরাইয়া দিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। যতীন বলিল—পয়সাটা নিয়ে যাও।

—না বাবু। ও দুধ এক পয়সা কেনে—এক ছিদেমেও কেউ নেয় না। ওর পয়সা কি নিতে পারি! সে সবিনয়ে মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েটির প্রীতি ও আনুগত্য বড় স্বচ্ছন্দ এবং আন্তরিক, যতীনের ভাল লাগিল। এই ভোরে সে ছাগলের টাটকা দুধ লইয়া আসিয়াছে। চা খাইয়া যতীন বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। রোজ তাহাকে একবার করিয়া থানায় হাজিরা দিতে হইবে। ময়ূরাক্ষীর ও-পারে জংসন সহরে এখানকার থানা। এই সকালেই সে হাজিরা দেওয়ার কাজটা সারিয়া আসিবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণও হইয়া যাইবে।

পাখীদের উষার কলরব শেষ হইয়াছে। কাকগুলো বিচ্ছিন্নভাবে এদিকে ওদিকে উড়িয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে একটা দুইটা ডাকিতেছে। ঝোপের মধ্যে কোন ছোট পাখী 'চিক্' 'চিক্' শব্দে সাড়া তুলিয়াছে; দূরে কোন আমের ডালে বসিয়া ক্রমোচ্চ স্বরে তান ধরিয়া ডাকিয়া চলিয়াছে কোকিল; 'চোখ গেল' পাখী। পথের দুই পাশে ঝোপে-ঝাড়ে নানা বর্ণের নানা আকারের কত ফুল। আশে পাশে ডোবাগুলিতে মেয়েদের ভিড়, বাসন মাজিতে ব্যস্ত। কিন্তু পুরুষ কাহারও দেখা মিলিল না।

যতীন আসিয়া মাঠে পড়িল।

সেদিনের বৃষ্টির পর রোদ পাইয়া মাটির 'বতর' হইয়াছে—কাদার আঠা মরিয়া চাষের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, লাঙ্গলের ফাল নরম কোমল সিক্ততার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া চিরিয়া চলিবে নিঃশব্দে, নির্বিঘ্নে, স্বচ্ছন্দ গতিতে—ছানার তালের মধ্যে ধারালো ছুরীর মত, বড় বড় মাটির চাঁই দুই পাশে উল্টাইয়া পড়িবে, অথচ এতটুকু কাদামাটি লাঙ্গলের ফালে লাগিবে না। সামান্ত আঘাতেই মাটির চাঁইগুলা ভুরার মত গুঁড়া হইয়া এলাইয়া পড়িবে। গরু মহিষগুলি চলিবে অবহেলে ধীর মন্থর গতিতে। এই কর্ষণের মধ্যে চাষীর বড় আনন্দ, বড় আরাম তাহারা অনুভব করে, অন্তরে তাহাদের যেন রসক্ষরণ হয়। যতীন দেখিল মাঠে কেবল হাল গরু আর মানুষ। সম্রান্ত চাষীরা মাঠের আইলের উপর দাঁড়াইয়া হুকা টানিতেছে; কৃষাণে হাল বহিতেছে—চাষীরা দেখিতেছে ফাঁকি দিয়া মধ্যে মধ্যে মাটি অকর্ষিত রাখিয়া যাইতেছে কি না। শ্রীহরির সঙ্গেও দেখা হইল। সেও মাঠে আইলের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। দন্তহীন মুখে হাসিয়া সম্ভাষণ করিয়া বলিল—আমার অশৌচ, প্রণাম করতে তো নাই।

যতীন মৃদু হাসিয়া বলিল—প্রণামে প্রয়োজনই বা কি—

বাধা দিয়া জিভ কাটিয়া শ্রীহরি বলিল—ও কথা বলবেন না, আপনি ব্রাহ্মণ, গোখরোর জাত আপনারা, বাপরে!

—আর এখন গোখরো নয়, বিষ গিয়েছে। ঢোঁড়া বলতে পারেন।

—তা হ'লে আমরাও গরু হয়েছি। জানেন তো গোখরোতে যদি গরুকে দংশায়, তবে গরু মরে না—কিন্তু ঢোঁড়া ছুলেই সর্ব্বনাশ।

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই এবারেই আমার একটা দামী হেলে—এই যে এইটার জোড়া, মরে গেল।

সম্মুখেই একখানা বড় ক্ষেতে শ্রীহরির চারখানা হাল জমি কর্ষণ করিতেছে। হেলেগুলি হৃষ্টপুষ্ট সবলকায়, আকারেও প্রকাণ্ড বড়। যতীন প্রশ্ন করিল—এগুলি সব আপনার নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের আশীর্ব্বাদে—আমারই। হাসিতে শ্রীহরির মুখ ভরিয়া উঠিল।

অকপট আনন্দেই যতীন বলিল—চমৎকার গরুগুলি, দেখলে চোখ জুড়োয়।

শ্রীহরি বলিল—এ মাঠে যত বাকুড়ি সাহী জমি দেখবেন সব আমার। বাকী যা অন্য লোকের আছে, অন্ততঃ এ দুখানা গাঁয়ের লোকের, তারও অর্দ্ধেক আমার কাছে বাঁধা রয়েছে।

যতীন শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনিরুদ্ধ



শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখার্জী। মান্দ্রাজ আর্ট স্কুল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

হইতে জগন ডাক্তার—হরেন্দ্র ঘোষাল পর্য্যন্ত সকলেই এই লোকটি সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়াছে। লোকটি নিজেও অকপট দাম্ভিকতার সহিত বলিতেছে দু'খানা গ্রামের অর্দ্ধেক জমি তাহার নিকট বাঁধা পড়িয়াছে। আগে নাকি লোকটি ছিল সরীসৃপের মত। রাত্রির অন্ধকারে লোককে দংশন করিয়া ফিরিত। এখন সে হিংস্র শ্বাপদের মত নির্ভীক দম্ভে গর্জ্জন করিয়া আক্রমণ ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীহরিই আবার বলিল—আপনার থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে। তা' আর এই মাসখানেক। মাসখানেক পরেই—আমার বাইরের ঘর আমি ঠিক ক'রে দোব।

—না-না, কোন কষ্ট নাই আমার—

—কিন্তু ওই লোকটা—ওই কামারটা ভয়ানক পাজী! আমার নামে বোধ হয় অনেক লাগান-ভাজান করেছে!

যতীন হাসিল।

শ্রীহরি বলিল—তা' এককালে অবিশ্যি;—কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—অবিশ্যি এককালে দোষ অনেক ছিল আমার। কিন্তু দেখলাম ওতে সুখ নাই। ওই যে দেবু ঘোষ আমার খুড়োও বটে একবয়সীও বটে—ভাল লোক, পাঠশালার পণ্ডিত—ওই আমাকে বুঝিয়েছে।

আকাশের পূর্ব্ব দিগন্তে চৈত্রের বালুকাগর্ভময়ী ময়ুরাক্ষীর বালুরাশি ও দিগন্ত মিলন রেখায় সূর্য্য উঠিতেছে। বালির রাশি যেন আবীরের রাশি হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে সময় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া যতীন বলিল—আচ্ছা তা' হ'লে এখন আসি। থানায় যেতে হবে একবার।

—থানায়?

—হ্যাঁ। প্রত্যহই একবার যেতে হবে আমাকে। যতীন চলিতে শুরু করিল। শ্রীহরিও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। বলিল,

—থানার জমাদার বাবু আমার বন্ধু লোক। বলবেন আমাকে, যদি কিছু সুবিধে-টুবিধের দরকার হয়। দারোগাবাবুও আমাকে ভালবাসেন।

যতীন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

—লোকের উপকার করেই আসল সুখ, না কি বলেন?

—নিশ্চয়।

—আজ্ঞে হাঁ, তা আমি দেখলাম। দশের উপকার করাই ধর্ম্ম। এই এবার বেবাক লোকের খাজনা-বাকীর জন্যে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছিলেন জমিদার। আমি গমস্তা কি না! তা' আমি সব লোকের টাকা নিজে থেকে দিয়ে দিলাম। অবিশ্যি হ্যাণ্ডনোট দিয়েছে তারা। কিন্তু নালিশ হ'লে তো মূলে চুলে যেত সব!

—শুনেছি আমি।

উৎসাহিত হইয়া শ্রীহরি বলিল—আমার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ, আমি এবার একটা কুয়ো কাটিয়ে দিচ্ছি। আর আমি অন্যায় ক'রে কারও অনিষ্ট করব না। তবে—

যতীন থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। অকস্মাৎ গতিভঙ্গে শ্রীহরির কথারও গতিতে ছেদ পড়িল। সম্মুখেই ময়ুরাক্ষীর বাঁধ। যতীন থমকিয়া দাঁড়াইল। পাশের জমিটার ওপাশের আইলের মাথায় একটা সদ্য কাটা গাছের গুঁড়ি মাটির উপরে জাগিয়া আছে; কিন্তু কাটাগাছের অবশিষ্ট কোথাও কিছু পড়িয়া নাই। কেবল কতকগুলা ঝরা কাঁচাপাতা, আঙুলের মত সরু দুই চারিটা ডাল—দুইটা কাচা কয়েতবেল পড়িয়া আছে—আর জমিটার জলসিক্ত নরম মাটিতে গাড়ীর চাকার দাগ গরুর পায়ের ক্ষুর চিহ্ন গাছের ডালের দাগে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা রহিয়াছে তাহার কাহিনী।

অকস্মাৎ এমনভাবে দাঁড়ানোর জন্য শ্রীহরি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

যতীন কাটাগাছের চিহ্নটার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—এটা কিন্তু আপনি অন্যায়ও করেছেন, অপরের অনিষ্টও করেছেন।

শ্রীহরি স্থিরদৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে তাহার দৃষ্টির রূপ পাল্টাইতে ছিল। তাহার পিঙ্গল চোখ দুইটি ক্রুর শনিগ্রহের মত প্রখর হইয়া উঠিল—সে বলিল—আমার যে শত্রু তাকে আমি শেষ করবই, সে অন্যায়ই হোক আর অধর্ম্মই হোক।

যতীন শ্রীহরির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। শ্রীহরির রূপের মধ্যে ফুটিতেছিল যেমন ক্রুর কঠোর রূপ, তাহার ঠোঁটে ফুটিতেছিল তেমনি একটি মৃদু হাসি। হাসিয়া সে বলিল—নমস্কার, তা' হ'লে এখন আমি আসি।

থানা হইতে যখন সে ফিরিল—তখন বেলা অনেকটা হইয়াছে। শ্রীহরির বাড়ীতে তখন প্রকাণ্ড একটি জনতা জমিয়া রহিয়াছে। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। উঠানের মাঝখানে সোনার বর্ণ ধানের একটি প্রকাণ্ড স্তূপ। পাশেই তিনটি বাঁশের একটি লম্বা তেপায়াতে প্রকাণ্ড বড় ওজনের কাঁটা টানানো হইয়াছে। একটা গাছের তলায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছে শ্রীহরি। কতকগুলি বাউরি মুচি পথের ধারে বসিয়া আছে। উঠানের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান তাহাদের হয় নাই।

একজন বলিতেছিল—তা বাপু, ঘোষমশায়ই ঠাঁইটাকে শেতল করে রেখেছে।

ওদিকে অবিরাম ধান ওজন চলিতেছে—দশ রামে ইগার্ ইগার্; ইগার্ রামে বার্, বার্, বার্, বার;—।

ক্রমশঃ

মধ্যবিত্ত

(নাটক)

বনফুল

পরিচয়

ফকির বন্দ্যোপাধ্যায়	বাড়ি-ওলা, দ্বিতলে থাকেন, বয়স ৬০, অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী
সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়	ফকিরের ভাই, বয়স ৪০, বেকার
নকুল মুখোপাধ্যায়	ভাড়াটে, একতলায় থাকেন, বয়স ৪২, অনবসর কেরাণী
সহদেব মুখোপাধ্যায়	নকুলের ভাই, বয়স ২২, রেডিওর দালালি করেন
পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ	সঙ্গীতজ্ঞ বেকার যুবক, বয়স ৩০, যমুনার বাল্যবন্ধু
শিবাজী	ফকিরের মাথা-খারাপ-আশ্রিত-আত্মীয়, বয়স ৪০
পিসামহাশয়	নকুলের দূর-সম্পর্কের পিসা, নকুলের আশ্রিত, বয়স ৫০
বিনয়	নকুলের আপিসের সহকর্ম্মী, বয়স ৪০
যমুনা	ফকিরের দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান পত্নী, বয়স ৩০
ললিতা	ফকিরের প্রথম পক্ষের কন্যা, বয়স ২২, অনূঢ়া
মৃন্ময়ী	নকুলের স্ত্রী (অন্তরালবর্ত্তিনী)
কুঙ্কুম বন্দ্যোপাধ্যায়	দুর্গামণির কন্যা, বয়স ২০, অনূঢ়া
দুর্গামণি	নকুলের বিধবা দিদি, বয়স ৫০
টুনু	নকুলের প্রথমা কন্যা, বয়স ৯
রুণু	নকুলের দ্বিতীয়া কন্যা, বয়স ৭

ছোকরা, কুলি, জ্যোতিষী

প্রথম অঙ্ক

একটি প্রশস্ত সেকেলে দালানের অভ্যন্তর। প্রশস্ত কিন্তু জীর্ণ। আয়তন দেখিলে মনে হয় ইহার নির্ম্মাতা দরাজ মেজাজের লোক ছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে সন্দেহ হয় ইহার বর্ত্তমান অধিকারী তাঁহার দরাজ মেজাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মলিন রং-ওঠা দেওয়াল, স্থানে স্থানে চটাও উঠিয়া গিয়াছে, জানলা কপাটে বহুকাল রং দেওয়া হয় নাই। দেওয়ালের একদা-সুদৃশ্য কুলুঙ্গিগুলি নানাজাতীয় কুদৃশ্য জিনিসে পরিপূর্ণ। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার হইতে সংগৃহীত গণেশ, মেমসাহেব, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির ছবি, তা-ও সবগুলি সোজা করিয়া টাঙানো নাই। একধারে একটা আলনায় নানা আকারের এবং রঙের ময়লা আধময়লা কাপড় অবিন্যস্তভাবে ঝুলিতেছে। দালানের একপ্রান্তে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছে। সিঁড়ির পাশে একটা অন্ধকার গলির মতো রহিয়াছে, দালান হইতে রান্নাঘর অঞ্চলে যাইবার পথ। ইহা ব্যতীত দালানে চারটি দরজা দেখা যাইতেছে, তিনটি শয়নকক্ষের এবং একটি বাহির হইতে ভিতরে আসিবার। দালানের এক পাশে একটি তক্তাপোশ রহিয়াছে। তক্তাপোশে বসিয়া নকুল একমনে টাইপ করিতেছেন। দালানের মাঝামাঝি একটি ভাঙা মোড়ায় বসিয়া ফতুয়া-পরা পিসামহাশয় খেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন, একটু দূরে বামে কুঙ্কুম এস্রাজ বাজাইতেছে, একটা ঘরের ভিতর হইতে টুনু রুণুর পড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছে, আর একটা ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ব্যথা-কাতর করুণ স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। পিসামহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া দুর্গামণি তরকারি কুটিতেছেন, একটু দূরে ডাহিনে সতীশ ও সহদেব একটি টেবিলে একটি কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া মুখোমুখি বসিয়া আছে। সময়, সকাল ন'টা (

পিসামহাশয়। জ্যোতিষের সঙ্গে তা হ'লে গোত্রটোত্র সব মিল ছিল ?

দুর্গামণি। তা ছিল, সে আকারে-ইঙ্গিতে আভাসও দিয়েছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিলাম না।

পিসামহাশয়। কেন ?

দুর্গামণি। ওর আছে কি, থাকবার মধ্যে আছে এক-খানা পুরোনো বাড়ি, তাও নাকি আবার বাঁধা আছে শুনলাম।

পিসামহাশয়। তা থাকলেই বা, ছেলেটি তো ভাল, বি. এ. পাশ করেছে, দেখতেও বেশ।

দুর্গামণি। ওসব নিয়ে কি হবে আমার ? একটা চাকরি-বাকরি থাকতো যদি তা হ'লে না হয়—

পিসামহাশয় নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন

সহদেব। (সতীশকে) মাথা নাড়ছেন যে ?

সতীশ। ভ্রুন হবে না, প্রন হবে।

সহদেব। প্রন ?

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া উভয়েই চুপ করিল

পিসামহাশয়। সে কথা যদি বল, চাকরিও খুব একটা

নির্ভরযোগ্য জিনিস নয়। আমার ঠাকুর্দ্দা বলতেন, ও হল তালপাতার ছাউনি, আজ আছে কাল নেই, বিষয়-আশয় থাকলে তবেই—

দুর্গামণি। বড় মেয়েটার বিষয়-আশয় দেখেই দিয়েছিলাম পিসেমশাই, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত আত্মহত্যা করতে হ'ল তাকে। বিষয়-আশয়ের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, চাকরির তুল্য জিনিস নেই।

পিসামহাশয়। তা হ'লে তোমার পরিতোষই বা কি এমন ভাল, ওরও তো চাকরি-বাকরি কিছু নেই, বেকার বসে আছে।

দুর্গামণি। কিসে আর কিসে! পরিতোষ হ'ল এম. এ. পাশ, বনেদী বংশের ছেলে, ওর চাকরি জুটবেই একটা, আর জ্যোতিষ হ'ল গিয়ে একটা বখাটে—

নকুল। (সহসা) কেন বাজে বকবক্ করচিস দিদি, জ্যোতিষ যদি কুঙ্কুমকে বিয়ে করত বেঁচে যেতিস তুই, মনে মনে হয় তো সিন্নি মেনেছিলি এই জন্যে।

সজোরে টাইপ করিতে লাগিলেন

দুর্গামণি। কি বললি ?

নকুল। জ্যোতিষ যদি কুঙ্কুমকে বিয়ে করত বেঁচে যেতিস তুই, আমিও বাঁচতাম।

দুর্গামণি। তুই তো বাঁচতিসই, আমরা মা-বেটিতে যদি কলেরা হয়ে মরে যাই তা হ'লে আরও বাঁচিস তুই। কপাল পুড়েছে বলেই পেট-ভাতায় তোর বাড়ি রাঁধুনিগিরি করতে এসেছি, তাই কট কট ক'রে কথা শোনাস তুই রোজ।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

তোরও মেয়ে আছে দুটো, ভগবান যদি বাঁচিয়ে রাখেন বুঝবি একদিন।

নকুল। ওসব ভণ্ডামি সহ্য হয় না আমার।

দুর্গামণি। ফের যদি অমন কটকটিয়ে কথা শোনাবি, থাক্‌ব না তোর এখানে, অর্জ্জুনের কাছে চলে যাব। যেখানে গতর খাটাব সেখানেই খেতে পাব দুটি।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না। দুর্গামণি খস্ করিয়া একটা লাউ কাটিয়া ফেলিলেন। কুঙ্কুমের গৎ ছাড়া কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নাই। পিসামহাশয় হুঁকাটা কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া কুঙ্কুমের কাছে গেলেন

পিসামহাশয়। একেবারে সুরের সুরধুনী বইয়ে দিলি যে দিদি, আহা, চমৎকার!

ঘেঁসিয়া বসিলেন

কুঙ্কুম। এখন বিরক্ত কোরো না দাদু, গৎটা ঠিক ক'রে না রাখলে পরিতোষদা বকবেন।

দুর্গামণি। কি নিঃস্বার্থপর ছেলে ওই পরিতোষ, নিজে দুবেলা এসে এস্রাজটি শিখিয়ে যাচ্ছে, কে ক'রে অমন।

সতীশ। খুব নিঃস্বার্থপর নয় দিদি। আপনি মফঃস্বল থেকে এসেছেন কলকাতার ছেলেদের চেনেন না। বৌদি আস্কারা না দিলে বাড়িতেই ঢুকতে দিতাম না ওসব ছোকরাকে।

নকুল। দিদিও কম আস্কারা দিচ্ছেন না।

দুর্গামণি কোন জবাব দিলেন না

সতীশ। এস্রাজের আমিও কিছু কিছু জানি, আমিই তো শিখিয়ে দিতে পারি দু-চারখানা গৎ ওকে।

নকুল। তোমাকে দিয়ে চলবে না, তুমি যে স্বগোত্র।

পিসামহাশয়ের মুখ একটা অদ্ভুত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।
দুর্গামণি ইহারও কোন জবাব দিলেন না

পিসামহাশয়। ভয় কি, আমি শেখাব তোকে, আমিও নেহাৎ আনাড়ি নই, বদ্‌রুদ্দীন মিঞার চেলা আমি, বদরুদ্দীনের চেয়ে বড় সেতারী সেকালে আর ছিল না। (আপন মনে) একদিন ওই বদরুদ্দীন আমাদের বাড়িতেই থাকত, আহা, কি দিনই গেছে!

সতীশ। (সহদেবকে) স্টুপ করছ কেন, স্টুপ হতেই বা ক্ষতি কি!

সহদেব। স্টুপ ?

সহদেব অভিধান উলটাইতে লাগিল। মৃন্ময়ীর ব্যথাকাতর শব্দটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল

সতীশ। (কুঙ্কুমকে) নি কোমলটা ঠিক হচ্ছে না কুঙ্কুম, দাও আমাকে।

এস্রাজটা লইয়া নি কোমল দেখাইয়া দিল

সহদেব। উঃ।

সতীশ। কি হ'ল ?

সহদেব। পা দুটো টনটন করছে।

সতীশ। (ঝুঁকিয়া দেখিল) ফুলেছে, একটু লালও হয়েছে দেখছি। অটল কি বলে ?

সহদেব। অটলের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল, হোমিওপ্যাথিতে কিছু হবে না।

পিসামহাশয়। রোদে রোদে টোটো ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে এইটি করেছ তুমি।

সহদেব। না ঘুরলে চলবে কেন, ঘরে বসে বসে ক্যানভাসিং করা যায় না কি ?

পিসামহাশয়। এত অল্পবয়সে কলেজ ছাড়ার কি দরকার ছিল তোমার বাপু, ঠাকুর্দ্দা বলতেন বিদ্যাই হ'ল শ্রেষ্ঠ ধন—

সহদেব। পড়ার খরচ দেবে কে ?

নকুলের দিকে একবার তাকাইল। নকুল একমনে টাইপ করিতেছিলেন, কথাটা শুনিতে পাইলেন কি-না বোঝা গেল না

সতীশ। পড়েই বা হবে কি, আমি তো বি. এ. পাশ করে ঠায় বেকার বসে' আছি। ওই যে আমাদের শিবাজী, বি. এ-তে হিস্টি্রতে অনার্স পেয়েছিল, বেকার বসে থেকে থেকে পাগল হয়ে গেল শেষটা।

পিসামহাশয়। সত্যিই কি ও পাগল ? এদিকে তো বেশ খায় দায় ঘুমোয়।

সতীশ। একজন ডাক্তার দেখে বলেছিলেন ও এক রকম পাগলই, ব্যায়ারামটার নাম হচ্ছে প্যারানইয়া।

পিসামহাশয়। প্যারানইয়া ? সে আবার কি ?

সতীশ। কি জানি।

সকলেই চুপ করিল। কুঙ্কুমের এস্রাজ বাজিতে লাগিল। মৃন্ময়ীর গোঙানিটা আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল

সতীশ। ললিতার হাত দেখাবার জন্যে দাদা একজন জ্যোতিষীকে ডেকেছেন আজ শুনলাম। আমার হাতটাও দেখাতে হবে তাকে।

দুর্গামণি। কুঙ্কুমের হাতটাও দেখাব।

নকুল। আমি কিন্তু পয়সা টয়সা দিতে পারব না, তা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।

দুর্গামণি। হবে না, হবে না—দিতে হবে না তোমাকে, ভয় নেই। তুমি নিজের বো'য়ের ব্যবস্থা কর আগে। বউটা কাল থেকে ব্যথা খাচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত একটা ভাল ডাক্তার ডাকতে পারলে না, যা করেন ওই বিনা পয়সার অটলবাবু! কিপ্‌টে কোথাকার!

নকুল। ষাট টাকা মাইনে পাই, ভাল ডাক্তার ডাকব কোথা থেকে! ডেকেই বা কি হবে, পাশের বাড়ির ভদ্রলোক ষোল টাকা-ফী-ওলা ডাক্তার ডেকে ডেকে তো জেরবার হয়ে গেলেন, ছেলেটা বাঁচল ? তা ছাড়া, পাব কোথা আমি নগদ টাকা ?

ঘরের ভিতর গোঙানিটা কমিয়া গেল

দুর্গামণি। বেশ, যা খুশি কর তোমার।

তরকারির থালা ও বঁটি লইয়া উঠিলেন এবং নকুলের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সিঁড়ির পাশের গলিপথ দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন

সতীশ। (সহদেবকে) পকেট নয়, রকেট কর ওটা।

সহদেব। এটা তা হ'লে রাউণ্ড হবে বলছেন ?

সতীশ। পাউণ্ডের চেয়ে রাউণ্ডই তো বেশী লাগ-সই বলে মনে হচ্ছে, অবশ্য সাউণ্ড সকেট—তাও হতে পারে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিল

সহদেব। দাঁড়ান, ডিক্‌শ্‌নারিটা দেখি।

অভিধান উলটাইতে লাগিল। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে শিবাজীর আবির্ভাব হইল

শিবাজী। (সিঁড়ি হইতে) একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না।

নকুল ব্যতীত আর সকলে সেদিকে ফিরিয়া চাহিল

সতীশ। কি বলছ শিবাজী ?

শিবাজী নামিয়া আসিল

শিবাজী। একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না, সৈন্যদল গড়ে' তুলতে হবে।

সতীশ। কি করবে সৈন্যদল নিয়ে ?

শিবাজী। টৌর্না দুর্গ জয়। টৌর্না চাই, যেমন করে' হোক।

সতীশ। তার চেয়ে এক কাজ কর না—

শিবাজী। কি ?

সতীশ। ওই থলিটা নিয়ে বাজারটা ঘুরে এস না চট করে', এই নাও ফর্দ্দ।

পকেট হইতে ফর্দ্দ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল

আলু এক সের, বেগুন এক সের, ছাঁচি-কুমড়ো একটা, সিম তু'পয়সার।

শিবাজী। সিম তু'পয়সার! আমি চাই টোর্না, তুমি বলছ সিম আনতে! ধিক, ধিক তোমাকে—

সতীশ। আমি বলি নি, বৌদি বলেছেন।

শিবাজী। বৌদি? বৌদি আবার কে! উনি জিজীবাঈ! জিজীবাঈ বলেছেন? ওঁর আদেশ শিরোধার্য্য, দাও—

থলি ও ফর্দ্দ লইয়া প্রস্থান

সহদেব। আজকাল শিবাজীর যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।

সতীশ। চিরকালই ওই রকম।

আবার দুজনে ক্রস্‌ওয়ার্ডে মন দিল

পিসামহাশয়। (কুঙ্কুমকে) কিসের গৎ ওটা?

কুঙ্কুম। ভৈরবীর।

পিসামহাশয়। 'নি' কোমল, নয়?

কুঙ্কুম। রে গা ধা নি চারটেই কোমল।

বাজাইতে লাগিল

সতীশ। (হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া) ঠিক আওয়াজ বেরুচ্ছে না কুঙ্কুম। ছড়টায় ভাল ক'রে রজন দিয়ে নাও। দাও আমি দিয়ে দিচ্ছি।

ছড়ে রজন দিতে লাগিল

পিসামহাশয়। এস্রাজ বাজালেই হয় না দিদি, কানটি ঠিক থাকা চাই।

সতীশ। আপনি সত্যিই এককালে গান বাজনার চর্চ্চা করেছিলেন?

পিসামশায়। খুব। এখন কিন্তু ভুলে গেছি। এই দেখ না ভৈরবীতে চারটে কোমল লাগে আমার একটি মনে আছে শুধু। একটু একটু এখনও মনে আছে বই কি।

গলায় ভৈরবী ভাঁজিবার চেষ্টা করিলেন। কিছুই হইল না

এস্রাজটা দাও তো দেখি—

সতীশের হাত হইতে এস্রাজ লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, অত্যন্ত বেস্থরা একটা আওয়াজ ব্যাহির হইতে লাগিল

কুঙ্কুম। খারাপ হয়ে যাবে, দাও। ললিতাদির এস্রাজ, গৎটা প্র্যাকটিস ক'রে এখুনি দিয়ে আসতে হবে আবার।

সহদেব। আচ্ছা, এটা কি হবে বল তো সতীশদা, ক্লু হচ্ছে, a pleasure vessel—আছে এ সি টি।

সতীশ। কই দেখি?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেখিতে লাগিল

ইয়ট্।

হাতঘড়ি দেখিল

সহদেব। ইয়ট্? বানান কি?

সতীশ। চুলোয় যাক বানান, চল্ ওঠা যাক।

পিসামহাশয় নাক মুখ কুঁচকাইয়া এস্রাজ বাজাইতে লাগিলেন, বেস্থরা আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছুই বাহির হইল না

কুঙ্কুম। দাও আমাকে দাও।

পিসামহাশয় এস্রাজ দিলেন। কুঙ্কুম আবার ভৈরবীর গৎ ধরিল

পিসামহাশয়। না, ভুলেই গেছি দেখছি সত্যি সত্যি।

সতীশ। (সহদেবকে) ওঠ, চল বেরুন যাক।

সহদেব। কোথা যাবেন এখন?

সতীশ। মিত্তিরদের বারান্দায় বসে' রেডিওটা শোনা যাক চল। আজ ভাল শানাই কনসার্ট আছে একটা।

সহদেব। ওহো, ভাল কথা মনে পড়ল, আমাকে এখুনি একবার চাটুজ্যেদের ওখানে যেতে হবে।

সতীশ। শানাই কনসার্টটা শুনে তারপর যেও।

সহদেব। শানাই কনসার্ট শুনে কি হবে?

সতীশ। ক্রসওয়ার্ড ক'রে যা হচ্ছে তাই হবে, সময় কাটবে খানিকক্ষণ।

সহদেব। ক্রসওয়ার্ড যদি ঠিক লেগে যায়—বারো হাজার টাকা নগদ।

সতীশ। এনট্রি ফী পাচ্ছ কোথা?

সহদেব। আপনি দেবেন বললেন যে।

সতীশ। পাগল না কি, আমি পাব কোথা?

সহদেব। তবে তখন বললেন যে—

সতীশ। ঠাট্টা করছিলুল। আমাকে ঠেঙিয়ে খুন ক'রে ফেললেও একটি আধলা বার করতে পারবে না।

পিসামহাশয়। উঃ, আমি একবার ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েছিলাম! আমার পালকি আটকেছিল ব্যাটারা।

সতীশ। (সবিস্ময়ে) কবে?

পিসামহাশয়। ১২৮২ সালে।

সতীশ। তাই না কি ?

পিসামহাশয়। নগদ পাঁচ শো' টাকা দিয়ে তবে নিস্তার পাই, করকরে পাঁচশোটি টাকা।

নকুল এতক্ষণ আপন মনে টাইপ করিতেছিলেন, এই কথায় থামিয়া ঘাড় ফিরাইলেন

নকুল। অনর্গল মিছে কথা বলতে প্রবৃত্তিও হয় আপনার পিসেমশাই! পাঁচ শো টাকা একসঙ্গে দেখেছেন কখনও জীবনে ?

সহদেব নীরবে দন্তবিকশিত করিয়া হাসিল

পিসামহাশয়। দেখি নি! বলিস কি তুই ? আমাদের পাঁচ শো বিঘে লাখরাজ জমিই ছিল যে, পদ্মায় হু হু ক'রে ভেঙ্গে গেল তাই, তা না হলে—ছি ছি ক্রমাগত কেরাণী-গিরি ক'রে করে' তোর দফা নিকেশ হয়ে গেছে দেখছি।

নকুল পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর আর্তস্বরটা হঠাৎ বেশী তীব্র হইয়া উঠিল। নকুল একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কুন্তুম এস্রাজ রাখিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। পিসামহাশয় উঠিয়া হুঁকাটা তুলিয়া পুনরায় টানিতে লাগিলেন

সহদেব। (সতীশকে) আপনাকে ঠেঙালে এক আধলা বেরুবে না মানে ? এই সেদিন তো ক্রসওয়ার্ড থেকেই আট টাকা পাঁচ আনা পেলেন, সেটা কি হ'ল ?

সতীশ। সেটা রেখে দিয়েছি, খরচ করব না।

সহদেব। কেন ?

সতীশ। দাদা-বৌদির কাছে সিগারেট-সিনেমার খরচ আর কাঁহাতক চাওয়া যায়! নিজের কাছে কিছু থাকা ভাল।

পিসামহাশয় পুনরায় হুঁকা রাখিয়া দিলেন এবং এস্রাজটা তুলিয়া ভৈরবী বাজাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর গোঙানিটা বাড়িতে লাগিল

নকুল। সহদেব, অটলবাবুকে আর একবার দেখ না।

সহদেব। অটলবাবু দশটার আগে আসতে পারবেন না বলেছেন।

সতীশ। অটল টলবার লোক নয়।

হঠাৎ শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। ভেবে দেখলাম ভুল করেছি। জিজীবাঈ আমাকে আদেশ করেন নি, করেছেন তোমাকে, সে আদেশ পালন করবার আমার কোন অধিকার নেই—এই নাও।

থলি ও ফর্দ্দ টেবিলে রাখিল

সতীশ। তুমি শিবাজী না ঘোড়ার ডিম। বাজার করতে পার না, টোর্না দুর্গ জয় করবে!

শিবাজী। টাকা দাও এক্ষুণি জয় করে' দিচ্ছি।

সতীশ। টাকা? টাকা নিয়ে কি হবে ?

শিবাজী। সৈন্যদল গঠন করতে হবে, বিনা পয়সায় সৈন্যদল গঠন করা যায় না। (সহসা) তাঞ্জোরে এক কপর্দ্দক পাঠানো চলবে না। টোর্না, টোর্না, টোর্না—

সিঁড়ি দিয়া সবেগে উপরে উঠিয়া গেল

পিসামহাশয়। মাথা খারাপ লোক—ওকে বেশী ক্ষেপিও না, কি করতে কি ক'রে বসবে।

সতীশ। সহদেব, চল শানাইটা শুনে ওইদিক থেকে বাজারটা সেরে আসা যাবে।

নকুল। সহদেব, এখন বেরিয়ো না, আমার আপিসের সময় হ'ল, অটলবাবু আসবেন, বাড়িতে একজন থাকা দরকার।

সহদেব। আমাকে কিন্তু একবার বেরুতেই হবে।

নকুল। কেন।

সহদেব। জীবন চাটুজ্যেরা একটা রেডিও কিনবে বলেছে, সেটার ট্রায়াল নেবে তারা এক্ষুণি।

নকুল। তবে যাও।

সতীশ। জীবন চাটুজ্যেরা নিচ্ছে না কি রেডিও ?

সহদেব। হ্যাঁ, ব্যাটারি সেট নেবে বলেছে একটা।

সতীশ। কাঁচা পয়সা দুহাতে পিটছে, নেবে না কেন বল বাবা! ব্যাটারি সেট কেন, ওদের বাড়িতে তো ইলেকট্রিসিটি আছে।

সহদেব। ব্যাটারি সেটে বাজে আওয়াজ কম হয়।

সতীশ। চল তা হ'লে।

নকুল। বেশী দেরি কোরো না।

সতীশ। আমরা এক্ষুণি ঘুরে আসছি।

সতীশ ও সহদেব চলিয়া গেল। পিসামহাশয় এস্রাজটায় কিছুতেই ঠিক সুর বাহির করিতে না পারিয়া অবশেষে সেটা রাখিয়া দিলেন। নকুল টাইপ রাইটারে নূতন কাগজ ও কার্ব্বন পেপার পরাইতে লাগিল।

পিসামহাশয়। খাঁ ক'রে তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী

বলে ফেললে হে! তুমি! তুমি কি জান না আমার প্রপিতামহর ঠাকুর্দ্দা আলিবর্দ্দি খাঁর—

নকুল। দোহাই আপনার, চুপ করুন।

কুঙ্কুম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল

কুঙ্কুম। মামীমার কোমরটা বড্ড কনকন করছে, একটু গরম তেল দিয়ে মালিশ ক'রে দেব ?

নকুল। দে।

পিসামহাশয়। যাই কর, ও ঘিনঘিনে ব্যথা ভোগাবে এখন, আমার জানা আছে; (কিছুক্ষণ পরে) আমার বড় শালীর হয়েছিল একবার, স্বয়ং কেদার দাস এসে কিছু করতে পারে নি, শেষটা কি একটা গাছের শিকড় মাথার চুলে বেঁধে দিতে ভালয় ভালয় সেরে গেল। আহা, কি যেন গাছটা, ভাল, ভুলে যাচ্ছি, আপাং বোধ হয়

নকুলের প্রতি আড়চোখে চাহিলেন। নকুল কোন উত্তর না দিয়া টাইপ করিতে লাগিলেন। পিসামহাশয় এস্রাজটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় বাজাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর আর্ত্ত রবটা হঠাৎ তীব্রতর হইয়া উঠিল

নকুল। (ঘরের দিকে চাহিয়া ধমকের সুরে) চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে লাভ কি, ওতে কি ব্যথা কমবে ?

মৃন্ময়ী চুপ করিল। নকুল টাইপ-রাইটারে মন দিলেন

নকুল। (সহসা পিসামহাশয়কে) আপনি একবার অটল ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন ?

পিসামহাশয়। বল—যাচ্ছি।

নকুল। যান একবার।

পিসামহাশয়। বেশ, (অর্দ্ধ স্বগত) চাকরেরও বেহদ্দ ক'রে তুলেছে।

নকুল। কি বললেন ?

পিসামহাশয়। কিছু না।

বাহির হইয়া গেলেন। নকুল দ্বারের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন। টুনু আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে একখানা বই

টুনু। বাবা

নকুল ফিরিয়া চাহিলেন

টুনু। ফ্রাইট ফুল মানে কি।

নকুল। ভয়ঙ্কর।

টুনু। হোয়েন্স, মানে—

নকুল। যেখান হইতে।

টুনু। ডাউন রাইট ?

নকুল। এখন বিরক্ত কোরো না টুনু, ব্যস্ত আছি, দেখছ না।

টুনু। তুমি আমাকে একটা ইংরিজি থেকে বাংলা ডিক্‌শ্‌নারি কিনে দাও বাবা, আমাদের ক্লাসের মণিকা কিনেছে।

নকুল। ডিক্‌শ্‌নারি দেখতে জান তুমি ?

টুনু। (সগর্ব্বে) হ্যাঁ।

নকুল টাইপ করিতে লাগিলেন

টুনু। আজ আপিস থেকে ফেরবার সময় একটা কিনে এনো, কেমন ?

নকুল। আচ্ছা।

টুনু। এবার পুজোর কাপড় চোপড় এখনও কিনলে না বাবা ?

নকুল। আজ কিনব।

টুনু। আমাকে কিন্তু চাঁপা রঙের সিল্কের শাড়ি কিনে দেবে বলেছিলে মনে আছে তো ?

নকুল। আছে।

টুনু। রুণুর জন্যে বরং ফুল দেওয়া একটা ফ্রক এনো, কেমন ?

নকুল। আচ্ছা।

ঘরের ভিতর হইতে আবার একটু একটু গোঙানির শব্দ আসিতে লাগিল

টুনু। মায়ের কি হয়েছে বাবা ?

নকুল। মায়ের পেট ব্যথা করছে, যাও মায়ের কাছে একটু বস গিয়ে।

টুনু। বাবা, পিসিমা কি বলছিল জান; বলছিল আমাদের ভাই হবে, সত্যি বাবা ?

নকুল। বিরক্ত কোরো না টুনু, যাও।

টুনু চলিয়া গেল। রুণু দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল এবং তাহার পর আসিয়া প্রবেশ করিল

রুণু। বাবা!

নকুল। তোমার কি আবার ?

রুণু। দিদির জন্যে যদি ডিক্‌শ্‌নারি আন, তা হ'লে আমার জন্যে একটা দ্বিতীয় ভাগ কিনে এনো বাবা।

নকুল। তোমার তো দ্বিতীয় ভাগ আছে।

রুণু। ওটা তো দিদির পুরোনোটা, কিচ্ছু পড়া যায় না, পাতাগুলো মুড়ে মুড়ে ছিঁড়ে গেছে।

নকুল। আচ্ছা আনব।

রুণু। আর আমার জন্যেও শাড়ি এনো, আমার ফুল-ফুল ফ্রক চাই না।

নকুল। আচ্ছা।

রুণু। (চুপি চুপি) মায়ের কি হয়েছে বাবা ?

নকুল। অসুখ করেছে।

রুণু। কি অসুখ বাবা ?

নকুল। আমি এখন কাজ করছি রুণু, গোলমাল কোরো না, যাও।

রুণু। মায়ের কাছে যাব ?

নকুল। যাও।

টুনু বাহির হইয়া আসিল

টুনু। কুসুমদি ওঘরে থাকতে মানা করছে। মায়ের কি হয়েছে বাবা, মা কাঁদছে।

নকুল। (ধমকাইয়া) যাও এখান থেকে।

টুনু ও রুণু সভয়ে ঘরে ঢুকিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া ফকির নামিয়া আসিলেন। পাকা গোঁফ, ছিমছাম পোষাক পরা, হাতে সৌখিন ছড়ি

ফকির। টাইপ রাইটার কোত্থেকে পেলে হে ?

নকুল। যতীনবাবুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

ফকির। কেন, হঠাৎ ?

নকুল। আর বলবেন না, মহা মুশকিলে পড়েছি।

ফকির। কি হল ?

নকুল। আমাদের আপিসে না কি রিট্রেঞ্চমেণ্ট হবে ; এক ব্যাটা নতুন সায়েব এসেছে, সে প্রত্যেকের খুঁত ধরে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে এক লম্বা explanation তলব করেছে, তারই জবাব দিচ্ছি ?

ফকির। কেন, অপরাধ ?

নকুল। অপরাধ একটু আছে, তাড়াতাড়িতে একদিন আপিসের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারি নি, কাজও কিছু কিছু এরিয়ার পড়েছে, লেট হয়েছি কদিন—

ফকির। ফ্যাসাদে পড়েছ তা হ'লে বল ! আমি আজ তোমার কাছে ভাড়াটা চাইব মনে করছিলাম, এ এক আচ্ছা খবর শোনালে তুমি। ভাড়া তোমার ছ মাসের জমে গেছে, খেয়াল রেখো সেটা কিন্তু।

নকুল। সে আমার খুব খেয়াল আছে, এইবার আস্তে আস্তে দিয়ে দেব। আপনি বেরুচ্ছেন ?

ফকির। মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটে একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, দেখি যদি গাঁথতে পারি। ছেলেটি এবার ডাক্তারি পাশ করেছে, বংশও ভাল। চেষ্টা তো করছি অনেক দিন থেকে, কিন্তু ফুল না ফুটলে তো হবার জো-টি নেই, আজ একজন জ্যোতিষীকে আসতে বলেছি, দেখি সে কি বলে।

ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ক্রন্দন শোনা গেল

ফকির। ও কি ?

নকুল। ব্যথা ধরেছে।

ফকির। তাই না কি, কখন থেকে ?

নকুল। কাল রাত থেকেই একটু খুঁটরেছে, সকাল থেকে একটু বেশী বেশী মনে হচ্ছে।

ফকির। বাঃ, তুমি আমাদের তো ঘুণাক্ষরে কিছু জানাও নি। দাই টাই সব ঠিক আছে তো ?

নকুল। সব ঠিক আছে, খবর পাঠিয়েছি ; অটল-বাবুকেও খবর দিয়েছি।

ফকির। দাঁড়াও ওঁকে ডেকে দি, উনি এসব বিষয়ে একজন এক্‌স্‌পার্ট।

নকুল। থাক বৌদিকে আর এখন থেকে ব্যস্ত করবেন না, দরকার হলে তো ডাকতেই হবে।

ফকির। না, না, সে কি কথা, এসব ব্যাপারে নো ফর্মালিটি (সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে) ওগো শুনচ!

উঠিয়া গেলেন। ক্রন্দনটা বাড়িয়া উঠিল। নকুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিলেন। বাহিরের দ্বার দিয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পরিতোষ আসিয়া প্রবেশ করিল। সুদর্শন সুবেশ যুবক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গলি দিয়া দুর্গামণিও প্রবেশ করিলেন

দুর্গামণি। (সহাস্যে) পরিতোষ এসেছ, বস বাবা বস, কুসুম কোথা গেলি, একটু চা করে' এনে দি বাবা ?

পরিতোষ। চা ? এখুনি তো এক পেয়ালা খেয়ে এলাম চন্দনাদের বাড়ি ; বেশ, দিন আর এক পেয়ালা।

দুর্গামণি। হ্যাঁ এই যে দি। কুসুম কোথা গেলি ?

নকুল। (ঘরের ভিতর হইতে) কুসুম, তুই যা।

দুর্গামণি। চা-টা আনি তা হ'লে ?

শশব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া যমুনা নামিয়া আসিলেন

যমুনা। এই যে পরিতোষ এসে গেছ, তোমার কথাই ভাবছিলাম এখুনি।

পরিতোষ। কেন?

যমুনা। ললিতা তোমার গানের কি দুর্দ্দশা করেছে, দেখ গে যাও ওপরে।

পরিতোষ। কোন্ গানটা, ওকে তো দুটো শিখিয়েছি।

যমুনা। পরশু যেটা শিখিয়ে গেলে—আজিকে সাকী, প্রাণের পাখী—(মুচকি হাসিলেন)

পরিতোষ। কেন, কি হল ?

যমুনা। (হাসিয়া) অন্তরাটা কিছুতেই হচ্ছে না, গাইতে গেলেই গলাটা কেঁপে যাচ্ছে (ফিক করিয়া হাসিলেন) যাও, তুমি ওপরে যাও।

পরিতোষ। কুঙ্কুম কোথা ?

নকুল। (ঘরের ভিতর হইতে ধমকের সুরে) কুঙ্কুম, তুই যা না।

কুঙ্কুম বাহির হইয়া আসিল

যমুনা। কুঙ্কুমের আজ আর বোধ হয় এস্রাজ শেখবার ফুরসত হবে না। ওর মামীর আবার এ দিকে—

হাসিলেন

পরিতোষ। তাই না কি, তা হলে তো—

যমুনা। যাও, তুমি ওপরে যাও।

পরিতোষ উপরে চলিয়া গেল

যমুনা। আয় কুঙ্কুম, আমরা দেখি এ দিকের খবর কতদূর।

কুঙ্কুমকে লইয়া মৃন্ময়ীর ঘরে ঢুকিলেন। নকুল বাহির হইয়া আসিয়া পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন। একটু পরে যমুনা নাক মুখ কুঁচকাইয়া একটা ময়লা কাঁথা ও তেল চিটচিটে বালিশ লইয়া বাহির হইলেন

যমুনা। এগুলো কোথা রাখি বলুন ঠাকুর পো ?

নকুল। যেখানে ছিল থাক না, বার করছেন কেন ?

যমুনা। এ সব ময়লা জিনিস ও ঘরে থাকলে কেস সেপ্‌টিক্ হয়ে যাবে যে। আঁতুড় ঘরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিস দিতে হয়।

নকুল কিছু না বলিয়া টাইপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। যমুনা বালিশ ও কাঁথা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। মৃন্ময়ীর গোঙানিটা হঠাৎ খুব বাড়িয়া উঠিল, নকুল তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া ফকিরবাবু নামিলেন, পাশের ঘর হইতে যমুনাও বাহির হইয়া আসিলেন

যমুনা। তুমি যাচ্ছ না কি ?

ফকির। হ্যাঁ, ঘুরে আসি।

যমুনা। বৃথা যাচ্ছ, ওখানে হবে না, তার চেয়ে পরিতোষকেই পাকড়াও ভাল করে'।

ফকির। ওকে বলেছি একদিন, ও হাঁ না কিছুই বলে না।

যমুনা। দিন কতক ললিতার সঙ্গে মিশুক।

হাসিলেন

ফকির। তোমার পরামর্শ মতো আমি মিশতে দিয়েছি বটে, কিন্তু সত্যি বলছি আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। আমরা বড় বংশের ছেলে, মানে—তাছাড়া পরিতোষই বা পাত্র হিসেবে কি এমন—

যমুনা। শুধু ভাল পাত্র খুঁজলেই তো হবে না (ক্ষণকাল চুপ করিয়া) সম্বলের মধ্যে তো এই বাড়িটি (নিম্নকণ্ঠে) তা-ও যা ভাড়াটে জুটেছে—

ফকির। চুপ চুপ, শুনতে পাবে।

যমুনা। পরিতোষ যদি রাজি হয়, পণ লাগবে না একটি পয়সা। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সে জোর আমার আছে।

ফকির। তবু ও পাত্রটির জন্যে চেষ্টা করি একটু। পাত্রটি বড় ভাল, মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে, ইয়া বুকের ছাতি, টকটক্ করছে রং—

যমুনা। যাও তা হ'লে, বেশী বেলা কোরো না যেন ; পিত্তি পড়িয়ে খেলে তোমার আবার আমবাত বেরোয়।

ফকির। না, বেলা করব না।

চলিয়া গেলেন

যমুনা। ওই তো রূপের ধুচুনি মেয়ে, তার জন্যে রাজপুত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন ! সতীনের কাঁটা গলা থেকে নাব্‌লে বাঁচি।

ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। ললিতা নামিয়া আসিয়া এস্রাজটা লইয়া গেল। একটু পরে পরিতোষ ও ললিতার যুগ্মকণ্ঠে গান শোনা গেল

আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা
আপনহারা সুরের ধারা
মানে না বাধা মানে না মানা ।

চায়ের পেয়ালা লইয়া দুর্গামণি প্রবেশ করিলেন

দুর্গামণি। পরিতোষ কোথা গেল ?

উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিলেন

দুর্গামণি। (কঠিন কণ্ঠে) কুঙ্কুম !

কুঙ্কুম বাহির হইয়া আসিল

কুঙ্কুম। কি মা ?

দুর্গামণি। কি করচিস ?

কুঙ্কুম। মামীমার কোমরে তেল মালিশ করে দিচ্ছি।

দুর্গামণি। (চাপা তর্জ্জন করিয়া) মামীমার কোমরে তেল মালিশ করলেই তুই উদ্ধার হবি, না ? যা পরিতোষকে চা দিয়ে আয় ওপরে। কি হাঁদা মেয়ে বাবা !

কুঙ্কুম চা লইয়া উপরে চলিয়া গেল

এত লোকের মরণ হয় আমার মরণ হয় না। উঃ কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলাম !

গলি-পথে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। গোঙানিটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তর্ক করিতে করিতে সতীশ ও সহদেব প্রবেশ করিল। সতীশের হাতে তরকারীপূর্ণ বাজারের থলি

সহদেব। আপনি কি বলতে চান—ফুঁয়ের জোর যার যতো সেই ততো বড় বাজিয়ে ?

সতীশ। আরে কি মুশকিল, ফুঁয়ের জোর না থাকলে শানাই বাজানই যায় না যে, কাগজ কলম না থাকলে যেমন লেখা যায় না।

সহদেব। যাই বলুন আপনার নাজির খাঁর চেয়ে আমাদের হ্যাপলা ঢের ভাল বাজায়, চমৎকার শ্রুতিমধুর—

সতীশ। ভাল গান বাজনা বুঝতে গেলে শ্রুতিকে শিক্ষিত করতে হয় তবে মধুর লাগে। বীথোফেন শুনেছ কখনও ? হঠাৎ শুনলে মনে হবে কতকগুলো যন্ত্র বেসুরো চীৎকার করছে।

পরিতোষ ও ললিতা পুনরায় গান ধরিল

সুদূর দূরে অসীম দূরে
চলেছি ভেসে প্রাণের সুরে
অলখ পথে অচিন পুরে
অজানা হল পরম জানা
আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা।

সতীশ। আবার সেই রাসকেলটা এসেছে !

সহদেব। পরিতোষবাবু, নয় ? ওঁকে জিগ্যেস করলে হয় সকেট হবে, না রকেট হবে, হাজার হোক লোকটা এম. এ. পাশ।

সতীশ। ইচ্ছে হয় জিগ্যেস কর গে যাও, আমি চললাম, আমার ভাল লাগে না এসব।

বাহির হইয়া গেল

সহদেব। কি মুশকিল ! [একটু ইতস্ততের পর] আমি যাই জিগ্যেস করেই আসি।

উপরে উঠিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে শিবাজী নামিয়া আসিল

শিবাজী। টোর্না দুর্গ এখনও বিজাপুররাজের করতল-গত আর এঁরা গান গাইছেন ! একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না আমি—

ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ক্রন্দন শোনা গেল। শিবাজী কান পাতিয়া শুনিল

শিবাজী। কে কাঁদছে ? ভারতমাতা ? সৈন্যদল গঠন করতে হবে, সৈন্য দল, সৈন্য দল, টোর্না চাই, টোর্না—

সবেগে বাহির হইয়া গেল। পরিশ্রান্ত কলেবর পিসামহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন

পিসামহাশয়। শুধু শুধু এতটা পথ হাঁটিয়ে মারলে আমাকে। (ঘাম মুছিলেন) আহ্নিকটা পর্য্যন্ত করা হয় নি এখনও আজ। আরে বাপু, পয়সা না দিলে কখনও ডাক্তার আসে ?

নকুল বাহির হইয়া আসিলেন

নকুল। অটলবাবু কি বললেন ?

পিসামহাশয়। তিনি এখন আসতে পারবেন না, ঘণ্টা দুই পরে আসবেন। এক ডোজ ওষুধ দিলেন, বললেন ওতেই কাজ হবে।

নকুল। ওষুধ ? কি ওষুধ ?

পিসামহাশয়। অটল ডাক্তার আবার কি ওষুধ দেবে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। বললে, আপনাদের হোমিওপ্যাথিতে যদি বিশ্বাস থাকে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না, ধীরে ধীরে ওষুধের কাজ হবে !

নকুল। কই, দিন।

পিসামহাশয়। হোমিওপ্যাথিতে তা হ'লে বিশ্বাস আছে তোমার ?

নকুল। কোন প্যাথিতেই বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস আছে দুটি জিনিসে, একটি অজানা তার নাম অদৃষ্ট, আর একটি জানা তার নাম দারিদ্র্য। কই, দিন কি এনেছেন।

উপরে গানটা সহসা থামিয়া গেল ; কলকণ্ঠের হাসি শোনা গেল। পিসামহাশয় ঔষধের পুরিয়া দিলেন। পুরিয়া লইয়া নকুল ভিতরে চলিয়া গেলেন। তিলক-কণ্ঠী-নামাবলীধারী জ্যোতিষী আসিয়া প্রবেশ করিল

জ্যোতিষী। এইটেই কি ফকিরবাবুর বাড়ি ?

পিসামহাশয়। হ্যাঁ, কি চান আপনি ?

জ্যোতিষী। আমি জ্যোতিষী, ফকিরবাবু আমাকে আসতে বলেছিলেন আজ।

পিসামহাশয়। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার আসবার কথা শুনেছিলাম বটে। আসুন, চলুন ওপরে চলুন।

উভয়ে উপরে চলিয়া গেলেন। স্টেজে শরীরী কেহ রহিল না; কেবল মৃন্ময়ীর অশরীরী আর্ত্ত ক্রন্দনটা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। সময় সেই দিনই সন্ধ্যার পর। কুঙ্কুম একা বসিয়া লণ্ঠনের আলোয় নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছে। দালানে আর কেহ নাই। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। পরিতোষ সন্তর্পণে আসিয়া প্রবেশ করিল

কুঙ্কুম। আসুন!

উঠিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। তুমি একাই রয়েছ দেখছি।

কুঙ্কুম। মা রান্নাঘরে আছেন, বসুন ডেকে দি।

পরিতোষ। মাকে ডাকবার দরকার নেই। বস তুমি।

উভয়েই বসিল

পরিতোষ। হাসপাতাল থেকে কোন খবর এসেছে ?

কুঙ্কুম। না, কেউ তো এখনও ফেরেন নি।

পরিতোষ। অবস্থা খুব খারাপ নাকি ?

কুঙ্কুম। ডাক্তারবাবু তাই তো বললেন।

পরিতোষ। অটলবাবু এসেছিলেন ?

কুঙ্কুম। অটলবাবু আসেন নি, সতীশদা অন্য একজন বড় ডাক্তার এনেছিলেন।

পরিতোষ। কখন ?

কুঙ্কুম। বড় মামা আপিস চলে যাওয়ার পর।

পরিতোষ। নকুলবাবু তা হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দেখে যান নি ?

কুঙ্কুম। না।

পরিতোষ। সতীশবাবু কোন্ ডাক্তার এনেছিলেন ?

কুঙ্কুম। নাম জানি না।

পরিতোষ। (হাসিয়া) বড় ডাক্তার জানলে কি করে ?

কুঙ্কুম। আট টাকা ফী যখন, তখন নিশ্চয়ই বড় ডাক্তার।

পরিতোষ। ফী-টা দিলে কে, নকুলবাবুর কাছে তো টাকা ছিল না, তিনি আমার কাছে ধার চাইছিলেন।

কুঙ্কুম। ফী সতীশদাই দিলেন।

পরিতোষ। ধার ?

কুঙ্কুম। জানি না।

উঠিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। উঠছ কেন ?

কুঙ্কুম। যাই মাকে ডেকে আনি।

পরিতোষ। তার চেয়ে এস্রাজটা আন, ভৈরবীটা শোনা যাক, ওবেলা তো গোলমালে শোনাই হল না, এখন একটু ফাঁক আছে।

কুঙ্কুম। আমি আর এস্রাজ শিখব না।

পরিতোষ। (সবিস্ময়ে) কেন ?

কুঙ্কুম। যা শিখেছি তাতেই চলবে।

পরিতোষ। চলবে মানে ?

কুঙ্কুম। আমাকে যখন দেখতে আসবে তখন যা শিখেছি তাতেই মুগ্ধ করতে পারব বরপক্ষের লোকেদের।

পরিতোষ। বরপক্ষের লোকদের মুগ্ধ করবার জন্যেই বাজনা শিখছ নাকি ?

কুঙ্কুম। তাছাড়া আর কি, আমাদের জীবনে গান বাজনার আর কি মানে আছে ? মামীমাও বিয়ের আগে অনেক রকম বাজনা শিখেছিলেন শুনেছি, কিন্তু বিয়ের পর একদিনও বাজাতে শুনি নি।

পরিতোষ। আহা, সবাই যে তোমার মামীমার মতো হবে তার কি মানে আছে ? তুমি ইচ্ছে করলে—

কুঙ্কুম। আমার অবস্থা আরও খারাপ, আমি মামাদের আশ্রিত। মামীমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার লোক জুটেছে, আমি অসুখে পড়লে হয়তো তা-ও জুটবে না।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

পরিতোষ। শোন শোন, কুঙ্কুম তোমার অমন চমৎকার মিষ্টি হাত, আমি বলছি, তুমি যদি ভাল করে শেখ—

কুঙ্কুম ঘুরিয়া দাঁড়াইল

কুঙ্কুম। একটা কথা জিগ্যেস করব, যদি কিছু মনে না করেন—

পরিতোষ। কর।

কুঙ্কুম। আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন?

পরিতোষ। বিয়ে!

কুঙ্কুম। হ্যাঁ বিয়ে।

পরিতোষ। হঠাৎ এ কথা বলবার মানে?

কুঙ্কুম। মানে, তা হলেই আমি আপনার কাছে এস্রাজ শিখতে পারি, ভৈরবী কানাড়া বেহাগ মালকোষ যা শেখাবেন তাই শিখব, আর তা যদি না থাকেন তা হলে এসব শেখাশিখির কোন অর্থ হয় না।

পরিতোষ। (হাসিয়া) আমাকে পছন্দ হয় তোমার?

কুঙ্কুম। আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কি?

পরিতোষ। পছন্দ অপছন্দ নেই?

কুঙ্কুম। থাকলেও কোন মূল্য নেই, সুতরাং বলা বৃথা।

পরিতোষ। তবু বল না শুনি?

কুঙ্কুম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল

কুঙ্কুম। আপনাকে আমার একটুও পছন্দ হয় না, কিন্তু তবু আপনাকে বিয়ে করতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই।

পরিতোষ। কেন?

কুঙ্কুম। মায়ের আর মামার দুর্ভাবনা ঘোচাবার জন্যে। রাজি আছেন?

সোৎসুকে চাহিয়া রহিল। পরিতোষ নীরব

কুঙ্কুম। বলুন, রাজি আছেন?

পরিতোষ। বিয়ে করবার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য নেই যে।

কুঙ্কুম। শুনলাম কোন্ কলেজে প্রফেসারি পাবেন নাকি।

পরিতোষ। এখন তার কোথায় কি, দরখাস্ত করেছি মাত্র; (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) সত্যি আমার সামর্থ্য নেই।

কুঙ্কুম। সামর্থ্য নেই যদি, তা হলে আপনার সরে থাকাই উচিত আমাদের মতো মেয়ের কাছ থেকে; আমাদের সঙ্গে মিশে শুধু শুধু আমাদের উৎসুক ক'রে তোলেন কেন মিছিমিছি?

পরিতোষ। উৎসুক ক'রে তুলি মানে? আমি তো—

সিঁড়িতে ললিতাকে দেখা গেল

ললিতা। পরিতোষবাবু কতক্ষণ এসেছেন? কুঙ্কুমকে এস্রাজ শেখাচ্ছেন নাকি?

কুঙ্কুম। আমি যাই।

গলি দিয়া রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল। ললিতা নামিয়া আসিল

ললিতা। কুঙ্কুম চ'লে গেল কেন? আমি আসাতে বাধা পড়ল?

মুচকি হাসিল

পরিতোষ। ও রান্নাঘরে গেল।

ললিতা। চা আনতে?

পরিতোষ। না, চা আনতে তো বলি নি। তোমার গানটা এবার ঠিক হয়েছে?

ললিতা। (হাসিয়া যেন ঢলিয়া পড়িল) না, এখনও হয় নি।

পরিতোষ। এখনও হয় নি? তোমাকে নিয়ে বিপদে পড়লাম তো! মা কোথা?

ললিতা। মা ঘুমুচ্ছেন

পরিতোষ। এমন অসময়ে ঘুম?

ললিতা। মায়ের যে ফিট্ হয়ে গিয়েছিল। মাথায় বরফ জলটল দিয়ে এই সবে সুস্থ হয়েছেন একটু।

পরিতোষ। ফিট? কেন?

ললিতা। টুনুর মায়ের ব্যাপার দেখে! উঃ সে কি রক্ত।

পরিতোষ। তাই নাকি?

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল

পরিতোষ। টুনু রুণু কোথা, তারাও হাসপাতালে গেছে নাকি?

ললিতা। কাকা তাদের নিয়ে গেছে।

পরিতোষ। কোথায়?

ললিতা। গোয়াবাগানে তাদের দূর-সম্পর্কের এক মাসী আছে সেইখানে।

পরিতোষ। ভারী মুশকিলে পড়েছেন তো নকুলবাবু।

ললিতা। সত্যি।

পরিতোষ। ফকিরবাবু কোথা ?

ললিতা। বাবাই তো হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। নকুলবাবু আপিসে, সহদেববাবু দুপুরে সেই যে বেরিয়েছেন এখনও ফেরেন নি, বাবাকেই যেতে হল শেষ পর্য্যন্ত। পিসেমশাইও গেছেন অবশ্য। (মুচকি হাসিল)

পরিতোষ। পিসেমশাই লোকটি বেশ, তোমাদের শিবাজীটিও বেশ, কোথায় সে ?

ললিতা। কি জানি কোথায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সে তো বাড়িতে প্রায়ই থাকে না। (সহসা) ওমা আপনার গালের ব্রণটা বেশ লাল হয়ে উঠেছে যে! টিপেছিলেন বুঝি ? সকালে মানা করলাম অত ক'রে, দাঁড়ান একটু জাম্বাক নিয়ে আসি।

উপরে উঠিয়া গেল। বাহিরের দ্বারদেশে একটি কুলি সমভিব্যাহারে একটি ছোকরা প্রবেশ করিল

ছোকরা। এখানে নকুলবাবু থাকেন ?

পরিতোষ। হ্যাঁ, কি চান ?

ছোকরা। তিনি আপিস যাবার সময় সর্ব্বমঙ্গলা স্টোর্স থেকে এই জিনিসগুলো পছন্দ ক'রে কিনে রেখে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন এই ঠিকানায় পৌছে দিতে।

পরিতোষ। বেশ, রেখে যান।

কুলি ভিতরে আসিয়া প্যাকেটগুলি নামাইয়া রাখিল

ছোকরা। বিলটা ?

পরিতোষ। নকুলবাবু আপিস থেকে ফেরেন নি এখনও। বিলটা রেখে যান, কিম্বা কাল সকালে নিয়ে আসবেন। তাঁকে চেনেন তো ?

ছোকরা। খুব চিনি, উনি হলেন আমাদের দোকানের পুরোনো খদ্দের। আগেকার বিলও বাকি আছে কিছু। বেশ, কাল সকালেই আসব। কুলির চারটে পয়সা দিয়ে দেবেন ?

পরিতোষ। আমি এ বাড়ির কেউ নই। নকুলবাবুর স্ত্রী খুব অসুস্থ, তাকে নিয়ে সবাই হাসপাতালে গেছেন। চারটে পয়সা ? আচ্ছা দেখি—

ব্যাগ বাহির করিয়া হাত ঢুকাইয়া শেষে উপুড় করিয়া দেখিলেন

না, নেই।

ছোকরা। আচ্ছা, আমরা দোকান থেকেই দিয়ে দেব এখন। নমস্কার।

কুলি ও ছোকরা চলিয়া গেল। জাম্বাক লইয়া ললিতা নামিয়া আসিল ও অনুরাগভরে তাহা পরিতোষের গালে লাগাইয়া দিল

ললিতা। সত্যি, বড্ড কেয়ারলেস তুমি (জিব কাটিয়া, মুচকি হাসিয়া) মানে, আপনি, ভুলে বলে' ফেলেছি, মাপ করবেন।

পরিতোষ কিছু বলিল না। প্যাকেটগুলির প্রতি ললিতার নজর পড়িল

ললিতা। এসব কি আবার ?

পরিতোষ। নকুলবাবুর পূজোর বাজার বোধ হয়। প্যাকেটের বহর দেখে মনে হচ্ছে, অনেক কিছু কিনেছেন ভদ্রলোক।

ললিতা। লজ্জাও করে না! ছ' মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, পাড়ার মুদির দোকানে ধার—

পরিতোষ। কি করবেন বল, পূজার সময়ে কিনতেই হবে।

ললিতা। দেখি কি কি কিনলেন ভদ্রলোক।

বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল

এই চাঁপা রঙের শাড়িটা বোধ হয় টুনুর, আর এই লালটা রুণুর, এটা বোধ হয় স্ত্রীর জন্যে কিনেছেন, বাঃ, বেশ টেস্ট আছে ভদ্রলোকের; এই থানখানা বোধহয় দিদির জন্যে, এই সব ছোট ছোট পাঞ্জাবি ও কাপড় কার জন্যে ?

পরিতোষ। ভাইপোদের জন্যে বোধ হয়, ওঁর এক দাদা আছেন শুনেছি।

ললিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। সেখান থেকেও আজ চিঠি এসেছে বাড়িসুদ্ধ সবায়ের অসুখ না কি।

পরিতোষ। ভদ্রলোক নিজের জন্যে কিছু কেনেন নি দেখছি।

ললিতা। এটা কি ?

কাগজের মোড়ক খুলিল

বাঃ, চমৎকার শাড়িটা তো, কুঙ্কুমের জন্যে বোধ হয়, এই হেলিওট্রোপ রঙে যা মানাবে ওই মেয়েকে—

ঠোঁট উলটাইয়া হাসিল। চায়ের পেয়ালা হস্তে গলি-পথ দিয়া কুঙ্কুম প্রবেশ করিল এবং পরিতোষের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা রাখিল

পরিতোষ। (বিস্মিত) চা কেন! চা আনতে তো বলি নি।

কুস্কুম। মা পাঠিয়ে দিলেন, চা টা খান ততক্ষণ, হালুয়া আনছি।

পরিতোষ। হালুয়া? আবার হালুয়া কেন?

কুস্কুম কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতেছিল

ললিতা। নকুলবাবু তোমাদের কি সুন্দর পুজোর বাজার করেছেন দেখ।

কুস্কুম। মেজমামা এসেছেন না কি।

পরিতোষ। না, পাঠিয়ে দিয়েছেন দোকান থেকে।

কুস্কুম। হাসপাতাল থেকে কেউ আসে নি?

পরিতোষ। না

ললিতা। তোমার শাড়িটা কি সুন্দর দেখ।

কুস্কুম। থাক, পরে দেখব।

প্যাকেটগুলি গুছাইয়া ঘরে রাখিল ও তাহার পর গলি-পথে রান্নাঘরে চলিয়া গেল

পরিতোষ। তোমাদের পুজোর বাজার হয়নি এখনও?

ললিতা। আমাদের? (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, হয় নি এখনও, বাবা ফুরসতই পাচ্ছেন না।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। গানের কোন্ জায়গাটায় আটকাচ্ছে তোমার?

ললিতা। সুদূর দূরে অসীম দূরে – ওই জায়গায়টা।

পরিতোষ। কেন, ওখানটা শক্ত কি এমন—

আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিল

সুদূর দূরে অসীম দূরে
চলেছি ভেসে প্রাণের সুরে
অলখ পথে অচিন পুরে
অজানা হল পরম জানা
আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা

ললিতা। গানটা আপনার তৈরি?

পরিতোষ। হ্যাঁ আমারই তৈরি, রবি ঠাকুরেরর নকল আর কি, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও দেখি।

আস্তে আস্তে দুজনে গানটি গাহিতে লাগিল। কুস্কুম এক প্লেট হালুয়া লইয়া প্রবেশ করিল, পিছনে পিছনে দুর্গামণি

দুর্গামণি। হালুয়াটুকু খেয়ে নাও বাবা। (ললিতার দিকে বিষদৃষ্টি হানিয়া) ললিতা, তোমার মা কেমন আছেন?

ললিতা। মা ঘুমুচ্ছেন।

দুর্গামণি। মাকে একলা ফেলে রেখে নেমে এলে কেন মা, আমিও এমন একটু অবসর পাচ্ছি না যে কাছে গিয়ে বসি। (পরিতোষের দিকে চাহিয়া) উঃ, দুপুরে সে কি কাণ্ড, এদিকে বউ যায় যায়, ওদিকে ওর মায়ের ফিট! পরিতোষ, তুমি বাবা কুস্কুমের বাজনাটা শোন একবার, কুস্কুম গৎটা শোনা পরিতোষকে, আমি যাই দুধটা চড়িয়ে এসেচি।

চলিয়া গেল

পরিতোষ। কুস্কুম এস্রাজটা আন তা হ'লে।

কুস্কুম ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল ও পরক্ষণেই বাহির হইয়া আসিল

পরিতোষ। কি হ'ল, এস্রাজ আনলে না?

কুস্কুম। এস্রাজটা ওপরে আছে, নিয়ে আসি।

চলিয়া গেল

ললিতা। (মুচকি হাসিয়া) আমি তা হ'লে যাই, মায়ের সেবা করিগে, আপনি কুস্কুমকে বাজনা শেখান।

পরিতোষ। মা তো ঘুমুচ্ছেন, বস না।

পুনরায় গুন গুন করিয়া গান ধরিল

আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা
আপন হারা সুরের ধারা
মানে না বাধা মানে না মানা

কুস্কুম এস্রাজ লইয়া নামিয়া আসিল

ললিতা। মা এখনও ঘুমুচ্ছে?

কুস্কুম। উঠেছেন

ললিতা। আমি যাই তা হ'লে।

পরিতোষ। বস না।

কুস্কুম। আমার কিন্তু এখন বাজাতে ইচ্ছে করছে না পরিতোষবাবু।

পরিতোষ। তা হলে দাও আমি বাজাই, এই গানখানাই বাজানো যাক, দাও দেখি, ললিতা তাল দাও তো—তোমার তালটা ঠিক হয়েছে কি না দেখা যাক।

পরিতোষ এস্রাজ লইয়া গানখানা বাজাইতে লাগিল—ললিতা তাল দিতে লাগিল, কুস্কুম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ বাজনা চলিবার পর বাহিরের দ্বার দিয়া সতীশ আসিয়া প্রবেশ করিল

সতীশ। এই যে কনসার্ট বেশ জমে উঠেছে দেখছি।

বাজনা থামিয়া গেল

সতীশ। পরিতোষবাবু, একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই আপনাকে, যদি কিছু মনে না করেন—

পরিতোষ। কি বলুন ?

সতীশ। আপনি এখানে আসেন কেন ?

পরিতোষ। আসি কেন মানে ?

সতীশ। কি উদ্দেশ্যে আসেন ?

পরিতোষ। এমনি বেড়াতে আসি।

সতীশ। বেড়াতে আসেন! আমাদের বাড়িটা কি পার্ক যে যখন খুশি বেড়াতে আসবেন ? পার্কে বেড়াবারও একটা সময় অসময় আছে।

সকলের অলক্ষ্যে সিঁড়ির উপর যমুনা আসিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। আমি আপনার কথাবার্ত্তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সতীশ। স্পষ্ট করে' বলব ? কার হুকুমে আপনি এদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করছেন ? কে আপনাকে যখন তখন এসে এদের গান শেখাবার জন্যে অনুরোধ করেছে ?

যমুনা। (সিঁড়ির উপর হইতে) আমি।

সকলে সেদিকে ফিরিয়া চাহিল, যমুনা নামিয়া আসিল

যমুনা। পরিতোষ আমার বাল্যবন্ধু, আমি ওকে রোজ আসতে বলেছি ললিতাকে গান শেখাবার জন্যে; আর কুঙ্কুমের মায়ের অনুরোধে ও দয়া করে কুঙ্কুমকে বাজনা শেখাচ্ছে। তোমার এতে আপত্তি আছে ?

সতীশ। আছে, যে কোন লোফারের সঙ্গে আমি আমার ভাইঝিকে মিশতে দিতে পারি না

যমুনা। যারা নিজেরাই লোফার, তাদের সঙ্গে লোফার ছাড়া আর কে মিশবে বল।

সতীশ। আমরা লোফার ?

যমুনা। তা ছাড়া আর কি, ভাগ্যে পূর্ব্বপুরুষদের এই বাড়িটা ছিল তাই নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলছে। তোমার দাদা যা পেনসন পান তাতে সংসার চলে না।

সতীশ। তার সঙ্গে পরিতোষবাবুকে বাড়িতে ঢোকানোর কি সম্পর্ক ?

যমুনা। এতদিন পরে আজ হঠাৎ ভাইঝির জন্যে এত দরদ যে! (মুচকি হাসিয়া ও কুঙ্কুমের দিকে চাহিয়া) দরদটা যে কোথায় তা আমি জানি। চল পরিতোষ, আমরা ওপরে যাই, ললিতা আয়।

যমুনা, পরিতোষ, ললিতা উপরে চলিয়া গেল। কুঙ্কুম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

সতীশ। লোকটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়।

কুঙ্কুম। কেন, উনি তো কখনও কোন অভদ্র ব্যবহার করেন নি। বরং—

সতীশ। কেন ? তুমিও বলছ কেন!

বাহিরের দ্বার দিয়া সহদেবের প্রবেশ। পিছনে কুলির মাথায় একটা রেডিও

সতীশ। এ কি!

সহদেব। চাটুজ্যে নিলে না রেডিওটা, আপিসে ফিরিয়ে দেবারও আর সময় নেই আজ। (কুলিকে) ওই টেবিলটার ওপর রাখ, আনা দুই পয়সা হবে সতীশদা, কাল দিয়ে দেব।

সতীশ পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিল, কুলি পয়সা লইয়া চলিয়া গেল

সতীশ। আর তিন আনা বাকি রইল, এক প্যাকেট কাঁইচি হবে।

সহদেব। কুঙ্কুম এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস, হেঁটে হেঁটে থকে' গেছি।

একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কুঙ্কুম চলিয়া গেল

সহদেব। বৌদির সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে, ছেলে হয়ে গেছে না কি ?

সতীশ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

সহদেব। তাই না কি, কখন ?

সতীশ। দুপুরে।

সহদেব। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল ?

সতীশ। খুব।

সহদেব। দাদা তো ছিল না—কে নিয়ে গেল ?

সতীশ। আমার দাদা আর তোমার পিসেমশাই।

সহদেব। টুনু রুণু কোথা ?

সতীশ। তোমার বৌদিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার

আগেই আমি তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে গোয়াবাগানে রেখে এসেছি।

সহদেব। কেন ?

সতীশ। তা না হলে হাসপাতালে যেতে চাইত। এইবার গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। রুনুটার আবার জ্বরও হয়েছে একটু।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

সতীশ। রেডিওটা নিলে না ?

সহদেব। না। নিলে গোটা কয়েক টাকা পাওয়া যেত।

সতীশ। নিলে না কেন ?

সহদেব। পছন্দ হ'ল না। সকালে তোমার সঙ্গে শানাই শুনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, ইতিমধ্যে আর একজন ক্যানভাসার এসে জুটেছে শুনলাম। আমাকে বললে— পছন্দ হল না, অথচ পছন্দ না হবার কি আছে এতে, কি চমৎকার ক্লিয়ার রিসেপ্‌শন, এই দেখুন না—

উঠিয়া গিয়া রেডিওটা লাগাইয়া দিতেই সেতারে বাগেশ্রীর আলাপ শোনা যাইতে লাগিল

সতীশ। দিল্লী ?

সহদেব। হ্যাঁ, কি রকম ক্লিয়ার রিসেপ্‌শন দেখেছেন !

রেডিও বাজিতে লাগিল। ললিতা উপর হইতে নামিয়া আসিল

ললিতা। কাকা, তোমার নামে দুপুরে এই চিঠিটা এসেছিল।

সতীশ। কি চিঠি ?

ললিতা। জানি না, খুলে দেখি নি, খাম।

চিঠি দিয়া উপরে চলিয়া গেল

সতীশ। (চিঠি পড়িয়া) যাক—

সহদেব। কি ?

সতীশ। একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, হ'ল না।

রেডিওতে বাগেশ্রীর আলাপ চলিতে লাগিল। উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে বাহিরের দ্বার দিয়া ফকিরবাবু প্রবেশ করিলেন

সহদেব। বৌদির খবর কি ?

ফকির। আমি তো জানি না, আমি তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই নিজের ধান্দায় বেরিয়েছিলাম। (সতীশকে) মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটে সেই পাত্রটির খোঁজে গিয়েছিলাম, সকালে দেখা পাইনি।

সতীশ। কি হল ?

ফকির। নগদ পাঁচ হাজার টাকা চায়, গয়না পত্তর ছাড়া।

সতীশ। তাই না কি ?

ফকির। তবে আর বলছি কি। ওই পরিতোষেরই খোসামোদ করতে হবে, উপায় কি তাছাড়া।

গট গট করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। রেডিওতে বাগেশ্রী বাজিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে সতীশ আস্তে আস্তে কথা কহিল

সতীশ। সহদেব !

সহদেব। কি ?

সতীশ। পালাই চল।

সহদেব। পালাব ? কোথায় ?

সতীশ। যে দিকে দু'চক্ষু যায়। জাহাজের খালাসি ফালাসি যা হোক হ'য়ে আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া যেথানে হোক পালাই চল, এ সমাজে বাস করার চেয়ে জঙ্গলে বাস করা ঢের ভাল।

সহদেব চুপ করিয়া রহিল। উত্তেজিতভাবে কথা কহিতে কহিতে পরিতোষের পিছু পিছু ফকির সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন

ফকির। শোন শোন, চলে যাবে কেন তুমি, আমার কথাটা শোনই না।

পরিতোষ। না, আমাকে মাপ করুন।

ফকির। (সতীশকে) তুমি একে অপমান করেছ ? এতবড় স্পর্দ্ধা তোমার ! ভদ্রতা বলে একটা জিনিস নেই ? আমরা আসতে বলেছি বলেই ও আসে, তুমি ওকে অপমান করবার কে ! বাড়ির কর্ত্তা তুমি ? ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও এক্ষুণি।

পরিতোষ। আহা, কি করেন ফকিরবাবু আপনি। আমি যাই, আমাকে যেতে দিন, সতীশবাবু কিছু মনে করবেন না, আমি চললাম—

বাহির হইয়া গেলেন

ফকির। লজ্জা করে না তোমার ? কুটোটি নেড়ে উপকার করতে পার না, একটি পয়সা রোজকার করবার

সামর্থ্য নেই, চিরটা কাল জোঁকের মতো ঘাড়ে লেগে আছ, ভদ্রতা জ্ঞানটা পর্য্যন্ত নেই, অতিথিকে অপমান করবে তুমি—

সিঁড়ির উপর ললিতাকে দেখা গেল

ললিতা। বাবা, শিগ্‌গির এস, মায়ের আবার ফিট হয়েছে।

ফকির। উঃ কি বিপদ।

হন্ত-দন্ত হইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। সতীশ ও সহদেব নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে শিবাজী প্রবেশ করিল

শিবাজী। (আপন মনে) বাঘ-নখ, বাঘ-নখ চাই একটা, আফজল খাঁর নাড়ি ভুঁড়ি টেনে ছিঁড়ে বার করব! আমার সঙ্গে চালাকি, বাঘের বাচ্চা আমি—

কোনদিকে না চাহিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল। সহদেব একটু মুচকি হাসিল। সতীশ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিল। পিসামহাশয় প্রবেশ করিলেন

পিসামহাশয়। (এদিক ওদিক চাহিয়া) নকুল আপিস থেকে ফিরেছে?

সহদেব। না, বৌদির খবর কি?

পিসামহাশয়। মেয়ে দুটো কোথা?

সহদেব। গোয়াবাগানে, বৌদির খবর কি আগে বলুন না।

পিসামহাশয়। মারা গেছে।

সহদেব। মারা গেছেন? সে কি!

পিসামহাশয়। হ্যাঁ। পেটে প্রকাণ্ড এক মরা মেয়ে ছিল, ফুলটা ছিল সামনের দিকে। আমার ঠাকুর্দ্দা যখন পাতিয়ালা স্টেটে ছিলেন তখন আমার ঠাকুরমার ঠিক এই রকম হয়েছিল শুনেছি। পাতিয়ালা স্টেটের চীফ মেডিক্যাল অফিসার নিজে চিকিৎসা করেছিলেন, নিজে স্বয়ং, কিন্তু (মাথা নাড়িলেন) বাঁচল না। এতে বাঁচে না।

সহদেব। হাসপাতালে বউদির কাছে আছে কে?

পিসামহাশয়। কেউ না, তোমাদের ডাকতেই তো এসেছি।

সহদেব উঠিয়া পড়িল

সহদেব। চলুন তা হলে, সতীশদা উঠুন, দিদিকে খবরটা দেব, না থাক পরে দিলেই হবে, সতীশদা উঠুন—

সতীশ কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সহদেবের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। পিসামহাশয় দাঁড়াইয়া রহিলেন

পিসামহাশয়। আর পারি না আমি, সমস্তটা দিন এক নাগাড়ে চলেছে। যাই, যেতেই যখন হবে।

চলিয়া গেলেন। মিনিটখানেক পরে নকুল আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং নির্জ্জন ঘরটায় চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সিঁড়ি দিয়া ফকির তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন

ফকির। সহদেব, স্মেলিং সল্‌ট্‌ আছে? সহদেব কোথা গেল (নকুলকে দেখিতে পাইয়া) নকুল, কখন ফিরলে? ওকি, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে?

নকুল। তাড়িয়ে দিলে, কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিলে।

ফকির। কে তাড়িয়ে দিলে?

নকুল। সায়েব। চাকরিটা গেল।

নির্ব্বাক হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রেডিওতে বাগেশ্রীর আলাপ চলিতে লাগিল

তৃতীয় অঙ্ক

সাত দিন পরে। দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। দালানের তক্তাপোশটাতে অসুস্থ রুণু জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় শুইয়া আছে। টুনু মাথার শিয়রে বসিয়া জল-পটি দিয়া বাতাস করিতেছে। নকুল একটি টেবিলের ধারে দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পাশে টাইপ-রাইটারটাও রহিয়াছে

টুনু। বাবা, কাকা হাসপাতালে গেল কেন, মাকে আনতে?

নকুল। না, ওষুধ আনতে।

টুনু। রুণুর জন্যে?

নকুল। রুণুর জন্যেও আনবে, নিজের জন্যেও আনবে।

টুনু। কাকার কি হয়েছে?

নকুল। পা ফুলেছে দেখ নি।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব.

টুনু। মা কখন আসবে বাবা, সাতদিন হয়ে গেল, মা তো এখনও এল না; রুণুর জ্বরের খবর দিয়েছ মাকে?

নকুল। না।

টুনু। দাও নি কেন, দিলে মা ঠিক চলে আসবে।

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিল

টুনু। কাল পিসিমা কি বলছিল জান বাবা?

নকুল। কি ?

টুনু। বলছিল—মা স্বর্গে গেছে। স্বর্গ কোথায় বাবা, হাসপাতালের কাছে কোনও জায়গা ?

নকুল। বেশী কথা বোলো না টুনু, রুণুর ঘুম ভেঙে যাবে এখুনি। জলপটিটা শুকিয়ে যায় নি তো, দেখি—

উঠিয়া জলপটি ঠিক করিয়া দিলেন

টুনু। মাকে নিয়ে এস তুমি আজই।

নকুল কোন উত্তর না দিয়া কন্যার হাত হইতে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন

টুনু। বাবা, তুমি আপিস যাচ্ছ না কেন আজকাল ?

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

টুনু। মাকেও তো হাসপাতালে দেখতে যাচ্ছ না—

নকুল কোন উত্তর দিলেন না। বাহিরের দ্বার দিয়া পরিতোষ প্রবেশ করিল

নকুল। কে, ও পরিতোষ, এস বস।

পরিতোষ। আমি আপনার বিপদের কথা শুনেছি, কিন্তু নানা কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে আসতেই পারি নি। ওর জ্বর না কি ?

নকুল। হ্যাঁ, খুব জ্বর।

পরিতোষ। সতীশবাবুর কোন খবর পাওয়া গেল ?

নকুল। না।

পরিতোষ। আশ্চর্য্য কাণ্ড, ভদ্রলোক কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন হঠাৎ—

নকুল। কি জানি। (রুণুর গায়ে হাত দিয়া) উঃ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

টুনু। দাও বাবা, আমি জোরে জোরে হাওয়া করি।

নকুল। না থাক, আমি করছি।

পরিতোষ। সতীশবাবুর কোন খবর পাওয়া যায় নি তা হলে ? আমি ব্যক্তিগতভাবে এজন্য কুণ্ঠিত, ঠিক আগের দিনই সামান্য একটা কারণে ভদ্রলোকের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে গেল মিছিমিছি।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না। দুর্গামণি প্রবেশ করিলেন

দুর্গামণি। টুনু, তুই খেয়ে নি গে যা; ললিতা তোর ভাত বাড়ছে, আমি কাপড়টা ছেড়ে ফেলি গে, ট্রেণের আর কত দেরি, পিসেমশাই কোথা গেলেন ?

নকুল। গাড়ি ডাকতে গেছেন।

টুনু গলি-পথ দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল

পরিতোষ। আপনারা কোথাও যাচ্ছেন না কি ?

দুর্গামণি। সবাই নয়, আমি কুঙ্কুম আর পিসেমশাই চললাম অর্জ্জুনের কাছে; টেলিগেরাপ এসেছে আজ, সেখানে তাদের বাড়িসুদ্ধ সব অসুখে পড়েছে, মুখে জল দেবার লোক নেই। এখানে ললিতা আছে, দেখাশোনা করছে, ভারী নেটিপেটি মেয়েটি, বড় ভাল, পর বলে' মনেই হয় না।

পরিতোষ। কুঙ্কুমকে রেখে গেলেই পারতেন।

দুর্গামণি। ও আবার আমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারে না বাবা, বিয়ে হলে ও মেয়ে যে কি করবে তাই ভাবি। তুমি একবার এসো না অর্জ্জুনের ওখানে বেড়াতে, নৈহাটি, বেশী দূর তো নয়।

পরিতোষ। দেখি সুযোগ পাই তো যাব।

দুর্গামণি। হ্যাঁ এসো।

নকুল। ট্রেণের বেশী সময় নেই দিদি, কাপড় চোপড় যা পরবে—পরে নাও

দুর্গামণি। হ্যাঁ, এই যে নি, কুঙ্কুমের জিনিসগুলোও গুছিয়ে নিতে হবে।

ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কুঙ্কুম আসিয়া প্রবেশ করিল

নকুল। খাওয়া হয়ে গেল ?

কুঙ্কুম। হ্যাঁ, ললিতা-দি তোমারও ভাত বাড়ছে।

নকুল। আমার ? আমার এখন খিদে নেই।

কুঙ্কুম। যা পার চারটি খেয়ে নাও গিয়ে, কতক্ষণ হেঁসেল নিয়ে বসে থাকবে বেচারি।

নকুল। আমি খেয়ে নিলেই ওর ছুটি হয়ে যায় বুঝি; আচ্ছা, তা হ'লে যাই, তুই একে একটু হাওয়া কর্, আমি চট্ করে' খেয়ে আসি।

চলিয়া গেলেন। কুঙ্কুম বিছানায় বসিল

পরিতোষ। আজ তোমরা তা হ'লে চললে ?

কুঙ্কুম। হ্যাঁ।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। যে গৎগুলো শিখিয়েছিলাম সেগুলোর চর্চ্চা রেখো।

কুঙ্কুম। আমার তো এস্রাজ নেই, ললিতাদির এস্রাজটা বাজাতাম আমি।

পরিতোষ। মানে, যদি কোন এস্রাজ পাও ওখানে, পেতেও তো পার।

কুঙ্কুম। সেজকাকার ওখানে যখন ছিলাম তখন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয় তাঁর সখ ছিল ইংরেজি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করার; তাঁর সখ মেটাবার আশায় দিন কতক বি এল এ ব্লে করে' চেঁচিয়েছিলুম। আপনার হুজুগে পড়ে দু-চারটে গৎও শিখলুম, এবার আর কারো পাল্লায় পড়ে হয় তো কার্পেট-বোনা বা নাচ শিখতে হবে।

পরিতোষ। তুমি এসব জিনিস ঠিক ওই দৃষ্টিতে দেখ কেন কুঙ্কুম?

কুঙ্কুম। অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখতে শিখি নি।

একবাটি সাবু হাতে করিয়া ললিতা প্রবেশ করিল

ললিতা। রুণু ঘুমুচ্ছে না কি, সাবু করে' আনলাম ওর জন্যে। পরিতোষবাবু কতক্ষণ এসেছেন? সেদিন যে রকম রাগ করে' গেলেন, ভাবলাম আর বুঝি আসবেনই না।

মুচকি হাসিয়া সাবুর বাটিটা টেবিলে রাখিয়া বই চাপা দিল

পরিতোষ। এসেছি নেমন্তন্ন করতে, কুঙ্কুম তো চলেই যাচ্ছে দেখছি।

ললিতা। কিসের নেমন্তন্ন?

পরিতোষ। আমার বিয়ের। চন্দনার সঙ্গে পরশু দিন আমার বিয়ে।

ললিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল

কুঙ্কুম। আপনার বিয়ের! তবে যে সেদিন বললেন আপনার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই।

পরিতোষ। আমার সামর্থ্য নেই, চন্দনার বাবাই সামর্থ্য-সঞ্চার করছেন; (একটু হাসিয়া) মোটা পণ এবং একটা চাকরি—

দুর্গামণি। (ঘরের ভিতর হইতে) কুঙ্কুম এলি, তোর কোথায় কি আছে গুছিয়ে নে, আমি কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছি না।

কুঙ্কুম। যাই। চললাম পরিতোষবাবু।

চলিয়া গেল

ললিতা। চন্দনার সমস্ত ইতিহাস জেনেও তাকে বিয়ে করতে প্রবৃত্তি হ'ল আপনার! টাকাটাই বড় হ'ল?

পরিতোষ। না জেনে বিয়ে করার চেয়ে জেনে বিয়ে করাই ভাল, এটা বিজ্ঞানের যুগ।

ললিতা। চন্দনা যদি আমাদের মতো গরীব হত, করতেন?

পরিতোষ। আমার নিজের সামর্থ্য থাকলে কেবল ওই জন্যেই আপত্তি করতাম না।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। ফকিরবাবু কোথা?

ললিতা। বাবা সকাল থেকেই বেরিয়েছেন, কাকাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়।

পরিতোষ। আশ্চর্য্য, ভদ্রলোক গেলেন কোথা! যমুনা ওপরে আছে?

ললিতা। তিনি প্রমথবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন।

পরিতোষ। প্রমথবাবুটি কে?

ললিতা। আমি ঠিক জানি না, দাদা দাদা তো বলছিলেন।

পরিতোষ। দাদা? প্রমথ বলে' ওর কোন দাদা আছে বলে' তো মনে পড়ছে না, ওদের বাড়ির সকলকেই তো চিনি।

ললিতা চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। প্রমথবাবুর সঙ্গে কোথা গেছে?

ললিতা। ঠিকানা জানি না। শুনলাম প্রমথবাবুর বাসায় আজ সমস্ত দিন থাকবেন, সন্ধেবেলা সিনেমা দেখে তারপর ফিরবেন।

পরিতোষ। তা হলে তার জন্যে অপেক্ষা করা বৃথা। কার্ডখানা রেখে যাই তা হলে, দিয়ে দিও তোমার বাবাকে। আর তোমরা সবাই যেও, বুঝলে?

ললিতা। চেষ্টা করব।

পরিতোষ। নকুলবাবুকেও এই কার্ডখানা দিয়ে দিও, আমার আর বসবার সময় নেই, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

দুইখানি রঙীন নিমন্ত্রণপত্র বাহির করিয়া ললিতাকে দিল

আচ্ছা, চলি তাহলে এখন। নিশ্চয় যেও তোমরা

চলিয়া গেল। ললিতা নির্ব্বাক হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর সহসা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরের দ্বার দিয়া শিবাজী প্রবেশ করিল। পদশব্দ শুনিয়া ললিতা নিজেকে সামলাইয়া লইল

শিবাজী। (চুপি চুপি) ললিতা, একটা ঝুড়ি দিতে পারিস? বেশ বড় মজবুত-গোছের একটা ঝুড়ি?

ললিতা। কি হবে?

শিবাজী। (চুপি চুপি) পালাতে হবে, ঝুড়ির ভেতরে লুকিয়ে পালাতে হবে! ঔরঙ্গজেবের বন্দী হয়ে আজীবন বাস করব বলতে চাস?

ললিতার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল। নকুল ফিরিয়া আসিলেন। ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল

ললিতা। খাওয়া হয়ে গেল আপনার এর মধ্যে, আমি যাচ্ছিলাম এখনি।

নকুল। না, আমার আর কিছু লাগত না। তুমি বরং টুনুকে একটু দুধ দিয়ে এস, আর দেখ (একটু ইতস্তত করিয়া) একটু মেখে চেখে ওকে খাইয়ে দিতে পার যদি ভাল হয়, ওর মা ওকে খাইয়ে দিত।

ললিতা। আমিও খাইয়ে দিচ্ছি গিয়ে। পরিতোষবাবু এই চিঠিখানা দিয়ে গেলেন।

নিমন্ত্রণ পত্রখানা দিয়া চলিয়া গেল। নকুল পড়িয়া দেখিলেন এবং চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বাহিরের দ্বারে সর্ব্বমঙ্গলা ষ্টোরের সেই ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল

ছোকরা। বিলটা এনেছি, যাদববাবু বললেন—

নকুল। এখন আমার বড় বিপদ, কিছুদিন পরে এসো ভাই।

ছোকরা। বেশ, কোন্ তারিখে আসব বলুন?

নকুল। তারিখ? আচ্ছা আমি ওবেলা যাদববাবুর সঙ্গে দেখা করব।

ছোকরা। আচ্ছা।

চলিয়া গেল। পিসামহাশয় প্রবেশ করিলেন

পিসামহাশয়। তোমাদের এ কোলকাতা শহর রাজধানী না ঘোড়ার ডিম! একটা ভাল ঘোড়ার গাড়ি পাবার জো নেই। উঃ, এইটুকু রাস্তা মাত্র এসেছি, মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত কবজাগুলো ঢিলে হয়ে গেছে যেন। উফ্! আমার ঠাকুর্দার ব্রুহামখানায় চড়লে টেরই পাওয়া যেত না যে গাড়িতে চড়েছি। কই দুর্গা, তোদের হল, ট্রেণের আর বেশী দেরি নেই।

দুর্গামণি ও কুঙ্কুম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া আসিল

দুর্গামণি। আমাদের হয়ে গেছে। গাড়ি ডেকেছেন?

পিসামহাশয়। ডেকেছি। গাড়ি এ গলিতে ঢুকল না।

দুর্গামণি। আমাদের জিনিসপত্তরগুলো কে নিয়ে যায় তা হলে?

পিসামহাশয়। কে আর নিয়ে যাবে, (নকুলের দিকে চাহিলেন) পাঁস ফেলতে ভাঙাকুলো আমি তো আছিই; কই কি জিনিস আছে দেখি।

দুর্গামণি, কুঙ্কুম ও পিসামহাশয় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। নকুলও নীরবে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। একটু পরেই আবার সকলে বাহির হইয়া আসিলেন। পিসামহাশয়ের এক হাতে একটা রং-চটা সুটকেস, আর এক হাতে প্রকাণ্ড একটা পুঁটুলি। নকুলের হাতেও একটা সুটকেস, তাহার কলটা সম্ভবত খারাপ, সেটা দড়ি দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। দুর্গামণি, কুঙ্কুম প্রত্যেকেরই হাতে পুঁটুলি। দুর্গামণি যাইবার পূর্ব্বে ঘুমন্ত রুণুর চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন

দুর্গামণি। ভাল হয়ে যাবে মা ষষ্ঠীর কৃপায়, কোন ভয় করিস নি। ও ভাল হয়ে গেলে ওদের দুজনকে নিয়ে তুই বরং নৈহাটি যাস।

নকুল নীরব

টুনু খাচ্ছে বুঝি, থাক তাকে এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি, যেতে দেখলে এখুনি আবার স্টেশনে যাবার জন্যে কাঁদাকাটি করবে।

সকলে একে একে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। একটু পরেই ফকিরবাবু প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। ললিতাও রান্নাঘর হইতে আসিল

ফকির। ললিতা, তোর মা ফিরেছেন?

ললিতা। মা তো সন্ধ্যের সময় সিনেমা দেখে তবে ফিরবেন।

ফকির। তাই বলে গেছেন নাকি?

ললিতা। হ্যাঁ।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া একটা টিন হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল

ফকির। ওটা কি?

ললিতা। চিনির টিন, টুনুকে দুধভাতটা খাইয়ে আসি।

চলিয়া গেল। নকুল ফিরিয়া আসিলেন

ফকির। ওরা সব চলে গেল?

নকুল। হ্যাঁ।

ফকির। রুণু কেমন আছে?

নকুল। খুব জ্বর—

ফকির। ওষুধ পড়েছে কিছু ?

নকুল। সহদেবকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি, এখনও ফেরেনি। সতীশের কোন খোঁজ পেলেন ?

ফকির। কিচ্ছু না। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছি, দেখ তো ছবিটা থেকে ঠিক চেনা যাচ্ছে কি না—

নকুলকে কাগজটা দিলেন

নকুল। তা যাচ্ছে।

নকুল কাগজের পাতা উলটাইতে লাগিলেন। ফকির চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন

ফকির। (একটু ইতস্তত করিয়া) আমি সমস্ত বুঝছি, তোমাকে বলা বৃথা তা-ও জানি, তবু বলতে হচ্ছে—

নকুল খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন

[illegible] টাকা আছে তোমার ? ভাড়া কিছু দিতে পারবে ? আমি এখন চাইতাম না, কিন্তু বাধ্য হয়ে চাইতে হচ্ছে ; মানে (নিম্ন কণ্ঠে) এরা কেউ জানে না, এই বাড়িটা মর্টগেজ রেখে কিছু টাকা ধার নিয়েছি আমি, তারা সুদের জন্যে এখন ভয়ানক তাগাদা লাগিয়েছে, বলছে এখন সুদ না দিলে কম্পাউণ্ড ইন্‌টারেস্ট দিতে হবে। তা ছাড়া এই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিতে হ'ল এদেরও লম্বা বিল হবে একটা, চেনাশোনা ছিল বলেই ধারে ছেপেছে।

নকুল। শ্রাদ্ধটা হয়ে যাক, মৃন্ময়ীর গয়না যা দু-একটা আছে বিক্রি করে যার যা পাওনা আছে সব চুকিয়ে দেব।

ফকির লাল খামখানা সহসা দেখিতে পাইলেন

ফকির। 'শুভ বিবাহ'—এ আবার কি ?

নকুল। পরিতোষের বিয়ে, নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল।

ফকির। পরিতোষের বিয়ে! সে কি! আমি যে তার ওপর ভরসা ক'রে—

চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ও একদৃষ্টে নিমন্ত্রণ-পত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহদেব প্রবেশ করিল

সহদেব। উঃ, কি ভিড় হাসপাতালে!

নকুল। তোকে দেখে কি বললে ?

সহদেব। বললে বেরিবেরি হয়েছে। তেল আর ভাত খেতে মানা, জাঁতায় পেষা আটার রুটি, ঘিয়ের রান্না তরকারি, টমাটো, মুগের ডাল ভিজোনো, কমলালেবু, মাখন, ইস্ট্‌, এই সব খেতে হবে! আর প্রকাণ্ড একটা ইনজেকশনের ফর্দ্দ দিয়েছে, ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামের, দাম জেনে এলাম পনর টাকা! যত সব বোগাস!

নকুল। রুণুর ওষুধ এনেছিস ?

সহদেব। অনেক মারামারি ক'রে তিনদাগ সিনকোনা পেয়েছি। কুইনিন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি। এই নাও।

টেবিলের উপর শিশিটা রাখিল

আমার বড় ক্লান্ত লাগছে, শুইগে যাই।

ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। নকুল ও ফকির নিঃশব্দে বসিয়া রহিল

নেপথ্যে বিনয়। নকুলদা, বাড়ি আছ ?

নকুল। আছি, ভেতরে এস।

বিনয় প্রবেশ করিল

বিনয়। একটা সু-খবর আছে, আমাদের আপিসের টাইপিস্ট জগৎবাবুর বেরিবেরি হয়েছিল জান তো, সে হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেছে কাল রাত্তিরে। সায়েব নাকি বলেছে তুমি একজন ওলড্ হ্যাণ্ড, তুমি যদি অ্যাপ্লাই কর, তোমাকে নেওয়া হবে। বড়বাবু বললেন তুমি এক্ষুণি দরখাস্ত লিখে নিয়ে আপিসে সায়েবের কাছে চলে যাও।

নকুল। (পুলকিত) তাই নাকি ?

তাড়াতাড়ি টাইপরাইটারে কাগজ পরাইতে লাগিলেন

বিনয়। তোমাকে এই খবরটা দেবার জন্যে বড়বাবু আপিস থেকে পাঠালেন আমাকে। আমি চলি, তুমি শিগগির এস।

নকুল। হ্যাঁ যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি আমি।

দ্রুতবেগে টাইপ করিতে লাগিলেন। ফকির চুপ করিয়া লাল খামটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। টুনুকে কোলে করিয়া ললিতা প্রবেশ করিল

ললিতা। চল তোমাকে ওপরে ঘুম পাড়িয়ে দিই গে, এখানে অসুখের বিছানায় তোমাকে আর বসতে হবে না।

উপরে উঠিয়া গেল

ফকির। নকুল, তোমাকে একটি কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো ?

নকুল। কি বলুন ?

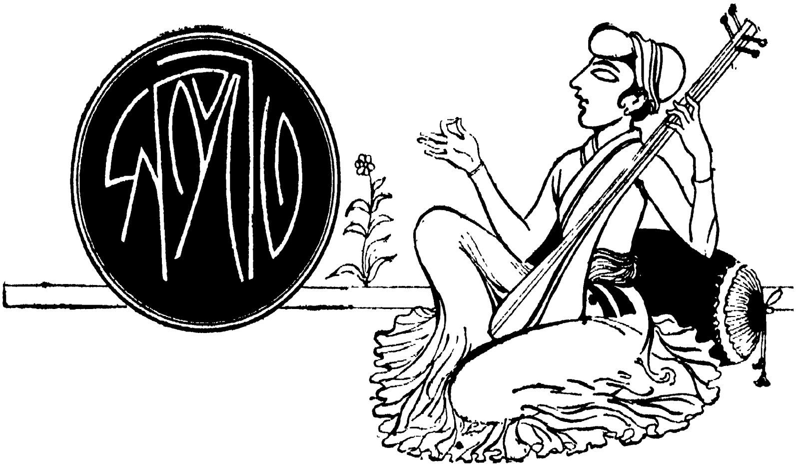
ফকির। তোমাকে দু'দিন পরে বিয়ে করতেই হবে ; তা না হলে, তোমার ওই কচি মেয়েদের দেখবে কে বল, তুমি আমার মেয়ে ললিতাকেই বিয়ে কর না—

নকুল একবার ঘাড় ফিরাইয়া ফকিরকে দেখিলেন, তাহার পর আবার টাইপ করিতে লাগিলেন। ফকির বলিয়া চলিলেন

নগদ টাকা আমার কিছু নেই, কিন্তু আমার ওই একটি মাত্র মেয়ে, আর সন্তান হবার সম্ভাবনাও নেই আমার, এ বাড়ি-ঘর-দোর সব তোমারই থাকবে, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর আমাকে তুমি ভাই।

তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেলেন, কিন্তু টাইপরাইটারে নকুলের দুটি হস্তই আবদ্ধ বলিয়া পারিলেন না। ঘুমন্ত রুণু অস্ফুট কণ্ঠে 'মা' 'মা' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। ফকির সাগ্রহে নকুলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। নকুল কোন উত্তর দিলেন না, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দ্রুত খট খট শব্দে টাইপ করিয়া যাইতে লাগিলেন

যবনিকা



কথা—শ্রীজগৎ ঘটক   সুর ও স্বরলিপি—কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার

ভজন

মন মন্দিরে জাগো ওগো দেবতা
দিবস রাতি
শয়নে স্বপনে মম জাগরণে
রহিও সাথী ॥

আমার পূজার মন্ত্র মাঝে
তোমার নূপুর নিত্য বাজে
(মম) অন্তরে প্রিয় রেখেছি তোমার
আসন পাতি ॥

আমার গানের ছন্দে সদা
জাগে তব নাম
তব প্রেমে মোর আঁখি নভে
বারি ঝরে অবিরাম।

আমার বীণার তারে তারে প্রিয়
তোমার হাতের পরশন দিও
(মোর) ধ্যানের প্রদীপে উঠুক তোমার
রূপ-শিখা ভাতি ॥

পা পদা
ম ন৽

\+ ০ + ০ +

II {মদা -পমা জ্ঞরা জ্ঞা | সা -রা রজ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞমা জ্ঞা রা | সরা -সা -ন্‌া -া I সা রা মা পদা |

ম৽ ৽ন্‌ দি৽ রে জা ৽ গো৽ ৽ ও গো৽ দে ব তা৽ ৽ ৽ ৽ দি ব স রা৽

° ‖ ॰ + ° + °
মপা -া -া-দা I পা মা জ্ঞা রা | জ্ঞসা -া পা পদা } I মদা -পমা জ্ঞরা জ্ঞা | সা রা রজ্ঞা -া I
তি॰ ॰ ॰ ॰ দি ব স রা তি॰ ॰ ম ন॰ ম॰ ॰ ন্ দি॰ রে জা ॰ গো॰ ॰

\+ ° + ° +
-া -া -া সা | সা রা মা রা I মা মপা মপা -া | পা ধা ণা পধা I ধর্সা -া -ণা পা |
॰ ॰ ॰ ॰ শ য় নে ॰ স্ব প ॰ নে॰ ॰ ম ম জা গ॰ র ॰ নে ॰

° + ° + °
পা ণা র্সা র্রা I র্সর্রা -র্সা -ণর্সা -ণা | -ধণা -ধা -পা -দা I পা মা জ্ঞা রা | সা -া পা পদা II
র হি ও সা থী॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ দি ব স রা তি ॰ ম ন॰

\+ ° + ° +
-া -া II র্সা র্সা -া র্সর্রা | র্সণা -া -ধা -পা I পা -ধা ণা ধা | ণপা -া -া -া I পধা ধর্সা -া পধা |
॰ ॰ আ মা র্ পূ ॰ জা ॰ ॰ র্ ম ন্ ত্র মা ঝে ॰ ॰ ॰ তো॰ মা॰ র্ নু॰

° + ° + °
ধর্সা -া -া -া I র্সর্রা -র্সজ্ঞা র্রা জ্ঞা | র্সা -া -া -া I পনা -র্সর্রা র্সা ণা | ধণা -পদা পা -া I
পু॰ ॰ ॰ র্ নি॰ ॰ ত্য বা জে॰ ॰ ॰ ॰ অ॰ ॰ ন্ ত রে প্রি॰ ॰ ॰ য় ॰

\+ ° + ° +
পা মা জ্ঞরা সরা | রজ্ঞা -া -া -া I পা মা জ্ঞা রা | সা -া -া -া I সা রা মা পদা |
রে খে ছি॰ তো॰ মা॰ ॰ ॰ র্ আ স ন পা তি ॰ ॰ ॰ দি ব স রা॰

মপা -া পা পদা II
তি॰ ॰ ম ন॰

\+ ° + °
-া -া II পা পমা -ধপা মজ্ঞা | রা -া -া -া I সরা -জ্ঞমা জ্ঞা রা | সা -া -ন্া -া I
॰ ॰ আ মা॰ ॰ র্ গা নে ॰ ॰ র্ ছ॰ ॰ ন্ দে স দা ॰ ॰ ॰

\+ ° + ° +
সরা -গমা রগা -া | -া -া মা পা I গপা -মগা -রগা -া | -া -া া া I মা মা -পা পা |
জা॰ ॰ ॰ গে॰ ॰ ॰ ॰ ত ব না॰ ॰ ॰ ॰॰ ম ॰ ॰ ॰ ॰ ত ব ॰ প্রে

° + ° +
পণা -ধপা মগা -মা I পা ধা ণা পধা | ধর্সা -ণধা পা -া I পা -পধা পা -ধপা |
মে॰ ॰ ॰ মো॰ র্ আঁ খি ন ভে বা॰ ॰॰ রি ॰ ঝু ॰ ॰ রে ॰ ॰

-া -া মা রগা I গমা -া -া -া | -া -া । । I { মা পা -া পা | পর্সা -া র্সা র্সা I
০ ০ অ বি০ রা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র বী ণা০ র্ তা রে

দা -পা দা দর্ঋা | র্সা -া -া -া I ধর্সা ধর্সা -র্জ্ঞা র্রা | র্সা -া র্সা র্সা I
তা ০ রে প্রি য় ০ ০ ০ তো০ মা০ ০র্ হা তে র্ প র

নর্সা -র্রা ণা র্সা | র্সদা -া (-পা -া) I } I পা -মা I পা ধা ণা পধা |
শ০ ০ ন দি ও০ ০ ০ ০ মো র্ ধ্যা নে র প্র০

ধর্সা -া ণা -া I পণা পণা -র্সর্রা র্রর্সা | র্সণা -া -ধণা -ধপা I র্সনা -র্রর্সা ণা পা |
দী ০ পে ০ উ০ ঠু০ ০ক্ তো০ মা০ ০ ০০ ০র্ রূ০ ০০ প শি

মজ্ঞা -া রজ্ঞা -সরা I রপা -া -া -া | -া -া । । I পা মা জ্ঞা রা | সা -া পা পদা IIII
খা ০ ভা০ ০ তি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দি ব স রা তি ০ ম ন০

আলেখ্য ঃ অবনীন্দ্রনাথ

৺কুলচন্দ্র দে

আলেখ্য কে বলে ?—এ যে কাব্যে আলিপনা !
যক্ষের কাকুতি গীতি—আকুল ক্রন্দন
পদ্মপর্ণে বর্ণে বর্ণে উর্ব্বর কল্পনা
সদ্যঃস্নাতা সুজাতার মৌন নিবেদন।
দারার সে ছিন্নমুণ্ড—লক্ লক্ অসি—
জিঘাংসা জাগ্রত নিজে ; তারি পাশে ভুলে
গড়িলে কি পুষ্পরাধা—শ্যামের মানসী
শিল্প-সিংহাসনে বসি কল্পনদী কূলে ?

ভগ্নজীর্ণ মন্দিরের খুলি রুদ্ধ দ্বার
কক্ষে কক্ষে দিলা জ্বালি সুবর্ণ-দেউটি
ভাস্কর্য্যে ভাস্বর আজ ভারত-ভাণ্ডার
ভ্রমর "ওমর"-কুঞ্জে করে ছুটাছুটি
অতীতের পুণ্যভস্মে রঞ্জিয়াছ পট
মহিমা-মণ্ডিত আজ, জরাজীর্ণ মঠ !

অবনীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীবীণা দে

বিশ্বরূপের হে প্রিয় পূজারি !
শিল্পী-শ্রেষ্ঠ তুমি।
অবনী-মাঝারে উজলি ধরিলে
ভারত মাতৃভূমি।
সার্থক তব নাম !
সত্যই তুমি অবনী-ইন্দ্র ! পুরালে মনস্কাম
শত-বিচিত্র-রস-সম্ভারে, সোনার তুলিকা-পাতে
ফুটায়ে তুলেছ জাতীয়-জীবন, সাধক নিপুণ হাতে
আঁধার ভারত নিকষের বুকে জ্বালিয়া দিয়াছ আলো
নব-ভারতীয়-চিত্রকলায় ঘুচায়ে তমসা কালো।
বিশ্বরূপের আরতি করিলে শত-বরণের শিখা ;
তোমার আয়ুর পঞ্জিকা হোক্ শত বরষেতে লেখা ;
হোক্ অক্ষয় স্বর্ণ তুলিকা, হে গুরু ! তোমার করে ;
চলি যেন মোরা তব নির্দ্দেশে, তব বর্ত্তিকা ধরে',
পরম-দেবতা-চরণ সমীপে এই প্রার্থনা মম—
হোক্ জয়ন্তী বরষে বরষে। শত-আয়ু-গুরু ! নমঃ।

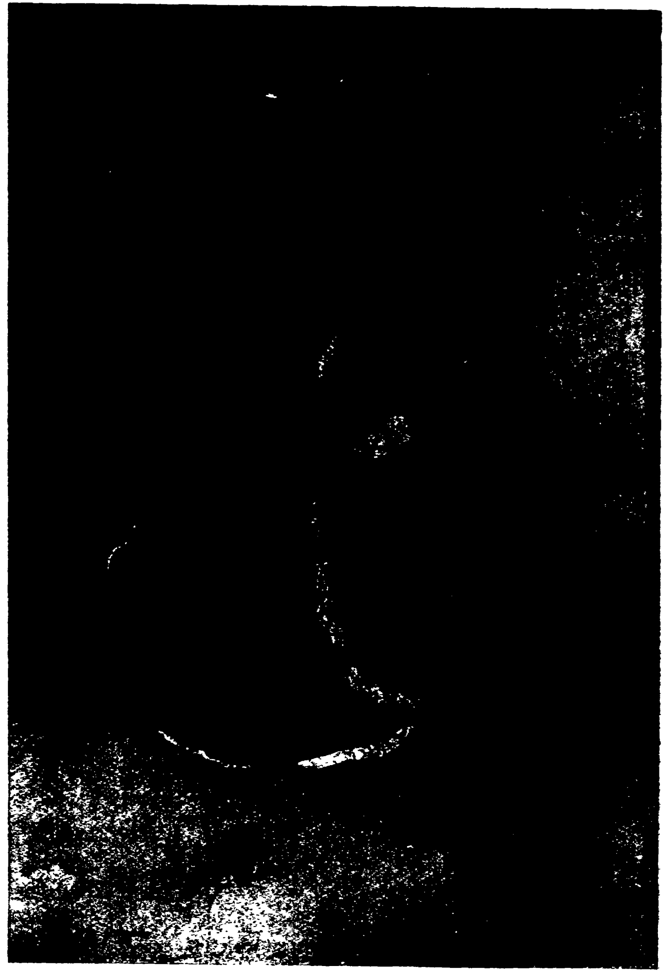


আচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত



যমুনা কূলে শিল্পী—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

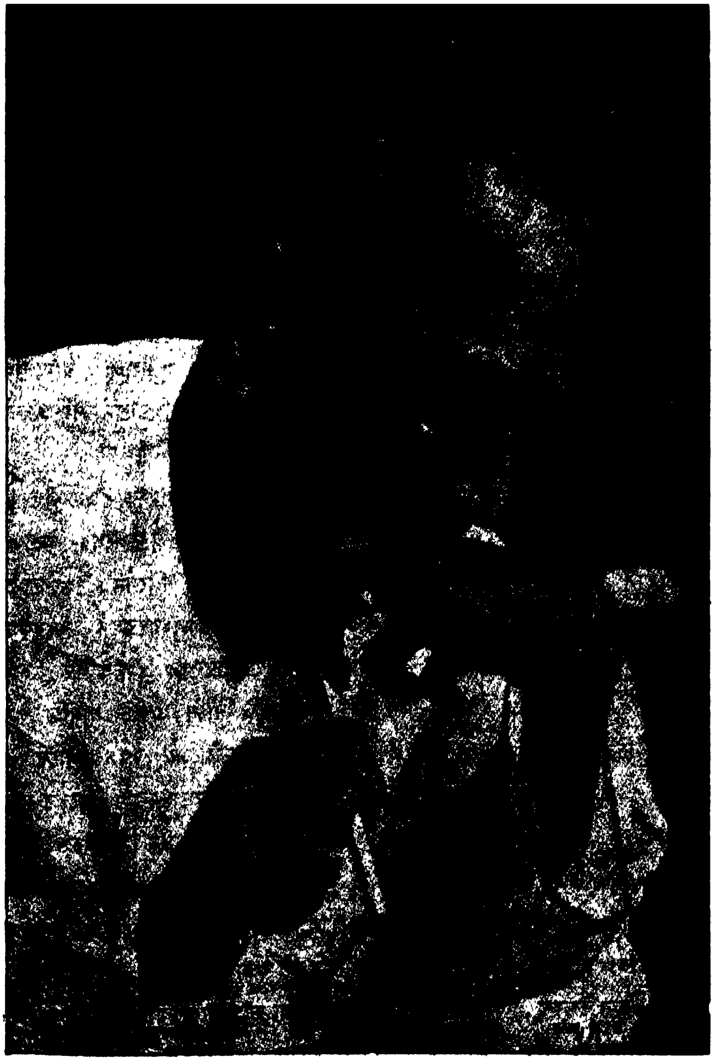


সচকিত শিল্পী—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির জন্মদাতা, আমার গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জন-কোলাহলের বাহিরে তাঁহার নিজের স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন। জীবনের সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিয়াও তিনি থাকেন বহুদূরে। এই কলিকাতা নগরীর কোন গণ্ডগোল তাঁহার কাছে পৌছিয়াও পৌছাইতে পারে না। বাড়ীর একান্তে তাঁহার নিজের আসনটিতে বসিয়া গত ষাট বৎসর হইতে ছবি লিখিয়া আসিতেছেন। ইহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, অক্লান্ত প্রযত্ন, একাসনে অবিশ্বাস সাধনা, অসীম ধৈর্য্য ও কঠোর তপস্যা। তাঁহার লেখনীও বঙ্গভাষায় অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছে এবং গদ্য সাহিত্যে নূতন পথ দেখাইয়াছে। সাহিত্যিক মাত্রেই তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় শিল্পীদের কাজ তাঁহার নখদর্পণে। তাঁহার শক্তিশালী তুলিকা দেশবাসীর ও বিদেশ-বাসীর জন্য যে শিল্পসৃষ্টি করিয়াছে তাহা চিরস্থায়ী। তাঁহার এই শিল্প-সৃষ্টি চিরকাল জাহ্নবীধারার ন্যায় দেশ-দেশান্তরকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিবে। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের মতই মহান, তিনি সিদ্ধ-পুরুষ। প্রশংসা, মান, লাভ, যশ, অর্থ—তিনি কিছুই চান নাই। তিনি সমস্তই জয় করিয়াছেন। ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হইয়াছে।



চিত্রাঙ্কনরত শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শ্রীমুকুল দের সৌজন্যে)

ভারতীয় চিত্রকলা যখন অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত, যখন সাধারণে ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তখন তিনিই পুনরায় নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই ঝঞ্ঝার দিনও আমাদের মনে আছে। কী প্রতিকূল অবস্থার

মধ্য দিয়াই না তাঁহাকে নিজের পথ করিয়া লইতে হইয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলা মন্দিরকে তিনিই সংহত ও সুদৃঢ় শিলাভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন। আজ তাহা বিশ্বে অমর স্থান পাইয়াছে। আজ সমগ্র ভারতেই তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ ভারতীয় চিত্রকলার কর্ণধাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাও অবনীন্দ্রনাথের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার দানের জন্য আমরা সকলেই তাঁহার কাছে ঋণী। এই মহাপুরুষকে চেনা সহজ ব্যাপার নহে।

অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতার ঠাকুর পরিবারে ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে, জোড়াসাঁকো ভবনে ১২৭৮ সাল, ২৩ শ্রাবণ, সোমবার, দিবা দুই প্রহর এগার মিনিট সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺গগনেন্দ্রনাথও একজন খ্যাতনামা চিত্রকর এবং মধ্যম ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথও একজন অধ্যয়নপরায়ণ ও আত্মস্থ প্রকৃতির লোক। তিনিই তাঁহাদের জমিদারীর বিষয়-সম্পত্তির ভার হাতে লইয়া তাঁহার দুই ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে ছবি আঁকিবার কাজে যথেষ্ট অবসর দিয়া আসিয়াছেন।

ঠাকুর পরিবারের এই শাখাটির ইতিহাস আলোচনা করিলে পুরুষানুক্রমিক শিল্পানুরাগিতা পরিদৃষ্ট হয় এবং তজ্জন্যই ইহার বর্ত্তমান বংশধরগণ শিল্পকলা, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও চিত্রামোদী এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর গোষ্ঠীতে যোগ দিতেন। জাপানের বিখ্যাত আর্ট-সমালোচক কাকুজো ওকাকুরা এবং ঐ দেশের এখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর য়োকোয়ামা টাইকান্, সিংহলের কুমারস্বামী, ইংলণ্ডের রোথেন্‌স্টাইন্, ত্রিবাঙ্কুরের বিখ্যাত চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা, কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ্ জাষ্টিস স্যার জন্ উডরফ্, বঙ্গের লাট লর্ড কারমাইকেল ও লর্ড রোণাল্ডসে, মিঃ এডউইন্ মণ্টেগু, স্যার জন্ হোমউড, প্যারিসের মিস্ কারপ্রেস্, মিঃ নরমান্ ব্লাণ্ট, মিঃ পণ্টেন-মুলার, মিঃ কটন্—আরো কত শত গুণী এই ৫নং বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। বিদেশের চিত্রশিল্পীদের এই জোড়াসাঁকোর বাড়ীই তাঁহাদের ভারতবর্ষের বাড়ী ছিল এবং ঐ বাড়ীতে তাঁহারা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখে বসিয়া বহু চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন।

অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথও একজন চিত্রকর ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় রীতিতে প্রতিকৃতি এবং স্থান-চিত্র অঙ্কন করিতেন। বেলগাছিয়া উদ্যানের চিত্রশালার তৈলচিত্রগুলির তিনি নকল করিয়াছিলেন। প্রথম ভারতীয় খ্যাতনামা তৈলচিত্রকর ডাঃ গৌরীশঙ্করকে তিনি বন্ধুভাবে পাইয়াছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন নাট্যকার এবং সুরশিল্পী। তিনি অনেকগুলি গান ও যাত্রাভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন এবং ঝটিকা আসন্ন, তখন মৃদঙ্গের বাদ্য ও সঙ্গীত সহযোগে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় ভ্রমণ ছিল গিরীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় ব্যসন। রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় গিরীন্দ্রনাথের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গুণেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (ইনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ) বহুবাজার আর্ট স্কুলের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। গুণেন্দ্রনাথ তথায় দুই-তিন বৎসর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। কয়েকজন ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক সম্মিলিত হইয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টাতেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সময়ে এটি স্কুল অফ্ ইণ্ডাসট্রিয়াল আর্ট নামে পরিচিত ছিল। তৎপরে প্রাচীন আর্ট গ্যালারীর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড নর্থব্রুক্ যখন গভর্ণর জেনারেল, তখন এই প্রতিষ্ঠানটিকে গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্ট-এ পরিণত করা হয়।

অন্যান্য অনেকের মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মিঃ জষ্টিস্ প্রাট্-এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। বিদ্যালয়টি প্রথমত ১৮৫৪-১৮৫৫তে জোড়াসাঁকো পল্লীর একটি বাড়ীতে (সেটি এখন মল্লিক পরিবারের বসত বাটি) অবস্থিত ছিল এবং যথাক্রমে কলুটোলায় (১৮৫৬-১৮৫৮) একটি বাড়ীতে

(বর্ত্তমানে মেডিক্যাল কলেজ চক্ষু চিকিৎসালয়) শিয়ালদহে (১৮৫৯-১৮৬৩) এবং বহুবাজারে বৈঠকখানায় (১৮৬৪-১৮৯২) স্থানান্তরিত হয়।

গিরীন্দ্রনাথের ন্যায় তদীয় পুত্র গুণেন্দ্রনাথও বিভিন্নমুখি-সৌন্দর্য্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আলোকচিত্রশিল্পে, উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়, উদ্যান রচনায় এবং প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার স্বরচিত উদ্যানে উৎপাদিত পুষ্পরাজি তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিতেন এবং তজ্জন্য বহু পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। একটি পুষ্প-বাটিকা রচনাকল্পে তিনি সুবিখ্যাত পুষ্পতত্ত্ববিৎ এস, পি, চ্যাটার্জ্জিকে পাঁচশত টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন। আলিপুরে প্রতিষ্ঠিত এগ্রি-হর্টিকালচারল্‌ সোসাইটির তিনি একজন লাইফ্‌ মেম্বার এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিরও একজন মেম্বার ছিলেন। নাটকাভিনয় তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এই শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয় কিরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ইহা হইতে তাহা কতকটা ধারণা করা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাদের নর্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করেন। জোড়াসাঁকোতে চিৎপুর রোডের যেস্থানে হরেন শীল মহাশয়ের বাড়ী, সেই স্থানে নর্মাল স্কুলটি তখন অবস্থিত ছিল। তিনি তথায় দুই-তিন বৎসর বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

একদিন তাঁহার ইংরেজী শিক্ষক, পুডিং কথাটি পাডিং বলিয়া উচ্চারণ করিলে অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার এই ভুল নির্দ্দেশ করিলেন এবং বলিলেন, তিনি প্রতিদিন রাত্রের আহারে পুডিং খাইয়া থাকেন, তিনি ইহার উচ্চারণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ইহাতে তাঁহার শিক্ষক মহাশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করিলেন এবং টানাপাখার দড়ি দিয়া বেঞ্চের সহিত তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে বেলা চারিটা পর্য্যন্ত রাখা হইল। তাহার পর বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে অবনীন্দ্রনাথ দড়ি খুলিয়া বাড়ীতে



অবনীন্দ্রনাথ শ্রীযুত মুকুলচন্দ্র দে'কে শিল্প-শিক্ষা দিতেছেন

পলায়ন করিলেন। এই প্রকার শাস্তি তাঁহার পিতার বিরক্তির কারণ হইল এবং সেইদিন হইতে নর্মাল স্কুলের সহিত অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইল।

রঙ দিয়া গৃহাদির নক্সা ও খসড়া চিত্র করা অবনীন্দ্রনাথের পিতার একটি বিশেষ খেয়াল ছিল। নর্মাল স্কুল ছাড়িবার পর অবনীন্দ্রনাথ কুটীর ও তালবৃক্ষাদি সমন্বিত গ্রাম্য দৃশ্যাবলী অঙ্কনে পিতার রঙের বাক্সের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পিতার লাল-নীল পেন্‌সিলের সাহায্যে সেইরূপ সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কনেও তিনি বেশ নিপুণতা অর্জ্জন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর।

এই সময় গুণেন্দ্রনাথের সাংসারিক ব্যাপারে একটা পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গ চাঁপদানিতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি বাগান বাড়ীতে স্থানান্তরিত হন। সেখানের আবহাওয়া কলিকাতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বাড়ীটি ছিল একটি পুরাতন ভুতুড়ে-বাড়ী। ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী এমন একটি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেটি পূর্ব্বে দস্যুতস্কর ও যত দুর্বৃত্তদের একটি আড্ডা ছিল। বাগানটির আয়তন ছিল ১০০ বিঘার অধিক এবং অস্থি ও নরমুণ্ডে সেটি সমাকীর্ণ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ এই সমস্ত নরমুণ্ড লইয়া ফুটবল খেলিতেন, কখনও বা সেগুলি লইয়া উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিতেন। এই প্রেতপুরীই অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যবোধ ও কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করে। সেই বাগানবাড়ীতে হরিণ, ময়ূর, বক, সারস ও নানাজাতীয় পশুপক্ষী স্বাধীনভাবে বিচরণ করিত। রাত্রে শৃগালেরা নানাপ্রকার সুন্দর পোষা হাঁস মারিয়া খাইত, আর প্রাতঃকালে তাহাদের বিচিত্রবর্ণের পালকে স্থানটি সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। গৃহটি ছিল যেন একটি আর্ট গ্যালারীর যাদুঘর। তথায় সুন্দর সুন্দর পুষ্পপাত্র, গালিচা, পর্দ্দা এবং বিভিন্ন বর্ণের ও গঠনের অন্যান্য গৃহসজ্জায় ভরা ছিল। সেগুলি শিশুশিল্পীর মনে গভীর আনন্দ দিয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে তাঁহার পিতার তুলি, রঙ ও পেন্‌সিল ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পিতা এইজন্য মনে মনে অবনীন্দ্রনাথের উপর খুশীই ছিলেন। এখানে পশুপক্ষীগুলিকে তিনি জীবিত মডেল রূপে পাইতেন, আর পাত্রাদি ও গালিচাসমূহে দেখিতেন বিচিত্র গঠনভঙ্গিমা ও বর্ণসমাবেশ। এই বাগানবাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথ দেখিতেন পল্লীবালাগণ জলপূর্ণ কলসীকক্ষে গঙ্গা হইতে ফিরিতেছে। এইরূপ আরও কত বঙ্গপল্লীসুলভ বিশিষ্ট দৃশ্যাবলী তাঁহার নয়নপথে পড়িতে লাগিল। কাজে কাজেই মাত্র নয়-দশ বৎসরের বালক অবনীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধুর্য্য স্থায়ীভাবে স্থান পাইতে থাকে। তিনি কোন সুযোগ হেলায় হারান নাই। তাঁর এখানকার এই স্কেচগুলি দেখিয়া তাঁহার এক কাকা নীলকমল মুখোপাধ্যায় এত খুশী হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাকে কতকগুলি রঙ্গীণ ছবি ও আঁকিবার জন্য একটি কাঁচের স্লেট হগ্ মার্কেট হইতে কিনিয়া উপহার দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি পর্দ্দায় সূঁচসুতা দিয়া কিছু ডিজাইনও করিয়াছিলেন এবং ময়দা দিয়া কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি তৈয়ারী করিতেন। এই চাঁপদানীর বাগানবাড়ীই তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম বড় আঘাত দেয়, কেন না এইখানেই তাঁহার পিতার অল্প বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হয়। তখন অবনীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র দশ বৎসর।

এই দুর্ঘটনার পর তাঁহার পরিবারবর্গের সকলেই নৌকাযোগে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের অভিভাবক যোগেশ গাঙ্গুলী ও নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা তাঁহাদের দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। অবনীন্দ্রনাথের মাতার ইচ্ছানুসারে তাঁহার অভিভাবকেরা পুনরায় শিক্ষার জন্য তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

১৮৮১-১৮৯০ সালে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় তিনি সরস্বতীদেবীর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেন এবং ইহার জন্য প্রথম পুরস্কার পান। তিনি পারিতোষিক হিসাবে অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তকও পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত কলেজে চিত্রাঙ্কনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় যে সব ভাঙ্গা মন্দির, চন্দ্রালোক, সন্ধ্যা, প্রত্যূষ প্রভৃতি বিষয়ের ছবি আঁকিয়াছিলেন সেই সব বিষয়ে বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে তাঁহার সহপাঠী ভবানীপুরের অনুকূলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি মহাশয়ের নিকট কিছু কিছু চিত্রাঙ্কন শিখিতে লাগিলেন। তিনি পেন্‌সিলের লাইনে যে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিতেন সে কথা অবনীন্দ্রনাথের এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমতী সুহাসিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সুহাসিনী দেবী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বংশধর ভুজগেন্দ্রভূষণ চ্যাটার্জ্জির কনিষ্ঠা কন্যা। সংস্কৃত কলেজে নয় বৎসর পড়িবার পর তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। ইহার পর দেড় বৎসর তিনি বিশেষ ছাত্ররূপে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে (১৮৯০-১৮৯২) ইংরেজি সাহিত্য পড়েন এবং সবিশেষ মনোযোগ সহকারে ফাদার লেফণ্টের বিজ্ঞানের বক্তৃতাগুলি শুনেন।

১৮৯২-১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার ছেলেবেলায় অঙ্কিত অনেক চিত্র সাধনা, চিত্রাঙ্গদা এবং রবীন্দ্রনাথের অপরাপর পুস্তকে প্রকাশিত হয়। তাঁহার নিজের বই শকুন্তলা এবং ক্ষীরের পুতুলেও ছাপা হয়। বিম্ববতীর গল্প চিত্রে বুঝাইবার জন্যও তিনি অনেক ছবি আঁকেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিয়া নিজে গাহিতেন এবং অবনীন্দ্রনাথ এস্‌রাজে এই সব গানের অনুধাবন করিতেন। ইহার পর চারি বৎসর (১৮৯২-১৮৯৬) অবনীন্দ্রনাথ সঙ্গীত চর্চা করেন এবং পুস্তকের জন্য বহু ছবি আঁকেন। এই সময় তিনি গল্প ও ছবি দুই লিখিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন অবনীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর তখন তিনি কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ একজন ইটালীয়ান চিত্রকর সিনর গিলহার্দ্দির নিকট লতাপাতা অঙ্কন, প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে চার্লস্ এল, পামারের আগমন অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-মনের বিশেষ পরিবর্ত্তন আনে। পামার সাহেবের কীড্ ষ্ট্রীটে একটি স্টুডিও ছিল। অবনীন্দ্রনাথ সেইখানে গিয়া তাঁহার কাছে চিত্রলিপি শিখিতে লাগিলেন। পামার সাহেবের কাছে তিন-চার বৎসর শিক্ষার পর (১৮৯৭-১৯০১) অবনীন্দ্রনাথ তৈলচিত্রে ও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কনে এমন পারদর্শিতা লাভ করিলেন যে, তিনি দুই ঘণ্টায় একটি আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন। এই সময়ে তিনি চিত্রাঙ্গদার জলে প্রতিচ্ছায়া দর্শন," "শকুন্তলা" প্রভৃতি বড় বড় তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। কিছুকাল পরেই এগুলি সব তিনি প্রায় বিনামূল্যেই ম্যাকেঞ্জী লায়ালের নীলামে বিক্রয় করিয়া দেন। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ একবার মুঙ্গেরে বেড়াইতে যান এবং এই মুঙ্গের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিল্পচর্চ্চার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে।

মুঙ্গের হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আবার পামার সাহেবের নিকট কিছুকালের মত জল রং-এ ছবি আঁকিবার শিক্ষা লইলেন। তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার মুঙ্গেরে যান। যাইবার সময় তিনি পামার সাহেবের নিকট যে সব ছবি আঁকিয়াছিলেন সেগুলি সঙ্গে লইয়া যান এবং তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়া সেই ছবিগুলিকে পরিস্ফুট করিতে লাগিলেন। এখানে কষ্টহারিণীর ঘাটে বসিয়া তিনি প্রাণ খুলিয়া জল রং দ্বারা ছবি আঁকিতে লাগিলেন। এই ঘাটে বসিয়াই তিনি পল্লীবাসীদের নদীতে আসা-যাওয়া দেখিতেন। পশ্চিম ভারতীয় পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা এই তাঁহার প্রথম। মানুষের চলাফেরা, নানা রঙের বসন, ভূষণ, ধরণধারণ,



১৯১২ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী নাটকের অভিনয়ে জোড়াসাঁকো রাজবাড়ীতে তিন ভ্রাতা—বামে কবিরাজের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ, মধ্যে রাজার ভূমিকায় গগনেন্দ্রনাথ ও দক্ষিণে কোষাধ্যক্ষের ভূমিকায় সমরেন্দ্রনাথ

মোগল আমলের ভাঙ্গাচোরা স্নানের ঘাট ও কেল্লা দর্শনের ফলে তাঁহার মন পুরাকালের ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইল। পুরাতন ভারতের অতুলনীয় চারুকলা সম্পদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি তৈলচিত্র ছাড়িয়া জল রং-এ ছবি আঁকিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের "টিশিয়ান" হইবেন বলিয়া বাল্যজীবনে তিনি মনে যে আশা রাখিয়াছিলেন সেটি এখন হইতে চিরকালের মত ত্যাগ করিলেন।

একদিন পিতৃপিতামহের সুবিশাল গ্রন্থাগারের মধ্যে

অবনীন্দ্রনাথের চোখে পড়িল একখানি সুচিত্রিত ইন্দো-পারসিক পাণ্ডুলিপি। সেইদিন হইতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। সেই পুরাতন রেখাঙ্কন তাঁহার কল্পনাকে উদ্দীপিত করিল এবং রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক চিত্রাবলীর অঙ্কন সুরু করিতে অনুপ্রাণিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইল তাঁহার ইউরোপীয় শিল্পশিক্ষার্থীর জীবন। এই ঘটনাই ভারতীয় শিল্পধারাকে নবজীবন দানে উৎসারিত করিবার পবিত্র কর্ত্তব্যে তাঁহাকে ব্রতী করিল। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। তেইশ বৎসরের যুবক অবনীন্দ্রনাথ সেইদিন হইতে ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার দশ বৎসর পরে সৌভাগ্যক্রমে হ্যাভেল সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই তরুণ উৎসাহী তাঁহাকে একজন প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ বন্ধুরূপে পাইলেন। ভারতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে উভয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। তখন হইতে বর্ত্তমান কলিকাতা শিল্প-শিক্ষালয় ভারতীয় শিল্পধারাকে প্রাণবান করিয়া তাহার নবরূপ বিধানে সচেষ্ট হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেল সাহেবের সহিত কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্ট-এ সহকারী অধ্যক্ষরূপে এবং অধ্যক্ষরূপে আট বৎসর কাজ করিতে থাকেন। এই সময় এই আর্ট স্কুলেই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিএণ্টাল আর্টের পত্তন হয়। লর্ড কিচেনার, স্যার জন্ উডরফ্, লর্ড কারমাইকেল, এডউইন মণ্টেগু, লর্ড রোনাল্ডসে, স্যার জন্ হোমউড, কুমারী কারপ্লেস, ভগিনী নিবেদিতা, মিঃ ব্লাণ্ট, মিঃ পণ্টেন-মুলার, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা প্রভৃতি এই সোসাইটির প্রথম লাইফ্ মেম্বার ছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটির ফাউণ্ডার মেম্বার হইয়া তাহার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী ইউরোপের খ্যাতনামা শিল্পীদের কাজের সহিত তুলনা হইতে পারে; চিত্রজগতে তাঁহার কৃতিত্বের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। তাঁহার যে সমস্ত চিত্র দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটির নাম উল্লেখ করি; যথা—ভারতমাতা, শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা, শাজাহানের মৃত্যু, সম্রাজ্ঞী মেরীর জন্য অঙ্কিত অশোক-মহিষী, শাজাহানের স্বপ্ন, বুদ্ধ সুজাতা, সিদ্ধ দম্পতি, অভিসারিকা, কচ ও দেবযানী, দারার ছিন্নমুণ্ড পরীক্ষারত আওরঙ্গজেব, পূজারিণী, দেবদাসী, বিরহী যক্ষ, ওমর খৈয়াম ও আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী, ভগীরথ, বাবা গণেশ ও পার্ব্বতীর তপস্যা, সাহাজাদপুরের পল্লীদৃশ্য, অসংখ্য স্থানচিত্র এবং পশুপক্ষীর চিত্র প্রভৃতি। তাঁহার বিখ্যাত চিত্র 'আলমগীর' একটি মহতী পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'কাজরী' ও 'শেষ বোঝা' তাঁহার অন্যতম দুইখানি প্রসিদ্ধ চিত্র। মোট কথা তাঁহার সমস্ত চিত্রই গভীর ও চিরস্থায়ী। 'শাজাহানের মৃত্যু' নামক কাঠের তক্তার উপর আঁকা তৈল-চিত্রটি দেখিতে ঠিক হলেও্ দেশীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবির মত। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য এবং গদ্য ও পদ্য রচনা অবনীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রকাশ। শিশুসাহিত্যের দিকেও তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণ ও মহাভারতের বৃহৎ নব সংস্করণ, ভারত-শিল্প, রাজকাহিনী, শকুন্তলা. ক্ষীরের পুতুল, ভূতপত্রি, নালক, নহুষ, আল্পনা, বুড়োআংলা, এনাটমি অফ্ ইণ্ডিয়ান আর্ট ইত্যাদি পুস্তকগুলি বাংলা ভাষার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক রচনা, প্রবন্ধাদি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিলে মূল্যবান গ্রন্থ হইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী প্রফেসার নিযুক্ত করা খুবই সমীচীন হইয়াছিল। সেই সূত্রে তিনি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেগুলি চিরদিনের জন্যে শিল্প সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইয়া থাকিবে। তাঁহার শিল্পী মনের বিকাশ বিচিত্র পথে। বীণা, বেহাল', বাঁশি, সেতার ও এস্‌রাজ তিনি চমৎকার বাজাইতে পারেন। তিনি একজন সঙ্গীতামোদী। উদ্যান রচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। মার্ব্বেল ও সাধারণ পাথরে অনেক ভাস্কর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনায় ও অলঙ্করণে তিনি অতি সুনিপুণ এবং স্বয়ং একজন উঁচু দরের অভিনেতা। রবীন্দ্রনাথের অনেক সুবিখ্যাত নাটক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে—বিশেষত কল্পনাপ্রবণ অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত প্রযোজনায়। বাল্মীকি-প্রতিভা, ডাকঘর, ফাল্গুনী প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের নানা অভিনয়ে তিনি অভিনয় করিয়াছেন। হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁহার এবং হাস্যরসাত্মক ভূমিকার অভিনয়ে তিনি অনন্যকরণীয়।

তাঁহার পোস্টকার্ড স্কেচের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বহু পোস্টকার্ডে ছবি আঁকিয়া তাঁহার

ছাত্রদের কাছে পাঠাইতেন এবং সেগুলি এখন প্রকাশিত হইলে অনেকেরই কাছে অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের বিষয় হইবে। সুন্দর চিত্রের হিসাবে ইহার তুলনা হয় না।

তিনি বড়ই সহৃদয় ও স্নেহপ্রবণ। তাঁহার মুখোসপরা মুখ দেখিয়া অনেকেই হয়ত ভয় পায়, কিন্তু আপন শিষ্যবর্গের মঙ্গলাকাঙ্খী তিনি চিরদিনই। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উৎসাহ দান ছাড়া তিনি তাহাদের প্রয়োজনমত বহু অর্থ সাহায্যও করিয়া আসিয়াছেন, যাহার অভাবে হয়ত কত শিল্পপ্রতিভা অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইত। আমি নিজেও ইহার অনেক ভাগ পাইয়াছি এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তাহা আমার স্মরণ থাকিবে এবং তাঁহার অসীম দয়ার কথা কখনও ভুলিব না।

অবনীন্দ্রনাথ এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। তাঁহার সতেজ মন এখনও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। তিনি এখনও আজেবাজে ফেলে দেওয়া জিনিষপত্র, ভাঙ্গা চোরা কাঠ কাঠ্‌রা, কাঁচ, পাথর, দড়ি, লোহা, তার দিয়া অপূর্ব্ব খেলনা তৈরী করিতেছেন। প্রায় হাজারের উপর এই সব খেলনা তৈয়ারী হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজের কাছেও কিছু কিছু আছে। সেগুলির সৃষ্টি যে কত উচ্চাঙ্গের তাহা চোখে না দেখিলে বুঝা যায় না।

আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, অবনীন্দ্রনাথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর চিত্রশিল্পী আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কেন, ভারতবর্ষেও জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ইতিহাসেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা এই শিল্পীশ্রেষ্ঠকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়াছি কি? ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই মনীষীর সম্মান চির অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে একটা যথোচিত পরিকল্পনার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে বোধ হয় অসময়োপযোগী হইবে না। আমি প্রস্তাব করি যে, বর্ত্তমান নব বঙ্গীয় চিত্রাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি এখন হইতে সংগ্রহ করিয়া একটি ভাল চিত্রশালায় রক্ষিত হইক। প্রস্তাব সহজসাধ্য এবং তাহা এই কলিকাতা নগরীতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁহাদের ছাত্রদের অপরূপ চিত্রাবলী সংগৃহীত হইয়া এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেই রক্ষিত হউক না কেন! সে সব জিনিষের জন্য দেশ ভবিষ্যতে গর্ব্ব অনুভব করিবে। সেগুলি হইয়া থাকুক চিরকালের মত শিল্পানুরাগীদের ও সাধারণের কাছে তাহাদের জীবন-পথের আলো—তাহাদের ধ্রুবতারা। সময় এখনও আছে। আর বিলম্ব করিলে, পরে ইচ্ছা হইলেও সুযোগ ঘটিবে না। দেশবাসী এখন হইতেই এই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হউন—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

মহারাজা বর্দ্ধমান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মহিমান্বিত যে রাজবংশ শৌর্য্যে জ্ঞানে ও দানে,
যশে গৌরবে চির বরেণ্য করেছে বর্দ্ধমানে।
বাঙ্‌লার বড় দানসত্রের সদাব্রতের ঘর,
হেন গ্রাম নাই যেথানে তাঁদের নাহিক দেবোত্তর।
অশ্রু ঝরিছে—যে রাজাধিরাজ চলিয়া গিয়াছে আজ,
বর্দ্ধমানের মহারাজা, সে যে আমাদের মহারাজ।

২

উপাধির মালা গুণের তালিকা অপরে যে হয় দিয়ো,
চলিয়া গিয়াছে কর্ত্তা মোদের আমাদের আত্মীয়।
আমরা দেখেছি তাঁর অনুরাগ বঙ্গভাষার প্রতি,
সত্য শিবের সেবকই ছিলেন গভীর ভকতি প্রীতি,
অশ্রু ঝরিছে সে রাজাধিরাজ চলিয়া গিয়াছে আজ
বর্দ্ধমানের মহারাজা সে যে আমাদের মহারাজ।

৩

সায়রে দেউলে মন্দিরে মঠে ভরিয়াছে সারা দেশ
লোকহিত ব্রতে সদা উৎসাহী—নাহি কৃপণতা লেশ।
আভিজাত্যের অভিমানে ভোর সদা উন্নত শির—
ছিল হীনতার অনেক উর্দ্ধে, সৌম্য সুগম্ভীর।
অশ্রু ঝরিছে সে রাজাধিরাজ চলিয়া গিয়াছে আজ—
বর্দ্ধমানের মহারাজা সে যে আমাদের মহারাজ।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্মান যুদ্ধ

অধীর উৎকণ্ঠা, আকুল উদ্বেগ ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার মধ্য দিয়া রুশ-জার্মান যুদ্ধের দশম সপ্তাহ অতীত হইয়া চলিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে হিটলার নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ করিবেন বলিয়া দম্ভোক্তি করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় প্রতিদিন যে জার্মান ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও জার্মানীর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হইল না। আগামী দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে যে ইহার অবসান হইবে এমন সম্ভাবনাও নাই। স্বীয় শক্তির সীমা সম্বন্ধে উদ্ধত হিটলারের অসার দম্ভোক্তি পরিণত হইল ব্যর্থতায়।

জার্মানীর প্রথম বিদ্যুৎগতি আক্রমণ যে ব্যর্থ হইয়াছে এ কথা 'ভারতবর্ষ'-এর ভাদ্র সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আক্রমণে জার্মানীর লক্ষ্যস্থল ছিল তিনটি—মস্কো, লেনিনগ্রাড এবং কিয়েভ। কিন্তু তাহা হইলেও একমাত্র স্মোলেনস্ক অঞ্চলেই স্বীয় সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয় এবং স্মোলেনস্ক দখলেই জার্মানীর দ্বিতীয় আক্রমণের পরিসমাপ্তি।

স্মোলেনস্ক জার্মানীর দখলে আসিলেও ইহার জন্য তাহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে প্রচুর। রুশদের প্রচণ্ড আক্রমণে জার্মানীর ৫ম ও ১৩৭তম পদাতিক ডিভিসন নিশ্চিহ্ন, ভী শহরের নিকট ২৫৩ সংখ্যক জার্মান পদাতিক ডিভিসন পর্য্যুদস্ত, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হতাহত ও বন্দীর সংখ্যাও অপরিমিত। ফলে মস্কোর উপর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি বোমারু বিমানের নৈশ আক্রমণ ব্যতীত আর কিছু করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। "ন্যাশন্যাল জাইটুং" পত্রিকায় এ বিষয়ে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, জার্মানী সরাসরি মস্কো অভিযান পরিত্যাগ করিয়াছে। জার্মান ইস্তাহারে ঘোষিত স্মোলেনস্ক জয়ের সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দাবী করা হইয়াছে যে, উক্ত যুদ্ধে জার্মানরা ৩ লক্ষ ১০ হাজার রুশ-সৈন্য বন্দী, ৩২০৫টি ট্যাঙ্ক ও ৩১২০টি কামান হস্তগত এবং ১০৯৮ খানা রুশ বিমান ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু মস্কো বেতারে ইহার প্রতিবাদ জানাইয়া বলা হয় যে, জার্মানীর এই দাবী সম্পূর্ণ আজগুবী। সোভিয়েট সরকারের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মানদের হতাহত ও নিরুদ্দিষ্টের সংখ্যা ১৫ লক্ষের উপর, অপর পক্ষে রুশ-সৈন্যের সংখ্যা সেই ক্ষেত্রে ছয় লক্ষ মাত্র! জার্মানরা ষ্ট্যালিন লাইন ভেদের যে দাবী জানায় তদ্প্রসঙ্গে সোভিয়েট সরকার হইতে বলা হয় যে, এই ষ্ট্যালিন লাইন জার্মানীর আবিষ্কার মাত্র। রুশ সৈন্যগণ প্রত্যেক ঘাঁটিতেই শত্রু-সৈন্যদের প্রবল বাধা দিতেছে এবং যে ক্ষেত্রে জার্মানী তীব্র আক্রমণ ও প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে সেইখানেই তাহারা ষ্ট্যালিন লাইন আবিষ্কার করিয়া বসিতেছে! প্রকৃতপক্ষে সিগ্‌ফ্রিড, ম্যাজিনো বা ম্যানারহাইম্ লাইনের ন্যায় রুশিয়ায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি বিস্তৃত কোন দুর্গশ্রেণী নাই। প্রাকৃতিক সুযোগ ও পারিপার্শ্বিক সুবিধা যেখানে অধিক, রুশিয়া সেইখানেই দুর্ভেদ্যদুর্গ ও ঘাটি স্থাপন করিয়াছে এবং জার্মানীর নিকট ইহাই হইয়াছে ষ্ট্যালিন লাইন!

জার্মানীর তৃতীয় বিদ্যুৎগতি আক্রমণ আরম্ভ হয় দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে ওডেসার দিকে। প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ডতায় কিয়েভ ওডেসা রেলপথ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং উক্রেইনে রুশবাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। অধিকৃত অঞ্চলে জার্মানী হেড্‌কোয়ার্টার্স স্থাপন করিয়াছে। লণ্ডনের ওয়াকিবহালগণের মতে উক্রেইনে জার্মানীর এই হেড্‌ কোয়ার্টার্স স্থাপন—রুশ-জার্মান যুদ্ধে জার্মানীর অতিশয় উদ্বিগ্নতার পরিচায়ক। সেই জন্যই হিটলার রণক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে ব্যগ্র, সেই জন্যই জার্মানীর বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এবং তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের কথা শুনা যাইতেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে জার্মানীর এই আংশিক সাফল্যলাভ সমর কৌশলের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। কিয়েভ ও প্রিপেট জলাভূমি অঞ্চলে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ চলে তাহাতে শত্রু সৈন্যকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে মার্শাল বুদেনী ওডেসার নিকটস্থ রুশবাহিনীর এক বৃহৎ অংশ ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং শত্রুপক্ষের দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইয়া জার্মানী প্রচণ্ড শক্তিতে ওডেসা অভিমুখে তাহার আক্রমণ পরিচালনা করে। বর্ত্তমানে যুদ্ধ অবশ্য উক্রেইনের রাজধানী হইতে সরিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি জার্মানগণ নিকোলায়েভ দখল করিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ওডেসার আত্মরক্ষার দিক হইতে নিকোলায়েভের গুরুত্ব যথেষ্ট। কিয়েভ অঞ্চলের এবং নীপার নদীর তীরবর্ত্তী জার্মান সৈন্যগণ যদি ওডেসার পশ্চিমস্থিত জার্মান বাহিনীর সহিত মিলনের চেষ্টা করে তাহা হইলে বাগ নদীর তীরস্থ রুশ সৈন্যদের পক্ষে প্রতিপক্ষের সেই প্রবল চাপ সহ্য করা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণসাগরেও জার্মান নৌবাহিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও রুশবাহিনী যে জার্মান অভিযান প্রতিহত করিয়াছে এবং এই অঞ্চলে জার্মান আক্রমণের বেগ যে ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে ইহা নিঃসন্দেহ। ওডেসার শ্রমিক ও জনসাধারণ পর্য্যন্ত লালফৌজের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ওডেসার চতুর্দ্দিকের প্রচণ্ড যুদ্ধে রুশ সাঁজোয়া বাহিনী জার্মান ও রুমানিয়ান মিলিত সৈন্যদলের ব্যূহ ভেদ করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এদিকে কিয়েভের দক্ষিণেও পাল্টা আক্রমণ করিয়া রুশ সৈন্যগণ খানিকটা স্থান পুনরধিকার করিয়াছে।

তৃতীয় বিদ্যুৎগতি আক্রমণে একদল জার্মান বাহিনী যখন ওডেসার দিকে অভিযান চালায়, সেই সময় উত্তরে লেনিনগ্রাড্ অভিমুখে জার্মানী অপর এক অভিযান পরিচালনা করে। পদাতিক, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি ও বিমান শক্তির সম্মিলিত সাহায্যে জার্মানবাহিনী লেনিনগ্রাডের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছে এবং রুশগণের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যার ন্যায় মারাত্মক আক্রমণ হইতে নগরী রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইতেছে। কারণ লেনিনগ্রাডের গুরুত্ব মস্কো অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। হিটলারের এই অভিযানকে বাধা দিবার জন্য দশ লক্ষ রুশ সৈন্য লেনিনগ্রাডে সমবেত হইয়াছে। জার্মান সৈন্যগণ লেনিনগ্রাডের অতি নিকটে আসিয়া পড়িলেও নগরী অধিকার আদৌ সহজসাধ্য নয়। কারণ লেনিনগ্রাডের অবস্থান আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। চারিদিকে বিভিন্ন হ্রদ, জলাভূমি ও অরণ্য অঞ্চল বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত বাল্টিক হইতে লেনিনগ্রাডের পথে রহিয়াছে ক্রোনষ্টাড্ দুর্গ এবং বাল্টিকে রুশ নৌবহরের প্রভুত্ব যথেষ্ট। অবস্থান ছাড়াও রুশ-সৈন্য এবং জনসাধারণ লেনিনগ্রাড রক্ষায় বদ্ধপরিকর। মার্শাল ভরোশিলভ লেনিনগ্রাড রক্ষার্থে রুশগণের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছিলেন তাহাতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নগরী রক্ষার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। রুশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকে নিজ সাধ্যমত যুদ্ধে সাহায্য করিয়া চলিয়াছে। পুরুষদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমর পরিচালনায় সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত রুশ রমণীরা কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের বিবিধ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেকের মুখেই এক কথা—"সকলই যুদ্ধজয়ের জন্য", "দেশ এবং স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে!" প্রতি কারখানায় প্রচুর সমরোপকরণ প্রস্তুত হইতেছে। জনসাধারণকে বক্তৃতাকারীরা স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, ১৯১৮ সালে গত মহাযুদ্ধের সময় মার্শাল যুদেনিকের বাহিনী নগরীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়াও নগরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এদিকে লেনিনগ্রাড হইতে ৭০ মাইল দূরে কিংসিপেক অঞ্চলে মার্শাল ভরোশিলফের নেতৃত্বাধীনে রুশ সৈন্য নাৎসী বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। স্থানে স্থানে রুশ বাহিনী জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পাল্টা আক্রমণ পর্য্যন্ত সুরু করিয়া দিয়াছে। জার্মান আক্রমণের বেগ যে ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে ইহা স্পষ্ট। তা ছাড়া লেনিনগ্রাডের সহিত বিভিন্ন কেন্দ্রের রেলপথ ও স্থলপথের সংযোগ রহিয়াছে। কাজেই, কোন এক বিশেষ অংশ নাৎসীবাহিনী অবরোধ বা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেও লেনিনগ্রাডের সরবরাহে তাহারা বাধা দিতে সক্ষম হইতে পারে না। উপরন্তু সোভিয়েট বাহিনী ও জনসাধারণ সকল শক্তির সম্মিলিত সাহায্যে নগরী রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প।

ইরান অভিযান

"ভারতবর্ষের" গত ভাদ্র সংখ্যাতেই আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, সিঙ্গাপুর যেমন ভারতের পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী ঘাঁটি, তেমনই ভারতের পশ্চিমেও দূরবর্ত্তী ঘাঁটি হিসাবে ইরাক উপযুক্ত স্থান। কিন্তু ইরাকের ব্যবস্থা যখন পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে তখন ইরানই ভারতের প্রবেশ-পথে সুদৃঢ় ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে উপযুক্ত! সম্প্রতি ইরানে দুই হাজারের ওপর জার্মান আছে এবং তাহারা পঞ্চম বাহিনীর কার্য্যকলাপ অনুসরণে প্রবৃত্ত, এই অভিযোগে বৃটেন এবং সোভিয়েট সরকার ইরান হইতে জার্মানদের দূরীভূত করিবার জন্য ইরান সরকারের নিকট এক নোট প্রেরণ করেন। কিন্তু এই নোটের প্রেরিত উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় অগাষ্টের চতুর্থ সপ্তাহে বৃটিশ ও সোভিয়েট বাহিনী সম্মিলিত ভাবে ইরানে প্রবেশ করে। প্রথম দিনেই সোভিয়েট বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যায়। প্রধান প্রধান রেলপথ এবং ইরানের নৌবহর হস্তগত করাই মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য। ইরান অধিকারের কোন উদ্দেশ্য যে তাঁহাদের নাই একথা বৃটিশ এবং সোভিয়েট সরকার স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিলেন। বন্দর সাপুর ও হোরাম শহর বৃটিশ বাহিনীর অধিকারে আসে। খোরাস হইতে আবাদান পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চল বৃটিশ সৈন্যগণ হস্তগত করে। পাল্টা আক্রমণ কালে ইরানের নৌসৈন্যাধ্যক্ষ য়্যাড্‌মিরাল বেয়েন্দর নিহত হন। এদিকে সেভ্‌জেভার, তোরবেতে হেইদারী, শারি-শা, কাজভিন্, তোরবেতেশেখ্-এজান রুশ সৈন্যের দখলে আসে। ফলে আলি-মনসুর মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং নবনির্ব্বাচিত প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফারুকী সংগ্রাম বন্ধের আদেশ প্রদান করায় ইঙ্গ-সোভিয়েট ও ইরানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়। উক্ত ত্রিশক্তির মধ্যে শান্তি আলোচনার নিমিত্ত ইরান সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে।

বৃটিশ ও সোভিয়েট বাহিনীর ইরান অভিযানের গুরুত্ব আদৌ অল্প নহে। ইরানের বিরুদ্ধে ইহা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নহে, বরং ইহা প্রতিরোধ ব্যবস্থা। শত্রু যাহাতে ভবিষ্যতে বিনা বাধায় আক্রমণের সুযোগ লাভ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ইরানের উপর এই অভিযান। শক্তি অথবা সহযোগিতা যে-কোন উপায়ে হউক—জার্মানী যদি তুরস্কের মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিবার সুযোগ লাভ করে তাহা হইলে বৃটিশ ও সোভিয়েট উভয়ের পক্ষেই তাহা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইবে। অথচ এদিকে জার্মানীর প্রলুব্ধ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। একথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি। ককেশশের ভিতর আসিতে পারিলে রুশসৈন্যদের ঘিরিয়া কাবু করা যেমন জার্মানীর পক্ষে অনেক সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে তেমনই বাকু এবং বাটুমের তৈলখনি অধিকারের সুবর্ণ সুযোগও আসিবে হাতের মধ্যে। এতদ্ব্যতীত ইরানের তৈলও সহজে লাভ করা কঠিন হইবে না। আবার ইরান ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে রেলপথ ও গমনাগমনের পথও সৈন্যবাহিনীর চলাচলের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। আর বৃটিশের দিক হইতে দেখিলে জার্মানীর ইরান প্রবেশের অর্থ শুধু ভারত নয়, সমগ্র নিকট-প্রাচীর পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতের আত্মরক্ষার জন্য ভারতের বাহিরে যে ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন ইরানকে তদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিলে সমগ্র নিকট-প্রাচীর বিপদের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে লাঘব হইবে। তাহা ছাড়া, সমগ্র ইয়োরোপ আজ নাৎসী-কবলিত। সুতরাং নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে রুশবাহিনীর সহিত সরাসরি সংযোগ

স্থাপনের ইচ্ছা থাকিলেও ইয়োরোপের মধ্য দিয়া বৃটিশবাহিনীর পক্ষে তাহা কার্য্যকরী করা দুরূহ। কিন্তু এই ইরানকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ ও সোভিয়েটবাহিনীর মধ্যে সেই প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের সুযোগ আসিল। আর ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে যুদ্ধ এলাকার বাহিরে থাকায় সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ভারত আজ বিশেষ উপযুক্ত স্থান। এই সকল উদ্দেশ্যেই ইরানের রেলপথ এবং প্রধান প্রধান ঘাঁটি সোভিয়েট ও বৃটিশ সরকার নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে সচেষ্ট। ইরানের উত্তর-পূর্ব্ব সোভিয়েট ও দক্ষিণ-পশ্চিম বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিবার ব্যবস্থাই বোধ হয় কার্য্যকরী হইবে। কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই সোভিয়েট সরকার রুশ সৈন্য মোতায়েন করিয়াছে। ককেশসের পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক বাধা ব্যতীত সোভিয়েটের নৌ ও স্থলবাহিনী এইভাবে রুশিয়ার সীমাকে সুরক্ষিত করিয়া তুলিল। এতদ্ব্যতীত, মার্কিন সাহায্য রুশিয়ায় আসিতে হইলে তাহা প্রেরণের একমাত্র পথ ভ্লাডিভষ্টক। কিন্তু এই পথ যেমন দূর তেমনই বিপজ্জনক। উপরন্তু জাপান আবার শাসাইয়া রাখিয়াছে যে, তাহার ঘরের পাশ দিয়া এই ভাবে সাহায্য প্রেরণ ও জাহাজ চলাচল সে বরদাস্ত করিবে না। কিন্তু ইরানের ঘাঁটিসকল বর্ত্তমানে বৃটিশ ও সোভিয়েটের অধিকারে আসায় সে বাধাও যথেষ্ট পরিমাণে বিদূরিত হইল। আরবসাগর ও ইরানের মধ্য দিয়া মার্কিন সাহায্যসম্ভার এখন অতি সহজেই রুশিয়ার রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইবার সুযোগ আসিল।

তবে ইরান ও ককেশস অঞ্চল সম্বন্ধে জার্মানী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইরানপ্রবাসী অনেক জার্মান বর্ত্তমানে তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এদিকে তুরস্কের ধারে গ্রীস ও বুলগেরিয়া সীমান্তে জার্মানী ও ইটালী বহু সৈন্য আনয়ন করিয়াছে। সহজ অর্থে বিচার করিতে হইলে ককেশস অঞ্চলে আসিবার জন্য জার্মানী তুরস্কের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু জার্মানীকে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে অথবা তুরস্ক বিনা বাধায় জার্মানীকে পথ ছাড়িয়া দিবে ইহা ভাবিবার কথা। তুরস্ক অবশ্য জানাইয়া দিয়াছে যে, তাহার সৈন্যদল আধুনিক যন্ত্রযুগের কৌশল রীতিমত আয়ত্ত করিয়াছে এবং দেশের জন্য তাহারা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত পাত করিবে। কিন্তু তবুও সন্দেহ থাকিয়া যায়, যদি জার্মানী তুরস্কের অভ্যন্তর দিয়া পথ করিয়া লইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তুরস্ক বাধা দিবে কি? নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের আত্মপ্রাধান্য ঘোষণার অর্থ ও পরিণতি কি তুরস্ক তাহা জানে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ ও মনোভাব যে জার্মানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একথা আমরাও জানি। তুরস্কের জার্মান মনোভাবের কারণ ও পরিচয় সম্বন্ধে আমরা এক পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করায় এক্ষেত্রে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। কিন্তু প্রশ্নটি তথাপি জটিল রহিয়া যায়, জার্মানী কি শীঘ্রই তুরস্কের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে সচেষ্ট হইবে এবং তুরস্ক জার্মানীকে তাহার প্রয়াসে বাধা প্রদান করিবে কি? ককেশস অঞ্চলে আসার প্রয়োজন জার্মানীর পক্ষে কতখানি একথা আমরা আগেই আলোচনা করিয়াছি এবং জার্মানীর বর্ত্তমান সমরকৌশল ও রণনীতিই আমাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে।

ফ্রান্স মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন

মার্শাল পেতাঁ, য়্যাডমিরাল দারলাঁ, জেনারেল ওয়েগাঁ এবং জেনারেল হাণ্টজিগার এই চারিজনে তিনদিন ধরিয়া পরামর্শ করিবার পর ফ্রান্স মন্ত্রিসভার অদল-বদল হইয়াছে। মার্শাল পেতাঁ দেশরক্ষার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন য়্যাডমিরাল দারলাঁর হাতে; জেনারেল ওয়েগাঁ আলোচনার প্রারম্ভেই আফ্রিকায় ফিরিয়া যান। গত ১৯এ আগষ্ট মার্শাল পেতাঁ বেতার মারফৎ জানান যে, সমগ্র নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনীর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন ও রক্ষার্থে জাতীয় দেশরক্ষা দপ্তরের ভার য়্যাডমিরাল দারলাঁর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ঐ দিন মার্শাল পেতাঁ বেতারে স্বীয় সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। অনধিকৃত ফ্রান্সের সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ফ্রিম্যাসন্ দলভুক্তদের প্রতি বিশেষ নজর রাখা হইতেছে। এক কথায়, হিণ্ডেনবার্গের জীবিতাবস্থায় হিটলার একদিন জার্মানীতে যে আসন ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, য়্যাডমিরাল্ দারলা ফ্রান্সে আজ তেমনই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছেন। দারলাঁর এই নিয়োগব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ওয়াসিংটনস্থ ভিসি রাষ্ট্রদূত মঃ আঁরিহে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে জানাইয়াছেন যে, মার্শাল পেতাঁর সারা বক্তৃতায় এমন কোন কথা নাই যাহা হইতে ধারণা করা চলে যে, ফ্রান্সের নৌবহর ও উপনিবেশ সে জার্মানীকে প্রদান করিবে। কিন্তু নৌবহর প্রদান করিতে চাহিলেই কি এই মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে সে সংবাদ প্রদান করা সম্ভব? দ্বিতীয়ত, জার্মানী রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবার পর হইতে ফ্রান্সের নৌবহরের প্রয়োজন বর্ত্তমানে তাহার কমিয়া গিয়াছে। ইটালীয় নৌ-বহরকেই সে কৃষ্ণসাগরে মোতায়েন করিতে পারে। হিটলার জানে যে, বৃটেনকে চরম আঘাত হানিতে হইলে তাহার অজেয় নৌশক্তির সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কাজেই সেই বিশেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় ফ্রান্সের নৌবহরকে জীয়াইয়া রাখিবার ইচ্ছা কি জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব? তাহা ছাড়া ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বিড়ম্বিত ফ্রান্স যে এই মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তনের ফলে দ্বিতীয় নাৎসী জার্মানীতে পরিণত হইতে চলিল ইহা অস্বীকার করা যায় কেমন করিয়া? তবে এ সম্বন্ধে একমাত্র ভাবিবার কথা এই যে, ফ্রান্সের বর্ত্তমান সরকার জার্মান মনোভাবাপন্ন হইলেও ফ্রান্সের জনসাধারণ এখনও অতীতের ফ্রান্সকে ভোলে নাই। সমগ্র ইয়োরোপে জার্মানী আজ যে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে, তাহা ফ্রান্সের জনসাধারণ সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। রুশিয়ার সহিত তাহার এই দীর্ঘ যুদ্ধে আশু সমাপ্তির কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া ফ্রান্সের প্রপীড়িত জনসাধারণ আজ বিক্ষুব্ধ। মঃ লাভালকে গুলি করার মধ্যেই তাহাদের এই মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভিসি সরকার কর্ত্তৃক ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট দলের অতিরিক্ত আগ্রহ ও কর্ম্মতৎপরতা

হইতেই ইহা সুপরিস্ফুট। কে জানে ফ্রান্সের জনসাধারণের স্বপ্ন সফল হইবে কবে, দীর্ঘ রজনীর অবসানে ফ্রান্সের গগন বহু আকাঙ্ক্ষিত তরুণ রবির অরুণ আলোয় কবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে কে জানে !

চার্চিল-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট প্রমোদ তরীতে ভ্রমণে বাহির হইবার পর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল হঠাৎ নিখোঁজ হইয়াছিলেন। নিরুদ্দেশের স্তম্ভে তাঁহার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদত্ত না হইলেও তাঁহার মত লোকের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে সারা দুনিয়া যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে রয়টার সে সংবাদ আন্তরিকভাবে বুঝাইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ওদিকে মিঃ রুজভেল্ট যে প্রমোদ তরী লইয়া কোথায় গেলেন সে সংবাদ ক্রমশ রহস্যময় হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা হইলেও দুই দেশের মাথা যে একত্র মিলিত হইবার জন্য এই ব্যবস্থা এ সংবাদ গোপন থাকে নাই। সম্প্রতি দুজনের গোপন মিলনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্ব-শান্তির উদ্দেশ্যে দু'জনে 'আট দফা' প্রকাশ করিয়াছেন। সমুদ্রবক্ষে 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' ও 'অগাষ্টা' জাহাজে ভাসিয়া তাঁহারা দুজনে অপরাপর দেশসমূহ যাহাতে না ডুবিয়া ভাসিয়া থাকিতে পারে তাহার পাকা বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কোন মহাদেশের কথাই তাঁহাদের আলোচনা হইতে বাদ পড়ে নাই। আট দফার প্রথমেই তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, বৃটেন বা আমেরিকা কাহারও স্বীয় রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা আর নাই। কথাটা যে যথেষ্ট বুদ্ধিমানের মত তাহা নিঃসন্দেহ। রাজ্য বিস্তারের উপযোগী নূতন কোন দেশই যখন নাই, রাজ্য বিস্তারে অনাসক্তি জানানই তখন একমাত্র উপায় নয় কি ?

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় দফায় ঘোষিত হইয়াছে যে, যে সকল দেশের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌম অধিকার বলপূর্ব্বক হরণ করা হইয়াছে সেই সকল দেশে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে তাঁহারা ইচ্ছুক। ইচ্ছা যখন আছে তখন নিজের হাতের মধ্যেই যে উপায় আছে তাহার দ্বারাই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার নমুনা আরম্ভ হইয়া যাক্ না কেন ? ইচ্ছা যখন হইয়াছে তখন শুভ দুর্গা সপ্তমীতে ভারতের হারামণিটি আবার ভারতে ফিরিয়া আসিবে ভারতের জনসাধারণ এই ধরণের একটা আশা মনের গোপন কোণে পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে কি জবাব দেওয়া যায় ?

এতদ্ব্যতীত, যে সকল রাষ্ট্র পররাজ্য আক্রমণ করিতেছে বা করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা আছে বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা আবশ্যক, অর্থাৎ জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া প্রয়োজন। বাস্তব এবং আধ্যাত্মিক কারণে সমস্ত দেশেরই অস্ত্রশক্তির প্রয়োগ পরিহার করা উচিত। কিন্তু রজঃগুণের অধিকারী হিটলার যে এত সহজেই বেদান্তের পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিবেন সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। অত্যাচারী দেশকে শায়েস্তা করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন অযথা কালবিলম্ব না করিয়া বিপুল বাহিনী ও বিশেষ শক্তির সাহায্যে রুশিয়ার সহিত যুদ্ধরত জার্ম্মানীকে অপর এক দিক হইতে আক্রমণ করিলেই সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়াই তো আমাদের বিশ্বাস। বিশেষ সমগ্র ইয়োরোপ নাৎসী-কবলিত হওয়ায় রুশবাহিনীর সহিত মিলিত হইবার বিশেষ সুবিধা এতদিন বৃটিশের পক্ষে ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে সে বাধাও দূর হইয়াছে। ইরানের অভ্যন্তরে সোভিয়েট ও বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। সরবরাহ ও সংবাদ আদান-প্রদানের পথও বিশেষ বিঘ্নসঙ্কুল নহে। এই অবস্থায় আত্মরক্ষামূলক হইতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা বিশেষ সহজসাধ্য অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাৎসী শক্তিকে পঙ্গু করিতে হইলে এই সম্মিলনের গুরুত্ব যথেষ্ট বলিয়াই আমাদের ধারণা।

সুদূর প্রাচী

গত ১৯এ জুলাই জাপ-ইন্দোচীন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া আমেরিকার ওয়াকিবহাল মহল যে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন 'ভারতবর্ষের' ভাদ্র সংখ্যাতেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পরে এই সংবাদ জাপসরকার কর্ত্তৃক সরকারীভাবে সমর্থিত হইয়াছে। ২৮এ জুলাই টোকিও হইতে সংবাদ প্রদান করা হয় যে, সম্রাটের উপস্থিতিতে জাপ প্রিভিকাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশনে জাপ-ইন্দোচীন মিলিত দেশ-রক্ষা চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে।

চুক্তির অব্যবহিত পরেই জাপবাহিনী ইন্দোচীনে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। সৈন্য চলাচলের জন্য ১৯০টি লরী আনিতে হয়। সায়গণ, সায়েমরীপ প্রভৃতি আটটি বিমানঘাঁটি জাপবাহিনী ব্যবহারের অনুমতি লাভ করিয়াছে। কামরান উপসাগরে জাপবাহিনী ঘাঁটি দখল করিয়াছে। জাপানের এই কার্য্যের প্রতিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতসরকার স্ব স্ব দেশস্থ জাপানী সম্পত্তি আটক করিয়াছেন। চীনসরকারের অনুরোধে বৃটেনে চীনা সম্পত্তিও আটক করা হইয়াছে।

ভাদ্রের "ভারতবর্ষে"ই আমরা বলিয়াছিলাম যে, ইন্দোচীনের পর থাইল্যাণ্ডের পালা। আমাদের ধারণা এবারেও মিথ্যা হয় নাই। ইন্দোচীনে ঘাঁটি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াই জাপান থাইল্যাণ্ড ও বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করে। বৃটিশবাহিনী থাইল্যাণ্ডের নিকটে আসিতেছে, বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ থাই-সীমান্তে টহল দিতেছে। থাইল্যাণ্ডের বৃটিশ অধিবাসীরা সরিয়া যাইতেছে—এই ধরণের নানা অভিযোগ বৃটিশ ও থাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টোকিও রেডিও হইতে ঘোষিত হইয়াছে। ইন্দোচীনে সামরিক ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন করিয়া জাপান থাই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য থাইসরকারের সংবাদে প্রকাশ যে, থাইল্যাণ্ড তাহার প্রভূত বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে সজ্জিত করিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও ইন্দোচীন যেমন জাপানের সহিত তৈল সরবরাহ চুক্তি বাতিল করে নাই, থাইল্যাণ্ডও তেমনই কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানকে ঋণদান করিয়াছে। ইহার ফলে জাপানের সম্পত্তি বিভিন্ন দেশে আটক পড়িলেও সেগুলিকে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করার পক্ষে ইহা বাধা সৃষ্টি করিল।

এদিকে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে জাপান এক বৃহৎ বাহিনী প্রেরণ করিয়াছে। প্রতি বহরে দেড়শত হিসাবে চারিটি ট্যাঙ্কের বহর পাঠান হইয়াছে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তদেশে। জাপ প্রচারবিভাগের মুখপত্র সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাপ-সোভিয়েট সম্পর্ক সৌহার্দ্দপূর্ণই আছে! কিন্তু গোল বাধিয়াছে রুশিয়ায় মার্কিন সাহায্য প্রেরণ লইয়া। ভ্ল্যাডিভস্টক-পথে মার্কিন সাহায্য রুশিয়ায় প্রেরিত হইয়াছে, অথচ জাপান জানাইয়া দিয়াছে যে তাহার ঘরের পাশ দিয়া এভাবে জাহাজ চলাচল সে সহ্য করিবে না। আমেরিকার জাহাজের এপথে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই তাহার ধারণা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়াও জানাইয়া দিয়াছে যে, মার্কিন সহযোগিতায় কোন বাধা প্রদত্ত হইলে রুশিয়া তাহা সহ্য করিবে না।

সম্প্রতি রয়টার প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ যে প্রিন্স কনোয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট একখানি ব্যক্তিগত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং মার্কিন ও জাপানের মধ্যে সঙ্ঘর্ষসৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি নাকি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন স্থানে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব করিয়াছেন।

এদিকে বম্বে ক্রনিকলের লণ্ডনস্থ নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ যে, থাইল্যাণ্ডকে আহ্বায়ক করিয়া জাপান বৃটেন, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইনস্ প্রভৃতিকে আহ্বানকরিয়া এক আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্যা আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিণতি বিশেষ স্পষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জাপান এইভাবেই কালহরণ করিতে ইচ্ছুক। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে সে মনোনিবেশ করিলেও বৃটেন ও আমেরিকাকে সহজে ঘাঁটাইতে সাহসী না হইয়া জাপান এইভাবে স্নায়ুযুদ্ধ ও ছল-কৌশলের মধ্য দিয়া কালক্ষেপ ও ইপ্সিত ভূখণ্ড হস্তগত করিতে চাহে। কিন্তু তাহা হইলেও সুদূর প্রাচ্যে জাপান একমাত্র স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে চাহিলে অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ সংঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তাহার গত্যন্তর নাই। ৩, ৯, ৪১

কবিতার তুমি

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কবিতা আমার ছিল সে আমারই মধুর বাল্যকালে,
অস্ফুট কলি ঘেরেনি তখনো সুষমা-সুরভি-জালে॥
সেঁঠাই-ওলার গুরু শিকা-ভার দিত রহস্য-দোলা!
মোর কবিতার দখিন-দুয়ার তারো তরে ছিল খোলা!
'প্রভাত' 'সন্ধ্যা' 'গরু' ও 'ছাগল' 'সাঁঝের শঙ্খনাদ'—
কবিতার সেই অবাধ আবাদে তুমিই সাধিলে বাদ!
কোথা হ'তে এলে শ্রীচরণ ফেলে সাধনার তপোবনে—
ঋষ্যশৃঙ্গ হ'ল বিমুগ্ধ—নব অনুভূতি মনে!
ধরণীরে আর ধরণী বলিয়া মনে নাহি হ'লো তার
লঘু হ'য়ে গেল সকল দুঃখ, জীবনের গুরুভার!
আলোছায়া ঘেরা সংশয়-ভরা দিনগুলি গেল উড়ে
সোনার অরুণ উদিল, হৃদয় ভরিল মধুর সুরে!
তুমি দেবি, এলে স্নেহ দিঠি মেলে আশীষকুম্ভ কাঁখে—
মঙ্গলবারি ভরা হেম-ঝারি, জটিল পথের বাঁকে!
বয়ঃসন্ধি—কৈশোর আর বাল্যের ছাড়াছাড়ি—
কি নেবে আর সে কিবা রেখে যাবে তাই ল'য়ে কাড়াকাড়ি!
সেই সঙ্কটে তুমি অকপটে মধুর হাস্য হাসি
ললিতকলার সাধিকা আমার মানসী উদিলে আসি'!

সব সংশয় করিয়া বিজয় সঙ্কট করি দূর
কবিতার মাঝে বাজিল তোমার রূপ-বিহ্বল সুর!
সবাই তখন হারাইয়া গেল আগে যারা ছিল জুড়ে—
দখিন-দুয়ারে মলয় পশিল—কবির মানসপুরে!
কবিতার আর বিবিধ আকার কিছু না রহিল বাকী
ছন্দ ভাষার দ্বন্দ্ব মিটিল—অলঙ্কারের ফাঁকি!
সহজ ছন্দে সরল ভাষায় চাতুর্য্যহারা কথা—
কবিতা আমার হারালো তাহার বাল্য চঞ্চলতা!
মুগ্ধ কিশোর, নয়ন বিভোর, নবীন জীবন লভি'—
কবিতার 'তুমি' জাগাইল চুমি' নূতন সে এক কবি!
তারপর এলো দিন-যৌবন তীব্র আবেগময়
প্রাণের ছন্দে পরমানন্দে গাহিল সে তব জয়!
যত কিছু লেখে তোমারেই দেখে স্বপ্নে অথবা জেগে—
বাস্তব তার রাঙা হ'য়ে ওঠে কল্পনা রঙ্ লেগে!
তোমারে সে লভে ইন্দ্রিয় দিয়ে, অথবা অতীন্দ্রিয়ে—
ধ্যান ও ধারণা, তুমি আরাধনা, সাধনা তোমারে নিয়ে!
কবিতা এখন তোমার বাহন স্বাতন্ত্র্য নাহি তার—
'তোমারই কবিতা', 'কবিতারই তুমি' হইয়াছে একাকার!

মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চন্দ্ মহতাব্

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমীদার, নানা গুণের আধার বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সার বিজয়চন্দ্ মহতাব্ গত ২৯শে আগষ্ট শুক্রবার মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। বর্দ্ধমানের রাজবংশ বহু কারণে বাঙ্গালার জন-সাধারণের নিকট সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার শত শত গ্রামে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির আজিও তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রীতির পরিচয় দান করে। রাঢ়ে কত ব্রাহ্মণ-বংশ যে বর্দ্ধমানের রাজ-বংশপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগ করেন, তাহার সংখ্যা নাই। বর্ত্তমান যুগেও বহু উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, সংস্কৃত শিক্ষালয় ও কলেজ তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে। সার বিজয়চন্দ্ সেই বংশের উপযুক্ত সন্তান ছিলেন এবং বংশের সকল মর্য্যাদাই অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বঙ্গসাহিত্যপ্রীতি বিশেষভাবে দেখা দিয়াছিল। তাঁহার প্রণীত 'বিজয় গীতিকা' 'একাদশী, ত্রয়োদশী' 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি পুস্তক একসময়ে বাঙ্গালী পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অন্যতম 'বান্ধব' ছিলেন। তাঁহার আহ্বানে বর্দ্ধমানে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ অধিবেশন প্রায়ই দেখা যায় না। মহারাজাধিরাজ শুধু অতিথি পরিচর্য্যায় অর্থব্যয় করেন নাই, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সার বিজয়চন্দ্ 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের সময় ভারতবর্ষের পরিচালক-বর্গকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার লিখিত 'ইউরোপ ভ্রমণ' প্রভৃতি বহু ভ্রমণবৃত্তান্ত ও



মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চন্দ্ মহতাব্ বাহাদুর

প্রবন্ধ এবং কবিতাদি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং সার বিজয়চন্দ তাঁহাকে

নিজ তহবিল হইতে আজীবন সাহিত্য-বৃত্তি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের মত আরও বহু সাহিত্যিক, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতকে বৃত্তি দান করিয়া তিনি সম্মানিত করিয়াছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তিনি নিজে প্রত্যহ শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না এবং বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে হিন্দুধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ সাড়ম্বরে সম্পাদিত হইত। রাজবাড়ীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণগণের লোকের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ একজন সামাজিক বাঙ্গালী ছিলেন। অবাঙ্গালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁহার কিরূপ মমত্ব বোধ ছিল, তাহা তাঁহার ব্যবহারে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত। বর্দ্ধমান রাজসরকারের কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী—এই সামান্য বিষয়টিই তাঁহার বাঙ্গালী প্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইলেও সাধারণের সহিত মেলামেশা করিতে তিনি কোনদিনই কুণ্ঠিত হন নাই; সেই জন্যই জনসমাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি সমাদর লাভ করিয়া গিয়াছেন। নানা বিষয়ে তাঁহার যে গভীর জ্ঞান ছিল, তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতাদির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। সে কারণে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বহু সরকারী কমিটীর সদস্য নিযুক্ত করিতেন। ফ্লাউড কমিশনের সদস্যরূপে তিনি শুধু বাঙ্গালার জমীদারগণের স্বার্থরক্ষায় অবহিত ছিলেন না, প্রজাসাধারণকে যাহাতে অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হইতে না হয়, সে বিষয়েও তিনি তাঁহার বিবৃতিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সার বিজয়চন্দের মত নানা গুণের অধিকারী মানুষ আজকাল সত্যই দুর্লভ হইয়াছে। তিনি বিধবা পত্নী এবং দুই কৃতী পুত্র মহারাজকুমার উদয়চন্দ ও মহারাজকুমার অভয়চন্দ এবং দুইটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রার্থনা করি, মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।



মহারাজাধিরাজ ও পুত্রদ্বয়

তিনি স্বয়ং, পুত্র ও জনক রাজা বনবিহারী কাপুরের সহিত পদধৌত করিয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও সার বিজয়চন্দের দান কম ছিল না। তিনি বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়া যেরূপ সাহস ও নির্ভীকতার সহিত কার্য্য করিতেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ ছিল। সরকারী চাকরী স্বীকার করিয়াও ঐরূপ তেজস্বিতা ও স্বাধীন মতের পরিচয় দেওয়া শুধু তাঁহার মত অভিজাত

শাশ্বত

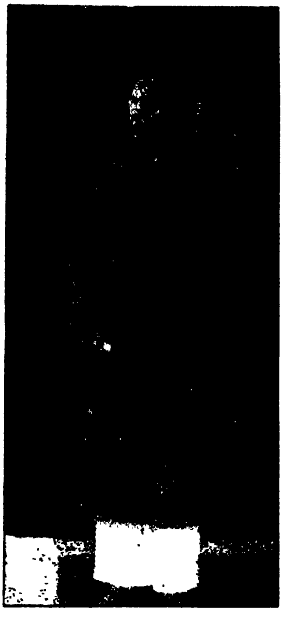
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তটিনী ধাইছে সদা সাগরের পানে,
আঁধার ছুটিয়া চলে আলোকের মুখে।
সুর মিলাইতে চাহে আপনারে গানে,
জীবনের লক্ষ্য সদা মরণের বুকে॥

সাময়িকী

প্রমথনাথ সংবর্দ্ধনা—

গত ২০শে ভাদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'সবুজপত্র' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের জড়তা ভঙ্গ করিয়া তাহাকে জীবন্ত কথ্যভাষায় প্রচলনের দুঃসাহস প্রমথনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রধান কীর্ত্তি এবং একাধারে সমালোচনা, ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ রচনায় চৌধুরী মহাশয় যে স্টাইলের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা অনন্ত সাধারণ এবং বাঙ্গালা ভাষার যে একটা স্বচ্ছন্দগতিবেগ আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহাও চৌধুরী মহাশয়ের দান। 'বীরবল' এর ছদ্মনামের আড়ালে তাঁহার যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ভাবের আভিজাত্য, প্রকাশের শৈলী সবই মনোরম; তাহা পাঠকের চিত্তকে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের জোগান দেয়। তাঁহার মনীষা, তাঁহার পাণ্ডিত্যের ক্ষুরধারযুক্তি সব মিলিয়া তাঁহার রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার গুণানুরাগী দেশবাসী তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স পূর্ত্তি উপলক্ষে তাঁহার সংবর্দ্ধনার আয়োজন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সংবর্দ্ধনার বিশেষত্ব এই যে, উদ্যোক্তাগণ চৌধুরী মহাশয়ের গল্পগুলি পুস্তকাকারে একসঙ্গে প্রকাশ করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে উপহার দিয়াছেন এবং হাজার টাকার একটি তোড়া অর্ঘ্য স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘায়ু হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে থাকুন ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।



বীরবল শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
(রবীন্দ্র মুখার্জ্জির সৌজন্যে)

নীরব কর্ম্মীর অভিনন্দন—

গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত মোহিনীমোহন মজুমদারকে এক সভায় অভিনন্দিত করা হইয়াছে। মোহিনীবাবুর বয়স ৭৩ বৎসর। তিনি যৌবনে আর্ট স্কুলে পড়িবার সময় মূক ও বধিরদিগের কষ্ট দেখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদানের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন ও তাহার ফলে অপর কয়েকজন কর্ম্মীর সহযোগে কলিকাতায় মূক বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মত নীরব ও অক্লান্ত কর্ম্মীকে যাঁহারা অভিনন্দিত করিয়াছেন, তাঁহারা সত্যই গুণের আদর করিয়াছেন।

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ—

রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর বহুমুখী কার্য্যের মধ্যে লোকশিক্ষা সংসদ অন্যতম। যে সকল বয়স্ক নরনারী নানা কারণে বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পান না, এই সংসদ গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সংসদের কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং বিদ্যার্থীরা অবসর সময়ে গৃহে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষালাভ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা আছে। বিদ্যার্থীদের জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ হইতে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালাও প্রকাশ করা হইতেছে। শান্তিনিকেতনে পত্র লিখিলে এবিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ জানা যাইবে।

শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা ও সিন্ধু সরকার—

সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের কার্য্যকলাপে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর সংবাদ জানিতে পারিয়া সিন্ধু সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহাদের উপর কিশোর শিক্ষার্থীদের মন, বুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব অর্পিত তাঁহারা যদি ছাত্রদের মনে এ বয়সেই সাম্প্রদায়িকতা সঞ্চারিত করিতে থাকেন, তাহা হইলে দেশ ও জাতির পক্ষে তাহার চেয়ে অনিষ্টকর আর কিছু হইতে পারে না। অনিষ্ট হইবার উপক্রমেই যে সিন্ধু সরকারের সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ইহার জন্য সরকারকে আমরা সাধুবাদ দিতেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালা সরকারের মনোভাব তুলনা করিলে হতাশ হইতে হয়। সিন্ধু সরকার যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে সাম্প্রদায়িকতা নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যত, আর সেইখানে অন্যত্র সরকার সমগ্র প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি পাকা করিতে অতি মাত্রায় আগ্রহশীল। আপাত স্বার্থের লোভে তাঁহারা সমগ্র প্রদেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা আজ ভুলিতে বসিয়াছেন।

নবাব ইয়ার জঙ্গ—

নবাব ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি, ইনি মুসলিম লীগের একজন বড় পাণ্ডা। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ও তাহার বাহিরে ইনি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি স্বয়ং নিজাম বাহাদুর এক আদেশ জারি করিয়া ইঁহার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন। ফলে নবাব বাহাদুর নিজামের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে আর কখনও আন্দোলনে যোগদান না করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মহামান্য নিজাম বাহাদুরের এই সুপরামর্শ বৃটিশ ভারতের লীগ নেতাদের দ্বারা অনুসৃত হইলে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।



নাট্যভারতীতে কলিকাতা পুলিস ক্লাবের 'কণ্ঠহার' সাহায্য অভিনয়ে সমবেত গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট ও অন্যান্য ভদ্রবৃন্দ (তথায় যুদ্ধ ভাণ্ডারে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে) ছবি—ডি-রতন



মুঙ্গেরে 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচনা-রত রবীন্দ্রনাথ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত



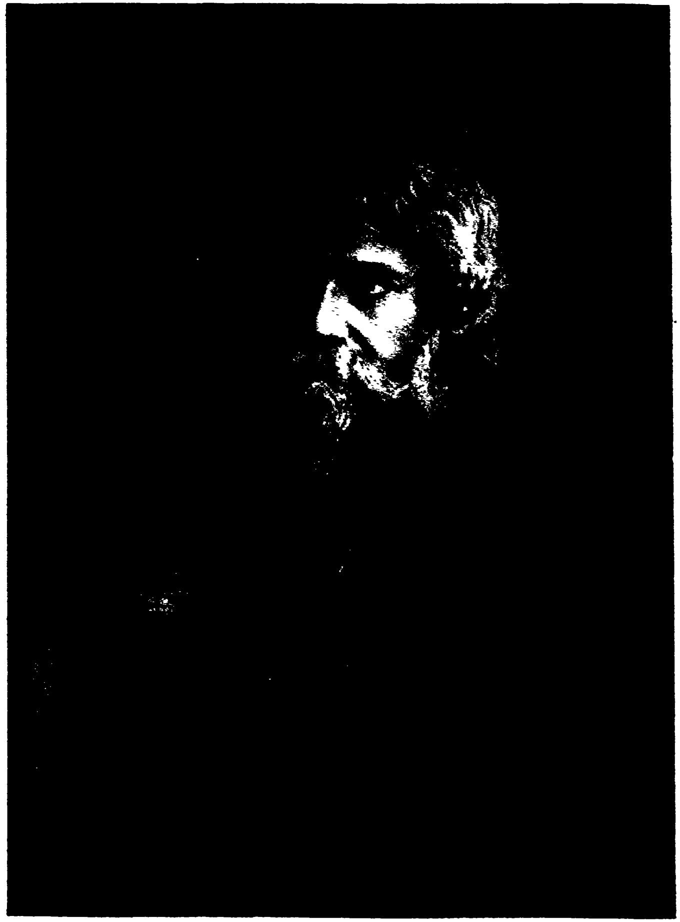
১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'ফাল্গুনী' নাটকাভিনয়ে বৈরাগীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত



কলিকাতা নিপন ক্লাবে (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ। (সারনাথে উপহার প্রদত্ত ঘণ্টা)



রবীন্দ্রনাথ ও প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী মিঃ টাইকান-টোকিও —১৯১৬ খৃঃ



বীন্দ্রনাথ—জাপান ইওকোহামায় মিঃ টি. হারার গৃহে—১৯১৬ খৃঃ

স্যর জর্জ সুষ্টারের সুমতি—

ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব স্যর জর্জ সুস্টারের দৃষ্টি-ভঙ্গীর একটুখানি পরিবর্ত্তনের আমেজ পাওয়া গিয়াছে তাঁহার নবপ্রকাশিত এক গ্রন্থে। তিনি এই গ্রন্থে পাকিস্থান সম্পর্কে প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইউরোপে বহু খণ্ডে বিভক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় যে অশান্তি দেখা দিয়াছে সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্যর জর্জ বলিয়াছেন—

> যাহারা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক দাবী উঠাইয়া ভারতবর্ষে এই অশান্তি ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে, তাহাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর।

আজ স্যর জর্জ এই মন্তব্য করিলেন; কিন্তু যতদিন ভারত-সরকারের অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন তাঁহার এই মন্তব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বিলম্বে হইলেও স্যর জর্জের এই সুমতির জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি।

স্যর সুলতান আহম্মদের জবাব—

বিহারের স্যর সুলতান আহম্মদকে বড়লাটের নবনিযুক্ত শাসন পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া মিঃ জিন্না যে হুকুমজারি করিয়াছিলেন তিনি তাহা মানিতে রাজী হন নাই। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

> দক্ষিণে বামে না চাহিয়া আমি আমার কার্য্য-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিব। ভগবানকে স্মরণ করিয়া এবং নিজের বিবেকের নির্দ্দেশ মানিয়া ভারতবর্ষ ও মুশলিম ভারতীয়দের কল্যাণসাধনের জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। আমি কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী নহি, সুতরাং কাহারও ভ্রূভঙ্গির তোয়াক্কা রাখিয়া চলিব না। আমার কাজে কে তুষ্ট হইলেন আর কে রুষ্ট হইলেন—আমি গ্রাহ্য করি না।

স্যর সুলতানের উক্তিতে নিজের দেশ, প্রদেশ ও সমাজের সেবা করিবার যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীই আশ্বস্ত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সহিত আমাদের ঐক্য না থাকিলেও এ দুর্দ্দিনে তিনি যে দৃঢ়তা দেখাইলেন তাহা অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে উদ্বোধিত করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ—

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল গৃহে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল আচার্য্য শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ৭১তম জন্মোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে আর্ট স্কুলের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল শ্রীযুত মুকুলচন্দ্র দে সকলের পক্ষ হইতে এক প্রশস্তি পত্র প্রদান করিলে শিল্পী শ্রীযুত ভবানীচরণ লাহা অবনীন্দ্রনাথকে গরদের ধুতি



আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা—শিল্পীকে তিলক দান

চাদর এবং ছাত্রছাত্রীরা রূপার রংয়ের বাক্স ও সোনার তুলি উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ ইচ্ছা অনুসারে দেশের নানা স্থানে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। গুণীর আদর যাহারা করে, তাহারাই ধন্য হয়— যাঁহার আদর করা যায় তাঁহার তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমরাও আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে তাঁহার জন্মদিনে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ু হইয়া দেশকে নূতন নূতন দানে সমৃদ্ধ করুন।

বীমা কোম্পানীর স্বর্ণজুবিলী—

গত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় হিন্দু মিউচিয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিমিটেডের স্বর্ণ জুবিলী উৎসব হইয়া গিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত কোম্পানীগুলির মধ্যে ইহাকে প্রথম বলা যায় এবং কোন বাঙ্গালী বীমা কোম্পানীর ইহার পূর্ব্বে স্বর্ণ জুবিলী উৎসব হয় নাই—ইহাই বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়।



হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকোম্পানীর জয়ন্তী উৎসবে বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি শ্রীরূপেন্দ্রকুমার মিত্র প্রভৃতি

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ ও ভারত—

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ পরিচালনার জন্য ভারতকে প্রতি বৎসর পৌনে এগার লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হয়। অথচ এই বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সত্যিকার অস্তিত্ব কাগজে কলমে ছাড়া আর কোথাও নাই। তাই তাহার ব্যয়ের পরিমাণও স্বভাবতই কিঞ্চিৎ হ্রাস করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চাঁদার হারও কমিয়া সাড়ে সাত লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। নিরন্ন ভারতের উপর অশোভন দরদ প্রদর্শন করিয়া এতগুলি টাকা অপব্যয়ের কি সঙ্গত যুক্তি আছে তাহা জিজ্ঞাসা করার অধিকার ভারতবাসীর আছে বলিয়াই এই অপব্যয় বন্ধ করিতে আমরা ভারত সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

আসাম মন্ত্রি-মণ্ডলের কর্ত্তব্যত্যাগ—

আসামের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ স্মল কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করার কারণ দেখাইয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে আদৌ সম্মানজনক নহে। মিঃ স্মল একজন ইংরেজ এবং প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল আসামের শিক্ষা বিভাগে চাকরি করিয়া আসিতেছেন, তিনি বার বৎসর যাবৎ ডাইরেক্টারের পদে আসীন আছেন। যোগ্যতার সহিত সুদীর্ঘকাল কাজ করিয়া আজ অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের অবসানের পর হইতেই এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, তাঁহার পক্ষে কার্য্যে রত থাকা সম্ভব হইতেছে না। তিনি এই গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন যে, শিক্ষা বিভাগের নিয়োগে এখন আর তাঁহার সম্মতি পর্য্যন্ত লওয়া হয় না। তিনি কোন নিয়োগে সুপারিশ করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয় এবং অসম্মতি দিলেও নিয়োগ বন্ধ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা—

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য অসংখ্য উপায় প্রতিদিনই আলোচিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, কবির স্মৃতি রক্ষার তাবৎ ব্যবস্থা কবি স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমর রচনাবলী ত আছেই, তাহা ছাড়া এ যুগে আমরা তাঁহার দেওয়া ভাষায় লিখি, তাঁহার কথায় চিন্তা করি, তাঁহার সঙ্গীত আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। কাজেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আর যা ব্যবস্থা আমরা করিব তাহা আমাদেরই নিজেদের সম্মানের জন্য। বিশ্বভারতী পরিচালনার দায়িত্বভার দেশবাসী গ্রহণ করিবেন—এই আশার বাণীতে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। যে আদর্শ কবির চিত্তে জন্মলাভ করিয়া দীর্ঘকাল কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের হাতে লালিত হইয়াছে তাহা অকবি-কর্ম্মীদের হাতে অন্যরূপ ব্যাপার হইয়া না পড়ে। আদর্শহীন বিশ্বভারতীকে বাঁচাইয়া রাখার মধ্যে কোন গৌরবই থাকিবে না—এ সত্যটা পরিচালকদের মনে রাখা উচিত হইবে। এই প্রসঙ্গে কবির স্মৃতিরক্ষার আর একটি প্রস্তাবও আমাদের মনে লাগিয়াছে। সে দিন 'রসচক্র'-এর বৈঠকে কবি কালিদাস

রায় মহাশয় 'রবীন্দ্রাব্দ' প্রচলনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটি সমীচীন কিন্তু নানা কারণে ব্যাপকভাবে ইহা কার্য্যকরী হওয়ার অন্তরায় আছে। প্রথমত, রাজানুমোদনের অভাব, দ্বিতীয়ত—ইংরেজীআনায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে বাঙ্গালা বার-তারিখ-সন দৈনন্দিন কোন কাজেই ব্যবহার করি না; তবে বাঙ্গালার সাহিত্যিক সম্প্রদায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে 'রবীন্দ্রাব্দ' ব্যবহার করিয়া ভবিষ্যতে ইহাকে কায়েম করিবার পথ প্রশস্ত করিতে পারেন।

টাউন হলে রবীন্দ্র-স্মৃতি সভা—

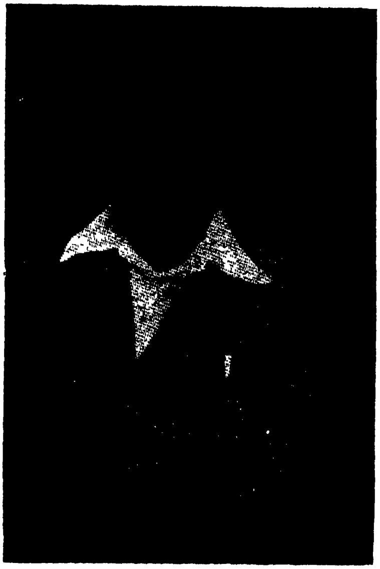
গত ১৩ই ভাদ্র কলিকাতার শেরিফ শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে টাউন হলে রবীন্দ্র-স্মৃতি সভার সভানেত্রীত্ব করিয়াছেন ভারত প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সার তেজবাহাদুর সপ্রু। স্মৃতি রক্ষার উপায় সম্পর্কে সভায় যে সব প্রস্তাব ও আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব-বিধানই মুখ্য প্রস্তাব ছিল। কিন্তু স্মৃতিরক্ষা প্রসঙ্গে স্যর তেজবাহাদুর যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শনের রস যাঁহারা মূল ভাষায় উপভোগে অসমর্থ তাঁহাদের জন্য কবির গ্রন্থাবলীর ভারতের প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা দরকার। তাহা ছাড়া, একজন বিশেষজ্ঞ বাঙ্গালীকে দিয়া কবির একখানি প্রামাণ্য জীবন চরিত রচনা করানো উচিত—ইহাতে বিশ্ববাসী উপকৃত হইবে। আমরা আশা করি নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি রক্ষা কমিটি স্যর তেজবাহাদুরের প্রস্তাব দুইটি কার্য্যকরী করিতে অবিলম্বে অগ্রসর হইবেন।

সুরেন্দ্রনাথের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ১৪ই ভাদ্র অপরাহ্নে কলিকাতার গড়ের মাঠের কার্জন পার্কে বাঙ্গালার রাষ্ট্রগুরু স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু সেই কার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ নব ভারতে জাতীয়তার প্রথম ও প্রধান প্রচারক। সুরেন্দ্রনাথ ভারতের নব জাগরণের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই জানা আছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল তাঁহার আর একটি দান। দুর্ভাগ্য দেশের, অযোগ্যদের হাতে সেই বিল আজ ধামা চাপা পড়িতে বসিয়াছে। সে যাহাই হোক, এতদিন বাদেও যে তাঁহার দেশবাসী সুরেন্দ্রনাথের এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়।

আশুতোষ দাস—

হুগলী জেলায় প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী অবসরপ্রাপ্ত আই এম এস ডাঃ আশুতোষ দাস এম-বি গত ৩১শে জুলাই তাঁহার বাসগ্রাম হরিপালে ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন



ডাঃ আশুতোষ দাস

করিয়াছেন। তিনি গত ২০ বৎসরেরও অধিক কাল যেভাবে কংগ্রেসের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। তাঁহার মৃত্যুতে হুগলী জেলা সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতে সমবায় ব্যাঙ্ক—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণীতে ভারতের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বিষয়ে যে তথ্য অবগত হওয়া যায় তাহাতে ভারতের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (ক) এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুদ তহবিল সহ পাঁচ লক্ষ বা ততোধিক অর্থ আছে; (খ) এই ধরণের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মূলধন এবং মজুদ তহবিল বাবদ অর্থের পরিমাণ হইতেছে একলক্ষ টাকা হইতে পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে।

১৯৩৯-৪০ সালে (ক) শ্রেণীর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একচল্লিশটি; পূর্ব্ববৎসরে এইগুলির সংখ্যা ছিল তেতাল্লিশটি। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা কমিয়া গেলেও আলোচ্য বৎসরে ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা এবং মজুদ তহবিল ৩ কোটি ৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরের আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা এবং ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। (খ) শ্রেণীর সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা হইতেছে



বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ—মধ্যে সভাপতি সার যদুনাথ সরকার

ছবি—তারক দাস

১৯৩৯-৪০ সালে ২৭৭টি; পূর্ব্ববৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৬১টি। এই সকল ব্যাঙ্কের আলোচ্য বৎসরে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা এবং মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে; পূর্ব্ববৎসরে আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা এবং ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

পল্লী পরিষ্কার ব্যবস্থা—

কলিকাতা বালীগঞ্জের হিন্দুস্থান সংঘের কর্ম্মীদের উদ্যোগে যে পল্লী পরিষ্কার ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ১ নং ডোভার লেনে সংঘের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা

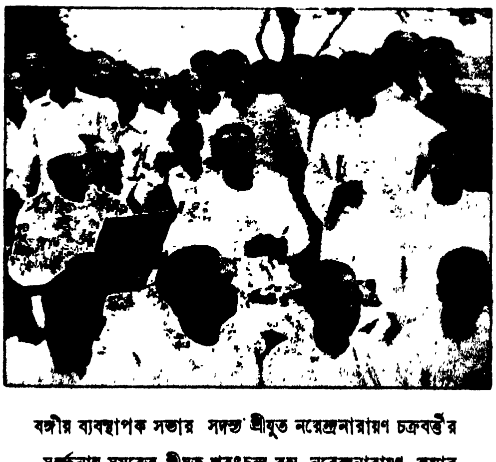


বালীগঞ্জে সহর পরিষ্কার ব্যবস্থার কর্ম্মীবৃন্দ

করা হইয়াছে। প্রত্যেকের নিজ নিজ বাড়ীর চারিপাশ পরিষ্কার রাখার জন্য প্রত্যেক গৃহস্বামীকে সজাগ করার চেষ্টাই ইহাঁদের কার্য্যের বিশেষত্ব। এইরূপ ব্যবস্থা কলিকাতা সহরের প্রত্যেক পল্লীতে অনুকৃত হইলে সহর আর অপরিষ্কার থাকিবে না।

মহাযুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতীকার—

বর্ত্তমান যুদ্ধ কতদিন চলিবে তাহা অনিশ্চিত। কেহই সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলিতে পারে না। অথচ যুদ্ধ শেষ



বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সম্বর্দ্ধনায় সমবেত শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রনারায়ণ, কুমার বিশ্বনাথ রায় প্রভৃতি

ছবি—ডি-রতন

হইলে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সব সমস্তা ভীষণভাবে দেখা দিবে তাহার প্রতীকার কেমন করিয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য ভারত সরকার একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করিয়াছেন। পাঞ্জাব, কলিকাতা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অর্থ-নীতিবিদগণ এই সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট দেখা দেয় এবং আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্যের অধঃপতন ঘটে। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রতীকার করিতে পারে নাই। সেই অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই গোপনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র বাড়াইতে লাগিল। এবারে যে যুদ্ধ বাধিয়াছে তাহা আরও ব্যয়বহুল। সুতরাং এ যুদ্ধের পর উত্তেজনা যখন থামিবে তখন কোন্ দেশের ভাগ্যে কি আছে—কে বলিবে। ভারতের ভাগ্যেও যে অর্থসঙ্কট আরও শোচনীয় ভাবে দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই ত যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত না হইয়াও ভারত করভারে প্রপীড়িত, এখানে অভাব ও দারিদ্র্য প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। সুতরাং উক্ত কমিটি যদি প্রতীকার কিছু উদ্ভাবন করিতে পারেন তাহা হইলে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

তাঁত শিল্প প্রদর্শনী—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বঙ্গীয় তাঁত শিল্প সমিতির উদ্যোগে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। গত সপ্তাহে বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস তাহার উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁতের কাপড় শুধু মিলের কাপড় অপেক্ষা মজবুত নহে, দামেও যে সুলভ তাহা



রবীন্দ্রনাথ শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্র মজুমদার অঙ্কিত

এই প্রদর্শনীতে গেলে বুঝা যায়। আমরা এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের—বিশেষ করিয়া প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীযুত সুকুমার দত্তের শুভবুদ্ধির প্রশংসা করি।

কৃত্রিম পেট্রল—

আজিকার এই পেট্রল নিয়ন্ত্রণের দিনে জনসাধারণকে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল উৎপাদন সমস্যার সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা পেট্রলিয়ামকে

পরিস্কৃত করিলে পেট্রলিয়াম ইথার, ভেসলিন, সলিড প্যারাফিন ছাড়াও ইহা হইতে পেট্রল, কেরোসিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। কাঁচা পেট্রলিয়াম ছাড়া পেট্রল, কেরোসিন ও দাহ্য তৈল উৎপন্ন করিবার নানা উপায়ও আছে। কোক কয়লাকে কার্ব্বণ মনক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণে পরিণত করিয়া এবং উচ্চতাপে উত্তপ্ত করিলে পেট্রল ও অন্যান্য জ্বালানী তৈল পাওয়া যায়। তাছাড়া, উচ্চ হাইড্রো-কার্ব্বন তৈলকে উচ্চতাপে তপ্ত করিয়া এবং উচ্চ চাপে রাখিয়া এইগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নিম্ন হাইড্রো-কার্ব্বনে পর্য্যবসিত করিলে পেট্রল উৎপন্ন হয়। পেট্রলের সহিত মেথিলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া লইলেও অনেক পরিমাণে পেট্রল বাঁচিয়া যায়। ইহা ছাড়া বিনা পেট্রলে মোটর গাড়ী চালানোর চেষ্টাও সাফল্য- লাভ করিয়াছে। এখন অনেক স্থলে পেট্রলের পরিবর্ত্তে কাঠ কয়লা হইতে উৎপন্ন প্রডিউসার গ্যাস ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাতে পেট্রলের তুলনায় মোটর চালানোর খরচ তিন ভাগের একভাগ মাত্র হয়। এই সবই আশার কথা—তবে যতক্ষণ না গবেষণা ফলকে ব্যবহারিক কার্য্যে লাগানো যাইতেছে ততক্ষণ ভারতের বিশেষ মঙ্গল নাই।



বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য
শ্রীসুকুমার দত্ত

পেট্রল নিয়ন্ত্রণ-নীতি—

পেট্রল নিয়ন্ত্রণকারী কর্ত্তৃপক্ষ থাকিয়া থাকিয়া পেট্রল সরবরাহ সম্পর্কে এখন তব তাক্-লাগানো নির্দ্দেশ দিয়া বসেন যে, গাড়ীর মালিকদের হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে হয়। অতিরিক্ত পেট্রল সরবরাহের দরখাস্তগুলি সম্পর্কে যে সরাসরি গোপন ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া বসেন তাহা অভ্রান্ত বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন অথচ যাহাদের জন্য সে ব্যবস্থা তাহারা কিন্তু কোন সুফলই লাভ করে না। সত্য বলিতে কি, তাঁহাদের ব্যবস্থাকে বলা যাইতে পারে নিছক খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ। যাহাদের অতিরিক্ত পেট্রল দেওয়া দরকার তাহাদের দাবী উপেক্ষিত হইল, আর ভাগ্যবানেরা বিনাক্লেশে সেই সুযোগ লাভ করিল। তবে বলাই বাহুল্য যে, এ সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ না দিলেও জনসাধারণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে যে, অতিরিক্ত পেট্রল নিয়ন্ত্রণে কর্ত্তৃপক্ষ 'যার ভাগে যা পড়ে'-নীতি অবলম্বন করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। আমরা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।



কলিকাতা সেনেট হলে আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সম্বর্দ্ধনায় সমবেত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ, আচার্য্য রায়, সার মন্মথনাথ, ডক্টর প্রমথনাথ প্রভৃতি ছবি—তারক দাস

গুরুদেবের স্মৃতি

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

আমি যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করি তখন আশ্রম-গুরু রবীন্দ্রনাথ সদ্য রোগমুক্তি লাভ করেছেন। কঠিন পীড়িতাবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্যে যে নিদারুণ ভাঙন দেখা দিয়েছিল—সেই ভাঙন তাঁর দেহকে করেছে পঙ্গু-অপটু। অথচ তাঁর মনের সম্পদ তখনো অজস্রধারায় প্রবাহিত হতে চায়, দেশের সর্বপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টায় নিজের অবাধ শক্তিকে প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু গুরুদেবের মনের এই তারুণ্যধর্মের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার রোগজীর্ণ পঙ্গুদেহ। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের মধ্যে কর্মপ্রেরণা ছিল ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মনের ভিতর থেকে আসতো কর্মের তাড়া। আমরা দেখেছি, কাজ না করতে পারলেই তাঁর মনে দেখা দিত বিরক্তি। তাই এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে দেখেছি, রৌদ্রদগ্ধ দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নেও কবিকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম লাভ করতে দেখা যায় নি। অবিশ্রান্ত কর্মে এবং বার্ধক্যে তাঁর সর্ব দেহে নেমে এসেছে ক্লান্তির ছায়া—কিন্তু চিরঞ্জীব মনের এক মুহূর্তের জন্যেও কর্মপরিক্রমার বিরাম নেই।

সর্বদাই দেখেছি, অপটু দেহের সম্বন্ধে তাঁর গভীর ঔদাসীন্য। আশ্রমে কোথাও কোন অনুষ্ঠান হবে সংবাদ পেলেই তিনি রোগ-পঙ্গু দেহ নিয়েও যোগ দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। একসময়ে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের যে শক্তি নিয়ে আশ্রমের প্রতি অনুষ্ঠানকে সংক্রামিত করতেন, মন্দিরে উপদেশ প্রদান করতেন, প্রত্যেকটি ছাত্রকে নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতেন, সে শক্তি যে তাঁর দেহ থেকে চিরতরে অন্তর্হিত হয়েছে, এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। এ জন্যে অধুনা তাঁকে আশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠানের সংবাদ জ্ঞাপন করা হতো না এবং ছাত্রেরা সচরাচর তাঁর কাছে যেতে কুণ্ঠা বোধ করতো—যদি তিনি অধিক আলাপ-আলোচনা ক'রে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এ প্রথায় তিনি অসম্ভব বিরক্ত বোধ করতেন। তিনি চাইতেন, আশ্রমের প্রত্যেকটি কর্মধারার মধ্যে যোগ দিতে—প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ করতে। ছাত্র-অধ্যাপকদের সংগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে। যখনই তাঁর কোন নতুন রচনা তৈরি হতো অমনি ছাত্র এবং অধ্যাপকদের ডেকে পাঠাতেন তাঁর গৃহে –নিজে সমস্ত রচনা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের স্বাধীন মতবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। এ ব্যবস্থা অবলম্বন করে তিনি ছাত্র এবং অধ্যাপকদের ব্যবহার তাঁর প্রতি অবাধ করতে চাইতেন।

একদিনের কথা মনে পড়ে, গুরুদেবের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলুম —সেখানে শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ এবং গুরুদেবের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। কথা-প্রসংগে তিনি রসিকতা করে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে গুরুদেবকে বল্লেন, "গুরুদেব, ওকে একটু বলে দিন, কলেজের পড়াশুনা সম্বন্ধে বড় উদাসীন।" অধ্যক্ষ মহাশয়ের কথা শেষ হতে না হতেই গুরুদেব তেমনি রসিকতা-মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, "ছাত্রেরা নিজেরাই যদি পড়াশুনা করবে—তা হলে তোমরা আছ কি জন্যে ; অসুখের অবস্থা রোগী যদি নিজেই ধরতে পারবে তবে ডাক্তারের প্রয়োজন কী জন্যে ?" শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে তাঁর এই সহজ সরল উদাহরণটি চিরকাল স্মরণ থাকবে।

শান্তিনিকেতনে তিনি যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছেন—তাতে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে অন্তরের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে—সে মধুর সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে শিক্ষক দৈনন্দিন অবাধ মেলামেশায় প্রতিটি ছাত্রের মনের পরিচয় পেতে পারেন এবং কোন দিকের এতটুকু ত্রুটি থাকলে তা অপনয়নের জন্য তৎপর হতে পারেন এবং তার জন্যেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় অবাধ সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই। শিক্ষকদের রক্ত চক্ষুর কটাক্ষের ভয়েই রবীন্দ্রনাথ কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে পদক্ষেপ করেন নি। তাঁর নিজের আদর্শে তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করেছেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক আবেষ্টনে শিক্ষক এবং ছাত্রদের অন্তরের আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়—ছাত্রদের মনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বীজ বপন করা হয়। শিক্ষকদের জ্ঞানাভিমান সেখানে ছাত্রদের কাছ থেকে তাঁদের ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখে না।

জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে অসুস্থ শরীর নিয়েও মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ মনীষী আবার শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে আমাদের "মানসী" কাব্যগ্রন্থখানা পড়াতেন। সে সময়ে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং কর্মশালীনতার যে পরিচয় পেয়েছি তা অপূর্ব। কী আবেগ দিয়েই না তিনি আমাদের "মানসী"র কাব্যরসধারা এবং রচনার মূল ইতিহাসের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতেন! একদিনও এক মুহূর্তের জন্য তাঁকে সময়ের অপচয় ঘটাতে দেখিনি—নির্দিষ্ট সময়ে তিনি পাঠগৃহে অবতীর্ণ হতেন এবং এক ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হলেই অধ্যাপনায় বিরত থাকতেন। একদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন গুরুদেব ছন্দ পড়াবেন। আমরা পাঠগৃহে উপস্থিত হয়ে বসেছি। ছন্দের নানাবিষয়ে বক্তৃতা শেষ করে তিনি তাঁর পশ্চাত ভাগ থেকে কয়েকটি গাছের ডালপালা এনে পাতার বৃন্তস্তবক ভাগ করে উদাহরণ দিয়ে ছন্দের যতিমাত্রা বুঝিয়ে দিলেন। অধ্যাপনায় তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার কী পরিচয়ই না সেদিন পেয়েছি! বিশ্ববিখ্যাত কবির সামান্য কাজেও বিন্দুমাত্র অবহেলা নেই—ছন্দ বুঝাতে গিয়ে কী উপকরণের প্রয়োজন হতে পারে সে সম্বন্ধে ভেবে পূর্বেই তিনি গাছের ডালপালা কয়টি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। শান্তিনিকেতনে যখন বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠা হয় তখন তিনি নিয়মিত

অধ্যাপনা করতেন—তাঁর শিক্ষাদানে নিষ্ঠা সম্বন্ধে সে সময়কার বহু ঘটনা শুনেছি। বৃদ্ধ অসুস্থ কবির শিক্ষকতার মধ্যেও যে নিষ্ঠা এবং কর্তব্য-তৎপরতার পরিচয় পেয়েছি তাতে প্রতিমুহূর্তে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিই নন—সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকও। শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের আদর্শে তিনি স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিকে শিক্ষকতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁরা সে যুগের আদর্শস্থানীয় শিক্ষক ছিলেন।

শান্তিনিকেতন বাস কালে যখনই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি—তখনই তাঁর স্বভাব-সুলভ রসিকতায় আমাদের মন থেকে সর্বপ্রকার ভয় এবং সংকোচ দূর করে দিয়েছেন। পৃথিবীর মহামানবের কাছে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে তাঁর কথা শুনেছি; এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি আমাদের নিজেদের তুচ্ছতা সম্বন্ধে সজাগ হবার অবকাশ না দিয়ে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করতেন।

কেউ কোথাও ব্যথা পেয়েছে শুনলে অধীর আগ্রহে তিনি দুঃখ দূর করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। অতি তুচ্ছ মানুষের অভিমানও তাঁর উদার মনকে চঞ্চল করে তুলতো। এ সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। শান্তিনিকেতনে সেবার "অরূপ রতন" নাটকটি অভিনীত হবার কথা। সংবাদ পেলুম, গুরুদেব তাঁর বাসগৃহ উদয়নে সেদিন রাত্রিতে অভিনেতাদের সমস্ত পুস্তকখানা পড়ে শোনাবেন। আমি তখন শান্তিনিকেতন সাহিত্যসমিতি "সাহিত্যিকা"র সম্পাদক ছিলুম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে সাহিত্যিকার কতিপয় সভ্যকে নিয়ে উদয়নে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলুম; সহসা বাধা এলো দ্বাররক্ষীদের কাছ থেকে—আমরা প্রবেশের অধিকার পেলুম না। দারুণ অভিমান নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে সেদিন আমরা ফিরে এলুম।

পরদিন অপরাহ্নে জনৈক অধ্যাপক এসে আমায় সংবাদ দিলেন, "গুরুদেব কী করে শুনেছেন, গতকাল তোমরা তাঁর নাটক আবৃত্তি শুনতে গিয়ে ফিরে এসেছ। তিনি আজ সন্ধ্যায় সাহিত্যিকার সভ্যদের উপস্থিত হতে বলেছেন।" সন্ধ্যায় যথাসময়ে আমরা গুরুদেবের বাসগৃহ উত্তরায়ণে উপস্থিত হলুম। তিনি আমাদের সম্পূর্ণ "অরূপরতন" নাটকখানা আবৃত্তি করে শোনালেন এবং নাটকের প্রায় অধিকাংশ সংগীতে সুর-সংযোজনা করে গাইলেন। বুঝতে পেরেছিলুম মানুষের সামান্য অভিমানও তাঁকে কত বড় আঘাত দেয়।

গুরুদেব পৃথিবীর কর্মক্ষেত্র থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেছেন, একথা যেন আজ কিছুতেই ভাবতে পারিনে। জীবনে তাঁকে অতি কাছে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীর ছাত্ররূপে পরিগণিত হতে পেরেছিলাম এতেই আজ নিজেকে সর্বপ্রকারে ধন্য মনে করছি। আজ এই স্মৃতিনিবন্ধ লিখতে গিয়ে মনে কেবলই তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, তাঁর দীর্ঘ দেহ, ঋষিসুলভ অকলংক সৌন্দর্য আমার দৃষ্টিতে ছায়া ফেলছে। জীবনে আর কোন দিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠমানব যুগগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় করে কাছে পাব না, এ চিন্তা মনকে কঠিন আঘাত দেয়। আজ ভাবি, সত্যই কি কোনদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে এত কাছে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল!

ভ্রান্তি-বাসর

শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী

মর্ম্মের মাঝখানে যে ফুল ফুটেছে গানে সে ফুল কি তুলে লবে কেউ গো?
মালায় কি গাঁথা হবে? কেউ কি কণ্ঠে লবে? ভাঙ্গিবে কি বেদনার ঢেউগো?
প্রেমের-সাগর তীরে অভিমানী ধীরে ধীরে আসিবে কি কভু পথ ভুলিয়া?
নিবে কি আঁচল ভরি প্রণয় সোহাগ করি দুটি তার মৃদু বাহু তুলিয়া?
মিলেছিনু দুইজনে ক্ষণিকের যেই ক্ষণে সে ক্ষণ কি আলো জাগে আঁখিতে?
যে গান গাহিত সে গো সে গান আজিও যে গো গাহে বনবালা আর পাখীতে?
ছোট্ট নদীর তীরে ছায়া-ঘেরা ক্ষীণ নীড়ে সাঁঝের প্রদীপ আর জ্বলে না;
আনন আনিয়া কাছে, মরমে সরম লাজে প্রণয়ের কথা কেউ বলে না।
হিমকণা রাত্রির, প্রভাতের যাত্রীর, পথে আপনারে দেয় বিলায়ে;
দূর্ব্বাকোমল বুকে সহে কত শত সুখে ধরণীর সাথে দেহ মিলায়ে।
কনক চাঁপার দল পরাগের পরিমল বিলায় আকাশে আঁখি মেলিয়া,
যে যায় সে চলে যায় আর নাহি ফেরে হায় স্মৃতির অশ্রুকণা ফেলিয়া।

যারে ভেবে আপনার ধরে রাখি বার বার সে যে মোর কেউ নয়, নয় গো
রঙ্গিমা চাঁদ জেগে মেঘের পরশ মেগে নিশীথ নয়ন জল বয় গো।
ফিরিয়া ফিরিয়া আসে ধরণী-তুয়ার পাশে বন-বকুলের ঝরা সুরভি,
তটিনী বেলায় ছেয়ে প্রভাতী আল্‌সে মেয়ে আজো ফোটে নামধরে—করবী।
বনবলাকার সারি দেয় দূর দেশে পাড়ি ভোরের পূবালী তরী বাহিয়া,
দীর্ঘশ্বাসের সাথে মুকুলিতা মন মাতে শুধু কার তরে পথে চাহিয়া।
মর্ম্মমুকুরে ব্যথা শুধু আনে ব্যাকুলতা মমতার খেলাঘর খুলিয়া,
ছায়ার তরণীখানি বাহে স্বপ্নের রাণী পুরাতনী পালখানি তুলিয়া।
দিবসের খেয়াপারে হাতছানি দেয় কারে প্রদোষের প্রশমিত বেদনা,
রিক্তের বন্ধনে বিদায়ের শেষ ক্ষণে বাঞ্ছিতা কেঁদে গেছে কত না।
কবরীর সুশীতল পরশটি নিরমল কপোলে করুণ আজো লাগিছে,
অধীর অধর আশা বেঁধেছে কোথায় বাসা, সজল চাউনি চোখে জাগিছে।
তারে আমি অবেলায় ভুলিতে পারিনি হায়, বোধ হয় সে মনে মোরে রাখেনি ;
চঞ্চলা নিশীথিনী তাই আজো গরবিনী বুকের বসনখানি ঢাকেনি।
মধু মমতায় ঝরা তুটি কর স্নেহভরা আর নাহি আসে করে মিলাতে,
"তুমিই স্বর্গ মোর"—ব'লে কেউ আঁখি লোর ঝরায় না বেদনায় বিলাতে।
দিনগুলি আসে আর ফিরে যায় বার বার, চিত্তের-পথ ধূলি-অন্ধ,
বক্ষ ব্যথায় বহি কাঁপিছে গো রহি রহি, অন্তর দ্বার বুঝি বন্ধ।
অজানা এমন ক'রে জানিল কেমনে মোরে ? বেশ ছিলো শান্তির প্রাণটা !
বুঝি তাও সহিল না ; তাই মিছে আনাগোনা, তাই এই ক্লান্তির দান্‌টা !
বিশ্বদেবতা মিছে কেন আর ব্যাকুলিছে হৃদয়ের অলকেতে বসিয়া ?
বিরহী দখিনা বায় উত্তরী দিয়ে গায় তনুতে পরশে যায় খসিয়া।
পর্ণকুটীর ছায়া ঘেরিয়া রয়েছে মায়া, বাজে বন-মর্ম্মর ধ্বনিটি ;
রুণুঝুনু মেঘনটী নাচে গো দোলায়ে কটি এলায়ে কাজল কালো বেণীটি,
চৈতালী ধূলিজালে কালবৈশাখী তালে নিয়ে যায় প্রান্তর প্রান্তে ;
বধূদের ছলভরা বৈকালী জলভরা গল্পের জালখানি টান্‌তে।
মিতালী সুরের বাণী গোধূলি বাঁশরীখানি বাজায় পূরবী রাগে সাঁঝেতে ;
সে গীতালি মধুটুক্ ভরে দেয় সব বুক, কারে তবু হেরি যেন পাছেতে।
জানি না এ অভিনব কেমন এ খেলা তব, খেলাও কেমনে মোরে ভুলায়ে !
কেমনে আঁকো গো কবি—তিমির তন্দ্রা-ছবি নিদের তুলিকাখানি বুলায়ে ?
মিছে সব মিছে সব—তুদিনের কলরব, মাধবীমাসের মায়া মিছে গো
ভ্রান্তির বাসরের মিলন এ আসরের ; রহিবে সকলি দূরে পিছে গো।



খেলা-ধূলা





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রোভার্স কাপ ঃ

আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার মরসুম এ বছরের মত শেষ হ'তে চলেছে। যে কয়েকটি প্রতিযোগিতার শেষ ফলাফল বাকি রয়েছে তাদের আকর্ষণ খুব বেশী নয়। এর পর সুদূর বোম্বাই প্রদেশের রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর ক্রীড়া অনুরাগী মাত্রেরই দৃষ্টি ফিরবে। আই এফ এ শীল্ডের পর রোভার্স কাপের আকর্ষণ এবং জনপ্রিয়তাকে সকলেই স্বীকার করবেন। ১৮৯১ সালে রোভার্স কাপের প্রথম খেলা আরম্ভ হয়। এই দীর্ঘ দিনের প্রতিযোগিতায় মাত্র ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালোর মুসলীম রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়ে ভারতীয় দলের কাপ বিজয়ের সর্ব্বপ্রথম সম্মান লাভ করে। পরবৎসরও তারাই উক্ত কাপ বিজয়ী হয়। ১৯৪০ সালে বাঙ্গলার অন্যতম ফুটবল প্রতিষ্ঠান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়। পূর্ব্বাপর বৎসরে বহু শক্তিশালী সৈনিক দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এসেছে এবৎসরে তার একান্ত অভাব দেখা গিয়েছে। মাত্র তিনটি সৈনিক দল প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে শক্তিশালী কে ও এস বি প্রতিযোগিতায় যোগদান থেকে বিরত হয়েছে। ওয়েলচ রেজিমেণ্ট ও উইণ্টসায়ার এই মাত্র দু'টী গোরা দল প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অন্যান্য বৎসরের মত এবৎসর বেশী সংখ্যক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। মহাযুদ্ধের দরুণ টীমের সংখ্যা



(১)



(২)

ফুটবল খেলায় সামনা-সামনি গতিরোধের পদ্ধতিঃ ১নং চিত্রে গাঢ় রংয়ের সার্ট পরিহিত খেলোয়াড়টি ভুল ভাবে অপর খেলোয়াড়টির গতিরোধ করবার চেষ্টা কচ্ছে। তাদের দূরত্ব বেশী থাকার ফলে জোরের অভাব ঘটে এবং গতিও মাত্র সাময়িক ভাবে রোধ করা যায়। সাদা সার্ট পরিহিত খেলোয়াড়টি সোজা ও দৃঢ় ভাবে দাঁড়ানোর জন্য জোর বেশী পায় এবং অতি সহজেই সে অপর পক্ষকে পরাজিত করে। ২নং চিত্রে কিন্তু প্রতিরোধকারী মোটেই ভুল করেনি। ডান পায়ের উপর যতদূর সম্ভব জোর দিয়ে বলটি আটকেছে

এইভাবে কমেছে ; দল পাঠানোর ব্যয়ভার বহন করা সকল প্রতিষ্ঠানের সম্ভব হয়নি। বাঙ্গলা দেশ থেকে এবৎসরের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং লীগ রানার্স ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যোগ দিয়েছে। মহমেডান দল ৭-০ গোলে পেশোয়ার ক্যানটনমেণ্ট জিমখানাকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালে তারা সহজেই উঠবে এবং এবৎসরেও কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করবে বলে অনেকেই আশা করছেন। এবং এই আশা একেবারে অমূলক নয়। রোভার্স কাপে ইষ্টবেঙ্গলের যোগদান এই প্রথম। তারা ৬-০ গোলে হিনরিকস মেমোরিয়াল বিজয়ী রয়েল নেভি দলকে পরাজিত করে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলার পরিচয় দিয়েছে। বোম্বাইয়ের দর্শকমণ্ডলী ইষ্টবেঙ্গল দলের যে ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় পেয়েছে তা দীর্ঘ দিন স্মরণ রাখবে। তারা মহমেডান দলের খেলাকেও নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। অনেকেই আশা করেন ফাইনালে মহমেডান দলের সঙ্গে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

ইলিয়ট শীল্ডের ফাইনালে রিপন কলেজ ২-০ গোলে এবৎসরের ইণ্টার-কলেজিয়েট লীগ চ্যাম্পিয়ান আশুতোষ কলেজকে পরাজিত ক'রে তৃতীয়বার উক্ত শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।

আন্তঃ কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইলিয়ট শীল্ডের আকর্ষণ এবং জনপ্রিয়তা বেশী। আই এফ এ-র পরিচালক-মণ্ডলী উক্ত শীল্ডের খেলা নিয়ন্ত্রন করে আসছেন। কিন্তু সম্প্রতি যে কয়েকটী অপ্রীতিকর ঘটনা হয়েছে তাতে নাকি ভবিষ্যতে উক্ত শীল্ড পরিচালনা করা আই এফ এ-র পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে, বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা রেফারীর খেলা পরিচালনা ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এমন অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে রেফারীরা এই শীল্ডের খেলা পরিচালনা করতে পারবেন না বলে একপ্রকার জবাবই দিয়েছেন। তাঁরা এটাও ঠিক করেছেন, রেফারী এসোসিয়েশন মারফৎ একটা প্রস্তাব প্রেরণ করে খেলা পরিচালনা ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা জানাবেন। আই এফ এ-র বহু বিশিষ্ট সভ্যও নাকি ছাত্রদের অভদ্রোচিত ব্যবহারের চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে খেলাটি বন্ধ করে দেওয়াই নাকি স্থির করছেন। এখনও রেফারী এসোসিয়েশন কিম্বা আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলী তাদের সভায় কোনরূপ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে চূড়ান্ত মীমাংসায় আসেন নি।

কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌছবার পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে আই এফ এ-কে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে আমরা অনুরোধ করছি। আন্তঃকলেজ শীল্ড খেলার সঙ্গে আমরাও একেবারে অপরিচিত নয়। কোন কোন সময়ে বিশেষ কারণ এবং অকারণে একদল ছাত্ররা যে অভদ্রতার পরিচয় দেয় তা অস্বীকার করবার নয়। অন্য কোন সময়েই বিশেষতঃ যখন ছাত্ররা, অধ্যক্ষ অধ্যাপক এবং সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্র বসে খেলা দেখেন সে সময়ে অখেলোয়াড়ী মনোভাবকে মার্জ্জনা করা যায় না। রেফারীর ভুল ত্রুটীর বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন অপ্রিয় ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও একটা সুষ্ঠু পন্থা আছে। অন্যায়ের প্রতিকার করা দোষের নয়। কিন্তু এটাও আবার সত্য যেখানে বার বার প্রতিবাদ জানিয়েও প্রতিকার পাওয়া যায় না সেখানে প্রতিবাদের সুষ্ঠু পন্থার উপর মানুষের কতদিন আর ধৈর্য্য থাকে? আই এফ এ আজ কোন কোন শ্রেণীর ছাত্রদের অভদ্র ব্যবহারের জন্য যদি ইলিয়ট শীল্ড প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখা স্থির করেন তাহলে একটী সমগ্র ছাত্র সমাজের সম্মানকে উপেক্ষা করা হয়। আমাদের মনে হয় কোনরূপ চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্ব্বে ছাত্রদের ভবিষ্যতের জন্য প্রথম সতর্ক করাটাই প্রধান কর্ত্তব্য। এছাড়া অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি দেখছি না। খেলা-ধূলায় শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে আই এফ এ যদি ছাত্রদের উপরই এইরূপ কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহলে তাঁদের বিচার যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব মূলক হবে। আমরা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পরামর্শ দিচ্ছি না। লক্ষ্য রাখলেই দেখা যাবে আমাদের সমাজ জীবনে ছাত্ররা খুব বেশী উপেক্ষিত হয়ে বহুভাবে নিন্দা অর্জ্জন করে আসছেন। এই ঘটনার মধ্যে কারণ যে একেবারে নেই তা বলছি না কিন্তু অকারণে, ভ্রান্ত ধারণা এবং নিজেদের অতীত ছাত্র জীবনের উপর একটা মোহ পোষণ ক'রে আমরা বর্ত্তমান কালের ছাত্র জীবনকে বহুভাবে নিন্দা করে আসছি।

অভিভাবক হিসাবে আমাদের যে যে দায়িত্ব রয়েছে সে সমস্তকে উপেক্ষা ক'রে ছাত্র জীবনের বিচ্যুতিকেই বড় ক'রে দেখি।

আই এফ এ পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ডের খেলাই ছাত্রদের প্রধান আকর্ষণ। আই এফ এ আজ প্রবীণত্বের পর্য্যায়ে এসে পড়েছে অথচ আজও দর্শকদের অভিযোগ দূর করতে সক্ষম হয় নি। খেলায় রেফারিং দিন দিন নিম্নশ্রেণীর পর্য্যায়ে নেমে আসছে। অভিযোগ দূর করার চেষ্টাও হ'চ্ছে বলে মনে হয় না। আই এফ এ-র এই মৌন ব্রতের জন্য দর্শকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কোন কোন শ্রেণীর দর্শক উত্তেজনা বশত সময়ে সময়ে অভদ্র ব্যবহারে রেফারীর উপর কঠোর শাস্তি দিতেও অগ্রসর হয়েছে। খেলার মাঠে খ্যাতনামা ফুটবল প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়রাও নানাভাবে বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কোন কোন দর্শক বা খেলোয়াড় রেফারীকে লাঞ্ছিত ক'রে, পাদুকা নিক্ষেপ দ্বারা সম্মানে আঘাত দিয়ে মাঠের স্বাভাবিক আবহাওয়া দূষিত করেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি এর জন্য দর্শকদিগকে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না। তাদের কথাও একবার চিন্তা করা দরকার। দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপ উপেক্ষা ক'রে আবার শ্রাবণের মুষল বর্ষা মাথায় বহন ক'রে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় খেলা আরম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই দর্শকদের গেটের সামনে উপস্থিত হতে হয়। তার পর বহু বেড়া-জালের মধ্যে ঘোড়ার পদাঘাত হজম করে যারা বহু পুণ্য সঞ্চয় করেছেন তাঁরাই অর্থের বিনিময়ে ভিতরে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করেন। সঙ্গীরা ঘোড়শাওয়ারের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ, সঙ্গের সাথী বর্ষাতি, ছাতা জুতাও নিঃসঙ্গ। দেহের জামা কাপড়ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ভদ্রতা হারিয়ে ফেলেছে। দেহের এবং মনের এই পরিবেশের মধ্যে রেফারী যদি



(১)



(২)

ফুটবল খেলায় শোল্ডার চার্জ (Shoulder Charge): ১নং চিত্রে ন্যায়সঙ্গতভাবে শোলডার চার্জ দেখান হয়েছে। ডানদিকের খেলোয়াড়টি বলটি সর্ট করতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়েছে; বাঁদিকের খেলোয়াড়টি প্রতিদ্বন্দ্বিকে বলে সর্ট মারবার পূর্ব্বেই আইন বাঁচিয়ে ধাক্কা দিয়েছে। প্রতিরোধকারীর বাঁদিকের বাহুটি অপর খেলোয়াড়টির খুব নিকটে দেখা যাচ্ছে এবং সে যাতে পায়ের উপর চাপ দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করতে পারে তার জন্য সময়ে ধাক্কা দিয়েছে। ডানদিকের খেলোয়াড়টি শরীরের তাল হারিয়ে ফেলে পাশে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে না; ফলে বলের কাছে পৌঁছতে পারবে না। যদি তার ডানদিকের পা মাটির উপর থাকত তাহলে বাঁ পা মাটিতে ফেলে পড়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত।

২নং চিত্রে অন্যায়ভাবে বিপদজনক ধাক্কা দেখান হয়েছে। গাঢ় রংয়ের সার্ট পরিহিত খেলোয়াড়টি বাঁ হাতের কনুই দিয়ে বিপক্ষকে ধাক্কা মেরে বলটি নিজের আয়ত্বে আনবার চেষ্টা করছে। এইরূপ ধাক্কায় মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। খেলোয়াড়দের সম্মানের জন্য এবং দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ধাক্কা মারার সময়ে কিম্বা তার পরে কনুইটি ভিতরের দিকে রাখা খুবই উচিত

মারাত্মক ক্রটী বিচ্যুতি ঘটিয়ে দর্শকদের বিদ্রূপ লাভ ক'রে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হন তাহলে দর্শকদের অখেলোয়াড়ী মনোভাবের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলীও এই সমস্তকে উপেক্ষা করে চলেন। তাঁরা অনুপযুক্ত রেফারীকে বার বার খেলা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিয়ে মাঠে দর্শকদেরই অখেলোয়াড়ী মনোভাব উদ্রেকের সহায়তা করছেন। কোন কোন রেফারী বার বার মারাত্মক ক্রটীপূর্ণ বিচার দিয়েও পুনরায় খেলা পরিচালনার অধিকার পেয়েছেন। সেই সমস্ত রেফারীর উপর পরিচালকমণ্ডলীর ব্যক্তিগত আস্থা থাকতে পারে কিন্তু দর্শকদের কতদিন ধৈর্য্য ধরে থাকা সম্ভব! সামান্য ক্রটীর মধ্যেও তাঁকে মার্জ্জনা করতে না পেরে প্রতিবাদ জানান স্বাভাবিক। আই এফ এ পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলাতে খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা যে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসছেন সেটাই আজ ছাত্রসমাজে সংক্রামিত হ'য়েছে। ছাত্রদের মধ্যে স্পোর্টিং স্পিরিট জাগিয়ে তুলতে হলে আই এফ এ এবং রেফারী এসোসিয়েশনের প্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য কলকাতার প্রথম শ্রেণীর খেলায় যাতে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকে তার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তা না হলে আজ যে সম্মান রক্ষার জন্য তাঁরা সজাগ হয়েছেন তা কোনদিনই অক্ষুণ্ণ থাকবে না। ক্রিকেটে বডি লাইন বোলিংএর আবির্ভাব হ'লে তার অনুকরণ বিভিন্ন ক্লাব এবং স্কুল কলেজের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে কি ভাবে চলেছিল! বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক ও ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব ক্যাপ্টেন পি এফ ওয়ার্ণার বডি লাইন বোলিং সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'What is done in a Test Match is copied in every club and school next day."

আজ আমাদের দেশের ছাত্ররাও কলকাতার বিভিন্ন ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় অপ্রিয় ঘটনাকে অনুকরণ করছে। এই পুনরাবৃত্তির জন্য আই এফ এ এবং রেফারী এসোসিয়েশন ছাত্রদের উপর দোষ চাপিয়ে যদি এতদিনের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেন তাহলে তাঁরা কর্ত্তব্য পালনে মস্ত ভুল করবেন।

কোন কোন রেফারির ক্রটী বিচ্যুতির জন্য রেফারী এসোসিয়েশনের সম্মান বহুবার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এসোসিয়েশন তাঁদের সম্মান রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়েছেন দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছি। তবে অপহৃত সম্মান উদ্ধার করতে বর্ত্তমানে তাঁরা যে প্রস্তাবের মধ্যে অগ্রসর হয়েছেন তার সঙ্গে একমত হতে পারি না। তাঁদের উচিত, যে সমস্ত রেফারী মারাত্মক ক্রটী দ্বারা এসোসিয়েশনের সম্মান খর্ব্ব করেছেন তাঁদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তা না হলে ইলিয়ট শীল্ডের খেলা বন্ধ করলেও লীগ, আই এফ এ শীল্ড রয়েছে। সেখানে এখানের তুলনায় তাঁদের সম্মান খুব বেশী উঁচুতে নেই। এ সমস্ত চিন্তার বিষয়। প্রথম শ্রেণীর রেফারিংয়েও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সে বিষয়ে এসোসিয়েশন কোন প্রকার নূতন পরিকল্পনাও করেন নি।

খেলা পরিচালনার জন্য রেফারীকে উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা এদেশে নেই। নামমাত্র দক্ষিণার উপর লোভ রেখে রেফারীদের নিবিষ্ট মনে খেলা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। নিজেদের দায়িত্বের উপরই বা আস্থা আমাদের দেশের রেফারীদের কতটুকু! পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করলে উপযুক্ত লোকের অভাব হবে না। খেলার পরিচালকমণ্ডলীও ব্যয় সঙ্কোচের জন্য মাত্র প্রথম শ্রেণীর রেফারিদেরই পারিশ্রমিক দিয়ে বহু নিম্নশ্রেণীর রেফারিদের বাতিল করতে বাধ্য হবেন। আমাদের দেশে বহু প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁদের উপর রেফারিংয়ের ভার সম্পূর্ণ অর্পণ করলে মাঠে দর্শকদের মধ্যে যে শ্রেণীর অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি তা দূর হবে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ ক্লাব পরাজিত হলে তাদের সমর্থকরা এবং সময় সময় খেলোয়াড়রাও পরাজয়ের গ্লানি সহ্য ক'রতে না পেরে রেফারীকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেন। তাতে রেফারিং যত ভালই হ'ক। কোন খেলোয়াড়ের আচরণ অথবা রেফারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করাটা ওদেশে আবার কোন রকম দোষণীয় নয়। ব্যারেকিং ত আছেই।

কিন্তু আমাদের দেশে রেফারীকে লাঞ্ছিত করার যে সব ঘটনা পাওয়া যায় তার তুলনায় ইউরোপ ও আমেরিকার ঘটনাগুলি যেমন নূতন তেমনি ভয়াবহ এবং রোমাঞ্চকর।

আমরা অখেলোয়াড়ী মনোভাবকে কোনদিন সমর্থন করিনি এবং ভবিষ্যতেও করব না। প্রতিকার এবং প্রতিবাদের প্রয়োজন স্বীকার করি। আমাদের অনুরোধ

তা করতে গিয়ে যেন বহু নিরপরাধ ক্রীড়ামোদী এবং খেলোয়াড়ের সম্মান অপহৃত না হয়।

ইয়জার কাপ ফাইনাল ঃ

ই বি রেলদল উক্ত কাপের ফাইনালে ২-০ গোলে রবার্ট হাডসন দলকে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়েছে। বিজয়ী দলের খেলা উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। রোজারিও এবং স্পিক বিজয়ীদলের গোল দু'টি দিয়েছিলেন।

হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড ঃ

রিপন কলেজ হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ডের দ্বিতীয় দিনের খেলায় বিদ্যাসাগর কলেজকে ১-০ গোলে পরাজিত করে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের খেলায় পেনাল্টির সুযোগ পেয়েও বিদ্যাসাগর কলেজ জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে বিজিত দল কোন অংশে খারাপ খেলে নি। বহুবার অব্যর্থ গোলের সন্ধান করেছে কিন্তু বিজয়ী দলের ব্যাক মোহনবাগানের খেলোয়াড় শরৎ দাস এবং গোলরক্ষকের ক্রীড়াচাতুর্য্যে তা ব্যর্থ হয়েছে। ঐদিন কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড় বিজিত দলে যোগদান না করায় দলটি অন্যদিন অপেক্ষা কতক অংশে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আক্রমণভাগের কোন কোন খেলোয়াড় একাই গোল করবার চেষ্টা না করলে ঐদিন তারা একাধিক গোলে জয়লাভ করতে পারত। বিজয়ীদল মাত্র একটি গোল ছাড়া বিপক্ষ দলের গোলের সম্মুখে বিশেষ কোন উদ্বেগের সৃষ্টি করেনি। খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিজিত দল খেলার মাঠে তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেও গোল করতে সক্ষম হয়নি।

রাজা শীল্ড ঃ

রাজা শীল্ডের ফাইনালে রবার্ট হাডসন ১-০ গোলে হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত করে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। হাওড়া ইউনিয়ন পরাজিত হলেও ভাল খেলেছিল।

লেডি হার্ডিঞ্জ শীল্ড ঃ

মোহনবাগান ক্লাব ১-০ গোলে পুলিশদলকে পরাজিত করে লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। ডি সেন পেনাল্টিতে গোল দেন।



(১)



(২)

খেলায় অযথা শারীরিক শক্তিপ্রয়োগ ঃ ১নং ছবিতে গাঢ় রংয়ের সার্ট পরিহিত খেলোয়াড়টি কাপুরুষের মত পিছন থেকে বিপক্ষকে ধাক্কা দিচ্ছে। প্রতিরোধকারী বাঁ হাতের কনুই এবং হাতের মুঠো কি ভাবে পিছনে প্রয়োগ ক'রে সামনের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে তা লক্ষ্যের বিষয়। এই ধরণের ধাক্কায় বিপদ অনেক। ২নং চিত্রেও ফাউল দেখান হয়েছে। একজন খেলোয়াড় সোলডার চার্জ না ক'রে 'হিপ-বোন' দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে

আমেরিকান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

আমেরিকান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের পুরুষদের ফাইনালে ববি রিগস ৫-৭, ৬-৩, ৬-৩, ৬-৩ গেমে কোভাক্সকে পরাজিত করেছেন। কোভাক্স প্রতিযোগিতার

সেমি-ফাইনালে ৬-৪, ৬-২, ১০-৮ গেমে ডন ম্যাক্‌নীলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় সেটের খেলা আরম্ভ থেকে রিগসের খেলা সম্পূর্ণরূপে ঘুরে যায়। রিগসের খেলার সামনে কোভাক্সের স্বাভাবিক খেলা আর খুলেনি। রিগস তাঁর ক্রীড়াচাতুর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। খেলার শেষের তিন সেটে তিনি একবারও সার্ভিস নষ্ট করেন নি।

বার্ষিক জলক্রীড়া ঃ

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সপ্তম বার্ষিক জলক্রীড়া প্রতিযোগিতা পূর্ব্বাপর বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ৩০০ মিটার মিডলে করেছে। সময় ৪ মিঃ ৩৬২।৫ সেকেণ্ড। প্রতিযোগিতার উভয় বিভাগে বহু সাঁতারু যোগদান করেছিলেন।

পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

পৃথিবীর হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য চ্যাম্পিয়ান জো'লুই পুনরায় বুড্ডি বেয়ারের সঙ্গে বক্সিং লড়েছিলেন। বুড্ডি বেয়ার ভূতপূর্ব্ব 'World title-holder.' পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও বুড্ডি বেয়ারের উপর রেফারি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে লড়াই অর্দ্ধ অবস্থাতেই শেষ করেছেন। এবারের লড়াইয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রথম রাউণ্ডেই বুড্ডি বেয়ার জো'লুইকে দড়ির বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেয়ার বাঁ এবং ডান দিকে



সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ঃ এই বৎসর বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটার-পোলো লীগের প্রথম ডিভিসনে শীর্ষস্থান অধিকার করা ছাড়াও ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত উপেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড এবং সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব পরিচালিত 'রজত জয়ন্তী' ওয়াটার-পোলো প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছে। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের 'বি' টিম দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে 'রাণার্স আপ' পেয়েছে।

রিলে রেস ন্যাশান্যাল সুইমিং ক্লাব ৩ মিঃ ৫৯ সেকেণ্ডে শেষ ক'রে প্রাদেশিক রেকর্ড স্থাপন করেছে। এছাড়া খিদিরপুর ক্লাব ৪০০ মিটার রিলে রেসে প্রাদেশিক রেকর্ড স্থাপন

ঘুসী চালিয়ে লুইকে অক্ষত রাখেন নি। চতুর্থ রাউণ্ডে বেয়ারের একটা প্রচণ্ড 'লেফ্‌ট হুক্‌' তাঁর ঠোঁট কেটে ফেলে এবং পঞ্চম রাউণ্ডে লুইয়ের বাঁ চোখটা কাটা যায়

চ্যাম্পিয়ানসীপের সম্মান রাখতে গিয়ে লুইকে বহুদিন এ ভাবের শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়নি। আর কোন সাংঘাতিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবার পূর্ব্বেই লড়াই শেষ করবার জন্য তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ৬ রাউণ্ডের খেলা সমাপ্তির নির্দ্দেশ উপেক্ষা করে লুই বেয়ারকে ঘুঁসী মারেন। খেলার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার জন্য বেয়ার প্রতিবাদস্বরূপ প্রতিযোগিতায় আর যোগদান করেন নি। সপ্তম রাউণ্ডের খেলা আরম্ভ করতে রেফারী নির্দ্দেশ দিলে বেয়ারের ম্যানেজার রেফারিংয়ের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঘোষণা করেন, এ লড়াইয়ে তিনি বেয়ারের চ্যাম্পিয়ান-সীপের ন্যায্য দাবি বলে কলম্বিয়া বক্সিং কমিশনের নিকট প্রতিবাদ পেশ করবেন। ১২।৯।৪১

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "কলঙ্কিনীর থাল"—২৲

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত "ম্যাদাম বোভারী"—১॥০

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত উপন্যাস "প্রতিশোধ"—২৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আরাম-বাগ"—১॥০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখিত শিশুসাহিত্য "আমার ভূতদেখা"—॥০

শ্রী[illegible] দাস সম্পাদিত রহস্য-রোমাঞ্চ "মরণজয়ী"—৸০

শ্রী[illegible] মজুমদার প্রণীত শিশুপাঠ "ভগবান বুদ্ধ"—।৵০

শ্রীতুলসী লাহিড়ী প্রণীত নাটক "মায়ের দাবী—১।০

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "বার্ষিক শিশুসাথী"—১৸০

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত "সঙ্গীত বিকাশ" প্রথম ভাগ—১৲

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত "রবীন্দ্রনাথ"—৸০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত "পথপ্রান্তে"—২৲

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সহরতলী" ২য় পর্ব্ব—২৲

ব্রহ্মচারী শ্রীপরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "জগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত" ১ম খণ্ড—১।০

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাসের কবিতার বই "মাটির মায়া"—১৲

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায় প্রণীত কৌতুক নাটিকা "গণ্ডগোল"—।৵০

শ্রীসুধীর বসু প্রণীত উপন্যাস "ডক্টর ঘোষ"—১॥০

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ঝটিকার ঊর্দ্ধে"—৵০ ও "দ্রষ্টার চোখে"—৵০

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "মনে মনে"—১৲ ও "জীবন-মৃত্যু"—১॥০

শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "ভারতীর প্রশ্ন"—১॥০

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত "অভাবনীয়"—১॥০

কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত "আজকার কথা"—১।০

ভবানী পাঠক প্রণীত "আকাশ মায়া"—॥৵০

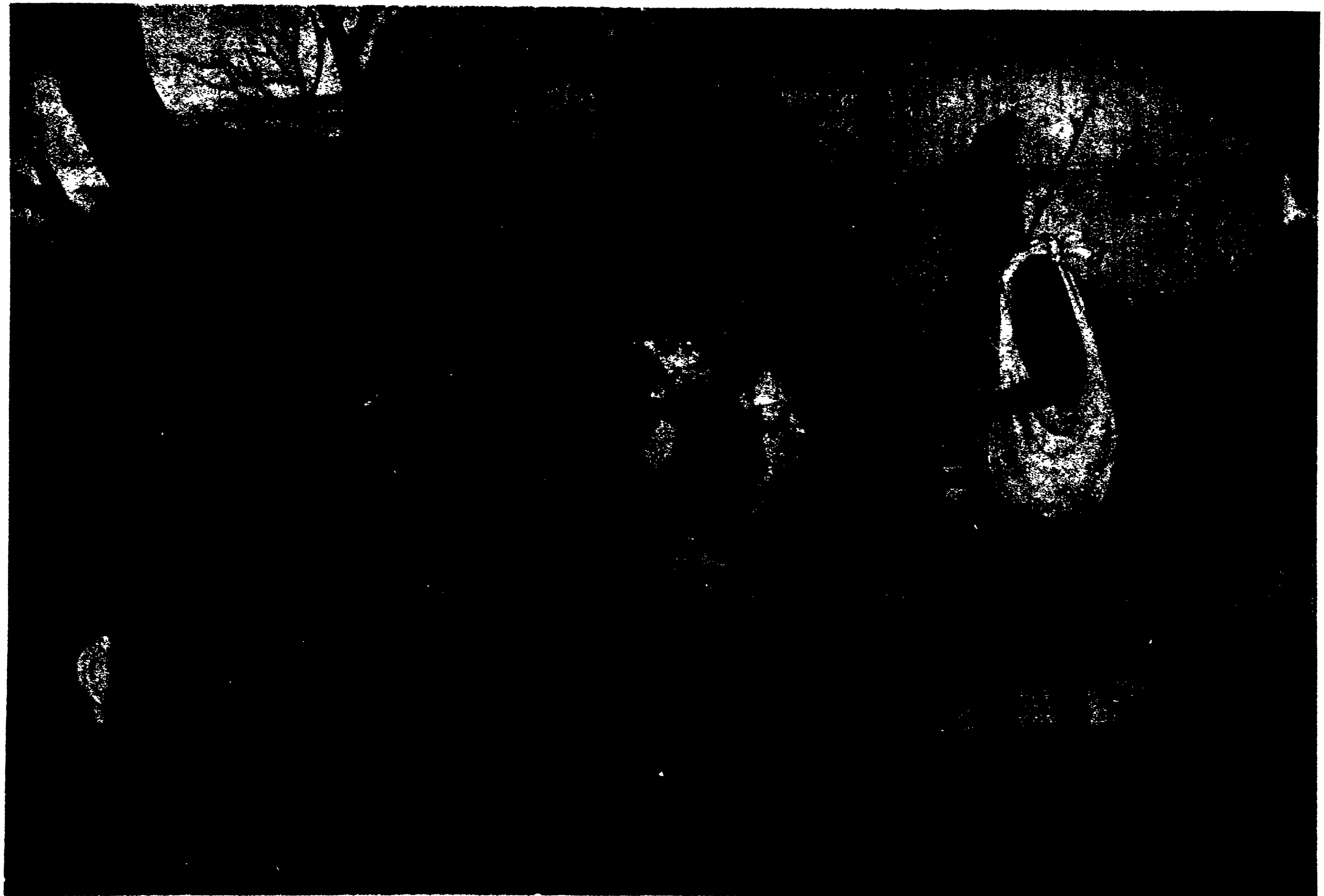
ব্রহ্মদেশীয় গ্রাহকগণের অবগতির জন্য

জানাইতেছি যে, ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে জাহাজাদি চলাচলে অসুবিধার জন্য ব্রহ্মদেশে প্রেরিত কাগজপত্রাদি খোয়া যাইতেছে। আমরা 'ভারত-বর্ষে'র প্রত্যেক সংখ্যা 'সার্টিফিকেট অফ পোষ্টিং' লইয়া গ্রাহকগণের বরাবর পাঠাইয়া থাকি। সুতরাং খোয়া গেলে পুনরায় পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হইবে না। পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে যাঁহারা নিঃসন্দেহ হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেক সংখ্যার পত্রিকা রেজিষ্টারী প্যাকেটরূপে লওয়াই সঙ্গত। প্রতি সংখ্যার জন্য তিন আনা হিসাবে অতিরিক্ত জমা দিলে আমরা পত্রিকা রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইতে পারি।

কর্ম্মকর্ত্তা—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—দ্বিজেশচন্দ্র ধর

রাবণ ও সীতা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্





ভারতবর্ষ



অগ্রহায়ণ—১৩৪৮

প্রথম খণ্ড | ঊনত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আগম ও শ্রীঅরবিন্দ

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ

আমির যেটা বীজ, সেটা বিশ্বে নেই কোথা? তোমার আমার চেতনায় যেটা আমি হ'য়ে ফুটে উঠেছে, যেটাকে কেন্দ্রে রেখে তোমার আমার দুনিয়ার সমস্ত কারবার চলছে, সেটা হচ্ছে ঐ বীজের একটা পল্লবিত, পুষ্পিত, ফলিত অবস্থা। কিন্তু সে অবস্থার আগেও কিছু আছে, পরেও কিছু আছে। ভগবানের সৃষ্টিটা যেমনধারা নানা আকারে ও ছন্দে লীলায়িত হ'য়ে র'য়েছে, সৃষ্টির অশেষ "ব্যক্তি"র ভেতরেও তেম্নিধারা "আমি" নিজেকে বিচিত্র রূপে ও ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছে। একটা হাইড্রোজেন এটম্—তার ভেতর "আমি" নেই? আছে, কিন্তু কি ভাবে? একটা কেন্দ্র-শক্তি—নিউক্লিয়াস্ পাওয়ার ভাবে রয়েছে। ঐ কেন্দ্রশক্তি বদ্‌লে আর কিছু হ'য়ে গেলে, হাইড্রোজেন বদ্‌লে আর কিছু হ'য়ে গেল। হিলিয়াম, অক্সিজেন বা আর আর পদার্থের সঙ্গে "মৌলিক" তফাৎ ঐ কেন্দ্রকে নিয়েই। যে "মৌলিক সংখ্যা" বা এটমিক্ নম্বার জগতের মশলাগুলোকে প্রকৃতিতে ও ধর্ম্মে, আকারে ও ছন্দে আলাদা আলাদা করে থুয়েছে সে সংখ্যাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কেন্দ্রকে ভর ক'রে। যেগুলোকে "জড়" ভেবে কারবার করছি, সেগুলো আমাদের কারবারি হিসেবের বাইরেও আসলে জড় কি না তা কে ব'লে দেবে? বিজ্ঞান—"পদার্থ-বিজ্ঞান" সে চলতি কারবারি হিসেবের অঙ্কগুলো খুব সূক্ষ্মও ক'রেছে, বড়ও ক'রেছে বটে; কিন্তু তাতে ক'রে অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত, সেই ভূতের হিসেবই মিলছে, "ভূতেষু ভূতেষু গূঢ়" যে ভূতাত্মা, যে প্রাণাত্মা, যে অন্তরাত্মা, যে প্রত্যগাত্মা—তার কোন হদিশ ঠিকঠাক মিলছে না। কাজেই এখনও বলা যাচ্ছে না—ঐ ধূলোবালি, মাটি পাথরের প্রতিটি রেণুর ভেতরে যে কেন্দ্রশক্তি ক্রিয়াশীল হ'য়ে র'য়েছে, সে কেন্দ্রশক্তি কি অন্ধ, শৃঙ্খলিত, প্রাণহীন; চেতনা-বেদনাহীন একটা

কিছু, না তার উল্টো? তাতে প্রাণ আছে বা নেই? চেতনা, সংজ্ঞা, সংবিৎ—এসব? তার ঐ কেন্দ্রশক্তি বা বীজ যেটা, সেটাকে যদি বলি তার "আমি", তবে সে "আমি" কি তোমার আমার "আমি"র মতন, একটা ফুল বা মৌমাছির "আমি"র মতন? বিকাশে আর বিকাশের ধারা ও ছন্দে আলাদাতো হবেই। কিন্তু মূলতঃ এক ধাঁজের এক ভাবের কি না? মূল টাইপ, প্যাটার্নটা এক কি না?

আমাদের যতটুকখানি চলতি পরিচয় পদার্থবর্গের সঙ্গে তাতে অন্নময় (কিনা জড়), প্রাণময় আর মনোময়—এই তিন থাকের সত্তাকে এক ভাবের ভাবতে আমরা প্রস্তুত নই। এদের তফাৎটা মূলগত ব'লেই যেন মনে হয়। মেনেও নিলাম তাই। কিন্তু তবু দেখি মনে আবার জেরা ওঠে—আচ্ছা এদের তফাৎটা আসলে মূলগত না কাণ্ডগত? আমার "আমি", একটা জীবকোষের নিউক্লিয়াসে অধিষ্ঠিত "আমি", আর একটা হাইড্রোজেনের কেন্দ্রস্থিত "আমি"—এ তিনেই কি এক আমি নামটা দেব, না দেব না? যদি অহং—I consciousness, Ego reference in consciousness—এইটে না থাক্‌লে "আমি" রইল না এই প্রতিজ্ঞা ক'রে নিই, তবে বলতে হয়—আমাদের যেটা চলতি কারবারি হিসেব আর বিজ্ঞানেরও যেটা "সরকারি" হিসেব, তাতে একটা জীবকোষে বা জড়দ্রব্যে "আমি"র পাত্তা এ পর্য্যন্ত মেলে নি। মেলে নি এই পর্য্যন্ত, মিলতেই পারে না —এমন দাবী করার মতো জবরদস্ত প্রমাণ হাজির নেই।

আসলে ওদের তফাৎটা কাণ্ডগত, শাখাগত হওয়াই সম্ভব; মূল-গত বীজ-গত বোধ হয় নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণের মামুলি সাড়াগুলো পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও কোথাও বা যাচ্ছে না—যেমন ঐ মাটির ঢেলায়। আবার কোথাও কোথাও চেতনার বেদনার সাড়াগুলোও মিলছে, কোথাও কোথাও বা মিলছে না—যেমন ঐ মাটির ঢেলায়, ঐ গাছের ফুলে বা পাতায়। এরকমে পাওয়া না পাওয়াটা আমাদের দৃষ্টিকার্পণ্যের জন্যে হ'তে পারে—দেখ্‌তে চাই না বা দেখ্‌তে পাই না ব'লে হ'তে পারে। বিজ্ঞানের সমীক্ষা পরীক্ষায় দৃষ্টিকার্পণ্য ও বিচারকুণ্ঠা কিছু কিছু দূর ও হচ্ছে। আবার সত্যি সত্যি বিকাশে তফাৎ আছে ব'লেও সাড়া মিলছে না এ হ'তে পারে। অর্থাৎ জড়, প্রাণ, মন—এরা এমন তিনটে সত্তার ভূমি, যেখানে প্রাকৃতিক (characteristic) বিকালটাই সত্যি সত্যি আলাদা হ'য়েছে। ধর শেষটাই হ'ল। তাতে কি এ ভাবতে হবে যে—জড়, প্রাণ, মন এদের পাতা ফুল ফলগুলো, ডালপালা-গুলো, এমন কি কাণ্ডগুলোই যে শুধু আলাদা এমন নয়, ওদের মূলে শিকড়গুলো, ওদের বীজগুলোই আলাদা? অভিব্যক্তির ধারায় যারা তিন বা বহু, প্রকৃতিতে মূলেও কি তারা তিন, বহু?

তিনের ভেতরেই যে কেন্দ্র বা বীজশক্তি কাজ ক'রছে, সেটার মূল চেহারা, মূল ছন্দটা কি তা তলিয়ে দেখ্‌লে ধরা প'ড়বে যে ওদের বীজটা একই ধাতের। আমার চেতনায় যার পরিচয় পাচ্ছি "আমি"রূপে, সেইটেরি খানিকটে ঢাকা খানিকটে ফোটা পরিচয় পাচ্ছি প্রোটো-প্লাজ্‌ম সেলের নিউক্লিয়াসে আর হাইড্রোজেনাদির নিউক্লিয়াসে। সবতাতে মূল ঋত ও ছন্দটা যেন মূলের দিকে মিলে এক হ'তে চলেছে। মূল থেকে কাণ্ড, কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা, শাখা-প্রশাখা থেকে পত্র-পুষ্প-ফল এসব অশেষ বিভেদ ও বৈচিত্র্যের মাঝে একদিকে যেমন ছড়িয়ে পড়েছে, তেম্নি মূলের দিকে যত যাওয়া যাবে ততই দেখা যাবে সারূপ্যের ও সাযুজ্যের ক্রোড়ে গিয়ে সমাহৃত ও সমালিম্পিত হ'য়েছে। মূল-মুখী গতি আর শাখা-মুখী গতি। একে একায়িত; অন্যে বিচিত্রিত, বহুধা রূপায়িত। তবে লক্ষ্য করলে দেখি—একে সেই বীজে একায়িত হচ্ছে বটে, কিন্তু নির্ব্বিশেষ একাকার হ'য়ে যাচ্ছে না, আবার বহুধা রূপায়িত হ'য়েও এক আপনাকে স্বরূপে ও ছন্দে হারিয়ে ফেলছে না। বহু এসে একে গা ঢাকা দিচ্ছে; এক এসে বহুতে লীলানন্দে ফোয়ারায় শতধারে যেন ফেটে ফুটে যাচ্ছে! কেন্দ্রে, বীজে, বহুকে খুঁজতে গেলে ধ্যানের কেন্দ্র সদৃষ্টি focussed vision—চাই; আর বৈচিত্র্যে এককে পেতে গেলে "ক্ষুরাততম্"—ঋষিদের সেই আকাশ-যোড়া আতত দৃষ্টি চাই।

এই দুরকম ক'রে দেখায় মিলবে—বিশ্বের সব-তাতে যে কেন্দ্র বা বীজশক্তি নিহিত থেকে সব কিছুর বিকাশ পরিণতির আবেগ, ঋত ও ছন্দ যোগাচ্ছে, সে বীজ হচ্ছে আমার "আমি"র যেটা আসল রূপ তাই, অর্থাৎ সেটা আত্মা। আত্মৈ বেদং সর্ব্বম—এ সমস্ত আত্মাই। তোমার আমার "আমি" ঐ ফুল-পাতার "আমি", ঐ কীট-পতঙ্গের

"আমি", ঐ মাটি-পাথরের "আমি" বিবিধ বিচিত্র হ'লেও "আমি"ই সেই মূলের "আমি"টাই আত্মা। আত্মাই পুরু রূপ, বহু রূপ হয়েছেন, হচ্ছেন। দেশ-কাল-কার্য্য-কারণের ঋতগুলোও আত্মা থেকেই। আত্মা থেকে ব'লে আত্মা ওদের বশ নয়। বিকাশ চক্রের অরগুলো থেকে যত না চক্রনাভির দিকে যাব তত দেখ্‌ব—দেশ-কাল-নিমিত্তাদির সম্বন্ধ কাটিয়ে হিসাবের বাইরে এক মহা রহস্যের ভূমিতে গিয়ে পৌছুচ্ছি। আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্। নাভির, বীজের, কেন্দ্রের কাছাকাছি যত যেতে থাকব তত দেখ্‌ব—বিচার-বিশ্লেষণ মনন-ভাষণ সব "শিখা-সূত্র" হারিয়ে, গ্রন্থি সন্ধি ভুলে মিলিয়ে যাচ্ছে এক মৌন পরমাশ্চর্য্যের মহাদ্রাবকে, ক্রমে শিথিল বিরল—তারপর নিরুদ্দেশ হয়ে।

এ সৃষ্টি পাদপের একেবারে মূল পর্য্যন্ত, এ ভুবন চক্রের একেবারে নাভি পর্য্যন্ত যে গেল, সে গেল তার আলাদা আমির যা কিছু হিসাব-নিকাশ তা ফেলে থুয়ে। সে আর নাভির খবর দেয় কি ক'রে? সেটা সব কিছুর যোনি, বীজ, নাভি, আত্মা, ব্রহ্ম—এই রকমের একটা আশ্চর্য্য ভাষণ ছাড়া অন্য রকমের কথা-বার্ত্তা তার কাছ থেকে শুনি কি ক'রে? "নাই" থেকে নেমে না এলে ত' কথা বার্ত্তা চলে না। "নাই" এ যতক্ষণ—ততক্ষণ কথা "নাই"—অর্থাৎ নেতি নেতি। ইতি ইতি ক'রে যা ব'লতে চাই তা—যেমন আত্মা, ব্রহ্ম, এসব—বলাতে ও না বলাই থেকে যায়—আশ্চর্য্যই থেকে যায়—আশ্চর্যবদ্ বদতি—আশ্চর্য্য বক্তা। কাজেই নাই থেকে সরে এসে যতটা কাছের খবর (approximate meaning) দিতে পারা যায় তার চেষ্টা করতে হয়। তাকে বলে তটস্থ লক্ষণ—অর্থাৎ তটে দাঁড়িয়ে যতটা দেখা যায়, বোঝা যায়। কোন কিছুর নাভি বা কেন্দ্রে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'লেই তার স্বরূপ স্বভাবে পৌছান গেল। তার আত্মাকে অধিকার করা গেল। "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে?" তার যেটা যোনি, সেটা বীজ; তার যেটা দেশ-কাল-নিমিত্তাদির অতীত অক্ষয় ভাব, আর তার দেশ-কালাদিতে ক্রিয়মাণ এবং পরিণমমাণ যে ক্ষয়ভাব—তার কারণকূট, তার কার্য্য-প্রপঞ্চ, তার বিধান-বিধাতা, নিয়ম-নিয়ন্তা—এ সবই পাওয়া গেল ঐ এক ঠাঁই উপনীত হ'য়ে। এটম্‌কে, জৈবকোষকে, মন ও বুদ্ধির আমিকে স্বরূপে, সমগ্রভাবে, পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে কখন? যখন তাদের সাইকেল বা সংসার চক্রের কেন্দ্রাভিমুখী অরগুলো ধ'রে তাদের যেটা নাভি, ঠিক সেইটেয় গিয়ে উপনীত হব। তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি। শুধু কি জানা? শক্তিতে ঋদ্ধিতে সিদ্ধিতে পুরো ক'রে পাওয়াও ঐ একটা যায়গায় প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্। সেই অব্যয় বীজশক্তিই মহাশক্তি আদ্যাশক্তি। মহাকালকেও কলন করেন ব'লে মহাকালী। কাল হচ্ছে শক্তির প্রকটরূপ। কালই সৃষ্টি স্থিতি লয় সব করছে—কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ। এই জন্যে মহাকালী মহাশক্তিরূপিণী। আবার চক্রের নাভি বা কেন্দ্রতেই প্রজ্ঞা পূর্ণ। সেইটে জান্‌লে তবে বিশারদী প্রজ্ঞা হয়; সেটা না জানা পর্য্যন্ত অজ্ঞ, অল্পজ্ঞ। সেখানটাতেই ছন্দ ও শৃঙ্খলার ও শিল্পের পূর্ণ প্রতিষ্ঠান; চক্রের নাভিতে না গেলে গতি সাইকেলের ছন্দ ধরা যায় না, তাকে আয়ত্তও করা যায় না। মহাকালী হচ্ছেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী সত্তাশক্তি; মহাসরস্বতী হচ্ছেন প্রজ্ঞারূপিণী চিচ্ছক্তি; মহালক্ষ্মী হচ্ছেন নিখিল ছন্দ সুষমায় প্রতিষ্ঠিত রস বা আনন্দ শক্তি। আর সচ্চিদানন্দের নিরতিশয়তা বা পূর্ণতা তাঁতে বলে' তিনি সাক্ষাৎ মহেশ্বরী। শ্রীঅরবিন্দ বোধ হয় সামান্য একটুখানি অন্য রকমে এঁদের সাজিয়েছেন; কিন্তু নাভিতে গেলে একেই যখন সব, তখন এতে তাতে গোল হবে কেন?

নাভি সম্বন্ধে একালের সেকালের অপরাবিদ্যা, যতটা কাছ ঘেঁষে পারে, একটা বোঝা-পড়া করার যত্ন করছে, করেছে। নাভিজ্ঞান না হ'লেও সময় সময় অপরা-বিদ্যার নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ হালে পানি না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছে—ওটা দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয়। চাকার বেড় শলাটলাগুলো কিছু কিছু জানা গেলেও তার নাইটে কার সাধ্যি জানতে পারে? হরিহরাদিভিরপ্যপারা—স্বয়ং হরিহর ও তার পারে যান নি, অন্যে পরে কা কথা! দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। তবু দেখি অপরা-বিদ্যা বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান-বিদ্যা অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত না ক'রে ছাড়বে না। অণু বা এটমের অন্দরে জীবকোষে, মনের অন্দরে গতি ক্রমে আগুয়ান, কিন্তু নাভির পাত্তা মিলছে না। একদিকে শক্তি, ছন্দ, নিয়ম এসব সমৃদ্ধতর, পূর্ণতরভাবে মিলে যাচ্ছে; অন্যদিকে রহস্যের কোয়াসা আরও ঘন,

সমস্তায় জটিলতা জটিলতর হ'য়ে আসছে। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে—"মাং" মানে বীজমব্যয়ং, ভূতযোনিং ভুবনস্য নাভিম্। অর্থাৎ কেন্দ্রাভিমুখী হ'য়ে কেন্দ্রে যেয়েই সুস্থির হ'তে হবে। তার—সেই কর্ম্মের কৌশলই যোগ; সেই পথের আলো—পরাবিদ্যা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। আত্মানং বিজানথ—আত্মাকে কিনা ঐ নাভিটিকে জান; অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ—অন্য কথা ছাড়; এষঃ অমৃতস্য সেতুঃ—এই হয় অমৃতের সেতু।

বেশ। কিন্তু পরাবিদ্যার পথের আলোও কি পথের শেষে, শেষের কাছাকাছি নিভে যায় নি? যে ভাবে জেনেছি সে জানে নি, যে ভাবে জানিনি সেই জেনেছে—এই রকম সব হেঁয়ালির কথা শ্রুতিতেই শুনতে পাই। তবু পথ চলায় আঁকা-বাঁকা পথে, নানান হের ফেরে যে অজানায় আঁধার, যে অ-পাওয়ায় রিক্ততা শূন্যতা, তার সঙ্গে পথ শেষের সেই পরম অজানায় মিল নেই, সেই চরম অ-পাওয়ায়ও মিল নেই। কেননা নাভিতে পৌছে যে জানা, সে একদিকে যেমন পরম অজানা, তেম্নি আবার অন্যদিকে তা পরম জানা; একদিকে যেমন চরম অ-পাওয়া—তেম্নি অন্যদিকে পরিপূর্ণ প্রাপ্তি। কোথা থেকে দেখছ তাই নিয়ে কথা। নাভি থেকে দেখ জানতে বা পেতে আর কিছু বাকি নেই; নাভি থেকে স'রে এসে তফাৎ থেকে দেখ—ঐ তটেই রয়েছ, সামনে মহা-অজানা—আর অ-পাওয়ার মহাসাগর যেমন প'ড়েছিল তেম্নি পড়ে রয়েছে। বিজ্ঞানের আলো যত না ফুটছে, চারধারের আঁধার তত জমাট বিপুল হ'য়ে উঠছে, প্রকৃতিকে যত না জয় করছি, প্রকৃতি ততই দুর্জ্জয় দুর্দ্দান্ত হচ্ছে! গল্পেই রয়েছি, খণ্ডেই রয়েছি; কোথায় ভূমা; কোথায় অখণ্ড—পূর্ণৈকরস ব্রহ্ম-বস্তু। নাভিতে বসে জানা অন্য রকমের জানা-অলক্ষ্য-অদৃশ্য-অব্যবহার্য্য-অপ্রমেয়-আত্মপ্রত্যয়েকসার ভাবে জানা। বাক্য-মনের যে সমস্ত মামুলি ছাঁচ categories-দেশ-কাল, দ্রব্য-গুণ, কার্য্য-কারণ, দ্বৈত-অদ্বৈত ইত্যাদি—তাদের অতীত হয়ে জানা। ওখানে গেলে তবে হয় supramental জানা। Physical, Vital, Mentalএর এই যে কারবারের যন্ত্র—apparatus—তাতে ক'রে ওটা মেলে না। আভাষকে ছেড়ে স্বরূপ বা Reality,the thing-in-itselfকে ধরায় এক্তার এর নেই, অল্প ছেড়ে ভূমায়, খণ্ডিত ছেড়ে অখণ্ডে, ক্রমিক আর আংশিক ছেড়ে শাশ্বতে অব্যয়ে যেতে গেলে এ apparatus নিজেকে যেমনটি তেমন বাহাল রাখলে চলবে না। আত্মপাশ, আত্মনিগড় থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে নিতে হবে। শুধু জানার দিকে নয়, পাওয়া আর আস্বাদের দিক থেকেও এই কথা। সাগরে গিয়ে কত নদনদী মিলছে। মনে হয় যেন তারা সাগরকে পূর্ণ করে দিচ্ছে। সমুদ্র "অপূর্য্যমাণ" হচ্ছে। কিন্তু তবু সমুদ্র "অচল প্রতিষ্ঠ"। কেমন ক'রে তা হয়? সাগর থেকে মেঘ হয়ে যত সব নদনদী সৃষ্টি হচ্ছে; তারা আবার সাগরেই দিয়ে এসে যাতে উৎপত্তি তাতেই লয় হচ্ছে! চক্র, সাইকেল কেমন নিখুঁতভাবে চলছে দেখ দেখি! এ চক্র সুদর্শন নয়? অক্ষরাৎ ক্ষরঃ। খরের আবার অক্ষরেই স্থিতি, অক্ষরেই পর্য্যবসান। জ্যোতি, রস, ছন্দের যেটা অনন্ত উৎস—সেই নাভি—সেটা এম্নি-ধারা লীলার মধ্য দিয়ে নিজেকে পূর্ণ ক'রে নিচ্ছে যেন। পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে—পূর্ণ থেকে পূর্ণের অভিব্যক্তি হচ্ছে। তাতে পূর্ণ অচল প্রতিষ্ঠ! নাভিতে না গেলে এসব রহস্যগ্রন্থি ভেদ ক'রবে কে? সব গ্রন্থি ভেদ হয় তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে!

এসব পথ-চলার শেষের কথা। তখন কথা ও চিন্তা আপনা আপনি কাটাকাটি ক'রে (যেন Self contradictory হ'য়ে) আপনারাই উজাড় হয়ে যায়—শান্ত হ'য়ে যায়। বাক্যকে ঠাণ্ডা কর মনে, মনকে ঠাণ্ডা কর বুদ্ধির বোধে বা বিজ্ঞানে; তাকে আবার ঠাণ্ডা কর "মহান আত্মায়" অর্থাৎ নিখিলের নাভিতে যে "আমি" বা আত্মা তাতে; শেষকালে তাও গিয়ে ঠাণ্ডা হোক "শান্ত আত্মনি"। এ শান্ত আত্মা থাকে শ্রুতি নান্তঃ প্রজ্ঞঃ ন বহিঃ প্রজ্ঞঃ··· শান্তম্ শিবমদ্বৈতং প্রপঞ্চোপশমং স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" ব'লে, অ-বলার বস্তুকে বলা গেল না এই বলেই যেন চুপ ক'রলেন—সে শান্ত আত্মা বস্তুটি যে কি আর কেমন, তার জন্যে আর এখানে বায়না ধরবে না। তা হোন্‌না তিনি বিজ্ঞেয়! নিজে নিজেই বিজ্ঞেয়—বাক্য-মন-বুদ্ধি এটা সেটা দিয়ে বিজ্ঞেয় নন ত তিনি! আর একটা কথা—সে পরম শান্তটি আবার "অশান্তে"র ও শিরোমণি। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে সব কিছু হচ্ছে; ইহারি নিঃশ্বসিত ঋগ্‌বেদাদি; এর ভয়ে সূর্য্য তাপ দিচ্ছে, মাতরিশ্বা প্রবাহিত হচ্ছে, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ—কাল ও এর

আস্তায় ছুটছে; ব্রহ্মমাত্র কিনা নিখিল প্রাণী এর "ওদন" খাদ্য, মৃত্যু এর "উপখেচন"—মৃত্যু "মাখিয়ে" এ খাচ্ছে সব কিছু। একি শুধু পরম প্রশান্তির প্রতিমূর্ত্তি? পরম শান্ত হচ্ছেন মায়ের পায়ের তলায় যিনি বুক পেতে দিয়ে প'ড়ে আছেন সেই সদাশিব। কিন্তু তিনি বুক পেতে দিয়েছেন যাঁর নাচের আসর রচনা ক'রে, তিনি—এলোকেশী মা-টি আমার—ভারি লক্ষী শান্ত মেয়েটি, বটে?

আরও একটা কথা—অবলার হ'লেও বলতে চেয়ে নাভি থেকে নেমে আসতে হবে। সে যেমন বিদিত কিনা জানা, থেকেও "অন্যৎ", তেম্নি আবার সে অবিদিত থেকেও অধি—অর্থাৎ অজানাকেও সে অধিকৃত ক'রে আছে; তার বাইরে, তাকে টপ্‌কে অজানাও কিছু নেই। সেই আবার শান্ত অশান্ত, অক্ষর ক্ষর, দ্বৈত অদ্বৈত এই দুটো দুটো দিক দেখিয়েও সকল দুয়ের অতীত—একেরও অতীত। অর্থাৎ এ জগৎটাকে ধারণায় আন্‌তে গেলে মূল যে কোন polarity যা দ্বৈত সম্বন্ধ বুদ্ধিকে যোগাড় করে এনে দিতে হয়, তাকে এড়িয়ে তত্ত্ব রয়েছে। এড়িয়ে মানে মোটেই ধার না ধেরে নয়। তা থেকে আলাদা তফাৎ কি হবে? তাতে অধিষ্ঠিত আশ্রিত, তা থেকে অভিব্যক্ত, আবার তাতেই প্রত্যাহৃত নয়, এমন কি থাকতে পারে? মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বধিস্থিতঃ।

ক্রমশঃ

একখানি পত্র

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

তোমার সঙ্গে বন্ধুতা বুঝি আছে,
এ ধারণা মোর ছিল এতকাল ভাই।
শিখিয়াছি মোরা একই গুরুর কাছে
একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি নিয়ে ঠাঁই।

তফাৎ থোড়াই দুজনের বিস্তার,
পদগৌরবে তফাৎ হয়েছে বটে।
তাই ব'লে ভাই মোদের বন্ধুতার
ভাবিনি ভুলেও, বাধা তায় কিছু ঘটে।

সভাসমিতিতে বসিয়াছি পাশাপাশি,
ভোজ-বৈঠকে বসেছি তোমার পাশে,
তোমারি মোটরে কতবার যাই আসি
মিতালিতে তায় সঙ্কোচ নাহি আসে।

ব্যাঙ্কে তোমার আছে কত টাকাকড়ি,
নিত্য কি খাও, খোঁজ কভু লই নাই।
মিলে মতামত, একই চিন্তা করি,
বন্ধুত্বের বন্ধন গণি তাই।

একই জায়গায় যাব মোরা দুইজনে
হাওড়া এলাম তোমারি মোটরে চ'ড়ে।
টিকিটের রঙে আজিকে ইষ্টিশনে
ভ্রান্ত ধারণা গেল হায় ধরা প'ড়ে।

ইণ্টারে তুমি নামিতে নারিলে ভাই,
তাহাতে তোমার ক'মে যাবে মর্য্যাদা।
সেকণ্ড ক্লাসের পয়সা আমার নাই,
তা ছাড়া ও ক্লাসে যেতে আছে মোর বাধা।

বরাবর আমি ইণ্টারে আসি যাই,
হঠাৎ আজিকে হয়েছি কি তালেবর?
নামায় তোমার মানহানি হলো ভাই,
ওঠাও আমার তেমনি লজ্জাকর।

এতদিন পরে হাওড়া ষ্টেশনে এসে
ভ্রান্ত ধারণা দূর হ'লো মোর শেষে।

কালিদাস

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি কালিদাসের কোনও নির্ভরযোগ্য জীবনী নাই—আছে কেবল কতকগুলি রূপকথার মত কিম্বদন্তী। এই কিম্বদন্তীর সহিত অনুরূপ কল্পনা মিশাইয়া এই কাহিনী রচিত হইল; ইহাকে বাস্তব জীবন-চিত্রণ মনে করিলে ভ্রম হইবে।

কাহিনীর ঘটনা-কাল অনুমান খৃঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী। বেশভূষা ও স্থপতি তদনুযায়ী হইবে।

ফেড্ ইন্।

একটি হস্তীর হরিচন্দন চিত্রিত মস্তকের উপর ক্যামেরার চক্ষু উন্মোচিত হইল। ক্রমে হস্তীর পূর্ণ অবয়ব ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখা গেল।

একটি নগরীর জনাকীর্ণ পথ দিয়া হস্তী রাজকীয় মন্থরতায় হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। স্কন্ধে অঙ্কুশধারী মাহুত; পৃষ্ঠের মহার্ঘ কারু-খচিত বস্ত্রাবরণের উপর ঘোষক বসিয়া পটহ বাজাইতেছে। ঘোষকের দুই হস্তে দুইটি মুষলাকৃতি পটহ-দণ্ড দ্রুতচ্ছন্দে পটহচর্ম্মের উপর আঘাত-বৃষ্টি করিতেছে।

চারিদিকে নাগরিকের জনতা; সকলেই ঘোষকের জ্ঞাপনী শুনিবার জন্য উৎসুক ঊর্দ্ধমুখে হস্তীর সহগমন করিতেছে। পথপার্শ্বের দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্যাগুলির গবাক্ষে অলিন্দে কুতূহলী পুরন্ধ্রীগণের মুখ লোভনীয় পশ্চাৎপটের সৃজন করিয়াছে। জনতার কলরব ও পটহের রোল মিশিয়া বিচিত্র ধ্বনি-বিপ্লব উত্থিত হইতেছে।

ঘোষকের পটহ-ধ্বনি সহসা স্তব্ধ হইল। ঘোষক দৃপ্তভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিতেই জনতার কল-মর্ম্মরও শান্ত হইয়া গেল। ঘোষক তখন শঙ্খের মত গভীর স্বরে ঘোষণা আরম্ভ করিল।

ঘোষক: ভো ভোঃ! শোনো সবাই!!—মহারাষ্ট্র কুন্তলের পরম বিদুষী কুমার-ভট্টারিকা রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবেন। সামন্ত-শ্রেষ্ঠী, চণ্ডাল-পামর, সকলে শ্রবণ কর ··· জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে এই স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে পারবে—

জনতার এক অংশে অবধূত নামধারী একজন অতি স্থূলকায় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ধামিতে মুড়ি লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছিল, ঘোষণার শেষ অংশ শুনিয়া তাহার চরণ ও চর্ব্বণ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। সে বিস্ফারিত চক্ষে ঊর্দ্ধে ঘোষকের পানে চাহিয়া রহিল।

ঘোষক ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—

ঘোষক: ··· রাজকুমারী প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীকে তিনটি প্রশ্ন করবেন—যে-ব্যক্তি যথার্থ উত্তর দিতে পারবে তারই গলায় কুমারী মালা দেবেন—

উপরোক্ত কথাগুলি শুনিবামাত্র অবধূত হস্ত-দন্তভাবে পিছু ফিরিয়া জনতা ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যেন স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না॥

জনতার অন্যত্র, ঝাড়ু ও চুপ্ড়ি হস্তে একটি হরিজন সম্মোহিতের মত দাঁড়াইয়া ঘোষণা শুনিতেছিল; অকস্মাৎ সে সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উচ্চ হর্ষ ধ্বনি করিয়া উঠিল। তারপর ঝাড়ু চুপ্ড়ি সজোরে মাটিতে আছড়াইয়া সে তীরবেগে বিপরীত মুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। এদিকে ঘোষকের জ্ঞাপনী তখন শেষ হইতেছে।

ঘোষক: আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন কুন্তল রাজধানীতে স্বয়ংবর সভা বসবে। অবহিত হও—সকলে অবহিত হও!

ঘোষণাশেষে ঘোষক আবার মন্দ্র-ছন্দে পটহ ধ্বনিত করিল।

ডিজল্ভ্।

পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া দীর্ঘ বঙ্কিম পথ চলিয়া গিয়াছে; পথের অপর পাশে বহু নিম্নে সমুদ্র। সহ্যাদ্রি ও আরব সাগরের মধ্যবর্ত্তী বাণিজ্য-পথ।

পথের উপর সম্মুখেই একটি চতুর্দ্দোলা; আটজন হৃষ্টপুষ্ট বাহক উহা স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়াছে। চতুর্দ্দোলায় স্থূলকায় অবধূত উপবিষ্ট; সে উদ্বিগ্ন মুখে বসিয়া একছড়া কদলী ভক্ষণ করিতেছে।

পিছন হইতে এক সুবেশ অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। তাহার অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিতে পাইয়া শঙ্কিত অবধূত চতুর্দ্দোলা হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিল। অশ্বারোহী দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে অবধূতকে অতিক্রম করিয়া গেল। ইতিমধ্যে পিছনে আরও দুইজন অশ্বারোহী আসিতেছে দেখা গেল।

আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় অবধূত কদলী ভক্ষণ ভুলিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল।

অবধূত: (বাহকগণের প্রতি) ওরে—ওরে—! তোরা মানুষ না বলদ্!—জল্দি চল্—জল্দি চল্—! সব বেটা এগিয়ে গেল!

নিম্নে সমুদ্রের কিনার বাহিয়া একটি ময়ূরপঙ্খী ভরা-পালে চলিয়াছে।

ঝিকিমিকি রৌদ্র-প্রতিফলিত নীল জলের উপর ময়ূরপঙ্খী মরালের মত ভাসিতেছে ; পিছনে হাল ধরিয়া মাঝি দাঁড়াইয়া আছে।

ময়ূরপঙ্খী হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

'রূপ নগরীর রাজ-কুমারীর দেশে
চল্ রে ডিঙা মোর—চল্ রে ডিঙা ভেসে।
সোনার পালে বাতাস লেগেছে
পূর্ণিমাতে জোয়ার জেগেছে—
ভিড়বে তরী রূপের ঘাটে
রূপনগরে এসে।
চল্ রে ডিঙা মোর—চল্ রে ডিঙা ভেসে।'

ডিজল্‌ভ্।

নানা পথ দিয়া নানা জাতীয় যান-বাহন বহু যাত্রীকে লইয়া কুন্তল-রাজধানীর অভিমুখে চলিয়াছে ; রাজপুত্রদের মাথায় রাজকীয় শিরস্ত্রাণ আপন আপন স্বতন্ত্র গঠনের বিচিত্রতায় শিরস্ত্রাণধারীদের পরিচয় নির্দ্দেশ করিতেছে। উচ্চপদস্থ সেনানীগণের বক্ষে লৌহজালিক, কটিতে তরবারি। কাহারও সঙ্গে অনুচর আছে ; কেহ একাকী যাইতেছে। এইরূপ কয়েকটি দৃশ্য দেখা গেল।

ডিজল্‌ভ্।

কানন মধ্যস্থ একটি জলাশয়। জলাশয়ের চারিপাশে কিছু দূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত ভূমি ; তারপর একটি-দুটি বড় বড় গাছ ; অতঃপর নিবিড় বনানীর শাখায় শাখায় জড়াজড়ি। নিম্নে ছায়ান্ধকার ; উপরে বহু দূর প্রসারী পল্লবপুঞ্জের উপর দ্বিপ্রহরের খর সূর্য্য-কিরণের প্রতিভাস।

জলাশয়ের অনতিদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষ হইতে কাঠ-ঠোকরা পাখীর আওয়াজের মত একটি শব্দ আসিতেছে—ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্—

শব্দ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলে দেখা যায়—বৃক্ষের নিম্নতন একটি স্থূল শাখায় পা ঝুলাইয়া একটি মানুষ বসিয়া আছে এবং যে-শাখায় বসিয়া আছে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। মানুষটি অল্প বয়স্ক ; কুড়ির বেশী বয়স হইবে না। অতি সুন্দর গৌরকান্তি যুবা ; মুখে শিশু-সুলভ সরলতা ; হাসিটি নব-বিস্ময় ও কৌতুকে ভরা—যেন এইমাত্র কোন্ দৈব দুর্ব্বিপাকে এই বিস্ময়কর পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে। সাংসারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাহার বিন্দুমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না।

যুবকের ঊর্দ্ধাঙ্গ নগ্ন ; কেবল স্কন্ধে উপবীত আছে। যুবক আপন মনের আনন্দে হাসিতেছে ও একটি ক্ষুদ্র কুঠারের সাহায্যে বৃক্ষ-শাখার গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিতেছে। কুঠার-দণ্ডের প্রান্তে একটি সূক্ষ্ম সূত্র সংলগ্ন।

যুবক মনের আনন্দে ডাল কাটিতেছে, সহসা অদূরে অন্য একপ্রকার শব্দ তাহার কানে আসিল ; সে কুঠার নামাইয়া কৌতূহলভরে বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। যে শব্দ যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা বনভূমির শষ্পাস্তরণের উপর মন্দীভূত অশ্বক্ষুরধ্বনি।

যুবক দেখিল, জলাশয়ের পাশ দিয়া একটি অশ্বারোহী আসিতেছে ; আসিতে আসিতে অশ্বারোহী ও ঘোটক উভয়েই সতৃষ্ণভাবে জলাশয়ের পানে ঘাড় বাঁকাইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। যেন ইচ্ছা, থামিয়া জল পান করে।

আরও নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল, অশ্বারোহীর বেশভূষা ঘর্ম্মাক্ত ও ধূলিধূসর হইলেও রাজোচিত ; অশ্বও তদনুরূপ। আরোহীর বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর ; মাংসল দেহ, গোলাকৃতি মাংসল মুখ। মুখে শাসক-সম্প্রদায়সুলভ আত্মাভিমান সুপরিস্ফুট।

ঘোটকটি কতক নিজ ইচ্ছানুসারেই ক্রমশ মন্দবেগ হইয়া শেষে সরোবরের তীরে থামিয়া গিয়াছিল। আরোহীও মনে মনে বিচার করিতেছিল এখানে নামিয়া অজ্ঞাত জলাশয়ে জলপান করা সমীচীন হইবে কি-না। ওদিকে শাখারূঢ় যুবক পরম আগ্রহে তাহাদের পশ্চাৎ হইতে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তন্ময়তাবশত তাহার কুঠার স্খলিত হইয়া ঝনৎকার শব্দে মাটিতে পড়িল।

চমকিয়া অশ্বারোহী ফিরিয়া দেখিল, গাছের উপর এক কাঠুরিয়া বসিয়া আছে। সে তখন অশ্বের মুখ ঘুরাইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

যুবক ততক্ষণে সূত্রের সাহায্যে ভূপতিত কুঠারটি টানিয়া তুলিয়া লইয়াছে। তাহার কুঠার বোধ হয় প্রায়ই পড়িয়া যায়, তাই উহা বিনা পরিশ্রমে উদ্ধার করিবার এই বালকোচিত কৌশল আবিষ্কার করিয়া যুবক গর্ব্বপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

অশ্বারোহী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব থামাইলেন। যুবকের কার্য্যকলাপ নিরুৎসুক অবজ্ঞাভরে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

অশ্বারোহী : তুই কে রে ?

সরল হাস্যে কাঠুরিয়ার মুখ ভরিয়া গেল ; সে সহজ অকপটতার সহিত উত্তর দিল—

কাঠুরিয়া : আমি কালিদাস—জঙ্গলের ঐ-ধারে ছোট্ট গাঁ আছে, ওখানে আমি থাকি। মামা বললেন—বামুনের ঘরের এঁড়ে, লেখাপড়া শিখলি না—যাঃ, জঙ্গলে কাঠ কেটে আন্‌গে যা। তাই কাঠ কাঠছি।

অশ্বারোহীর মুখভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি কালিদাসকে পরিপক্ক বেকুব বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি কপালের ঘাম মুছিলেন।

অশ্বারোহী : কুন্তল-রাজধানী এখান থেকে কতদূর জানিস ?

কালিদাস : জানি। হেঁটে গেলে একদিনের পথ।

অশ্বারোহী যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন ; অশ্ব হইতে নামিবার উদ্যোগ করিয়া কতক নিজ মনেই বলিলেন—

অশ্বারোহী : তা হ'লে ঘোড়ার পিঠে দু'দণ্ডে যাওয়া যাবে—

কালিদাস বৃক্ষশাখায় বসিয়া সকৌতুকে আরোহীর অবরোহণ-ক্রিয়া দেখিলেন ; তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

কালিদাস : তুমি কে—?

অশ্বারোহী ভূপৃষ্ঠ হইতে তাচ্ছিল্যভরে একবার কালিদাসের পানে চোখ তুলিলেন

অশ্বারোহী : আমি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ।

কালিদাসের ভাগ্যে রাজপুত্রদর্শন এই প্রথম। উত্তেজনায় তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া সংহতস্বরে তিনি বলিলেন—

কালিদাস : রাজপুত্তুর! কিন্তু তোমার মন্ত্রি-পুত্তুর কোটালপুত্তুর লোক-লস্কর—এরা সব কই?

যুবরাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন।

যুবরাজ : আমার লোকলস্কর সব পাকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ; দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে আমি জঙ্গলের রাস্তা ধরেছি—

কালিদাস : তুমি বুঝি স্বয়ংবর-সভায় যাচ্ছ?

যুবরাজ ঘাড় নাড়িলেন। ইতিমধ্যে তিনি ঘোড়াটিকে কালিদাসের ঠিক নীচে গাছের একটি উপশাখায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মস্তক হইতে ধাতুময় শিরস্ত্রাণটি মোচন করিয়া গাছের আর একটি গোঁজের মত ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়া ছিলেন। এখন ঘর্ম্মার্দ্র কুর্ত্তাটি খুলিতে খুলিতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন—

যুবরাজ : নাইতে হবে—ঘামে ধুলোয় কাপড়-চোপড় সব নষ্ট হয়ে গেছে। তোদের ঐ পুকুরটার জল কেমন? ভাল?

কালিদাস : হ্যাঁ—খুব ভাল।

কুর্ত্তা মাটিতে ফেলিয়া যুবরাজ নূতন বস্ত্রাদি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোড়ার পিঠে কম্বলাসনের নীচে বহুবিধ উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্রাদি পাট করিয়া রাখা ছিল ; কম্বল তুলিয়া সেগুলি একে একে বাহির করিয়া যুবরাজ ঘোড়ার পিঠের উপরেই সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন ; উদ্দেশ্য স্নান সারিয়া আসিয়া সেগুলি পরিধান পূর্ব্বক বরবেশে স্বয়ংবর-সভায় যাত্রা করিবেন।

যুবরাজ : স্বয়ংবর-সভায় যেতে হবে, যা-তা প'রে গেলে তো চলবে না—আজকালকার মেয়েদের আবার পোষাকের ওপর নজর বেশী। আমার প্রথম রাণীকে যখন বিয়ে করেছিলুম তখন এত হাঙ্গামা ছিল না—

কালিদাস সহস্রচক্ষু হইয়া এই অপূর্ব্ব বস্ত্র-বৈভব দেখিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—

কালিদাস : তোমার বুঝি অনেক রাণী?

যুবরাজ অবহেলাভরে বলিলেন—

যুবরাজ : না—অনেক আর কই—সাতটি।

সোনালী জরির জুতাজোড়া গাছের তলায় খুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন—

যুবরাজ : হ্যাঁ দ্যাখ্—কি নাম তোর—কালিদাস? শোন্, আমি পুকুরে নাইতে চললুম। তুই এ গুলোর ওপর নজর রাখিস—যেন জংলি কেউ এসে নিয়ে না পালায়—বুঝলি?

কালিদাস ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইলেন। যুবরাজ আর বিলম্ব না করিয়া সরোবরের দিকে চলিলেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি ইতস্তত করিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। জুতাজোড়া মাটিতে পড়িয়া রহিল ; কি জানি যদি শৃগালে লইয়া পলায়ন করে! তিনি ফিরিয়া আসিয়া জুতা দুইটি শিরস্ত্রাণের সঙ্গে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন।

গাছের উপর কালিদাস মুগ্ধ তন্ময়তার সহিত বিচিত্র সুন্দর আভরণগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যুবরাজ প্রস্থান করিবার পর তাঁহার চোখদুটি যুবরাজের দিকে দূরে সঞ্চারিত হইল, আবার বস্ত্রগুলির দিকে ফিরিয়া আসিল, আবার যুবরাজের দিকে প্রেরিত হইল—তারপর কালিদাস সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া শিরস্ত্রাণটি তুলিয়া লইলেন। মহানন্দে কিছুক্ষণ শিরস্ত্রাণটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিবার পর তিনি সেটি নিজ মস্তকে পরিধান করিলেন। বাঃ, একটুও তো বড় হয় নাই, যেন তাঁহারই মাথার মাপে তৈয়ার হইয়াছিল। শাণিত কুঠার-ফলকে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া কালিদাসের সর্ব্বাঙ্গে উল্লসিত শিহরণ খেলিয়া গেল। অতঃপর জুতাজোড়াও কালিদাসের শ্রীচরণেষু হইল। আরে!, একটু আঁট হইয়াছে বটে কিন্তু বে-মানান্ হয় নাই।

ওদিকে যুবরাজ তখন এক-কোমর জলে দাঁড়াইয়া পরম আরামে স্নান করিতেছেন ; নাক টিপিয়া জলে ডুব দিতেছেন ; দুই হস্তে সবেগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিতেছেন। কালিদাসের দিকে তাঁহার নজর নাই।

কালিদাস কিন্তু ইতিমধ্যে—

ঘোড়ার পিঠের উপর বস্ত্রাভরণগুলি সাজানো ছিল, উর্দ্ধ হইতে একটি লোলুপ হস্ত আসিয়া বস্ত্রটি তুলিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইল ; কিছুক্ষণ পরে আবার উত্তরীয়টি অন্তর্হিত হইল—; তারপর আঙরাখা—

যুবরাজ ও দিকে আপন মনে স্নান করিয়া চলিয়াছেন।

সর্ব্বাঙ্গে রাজবেশ পরিয়া কালিদাসের আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু রাজবেশ পরিয়া তো আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না ; একটা কিছু করা চাই। শাখারূঢ় কালিদাস হঠাৎ কুঠারটি তুলিয়া লইয়া খটাখট্ ডাল কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। নিম্নে ঘোড়াটি এই আকস্মিক শব্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শাখাটি ইতিপূর্ব্বেই বেশ জখম হইয়া ছিল, এই দ্বিতীয় আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল। শাখাটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হইলেও মড়্ মড়্ শব্দে নীচে নামিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; কালিদাসের হাত হইতে কুঠার ছিট্‌কাইয়া পড়িল। ঘোড়াটা নীচে লাফালাফি সুরু করিয়াছিল, শাখাচ্যুত কালিদাস তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া ভল্লুকের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভয়ার্ত্ত ঘোড়া মুখের এক ঝট্‌কায় বন্ধন ছিঁড়িয়া তীরবেগে একদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কালিদাস প্রাণপণে তাহাকে আঁক্‌ড়াইয়া রহিলেন।

স্নানরত যুবরাজের কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিতেই তিনি উচ্চকিত হইয়া সেই দিকে তাকাইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে ঘোর উদ্বেগে হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া তিনি জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সিক্তবস্ত্রে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার অশ্ব কাঠুরিয়াকে পৃষ্ঠে লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

বনের মধ্যে কালিদাস অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যুবরাজ হতভম্ব হইয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার সুবর্ত্তুল মুখে ক্রোধ ও হতাশার মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ব্যাঘ্রের মত একটি গর্জ্জন ছাড়িয়া দুই হস্ত ঊর্দ্ধে আস্ফালন করিতে করিতে যেন পলাতক ঘোটকের পশ্চাদ্ধাবন করিবার উদ্দেশ্যেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে এক পদও অগ্রসর হইতে হইল না। তাঁহার সিক্ত বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া মাটি কর্দ্দমিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ পা পিছলাইয়া সশব্দে মৃত্তিকার উপর উপবিষ্ট হইলেন।

ফেড্ আউট্।

ক্রমশঃ

শীতের অজয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সিকতায় লীন শীর্ণ মলিন ধারা,
নদী—জননীর স্নেহ হতে যেন হারা।
কূলে কূলে তারি গড়া সবুজের ভিড়,
তীরে কাশতরু করে উন্নত শির,
তারই সাড়া নাই—পায়ে সবাকার সাড়া।

২

ভুলে সে গিয়াছে উদ্দাম নর্ত্তন,
দুকুল ভাসানো তুফানের আলোড়ন।
সেই তরঙ্গ—কল্লোল গম্ভীর,
অথই গভীর গৈরিক-গলা নীর,
হেলায় ডুবানো গ্রাম প্রান্তর বন।

৩

সে ভুলে গিয়াছে খর দুর্ব্বার গতি,
দ্বিধা বাধাহীন—দুর্দ্দমনীয় অতি।
তৃণের মতন তরু ভেসে যায় বেগে,
বেণু নুয়ে পড়ে হিল্লোল তার লেগে,
বে-হিসাবী তার সম ছিল লাভ ক্ষতি।

৪

ভাঙিয়া চুরিয়া উর্ব্বর করি' মাটী
যাত্রা তাহার জয় যাত্রাই খাঁটি।
খসিয়াছে তার দম্ভের নির্ম্মোক
ভিক্ষু হয়েছে আজিকে 'চণ্ডাশোক',
যৌবনের সে জোয়ার গিয়াছে কাটি।

৫

নাহি গর্জ্জন বাচাল হয়েছে মূক,
লভিছে আঘাত-না-দিয়া যাওয়ার সুখ।
ভাল লাগে তার হতে নীচু আরও নীচু,
জোর করে আর পাইতে চাহেনা কিছু,
আছে যেন কা'র আগমন উৎসুক।

৬

আজিকে তাহার স্বচ্ছ স্বল্প দেহ
লঙ্ঘে সবাই, ভয় করেনাক কেহ।
বালির বাঁধেতে করে তার পথ রোধ,
আজি যেন তার নাহি মর্য্যাদা বোধ
আনন্দ পায় হয়ে থাকিতেই হেয়।

৭

গুরুভার বাহী এখন হয়েছে ভার,
সমারোহ নাই এ তীর্থ যাত্রার।
জলটুকু ভরা—একটী আকাঙ্খায়,
বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চায়,
ধরা চেয়ে তার মেঘ বেশী আপনার।

৮

অতীতের লাগি ফেলে না দীর্ঘশ্বাস
আরও বিশুদ্ধ আরও লঘু হতে আশ।
প্রেমাশ্রু আজ হয়েছে তাহার জল
ঢলঢল করে, করে নাক কলকল,
বুকে পায় মহাসাগরের নিঃশ্বাস।

৯

দেখি বেলাভূমি হাসে আর মনে করে
এত কি তৃপ্তি আছে আহা অনাদরে।
জানা যায় যবে সরে যায় অভিমান
হাতের নিকট ছিল কি বিরাট দান
উপেক্ষাই ত ত্যাগের বদ্বীপ গড়ে।

১০

মত্ত যে ছিল নিমজ্জনের কাজে,
আজ পান্থের গৌরব লভিয়াছে।
ধৌত করিয়া চলেছে সবার পদ,
হয়ত মিলিবে রাঙা পদ কোকনদ
ধরাতলে তাই লুটায়ে পড়িয়া আছে।

ভারতের পুণ্যতীর্থ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি-এইচ-ডি

এই প্রবন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের তীর্থস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

হিন্দু তীর্থস্থান

(১) ইন্দস্‌ ও গঙ্গার সমতল ক্ষেত্রের অন্তর্গত দেশগুলি

বঙ্গদেশ

উত্তরবঙ্গ

খেতুড়—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। খ্রীষ্টীয় ষোল শতাব্দীতে মহাপ্রভু চৈতন্য এই স্থানটী পরিদর্শন করেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এখানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে একটী মেলা বসে এবং এই মেলায় বহু লোকের সমাগম হয়।

তর্পণ ঘাট—দিনাজপুর জেলায় নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। মহামুনি বাল্মীকি এখানে স্নান ও তর্পণ করিয়াছিলেন। ইহারই অনতিদূরে সীতা-কোট নামে একটী ইষ্টকের স্তূপ আছে। কথিত আছে এই স্তূপটী নির্ব্বাসিতা সীতার বাসগৃহ ছিল।

দুয়ারবাসিনী—মালদহ জেলার একটী গ্রাম। এখানে একটী সুবিখ্যাত মন্দির আছে এবং এই মন্দিরে যাত্রীরা প্রায়ই আসে।

পশ্চিমবঙ্গ

আড়ংঘাট—নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটের ছয় মাইল উত্তরে এই গ্রামটী অবস্থিত। এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চুরণি নদী প্রবাহিত। নদীর তীরে যুগলকিশোরের মন্দির আছে। এই মন্দিরে কৃষ্ণ ও রাধার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ মূর্ত্তিটী আনাইয়া নবদ্বীপের নিকটে সমুদ্রগড়ে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরে মন্দিরের প্রথম সেবাইৎ গঙ্গারাম দাস ইহাকে আড়ংঘাটে লইয়া আসেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদ হইতে রাধার মূর্ত্তি আনা হয়। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি ১২৫ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে একটী মেলা হয়। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক এই মেলা দেখিতে আসে। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব বেশী। লোকের বিশ্বাস, যদি কোন স্ত্রীলোক এই মন্দির দর্শন করে, তাহা হইলে সে বৈধব্য দশা হইতে মুক্তি পাইবে অথবা যদি সে বিধবা হয় তাহা হইলে সে পরজন্মে বৈধব্য দশা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। মন্দিরের দক্ষিণে আর একটী বহু পুরাতন মন্দির আছে। এই মন্দিরে গোপীনাথের মূর্ত্তি আছে।

বল্লভপুর ও মাহেশ—হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত দুইটী গ্রাম। মাহেশের রথযাত্রা সুপ্রসিদ্ধ। রথযাত্রার দিন মাহেশের মন্দির হইতে জগন্নাথের মূর্ত্তি বাহির করিয়া একটী বড় রথের উপর রাখা হয়। পরে রথটীকে ধীরে ধীরে টানিয়া প্রায় এক মাইল দূরে বল্লভপুরে লইয়া যাওয়া হয় এবং রাধাবল্লভের মন্দিরে মূর্ত্তিটীকে রাখা হয়। আবার উল্টা রথের দিন উপরোক্ত নিয়মে বল্লভপুর হইতে মাহেশে রথটীকে টানিয়া লইয়া আসা হয়। রথযাত্রা উৎসব দেখিবার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। পুরীর রথযাত্রা ব্যতীত আর কোথাও এখানকার মত রথযাত্রা দেখা যায় না।

বাঁশবেড়িয়া—হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে বিষ্ণু, স্বয়ম্ভব (কালী) এবং হংসেশ্বরী, এই তিনটী মন্দির আছে। বিষ্ণু মন্দিরটী বহু পুরাতন। উহার উত্তরে স্বয়ম্ভবের মন্দির অবস্থিত। উহার পূর্ব্বে হংসেশ্বরীর মন্দির। এই মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ১৮১৪ সালে ইহা নির্ম্মিত হয়।

দক্ষিণেশ্বর—ব্যারাকপুর মহকুমারের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি মন্দির আছে। রাণী রাসমণির নামানুসারে এই মন্দিরগুলিকে বলা হয় রাণী রাসমণির নবরত্ন। কালী এবং কৃষ্ণের মন্দির মধ্যস্থলে অবস্থিত। তাহারই সম্মুখে বারটী ছোট শিবের মন্দির আছে।

কালীঘাট—কলিকাতার দক্ষিণে একটী জনবহুল স্থান। কালীঘাটের কালীমন্দির আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কথিত আছে, সতীর মৃতদেহ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে খণ্ডিত হইয়া একটী অঙ্গুলী এইস্থানে পতিত হইয়াছিল। বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়গণের অর্থানুকূল্যে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত। মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য ১৯৪ একর জমি নির্দিষ্ট আছে। মহা-অষ্টমীর দিন এবং কালীপূজার দিন এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়।

কেঁদুলি—বীরভূম জেলাস্থিত সিউড়ী মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা অজয় নদীর তীরে অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণ এবং রাধিকার উদ্দেশ্যে গীতগোবিন্দ নামে একটী সুললিত সংস্কৃত গীতিকাব্য রচনা করেন। এই স্থানটী জয়দেব-কেঁদুলি (কুন্দবিল্ব) নামে সুপরিচিত। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন এবং মাঘ মাসের প্রথম দুই দিন জয়দেবের সম্মানার্থ এখানে জয়দেবের মেলা নামে প্রসিদ্ধ মেলা বসে। এই উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং উঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব।

জয়দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ মাটীতে পোঁতা হয়। এখনও তাঁহার কবর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। পূজা করিবার সময় জয়দেব যে প্রস্তরের উপর বসিতেন সেই প্রস্তরটী অজয় নদীর নিকটে একটী পর্ণকুটীরে সুরক্ষিত আছে। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুরের মাতা রাধাবিনোদের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটী জয়দেবের মন্দির নামে সুপরিচিত। কেঁদুলির একজন মোহন্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

খড়দহ—ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূরে হুগলী নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্য নিত্যানন্দের এখানে বাসস্থান ছিল। কথিত আছে, হুগলী নদীর তীরে তাপস জীবন যাপন করিবার জন্য নিত্যানন্দ এখানে আসেন। একদিন তিনি কোন একটী স্ত্রীলোকের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া তাহার নিকট যান এবং জানিতে পারেন যে তাহার একমাত্র কন্যা সদ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তিনি বলেন যে, বালিকাটী কেবলমাত্র নিদ্রা যাইতেছে। তখন স্ত্রীলোকটী অঙ্গীকার করে যে, যদি তিনি তাহার কন্যাকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন তাহা হইলে সে কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে। নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ বালিকাটীকে পুনর্জীবিত করিয়া বিবাহ করেন। বাস করিবার জন্য তিনি তথাকার জমিদারের নিকট একখণ্ড জমি ভিক্ষা করেন। জমিদার মহাশয় তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যে একটী খড় লইয়া নদীর দহে নিক্ষেপ করেন এবং তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে বলেন। নিত্যানন্দের ধর্ম্মমাহাত্ম্যে দহের জল শুকাইয়া যায় এবং তিনি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। এইজন্যই গ্রামটীর নাম হয় খড়দহ।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের বংশধরগণ খড়দহের গোস্বামী নামে সুপরিচিত। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া মান্য করেন। খড়দহ বৈষ্ণবদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। দোলযাত্রা এবং রাসযাত্রা উপলক্ষে এখানে মেলা হয় এবং বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এখানকার একটী মন্দিরে শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

নবদ্বীপ (নদীয়া)—নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত একটী নগর। ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে তিন বর্গ মাইল। ইহা একটী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাকেন্দ্র। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের এখানে রাজধানী ছিল। হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থানের মাহাত্ম্য গুণে বহু দেশ হইতে বড় বড় পণ্ডিত আসিয়া এখানকার ছাত্রদিগকে সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা দিতেন। হলায়ুধ, পশুপতি, শূলপাণি এবং উদয়নাচার্য্য এই চারিজন পণ্ডিত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বাংলা দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। ১৪৮৫ সালে মহাপ্রভু চৈতন্য এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম ছিল বিশ্বপ্রেম। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার সময় এখানে একটী মেলা বসে। বাংলার সকল স্থান হইতেই যাত্রীরা এই মেলায় আসে এবং ভাগীরথীর জলে স্নান করিয়া শ্রীচৈতন্যের মন্দিরে পূজা দেয়। যাত্রীদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক।

শান্তিপুর—নদীয়া জেলাস্থিত রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ইহা একটী নগর। ইহা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিষ্ণু ও শিবের অবতার অদ্বৈতাচার্য্য এখানে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য এই স্থানটী পুণ্যতীর্থ। চৈতন্য অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানকার শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ ও জলেশ্বরের মন্দির সুবিখ্যাত। শ্যামচাঁদের মন্দির ১৭২৬ সালে এবং গোকুলচাঁদের মন্দির ১৭৪০ সালে নির্ম্মিত হয়। জলেশ্বরের মন্দির খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নদীয়ার মহারাজ রামকৃষ্ণের মাতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

উৎকৃষ্ট ধুতি ও শাড়ীর জন্য শান্তিপুর প্রসিদ্ধ। শান্তিপুর হইতে ৬ মাইল দূরে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। এক সময় এখানে ব্রাহ্মণের বাস খুব বেশী ছিল। মহাকবি কীর্ত্তিবাস এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

তারকেশ্বর—হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত ইহা একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। তারকেশ্বর নামক শিব-মূর্ত্তির নাম হইতে গ্রামের নাম হইয়াছে। তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫০০ গজ দূরে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। প্রতিদিন, বিশেষত প্রতি সোমবার এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিব চতুর্দ্দশী এবং চড়ক পূজা উপলক্ষে এখানে মহা সমারোহ হইয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখে নাট-মন্দিরে বহু লোক নিজ মনস্কামনা পূরণের জন্য হত্যা দেয়।

ত্রিবেণী—হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। তিনটী নদীর সঙ্গম স্থান বলিয়া ইহাকে ত্রিবেণী বলা হয়। হুগলী নদীর তীরস্থ ত্রিবেণীর ঘাট মগরা ষ্টেশনের দেড় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। মকর সংক্রান্তি, বারুণী এবং দশহরা উপ-লক্ষে এখানে মেলা বসে এবং বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

বিষ্ণুপুর—বিষ্ণুপুর মহকুমার উত্তরে দামোদর নদী, দক্ষিণে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা, পূর্ব্বে বর্দ্ধমান এবং পশ্চিমে বাঁকুড়া অবস্থিত। এখানে অনেক মন্দির আছে, যথা—মল্লেশ্বর, মদনগোপাল, মুরলীমোহন, মদনমোহন, রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব এবং রাধাশ্যাম। মদনগোপালের মন্দির ১৬৬৫ সালে, মুরলীমোহনের মন্দির ১৬৬৫ সালে এবং মদনমোহনের মন্দির ১৬৯৪ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্যাম ও মদনমোহনের মন্দির ইষ্টকনির্ম্মিত, রাধাশ্যাম ও মদনগোপালের মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রস্তরনির্ম্মিত ও ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরে বহু কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গ

চন্দ্রনাথ—সীতাকুণ্ডের উপকণ্ঠে শম্ভুনাথ, চন্দ্রনাথ, লবণাক্ষ ও বাড়বকুণ্ডের মন্দির অবস্থিত। বাংলা দেশের সকল স্থান হইতেই যাত্রীরা এখানে তীর্থদর্শন করিতে আসে। শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে যাত্রীদের সমাগম খুব বেশী হয়। চন্দ্রনাথের শৃঙ্গ শিবের প্রিয়স্থান। কথিত আছে, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে খণ্ডিত হইয়া সতীর দক্ষিণ বাহু এখানে পতিত হইয়াছিল। লোকের বিশ্বাস, পাহাড়ের উপরে উঠিয়া শিবের মন্দির দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ হয়।

সীতাকুণ্ড—চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা চট্টগ্রাম নগর হইতে ২৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুণ্ডই শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। কথিত আছে, রাম ও সীতা বনবাস কালে এখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সীতা উষ্ণ জলকুণ্ডে স্নান করিতেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম সীতাকুণ্ড। এখন আর কুণ্ডটীর অস্তিত্ব নাই। তবে স্থানটীতে শম্ভুনাথের মন্দির আছে।

সুন্দরবন

সাগরদ্বীপ—চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমার অন্তর্গত ইহা একটী দ্বীপ। ইহার পশ্চিমে হুগলী নদী, পূর্ব্বে বরতলা অথবা ক্রীক প্রণালী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। যে স্থানে গঙ্গা নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে ইহা অবস্থিত বলিয়া হিন্দুদিগের নিকট এই দ্বীপটী পুণ্যস্থান।

এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে, অযোধ্যার রাজা সগর নিরানব্বই বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গচ্যুত হইবার ভয়ে অশ্বটীকে চুরি করিয়া পাতালপুরীতে কপিলমুনির আশ্রমে লুকাইয়া রাখেন। মুনি তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সগরের ষাট হাজার পুত্র অশ্বটীকে কপিলমুনির আশ্রমে দেখিতে পাইয়া মুনিকে চোর মনে করিয়া প্রহার করেন। মুনি তাঁহাদিগকে অভিশাপ

দেন। ফলে সকলেই ভস্মীভূত হইয়া নরকগামী হয়। সগরের এক পৌত্র মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃতলোকদিগের আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করেন। মুনি বলেন, যদি স্বর্গ হইতে গঙ্গার জলধারা আনিয়া মৃতলোকদিগের ভস্ম ধৌত করা হয় তাহা হইলে উহাদের আত্মা মুক্তিলাভ করিবে। গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। সগরের পৌত্র গঙ্গাকে মর্ত্তে পাঠাইবার জন্য ব্রহ্মাকে প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভগীরথ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া গঙ্গাকে মর্ত্তে লইয়া আসেন। তিনি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হাথিয়াগড় নামক স্থান পর্য্যন্ত গঙ্গাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসেন এবং তারপর আর পথ দেখাইতে না পারায় গঙ্গা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার জন্য এক শত শাখা বিস্তার করে। একটী শাখার জলে ভস্মসমূহ ধৌত হয় এবং সগর রাজার পুত্রদের আত্মা মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। এই সময় হইতেই গঙ্গা পুণ্যনদীরূপে পরিগণিত হয়। সগর রাজার নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে সাগরদ্বীপ। স্নানযাত্রা উপলক্ষে এখানে যাত্রীর বিপুল সমাগম হয়। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে একটী বড় মেলা হইয়া থাকে। সমুদ্রকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাত্রীরা নারিকেল, ফল, ফুল প্রভৃতি অর্ঘ্য জলমধ্যে নিক্ষেপ করে। যাত্রীরা প্রত্যূষে সমুদ্রে স্নান করে। কেহ কেহ সকাল ও দুপুরে দুইবার স্নান করে। কেহ কেহ স্নান করার পর মস্তক মুণ্ডন করে এবং যাহারা পিতৃমাতৃহীন তাহারা সমুদ্রতীরে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করে। স্নানান্তে যাত্রীরা কপিল মুনির মন্দিরে গিয়া পূজা দেয়।

কপিল মুনির মূর্ত্তি বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকে। উৎসবের দুই-এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পুরোহিতদিগের হস্তে মূর্ত্তিটীকে সমর্পণ করা হয়। কোন একটী মন্দিরে সাময়িকভাবে মূর্ত্তিটীকে রাখা হয়, কারণ পুরাতন মন্দিরটী সমুদ্রের জলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই পুণ্য স্থানটী গঙ্গাসাগর নামে সুপরিচিত।

আসাম

কামাখ্যা—কামরূপ জেলায় গৌহাটীর নিকটে একটী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের উপরে কামাখ্যা দেবীর মন্দির অবস্থিত। দেবীর নাম হইতে পর্ব্বতের নাম হইয়াছে কামাখ্যা। এখানকার শক্তির মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। এই স্থানটী তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির একটী বিশিষ্ট কেন্দ্র।

কথিত আছে, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীর মৃতদেহ খণ্ড বিখণ্ড হইবার সময় একটী অংশ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। সেইজন্য এই স্থানটী তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত। এখানে শক্তির উপাসক এবং শৈবদের সংখ্যা কম। সহজভজন নামে আর একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় এখানে আছে।

ব্রহ্মকুণ্ড—লখিমপুর জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদীর একটী গভীর অংশ (দহ)। বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়া এই দহের মধ্যে আপনার কুঠারটী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইজন্য ইহা হিন্দুদের একটী পুণ্যস্থান। ব্রহ্মপুত্র নদীর উৎপত্তির স্থানে ইহা অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে ইহা পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত।

শিবসাগর—এখানে আহম রাজাদের নির্ম্মিত অনেক মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি নানা কারুকার্য্যে শোভিত। কারুকার্য্যগুলি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, বৈদেশিক শিল্পের প্রভাব এই মন্দিরগুলিতে অনুভূত হয়।

শিবসাগর হইতে কয়েক মাইল দূরে গৌরীসাগর, রুদ্রসাগর এবং জয়সাগরে কয়েকটী জলাশয় আছে এবং উহাদের তীরে মন্দির আছে। শিবসাগরে একটী ছোট মন্দির আছে। এখানে প্রতি বৎসর দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়া হইত।

হাজো—কামরূপ জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরস্থ একটী গ্রাম। গৌহাটী হইতে স্থলপথে ইহা ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। একটী শিবের মন্দিরের জন্য এই স্থানটী প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরটী একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। কথিত আছে, কোন এক সাধু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় ইহাকে ধ্বংস করেন। পরে ১৫৮৩ সালে রঘুদেব কর্ত্তৃক ইহা পুনঃনির্ম্মিত হয়। বুদ্ধের বাসস্থান বলিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট এই স্থানটী পবিত্র।

(ক্রমশঃ)

কুম্ভমেলায় সাধুদর্শন

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

কুম্ভমেলা ভারতে যে কোন্ অজানিত যুগ হতে সুরু হয়েছিল আজও তার কোনও সময়নির্দ্দেশ হয় নাই, তবে যাঁদের আদেশ বা নির্দ্দেশে এই মেলা আরম্ভ হয়েছিল—সত্যই যে তাঁরা বিচক্ষণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি বা মহাপুরুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুর অতি নিজস্ব জিনিষকে—অর্থাৎ ধর্ম্ম, জাতি, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে চিরন্তন করবার জন্যই এ মেলার অবতারণা করা হয়েছিল। একে সুমহান্ হিন্দুধর্ম্মের বিরাট সম্মেলন ধরে নিলে তার অর্থ আরও সুপরিস্ফুট হয়। যাঁরা ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে ধরে নিয়েছেন সেই ত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীদের প্রাদুর্ভাবই এখানে খুব বেশী। আর হিন্দু মাত্রেই ধর্ম্মপিপাসু, তাই এই পুণ্যস্থানে ধর্ম্মার্জ্জন করতে গৃহীদের আগমন সংখ্যাও নিতান্ত কম হয় না।

এই কুম্ভমেলা ভারতের চারিটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

> পৃথিব্যাঃ কুম্ভযোগস্য চতুর্ধাভেদ উচ্যতে
> গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ ধারা গোদাবরী তটে ॥

এইরূপ হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক এই চারিটি তীর্থে বিভিন্ন সময়ে কুম্ভযোগে প্রত্যেকস্থানেই নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ বৎসর অন্তর পরপর পূর্ণকুম্ভ মেলা হয়। হরিদ্বার ও প্রয়াগে মাঝে আবার ছয়বছর অন্তর অর্দ্ধ-কুম্ভ মেলা হয়। তাতেও বহু সাধু, ভক্তের সমাগম হয়; নাসিকে উজ্জয়িনীতে তেমন হয় না।

কুম্ভমেলা সম্বন্ধে পুরাণে প্রবাদ আছে—সমুদ্রমন্থনে যখন সুধাপাত্র উঠেছিল তখন তাই নিয়ে দেবাসুরদের মধ্যে কয়দিন যুদ্ধ হয়—এবং সে সময় সে সুধাভাণ্ড দেবগণ বারদিন বিভিন্নস্থানে লুকিয়ে রাখেন; তারই আটদিন স্বর্গেও চারদিন ছিল মর্ত্তধামে, তাই সেই সুধাকুম্ভ লুক্কায়িত মর্ত্তের চারিটি স্থানে, অর্থাৎ—হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনীতে; যখনই সেই সুধাকুণ্ড রক্ষক দেবতাদের একত্র মিলন-তিথি সম্ভব হয়, তখনই মর্ত্তে কুম্ভযোগ উপস্থিত হয় এবং সে যোগে ঐ সবস্থানে স্নান করলে মর্ত্তবাসীর মহাপুণ্য-সঞ্চয় ও অমৃত ফললাভ হয়।

কোন্ তিথির সংযোগে কোথায় কখন কুম্ভযোগ হবে—সে সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত আছে।

হরিদ্বারে

> পদ্মিনী নায়কে মেষে কুম্ভরাশি গতে গুরৌ।
> গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ ॥

অর্থাৎ—বৃহস্পতি কুম্ভ-রাশি এবং সূর্য্যদেব মেষ-রাশিতে অবস্থান করলে হরিদ্বারে অমৃত কুম্ভযোগ উপস্থিত হয়।

প্রয়াগে

> মেষরাশিগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।
> অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে ॥

অর্থাৎ—বৃহস্পতি মেষ-রাশিতে এবং চন্দ্রসূর্য্য মকর-রাশিতে অবস্থান করলে তীর্থরাজ প্রয়াগধামে কুম্ভযোগ উপস্থিত হয়।

নাসিকে

> সিংহরাশিগতে সূর্য্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
> গোদাবর্য্যাং ভবেৎকুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ ॥

অর্থাৎ—বৃহস্পতি ও সূর্য্য উভয়ে কুম্ভরাশিতে গমন করলে গোদাবরীতে মুক্তিপ্রদ কুম্ভযোগ উপস্থিত হয়।

উজ্জয়িনীতে

> মেষরশিগতে সূর্য্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
> উজ্জয়িন্যাং ভবেৎ কুম্ভঃ সর্ব্বসৌখ্যবিবর্দ্ধনঃ ॥

অর্থাৎ—সূর্য্য মেষ-রাশিতে এবং বৃহস্পতি সিংহরাশিতে অবস্থান করলে উজ্জয়িনীতে সকলের সুখদায়ক কুম্ভযোগ উপস্থিত হয়।

প্রতি বারবছর পরেই এইসব তিথির মিলন অনুসারে এই কয়টি তীর্থে বিভিন্ন সময়ে কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হয়।

পুরাণে যাহাই বর্ণিত থাক্ না কেন এই বহু প্রাচীন প্রচলিত কুম্ভমেলা বা ধর্ম্ম-মহাসম্মিলনী ভারতের জাতীয় জীবনের এবং হিন্দুধর্ম্মের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরাট মেলা বা উৎসব। ঐতিহাসিকযুগে বৌদ্ধ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের প্রতি

পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগতীর্থে সর্ব্বত্যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে বিরাট সাধুসম্মিলন হত সে অপূর্ব্ব দৃশ্যটিও কুম্ভমেলার স্মৃতি প্রাণে জাগিয়ে দেয়। আচার্য্য শঙ্কর এই কুম্ভমেলাকে আরও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত ক'রে গেছেন।

সত্যই মনে হয় যেন এই পুণ্যতীর্থে পবিত্র কুণ্ডযোগে—বিরাট ধর্ম্মকুম্ভ হ'তে ধর্ম্মের রক্ষক সাধুসন্ন্যাসী ও ত্যাগী, যোগী, ভক্তগণ নিজেদের তপস্যালব্ধ প্রত্যক্ষ উপলব্ধিপূর্ণ জীবন দিয়ে নির্ব্বিচারে সনাতন সত্যধর্ম্মের গূঢ় রহস্য অকাতরে সর্ব্বসাধারণে বিতরণ করছেন। আবার তাদের আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, ধ্যান, ভজন, পূজন দেখে ও শুনে হিন্দুভারতের বিভিন্নমত ও পথের জনমানবগণ শ্রদ্ধায় মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়ে নিজেদের জীবনে ধর্ম্মের প্রকৃত নিগূঢ় রহস্যটি জাগিয়ে তোলেন। প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন, ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং সাধুদের কাছে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ ক'রে প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়ে—পঙ্কিল কণ্টকাকীর্ণ পথ হ'তে জীবনকে নিয়ে যান—ধর্ম্ম বা মনুষ্যত্বের পবিত্র পথে। সাধু ও ভক্তের মিলনেই কুম্ভমেলা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মাসাধিক কালব্যাপী এই ধর্ম্মমেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী ভারতের সর্ব্বদিক হতে নিজেদের মর্য্যাদা, নিজেদের জাতি ও মানসম্ভ্রম সকল ভুলে, কি আকুল আগ্রহে, কি অসীম ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়েই না শুধু সাধু দর্শন, উপদেশ গ্রহণ এবং পুণ্য স্নান ক'রে জীবনকে ধন্য ও পবিত্র করতে আসেন। এই বিরাট ধর্ম্মপ্রাণ জনমণ্ডলীকে দেখ্‌লে অবাক বিস্ময়ে প্রাণ মন আপনিই শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। এখানে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী দরিদ্র, কিসের নেশায় পাশাপাশি এসে স্থান ক'রে নিয়েছে? কিসের প্রেরণায় নিতান্ত অসহায় পঙ্গুও দুর্গম গিরিসঙ্কট পদদলিত ক'রে এসেছে! কিসের অনুপ্রেরণায় তারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে? এ যে ধর্ম্মনিষ্ঠা! এই আকুল ধর্ম্মনিষ্ঠাই ভারতের প্রকৃত জীবন ধারা—এইখানেই ত ভারতের প্রাণশক্তি! তাই ভারতকে জাগাতে হ'লে তার জীবনীশক্তির উৎসধারার সন্ধান করতে হবে—নতুবা সবই বিফল। চিরদিন ভারত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিকে ধর্ম্মের পবিত্র সিংহাসনের নীচে স্থান দিয়েছে। তাই ধর্ম্মের নামে সে সব কিছুই ত্যাগ করতে পারে, অন্যান্য জাতি থেকে এইখানেই তার প্রভেদ, এতেই তার প্রকৃত প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্ম্মজীবনই ভারতের বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তি হয়ে জগতের বুকে উজ্জ্বল-আলোর মত জ্বল জ্বল করছে।

কুম্ভমেলা দেখে এসে ভারতীয় যুবকগণকে লক্ষ্য ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়—হে নব্যযুগের বিদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু তরুণগণ, এস একবার পূর্ণকুম্ভমেলায়—দেখে যাও ভারতের প্রাণের স্পন্দন কোথায়—আর কোথায় তার প্রাণের শক্তির উৎস? বুঝতে পারবে, চিন্তা করবার অবসর পাবে—নিজের প্রাণের তারেও শুন্‌তে পাবে এক অভিনব সুরের অপরূপ ঝঙ্কার।

সেবার বাংলা ১৩৪৫ শনের মাঝামাঝি হইতেই দেশজুড়ে একটা রোল্ উঠ্‌লো—এবার পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে দ্বাদশ বৎসর পর পূর্ণকুম্ভমেলা—দোলপূর্ণিমা হতে সুরু হয়ে চৈত্র সংক্রান্তিতে শেষ হয়। গত একশত বৎসরের মধ্যে এমন পুণ্য যোগ আর উপস্থিত হয় নাই। এই সংবাদ বায়ুবেগে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের ঘরে ঘরে, সবার কানে কানে—কে প্রচার করল তা কেউ জানে না—কিন্তু সবাই সংবাদটি জেনেছে। রেলকোম্পানীও আয়ের এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তাদের বিচিত্র বিজ্ঞাপনগুলিকে ছড়িয়ে দিল পথে, ঘাটে, বাজারে সর্ব্বত্র—তাতে আবার বহু সুযোগের কথাও উল্লেখ করে ছিল। ধর্ম্মের প্রলোভনে দলে দলে সাধু, ভক্ত, কর্ম্মী ও ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসী ধনী দরিদ্র সবাই কুম্ভমেলায় যাবার জন্য উদ্‌ব্যস্ত হয়ে পড়ল্। শতকষ্ট সহস্র বিপদকে তুচ্ছ করেও তারা এ পুণ্য অর্জ্জন করবে—এই হ'ল তাদের একমাত্র কামনা। তাদের যাত্রাকালে এক অপূর্ব্ব চিত্র চোখে পড়ে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত নিঃশঙ্ক প্রাণে অতি আকুল আগ্রহে চলেছে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়। কেউ ওখানে সুখসুবিধার সন্ধানে যাচ্ছে না—চলেছে এক অজানা আকর্ষণে, ধর্ম্ম অর্জ্জন করতে—পুণ্য সঞ্চয় করতে।

অনেকদিন হতেই মনের এক নিভৃত কোনে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় সাধু দেখবার একটা কল্পনা ছিল; তাই কুম্ভমেলার দিন যতই নিকটে এগিয়ে আসতে লাগল, ততই মন কুম্ভে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। সত্যি একদিন কাউকে বিশেষ কিছু না জানিয়ে চৈত্রের একটি ধূসর সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে একখানা রিটার্ণ টিকিট কিনে বম্বে মেলে চলে গেলাম।

একদিন অতি প্রত্যুষে একজন সঙ্গীর সাথে বেরিয়ে পড়লাম সাধুদর্শন মানসে। প্রথমেই কন্‌খল বাজারের কাছ-থেকে সোজা পথে গঙ্গার একটি সাময়িক পুল পার হয়ে চললাম। গঙ্গার চড়ার বুকে পাথরের ঢেলাগুলি যেন মুখ বিকৃত করে সব জায়গা জুড়ে চেয়ে আছে। তার মাঝ থেকে কতক পাথর সরিয়ে সোজা একটি পথ করে দেওয়া হয়েছে। পথের দুদিকে মাধ্ব, বল্লভী, নিম্বার্ক, শ্রী ও রামাইত—এরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধু ও ত্যাগীদের ছোট-বড় নানা ছাউনি পড়েছে। প্রত্যেক ছাউনিতে বৈষ্ণব চিহ্নযুক্ত বিভিন্ন রঙের পতাকা উড়ছে। ঐ সঙ্কীর্ণ স্থানেই আবার প্রায় ছাউনীতেই দেববিগ্রহেরও একটি আসন আছে। উষার কলরবের সঙ্গে সঙ্গে সব আস্তানায় ভগবানের প্রভাতী আরত্রিক ও ভজন সুরু হয়েছে। কি মধুর লাগল—শঙ্খ ঘণ্টা রোলে ভক্তকণ্ঠের বন্দনাগীতির সঙ্গে দেবতার আরত্রিক হচ্ছে। সামনে ও ধারে ভক্তসব করজোড়ে দাঁড়িয়ে দেবতার নিকট ভক্তি নিবেদন করছে। দু-চার জন বৈষ্ণব ত্যাগী ও সাধুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হ'ল—বড়ই বিনয়ী ও ভক্ত। কোথাও দেখলাম বৈষ্ণব অস্ত্রেরও পূজা হচ্ছে, প্রায় প্রতি আখ্‌ড়ায় ও আস্তানায়ই পাঠ, ব্যাখ্যা, ভজন, পূজন, ধ্যান, জপ, উপদেশ চল্‌ছে—বৈকালেও নিয়মিতভাবে এসব অনুষ্ঠিত হয়। ঘুরে ঘুরে সব স্থানটি দেখলাম—কয়েক হাজার বৈষ্ণবসাধু এখানে একত্রিত হয়েছেন। দলে দলে ভক্তগণ এঁদের দর্শন করতে আস্‌ছেন ও ফিরে যাচ্ছেন। বৈষ্ণবদের কণ্ঠি ও তিলকই তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিচয় দেয়। এদের মধ্যে একরকম সাধু আছেন, এরা নাগাদের মত উলঙ্গ নয়—তবে গায় ছাইমেখে মাত্র কৌপীন সম্বল করেই থাকে—তাদের বলা হয় ত্যাগী। এদেরই দু-চারজন বলিষ্ঠকায় ত্যাগীদের দেখলাম, ধুনির কাছে বসে চোখ বুজে হঠাৎ বিরাট গুরুগম্ভীর শব্দ ক'রে দর্শকদের ভীতি উৎপাদন করছে—কেউ বা অবিরত নাম-গানে মত্ত—কেউ বা মৌনী হয়ে আছেন। ফেরবার পথে একটু দূরে কয়েকজন সাধুকে দেখেছিলাম—জানি না এরা কোন্ সম্প্রদায়ের, একজন তার দেহটাকে সম্পূর্ণ মাটির ভিতর পুঁতে কেবল মাত্র মাথাটিকে বাহিরে রেখে ধ্যান করছেন, আর একজন মাথাসুদ্ধ সম্পূর্ণ দেহটিকে মাটীর ভিতর ঢেকে বাইরে একখানা হাত ঊর্দ্ধবাহু হয়ে জপ করছেন, একজনকে দেখলাম চারিদিকে আগুন জেলে তার ভিতর ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন, এইরূপ আরও অনেক রকম আছেন। এদের কে যে কোন্ ভাবে, কি উদ্দেশ্যে এরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিরত তা বুঝতে পারলাম না। বৈষ্ণব সাধুদের কয়জনকে দেখে খুব ভক্তি হয়েছিল—কিন্তু এদের দেখে তেমন কিছু মনে হল না। দর্শকগণ কিন্তু এদের দেখে টাকা পয়সা দিচ্ছে, বৈষ্ণব সাধুদের ওখানেও ভক্তগণ আটা, ঘি, চিনি, ডাল ভেট দিচ্ছে—ত্যাগীদের ধুনি জ্বালাবার জন্য শেঠভক্তগণ নিত্য শত শত টাকার কাঠ বিতরণ করছেন। এখানেও পুলিস, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী রয়েছে। বৈষ্ণবদের আস্তানাগুলো বড়ই মনোরম স্থানে হয়েছে। এখানে আলো ও জলের কোন অভাব নেই। অদূরে হিমাদ্রিশিখরের তুঙ্গশির সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, নীচুতে মা গঙ্গা এঁকে বেঁকে এই স্থানটিতে ধীরে কুলু কুলু রবে আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন। তান তরঙ্গিণীর স্বচ্ছ বালুচরের উপর বালির চড়াই—বৈরাগী সাধুদের ছাউনি। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক।

অপর একদিন সন্ধ্যায় বৈষ্ণব সাধুদের সেবা দেখতে এসেছিলাম। সারাদিন পরে তাঁরা নিজেরা রান্না ক'রে দেবতার ভোগ দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বড়ই সুন্দর ব্যবস্থা-সন্ধ্যার খানিক পূর্ব্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সাধু, ত্যাগী নিজ নিজ আস্তানায় ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসেছেন। পাতায় পুরি, তরকারি, লাড্ডু, কচুরি পড়েছে—কিন্তু তাঁরা কয়মিনিট ধরে উচ্চ রবে তাঁদের দেব ও গুরুর স্তবস্তুতি নাম উচ্চারণ ক'রে আহার আরম্ভ করলেন এবং সম্প্রদায়ের জয়ধ্বনির সঙ্গেই আহার সমাপ্ত হ'ল। কোন সাড়া শব্দ কিছুই নাই, বেশ শান্ত নীরব ভাবে সবাই তৃপ্তির সঙ্গে সেবা সমাপন করলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আগমনে আখ্‌ড়া ছাউনি কুটীরে তাদের আবার উদাত্তকণ্ঠে গম্ভীর স্তবগান সুরু হল—সে সুরের মোহিনীশক্তি আমার মনের নিভৃত কোণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব সৃষ্টি করল—সেইভাবে ভাবিত হয়ে খানিকক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে, পরে ধীরে ধীরে ফিরে এলাম।

পরে একদিন কন্‌খল দশনামী, উদাসী ও নাগা সাধুদের

কয়েকটি বড় বড় আস্তানা দেখতে গেলাম। সব আস্তানাই সুসজ্জিত—প্রবেশ দুয়ারের উপর উচ্চ পতাকা উড়ছে, নীচুতে ধারেই সুমধুর ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হয়েছে—ভিতরে প্রবেশ ক'রে দু-চার জন সাধুর সঙ্গে দেখা হতে "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" বলে উভয় পক্ষের সম্ভাষণ হ'ল এবং অতঃপর তারা সাদরে, "আইয়ে মহাত্মা, বিরাজিয়ে, পাধারিয়ে কৃপানিধান" ইত্যাদি বলে খুবই আদর যত্ন করতে লাগলেন। আমি এগিয়ে যেতে দেখলাম একটি সুসজ্জিত ঘরের ভিতর মণ্ডলেশ্বর মহারাজ নির্দ্দিষ্ট সুন্দর আসনে উপবিষ্ট। (মণ্ডলেশ্বর বলতে সাধুমণ্ডলীর যিনি শ্রেষ্ট বা প্রধান আচার্য্য—যাঁকে সকল সাধু মিলে সঙ্ঘের প্রধান পদে বরণ করেন)। আমি "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" করে করজোড়ে প্রণিপাত জানিয়ে তাঁর সুমুখে বসলাম, তিনিও অতি স্নেহমধুর কণ্ঠে কুশলপ্রশ্নাদি করে আপ্যায়ন করলেন। দলে দলে ভক্ত নরনারী এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে প্রণামী দিয়ে শুভ আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে আনন্দে শান্ত মনে ফিরে যাচ্ছে। কত সাধু ভক্ত উপদেশ-আকাঙ্খী হয়ে অপেক্ষা করছেন। সৌম্য, শান্ত, ধীর, প্রেমিক সন্ন্যাসী মণ্ডলেশ্বর মহারাজ গৈরিক বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক, সহাস্য বদনে সমাগত ভক্তদেব প্রশ্নের সরল মীমাংসা ক'রে দিয়ে প্রকৃত ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ শুনে প্রাণে পরম শান্তি এল। মনে হ'ল এঁরাই হ'লেন ধর্ম্মের রক্ষক এবং বিচারশীল পণ্ডিত উপলব্ধিবান সাধু মহাত্মা—সত্যই মানুষের মনে ধর্ম্মের ভাবটি জাগিয়ে দিতে পারেন। যতক্ষণ বসেছিলাম মণ্ডলেশ্বর মহারাজের শান্ত মধুর দু-চারটি উপদেশ প্রাণে স্পর্শ করেছিল। খানিক বাদে বেরিয়ে এসে প্রাঙ্গণের সব দিকটা ঘুরে ফিরে দেখলাম—কোথাও ব্রহ্মচারী বালকগণ সমস্বরে বেদপাঠ করছে, কোথাও হোমানলে আহুতি দিচ্ছে, কোথাও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হচ্ছে, আবার পণ্ডিতসাধুদের উত্তরপক্ষ ও পূর্ব্বপক্ষের জটিল শাস্ত্রবিচার চলছে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বিভিন্ন ভাবের আনুষ্ঠানিক বিকাশ দেখে আনন্দ হল। অদূরে কয়টি ন্যাংটা নাগা ধুনি জ্বালিয়ে একান্ত মনে ধ্যান-ধারণা পাঠে মগ্ন রয়েছেন। এখানে কয়েক হাজার সাধু, বিদ্যার্থী, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত মণ্ডলেশ্বর মহারাজের সঙ্গে এসেছেন, তাঁদের আহার ও থাকার সব ব্যবস্থাই এখানে হয়েছে। সকল ব্যয়ভারই শেঠ ভক্তগণ আনন্দে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করছেন। ভারতের অস্থি, মজ্জা, রক্ত—সব কিছুই ধর্ম্মে জড়িত, তাই ধর্ম্মের জন্য অকাতরে দান—এদেশের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক—হরিদ্বারে যা দেখলাম সে ত আমাদের সহস্র সহস্র বছরের মুনিঋষিদের আশ্রমেরই ছায়া—সত্যই এসব দেখে শুনে খুবই মুগ্ধ হলাম।

এখান হতে বের হয়ে কাছেই অপর একটি সুসজ্জিত আস্তানায় প্রবেশ করলাম—এখানেও সেই দুয়ারের উপর পতাকা উড়ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, তিন জন বিখ্যাত মণ্ডলেশ্বর এখানে আছেন। ভিতরে গিয়ে দেখলাম—প্রত্যেক মণ্ডলীশ্বরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সজ্জিত গৃহে তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসন পাতা আছে, এখানেও দর্শকের বিরাম নেই। সুধী, বুদ্ধিমান, ত্যাগী সুদর্শন মণ্ডলেশ্বরগণ অতি শান্ত মধুর স্বরে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ ক'রে সমাগত সবাইকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে চিরশান্তি ও চির-আনন্দময়ের স্বরূপ—ভগবৎ চিন্তাকে প্রাণে জাগিয়ে দিচ্ছেন। এখানে কয়েকটি হিন্দি ভজন শুনে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম, সবাই যেন ভাগবত ভাবে মাতোয়ারা—সাধুরা খুবই মিষ্টভাষী, দেখা হতেই "ওঁনমঃ নারায়ণায়" ক'রে সাদর সম্ভাষণ জানান—এঁদের বড়ই মধুর ব্যবহার, এতেই মানুষকে আরও বিশেষ মুগ্ধ ক'রে দেয়। তাঁদের হৃদয় যেন ক্রোধ বা ঈর্ষার সীমারেখার অনেক দূরে অবস্থান করে—শান্ত সুন্দরের উপাসনায় সকলেই শান্ত হয়েছেন। ফেরবার পথেও পূর্ব্ববৎ বিদায় সম্ভাষণ।

পথে একটি নাগা সন্ন্যাসীর আস্তানা দেখে এলাম, কয়েক শত নাগা একেবারে নগ্ন দেহে ভস্ম মেখে দীর্ঘ জটায় শোভিত হয়ে ধুনি জ্বেলে ধ্যান, ভজন, পাঠ বা আলোচনায় মগ্ন হয়ে রয়েছে। তাদের দেবালয়ের সামনে ডমরু, ভেঁপু, সিঙ্গা বাজছে। বেশ স্বাধীন উন্মুক্ত সকল আবরণহীন এই সাধুরা খুবই ত্যাগী, মাত্র চিমটা ও লোটা সম্বল ক'রে ধুনির কাছে বসে আছে—তাতেই পূর্ণানন্দে রয়েছে। দর্শকের দলে দলে এসে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন ক'রে যাচ্ছে। কোন কোন লোক এদের কাছ থেকে ঔষধ ও মন্ত্র জানতে চায়, এদের ভিতর খুব কঠোরী সাধুও আছেন। ভক্তগণ স্বেচ্ছায় এঁদের জন্য নিত্য ধুনি জ্বাল্‌বার কাঠের সকল ব্যয়ভার বহন করছেন। এখান হতে বেরিয়ে কাছেই আরও কয়টি

আস্তানায় মোহন্ত ও পণ্ডিত সাধুদের দর্শন ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে এলাম—কোথাও সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছার বিরাম নেই, আমরাও আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম। সব সাধুর আস্তানায়, মঠে, মন্দিরে, আখ্ড়ায় সর্ব্বত্র প্রতিদিন বৈকালে, সন্ধ্যায় ও সকালে সনাতন ধর্ম্মের বিভিন্ন ভাবের পাঠ, ব্যাখ্যা ও উপদেশ হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত সাধুগণ এজন্য নিযুক্ত আছেন। আগ্রহবান দর্শক ও ভক্তগণ উপস্থিত হয়ে ধর্ম্ম কথা শোনেন।

আরও দু-একটি সাধু ও নাগার সুসজ্জিত আশ্রম দেখে উদাসীদের নয়া আখ্ড়ায় এলাম। এদের এখানে অনেক সাধু ও শান্ত আছেন, ধুনি জ্বলছে, গায়ে ছাই, মাথায় জটা, মুখে দাড়ি, ধূসর কৌপীন পরা, সুন্দর সুস্থ সবলদেহ দীর্ঘকায় এই পাঞ্জাবী দেহধারীদের দেখে খুবই আনন্দ হয়, এদের মুখের শান্ত সৌম্য ভাবটি বড়ই তৃপ্তি দেয়। এরা হলেন 'শ্রীচাঁদের' উপাসক, উচ্চ বেদীমূলে গুরুর ছবি ও বিগ্রহ সুসজ্জিত রয়েছে। মোহন্তের গদীতে একজন স্থূলকায় সাধু গুরুমুখি ভাষায় ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন, দলে দলে পাঞ্জাবী ভক্ত আস্ছেন—এঁদের কাছ থেকেও মিত্রভাবে সাদর সম্ভাষণ পেয়ে ফিরে এলাম—এখানেও অনেক শান্ত সাধু আছেন।

অপর একদিন উদাসীদের বড় আখ্ড়ায় গিয়ে কয়েক হাজার শান্ত, ভক্ত ও সাধু দেখে এসেছিলাম; 'গ্রন্থসাহেব' ও গুরুদের সব সুসজ্জিত আলেখ্য সজ্জিত ঘরে নীচুতে বসে একজন আচার্য্য গুরুমুখী ভাষায় গ্রন্থসাহেব ব্যাখ্যা ও উপদেশ করছেন। উপস্থিত দর্শক ও ভক্তদের প্রাণে একটা তন্ময়তা এনে দিচ্ছিল। আমাদেরও বেশ ভালই লাগল—ঐ দীর্ঘ সবল শক্ত সুন্দর—ছাইমাখা কৌপীনধারী প্রশান্ত বদন চেহারাগুলি, সত্যি মানুষকে মুগ্ধ উদাস ক'রে দেয়। এঁরা গুরুর বাক্যে একান্ত শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী। এখানেও ধুনি জ্বলছে, বাইরের দুয়ারে একজন বিশাল আকৃতি দর্শনধারী সাধু বসে আছেন—তাঁর অতবড় দেহটি দেখবার জন্য নিত্যই ভীড় জমে থাকে, মাঝে মাঝে তিনি গুরুগম্ভীর শব্দে উচ্চ চীৎকার তুলে দর্শকদের আরও অবাক ক'রে দেন। এসব আখ্ড়ায় সুমধুর ভজন গান, ভেঁপু, ডমরু, ব্যাণ্ড এবং লাঠি ও উন্মুক্ত কৃপাণ চালনার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়ে নিত্যই যাত্রীদের আনন্দ দেয়।

নির্ম্মলা সম্প্রদায়ের সাধুদেরও দেখতে গিয়েছিলাম—তাঁরা গুরু গোবিন্দের উপাসক—পাঞ্জাবী শরীর উদাসীদের মতই শক্ত ও সবল নেংটি বা কাল রঙের বহির্বাস—মাথায় জটা বা কালো পাগড়ি—ভস্মাচ্ছাদিত মুখে দাড়ি—অনেক শান্ত সাধু এখানে আছেন, কেউ-বা ধুনির পাশে আপন মনে বসে আছেন, কেহ গভীর ধ্যানে মগ্ন—আর সুসজ্জিত গুরুর আসনের সম্মুখে একজন পণ্ডিত মোহন্ত সাধু পাঠ, আলোচনা ও ব্যাখ্যার ছলে উপদেশ দিচ্ছেন। দলে দলে ভক্ত নরনারী প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও উপদেশ শ্রবণে তৃপ্ত মনে আনন্দের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন। এদের ভিতর অনেক ত্যাগী শান্ত সাধু আছেন। আমরা হিন্দিতে কিছুক্ষণ এঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে পরম পরিতুষ্ট চিত্তে ফিরে এলাম। এসব উদাসী নির্ম্মলা সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সাধু শান্তের জন্য শেঠ ভক্তগণ অকাতরে অর্থব্যয় করে সাধুসেবায় ধর্ম্ম-অর্জ্জন করছেন।

কুম্ভমেলা উপলক্ষে এই পবিত্রস্থানে প্রায় সম্প্রদায়েরই মোহন্ত ও মণ্ডলেশ্বরগণই সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্র দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

ভক্তগণ এই পুণ্যস্থানে সাধুদের সেবার সুযোগ পেয়ে ধন্য ও কৃতার্থ হন, মাঝে মাঝে ভক্তগণ এক এক আস্তানায় সাধুদের স্বতন্ত্র ভাণ্ডারার আয়োজন করেন। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সাধু, মণ্ডলেশ্বর, মোহন্তগণ নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাধুগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে বসে যান, মণ্ডলেশ্বর ও মোহন্তগণ তাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে বসেন, ভক্তদের পূজা দক্ষিণাদির পরে মণ্ডলেশ্বরগণ অনুমতি দেওয়া মাত্র আশ্রম-কোতোয়াল সিঙ্গা বাজিয়ে আহার আরম্ভের ইঙ্গিত করে—ইতিমধ্যে পাতা জল দেওয়ার সঙ্গে পুরি, কচুরি, লাড্ডু, তরকারি ইত্যাদি যা-কিছু আহার্য্য তৈরি হয়েছে—সবই পাতায় দেওয়া হয়ে যায়, সাধুগণ সমস্বরে পঙ্গত কা হরিহর বলে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করে আহার সুরু করেন। মাঝে মাঝে পণ্ডিত বিদ্বান সাধু ও বিদ্যার্থীগণ আহারের ফাঁকে শাস্ত্রের শ্লোক উচ্চরবে আবৃত্তি করেন, আর শোনা যায় যারা পরিবেশন করেন তাদের রব—পুরি নারায়ণ, কচুরি নারায়ণ, লাড্ডু নারায়ণ, জল ভগবান ইত্যাদি যার যা দরকার চেয়ে নেন।

(সাধুকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করবারই প্রথা) নীরবে

আহার শেষ হয়ে যায়, আবার বেজে ওঠে কোতোয়ালের বাঁশী, কাপড় থাকলে আহারের সময়েই দেওয়া হয়ে যায়, সবাই জয়ধ্বনি করে উঠে যায়। আহারের পূর্ব্বে প্রবেশ-পথে একজন বিচক্ষণ সাধু থাকেন—যিনি সব সাধুরই খবর রাখেন—অর্থাৎ অন্য কোনও বাজে লোক ফাঁকি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ না করে তার জন্য এ ব্যবস্থা। "ভাণ্ডারা" অর্থে সাধু সেবাকেই বুঝায়।

বেলা বেড়ে গেল, তাই ফিরে চল্‌লাম। পথে দেখ-লাম অগণিত যাত্রীদল, মনে হ'ল সামনে অমাবস্যা স্নান—তাই এসব যাত্রী আস্‌ছে। সাধুদের আস্তানাঞ্চল আমরা খুবই আগ্রহ নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখেছি, কেবলই মনে হচ্ছিল এ যেন কোন্ ধর্ম্মরাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মকথা নানাভাবের বিভিন্ন পথ ও মতের—ধর্ম্ম আলোচনাই চলছে। দর্শকভক্তগণ ধর্ম্মভাবে ভাবিত হয়ে আনন্দে নিজস্ব ভাবটিকে প্রাণের পরতে আরও পরিস্ফুটভাবে জাগিয়ে নিচ্ছেন। সর্ব্বত্র মেলাক্ষেত্রটি জুড়ে যেন একটা ধর্ম্মভাবের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আকাশ বাতাস সবই যেন সেই পবিত্রভাবের আভাষ দিচ্ছে। সাধু মহাত্মাগণের দর্শনে, উপদেশশ্রবণে প্রাণে একটা অনাবিল বিমল আনন্দ ও শান্তি নিয়ে ফিরে চললাম। পথে বেশ রোদ ও ধূলায় খুবই আচ্ছন্ন করে দিল। সকালের দিকটা বেশ শীতবোধ হয়েছিল তাই অনেকটা বেলা পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ান ভালই লাগল।

আহারাদিশেষ ক'রে খুব খানিকটা বিশ্রাম করলাম—ভাব-ছিলাম বিকালে আর বাইরে যাব না, কিন্তু তা কি আর হয়। যখন দেখলাম সবাই দলে দলে স্বাধীনভাবে এদিক ওদিক সাধু দেখ্‌তে, মেলা দেখতে গঙ্গার ধারে বেরিয়েছে, তখন বাধ্য হয়েই আমরাও একটি ক্ষুদ্র দলে বেরিয়ে পড়লাম—অনেকটা দূর পথের উদ্দেশে—"সপ্ত সরোবর" বা সপ্তধারা—যেখানে বিরাগী বা বিরাকত সাধু মহাত্মাদের কুঠিয়া-ছাউনি পড়েছে, সে স্থানটি কনখল থেকে প্রায় তিন-চার মাইল ব্যবধান হবে, তবে সোঝাপথে যাবার জন্য রৌরীদ্বীপ হয়ে এগিয়ে গিয়ে ঐখানেই গঙ্গার উপরের নতুন পুল পার হয়ে যাব স্থির করেছি। এগিয়ে চললাম—রোদের তাপ তখনও কমে যায় নি, পথে মানুষের ভীড়, মোটর, টাঙ্গাও চলেছে অনেক, ধূলাও উড়ছে খুব, নূতন যাত্রী পেয়ে টাঙ্গাগুলো উৎসাহে উচ্চ চিৎকারে পথিকদের সতর্ক ক'রে ছুটেছে। যাত্রীও আস্‌ছে অগণিত, আমরা ঐ ধূলাবালিভরা পথে নাকে মুখে কাপড় ঢেকে জনতার ভীড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি রৌরীদ্বীপের পথে। প্রায় একঘণ্টা সময় লাগল ওখানে পৌছতে, পথে যেতে যেতে দেখলাম কাল যে সবস্থান ফাঁকা দেখেছিলাম, আজ যে সব স্থান ভরে গেছে, এখানে ওখানে কত যে ছাউনি পড়েছে তার হিসাব নাই, আমরা গঙ্গার পুল পার হয়েই সপ্তসরোবর অথবা সপ্তধারায় পৌছলাম, এখানেই মা গঙ্গা সাতটি ধারায় প্রবাহিত—এর ধারেই ত্যাগী বিরাকত অর্থাৎ কঠোর বৈরাগ্যবান—সাধু মহাত্মাদের ছাউনি পড়েছে, এ সাধুরা কোন সম্প্রদায়ের ভিতর থাকেন না—স্বাধীনভাবেই নীরবে ঘুরে বেড়ান, এখানেও অনেক সাধু এসেছেন—আপন ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠিয়ায় মনের আনন্দে রয়েছেন। অনেকেই ধ্যান-ধারণা ও পাঠে মগ্ন থাকেন, কেউ হয়ত নীরবে মৌনী হয়ে আপন ভাবে বসে আছেন—এঁদের কাছে বিশেষ কিছু সম্বল নাই—বহির্বাস হয়ত একখণ্ড গেরুয়া—কি একখানা কম্বল মাত্র, কারু-বা কৌপীন মাত্রই সার। জলপাত্র—একটি কমণ্ডুলু বা লোটা আছে অনেকের, কেহ-বা নগ্নদেহে সারা অঙ্গে বিভূতি মেখে একটি চিমটা নিয়ে ধুনির ধারে নির্ব্বিকার-ভাবে বসে আছেন। এরূপ বিভিন্ন ভাবের কত যে সাধু এসেছেন। আমরা খুবই আগ্রহ নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে লাগলাম, এদের ভিতর প্রায়ই কঠোর বৈরাগ্যবান ত্যাগী—একান্ত নির্ভরশীল, নিঃস্বম্বল ৺ভগবানের করুণাই তাঁদের একমাত্র সম্বল, এঁদের দু-একজন সাধুর কাছে খুবই আগ্রহ নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে তাঁদের উপলব্ধিপূর্ণ দু-একটি প্রেমের বাণী শুনে প্রাণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে ভরে গিয়েছিল। মনে পড়ে, একজন মহাত্মাকে কোনও প্রশ্ন করতেই তিনি আমাদের দিকে চেয়ে এক স্বর্গীয় হাসি মিশ্রিত আন্তরিক আশীর্ব্বাদে সকল প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে প্রাণে এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দিলেন। অদূরেই আবার দেখলাম কয়টি বড় বড় ছাউনি পড়েছে। দু-একজন সাধু ভক্ত নিয়ে বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছেন—এরূপ কত সাধুর কথাই বা বলব, এ যে সাধুরই মেলা। কয়টি আশ্রমে রামনাম, কথকতা, কীর্ত্তন, ভজন ইত্যাদি চল্‌ছে, দেখে মনে হয় যেন গায়ক ও শ্রোতাগণ কি এক আনন্দসাগরে ডুবে আছেন।

কয়জন সিদ্ধবাবা, পাহাড়ীবাবা, মৌনীবাবা এসেছেন

—তাঁরা মানুষকে তাবিজ, কবজ, ঔষধ, ছাই, মন্ত্র ইত্যাদিতে কঠিন ব্যাধি হতে আরোগ্য অথবা ভাগ্য পরিবর্ত্তন ক'রে দিচ্ছেন—দক্ষিণাও বেশ আদায় হচ্ছে। শুনলাম কয়জন মেয়ে সাধু এরূপ এসেছেন—সিদ্ধমা, গুরুমা, গঙ্গামা, যমুনা মা—এঁরাও নাকি বিপদ ব্যাধিতে মানুষের অনেক উপকার করতে পারেন। এঁদের দেখ্‌বার সুযোগ আমার হয় নাই, তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—এইসব সাধুর একদল প্রচারক রয়েছেন। তাঁরা সর্ব্বদাই এঁদের প্রশংসায় শতমুখ। আবার একদল যাত্রীও এঁদের সন্ধানেই এসেছেন—তাঁরা খুবই আগ্রহ নিয়ে এসব সাধুর কাছে ভীড় জমিয়েছেন। এঁদের দেখে আমার কেবলই মনে হত—এঁরা আবার কি রকম সাধু, খোদার উপর খোদকারি কর্‌তে বসেছে।

এই সপ্তধারাতে শেঠ ভক্তগণ সাধুদের জন্য কয়টি বড় বড় ছত্র খুলেছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিত্য সাধুকে ডাল, রুটি, ভাত দিচ্ছেন, জলছত্রও মাঝে মাঝে রয়েছে—দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলা হয়েছে। হৃষীকেশ যাবার পথের ধারে ধর্ম্মশালাগুলি সাধু ভক্তে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। এখানে দুই-একটি ছত্র হতে যাত্রীদিগকেও ডাল, রুটি দেওয়া হচ্ছে। এবার ভীম গোড়ার দিকে চল্লাম। (প্রবাদ, এইখানেই পাণ্ডবগণ স্বর্গে যাবার সময় ভীমসেন গদা ত্যাগ ক'রে ছিলেন—তাই এস্থানের নাম ভীমগোড়া) পথে যেতে দেখ্‌লাম একদল বিচিত্র পোষাকপরা সাধু—ঘণ্টা, ঘুঙুর, গলায়বাঁধা সিঙ্গা ও হাতে কমণ্ডলু, দেহে ভস্মমাখা, মাথায় জটা, ঝুমুর ঝুমুর শব্দে ভিক্ষা করতে চলেছেন। এরা হ'ল আলেক সাধুর দল, এদের নিয়ম চলার পথেই ভিক্ষা নিয়ে যাওয়া—যে যা কিছু দেয়—ভিক্ষার সময় কোথাও দাঁড়াবার নিয়ম নাই।

নর্ত্তন—এও অভিশাপ!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জীবনের বালুচরে রাবণের চিতাসম ধূধূ ক'রে জলে হৃদিচিতা,
স্বপনের পার হ'তে তুমি প্রিয়া তরী বেয়ে সেইপথে হ'লে উপনীতা।
এ চিতা নিভাতে তুমি পারিবে কি কোন দিন অনুরাগে প্রেমবারি দিয়া,
নিখিলের নির্ঝরে যত ছিল ভালবাসা, যত গান—সব কিছু নিয়া
নিভাতে পারিনি প্রিয়া, আশা-নিরাশার বাণী পথে পথে শুনিয়াছি কত,
সবাকার মাঝখানে সকলি হয়েছে মিছে—ভুল ক'রে ভাবিয়াছি যত
ভাবী দিবসের সুখ কল্পনার সমারোহে, তারি মাঝে দহনের শিখা
তবু হেরি বারে বারে—মুছিতে পারি কি মোরা এ ধরায় নিয়তির লেখা।
এ সংসারে আসা-যাওয়া বিপুল আশাতে রচি আপনার অলীক স্বপন,
কে জানে কখন সব ফেলে রেখে যেতে হবে হাতে গড়া তাসের ভবন।
জীবনের সীমা হ'তে যতদিন নাহি ত্রাণ, ততদিন ভোগ করি দুখ,
পুড়ে পুড়ে হ'ল সারা আমার হৃদয় মন, ভেঙে গেছে উন্নত বুক।
সুন্দরি! ভুলে যাও সুন্দর স্বপনেরে, বাস্তবে শুধু শোক তাপ,
ক্ষণিকের সুখ পেয়ে মিছে মোরা নেচে উঠি, নর্ত্তন—এও অভিশাপ!

মনে পড়ে ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত এবং আপনাকে সে ভাগ্যবান ব'লেই ভাবত। ইতিমধ্যে বয়স পঞ্চাশে পৌছেচে। তবু মাথার চুলে পাক ধরেনি, মসৃণ দেহ, চলা ফেরায় আছে একটা সহজ ছন্দ ও আভিজাত্য। ত্রিশ বৎসর একাগ্রমনে পরিশ্রম করার ফলে পেয়েছে উচ্চপদ ও প্রতিপত্তি, কোনো অভাব অতৃপ্তি নেই তার মনে।

'উঠেছি ত অনেক দূর'—ভাবে মনে মনে—সোনার দোলায়' শৈশবে মা দেননি আমাকে দোলা ; বাবা মা কি সংগ্রামেই দিনপাত করেছেন ! পরের কাছে হাত পাত্‌তে না হ'লেও কি কষ্টের জীবনই ছিল তাঁদের, দুঃখ দুর্ভাবনা ও খাটুনির ছিল না কোনো অন্ত। আমাকে ওরকম পরিশ্রম ও সংগ্রাম করতে হ'লে বছর তিনেকেই শিঙে ফুঁক্‌তে হ'ত। কি অবস্থা থেকে উঠেছি কোথায় ! হাঁ, আমার স্থাপত্য-কৌশল আছে বটে, নিজের হাতে গ'ড়ে তুলেছি আমার দৌলতখানা। তবু কম মেহনত করতে হয়নি, বেগ পেতে হয়েছে যথেষ্ট, সিদ্ধিলাভ হয়েছে অবশেষে– তবে অভাব কিসের ?

গত দু বৎসর তার কেমন আর আগেকার স্ফূর্তি নেই। নিজেই বুঝতে পারে না কোথায় যেন কিসের অভাব। ডাক্তারের বিধি-নিয়ম, নানা ঝরণার ধাতুজ অগ্নিবর্দ্ধক জল পান, স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্তন, স্রোতের জলে অবগাহন, ব্যায়াম প্রভৃতি কিছুতেই কিছু হ'ল না। বিশেষ বেদনা বা দৌর্বল্যের প্রকোপ নেই, অথচ সর্বদাই কেমন একটা অসোয়াস্তির ভাব। বন্ধুরাও লক্ষ্য ক'রে কি যেন ওর বিগড়ে গেছে। মসৃণ কপালে চিন্তারেখা দেখা দিয়েছে, রেশমের মত সূক্ষ্ম, কিন্তু দিন দিন হচ্চে গভীরতর। 'কি হ'ল ওর ?' সবাই বলাবলি করে। 'কি হ'ল আমার' প্রশ্ন করে সে আপনাকে। এই আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মীয়দের উৎকণ্ঠার একই উত্তর—'কি জানি কি হ'ল। হয় পৃথিবীটা বদলে গেছে, না হয় আমি হয়েছি আহাম্মক, নিজেই ছাই বুঝি না—হ'ল কি ঘোড়ার ডিম !'

থিয়েটারে গেল, যেমন বরাবর যায়। বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে দেখা। কিন্তু আজ সবাইকে লাগে অসহ্য। বড়দিনের সময় আমোদ আহ্লাদের অন্ত নেই। হঠাৎ গাড়ী চেপে কোচম্যানকে হাঁকে—'ঘরে চল, জলদি হাঁকাও।'

ঘোড়া ছোটে পবনবেগে।

হাই তুলতে তুলতে ঢুকল ঘরে। চায়ের হুকুম দিল। তারপর সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে টানে দীর্ঘশ্বাস। চারিদিকে দামী আসবাবপত্র, আয়না, কার্পেট, সবই মহার্ঘ। পাশে খানসামা দাঁড়িয়ে, বাড়ীতে আর জনপ্রাণী নেই, লোকটি অকৃতদার।

খানিকক্ষণ আলোকোজ্জ্বল ঘরে করলে পায়চারি, চোখ যেন ঝল্‌সে যায় সেই আলোয়। পাকানো গোঁফের ডগা চেপে ধরে দাঁতে, তারপর বলে একাধিকবার— 'চুলোয় যাক সব।' জীবনে হয়েছে অরুচি। খ্যাতি প্রতিপত্তি পদমর্যাদা অর্থাগম সব পণ্ডশ্রম—কেবল জীবনটাকে বিস্বাদ ক'রে তোলবার জন্যে এই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ! আশ্চর্য !

টেবিলের কাছে যেতেই একটা ডাকের চিঠি পড়ল চোখে। সেটাকে তুলে নিয়ে দেখবামাত্র তার ম্লান চক্ষে ফুটল একটা দীপ্তি, আর চাপা ঠোঁটে দেখা দিল হাসির আভাস। 'অ্যাঁ, আন্নুকার চিঠি ! এতকাল পরে ও যে আবার চিঠি লিখবে স্বপ্নেও তা ভাবিনি !'

বোনের নাম আন্নুকা। দেশেই ওর বিয়ে হয়েছে, থাকে সেই গণ্ডগ্রামের অজ্ঞাতবাসে। কুড়ি বছর ভাই-বোনে দেখা নেই। কদাচিৎ চিঠি লেখে, কখনো জবাব পায়, কখনো পায় না। মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর কেটে গেছে, বোনের কথা মনে হয়নি একটিবারও। কিন্তু এখন খামের উপর তার হাতের লেখা চিন্‌বামাত্রই মনে আর আনন্দ ধরে না। চিঠিখানা খুলতে খুলতেই মুখটা ভ'রে উঠল হাসিতে, কপালের চিন্তা রেখাগুলি গেল মিলিয়ে।

চিঠির প্রথম অংশটার উপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে

শেষের দিকটাতে পত্র পাঠের গতি এল মন্দীভূত হয়ে। এক জায়গায় এসে সে থামল।

'মনে পড়ে ?'—লিখ্ছে তার সহোদরা, যে এখন ক্ষুদ্র একটি তালুকের মালিক—'বাবা সন্ধ্যার সময় তাঁর এক প্রজার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কি কথাবার্তা বলছেন, আর আমরা দুই ভাই-বোনে দূর থেকে দেখছি ছায়ায় তাঁর লম্বা দাড়ি কেমন দুলছে সেই কথার তালে তালে, আর আমাদের কি মজাই লাগছিল! তখন আমাদের বয়স খুব অল্প, তাই একটুতেই তখন অসীম আনন্দের খোরাক পেতাম। মনে পড়ে, বাবা প্রথম আমাদের কবে সেই জঙ্গলের মধ্যে শিকারীর কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন ? আমি প্রায়ই এখন সেখানে যাই। তখন যেমনটি ছিল এখনো সব ঠিক তেমনই আছে। সেই দীর্ঘ সরল পাইন গাছগুলি আগেকার মত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পায়ের কাছে ঝোপগুলি তেমনি জটলার গোলোকধাঁধা পাকিয়ে আছে, যার মধ্যে একদিন আমরা দুজনে হারিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর বাবা মা যখন অনেক খুঁজে আমাদের বার করলেন, তখন রাগের বদলে কত আনন্দে আমাদের বুকে ক'রে তুলে নিয়ে গেলেন সেই শিকারীর ডেরায়, সেখানে যাতে আমরা একটু বিশ্রাম ক'রে ক্লান্তি দূর করতে পারি। সে সব কথা মনে পড়ে ভাই ? আর মনে পড়ে সেই পাইন বনের মর্মর, যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দুজনে ঘুরে বেড়াতাম। পাইন গাছের কথায় মনে পড়ল—ডালে ডালে জড়ানো সেই ছায়ায়-ঢাকা তিনটে বটগাছের কথা, যাদের তলায় প্রায়ই চলত আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন, আর কখনো কখনো বিকালে মধু আর পাউরুটির জলযোগ। কিছুতেই তোমার পেট আর ভরত না। আর মনে পড়ে, আমি কৃপণের মত আমার ভাগের একটু মধু দিয়ে তোমার কাছ থেকে অনেকগুলি বাদাম আদায় করতাম – বহু কষ্টে যেগুলি তুমি ঝোপঝাপ থেকে সংগ্রহ করে আনতে ? সেই বুনো গাছগুলো আজও ডালপালা মেলে সেইখানটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মধু তেমনিই মিষ্টি, এখনো উপত্যকার ঝোপে ঝোপে তেমনি অঢেল বাদাম। কেবল তুমি নাই এখানে, থাকবে না কোনো দিনও—'

এই পর্যন্ত প'ড়েই সে আবার চিঠিখানা পড়তে সুরু করে গোড়া থেকে। সে হাসি তার চোখে ঠোঁটে কখনো ফিকে হ'য়ে আসে, আবার ফুটে ওঠে শেষের দিকে এসে। বার বার পড়ে সেই অংশগুলি যেখানে স্নেহময়ী বোন মধুময় স্মৃতিগুলি ঢেলে দিয়েছে।

'আর মনে পড়ে আমাদের ছেলেবেলার সেই ছোট্ট ঘরখানি ? চুণকাম করা দেয়ালের মাঝখানে একটিমাত্র জানালা। সেই জানালায় দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম মা বাগানে কত রকমের ওষুধের গাছ-গাছড়া পুঁত্ছেন। তাদের পাতায় ফুলে কি সুন্দর গন্ধ! পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মা'র সুখদুঃখের কত গল্প চলত। তাদের রুগ্ন ছেলেমেয়েদের অসুখ সারত তাঁর টোট্কা ওষুধে। সেই ঘরে আমার ছেলেমেয়ে ষ্টাক্ আর জুল্কা মানুষ হয়েছে। এখন সেটা জুল্কার শোবার ঘর। সেই সাদা দেওয়ালের মাঝে সেই জানালা দিয়ে সেই বাগান চোখে পড়ে। আমি এখন নিজের হাতে সেখানে কত গাছ-গাছড়া পুঁতি। সেদিন চিলেকোঠায় আবিষ্কার করলাম তোমার সেই কাঠের ঘোড়া, যেটা তুমি উপহার পেয়েছিলে এক বড়দিনের পার্বণে। ঘোড়াটিকে আমি এক কোণে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, দেখি ঠিক সেই খানটাতে দাঁড়িয়ে আছে এতকাল। তোমার স্মারকচিহ্ন রইল অচল হয়ে আমাদের কাছে—তুমি চলেছ ভেসে জীবনের স্রোতে—কিন্তু আমাদের এ ঘাটে ত আর—'

চিঠিখানা খসে পড়ল শিথিল হাত থেকে, চোখে উদ্দাম দৃষ্টি, সে কেবল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। চিঠিখানি কুড়িয়ে নিয়ে আবার পড়তে আরম্ভ করল।

—'আর মনে পড়ে আমাদের সেই বুড়ী ঝি কাসেন্কা হলুবোভাকে ? কত মজার গল্প, পাকা পাকা কথা, মেয়েলী ছড়া ফুটত তার মুখে, আর সেই কড়া-পড়া রুক্ষ হাতে চলত চিরুণির টান আমাদের উস্কোখুস্কো চুলে, আর সযত্ন প্রসাধনের প্রয়াস আমাদের বিদ্রোহী দেহে। চাষার মেয়ে সে, কিন্তু তার প্রাণটা ছিল খাঁটি সোনার, আমাদের কি ভালই বাসত! আমার স্টাক আর জুল্কা ওর কোলেই ত মানুষ হয়েছে। সারাজীবন সে কাটিয়েছে আমাদের বাড়ীতে সেই ছোট্ট কুঠুরিতে, যেখানে শীতকালে জমা থাকত রাশীকৃত আপেল—আর ঠিক যার জান্লার পাশেই বার্চগাছের জটলা। কিন্তু নিশ্চয়ই জানো না যে, সে

আর ইহলোকে নেই। গত বছরে তার মৃত্যু হল। মরবার কয়েক মিনিট আগে—তখন নাভিশ্বাস উঠেছে—তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে।—'ভ্লাদিয়ার চিঠি পেয়েছ? সে ত আমাদের ছেড়ে চলে গেছে—ভগবান তার মঙ্গল করুন!' আমাদের দেবদারুকুঞ্জের তলে ওকে কবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি ত চিরমমতাময়ী হলুবোভার কবর কখনো দেখবে না!—'

আবার চিঠিখানা হাঁটুর উপর রেখে সে আনমনা হয়। ওকে ক্লাবে অথবা রঙ্গালয়ে যারা দেখেছে তারা এখন দেখলে অবাক হয়ে যেতো। ঘাড় নীচু ক'রে বুকে মাথা গুঁজে ব'সে আছে। চোখে উদাস ঘোলাটে অপলক দৃষ্টি, কপালে মুখে অসংখ্য রেখা, হঠাৎ যেন বুড়ো হয়ে গেছে—

কিছুক্ষণ পরে, পত্রখানি শেষ না করেই বসলে সে চিঠি লিখতে। 'আনুস্কা, বোন আমার, সবই গিয়েছিলুম ভুলে, আবার মনে জেগে উঠল সব। মানুষ এক অদ্ভুত জীব, সে চেনে না নিজেকে। এখন মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি আত্মপরিচয়। যখন উধাও হয়ে ছুটেছিলাম জীবনের পথে তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল সিদ্ধিলাভ, এটার পর ওটা, তারপর সেটা। যখন কৃতকার্য হলাম—হায়, আমাদের জীবন একটা বিপুল কৌতুক! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কেবল ছুটে চলি পাগলের মত, যখন পৌঁছলে গন্তব্যে, দেখবে মুঠোর মধ্যে রয়েছে কেবল শূন্য!

'যদি কাউকে এ সময় কাছে পেতাম তা হলে শূন্যটা এত ফাঁকা লাগত না, হয়ত আনন্দই পেতাম। কিন্তু আজ আমি একা, তাই সব গেছে উবে, কেবল রয়েছে বিশ্বব্যাপী একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা চারিদিক ঘিরে। তোমার মুখে এই ভ্লাদিয়া ডাকটি কি মধুর লাগছে! চোখ-জুড়ানো তোমার এই ভ্লাদিয়া এখন, পিপের মত মোটা, বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো, তবু সেই ভ্লাদিয়াই বটে! আজ বিশ বছর উচ্চারণ করিনি আমার মাতৃভাষা, যে ভাষায় মা বাবা কথা কইতেন। এতদিন আমি ছিলাম বিদেশী—আজ পর্যন্ত। আবার পেলাম আমাকে। আশ্চর্য! যখন ছোট ছিলাম সব ছিল আমার চোখে সুন্দর, ছিল না কোনো ইতরবিশেষ। আর আজ? রক্তের স্রোতে পড়েছে ভাঁটা, সেই সঙ্গে সব গেছে বদলে। আনুস্কা, তুমি কি জান যে, আমার চেয়ে কত সুখী তুমি? তোমার সব আছে—স্টাক, জুলুখা, সম্পত্তি, পাইনের বন, সাদা দেয়াল-ঘেরা ঘর, মাঠ জঙ্গল, চাষীদের বউ, তাদের ছেলেপিলে—ঠিক বলেছ, মধুময় সেই বনের মর্মর, বাগানের সেই গাছপালার প্রাণ-মাতানো সৌরভ, তার তুলনা নেই কোথাও। আচ্ছা, সেই আগেকার মত একধামা বাদাম পেটে তলায়? হিজলের ঝাড় তোমার হাতে এখনো নির্বংশ হয় নি? আমাদের সেই কুকুর 'বার্কে'র খবর কি? বনভূমি পাইনবীথি কাঠের ঘোড়া আর ধাই-মা হলুবোভার সমাধিকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ো। কিম্বা, কি ভাবছি বুঝতে পারছ? আমি ফিরব আবার দেশে তোমাদের কাছে। কাজের হিড়িকে এক্ষুণি যাওয়া সম্ভব হবে না। গ্রীষ্মের সময় যাবো, যদি ভগবান কৃপা করেন। দূর হোক গে, এখুনি ঠিক ক'রে ফেলি না কেন? এক বৎসর—কি দুবৎসরের মধ্যে, এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চিরদিনের মত ফিরব তোমার কাছে, আর—আর গ্রামের সকলের কাছে।

টপ্ ক'রে বড় এক ফোঁটা জল পড়ল ঠিক পূরের কথাটির উপর, সেটা অশ্রুতে [illegible] অস্পষ্ট হয়ে গেল। *

* পোলিশ [illegible] ইংরেজী অনুবাদ—Do You Remember হইতে।



প্যাপ্‌ওআর্থ

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

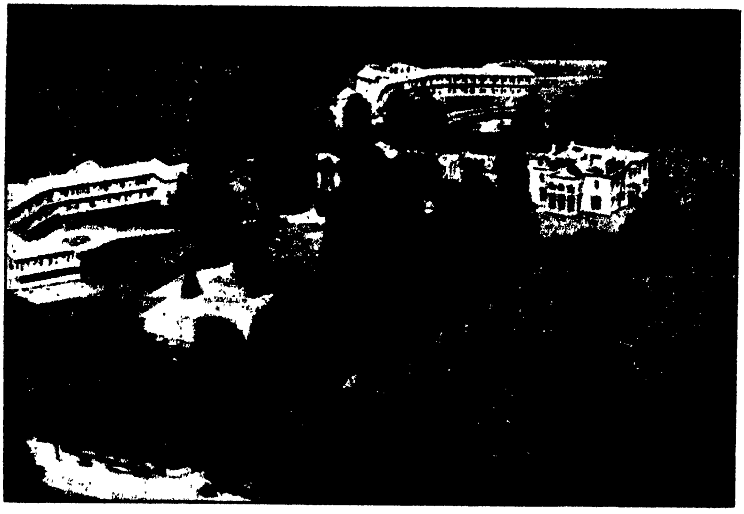
অল্পকাল হ'ল ইংল্যাণ্ডে একজন মহান ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এই ব্যক্তির নাম—সার পেন্‌ড্রিল ভেরিয়ার জোন্‌স্ (Sir Pendrill Varrier Jones)। জনৈক লেখক এঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে ইনি ছিলেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

যাঁরা পীড়িত, আর্ত্ত, দুর্গতজনেদের কল্যাণকামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের সহস্র মূঢ়তার মাঝখানে, সহস্র বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজেদের কর্ম ও চিন্তাধারাকে এক অভিনব পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হন, কেবল সচেষ্ট হওয়া নয়—তাঁদের মহান স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে অবলম্বন করেন এক জীবনব্যাপী সাধনা—নিজেদিগকে এক নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে—তাঁরা যে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? ইয়োরোপেও এমন দিন গিয়েছে যখন কোনো টি. বি. রোগীকে পথে চলতে দেখলে লোকে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারত। না ছিল তার আশ্রয়, না হত তার চিকিৎসা, না ছিল তার ভবিষ্যৎ। শিয়াল-কুকুরের সঙ্গেই বোধ হয় তার তুলনা হত।

তারপরে অবশ্য ওদেশে বহু পরিবর্তনই ঘটে গেছে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, সমাজে, টি. বি. রোগীর প্রতি মনোভাবে এবং আরও অনেক কিছুতে। উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অসংখ্য টি. বি. রোগীকে সুস্থ ক'রে তোলা সম্ভব হল, টি. বি. রোগে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা যুগান্তরের সৃষ্টি করল।

টি. বি-র চিকিৎসার ক্রমবিবর্তনের বিচিত্র ইতিহাস আজ আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ইংল্যাণ্ডে কেম্‌ব্রিজের কাছে প্যাপ্‌ওআর্থ (Papworth) নামক স্থানে টি. বি রোগীদের জন্যে গড়ে-ওঠা এক অপূর্ব প্রতিষ্ঠান দ্বারা—যে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করবার সূত্রপাত করেছিলেন পেনড্রিল ভেরিয়ার জোন্‌স্ তাঁর আর দু-একজন সহকর্মী সহ ছাব্বিশ বছর আগে এবং যে প্রতিষ্ঠানটি তাঁর বিরাট প্রতিভা এবং কর্মশক্তির ভিতর দিয়ে বিস্ময়কর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজ দাঁড়িয়েছে বিশ্ব-বিখ্যাত হয়েই।

কিন্তু কোন্ বিশেষত্ব প্যাপ্‌ওআর্থকে আজ করেছে বিশ্ববিখ্যাত? কেমন ক'রে প্যাপওআর্থ টি.বি-র আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির ভিতর এনে দিল এক নতুন আলোর সন্ধান? কোন্ দিক থেকে প্যাপ্‌ওআর্থের মত প্রতিষ্ঠান অগ্রদূতের মত? ঠিক কাজ কেমন ক'রে করতে হয় এবং ঠিকভাবে কেমন ক'রে কাজ করতে হয়, প্যাপওআর্থে সেইটে দেখবার জন্যে আজ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে আসছে লোক। প্যাপ্‌ওআর্থের স্বাতন্ত্র্য কোন্‌খানে?



আকাশ হইতে প্যাপ্‌ওয়ার্থ বিশ্রাম-নগরের দৃশ্য

টি. বি. রোগীকে চিকিৎসার জন্যে যতদিন পর্যন্ত স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে রাখা হয়, খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ততদিনের ভিতর টি.বি. রোগীর আরোগ্যলাভ সম্পূর্ণ হয় না। সাধারণত অসুখের অগ্রগতিকে রুদ্ধ ক'রে রোগীকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থায় যখন স্যানাটোরিয়াম

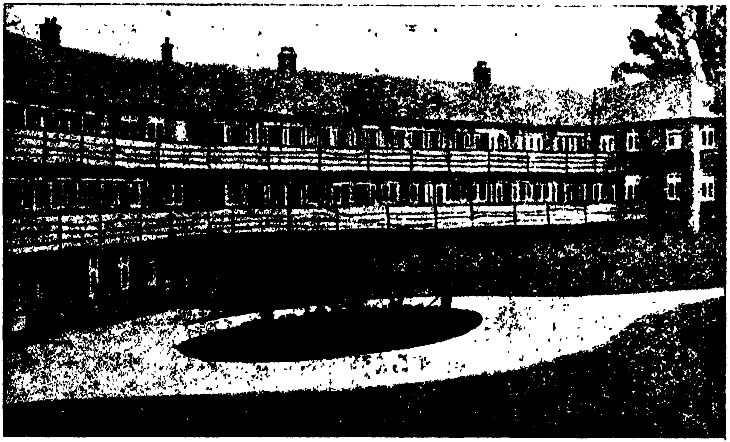
বা হাসপাতাল ত্যাগ করতে বলা হয়, তারপরেও তাকে দীর্ঘকালের জন্যে দরকার হয় এক অতি সতর্ক জীবন যাপন করবার। কিন্তু সুদীর্ঘকাল অসুস্থতা ভোগের পরে স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে কখনও সমাজের অবিচারে, কখনও আপন অবস্থা বিপর্যয়ে, কখনও প্রলোভনে পড়ে অনেক রোগীর পক্ষেই—যে সব নিয়ম চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী পালন করে চললে তারা নিজেদিগকে সুস্থ রাখতে পারত—সেই নিয়মগুলি মেনে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বস্তুত স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা রোগীকে কেবল একটা সাম্যের অবস্থায় এনে পৌছে দেয় এবং স্যানাটোরিয়াম থেকে মুক্তিলাভ করে বহু রোগীই জীবন-যাত্রা নির্বাহের নানা জটিল সমস্যার মাঝখানে আপনাদিগকে দাঁড় করাতে গিয়ে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যায়াম, নিয়ম-মত আহার-বিহার ও শয়ন, মুক্ত বায়ু, মানসিক প্রফুল্লতা, উপযুক্ত চিকিৎসক ও চিকিৎসা—প্রভৃতিই স্যানাটোরিয়ামে রোগীর উন্নতির পক্ষে হয় সহায়ক এবং স্যানাটোরিয়াম থেকে বাইরের জগতে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে যদি রোগীর পক্ষে এগুলির অভাব ঘটে, তা হলে সে তখনও পরিপূর্ণরূপে সুস্থ এবং সবল নয় বলে, (যদিও কোনও উপসর্গ তার আর নাই, থুতু সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত, বাইরের চেহারাও বেশ ভাল)—তার ব্যাধির অবিলম্বে বা বিলম্বে ঘটে পুনরাবির্ভাব। বহু যত্নে, বহু অর্থব্যয়ে, বহু সাধনায় বেশ খানিকটা ভাল হয়ে আসা অবস্থা থেকে রোগীকে যদি পুনরায় পীড়া-কাতর হতে হয় তবে তা তার নিজের দিক থেকে, পরিবারের দিক থেকে, সমাজের দিক থেকে—সব রকমেই যে অতি শোচনীয় ব্যাপার হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

যাঁরা প্যাপ্‌ওআর্থের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যাঁরা এর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, তাঁদের মত হচ্ছে এই যে, স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা দ্বারা রোগীকে সুস্থ ক'রে তারপরে যদি তার সেই সুস্থতাটাকে উত্তমরূপে রক্ষা করবার সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত না করা যায় এবং তার অর্থোপার্জন ক্ষমতাকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ অবস্থায় যথাসত্বর তাকে একটা স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না দেওয়া যায়, তবে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা এবং তার পিছনে সমস্ত অর্থব্যয় শুধু প্রকাণ্ড একটা ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হবে।

"তার অর্থোপার্জন ক্ষমতাকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ অবস্থায় যথাসত্বর তাকে একটা স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে" দেবার ব্যাপারটা এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। বস্তুত সব রকম চিকিৎসারই আসল উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? একখানা এক্স্‌-রে ফটো ভাল ক'রে তুলতে পারলেই অথবা একখানা ফটোর সঙ্গে আর একখানা ফটো মিলিয়ে একটা মতামত প্রকাশ করতে পারলেই কি সব হয়ে গেল? সার পেন্‌ড্রিল দুঃখ করে বলেছেন, টি.বি. রোগীর ভবিষ্যৎ-জীবনের সমস্ত সমস্যাকে এড়িয়ে, আসল মানুষটাকেই উপেক্ষা করে, প্রত্যেক মেডিকেল কংগ্রেসে, অথবা চিকিৎসক ও ছাত্রদের ভিতরে, কেবল শরীর-তত্ত্ব, জীবাণু-তত্ত্ব, নিদান-তত্ত্ব এবং অন্যান্য আরও নানা তত্ত্ব আলোচনারই প্রবণতা সর্বদা দেখা যায় এবং এমন সব বিষয় নিয়ে বক্তৃতা চলে যা আগে থাকতেই তাদের অধিকাংশেরই ভালভাবে বোঝা আছে। এটা সবাই ভুলে যায় যে, রোগীর মানসিক বিপর্যয়গুলির প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু তার শরীরটাকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি—সমস্ত চিকিৎসা-টাকে বহু সময়ে শুধু ব্যর্থতা দ্বারাই কলঙ্কিত করে তোলে।

অসুস্থ বুককে জোড়া-তাড়া দিয়ে রোগীকে হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম থেকে বিদায় দেওয়া হ'ল হয়ত। সে করতে সুরু করল তার আগেকার কাজ—হয়ত অতি কঠিন কাজ এবং প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ পরিশ্রমের কাজ। অসম্পূর্ণরূপে সুস্থ অবস্থায় কতদিন তার শরীর এই অত্যাচার সহ্য করতে পারবে? অথচ কাজ না ক'রে হয়ত তার উপায় নাই। পরিবার প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব এই সময় এসে পড়তে পারে তার উপর, অথবা তার নিজের ব্যবস্থাও নির্ভর করতে পারে তার নিজেরই পরিশ্রমের উপর—অথচ ঘটনাচক্রে সে সব অনিয়মিত এবং গুরু পরিশ্রম তার ভাল থাকবার পক্ষে অনুকূল না হওয়াই সম্ভব। অনেক রোগীকেই হয়ত বলে দেওয়া হয় কোন একটা হালকা কাজ নিয়ে থাকবার জন্যে; কাজের স্থানটিও যেন খোলা আলো-বাতাসে হয়—ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু সেই 'হালকা' কাজের নামটি কি? কয়টি সেই ধরণের 'হালকা' কাজ যত্রতত্র সুলভ? কয়টি কাজের স্থান খোলা আলো-বাতাসযুক্ত? এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে তাতে উপার্জনই বা কি হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা চিকিৎসকের নাই।

অনেক রোগীর পক্ষে তার পূর্বেকার কাজ চিকিৎসা-অন্তে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হলেও মনিব হয়ত তাকে পুনরায় কাজে বহাল করতে ইচ্ছুক না হতে পারেন। এই ব্যাধি সম্বন্ধেও তাঁর খুঁতখুঁতি থাকতে পারে (আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীটি হতে সংক্রমণের সম্ভাবনা কিছুমাত্র না থাকলেও), অথবা অসুস্থ লোকের চাইতে স্বাস্থ্যবান, সবল একজন লোককে নিয়োগ করলে তিনি আরও ভাল কাজ পাবেন এই ধারণারও বশবর্তী তিনি হতে পারেন। হতভাগ্য রোগীর কাজটি হয়ত ঠিকই গেল। তখন তার দুশ্চিন্তা এবং স্নায়বিক বিপর্যয় কি পরিমাণ ঘটতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়। পেট-চালানর জন্যে অর্থোপার্জনের প্রয়োজনের দিকটা ছাড়াও এখানে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। নিয়মিত একটা কাজের ভিতর না থাকলে শারীরিক ক্রিয়ার কতকগুলি অবনতি পরিলক্ষিত হয়—এবং সেটা সাধারণ ভাবে সকলের বেলায় যেমন, আরোগ্যপ্রাপ্ত যক্ষ্মা-রোগীর বেলাতেও তেমন। যে সব রোগী বেশ একটা নিয়মের ভিতর দিয়ে শারীরিক শ্রমঘটিত কাজ আরম্ভ ক'রে চলতে থাকে তারা শীগ্‌গীরই বুঝতে পারে যে, তাদের দৈহিক বল আস্তে আস্তে কেমন বেশ ফিরে আসছে এবং তাদের এই বুঝতে পারাটার সঙ্গে থাকে আর একটি মনোরম চেতনা—যা নাকি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে একটা নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে এবং দৈনিক কর্মপদ্ধতির ভিতরে শরীরকে থাপ খাইয়ে নেবার সঙ্গে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রোগীর উপর এই রকমের দৈনিক কর্মপদ্ধতি একটা বিশেষ রকম অনুকূল নৈতিক এবং মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বস্তুত নিজেকে সুস্থ ক'রে তুলবার পথে নানা রকম উদ্বেগ ও হতাশা নিয়ে নিষ্কর্মা অবস্থায় থাকবার অবস্থাটা রোগীর পক্ষে এমন একটা সময় আসে যে-সময়টাতে একেবারেই সুফলপ্রদ নয়।



পুরুষদের জন্য বার্ণহার্ড ব্যারজ স্মৃতি-হাসপাতাল—পূর্ব্বদিকের গৃহ

তারপরে রোগীর জীবনের আর একটি দিকও তো উপেক্ষণীয় নয়! আমোদ-প্রমোদও তার দরকার, যে কোন স্বাভাবিক লোকের মত (আরোগ্যপ্রাপ্ত যক্ষ্মা-রোগীকে 'অস্বাভাবিক' ভাববারও কোনই হেতু নাই) প্রেম, পিতৃত্ব, মাতৃত্বও তার কাম্য! বিবাহের এবং বিবাহিত জীবনযাপনে (আরোগ্য লাভ সত্বেও) টি. বি. রোগী অনধিকারী, তার জন্যে বংশানুক্রমে তার সন্তানও এই ব্যাধিগ্রস্ত হবে—এসব তত্ত্বে গিয়েছে মরচে ধরে। তত্ত্বে মরচে ধরেছে, অথচ সুব্যবস্থা কিছুই হয়নি তাদের জন্যে এবং সমাজও আপন মূর্খতা নিয়ে আস্ফালন করেই চলেছে।

এই দিক থেকে প্যাপ্‌ওআর্থে যক্ষ্মা রোগীদের জন্যে যে অপূর্ব প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে, কার্য্যকলাপে তার বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। প্যাপওআর্থের কাজকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) প্রথমেই রোগীর অসুখের চিকিৎসা। অন্যান্য সব রকম চিকিৎসার সঙ্গে আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসাদির সব সুব্যবস্থাই যোগ্য চিকিৎসকের হাতে রয়েছে। ল্যাবরেটরি, সুসজ্জিত গবেষণাগার, চোখ, দাঁত, কান, নাক, গলা প্রভৃতির চিকিৎসার জন্যে বিভিন্ন বিভাগ, এক্স-রে বিভাগ—ইত্যাদি সবই রয়েছে। (২) চিকিৎসা দ্বারা রোগী ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে, সে যতটুকু এবং যেরকম কাজের উপযুক্ত তাকে ততটুকু এবং সেই রকম কাজ দেওয়া অথবা তাকে নতুন কাজে শিক্ষিত করে তোলা।

(৩) ক্রমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অধিকতর পরিশ্রমের কাজ দিয়ে আদর্শ পারিপার্শ্বিকের ভিতরে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা। (৪) অবিবাহিত রোগীদের ক্লাব-ঘর-জাতীয় বাড়ীতে এবং বিবাহিত রোগীদের বাংলো ধরণের বাড়ীতে সুব্যবস্থার সঙ্গে রাখা। (প্রথম দিককার চিকিৎসা শেষ হবার পরে বিবাহিত রোগীকে যখন বাংলো দেওয়া হ'ল তখন তার পরিবারের লোকেরা এসে অবস্থান করতে পারে তার সঙ্গে; সর্ব বিষয়ে অনুকূল আবহাওয়ার ভিতরে তার জীবন তখন সাধারণ সাংসারিক জীবনেরই মত)। (৫) প্রত্যেকটি রোগীকে প্রত্যেক সময়ের জন্যে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা তত্বাবধান।

বস্তুত রোগী এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার পরে প্রথমে তাকে উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ ক'রে তারপরে তাকে ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত কটেজ বা হস্টেলে যোগ্য চিকিৎসকের নিয়মিত তত্বাবধানে রেখে প্রতিষ্ঠানটির আপিস, ফ্যাক্‌টরি এবং অন্যান্য বহু রকম শিল্প-বিভাগে তাকে নানা রকম শিক্ষা দিয়ে, তাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করে অর্থোপার্জন এবং ক্রমোন্নতি দ্বারা তার নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে প্রতিপালনের সুযোগ দিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে তাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠান-সংলগ্ন উপনিবেশে (প্যাপ্‌ওয়ার্থের সঙ্গে যার নামকরণ হয়েছে 'ভিলেজ সেট্‌ল্‌মেণ্ট' বলে) রাখবার ব্যবস্থা ক'রে এবং তাকে স্বামী বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিয়ে আনন্দময় পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন-যাপনে সহায়তা ক'রে প্যাপওয়ার্থ যে আদর্শ স্থাপন করেছে তা তুলনা-বিহীন।

স্যার পেন্‌ড্রিল এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যে সহানুভূতি এবং সুবিচার বাইরের জগতের নিয়োগ-কর্তাদের কাছ থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত যক্ষ্মা রোগীদের জন্যে পাওয়া গেল না, সেই সহানুভূতি এবং সুবিচারই রোগীদিগকে দেবার চেষ্টা হয়েছে প্যাপওয়ার্থে। এখানে "সখের কাজ" কিছু নাই; রোগীরা সময়টাকে শুধু কোনমতে কাটাবে—টুকরো-টাকরা এটা-ওটা বাজে কাজ বা ব্যাপার নিয়ে, প্যাপওয়ার্থের ব্যবস্থা সেরকম নয়। বাইরের জগতের যন্ত্রশিল্পগুলি যতখানি আধুনিক এবং উন্নত ধরণের, তার বিভিন্ন বিভাগগুলি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে, আমদানি করা কাঁচা মাল থেকে তৈরি জিনিস যেভাবে বিক্রীর জন্যে খাঁটি ব্যবসায়ের রীতিতে নানা স্থানে প্রেরণ করা হচ্ছে, প্যাপওয়ার্থের ব্যাপার অবিকল তাই। রোগীদের ভিতরে যে যে-বিষয়ে সুদক্ষ—তাকে সেইদিকে নিযুক্ত করা হচ্ছে, উপযুক্ত বেতন-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গুণ এবং ক্ষমতা অনুযায়ী কাজে তার "প্রোমোসান" হচ্ছে, আপিস, ফ্যাক্‌টরি, কল-কব্জা, কার্য-পরিচালনা প্রভৃতি অদ্ভুত শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলেছে। যে কাজে যে কুশলতা দেখাতে পারে তাকে ঠিক সেই কাজেই নিযুক্ত করবার দরুণ কোন রোগীর ভিতরেই স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটেনা—তা সে রোগী ছুতোর হোক, মিস্ত্রী হোক, বই বাঁধাই বা ছাপাখানার লোক হোক, স্থাপত্য শিল্পী হোক, চামড়ার নানা-দ্রব্য তৈয়ারকারী হোক, রাজমিস্ত্রী হোক, কেরাণী বা টাইপিস্ট হোক, অথবা অন্যান্য বহু প্রকার কৃষি বা শিল্পের যে কোনটির অনুরাগী হোক। নানা কাজের জন্যে প্যাপওয়ার্থে বহু রকম বিভাগই স্থাপিত করা হয়েছে এবং ঠিক বাইরের জগতের শিল্প-বাণিজ্যনীতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে প্যাপওয়ার্থে উৎপন্ন দ্রব্যের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্যাপওয়ার্থে নার্স-রোগীদের জন্যে যে সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে তা দেখবার মত। তাদের চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ ক'রে প্রত্যহ ছ-সাত ঘণ্টা ক'রে কাজের উপযুক্ত করা হচ্ছে। তাদের জন্যে বিরাট হস্টেল হয়েছে তৈরি, প্রত্যেক নার্সকে দেওয়া হয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে অতি আধুনিক ব্যবস্থায় সুসজ্জিত বসবার এবং শোবার ঘর—তাছাড়া খাবার এবং ক্রীড়াদির ঘর তো আছেই। অতি সুন্দর পারিপার্শ্বিকের ভিতরে রেখেই যে শুধু তাদের কর্মক্ষমতাকে ফিরিয়ে এনে তাদের স্বাস্থ্যের তত্বাবধান করা হচ্ছে তাই নয়, তাদের সব রকমে সেই সব স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে—ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক ইংরেজ নরনারীর যে স্বাধীনতা একান্তরূপে কাম্য।

প্যাপ্‌ওয়ার্থে কোন রোগী মনে ভয় রেখে কাজ করে না—কারণ সবাই জানে যে, সাধ্যের অতিরিক্ত ভাবে তাদের খাটান হবে না এবং সামান্য কোন শারীরিক উপদ্রব দেখা দিলেই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও রোগীদের জন্যে প্রচুর এবং সবই চলেছে অতি

সুসম্বদ্ধ ভাবে। রেডিয়ো, সিনেমা, বিলিয়ার্ড, লীগ-ম্যাচ, উদ্যান-কৃষি সমিতির সভা, আর্ট-ক্লাশ, নানা রকমের ক্রীড়া-কৌতুক, নাচ, পিয়ানো, কন্‌সার্ট, কৌতুক-নাট্যের রিহার্সাল, বাইরের শিল্পীদের এনে নানা রকম জলসা—ইত্যাদি—কিছুরই ক্রটি নাই। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসা, কাজ এবং নানা রকম আনন্দের ভিতর দিয়ে অসীম কৃত-কার্যতার সঙ্গে টি. বি. রোগীদের সম্পূর্ণরূপে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ক'রে তোলবার এই বিরাট আয়োজন, এই ক্রটিহীন শৃঙ্খলা-পূর্ণ প্রচেষ্টা যক্ষ্মা রোগীদের কাছে যে এক নব-যুগেরই সূচনা করেছে তাতে সন্দেহ নাই। এর পরিকল্পনা যাঁদের, যাঁরা এর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় সমস্ত জাতির মাথা অবনত করবারই কথা।

ইংল্যাণ্ডে প্যাপওআর্থের আদর্শে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান ("After-Care Colony") স্থাপিত হয়েছে—একটি এন্‌হাম্‌-এ এবং আর একটি মেড্‌-স্টোন-এর নিকট প্রেস্টন হল্‌-এ। কিন্তু এ দুটিই অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের জন্যে। এ-ছাড়া আর একটি আছে—"বারো-হিল স্যানাটোরিয়াম কলোনি" (Frimley, Surrey)—অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক তরুণ রোগীদের জন্যে।

আজ আমাদের দেশে যক্ষ্মা রোগ গুরুতর সমস্যার আকারেই দেখা দিয়েছে এবং প্যাপওআর্থের মত প্রতিষ্ঠানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু যে দেশে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার প্রথম স্তরই এখন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে নানা অসম্পূর্ণতায় পরিপূর্ণ, যে দেশে টি. বি. রোগের প্রথম দিককার উপযুক্ত চিকিৎসাই অতি সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অতি নগণ্য কয়েকটি লোকের জন্য সীমাবদ্ধ, সে দেশের চিকিৎসকবৃন্দ, সমাজসেবী এবং রাজনীতিকদের আন্তরিকতা, চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতা, কর্মক্ষমতা, সহৃদয়তা ও কল্পনার প্রসার সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়; যে দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং কুশিক্ষা হিমালয়ের মতনই বিরাট, সে দেশে "প্যাপ্‌ওআর্থ" এখনও সুদূর-পরাহত।



মহিলাদের জন্য প্রিন্সেস হাসপাতাল

ইয়োরোপে আজ রণ-দামামা উঠেছে বেজে, এই সংগ্রামের শেষ ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এখনও বলতে পারে না কেউ। কামানে আর বোমায় নানা যুগের শ্রেষ্ঠ মানবগণের বহু কীর্তিই হয়ত যাবে ধূলিসাৎ হয়ে; সহসা যদি এই সময়ের অপ্রতিহত গতির মুখে প্যাপওআর্থের মত প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতের ইতিহাসে বর্তমান যুগের এক কলঙ্কময় অধ্যায়ে তার কথা বর্ণিত থাকবে।



ক্ষুধা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সেদিন সকালে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। হরিবল্লভ গুহ একটি বন্ধুকে সী-অফ্ করিতে আসিয়াছিলেন, লাহোর-কলিকাতা ডাকগাড়ীটা সেই সময়ে আসিয়া পড়িল। প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে যে সুদর্শন যুবাপুরুষটি নামিলেন, হরিবল্লভ তাঁহার পাইপসংলগ্ন মুখের পানে মিনিটখানেক অভদ্রভাবে চাহিয়া থাকিয়াই হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, পরিতোষ, না?

মাষ্টার মশাই, বলিয়া যুবক পাইপটি সরাইয়া যেন অতি কষ্টে খানিকটা নত হইবার চেষ্টা করিতেই হরিবল্লভ বলিয়া উঠিলেন, থাক্ বাবা থাক্, হয়েছে।

আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন কিন্তু, বলিয়া পরিতোষ হাসিল।

বয়স ত বাড়ছে, বাবা! তা এখানে? বেড়াতে নাকি?

পরিতোষ হাসিয়া বলিল, চাকুরী কুকুরীবৃত্তি, বেড়ায় দেশে দেশে। এ আপনারই কথা। তা আপনারও তাই বোধ হয়।

হ্যাঁ। কোথায় থাক্‌বে ঠিক করেছ বাবা?

কিছুই ঠিক করি নি, টেলিগ্রাফে বদলী হয়ে আসতে হয়েছে। চার ঘণ্টার মধ্যে—

তাতে আর কি হয়েছে! চলো, আমার বাড়ীতেই চলো বাবা। পরে বাসা টাসা ঠিক হলে—

মন্দ কি, চলুন।

ইত্যবসরে পরিতোষের বয়, বেহারা প্রভৃতি তাঁহার বিছানা ও সুটকেশ, টুপির বাক্স, গল্‌ফের সরঞ্জাম ইত্যাদি লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া হরিবল্লভ বলিলেন—চল, বাবা চলো। তোমার বাবা ভাই বোনেরা—

বাবা অনেকদিন গত হয়েছেন মাষ্টার মশাই। মা ত ছেলেবেলাতেই—সে ত আপনি জানেন। পরিমল কলকাতাতেই আছে, হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। কাবেরী তার স্বামীর সঙ্গে বিলেত বেড়াতে গেছল, যুদ্ধের জন্যে আটক পড়েছে, মাস দুই কোন খবরও পাওয়া যায় নি। নর্ম্মদা আর সিন্ধু তাদের স্বামীর সঙ্গে দেশেই থাকে।

বলিতে বলিতে সকলে প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। হরিবল্লভের টাঙা ছিল, সেটাকে বিদায় দিয়া একখানা মোটর ভাড়া করা হইল। গাড়ীতে বসিয়া পরিতোষ বলিল, আপনি এখানে কতদিন আছেন, মাষ্টার মশাই?

তা বছর দশেক হবে বই কি! হ্যাঁ, তা হবে। তার আগে লক্ষ্ণৌয়ে ছিলাম। তুমি এখন কোথা থেকে আসছ পরিতোষ?

লাহোর থেকে। আর বলেন কেন, কাল সকাল ৯টায় টেলিগ্রাম পেলুম, বেলা দশটার সময়ই রওনা হতে হলো। জিনিষপত্তর, গাড়ী ফাড়ী সব সেখানে পড়ে। আগ্রায় ত দেখছি ঠাণ্ডা একটুও পড়ে নি। লাহোরে এরই মধ্যে খুব শীত। থামিয়া পরিতোষ একটু কুণ্ঠার সহিত বলিল, এ সবে মাষ্টার মশাই কিছু মনে করছেন না ত? বলিয়া সে পাইপটা দেখাইল।

হরিবল্লভ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, না, মনে করবো কেন, মনে করবো কেন! তুমি খাও না বাবা।

পরিতোষ পাইপটার তামাক টিপিয়া দেশলাই জ্বালিয়া টানিতে টানিতে বলিল, অনেক কাল পরে দেখা, প্রায় কুড়ি বছর।

হ্যাঁ, তা হবে বৈকি! বি-এ পাশ করার পর আর ত দেখা হয় নি! তবে শুনেছিলাম, তুমি বিলেত গেছ। কতদিন ছিলে সেখানে?

পাঁচ বছর। সেই সময়ের মধ্যেই বাবা মারা গেলেন।

পরিতোষ একটু পরে প্রশ্ন করিল, প্রোফেসারী ছাড়লেন কেন মাষ্টার মশাই?

লাষ্ট ওয়ারের সময় এটা পেয়ে গেলুম।

আপনার মেয়ে কোথায়? তার নামটা কি যেন—মাধুরী,—না? তার মা—

মনে আছে! বলিয়া হরিবল্লভ হাসিলেন। বলিলেন, বারাসাতে তার বিয়ে হয়েছে, সেইখানেই আছে, তার স্বামী

উকিল। তিনি যেন আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, থামিয়া গেলেন।

পাইপ নিবিয়া গিয়াছিল। পুনরায় ঝাড়িয়া, খোঁচাইয়া, টিপিয়া দেশলাই জ্বালিতে হইল। হরিবল্লভ বলিলেন, কোন্ আফিস বললে তোমার?

ইণ্ডিয়ান আরমি আফিস, বলিয়া সে খুব জোরে জোরে পাইপ টানিতে লাগিল। আগুন নিব-নিব হইয়া আসিয়াছিল। পাইপ এক অধর্ম্ম। বহু চেষ্টায় ধোঁয়া বাহির করিয়া বলিল—হঠাৎ কণ্ট্রোলারের অসুখ হয়ে পড়েছে—

হরিবল্লভের চক্ষু কপালে উঠিতেছিল; বলিলেন, তুমি কি তবে মালকাহি সাহেবের জায়গায় কণ্ট্রোলার হয়ে এসেছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বটে! আবার পাইপে খুব জোর জোর টান দিতে হইল।

হরিবল্লভ শুষ্ককণ্ঠ সরস করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, আমিও যে ঐখানে কাজ করি। অবিশ্যি কেরাণি মাত্র!

তাই নাকি! আবার সেই অধর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতে হইল। বোধ করি অসাধ্য অধর্ম্ম ভাবিয়া পাইপটাকে পকেটে ভরিয়া পরিতোষ সিগরেটের কৌটা বাহির করিল।

হরিবল্লভ ড্রাইভারকে পথটা বাৎলাইয়া দিলেন, তারপর পরিতোষকে কহিলেন, তা হ'লে আমার বাড়ীতে ওঠাটা কি—কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

পরিতোষ সিগরেট ধরাইয়া মুহূর্ত্তখানেক ভাবিয়া লইয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল, তাতে আর কি হয়েছে।

গাড়ী ফটকে ঢুকিল। বেশ বাড়ীখানি, বাগানটি আরও বেশ। সাজানো, গুছানো, পরিপাটি। হরিবল্লভ মাহিনাটা ভাল পান এবং খরচ করিতে জানেন, অতিথি তাহা এক দণ্ডেই বুঝিলেন। চা ইত্যাদির দ্বারা অতিথি সেবার প্রথম পর্ব্ব উদ্‌যাপিত হইলে হরিবল্লভ মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, তুমি বসে বিশ্রাম করো, কাগজ টাগজ দেখো, বাবা, আমি স্নান করি গে।

হ্যাঁ যান, বলিয়া পরিতোষ পাইপ সংস্কারে মন দিল।

হরিবল্লভ একটুখানি ইতস্তত করিয়া বলিলেন, তুমি ক'টায় বেরুবে?

দেখি কোনটা হ'টা।

তা হ'লে নিজে দেখে শুনে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব আপনাকে ভাবতে হবে না। গুরুপত্নী আছেন ত! সে সব ঠিক হয়ে যাবে।—গুরুপত্নী সেকালে তাহাকে খুব ভালবাসিতেন, আদরযত্ন করিতেন, পরিতোষ তাহা ভুলে নাই। তিনি যে এখনো কেন অন্তরালে রহিলেন, পরিতোষ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল।

হরিবল্লভ সঙ্কোচটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, মাধুরীর মা মারা গেছেন।

পরিতোষ নিঃশব্দে ব্যথিত চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিল।

হরিবল্লভ স্বর খুব খাটো ও কুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন, বছর দুই পরে লক্ষ্ণৌ থাকতে আবার বিয়ে করেছি।

ও আচ্ছা, সে হবে'খন, আমি ঠিক ভাব করে নেবো।

হরিবল্লভ আর কিছু না বলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। আহারাদি শেষ করিয়া আফিসে বাহির হইবার সময়ে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়ামুখস্থ করার মত বলিলেন, তা হ'লে পরিতোষ, বাবা নিজের বাড়ী মনে করে—

আচ্ছা আচ্ছা, বলিয়া পরিতোষ তাঁহাকে থামাইয়া দিল। হরিবল্লভের মুখটা বেশ প্রসন্ন নয় বলিয়াই মনে হয়। কি জানি কারণটা কি! বোধ হয় ছাত্র মনিব হইয়া মাথার উপরে বসিয়াছে ইহা মনে করিয়াই মেজাজ অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল; অথবা বৃদ্ধ বয়সে দার পরিগ্রহের বার্ত্তাটা ছাত্রকে নিজের মুখে শুনাইতে হওয়ায়, কিছুই বলা যায় না।

দুই

বহুদিনের পরিচিত নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে যেভাবে লোকে কথা কহে, বেলা ঘরে ঢুকিয়া সেই ভাবে বলিল, বারটা বাজে, স্নান করবেন না?

পরিতোষ সলজ্জ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, এই যে করি। নমস্কার।

বেলা পূর্বে নমস্কার করে নাই, ইচ্ছা করিয়াই করে নাই, সম্পর্কটা ঠিক নমস্কার করার মতো নয়। এখন নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আজ এ বেলা কিন্তু দেশী ভাত ডালই খেতে হবে, সব জোগাড় জাগাড় ক'রে উঠতে পারি নি।

আমি বিলিতি খাবার খাই, মাষ্টার মশাই বুঝি এই কথা বলে গেছেন আপনাকে?

বললেই বা, দোষটা কি ! ওবেলা সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাষ্টার মশাই জানেন না, ছেলেবেলা থেকে ডাল ভাত লুচি তরকারিতেও আমার অরুচি নেই।

না থাকাই ত উচিত।

বেলা একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পরিতোষ হাসিয়া বলিল, বসবেন না ?

না, বলিয়া বেলা হাসিল ; আবার বলিল, বারটা বাজল, স্নান করে খেয়ে নিন্, সারা রাত গাড়ীতে—

সে গা-সহা আছে।

বেলা বলিল, বউ-টউ কোথায় ?

পরিতোষ হাসিয়া মাথা নীচু করিল, জিবন্ত পাইপটাকে নাড়িতে নাড়িতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, বউই নেই, তা টউ।

কেন, বলিয়া ফেলিয়াই বেলা থমকিয়া গেল। বিয়োগ-বার্ত্তা হইতেও ত পারে। প্রশ্ন করাটা ঠিক হয় নাই।

পরিতোষ হাসিতে হাসিতে বলিল, সময় পেলাম কই বিয়ে করবার !

বেলা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, অনেক সময়ের দরকার নাকি ? কিন্তু ক'টার সময় খাওয়ার অভ্যেস ?

একটা নাগাদ লাঞ্চ খাই।

বেলা ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, তার ত আর দেরি নেই, আমি রান্নাঘরে উদ্যোগ করি গে, স্নান করে নিন। আর দেরি করা নয়—বলিয়া বেলা চলিয়া গেল। পরিতোষ একটা মহাতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ইংরেজী গানের একটা কলি গাহিতে গাহিতে বাথরুমে প্রবেশ করিল।

খাইতে বসিয়া পরিতোষ বলিল, মনে হচ্ছে সবই নিজের হাতের রান্না।

বেলা চুপ করিয়া একটু হাসিল।

এত কাণ্ড কেন করলেন ?

বেলা আবার হাসিল। একথাটিও বলিল না যে কাণ্ড কিছুই নয়।

একটা লোকের জন্যে এতো সব করবার দরকার ছিল না। মিছে এত কষ্ট করা—

বেলা বলিল, একটি কেন, দশটি লোকের জন্যে করতেও কষ্ট হয় না, তাও কি বলতে হবে !

পরিতোষ মনে মনে বলিল, না, না, বলিতে হইবে না, কিছু দরকার নাই। এ যে বাঙ্গালীর সংসার, বাঙ্গালীর মেয়ে। এই একটি মেয়ের সলজ্জ মুখের পানে চাহিয়া সমস্ত বাঙ্গলা দেশ ও সমস্ত বাঙ্গালী মেয়ের মুখের প্রতিচ্ছবিটা সেই ঘরের মধ্যে প্রভাসিত হইয়া উঠিল।

পরিতোষ যখন বাথরুমের বাহিরে আসিয়া তোয়ালে দিয়া হাত মুখ ঘসিতেছিল, বেলা বলিল, পান খাও ?—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই হাসিল। হাসিয়া আবার বলিল, বয়সে বোধ করি কিছু বড়ই হবে, তবু আপনি বলতে কেমন বাধ বাধ ঠেকছে।

তুমিই ত ভালো।

ভালো হলেও ভালো, না হলেও ভালো ; আমি আপনি, মশাই বলতে পারি নে আর। পুনরায় সেই হাসি। বলিল, পান খাও ত ?

খাই।

বেলা বলিল, তবে সেজে আনি, মিলিটারী সাহেব, কি জানি খাবে কি-না তাই সাজি নি। তুমি বসো।

বিলাতে অনেকদিন ছিল, তাহাদের বংশটাও বিলাত-ফেরতের, নিজেও পুরাদস্তুর সাহেব—কিন্তু পরস্ত্রী যত সুন্দরী এবং মধুর স্বভাবই হোক্, মনে মনেও সে সব আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি, আগ্রহ অথবা অবসর পরিতোষের ছিল না। বেলা নিতান্ত অসুন্দর নয় ; বরং যেমনটি হইলে চোখে ভাল লাগে, সে তাই এবং ব্যবহারও অকুণ্ঠ ও মধুর, যত্নও যেমনটি করিয়াছে, কে বলিবে কয়েক ঘণ্টা আগেও কেহ কাহাকেও চিনিত না, নামটাও শোনে নাই। যেন নিতান্তই আপন, একান্তই আত্মীয়, বহুদিবসের বন্ধু, যেন খুবই অন্তরঙ্গতা ! কিন্তু ছুইটার সময় ধড়াচূড়া আঁটিয়া ভাড়া মোটরে বসিয়া পরিতোষ যখন আফিসে বাহির হইল, তখন তাহার মনে এই কথাগুলা সত্য সত্যই ছিল না। হয়ত লেখকের এই কথা-গুলা গিলিতে পাঠককে অনেকখানি চিবাইতে হইবে, আমতা আমতাও করিতে হইবে, কোঁথ পাড়িতে হইতেও পারে কিন্তু আমার কথা যে নিছক কষ্টকল্পনা নয়, পরে সপ্রমাণ হইবে বলিয়া আমি এখন কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিলাম না। পাঠক চিন্তার লাগাম আলগা করিয়া দিয়া ঘোড়া ছুটাইতে থাকুন, লেখক বাধা দিতে নারাজ !

চার্জ লওয়ার ব্যাপারটা কিছুই নয়, অন্তত বড় সাহেবদের

পক্ষে। কেরাণি ও আজ্ঞানুবর্ত্তী ব্যক্তিবর্গের সন্ত্রস্ত ও সচকিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া বুটের প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে কামরায় ঢুকিয়া চেয়ারে বসিলেই কাজটা সম্পন্ন হইয়া যায়। তাহাই হইল। আফিসের লোক সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহাদের ধারণা, বিলাতী সাহেবগুলা পাজী ও বদমায়েস হয় বটে কিন্তু বাঙ্গালী সাহেবরা ঐ সকল গুণে তাহাদেরও পিতামহ-স্থানীয়। এই বাঙ্গালীসাহেবটি পূর্ব্বে যে সকল ষ্টেশনে ছিলেন, সেখানকার ইতিহাস কাহারও জানা না থাকিলেও কল্পনাপ্রবণ কেরাণিকুল ইতিহাস রচনা করিয়াই ভয়ে ভয়ে মনে মনে বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাইয়া কাগজে কলমে মন ও মাথা গুঁজিয়া রহিল।

সাহেব যে হরিবল্লভের এককালের ছাত্র এবং আজ তাহারই গৃহে অতিথি, এ খবর কেহ জানিল না; হরিবল্লভও এ কথা জানাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিলেন না। সে বয়স তিনি অনেক দিন পার করিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার অনেক পরে সাহেব ফিরিলেন। হরিবল্লভ রাশি রাশি সংবাদপত্রের মধ্যে মগ্ন ছিলেন; ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি যেন বলিতেও গেলেন, সাহেব ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সোজা ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। এ ঘরটা সকালে দেখেন নাই, অথচ খুব জোর আলো দেখিয়া ভিতরে চাহিতেই দেখিলেন, বেলা ডাইনিং টেবিল সাজাইতেছে। একটিবার পরিতোষকে দেখিয়া হাসিয়া নিঃশব্দে কাজে মন দিল।

টেবিল নূতন, টেবিল ক্লথ নূতন, কাঁটা চামচ ছুরি নূতন, ফুলদানি নূতন, ন্যাপকিন নূতন। পরিতোষ দেখিতেছে আর হাসিতেছে। তবে দুজনের মত ব্যবস্থা দেখিয়া সে খুশী হইল।

বেলা মুখ তুলিয়া তাহাকে হাসিতে দেখিয়া বলিল, অত হাসি হচ্ছে যে, উল্টে পাল্টে ফেলেছি না-কি!

উল্টে ফেলেন নি। ফেললেও দোষ হোত না। কিন্তু কেন এ অধর্ম্ম!

বেলা রাঙা হইয়া উঠিয়া বলিল, অধর্ম্ম! তার মানে?

মানে! একদিনের জন্যে এতো হাঙ্গামা করার কোন মানে হয় না!

কষ্ট দেওয়ারও কোন মানে হয় না, একদিনের জন্যেই হোক আর দশ দিনের জন্যেই হোক্। আর একদিনই বা কেন? আমি যে শুনলুম, মালকাহি সাহেবের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি চলছে, বাঙলো এখন পাওয়া যাবে না।

না, তা পাওয়া যাবে না।

তবে, সে ক'দিন এখানেই থাকতে হবে ত!

পরিতোষ হাসিয়া বলিল, না, কাল সকালেই ডাক্-বাঙলোয় যাবো, ঠিক করেছি। ডাক্-বাঙলোটা দেখে এলুম।

বেলা মনে ব্যথা পাইল, মুখে তাহা অপ্রকাশ রহিল না। কিন্তু পরিতোষ সেদিকে খেয়ালও করিল না, বলিল, সার্কিট হাউস্‌টা পেলেই হোত ভাল, কিন্তু লাটসাহেব আসবেন ব'লে সেটা ভেঙ্গে চুরে নতুন ক'রে সারাচ্ছে, পাওয়া গেল না। ডাক্‌বাঙলোটা অবিশ্যি ভাল নয়, কিন্তু—

বেলা কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ভালো নয়, কিন্তু থাকতে হবে। কথাটা ত এই! এবার তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যথা গোপন ছিল না; কিন্তু মনস্তত্ত্বে উদাসীন ব্যক্তি সে পথও মাড়াইল না; বলিল, সেটা কেমন যেন দেখায়, না? সকালেই ত মাষ্টার মশাই ঢোক গিলছিলেন।

ঢোঁক গিলছিলেন? কেন? বেলা আকাশ-পাতাল অন্বেষণ করিয়াও ঢোক গেলার হেতু নিরাকরণ করিতে পারিল না। তাহার স্বামী কৃপণ নহেন, সংসারও অসচ্ছল নয়, যথেষ্ট সচ্ছল, তবু তিনি ঢোক গিলিয়াছেন, বেলা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

পরিতোষ বলিল, আমি অবিশ্যি ওঁর কথাটা গ্রাহ্যই করি নি; কিন্তু উনি মনে করেন, অফিসারের উচিত নয় সাব-অর্ডিনেটের বাড়ীতে থাকা।

বেলা একটু একটু করিয়া কথাগুলা বেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়া বলিল, এই কথা! আপিস আর বাড়ী যে এক জিনিষ নয়; এটা কি মাষ্টার মশাই জানেন না! কোথায় তোমার মাষ্টার-মশাইটি, দেখি একবার!

দেখিবার জন্য কোথায়ও যাইতে হইল না। মাষ্টারমশাই আসিয়া হাফ্ প্যান্টের পকেটে কি যেন হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিলেন, লোকে—লোকে কি, বুঝলে না—

বেলার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, বলিল, লোকদেরও ডেকে এনে খাইয়ে দিও না একদিন, নতুন ডিনার সেট্—

হরিবল্লভ এতক্ষণ ঘরের সাজসজ্জা দেখেন নাই। এখন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন। 'লোকে' 'বুঝলে না' এগুলা

তাঁহার মনে খুব স্পষ্ট ছিল না, তাঁহাদের দিশী ঘরকন্নায় বিলাত-ফেরত সাহেবদের নানা অসুবিধার কথাটাই মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতেছিল। এখন একেবারে বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণ-দিকের মলয় হাওয়া আসিয়া মনটাকে জুড়াইয়া দিল। পতিব্রতা, সুশীলা স্ত্রী বলিয়া বেলাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, (লোকে বলে, দ্বিতীয় পক্ষমাত্রই একজাতীয় জীব!) বেলা যে তাঁহার মনের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পায় ইহা জানিয়া সেই ভালবাসাটাই আরও যে কতগুণ বাড়িয়া গেল, তাহা মাপিয়া লইবার জন্য তিনি আর সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন না বটে; একটা কথায় সব সাফ্ করিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, বাড়ীর কর্তৃত্বটা আমার হাতে নয়, বুঝলে হে পরিতোষ! ওবিষয়ে কথা আমার না বলাই ভাল।

বেলা হাসিয়া পরিতোষকে বলিল, এখন?

পরিতোষ তেমনই হাসিয়া বলিল, আপনিই বলুন।

যতদিন না তোমার নিজের কোয়ার্টার পাও, এখানেই থাকবে। জজ যেমন ফাঁসীর রায় উচ্চারণ করিয়াই এজলাস্ ছাড়িয়া চলিয়া যান্, বেলাও সেই মত চলিয়া গেল; বলিয়া গেল, ডিনার য়্যাট এইট্ ত? ঠিক আছে। তবে হিঁদু কেরাণির বাড়ী, গং টং নেই, ঠিক আটটায় এসে বসো।

বেলার বাবা পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ছিলেন। কোনও আদব-কায়দা তাহার অজানা নাই, পরিতোষ এ খবর না জানিলেও মনে মনে অকপটে স্বীকার করিল যে বাঙ্গালীর মেয়ের একটি মাত্র রূপ দেখিয়াই যাঁহারা দেশবিদেশের পানে চাহিয়া চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইতে ধাবিত হন্, তাঁহারা হয় মূর্খ, না হয় অন্ধ। কিম্বা একসঙ্গে দুই ই।

তিন

প্রথমে, মনোহরলাল মিশ্র দেখিয়াছিল, পরে তাহাদের আপিসের আর একজন কেরাণিও দেখিল, মিসেস্ হরিবল্লভ তাহাদের নূতন বড় সাহেবের মোটরে চড়িয়া তাজ, দুর্গ, জুম্মা, ফতেপুর দেখিয়া বেড়াইতেছেন। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। যদিচ শীতের জ্যোৎস্না তেমন স্পষ্ট নয়, আনন্দদায়কও নয়, বর্ষার জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট, তবুও জ্যোৎস্না। পরিতোষ বলিল, আজ তাজ দেখতেই হবে। ঠিক দিনে আমার গাড়ীও এসে গেছে, চলুন, যাই। বেলা সানন্দে স্বীকার করিল। হরিবল্লভ খবরের কাগজগুলা ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার একটু যেন সর্দ্দিভাব হয়েছে, ইত্যাদি। তাজমহলের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে বেলা বলিল, তাজে এলে আমার সাজাহান বাদশার কথাই মনে পড়ে। কি ভালই বাসত বেচারা তার স্ত্রীটিকে! মরার পর ভালবাসা যেন আরও বেড়েছিল। তাই মনে হয় না?

হয়—পরিতোষ এই কথা বলিয়া একটু চুপ করিল; তারপর বলিল, কিন্তু আরও একটা কথা মনে হয়।

বেলা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। পরিতোষ বলিল, সেকালের রাজা-রাজড়াদের যত কীর্ত্তি দেখি, আমার মনে হয়, প্রজাহিতচেষ্টাটা তাঁদের খুব বেশী পরিমাণেই ছিল।

কথাটা বেলা ঠিক বুঝিল না, পরিতোষ তাহা বুঝিয়া পুনরায় বলিল, এই যে সব কীর্ত্তিগুলি, এর মূলে দেশের শিল্পী, কারিগর, স্থপতি, মজুরদের আহার দেওয়ার চেষ্টাটাই ছিল বড়। যখনই দেশে অন্নাভাব হয়েছে, প্রজার অর্থকষ্ট হয়েছে, রাজা-রাজড়ারা এমনই সব কাজ সুরু ক'রে দিতেন। প্রজাও খেতে পেতো, তাঁদের কীর্ত্তিও গড়ে উঠতো। বাঙ্গলা দেশের পাড়াগাঁয়েও শুনেছি, জমিদাররা বড় বড় পুকুর, বাঁধ, মন্দির করতেন ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই। অবশ্য তাই হওয়া উচিত। নইলে রাজা কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় ক'রে হাত গুটোলে প্রজারঞ্জন বা প্রজাপালন হয় না। সেকালের রাজারা সেটা ভাল জানতেন।

বেলা হাসিয়া বলিল, একালে?

পরিতোষ হাসিয়া কহিল, বর্ত্তমানের আলোচনা করতে নেই; শাস্ত্রে নিষেধ আছে। সে কাজ পরবর্ত্তীকালের লোকের জন্যে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

বেলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, বুদ্ধিমান ছেলে, বুদ্ধির কথাই বলেছ! সরকারের নিমক খেতে হয়, নিমক-হারামি করাটা অন্যায়, তাই না?

পরিতোষ হাসিল।

মনোহরলাল এই দিনই দেখিয়াছিল। দেখিয়াছিল —কথাবার্ত্তা শুনে নাই, কেন না অনেক দূরে থাকিতে হইয়াছিল, কাছে আসিবার সাহস হয় নাই—দেখিয়াছিল যে ইহাদের গল্প শেষ আর হয়না। কথাটা সে পার্শ্ববর্ত্তী

কেরাণি কৈলাসনাথ চৌবেকে বলিয়াছিল; চৌবে চুপি চুপি হরিশচন্দ্র ভাটকে বলে; হরিশ ভাট বলে, সে নিজেই মিসেস্ হরিবল্লভকে সাহেবের সঙ্গে ফতেপুর সিক্রিতে দেখিয়াছে। কথাটা এই পর্য্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছিল, আর অধিকদূর যায় নাই। যাইতও না, যদি না ইত্যবসরে একটা কাণ্ড ঘটিত।

জয়মাধব সিংহ যমুনার ওপারের একটা গ্রাম হইতে আসিত। সে পেন্সনবিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিল। হঠাৎ একদিন খবর আসিল, প্লেগে জয়মাধবের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ঠিক-নিম্নস্থ কর্ম্মচারী মনোহরলাল প্রোমোশন পাইবে ইহাই সকলে জানিত। ছোট সাহেব তাহার পক্ষে মস্ত নোট্ লিখিলেন। মনোহরলালের সার্বিস সীটে অনেক দাগ আছে, দু-একবার তাহাকে দণ্ড দিতেও হইয়াছে, এই সব লিখিয়া শেষকালে কিন্তু সুপারিশ করিলেন, তা হোক্, লোকটা বুড়া হইয়াছে, বছর খানেক মাত্র চাকরীর বাকি, উঁহাকেই পদটা দেওয়া হোক্। ছোটসাহেব খাঁটি ইংরেজ, মেজসাহেবও তাই, মেজ সাহেব ঢেঁরা সহি আঁটিয়া ফাইল বড়-সাহেবের কাছে পাঠাইলেন। বড়সাহেব একটা ছোট সহি দিলেই পারিতেন এবং মিটিয়াও যাইত, কিন্তু সেইটুকুও দিলেন না। ছোটসাহেবকে সেলাম দিলেন। ছোটসাহেব বারকতক কতকগুলা ফাইল বগলে সেলাম বাজাইলেন; পরে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিবল্লভকে ডাকিয়া হাসিমুখে ফাইলটি অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, আই কনগ্রাচুলেট্ ইউ, হড়িবালব!

বড়সাহেবের যুক্তিও অকাট্য, নির্দ্দেশও ন্যায়সঙ্গত। যে লোকের সার্বিস সীট্ নানা কলঙ্কে কলুষিত এবং নিতান্ত দয়াপরবশ গবর্ণমেণ্ট যাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন নাই, তাহাকে পুরস্কৃত করার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বিভাগের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হরিবল্লভই পরবর্ত্তী যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহাকেই পদোন্নতি দেওয়া সঙ্গত।

বলা নিতান্তই বাহুল্য যে, উহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। হাইকোর্টের উপরে মামলা চলে না। হরিবল্লভ 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন, আপিসের চেহারা কালো হইয়া উঠিয়াছে। খুব ফর্সা লোকগুলির মুখেও কে যেন আলকাৎরা মাখাইয়া দিয়াছে। দেওয়াল, চেয়ার টেবিল, ফ্যান, আর্দালীর মুখ সব অন্ধকার!

একদল বলিল, যেহেতু হরিবল্লভ বাঙ্গালী এবং বড়-সাহেবও তাহাই, অতএব ইহা তাহাদের জানাই ছিল।

কিন্তু কথাটা কি ঠিক? বাঙ্গালী আর যাহার জন্যই কাঁদুক, বাঙ্গালীর জন্য কাঁদে না; অনুভবও করে না। ইংরেজ ইংরেজের জন্য ভাবে; মাড়োয়ারী মাড়োয়ারীর দুঃখ বোঝে; মুসলমান মুসলমানের দরদ জানে; পাঞ্জাবীর কাছে পাঞ্জাবীর আদর; কিন্তু বাঙ্গালী বাঙ্গালী-ভোলা। বাঙ্গালী বুঝে, আমি ও আমার।

মনোহরলালের দল বলিল, আসল কারণ তাহার জানা আছে। তিন-চারজন অর্থপূর্ণ হাস্য করিল। কাষ্ঠহাসি বটে, কিন্তু অর্থ সুগভীর।

হরিবল্লভ পদোন্নতিটা আশাও করেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়ায় খুশী হন্ নাই ইহাও যেমন বলা যায় না, মনোহরলালের কথা ভাবিয়া একটুও দুঃখিত হন্ নাই এ কথাও তেমনি বলা যায় না। বড়সাহেব অবিচার বা অন্যায় করিয়াছেন একথা বলা খুবই অন্যায়, তবুও কেমন-যেন মনটা প্রসন্ন হইতেছে না। হঠাৎ মনে হইল, বড়সাহেব তাহার বাড়ীতে না থাকিয়া—

বেলা বলিল, ঐ মনোহরলাল ছাড়া তোমার ওপরে আর কেউ ছিল?

না।

তবে তুমি কেন এতো—

না, তা না, তবে—

ঐ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। রাত্রে খাইতে বসিয়া বেলা সহাস্যে কহিল, আজ শুনলুম গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়েছে!

পরিতোষ বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল।

বেলার মনে হইল, পরিতোষ বুঝিয়াছে সব, যেন বুঝে নাই এই ভান করিতেছে। বলিল, গুরুদেবকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে, মাইনে বেড়েছে।

ওঃ, তাই! গুরু বলে পান্ নি, জয়মাধবের পরে উনিই যোগ্য ব্যক্তি, তাই পেয়েছেন। পরিতোষ আর কিছুই বলিল না।

যাহারা আপিসে কর্ম্ম করে না, তাহারা বুঝিবে না যে ইহা কত বড় বিপর্য্যয় কাণ্ড। কয়েকদিন ধরিয়া আবহাওয়াটা এমনই গুমট্ হইয়া রহিল যে, এরূপস্থলে যাহা একান্ত স্বাভাবিক, সেই খাওয়াইবার কথাটাও কেহ তুলিল না। অল্প অল্প

সময়ে কি ধরপাকড়ই না হয়! আরও একটা কাণ্ড ঘটিল। হরিবল্লভের স্থান কে পায় ইহা লইয়া যখন চাপা আন্দোলন চলিতেছিল, অকস্মাৎ বারুদের স্তূপে দেশলাই কাঠি নিক্ষিপ্ত হইল। জানা গেল যে সদ্য এম্-এ পাশকরা এক আন্‌কোরা মুসলমানকে ডেপুটী করা হইয়াছে। এটা যদিও ছোট-সাহেবই করিয়াছেন, মেজসাহেব ঢেঁরা সহি এবং বড়-সাহেব ধোবী মার্ক সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন মাত্র, দোষটা যে বড়সাহেবেরই, তাহাতেও কাহারও সন্দেহ রহিল না।

গবর্ণমেণ্ট আপিস, মিলিটারী বিভাগ, আপিসের ভিতরে জটলা করিবার, দল পাকাইবার, ঘোঁট করিবার সুযোগের অভাব বটে, আপিসের বাহিরে বাধা দিবার কেহ থাকে না। এইরূপ একটা সম্মিলনে যে কয়টি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হইল, তাহা যেমন কুরুচিব্যঞ্জক, তেমনই জঘন্য। বড়সাহেবের চাপরাসীকে খৈনি খাওয়াইয়া পরিতুষ্ট করিয়া হরিশচন্দ্র ভাটবাবু জানিয়াছিলেন যে, বড়সাহেব আগ্রা আসাবধি হরিবল্লভের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। মনোহরলাল প্রভৃতি যাহা দেখিয়াছেন হরিশচন্দ্রের সংবাদ তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিবামাত্র সমস্তই একেবারে সুনির্মল হইয়া গেল। হরিবল্লভ প্রাচীন, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষ তরুণী এবং বড়সাহেব অকৃতদার, এইরূপ ত্র্যহস্পর্শ যে প্রলয় করিতেও পারে সে বিষয়ে সকলে একমত।

বাহিরের কথা বাহিরে থাকিলেই ভাল হইত কিন্তু থাকিল না। ভিতরেও আসিল; হরিবল্লভও শুনিলেন। তাঁহারই একজন অনুগত কর্ম্মচারী সংবাদটা তাঁহাকে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল। কথাটা বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামে উঠিলে বিস্ময়েরও হেতু ছিল না, দুঃখও হইত না। বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূরে, স্ত্রী-স্বাধীনতা যেখানে অব্যাহত, স্ত্রী-শিক্ষা যেখানে সুদূর বিস্তারিত, সেখানে এই নোংরা কথা শুনিবার আশঙ্কা না করিবারই কথা। বেলা সেই কথাই বলিল, তোমাদের আপিসের লোকগুলার উচিত হুগলী জেলার হাতিকান্দায় গিয়ে বাস করা। হরিবল্লভেরও সেই মত।

নিজের বয়সের কথাটা বেলার মনে ছিল না। স্বামী প্রাচীন এবং সে নবীন, ইহাও সে ভুলিয়াছিল। মনে করাইয়া দিবার লোকও ছিল না, কারণও ঘটে নাই। বহু আত্মীয় স্বজন, অতিথি অভ্যাগত এ বাড়ীতে আসিয়াছে, থাকিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, তাহারাও মাথা ঘামায় নাই। কেনই বা ঘামাইবে?

বেলা পরিতোষকে বলিল, শুনেছ তোমার আপিসের বাবুদের কথা!

ঐটুকু শুনিয়াই পরিতোষ বলিল, কুৎসা রটাচ্ছে নাকি?

বেলা কথা বলিবার আগেই পরিতোষ হাসিয়া বলিল, আপনাকেও জড়িয়েছে বোধ হয়?

বেলা বলিল, তোমার মাষ্টার মশাই বুড়ো, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ—

পরিতোষ রোষ্টটা কাটিতে কাটিতে বলিল, সেই পুরাণো কথা! অত্যন্ত হ্যাক্‌নিড্। ওতে আর নতুনত্ব নেই!

বেলা হাসিয়া বলিল, কতকগুলো কথা আছে, যা যত পুরোণোই হোক্, চিরনতুন।

তা যা বলেছেন, বলিয়া মাংসখণ্ড মুখগহ্বরে প্রেরণ করিল। চিবাইতে চিবাইতে বলিল, গুরুজী গেলেন কোথা? ভয় পান্ নি ত?

ভয় পেয়েছেন কি-না বলতে পারি নে; তবে খোশামোদ করবার জন্যে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছেন—বলিয়া বেলা হাসিল।

কেমন?

মতলব করেছেন ভোজ দিতে হবে—

পরিতোষ সাশ্চর্য্যে কহিল, বটে!

বেলা হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, মনোহরলালের বাড়ী গেছেন, কেকে ফর্দ্দ ধরতে।

পরিতোষ ন্যাপকিনে মুখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মত আছে?

ওমা, তা আবার নেই!

ঐ সব শুনেও?

বেলা সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, আমি শুধু বলেছি, ও বড়দিন পর্য্যন্ত দেরি করা চলবে না বাবু! মালকাহিত বাঙলো ছেড়ে দিয়েছে, বড়সাহেব কখন্ হুট্ বলতে চলে যাবেন, তার ঠিক নেই, তিনি এই বাড়ীতে থাকতে থাকতে আমি খাওয়াতে চাই।—বলিয়া বেলা পুডিঙের ডিশ্‌টা পরিতোষের সামনে আগাইয়া দিল।

বেশ বলেছেন, বলিয়া পরিতোষ আহারে মন দিল।

কথাটা স্পষ্ট করিয়া ওঠে নাই, নিষ্পত্তিটাও সুস্পষ্ট হয়

নাই, তাই পরদিনই আবার কথা উঠিল। মালকাহি-পরিত্যক্ত বাঙলো সাফ-সুতরা হইয়াছে, সাজান গোজানও হইয়াছে, এখন সাহেবকে উঠিয়া যাইতেই হয়। পরিতোষই কথা তুলিয়াছিল। শুনিয়া তাহার গুরুপত্নী আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, সে কি, কালই ত বললুম, বাবুদের খাওয়ান দাওয়ান হয়ে যাক, তখন একদিন—

পরিতোষ বলিল, তার ত সাত-আট দিন দেরি এখনও।

বেলা বলিল, হলোই বা দেরি! জলে পড়ে নেই ত তুমি!

না, না, তার জন্যে নয়, বিস্তর জিনিষপত্তর এসে পড়েছে কি-না—

আগলাবার লোক নেই তোমার? না থাকে, দুটো দরোয়ান এই ক'দিনের জন্যে রেখে দিলেই পারো।

পরিতোষ হাসিয়া মাষ্টার মশাইকে বলিল, শুনছেন—

মাষ্টার মশাই অম্লানমুখে বলিয়া দিলেন, ঐ রোগ!

বেলা হাসিয়া, রাগিয়া, ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, রোগটা কি তাই শুনি? কেউ এলে ছাড়ি নে, এই ত!

মাষ্টার মশাই পরিতোষের উদ্দেশে সহাস্যে বলিলেন, দেশ থেকেই হোক আর যেখান থেকেই হোক্, চেনা হোক্, আর অচেনা হোক্, কেউ দু'দিনের জন্যেও যদি এলো, আজ দিন ভাল নয়, কাল সংক্রান্তি, পরশু মাসপয়লা, ডাইনে যোগী, বাঁয়ে যোগিনী, তার পর দিন তেরস্পর্শ, অশ্লেষা, মঘা, কালবেলা, বারবেলা, তারা অশুদ্ধ, যাত্রা নাস্তি—

বেলা বলিল, হ্যাঁ, করি ত। তার হয়েছে কি! না-হয় জুতো মোজাই পরি, ইংরিজী নভেল পড়ি, তাই বলে হিন্দু নই, পাঁজী পুঁথি সব মিথ্যে নাকি? ও সব না মানলে কি হয় জানো? ওঃ, ভারি আমার মাষ্টার মশাই গো!

মাষ্টার মশাই হাসিয়া বলিলেন, এই সেদিন হলো কি, লক্ষ্ণৌ থেকে আমার এক বন্ধুর খুড় শ্বশুরের ছেলে বৌ এলো, তারা দেশ দেখতে বেরিয়েছে, তাদের একটি মাত্র ছোট ছেলে—উনি জেদ ধরলেন, ছেলেটিকে এখানে রেখে যেতে হবে। কচি ছেলে, তাকে ছেড়ে মা-ই বা থাকে কেমন ক'রে; আর ছেলেই বা থাকৃতে পারবে কেন, উনি কিন্তু একেবারে গোঁ ধরে বসলেন—

গোঁ ধরবে না ত কি করবে! আমার মত একলা থাকতে হোত ত—বাড়ীতে না একটা জনমনিষ্যি, না একটা ছেলে, না একটা—বলিতে বলিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল এবং চক্ষুর নিমিষে চায়ের বাটী কাটি ফেলিয়া সে যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, অনেকক্ষণ আর তাহাকে দেখা গেল না।

চার

ধর্ম্ম অনেক রকমের, সেটা সকলেই জানেন। নারীধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, সেবাধর্ম্ম, ব্রতধর্ম্ম, তীর্থধর্ম্ম, এ সকল ত আছেই, উপরন্তু নারীর জন্য আর একটা ধর্ম্মের কথা তাহার বুকের ভিতরের অনুশাসনগ্রন্থে লিখিত অথবা অলিখিত আছে জানি না, তাহার প্রভাবও বড় অল্প নয়। সেটা যাহারই জন্য হোক্ না কেন, খানিকটা ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের ধর্ম্ম। এ না করিতে পারিলে নারীর জীবনটা যেন ফাঁকা থাকিয়া যায়। দরকারী অদরকারী যত উপকরণ দিয়া ভরাইবার চেষ্টা হোক্ না কেন, ফাঁকটা ফাঁকই থাকে, বুজে না। বেলা যে মুহূর্ত্তে বুঝিল আর কাহারও জন্য কোন কাজ করিবার নাই, কাহাকেও তুষ্ট করিবার জন্য এতটুকু পরিশ্রম করিবার নাই, যত্ন, একাগ্রতা ব্যয় করিতে হইবে না, অলস মধ্যাহ্নটা একেবারে বিস্বাদ, বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার স্বামীর প্রয়োজন অতীব অল্প, নাই বলিলেই হয়। শুধু প্রয়োজনই অল্প নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত সেবা যত্ন লইতে তাঁহার আগ্রহ যত কম, সে সব দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার আশা আরও কম। তাই সে যখন আগের মত, বিছানায় শুইয়া, আপিস-ঘরের চেয়ারে বসিয়া, রাস্তার ধারের জানালায় দাঁড়াইয়া কোনও মতে আপনাকে কোন কাজেই লাগাইতে পারিল না, তখন বিগত কয়দিনের কর্ম্মব্যস্ততা মনে করিয়া তাহার চক্ষুপল্লব কেবলই ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। কোন অতিরিক্ত কাজের ভার কেহই তাহাকে দেয় নাই, বরঞ্চ কাজ যতটুকু, করিবার লোকের অভাবও সংসারে ছিল না, তবু যে সবটাই তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার নিজের হাতে টানিয়া লইয়া কয়েকটা দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেকটি কাজ উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তৃপ্তি দিয়াছে ভাবিতে আরও বেশী করিয়া চোখে জল আসিয়া পড়ে। অতিথি অভ্যাগতের জন্য ততখানি করিবার দরকারও ছিল না, না করিলে কি অতিথির, কি হোতার দোষ ধরিবারও কিছু ছিল না, তবু তাহার অন্তরের ভিতরকার কর্ম্মপরায়ণ পরিশ্রমী ধর্ম্মটা অনেকদিন পরে

যেন তাহাকে ঠেলা দিয়া কাজের সমুদ্রের মাঝখানে নামাইয়া দিয়াছিল। কুমারী বয়সে, যখন তাহার পিতা জীবিত ছিলেন, সেই বালিকা বয়সেও এই নারীটির পরিচয় সর্ব্বদাই মিলিত, তাহার পর সে যেন কোথায় বিদেশ যাত্রা করিয়াছিল, এ তল্লাটেই ছিল না। হঠাৎ যেদিন স্বামীর এককালের এই ছাত্রটি আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিল, সেইদিন সেই সঙ্গে সেই প্রবাসী-নারীটিও মুহূর্ত্তে আসিয়া দাঁড়াইল। পরিতোষ সুশ্রী, মিষ্টভাষী, সৌখীন ও সুরুচিসম্পন্ন যুবক, তদুপরি সে ধনবান এবং সাহেবী-ভাবাপন্ন, তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে ও পরিতোষের তুলনায় সঙ্গতি স্বল্প, অতিথিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা যত দুরাশাই হোক্, নারী তদ্দণ্ডে নারীত্ব পুঞ্জীভূত করিয়া উঠিয়া বসিল; পরাজয়ের চিন্তাটাকেও মনের মধ্যে উঁকি মারিতে দিল না। আজ যখন সে চলিয়া গিয়াছে, তখন পূর্ব্বাপর চিন্তা করিয়া সুগভীর সন্তোষের সহিত গর্ব্ব অনুভব করিতেও পারিতেছে যে তাহার সর্ব্ব চেষ্টা জয়শ্রী-মণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু এই জয়ের চিন্তাটাই যে এত বড় দুঃখের, এত করুণ, আর অবিশ্রান্ত চোখের জলের এত বড় একটা উৎস, সে কথা কে জানিত! শুধু চোখের জলের সহিত সংগ্রাম করিয়াই দিবাবসান হইল এবং সন্ধ্যার সময়ে স্বামী ফিরিলে কফি প্রস্তুত করিতে করিতে স্বামীর মুখ হইতে কোন একটা বিশেষ খবর শুনিবার জন্য উন্মুখ সাগ্রহে চাহিয়া রহিল কেন, তাহার কোন হদিস সে নিজেও পাইল না। হরিবল্লভ অভ্যাসমত রাশীকৃত খবরের কাগজের সংবাদ শিরোনামাগুলি পড়িয়া যাইতে লাগিলেন এবং পড়া শেষ করিয়া পোষাক বদলাইবার জন্য যখন কক্ষান্তরে গমনোদ্যম করিলেন, তখন হঠাৎ যেন প্রশ্নটা মনে পড়িয়া গেল এবং আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহে না এমনভাবে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, সাহেবের সঙ্গে দেখা হোলো? বলিয়া মুখখানা যতটা সম্ভব হাসি-হাসি করিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

হরিবল্লভ বলিলেন, না; আজ আর দেখা হয় নি। তিনি এই কথা বলিয়াই চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই খবরটা শুনিবামাত্র কেন যে বেলা কাঁদিয়া ফেলিল, সে নিজেও তাহা বুঝিল না, কিন্তু তাহারই লজ্জায় জড়সড় হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছাদে পলাইয়া গেল।

পরিতোষ তাহার বাঙলোয় চলিয়া গিয়াছে। তা যাক্, আশ্চর্য্য এই যে, তাহার পর কতদিন কাটিয়া গেল, একদিন, একটিবারের জন্যও এপথ মাড়াইবার কথা তাহার মনেও হইল না। বেলা প্রতিদিনই মনে করিত রাত্রে ডিনারের পর, বেড়াইতে বাহির হইলে নিশ্চয়ই একবার আসিবে কিন্তু প্রতিদিনই তাহার অনুমান মিথ্যা হইয়া যাইত। আপিসে মাষ্টার মহাশয়কে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইয়া খবর লওয়ায় আদব-কায়দায় যত বাধাই থাক্, কোন-না-কোন ছলেও কি তাহা করা যায় না? সমস্যা যখন কোন মতেই ভঞ্জন হইল না, তখন একদিন সে হরিবল্লভকে বলিল, আজ বলে এসো, রাত্রে এখানে খাবে।

বাপ্‌রে! আপিসে! সে কি হয়?

তার বাড়ীতে গিয়ে বলে এসো। না, না, কোন কথা আমি শুনতে চাই নে। কতদিন সে খায় নি তা জানো?

হরিবল্লভ হাসিয়া বলিলেন, খায় নি মানে? প্রায়োপবেশন করছে সে খবর ত শুনি নি।

বেলার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল, আমার বাড়ীতে একমাসের ওপর খায় নি, তার খবর রাখ?

হরিবল্লভ বলিলেন, আজ আর কখন্ যাব? কাল সকালে গিয়ে ব'লে আসবো, যাতে কাল এখানে খায়।

আচ্ছা, বলিয়া বেলা নিজের কাজে চলিয়া গেল। পরদিন সকালে উঠিয়াই সে ডাইনিং টেবিল সাজাইতেছে দেখিয়া হরিবল্লভের মনে পড়িল, সাহেবের বাঙলোয় না গেলে আর চলে না। কিন্তু বাঙলোয় দেখা করার যা বিড়ম্বনা! স্লিপে নাম পাঠাইয়া আধ ঘণ্টা বসিয়া থাকার পর সেলাম আসিলে হরিবল্লভ দেখা করিল। বিলম্বের জন্য সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিলেন। হরিবল্লভ নিমন্ত্রণের কথাটা বলিল। সাহেব বলিলেন, আজ! আমি যে জেম্‌সের নিমন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছি।

তবে, কাল?

কাল? দেখি—বলিয়া সাহেব এনগেজমেণ্ট বুক খুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, কাল রায় বাহাদুর গিরিধারীলাল এখানে খাবে। গিরিধারীলালকে ত জানেন আপনি, এক্সাইজ কমিশনার। সাহেব বহি বন্ধ করিলেন।

ডাইনিং টেবিলের সজ্জার কথা মনে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল, হরিবল্লভ বলিলেন, পরশু হয় না?

সাহেব আবার নোট্ বুক টানিলেন, কিন্তু না খুলিয়া, কক্ষবিলম্বিত দিনপঞ্জীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, পণ্ড', এগারোই ত! টুরে যাচ্ছি, ষোলই ফিরবো—বলিয়া থামিলেন। একটু পরে বলিলেন, ফিরে এসে আমি খবর দেবো। কেমন?

হরিবল্লভ অগত্যা বলিলেন, তাই হবে।

বেলা আগুন হইয়া উঠিল, বলিল, তা আমি জানি-নে। আমার সব যোগাড়-যাগাড় হয়ে গেছে, আর উনি বলছেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাস্তবিক যোগাড়-যাগাড় কিছুই হয় নাই। যোগাড় করিতে কতটুকু সময়ই বা লাগে! আসল কথা, তাহার মন যে সমস্ত প্রস্তুত করিয়া আদর যত্নে খাওয়াইতে টেবিলের একান্তে বসিয়া গিয়াছিল সে ছাড়া একথা কে বুঝিবে!

দিচ্ছি সব টান মেরে ফেলে, বলিয়া বেলা ত্রস্তপদে অন্যত্র চলিয়া গেল। হরিবল্লভ তাহার চোখের কোণে জল দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মনের ভিতরে এতটা বাড়াবাড়ি না হোক্, মনটাও ভাল ছিল না। "না" করা ছাড়া সাহেবেরও অন্য উপায় ছিল না সেকথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধের এমন কঠোর ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রত্যাখানও হরিবল্লভ ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আপিসে বাহির হইতেছেন, বেলা বলিল, তোমার একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিও ত একবার।

দোব, বলিয়া হরিবল্লভ টাঙায় উঠিলেন।

গল্পের এতখানি পড়িয়াও যাঁহারা হরিবল্লভকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই তাঁহাদের জন্যই একথাটা বলা দরকার হইয়া পড়িতেছে যে ফাইল, পে-সীট্, মাষ্টার রোল্ প্রভৃতির ভিতরে নিমিষে মগ্ন হইয়া হরিবল্লভ চাপরাসী পাঠাইবার কথাটা ভুলিতে বিলম্ব করিলেন না এবং দিনান্তে, ফাইলের বোঝা নামাইয়া যখন গৃহদ্বারে পৌছিয়া দু'টি অগ্নিগোলক সদৃশ দৃষ্টির সম্মুখীন হইবামাত্র বিস্মৃত কথাটা স্মৃত হইল, তখন জিভ কাটিয়া "ঐ যা" বলিয়া মাথাটা চুলকাইতেও তাঁহার বাধিল না। প্রত্যুত্তরে ওপক্ষ কোন জবাব দিল না বটে, কিন্তু চোখের জল আর কিছুতেই গোপন রহিল না।

কিন্তু পরের দিন হরিবল্লভ যাহা করিলেন, তাহা একেবারেই অমার্জ্জনীয়। আপিসে আসিতেই তাঁহার চাপরাসী নিবেদন করিল, বড় সাহেব দুইবার সেলাম পাঠাইয়াছেন, ছোটসাহেবও একবার। হরিবল্লভ প্রথমটা ঘড়ির দিকে চাহিলেন, যথাসময়ে আসিয়াছেন বুঝিয়া মনটা কতক হাল্কা হইল। কতক হাল্কা হইল কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। একে ত বড়সাহেব কাহাকে কখনও ডাকেন না—মেজসাহেব ও ছোটসাহেবের নীচে না নামিতেই তাঁহারা অভ্যস্ত—তায় দু' দুবার ডাকিয়াছেন, হরিবল্লভ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বড়সাহেবের কামরার সম্মুখীন হইয়া শুনিলেন, মেজসাহেব আছেন। অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। মেজসাহেব বাহির হইলে তিনি ঢুকিলেন। বড়সাহেব খুব ব্যস্ত। বাঁ হাতে একখানা চিঠি পকেট হইতে বাহির করিয়া প্যাডের উপর রাখিয়া বলিলেন, এইটি বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। গিরিধারীদের ডিনারটা পিছিয়েই দিলাম। বড়সাহেব যেমন লিখিতেছিলেন, লিখিতেই লাগিলেন। হরিবল্লভ গুড মর্নিং বলিয়া বাহির হইতেই ছোটসাহেবের চাপরাসী ধৃত করিল। দু' মাসের হিসাবে দুইটা মস্ত ভুল ধরা পড়িয়াছে, হিসাব বিভাগ কড়া ভাষায় কৈফিয়ৎ চাহিয়াছে শুনিয়া হরিবল্লভের মাথা ঘুরিতে লাগিল। ছোটসাহেব তাহা বুঝিলেন; মৃদু হাসিয়া বলিলেন, হরিবোলব, ভুলটা তোমার সময়ের নয়, পুওর জয়মাধবের সময়ের। তোমার ভয় নাই। হরিবল্লভ কড়া মন্তব্যটা পাঠ করিলেন, সেটা খুবই কড়া বটে! ছোটসাহেব বলিলেন, হিসাবটা আগাগোড়া পরীক্ষা করাও। ও নোটের জবাব আমি তৈয়ার করিতেছি। হরিবল্লভ স্বস্থানে আসিয়া কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া পরীক্ষার ভার দিলেন এবং পাছে ঠিক মত পরীক্ষা না-হয় তাহাদিগকে তাঁহার টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া তখনই কাজ সুরু করাইয়া দিলেন। এককালে ছাত্রেরা মাষ্টার মহাশয়দের ঘিরিয়া বসিয়া যেমন ভাবে পড়া বুঝাইয়া লইত, আজ এই বৃদ্ধবয়সে কেরাণিকুল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈস্বরে দু-এককে দুই, দুই দুগুণে চার করিয়া আপিস জমাইয়া ফেলিল। কিন্তু সেই চিঠিখানা পকেটেই রহিয়া গেল। ভুলটার উৎপত্তি ধরা পড়িল না, মনটা খারাপ থাকিয়া গেল। সন্ধ্যার পরে বাড়ী আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া কফি খাইলেন, চাপরাসী কতকগুলা খাতা রাখিয়া গিয়াছিল, খুলিয়া হিসাবের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন।

আটটা বাজিয়াছে কি বাজে নাই, মোটরের খুব জোর

হর্ণের শব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিতেই দেখিলেন, বড়সাহেব। খাতাগুলা সরাইয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে যাহা শুনিলেন, তাহার সম্পূর্ণার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তবে এইটুকু বুঝা গেল যে এখানে শীঘ্র আহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইবে। বড়সাহেব একেবারে ভিতরের দিকে প্রস্থান করিলেন। হরিবল্লভ কিয়ৎকাল হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘরেই বসিলেন।

মোটরের হর্ণ বেলাও শুনিয়াছিল এবং বারান্দায় জুতার জোর শব্দ শুনিয়া শয়নকক্ষ হইতে অনিচ্ছায় উঁকি মারিয়াই অবাক্ হইয়া গেল। পরিতোষ বলিল, রেডী ?

বেলা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরিতোষ বলিল, দেরি আছে বুঝি ? তা হ'লে আমি এখন যাই, ফিরে এসে খাবো, কেমন ? দশটা, স'দশটা হবে, একটু কষ্ট হবে, না ?

বেলা যেন আর সামলাইতে পারিতেছিল না; বলিল, তুমি কি এখানে—

পরিতোষ বলিল, কেন, আমার চিঠি পান্ নি ?

চিঠি, কই না! কখন পাঠিয়েছ ?

জিজ্ঞাসা করুন কখন্!—বলিয়া সে ফিরিতে উদ্যত হইল। আবার হাসিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাষ্টার মশায়ের কাণ্ড আমি জানি! তা আসব, না আসব না ?

বেলা দাঁত দিয়া সজোরে অধর দংশন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, যত রাত হোক্, এসে খাবে। আমি ব'সে থাকবো।

আচ্ছা, বলিয়া পরিতোষ তেমনই শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। বেলা কয়েক মিনিট সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আজ সমস্ত দিন তাহার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; বুকের ভিতরে কেবলই হু হু করিয়াছে; সেবাপরায়ণা নারী ও স্নেহাতুরা মাতা, রহস্যপরায়ণা সাথী, এই সকলের সংঘর্ষে আজ সারাদিন সে কি কষ্টই না পাইয়াছে। সকালে বাসার বামুন ঠাকুরকে দিয়া পরিতোষকে লিখিয়া পাঠায় যে আজ রাত্রে তাহাকে খাইতেই হইবে, কোন ওজর আপত্তি শুনিবার ইচ্ছা তাহার নাই। বামুন ঠাকুর এমনই বুদ্ধিমান যে সাহেব গোসলখানায় শুনিয়া চিঠি ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। একটু অপেক্ষা করে, জবাবটা নে, তা নয়! হিন্দুস্থানী খোট্টাগুলার যদি একটু বুদ্ধিসাধ্যি থাকে! তারপর ভাবিল, পরিতোষের ত চাপরাসী, আর্দালী, দরোয়ানের অভাব নাই, নিশ্চয়ই খবর পাঠাইয়া দিবে।

বিকাল পর্য্যন্ত কোনও খবরই যখন আসিল না, তখন বিশ্বের বিতৃষ্ণা লইয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছিল। এখন চোখের জল আর ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে শুধু ঐ বিতৃষ্ণাটাই বাড়িতেছিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, একখানা খাম হাতে করিয়া হরিবল্লভ দাঁড়াইয়া আছেন। বোধ করি এই দিকেই আসিতেছিলেন। মাঝে মাঝে হরিবল্লভের মাথাটা বড়ই চুলকায়, কে জানে খুশ্‌কী অথবা মরামাসে সেটা ভরিয়া উঠিয়াছে কি না! বেলা ব্যাপারটা সবই বুঝিল; কিছু বলিল না, চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া গেল।

ভুল সংশোধনের কোনই চেষ্টা হরিবল্লভ করিলেন না। বোধ করি কি করিয়া কি করিতে হয় তাহাও জানা ছিল না। তাই সেই খাতাগুলায় চোখ ও মন গুঁজিয়া দিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। হিসাবের ভুল বাহির করাই উদ্দেশ্য, কিন্তু দেখিতে লাগিলেন, প্রত্যেক পাতায় গণ্ডায় গণ্ডায় ভুল। কাজেই কিছুক্ষণ পরে ভিতরে যাইতে হইল। বেলা রান্নাঘরে, দু'টা উনুন, দু'টা ষ্টোভ, একটা ইলেকট্রিক হিটার জ্বালিয়া—তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, তোমার খাবার ত সময় হয়েছে, ঠাকুর দিয়ে দিক। কি বল ?

হরিবল্লভ মহা-পরিত্রাণ পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, হ্যাঁ, তা দিক। আমার আবার রাত হ'লে, হ্যাঁ, জান ত!

খুব জানি। তুমি বস গে, ঠাকুর যাচ্ছে। আমি কিন্তু যেতে পারবো না, মন দিয়ে, চেয়ে টেয়ে নিয়ে খেও, বুঝলে, ভুল টুল ক'রে বসো না যেন, বলিয়া বিলোল কটাক্ষে হরিবল্লভের খুশ্‌কীভরা মাথাটাকে ঘুরাইয়া দিয়া ডেকচি প্যান খটাখট করিতে লাগিল।

পাঁচ

লাট সাহেবের আসিবার কথা ছিল, হঠাৎ সংবাদ বাহির হইল, টুর ক্যান্সেলড্। এই দিকটায় প্লেগ দেখা দিয়াছিল। প্লেগ আগে যমুনার ওপারে ছিল, যমুনার জল কম, গরু ছাগলও হাঁটিয়া যায়, প্লেগও কখন্ টুক্ করিয়া নদী পার হইয়া এদিকে আসিয়া পড়িয়াছে। চারদিক হইতেই খবর

আসিতেছে টপাটপ ইন্দুর মরিতেছে, আর লোকও টুপ্ টুপ করিয়া জ্বরে পড়িতেছে, গালগলাগুলা ফাঁপিয়া উঠিতেছে, ইন্দুরদের প্রদর্শিত পথে তাহারাও সরিয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় লাট সাহেবকে আনা যায় না। তাঁহার জীবনের দাম অনেক বেশী। তিন-চার কোটী লোকের জীবনের দাম এক করিলেও তাহার কাছেও পৌঁছে না। শহরে অনেকগুলি তোরণ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেগুলার লতাপাতা-গুলা শুকাইতে লাগিল; সার্কিট হাউসের সুমুখে যে প্যাণ্ডাল হইয়াছিল, তাহার বাঁশগুলা ডাক্তারখানার মড়ার হাড়ের মত খাড়া রহিল; মধ্যস্থলে তক্তাপোষ জড়ো করিয়া যে উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ব্যর্থ প্রণয়িনীর শয্যার মত সেইখানে পড়িয়া পড়িয়া যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, আঞ্জুমান ইত্যাদি এবং প্রভৃতিদের মানপত্র ছাপার বিলের টাকার জন্ম ছাপাখানার মালিকরা দেহের মাংসে কামড় ধরাইবার উপক্রম করিল। তাহাদের বোধ হয় এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে লাট সাহেব যেমন উহাদিগকে হতাশ করিয়াছেন, উহারা তাহাদিগকে সেইরূপ নিরাশ করিবার চেষ্টায় আছে। তাই সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা তাগাদা পাঠাইতেছিল।

বড় শহরে যদি সংবাদপত্র না থাকে তবে সব খবর সব সময়ে যে পাওয়া যায় না, গেলেও সঠিক সংবাদ না হইয়া অতিরঞ্জিত সংবাদই পাওয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। নিত্য খবর পাওয়া যাইতেছে, অমুক গঞ্জে আজ ত্রিশটা, অমুক মহল্লায় আজ কুড়িটা মরিয়াছে—আর শ' খানেক শুষিতেছে। সংবাদ সত্য অথবা মিথ্যা যাচাই করিয়া প্যানিক হয় না। বরং যাচাই করা হইলে প্যানিকই থাকে না। কিন্তু এ রকম সময়ে যাচাই করার কথাটা কাহারও মনেই আসে না। শহর হইতে লোক যে দলে দলে পলায়ন করিতেছে, যে যে পথে পারে, যেখানে পারে পালাইতেছে তাহা সর্ব্বদাই চোখে দেখা যাইতেছে। ট্রেণগুলা যেন আর সামাল্ দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাস্‌গুলার ত মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে।

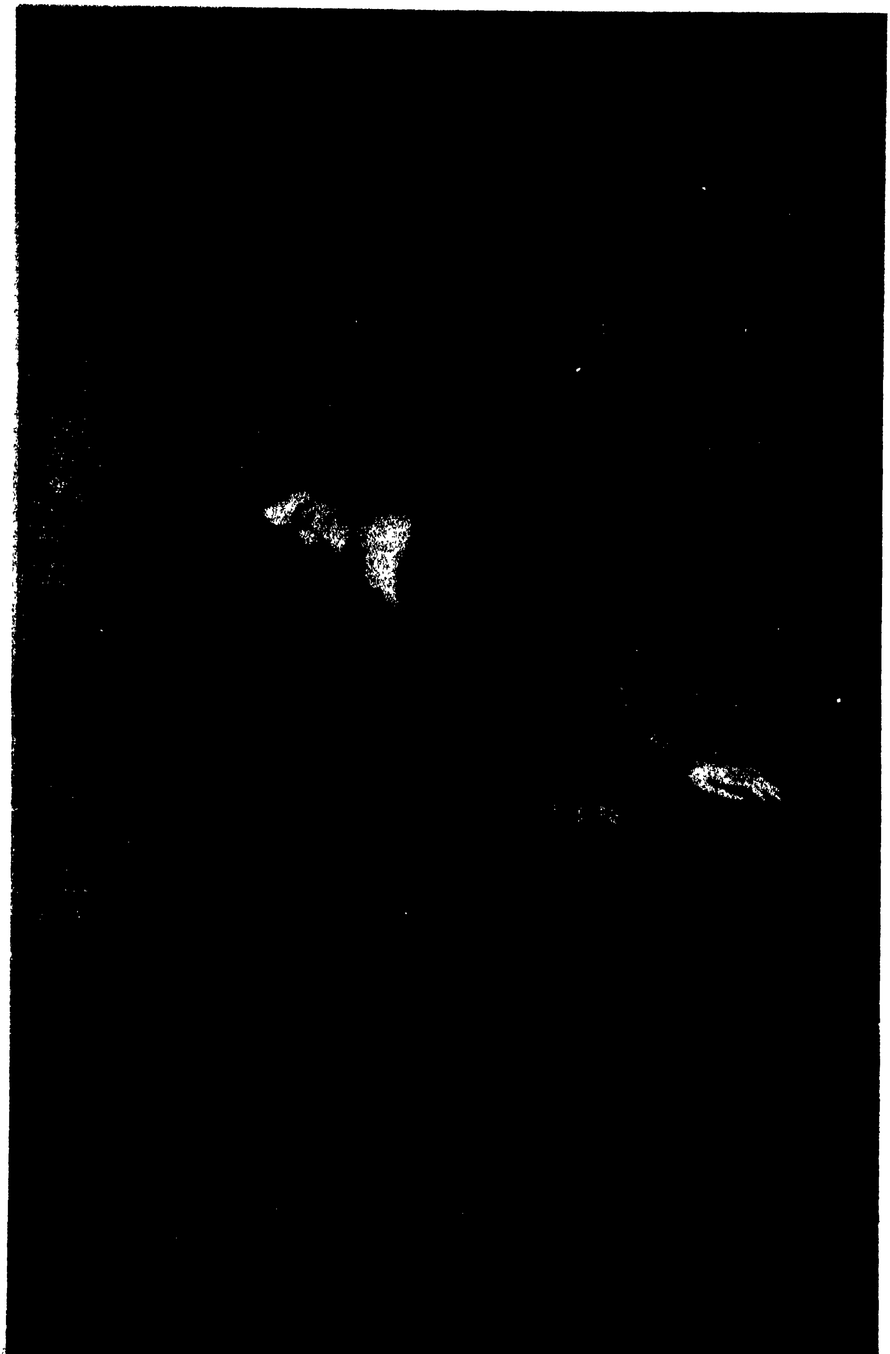
জয়মাধব কিছুদিন আগে গিয়াছিলেন, হরিবল্লভদের আপিসের ডেস্‌প্যাচার কান্তিলাল শনিবার আপিস করিয়া গিয়া সোমবারে আর আসিলেন না। খবর পাওয়া গেল, আর আসিবেন না, অন্য কোনও জগতের আপিসে চাকরি মিলিয়াছে। বুধবার হইতে হরিবল্লভ কামাই—এ্যাবসেণ্ট উইদাউট নোটিশ। সরকারী আপিসে—অন্ম আপিসেও বটে—ইহা গুরুতর অপরাধ। মনোহরলাল হাজিরা বহিতে লাল কালীতে গুটী পাঁচ-ছয় মূল্যবান শব্দ লিখিয়া ছোট-সাহেবের কামরায় পাঠাইয়া দিলেন। ভরসা ছিল, সাহেব যথাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবেন। ছোটসাহেবটা কিন্তু গাড়োল, লিখিয়াছে অসুস্থ নয় ত? বৃহস্পতিবারেও হরিবল্লভ অনুপস্থিত, শুক্রবারেও তাই। ছোটসাহেব মুসলমান ডেপুটীকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা কেহ খবর লও না কেন? শনিবারে চাপরাসী আসিয়া জানাইল, উনকো মেমসাহেবকো উহি হুয়া। এই উহিটা যে কি তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। মনোহরলালের কথা জানি না, অন্য বাবুরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, আপিসের পর তাঁহারা খবর লইতে যাইবেন। আর যাহাই হোক্, হরিবল্লভ চমৎকার লোক। আর সেদিন তাঁহার স্ত্রী কত রকম রান্নাই না রাঁধিয়াছিলেন! সমস্ত পরিবেশন নিজে করিয়াছিলেন। শুধু কি তাই? প্রত্যেককে বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া পীড়াপীড়ি চাপাচাপি করিয়া কি খাওয়ানটাই খাওয়াইয়াছিলেন! অনেকেরই পরদিন অনাহার অথবা অর্দ্ধাহার হইয়াছিল। বাঙ্গালীর মেয়েদের ঐ একটা মস্ত দোষ, খাওয়াতে বড্ড জোরাজেদী করে।

আপিসের ছুটির সময় দেখা গেল, মনোহরলালও তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছেন। মনোহরলালের একজন রাজ-নৈতিক চেলা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, সবাই যাইতেছে, আপনি না গেলে মানে দাঁড়াইবে যে আপনি হরিবল্লভের হিংসা করেন। আপিসের লোকে এই মন্ত্রীটিকে শকুনি আখ্যা দিয়াছিল—মনোহরলাল তাহার বড় বাধ্য।

হরিবল্লভ চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ভাই, তোমরা কেউ জান কি বড়সাহেব- টুর থেকে ফিরেছেন কি-না?

এ ওর, ও এর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখে না। হরিবল্লভ আকুলকণ্ঠে বলিলেন, ভাই একজন যদি একটিবার যাও, উনি একবার দেখতে চাইছেন, কিছু বলবেন বোধ হয়, সময়ও হয়ে এসেছে, বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমি যাচ্ছি।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রণবনাথ ঠাকুর লজ্জাবতী ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

তোমরা বসো ভাই, বলিয়া হরিবল্লভ ভিতরে চলিয়া গেলেন। বাস্তবিক সময় হইয়া আসিয়াছিল। সে সময়কার সে ঘরের দৃশ্য বর্ণনা করিবার বাসনা আমার নাই; থাকিলেও চিত্রিত করিতে পারিতাম না। দুইটি বিদেশী নার্স দুইদিক হইতে দুইটা অক্সিজেনের চোঙ্গা রোগীর দুই পাশ হইতে ধরিয়া আছে—রোগীর পক্ষে তাহাও অসহ্য, হাত দু'টি আস্তে আস্তে নাড়িয়া সেগুলা সরাইতে নির্দ্দেশ দিতেছে। ডাক্তার গম্ভীরমুখে ওদিকে চেয়ারে বসিয়া, তিনি ঘাড় নাড়িতেছেন। হরিবল্লভ বেলার একখানা হাত ধরিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

বাহিরের ঘরে আপিসের বন্ধুরা বসিয়া আছেন। মনোহরলাল কি একটা কথা বলিয়া প্রাণহীন শব্দহীন শুব্ধ সভায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন, অত্যন্ত ঘৃণায়, প্রায় সকলেই তাঁহার সান্নিধ্য হইতে সরিয়া বসিয়াছেন।

হরিবল্লভ আর একবার বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কেউ গেছে?

আলম্ সাহেব তখনি গেছেন, শুনিয়া হরিবল্লভ আবার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বেলা ঘরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, পরিতোষ আসে নি?—তাহার দু'টি চোখ দিয়া দুইটি ধারা নামিয়া আসিল।

হরিবল্লভ কোঁচার খুট দিয়া ধারা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, খবর পাঠিয়েছি বেলা।

পাঠিয়েছ, বলিয়া বেলা চক্ষু মুদিল। কিন্তু অশ্রুর ধারা শেষ হয় না। হরিবল্লভ যতই মুছিয়া দেন, আবার গড়ায়।

ডাক্তার বাক্স খুলিয়া ইঞ্জেক্‌সানের ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, বেলা চক্ষু চাহিয়া হরিবল্লভকে কহিল, লক্ষ্মীটি, বারণ করো, আর ওসব না।

হরিবল্লভ কি যেন বলিতে গেলেন, বেলা দু'টি হাত তুলিয়া বলিল, ওসব আর না, শুধু তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় একটু দাও।

হরিবল্লভ শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তারদের শাস্ত্রে বোধ করি এই কথা লেখা আছে যে যতক্ষণ শ্বাস থাকিবে ততক্ষণ আশা ছাড়িবে না; আর ফুঁড়িতেও কসুর করিবে না। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিতেই বেলা স্বামীর হাতটা টানিয়া লইয়া আকুলকণ্ঠে বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, আর ফুঁড়তে দিও না।

হরিবল্লভ ডাক্তারকে নিষেধ করিলেন। বেলা তাহার হাতখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, পা দু'টি একবার তোলো না গো।

হরিবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে পা তুলিলেন। যাহা সকল বাঙ্গালীর মেয়ে করে, করিবার প্রবল বাসনা আমরণ পোষণ করে, বেলা তাহাই করিল। তারপর দোরের পানে চাহিয়া বলিল, সে বুঝি আর এলো না!

বাহিরে একসঙ্গে অনেকগুলা জুতার শব্দ শুনা গেল এবং একটা শব্দ এই ঘরের কাছে আসিয়া বাহিরেই থামিয়া গেল। পরিতোষ জুতাটা বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ঘরে ঢুকিল। হরিবল্লভ বেলার মুখের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিলেন, বেলা, বেলা, দেখো, দেখো, একটিবার চাও, পরিতোষ এসেছে।

বেলা চাহিল। চক্ষু মেলিতে বড় কষ্ট, তবু মেলিল। মুখখানি প্রসন্ন হইল। ডান হাতটি অধরোষ্ঠের উপর রাখিয়া অতিকষ্টে বলিল, তুমি দিও।

পরিতোষ আসিয়াই বেলার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়াছিল, নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বেলার মুখে হাসির মৃদু একটি রেখা ফুটিয়া উঠিল; বলিল, বুঝতে পারলে না? নিঃসন্তান মরার বড় দুঃখ। ছেলের যেটা বড় কাজ, তুমি করো। মুখে আমার—

কথাটা শেষ হইল না। পরিতোষ তাহার পায়ের উপর মাথাটা ঠেকাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

তার তিনঘণ্টা পরে বেলার জীবনাবসান হইল।

ছয়

পরদিন আপিসের লোক সবিস্ময়ে দেখিল, হরিবল্লভের পায়ে জুতা আছে; কিন্তু বড়সাহেবের পা খালি। হরিবল্লভ শান্তভাবে কাজ করিতে লাগিলেন; বড়সাহেব আধঘণ্টা পরেই চলিয়া গেলেন।

মনোহরলাল ইহার টীকাভাষ্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই পরম অনুগত ও বাধ্য শকুনিই ঝঙ্কার দিয়া বলিল, এখন থামুন মশাই, ইতরামির অনেক সময় পাবেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাহা রবীন্দ্রনাথ রচিত ছোটগল্পেরই ইতিহাস। বাংলা ছোট গল্প শুধু যে তাঁহার হাতে গঠিত তাহা নয়, তাহার বর্ত্তমান পরিণতির মূলেও রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম যুগ হইতে শুরু করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ ছোটগল্প রচনা করিয়াছেন এবং একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার অধিকাংশ গল্পই বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ক্রমপরিণতির সহিত তাঁহার গদ্যরচনার পদ্ধতিও নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। সজনী-কান্ত দাস বলেন—"রবীন্দ্রনাথের পদ্য ও গদ্যজীবনের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে একটা অসামঞ্জস্য দেখা যায় যে, কাব্যে ও কবিতায় হাঁটি-হাঁটি পা-পা করিয়া টলিতে টলিতে কবি অগ্রসর হইয়াছেন ;...কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য সূত্রপাত হইতেই সক্ষম ও সবল—ঈশ্বরচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার উপর তাঁহার ভিত্তিমূলকে স্বীকার করিয়াই তাঁহার যাত্রা। তাঁহার আদিতম গদ্যরচনা "মেঘনাধবধ কাব্য সমালোচনা" ও "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" বাংলা গদ্যের সাধু ও ও চলিত দুই পদ্ধতির অপূর্ব্ব নিদর্শন।

(—অলকা, পৌষ, ১৩৪৫)

বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষার কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষাকে মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত করিয়া বর্ত্তমান রূপ প্রদান করিয়াছেন। ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা' কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয় ; দ্বিতীয় গল্পটি ঐ বৎসরের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'নবজীবনে' 'রাজপথের কথা' নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীব-দ্দশায় সর্ব্বশেষ প্রকাশিত গল্প 'বদনাম' ১৩৪৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে ; আর মৃত্যুর পর শারদীয়া আনন্দবাজারে 'প্রগতি সংহার' গল্পই প্রকাশিত হইল।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি যুগধর্ম্ম এবং রুচি অনুসারে বহুবিধ প্রথম শ্রেণীর গল্প রচনা করিয়াছেন। ইহা শুধু রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

গল্প-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলা-ভাষায় প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'মধুমতী' (শ্রী পুঃ লিখিত) ১২৮০ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর মাঝে মাঝে কয়েকটি ছোটগল্প প্রকাশিত হইলেও ১২৯৪ সালের পূর্ব্বে ধারাবাহিকভাবে বাংলা ছোটগল্প প্রকাশিত হয় নাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্য তথা বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 'ভারতী' 'সাধনা' ও 'সবুজ পত্রের' প্রকাশ বিধাতার বিশেষ আশীর্ব্বাদ। রচনাভঙ্গীর ক্রমপরিণতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যকে সুকুমার সেন তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন :—

প্রথম যুগ, ১২৮৩ হইতে ১২৯০ সাল—জ্ঞানাঙ্কুর—ভারতী।

মধ্যযুগ—১২৯১ হইতে ১৩১৯ বা ১৩২০ সাল—হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী।

তৃতীয় যুগ—১৩২১ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত সেনের গ্রন্থের প্রকাশকাল—১৩৪১ পর্য্যন্ত।

আমার মনে হয় তৃতীয় যুগের পর একটি চতুর্থ যুগ আছে, তাহার সূচনা শেষের কবিতার প্রকাশ তারিখ ১৩৩৫ হইতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল ১৩৪৮ পর্য্যন্ত। যদিচ যোগাযোগ (১৩৩৪—আশ্বিন) ও 'শেষের কবিতা' রচনা হিসাবে সম-সাময়িক, তথাপি উভয়ের রচনাপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারার এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কালের গল্পগুলি "শেষের কবিতার" ভঙ্গীতেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ১২৮৩ সালে কার্ত্তিক মাসে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ; তখন হইতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা নিয়মিতভাবে ভারতীতে প্রকাশ হইতে থাকে, প্রথম সংখ্যাতেই 'মেঘনাদবধ কাব্য'

প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। কবির বাল্যরচনার মধ্যে এই আলোচনা প্রবন্ধটি সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীর প্রথম বর্ষের আশ্বিন সংখ্যা হইতে তাঁহার 'করুণা' নামক উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পর বৎসর ভাদ্রসংখ্যায় তাহা শেষ হয়। এই গ্রন্থটির পুর্নমুদ্রণ হয় নাই। ১২৮৬ সালের ভারতীতে 'য়ুরোপ যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' প্রকাশিত হয়, এই রচনাটিতে তিনি সর্ব্বপ্রথম চল্‌তিভাষা ব্যবহার করেন। ১২৮৮ সালের ভারতীতে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হয়, তারপর ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ক্রমপরিণতি দেখাইবার জন্য উপরোক্ত তালিকা বিস্তারিত ভাবে দিলাম। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হইলেও ১২৯৮ সালে হিতবাদী প্রকাশের পূর্ব্বে নিয়মিতভাবে তাঁহার গল্পাবলী প্রকাশিত হয় নাই। হিতবাদীতে তাঁহার দেনাপাওনা, গিন্নী, পোষ্টমাষ্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, ব্যবধান ও রামকানা'য়ের নির্ব্বুদ্ধিতা নামক বিখ্যাত গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। এই ১২৯৮ সালে তাঁহার 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' ও ১২৯৮ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'কঙ্কাল' গল্পটি প্রকাশিত হয়। তারপর ১২৯৯ সালের 'সাধনা'র কার্ত্তিক সংখ্যায় 'জয় পরাজয়', অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'কাবুলীওয়ালা' ও চৈত্র সংখ্যায় 'দান প্রতিদান' এবং 'ভারতী' ও 'বালকে' 'সফলতার দৃষ্টান্ত' প্রকাশিত হয়।

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা' প্রকাশিত হয় এবং ১৩০২ সালে সাধনা প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যযুগ এই সাধনার যুগ, এই সময়েই তাঁহার গদ্য এবং পদ্য রচনা একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে এবং এই সময় হইতেই বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-যুগের সূচনা হয়। 'মধ্যবর্ত্তিনী', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মাষ্টার মশায়', 'রাসমণির ছেলে', 'ঠাকুর্দ্দা', 'হালদার গোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুর-সঙ্গীত লক্ষিত হয়। গল্পগুলির রচনাকাল জানা যায় না, কিন্তু এই গল্পগুলিতে শুধুমাত্র যে রবীন্দ্র-রচনার একটা অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতা লক্ষিত হয় তাহা নয়, তাঁহার অপরূপ মননশীলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই সময় হইতেই বাংলা ছোটগল্প একটা আকার লাভ করিল।

ব্যবহারিক জগতের ধূলিমলিন রূপ, দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি, পল্লী প্রকৃতির যে তথ্য অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত ছিল রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব প্রতিভায় তাহা অপসারিত হইল। ভাবের সূক্ষ্মলোকে যে কবি-মন বিচরণ করে, হৃদয়-বেদনার যে বিচিত্র সুর-তরঙ্গের আঘাতে-অভিঘাতে তাঁহার মন আচ্ছন্ন ছিল, তাহারই অপূর্ব্ব অভিব্যঞ্জনা এই কাহিনীগুলি। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে আজো রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত এই রীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে।

১৩০৫ হইতে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ভারতীতে নিয়মিত লিখিতে সুরু করেন এবং ১৩০৮ হইতে ১৩১৩ পর্য্যন্ত 'বঙ্গ দর্শন' (নবপর্য্যায়) সম্পাদন করেন। সাধনার যুগে রবীন্দ্রনাথের যে-শক্তির উন্মেষ দেখা গিয়াছিল তাহা এই সময়ের মধ্যে "অপূর্ব্বরূপে বিকশিত ও অলঙ্কৃত হইয়া উঠে, এই সময়ে লেখা গল্প, উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন। গদ্য পদ্যের মত সুষমাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।" (—সুকুমার সেন)

শরৎচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন—'মানুষ বিরহ-কাতর হইয়া প্রিয়জনের নিকট পত্রে নিজের মনের গোপন ব্যথা জানায়, ছোটগল্পের জন্ম সেখানে। প্রণয়-পত্র হইতে ছোট গল্পের উদ্ভব। হৃদয়ের প্রেমের সমস্তটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে রিক্ত করিবার উপায় ছোটগল্প, ইহা সমগ্র জীবনের কথা নহে।' (ভবানীপুর সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত অভিভাষণ)

ছোটগল্প সমগ্রজীবনের ঘটনা নয়, জীবনের সামান্য অংশ, সামান্য ঘটনার সন্নিবেশেই ছোটগল্পের উৎপত্তি, ছোটগল্পের পরিধি তাই ব্যাপক নয়, স্বল্পপরিসর। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি—'। জীবনের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলাবৈচিত্র্য শিল্পীর মনে ধরা দেয়, তারপরই কথা ও কাহিনীর উৎপত্তি। এই কারণে উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পের রচনা-কৌশল অধিকতর কঠিন ও সূক্ষ্ম।

রবীন্দ্রনাথের সমাপ্তি, দৃষ্টিদান, মাল্যদান, মধ্যবর্ত্তিনী, প্রায়শ্চিত্ত, দুরাশা, মহামায়া, একরাত্রি, শেষের রাত্রি প্রভৃতি গল্পগুলির মূল সুর প্রেম। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন—"অধিকাংশ রবীন্দ্র-ছোটগল্পই একান্তভাবে গীতি-কবিতার ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে, চিত্তের একটা বিশেষ 'মুড্', একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই তাঁহার অধিকাংশ গল্প অনুপ্রেরণা

লাভ করিয়াছে। যে মনোধর্ম্ম—মনের যে বিশেষ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভাকে গীতধর্ম্মী করিয়াছে, সেই মনোধর্ম্ম, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁহাকে তাঁহার ছোটগল্পের উৎসের সন্ধানও দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাঁহার গীতি কবিতার আর একটি দিক্—অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতি-কবিতারই গদ্যরূপ।"

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার গল্পগুলিতে পল্লীজীবনের চিত্র, পল্লীবাসীর দুঃখ কাহিনী, অপরিবর্ত্তনীয় পল্লী-প্রকৃতির, মানব-জীবনের চিরন্তন সুখ দুঃখের কাহিনী পাঠকের মনে ক্যামেরায় গ্রথিত নিখুঁত ফটোচিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'দৃষ্টিদান' গল্পটিতে সম্পূর্ণভাবে একটা নিগূঢ়প্রকৃতি প্রেম ও অতীন্দ্রিয় ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া চক্ষুহীনের মনে যে অন্তর্দৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যবোধের ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

'মাল্যদান' গল্পটিতে সাংসারিক বিচারবুদ্ধিহীনা সরলা বালিকার প্রথম প্রেমের ব্রীড়া বিনম্রভঙ্গীটুকু অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পের মধ্যেও কবি-মনের পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

'মধ্যবর্ত্তিনী' গল্পের মধ্যে শুধু যে হৃদয়বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নয়, বাস্তব জীবনের এক নিদারুণ সমস্যা এই গল্পের বিষয়বস্তু। প্রেমের পীড়নে নিবারণের মত সাধারণ প্রাণীর পরিণাম, হরসুন্দরীর নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা এবং শৈলবালার ট্রাজেডি বিশেষভাবে অন্তরকে স্পর্শ করে।

শেষের রাত্রি ও দুরাশা গল্পের মধ্যেও সূক্ষ্ম মনো-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই গল্পগুলি হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিলে রচনা-মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ নমুনা পাওয়া যাইত, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা দেওয়া সম্ভব হইল না।

এই সময়ে রচিত কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলির পরিচয় দিবার প্রয়োজন বোধ করি না, বাংলা সাহিত্যের সহিত যাহার সামান্যতম পরিচয় আছে, তাঁহারাও এই গল্পগুলি পড়িয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পাবলী ১৩০৮ সাল হইতে ভিন্নরূপ ধারণ করিল। ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'নষ্টনীড়' রচিত হয়। আকার দীর্ঘ হইলেও, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি সমালোচকবৃন্দ 'নষ্টনীড়'কে ছোট গল্পের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। 'নষ্টনীড়' আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের একটি নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বতন গল্পগুলির অন্তর্নিহিত সারল্যের সুর এই কাহিনীর মধ্যে না থাকিলেও অসামান্য শক্তিপ্রভাবে ও ভাবের অভিনবত্বে তাহা অসীম সাফল্য লাভ করিয়াছে। বিশ্বজগতের সহিত কবির চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, বোধের যোগ—তাই লিপিকুশলতার গুণে এই জাতীয় রচনা এত রসগর্ভ হইয়াছে উঠিয়াছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন—

"রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথাসাহিত্যের এই নবধর্ম্মের অগ্রদূত হইলেও শুধু মাত্র বুদ্ধির দীপ্তিতেই তাঁহার এই ধরণের গল্পগুলি আলোকিত হয় নাই, যুক্তির প্রাখর্য্য ও বর্ণনার চাতুর্য্যই তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড হইয়া উঠে নাই; বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে মিলিয়াছে হৃদয়ের সহজ দরদবোধ, যুক্তির প্রাখর্য্যের সঙ্গে মিলিয়াছে অন্তরের গভীর রসানুভূতি, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়াছে সহজ সৌন্দর্য্যবোধ, বর্ণনা চাতুর্য্যের সহিত মিলিয়াছে অপূর্ব্ব কলা-কৌশল, বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়াছে ভাব ও কল্পলোকের সত্য ও সৌন্দর্য্য।"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্ম্ম স্বকীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত কোনো মতবাদ বা নিয়মের গণ্ডীতে তাঁহার স্বতোৎসারিত ভঙ্গী ব্যাহত হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ Religion of Man-এ বলেছেন—"What is Art? It is the response of Man's creative soul to the call of the Real."

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনাবলীতে সর্ব্বদাই নূতন সুর, নূতন রূপ, নূতন প্রকৃতি প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার সাহিত্য তাই নিত্যনবনবায়মান সৌন্দর্য্যের উৎস।

নষ্টনীড়ে অমল ও চারুর পারস্পরিক সম্পর্ক ভূপতি ও চারুর নীড় নষ্ট করিয়া দিল—ইহাই অমল-চারুর দীর্ঘকাল-ব্যাপী সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতার স্বাভাবিক পরিণতি। সামাজিক সংস্কারাচ্ছন্ন মন এই সম্পর্ক প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে না, কিন্তু কবি এখানে প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া হৃদয়-বৃত্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-কৌশলে সমগ্র কাহিনীটি এমন অভিনব ভঙ্গীতে সাজানো হইয়াছে, যাহাতে পাঠকচিত্ত লেখকের বক্তব্য অনুমোদন না করিয়া পারে না। সমস্যাপ্রধান কাহিনীর এই ভঙ্গীটুকুই প্রধান।

১৩২১ সালে সবুজপত্র প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি (১৩০৮-৯) ও নৌকাডুবি (১৩১০-১২) বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় এবং ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস হইতে ১৩১৬ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত প্রবাসীতে গোরা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। গোরাতেই সর্ব্বপ্রথম পাত্র-পাত্রীর মুখে কথ্য ভাষা সংযোজিত হইল। ইতিমধ্যে ১৩১৮ সালের ভাদ্র হইতে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত প্রবাসীতে 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হয়। তারপর ১৩২১ সালে সবুজপত্র প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি অসংখ্য রচনা ইহাতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই একটি নূতন যুগ—সবুজপত্র প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যও এক নতুন পথে মোড় ফিরিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পসপ্তকের গল্প-গুলি, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে উপন্যাস, লিপিকার কথা-চিত্র বা কবিতাবলী সবই তাঁহার দিগন্তপ্রসারী প্রতিভার পরিচায়ক।

১৩২১ সালে 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হইবার দীর্ঘকাল পরে ১৩৩৪ সালে নূতন উপন্যাস যোগাযোগ প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' সমসাময়িক রচনা হইলেও উভয়ের প্রকৃতি বিভিন্ন। রবীন্দ্র-নাথের পরবর্ত্তীকালের রচনা যথা—দুই বোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায় এবং অধুনা প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'তিন সঙ্গী'র রচনাভঙ্গী 'শেষের কবিতা'র রচনাভঙ্গীর সহিত তুলনীয়।

'ঘরে-বাইরে' 'যোগাযোগ' 'এবং শেষের কবিতা' উপন্যাস বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য না হইলেও রবীন্দ্র-ভঙ্গীর ক্রম-পরিণতি হিসাবে এই উপন্যাস গুলির অপূর্ব্ব রচনাপদ্ধতির কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য মনে করি। ঘরে বাইরে উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্রটি অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তুর্গেনিভের Rudin চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"Portrait of Rudin lives in Sandip—"। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেন—'সন্দীপ নবীন য়ুরোপ, নিখিলেশ প্রাচীন ভারতবর্ষ ও বিমলা বর্ত্তমান ভারত, বিমলা এই দোটানার ভিতর পড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে, মুক্তির পথ কোন দিকে খুঁজে পাচ্ছে না।' ঘরে বাইরেতে বিমলার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি কল্যাণীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের 'কুমুদিনী' রবীন্দ্রনাথের আর একটি অপরূপ সৃষ্টি, তাহার চরিত্র বজ্রাদপি কঠোর আবার কুসুমের মত মৃদু, ক্ষুদ্রতা নীচতা তাহার ঘৃণা উদ্রেক করে, অপরূপ সংস্কৃত ও মার্জ্জিত মন তাহার, পুরুষের মন তাহাকে টানে না, সে চিরন্তনী নারী, কুমুদিনী চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের—

'পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি নহি,
অবহেলে ফেলিবে তলায় সেও আমি নহি॥'

এই সুরটি বর্ত্তমান।

এর পর রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত এবং বহুল-আলোচিত গ্রন্থ 'শেষের কবিতা' প্রকাশিত হয়। উপন্যাস আকারে প্রচারিত হলেও, 'শেষের কবিতা' আকৃতি ও প্রকৃতিতে বড় গল্প হিসাবেই গৃহীত হইবে। 'শেষের কবিতা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও তীক্ষ্ণধার যুক্তির দীপ্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমালোচকবৃন্দের মতে সমন্বয়-সুষমা ও কবিত্ব-মণ্ডিত বিশ্লেষণশক্তির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সমূহের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবী করিতে পারে। শেষের কবিতার 'চম্পূ-গল্প', শেষের কবিতার কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা-হিসাবে 'মহুয়া'য় সংযোজিত হইয়াছে। শেষের কবিতার 'লাবণ্য ও অমিত' চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত সৃষ্টি। দু-একজন সমালোচক ঘরে বাইরের বিমলা ও সন্দীপের সহিত লাবণ্য ও অমিতের তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু লাবণ্য ও অমিত একই শিল্পীর আঁকা সম্পূর্ণ নূতন ছবি। যে-সব উদ্ধত সমালোচক 'রবীন্দ্র-যুগের অবসান ঘটেছে' বলিয়া আলোড়ন সুরু করিয়া-ছিলেন 'শেষের কবিতা' প্রকাশের পর তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

শেষের কবিতার পর দুইবোন ও মালঞ্চ প্রকাশিত হয়। কাহিনী ও সুরসঙ্গতি-হিসাবে এই উভয় গ্রন্থই এক সুরে গ্রথিত। 'দুই বোনে' শর্ম্মিলার স্বামী শশাঙ্ক স্ত্রীর নিকট সকল প্রাপ্য গ্রহণ করিয়াও উর্ম্মিমালার সান্নিধ্য লাভ করিয়া নূতন আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। রোগশয্যায় শর্ম্মিলা ব্যথা ও বেদনায় আকুল হইয়া উঠিল, স্বামী সব বুঝিলেও উর্ম্মিমালার মোহ কাটাইতে পারিলেন না—

অবশেষে উর্ম্মিমালাই শশাঙ্ককে মুক্তি দিয়া গেল। মালঞ্চ গ্রন্থে আদিত্যের স্ত্রী নীরজা অসুস্থ হইয়া পড়িল, আদিত্যের দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়া সরলার আগমনে নীরজা ক্রমশ শঙ্কিত হইয়া উঠিল, স্বামীর কাছে অভিযোগ করিল, তারপর আদিত্য আবিষ্কার করিল সরলাকে ছাড়া অসম্ভব, সে কখন সরলাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। আদিত্য সরলাকে ছাড়িতে পারিল না, নীরজাও সরলাকে ক্ষমা করিল না, এমন কি মৃত্যুশয্যায় সে সরলার প্রতি কটূক্তি করিয়া গেল। নীরজার মৃত্যুর পর আদিত্য সরলাকে গ্রহণ করিল। দুই বোনের উর্ম্মিমালা শশাঙ্ককে মুক্তি দিয়াছিল, মালঞ্চের নায়িকা অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর 'শূন্যতা পূর্ণ করিবার' ব্যবস্থা করিয়া দিল।

'চার অধ্যায়' গ্রন্থের কাহিনী শুধু নূতনত্বের জন্য নয়, আরো কয়েকটি কারণে বিশেষ আন্দোলনের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নায়িকা এলা স্বদেশসেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, বিবাহের প্রস্তাবকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু একদা এলা আপনাকে হারাইয়া ফেলিল, অতীনের সংস্পর্শে তাহার ভাবান্তর ঘটিল, এলা অতীনের হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিল। কিন্তু অতীন ধরা দিল না, লৌকিক জগতে তাহাদের মিলন ঘটিল না। চার অধ্যায়ের এই 'এলা' চরিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশেষ প্রকাশিত গল্প 'প্রগতি-সংহারের' নায়িকা 'সুরীতি' চরিত্রের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, আর অতীন যেমন এলার হাতে আপনাকে ধরা দেয় নাই, নীহারও তেমনই সুরীতিকে ধরা দেয় নাই বরং হৃদয়হীনের মত বঞ্চনা করিয়াছে।

চার অধ্যায় সম্পর্কিত আন্দোলনের পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত কৈফিয়ৎ-এ বলেন—

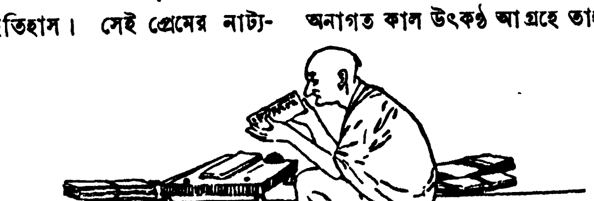
"চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কি না সে তর্ক সাহিত্য-বিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্য-রসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলা দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।"

চার অধ্যায় প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথের রবিবার এবং ল্যাবরেটরি নামক দুটি গল্প আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; অপর একটি গল্পের সহিত পরে এগুলি তিনসঙ্গী নামক সম্প্রতি-প্রকাশিত গল্পগ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে ল্যাবরেটরি ও সম্প্রতি প্রকাশিত বদনাম ও প্রগতিসংহার গল্প দুটিতে শুধু মাত্র অসামান্য শক্তির পরিচয় নয়, কল্পনার অভূতপূর্ব্ব বলিষ্ঠতা লক্ষিত হয়।

এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে তাঁহার সমুদ্রসদৃশ গল্প-সাহিত্যের সমালোচনা করার ধৃষ্টতা নাই; কবিত্বের ছন্দে, উপলব্ধির আবেগে, রসের পরিপূর্ত্তিতে যে অপূর্ব্ব অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রভাতসূর্য্যের মতই প্রকাশ।

আজিকার বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের সমকক্ষ বলিয়া আমরা দাবী ও গর্ব্ব করিতে পারি এবং এই উৎকর্ষের মূলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা যে কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার রচিত ছোটগল্পের ক্রমপরিণতি তথা বাংলা ছোটগল্পের পরিণতির এই ধারাবাহিক বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাংলার সাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রধান বাহন বঙ্কিমচন্দ্রে যে সাহিত্যের সূচনা, রবীন্দ্রনাথে যাহা আকৃতি ও রূপ পাইয়াছে—তাহা অতঃপর কোন্ শক্তিমান সাহিত্য-স্রষ্টার বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় বর্ণচ্ছটায় ইন্দ্রজাল রচনা করিবে অনাগত কাল উৎকণ্ঠ আগ্রহে তাহাই লক্ষ্য করিবে।



স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

১১

শীতকালের সকালবেলাকার রৌদ্রটি ঢেঁকিশালে আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল। কাল নবান্ন। ঘরে ঘরে চাল কুটিবার উৎসব সুরু হইয়াছে। কাছে তাহার ছোট ভাই একটা ভাঙ্গা মাটির পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে। নীহার আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, বলিল, সই তোর কাজ সারা হোল? আজকের খবরের কাগজটা এনেছি—এই দে'খ। অনেক নতুন খবর রয়েচে, দু'জনে মিলে পড়ব। দাদাকে কলকাতা যাবার সময়ে আমি বলে দিয়েছিলুম যেন আমাদের নামে একটা কাগজ পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেয়। দেখছি আমার কথা ভুলে যায় নি। ঠিকই পাঠিয়েছে।

মালতী ম্লানমুখে বলিল, আমার তো এখন সময় হবে না। এখন অনেক চাল কুটতে হবে, তারপর পিঠে গড়তে হবে। রান্নাবান্নাও সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে। আজ ছোটমার শরীর খারাপ। কাল রাত্রি থেকে জ্বরের মত হয়েছে। নীহারের উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আসিল, তবুও সে মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, আচ্ছা ওবেলায় তুই আসিস আমাদের বাড়ীতে। কেমন? তখন তো আর বেশি কাজ থাকবে না। রাতদিন তোর এত কি কাজ থাকে ভাই?

নীহার চলিয়া যাইবামাত্র ঢেঁকিশালার পুবদিকের কোঠা হইতে একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ নারীকণ্ঠের আহ্বান ধ্বনিত হইল, মালতী! ও মালতী! একপহর বেলা হ'য়ে গেল, এখনও মুখে জলটুকু পড়লো না, ধাড়ীমেয়ের সকাল থেকে হচ্চে কি? ও বাড়ীর ধিঙ্গি মেয়েটার সঙ্গে রসকথা হচ্ছে না কি? দিন দিন গোল্লায় যাচ্চো, যার তার সঙ্গে মিশবি নে।

মালতী চাল কুটিবার কাজ ফেলিয়া ত্রস্ত ভীত পদক্ষেপে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ছোটমা দুর্গামণি শয্যায় শুইয়া শুইয়াই ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, এই যে পড়ে আছি—একবার খোঁজ নেওয়া নেই, যত্ন-আত্তি নেই। সতীনের কাঁটা। হাজার খাওয়াও মাখাও, পর কখন আপনার হয়!

এসব কটূক্তি শোনা মালতীর নিত্য অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সে জবাব দিবার চেষ্টা না করিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাঠকুটা জ্বালিয়া সাবু চড়াইল। রোগীর পথ্য রাঁধিয়া নবান্নের জোগাড় করিয়া, রান্না খাওয়া শেষে এক পাঁজা বাসন লইয়া মালতী যখন খিড়কির ডোবাটাতে নামিল তখন শীতের দিনাবসান হইতে আর বড় বাকি নাই।

যুগীপাড়ার চারু তখন ঘাটে ছিল। ব্যস্তভাবে কাপড় কয়েকটা কাচিয়া তুলিতেছিল। মালতী ডাকিয়া শুধাইল, ও চারু, তোমার ভাইপো আজ কেমন আছে?

ভাল নয় দিদিঠাকরুণ। আজ দুপুর থেকেই জ্বরটা আবার চেপেছে। আজ প্রায় একমাস হ'য়ে গেল, কিছুতেই আর জ্বর সারছে না। কত কুইনিন্ খেলে, দু'দিন ভালো থাকে, আবার জ্বরে পড়ে। আর মা মাগীকে বললেও শোনে না দিদিঠাকরুণ, যা পায়—খাইয়ে দেয়। আজ সকালে বাসি তরকারি দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিল, ছেলেটা পাশে বসবামাত্র এক খাবা হাতে তুলে দিলে। আমি বললে বলে, ভালমন্দ জিনিস এক খাবা ছেলের হাতে দিতে পাব না, এমন খেরেস্তানি ডাক্তারি আমাদের ধাতে সয় না। তা আমার ভাজ কিছু মন্দ বলে না। দোষই বা তাকে কেমন ক'রে দিই দিদিঠাকরুণ বল? সত্যিই তো একেবারে উপোস দিলে আর ক'দিন। যাই দিদি, বেলা পড়ে এল। আর গল্প নয়। ছেলেটা জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। আবার একখোলা চাল ভাজতে হবে।

চারু চলিয়া গেল। মালতীর বাসন মাজিতে মাজিতে মনে কেমন একটা অবসাদ আসিল। শীতের ম্লানসন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে, ডোবার পাড়ে একটা বাঁশঝাড়, তাহার পরে গোটা দুই তেঁতুল গাছ অস্তগামী সূর্য্যের কিরণসম্পাতে লাল হইয়া উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়া কন্‌কন্ করিয়া উঠিতেছে। জীবনের এমনই একটা শীতল ম্লান তীক্ষ্ণতাই যেন কেবল অনুভূত হয়। কোন দিকে আনন্দ নাই, সুখ নাই, মাধুর্য্য নাই। মালতী যখন মামার

বাড়ীতে ছিল, একখানি খাতা করিয়া রবিবাবুর, অতুল-প্রসাদের, রজনীকান্তের অনেকগুলি গান টুকিয়াছিল। বারংবার পড়িয়া সেগুলি প্রায়-কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। রবি ঠাকুরের একটা গান তাহার মামাতবোন মীরা প্রায়ই গাহিত,

'ডাকিলে মোরে জাগার সাথী
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে ···

সেই গানটা কি জানি কেন তাহার বারবার মনে পড়িতে লাগিল। এ জীবনের এই অবসাদ আর অন্ধকার হইতে তাহাকে যে জাগাইবে? তাহার আবির্ভাব কেন হয় না? শুধু সে নিজেই নয়, সমস্ত লোকেই যেন নিষ্ক্রিয়তায় জড়তায় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। হঠাৎ এই নিরানন্দ অন্ধকার কাটিয়া যায়, বিভাস বাজিয়া ওঠে প্রভাতের আলোকের সঙ্গে ··· চিন্তার সূত্র কাটিয়া গেল। ছোট ভাইটা কাঁদিতে কাঁদিতে পুকুরের পাড়ে আসিয়া হাজির হইল, দিদি, আমাকে মা মেরেছে। মুড়ি দে। তাড়াতাড়ি হাতের বাসন কয়খানা মাজিয়া ভাইটাকে সঙ্গে করিয়া সে বাড়ী আসিল। উপস্থিত আর গৃহকাজ কিছু বাকি নাই। নীহার বলিয়া গেছে। এবেলায় সময় করিয়া অল্পক্ষণের জন্যও যে করিয়া হোক তাহার বাড়ী একবার যাইতে হইবে। না হইলে আবার যে অভিমানিনী মেয়ে। ভাইটাকে হাত-মুখ মুছাইয়া একটা জামা পরাইয়া কোলে তুলিয়া লইয়া সইয়ের বাড়ীর পথে বাহির হইল।

নীহার তখন একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মালতীকে দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল, সই, দেখছিস 'বন্দে মাতরম' নিয়ে কি ভীষণ গোলমাল চলছে। আশ্চর্য্য! দেশের এত বড় শিক্ষিত বড় বড় লোকরা আর কি মাথা ঘামাবার বিষয় খুঁজে পেলে না? কোন্ গানে কি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, কোন্ বইয়ে কতটুকু সাম্প্রদায়িক কটাক্ষ রয়েচে—এই সব বৃথা জল্পনায় বেলা গেল।

মালতী তাহার হাত হইতে কাগজটা টানিয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ তাহার ভারি হাসি পাইল। চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একটা দৃশ্য: মুগীপাড়ার চারুর ভাইপোটা পেটজোড়া পিলে লইয়া জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে উঠিয়া মায়ের পাশে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার মা বাসি তরকারি-মাখান মুড়ি গোলা পাকাইয়া স্নেহভরে ছেলের হাতে তুলিয়া দিতেছে। "আহা ভালো মন্দ এক থাবা না পাইলে বাছার প্রাণ বাঁচা চাই তো!" বাংলা দেশের এই দৃশ্যের পরেই 'বন্দে মাতরম্' গানটি জাতীয় সঙ্গীত হইবে কি-না তাহার চুল-চেরা বিচার! হাসি পায়, কষ্ট হয়। নিরর্থক অসংলগ্নতায় রাগও যে না হয় তাহা নহে।

নীহার জিজ্ঞাসা করিল, সই, হাসলি কেন?

মালতী বলিল, এমনই হাসি পেল। সংসারে হাসি পাবার মত জিনিসের এখনও অভাব ঘটেনি, মাঝে মাঝে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আচ্ছা নীহার, তোর দাদার চাকরি হোল?

—না ভাই, দাদা আবার বি. এ. পড়ছে। একটা টিউশনি করে। বাবার বন্ধু কে একজন মস্ত বড়লোক, তিনি নাকি বলেছেন দাদা বি. এ. পাশ করলেই ভালো চাকরি দেবেন।

মালতী খুশী হইয়া বলিল, তাই নাকি? তা হ'লে তো খুব ভালোই হয়। তা হ'লে ভাই তোর দাদাকে লিখিস্ যেন রবি ঠাকুরের 'চয়নিকা' বইটা পাঠিয়ে দে'ন। কেমন, লিখবি তো?

নীহার সম্মত হইয়া কহিল, হ্যাঁ, পরের চিঠিতেই লিখে দেব।

বেশিক্ষণ বসিয়া গল্প করিবার হুকুম মালতীর ছিল না। তাই সে বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িল।

১২

বিনয় আবার বি. এ. পড়াতে তাহার বন্ধুর দল খুব খুশী হইয়া উঠিয়াছে।

শরদিন্দু জোরের সঙ্গে কহিল, আরে ও তো যোগীনবাবু একরকম কথাই দিয়েছেন। কোন রকম ক'রে বি. এ-টা পাশ ক'রে ফেল। তারপর তোমাকে একটা ভালো, চাকরিতে ঢুকিয়ে নিশ্চয়ই দেবেন। বেশি কথার মানুষ নন ওঁরা। যা বলবার সংক্ষেপেই বলেন। কিন্তু সে বলার দাম আছে।

বিনয় আশার উজ্জ্বল দিকটাই জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল। সকালে বিকালে দুইটা টুইশানি জোগাড় করিল। মাকে চিঠি লেখাতে তিনি জবাব দিলেন, এমন সুযোগ

কখনও ছাড়া উচিত নয়। তাঁহার যে দুই-একখানা গয়না আছে তাহা বিক্রয় করিয়াও তিনি বিনয়ের কলেজের মাইনে, পরীক্ষার ফী দিবেন। এমন কিছু ভাবনার কারণ নাই। সে যেন এ সুযোগ না হারায়। বিনয় আবার পড়া সুরু করিল। সকালের দিকে শোভাবাজারে ফোর্থ ক্লাসের দু'টি ছাত্র আর থার্ড ক্লাসের একটি ছাত্রকে দু'ঘণ্টা পড়াইয়া দশটি টাকা পায়। বিকালের দিকে ছেলে পড়াইতে ভবানীপুরে যাইতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মনটা সর্ব্বদাই অবসন্ন হইয়া থাকে। তবু ভবিষ্যতের আশাটাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরে। শোভাবাজারের ছাত্রদের বাড়ীতে সেদিন সকালে যখন পড়াইতে গেল তখন বেলা ন'টা বাজিয়া গেছে। গত রাত্রিতে ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল, অনেক রাত্রি অবধি ঘুম হয় নাই। উঠিতে বেলা হইয়া গিয়াছিল। সবচেয়ে বড় ছেলে ভবেশ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—মাষ্টার মশাই, এত দেরী করেন আজকাল, ইস্কুলের কোন টাস্ক হয় না। এত দেরী করলে রোজ রোজ চলবে না বলে দিচ্ছি। মাষ্টার রেখেও ইস্কুলে বকুনি খেতে পারব না।

বিনয়ের হঠাৎ এত রাগ হইল, ইচ্ছা হইল ভবেশের গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারে। অনেক কষ্টে আপনাকে সংবরণ করিল। মেজ ছেলে সুধা কহিল, তা নয় তো কি, আপনার যদি সুবিধে না হয় পষ্টাপষ্টি বলে দিলে তো পারেন। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব হয়।

বিনয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বহু যত্নে সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, ভবেশ, একটা কাগজ দাও দেখি। ভবেশ তাহার এক্সারসাইজ বুক ছিঁড়িয়া একটা পাতা দিল। পকেট হইতে কলমটা টানিয়া লইয়া খস খস করিয়া পদত্যাগ পত্র লিখিয়া বিনয় কাগজটা ভাঁজ করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, এটা রেখে দাও। তোমার বাবাকে দিও। কাল থেকে আর আমি আসব না। অন্য জায়গায় ভাত ছড়িয়ে দেখতে পার।

রাগের মাথায় সে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তখনও মাথার ভিতরটা শান্ত হয় নাই। রাগে কান ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এতটুকু ছেলে, সম্বন্ধে তাহার ছাত্র, সেও পয়সার জোরে তাহাকে অপমান করিতে পারিল! সারা দুনিয়াটা কি শুধু টাকার জোরেই চলিতেছে। এখানে মনুষ্যত্ব মাপিবার অন্য কোন মানদণ্ড নাই!

১৩

রাস্তায় যাইতে যাইতে একটা পার্কের ভিতর বিপুল জনসমাবেশ দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য বিনয় ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে একজন বক্তা বক্তৃতা দিতেছেন। জাপানীরা যে সমস্ত মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিয়া একান্ত অন্যায়ভাবে চীন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই চরম অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন। ভীড় জমিয়াছে, সকলেই উৎসুক হইয়া শুনিতেছে।

বিনয়ের হাসি পাইল। বিশ্বমানবতার কোন রন্ধ্রপথে এই আহ্বান ধ্বনিত হইবে? কে প্রতিবিধান করিবে এই অন্যায়ের? অন্যায়! অন্যায়ের উপরেই তো গোটা জগতটা চলিতেছে। কাঁধের উপর কে হাত রাখিল, মুখ ফিরাইয়া বিনয় দেখিল—তাহাদেরই গাঁয়ের মহেন্দ্র, দীনু কাকার ছেলে। শুনিয়াছিল বটে বহুদিন হইতে সে কলিকাতায় চাকরি করে, কিন্তু ঠিকানা জানিত না বলিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখা হয় নাই। খুশী হইয়া কহিল, আরে, মহীনদা যে! মহেন্দ্র বলিল, কতদিন তোর সঙ্গে দেখা নেই, চল্ চল্ নিকটেই আমার বাসা। সেখানে ব'সে একটু গল্প গুজব করা যাক। তোর কলেজের আবার দেরি হবে না তো?

বিনয় বলিল, না, আজ শনিবার। আমার প্রথম ঘণ্টায় ক্লাস নেই।

বাগবাজারের গলির ভিতর একটা জীর্ণ খোলার একতলা বাড়ী। মহেন্দ্র বাড়ী ঢুকিয়া হাঁকিল, ওগো, বিনয় এসেছে। শীগ্‌গীর চা তৈরি করে দাও দেখি।

বারান্দার এক পাশে দরমা দিয়া ঘেরা রান্নার স্থান, সেখানে কয়লার ধুঁয়া উঠিতেছে। একটি মাস ছ'য়েকের শিশু উবুড় হইয়া শুইয়া চেঁচাইতেছে। পাশের ঘরে আর একটি ছেলের ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যাইতেছে, আ-মি-বা-র্লি খাব, আমি চিনি দিয়ে বার্লি খাব, বড্ড খিদে পেয়েছে। ওমা··· মহীনদা একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া বিছানাটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন, বড় ছেলেটা আজ আবার দিন পনের থেকে ক্রমাগত ভুগছে। জরটা

ছাড়চে না। বলি ওগো শুনতে পাচ্ছ, চট্ ক'রে পেয়ালা দুই চা তৈরি করে দাও। বিনয়ের আবার কলেজ আছে, কতক্ষণ বসবে।

বিনয় বলিল, আবার এই অসময়ে চায়ের জন্যে বৌদিকে বিরক্ত করা কেন। নাই বা হ'লো চা। কি দরকার?

মহেন্দ্র হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, এতদিন পরে দেখা হোল, অন্তত এক পেয়ালা চা খাবিনে?

প্রত্যুত্তর স্বরূপ পাশের দরমা-ঘেরা জায়গা হইতে আরও ধোঁয়া উঠিতে লাগিল, কে একজন একটা হাত পাখা নাড়িয়া প্রাণপণে উনুন ধরাইবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারা গেল। পাশের ঘরে বার্লির আবেদন জানাইয়া ছেলেটা আরও করুণ স্বরে চেঁচাইতে লাগিল।

বিনয় প্রশ্ন করিল, তোমার ছেলেটি এত বেলা অবধি এখনও কি পথ্য পায় নাই মহীন্দা? চল না দেখে আসি কেমন আছে।

মহেন্দ্র তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে কহিল, ও ছোঁড়াদের পিছনে আর কত খেটে মরব বল'। যতই কর আর যতই দাও, রাতদিন ওরা চিঁ চিঁ করবেই।

এই অন্ধকার স্যাঁত্‌সেতে ভাপ্‌সা বাড়ীতে বসিয়া এই অল্পক্ষণের মধ্যেই বিনয়ের মাথা ধরিয়া উঠিল। সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহারা দিনের পর দিন মাসের পর মাস ইহারই মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করে কেমন করিয়া। ইতিমধ্যে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে একখানা আধছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়া কলাই-করা পেয়ালায় দু পেয়ালা চা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিনয় শুধাইল, আচ্ছা মহীনদা বৌদিদের তো গাঁয়ের বাড়ীতে রাখলেই পার। এখানে এমন ভাবে—

সেই মেয়েটি আবার একখানা পিতলের রেকাবিতে তেলে ভাজা পাঁপর লইয়া ঘরে ঢুকিল। এইটি বুঝি তোমার বড় মেয়ে? বাঃ বেশ···খুকী, তোমার নাম কি? অপর্ণা··· বাঃ বেশ নাম।

মহেন্দ্র সদুঃখে কহিল, গাঁয়ের বাড়ীতে তোর বৌদিকে রাখব কার কাছে, কোন্ ভরসায় শুনি? মা নেই, বাবা নেই। আর জ্যোঠামশায়দের ব্যবহার, সে না বললেই ভালো। পাড়াগাঁয়ের কাণ্ড সব জানিস তো।···তোর কলেজের বুঝি সময় হয়ে এলো। আচ্ছা, আসিস্ মাঝে মাঝে। আমার চাকরি তো এখন নয়। সেই রাত ন'টায় ডিউটি আরম্ভ। দিনের বেলাটা ছুটি পাই। এখন খেয়ে দেয়ে ঘুম দেব। পাশের বাড়ীর বিপিনবাবুদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েচে, তাঁদের ভরসাতেই তোর বৌদিদের রেখে রাত্রি-বেলার চাকরির জায়গায় ছুটি।

মহীনদার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিনয় আবার পথে নামিল। একটু আগে বাগবাজারের ছাত্রদের বাড়ীতে জবাব দিয়া আসিবার সময় মনে মনে যে উত্তেজনা ও রাগ সঞ্চিত হইয়াছিল এখন একটা বিষণ্ণ করুণায় তাহা ঢাকিয়া গেল। টাকা, টাকার জন্য মানুষে কিই না করিতেছে, আর এই বস্তুটির অভাবে তাহাকে কতই না সহ্য করিতে হইতেছে। মহীনদা, আহা অতগুলি কাচ্চা বাচ্চা বৌদিকে লইয়া ঐ খোলার বাড়ী, ঐ দৈন্যদশা। কে জানে কাজটা ছাড়া ভালো হইল কি না। ছেলেটা মাস্টারের মান্য না রাখিয়া অযথা রূঢ় কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অভিভাবক কিছু বলেন নাই এখনও। মেসে ফিরিতে একটু বেলা হইয়া গেছে। অন্য ছেলেরা খাইয়া দাইয়া কলেজ গেছে। সামনের ঘরটায় মেসের ম্যানেজার কাঠের হাতবাক্স সম্মুখে রাখিয়া হিসাব নিকাশ মিলাইতে-ছিলেন, ডাকিয়া কহিলেন, ও বিনয়বাবু, একবার এদিকে শুনে যান দেখি।

বিনয় ঘরে ঢুকিল।

ম্যানেজার কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া দু-একবার ইতস্তত করিয়া অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন, আপনার ও মাসের গোটা দশ আর তার আগের মাসের আট—আঠারো টাকা বাকি পড়েছে। টাকার বড্ড টানাটানি যাচ্ছে, যদি কিছু···

বিনয়ের চোখ মুখ ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। তাহার হাতে গোটা দুই টাকা আছে মাত্র। বাগবাজারের কাজটার আজ জবাব দিয়া আসিল সেখানে বরঞ্চ একমাসের পাওনা বাকি ছিল, কিন্তু আর কি উহারা দেবে···

বিনয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, এই দশ তারিখের মধ্যেই আমি যে ক'রে পারি সব মিটিয়ে দেব। আপনার বলবার দরকার নাই।

সে বাহির হইয়া আসিতেছিল, পিছনে শুনিল ম্যানেজার আপন মনেই বলিতেছে, আবার দশ তারিখ! কিছু কিছু

ক'রে দিয়ে গেলে তবে যদি শোধ হয়, নইলে কোন দশ তারিখেই শোধ হবার আশা নেই।

কষ্টে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া বিনয় বাহির হইয়া আসিল। পৃথিবীর রূপ আর এক রকম করিয়া তাহার চক্ষে ঠেকিতে লাগিল। কোথাও কোন আবরণ নাই, রস নাই, প্রীতি নাই। কেবল আগাগোড়া ব্যাপিয়া একটা রসলেশ-হীন নির্লজ্জ উলঙ্গ স্বার্থ লইয়া চারিদিকে মারামারি হানাহানি চলিতেছে।

১৪

রত্নময়ী হাঁকিয়া বলিলেন, ও নীহার, কলাছড়াটা যেন খরচ করিসনে। ও আমি আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছি, সত্যনারায়ণ হবে। বিনুর আমার পরীক্ষাটি ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে যাক, আমি স' পাঁচ আনার ভোগ দেব।

নীহার পট্টবস্ত্র পরিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া কলা ছড়া ভালো করিয়া তুলিয়া রাখিল। রাখিবার সময় মনে মনে কহিল, হে ঠাকুর, দাদা যেন ভালো ক'রে পাশ করে। সংসারের এই দুর্দ্দিন যাচ্ছে, তুমি যদি মুখ তুলে চাও, তা হ'লে দাদা পাশ করে বেরিয়ে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ও পাড়ার কৈবর্ত্ত পিসি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া পান জর্দ্দা মুখে ফেলিয়া রত্নময়ীকে সম্বোধন করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কহিতে লাগিলেন, বৌমা, তোমার ঐ ছোট ব্যাটা অতুলকে বাছা সাবধান ক'রে দিও, দিন দিন ভারি বজ্জাত হচ্ছে। কাল দুপুর বেলায় মজুমদার-পুকুরে দাঁড়া দিয়ে কোন্ না তিন পোয়াটাক্ হালি পোনা ধরে এনেছে। মজুমদার-গিন্নী শুনতে পেয়ে যেন খেপে গেছে। তাও বলি বাছা এই অল্প বয়েস, এখন থেকে লেখা পড়া ছাড়ালে কেন? লেখা নেই পড়া নেই, সমস্ত বেটা-ছেলে—কৈবর্ত্ত-পিসী ঠোঁট উল্টাইয়া এক প্রকার অদ্ভুত মুখ-ভঙ্গী করিলেন।

রত্নময়ী ব্যথিত হইয়া কহিলেন—না পিসি, অতুলের খেলা-পড়া ছাড়াব কেন, তবে কি জান, কর্ত্তা মারা গেলেন, বিনুকে কলকাতায় পড়ার খরচ পাঠাতে হচ্ছে, কত দিকে আর একা বিধবা মানুষ সামলাব। তাই এ বছরটার মত অতুল বাড়ীতেই পড়ছে। সামনের মাসে বিনুর আমার বি. এ. পাশ হয়ে যাবে। ওঁর বন্ধু, খুব বড়লোক। কলকাতায় মস্ত কারখানা, নিজের গাড়ী, মোটর। সেই তিনি বলে রেখেছেন—বিনু বি. এ পাশ করলেই তাকে চাকরি দেবেন। তারপরে, ও আমার চাকরিতে ভর্ত্তি হ'লেই অতুলকে পড়াবো, সামনের বছর থেকে সে আবার ইস্কুলে পড়বে। ছোট ভাইকে কি আর বিনু লেখাপড়া ছাড়তে দেবে। এতেই বলে আমাকে কত বকে চিঠি লিখেছে।

কৈবর্ত্ত-পিসি অর্দ্ধেক বিশ্বাস করিয়া এবং অর্দ্ধেক অবিশ্বাস করিয়া সন্দেহ-দোদুল্যমান চিত্তে কহিলেন, তা হ'লে তো খুবই সুখের কথা বাছা। তা হ্যাঁগা, বিনুর আমাদের চাকরির বুঝি সব একেবারে ঠিকঠাক?

রত্নময়ী সগর্ব্বে কহিলেন, ঠিকই এক রকম বই কি। খুব বড় কাজ কি না, বি. এ পাশ নইলে অত বড় কাজ সামলাতে পারবে কেন, তাই সায়েব বলেছে—সবই তো পড়া আছে, পাশটা কেবল দিয়ে এস গে।

কৈবর্ত্ত-পিসি আর একটু সরিয়া আসিয়া আত্মীয়তার সুরে কহিলেন, আহা, হোক মা, হোক। ভগবান দিন দেবেন বই কি। তা বাছা বিনু এবারে বাড়ী এ'লে আমার নাতিটার জন্তে একটু বলে রেখো দিকি। যদি তাদের আপিসে সায়েবকে বলে কয়ে একটা ছোট মোট কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারে। না বৌমা, হাসির কথা নয়, আমি যাবার পথে মজুমদার-গিন্নীকে খুব শুনিয়ে দিয়ে যাব। যদি ছেলেমানুষ সখ ক'রে হালি পোনা গোটাকতক ধরেই থাকে, তবে এত কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? তার জন্তে এত বকাবকিই বা কিসের, এত শাপমন্যি দেবার ঘটাই বা কেন!

রত্নময়ী বিবর্ণ মুখে কহিলেন, ওমা, আমার দুধের ছেলেকে শাপ দিচ্ছিলো নাকি মাগী! আচ্ছা, আমি অতুলকে ডেকে ধমকে দেব যাতে সে আর মাছধরা-টরার ত্রি-সীমানা দিয়ে না যায়। আর তোমার নাতিটির জন্ত বলবো বই-কি পিসি, তুমি কিছু ভেবো না। হাজার হোক, তোমার নাতি ফার্ষ্ট কেলাস পর্য্যন্ত পড়েছে। অমনি তো নয়। পিসি পরম পুলকিত হইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধা আর একটু দোক্তা মুখে দিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন; কি মনে হওয়ায় আবার বসিয়া কহিলেন, আর ও পাড়ায় হরিমতির বাড়ীতে কাল দুপুর বেলায় মজলিস হয়ে আলোচনা হচ্ছিলো, তোমার নীহারের এই এতখানি বয়সেও বিয়ে থা হচ্ছে না

কেন। আমি স্পষ্টবক্তা লোক, উচিত কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়িনে। আমি বললাম, অত ঘোঁট কেন রে বাপু! আজকাল খেড়ে না করে আর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কোন্‌খানটায়। কার বাড়ীতে না খেড়ে মেয়ে রয়েছে, কই, তোরা দেখা দিকি।

তুমি কিছু ভেব না বৌমা, পরের কথাতে কানই দিও না। এই বলিয়া একাধারে উপদেশ এবং আশ্বাস দিয়া পিসি প্রস্থান করিলেন।

নীহার আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। তাহার চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ধীরে মায়ের কাছে আসিয়া ম্লান মুখে দাঁড়াইল।

রত্নময়ী মাটির দিকে চাহিয়া নতমুখে বসিয়াছিলেন। অপরাহ্নের বেলা গড়াইয়া গেল। শীতের ম্লানসন্ধ্যার আসন্ন ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, নীহার বলি-বলি করিয়া কি একটা কথা যেন বলিতে পারিতেছিল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া রত্নময়ী বলিলেন, একবার অতুলকে ডাক দিকি।

নীহার ভীতকণ্ঠে কহিল, মা, ছোটদাকে কিছু বোলো না। আমিই তাকে মাছ ধরতে বলেছিলাম। ক'দিন থেকে কিছুই তরকারিপাতি নেই, শুধু ভাত আর আমি ছোটদাকে দিতে পারিনে। আমার কেমন লাগে।

তুই বলেছিলি!—রত্নময়ী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পরের জিনিস চুরি ক'রে নোলা ভরানো নাই-বা হোলো। কেন কাউকে হাটে পাঠালেই তো হোত।

নীহার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিল। হাটে পাঠানো যে অসম্ভব, হাতে পয়সা নাই। ধান বিক্রীর টাকা কবে ফুরাইয়া গেছে। রত্নময়ী নিজের হাতে খরচ-পত্রের হিসাব রাখেন না, ওসব তিনি বড় একটা বোঝেনও না। তাহার হাতেই সবভার।

এতদিন চারটি করিয়া ধান বিনিময় দিয়া সে বাগদী-কৃষাণদের নিকট বেগুনটা কুমড়োটা জোগাড় করিতেছিল। কিন্তু সকলসময় তাহাদের কাছেও পাওয়া যায় না। আর ধানও ফুরাইয়াছে।

কিন্তু অতুলকে ডাকিতে হইল না। সে কোথা হইতে এক পা ধূলা ভরিয়া একটা ছেঁড়া গেঞ্জি এবং ময়লা হাফ্‌প্যান্ট পরিয়া আসিয়া হাজির হইল।

মা ধমক দিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে অতুল, ইস্কুল যাসনে বলে কি একবার বই নিয়ে ব'সতে নেই। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াবি আর লোকের চুরি-চামারি করে বেড়াবি! তোর জন্যে যে লোকের কাছে মুখ দেখানোর উপায় রইলো না রে।

অতুল মুখের একপ্রকার কদর্য্যভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, হ্যাঃ, ইস্কুল থেকে নিজে নাম কেটে দিলেন, আমি ইস্কুলে পড়লে যে তোমার সাধের বড়ছেলের পড়া হবে না। এখন আবার লেখাপড়ার জন্যে আমার পিছনে লাগতে এসেছেন! চুরি তো করবই, বাড়ীতে খেতে না পেলে যেমন ক'রে হোক তার জোগাড় করতে হবে।—অতুল আর প্রত্যুত্তরের জন্য সেখানে না দাঁড়াইয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

রত্নময়ী ব্যথায় এবং অসহ্য বিস্ময়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নীহার কাতরস্বরে বলিল, মা, দাদা কবে আসবে? তার পরীক্ষার আর কত দেরি? বি. এ. পাশ নাই-বা হোত। বেশী বড় চাকরী না হোক, ছোটখাট চাকরী একটা করলেও তো আমাদের সংসারের দুঃখ ঘুচত।

মা কোন সঠিক জবাব দিতে পারিলেন না। তবু তাঁহার ম্লান শুষ্ক মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আশ্বস্তস্বরে মেয়েকে বলিলেন, আর ক'টা মাস সবুর কর্‌ বাছা। বিনয় পাশটা করে কাজে ঢুকলেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। কোন ভাবনাই তখন আর থাকবে না।

সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। কে একটা লোক মোটাগলায় চীৎকার করিতেছে, একঠো জরুরী তার আছে বাবু!

রত্নময়ী শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। অস্ফুটকণ্ঠে কহিলেন, ও নীহার, দেখ তো তার কোথা থেকে এসেছে? হে মা মঙ্গলচণ্ডী, মুখ রেখো মা। আমার বাছার যেন কিছু না হয় মা। তোমাকে বুক চিরে রক্ত দোব মা।

নীহার নিজেও ভয় পাইয়াছিল কম নয়। পল্লীগ্রামের গৃহস্থ বাড়ীতে চিঠিই কখনো কালে ভদ্রে আসে, তার আসে না সহজে। আসিলে অশুভ ভাবনাটাই বেশি হয়। তথাপি সে মুখে সাহস দিয়া কহিল, অত ভয় পাচ্ছ কেন মা। আমি ও বাড়ীর ভট্টচায্যি জ্যেঠাকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি পড়ে দেখুন। ছোটদা তো দিনে রাত্রিতে কখনোই বাড়ী থাকে না। একটা কাজেও কখনো আসে না।

ভট্টচার্য্য মহাশয় আসিয়া তার পড়িয়া দিলেন। কলিকাতায় বিনয়ের নিকট হইতে তার আসিয়াছে, এক সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার ফী দাখিল করিতে হইবে, অবিলম্বে দেড়শো টাকা পাঠাও। সেই দেড়শো টাকা পাঠাইতে রত্নময়ীর স্বল্পাবশিষ্ট যে কয়েকটি আভরণ তখনও বাকি ছিল তাহার মধ্যে সবচেয়ে ভারি যেখানা, সেখানা বিক্রয় হইয়া গেল। ক্রমশঃ

চারুকলার রূপ ও অভিব্যক্তি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

'আর্ট' বা ললিত কলার সীমাবদ্ধ কোন একটি সংজ্ঞা নাই। তার দান—আনন্দম্। সে আনন্দ বলিবার নয়, বুঝাইবারও নয়; শুধু উপলব্ধির বস্তু। রূপ ও অরূপের মিলনে এই আনন্দের জন্ম হয়। কথাটা আরও প্রাঞ্জল করিলে বলিতে হয়—বিশ্বস্রষ্টার দান এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৌন্দর্য্য সকলেই উপভোগ করে সত্য—কিন্তু যথার্থ উপলব্ধি কয়জনের ভাগ্যে সম্ভব হয়?

সাধনার ফলে অধিকারীর অন্তরে যখন অরূপের রূপ প্রকাশিত হয় তখন সেই মিলনের ফলে তিনি রস-সাগরে ডুবিয়া যান। তাঁর বাহ্যচেতনা থাকে না, বিচারবুদ্ধি থাকে না, নিজের অস্তিত্বও থাকে না। থাকে শুধু—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, কেবল আনন্দ। সে অসীম আনন্দ চেষ্টায় মিলে না, ঐশ্বর্য্য তাহা দিতে পারে না, জ্ঞানেও তাহা ধরা দেয় না। পাইবার শুধু একটি রাস্তা—স্রষ্টার কৃপা। শিল্পী যখন পার্থিব সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ-লোকসানে উদাসীন থাকিয়া একমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনাতেই মগ্ন থাকেন, কেবল তখনই প্রাণ সেই অবিকারী বস্তুর সন্ধান পায়। সে অবস্থা বড়ই দুর্লভ। আবার যখনই দেহীর মায়িক দৃষ্টি প্রবল হয়, মনে প্রতিষ্ঠা জাগে, বাসনা আসে, জ্ঞানের দীপ নিবিয়া যায়, তখন আনন্দও শিল্পীকে ছাড়িয়া যায়। তথাকথিত শিল্পী বা কলা-সম্পদ এ অপার্থিব আনন্দের ত্রি-সীমায়ও পৌছাইতে পারে না। এর জন্য চাই—প্রাণ, জ্ঞান, আর ধ্যান; কৃপা আপনি আসিবে।

সাহিত্যের ন্যায় কলাশিল্পেরও প্রকৃত উদ্দেশ্য—লোক-শিক্ষা। কতকগুলি উদ্দেশ্যবিহীন মধুর শব্দবিন্যাসকে যেমন সাহিত্য-সৃষ্টি বলে না, তেমনি বর্ণের কতকগুলি মনো-রঞ্জক খেলার নামও 'কলা' নয়। যে সাহিত্য বা শিল্প মানুষের মনের খোরাক না জোগাইবে, যাহা মানুষের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক কোন কাজেই আসে না, সেগুলি কিছুই নয়, আর তার জীবনও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যে সাহিত্য দেশকে আদর্শ দেয়, জাতির মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, সে সাহিত্য অমর; যেমন—রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি। এগুলিকে 'সাহিত্য' বলিলে অমর্য্যাদা করা হয়। এদের নাম—'মহাকাব্য'—যাহা সর্ব্বসাহিত্যের পরিণতি। কাল ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, বিপ্লব ইহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। জাতির পতনাবস্থার সময় যখন দেশের শিক্ষাদীক্ষা নষ্ট হয়, লোক আদর্শভ্রষ্ট হয়, মনুষ্যত্ব হারায়—তখনও এই মহাকাব্যই মৃত্যুর হাত হইতে দেশকে, জাতিকে, সমাজকে রক্ষা করিতে পারে। তাই ইহার যথার্থ নাম—জীবন-সাহিত্য। ইহার রচয়িতাও তেমনি মৃত্যুঞ্জয়; নতুবা এত বড় দানের অধিকারী তিনি হইবেন কি করিয়া?

শিল্প-জগতেও সেইরূপ বহু শিল্পী অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের সৃষ্টিও তেমনি বিশ্বব্যাপী। শত শত বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাত সে সৃষ্টিকে নষ্ট করিতে পারে নাই; ভাবের বিন্দুমাত্রও উহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, রূপের সামান্যও মালিন্য ঘটে নাই। ইহার পর কত শিল্পী জন্মিল, চিত্র ছাড়িয়া কত বৈচিত্র্য রচনা করিল, তবু তাহারা ক্ষণস্থায়ী পঙ্গু। তাহাদের সে চিন্তাশক্তি নাই, তুলিকার সবলতাও নাই।

র‍্যাফেলের 'মায়ের হাসি' আজও অবিকৃত, টিশিয়ানের বর্ণঝঙ্কার তেমনি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, মাইকেল এঞ্জিলো প্রস্তরেই যৌবনের প্রাণ-সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কালের সাক্ষী—দ্রষ্টা—স্রষ্টা—অমর।

সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদি সকলের অন্তরালেই একটি সনাতন অবিকারী বস্তু আছে, সেটি—সত্য। সত্যকে বাদ দিয়া রং ফলান কেবল মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া; কারণ সমস্ত জগতটা সত্যকেই আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অভ্রভেদী প্রাসাদ নির্ম্মাণ তখনই সম্ভব হয় যখন তাহার ভিত্তিটি প্রাসাদের গুরুত্ব বহন করিতে সমর্থ হয়, নতুবা থাকিবে কাহার উপর? সাহিত্য, কলা প্রভৃতিও সত্যকে বিকৃত করিয়া জন্মিতে পারে না, কারণ তাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হয়। শিশুর শুভ্রকেশ সম্ভব নয়, হইলে—তাহা ব্যাধির ফল। বৃদ্ধের দেহে পূর্ণযৌবন অঙ্কিত হইলে

তখন 'চ্যবন মুনির' কথাই শুধু মনে পড়িবে, সে বৃদ্ধ আমাদের মর জগতের কেহই নয়। সত্য যদি অবিকৃত থাকে, আদর্শও তখন সুলভ হয়; আর সেই আদর্শে কাব্য শিল্প ইত্যাদি তৈরী করিতে দুর্জ্ঞের শব্দেরও প্রয়োজন নাই, দুর্ভেদ্য পরিকল্পনারও আবশ্যকতা হয় না। রামায়ণের ভাষা চাষারও বোধগম্য হয়। একটি কথাও জটিল নয়; কারণ—সত্যই ওর প্রাণ, আর—ধর্ম্মই ওর দান। এই রামায়ণ যদি অধিক পাণ্ডিত্য-রসে ভাবনা দেওয়া হইত তবে দুনিয়া-জোড়া আসনটি ইহার খর্ব্ব হইত। লোকে বলে—ভাষাটি যেন বাইবেলের মত সরল। বাইবেল বা রামায়ণের স্রষ্টা এ জগতে কয়জন জন্মিয়াছে?

চারুকলার পক্ষেও ঐ কথা। যে চিত্রের দিকে চাহিবা-মাত্র তাহার ভাব ও ভাষা লইয়া দর্শকের সমক্ষে আত্মপরিচয় দেয় তাহাই জীবন্ত ও প্রকৃত কলা। চিত্র অপেক্ষা যার ভাষ্য প্রবল তাহা চিত্র নয়—আর তিনিও শিল্পী নহেন। জগজ্জয়ী নামের একটি চিত্রও নির্ম্মাতার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যদি ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে "আলেখ্য" না বলিয়া "লেখ্য" বলাই সঙ্গত; কারণ "লেখ্যকে" যে মূর্ত্তিমান করে তাহাই হইল "আলেখ্য"।

এ দেশে আজকাল ললিতকলার সংজ্ঞা, সূত্র ও অধিকারে বিশেষ জটিলতা দেখা দিয়াছে। তাহা ব্যতীত "কলা"র শ্রেণী-বিচারেও মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে। দর্শক শিল্প-রস উপভোগ করিতে যাইয়া শিল্পের বহু শাখা, প্রশাখা দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। ফলে চিত্রের ভাবমাধুর্য্য আদৌ উপলব্ধি হয় না। শিল্পীরা দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক শ্রেণীর শিল্পীরা নিজেদের চিত্রকে idealistic art অর্থাৎ আদর্শ-প্রধান চিত্র বলেন। প্রচলিত ভাষায় তাহার নাম—Indian art বা Oriental art অর্থাৎ 'ভারতীয়' চিত্রকলা। তাহাদের অঙ্কন পদ্ধতি নিজস্ব বস্তু এবং বাস্তবের সহিত প্রায় সম্পর্কহীন। নিজেদের প্রণালী ছাড়া অঙ্কিত অন্যান্য চিত্রকলাকে ইহারা Western art বা "পাশ্চাত্য" চিত্র বলিয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে আরও একটি আখ্যা দেন—ইহারা Realistic বা বাস্তব চিত্র। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের শিল্পীরা প্রকৃতির সহিত সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কলাশিল্পের অনুশীলন করেন। ইহাদের চিত্রে বাস্তবের প্রাধান্যই বেশী। তাই বলিয়া ইহারা আদর্শকে ত্যাগ করেন নাই। ভারতের বিষয়বস্তু, রীতিনীতিকে যথাযথভাবে চিত্রে প্রকাশ করিলে তাহা পাশ্চাত্য বলিয়া গণ্য হইবে এ সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার স্থান এ ক্ষীণজীবী নিবন্ধে সম্ভব নয়; তবে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া কোন কলাই বাঁচিতে পারে না, শুধু এই কথাটিই সাধারণভাবে বর্ত্তমানে বলা হইতেছে। 'বাস্তব' ও 'আদর্শ' উভয়েই প্রকৃতিগত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি লাভ করা যায় না, যেহেতু বাস্তবের মধ্যেই আদর্শের জন্ম। দুনিয়া ছাড়িয়া অন্য কোথাও হইতে আদর্শ আসে না। এক কথায়—বাস্তবের পূর্ণতাই আদর্শ। বস্তু খুঁজিতে খুঁজিতে পরে বাঞ্ছিত জিনিস মিলে; বস্তুই যদি না থাকে পছন্দ আসিবে কোথা হইতে? এই পছন্দেরই সংস্কৃত নাম—আদর্শ। আদর্শ শব্দটা খুবই দুর্ল্লভ; যেমন আদর্শ পিতা—আদর্শ গুরু—আদর্শ গৃহিণী ইত্যাদি। আদর্শ পিতা অর্থে—হাজার হাজার পিতার মধ্যে যিনি বহু গুণে গুণী তিনিই আদর্শ পদবাচ্য; তাই বলিয়া তিনি বাস্তবের উর্দ্ধে বায়বীয় কোন একটা পদার্থ নহেন—রক্ত মাংসে নির্ম্মিত অতি সাধারণ মানুষ। হাজার হাজার শিল্প-নিদর্শন ঘাঁটিয়া তেমনি দুই-একটি আদর্শ কলার দৃষ্টান্ত মিলে। জগতের ভাল-মন্দ সবই বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি। ইহার মধ্যে যেটি শিল্পীকে অধিক আকর্ষণ করে, শিল্পীও যাহার কামনা করেন তাহাই তাঁহার আদর্শ। এই কাম্য বস্তুটি জগতের একস্থানে পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে না। থাকিলে সেই আদর্শ অতি সস্তা হইত আর তাহাতে আদর্শের গৌরবও কিছু থাকিত না। আদর্শ পূর্ণতার অনুগামী। যৌবন অল্প বিস্তর সর্ব্বত্রই মিলে, কিন্তু যে যৌবনে ক্ষয় নাই, খাদ নাই সেই পরিপূর্ণ যৌবনকে আদর্শ বলে। আবার এই আদর্শ যৌবনটি বাস্তব জগতেই বিচ্ছিন্ন ও প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে।

কবি বলিয়াছেন, "মনুষ্যজগতে নিখুঁত রূপ নাই, নিখুঁত কাব্যও নাই।" কথাটি বাস্তবতার দিক দিয়া অক্ষরে অক্ষরে সত্য, কিন্তু আদর্শে সেই নিখুঁত রূপই চাই। শত শত লোকের মধ্যে দুই-একটি মিলিবে যাহাদের বাহু দুইটি অনিন্দ্য সুন্দর। তারপর হাজার হাজার খুঁজিলে চরণ যুগলেরও সন্ধান মিলিবে। আরও লক্ষাধিকের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য আঁখি; নাক, ঠোঁট সকলেরই সমন্বয় ঘটিবে। এইরূপে অগণিত লোক ভাঙিয়া গড়িয়া শিল্পী যে কল্পনার মূর্ত্তি তৈয়ারি

করেন তাহাই আদর্শ রূপ বা মানস-প্রতিমা। যদিও দুই-চার জনের মধ্যে এ সৌন্দর্য্য মিলে না, তথাপি ঐ আদর্শটি সম্পূর্ণ বাস্তব বা মায়িক জগতেরই সম্পত্তি। মানুষের চিন্তা যত গভীর ও বিস্তৃত হউক না, তাহাও আমাদের বাস্তব অর্থাৎ দৃশ্যমান প্রকৃতিকে লইয়াই কল্পিত হইবে। এমন কি, ঊর্দ্ধ জগতের দেবতার পরিকল্পনাতেও এই মানুষের পরিপূর্ণ রূপেরই ছায়াপাত করা হয়; কারণ কল্পনা ইহার ঊর্দ্ধে উঠিলে আর তাহা (মায়িক জগতের পক্ষে) বোধগম্যের অবস্থায় থাকে না।

উর্বশী নাকি স্বর্গে অপূর্ব্ব লাবণ্যের অধিকারিণী। এ হেন উর্বশী এ পৃথিবীর কোন শিল্পীর তুলিকাধীন হইলে তাহাকেও বাস্তবের সামায় আসিতে হইবে। যদি তিনি আদর্শের আতিশয্যে কুড়ি হস্ত পরিমাণ উচ্চতা লইয়া শিল্পীর দ্বারস্থ হ'ন তবে নিশ্চয়ই সেই চিত্রশিল্পী ইহাকে দৈব দুর্বিপাক মনে করিয়া চিত্র ছাড়িয়া উর্বশী রূপসীর নিকট বিদায় ভিক্ষাই চাহিবেন। যেহেতু অচিন্ত্য ও অবাঙ্মনীয় ইন্দ্রিয়াদি দেখিয়া শিল্পীর রূপের নেশা মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাইবে, আর বাস্তবিক যদি বিরাট স্বর্গের নর্ত্তকীর দৈর্ঘ্য ঐ পরিমাণই হয় তথাপি মর্ত্ত্যের ক্ষুদ্র জীবেরা তাহার যৌবনের প্রসারতায় হতভম্ব ছাড়া কখনও উল্লসিত হইবে না; কারণ এত দৈর্ঘ্যের ধারণা উহাদের চিন্তায় আসে না। ইহাকেই বলে মানুষের কল্পনার উপর বাস্তবতার অধিকার। সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলে উর্বশীর আর এ সংসারে স্থান মিলিবে না। সীমা ছাড়াইলে এত রূপেরও এই পরিণাম!

অনেক তথাকথিত পণ্ডিত শিল্পীরা আছেন যাঁহারা অঙ্কন বিদ্যায় নিতান্ত অপটু হইয়াও নিজেদের অক্ষমতার দানকে আদর্শের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। চিত্রে বাস্তব বা প্রকৃতির স্বাভাবিকতার কোন লক্ষণ নাই অথচ অবোধ্য পটকে অতি উচ্চ আদর্শের প্রতীক বলিয়া প্রচার করেন।

এ শ্রেণীর শত শত চিত্র অজ্ঞান ক্রেতার বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছে। উহাতে শিল্পরস এক ফোঁটাও নাই, কেবল মিথ্যাভাষ্যের সাহায্যে এই গুলিকে জোর করিয়া অচল টাকার মত চালান হইতেছে। সেইগুলি কাহার চিত্র তাহা বুঝিবার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয়। এক কথায়, তাহাকে বহু বর্ণের একটা অর্থহীন সংমিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। 'চিত্র' বলা হয় শু ফ্রেমের সাক্ষ্যের জোরে। অপর দিকে ইহার স্রষ্টারা—'আধ্যাত্মিক', 'অপ্রাকৃত' 'ঐতিহ্য' 'অসীম', 'নির্গুণ' প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য শব্দযোজনা করিয়া দর্শকের কেবল চিন্তাশক্তির অপব্যবহারই ঘটাইয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ জগতের বাহিরে যত বড় আদর্শই নির্ম্মিত হউক তাহা মানুষের কোন উপকারে আসিবে না; কারণ মানুষ তাহার খবর জানে না। 'এইটি কিসের চিত্র' এ কথার উত্তর বস্তুকেই দিতে হইবে। কিন্তু বস্তুই যদি না থাকে তবে পরিচয় দিবে কে? যেমন শিব চলিয়াছেন বলদে চড়িয়া। এখানে বাহনটির রূপ দিতে—শিং দুইটি ছাগলের মত, লেজটা কুকুরের মত, পেটটা হাতির মত, আর মুখটি কিছুর মতই নয়—হইলে জন্তুটির কি নাম হইবে? চিত্রে শিবেরও ঐ প্রকার দুর্গতি ঘটাইলে হতভাগা শিল্পীর পরকালেও আর শান্তি মিলিবে না।

ভারতীয় কলার রসজ্ঞগণ বাস্তবকে ত্যাগ করিয়া নিজস্ব সৃষ্টির পক্ষে যুক্তি দেন যে, মানুষের মূর্ত্তি ঠিক মানুষের মত অঙ্কন করা অতি সাধারণ ব্যাপার। ইহাতে শিল্পীর মন অতীন্দ্রিয় জগতের কল্পনা করিতে সক্ষম, তাই তিনি বাস্তবের ঊর্দ্ধেও চলিয়া যান; যেমন দেবদেবীর মূর্ত্তি পরিকল্পনায়। এ উক্তি উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাস্য—শিল্পী যখন সেই অতীন্দ্রিয় রূপ চিত্রে বিকাশ করিবেন তখন বিকাশের সাহায্য করিতে যে সব উপকরণ প্রয়োজন তাহা তিনি কি অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে আনয়ন করিবেন? আর দেবদেবীর হস্ত-পদাদির রূপ মায়িক জগতের ন্যায় হইবে অথবা বিষয়ের গুরুত্ব হেতু হস্তগুলি অদ্ভুতরূপে মস্তক হইতে উত্থিত হইবে? তা ছাড়া, তিনি অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই অতীন্দ্রিয় চিত্র যদি বাস্তব জগতের উপাদান দ্বারা নির্ম্মাণ না করেন তবে অতীন্দ্রিয় বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার উপায় কি? সাধারণ ইন্দ্রিয়যুক্ত এই পৃথিবীর লোকের তাহা বোধগম্য হইবে কি করিয়া? যেহেতু তাহারা অতীন্দ্রিয় জগতের কোন বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করে নাই।

আদর্শ ও বাস্তবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বস্তু উভয়েই এক, পার্থক্য কেবল গুণের তারতম্যে। উপলব্ধির বিভিন্নতায় আদর্শও লঘু-গুরু অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। আদর্শের প্রচলিত কোন মাপকাঠি নাই—ব্যক্তিত্বের উপর ইহার মানদণ্ডটি সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত থাকে।

চিত্র কি প্রণালী ও আদর্শে ত হইবে এই নির্দেশ

দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে একথা স্বচ্ছন্দচিত্তে বলা যাইতে পারে—প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যে চিত্রই হউক, প্রকৃতিকে ছাড়িয়া জন্মাইতে পারে না—কেন না, শিল্পীর কল্পনা ও সৃজন বিশ্বপ্রকৃতির বাইরে যাইতে পারে না। গেলে সূর্য্যকে 'চন্দ্র' অথবা পাহাড়কে 'বৃক্ষ' বলিলে প্রতিকার করিবে কে? *

সাহিত্যের যেমন 'বর্ণমালা', সঙ্গীতের যেমন 'স্বরগ্রাম'—আর 'কলা'র সেইরূপ 'প্রকৃতি বিজ্ঞান' আছে। ওগুলি তাহাদের স্ব স্ব ভাষা—যাহার সাহায্যের অভাবে সৃষ্টিও হয় না, অনুভূতিও আসে না।

জড় ও চৈতন্যের মিশ্রণে যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি বাস্তব ও আদর্শের সমাবেশে শিল্পজগৎ গঠিত। বাস্তবকে ক্ষুণ্ণ করিলে শিল্পের প্রাণশক্তিও কমিয়া যায়; তখন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে অশেষ প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।

আবার বলা হইতেছে—প্রকৃত কলা তাহাকেই বলে যাহার প্রতি দৃষ্টিমাত্রে দুর্জ্ঞেয় ভাব সরল হয়—উৎকট চিন্তাস্রোত মৃদুতর হয়; আর উন্নত আদর্শ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কলার নামে অবাস্তব একটা জ্যামিতির নক্সা দেওয়ালস্থ করিয়া তাহার রসাস্বাদনের জন্য মুহুর্মুহু কেবল অভিধানের শরণ লওয়াকে পরম অভিশাপের বিষয় ব্যতিত আর কি বলা যাইতে পারে?

আহ্বান

শ্রীদক্ষিণা বসু

মৃত্যুর প্রাসাদ হতে
আসে যে আদেশ
আমার অন্তর-দেশ
করে তাহা মেঘ-ম্লান
ভুলে যাই জীবনের গান;
অমোঘ সে বাণী—
আমার মনের তলে চলে কানাকানি,
যাব কি যাব না
না যেয়ে উপায় নাই তবু সে ভাব না।
ধরার ধূলির প্রেম—
সুকঠোর তাহার বন্ধন,
পারে না বাঁধিতে তবু।
প্রাণের স্পন্দন
নিমেষে নিভিয়া যায়,
হায়!
ক্রন্দনের মায়া-মহোৎসবে,
সে বাণী জানায়ে দেয়
সব কিছু ফেলে যেতে হবে।

যৌবনের ডাক

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

যৌবন প্রথম ডাক দিল যবে বন-মল্লিকারে
ফাল্গুনের দ্বারে—
তখনো কাটেনি দূর দিগন্তের ঘন বাষ্প রেখা,
তরুণের নবদূত আঁকে নাই সবুজের রেখা,
শূন্য মাঠ বিস্তৃত শ্রীহীন
ঐশ্বর্যবিহীন,
নগ্ন তরু আপনার দীনতারে পারেনি ঢাকিতে
জীর্ণতারে গোপন রাখিতে।
প্রথম ভাঙিল ঘুম সেথা এক বন-মল্লিকার,
চোখে দোলে রহস্য জড়িত তন্দ্রাভার।
আকাশের ডাক আসে বিচিত্র আলোতে;
ব্যাকুল বাতাস দূর হতে
স্পর্শ আনে স্বপ্ন শিহরিত:
শরমে রাঙিয়া ওঠে চিত্ত।
বেদনা-বিহ্বল-গন্ধ সুন্দরের মন্দির প্রাংগণে
ভেসে যায় অধীর পবনে
যৌবন-প্রথম ডাকে বন-মল্লিকারে
ফাল্গুনের দ্বারে।

জঙ্গম

বনফুল

২৮

মৃন্ময়ের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া, বিশেষত মৃন্ময়ের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা শুধু যে মুষড়াইয়া গিয়াছে তাহা নয়, কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের নিজের দুঃখও কম নয়, কিন্তু মৃন্ময়ের দুঃখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। শঙ্কর স্বেচ্ছায় খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখকে বরণ করিয়াছে, নিজের আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, দুঃখের ভারে ভগ্ন-মেরুদণ্ড হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে নাই। তাহার আদর্শ ঝুটা হইতে পারে, সে কিন্তু সে আদর্শ হইতে এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই, তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকেই এখনও আঁকড়াইয়া আছে অর্থাৎ তাহার এই কৃচ্ছ্রসাধন একটা বলিষ্ঠতা দ্বারা মহিমান্বিত। পিতামাতার বিরুদ্ধে অমিয়াকে বিবাহ করিয়া সে হয় তো ভুল করিয়াছে, কিন্তু সেই ভুলটাকে সংশোধন করিবার নিমিত্ত সে নিজের অহঙ্কৃত পৌরুষকে অপমানিত করে নাই। সগৌরবে উন্নত শিরে নিজের স্বেচ্ছাকৃত ভুলের জন্য লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছে ও করিবে। এমন কিছুই করে নাই বা করিবে না যাহা আত্মধিক্কারের গ্লানিতে সমস্ত অন্তর অহরহ বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। মৃন্ময়ের কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছে। হাসিকে বিবাহ করিয়া অন্তর্হিতা স্বর্ণলতার প্রেমে একনিষ্ঠ থাকিয়া পুলিশে চাকরি করিতে করিতে তাহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন হইলে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া দিব—এই অসম্ভব আদর্শকে অনুসরণ করিতে গিয়া মৃন্ময় স্বাভাবিক নিয়মে আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে স্বর্ণলতাকে ভুলিয়া হাসিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে! বিনিময়ে হাসির ভালবাসা সে পাইয়াছিল কিন্তু স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিয়া হাসি যেন খেপিয়া গিয়াছে। হাসি যদি মৃন্ময়কে আর একটু কম ভালবাসিত অথবা সে যদি আর একটু চাপা গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে হইত, তাহা হইলে তাহার ঈর্ষ্যা-ক্ষুব্ধ অন্তর এমন প্রখরভাবে হিংস্র হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে মৃন্ময়কে অকপটে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া এবং মনের ভাষার সহিত মুখের ভাষার পার্থক্য রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অকপটে সে মৃন্ময়কে এই প্রতারণার জন্য ধিক্কার দিতেছে। মৃন্ময়ের চাকুরিবিহীন জীবন হাসির বাক্যবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময়ের আর একটা মুশকিল হইয়াছিল, কাহারও কাছে সব কথা খুলিয়া বলিয়া সে মনের ভার লাঘব করিতে পারিতেছিল না। কাহার নিকট বলিবে! সে মুখ-চোরা প্রকৃতির লোক, কাহারও সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারে না, কাহারও সহিত তাহার হৃদ্যতা জন্মে না। ভন্টু তাহার পরিচিত, কিন্তু ভন্টুর অভিধান-বহির্ভূত বাক্যাবলীকে সে ভয় করে। হয় তো তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে কতকগুলা অদ্ভুত শব্দ সৃজন করিয়া বসিবে এবং যেখানে সেখানে আওড়াইতে থাকিবে। তা ছাড়া ভন্টুর এবং ভন্টুর পরিবারের সকলেরই সম্বন্ধে মৃন্ময়ের আর একটা কারণে কিঞ্চিৎ বিরূপ মনোভাব ছিল। স্বর্ণলতার অন্তর্দ্ধানের ব্যাপারটা ইহারা কেহই সহানুভূতির চক্ষে দেখে নাই, ইহাকে একটা কেলেঙ্কারির পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাহা লইয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছে। মৃন্ময়কে তাহারা অবশ্য অনুকম্পার চক্ষে দেখিত, কিন্তু মৃন্ময় পুনরায় যখন বিবাহ করিল তখন তাহা তাহাদের নিকট আর একটা স্থূল রসিকতার খোরাক জোগাইল মাত্র। সেজন্য মৃন্ময় ভন্টুকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে।

সেদিন শঙ্করকে নিকটে পাইয়া, শঙ্করের নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়া এবং তাহার সহানুভূতিপূর্ণ সহৃদয় আলাপে মুগ্ধ হইয়া মৃন্ময় নিজের সমস্ত কথা শঙ্করকে খুলিয়া বলিয়াছিল। অনুরোধ করিয়াছিল শঙ্কর যেন আবার আসে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ফেরত তাই সে পুনরায় একদিন মৃন্ময়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল। দেখিল মৃন্ময় একাই আছে, মুকুজ্যে মশাই বাহিরে গিয়াছেন। শঙ্কর বলিল, "চলুন একটু বেড়িয়ে আসা যাক—"

"চলুন।"

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকদূর নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর মৃন্ময় বলিল, "জ্বালাতন হয়ে উঠেছি—"

"কেন ?"

মৃন্ময় কোন উত্তর দিল না। শঙ্কর চাহিয়া দেখিল সে অন্যদিকে চাহিয়া আছে। ক্ষণকাল নীরবতার পর সহসা বলিল, "চানাচুর খাবেন ?"

"আপত্তি কি—"

মোড়ে একটা লোক চানাচুর বিক্রয় করিতেছিল, মৃন্ময় আগাইয়া গিয়া তাহার নিকট হইতে তিন ঠোঙা চানাচুর খরিদ করিয়া ফেলিল। মনিব্যাগের ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটি পয়সা বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। ব্যাগটা উপুড় করাতে একটা আনি বাহির হইল। চানাচুরের দাম চুকাইয়া পয়সা দুইটি ব্যাগে পুরিতে পুরিতে বলিল—"বাস, দুটি পয়সা মাত্র বাকি রইল আর—"

"তিন ঠোঙা কিনলেন কেন ?"

"একটা আমার স্ত্রীর জন্যে নিয়ে যাব, ভারি ভালবাসে চানাচুর খেতে—"

হাসিয়া মৃন্ময় একটি ঠোঙা পকেটে পুরিল। আসলে চানাচুরওলাকে দেখিয়া হাসির কথাই তাহার মনে হইয়াছিল; হাসির জন্য কিনিতে গিয়াই ভদ্রতার খাতিরে আরও দুই ঠোঙা কিনিতে হইল।

চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে নীরবে উভয়ে হাঁটিতে লাগিল। মিনিট খানেক পরে শঙ্কর সহসা দেখিল মৃন্ময় পাশে নাই, সে যে কখন একটা কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে ভীড়ে শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারে নাই। শঙ্কর দেখিল একটা শো-কেসের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া মৃন্ময় দাঁড়াইয়া আছে।

"কি দেখছেন ?"

"কি চমৎকার শাড়িখানা দেখুন, কি অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠী রং—"

মৃন্ময় খানিকক্ষণ শাড়িটার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া বলিল, "যাই চলুন—"

আবার উভয়ে চলিতে সুরু করিল।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর মৃন্ময় আপন মনেই যেন বলিল "কে জানে—", তাহার পর শঙ্করের দিকে হঠাৎ ফিরিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনার কি ধারণা বলুন তো—"

"কি বিষয়ে ?"

"আবার নতুন ক'রে সুরু করলে শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে ?"

"নিশ্চয়—"

মৃন্ময় কোন উত্তর দিল না, শঙ্কর দেখিল সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

শঙ্কর পুনরায় বলিল, "না পাবার কোন কারণ নেই—"

মৃন্ময় ইহারও কোন জবাব দিল না, আবার নীরবে দুজনে পথ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিল, "কিছুতেই জুটছে না, আশ্চর্য্য—"

"কি ?"

"চাকরি।"

"আমারও তো সেই অবস্থা।"

"আপনার চাকরি তো হয়ে গেছে।"

"কে বললে ?"

"আপনি আসবার একটু আগে ভন্টু এসেছিল। সে বললে তার আপিসে যে চাকরিটা ছিল সেটা আপনি পেয়ে গেছেন।"

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, "আমিও ওই চাকরিটার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, ভন্টু বললে সে তা জানতো না, আমি অবশ্য ভন্টুকে কিছু বলিনি, মানে আপনি তো সবই জানেন—"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

মৃন্ময় হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল, "চলুন, ফেরা যাক—আর বেড়াতে ভাল লাগছে না—"

"বেশ চলুন।"

ফিরিবার পথে মৃন্ময় বলিল, "একটা উপকার করবেন আমার ?"

"কি ?"

"আমি খবরের কাগজে মুড়ে আমার শালখানা লুকিয়ে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রি ক'রে হোক, কিছু টাকা কাল এনে দিতে হবে। এসব জিনিস

কোথায় বিক্রি করে আমার জানা নেই, আপনার হয় তো জানা থাকতে পারে—"

মৃন্ময়ের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া শঙ্কর দেখিল মৃন্ময় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

২৯

সমস্ত শুনিয়া মুকুজ্যে মশাই নিবারণবাবুকে বলিলেন, "আপনার মেয়ে দোষী কি নির্দ্দোষ সে কথা এক্ষেত্রে অবান্তর।"

নিবারণবাবু সকরুণভাবে মুকুজ্যে মশায়ের দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস করুন আপনি, একেবারে নির্দ্দোষ সে। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।"

"আহা, আপনি অমন কচ্ছেন কেন? সে দোষী হোক নির্দ্দোষ হোক তাতে কিচ্ছু এসে যায় না—"

"খুব এসে যায়, সে নির্দ্দোষ এ বিশ্বাস না থাকলে কি তাকে ফিরে পাবার জন্যে আমি এমন উতলা হতুম!" নিবারণবাবুর গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল।

একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি বিশ্বাস করুন, তার নিজের কোন দোষ নেই।"

মুকুজ্যে মশাই হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "বেশ, বিশ্বাস করলুম।"

নিবারণবাবু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মুকুজ্যে মশায়ের দিকে চাহিতেই মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, "আমি তো আপনার কথাতে অবিশ্বাস করিনি, আমি বলতে চাইছিলাম যে, সে যদি দোষীও হত তা হলেও তাকে আমি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতাম।"

নিবারণবাবু অবুঝের মতো পুনরায় বলিলেন, "না, সে দোষী নয়!" মুকুজ্যে মশাই স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন আর উত্তর দিলেন না। একটু পরে নিবারণবাবু বলিলেন, "তা হলে আপনি—"

"এ কাজে আমি কয়েক দিন পরে হাত দেব। শঙ্কর আর মৃন্ময়ের যতক্ষণ না একটা কিছু হচ্ছে ততক্ষণ আমি অন্য কোন কাজে হাত দিতে পারছি না। আর একজনেরও খোঁজ করতে হবে আমাকে। আপনাকে এ বিষয়ে আর বারবার এসে বলতে হবে না, আমার যথাসাধ্য আমি ঠিক যথাসময়ে করব। আচ্ছা, এবার আমি উঠি। বেরুতে হবে একবার—"

"আচ্ছা, আমি এখন যাই তাহলে—"

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্যে মশাই কয়েকখানি টাইপ করা দরখাস্ত গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবারণবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িলেন। মৃন্ময়কে এবং শঙ্করকে তিনি দুই স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি নিজে আরও দুই স্থানে যাইবেন, তা ছাড়া তিনটি আপিসে তিনখানি দরখাস্ত দিয়া আসিতে হইবে, পোস্টে না পাঠাইয়া সেখানকার পৈরবি-চুমরায়িত বাবুদের হাতে দিলে বেশী ফলপ্রদ হইবে। শিরিষের পত্রখানিও অবিলম্বে পোস্ট করা দরকার, তাহা না হইলে সে আবার অকারণে ছুটি লইয়া ব্যস্ত সমস্তভাবে আসিয়া পড়িবে। শঙ্করের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে মুকুজ্যে মশায়ের সহসা মনে হইল, শিরিষকে বোধ হয় সুশীলাই উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। তাহা না করিলে শিরিষ মনে মনে হাজার চিন্তিত হইলেও একা এতদূরে আসিবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চাহিত কি-না সন্দেহ। কিছুদূর গিয়া মুকুজ্যে মশাই থামিলেন এবং অবশেষে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার মনে হইল সুশীলাকে এ বিষয়ে কিছু লেখা উচিত। ফিরিয়া আসিয়া শিরিষবাবুর নামে লেখা খামটি জল দিয়া ভিজাইয়া খুলিয়া লিখিলেন—

কল্যাণীয়া সুশীলা,

তুমি সম্ভবত শঙ্করের জন্য বেশী উতলা হইয়াছ এবং শিরিষকে উত্যক্ত করিতেছ। শিরিষ অবশ্য তাহা আমাকে লেখে নাই, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি। শিরিষকে উত্যক্ত করিও না, শঙ্কর ভাল আছে, শীঘ্রই তাহার একটা চাকরি জুটিবেই। অমিয়াকেও চিন্তিত হইতে বারণ করিও—ইতি

মুকুজ্যে মশাই

খামটি জুড়িয়া মুকুজ্যে মশাই আবার বাহির হইয়া গেলেন।

৩০

দিন দশেক পরে শঙ্কর সহসা কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিল যে, মিসেস্ স্যানিয়ালের বাড়িতে সে আর থাকিবে না। নিজের জন্য নয়, চুনচুনের জন্যই তাহাকে মিসেস্ স্যানিয়ালের সম্পর্ক

ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার জন্য চুনচুনকে অহরহ বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইতেছে। চুনচুন নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু শঙ্করের আর সহ্য হইতেছে না। শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে বেলার বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বেলার বাসাতেই বরং সে আপাতত কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় লইবে, কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের ওখানে আর নয়। বেলার বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর কিন্তু অবাক হইয়া গেল। বাড়ির সামনে 'টু লেট' ঝুলিতেছে, দরজায় তালা-লাগানো। বেলা বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। শঙ্কর খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ গেল কোথায়! পাশের বাড়ির একটি ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল প্রায় পনেরো ষোল দিন পূর্ব্বে মিস মল্লিক বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার বেশী কোন খবর সে আর বলিতে পারিল না, আশে পাশে কেহই পারিল না। আশ্চর্য্য এই কলিকাতা শহর! কেহ কাহারও খবর রাখে না, প্রতিবেশীর খবর রাখার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করে না। এখানে অতি-পরিচিত লোকেরও নাগাল পাইতে হইলে বাড়ির রাস্তা এবং নম্বর জানা থাকা প্রয়োজন। ঠিকানার সূত্রটুকু হারাইয়া গেলে এই বিরাট জনসমুদ্রে লোকটাই হারাইয়া যাইবে। যদি দৈবানুগ্রহে অকস্মাৎ কোনদিন দেখা না হইয়া যায় তাহা হইলে বেলাও হয় তো হারাইয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল প্রফেসার গুপ্তের নিকট খোঁজ করিলে হয় তো কোন খবর পাওয়া যাইতে পারে, এ বাড়িটা তো প্রফেসার গুপ্তেরই একজন বন্ধুর বাড়ি। প্রফেসার গুপ্তের বাড়িতে গিয়া শঙ্কর শুনিল প্রফেসার গুপ্ত বাড়িতে নাই। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গলিটা হইতে বাহির হইয়া পড়িল, ঠিক করিল আর একদিন আসিয়া খোঁজ করিবে। আরও খানিকক্ষণ অনিশ্চিত ভাবে রাস্তায় ঘুরিয়া সে ঠিক করিল ভন্টুর বাসায় যাওয়া যাক, এতক্ষণ সে হয় তো আপিস হইতে ফিরিয়াছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়া ভন্টুর বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর দেখিল যে আর একটু দেরি হইলে ভন্টুর সহিতও দেখা হইত না। এক একদিন এরকম হয়, কাহারও সহিত দেখা হয় না, যাত্রাটাই নিষ্ফলা হইয়া যায়। ভন্টু বাইকে চড়িতে যাইতেছিল শঙ্করকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"তোর কাছেই যাব ভাবছিলাম, জাল্‌ফিদারিক অ্যাফেয়ার সাকসেস্‌ফুল, চাকরি হয়ে গেছে, দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যেই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাবি। জুলফিদার প্রথমটা একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই, কচলে কচলে ব্যাঙ্‌ তেতো করে ফেললাম, শেষটা দিক হয়ে জুলফিদার রাজি হল!"

শঙ্কর বলিল, "আমার কিন্তু ভাই একটা অনুরোধ আছে—"

"কি?"

"চল রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। কোন্ দিকে যাচ্ছিস তুই?"

"আমি তোর খোঁজেই ম্যাডাম গুম্ফের বাসায় যাব ঠিক করেছিলাম। তুই যখন এসে পড়েছিস তখন চল্ আর এক জায়গায় যাওয়া যাক, সেখানে যাওয়া দরকার—"

ভন্টু ইতিমধ্যেই নিজস্ব ধরণে মিসেস স্যানিয়ালের নূতন নামকরণ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া শঙ্কর মুচকি হাসিল।

"হাসচিস যে?"

"নামকরণটা বেশ হয়েছে।"

ভন্টু কিছু না বলিয়া নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া গলা হইতে 'গোক্' 'গোক্' ধরণের একটা শব্দ বাহির করিল।

"কোন দিকে যাচ্ছিস তুই বল্ তো?"

"ওরিজিন্যালের কাছে—"

"মানে, দশরথবাবুর কাছে?"

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে মুক্তোর মুখখানা মনের মধ্যে উঁকি দিয়া গেল।

"কি রে, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?"

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "ভাবচিস আমি কিছু জানি না! ওরিজিন্যালের কাছ থেকে সব হদিস পেয়েছি তোর। কানা করালিও কিছু আভাস দিয়েছিল তোর কুষ্ঠি দেখি—"

"কিসের আভাস!"

"মোল্লা অ্যাফেয়ারের—"

কাছা দেয় না বলিয়া ভন্টু নারী মাত্রকেই মোল্লা বলে শঙ্কর তাহা জানিত। ওরিজিন্যালের নিকট হইতে ভন্টু মুক্তোর ব্যাপার শুনিয়াছে না কি। শঙ্করের মুখটা একটু যেন

বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "শুনেছিস, বেশ করেছিস" এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ একটা হাসি হাসিয়া বলিল, "চল্—"

ভনুটু অলক্ষিতে মুখ-বিকৃতি করিয়া একটু ভ্যাঙাইল এবং চলিতে শুরু করিল। খানিকক্ষণ নীরবে চলিবার পর বলিল, "ম্যাডাম গুপ্তের আস্তানা এবার ত্যাগ কর্ তুই। চাকরি তো হয়ে গেল, এবার আলাদা একটা বাসা কর, বউকে নিয়ে আয়, ওসব মোল্লাফায়িং ছাড়—"

"আমি চাকরি করব না।"

ভনুটু যেন চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িল।

"চাকরি করবি না, মানে—!"

"চাকরি করব না তা বলছি না, কিন্তু তোর এ চাকরিটা করব না, এটাতে তুই মৃন্ময়বাবুকে ঢুকিয়ে দে, ও ভদ্দরলোকের অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়।"

ভনুটু নির্ব্বাক বিস্ময়ে শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল। ছোকরা হন্যে কুকুরের মতো পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাথা গুঁজিবার একটা জায়গা নাই, কাল কোথায় কি ভাবে অন্ন জুটিবে তাহাও বোধ হয় অনিশ্চিত, অথচ ভাল একটা চাকরি হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিতেছে! যেন তেন প্রকারেণ নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিয়া রাখাই ভনুটুর জীবনের মূলমন্ত্র—এ জাতীয় মনোবৃত্তি তাহার ধারণার অতীত।

"মৃন্ময়কে না হয় ঢুকিয়ে দিলুম, কিন্তু তোর হাল কি হবে! তোর কি একটা ভয় ডরও নেই—"

শঙ্কর সহাস্যে উত্তর দিল—"সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!"

"শিশিরে কি ভয়!"

"মৃন্ময়বাবুর চাকরি পাওয়া আগে দরকার। ভদ্দর লোক কাপড়-জামা বিক্রি করতে সুরু করেছেন। আমাকে নিজের শালখানা বিক্রি করবার জন্যে দিয়েছেন, যদিও এখনও বিক্রি করতে পারি নি—"

"মোমবাতির এ রকম দুরবস্থা হয়েছে, অথচ আমাকে কিছু বলে নি তো—"

শঙ্কর ইহার কোন উত্তর দিল না। উভয়ে আবার নীরবে চলিতে লাগিল।

"তুই তা হলে তোর বাবার কাছে ফিরে যা, হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে ফেল্ গে যা—"

"সে অসম্ভব—"

"উন্মাদ হয়ে গেলি না কি হঠাৎ! বাবার কাছে ফিরে যাবি না, চাকরি জুটিয়ে দিলে করবি না, একাধিক মোল্লা জুটিয়েচিস—"

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল।

"কোন ভয় নেই তোর, সব ঠিক হয়ে যাবে। মৃন্ময়কে এ চাকরিটায় ঢুকিয়ে দে তুই—"

"তার মানে জুল্‌ফিদারকে ফ্রেশ্ খজ্‌লাতে হবে। খজলে খজলে লোকটাকে এমনিই তো ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলেছি, বেশী খজলালে আবার দকচে না যায়—"

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। সে বারম্বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তো মনের মধ্যে বারম্বার আনা-গোনা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হাঁটিয়া শঙ্কর বলিল, "আমি আর দশরথবাবুর কাছে যাব না, তুই যা—"

ভনুটু মুখটা সূচালো করিয়া বলিল, "কেন লজ্জা করছে বুঝি—"

"অনর্থক একটা অপ্রিয় জিনিসের ভেতর গিয়ে লাভ কি!"

"ওরিজিন্যাল কম্‌প্লিট্‌লি চেঞ্জড্, সে মানুষই আর নেই। গুম হয়ে চুপচাপ বসে থাকে—কথাটথা একদম বলে না। যে মেয়েমানুষটাকে রেখেছিল সেটা খুন হয়ে যাবার পর মিস্টার ফাইভ কেমন যেন হয়ে গেছে, তা ছাড়া হাঁপানিতে ধরেছে—"

"কে খুন হয়ে গেছে, মুক্তো?"

"খবরের কাগজে পড়িস নি তুই! মহা হৈ চৈ হ'ল যে ক'দিন তাই নিয়ে—"

"খবরের কাগজের সঙ্গে অনেক দিন সম্পর্ক নেই। সত্যি জানিস তুই, কে খুন করলে?"

"কতকগুলো গুণ্ডা। তাকে খুন করে তার গয়নাপত্তর টাকাকড়ি যা ছিল সব নিয়ে গেছে। একটা ভাঙা তোরঙ্গ খালি পড়েছিল, ওরিজিন্যালের কাছে আছে সেটা—"

খানিকক্ষণ হাঁটিয়া উভয়ে ওরিজিন্যালের বাসার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়িখানা যেন স্তূপীকৃত পুঞ্জীভূত খানিকটা অন্ধকার। কোথাও

এতটুকু আলো নাই। ভন্টু সাইকেলের ঘণ্টা বাজাইতেই সম্মুখের দ্বার খুলিয়া এক ব্যক্তি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "কে, ভন্টুবাবু না কি, কদিন আসেন নি, আমি ভাবছিলাম কি হল আবার আপনার। কেমন আছেন?"

"জবুত্থবু—"

"ভেতরে আসুন; একটু পরামর্শ আছে, সঙ্গে উনি কে?"

"চাম্ গ্যাণ্ড অ—"

"দাঁড়ান আলোটা জ্বালি—"

ভদ্রলোক পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানে কানে চুপি চুপি বলিল, "ইনি হচ্ছেন নেপো, দই মারতে এসেছেন। ওরিজিন্যালের দূর সম্পর্কের ভাগনে হয়, নিঃসন্তান বড়লোক মামার দুঃখে বিগলিত হয়ে সেবা করতে এসেছে রাস্কেল্। হাড় কিপ্টে—"

ঘরের ভিতর আলো জ্বলিয়া উঠিল।

ভন্টু বলিল, "চল, এবার যাওয়া যাক—"

শঙ্কর ভিতরে গিয়া লোকটিকে প্রত্যক্ষ করিল। লোকটি যুবক নয়, প্রৌঢ়। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, গোঁফ দাড়ি নাই, গলায় কণ্ঠী, চোখে মুখে চতুরতার সহিত বৈষ্ণবভাবের অদ্ভুত একটা সমন্বয়। ভন্টু বলিল, "আপনি কি এতক্ষণ অন্ধকারে বসেছিলেন না কি—"

ভদ্রলোক এতক্ষণ চাহিয়াছিলেন, ভন্টুর কথা শুনিবামাত্র প্রশান্ত ভাবে চোখ দুটি বুজিয়া ফেলিলেন এবং কথাটা যেন ভালভাবে প্রণিধান করিয়া পুনরায় চাহিলেন।

"কেরোসিনের আলো জ্বেলে কতখানি অন্ধকার আমরা দূর করতে পারি, বলুন—"

"লদকালদকি রেখে আসল কথাটা কি বলুন—"

"মামা যে একেবারে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন—তার উপায় কি করি বলুন আগে আপনি—"

এইটুকু বলিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং খানিকক্ষণ বুজাইয়া রাখিয়া আবার খুলিলেন। শঙ্কর লক্ষ্য করিল যে নিজের এবং অপরের কথোপকথনের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া তিনি চক্ষু বোজেন এবং খোলেন। ইহার মধ্যে বেশ একটা ছন্দ আছে।

শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং ভন্টুর দিকে ফিরিয়া চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, "এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন—"

"উনি চাম গ্যাণ্ট অ শঙ্কর, আমার একজন পুরোনো বন্ধু" এবং শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ইনি হচ্ছেন নেফিউ-শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র কর, দশরথবাবুর ভাগ্নে, মামার জন্যে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে ফেলছেন—"

সতীশবাবু সবিনয়ে শঙ্করকে নমস্কার করিতে শঙ্করও প্রতি-নমস্কার করিল।

ভন্টু বলিল, "দশরথবাবুর সঙ্গে দেখা হবে এখন?"

সতীশবাবু স্মিতহাস্য সহকারে চক্ষু দুটি বুজিয়া এবং খুলিয়া বলিলেন, "কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই, তিনি একটিও কথা বলবেন না, খালি বিরক্ত হবেন। আগে যা-ও দু-একটা কথা বলছিলেন আজকাল তা-ও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। দূর থেকে অবশ্য দেখে যেতে পারেন—"

"বেশ তো, এসেছি যখন, দূর থেকেই দেখে যাওয়া যাক—"

"তা হলে আসুন, দোতলায়। আলো টালো নিয়ে যাব না, জানলা দিয়ে লুকিয়ে দেখে যান। লোকজন কেউ এলে বড্ড অস্বোয়াস্তি বোধ করেন। অবশ্য এক আপনি ছাড়া আজকাল আর বিশেষ কেউ আসেনও না, সুখের পায়রারা সব উড়ে চলে গেছে। আপনিই যা মাঝে মাঝে খবর টবর নেন—"

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন এবং খুলিলেন।

ভন্টু কণ্ঠ হইতে বার দুই গোঁক্ গোঁক্ শব্দ করিল।

শঙ্কর কিছুই বলিল না, মুক্তোর মৃত্যু-সংবাদে তাহার সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভন্টু দোতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দোতলাও অন্ধকার। প্রকাণ্ড দালানটার এক প্রান্তে শুধু মৃদু একটা আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল।

সতীশবাবু চুপি চুপি বলিলেন, "ওই ঘরটাতে আছেন উনি, আপনারা চুপি চুপি এগিয়ে যান, একটু গেলেই জানলা দিয়ে দেখতে পাবেন—"

কিছুদূর গিয়াই ওরিজিন্যালকে দেখা গেল। ঘরে মৃদু

আলো জ্বলিতেছে, একটা কালো র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ওরিজিন্তাল বসিয়া আছেন। মুখটা ভাল দেখা যাইতেছে না, কিন্তু যতটুকু দেখা যাইতেছে ততটুকুই যথেষ্ট ভীতিকর। সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, রগের এবং কপালের শিরাগুলি স্ফীত, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। একটা তীব্র ঘৃণা সমস্ত চোখে মুখে যেন মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। দুই হাতে দুইটা বালিশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া ওরিজিন্তাল হাঁপাইতেছেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভন্টু পুনরায় নামিয়া আসিল। ভন্টু যেজন্য আসিয়াছিল তাহা এখন উত্থাপন করা যদিও একটু অসমীচীন মনে হইল তথাপি একবার চেষ্টা করিতে সে ছাড়িল না।

"আচ্ছা, সাইকেলের একটা ভাল সীট সস্তায় বিক্রি ছিল, দশরথবাবু সেটা দেবেন বলেছিলেন আমাকে। সেটা কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন ?"

চক্ষু দুইটি বুজিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীশবাবু চক্ষু দুইটি পুনরুন্মীলন করিলেন এবং অত্যন্ত নিরীহভাবে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি তো ওসবের কিছুই জানি না, দোকানের খবর নেবার কি আর অবসর আছে, ওই মটরা ব্যাটা যা করছে তাই হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনাকে একটা পরামর্শ জিগ্যেস করব ভাবছিলাম, আপনার যদি অসুবিধা না হয়—"

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন ও খুলিলেন।

ভন্টু বলিল, "কি বলুন ?"

"চিকিৎসা নিয়ে মহা বিভ্রাটে পড়েছি! এখানকার ডাক্তারদের ভাঁজ ভোঁজ ঘাঁত ঘোঁত বিলিব্যবস্থা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি ভন্টুবাবু। দুবেলা আসচে যাচ্ছে, দামি দামি ওষুধ ফরমাস করছে, নানারকম এগজামিন করাচ্ছে, কিন্তু ফল তো কিছুই হচ্ছে না, হু হু ক'রে অর্থব্যয় হচ্ছে কেবল, দুদিন থেকে কথাও বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বলি কি, হোমিওপ্যাথি করাব ? পাড়ার একজন—"

ভন্টু বলিল, "যাই করুন, খরচের ত্রুটি করবেন না। হোমিওপ্যাথি করতে চান ভাল ভাল রুই কাতলাদের নিয়ে আসুন। যার নেই কোন গতি—সেই করে হোমিওপ্যাথি, এ রকম কোন বাজে চামাটুকে জোটাবেন না, ডাকতে হয় চামলদ্ কাউকে ডাকুন। মানে লোকে যেন এ অপবাদ দেবার সুযোগ না পায় যে টাকার জন্তেই আপনি—"

সতীশবাবু চক্ষু দুইটি বুজিয়া ফেলিলেন ও নিমীলিত-চক্ষেই মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন, "কাকে বলছেন আপনি ভন্টুবাবু—", তাহার পর চক্ষু খুলিয়া আর একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখি আরও দু'দিন—"

শঙ্কর স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া সহসা বলিয়া বসিল, "মুক্তোর সেই তোরঙ্গটা একবার দেখতে পারি ?"

ভন্টু বলিল, "সেটা বোধ হয় ও ঘরে আছে।"

সতীশবাবু সোৎসুকে বলিলেন, "কি বলুন তো ?"

ভন্টু বলিল, "সে আপনি জানেন না, আমি জানি, এ ঘটনা আপনি আসবার পূর্ব্বেই ঘটেছিল। এই পাশের ঘরের কোণেই তোরঙ্গটা আছে, আর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, চাম গ্যাণ্ড অ তুই, না দেখে তো ছাড়বি না, দেখি আলোটা একবার—"

সতীশবাবু বলিলেন, "ভাঙা হলদে তোরঙ্গটার কথা বলছেন ? সেটা আমি পরশুদিন ভাঙা সব জিনিস পত্তরের সঙ্গে বিক্রি করে দিলাম যে! ভাবলাম কি হবে ও ঝড়ঝড়ে ট্রাঙ্কটা রেখে। তাতে দুটি জিনিস মাত্র ছিল, একটি নীল রঙের খদ্দরের চাদর, আর একটি ফোটো। রেখে দিয়েছি সে দুটি, দেখতে চান তো দেখতে পারেন—"

দেওয়ালের গা আলমারি হইতে খবরের কাগজে মোড়া ছোট একটি পুলিন্দা বাহির করিয়া সতীশবাবু শঙ্করের হাতে দিলেন। শঙ্কর পুলিন্দাটি খুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কাহার ফোটো! এ যে চুনচুনের স্বামী যতীন হাজরা। ফোটোর মুখখানা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া কে যেন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। আঁকা বাঁকা অক্ষরে নীচে লেখা, "স্বামী নয় শয়তান"। খদ্দরের নীল চাদরখানাও শঙ্কর চিনিতে পারিল—সে-ই একদিন মুক্তোকে ইহা কিনিয়া দিয়াছিল।

রাত্রি দশটা নাগাদ হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর অবশেষে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ সে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছিল—যেমন করিয়া হোক মিসেস

স্যানিয়ালের বাসা ত্যাগ করিবে, কিন্তু সে কথা তাহার মনেই ছিল না। রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার সমস্ত মনে এই কথাটাই প্রবলভাবে শুধু জাগিতেছিল যে—যে বিচিত্র যোগাযোগের ফলে এবং বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে মুক্তো, যতীন হাজরা এবং চুনচুনের জীবনে তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সেই বিচিত্র যোগাযোগের নামই কি অদৃষ্ট? এই যোগাযোগ কি কোন শক্তিমান বিধাতার নিগূঢ় অভিসন্ধি? না, এমনিই আকস্মিক যোগাযোগ! কোথায় আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি, এই চলার কোন উদ্দেশ্য আছে কি-না, থাকিলেও তাহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া বোঝা সম্ভবপর কি-না, কে আমাদের চালক—নানা প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্ত্তে তাহার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইতে লাগিল।

কড়া নাড়িতেই দ্বার খুলিয়া গেল, শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল চুনচুন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্করের মনে হইল সে যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল।

ক্রমশঃ

কদমতলীর বিল—

শ্রীপথিক ভট্টাচার্য্য

কদমতলীর বিল,
আমার গাঁয়ের স্নেহশীতল কদমতলীর বিল।
আমন ক্ষেতের সোনার ফসল ঢেউয়ের দোলে দোলে,
ভাঙ্গা বেড়ার দাওয়ার কোণে স্বপন যখন তোলে,
সেই সে ক্ষণে তপ্ত রোদের আশীষ মাথায় নিয়ে,
দাদীর ব্যথায় কৃষাণ গাহে বুকের দরদ দিয়ে।
কল্মিলতার ডগায় ডগায় ডাহুক কালেম কত।
সাপলা ফুলের গন্ধে উতল গায় রে মনের মত।
সরু ধারের বাঁকা পথে সওদাগরের নাও,
হাজার ছেঁড়া জোড়া পালে দেখ্‌তে যদি চাও,
দাঁড়িও মোর কদমতলীর শেওলা-পড়া ঘাটে,
অরুণ যেথায় দেনা চুকায় কাঁচা সোনার হাটে।
হিসাব নিকাশ মিটিয়ে দেওয়া সেই সন্ধ্যা ক্ষণে
দেশান্তরী অবোধ ছেলের মুখটি জাগে মনে?
আমার যত সুর হারানো মূল্যবিহীন গাথা,
সরলতার 'স্বর্ণলতায়' আছে সেথায় বাঁধা।
তারি ছায়ার কোলের প'রে মায়ের পরশ আছে,
আমার হ'য়ে এক ফোটা জল দিও তারি কাছে।
অমূল্য সে আঁখিজল যে শ্রাবণধারায় ঝ'রে,
শুধবো আমি এ ধরাতেই শতেক জনম ভ'রে।

সাধনার ধন

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

(James Thomson-এর 'Art' কবিতার অনুবাদ)

শুনতে কি চাও, রেশমী সুতোর সূক্ষ্ম কারুকাজ করা
কাহার তরে রচছি মোর এ চিত্রটি—
বর্ণ-রেখার দিব্য লেখায় চিকণ চারু সাজ ভরা,
কে সে আমার পরম প্রিয় মিত্রটি?

আমার সকল ভালবাসা শঙ্কা-আশা-সুখ-ব্যথা
আমার দুখের দগ্ধ বুকের দীর্ঘ দিন
চিত্রপটে উঠবে ফুটে বুকের যত মূক কথা
সীবন মাঝে জীবন-গাথা রইবে লীন।

মন যে চাহে পাঠিয়ে দিতে মোর সাধনার ধনখানি
মলয় হাওয়ায় দূর হতে সুদূর পানে,
কোথায় আমার মানুষ – ঠাঁই-ঠিকানা নাই জানি
কোন্ গগনের নীহারিকার মাঝখানে!

হয় তো যখন জমবে পাড়ি দীর্ঘ অভিসার শেষে
কল্পলোকের দ্বারদেশে
হারিয়ে আমার চিত্রলেখা বর্ণ-রেখার রূপ-বিভা
সখার পায়ে লুটবে মলিন দীনবেশে।



কথা ঃ—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

ভজন—কাহারবা।

ওগো আনন্দ-রস-ঘন শ্যাম !
দেখি চরণে চরণ তব বঙ্কিম ঠাম ॥
ঝিণি ঝিণি ঝিণি ঝিণি নূপুর নিক্কনি
মোহন মুরলী করে অতি সুমধুর ধ্বনি।
কটিতটে পীতবাসে শ্যাম সুখ-অভিলাষে
মূরছিত চিত-কোটী কাম ॥

তনু মন বিমোহন হে শ্যাম নিরঞ্জন
জ্ঞানাঞ্জন গুণধাম ॥

এ হৃদি যমুনা কূলে এস শ্যাম দুলে দুলে
কাঁদিছে শ্রীমতী রাধা বিরহ বিটপী মূলে।
এস, সুন্দর নটবর রূপ-মনোহর
এস চির নয়নাভিরাম ॥

সা ন্‌া II { সা গা -া গমা | রা গা পা মা I পা -া গা -া | (-া -মা -পা -ধা) } I
ও গো { আ ন ন্ দ০ র স ঘ ন শ্যা ০ ম্ ০ ০ ০ ০ ০ }

I -া -া গা মা I পা পধা -নর্সা না | ধা পা মগা মা I গমা -পা -া -া | -া -া গা মা I
০ ০ ও গো আ ন০ ন্০ দ র স ঘ০ ন শ্যা০ ০ ম্ ০ ০ ০ দে খি

I মপা দা দা দা | পা ণা দা পা I মা -পা দা মপা | পমা -পা -া -া I
চ০ র ণে চ র ণ ত ব ব ঙ্ কি ম০ ঠা০ ০ ম্ ০

I পা পধা নর্সা না | ধা পা মগা মা I গমা -পা -া -া | -া -া সা ন্া II
আ নং নৃং দ র স ঘং ন শ্যাং ০ মৃ ০ ০ ০ "ও গো"

\+ ০ + ০
II {ণা ণা পা পা | ণা ণা পা পা I রা -মা পণা পা | মা -রা সন্া সা I
রি ণি রি ণি ঝি ণি ঝি ণি নূ ০ পুং র নি কৃ কং নি

\+ ০ + ০
I সা রা রমা মা | মপা পা পা পা I পা পর্সা না ধা | গা মা গমপা পা} I
মো হ নং মু রং লী ক রে অ তিং মু ম ধু র ধ্বং০ নি

\+ ০ + ০
I পা পর্রা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্রর্সা -র্রা I র্মর্জ্ঞা -া -া -া | র্রা র্রা র্সা না I
ক টিং ত টে পী ত বা০ ০ সে ০ ০ ০ শ্যা ম মু খ

\+ ০ + ০
I ধা পা মপা -ণপা | -মপা মজ্ঞা -া -া I সা মা মা মা | -া -া সা ন্া I
অ ভি লা০ ০০ ০০ ০ যে ০ ০ মূ র ছি ত ০ ০ ও গো

\+ ০ + ০
I সা পা পা পা | -া -া সা ন্া I সা গা গা গা | রা গা পা মা I
মূ র ছি ত ০ ০ ও গো মূ র ছি ত চি ত কো টী

\+ ০ + ০
I পগা -া -া -া | -গা -মা -পা -ধা I পা পধা -নর্সা না | ধা পা মগা মা I
কাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ মৃ আ নং নৃং দ র স ঘং ন

\+ ০
I গমা -পা -া -া | -া -া সা ন্া II
শ্যাং ০ মৃ ০ ০ ০ ও গো

\+ ০ + ০
II {সা সরজ্ঞা রা জ্ঞা | সা রা সা ন্া I সরা -গা গা গা | সা সরগমা গা মা I
ত মুং০ ০ ম ন বি মো হ ন হেং ০ শ্যা ম নি র০০০ ঞ্জ ন

I পা পধা -নর্সা না | ধা -পা গা মা I গা -মপা -া -া | -া -া -া -া } I
আ নাং নৃং জ ন ০ গু ণ ধা ০ মৃ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা পা মধা | পা মা জ্ঞা মা I -া না -ধা না | র্র্সা -া -া -া I
এ হৃ দি য° মু না কূ লে ০ এ ০ স শ্যা ০ ০ ম্

I -া -া র্সা না | ধা -র্সা -না -া I -া -া -া -া | পা ধা পা ধা I
০ ০ এ স শ্যা ০ ০ ম্ ০ ০ ০ ০ এ স শ্যা ম্

I মা গা রা -মা | গা -া -া -া I সা রা রা রা | রা গা পা -মা I
দু লে দু ০ লে ০ ০ ০ কাঁ দি ছে শ্রী ম তী রা ০

I গা -া -া -া | -া -মা -পা -ধা I পা র্সা না ধা | পা মা গা -মা I
ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বি র হ বি ট পী মূ ০

I গমা -পা -া -া | -া -া পা পা I পা র্রা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্র্সা -র্রা I
লে° ০ ০ ০ ০ ০ এ স সু ন্ দ র ন ট ব° ০

I র্জ্ঞা -া -া -া | ণা -ধা না র্সা I নর্সা -র্রা জ্ঞর্রর্সা -না | র্সা -া -া -া I
র ০ ০ ০ রূ ০ প ম নো° ০ হ°০ ০ র ০ ০ ০

I গা -মা গমা -পা | -া -া -পা -র্সা I না -ধা পা -া | -া -া -পা -র্সা I
এ ০ স° ০ ০ ০ ০ ০ এ ০ স ০ ০ ০ ০ ০

\+ ০ + ০
I না -ধা পা -া | -া -া -া -া I সা সা রা রা | রা গা পা মা I
এ ০ স ০ ০ ০ ০ ০ এ স চি র ন য় না ভি

\+ ০ + +
I পা -গা -া -া | -া -মা -পা -ধা I পা পধা -নর্সা না | ধা পা মগা মা I
রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্ আ ন° ন্° দ র স ঘ° ন

\+ ০
I গমা -পা -া -া | -া -া সা না II II
শ্যা° ০ ম্ ০ ০ ০ "ও গো"

গোবিন্দচন্দ্রের লেখ

আলোচনা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১৩৪৮) জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার এম, এ, পী, আর, এস, পী, এ-চ্‌ডি মহাশয়ের "পাইকপাড়ার বাসুদেব মূর্ত্তিতে গোবিন্দচন্দ্রের লেখ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দুই ছত্র লেখের পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া সরকার মহাশয় দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা জুড়িয়া বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের মধ্যে "অনধিকৃত বিলুপ্ত পৈত্র্য রাজ্য গৌড়েশ্বর" প্রথম মহীপালের আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"যে অনধিকারী চন্দ্রগণ পালসাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ হইতে পাল-প্রভুত্ব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, সম্ভবত প্রথম মহীপাল তাহাদিগকে হতবল করিয়া ঐ রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

চন্দ্রবংশ যদি অধিকারী না হইয়া অনধিকারী হন, তাহা হইলে "কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" ভদ্রলোকটী কে? নয়পালের ইর্দ্দা তাম্রশাসন হইতে কম্বোজবংশতিলক রাজ্যপাল নামে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহার পুত্র নয়পাল প্রিয়ঙ্গু হইতে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতি দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই নয়পাল ও রাজ্যপাল কে? রাজেন্দ্র চোলের হস্তে নিহত দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ কি? প্রথম মহীপালের রাজ্যে ইঁহারাই অনধিকারী কি-না? পালবংশীয় প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পাল ও ইর্দ্দা তাম্রশাসনের নয়পাল নিশ্চয়ই পৃথক ব্যক্তি। ইঁহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কিরূপ? সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে কম্বোজান্বয়জদের কোন আলোচনা দেখিলাম না।

অভিনন্দ কবির রামচরিতে একজন যুবরাজ, নরেশ্বর, পৃথ্বীপাল, জগতীপতি প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত "হারবর্ষ" নামক রাজার বা যুবরাজের নাম পাই। ইনি পালাম্বুজ, পালকুলচন্দ্রমা, পালান্বয়! ইনি "শ্রীধর্ম্ম-পাল-কুল-কৈরব কাননেন্দু!" এই হারবর্ষ কে? কুঞ্জরঘটাবর্ষ কাহারও নাম, না কোন অব্দ?

সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে এইরূপে অনেক প্রশ্নই উপস্থিত হয়। গত ১৩৪৭ সালের চৈত্র-সংখ্যায় আমার লিখিত—"বাঙ্গালায় পালরাজত্ব ও কম্বোজবংশ" প্রবন্ধটী দয়া করিয়া একবার দেখিয়া সরকার মহাশয় যদি উপরোক্ত প্রশ্নগুলির একটা সমাধান করিয়া দেন, বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা অধ্যায় বেশ সুপরিস্কৃত হয়। এইদিকে সরকার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উত্তর

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতবর্ষ-এ আমি পূর্ব্ববাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রের নবাবিষ্কৃত পাইকপাড়া লেখ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, দেখিতেছি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহা পাঠ করিয়া দুইটী কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। প্রথমত, আমি কেন "দুই ছত্র" লেখের পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া "আট পৃষ্ঠা"ব্যাপী প্রবন্ধ লিখিয়াছি; দ্বিতীয়ত, আমি কেন "কাম্বোজবংশীয় রাজগণ" সম্বন্ধে কোন আলোচনা করি নাই।

ক্ষুদ্র লেখটির পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া বৃহৎ প্রবন্ধ লেখায় আমার কোন অপরাধ হয় নাই; কারণ লিপি ক্ষুদ্র হইলেও উহা অত্যন্ত মূল্যবান্ হইতে পারে। মহাস্থান, যাসুভী প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখ সম্পর্কে কত বড় বড় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাইকপাড়ার ঐ ক্ষুদ্র লেখটী পূর্ব্ববাংলার একাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে ২৫ বৎসরের একটী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্ববাংলার ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমাকে চারি-পাঁচ শত বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে। উহার বহুস্থলে—বিশেষরূপে চন্দ্র ও বর্মাদিগের সম্পর্কে—আমি নূতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য আমার সঙ্গে অপর কোন ঐতিহাসিকের মতভেদ ঘটিতে পারে; কিন্তু কেহ আমাকে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুযোগ করিবেন বলিয়া কল্পনাও করি নাই।

আমি কেন "কাম্বোজদিগের" সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই, তাহার প্রধান উত্তর এই যে, আমি পূর্ব্ববাংলার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি; আর ঐ "কাম্বোজরাজগণের" পূর্ব্ববাংলার সহিত কোনই সম্পর্ক জানা যায় নাই। তাঁহাদের দুইটী লিপির একটী দিনাজপুরে এবং অপরটী বালেশ্বরে পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালে "গৌড়পতি" বলিতে যে পূর্ব্ববাংলার রাজা বুঝাইত না, বোধ হয় তাহা এখানে প্রমাণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। আর একটী কথা এই যে, সম্প্রতি এই "কাম্বোজরাজগণে"র সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই বাণগড় লিপির "অনধিকৃত" কথাটীর সহিত "কাম্বোজদিগের" সম্পর্ক আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; কিন্তু আমি পূর্ব্ববাংলার ইতিহাসের দিক হইতে কথাটীকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের পাঠকরাও জানেন যে, "অনধিকারী" "কাম্বোজগণ" প্রথম মহীপালের পূর্ব্বে পাল-সাম্রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। অবশ্য আমি এই "কাম্বোজগণ" সম্পর্কে যে প্রচলিত মত হইতে ভিন্ন মত পোষণ করি, এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমার প্রবন্ধগুলি অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যখন কাম্বোজগণ পালসাম্রাজ্যের একাংশ অধিকার করিয়াছিল, তখন ঐ সাম্রাজ্যের অপর এক অংশ চন্দ্রগণকর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় আপত্তিটা কি, তাহা বুঝিতেছি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি মনে করেন যে, দুর্ব্বল রাজার রাজত্বকালে একই সময়ে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আক্রান্ত এবং অধিকৃত হইতে পারে না?

গত চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের "কাম্বোজগণ" সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

১। ৺ননীগোপাল মজুমদার প্রণীত Irda Copper-plate of the Kamboja King Nayapaladeva (*Epigraphia Indica*, vol. XXII, pp. 159-159), এবং ঐ লিপি সম্পর্কে অপর একটী প্রবন্ধ (*Modern Review*, September, 1937, pp. 323-324)

২। শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার লিখিত Evidence of the Irda Plate (*Modern Review*, October, 1937, pp. 440-441) এবং "বঙ্গদেশে কাম্বোজরাজগণের রাজত্ব" (কায়স্থ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৪৪, পৃঃ ১১১—১১৩)।

৩। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত The Revolt of Divvoka against Mahipala II and other Revolts in Bengal (reprinted from the *Dacca University Studies*.

৪। শ্রীহেমচন্দ্র রায় লিখিত New Light on the History of Bengal (*Indian Historical Quarterly*, December, 1939, pp. 508-511).

৫। শ্রীপ্রমোদলাল পাল প্রণীত History of Bengal গ্রন্থে কাম্বোজগণের রাজত্ব-বিষয়ক অধ্যায়।

অন্তত উল্লিখিত প্রবন্ধ কয়টী পাঠ করিলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করিতে হইত না। কারণ ঐ গুলিতে তাঁহার সমস্তগুলি প্রশ্নেরই উত্তর আছে। আমি পূর্ব্বে একটী বাংলা প্রবন্ধে এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে হইতেছে।

কবি-কথা

উর্বশী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

নদী, আর নদী !

ইহাই বালক কবির ধ্যান ধারণা ও স্বপ্ন। কোমল অন্তরটি তাঁহার কানায় কানায় যেন ভরিয়া গিয়াছে—চোখে-দেখা নদীটির কূলে কূলে পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত রূপের শোভায়। বালকের দুই চক্ষু সর্ব্বক্ষণই এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের পানে পড়িয়া থাকিতে চায়, পাঠ্য গ্রন্থের পাতাগুলি কিছুতেই সে-দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না। বালকের মনে হয়, নদীতে আকাশে একত্র মিলিয়া—রঙ্গে রঙ্গে আলোয় ছায়ায় কোলাকুলি করিয়া যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া মানুষের ভাষায় ডাকিতেছে—আয়, ওরে আয়, কাছে আয় !

এই আকুল আহ্বানই একদিন অভিভাবকদের কঠোর শাসনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। উপলক্ষ হইলেন বালকের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। সবার বড় হইয়াও ইনি যেন বাড়ীর বড়দেরও নাগালের বাহিরে। ভারি ভারি তত্ত্বকথা লইয়া তাঁর কারবার। দর্শন শাস্ত্রের শক্ত শক্ত কথার মীমাংসা এবং গণিতের নানারূপ সমস্যার আবিষ্কারই হইতেছে বড়দাদার বড়রকমের সখ। ইহার ফাঁকে মধ্যে মধ্যে স্বপ্নপ্রয়াণ নামে কাব্যগ্রন্থ লেখেন, কখন বা বিলিতি বাঁশি বাজান, কিন্তু তাঁর বাঁশির সুরে গানের শব্দ ঝঙ্কার দেয় না—অঙ্ক দিয়া এক এক রাগিণীতে গানের সুর মাপিবার জন্যই তিনি বাঁশির আশ্রয় লইয়া থাকেন। এমন গম্ভীর প্রকৃতি এবং গভীর প্রবৃত্তির মানুষটির বালক-সুলভ দুটি অভ্যাস সবার চোখে পড়ে ও আনন্দ দিয়া থাকে। প্রথম অভ্যাসটি হইতেছে তাঁর গভীর তত্ত্বকথা কিম্বা স্বপ্নপ্রয়াণের লেখা শ্রোতাদের সামনে পড়ার মাঝে আকাশভরা উচ্চহাসির উচ্ছ্বাস। দ্বিতীয় অভ্যাসটি আরও কৌতুকাবহ। স্নানের সময় বাড়ীর পুষ্করিণীতে নামিয়া অবিশ্রান্তভাবে সাঁতারকাটা। খুব কম করিয়া ধরিলেও অন্তত পঞ্চাশ বার তাঁর এপার-ওপার হওয়া চাইই। পেনেটির বাগানবাড়ীতে আসিয়া এ অভ্যাসটিরও ব্যতিক্রম হয় নাই। গঙ্গায় তাঁহার সাঁতার চলিল, নিত্যই এপার ওপার হন। বালক-রবি তীরে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নদীর জলে দাদার মাতামাতি দেখেন, তাঁহারও দেহ মন উৎসাহে নাচিতে থাকে। পুকুরের জলে এই বড়দাদাই তাঁহাকে যখন সযত্নে সাঁতার শিখাইতেন, এখন এখানে তাঁহার অনুসরণে কি দোষ ? কাহাকেও কিছু না বলিয়া বা জিজ্ঞাসা না করিয়াই একদা তিনি দাদার পিছু পিছু নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বালকের স্বপ্ন সত্য হইল, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ ঘটিল, যেন কোন্ পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ে গঙ্গার অতল জল আনন্দে উছলিয়া বালক-রবিকে কোলে করিয়া লইল। ঢেউগুলির সহিত তালে তালে খেলা করিয়া মনের আনন্দে আলাপ জমাইয়া বালক যেন নবজীবন পাইলেন।

ভাইটিকে গঙ্গায় নামিতে দেখিয়া বড়দাদা আর নিশ্চিন্ত হইয়া অধিক দূরে যাইতে পারেন নাই। খানিকটা তফাতে আসিয়াই তিনি সকৌতুকে এই আনন্দবিহ্বল বালকের জলক্রীড়া দেখিতেছিলেন। বালক রবির তীরে উঠিবার কোন আগ্রহ নাই, জলের সহিত এরূপ মাতামাতিতে দেহে মনে কিছুমাত্র অবসাদও আসে না, বরং উৎসাহই বাড়িতে থাকে। ওদিকে দাদার মনটিও পড়িয়া রহিয়াছে সাঁতার কাটিয়া ওপারে যাইবার দিকে। অগত্যা তাঁহাকে বালকের জলখেলার উদ্দেশে বলিতে হয়—আর নয়, উঠে পড়ো রবি, অসুখ করবে।

যে সহৃদয় অভিভাবকের অনুগ্রহে এতখানি স্বাধীনতালাভ সম্ভব হইয়াছে, তাঁহার আদেশ যে কিছুতেই অবহেলা করা চলেনা—বালকের কর্ত্তব্যবুদ্ধি সে সম্বন্ধে পূরামাত্রায় সচেতন ; এই নূতন অথচ বহু আকাঙ্খিত আনন্দটুকু যেন নদীর জল হইতে নিঙড়াইয়া লইয়া তিনি তীরে উঠিলেন। বালক-কবির স্বাভাবিক বিষণ্ণতা যেন গঙ্গার স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার অমল পরশ-রস অন্তরে পশিয়া সেখানকার অনেকদিনের একটা চাপা বাসনার ঢাকা খুলিয়া

দিয়াছে—অমনি ভিতর হইতে এক অপূর্ব্ব ভাবের অরুণিমা হাসির মত বাহির হইয়া বালক-কবির সুন্দর মুখখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

স্নানান্তে প্রসাধন সারিয়া বালক-রবি গঙ্গাতীরের সুপ্রশস্ত বাঁধানো চাতালটির উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় সেই রহস্যময়ী বালিকা টাটকা ফুলের সুবাস ছড়াইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ সে মনের সাধে ফুলের সাজ পরিয়াছে, মাথার চুলে বকুল ফুলের ছড়ি, কমনীয় প্রকোষ্ঠে চামেলির চুড়ি, গলায় চাঁপার মালা, হাতে রক্তকরবীর সদ্যভাঙ্গা একটি মঞ্জরী। মুচকি হাসিয়া বালিকা কহিল—আজ যে হাসি আর ধরে না মুখে! কি হয়েছে?

বালকের মুখের হাসি আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—স্বপ্ন ফলেছে।

দুই চক্ষু বড় করিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—নৌকোয় বুঝি চড়েছিলে?

বালক উত্তর দিলেন—না; নৌকো যার বুকের উপরে নাচে, আমি তারই কোলে উঠেছিলুম; কি সে নাচুনি আমার—যদি দেখতে!

চক্ষু দুটি কপালের দিকে তুলিয়া বালিকা কহিল—গঙ্গায় নেমেছিলে বুঝি? সাহস ত বড় কম নয়! না, এবার দেখছি ওরা তোমাকে বেঁধে রাখবে, যেমন আগে রাখত। সেই গণ্ডী-বন্ধন মনে আছে ত?

বন্ধনের কথা শুনিয়া বালকের মুখের হাসি মুখেই আজ আর মিলাইয়া গেল না, হাসিতে হাসিতেই কহিলেন—মনে আছে, কিন্তু সে বন্ধন মুছে গেছে। সেদিন বলেছিলুম না, দাঁড়ে বসে আছি, পায়ের শিকল কাটেনি; তবে একদিন কাটবে, কেটে দেবে ঐ নদী। সত্যি, তাই হয়েছে। ঐ নদীর জলে সেটা খুলে গেছে।

—আবার যদি পরিয়ে দেয় সেই খোলা শিকলটি, তখন?

—আর পারবে না, নদীর জলের পরশ পেয়ে মনটি যে আমার আকাশের মেঘের মতন হাল্কা হয়ে গেছে, মেঘকে কেউ শিকল দিয়ে বাঁধতে পারে?

বালিকার মুখে বিস্ময়ের রেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল, সাথীর বিহসিত মুখখানির পানে কিছুক্ষণ নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—আজ তোমার হ'লো কি? নদী-নদী করে ত খেপে উঠেছিলে, এখন এলেন আবার মেঘ! নদীর জলেও নামা হয়েছে, এবার কি মেঘে উঠে মেঘনাদ হবে?

বালক-কবি হাসিমুখে উত্তর দিলেন—মেঘ থেকেই ত জল হয়, মেঘ ছেড়ে নদী থাকে না। ঐ চেয়ে দেখ না—নদী যত এগিয়ে যায়, মেঘও যেন নেমে এসে তাকে ধরা দেয়। এই যেমন আমি, এখানে এসেই নদী দেখে এক নিমেষে চিনে ফেললুম, বুঝলুম—ও আমার অতি আপনার, ওর কোলে আমাকে উঠতেই হবে, আর আমাকে দেখে ওর মনে কি আহ্লাদ, কত রকম ক'রে ডাকে, আমি না গিয়ে কি পারি? মেঘও ঠিক এমনি, আমরা তিনটি যেন একই!

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বালিকা প্রশ্ন করিল—আর, আমি?

পরক্ষণে প্রফুল্লমুখে বালক কহিয়া উঠিলেন—তুমিও। তোমাকে না হ'লে আমার মুখ ত খোলে না। নদীর কথা, মেঘের কথা, আমার মনের কথা তোমাকেই ত সব বলি।

বালিকা কহিল—তোমার মুখে নদীর কথা আমার ভারি ভালো লাগে, আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি তোমার মুখের পানে, মনে হয় তোমার কথার সঙ্গে নদীর জলও যেন ছল ছল করে সাড়া দিতে থাকে। আচ্ছা, এখানে এসে নদী দেখেই ওর ওপর তোমার এত দরদ কেন জাগলো বলবে? ওর সঙ্গে তোমার কেন এত ভাব?

গাঢ়স্বরে বালক-কবি উত্তর দিলেন—ভাব কেন শুনবে? যে-ড'ঙার উপরে আমরা বাস করি, সে-ডাঙা ত নড়ে না—চুপটি ক'রে অসাড়ে পড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে। ওর পানে চেয়ে আমি এইটে ভাবি, আর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আলাপ আমাদের জমে উঠে।

—ঐ নদীর সঙ্গে?

—হ্যাঁ। আর সকলে শুধু দেখে ওর অথৈ জল, অগন্তি ঢেউ, তাদের কানে বাজে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। আমার দেখা-শোনা কিন্তু একেবারে আলাদা। আমি ওর পানে চেয়ে কত কি দেখি, ওর ঐ ঢেউগুলি মিষ্টি সুর তুলে কত রকমের গান আমাকে শোনায়, কত সব গল্প বলে, কত কি শেখায়—বই পড়ে ইস্কুলে গিয়েও যার হদিস পাইনি।

এই কটা দিনে ওর কাছ থেকে আমি কত কথা জেনেছি, কত শিক্ষা যে আদায় করেছি—তা বলে শেষ করা যায় না। ওরই সংস্পর্শে আমার মনের গতিটাও একেবারে যেন বদলে গেছে। ওই ত আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে নিজেকে ছোট ভেবে আমার ভেতরের মনটাকেও যেন ছোট ক'রে না ফেলি, তাকে বড়ো বলেই ভাবি।

গম্ভীর মুখে বালিকা কহিল—বড়দাদার কাছে সাঁতার শিখে তোমার গায়েও তাঁর ছোঁয়াচ লেগেছে দেখছি! বাঁধা গরু ছাড়া পেলে ভাবে কি হয়েছি, আর আমায় কে পায়! তোমারও হয়েছে এই দশা। কলকাতায় ফিরে ত চল, আবার সেই অষ্টবন্ধন। আমি কি ভেবে রেখেছি জান?

—বল।

—রাজার যে ঘরখানি খুঁজে বা'র করেছি, তারই ভেতরে রাজপুত্তুরটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজার গল্প শোনাবো।

ভাবার্দ্রকণ্ঠে বালক-কবি কহিলেন—গল্প শোনার সখ মিটিয়ে দিয়েছে ওই নদী, এত গল্প শুনিয়েছে যে থলি আমার ভর্ত্তি হয়ে গেছে। তুমি বরং শুনো, পুঁজি অনেক, ফুরাবে না শীগ্‌গীর।

কলকণ্ঠে বালিকা কহিল—বেশ কথা, আমি রাজি। কিন্তু আমার সেই রাজবাড়ীর নিরেলা ঘরখানির ভিতর বসে—

মুখখানি কিঞ্চিৎ শক্ত ও কণ্ঠের স্বর দৃঢ় করিয়া বালক কহিলেন—তা কেন? বাড়ীর কথা শুনলেই মাথায় আমার বাড়ি পড়ে। তোমার মুখে খালি-খালি রাজার বাড়ী—কেন, খোলা আকাশ, জল, গাছপালা—এসব মনে রোচে না?—রাজার বাড়ী এদের কাছে লাগে!

মুখখানি ভার করিয়া বালিকা কহিল—তুমি আশ্চর্য্য ছেলে, রাজার বাড়ীর মর্ম্ম বুঝলে না!

৭

বালিকার কথাই ফলিয়াছে। পেনেটির বাগানবাড়ী হইতে ফিরিয়া আমাদের বালক-কবিকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পূর্ব্বের বাঁধাধরা নিয়মাধীনেই থাকিতে হইয়াছে। ইহার উপর আর এক বিপদ—কলিকাতা শহরটা এখন তাঁহার চক্ষুতে ভারি বিশ্রী ঠেকিতেছে; মনে হয় যেন ইট কাঠের একটা মস্ত জন্তু তাঁহাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতেছে! কেবলই মনের ভিতরে এবং চক্ষুর উপরে ভাসিয়া ওঠে—নদী ও তাহার তীরবর্ত্তী পল্লীটির শান্তশ্রী। তাহার তুলনায় শহরের শোভা ঐশ্বর্য্য জনতা সমস্তই যেন কৃত্রিম ও শ্রীহীন। তবে স্বল্প কালের পল্লীবাসে, নদীর সঙ্গ ও পল্লীর মধুর পরশে কবির মনোরাজ্যে সমুদ্ভূত ভাবের উৎস তাঁহাকে যে কল্প-লোকের সন্ধান দিয়াছে, তাহাতেই তিনি সর্ব্বক্ষণ বিভোর হইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা। বালক-কবির লুকানো খাতার পাতাগুলির পৃষ্ঠায় পয়ারের ছন্দে কল্পলোকের কত চিত্রই রূপায়িত হয়। এ-কার্য্যের পথপ্রদর্শক সত্যপ্রকাশের দেওয়া সেই নীল খাতাখানি ত পেনিটির বাগানেই ভরিয়া গিয়াছে, এখন বালক নিজেই সযত্নে এবং অতি সন্তর্পণে নূতন খাতা বাঁধিয়া লইয়াছেন, এখানাও প্রায় ভরিয়া আসিয়াছে। বালকের খেলাধূলা আনন্দ-উৎসব সবই এখন এই খাতায় নিবদ্ধ। অথচ, এতই গোপনে এই ব্যাপারটি চলিতে থাকে যে, বাহিরের কেহ বড় একটা জানিতে পারে না, জানে শুধু সেই রহস্যময়ী বালিকা—বালক-কবি তাঁহার এই দুর্ম্মুখ বাল্যসঙ্গিনীটিকে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন না, কোন কথাই তাহার কাছে গোপন থাকে না; ঠিক সময়টিতে আসিয়া রহস্যচ্ছলে এমন-ভাবে এই রহস্যময়ী বালকের অন্তরের বদ্ধ দুয়ারটির উপর অতর্কিতে টোকা দেয় যে, তাহার পরশেই সে দুয়ার আপনি খুলিয়া যায়, গৃহস্বামী তখন এই দুরন্ত অতিথির হাতেই ভাবের ঘরখানি তাঁর সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। পূর্ণ ঘরে তখন ভাবের বন্যা বহে।

সেদিনও নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বালক-কবি বসিয়াছেন তাঁহার খাতাখানি লইয়া। খিড়কির বাঁধা পুকুরের জল, খোলাটে আকাশ, আর পুকুর-পাড়ের জামরুল গাছটার রোদে পোড়া পাতাগুলোর পানে চাহিয়াই কবি আলাপ জমাইতে শুরু করিয়াছেন, এমন সময় চুপি চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া সেই রহস্যময়ী বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল ভাব-বিভোর কবির ঠিক পিছনে। আবির্ভাবের সঙ্গেই কবির অন্তর দোলাইয়া দিয়া বহে ভাবের ধারা বিপুল আবেগে। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আমি এসেছি।

দৃষ্টি খাতার পাতায় নিবদ্ধ করিয়া বালক উত্তর দিলেন—জানি।

ঝঙ্কার দিয়া বালিকা কহিল—ছাই জান! ভেবেছিলুম এসেই পিছন থেকে চোখ দুটো টিপে জব্দ করবো, কিন্তু পোড়া হাসিই আগে জানিয়ে দিলে।

খাতার পাতাটি চাপা দিয়া বালক কহিলেন—তোমার আসা জানবার জন্যে চোখের দরকার হয় না, আমার মনই জানিয়ে দেয়—তুমি এসেছো।

সুন্দর মুখে এবং দুটি ডাগর চোখে হাসির ঝিলিক তুলিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি?

একটু গম্ভীর হইয়া বালক উত্তর দিলেন—জানো ত আমি মিথ্যা বলি নে, বাড়াবাড়িও পছন্দ করি নে—

বালকের কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বালিকা কহিল—ভালো কথা, যেটা জানবার জন্যে এসেছি, আগেই বলি, নইলে হয়ত ভুলে যাবো শেষে। বলি, খেলাধূলো কি ছেড়ে দিলে? আর খেলবে না?

উপেক্ষার ভঙ্গিতে বালক কহিলেন—ভালো লাগে না।

সুশ্রী দুটি ভুরু কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া বালিকা কহিল—উঁহু, আরো কিছু আছে; আমি ত তোমাকে চিনি, বলো না—কেন খেলো না?

বালক-কবি এবার চিত্তদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। অভিমানের সুরে কহিলেন—কি করে খেলি বলো? বড়োরা কত কি খেলেন, দেখবার জন্যে ভরসা ক'রে কাছে যদি যাই, অমনি বলেন—'ওদিকে যাও, খেলা করগে।'

—ভালো কথাই ত বলেন, এতে রাগ করবার কি আছে?

—সবটা শোনোই আগে, তারপর ভাল-মন্দ বিচার ক'রো। হ্যাঁ, তারপর ওদিকে গিয়ে যেই খেলা শুরু করেছি, গোলমাল কিছু হয়েছে, আর রক্ষা নেই, কি বকুনি, অমনি হুকুম হ'লো—গোল ক'র না, চুপ করো সকলে। আচ্ছা, তুমিই বলো—চুপ ক'রে কখনো খেলা চলে? তাই ওপাট একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

ভারিক্কি ভাবে বালিকা উপদেশ দিল—বড়োরা অমন বলেন, ওঁদের কথা না মেনে উপায় কি বলো?

গম্ভীরমুখে বালক কহিলেন—সবতাতে মানা করাটাই যখন বড়োদের অভ্যাস, ওসবের ভিতর না যাওয়াই ভালো। তাই ত এই খেলা ধরিছি।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আমি কিন্তু আগেই এটা ধরেছিলুম। যাক্, লক্ষ্মী ছেলেটির মতন চুপটি ক'রে একলাটি বসে বসে এতক্ষণ কি খেলেছো শুনি?

বালকের মুখেও হাসি ফুটিল, কহিলেন—বেশ, শোনো।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাপাটি খুলিয়া সদ্যসমাপ্ত কবিতার ছত্র কয়টি সুর করিয়া পড়িলেন—

আমসত্ত দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি',
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

উল্লাসের সুরে বালিকা কহিয়া উঠিল—ওরে বাবা! এর নাম তোমার খেলা, কালিকলম আর কাগজ নিয়ে! আমি জানি, কার পিণ্ডি চটকানো হয়েছে—বলবো?

—আমি যা জানি, তা কি তোমার অজানা থাকতে পারে? কিন্তু লক্ষ্মীটি, যা জানো, মনের ভিতরে ছিপি এঁটে রাখো। সব কথা বলতে নেই।

—কি হয় বললে?

—অমনি বড়োরা বকুনি দেবেন। এ খেলাও বন্ধ হয়ে যাবে। বড়োদের মানাকে আমার ভারি ভয়।

বড়োদের মত মুখের ভঙ্গি করিয়া বালিকা কহিল—আচ্ছা, আমি তোমাকে অভয় দিলাম, কাউকে বলবো না। তবে একটা কথা আছে কিন্তু।

মৃদু হাসিয়া বালক কহিলেন—বলো?

—রাজার বাড়ীতে এবার যাওয়া চাইই। সেখানে আমরা দুজনে খেলবো, কেউ মানা করবে না, কেউ সেখানে যায় না।

বালকের মুখখানা পুনরায় গম্ভীর হইয়া উঠে, মর্ম্মস্পর্শী গভীর দৃষ্টি সঙ্গিনীর বিহসিতমুখে নিবদ্ধ করিয়া বলেন—বাড়ী, রাজার বাড়ী। ভারি আশ্চর্য্য ত! আমার মনে বইছে নদী, তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ রাজার বাড়ী! এতে কি মিল হয়? খেলা জমে? আচ্ছা—তুমি ওটা ভুলতে পারো না?

মুখখানা ম্লান করিয়া বালিকা উত্তর দেয়—আচ্ছা, তোমার কথাই সই, ভুলবো; আর ও কথা তুলব না।

বালক-কবির গম্ভীর মুখখানি তরল হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

রাসলীলা

শ্রীবসন্তকুমার পাল এম-এ, বি-এল

শ্রীশ্রীরাসলীলা মহোৎসব শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলোৎসবের মুকুট মণি। শ্রীমদ্ভাগতের দশম স্কন্ধে ২৯ অধ্যায় হতে আরম্ভ করে পাঁচটি অধ্যায়ে এই লীলাটি বলা হয়েছে, এরই নাম 'রাসপঞ্চাধ্যায়'।

রাসের পূর্বাভাষ আমরা পাই শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে :—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকা।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥"

হেমন্তের প্রথম মাসে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে ব্রজকুমারীরা কাত্যায়নীব্রত করেছিলেন। তাঁদের সেই ব্রতের মন্ত্রটি ছিল এই :

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

কাত্যায়নী—কি-না দুর্গা, মহাযোগিনীদের অধীশ্বরী মহামায়া, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যোগমায়া, শ্রীকৃষ্ণের অনুজারূপে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকে পেতে হলে এই স্বরূপ-শক্তির কৃপা ছাড়া আর কেউ সমর্থ নয়।

নিত্য প্রভাতে এমনি কাত্যায়নীর পূজাপরায়ণা সেই পাঁচ বছরের ন্যূন কুমারীরা এই প্রার্থনা করতেন—যেন নন্দসুতকে পতিরূপে পাই। সেইটি ছিল তাঁদের সঙ্কল্প!

অন্যান্য দিবসের ন্যায় ব্রতপূর্ণ দিবসে এমনি পূজা-পরায়ণারা প্রাতঃকালে যমুনায় বিবস্ত্রা হয়ে জলকেলি করছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে নিয়ে সেখানে এলেন। শ্রীকৃষ্ণের তখন বয়স অমনি ছয়-সাত বছরের, সখাগণ ছিলেন শ্রীদামাদি চারিজন, তাঁদের বয়স ছিল দুই-তিন বছর ক'রে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চারিটি তত্ত্ব—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। এই লীলার প্রধান সাক্ষী—মন। তারপর হোলো সেই অপূর্ব বস্ত্রহরণলীলা, ব্রজকুমারীদের সে বিষম পরীক্ষা! সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হ'য়ে তাঁদের সঙ্কল্প সিদ্ধি করতে স্বীকার করলেন :

"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥"

ওগো আর্য্যা! ওগো সতীগণ! তোমরা যে কামনা করে ব্রত করেছ তা আগামী রাত্রিসমূহে সংঘটিত হবে।

"ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" এই প্রতিশ্রুতিই রাসের পূর্বাভাষ।

ক্রমে সেই সর্বগুভদ পরম মঙ্গলময় রাত্রি এসে উপস্থিত হোলো; তাই শ্রীমদ্ভাগবত এই উনত্রিংশৎ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বললেন :

"শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

অর্থাৎ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই শরৎকালের কুসুমরাজি বিকশিত হয়েছে এমন সব পূর্ব-প্রতিশ্রুতা রাত্রি সকলকে বিশেষরূপে দর্শন করিয়া যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ রমনার্থ সঙ্কল্প বিশেষ করেছিলেন। এই তো শ্লোকের সোজা ভাবার্থ।

বাদরায়ণি অর্থাৎ রসিক ভকতগণ মুকুটমণি শুকদেব মহারাজাধিরাজ পরীক্ষিৎকে এই রাসলীলা বর্ণন করেছিলেন।

শ্রীধরস্বামীপাদ এর টীকার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের জয় গান করে বলছেন :

উনত্রিংশেতু রাসার্থমুক্তিপ্রত্যুক্তয়ো হরে।
গোপীভী রাস সংরম্ভে তন্ত চান্তর্ধিকৌতুকম্॥
ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপী রাসমণ্ডল মণ্ডনঃ॥" ইত্যাদি

স্বামীপাদের অভিপ্রায় এ লীলার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দু প্রকা-রের, সেটি তাঁর দুটি কথায় প্রকাশ পায়, যথা :

(১) রাসার্থং, আর
(২) কন্দর্পদর্পহা।

রাসার্থং অর্থাৎ রাস করবেন ব'লে। শুকমুনি আরম্ভেই বলছেন—সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করেছিলেন—আর শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে গোপীগণের অপূর্ব উৎকণ্ঠা হোলো—এমনি দৃঢ় কৃষ্ণাবেশ যে অন্য কোনো বিষয়ের

অনুসন্ধানই নাই, ধর্মত্যাগ কর্‌ছেন—অনায়াসে। ধর্ম কি? যেমন শ্রুতির নির্দেশ "নৈবারম্ভং পরিত্যাজৎ"। এখানে দোহনাদি ছেড়ে চললেন, তাও কি কোনো বিচারসাপেক্ষ? না, ভালমন্দ কিছু ভাববারও অবসর নেই—অমনি চললেন! কিসের জন্য?—পরমাত্মা সন্দর্শনে! গীতার সেই "সর্বধর্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এবুঝি তারই মূল তত্ত্ব।

তারপর হোলো কি? শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসতেই ব্রজাঙ্গনাগণ কি পেলেন?

প্রীতির স্বভাবই এই যে, লোকে যে বস্তু পেতে ইচ্ছা করে তা পেলেই তার অনেকটা শান্তি হয়, কিন্তু ব্রজাঙ্গনাদের এ কি দশা—কৃষ্ণ সম্মুখে, কিন্তু তাঁর উক্তি যে কেমন! কেমন! কতরকম বাক্‌বিলাস ক'রে শেষে তিনি বল্‌লেন:

"অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥"

—তোমরা আমাকে যে ভালবাস সে ভালবাসা তো সকল 'জন্তু'তেই ক'রে থাকে। এ কি অসভ্যের মতো কথা—জন্তু! প্রাণী বললেও কতকটা মিষ্টি হোত! কোন্ প্রীতির বিষয়ে এ দুর্বাক্য সহ্য করতে পারে? শুধু কি তাই? আবার বললেন, "প্রতিযাত ততো গৃহান্" ঘরে ফিরে যাও!

প্রীতির স্বভাব অন্যকিছু প্রতিদান না চাইলেও প্রীত্যাস্পদের শুধু প্রীতিটুকুর অপেক্ষা রাখে। ব্রজাঙ্গনারা তা তো পেলেন্‌ই না, কৃষ্ণতত্ত্বের যে মূল—কর্ষয়তি ইতি—আকর্ষণ, এ যে তার বিপরীত বিকর্ষণ হোলো! ঘরে ফিরে যাও—এ কি সর্বনেশে কথা!

কিন্তু এসব হয় কেন? উত্তরে সেই একই কথা, উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য—কারণ 'রাসার্থং' তা না হোলে রাস হয় না। কেন, তা পরে বলবেন।

তারপর উপরে যে বলা হোলো স্বামী পাদের দ্বিতীয় কথা—"কন্দর্প দর্পহা," তাইতে তিনি বলছেন "ব্রহ্মাদিজয় সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা"—অর্থাৎ ব্রহ্মাদি অনন্তজীবগণকে এমন কি মহারথী শিব বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলকে জয় করিয়া কন্দর্পের যে দর্প হয়েছিল, কন্দর্পের সেই সংরূঢ়দর্প নিঃশেষরূপে চূর্ণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের প্রেমে গভীর আবিষ্ট থাকলেও ইতিপূর্বে ব্রহ্মা কালীয়নাগ অগ্নি বরুণ প্রভৃতি সকলের গর্ব খর্ব করেছেন। যেমন—

(১) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জু মহিমায় সন্দিহান হয়ে তা পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁর উপর নিজ মায়া বিস্তার করতে গিয়ে নিজে যে হাঁপানি ছোপানি খেয়ে' দিশেহারা হোলেন সেটা আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মমোহনে দেখেছি।

(২) কালীয়নাগের যে বিষবীর্য্যের গর্ব, সেই ফণাকে শ্রীকৃষ্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ করলেন, সেটা আমরা "কালীয়-দমনে" দেখেছি।

(৩) তারপর যখন কালিন্দীর তটের কাছে সব সখাগণ মিলে শ্রীকৃষ্ণ শুয়ে আছেন—অগ্নি সেই সময় যে দাবানলে বনস্থলী ঘিরে ফেলেছিলেন তাহা শ্রীকৃষ্ণ গণ্ডূষে পান করলেন—অগ্নি নিরস্ত হোলো—তার দর্পও খর্ব হোলো।

(৪) আবার গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রে ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করলেন। সে কেমন?—ব্রজবাসীদের নিয়মিত ইন্দ্রযজ্ঞের অধিবাস হ'য়ে গেছে; মনে করুন, ঐরাবত নিয়ে ইন্দ্র আসবেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের কথায় হোলো যজ্ঞ বন্ধ। নিমন্ত্রণ না করা যে ছিল ভাল, নিমন্ত্রণ ক'রে ফিরিয়ে দেওয়া আরো অপমানজনক। শুধু কি তাই, আবার যেসব উপকরণে ইন্দ্রযাগের আয়োজন হয়েছিল তাই দিয়ে কি-না একটা মাত্র গিরিরাজের পূজা!

ইন্দ্র রেগে সম্বর্ত্তক নামে কল্পান্তক মেঘকে পাঠালেন জলে বৃন্দাবন ভাসিয়ে দিতে, তাও কিন্তু ব্যর্থ হোলো—শুধু গোবর্দ্ধন ধারণ করেই নয়, জলপ্লাবন হ'তে জব্দ করা নিবারণ করতে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জল শোষণ করলেন, সেই এক অদ্ভুত উপায়ে।

(৫) এর পর বরুণেরও গর্ব খর্ব করেন—যখন বরুণ নন্দরাজকে অপহরণ করেছিলেন।

আজ কন্দর্পের দর্প হরণ করবেন ব'লে এই রাসের আয়োজন। সে কেমন ক'রে? না 'রাসমণ্ডলে' রাসে ভূষিত হ'য়ে। শুকমুনি বলছেন:—

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥" (১০।৩৩।৩)

রসিক ভক্ত বিল্বমঙ্গলের ভাষায়:

"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরে মাধবঃ
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।

ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকী নন্দনঃ ॥"

দু অঙ্গনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, দু মাধবের মধ্যে অঙ্গনা, এইরূপে তিনশত কোটি ব্রজাঙ্গনা, তাঁরই মধ্যে শ্রীরাধাবল্লভ গান করেন।

পরদারবিনোদনে কি কাম জয় করা যায়, না, উল্টে সে কামেরই বশীভূত হয়? এমন আশঙ্কা যদি হয়, তাই স্বামীপাদ অমনি জিব কেটে জোর ক'রে বলছেন—'মৈবং' (মা+এবং) অমন কথা কখনও ভেবো না—সে কথা বলবার এখানে তোমার অবসরই কোথায়? তাই বললেন :—"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ তস্মাদ্রাস ক্রীড়াবিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বং" ইত্যাদিঃ

এখানে দুটি কথা বড় হ'য়ে ওঠে—"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" আর "স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ"।

যোগমায়াকে নিকটে আশ্রয় করিলেন, এ আশ্রয়ে অধীনভাব নেই, কর্ত্তা ভগবান নিজেই। সে কেমন ক'রে হয়, আশ্রিত তো চিরদিন আশ্রয়ের অধীন?

তবে বলি—ভক্ত নিজগৃহে বহু উৎসবের আয়োজন করেছেন। উৎসবগৃহ পরিপূর্ণ, এমন সময় তিনি যদি সকলকে অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়ন করতেই ব্যস্ত থাকেন, তবে তাঁর আর সে উৎসবের পরিপূর্ণ ভোগ হোলো না, তাই তিনি নিজে পরিপূর্ণ ভোগ করবার সঙ্কল্পে আপনার কোনো জনকে নিযুক্ত করেন সে সব অভ্যর্থনা ব্যাপার দেখতে, তেমনি শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ 'রাসার্থং' পরিপূর্ণ রাস আস্বাদন করবেন ব'লে নিজ স্বরূপ শক্তি যোগমায়াকে নিযুক্ত করলেন, সেই আস্বাদনের অনুকূল সমস্ত আয়োজন করতে। কি সে আয়োজন? অনেক অঘটন ঘটাতে হবে, যেমন রাতের পর রাতই আসবে (তাঃ রাত্রীঃ), চাঁদ ঠিক মাথার উপরেই থাকবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাস নির্বাহ না শেষ হয়, জ্যোতিষ্ক গতিশীল কিন্তু সবাইকে ঠিক থাকতে হবে, এমনি বহুবিধ আয়োজন।

এখানে কি কামের কথা উঠতে পারে? অহমিকা রজ্জুতে বদ্ধ যে জীব সে কি প্রকৃতির বাইরের বিষয় বিচার করতে পারে? বেদ প্রভৃতি "আর্ষ্য বিজ্ঞ" বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করতেই হবে। যদি কেউ আগুন আগুন ব'লে চিৎকার করে, যে চিৎকার করছে তাকেও হয়ত দেখে না, আর আগুনও দেখে না, কিন্তু শব্দের দ্বারা জানা যায়, কারণ সে সবে কোনো বঞ্চনা করবার ইচ্ছা কি অন্য দোষ-দুষ্ট দেখা যায় না।

মায়া গুণময়ী, ভগবান হ'তে বিয়োগ করে, যোগমায়া চিন্ময়ী ভগবানে মিলন করে। যোগমায়ার কার্য্য অখণ্ড আনন্দ বস্তুটিকে মূর্তরূপে দেখানো—যোগমায়া ছাড়া লীলা হয় না। যোগমায়া ভগবানের স্বরূপ শক্তি, নিত্যা। ব্রহ্মসংহিতার সেই "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্ত পরমপুরুষঃ" শ্লোকটি মনে করুন।

কাম গুণমায়ার বৃত্তি—রজোগুণের ধর্ম। গুণাতীত যোগমায়াকে আশ্রয় ক'রে যে লীলা, তা কখনও কামকেলী হোতে পারে না।

তবে এখানে কি হয়েছে জানেন? মায়ার গুণ যেমন ভুলানো, তেমনি বিবর্ত অর্থাৎ অন্য ধর্মের ভান আনা, কি-না ওলট-পালট। তাই যোগমায়া এখানে ধর্মের বিপর্যয় করাইতেছেন, নিজ বধূকে পরবধূরূপে প্রতীতি করায়ে নিজ পতিকে পরপতি প্রতীতি করাচ্ছেন। কেন জানেন? উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য।

বিবর্ত প্রমাতা জীবকে ভ্রান্ত করে যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়ে—হাজার ভ্রান্ত করালেও দড়ি কিন্তু সত্যি সত্যি সাপ হবে না, নিজবধূ নিজবধূই থাকবে।

ব্রজাঙ্গনারা সব কৃষ্ণবধূ, রাস সেই সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তা না হোলে ধর্মের প্রতিকূল হোলে জগৎ বিনাশক হোত, ভগবান শ্রীগীতায় নিজমুখে বলেছেন :— (গীঃ ৭।১১)

এ কি "নিন্দামি চ পিবামি চ"? এমন আশঙ্কা কোথায়? এই রাসলীলায় শ্রোতার কি দ্রষ্টার এত আবেশ হয় কেন? মহাত্যাগী মুনিগণও এই রাসের উৎকর্ষ সানন্দ উচ্ছ্বাসে বর্ণন করেছেন। বিষ্ণু সহস্র নামে তেমনি উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন—"জোর মার শিরোমণি"।

আবার রাসের আবরণ ছেড়ে দিয়েছেন, অমনি স্বরূপ প্রকাশ 'স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ'—শ্রীকৃষ্ণ নিত্যস্বতন্ত্র—নিত্য-স্বাধীন।

কন্দর্পকে কেমন ক'রে জয় করেছেন তাই রাসলীলার উদ্দেশ্য, সেটি পরে এই কয়টি কথায় দেখিয়েছেন :—

(১) 'আত্মারামেশ্বরেশ্বরে,

(২) "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ"

(৩) "অবরুদ্ধসৌরতঃ"।

আত্মারাম যিনি, আপনার স্বরূপানন্দে আবেশ-পর যিনি, তিনি আবার সাক্ষাৎ মন্মথের মনকে মথন করেছেন—কাম দ্বারা পরাজিত হোতে পারেন না—আবার—আত্মনি অবরুদ্ধ-সৌরতঃ--এই সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য বলা হয়েছে।

যার স্মরণেই হৃদয় ক্ষোভিত হয়, তাই কন্দর্পের একটি নাম হয়েছে 'স্মর'; এখানে শুধু স্মরণ নয়, তিনশত কোটি অঙ্গনা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত চুম্বিত হচ্ছেন, আপনার আবেশে আপন স্বরূপে আপনি অবস্থিত। যত গোপী তত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—একটু অভিমান দেখালেই অমনি ত্যাগ—স্বাতন্ত্র্যই তো এই।

আলিঙ্গন চুম্বনের কথা শুনে অনেকে ভ্রুকুঞ্চিত করেন; কিন্তু শুকমুনি বলেন, এ রাসলীলা যেই সত্যকার শুনবে তার সেই কাম-হৃদরোগ দূর হয়ে যাবে। ব্যবহারিক জীবনেই দেখি আলিঙ্গন চুম্বনে কিছু হয় না, যদি তার ভিতর কাম না থাকে। শিশুকন্যাকে আলিঙ্গন কি চুম্বন করায় কামের গন্ধ আছে কি? তার কারণ তাদের ভিতর যে কাম নেই। তাই যার ভিতর কামকণাও নাই সে কেমন ক'রে কাম উদ্বোধন করতে পারে?

সে দেহটিই যে এমনি ভাবে গড়া—কিশোর-কিশোরী হোলে কি হয়? যেখানে প্রীতি কিন্তু সেখানেই আলিঙ্গন চুম্বন। নিজেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা যেখানে ঘুণাক্ষরেও নেই সেখানে কাম কোথায় আছে? গোপীতত্ত্ব বুঝলে তবে সেটা আমরা জানতে পারি।

শৃঙ্গার রসের আবার অবতারণা করেন কে? শুকমুনি, যাঁর কোমরে কাপড়টাও পর্য্যন্ত নেই, মায়ার আবরণ হোতে একেবারে বাইরে! এখানে তেমনি শৃঙ্গার রসের পশুভাব নয়, বড় বিদ্যুতের আলোর কাছে খদ্যোতের আলোর কি কোনো অনুসন্ধান থাকে?

রাস পরিপূর্ণ হ্লাদিনী শক্তির অবলম্বনে—সেখানে প্রাকৃতিক গুণবিচারের অবসর নেই।

রাস ভোগ পরা নয়, রাস কেবল ত্যাগ। কৃষ্ণ পেয়ে গেলেও কৃষ্ণ পেয়েছি ব'লে অভিমান ক'রো না, কৃষ্ণ যদি তোমায় ছাড়েন তুমি ছেড়ো না, কৃষ্ণে ভালবাসার বিনিময় চেয়ো না।

আবার পূর্বরাগের পর যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ এ রাস তা নয়। মানের পর সংকীর্ণ সম্ভোগ—এ তাও নয়। এ পরিপূর্ণ সম্ভোগ অথচ পূর্বরাগের পরেই হচ্চে, তাই সাধ্য সঙ্কোচ লজ্জা ত্যাগ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হোলো। সেইটাই দেখালেন এই ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে। যখনি সেটি পরিপূর্ণ হোলো তখনি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হোলেন।

কিন্তু তারপর গোপীদের যেমনি জ্ঞান হোলো যে তাঁরা কত সৌভাগ্যশালিনী তখনই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান—স্বাতন্ত্র্যা-ভিধানাৎ—অপরূপ ত্যাগ—সেটি কেমন? স্বামীপাদ বলেন সেইটাই 'কৌতুকং'! এই পূর্বরাস।

তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে এলে ব্রজাঙ্গনাদের যে অভিমান-আবরণ পড়ল—সেই অভি-মান কার্যটির কারণ যেটি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে আসা—সেটি আবার সরিয়ে নিলেই অভিমানটি চলে যায়, তাই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, ব্রজাঙ্গনাদের গর্ব চূর্ণ হোলো! এও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য। এইখানে ২৯ অধ্যায়ের উপক্র-মণিকার শেষ। ক্রমশঃ

কাদের নওয়াজ

(আরবী হইতে)

গভীর রাতে গেলাম যখন
গোপনে মোর প্রিয়ার ঘরে,
চেয়ে দেখি দীপ্ত উজল,
স্তব্ধ নিঝুম আকাশ 'পরে—
জ্বলছে 'সুরাই' তারকা এক
জ্যোতির জালে ভুবন ভরি,
বেষ্টিত সে হাজার তারায়
মণ্ডলাকার ধারণ করি।
মনে হ'ল কে যেন এক
মোতির মালা হস্তে ধরি—
গেঁথেছে তায় সোনার দানা
মাঝে মাঝে একটি করি।

তিনখানি পুস্তক

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী এম-এ, পি-আর-এস, শাস্ত্রী

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় এই তিনখানি পুস্তকই বাঙ্গালা সাহিত্যে সুখ্যাত। তিনজন লেখকই বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর অতি পরিচিত। তিনখানি পুস্তকই বাঙ্গালার বিপ্লববাদের সমসাময়িকচিন্তার ইতিহাস। চিন্তাধারা লেখকের মনোবৃত্তি অনুসারিণী। 'আনন্দমঠ' একখানি রোমান্স, 'পথের দাবী' উপন্যাস, 'চার অধ্যায়' ললিত খণ্ড গদ্যকাব্য। এই তিনখানিকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লবীয় যুগের বাঙ্গালীর চিন্তাধারার একখানি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। পটভূমিকা, আখ্যান বস্তু, ভাষাবৈশিষ্ট্য, আদর্শনির্দ্দেশ, চরিত্র-বিশ্লেষণ, রসবিচার, স্থানকালপাত্রের আবেষ্টনী—প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুই ইঁহাদের স্রষ্টাদের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে।

স্থান

আনন্দমঠের রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালা দেশ; বরেন্দ্রভূমির ঘন বন, অতি বিস্তৃত অরণ্য। আরম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি পারিপার্শ্বিক স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন যাহার ভিতরে ভবিষ্যৎ ভীষণতার আভাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

পথেরদাবীর কেন্দ্রস্থল বাঙ্গালার বাহিরে—সুদুর ব্রহ্মদেশে। সব্যসাচীর কর্ম্মস্থল পুনা, সিংহল, যাভা, সুরাভায়া, হংকং, ক্যান্টন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ। শরৎচন্দ্র ভারতের বহু প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি বহুধা অভিজ্ঞ, বহুদর্শী।

বঙ্কিমের যুগে যে কালের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার পরিসর মাত্র বাঙ্গালা। বঙ্কিমের অভিজ্ঞতা ছিল বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ, সুতরাং তাঁহার কল্পনা বাঙ্গালার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ শরৎচন্দ্রের যুগে বিপ্লবের প্রচেষ্টা ভারতের বাহিরে প্রবলবেগে চলিতেছিল। সুতরাং শরৎচন্দ্রের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ব্যাপক।

চার অধ্যায়ের পটভূমিকা কলিকাতা। কলিকাতা তখন সমস্ত বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর কর্ম্মকেন্দ্র। বিপ্লব তখন উহার অতি গোপন শৈশবজীবন অতিক্রম করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। দৃশ্যাবলী কলিকাতা নারায়ণী স্কুল।

কাল

আনন্দমঠের ঘটনা সময় মুসলমানের পতন কাল; বৃটিশ আগমনের প্রাক্কাল। উপন্যাস রচিত হইয়াছে একটী বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া—সেই ঘটনা ১৭৭০ সালে বাঙ্গালায় সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ।

পথের দাবীর ঘটনাবলী ব্রহ্মদেশে সমাপ্ত হইয়াছিল সব্যসাচীর জীবনকে বেষ্টন করিয়া। ১৯১০ সালে সব্যসাচী কেণ্টনে সান্ ইয়াৎ সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, পুনায় কারাগারে অতিথি ছিলেন, সিঙ্গাপুরে কারাপ্রাচীর উল্লম্ফন করিয়াছেন। পথের দাবীতে যে ভাবে ঘটনার সমাবেশ ও আদর্শের যুক্তিনির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে রুশিয়ার শ্রমিকবিদ্রোহ বলশেভিক আন্দোলনের প্রভাব হইতে শরৎচন্দ্র মুক্ত হন নাই। ভারতের বাহিরে যে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইয়াছিল, শরৎচন্দ্র তাহারই মধ্যে প্রচ্ছদপটের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালা দেশে বারীন্দ্র-যুগের অন্তিমকাল, চিত্তরঞ্জন তখন বাঙ্গালার সারথি, তাঁহার মধ্যে ছিল বিরাট আদর্শবাদ, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মপ্রচেষ্টা। বাঙ্গালীর অশান্ত মনকে 'নূতন পথে চালিত করিবার জন্য চলিতেছিল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রয়াস। এই যুগেরই পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন শরৎচন্দ্র তাহার 'পথের দাবী'তে।

রবীন্দ্রনাথ চার অধ্যায়ের 'আভাসে' অবতারণা করিয়াছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের। আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত্ত আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল তারি মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢাল্‌তে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজালা বইয়ে দিলে। এই কাগজে

প্রথম দেখা গেল বাঙ্গালা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা।" ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারের অব্যবহিত পরের ঘটনাবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চার অধ্যায়' রচনা করিয়াছেন—যদিও রচনাস্থল কাণ্ডি, সিংহল। সময় ৫ই জুন, ১৯৩৪।

ভাষা

ভাষার দিক দিয়া বঙ্কিম শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতের কন্যারূপে তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষার মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি ও অলঙ্কারের প্রাধান্য আছে। শরৎচন্দ্র স্বয়ং নিরাভরণ, অতীত গরিমায় তিনি উৎফুল্ল হন নাই। তাঁহার ভাষায় আছে এক নিরলঙ্কার অনাবিল সহজ সৌন্দর্য্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাজসিক। প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে প্রচুর তাঁহার অঙ্গশোভা, গতি তাঁহার ছন্দোময়ী, প্রকাশভঙ্গিমা সালঙ্কারা। তাঁহার অন্তরের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে এলা-ইন্দ্রনাথ-অতীনের কথোপকথনের অপরূপ ভাষায়।

উদ্দেশ্য ও আদর্শ

প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্ভিক্ষের একখানি করাল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বাঙ্গালার রাষ্ট্রচিত্র পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করিয়া সন্তানবিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছেন। বাঙ্গলার সম্পত্তিরক্ষণের ভার "মীরজাফরের উপর, মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম। বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙ্গালী কান্দে আর উৎসন্ন যায়।" সুতরাং ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেশ উদ্ধারের আদর্শ স্থাপন করিলেন সন্ন্যাসী সত্যানন্দের ভিতর দিয়া—যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টাই ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেশকে বঙ্কিম কল্পনা করিয়াছেন মাতারূপে, পূজা করিয়াছেন দেবীরূপে, তর্পণ করিয়াছেন রক্তে, বরণ করিয়াছেন ত্যাগে, পূর্ণ করিয়াছেন জীবনসর্ব্বস্ব, উৎসর্গ করিয়াছেন ভক্তি, পূজার মন্ত্র হইয়াছে "বন্দেমাতরং"।

বঙ্কিমের সন্ন্যাসীর কর্ম্ম আছে, ফলস্পৃহা নাই। গীতার কর্ম্মবাদ বঙ্কিমের আদর্শ। আনন্দমঠের বৈষ্ণব চৈতন্যপন্থী নহে, কেবলমাত্র প্রেমময় নহে। তাঁহারা শক্তিময় বিষ্ণুর উপাসক—যে বিষ্ণু কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, রাবণ, কংস ও শিশুপাল বধ করিয়াছেন, যে বিষ্ণু 'ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্' সন্তানগণ তাঁহারই উপাসনা করেন। বঙ্কিমের শান্ত মন কখনও যুদ্ধবিগ্রহে সঙ্কুচিত হয় নাই।

পথের দাবীর আদর্শ অন্যরূপ। আপন 'পথে চলার দাবী' সকলের আছে—এই তার বাণী। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে মানবের পথ চলা অসম্ভব। পরাধীন দেশে পথে চলার লক্ষ বাধা। তাই সব্যসাচীর দাবী দেশের অখণ্ড স্বাধীনতা। এই যন্ত্রের মূলে ছিল শৈল—তথা সব্যসাচীর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা—যেদিন তার বড়দা যাঁর বন্দুক অন্যায়ভাবে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কাড়িয়া লইয়াছিল, যিনি ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিয়াছিলেন এবং যিনি মৃত্যুশয্যায় সব্যসাচীকে বলিয়াছিলেন—"রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি, তাদের তুই কখনো ক্ষমা করিসনে।" এই ঘটনা কার্থেজে হামিল্‌কারের সম্মুখে বীরপুত্র হানিবলের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দেয়। সব্যসাচী ভারতীকে বলিয়াছিল, "একদিন মুসলমানের হাতেও দেশ গিয়াছিল। কিন্তু মনুষ্যত্বের এত বড় শত্রু আর নাই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার।" সব্যসাচীর সমগ্র জীবন বিদ্বেষের জ্বালায়—হিংস্র প্রতিশোধের জ্বালায় বিষাইয়া গিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা—যে-কোন উপায়েই হউক তাহার একমাত্র কাম্য। আবার অন্য দিক দিয়া ব্রহ্মদেশে বাঙ্গলার বাহিরে প্রকারান্তরে ভারতের বাহিরে যন্ত্র-সভ্যতার আবেষ্টনীর মধ্যে শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। ভারতী শ্রমিক কালাচাঁদকে বলিতেছিল, "তোমরাই ত' এর সত্যিকারের মালিক।" সুমিত্রা অপূর্ব্বকে বলিয়াছিল, "চীৎকার করে জানিয়ে দিন, সঙ্ঘবদ্ধ না হ'লে এদের উপায় নেই।" রামদাস তলোয়ারকর ফয়ার মাঠে বক্তৃতা করিল, "এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম্ম নেই, মতবাদ নেই, হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, জৈন, শিখ—কোন কিছুই নেই, আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক—আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।" রামদাস আবার

বলিল, "তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাবার প্রথম শঙ্খধ্বনি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আমরা করে এসেছি … এই পথের দাবীর চেয়ে বড় বন্ধু এদেশে তোমাদের আর কেউ নেই।" ডাক্তার আর একদিন ভারতীর প্রতিবাদের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়াছিল, "শ্রমিকদের ভাল করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যই আমার পথের দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়, হিংসার মধ্য দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়—এই তার বর, এই তার অভিশাপ।"

চার অধ্যায়ের ভিতর যদিও বিপ্লবী প্রচ্ছদপট আছে, যদিও প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার চিত্ত-বিবর্ত্তনের আভাস দিয়াছেন, তবু তিনি বিপ্লবীর আদর্শ সম্পূর্ণমনে গ্রহণ করেন নাই। রোমান্ ক্যাথলিক ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—"রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে", অর্থাৎ বৈদান্তিকের বিপ্লবপন্থানুসরণ গর্হিত। তবু সমস্ত পুস্তকখানি জুড়িয়া আছে ইন্দ্রনাথের উদ্দাম বিপ্লবী নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) কর্ম্মদ্যোতনা। ইন্দ্রনাথ প্রারম্ভে প্রচার করিলেন, "ইংরেজদের বিদেশী রাজত্ব। সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মবিলোপ করছে। এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা ক'রে আমি আমার মানবস্বভাবকে স্বীকার করি।" কিন্তু ইন্দ্রনাথের কোন ঘৃণা নাই ইংরেজের বিরুদ্ধে, যেমন ছিল সব্যসাচীর। ইন্দ্রনাথ ইউরোপে বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার কৃতিত্ব অশেষ। কানাই গুপ্তকে ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "সমস্ত ইউরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সবচেয়ে বড়ো জাত।" বঙ্কিমচন্দ্র জাতি হিসাবে ইংরেজ-বিরোধী ছিলেন কি-না সে বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে টমাস ও লিগুলের নৈতিক চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের আলেখ্য বর্ণন ইংরেজ জাতির পক্ষে খুব প্রীতিপ্রদ নহে। ইংরেজের প্রশংসা বঙ্কিম বহুস্থানে করিয়াছেন, যথা—"একটা গোলা দেখিলে মুসলমান গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়, আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলেও একটা ইংরেজ পলায় না।" কাপ্তান টমাসকে ভবানন্দ বলিয়াছেন, "তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস, তোমার প্রাণদান দিলাম।" চিকিৎসক অষ্টম পরিচ্ছেদে সত্যানন্দকে বলিলেন, "ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।" বঙ্কিম ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী, যুদ্ধ জয়ের পরেও ইংরেজবিহীন ভারতবর্ষ কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার স্বাধীন ভারতবর্ষের আদর্শ পঙ্গু। বঙ্কিমের আখ্যানবস্তুর পটভূমিকায় রহিয়াছে অতীত—যাহা হইয়া গিয়াছে—অবশ্যম্ভূতকে তিনি একটা অলৌকিক আবেষ্টনীর মধ্যে আনিয়াছেন—তাঁহার কল্পনা ও ব্যাখ্যান ক্ষুণ্ণ এবং খর্ব্ব। পথের দাবীর কল্পনা ভবিষ্যৎ ভারতের চিত্র, তাই শরৎচন্দ্র বিপ্লব ও ষড়যন্ত্রের গতিবিধি ও স্থানকালকে কল্পনা দ্বারা অভিনব রূপ ও মাদকতা দান করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় বহির্বঙ্গের কোন অংশের কোন ইঙ্গিত নাই। বঙ্কিমের যুগে ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলন ও বিপ্লবের পরিপন্থী ছিল; সুতরাং আনন্দমঠের পরিকল্পনা ও কার্য্যস্থল বাঙ্গালার সীমার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু পথের দাবীর ভিতর শরৎবাবু আহ্বান করিয়াছেন সমস্ত ভারতবাসীকে। পথের দাবীতে আছে—

বাঙ্গালী— অপূর্ব্ব হালদার
মহারাষ্ট্রীয়— রামদাস তলোয়ারকর
পাঞ্জাবী শিখ— হীরা সিং
মাদ্রাজী— কৃষ্ণ আইয়ার
চট্টগ্রামের মগ— ব্রজেন্দ্র
মিশ্র ভারতীয়— মিস জোসেফ ভারতী
বহির্ভারতীয় মিশ্র—রোজ দাউদ তথা সুমিত্রা
সব্যসাচীর সাথী ছিল—পুনার নীলকান্ত যোশী
ফৈজাবাদের মথুরা দুবে
সীমান্তবাসী আমেদ দুরানি।

শরৎবাবু চিন্তা করিয়াছেন অখণ্ড ভারত, ভারতের স্বাধীনতার প্রয়াস একমাত্র বাঙ্গালীর একচ্ছত্র অধিকার নয়। সেখানে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান সকলেরই সম অধিকার। এমন কি, সুমিত্রা—যাহার জন্ম পর্য্যন্ত ভারতের বাহিরে, মাত্র পিতার রক্তের টানে এবং ভারতী—যাহার পিতা খৃষ্টান ও যাহার সমস্ত শিক্ষা খৃস্টান মিশনারীর

মন্দিরে, তাহারা ভারতবর্ষকে দেশরূপে গ্রহণ করিয়া সেবা করিয়াছে। সব্যসাচীর কর্ম্মক্ষেত্র সুদূর মাঞ্চুরিয়া হইতে সিংহল পর্য্যন্ত—ব্রহ্মদেশ হইতে রুশিয়া পর্য্যন্ত।

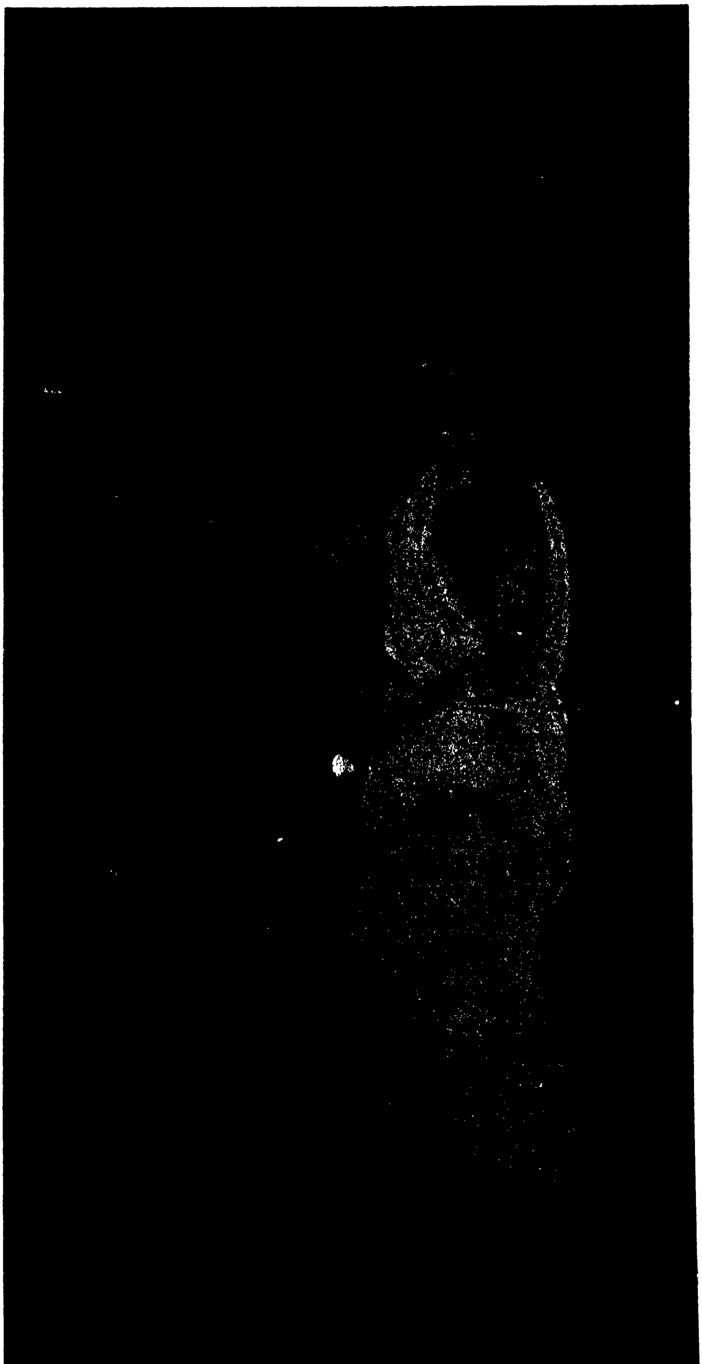
চার অধ্যায়ের মধ্যে কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট। একবার মাত্র অতীন ডাকাতি দ্বারা সংগৃহীত অর্থপ্রাপ্তির আভাস দিয়াছে।

আনন্দমঠের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ, কামান, গোলা বন্দুক নির্ম্মাণের কথা আছে। বঙ্কিমের শাক্তমন রক্তপাতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাঁহার নায়ক সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ কেহই রক্তপাতকে হত্যা বলিয়া শিহরিয়া ওঠে নাই। পথের দাবীতে প্রাণত্যাগ, প্রাণদণ্ড ইত্যাদির বহু আভাস আছে। পথের দাবীতে রক্তপাত অতি সাধারণ কথা। চার অধ্যায়ে ইন্দ্রনাথ ছাগলছানাকে পিস্তল দিয়া হত্যা করিয়া কাঠিন্যের পরীক্ষা করিয়াছেন। 'সেন্টিমেণ্টাল'কে তিনি ঘৃণা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "নির্দ্দয় হবে না, কিন্তু কর্ত্তব্যের বেলায় নির্ম্মম হোতে হবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্বের আভাষ তাঁহাদের বিভিন্ন নায়কের মধ্যে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র শুদ্ধ সত্ব ব্রাহ্মণ, চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান। তাঁহার আদর্শ গীতার শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার কর্ম্ম আছে, কর্ম্মফল ভোগস্পৃহা নাই। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শপুরুষ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ সত্যানন্দ, কর্ম্মসন্ন্যাসী জীবানন্দ, ব্রহ্মচারী ধীরানন্দ, বীর ভবানন্দ। চরিত্রের দৃঢ়তা, আদর্শে নিষ্ঠা, কর্ম্মে আনন্দ, দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি—আনন্দমঠকে এক লোকাতীত মহিমায় উজ্জ্বল করিয়াছে। আনন্দমঠের কর্ম্মী জিতেন্দ্রিয়—সামান্য পাপ-চিন্তাতেও দীক্ষামন্ত্র আহত হয়। ক্ষুদ্রতম পাপস্পর্শের প্রায়শ্চিত্তও আনন্দমঠে আছে। ভবানন্দকে কল্যাণীর প্রতি আকর্ষণের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে হইল; এমন কি, দীক্ষাবদ্ধ জীবানন্দকে নিজ স্ত্রী শান্তির স্পর্শজাত পাপহেতু শাস্তিবিধান মানিয়া লইতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী ও আদর্শের বহু আভাষ তাঁহার সৃষ্ট একাধিক চরিত্র জুড়িয়া আছে।

শরৎচন্দ্রের নায়ক সব্যসাচী তাঁহার দৃষ্টিতে আদর্শপুরুষ। গৃহহারা, ছন্নছাড়া, ভবঘুরে জীবন সব্যসাচীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের স্বীয় জীবনাদর্শের উদ্দাম কল্পনার আভাষ পাওয়া যায়। সব্যসাচীর ব্যক্তিগত গুণের সীমা নাই। ইউরোপে চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আমেরিকায় ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন। এমন দেশ নাই যাহা সব্যসাচীর অ-দৃষ্ট, এমন কোন বিদ্যা নাই যাহা তাঁহার অলব্ধ, এমন কোন ভাষা নাই যাহা তাহার অ-জ্ঞাত। তাহার ক্ষীণ দেহযষ্টির মধ্যে লুকাইয়া আছে ইঞ্জিনের স্তব্ধ বয়লারের মত অফুরন্ত শক্তি। নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত জ্বলিতেছে তাহার মধ্যে দেশপ্রেমের অনির্ব্বাণ দীপশিখা। আহার, নিদ্রা, ভয় সমস্ত তাহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। কোথায় মাঞ্চুরিয়া, কোথায় সিংহল, কোথায় সুরভায়া, কোথায় ভামোর পায়ে-হাঁটা পথ। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া আছে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র। সত্যানন্দের কর্ম্মক্ষেত্র বরেন্দ্রভূমির শ্যামায়িত ঘন বন; ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র সব্যসাচীর নিকট মিশিয়া গিয়াছে বাঙ্গালার স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে। সব্যসাচী সংস্কার বিশ্বাস করে না। শ্রমিক-কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্বও স্বীকার করিল, "মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে? নতুন কিছু কি সে করিবে না? উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে? যাহা বিগত, যাহা মৃত, কেবল তাহারই ইচ্ছা তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভুত্ব করিতে থাকিবে!" সব্যসাচীর সমস্ত দেশপ্রেমের মধ্যে আছে তীব্রজ্বালা—যদিও তাহার অন্তরে ছিল অফুরন্ত প্রেম—দেশের স্বাধীনতার সম্মুখে তাহার ব্যক্তিগত স্নেহমমতা প্রেম সমস্ত বিলীন হইয়া গিয়াছে। অন্য সমস্ত ব্যক্তিগত চিন্তা ও কল্পনা নিঃশেষে আহুতি দেওয়া হইয়াছে দেশসেবার যজ্ঞভূমিতে।

চার অধ্যায়ের ইন্দ্রনাথ খুব বেশী স্থান জুড়িয়া নাই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের মত সমস্ত কাব্যখানি জুড়িয়া আছে একটা নৈর্ব্যক্তিক কর্ম্মের আভাস। যদিও পুস্তকখানিতে একটা বিপ্লবী পটভূমিকা আছে তবু উহাতে কোন সত্যকার বিপ্লবী-কার্য্যক্রম নাই। রবীন্দ্রনাথের কবি-মন কোন রক্তপাত বা চণ্ডালনীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। কথোপকথনের অন্তরালে, পুরুষনারীর আকর্ষণে কর্ম্মপ্রচেষ্টা কবি-মনের পশ্চাতে সরিয়া আসিয়াছে। কুসুম যেমন কণ্টকের আবেষ্টনীতে ফুটিয়া ওঠে, রবীন্দ্রনাথের



শিল্পী—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর　　যাদুকরী　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অতীন্‌ও তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে—বিপ্লবীর পারিপার্শ্বিক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় অতীন অতীন্দ্রিয় পুরুষ নয়, চরিত্রবান বটে। সে জীবনকে জীবনরূপেই গ্রহণ করিয়াছে। আদর্শের মূল্য সে খুব ভাল করিয়াই বোঝে। তাই এলা যেদিন অতীনের কাছে আত্মসমর্পণ করিল, অতীন অস্থিরচিত্তে বলিয়া উঠিল, "আজ যে পথে এসে পড়েছি, এ পথ ক্ষুরধারার মতো সঙ্কীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।" অতীন এই বিপ্লবপথে আসিয়াছিল কক্ষচ্যুত নীহারিকার মত। অতীন নিজেই এলাকে বলিয়াছিল, "এ পথে প্রবেশ করার আগে অনেক কথা জানতাম না, অনেক কথা ভাবি নাই।" চোখের সামনে সে দেখিয়াছে দেশের জন্য তাহার প্রণম্য বন্ধুরা কি ব্যথা সহিয়াছে, কত অপমান বরণ করিয়াছে। নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও অতীন এই বিপ্লব-সমুদ্রে পড়িয়াছিল, কারণ—"প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্ম্মে বড়ো। নইলে অত বড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? ··· মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা, যাদের আছে বাহুবল। কিন্তু আমরা পারবো না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষ সীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।" বিরাট আদর্শবাদ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই আদর্শ অতীনের জীবন রূপায়িত করিয়াছে। একটা আদর্শবাদের মাদকতা যেন চার অধ্যায়ের প্রতি অধ্যায়কে লীলায়িত করিয়া আছে। এলার জীবনের চার অধ্যায়ে আছে ভারতের বিপ্লবচেষ্টার চারিটি স্তরের পরোক্ষ বিশ্লেষণ।

নারী ও দেশসেবা

এই তিনখানি পুস্তকেই নারী পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেশসেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং সেবা করিয়াছে। তিনজন শিল্পীর সুনিপুণ তুলিকাসম্পাতে নারীর বিপ্লব-কর্ম্মপ্রচেষ্টা অভিনব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। আনন্দমঠে শান্তি ও কল্যাণী, পথের দাবীতে সুমিত্রা ও ভারতী, চার অধ্যায়ে এলা। বঙ্কিমের যুগে হিন্দুসমাজের স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে এমন একটি পরিস্থিতির অবতারণা করিয়াছেন যাহাতে শান্তির পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাজ করা সম্ভব হইয়াছে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র নারীকে বিদ্রোহের আবর্ত্তে টানিয়া আনিয়াছেন, মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রশান্তমনে নারী-পুরুষের সমকর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করেন নাই। কল্যাণী বিবাহিতা নারী হইলেও স্বামী মহেন্দ্রের পার্শ্বে কার্য্যাধিকার পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদিগকে পৃথক স্থান দিয়াছেন। শান্তিকে প্রায় পুরুষরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন। শান্তির শৈশব পিতৃগৃহে পিতার পুরুষ-শিষ্যের সঙ্গে অতিবাহিত হইয়াছে, তারপর পিতৃশিষ্য জীবানন্দের সঙ্গে উদ্বাহ সম্পন্ন করিয়াছেন। শান্তি গৃহত্যাগ করিয়া পুরুষের বেশে দেশ-ভ্রমণ করিয়াছে, পুরুষের সঙ্গে কুস্তি করিয়াছে, স্বীয় সম্মান রক্ষা করিয়াছে। নারীসুলভ দৌর্ব্বল্য শান্তির দেহে ও মনে কখনও ম্লানিমা সৃষ্টি করে নাই। প্রায় কাদম্বরীর চিত্রলেখার অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। শান্তির চিত্রে রোমান্সের স্থান অতি বেশী। পরিশেষে শান্তি সন্ন্যাসী বেশে দীক্ষিত হইয়া নবীনানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিল। পুরুষবেশে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষোচিত কাজ করিয়াছিল। শান্তি কখনও বা নারীবেশে ইংরেজ সেনাপতিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে বিভ্রান্ত করিয়াছে, লিণ্ডলে সাহেবের সহিত এক অশ্বে আরোহণ করিয়াছে, সন্তানগণকে যুদ্ধে উৎসাহ দান করিয়াছে। বিবাহিতা ব্রহ্মচারিণীর কার্য্যকলাপে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক ইতালীয় বীর গারিবল্ডীর পত্নী এরিটার পন্থানুসরণ করিয়াছেন। স্বামীর ধর্ম্ম স্ত্রী পুরুষের বেশে পালন করিয়াছে। শান্তি যেন কাদম্বরীর পত্রলেখার মত নির্যৌন নারীপুরুষ। কর্ম্মক্ষেত্রে কোন মুহূর্ত্তেই তাহার নারীত্ব কর্ত্তব্য ভুলাইয়া দেয় নাই। স্বামী জীবানন্দকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু স্বামী-দেবতার উপরে ছিল তাহার দেশমাতৃকার স্থান, তাহার উপরে আরোপ করিয়াছিল ধর্ম্মের স্থান। সুতরাং শান্তিকে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অনভিজ্ঞ নারীরূপে বিচার করা চলে না।

শরৎচন্দ্র পথের দাবীতে নারীর চলার দাবীও অসন্দিগ্ধ-ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতী ও সুমিত্রা যেন তাঁর সমস্ত উপন্যাসের জীবনীশক্তি। ভারতী ও সুমিত্রা উভয়েই পরমাসুন্দরী। তাহাদের রক্তে আছে মিশ্রণ। ভারতীর মাতা ভারতীয়া ললনা, সুমিত্রার পিতা ভারতীয় পুরুষ।

ভারতীর চরিত্রে কর্ম্মপ্রাণতা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তাহার অন্তরে নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছিল "নারী" অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত। তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং কাহারও নিকট অবিদিত ছিল না—ভারতীও জানিত, সব্যসাচী এবং সুমিত্রাও জানিতেন। ভারতী সুগৃহিণী, সুরুচিসম্পন্না, কর্ম্মে নিষ্ঠাবতী। সুমিত্রা কিন্তু "ভয়লেশহীনা তেজস্বিনী" সভানেত্রী। তার জন্ম, শৈশব, কৈশোর, প্রারম্ভ-যৌবন অতিবাহিত হইয়াছে প্রশান্ত মহাসাগর দ্বীপপুঞ্জে হাব্সী, আরবী, নিগ্রো দস্যুর আবেষ্টনীর মধ্যে। জীবনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সুমিত্রার কর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রতিকূল নহে। বঙ্কিমবাবু শান্তিকে পিতৃগৃহে পুরুষোচিত আবেষ্টনীর মধ্যে জীবনের অভিজ্ঞতা দান করিয়া উত্তর-জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎবাবুও সুমিত্রার প্রাক্-বিপ্লবী জীবনের সঙ্গে বিপ্লবোত্তর জীবনের সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন—যাহাতে রোমান্সের আভাস থাকিলেও সুসঙ্গত। শরৎচন্দ্র পরোক্ষে ভারতী ও সুমিত্রাকে পূর্ণ ভারতীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান দান করিয়াছেন। তাহাদের রক্তে বিদেশের বিন্দু থাকিলেও, এমন কি, সুমিত্রার জন্ম ভারতের বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে হইলেও তাহারা ভারতীয় বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত। সুমিত্রা অপূর্ব্বকে বলিয়াছিল, "দেশের বড় আমার কাছে কিছুই নাই"—আর সেই দেশ ভারতবর্ষ। ভারতী ও সুমিত্রার চরিত্রে সংযমের শক্তি অসীম। নারীত্ব কখনও কর্ম্মকে পশ্চাতে ফেলিয়া যায় নাই।

এলা মানসী। ইন্দ্রনাথ এলাকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিল বিশেষ উদ্দেশ্য করিয়া। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, "তোমার কাছে থেকেও কাজের কথা সব জানাইওনে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বেলে দেয়?" এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় এলা ছিল "Elixir of life"—জীবন রসায়ন। রবীন্দ্রনাথ নারীর বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার অধিকার নিয়ে কোন তর্ক উপস্থিত করেন নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত কোন ভূমিকার অবতারণা করিয়া এলাকে কর্ম্মক্ষেত্রে টানেন নাই। এলার ছিল কর্ম্মের নামে উৎসাহ, দেশের নামে মাদকতা। সুযোগ দিল ইন্দ্রনাথ। সে বিশেষ কিছু ভাবিয়া দেখে নাই। ইন্দ্রনাথ এলাকে 'শক্তিস্বরূপিণী' বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিল। এলা সম্ভাষণে গলিয়া গেল। এখানে একটু 'ঘরে বাইরে'র বিমলা-সন্দীপের পরোক্ষ আভাস পাওয়া যায়। ক্রমশ বিপ্লবী ছেলেদের দল দেশমাতৃকার সেবা ত্যাগ করিয়া এলাদিদি'র সেবায় মনোনিবেশ করিল। তাহাদের সমস্ত সাধনা অর্পিত এলার মনস্তুষ্টিতে। ইন্দ্রনাথ যে এ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন তাহা নহে। ক্রমশ কর্ম্ম-ব্যপদেশে এলা ও অতীন পরস্পরকে চুম্বক টানে আকর্ষণ করিল। সে আকর্ষণ অতি তীব্র। এলার ডায়েরী ভরিয়া উঠিল দেশের নামে অতীনের অতি-প্রশস্তিতে। অতীন এলাকে সম্ভাষণ করিল, "তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে মনে মনে সাজিয়েছি। তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।" এলা যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছিল অতীনকে—"তুমি আসবার আগেই আমি শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্য কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।" কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে অতীনের আকর্ষণের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে এলার দেশ-সেবা ও বিপ্লব-প্রচেষ্টা। স্পষ্টস্বরে এলা নিজেকে সমর্পণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি স্বয়ম্বরা ······ সহধর্ম্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে। নারী এলা জোগাবে সেবা—পুরুষ অতীন জোগাবে জীবিকা।" অতীন কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিল না। এমন একদিন অতীনের জীবনে আসিয়াছিল সে ভাবিয়াছিল এলা অতীনের মধ্যে "জন্ম লইয়াছে দান্তে বিয়েত্রিচে।" কিন্তু সে মোহ তাহার ছুটিয়া গেল—যে-মুহূর্ত্তে তার স্মরণে আসিল তাহার প্রতিজ্ঞা—সে বিবাহ-বন্ধনে জড়াইবে না। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কেবলি ভাবিতে লাগিল ইব্‌সেনের ভাষায়—

Upwards,
Towards the peaks
Towards the stars
Towards the vast silence.

এইখানে একটা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যদি পুরুষ-নারী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের মধ্যে আদিমতম সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে কি-না? বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহ-বন্ধনবিহীন পুরুষ-নারীর একত্র

কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দেশ করেন নাই। এমন কি, শান্তি-জীবানন্দের বিবাহিত স্ত্রী হওয়া সত্বেও ব্রহ্মচর্য্যসাধন ভিন্ন তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিতে দেন নাই। ভবানন্দের মত বীরপুরুষও কল্যাণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। একদা সত্যানন্দ শান্তিকে বলিয়াছিলেন, "পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, বীরধর্ম্মে রমণী কি?" শান্তি উত্তর দিয়াছিল, "অর্জ্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?" কিন্তু সত্যানন্দ শান্তিকে দীক্ষিত করিয়া ব্রহ্মচারিণীরূপেই আনন্দমঠে স্থান দান করিয়াছিলেন।

পথের দাবীতে ভারতী তাহার যথেষ্ট শিক্ষা, সংযম ও প্রতিবন্ধকতা সত্বেও অপূর্ব্বকে ভাল বাসিয়াছিল। সেই ভালবাসার পরোক্ষ পরিণাম হইল বিরোধ ও আত্মকলহ। সুমিত্রা ও সব্যসাচীর প্রেম অত্যন্ত অস্পষ্ট—সূক্ষ্মদ্রষ্টার কাছে গোপনও নয় প্রকাশও নয়। অতি-মানব সব্যসাচী যদিও অপূর্ব্বকে বলিয়াছিল, "মেয়েদের প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার আমি কিছুই বুঝি না"—তথাপি ভারতী-সুমিত্রার মনের গোপন কথাগুলি তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। তাহার মত দরদী মানবের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অনুভূতিতে প্রেমের কোন কোন পরমাণু অলক্ষ্য ছিল না। পরিশেষে ব্রজেন্দ্রের ঈর্ষাই সমস্ত পথের দাবীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথের সুচিক্কণ তুলিসম্পাতে এক নবারুণরাগে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে এলা-অতীনের প্রেম। ইন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, এলার মোহিনী হ্লাদিনী শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি গঠন করিবেন তাহার বিপ্লবের দল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের ভুল হইয়াছিল যে বন্যাপ্লাবনের জলধারাকে আদেশ দেওয়া যায় না—thus further and no further —এইটুকু এসো, আর নয়। তাহাতেই সৃষ্টি হইয়াছিল ঈর্ষার। বটু বিপ্লবের সংবাদটুকু যথাস্থানে পৌঁছাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে দ্বিধা করে নাই।

রবীন্দ্রনাথের কবি-মন বিপ্লবীদের রক্তরাঙ্গা পথের দাবী স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। নারীকে সেই চঞ্চল আবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া আনিয়া শেষ পর্য্যন্ত নারী-রূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

গর্ব্ব

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার বি-এ

অমৃতের পুত্র আমি সর্ব্বশেষ সৃষ্টি বিধাতার
শেষ আগন্তুক আমি পৃথিবীর শ্যাম অন্তঃপুরে;
মোর তরে গুপ্ত ছিল বসুধার সুধার সম্ভার
ধরিত্রীর রঙ্গমঞ্চ মোরে হেরি বাজে নবসুরে।
থমকি দাঁড়ানু হেরি' মস্তকের চন্দ্রাতপ ছায়া
চকিত সহসা শুনি' অরণ্যের মোহময় গান,
প্রাবৃটের মেঘদল সৃজি' দিল অপরূপ মায়া
পূর্ণিমার স্মিত রশ্মি প্লাবিয়া তুলিল মোর প্রাণ।

প্রত্যূষে পুষ্পের কলি মোরি তরে মেলিছে নয়ন
বসন্ত সাজায় ডালা, সে তো শুধু মোরে তৃপ্তি দিতে—
তুষার হিমাদ্রি শিরে করে কল্পলোকের সৃজন
তটিনীর উর্ম্মিমালা গাহে গান আমারি ইঙ্গিতে।
নিসর্গ সৃজিল ধাতা, সার্থক করিনু তারে আমি
আনন্দলোকের পথে সঙ্গীহীন আমি তীর্থগামী।

ডাক' মোরে অভিসারে

শ্রীনীলরতন দাশ বি-এ

শ্রাবণগগন আঁধারে মগন, নেমেছে প্লাবনধারা;
বৃষ্টিতে মোর মত্ত যে মন ছুটেছে বাঁধনহারা।
কোন্ সে অতীতে শিপ্রার তীরে বসিয়া বিরহী কবি
এঁকেছিল তার মানস-প্রিয়ার বিরহবিধুর ছবি।
যুগে যুগে কত আশাহত চিত জগতের নরনারী
বরষাধারায় ফেলেছিল হায় বেদনার আঁখিবারি!
এমনি বাদলে বিরহী যক্ষ কত নিশিদিন জাগি'
রামগিরিশিরে কাঁদিয়া যে মরে বিরহিনী প্রিয়া লাগি।
শূন্য হৃদয়-মন্দির মাঝে বন্ধুরে নাহি হেরি'
বিরহিণী রাধা চলে অভিসারে, সহে না তিলেক দেরি।
তৃষাতুর মম চিত্তে উঠেছে তুফানের কোলাহল—
বক্ষে বাজিছে দুঃখের বাজ, চক্ষে ঝরিছে জল।
আজি ক্ষণে ক্ষণে কার কথা মনে জাগে যেন বারে বারে—
দুর্গম পথে, হে জীবনস্বামী, ডাক' মোরে অভিসারে!

নিন্দার ভয়

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

হর্ষের দিনেও লুকানো বিষাদের ছায়া ইলাকে বিব্রত করছিল। কেমন-করে-কি-হোল এবং এর-পর কি-হবে, এ দুশ্চিন্তা যেন ঝোপের ধারের সাঁঝের ভূত। তার বহুদিনের অনাদৃত চেতনার নবীন জাগরণের অন্তরালে ছিল গোপন বিষাদের কালো ছায়া। তার সুন্দর মুখের প্রতিবিম্বে, সেই অজানা বিষাদের রেখা তাকে বিমর্ষ করলে। প্রসাধনের বিলাস, স্বচ্ছলতার সচ্ছন্দতা, প্রেমের কুহক পরশ—এসব স্পষ্ট আঁকা ছিল তার কমনীয় মুখে। কিন্তু—

এত ভোগের মাঝেও তার বিগত দিনের জীর্ণ-কুটীর আর অনটনের অগৌরবের স্মৃতি, তার সম্পদের চিত্রে একটা খাপ্‌ছাড়া অশোভন রেখা টান্‌তো। কেন?

—যত বলি ভাব্‌ব না, ভাবনা আসে কোথা থেকে?—ভাবলে সে।

সে দৃঢ়-সঙ্কল্প হল—পোড়া পুরোনো কথা ভাব্‌ব না, ভাব্‌ব না, ভাব্‌ব না।

এবার বিজয়ের ব্যক্ত হাসি ফুটে উঠ্‌লো দর্পণে। অমলকুমার গোলাপ-গন্ধ বিলাসী। ইলা গোলাপী পাউডারের থুবনী ঠুকলে তার গোলাপী গালে। সে আবার হাসলে।

—চুলোয় যাক্ জীর্ণ কুটীর। শ্রমিক স্বামীর নির্ম্মম স্মৃতি।

স্বামী! আবার সেই ঝোপের ভূত। এবার ইলারাণী সাহস ক'রে তার ঘাড় মট্‌কাবার সঙ্কল্প করলে। স্বামী! অতীতের একটা ছড়া তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠ্‌লো। ভাত দেবার মুরোদ নাই, কীল মারবার গোঁসাই! কোটী কোটী নির্য্যাতিতা ভারতের মেয়ের মত, তখন তাকে বিশ্বাস করতে হ'ত, স্বামী দেবতা—কীল মারবার অধিকারী। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন—কাজেই অন্ন না জোটার জন্য অপরাধিনী স্ত্রী।

এ পাঁচ বৎসর সস্নেহ পরিশ্রমে গুরু অমলকুমার তার অন্তরকে বিকশিত করেছিল। তার নিজের সাধনাও ছিল একনিষ্ঠ। কবিতার বহির লুকানো মধু—যাদুকরের সোনার কাঠির স্পর্শ না পেলে—চিরদিন পুঁথিগত থাক্‌তো। শিশুকাল হতে দীর্ঘ সতেরো বৎসর সে আঁধারের সঙ্গে উষার আলোর সংগ্রাম দেখেছিল। কত আম বাগান, কত সোনার ধানের ক্ষেত, খর-পরশা নদী, নিরুপায় ঢেউ তার আঁখি-পথে পড়েছিল। কিন্তু তার এ ঘুম-ভাঙ্গা চোখ সে তো দেখেনি হাস্যমুখ প্রকৃতিকে।

পুরোনো দিনে সে ছিল কামিনী গোয়ালিনী। আজ সে ইলারাণী। আজ ধনী ঘরের মহিলারা হেসে কথা কয় তার সঙ্গে। পুরোনো দিনে রেশম-পশম-মখমল-মোড়া, সালঙ্কৃতা ধনী ঘরের ক্রীড়নকগুলা, উদার করুণার স্বরে বলত—কামিনী, গোয়ালিনী হ'লেও সুন্দরী।

সত্যই তো সে সুন্দরী। নিজের কাছে লজ্জা কি? বিনয়েরই বা কারণ কোথায়? তার নিটোল দেহের রেখাগুলাকে আচ্ছাদন করত তার জীর্ণ বাস। আর আজ?

হঠাৎ অমলকুমারের কান্ত দেহের ছায়া পড়লো মুকুরে। গলা-টেপা ভূতটা রণে ভঙ্গ দিলে। পুরাতনকে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে সুন্দরী উঠে দাঁড়ালো। তার দীপ্ত হাসিতে উদ্দীপিত হল কান্ত চিকিৎসক।

সে সস্নেহে বললে—আজ এত সাজের ঘটা কেন ইলারাণী?

ইলা বললে—পুরোনো সাধের দেনা, বাকী-বকেয়া-সুদসমেত শোধ দিচ্চি। ভূষণ গোয়ালার স্ত্রী কামিনী গোয়ালিনী মাত্র—

—ছিঃ ইলা, বিগতের অনুশোচনা!

ইলা সামলে নিলে। হেসে বললে—এবার ডাক্তারবাবু হেরে গেলেন। ওমা! অনুশোচনা করব কেন? এ তুলনা। গৌরবের গর্ব্ব। কামিনী মরে ইলা হয়ে জন্মেছে—তার সবই গৌরবময়। নাম, ধাম, আহার, শয্যা, বসন-ভূষণ মায় চেহারা!

ডাক্তার ঘাড় নাড়লে। বললে—উঁহু! প্রথমগুলা জানি না। শেষটা ভুল। চেহারা ভাল হয়নি।

ইলা বললে—কেন? মাত্র পাঁচ বছরেই বুড়ি হ'য়ে গেছি?

ডাক্তার বললে—শত শত বৎসরে উর্ব্বশীর যখন বার্দ্ধক্য আসেনি, পাঁচ বছরে আমার ইলারাণীর কি হবে? আসল কথা, পুরণের সমস্যা থাকে অসম্পূর্ণতায়। কিন্তু যে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ—জোয়ারে সাগরের মত, পূর্ণিমার চাঁদের মত—

ইলা বললে—বোতল ভরা মদের মত।

—সত্যি ইলা তোমার রূপ মদিরার মত উন্মাদক। বহুদিন পরে বাড়ি যাচ্চি। আত্মীয়স্বজন হিংসায় ফেটে যাবে।

অমলকুমার ফতেগড়ে ডাক্তারী করত। তার সঙ্গে ইলার গোপন আগমনের কথা দেশে আত্মীয়েরা জানতো না। ফতেগড়ের লোক জানতো সুন্দরীটি, ডাগ্‌দার বাবুকী জেনানা। কিছুদিন পরে সে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল একটি পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণ বালিকার পাণি-গ্রহণের। পিতা সম্মতি দিয়েছিলেন। এবার সে ছুটি নিয়ে স্ত্রী-সমভিব্যাহারে স্বদেশে যাবার আয়োজন করছিল।

মাঝে মাঝে ইলার হৃদ্‌কম্প হত। যদি তার রহস্য-কথা, তার কিম্বা অমলের পরিচিতেরা জান্‌তে পারে, তার আত্মহত্যা ভিন্ন নিস্তার থাকবে না। আর বেচারা অমলের দুর্নাম। কিন্তু সে স্মরণ করলে তার দেশে শোনা-টপ্পা—মণি কোথায় পাওয়া যায় সই, ফণীর শিরে হাত না দিলে!

এক একদিন ইলা জিজ্ঞাসা করত—আচ্ছা ডাক্তার, বাপ-মার কাছে আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলে পাপ হবে না?

অমল বল্‌ত—তুমি কি আমার স্ত্রী নও?

—মানে, লোকের চক্ষে, সমাজের চক্ষে।

—লোক আর সমাজ—উভয়েই জ্ঞানবুদ্ধিহীন। দক্ষিণা-লোভী একটা পুরুত এলেই বিয়ে হ'ল, আর যার মানে জানি না এমন মন্ত্র আওড়ালে? বিয়ের প্রাণটা যে স্ত্রী-পুরুষের প্রাণ-বিনিময়; সে প্রাণের কোন তোয়াক্কা রাখে না নিষ্প্রাণ সমাজ।

ইলা ভাবত। মুগ্ধ হ'য়ে অমলের কথা শুনতো, তার অন্দরে সে প্রাণের সন্ধান পেতো। তার নিজের প্রাণে চেতনা জাগতো বিলিয়ে-দেওয়ার সুখের অনুভূতি, শিকল কাটার উন্মাদনা। জন্মজন্মান্তর-তৃষাতুরের মত অঞ্জলি ভরে পান করত অমলের প্রেম-উৎসের নির্ম্মল শীতল জল। শীতল কিন্তু মদির।

২

আবার বাঙ্‌লা দেশ। চৈত্রের ঝল্‌সানো তাপে বাঙ্‌লার পল্লী-প্রাণ গরমে উঠেছে। শাখায় শাখায় নূতন পাতা। গাছে গাছে নবীন শাখা। লালিত্যের অন্ত নাই, সুষমার শেষ নাই। মাঠে গরু চরছে, রাখালের ছেলেগুলার অর্দ্ধ নগ্ন রোদে-পোড়া-দেহ, তবু তাদের আমোদের বিরাম নাই। হাওয়ায় নেবু ফুলের, আমের মুকুলের, আর কত কিসের সুগন্ধ।

হুস্‌ হুস্‌ করে ট্রেন ছুট্‌ছিল। চারিদিকে গাছের ঝোপ টপ্‌কে প্রভাতের আলো মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল। দিকে দিকে জেগে উঠ্‌ছিল কুটীর, ভাঙ্গা মন্দির, শালুকভরা পুকুর।

ট্রেন ছুট্‌ছিল। ডাকবাহী রেল-গাড়ির যন্ত্র অসুরের স্পর্দ্ধার দৌড়। ছোট ছোট গ্রাম্য স্টেশনে, ঘোমটার অন্তরাল হতে, বিস্ময়ে, পল্লী-বধূ ডাক-গাড়ীর দাম্ভিক প্রয়াণে পুলক অনুভব করছিল। প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে ছড়ানো ষ্টীল ট্রাঙ্ক। মৃণাল-অঙ্গে কারও ডুরে সাড়ি, রঙীন সাড়ি, কাঁচী সাড়ি। আল্‌তা-মাখা ছোট পা, তেলা চুলের মাঝে সিঁথির সিঁদুর।

অমলকুমার ইলারাণীকে বললে—কামারপুকুর। এখানে পরমহংসদেবের জন্ম হ'য়েছিল।

ইলারাণীর ধ্যানের বস্তু ছিল তখন বাঙ্‌লা মায়ের আসল মূর্ত্তি। তাঁর ক্ষেপা ছেলের কথা তখন তার ধারণার মাঝে এলো না।

উত্তেজনার সঙ্গে সে বললে—দেখ দেখ, ঐ মেয়েটি বোধ হয় শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে—পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর, পরনে লাল ডুরে সাড়ি। দেখ, কি দো-টানা ভাব—মায়ের, ভাইয়ের, বাপের জন্যে মন কেমন করছে—প্রাণ অথচ নূতন-জাগা প্রেমের রহস্য জান্‌তে ব্যাকুল।

অমল বললে—তুমিও তো শ্বশুরবাড়ি যাচ্চ, ইলা।

ইলা বললে—হ্যাঁ! কলিকাতায় গিয়ে জুতা খুলে আলতা পরব।

বেগমপুরে উত্তেজিত ভাবে হাস্‌লে ইলা।

বললে—ঐ দেখ কেঁড়ে কাঁকে দুধ যোগাতে যাচ্ছে কামিনী। পিছনে বাঁক নিয়ে চলেছে, ভূষ্‌ণো গোয়ালা।

অমলকুমার একটু বিচলিত হ'ল। সে বললে—তোমার কি ভূষণের জন্য মন কেমন করে ইলারাণী?

উদাসীন ভাবে ইলা বললে—তুমিই বল না।

কিছুক্ষণ পরে বললে—রক্ষা কর। কেঁড়ে কাঁকে ক'রে দুধ যোগান দিতে যেতে পারি না। তোমাদের যত ভদ্র ঘরের জোয়ান, আধা-বয়স, বুড়া বাবুরা, কেঁড়ে-কাঁকে গোয়ালিনী দেখ্‌তে কেন ভালবাসে বল ত?

অমল বললে—অপলে কে কি করে জানি না। কিন্তু অমল চাটুয্যে যখন পলাশপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তারী করত, সুবিধা জুটিয়ে নিত, ঘুরে ফিরে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী ব্রজবালার মত গোপবালাকে দেখবার জন্যে।

ইলা একটু দুষ্টুর মত হাসলে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

সে বললে—রক্ষক ভক্ষকের কথা যেমন অপরের পক্ষে সাজে, ডাক্তারের পক্ষেও রোগী—

সগর্ব্বে অমল বললে—কেন ইলা। এ রোগীকে তো আমার রোজা করেছি। সে ঘাড় থেকে আমার চিরকুমার থাকার ভূতকে নামিয়েছে—সমাজের নিরর্থক অনুশাসন, জিপেষণ প্রভৃতি ভূতগুলাকেও কাবু করেছে। সত্যি কথা শুনবে ইলা। চিকিৎসক চায় নিরাময়তা। কিন্তু আমার সৌভাগ্য ক্রমে বিধাতা তোমায় ম্যালেরিয়া দিয়ে আমার দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে ছিলেন।

—এটা কি সৌভাগ্যের কথা ডাক্তারবাবু? তবে কথাটা সত্য—দিনের পর দিন যদি ধন্বন্তরির মত তুমি আমায় না দেখ্‌তে, এতদিন এ-দেহ তোমার সেবার জন্যে—

উৎসাহ পেয়ে চিকিৎসক বললে—আগে ভাবতাম, ঋষিদের দেববালা কল্পনার মূলে ছিল যোগবল। পরে বুঝলাম, তারা এই রকম এক একটি মানুষ সুন্দরীর বর্ণনাকে মানস-সুন্দরী বলে চালিয়েছে।

গাড়িতে অন্য কেহ ছিল না। সে সস্নেহে ইলাকে বাহুপাশে বেঁধে বললে—ইলা আমার বড় গর্ব্ব বোধ হচ্চে।

ইলা মাঠের দিকে চেয়ে বললে—কি জানি কেন আজ আমার হীনতা আমায় ধিক্কার দিচ্চে।

অমল বললে—ছিঃ।

এবার সে হেসে বললে—তোমার ভালবাসার অধিকারিণী সত্যই—

বাকীটুকু উচ্চারিত হ'তে পেলে না। কারণ, তার কুসুম-পেলব কোমল ঠোঁট আন্তরিক আবেগের চুম্বনে রুদ্ধ হ'ল।

৩

কলিকাতা ঘুরে রাতের ট্রেনে তারা গেল বহরমপুর। সারাদিনের ঘোরা ও দেখার পরিশ্রম। রেলে উঠে ইলারাণী শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ল। মুগ্ধ হয়ে অমলকুমার কিছুকাল তার সদ্য-ফোটা কমলের মত মুখের দিকে চেয়ে থেকে নিদ্রার মোহজালে নিজেও ধরা পড়লো।

বহরমপুর, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি দেখে অপরাহ্ণে তারা ঘোড়ার গাড়িতে জলঙ্গীর পথে বাহির হ'ল। প্রায় ষোলো মাইল যেতে হবে পাকা রাস্তায় কলাডাঙ্গার ঘাট অবধি। তারপর নদী পার হ'য়ে পাঁচ ক্রোশ পথ গো-শকটে। প্রত্যূষে তারা পৌছাবে অমলকুমারের গ্রামে, গোপীবল্লভপুর।

আসল পল্লীগ্রামে, ঝরঝরে ঘোড়ার গাড়ি, তারপর মান্ধাতার আমলের গো-যান। জীবনের প্রথম সতেরো বছর ভেসে আসছিল ইলার মানস-পটে—আমপাড়া, জাম-পাড়া, সাঁতার কাটা, বুধী গাইয়ের বাছুর নিয়ে খেলা করা। সে নিজের দেহসজ্জা ভাবলে—মিহি সাড়ি, সেমিজ, ব্লাউজ, আণ্ডিজ্‌। চরণে সাণ্ডাল পাদুকা। তার অতীতের তিন-পাড় সাড়ি আর গাছ-কোমরের স্মৃতি তাকে হাসালে।

বালুঘাটে তারা নামলো। ঘাটের ধারে পান্থশালা, ময়রার দোকান—মুড়ি মুড়কি, খই বাতাসা। চাষা ভাইয়েরা লাঠি রেখে, হাঁটুর কাপড় তুলে বিশ্রাম করছে—মুখে অনির্দ্দিষ্ট উদাস ভাব, কপালে বিগত দিনের সঙ্কটের রেখা—অনাগত দিনের উপর ঘোর অবিশ্বাস। এক একজনকে দেখলে মনে হয়, বিধাতা সংসারের পাটার উপর রজকের হাতের কাপড়ের মত তাদের আছড়েছেন।

পারের নৌকায় উঠে ইলারাণী দীর্ঘশ্বাস দমন করতে পারলে না। সংস্কৃতি তার আবেগকে সচেতন করেছে, রুদ্ধ স্বজন-প্রীতি শুদ্ধ হয়েছে। তার সঙ্গে চিত্তের অন্তস্তলে জন্মেছে বিধাতার বিপক্ষে বিদ্রোহের বীজ।

অমলকুমার অন্ত-ভাবে মশ্‌গুল ছিল। গ্রাম্য-পাঠশালা, ইশলামপুর বিদ্যালয়, কৃষ্ণনাথ কলেজ, মেডিকেল কলেজ। তারপর পলাসপুর গ্রাম্য দাতব্য চিকিৎসালয়। সেই গ্রামেই তার সৌভাগ্যের প্রারম্ভ। মাত্র ছমাস সেখানে কাজ করেছিল। তার দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রে ফতেগড় টেলিগ্রাফে তাকে ডেকেছিল। সেই গ্রামের ছাই উড়ায়ে সে লাভ করেছিল অমূল্য রতন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পশ্চিমদিকে মেঘের অনেকগুলা টুকরো একত্র হ'ল। ক্রমে তারা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। মাথার উপর এলো, পূর্ব্বে নামলো। উত্তরে, দক্ষিণে অভিযান করলে। মাঝে মাঝে চিকুর হানলে।

যখন কলাডাঙ্গার ডাক-বাঙালা পেরিয়ে তারা নদীর মোহানায় নামলো—আকাশ তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন। প্রকৃতি থমথমে। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ভীত-গরুর হাম্বা। পাখীগুলা ঝোপে লুকিয়ে প্রতীক্ষা করছিল ঝড়-জলের। কাকলীর শব্দ নাই।

নিধু এপারে এসেছিল। বউ নিয়ে দাদাবাবু ঘরে আসছে—পাশ করা দাদাবাবু, ডাক্তারী পাশ করা। গর্ব্বিত নিধু অন্ধকারে দেখ্‌তে পেলে না নূতন-বৌ রাঙা কি সাদামাটা।

—একটু পা চালিয়ে এসেন। ঝড় উঠ্‌বে।

অমল বললে—এঁদের নিয়ে যাও নিধু। আমি জিনিস পত্তরগুলা গুছিয়ে আনছি।

গর্ব্বিত নিধু বললে—এসেন বৌ-ঠান!

নৌকা তৈয়ার ছিল। দড়ি ধরে পাটনী দাঁড়িয়েছিল গলুইয়ের কাছে।

ইলারাণী নৌকায় উঠ্‌লো। নিধু গেল দাদাবাবুকে সাহায্য করতে। গভীর অন্ধকার। মাত্র শব্দ শোনা যায়, লোক দেখা প্রায়-অসম্ভব।

হঠাৎ অন্ধকারের অন্তর ভেদ ক'রে কাল-নাগিনীর মত এঁকে বেঁকে আত্ম-প্রকাশ করলে দামিনী। কড় কড়কড় শব্দে স্তব্ধ প্রকৃতি চম্‌কে উঠ্‌লো। ভয়ে স্থির বাতাস গর্জ্জে উঠ্‌লো—পাগলের মত সে ছুটলো।

গোকুল পাটনী নৌকার উপরের মূর্ত্তি দেখলে বিদ্যুতের আলোয়। ইলারাণী দেখলে গোকুল পাটনীকে, উভয়ে শিহরে উঠ্‌লো। তার হাতের দড়িতে ভীষণ টান পড়ল, দড়ি ফস্‌কে গেল। নৌকা নেচে উঠলো। যাত্রী ও নাবিক আর্ত্তনাদ করলে।

বাঘের মত লাফ দিয়ে নৃত্যশীল নৌকার গলুই ধরলে পাটনী। নৌকা নাচ্‌ছিল। হাতের জোরে সে লাফিয়ে উঠ্‌লো নৌকায়। আবার চিকুর হানলে। দুজন যাত্রী আবার পরস্পরকে দেখ্‌লে। দুজনে আবার শিউরে উঠ্‌লো।

—শুয়ে পড় কামিনী, শুয়ে পড়—বললে গোকুল পাটনী।

ইলারাণী শুয়ে পড়লো—কিন্তু সংজ্ঞাহীন, অসাড় মাংসপিণ্ডের মত।

যখন তারা ছুটে এলো ঘাটের ধারে, তীরবেগে নৌকা ছুটছে বেনিয়াখালির দিকে। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল।

—বাঁচাও নিধু, বাঁচাও!

নিধুর কি সাধ্য? সে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো, গোকুল—গোকুল—মাঝি! গো—কুল মাঝি—গো—

তাকে ব্যঙ্গ করতে লাগ্‌লো হাওয়া আর জল।

৪

নৌকা ঘুরলো, ফিরলো, নাচলো। কত বাঁক ঘুরলো, কতবার সোজা চললো, মাঝি তার কোনো সন্ধান রাখলে না। সে সংজ্ঞাহীনাকে ধরে বস্‌লো—একখানা পাটা তুলে পা ঢুকিয়ে দিলে পাটার নিচে নৌকার খোলে। পায়ে চেপে ধরলে ডিঙ্গির পাঁজর, জোর পাবার জন্য। প্রাণপণে চেপে রইল রমণীকে। জলের স্রোত পাছে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

কামিনীর যখন জ্ঞান ফিরলো, সে বিজলীর আলোয় আবার দেখলে, অনিমেষ লোচনে তার দিকে তাকিয়ে তাকে চেপে ধরে আছে পাটনী।

সে বললে—ছাড়।

—নড়লে নৌকা কাত হবে। ঝড় কমেছে। বৃষ্টির জোর। আস্তে আস্তে পাশ ফেরো, মুখে জলের ছিটে ঝাপটা লাগবে না।

চারিদিক ভিজে—পাটনীর গলার স্বর অবধি।

চক্ষু বুজে পড়ে রইল ইলারাণী। সুবিধা পেলেই লাফিয়ে পড়বে জলে—মনে মাত্র এই একটি সাধ। আর বাজ পড়ছিল না, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল না, হাওয়া সোঁ সোঁ করছিল না—কেবল জল পড়ছিল—মুষলধারে জল পড়ছিল।

কাজ কি বিদ্যুতের আলো—সূর্য্যের আলো? কেবল একটা বেদনার সূক্ষ্ম পরদা-ঢাকা মুখ। সেই দৃষ্টি। মাত্র বিস্ময় মাখা। সেই কণ্ঠস্বর। আদেশের দৃঢ়তা তাতে নাই, কোমল ভিক্ষা-মাগ্না সুর। কিন্তু স্পর্শবজ্র-কঠিন। একবার এ চাপ সরলেই ইলারাণী অন্তিম শান্তির আশ্রয় নেবে স্রোতস্বতীর জলে। দুঃসময়েও তার কানে বাজলো গানের রেশ—কলঙ্কিনীর মরণ ভাল, শুকায়নি নদী।

সকলের শেষ আছে। বৃষ্টিরও। বৃষ্টি কম্‌লো। নৌকার আর বেগ নাই। সে মাত্র ভেসে যাচ্ছিল। একটু বাইতে পারলে তরী ভেড়ানো যায় গাঙের কূলে।

পাটনী বললে—নৌকা ভেড়াব। এমনি চুপটি ক'রে শুয়ে থাক।

এবার সে তেড়ে উঠে বস্‌লো। চীৎকার ক'রে বললে—কিসের জন্তে? কেন? ছাড় আমি লাফিয়ে পড়ি। তারপর যেথা খুশী ডিঙ্গি ভিড়িও।

বজ্র-মুষ্টিতে তাকে চেপে ধরলে নাবিক। বললে—আমি ডাক্তারবাবুর বাড়ি চিনে ঠিক্ পৌঁছে দোব। আমার কি দোষ বল? আমার অদেষ্ট।

—না ছাড়। মরব। মরব! মরব!

—আমার কি দোষ কামিন্?

সেই আদরের ডাক্—কামিন্!

আকাশের জল, চোখের জল, নদীর জল—এক স্রোতে বাইতে লাগ্‌লো।

৫

তারা বড় অশ্বত্থের তলায় বসেছিল। চরে নৌকা বাঁধা ছিল। কামিনী তাকিয়ে ছিল দূরে মাঠের দিকে। ভূষণ তাকিয়ে ছিল—জলের দিকে।

কামিনী দেখলে একটা রাখালের ছেলে গরু চরাচ্চে। সে স্বামীর দিকে তাকালে—রোদে পোড়া সবল দেহ, আধ-ভিজে কাপড়, দেহ মন অবসন্ন। একে সরাতে পারলে তিন পক্ষের মঙ্গল।

সে বললে—ঐ ছোঁড়াকে হাঁক মারো। ওর সঙ্গে গিয়ে কিছু খাবার আনতে পার। তোমার ক্ষিধে পেয়েছে বোধ হচ্চে।

—গরীবের আবার ক্ষিধে তেষ্টা। তোমার কিছু খাওয়া কর্ত্তিব্যি। তোমরা যে চা খাও ভোরে।—সরল ভাবে বললে ভূষণ।

সে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার ক'রে ডাকলে—ও ভাই! ও রাখাল!

রাখাল মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে, গ্রাহ্য করলে না।

কামিনী বললে—ওর কাছে গিয়ে গ্রামের সন্ধান নাও না।

সে বললে—আমি কি তোরে চিনিনে কামিন্? সারারাত মরতে চেয়েছিস। তোকে ধরে রেখেছি। আমি নড়ব না।

কামিনী বললে—আমি বেঁচে থেকে কি করব? আমি কলঙ্কিনী—আমার মরা ভাল।

—গেরামে বড় নিন্দে। নিন্দের ভয়ে গ্রাম ছেড়েছি। মরে কি করবে কামিন্? মরলে কি অখ্যাত যাবে গা?

নিন্দার ভয় তার ছিল না, কারণ গ্রামের সম্পর্ক সে ছেদন করেছিল। সে বললে—মরে তোমায় নিষ্কৃতি দোব।

সে ম্লান হাসি হাস্‌লে। বললে—গ্রাম ছেড়ে গোকুল মাঝি হয়েছি—নৌকা বাইছি। এ গ্রামে কেউ জানে না। তোমায় পৌঁছে দিয়ে আবার ভিন্ গাঁয়ে যাব—বৈরাগী হ'ব। ঘুরতে ঘুরতে চলে যাব।

ইলারাণী কিছু বললে না। গাছের তলায় চোখ বুজে শুয়ে রহিল।

ক্রমশ রোদের তাত বাড়লো। একটু এগিয়ে গিয়ে আম বাগানের গাছের ছায়ায় তারা বস্‌লো।

ভূষণ ক্রমশঃ অবসন্ন হচ্ছিল। একটু খেতে পেলে সে সুস্থ হয়। কামিনী বললে—নৌকার খোলে আমার একটা ব্যাগ পড়ে আছে। তাতে টাকা আছে। কাছেই গ্রাম। ব্যাগটা আনো।

—ওরে আমার চালাক্ রে—বললে ভূষণ।

—না, পালাব না।

কিন্তু তাকে না খাওয়ালে কামিনী ক্লান্ত হবে।

ভূষণ বললে—আমি ব্যাগ আন্‌তে গেলে পালাবে না বল—ডাক্তারবাবুর দিব্যি।

—তোমার দিব্যি।

—আমার দিব্যি!—অতি কাতর স্নেহের সঙ্গে ভূষণ বললে—আমার দিব্যি! হাঃ অদেষ্ট! ভূষণো গরলার দিব্যি!

ধীরে ধীরে কামিনী বললে—আচ্ছা,ডাক্তারবাবুর দিব্যি।

ভোজন করে তারা নিদ্রা যেতে পারলে না। ভূষণ নিদ্রা গেলে কামিনী পালাবে। ভূষণকে জাগিয়ে রেখে কামিনী নিদ্রা যায় কেমন করে। তারা দু'জনে দুদিকে তাকিয়ে রহিল।

ইলা-রাণীর সংস্কৃত অনুভূতি উৎসুক হ'ল জানতে দেশের কথা। বিবাহের পর তার একমাত্র আত্মীয়া—পিতৃস্বসা পরলোকগমন করেছিল। ভূষণের সংসারে ছিল তার বিধবা জননী।

—তা হ'লে দেশে আমার খুব নিন্দা।

—নিন্দা! তুমি যখন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলে কামিন্—

তার শরীর শিউরে উঠ্‌লো। প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমের ডাকে চলে যাওয়াকে সমাজ ঐ নোংরা কথাটা বলে বটে।

—লোকে অখ্যাতি দিয়ে ক্ষান্ত হ'ল না। কত লোকে কত কি বললে। সবাই বললে—থানা-পুলিস কর।

আবার সে শিউরে উঠ্‌লো।

কিছুক্ষণ পরে কামিনী বললে—মা?

—মা বললে—ছিঃ। ও দিরিব্যি কি গরীবের ঘরের। এখানে ভাত নেই, কাপড় নেই, ছোঁড়ার মুখে মিষ্টি কথা নেই। মা-হারা ছুঁড়ি খেয়ে পরে বাঁচবে। আহাঃ! মা আমার তিন মাসের মধ্যে স্বর্গে গেলেন।

ভূষণ চোখের জল মুছলে। ইলা দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। দুমুটো ভাতের জন্য আর দুখানা রঙীণ সাড়ির জন্য সে কুল-ত্যাগিনী—সত্যই তো একথা বলবে সমাজ। ফ্রি-লাভ, মনের-সাথে-মনের বাঁধন, জীবনের সাথী খোঁজার সহজ অধিকার ও মাধুরী, সাধারণ লোকে বোঝে না। ভাত কাপড়ের জন্য—আত্ম-বিক্রয়! ছিঃ!

ভূষণ বললে—রাগছ কেন কামিন্। সত্যি কথা। আমি এখন বুঝেছি তোমার কদর—তুমি রাণী, আমি মুরখু। তুমি রাণীর মত পার ঘাটে এলে! কেমন সাজ, কেমন চলন। বিজ্‌লীর আলোয় যখন তোমায় চিনলাম, পরাণটা আমার হাঁক-পাকিয়ে উঠ্‌লো।

৬

একটা গণ্ডগোল হ'ল। দু-নৌকা বোঝাই লোক এলো। চরে বাঁধা ডিঙি দেখে তারা নৌকা ভেড়ালে। কজনে চীৎকার করতে লাগলো—গোকুল মাঝি! ও গোকুল!

পথে তারা ডাক্তারকে বুঝিয়েছিল—গোকলো পাগলা। ওর লোভ নেই। ও গয়নার লোভে বৌ-মা-ঠানকে খুন করবে না। অমলের অধীর প্রাণ আশায় নেচে উঠ্‌লো। সে ডাকলে—গোকুল! গোকুল মাঝি!

গোকুল শুনলে। বললে—কামিন্, পালাই। ওরা এসেছে। আমার কেউ নেই কামিন্—মা নেই, তুই নেই, কেউ নেই। সুখে থাক্। তুই রাণী।

এবার কামিনী তাকে বজ্র-মুষ্টিতে ধরলে।

অবাক হয়ে ভূষণ বললে—ছাড়! ছাড়! অখ্যাত্ হবে কামিন্। লোক-জানাজানি হবে। নিন্দে হবে। ছাড়।

—বখ্‌শিশ নিতে হবে ডাক্তারবাবুর কাছে।

—চুলোর ছাই। লক্ষ্মীছাড়ার বখ্‌শিশ। ছাড়! ছাড়! নিন্দে হবে। চিনে ফেলবে কামিন।

তারা এসে পড়লো।

ডাক্তার বললে—হাঃ ভগবান! তুমি বেঁচে আছ ইলা? তোমায় আবার দেখব আশা করিনি।

পারঘাটের ঠিকেদার বললে—ডাক্তারবাবু। গোকুল মাঝির কেরামতি। ওকে বখশিশ দিতে হবে।

—নিশ্চয়।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা নির্ব্বাক হ'ল মাঝির দিকে তাকিয়ে। সে স্বপ্নোত্থিতের মত বললে—এ কে?

ভূষণ বললে—আমি গোকুল।

সে আর একবার পালাবার চেষ্টা করলে। ইলা তাকে ধরলে।

ডাক্তার বললে—ইলা চলে এস। চলে এস। সারা রাত ভিজেছ। কি ভীষণ চেহারা হয়েছে তোমার। এস। এস।

ইলারাণী গায়ের গয়না খুলতে খুলতে বললে—ডাক্তারবাবু, ইলারাণী আপনার দয়ার কথা ভাবতে ভাবতে মরেছে। আমি কামিনী গোয়ালিনী। ভূষণো গোপের স্ত্রী। ভূষণকে চিনতে পারছেন না?

ডাক্তার বললে—রঙ্গ রাখ। এস। এস।

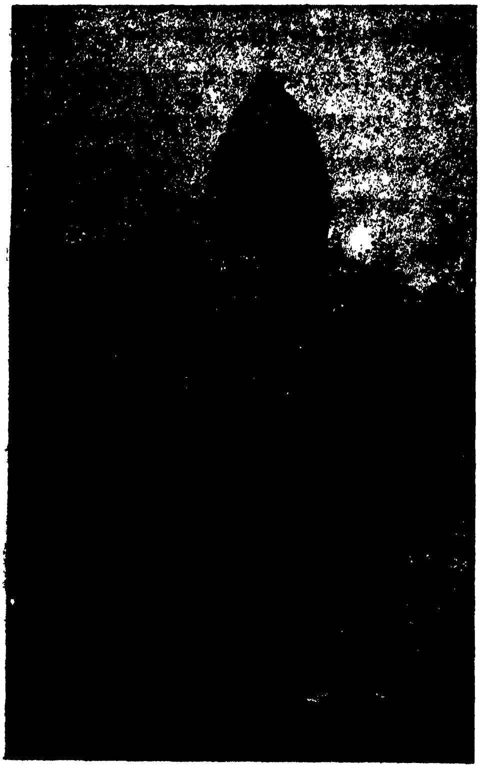
কামিনী বললে—ডাক্তারবাবু, আমার স্বামীকে দেখবার কেউ নাই। আমার শাশুড়ী পরলোকে। প্রণাম।

সে মাঠের উপর সোনার ভূষণগুলা রেখে তার স্বামী ভূষণের হাত ধ'রে গ্রামের দিকে চলে গেল।

ব্রাহ্মণডিহির নবরত্ন মন্দির

শ্রীউমাপদ রায়

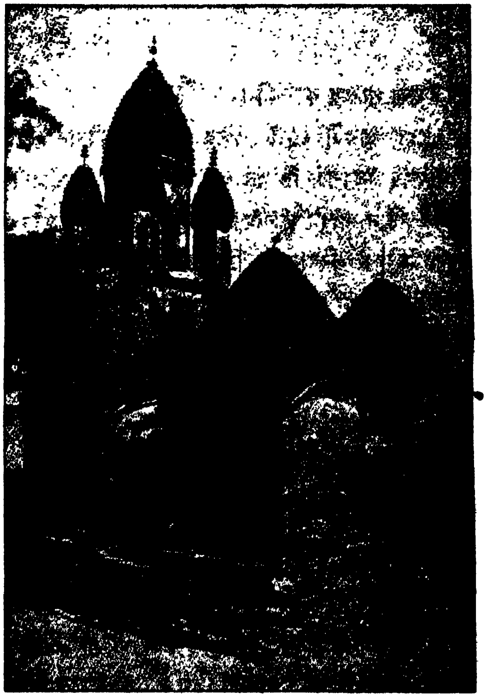
বাংলা দেশের বীরভূম জেলার নানুর থানার অধীন ব্রাহ্মণডিহি গ্রামখানি অতি প্রাচীন। এই জেলার মধ্যে যে কয়টী অতি প্রাচীন মন্দির আছে তন্মধ্যে এই গ্রামের নবরত্ন মন্দির অন্যতম। এ ধরণের প্রাচীন মন্দির আজকাল বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। যে কয়টী আজও কোন প্রকারে টিকিয়া আছে, সে কয়টিও সংস্কারাভাবে ও দেশবাসীর অমনোযোগিতায় একরূপ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র না হইলেও এই গ্রামে অর্থশালী ধনবান লোকের বসতি একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই গ্রামবাসীদের দ্বারা এই মন্দিরের সংস্কার



ব্রাহ্মণডিহির প্রাচীন মন্দির

আশা করা যায় না। মধ্যযুগে স্থাপত্য বিস্তায় বাঙ্গালী কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল সম্রাট আকবর কর্তৃক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত আগ্রার শত শত প্রাসাদগুলি তাহার জলন্ত নিদর্শন। এই প্রাসাদগুলি বাঙ্গালার স্থাপত্য প্রথায় রচিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা মোগল স্থাপত্য শিল্পে বাঙ্গালীর দান যে কত বড় তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। বীরভূমের অতি প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণডিহির ত্রিতল নবরত্ন মন্দিরটী কত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমার পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে এই মন্দিরের বিষয় যতটুকু অবগত হইয়াছি তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে অধিকাংশ মন্দিরই ষোড়শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমার জেঠাইমায়ের মাতা স্বর্গীয়া ভবতারিণী দেবীর নিকট শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদের বংশের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় রুদ্রনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক এই মন্দির নবাব আলিবর্দ্দির রাজত্বকালের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, মন্দিরটী প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, একদিন এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নে অতিথিরূপে রুদ্রনারায়ণ রায়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। আহারের সময় আগন্তুক অতিথি জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে যে অন্ন দান করিতেছেন, উহা ভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত কি-না? ইহাতে রুদ্রনারায়ণ রায় বলিয়াছিলেন আমার বাড়ীতে নারায়ণ শিলা বা কোন প্রকার বিগ্রহমূর্ত্তি নাই, কাজেই আপনাকে অনিবেদিত অন্ন প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে অতিথি অন্নগ্রহণ না করিয়া চলিয়া যান। এই ঘটনায় রুদ্রনারায়ণ দারুণ মনঃকষ্ট অনুভব করেন। এই সময় তিনি এই গ্রামের মধ্যে অতিশয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বাড়ীতে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করেন। তাঁহার সংকল্প অনুসারে অচিরাৎ ব্রাহ্মণডিহি গ্রামে একটী ত্রিতল নবরত্ন মন্দির নির্ম্মিত হয়। উক্ত মন্দিরেই লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীধর, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেববিগ্রহগুলি ও শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই নবরত্ন মন্দির ছাড়া তিনি চারিটী শিব মন্দির, একটী শ্যামামন্দির ও একটী দোলমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজও একমাত্র দোলমন্দির ছাড়া এইগুলির সমুদয় বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। রুদ্রনারায়ণের বংশধর না থাকায় তাঁহাদের বংশধরের পরিচয় বিশেষ করিয়া বলা যায় না। এই বংশের শেষ বংশধর স্বর্গীয় ঋষভচন্দ্র রায়ের পুত্রসন্তান ছিল না—কেবল মাত্র ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, চন্দ্রমুখী ও বসন্তকুমারী দেবী নামে চারি কন্যা ছিল। কন্যা চতুষ্টয়ের যথাক্রমে বীরভূম জেলায় লাভপুর থানার ঠিবা গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রথমা কন্যা ইন্দ্রাণী দেবীর, ঐ জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অধীন রাতমা গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত রুদ্রাণী দেবীর, ঐ জেলার নানুর থানার অধীন উচকরণ গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত চন্দ্রমুখী দেবীর ও বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থানার অধীন বারগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বসন্তকুমারী দেবীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কাজেই বিবাহের পর কন্যাগণের মধ্যে কেহই পৈতৃক বাসভবনে না থাকিয়া আপন আপন স্বামীগৃহেই বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে অর্দ্ধেকের মালিক

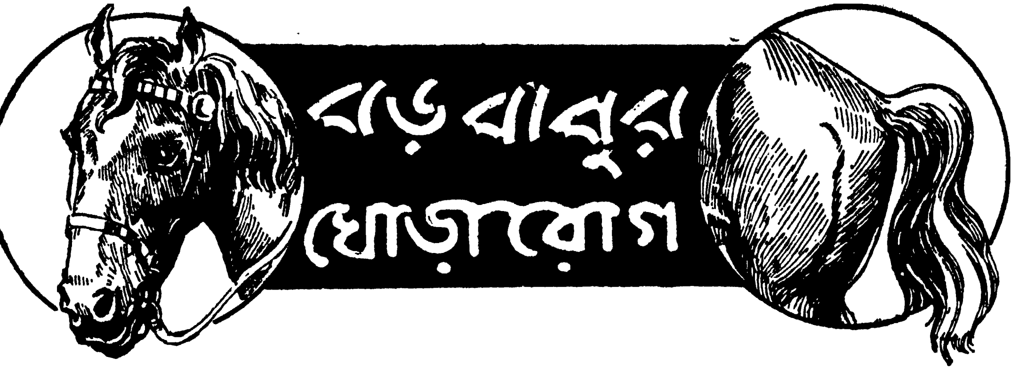
ছিলেন। বাকী অর্দ্ধেকের মালিক স্বর্গীয় জগদিন্দুনারায়ণ রায়ের বিধবা পত্নী। ইঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায় ও পূর্ব্বোক্ত কন্যাগণের তদ্বিরের অভাবে এই মন্দিরগুলি ক্রমশ নষ্ট হইতে থাকে। বর্ত্তমানে স্বর্গীয়া রুদ্রাণী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত শক্তিধর চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় জগদিন্দুনারায়ণ রায়ের বিধবা পত্নী ইঁহারা উভয়ে শালগ্রামশিলা, শিবচতুষ্টয়, অন্নপূর্ণা বিগ্রহ ও শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাদি চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা এত খারাপ যে, ইঁহাদের দ্বারা এই বিরাট মন্দিরের সংস্কার করা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণডিহির বহুকালের অতি প্রাচীন মন্দির সংস্কার অভাবে নষ্ট হইতেছে দেখিয়া আলোচ্য মন্দিরের সংস্কারের জন্য Temple Preservation Act অনুসারে ঐ মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচরীভূত করি। তিনি বোলপুর সার্কেলের সার্কেল-অফিসারের উপর ঐ মন্দির পরিদর্শনের ভার দেন। সার্কেল অফিসার কর্ত্তৃক উক্ত মন্দির সম্বন্ধে তদন্ত শেষ করিয়া রিপোর্ট পাঠাইবার পর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নীরব থাকায় আমি পুনরায় ঐ মন্দিরের সংস্কারপ্রার্থী হইয়া বাঙ্গালার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয়ের সহিত রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ সাক্ষাৎ করি এবং যাহাতে প্রাচীন মন্দির সংস্কার আইন অনুসারে ঐ মন্দিরের সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হয়, তাহার প্রার্থনা জানাই। তিনি আমার আবেদনপত্রের উপর ভালভাবে মন্তব্য লিখিয়া উক্ত আবেদন পত্রখানি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন শিল্প বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহার আদেশক্রমে উক্ত বিভাগের আরকিওলজিক্যাল ওভারশিয়ার বাবু বিজয়চন্দ্র ঘোষ ও ফটোগ্রাফার বাবু শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ১লা মে তারিখে ব্রাহ্মণডিহি গ্রামের নবরত্ন মন্দির ও শিবমন্দিরের ফটো গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে মন্দিরটী দুই শত বৎসরের বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু রুদ্রনারায়ণ রায়ের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা বর্গীর হাঙ্গামার বহু পূর্ব্বে। এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, উক্ত নবরত্ন মন্দির একমাত্র রুদ্রনারায়ণ ছাড়া অপর কাহারও আমলে নির্ম্মিত হয় নাই। রুদ্রনারায়ণ রায়ের এষ্টেট সংক্রান্ত কাগজপত্র ও প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ অনুসন্ধান করিলে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় যে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বের বহু পূর্ব্বে রুদ্রনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আকবর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশ জয় করেন এবং তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব সচিব টোডর মল্লের সহায়তায় সমগ্র বাঙ্গালা দেশ ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। ৬৮২ পরগণার মধ্যে ফতেসিংহ পরগণা অন্যতম এবং ব্রাহ্মণডিহি গ্রামখানি এই পরগণার অন্তর্গত। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। তবে নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা ব্রাহ্মণডিহির প্রাচীনতম মন্দির এবং বাঙ্গালা ধরণের এরূপ সুপ্রাচীন মন্দির সমগ্র বীরভূম জেলার মধ্যে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের



ব্রাহ্মণডিহির প্রাচীন মন্দির (অপর দিকের দৃশ্য)

প্রাচীন শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী ঐ মন্দিরের ফটো লইয়া নীরব রহিলেন ; তাঁহার মন্তব্য অনুসারে জানা যায় যে, ঐ মন্দির সংস্কার ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া বাঙ্গালা সরকার বর্ত্তমানে ঐ মন্দির সংস্কারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না।





শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী।

বিহারের একটী ছোট শহরে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। তখনকার দিনে প্রবাসে বাঙ্গালীবাবুদের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। বিমানবাবু তাহা অতিরিক্ত পরিমাণেই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকলের সহিতই মেলামেশা করিতেন, লোকেও সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। সকালে বৈকালে তাঁহার বাড়িতে প্রত্যহ বহুলোকের সমাগম হইত।

বিমানবাবু স্থানীয় সরকারী ফ্যাক্টরীর বড়বাবু ছিলেন এবং শহরে সর্ব্বত্র তিনি 'বড়বাবু' এই নামেই অভিহিত হইতেন। অনেকে তাঁহার আসল নামটীও জানিত না। বড়বাবুর বৈঠকখানায় সন্ধ্যার মজলিসে উপস্থিত থাকা জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল-মোক্তার, সরকারী কর্ম্মচারী—সকলের পক্ষেই বিশেষ কাম্য ছিল। তখনকার সময়ে চায়ের প্রচলন হয় নাই, পান-তামাক দিয়াই তিনি সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। দৈনিক প্রায় একসের করিয়া উৎকৃষ্ট গয়ার তামাক সেখানে সদগতি প্রাপ্ত হইত।

গৃহিণী, দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা এবং পাঁচ-সাতটি দাসদাসী লইয়া বাগানঘেরা সুবৃহৎ পাকাবাড়িতে বড়বাবু বেশ আনন্দেই দিন কাটাইতে ছিলেন। সঞ্চয়ের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি মাসিক দেড়শত টাকা বেতন পাইতেন, এখনকার দুর্ম্মূল্যের দিনে তাহা অন্তত পাঁচশত টাকার সমান। বেতনের প্রায় সবটাই তাঁহার খরচ হইয়া যাইত।

হঠাৎ বড়বাবুর মনে হইল যে, গাড়ি-ঘোড়া না হইলে আর মান থাকিতেছে না। তাঁহার অপেক্ষা অল্প আয়ের অনেকেরই গাড়িঘোড়া রহিয়াছে, এমন কি অধীনস্থ চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা বেতনের বিহারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেও কেহ কেহ নিজের এক্কা বা টম্‌টম্ করিয়া আপিসে যাওয়া-আসা করে। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ভাল একটি গাড়িঘোড়া রাখিতে তাঁহার খুব বেশী ধরিলেও মাসে পঁচিশ টাকার অধিক খরচ পড়িবে না।

বাড়ি হইতে ফ্যাক্টরী অতি নিকটে, হাঁটিয়া যাইতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগে না, সেজন্য গাড়ির কোনই দরকার নাই। গৃহিণী এই কারণে প্রথমে আপত্তি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু বড়বাবু যখন তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উহাতে তাঁহাদের উভয়েরই মান আরও বাড়িবে, তখন তিনি সম্মতি দিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হইল, সব দিকের খরচপত্র যথাসম্ভব কমাইয়া কয়েকমাসের মধ্যেই গাড়িঘোড়া কিনিবার টাকাটা সঞ্চয় করিতে হইবে।

অল্প কয়েকমাস কাটিয়া যাইতেই গৃহিণী একদিন বড়বাবুকে জানাইলেন যে, গাড়িঘোড়া কিনিবার জন্য তিনি তাঁহাকে এখন চারশত টাকা দিতে পারেন। বড়বাবু আশ্চর্য্য হইয়া গৃহিণীর দিকে চাহিতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, দুইশত তাঁহার পূর্ব্বে জমান ছিল, সেই কারণেই এত শীঘ্র সব টাকাটা দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে। আনন্দের আতিশয্যে, স্থানকাল বিবেচনা না করিয়াই বড়বাবু পত্নীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কন্যাটি আসিয়া পড়ায় তাঁহাকে বাধা পাইতে হইল।

বড়বাবু গাড়িঘোড়া কিনিবেন, একথা প্রচার হইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। সকাল-সন্ধ্যার মজলিসে

বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে ক্রমশই ব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। সকলের মুখেই এককথা—বড়বাবুর গাড়িঘোড়া শহরের মধ্যে সেরা হওয়া চাই। মজলীসীরা অন্য আলোচনা একরূপ ছাড়িয়া দিয়া গাড়িঘোড়ার আলোচনাতেই বড়বাবুর আসর গরম করিতে লাগিল। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলে গৃহিণীর সঙ্গেও সেই গাড়িঘোড়ারই কথা। তিনিও উহাতে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

হঠাৎ একটা সুযোগ ঘটিয়া গেল। বড়বাবু আদালতের নিলাম হইতে মাত্র দেড়শত টাকায় একখানি প্রায় নূতন 'আপিস্ যান' গাড়ি কিনিয়া ফেলিলেন। সকলেই বলিল, বড়বাবুর বরাত। তাহা না হইলে ঐরূপ সুন্দর সাহেব-বাড়ির তৈয়ারী গাড়ি উহার তিন গুণ দামেও কেহ পাইত না। গাড়ি দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা খুবই খুশী হইল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহিণী ছেলেমেয়েদের লইয়া পূরা একটি সকাল বাহনহীন নিশ্চল গাড়ির মধ্যে বসিয়াই কাটাইলেন।

গাড়ি হইয়াছে, এইবার একটি ভাল ঘোড়া কিনিতে পারিলেই হয়। বড়বাবু ঘোড়ার সন্ধানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বাবু মনোহরপ্রসাদ স্থানীয় একজন সম্রান্ত অধিবাসী, বড়বাবুর একজন বিশেষ বন্ধু। ঘোড়া চিনিতে তাঁহার সমকক্ষ শহরে আর কেহ ছিল না। তিনি নাকি একবার মাত্র চক্ষে দেখিয়াই যে-কোন ঘোড়ার দোষগুণ অবলীলাক্রমে বলিয়া দিতে পারিতেন। মূল্য নির্দ্ধারণেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বলিতেন, নিজের ও অপরের হইয়া এযাবৎ প্রায় পাঁচশত ঘোড়া কিনিলেও মাত্র একবার ব্যতীত তাঁহাকে কখনও কেহ ঠকাইতে পারে নাই। ঘোড়া পছন্দ করিয়া দিবার জন্য বড়বাবু মনোহরপ্রসাদের শরণাপন্ন হইলেন।

প্রতিদিনই দালালেরা ঘোড়া লইয়া আসিতে লাগিল। বিশেষত রবিবার সকালে বড়বাবুর বাড়ির সুবিস্তৃত হাতার মধ্যেও আর স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া পড়িল। লোকে দেখিত, সেদিন ফটকের বাহিরে সদর রাস্তার উপরও সারিসারি নানা রকমের ঘোড়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইমাস ধরিয়া কত যে ঘোড়াওয়ালা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল তাহার অন্ত নাই। মনোহরপ্রসাদের কোন ঘোড়াটাই পছন্দ হইল না।

বড়বাবু ও গৃহিণী উভয়েই বিশেষ অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যে মনোহরপ্রসাদকে না ডাকিলেই ভাল হইত। বড়বাবু ঘোড়ার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে উহা গৃহিণীতেও সংক্রামিত হইল। এমন সময় একদিন মনোহরপ্রসাদ বড়বাবুকে জানাইলেন যে, তাঁহার আর ঘোড়ার জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। দুই সপ্তাহ পরেই হরিহর ছত্রের মেলা সুরু হইবে, দুইজনে সেখানে গিয়া মনের মতন একটি ঘোড়া কিনিয়া আনিবেন।

হরিহরছত্রের মেলা, ভারতের প্রধান মেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এই মেলার মত অন্য কোন মেলায় হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, ছাগল প্রভৃতির এত বেশী কেনাবেচা হয় না। অনেক রাজা, জমিদারও নিজের আবশ্যক মত জানোয়ার কিনিবার জন্য হরিহর ছত্রের মেলায় গিয়া তাঁবু ফেলেন। দেশদেশান্তর হইতে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আসিয়া এখানে হাজির হয়। বিহার প্রদেশের প্রধান নগরী পাটনা শহরের পরপারে গঙ্গার তীরে সোনপুরে বহুবিস্তৃত স্থান জুড়িয়া এই মেলা বসে। মেলায় বহু লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। পছন্দমত ঘোড়া সেখানে যে নিশ্চয়ই মিলিবে এবং দরেও সুবিধা হইবে, সে বিষয়ে বড়বাবুর কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি মনোহরপ্রসাদের কথাতেই রাজি হইয়া গেলেন।

মেলা আরম্ভ হইবার তিনদিন পরেই মনোহরপ্রসাদ ও একজন সহিসকে সঙ্গে লইয়া বড়বাবু ঘোড়া কিনিতে যাত্রা করিলেন। তিনি যে শহরে থাকিতেন, সেখান হইতে সোনপুরের দূরত্ব খুব বেশী নয়। তাঁহারা নৌকাযোগে যাওয়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নৌকায় কেবলমাত্র ঘোড়ার গল্প করিয়াই মনোহরপ্রসাদ সমস্ত সময়টা কাটাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা মেলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি বিরাট মেলা, লোকে লোকারণ্য। বড়বাবুর মনে হইল, ঘোড়ার হাটেই যেন সকলের অপেক্ষা বেশী লোকের ভীড়। হরিহরপ্রসাদ বলিলেন, এখানে ক্রেতার কোনরকম ব্যস্ততা যেন প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে ঘোড়াওয়ালারা ঠকাইয়া বেশী দাম আদায় করিয়া লইবে। তাঁহারা কতকটা নির্লিপ্তভাবেই ঘোড়া দেখিয়া বেড়াইতে-

ছিলেন। হঠাৎ হরিহরপ্রসাদ একজায়গায় থামিয়া পড়িয়া ইশারা করিলেন। বড়বাবু দেখিলেন, নিকটে দক্ষিণ দিকে একটি তেজস্বী উর্দ্ধগ্রীব ও উর্দ্ধপুচ্ছ সুন্দর বাদামী রং-এর ঘোড়াকে ঘিরিয়া কয়েকজন লোকে দরাদরি করিতেছে। ঘোড়াটা কিছুতেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছে না, যেন এখনই বাহির হইয়া দৌড়াইতে পারিলেই তাহার তৃপ্তি হয়।

সেখানে অল্পক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিয়াই বড়বাবুকে একরূপ টানিয়া লইয়া হরিহরপ্রসাদ একটু দূরে সরিয়া আসিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, খাসা ঘোড়া, একটু বেশী তেজী, দিনকতক 'ব্রেক্' করিয়া লইলেই চলিবে। বড়বাবু উত্তর করিলেন, এইটিই যেমন করিয়া হউক আমাদের কিনিতে হইবে।

যাহারা ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে দরাদরী করিতেছিল, তাহারা সেইদিকেই আসিতেছে দেখিয়া দুইজনে কথাবন্ধ করিলেন। নিকটে আসিতে শুনিলেন, তাহারা বলিতেছে, সমস্ত মেলার মধ্যে কম্পাস্ বা টম্‌টম্ গাড়ির উপযোগী ওরূপ সুন্দর ঘোড়া আর একটিও নাই। তবে, ঘোড়া-ওয়ালা দামটা একটু বেশীই চাহিতেছে, অতটাকা তাহাদের সঙ্গে নাই। লোকগুলি আগাইয়া যাইতেই বড়বাবু মনোহরপ্রসাদকে বলিলেন, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? উত্তরে তিনি কোনকথা না বলিয়া বড়বাবুকে আগাইয়া চলিতে ইশারা করিলেন।

কিছুদূর যাইতেই দুইটি কালবর্ণের ঘোড়া উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মনোহরপ্রসাদ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মন্তব্য করিলেন, ইহার মধ্যে একটি লইলেও চলে। বড়বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দুইটি ভদ্রবেশধারী অপরিচিত লোক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে চুপ করিয়া গেলেন। তাহারা অযাচিতভাবে মনোহর-প্রসাদের সহিত ঘোড়ার সম্বন্ধে আলাপ শুরু করিয়া দিল। নানা কথার পর পূর্ব্বদৃষ্ট সেই ঘোড়াটিরই কথা আসিয়া পড়িতে অপরিচিত দুইজনেই উহাকে মেলার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিল।

আরও খানিকটা আগাইয়া যাইতে যাইতে বড়বাবু হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মনোহরপ্রসাদকেও থামিতে বলিলেন। উভয়ের বামে একধারে কয়েকজন লোক-মি লয়া তর্ক করিতেছিল। উভয়ে শুনিতে পাইলেন, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট তেজস্বী ঘোড়াটার কথাই হইতেছে। একজন বলিতেছে যে, সে জীবনে কখনও কোন ঘোড়ার ওরূপ চামরের মত সুন্দর ল্যাজ দেখে নাই। ঘোড়াটা তাহার বড়ই পছন্দ হইয়াছে, কিছু টাকা ধার লইতে হইলেও সে উহাকেই কিনিতে চায়।

সকলের মুখে সেই একই ঘোড়ার প্রশংসা শুনিয়া বড়বাবুর মনে হইল, বোধ হয় তাঁহার ভাগ্যে আর উহাকে লাভ করা ঘটিবে না। এখনই অন্য কেহ কিনিয়া লইবে। তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনোহরপ্রসাদের হাত ধরিয়া বলিলেন, আর বৃথা না ঘুরিয়া কাজ শেষ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া দরাদরীর পর নগদ আড়াই শত টাকায় পছন্দসই সুন্দর ঘোড়াটি বড়বাবু ক্রয় করিলেন। ঘোড়াওয়ালা বলিল, তিনি অন্তত দেড়শত টাকা লাভ করিলেন। সারা হিন্দুস্থানে ঘুরিলেও চার শত টাকার কমে কিছুতেই এমন ভাল ঘোড়া মিলিবে না। এরূপ তেজী ঘোড়াকে সহিস একা এতটা পথ সামলাইতে পারিবে না, ঘোড়াওয়ালা নিজে সঙ্গে গিয়া উহাকে বড়বাবুর আস্তাবলে পৌছাইয়া দিয়া আসিবে, সেজন্য সে কিছু বকশিশ পাইবারও আশা রাখে। মনোহরপ্রসাদের সহিত পরামর্শ করিয়া বড়বাবু তাহাতেই রাজি হইলেন।

সহিস এবং ঘোড়াওয়ালার জিম্মায় ঘোড়াকে স্থলপথে রওনা করিয়া দিয়া বড়বাবু ও মনোহরপ্রসাদ নৌকায় আসিয়া উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। রাত্রিশেষেই তাঁহারা শহরের ঘাটে পৌছিবেন, ঘোড়া বাড়িতে পৌছিতে অন্তত বেলা দশটা বাজিবে। রাত্রে কাহারও আর ঘুম হইল না। বড়বাবুর আজ আনন্দের সীমা নাই। মনোহর-প্রসাদও নিজের কৃতিত্বের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাঁহারা যে কিরূপ জিতিয়াছেন তাহারই আলোচনা চলিল। বড়বাবুর মনে হইতেছিল, ঐরূপ তেজস্বী ঘোড়াকে 'ব্রেক্' করিতে হয় ত দশ-পনের দিন সময় লাগিবে। কিন্তু মনোহরপ্রসাদের আশ্বাসবাক্যে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন যে, দুই দিনের মধ্যে সপরিবারে গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে তাঁহার কোন বাধা থাকিবে না।

প্রভাতের পূর্ব্বেই বড়বাবু বাড়িতে আসিয়া পৌছিলেন।

মনোহরপ্রসাদ নিজের আবাসে চলিয়া গেলেন। কথা রহিল, আহারাদি সারিয়া তিনি দশটার মধ্যেই আবার বড়বাবুর বাড়িতে হাজির হইবেন। ঘোড়া পৌছিবার সময় তাঁহার না থাকিলে চলিবে না। বড়বাবু স্থির করিলেন, আজ তিনি বিলম্বেই অফিস যাইবেন।

গৃহিণীও সমস্ত রাত্রি না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছেন। বড়বাবু পৌছাইতেই তিনি ছুটিয়া আসিলেন। অশ্বগর্ব্বে গর্ব্বিত স্বামীর মুখে মৃদু হাসি দেখিয়াই বুদ্ধিমতী নারী বুঝিলেন যে, তাঁহাদের বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। অশ্বরাজ অচিরেই উপস্থিত হইয়া বড়বাবুর আস্তাবল আলোকিত করিবে। তিনি কোন কথা না বলিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া তাহাকে একরূপ টানিতে টানিতেই আস্তাবলে আনিয়া হাজির করিলেন। বড়বাবু ত অবাক। সমস্ত আস্তাবল জুড়িয়া বিচিত্র আল্পনা, আর ধপধুনার সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। অভ্যর্থনার আশাতীত ব্যবস্থাই গৃহিণী করিয়া রাখিয়াছেন।

দশটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও ঘোড়া আসিয়া পৌছায় নাই। বড়বাবু সদরের বারান্দায় আরামকেদারায় বসিয়া একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া আছেন, গৃহিণী এক একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন। মনোহরপ্রসাদের আসিতে প্রায় এগারটা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ঐরূপ তেজী ঘোড়াকে বাগ মানাইয়া এতটা পথ লইয়া আসা সহজ ব্যাপার নয়, দুইজনে নিশ্চয়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসিয়া পৌছিবে।

বারোটাও বাজিয়া গেল, বড়বাবু দুইজন চাকরকে আগাইয়া দেখিবার জন্য আদেশ দিয়া আহারাদি সারিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। মনোহরপ্রসাদ বসিয়া বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। তেজী ঘোড়া হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করে নাই ত! বড়বাবুও আহারে বসিয়া ঐ একই কথা ভাবিতে লাগিলেন।

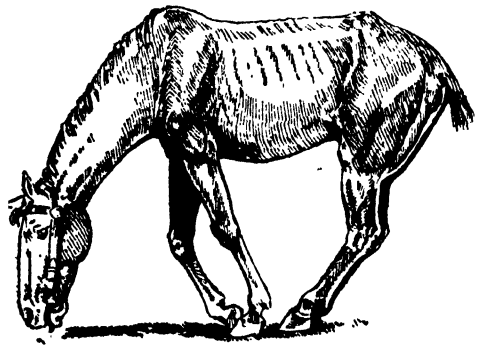
ক্রমে ক্রমে একটা, দুইটা এবং তিনটাও বাজিয়া গেল। যাহাদের আগাইয়া দেখিতে পাঠান হইয়াছে, তাহাদের পর্য্যন্ত কোন খবর নাই। বড়বাবুর পক্ষে আর ধৈর্য্য ধারণ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি অস্থির-ভাবে সদর ফটকের সম্মুখে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন পরিচিত একাওয়ালা বড়বাবুকে সেলাম জানাইয়া খবর দিয়া গেল যে, তাঁহার ভৃত্যেরা নূতন ঘোড়া লইয়া শহরের প্রায় সীমানায় আসিয়া পৌছিয়াছে, আর অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই বাড়িতে হাজির হইবে। বড়বাবু একরূপ ছুটিয়া গিয়াই এই আনন্দ সংবাদটী গৃহিণীকে জানাইয়া আসিলেন। এতক্ষণে চিন্তা দূর হইয়া সকলের মুখেই হাসি দেখা দিল। বড়বাবুর আজ আর আদৌ আপিস যাওয়া হইল না।

সহিস ও দুইজন চাকরে মিলিয়া কোনরূপে টানিতে টানিতে ঘোড়াকে লইয়া যখন বাড়িতে হাজির হইল, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া বড়বাবু ও মনোহরপ্রসাদ উভয়েই একবারে অবাক হইয়া গেলেন। এ কি সেই ঘোড়া? যে উর্দ্ধগ্রীব ও উর্দ্ধপুচ্ছ অতি তেজস্বী সুন্দর ঘোড়ার প্রশংসায় গতকাল মেলাশুদ্ধ লোকে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার এ কি পরিণতি! ঘাড় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বের চঞ্চলতার লেশমাত্র নাই, নিজের দেহভার বহিতেও অক্ষম বলিয়া মনে হইতেছে, ঘাম ঝরার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের সুন্দর বাদামী বর্ণও কতকটা ফিকা হইয়া আসিতেছে। চামরের মত সুন্দর ল্যাজটী দেখা না গেলে নিশ্চয়ই মনে হইত, এ সে ঘোড়া নয়!

চাকরেরা জানাইল, তাহারা তিন ক্রোশ পথ আগাইয়া গিয়া তবে সহিসের দেখা পাইয়াছে, তাহার পর এতটা পথ অতিকষ্টে ঘোড়াকে টানিয়া আনিতে হইয়াছে, সেই কারণেই পৌছিতে এত বিলম্ব। সহিস ত একরূপ কাঁদিয়াই ফেলিল। বলিল, সমস্ত রাত পথে তাহার যে কষ্ট গিয়াছে, তাহা কেহ ধারণা করিতেও পারিবে না। ঘোড়াওয়ালা সঙ্গে আসিবে বলিয়াছিল। কিন্তু মেলা হইতে বাহির হইবার মুখেই কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আর দেখা পাওয়া গেল না। ঘোড়াটা তখনও বিশেষ চন্মন্ করিতেছিল, কিন্তু কিছু দানা ও এক বালতি জল পান করাইয়া লইতেই একেবারে নেতাইয়া পড়িল। তাহার পর সে একাই টানিতে টানিতে আনিয়াছে।

এক মুহূর্তেই মনোহরপ্রসাদের নিকট সমস্ত ব্যাপারটা সরল হইয়া গেল। জুয়াচোর ঘোড়াওয়ালা তাহাদের কিরূপ ঠকাইয়াছে। ঘোড়ার যে চঞ্চলতা তাঁহারা মেলায় দেখিয়া-ছিলেন, উহা তাহার প্রকৃতিগত গুণ নয়, তীব্র [illegible] অগ্রপশ্চাৎ প্রয়োগের কারণেই তাহাকে সাময়িকভাবে

অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। গ্রীবা উচ্চ করা এবং পুচ্ছ উত্তোলনের কারণ উহাই। অধিকন্তু বাদামী রং মাখাইয়া গায়ের বর্ণও মনোরম করা হইয়াছিল, তাহা এখন ঘামের সহিত ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনোহরপ্রসাদ কিন্তু এসব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তিনি বড়বাবুকে আশ্বাস দিলেন যে, একটানা এতটা পথ আসাতেই ঘোড়াটা একটু বেশী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত ডলাই মলাই এবং দানাপানি গ্রহণের পর একটা রাত্রি সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাইলেই আবার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। বড়বাবু



বড়বাবুর ঘোড়া

তাঁহার এ সকল কথার উত্তরে কোন কিছু না বলিয়া ঘোড়াকে আস্তাবলে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

ঘোড়া আস্তাবলে বাঁধা হইলে গৃহিণী একটী ছোট চুপড়িতে করিয়া সযত্নে রক্ষিত কতকগুলি তরকারির খোসা লইয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলেমেয়েরাও হাতে দুটী দুটী ঘাস লইয়া হাজির, ঘোড়াকে খাওয়াইতে হইবে। গৃহিণী ঘোড়ার মুখের কাছে দক্ষিণ দিকে খোসাগুলি রাখিয়া দিলেন, কিন্তু সেগুলি খাইবার উহার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। মালির সহিত ছেলেমেয়েরা বামদিকে গিয়া হাত বাড়াইতেই, ঘোড়া অধিক আগ্রহের সহিত তাহা খাইবার জন্য হাঁ করিল। ইহাতে মালির কিরূপ সন্দেহ হইল। সে কর্ত্রীকে সরিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি দক্ষিণ দিকে গিয়া ভাল করিয়া ঘোড়ার চক্ষুটী নিরীক্ষণ করিল। তাহার পরই বলিয়া উঠিল, ঘোড়াটার একচোখ কাণা। গৃহিণীও বুঝিতে পারিলেন যে, এই কারণেই তাঁহার প্রদত্ত খোসাগুলির উপর উহার আদৌ দৃষ্টি পড়ে নাই। তিনি কোন কথা না বলিয়াই ক্ষুণ্ণমনে আস্তাবল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বড়বাবু ও মনোহরপ্রসাদ দুইজনে বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া চুপচাপ বসিয়াছিলেন। সপ্তমবর্ষীয় বড় খোকা সেখানে গিয়া 'ঘোড়াট' কাণা' এই কথা বলিতেই পিতার নিকট হইতে এক অপ্রত্যাশিত ধমক খাইল। মনোহরপ্রসাদ একেবার মুখ তুলিয়া বড়বাবুর দিকে চাহিলেন, কোন কথা হইল না।

এদিকে, ঘোড়াকে দানাপানি দিবার পর ডলাই মলাই শুরু হইয়া গিয়াছে। সহিস সাধ্যমত নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে কোন ত্রুটি করিল না। কিন্তু সর্ব্বশেষে প্রথামত যখন সে ল্যাজের গোছা ধরিয়া টান মারিয়াছে তখন এক অসম্ভব দুর্ঘটনা ঘটিল। চামরের মত নকল ল্যাজ খসিয়া গেল এবং তাহা হাতে করিয়া সহিস সশব্দে মেঝেয় চিৎপাত হইয়া পড়িল।

শরীরে বেদনা লইয়া ও ল্যাজের চামর হাতে ধরিয়া সহিস যখন ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে বৈঠকখানায় বড়বাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি একবার তাহার দিকে এবং মনোহরপ্রসাদের দিকে চাহিয়াই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

মনোহরপ্রসাদ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, জীবনে এই দ্বিতীয়বার তাঁহাকে ঠকিতে হইল।

ভিতরে তখন গৃহিণী ক্রন্দন শুরু করিয়া দিয়াছেন।



তিরুপতি প্রাচ্য-বিদ্যা-সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

তিরুপতিতে দশম বার্ষিক নিখিল-ভারতীয় প্রাচ্য-বিদ্যা-সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য ১৮ই মার্চ সোমবার হাওড়া ষ্টেশনে মাদ্রাজ মেল ধরিতে যখন আমরা কয়েক জন উপস্থিত হই—তখনই প্রকৃত অভিসন্ধি ছিল প্রসিদ্ধ মন্দির ও তীর্থের অধিষ্ঠান দাক্ষিণাত্যের কতকটা দেখিয়া আসিব। অথচ হাতে মাত্র ছুটির বার দিন। আশার কুহকে পড়িয়া যাত্রা ক্ষণে সম্ভাব্যতা কত সঙ্কীর্ণ তাহা তেমন মনে হয় নাই—কিন্তু ৩১শে মার্চ যখন কলিকাতায় ফিরিলাম তখন কল্পনার কতখানি যে অপূর্ণ রহিয়া গেল—তাহাই বারংবার বোধ হইতে লাগিল। হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবের কথা ভাবিলে মনে হয় বুঝি বা দাক্ষিণাত্যেরই হিন্দুস্থান নাম যোগ্য। সে গৌরবের নিদর্শনগুলি যদি নিঃশেষে দেখিতে হয় তাহা হইলে দুই মাসও পর্যাপ্ত নহে। বার দিনের আয়ুতে আর কত হইবে?

পিতৃদেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতেছেন—সঙ্গে জননীও আছেন। একারণ দুই খানি ভৃত্যের টিকিট সংগ্রহ হইল এবং ভৃত্যকে স্থানান্তরিত করিয়া শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী ও আমি দুইখানি ভৃত্যের কামরা সগৌরবে দখল করিলাম—দীর্ঘ পথ, একাদিক্রমে দেড় দিন গাড়ীতে কাটাইতে হইবে। সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর যাত্রীর পরিচারকের জন্য রেল কোম্পানীর দরদের সুযোগ লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা গেল। এ সুযোগে সুযোগ্য সঙ্গী ও অংশীদারও মিলিল। অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ মিত্র। চিল্কার তীরে বালুগাঁ পর্যন্ত আমার পূর্বেই পরিচিত। ভুবনেশ্বরে একাধিকবার গ্রীষ্ম যাপন করিয়াছি। সেই জন্য পরদিন বেশ আঁধার থাকিতে যখন প্রভাত কাকলিতে জাগিয়া উঠিলাম—মনে হইল ভুবনেশ্বরের পরিচিত বিহঙ্গ-কূজন ও বায়ুর সুখস্পর্শের মাঝে পৌছিয়াছি। গাড়ী থামিতেই দেখিলাম খুরদা রোড।

তখনও বেশ অন্ধকার রহিয়াছে। বালুগাঁয় যখন গাড়ী থামিল তখন ভোর সাড়ে চারিটা। ঊষার আলোয় পূর্ব-দিঙ্মুখ উদ্ভাসিত, পূর্বঘাট গিরিমালা দক্ষিণে ও চিল্কা হ্রদ বামে, চিল্কার জল বিস্তার ক্রমশ চোখের সামনে প্রসারিত হইয়া পড়িল। রম্ভা হইতে হ্রদের দৃশ্য চমৎকার। ছোট পাহাড়ের ধার দিয়া রেল লাইন—রেল লাইন পাহাড় কাটিয়া উচ্চ বাঁধের উপর পাতা—তাহার তলে পাহাড়ের একেবারে পাদদেশ পর্যন্ত জলবিস্তার আসিয়া ঠেকিয়াছে। ক্রমশ সূর্য উপরে উঠিতে লাগিল—দীর্ঘ-পথযাত্রী বাষ্পীয় যানও অবিশ্রান্ত দ্রুত গতিতে এক এক করিয়া পূর্বতীরবর্তী প্রসিদ্ধ নগর ও জনপদ অতিক্রম করিতে লাগিল। গঞ্জাম ও তাহার পর সমুদ্রতটবর্তী স্বাস্থ্যনিবাস গোপালপুরের পথে জংসন বহরমপুর ছাড়িয়া নৌপাদার নিকটবর্তী হইতে লাগিল। শ্যামল শস্যক্ষেত্র, খেজুর ও নারিকেল গাছ। রেলপথের তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী, কয়েকখানি মাত্র কুঁড়েঘরের সমষ্টি—এরূপ ক্ষুদ্র গ্রামের পর গ্রাম—এ দৃশ্য যোজনের পর যোজন ধরিয়া পর পর চোখের সামনে উন্মোচিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে পুরীর মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ-প্রায় দেউল অবস্থিত। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্নানের প্রয়োজন বোধ হইল। পলাস ষ্টেশনে ট্রেন পাঁচ মিনিট থামে—সেই অবসরে সংক্ষেপে স্নান সম্পন্ন করিয়া লইলাম। দুইখানি কামরা আমাদের অধিকারে—সুতরাং স্বচ্ছন্দ্যে সকল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা গেল। কদলী, ডাব, দুগ্ধ অনেক ষ্টেশনেই মিলে। দ্বিপ্রহর প্রায় অতীত হইতে চলিল। আমরাও বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের সীমা ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম। ওয়ালটেয়ারে মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলের আরম্ভ। কিন্তু গাড়ী বদল করিতে হয় না—রেলপথ সমান-প্রস্থ বলিয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত একই গাড়ী চলে। শস্য-শ্যামল গিরিরাজির পাশ দিয়া ত্বরিত গতিতে গৃহোন্মুখ পান্থের মত ট্রেন ওয়ালটেয়ার অভিমুখে চলিতেছে—দূরে ভাইজাগাপত্তম বন্দর। কয়েকখানি সমুদ্রগামী জাহাজের উপরিভাগ দেখা যায়—পাহাড়ের ধারেই সমুদ্রের এক অংশ আসিয়া মিলিয়াছে। রৌদ্রের ঝাঁঝে

সমস্ত ভূভাগ খাঁ খাঁ করিতেছে। ওয়ালটেয়ারে যখন আমরা পৌঁছাইলাম তখন প্রায় দেড়টা বাজিয়াছে। এখানে প্রায় আধ ঘণ্টা অবস্থিতি। ট্রেন হইতে নামিয়া তাহারই ছায়ায় কি কি জিনিষ বিক্রয় হয় দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম—উত্তপ্ত বালু-কঙ্কর-পাথরের দেশ হইলেও অধিবাসিগণ পুষ্পপ্রেমিক। ষ্টেশনে নানা রকম ফুলের ও সুগন্ধি পাতার গুচ্ছ বিক্রয় হইতেছে। কলার খোলায় মোড়া বিশ-পঁচিশটি ফুটন্ত গোলাপের প্যাকেট—মূল্য এক আনা। কলিকাতায় দুর্লভ। লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ষ্টেশনে পায়চারি করিবার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও তথাকার সংস্কৃত বিভাগের প্রধানাধ্যাপক ও ওরিএন্টাল সম্মেলনীর অন্যতর সম্পাদক ডক্টর সুশীলকুমার দে মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। সম্মেলনের স্থায়ী পরিচালক সমিতিতে বর্ত্তমানে ইঁহারা দুইজনেই বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

সন্ধ্যার সময় রাজমহেন্দ্রী অতিক্রম করিলাম—গোদাবরীর সুদীর্ঘ সেতু পার হইলাম। গোদাবরী হিন্দু ভারতের ঐক্যের স্মারক সপ্ত পুণ্য-সরিতের অন্যতম। আক্ষেপ রহিয়া গেল—ইহার পুণ্যতোয়ে স্নান করিতে পারিলাম না। রাত্রি এগারটার সময় বেজোয়াদার নিকট কৃষ্ণা নদীর পুলও উত্তীর্ণ হওয়া গেল। ট্রেন যতই অন্ধ্র দেশ পিছনে ফেলিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল—ততই যাত্রীর উঠা-নামা ও গাড়ীতে ভিড় বাড়িতে লাগিল। যে ভৃত্যের কামরার স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া আমরা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম—তাহাও আর উপভোগ করা সম্ভব হইল না। তথাপি নষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের ভগ্নাংশের বলে কোন মতে শয়ান অবস্থাতেই রাত্রি যাপন করা গেল।

পরদিন ২০শে বুধবার রাত্রি শেষ প্রায় পাঁচটার সময় গুড়ুর জংশনে দীর্ঘ দেড় দিনের যাত্রার বাহনটীকে ত্যাগ করিতে হইল। দু' ঘণ্টা বিশ্রামের পর তিরুপতি-যাত্রী ট্রেন মিলিবে। সুতরাং প্রত্যুষে 'দায়ে পড়ে রায় মশায়ে'র নীতি অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতেই যথাকালে প্রাতঃকৃত্য-সকল সম্পন্ন করা গেল। প্রায় সাতটার সময় ছোট লাইনের ট্রেন ছাড়িল। এখানে আরও কয়েকজন সম্মেলনের বাঙ্গালী প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার, অধ্যাপক হেমচন্দ্র আচার্য আমাদের সহযাত্রী হইলেন।

গুড়ুর হইতে তিরুপতি আটাত্তর মাইল—কিন্তু এই পথ অতিক্রম করিতে প্রায় সাড়ে চারি ঘণ্টা লাগিল। এ অঞ্চলটী পার্বত্য—বেশ দেখিতে পাওয়া গেল প্রশস্ত উপত্যকার ভিতর প্রবেশ করিতেছি। চতুর্দ্দিকে উচ্চ অনুচ্চ গিরিমালার বেষ্টনী। দূর হইতে পর্বতগাত্রে কোথাও দুর্গ, কোথাও প্রাসাদ, কোথাও মন্দিরের মত বোধ হইতে লাগিল। রুক্ষ দেশ—বৃক্ষলতা বিরল। প্রায় চল্লিশ মাইল অতিক্রম করিয়া কালহস্তী, দক্ষিণের অন্যতম প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থ। এখানে মহাদেবের বায়ুমূর্ত্তি। তিরুপতি হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্যাহ্ন সাড়ে এগারটায় গন্তব্য স্থান তিরুপতিতে পৌঁছাইলাম। ষ্টেশনে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং অধুনা শ্রীবেঙ্কটেশ-প্রাচ্য-বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত চিন্ন স্বামী শাস্ত্রী স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সমেত অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি যাঁহারা ঐ ট্রেনে ছিলেন—মাল্যাদি দ্বারা সমাদর-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং প্রতিনিধিগণকে নূতন চৌলট্রি বা ধর্ম্মশালায় পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের বাসস্থান উহারই সন্নিকটে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

তিরুপতি দক্ষিণ ভারতের প্রধান তীর্থস্থান। তিরুমালাই বা শ্রীশৈলের পাদতলে অবস্থিত। শহরটি ক্ষুদ্র হইলেও মাদ্রাজের বহু শহরের মত বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। ধূলা ও উত্তাপে উত্তর ভারতের শহরেরই অনুরূপ। ক্ষুদ্র শহর—তবে পরিচ্ছন্ন। সমতলে গোপুরম্ সমন্বিত গোবিন্দ-রাজজীর মন্দির। গোপুরম্ মন্দিরের প্রবেশ-পথের উপর উত্তুঙ্গ তোরণ—বহুতল বিমান। সাত-আট তলা গোপুরম্ সাধারণত দৃষ্ট হয়। তিরুপতির গৌরব পর্বতোপরি সাত মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত শ্রীবেঙ্কটেশের মন্দির—শ্রীরামানুজাচার্যের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। আমরা বুধবারে উপস্থিত হই—পরদিন সম্মেলনের কার্য্যারম্ভ সুতরাং ঐ দিন অপরাহ্নেই শ্রীবেঙ্কটেশ মন্দিরের পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সাত মাইল পর্বতের উপর চড়াই উতরাই। একারণ তিনখানি ডুলির ব্যবস্থা করা গেল। ডবল ডুলির যাতায়াতের ভাড়া সাড়ে ছয় টাকা, সাধারণ একক ডুলির ভাড়া সোয়া তিন টাকা—আমার জন্য একখানি মধ্যম শ্রেণীর ডুলি করিতে হইল। ইহা ঝুলান ছোট খাটিয়া নহে—দুটি বাঁশের উপর বাঁধা—

চারি জন বাহক স্কন্ধের উপর করিয়া বহন করে। অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে পাঁচটায় পর্বতের পদতলে যাত্রারম্ভ—রাত্রি নয়টার পর মন্দিরে পৌছান গেল। প্রথম খাড়া উঠিতে হয়—পরে পথটী কোথাও কিছুদূর পর্যন্ত উঠিয়াছে—আবার নামিয়াছে। স্থানে স্থানে সিঁড়ির মত ধাপ করা আছে। পিতৃদেব, জননী ও আমি ডুলি আশ্রয় করিলাম। শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ, শ্রীমান্ জানকীবল্লভ ও শ্রীমান্ ভবতোষ পদব্রজে চলিলেন। দুর্গম তীর্থ হইলেও যাত্রীর সমাগমে এখনও জীবন্ত ও জাগ্রত বলিয়া মনে হইল। পথের ধারে বরাবর বৈদ্যুতিক আলোকের স্তম্ভ—সংখ্যায় প্রায় ২৩০। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণের কফির দোকান ও অন্যান্য ঐ-দেশী যাত্রীর প্রয়োজনীয় আহার্য ও পানীয়ের দোকান। পরদেশীর পক্ষে তেমন লোভনীয় মনে হইল না। মাঝে মাঝে তোরণ। পথিপার্শ্বে কলের জলেরও ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে ডুলি যখন আছে—মাঝে মাঝে উহা ছাড়িয়া পথ হাঁটিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সঙ্গিগণ অক্লান্ত উৎসাহে হাঁটিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম—এই চিন্তায় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল—অথচ দীর্ঘ পথের ক্লেশও স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইল না। আলোকমালা সর্পের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়টী জড়াইয়া রহিয়াছে। সমতলস্থ শহর হইতে দেখিতে চমৎকার। পর্বত-গাত্রে জুতা পরিয়া ওঠা নিষিদ্ধ। তবে শুনিলাম ম্যাজিস্ট্রেট্ বা তৎসম পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। তিরুমালাই পর্বত অনন্ত বা শেষ সর্পের দেহ-স্বরূপ—তাহাতেই বেঙ্কটনাথের অধিষ্ঠান—এ কারণ ইহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য এরূপ বিধান। এই অদ্রিমালার প্রধান ছয়টী চূড়ার নাম—শেষ, গরুড়, বেঙ্কট, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও বৃষপর্বত। বেঙ্কট পদের অর্থ লইয়া নানা মত। কেহ বলেন জঙ্গল কাটিয়া তীর্থ স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এই নাম। আবার কেহ বলিলেন বেঙ্কট অর্থে পাপনাশন। আর একটি অর্থে ইহা মোক্ষ ও ঐশ্বর্যের সমন্বয়। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় মন্দির সন্নিকটে উপনীত হইলাম—সুপারিশপত্র সঙ্গে থাকায় ধর্মশালার রক্ষক বিশেষ যত্ন সহকারে আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিলেন। দুগ্ধ ও প্রসাদী মিষ্টান্নও মিলিল। রাত্রি অধিক হইলেও বিশেষ ব্যবস্থায় দর্শন হইতে পারিত—কিন্তু সঙ্গীদের বিলম্ব হওয়াতে এবং পথশ্রমের জন্য তখন দেবদর্শনে আমরা বিরত হইলাম।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া দেবদর্শনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ধর্মশালার পার্শ্বেই জলাশয়। এখানে শ্রীমন্দিরের এত নিকটে শৌচাদিরও ব্যবস্থা রহিয়াছে—অথচ জুতা পরিয়া পর্বতে আরোহণ নিষিদ্ধ—ইহা একটু অসঙ্গত বোধ হইল। সূর্যোদয় হইতেই মন্দিরের সন্নিকটে স্বামী তীর্থে স্নানার্থ জননীকে লইয়া উপনীত হইলাম। এমন সুপ্রশস্ত কুণ্ড বা চারিদিকে পাথর বাঁধান তড়াগ—গিরিশিরে যথার্থই বিস্ময়কর। স্নানের সংকল্প করাইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ জুটিলেন। সঙ্কল্প বাক্যটী অতি দীর্ঘ এবং বিন্ধ্যাদ্রির উত্তরে যেরূপ সঙ্কল্প বাক্য প্রচলিত তাহা হইতে অনেক বিভিন্ন। মর্ম এইরূপ—শ্রীশৈল তীর্থে—সর্বতীর্থের সম্মেলনে—বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ জন্মে—জাগ্রৎ, সুষুপ্তি অবস্থায় কায়-মনোবাক্যে যে সকল দুরিত যথা ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি যাহা কিছু পাপ করিয়াছি বা করিতে পারি তাহার ক্ষালনার্থ অমুক বৎসরে, পক্ষে, দিনে, তিথিতে স্নান করিতেছি। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখের সমাবেশ একটী দ্রাবিড়ী-ভঙ্গী—দাক্ষিণাত্যের অন্য স্থলেও দেখিয়াছি।

শ্রীমন্দিরে গিয়া শুনিলাম পুরোহিতের স্বজনের মধ্যে সদ্যঃ কাহার মৃত্যু হইয়াছে—একারণ সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না। প্রাঙ্গণের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এদিকে বেলা বাড়িতে লাগিল। প্রত্যুষে শহর হইতে পদব্রজে অনেক বিশিষ্ট দূর-দেশাগত যাত্রী সমবেত হইতে লাগিলেন। দশ-পনর মিনিট করিয়া বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। তখন পুরোহিত আসিলেন। আশা হইল দর্শনলাভ ঘটিবে। রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে প্রথমে পুরোহিতগণ স্তোত্র পাঠ করিলেন—সুললিত সংস্কৃতে রচিত—বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত—শুনিলে অন্তর প্রসন্ন হয়। তারপর কাংস্য-ঘণ্টা—পটহের বিচিত্রধ্বনির মাঝে সকল কর্মচারীর সমক্ষে নানাবিধ তালা ও শিকল পর পর খোলা হইল। তারপর মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে দেবতার সম্পত্তি সদ্যঃপ্রাপ্ত টাকা-কড়ি হুণ্ডির বালিশ নাটমন্দিরের সিন্দুকে জমা হইল। অনন্তর আরতির পর নানা দীপের আলোকে মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর বিগ্রহ দৃষ্টিগোচর হইলেন। উজ্জ্বল স্বর্ণের পাতে মোড়া

শ্রীভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তি। পূজা, ভোগ, আরতির খুব জাঁক—সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের আবহাওয়া এখনও বিদ্যমান। দেবতার বার্ষিক আয় বহু লক্ষ—ভূসম্পত্তি বিস্তৃত। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দর্শন সারিয়া ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম—গিরি-গাত্র রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। দীর্ঘ উচ্চ পার্বত্য অগ্নিস্পর্শ পথ—পদব্রজে প্রায় অগম্য হইয়া উঠিতেছে। প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইতেই প্রায় দশটা বাজিল। ডুলিবাহক ও পাদচারী সঙ্গীদের কষ্টের জন্য উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল।

ডুলিবাহকগণ উত্তাপের তাড়নায় ত্বরিতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল—পাদচারী সঙ্গিগণ পিছনে পড়িয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে তোরণের ছায়ায় বিশ্রাম না করিয়া কেহই অগ্রসর হইতে পারে না—পাদচারিগণের কষ্ট দেখিয়া মন বড়ই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তপ্ত কটাহের মত প্রস্তরময় পথ—পা রাখা দুষ্কর। উপরে তীব্র সূর্যকিরণ। পথিপার্শ্বে কিছু দূর দূর দুই-চারি জন করিয়া ভিক্ষুক বসিয়া আছে—মনে হইল যেন পৃথিবীর যত খঞ্জ, যত অন্ধ, যত কুষ্ঠী, যত অনাথ ও দরিদ্র সেই দীর্ঘ পথের ধারে সারি দিয়া আশ্রয় লইয়াছে। যাত্রী দেখিলেই 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দ' বলিয়া উঠিতেছে এবং 'স্বামিন্' সম্বোধনে ভিক্ষা মাগিতেছে। দাতা ভক্তজন দান করিয়া এস্থলে অন্তরে প্রসাদ লাভ করেন বটে কিন্তু সাধারণ তীর্থযাত্রী ইহাদের সকলকে এক একটী পাই পয়সা দিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। পাদদেশে যখন ফিরিলাম তখন বেলা একটা—সঙ্গিগণ যে কি কষ্ট পাইয়াছেন তাহা ভাবিয়াও আতঙ্কিত হইলাম। যাহা হউক কিছু পরে তাঁহারাও আসিয়া পৌছিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন। ভারত গৌরব পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জীর সভাপতি হইবার কথা ছিল—কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার উপস্থিতি অসম্ভব হয়। তিনি উপস্থিত হইতে না পারিলেও অভিভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে কয়েকটী বিশেষ অবধানযোগ্য কথা ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রমাণস্বরূপ পুঁথি, তাম্রশাসন, ভাস্কর্য ও মুদ্রা প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন যাহা এযাবৎ অক্সফোর্ড বা লণ্ডনেই মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, তাহা ভারত ভারতে প্রত্যর্পিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত পুরাণের মধ্যে আর্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির সংস্কৃতি-ইতিহাসের যে সকল উপাদান বিদ্যমান, তাহা যথাযথ পরীক্ষিত হওয়া উচিত এবং সংস্কৃতোদ্ভব-ভাষা-ভাষিদের মধ্যে এক লিপি হিসাবে দেবনাগরীর বিস্তৃত প্রচলন আবশ্যক। আর্য ভারতের চিরন্তন মনোবৃত্তির অনুকরণে বিভিন্ন সংস্কৃতির অনুশীলক-দিগের মধ্যে পরম সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। মালবীয়জীর অনুপস্থিতিতে সম্মেলনের কার্য-পরিচালনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলর ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসনে নির্বাচিত হন। মালবীয়জীর জন্য উদ্দিষ্ট সভাপতির মাল্য ও প্রতীক বৈদিক বিভাগের সভাপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। সম্মেলনের কার্যাবলীর আরম্ভে স্যর রঙ্গনাথন একটী অভিভাষণ দেন। সম্প্রতি ইনি ভারত সচিবের অন্যতম সহকারী পদে উন্নীত হইয়াছেন। তদনন্তর শ্রীরামলিঙ্গম্ চেট্টিয়ার স্বাগত-ভাষণ পাঠ করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি তিরুপতির প্রাচীন ইতিহাস কথঞ্চিৎ বিবৃত করেন। এখানকার দেবতা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে থেণ্ডোমন নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট আবির্ভূত হন এবং সেই সুদূর অতীতে এখানে প্রথম মন্দির নির্মিত হয়। তিরুপতি কোন রাজার রাজধানীরূপে প্রবল হয় নাই—ভক্ত ও তীর্থযাত্রীর উপহারই ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ১৯৩৩ সালে তিরুপতি তিরুমালই দেবস্থান-গুলির পরিচালনার্থ একটী স্বতন্ত্র বিধি মাদ্রাজ আইন সভায় রচিত হয়। তদনুসারে পূর্বতন কমিশনার বা কার্যাধ্যক্ষ শ্রীরঙ্গনাথ মুদালিয়র, দেবোত্তর-সচিব ডক্টর রাজন ও বর্ত্তমান কার্যাধ্যক্ষ রাও বাহাদুর রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার একযোগে এই স্থানে একটী সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সেই বিদ্যাপীঠের উদ্যোগেই এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান। রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মহোদয় কিছুদিন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি রাজসরকারে বিশেষ প্রভাবশালী এবং তিরুপতি দেবস্থানগুলির প্রভূত আয় যাহাতে জন-হিতকর কার্যে ব্যয়িত হয় তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগী; একারণ তাঁহাকে অনেক প্রকার বাধাবিঘ্ন গ্লানিবিরাগ সহিতে হইয়াছে। এবৎসরের প্রাচ্য বিদ্যানুরাগি-সম্মেলনে চারুকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যশাস্ত্র সহ তেরটি বিভাগ ছিল। তন্মধ্যে বৈদিক বিভাগে পিতৃদেব, ভাষাতত্ত্বে ডক্টর সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় এবং চারুকলা শাখায় অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি হন। বঙ্গদেশ হইতে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ডক্টর উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল, ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীগোপালচন্দ্র রায় চৌধুরী, ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া সম্মেলনে যোগ দেন। সর্বসাকল্যে ২১০টী প্রবন্ধ পঠিত বা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়, তন্মধ্যে বাঙ্গালী বিদ্বদ্বৃন্দের প্রবন্ধ ২৬টী। বৈদিক বিভাগে ও ললিতকলা বিভাগে বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রবন্ধ ছিল না। এবারকার অধিবেশনে সঙ্গীত ও নাট্যের দুইটী নূতন বিভাগ সংযুক্ত হয়। নাট্য বিভাগে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর অভিভাষণ মনোজ্ঞ হইয়াছিল—ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের অভিব্যক্তি-সংযোগে ভারতীয় নাট্যের স্বরূপ বিবৃত করিয়া তিনি দেখান যে, নৃত্যকলা ভারতের জীবনের নানাদিকে বিলাস কলারূপে নহে—স্বতঃস্ফূর্ত্ত অঙ্গরূপে জড়িত ছিল। সম্মেলনের তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে একটী পণ্ডিত-পরিষদের অধিবেশন হয়। ইহার আলোচনা ও অভিভাষণ সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন হয়। ইহাতেও পিতৃদেব সভাপতি ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট পণ্ডিত সকল সমবেত হন। তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় বাক্‌পটুতা দেখিলে দেববাণী যে এ অঞ্চলে এখনও বেশ জীবন্ত তাহা বুঝা হয়। কয়েকজনের বক্তৃতা সাবলীল ভঙ্গী ও অলঙ্কারচ্ছটায় উপভোগ্য হইয়াছিল। ইংরেজী-নবিশ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণ সকল অধিবেশনে যে আগ্রহ বোধ করেন না—ইহা আক্ষেপের বিষয়। বিদ্বৎ-পরিষদে 'সংস্কৃত ভাষা ভারতের সর্বজন ব্যবহার্য ভাষা হইতে পারে কি-না' ইহা একটী আলোচ্য বিষয় ছিল। বাঙ্গলার প্রতিনিধি এত বিরল যে শ্রীমান্ জানকীবল্লভ এবং পরিশেষে এই লেখককেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে হয়।

পুষ্পাঞ্জলি*

শ্রীমানকুমারী বসু

আজকে শুভ জয়ন্তীতে,
দিছি পদে পুষ্পাঞ্জলি,
শক্তি গেলেও ভক্তি আছে,
তাতেই দুটি কথা বলি।
কেই বা জানে কেমন ক'রে,
স্বরগপুরের পথটি ভুলে,
কথন তুমি ধরায় এলে,
শ্যামা কপোতাক্ষী কূলে।
যথায় ভরা স্বভাব শোভা,
ভাদ্রমাসের আকাশ নীল,
গাইছে গীতি পিক পাপিয়া
দোয়েল, শ্যামা শঙ্খ চিল।
নানা গন্ধে নানা বর্ণে,
ফোটে যথা কুসুমরাশি,
বীণাপাণি হাসেন যথা,
ঢেলে দিয়ে দয়ার রাশি।
সেই নদীর বারি পরশ করি,
অমর কবি মধুসূদন,
ঠাকুরদাস ও শিশিরকুমার,
মিলে তাদের সোদর স্বজন।

তুমি এলে জীবন ঢালি,
বিজ্ঞানে ও রসায়নে,
তোমার সে জপ তোমার সে তপ,
অধ্যয়ন আর অধ্যাপনে।
নিত্যই নব উদ্ভাবনে,
শিল্প কলা আচরিতে,
তোমার ধর্ম্ম তোমার কর্ম্ম,
আত্মত্যাগ ও লোকের হিতে।
সবাই বলে ত্যাগী যোগী,
নাই ক তোমার ছেলে মেয়ে,
আমরা জানি সুসন্তানে,
সারা দেশটি আছে ছেয়ে।
বিজ্ঞানে জ্ঞান নাইক মোদের,
পাই নি রসায়নের রস,
চিনি আমরা ও-দেবহৃদয়,
তাই হয়েছি এমন বশ।
শতেক বরষ পরমায়ু,
দয়াল বিধি তোমায় দিন,
এমনি করে পরাণ ভরে,
কাজেই রাখুন চিরদিন।

এস তাপস দেব মুরতি,
দেখি মোরা নয়ন ভরি,
বস ঋষি দেব আসনে
শ্রীচরণে প্রণাম করি।

* আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের জয়ন্তী।

চল্‌তি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

এক স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতির স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে চারি মাস পূর্ব্বে এক অন্ধকার রাত্রিতে যে বর্ব্বর অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল, আজও সে অভিযানের শেষ হয় নাই। নিষ্ঠুর নাৎসী স্বৈরাচার, উদ্দ্‌প্ত দুঃসাহস ও স্বেচ্ছাচারিতায় শুধু যুযুধান দেশ নহে, সমগ্র বিশ্বে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। তথাকথিত গণতন্ত্রের পূজারীদের মুখোস আজ নিষ্ঠুর নাৎসী নখরাঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত, প্রায় সমগ্র ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহার দুঃসহ পদভরে প্রপীড়িত, উত্তাল আট্‌লান্টিকের অপর তীরও আজ উদ্বিগ্ন। একদিকে যেরূপ সমগ্র মধ্য-ইয়োরোপে রণদেবতার তাণ্ডবনৃত্যে ধ্বংস লীলা চলিয়াছে, সুদূর প্রাচ্যেও তেমনই প্রবল ঝটিকা আসন্ন। কর্ণেল নক্সের ভাষায়—সমগ্র সুদূর প্রাচীতে বারুদের এক বিশাল পিপা আসন্ন বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায় উন্মুখ ; সম্ভাবিত বিস্ফোরণের সে প্রচণ্ড শব্দ অসীম আট্‌লান্টিকের পারেও অশ্রুত থাকিবে না।

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ

বিগত ছয় সপ্তাহে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের ভয়াবহ গুরুত্ব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিয়াও আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর এই মহাসমর বর্ত্তমানে এক চরম অবস্থায় আসিয়াছে। রুশদের প্রবল বাধাদান ও মাঝে মাঝে পাল্টা আক্রমণ করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ যে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কৃষ্ণসাগরের তীরে রুশিয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ওডেসায় জার্ম্মানী সাফল্য লাভ করিয়াছে। বেসারেবিয়া হইতে দুইটি বাহিনী, নিকোলায়েভ হইতে একটি এবং বাগ নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসরমান এক জার্ম্মান-বাহিনী ওডেসাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া ওডেসা-রক্ষাকারী রুশসৈন্যগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। কিয়েভও জার্ম্মানীর হস্তগত হইয়াছে। এদিকে রাজধানী মস্কোর দিকে এক বিশাল অভিযান চলিয়াছে। মস্কোর এই অভিযান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জার্ম্মানদের কৌশল ও অগ্রগতি এবং রুশিয়ার আত্মরক্ষা-পদ্ধতি সম্যক উপলব্ধির জন্য মস্কোর ভৌগলিক অবস্থান ও জার্ম্মানীর সৈন্য-পরিচালনাপদ্ধতির কৌশল অবগত হওয়া আবশ্যক। রাজধানী মস্কোর চারিধারে রেল লাইন জালের মতই বিস্তৃত। সবগুলি আসিয়া মস্কোতে মিলিয়াছে। ভেলিকিনিকি ও রাজেভ, মস্কো-ওয়ারশ পথে স্মোলেনস্ক ও ভিয়াজমা, বেসারেবিয়ার দিক হইতে গোমেল, ব্রিয়ানস্ক, কালুগা, দক্ষিণে ওরেল এবং টুলা, পূর্ব্বে রিয়াজান, স্কার্ডলভাস্ক, উত্তর-পশ্চিমে মস্কো লেনিনগ্রাড পথে কালিনিন, —প্রত্যেকটি স্থানই মস্কোর সহিত রেল লাইন দ্বারা সংযুক্ত, ফলে এই সকল স্থানের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ঐ সকল স্থান দখল করিতে পারিলে মস্কোর দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া বিশেষ সহজসাধ্য হয়। আর একটি বিষয় ইহা হইতে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া ওঠে যে, লেনিন্‌গ্রাড্ যেরূপ প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে, মস্কো সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত। মস্কোর চারিধারে উন্মুক্ত প্রান্তর, শহর এবং শিল্পকেন্দ্র চারিধারে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লেনিন্‌গ্রাডের পথে চারিদিকে প্রাকৃতিক বাধা বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত লেনিন্‌গ্রাড রক্ষার জন্য বাল্টিকের নৌবহর বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ, কিন্তু স্থল এবং বিমান বাহিনী ব্যতীত নৌশক্তির সাহায্য লাভের কোন উপায় মস্কোর নাই।

দ্বিতীয় কথা—সৈন্য সমাবেশ। লেনিনগ্রাড্ ও মস্কোর উত্তর-পশ্চিম দিকে মার্শাল ভরোশিলফের সৈন্য, পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণে জেনারেল টিমোশেঙ্কোর (বর্ত্তমানে জেনারেল জুকোভ) বাহিনী এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে মার্শাল বুদেনীর বাহিনী মস্কোকে ঘিরিয়া আছে। এই তিন সৈনাধ্যক্ষের সহিত চরম বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে মার্শাল ফন্ লীব, মার্শাল ফন বোক এবং মার্শাল রুন্‌ড্‌ষ্টেড্ স্বীয় বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্য পরিচালনার গুরুত্বই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মার্শাল ফন বোকের বাহিনী মধ্যভাগে স্মোলেন্স্ক ও ব্রিয়ানস্ক ভেদ করিয়া ভিয়াজমা ও কালুগা অধিকার করিয়াছে। অধিকন্তু বোকের পূর্ব্বপার্শ্ব—ওরেল—অধিকার করিয়া টুলায় পৌঁছিয়াছে এবং পশ্চিম পার্শ্বস্থ বাহিনীর একাংশ রাজেভ দখল করিয়া কালিনিন পর্য্যন্ত অগ্রসর। প্রকৃতপক্ষে, জার্ম্মান সৈন্যের এই অগ্রগমন সাঁড়াসীর আকারে না বলিয়া অক্টোপাশের ন্যায় বলাই বিশেষ যুক্তিযুক্ত। যদিও চারি সপ্তাহ ধরিয়া জার্ম্মান সৈন্যদল বিদ্যুৎগতি আক্রমণ সত্ত্বেও মস্কো অধিকার করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই, তথাপি তাহাদের এই অগ্রসর-কৌশল যে বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ইহা নিঃসন্দেহ। স্থানে স্থানে জার্ম্মান বাহিনী মস্কোর বহির্ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মোঝাইস্ক ত্যাগ করিয়া রুশ সৈন্য পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এখনও মস্কোর পতন সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কালিনিন ঘুরিয়া আরও উত্তর-পশ্চিমে মার্শাল ভরোশিলফের বাহিনীর সহিত মস্কোর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য জার্ম্মান বাহিনীর যে পরিকল্পনা ছিল তাহা কতদূর সফল হইয়াছে এখনও তাহা বুঝা যাইতেছে না। এতদ্ব্যতীত মস্কোর বহির্দ্বারে জার্ম্মান-বাহিনী প্রচণ্ডতম বাধার সম্মুখীন হইবে ইহা সুনিশ্চিত। ১৯৩২ সাল হইতে মার্শাল টুখাচেভ্‌স্কি মস্কোকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ভূনিম্নে দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ভূনিম্নস্থ দুর্গ-সকল মস্কোকে ঘিরিয়া আছে। ইহা কেবল মাত্র ঘাঁটি নয়, এই সকল দুর্গের মধ্যে ট্যাঙ্ক রাখিবার গ্যারেজ পর্য্যন্ত আছে। জার্ম্মান-বাহিনী যেরূপ মস্কোর দ্বারদেশে আসিয়াও প্রবলতম বাধার সম্মুখীন হইবে, যুদ্ধরত রুশ-বাহিনীও এই নূতন সৈন্যদলের সাহায্যে তেমনই শক্তিশালী ও

অধিকতর বাধাপ্রদানে সক্ষম হইবে। অবশ্য মস্কো যে শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে ইহা বলা চলে না। মস্কোর পতন হওয়া কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল সুবিধার জন্য লেনিনগ্রাড, এখনও আত্মরক্ষা করিতেছে ও স্থানে স্থানে জার্মান বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে পর্য্যন্ত বাধ্য করিয়াছে, সেই সকল সুবিধা মস্কোর নাই। তবে মস্কোর পতনকে (যাহা অদূর ভবিষ্যতে হইলেও হইতে পারে) যাঁহারা রুশিয়ার চরম পরাজয় বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের ধারণা যুক্তিসহ নয়। রুশিয়ার রাজধানী মস্কো হইতে ৫৫০ মাইল পূর্ব্বে ভলগা নদীর তীরে অবস্থিত কুজ্‌বিশেভ (পূর্ব্ব নাম সামারা) বন্দরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রুশ-গভর্ণমেণ্ট কুজ্‌বিশেভে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, রুশিয়া ইতিমধ্যেই পরাজিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের চিন্তা অতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই, তাঁহারা কেহ কেহ এই ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—রুশিয়া গেল বলিয়া। কিন্তু এতটা নিরাশ হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। পারির পতন ও মস্কোর পতন বা রাজধানী স্থানান্তর এক নহে—উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। যে সকল দেশ তথাকথিত গণতন্ত্রের শাসনাধীনে মুষ্টিমেয় ধনিকের ইচ্ছায় চালিত হয় সে দেশের রাজধানীই জনসাধারণের প্রাণকেন্দ্র হইয়া ওঠে এবং সেই রাজধানীর পতনেই দেশরক্ষী বেতনভোগী সৈন্যদলের নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রুশিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এতদ্ব্যতীত রাজধানী হস্তচ্যুত হইলেই যে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে—ইতিহাসে তাহার বিপরীত সাক্ষ্য যথেষ্ট আছে। চীনাদের রাজধানী নান্‌কিং বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু এই দীর্ঘ চারি বৎসরেও চীনারা স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া নতজানু হইয়া জাপানের নিকট সন্ধি ভিক্ষা অথবা অধীনতা স্বীকার করে নাই। স্বয়ং জাপানই আজ এই ক্লান্তিকর যুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্য উন্মুখ।

দক্ষিণ রণক্ষেত্রেও জার্মানীর আক্রমণ প্রতিদিন তীব্রতর হইতেছে। ক্রিমিয়ার অভিযান আরম্ভ করিয়া পেরেকফ যোজকে তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। খারকোভ এবং রষ্টোভ জার্মানী অধিকার করিতে না পারিলেও যুদ্ধের ভয়াবহতা সেখানে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কোকে মস্কো রণাঙ্গণ হইতে সরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ রণক্ষেত্রের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে। জার্মানী যেমন যে-কোন মূল্য প্রদান করিয়া মস্কো অধিকারের আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, দক্ষিণ রণক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্যও তাহারা তেমনই বদ্ধপরিকর।

কিন্তু যুদ্ধের এই তৃতীয় বর্ষে এক প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার কালে জার্মানী হঠাৎ একাধিক রণক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া বসিল কেন? আমরা পূর্ব্বে বহুবার "ভারতবর্ষ"-এ বলিয়াছি যে, জার্মানী বর্ত্তমান যুদ্ধে কোথাও একাধিক স্থানে এক সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে নাই, কারণ কাইজার-শাসিত জার্মানী একদিন যে মারাত্মক ভুল করিয়াছিল, হিটলার আজ সেই প্রমাদ হইতে দূরে থাকিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। একটির পর একটি শত্রুকে ঘায়েল করাই তাহার এই যুদ্ধের বিশেষত্ব। যদিও বর্ত্তমানে জার্মানী একাধিক রণক্ষেত্রে একমাত্র রুশিয়ার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, তাহা হইলেও একাধিক রণাঙ্গণ সৃষ্টির প্রয়োজন ও তাহাতে সাফল্য লাভের আশা হিটলার বোধ করিলেন কেন?

জার্মান-বাহিনী যে সময় লেনিনগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর হয়, আমরা সেই সময়েই লক্ষ্য করিয়াছি যে, রুশ সৈন্যদল শত্রুর আক্রমণের বেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া পিছাইয়া গিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী ঘাঁটিতে শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু নূতন সৈন্যদল বিশেষ কোথাও নূতন সমর-সম্ভারসহ আমদানি হয় নাই, দ্বিতীয়ত, মধ্য-রণাঙ্গণে জার্মান-বাহিনীকে ঠেকাইবার জন্য মার্শাল বুদেনীকে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে। সৈন্য-সংখ্যার তুলনায় সমরোপকরণের অভাব বিশেষ বোধ করা গিয়াছে। তদুপরি মঃ মেইস্‌কি ট্যাঙ্ক বিমানাদি সত্বর প্রেরণের জন্য বৃটেনের নিকট যে করুণ আবেদন জানান তাহাতেই যুদ্ধের ও রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ সম্বাদ অনেকটা ধরা পড়িয়া যায়। হিটলার দেখিলেন যে, এই একমাত্র সুযোগ যখন রুশিয়াকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে একই সময়ে আক্রমণ করিলে একটিকে রক্ষা করিতে গিয়া অপরটিকে রুশিয়ার দুর্ব্বল করিয়া ফেলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ইহার পর আছেন সেনাপতি "শীত।" শীতের সময় রুশ যুদ্ধের প্রচণ্ডতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই শীতের পূর্ব্বেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করা জার্মানীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে একদিকে যেমন যুদ্ধরত রুশ সৈনিকদের মধ্যে নৈতিক অবসাদ আসিবে, তেমনই রুশিয়ার রাজধানী ও বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র অধিকার করিয়া জার্মানী নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর লাভ করিবে। মস্কোর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কারখানা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এই দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া মস্কো ও তাহার চারিদিকে যে শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া সরাইয়া ফেলা সম্ভব নয় এবং এই অঞ্চল হস্তচ্যুত হইলে রুশিয়ার যে বিশেষ ক্ষতি হইবে ইহা সুনিশ্চিত। তাহার পর আবার রুশ সৈন্য পশ্চাদপসরণের সময় সেই স্থান অগ্নিদগ্ধ করিয়া সরিয়া যাইতেছে। ইউক্রেনে জার্মানী বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই অঞ্চলকে আবার শস্যশ্যামল করিয়া তুলিতে হইলে যন্ত্রাদি ও পেট্রোলের বিশেষ প্রয়োজন। রষ্টোভের দিকে জার্মানীর অভিযানের কারণও এই। রষ্টোভের পর রাস্ত্রোখানের শ্রমশিল্প অঞ্চল ও মেকপ, গ্রজনি, টিফ্‌লিস্‌, বাকু প্রভৃতি ককেশসের তৈল-অঞ্চলগুলি দখল করাই হিটলারের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদিকে যেরূপ জার্মান-বাহিনী খারকোভ ও রষ্টোভ দিয়া অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য সচেষ্ট, তেমনই ক্রিমিয়া দিয়া আসিয়া আর একটি প্রধান সৈন্যদল কার্চ্চ অতিক্রম করিয়া ক্রশনোডরের পথে মেকপ তথা ককেশাস্‌ অঞ্চলে আসিতে ইচ্ছুক। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য কার্চ্চ অতিক্রমকালে জার্মানী বিমান ও প্যারাস্যুট দুইই ব্যবহার করিতে পারে। ওডেসা রুশিয়ার হস্তচ্যুত হওয়ায় রুশ নৌবহর ও কৃষ্ণসাগরে কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মানী ককেশাস্‌ অঞ্চলে উপস্থিত হইতে

পারিলে এখানেও সে সাঁড়াসীর আকারে সৈন্য সমাবেশে অগ্রসর হইতে পারিবে।

অনেকে আশা করিতেছেন যে, শীতে রুশিয়ার যুদ্ধ "মিয়াইয়া" যাইবে। যুদ্ধের তীব্রতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইবে সত্য, কিন্তু অতিমাত্রায় নিস্তেজ হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। মার্শাল বুচারের নেতৃত্বে রুশিয়ার শৈত্যবাহিনী গঠিত হইয়াছে। তবে যুদ্ধের তীব্রতা যে হ্রাস পাইবে ইহা সুনিশ্চিত। প্রাকৃতিক অবস্থাকে উপেক্ষা করিবার জন্য জার্মান-বাহিনী প্রস্তুত হইলেও দুর্দ্ধর্ষ শীত বর্ব্বর নাৎসী সৈন্যদলকেও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে. ইহা উপলব্ধি করিয়াই হিটলার শীতের পূর্ব্বেই রুশিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসকল দখলে যত্নবান।

জার্মানী-তুরস্ক সম্পর্ক

ইতিপূর্ব্বে জার্মানী কর্ত্তৃক তুরস্ক আক্রমণের আশঙ্কা যখন অনেক সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা তখন সেই আশঙ্কাকে উপেক্ষাই করিয়াছিলাম। আমরা বার বার বলিয়াছি যে, রুশিয়ার যুদ্ধে জার্মানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিবার পূর্ব্বে তুরস্কের আর একটি নূতন রণাঙ্গণ সৃষ্টি করিয়া বসিবে না। আজ যদি মস্কোর পতন হয় তাহা হইলে জার্মানী ককেশাসে যাইবার পূর্ব্বে ক্রিমিয়াকেও সম্পূর্ণ করতলগত করিবে। কারণ, পিছনে শত্রুদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি বিনষ্ট না করিয়া জার্মান-বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইবে, জার্মানীর পূর্ব্বাপর অভিযান যাঁহারা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইহা অবিশ্বাস্য। ওডেসা পূর্ব্বেই অধিকৃত হইয়াছে, সিবাস্তোপোল ও জার্মানী অধিকার করিতে প্রয়াস পাইবে। কৃষ্ণসাগরের উত্তর দিক এই ভাবে হস্তগত করিতে পারিলে কৃষ্ণসাগরকে নাৎসী হ্রদে পরিণত করিবার পরিকল্পনা বিশেষ সফল হইবে। এই কৃষ্ণসাগর লইয়াই তুরস্কের সহিত জার্মানীর সম্বন্ধ অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ উদ্বেগজনক হওয়া বিচিত্র নয়। বৃটিশ-বাহিনী সোভিয়েট-বাহিনীর সহযোগিতায় ইরাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তুরস্কের কিঞ্চিৎ সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্মানীর সহিত তুরস্কের যে বাণিজ্য-সংক্রান্ত আলোচনা চলিতেছিল তাহাতে জার্মানী আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। হিটলার ইহা সহজেই বিস্মৃত হইবেন এরূপ ধারণা পোষণ করার কোন কারণ নাই। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে তুরস্কের সহিত একটা বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য রুশিয়ার সেনাপতি 'শীত' যখন আপনার প্রচণ্ড বিক্রম লইয়া আবির্ভূত হইবে, তখন কৃষ্ণসাগর ও তুরস্ককে লইয়া জার্মানীর অবহিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা বোধ করি না। এই কৃষ্ণ সাগরের তীরই হয় ত আগামী শীতে রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে এবং বৃটিশ ও রুশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে ককেশাসে জার্মান-বাহিনীর প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইতে আমরা দেখিতে পারি। কারণ কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীর অর্থাৎ তুরস্ক দিয়া আর একটি জার্মান অভিযান যদি ককেশাসের দিকে অগ্রসর হয় তাহা হইলে দুর্দ্ধর্ষ জার্মান-বাহিনী সাঁড়াসীর আকারে ককেশাসকে বেষ্টন করিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিবে, পশ্চিম এশিয়ায় বসিয়া বৃটিশ-বাহিনীর পক্ষে তাহা নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে লক্ষ্য করা অসম্ভব।

মধ্যপ্রাচী

পশ্চিম এশিয়া ব্যতীত এই শীতে জার্মানী কি উত্তর আফ্রিকাতে মনোনিবেশ করিবে? রুশিয়ায় নাৎসী সৈন্যের কার্য্যকলাপ যখন শীতে মন্দীভূত হইবে, তখন আফ্রিকার দিকে জার্মানীর অবহিত হওয়া বিশেষ অসম্ভব নয়। শীতের সময় মধ্য ইয়োরোপে যুদ্ধ পরিচালনা দুষ্কর হইলেও আফ্রিকাতে সেই সময় কোন অসুবিধা নাই। এই সময়ে সার অচিন্‌লেক লিবিয়ার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। এতদিনে আফ্রিকাস্থ বৃটিশ-বাহিনী সৈন্য ও নূতন রণসম্ভারে বিশেষ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এ আশা আমরা করিতে পারি। তবে জার্মানী ও ইটালী সম্প্রতি লিবিয়ার দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে এবং আগামী শীতে এই অঞ্চলে আবার রণকামানের গর্জ্জন বিশেষভাবে ভূমধ্যসাগরকে কাঁপাইয়া তুলিতে পারে—মিঃ চার্চ্চিল এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তবে জার্মান সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত মুসোলিনী একা যে এই অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া সাফল্য অর্জনে সক্ষম হইবেন না ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু জার্মানী কি ইটালীকে সাহায্য করিবার জন্য এই অঞ্চলে মনোনিবেশ করিবে? আমাদের মনে হয়, প্রত্যক্ষ সাহায্য অপেক্ষা পরোক্ষ সাহায্যের দিকেই জার্মানীর নজর বেশী। জার্মানী যদি ককেশাস অঞ্চলে অভিযান চালায় এবং কৃষ্ণসাগরের তীরে তুরস্ককে জড়াইয়া এক রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করে তাহা হইলে জেনারেল ওয়াভেলকে যেরূপ সেইদিকে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, আর অচিন্‌লেক্‌কেও তেমনই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। বৃটেনকে ককেসাস ও পশ্চিম এশিয়ার দিকেই অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই সুযোগে মুসোলিনী স্বীয় হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য হয় ত আর একবার সচেষ্ট হইয়া উঠিবেন। বৃটিশকে ককেশাসে ব্যাপৃত রাখায় যেমন তাহা ইটালীর পক্ষে পরোক্ষ সাহায্য হইবে, মুসোলিনীও তেমনই আফ্রিকায় আর এক রণাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়া বৃটিশকে ককেশাসে অখণ্ড সামরিক সাহায্য প্রদানে বাধা দিয়া তাহাকে উত্তর আফ্রিকাতেও অবহিত করিবার প্রয়াস পাইবে।

সুদূর প্রাচী

মধ্য ইয়োরোপের যুদ্ধ তীব্রতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব এশিয়ার রাজনীতিক গগনও মসীকৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসন্ন ঝটিকার আভাস সূচিত করিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে জাপানে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ও সমর সচিব হইয়াছেন জেনারেল টোজো। রেলপথ ও সংযোগ-রক্ষা সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ভাইস্ এ্যাডমিরাল টেরাজিমা। মন্ত্রি-সভার এক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী যে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে চীনের ব্যাপারে একটা সুব্যবস্থা ও পূর্ব্ব-এশিয়ায় একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল প্রতিষ্ঠাই নবগঠিত জাপ-মন্ত্রিসভার নীতি বলিয়া

জানান হইয়াছে। ঘোষণা বাণী পাঠের সময় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোর দিয়াই জানান যে, বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক এবং প্রধান মন্ত্রী ও সমরসচিবের দায়িত্ব তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

জাপ মন্ত্রি-সভার ঘন ঘন বৈঠক, মন্ত্রি-সভার পরিবর্ত্তন, মূল নীতি বিশ্লেষণ ও বার বার সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ আমাদের নিকট অপরিচিত নয়। আমরা পূর্ব্বে বহু বার বলিয়াছি যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধের পরিণতি বিশেষ স্পষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জাপান আস্ফালন ও স্নায়ুযুদ্ধ করিয়া কালহরণ করিতে ইচ্ছুক। রুশিয়ার সহিত জাপানের মন কষাকষি আজ নূতন নয়। অথচ ঘরের পাশে অত বড় শত্রুকে একাকী ঘাঁটাইতে যাওয়ার দুঃসাহস সে রাখে না। এদিকে জার্মানী জাপানকে স্বীয় প্রভাবাধীনে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিলেও মধ্য ইয়োরোপের যুদ্ধের গতি বিশেষ স্পষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত সে কাহাকেও ঘাঁটাইতে ভরসা পায় না। এই জন্যই জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ-বাহিনীর মহড়া দিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে তেত্রিশ ডিভিসন সৈন্য পাঠাইয়া কালক্ষেপের প্রয়াসী। কিন্তু সেনাপতিকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া গঠিত বর্ত্তমান জাপ-মন্ত্রি-সভার সময় প্রাচ্যের অবস্থা সত্যই সঙ্কটজনক। জাপান যে আমেরিকার সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে একটী আলোচনা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে একথা আমরা "ভারতবর্ষ"-এর গত সংখ্যাতেই জানাইয়াছি। কিন্তু এই আলোচনা কোন্ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষই নীরব। তবে এ কথা আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, যুদ্ধে নামিবার পূর্ব্বে আমেরিকার মনোভাব জানিয়া লওয়াই জাপানের উদ্দেশ্য। সুদূর প্রাচ্যে স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে ইচ্ছুক হইলে যে দীর্ঘকাল দূরে দাঁড়াইয়া স্নায়ুযুদ্ধ চালাইয়া চলিবে না, সংঘর্ষে তাহাকে লিপ্ত হইতেই হইবে একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু রুশ-জার্মান যুদ্ধে জার্মানীর সাফল্য বিশেষ পরিস্ফুট হইলে সাইবেরিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে আমেরিকার উদ্দেশ্য ও মনোভাব জানিয়া লওয়া জাপানের বিশেষ প্রয়োজন। আমেরিকাকে বর্ত্তমানে প্রাচ্যের সঙ্ঘর্ষে নির্লিপ্ত রাখাই জাপানের অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। জাপান জানে, একবার যুদ্ধে নামিয়া পড়িলে তাহাকে দীর্ঘ দিনের জন্য লিপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। অথচ সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার মত পেট্রোল তাহার নাই। এ সম্বন্ধেও আমেরিকার সহিত আলোচনা চালান অসম্ভব নয়। ভ্লাডিভষ্টকের পথে রুশিয়ায় মাল প্রেরণের প্রস্তাবে জাপান পূর্ব্ব হইতেই হুমকি দিয়া রাখিয়াছে। এদিকে আটলান্টিকে মার্কিন জাহাজ ডুবাইয়া জার্মানী আমেরিকার মনোযোগ ইয়োরোপের যুদ্ধের দিকেই আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী। এতদবস্থায় উভয় সমুদ্রে একসঙ্গে মনোযোগ প্রদান আমেরিকার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এবং আট্‌লান্টিকের গুরুত্বই অধিক—ইহাই বুঝাইবার জন্য তাহার সহিত অর্থনৈতিক আলোচনা চালাইয়া আমেরিকার জনমতকে প্রাচ্যসংঘর্ষে আমেরিকার লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রবল করিবার চেষ্টা করা জাপানের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। চীনে যে সকল স্থান জাপান অধিকার করিয়াছে সেই সকল প্রদেশে আমেরিকাকে বাণিজ্য করিবার সুবিধা দানের পরিবর্ত্তে জাপান তাহাকে পেট্রোল প্রদানের কথা এবং স্বীয় দক্ষিণাভিমুখী অভিযান বন্ধ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রাচ্যের যুদ্ধে আমেরিকাকে নির্লিপ্ত থাকিবার দাবী জানাইতে পারে। আমেরিকার বণিক ব্যবসায়ীদের কাহারও কাহারও এই টোপ গেলা আশ্চর্য্যের নহে, তবে মার্কিন সরকার যে জাপানের এই চালে ভুলিবেন না এ ভরসা আমাদের আছে। বিশেষ কর্নেল নক্স প্রভৃতির ঘোষণাতে আমেরিকা যে বর্ত্তমান যুদ্ধে বিশেষ দৃঢ় ভাব অবলম্বন করিবে তাহারই কথা ব্যক্ত হয়। গত ২৪শে অক্টোবর নৌবিভাগীয় সময়োপকরণ নির্মাতাদের সমক্ষে কর্নেল নক্স যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা অতিরিক্ত আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিলেও আমরা আনন্দিত যে জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় স্বীয় রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে নাই এবং ফলে এক সঙ্ঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

সম্প্রতি সরকারী সোভিয়েট এজেন্সী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, জাপ-সোভিয়েট সীমান্তে রাস্কিনো গ্রামের নিকটে বেলচায় বারটোভা পর্ব্বতমালায় জাপ-সৈন্য ও রুশ-সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে এক সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ন্যূনাধিক বিশ জন জাপসৈন্য রুশসীমান্ত অতিক্রম করিয়া সীমান্তরক্ষীদের আক্রমণ করে। উভয় পক্ষেই কয়েকজন হতাহত হয়।

সংবাদটি লাভ করা মাত্র অনেকে ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অত সহজে সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্ব্বে বিষয়টি সম্বন্ধে দ্বিতীয় বার চিন্তা করা প্রয়োজন। যুদ্ধ বাধাইতে হইলে ছল করিয়া যে একটা কারণ সন্ধানের প্রয়োজন ইহা স্বীকার্য্য। জাপান যে এই পদ্ধতিতেই যুদ্ধ বাধায় ইহাও চীন-জাপান যুদ্ধ হইতে (গত কয়েক বৎসর ধরিয়া) প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি প্রশ্ন ওঠে, ইহার মধ্যে কোন কূটনৈতিক চাল লুকাইয়া আছে কি-না। সংবাদটি আসিয়াছে সরকারী সোভিয়েট এজেন্সী হইতে; সুদূর প্রাচীর অবস্থা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইহা প্রচার করিয়া আমেরিকাকে অবিলম্বে যুদ্ধে নামাইবার চেষ্টা হইলেও হইতে পারে বটে—কিন্তু তাহা হইলে জাপ-সরকার হইতে ইহার প্রতিবাদ জানান হইত। তাহা হইলে বাকী থাকে জাপান। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য এইরূপ এক সংঘর্ষ বাধান জাপানের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। আমেরিকাকে সে বিশেষ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে তাহার সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইবার অভিপ্রায় অন্তত বর্ত্তমানে জাপানের নাই এবং ইহার দ্বারা আমেরিকা কর্ত্তৃক জাপানের অভীপ্সিত সর্ত্তাবলী পূরণের ব্যবস্থা দ্রুততর ও সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। অধিকন্তু জাপান জানে যে, যদি আমেরিকার সহিত তাহার আলোচনা বিফল হয় তাহা হইলে রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুধু তাহার পক্ষে কঠিন নয়, বিশেষ চিন্তার কারণও বটে। সুতরাং তদপেক্ষা বিপন্ন রুশকে ভয় দেখাইয়া কিছু দাবী করা অধিকতর সহজ। এই এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ইচ্ছা হইতে এই রুশ-জাপান সংঘর্ষের উৎপত্তি কি-না কে জানে। তবে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও বলিতেছি যে, স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা যদি জাপান বর্ত্তমানে কার্য্যকরী হইতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে বিনা যুদ্ধে তাহা জাপানের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহাকে অবিলম্বে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতেই হইবে। অন্যথা ক্লান্তিকর চীন-জাপান যুদ্ধেই তাহার সন্তুষ্ট থাকা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ২৯।১০।৪১

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

তেইশ

পাড়াগাঁয়ে 'জলখাবার' বেলা হয় সকাল দশটার পর। ঘড়ির কাঁটা-ধরা দশটা নয়, আপন-আপন ঘরে প্রত্যেকেই একটি একটি নির্দ্দিষ্ট ছায়াচিহ্নকে অনুসরণ করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের কথা এই, ছায়াচিহ্ন প্রত্যেক ঘরেই প্রায় একই সময় ঘোষণা করে। ঋতুভেদে ছায়া চিহ্নের তারতম্য গুলিও ইহাদের পরিচিত।

একা পদ্ম বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সমস্ত বাড়ীখানি নিকানো তকতক করিতেছে। অসুস্থ পদ্ম ইদানীং বেশী পরিশ্রম করিতে পারিত না, আর বাড়ীঘরের প্রতি যে প্রগাঢ় মমতা বাঙালীর মেয়ের মজ্জাগত—সে মমতাও যেন অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। বৈরাগ্য নয় একটা বিরাগ যেন ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। কিছুদিন হইতেই সে ঘরদুয়ার বড় একটা নিকাইত না। কিন্তু আজ সকাল হইতেই সে ঘরদুয়ার নিকাইয়া ফেলিয়াছে। এমন পরিচ্ছন্নতা এবং পারিপাট্যের সহিত নিকাইয়াছে যে—দেখিলেই পাল-পার্ব্বণের সূচনা মনে পড়িয়া যায়। কাজকর্ম্মগুলি সারিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু মুখে চোখে তাহার পরিস্ফুট বিরক্তি। হঠাৎ বাহিরের দরজাটি ছট্ করিয়া খুলিয়া গেল। ওই মৃদু শব্দটিও স্তব্ধ বাড়ীখানার মধ্যে তাহার কাণে আসিয়া ঢুকিল—সে তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানিয়া কাপড় সম্বৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কই হে মিতেনী! দুর্গার কণ্ঠস্বর।

মুহূর্ত্তে পদ্ম মাথার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া কঠিন বিরক্তিভরেই মৃদুস্বরে বলিল—মর।

দুধের ঘটি হাতে দুর্গা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—বাবু কোথা গেয়েছে হে, এখনও ঘরে তালা লাগানো রইছে!

পদ্মের ইচ্ছা হইতেছিল—কঠোর ঝঙ্কারে একটা কঠিন উত্তর দেয়—আমি কি জানি? আমি কি জানি? কিন্তু কোন মতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—বাবুলোকের খবর কি ক'রে আমরা জানব ভাই? সকাল বেলা থেকেই দেখছি ঘর বন্ধ। এদিক দিয়ে খিল—ওদিকে তালা।

দুর্গা বলিল—তা হ'লে থানা থেকে এখনও ফেরে নাই।

—থানা?—পদ্ম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

—নজরবন্দী কি না, থানাতে বাবুকে হাজরে দিতে হয়। পরক্ষণেই সে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—ঘর-দুয়োর আজ তকতক করছে লাগছে!

পদ্ম ছোট্ট একটি জবাব দিল—হ্যাঁ।

রসিকতা করিয়া স্বৈরিণী মেয়েটা বলিল—ভোজ-ভাত কিছু করবা নাকি হে!

পদ্ম কোন জবাব দিল না; মনে মনে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল মেয়েটার উপর। একা ঘরে যে বিরক্তি তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে সমস্তই এখন পুঞ্জীভূত হইয়া দুর্গার উপরেই উদ্যত হইয়া উঠিল। দুর্গা আবার কি একটা বলিতে গেল—সঙ্গে পদ্মের চোখ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিতেই বাহিরের ঘরের ওপাশে জুতার শব্দ ও যতীনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সুর করিয়া সে যেন কিছু বলিতেছিল। দুর্গা এবং পদ্ম উভয়েই স্তব্ধ হইয়া গেল।

যতীন আপন মনেই আবৃত্তি করিতেছিল—

"—দাও হস্তে তুলি!
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে॥"

—বাবু! বাড়ীর ভিতরের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া দুর্গা ডাকিল।

ঈষৎ বিরক্ত হইয়াই যতীন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—কি দরকার?

দুর্গা কিন্তু এই রূঢ় প্রশ্নের বিরক্তি এবং যতীনের ঘর্মাক্ত আরক্ত মুখের ভ্রুকুটি গায়েই মাখিল না, হাসিয়া স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতেই বলিল—দুয়োরটা খুলে দেন বাবু, ঘরখানা

পরিষ্কার ক'রে দি, নিকিয়ে দি। কি হয়ে আছে দেখেন দেখি!

একবার ঘরখানার দিকে চাহিয়া দেখিয়া যতীন ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিল, নিজে বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসিয়া অসমাপ্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিতে বসিল। এতখানি অযাচিত আত্মীয়তা ও প্রীতি আজ এই মুহূর্ত্তে তাহার নিকট কটু বলিয়া বোধ হইতেছিল। সহসা তাহাকে অতিক্রম করিয়া বারান্দার শেষ সীমার দিকে আগাইয়া গেল একটি নিঃশব্দ শুভ্রবস্ত্রাবৃতা মূর্ত্তি। পরিপূর্ণ একবালতী জল, একটি ঘটি, একখানি গামছা নামাইয়া দিয়া নিঃশব্দেই আবার ঘরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর খস্‌খস্ শব্দ উঠিতেছে। ঝাঁটার শব্দ। শব্দটা থামিয়া গেল, দুর্গার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—চরণ ধুয়ে ফেলেন বাবু!

—চরণ! যতীন এবার হাসিয়া ফেলিল।

—আজ্ঞে, জল দিয়েছে কামার বউ।

—তা' চরণ বলছ কেন?

—আজ্ঞে আপনারা দেবতা, চরণই তো বলতে হয় বাবু।

মৃদু চাপাস্বরে কে বলিল—বল, বকতে হবে না, তেতে পুড়ে এলেন, মুখ হাত ধোন, সরবৎ খান। আচ্ছা 'নিথাউস্তি' ছেলেরে বাবা!

যতীন আর কথা না বাড়াইয়া পা হাত মুখ ধুইয়া ফেলিল; গামছায় জল মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া দেখিল—একটি গ্লাস, গ্লাসের জলে একটুকরা নেবু ভাসিতেছে। তবে কি—?

—সরবৎ। খেয়ে ফেলেন বাবু; শরীর ঠাণ্ডা হবে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া দুর্গা। তাহার পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় কাদার ছিটা লাগিয়াছে; হাতে কনুই পর্য্যন্ত কাদা—মুখেও দুই চারিটা কাদার ছিটা। মেয়েটার মুখে হাসি যেন লাগিয়াই আছে!

সরবৎ গ্লাসটি নিঃশেষে পান করিয়া যতীন সত্যই বিশেষ তৃপ্তি পাইল, বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ দেহের ভিতর বাহিরটা জুড়াইয়া গেল। গভীর তৃপ্তিতে তাহার মুখ দিয়া আপনি বাহির হইয়া আসিল—আঃ!

সেই হাসিমুখে দুর্গা বলিল—ভাল লাগল বাবু?

—খুব ভাল লাগল।

—কামার বউ তো ভেবে আকুল—

—কেন?

—আপনারা কলকাতার লোক, কত ভাল মন্দ খাওয়া মুখ। আমরা কি তেমনি ভাল জানি—না করতে পারি! কামার বউ বলছে—বাবু এখান থেকে যাবে—গিয়ে মায়ের কাছে নিন্দে করবে—বলে যত সব পাড়াগেঁয়ে ভূত, চাষা—

—না—না—না! যতীন প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। না—না—না। তোমাদের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে!

দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উ আপনার মন-রাখা কথা বাবু। কলকাতার মেয়েরা যা' জানে—তাই কি আমরা জানি? আপনার মা—আপনার বউ—; দুর্গা মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

এ হাসি দেখিয়া আবার যতীনের ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—মিথ্যে কথা বলিনি আমি, সত্যিই তোমরা আমায় খুব সেবা-যত্ন করছ। যাও এখন, কাজ সেরে ফেলে বাড়ী যাও।

ফিস ফিস করিয়া পদ্ম বলিল—চান করতে বল দুর্গা। রাঁধা-বাড়া আর হবে কখন?

বেলার দিকে চাহিয়া যতীনও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গায়ের গেঞ্জিটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—আমার কাপড় গামছাটা দাও তো!

অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্ম আসিয়া নিঃশব্দে কাপড়গামছা নামাইয়া দিল।

দুর্গা বলিল—তেল সাবান কোথা আছে বাবু?

—তেল আমি মাখিনে, সাবানেরও দরকার নেই। নাইবার পুকুর কোন দিকে বল দেখি?

—পুকুরে চান করবেন?

হাসিয়া যতীন বলিল—তা ভিন্ন? তোমাদের এখানে তো জলের কল নেই।

—পুকুর যে অনেক দূর! মাটি তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। পুকুরের জলও কাদা-গোলা! আর পুকুরে ডুবে চান করলে জর হবে বাবু!

—জর! ম্যালেরিয়া! যতীন এবার শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ। দেখেন নাই এখানকার লোকের চেহারা

পিলে ? পেটগুলি এক একটি জয়ঢাক ! দুর্গা আবার হাসিতে আরম্ভ করিল।

যতীন চিন্তিত হইয়া পড়িল, এবার দুর্গার হাসি তাহাকে পূর্ব্বের মত কটুভাবে স্পর্শ করিল না, সে প্রশ্ন করিল—লোকে জল খায় কোথায় ?

—ভদ্দর গেরস্ত লোকে ঐ জলই খায় ; তবে আমরা বাবু নদীর জল খাই। বালি খুঁড়ে জল নিয়ে আসি। ভদ্দ ঘরের মেয়েছেলে তো নদীর ঘাট যেতে লারে বাবু।

—আমাকে তুমি রোজ এক কলসী করে নদীর জল এনে দেবে ? আমি মজুরী দেব।

—আমার জল, আমার আনা জল—

—কেন—কি হয়েছে তোমার ?

—আমি যে জাতে বায়েন—মুচী—

—তাতে কিছু যাবে আসবে না। তুমি এনে দিয়ো আমি খাব। জাত আমি মানি না। নোংরা হলে বামুনের হাতেও আমি খাই না। তুমি তো নোংরা নও। যতীন আর কথা বলিতে পারিল না—দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার শ্যামল মুখশ্রী—রৌদ্রঝলমল বসন্তের কচিপাতার মত উজ্জ্বল কোমল হইয়া উঠিয়াছে। যতীন নীরব হইতেই সে ব্যগ্র ব্যাকুল আগ্রহে বলিয়া উঠিল—তবে আপুনি একটুকুন বসেন বাবু, আমি এলাম ব'লে ! যাব-আর আসব ! বলিয়াই সে আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অনিরুদ্ধের বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। যতীন শুনিল—দুর্গা বলিতেছে—ও ভাই মিতেনী, তোমার—ঘড়াটা—

পদ্মের উচ্চকণ্ঠস্বর আজ এতক্ষণে যতীন শুনিতে পাইল—না ! ছুয়োনা—; সে কণ্ঠস্বর তীব্র তীক্ষ্ণ—উগ্র।

—মেজে দোব হে মেজে দোব। পরমুহূর্ত্তেই দুর্গা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল—তাহার কাঁখে ঘড়া—হাতে যতীনেরই একটা বালতী।

যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিল—শোন—শোন ! আজ আর দরকার নেই—

চলিতে চলিতেই মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে দুর্গা বলিল—যাব আর আসব বাবু, এলাম বলে ! কথা বলিতে বলিতেই সে পথের দুপাশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। যতীন মুগ্ধ বিস্ময়ে ওই পথটার দিকেই স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল—ওই অস্পৃশ্যা মেয়েটি সম্বন্ধে আজই থানার জমাদার অনেক কথাই তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছে ; মেয়েটি যে তাহাকে দুধের রোজ দেয়—আসে যায় সে সংবাদ ইহারই মধ্যে থানায় পৌঁছিয়াছে। মেয়েটির বেশভূষা হাসির ধারার সঙ্গে জমাদারের কথা অনেকটা মিলিয়া গিয়াছিল। ঘৃণা লইয়াই সে বাসায় ফিরিয়াছিল। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—এই সেবা এই স্নেহ বা প্রেম বা ভক্তি ইহার মধ্যে একবিন্দু কলুষ নাই—পাপ নাই। সে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে না।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে বাড়ীর ভিতর পদ্মের তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—কি রকম লোককে তুমি ঘরে এনে ঠাঁই দিলে ?

—কেনে, কি হ'ল কি ? কণ্ঠস্বর শুনিয়া যতীন বুঝিল অনিরুদ্ধ ফিরিয়াছে। সে সদরে কংগ্রেস আপিসের খবর জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল।

পদ্ম বলিল—মেলেচ্ছের মতন আচার বিচের নাই—ওই দুগ্‌গার জলে চান করবে সেই জল খাবে !

—সত্যি না কি ?

—আমার ছেলে হ'লে, আমি মুখ দেখতাম না, মলে হাতের আগুন পর্য্যন্ত নিতাম না ! পদ্মের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিয়াছিল।

যতীন সে কথায় কান না দিয়া ডাকিল—অনিরুদ্ধবাবু !

পদ্ম স্তব্ধ হইয়া গেল ; অনিরুদ্ধবাবু—আহ্বানে বিব্রত এবং ব্যস্ত হইয়া বলিল—আজ্ঞে যাই। তার পর ফিস ফিস করিয়া বলিল—তোর কথার ধাঁতা-ফাঁতা নাই। হয় তো শুনতে পেয়েছে।

ফিস-ফিস করিয়াই পদ্ম জবাব দিল—আমি তো কারুর নাম ধরে বলি নাই। আমি বলেছি, আমার ছেলে হ'লে ! তাহার মুখে চোখে এক অদ্ভুত রূপ ফুটিয়া উঠিল, সে অনিরুদ্ধের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

অনিরুদ্ধ উৎসাহের সঙ্গেই বলিল—মামলা একটা দায়ের করে দিলেন। আর বললেন—গাঁয়ে একটি কংগ্রেস কমিটি করতে হবে। বাস—তা হ'লেই আর 'ট্যাঁ-ফোঁ' খাটবে না। কিছু করলেই এখান থেকে রেপোর্ট যাবে, ওখান

থেকে সেই রেপোর্ট নানান জায়গায় চলে যাবে। হাকিম—আদালত—গেজেটের কাগজ—মায় লাট সায়েবের দরবার পর্য্যন্ত।

যতীন একটু হাসিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—সেক্রেটারীবাবু শিগ্‌গির আসবেন। গাছ-কাটার তদন্ত হবে—নিজেই আসবেন সে দিন। সেই দিন মিটিং করে সব ঠিক করে দেবেন।

বাহির হইতে দুর্গা ডাকিল—বাবু!

মুখ ফিরাইয়া যতীন দেখিল—মাথায় বিঁড়ার উপর ঘড়া ও হাতে বালতী লইয়া দাঁড়াইয়া দুর্গা। বৈশাখের দু-পহর বেলার রৌদ্রে সে ঘামিয়া যেন এইমাত্র স্নান করিয়া উঠিয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শ্যামল মুখশ্রী রৌদ্রে হইয়া উঠিয়াছে কালি বর্ণ। সে হাঁপাইতেছে, তবু তাহার মুখে হাসি। জল নামাইয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল—বলিল—একটা পিঁড়ি এনে দি বাবু। বসে চান করবেন।

অনিরুদ্ধ মৃদুস্বরে বলিল—ওরা জাতে মুচী বাবু!

মৃদু হাসিয়া যতীন বলিল—জানি।

—ওর জলে চান করবেন বাবু?

—হ্যাঁ। খেতেও হবে ওই জল।

বাড়ীর ভিতর হইতে দুর্গা ডাকিল—কম্মকার! কম্মকার! তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল ব্যস্ততার আভাষ।—শিগ্‌গিরী এস হে। কামার বউয়ের দাঁতি লেগেছে।

—কি বিপদ! অনিরুদ্ধ ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

'দাঁতি লেগেছে'—শব্দটার অর্থ যতীন বুঝিতে পারিল না।

ভিতরে অনিরুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছিল—পদ্ম! পদ্ম!

দুর্গা একখানি পিঁড়ি আনিয়া পাতিয়া দিয়া বলিল—চান করেন বাবু!

যতীন ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে? দাঁতি লেগেছে—না কি বললে?

দুর্গা লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল—দাঁতি লেগেছে—মানে মুচ্ছা গেয়েছে বাবু। আমরা দাঁতিলাগা বলি।

উৎকণ্ঠিত হইয়া যতীন বলিল—মূর্চ্ছা গিয়েছে! সে কি!

দুর্গা কিন্তু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না, বলিল—ও ওর রোগ আছে বাবু। যখন তখন মুচ্ছা যায়। আপনি চান করুন। বেলা আর নাই। তারপর পিচ কাটিয়া—বলিল—ওই এক ঢঙের মেয়ে!

চব্বিশ

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনিরুদ্ধ সমস্ত গ্রামময় কথাটা জাহির করিয়া বেড়াইল। বলিল—মাজিষ্টর সায়েবের কাছে দরখাস্ত হয়েছে, মামলা দায়ের হয়েছে; একবারে খোদ গান্ধী মহারাজের কাছে রেপোর্ট গিয়েছে। লাট সায়েবের দরবারে তুল-তামাল কাণ্ড হবে, কেনে এমন কাণ্ড হবে!

বুকের উপর দুই হাত ছাঁদ-দিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়া চলার মধ্যে—বে-পরোয়া ভাবের বেশ খানিকটা স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি হয়; অনিরুদ্ধ বুকের উপর হাত ছাঁদিয়া গোটা গ্রামটাই ঘুরিয়া আসিল। হরিশ মণ্ডল, ভরেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ প্রবীণ লোক, ধান-চালের হিসাবে পাকা মাথা, তাহারা কথাটা শুনিয়া ভাল মন্দ কোন কথাই উচ্চারণ করিল না। হরিশ মোড়লের দাওয়াতে বৃদ্ধদের আড্ডা; দাওয়ায় উঠিবার সিঁড়ি একটা তাল' গাছের কাণ্ডের টুকরা, সেই সিঁড়িরূপী কাঠখানার উপর পা রাখিয়া অনিরুদ্ধ সমস্ত কথা ঘোষণার ভঙ্গীতে বর্ণনা করিল। হরিশ তামাক খাইতেছিল, সে হুকা দিল ভরেশকে; ভরেশ কিছুক্ষণ টানিয়া নীরবেই মুকুন্দের হাতে হুঁকাটা হস্তান্তরিত করিল। হরিশ শেষ পর্য্যন্ত শণ পাকানো দড়ি ভর্ত্তি টেঁড়াটা বাহির করিয়া বলিল—ধরতো ভাই মুকুন্দ।

মুকুন্দ এ অঞ্চলে শণের দড়ি পাকাইতে ওস্তাদ লোক, সে দড়ি দেখিয়া বলিল—ভাল কেটেছ। খাসা পাক হয়েছে!

অকস্মাৎ হরেন ঘোষাল পথের বাঁকে আবির্ভাবের মত দেখা দিয়া উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—বন্দেমাতরম্!

সংবাদটা ইতিমধ্যেই ঘোষালের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিগত অসহযোগ আন্দোলনে সে গান্ধীটুপী পরিয়া পিকেটিং করিয়াছিল; সংবাদ পাইবামাত্র সে দেশপ্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া অনিরুদ্ধের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পথের বাঁক ঘুরিয়া অনিরুদ্ধকে দেখিয়াই সে ধ্বনি দিয়া উঠিল—বন্দেমাতরম্! কাছে আসিয়া অনিরুদ্ধকে একরূপ টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল—এখানে কি করছিস, ডাক্তারের ওখানে চল।

ঘোষাল ইহারই মধ্যে মনে মনে কংগ্রেস কমিটি ছকিয়া ফেলিয়াছে, ডাক্তার প্রেসিডেন্ট, সে নিজে সেক্রেটারী, অনিরুদ্ধ এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী।

ভরেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়াও আর পারিল না। হাসিয়া বলিল—ঘোষাল মশায় আবার একবার নাক দিয়ে জমি মাপবেন না কি গো? গত আন্দোলনের সময় হরেন ঘোষাল থানায় নাকে খত দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছিল। কথাটা তাহারই ইঙ্গিত। হরেনের মাথাটা বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রাংশের মত ভরেশের দিকে ফিরিয়া গেল। বুক ফুলাইয়া সে জবাব দিল—কালি সাধনা জান? গুরুকরণ নইলে কালি সাধনা হয় না। সেবার গুরু ছিল না। এবার গুরু এসেছে।

হরিশ মণ্ডলের বাড়ীর পর খান দুয়েক বাড়ীর পরই শ্রীহরির বাড়ী। নূতন বৈঠকখানার দাওয়ায় তক্তাপোষের উপর কম্বল বিছাইয়া শ্রীহরি বসিয়াছিল; দেবনাথ হিসাবের খাতাপত্র লইয়া কাজ করিতেছিল। যে সমস্ত ধান দাদন দেওয়া হইয়াছে তাহারই হিসাব-নিকাশ। শ্রীহরির বাড়ীর সম্মুখের পথে ঘোষাল এবং অনিরুদ্ধ আসিতেই দেবু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—মন্তর নিলে না কি ঘোষাল? কে গুরু হে? ওই ছোকরাবাবু না কি?

হরেন ইংরাজীতে উত্তর দিল—ইয়েস।

দেবু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্রীহরি কিন্তু গম্ভীরস্বরে ডাকিল—ভূপাল!

ভূপাল লোহার চৌকীদার এবং জমিদারের নগ্দী। গমস্তা শ্রীহরির বাড়ীতে সে হাজির থাকে। ভূপাল বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে কল্কেটা মাহিন্দার ছিদামের হাতে দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীহরি বলিল—একবার কঙ্কনা যা। মিশি বাঁড়ুজ্জে বাবুদের চাপরাসী নাদের সেখকে আর তার ছেলে কালু সেখকে সঙ্গে ক'রে আন্‌বি।

ভূপাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে?

নাদের সেখের ছেলে কালু সেখ দুর্দ্দান্ত ভীষণ প্রকৃতির লোক।

শ্রীহরি গম্ভীর ভাবে বলিল—নাদের সেখ আর তার ছেলে কালু-সেখ! বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইয়া ক্রুদ্ধ সাপের মত সে ফুলিয়া উঠিল।

প্রতিবাদ করিয়া দেবু বলিল—না রে ছিরু না। ও-পাপ—

শ্রীহরি দেবুকে কথা বলিতে দিল না—তাহার দিকে বঙ্কিম ভঙ্গিতে এমন ভাবে চাহিল যে দেবু চুপ করিয়া গেল। সে খানিকটা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই ভঙ্গির দৃষ্টি দেবু কল্পনায় বাবুদের চোখে দেখিয়াছে। এ দৃষ্টি শ্রীহরি পাইল কি করিয়া!

মৃদু গম্ভীর স্বরে শ্রীহরি বলিল—শালা ঘোষালের আমি পথের ওপর কান মলিয়ে দোব। আর ওই নজরবন্দী—

শ্রীহরি চুপ করিয়া গেল, কথাটা শেষ করিল না। ক্রুদ্ধ সাপের মতই সে মৃদুমৃদু দুলিতে আরম্ভ করিল।

* * * *

অন্তরে অন্তরে তৃপ্তি লাভ করিলেও—যতীন খানিকটা বিব্রত বোধ না করিয়া পারিল না। হরেন ঘোষাল, জগন্নাথ ডাক্তার, গিরীশ ছুতার সঙ্গে আরও চার পাঁচজন অল্পবয়সী চাষীকে লইয়া সন্ধ্যায় আসিয়া যতীনের দাওয়াতেই জমিয়া বসিল। পাতু পূর্ব্বেই আসিয়াছে, অনিরুদ্ধ তো ছিলই, ভিতরে ভিতরে সে কিছু কিছু উদ্যোগও করিয়াছিল। কিছু পান, সাধারণের জন্ম তামাক, জগন ডাক্তারও হরেনের জন্ম বিড়ির ব্যবস্থা সে রাখিয়াছিল। সকলে আসিয়া উপস্থিত হইতেই অনিরুদ্ধ হাসিয়া বলিল—আপনার চা খানিক নেব বাবু, একটুকুন চা করা যাক, না—কি গো ঘোষাল মশায়!

ঘোষালের উৎসাহের অভাব হইল না।

জগন ডাক্তার কথা আরম্ভ করিল।

—এই দেখ, যারা নামবে আসরে, বুঝে-সুঝে নামো বাপু। শেষকালে যে ঘর ঢুকবে সে হবে না।

ঘোষাল বলিল—সারটেনলি।

—তুমিই আগে ভেবে দেখ ঘোষাল, জগন বলিল—তুমিই আগে ভেবে দেখ। তোমার আবার বণ্ড Bond দেওয়া আছে।

—ছিল। এখন সে Barred by limitation; বলিয়াই সে কথাটা চাপা দিবার জন্ম যতীনকে বলিল—যতীনবাবু, কাজ আরম্ভ ক'রে দিন মশায়। সন্ধ্যের পরই সময় খুব ভাল। আমি পাঁজি দেখেছি।

যতীন স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল।

বাংলার পল্লীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা সে শুনিয়াছিল। ষ্ট্যাটিষ্টিকস এবং নানা বিবরণে বর্ণনা পড়িয়া অনেক কিছুই সে জানিত। কিন্তু এ রূপ সে কল্পনা করিতে পারে নাই। বৎসরের প্রথম এই বৈশাখের শেষেই দলে-দলে মানুষকে অন্ন ঋণের জন্য শ্রীহরির দুয়ারে জমায়েৎ হইতে দেখিয়াছে। এ গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থটির কর্ত্তা সেখানে উপস্থিত ছিল; আরও অন্যগ্রামের অনেকে ছিল। এই গ্রামের মাঠের বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের সবই না কি শ্রীহরির কাছে আবদ্ধ। অপরাহ্নে সে গ্রামটার চারিদিক বেড়াইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে কেবল জীর্ণ শ্রীহীন ঘর; মানুষও পশুগুলি কঙ্কালসার। চারিপাশে কেবল জঙ্গল, বড় বড় বাগানগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। খানায় খন্দকে দুর্গম পল্লীপথ, সেদিনের বৃষ্টিতে সমস্ত পথটাই এখনও কর্দ্দমাক্ত। স্নানের ও পানের জলের পুকুর দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড বড় একটা দীঘি, কিন্তু জল আছে কেবল সামান্য খানিকটা স্থানে, গভীরতা মাত্র হাতখানেক কি হাত দেড়েক। একটা লোক পলুই চাপিয়া মাছ ধরিতেছিল, ভাল করিয়া তাহার কোমরও ডোবে নাই।

আশ্চর্য্য! ইহার মধ্যে মানুষ বাঁচিয়া আছে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন—এ বাঁচা প্রেতের বাঁচা। অথবা ক্ষয় রোগাক্রান্ত রোগীর বাঁচা। তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে, নিশ্চেষ্ট আত্মসমর্পণের মধ্যে।

অনিরুদ্ধের সেই উদ্যত কুঠারের সম্মুখে দাঁড়ানোর ছবি সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল। জমিদারের চাপরাশী, ভূপাল নগদী, শ্রীহরির মজুর সকলের বিরুদ্ধে উদ্যত অস্ত্রের সম্মুখে একা অনিরুদ্ধ। সে কি তবে ক্ষয় রোগীর বিকারের আক্ষেপ!

এ গ্রামের প্রতিটি জনের সাদর সম্ভাষণে তাহাকে গ্রহণ করা—যতীনের মনে পড়িয়া গেল বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীকে। চৌধুরীর সরল উদার আপ্যায়ন, স্মৃতিকথাগুলি কি প্রাচীন পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরের মতই কাহিনীরই বস্তু! মহিমার কণার মত এক কণা প্রেরণার বীজও কি তাহার মধ্যে সজীব নাই! সংস্কৃতির বীজ কি নিঃশেষে মরিয়া যায়!

ওই দীর্ঘাঙ্গী অবগুণ্ঠিতা এ বাড়ীর গৃহিণীটির সেবা মমতা, ওই মুচীদের মেয়েটির সেবা স্নেহ জৈবধর্ম্মের বিচিত্র প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়!

ভারতের মুক্তিকামী স্বপ্নাতুর কিশোর আপনার মনেই ভাবিয়া চলিয়াছিল, তাহার এতদিনের পড়া এবং শোনা তথ্য ও কথার সহিত বাস্তবের একটা যেন দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। কিছুতেই তথ্যকে আজ সে স্বীকার করিতে পারিতেছে না। আঙ্কিক নিয়মে ইহাদের নিশ্চিত বিলুপ্তির মধ্যেই যাওয়ার কথা, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বসিয়া সে অনুভব করিতেছে এক অদৃশ্য প্রাণ শক্তির স্পন্দন। বহুকালের প্রাচীন কচ্ছপের মত শ্যাওলাধরা সুদৃঢ় খোলার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া মৃতের মতই সে প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে, জলোচ্ছ্বাসে কলরোল শুনিলেই সে আত্মপ্রকাশ করিবে।

কিছুক্ষণ জবাবের প্রতিক্ষা করিয়া ঘোষাল আবার তাগিদ দিল—যতীনবাবু!

জগন ডাক্তারও প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কয়েকজন ফিস্ ফিস্ করিয়া আলোচনা করিতেছিল—গান্ধীমহারাজের কথা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা। অনিরুদ্ধ চা লইয়া আসিয়া হাজির হইল। কাঁসার বাটিতে গ্লাসে চা আনিয়া একে একে সকলের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া জগনকেই সম্ভ্রমভরে কহিল—খান গো!

ডাক্তার চায়ের গ্লাসটি কোঁচার খুঁটে জড়াইয়া ধরিয়া মুখে তুলিয়াই সচকিত স্বরে বলিল—কে? কে?

একটা মূর্ত্তি অন্ধকারের মধ্যে চকিতে অনিরুদ্ধের খিড়কীর দুয়ারের দিকে চলিয়া গেল। ক্ষীণ হইলেও পদধ্বনি সকলেই শুনিল—সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি টুং টাং শব্দ যেন শোনা গেল।

—কে গেল? কে?

সেই মুহূর্ত্তেই বাড়ীর ভিতর হইতে কে ডাকিল—কম্মকার!

দুর্গার কণ্ঠস্বর। অনিরুদ্ধ সেইখান হইতেই সাড়া দিল—কি?

—শোন, শিগ্গী একবার এস!

বিরক্ত হইয়াই অনিরুদ্ধ ভিতরে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সেও ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—বাবু!

যতীন আপন মনেই ভাবিতেছিল। জগন ডাক্তার তাহাকে সচেতন করিয়া বলিল—আপনাকে ডাকছে। অনিরুদ্ধ ডাকছে। যতীন ভিতরে আসিতেই অনিরুদ্ধ

শঙ্কিত উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—পুলিশের জমাদার এসেছে। আমাদের কমিটির খবর দিয়েছে ছিরে। আসবে এখানে।

দুর্গা দাঁড়াইয়া তখনও হাঁপাইতেছিল। সে বলিল—ছিরু পালের ওইখানে বসে আছে। আমি চল্লাম বাবু, লোকজন সব বিদেয় ক'রে দেন।

চকিতের মতই সে বাহির হইয়া গেল—শোনা গেল শুধু লঘু দ্রুত পদধ্বনি—আর চুড়ির দুই একটি টুং-টাং শব্দ।

ছিরুই খবর পাঠাইয়াছিল। নজরবন্দীর বাড়ীতে কংগ্রেসের কমিটি বসিয়াছে। জমাদার সাহেবের কাছে সেলাম পাঠানো হইয়াছিল, সেলামীর ইঙ্গিতও ছিল। জমাদারের নিজেরও একটা প্রত্যাশা ছিল। ডেটিনিউটিকে হাতেনাতে ধরিয়া ষড়যন্ত্র বা আইনভঙ্গ—যে কোন মামলায় ফেলিতে পারিলে চাকরীতে পদোন্নতি বা পুরস্কার—নিদেন পক্ষে বিভাগীয় একটা সদয় মন্তব্য লাভ অনিবার্য্য। সেলামীটা ফাউ। সেলামটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

মুচিপাড়ার প্রান্ত দিয়াই ও-পারের জংসনের পথ। ভূপাল আলো দেখাইয়া জমাদার সাহেবকে লইয়া আসিতেছিল। দুর্গা আপনার কোঠার জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রথমেই সে একবার কর্ম্মকারের ওখানে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। লোকজনে ভিড় করিয়া বাবুকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল। ভিতরে পদ্মের কাছেও ভাল জমে নাই। ভাল জমে নাই বলিলে ভুল হইবে, পদ্ম একবারে কথাই বলে নাই। দুর্গা কথা বলিলে—সে বিরক্তিই প্রকাশ করিয়াছে। বলিয়াছিল—আমাকে বকিয়ো না ভাই, ও বেলায় আমার ব্যামো উঠেছিল—আমার মাথা ঘুরছে।

অথচ পদ্ম ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ কর্ম্মও করিতেছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দুর্গা বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে। পাড়াতেও সে বাহির হয় নাই, নীচে মা অথবা পাতুর বউয়ের কাছেও সে বসে নাই, উপরে আসিয়া জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অন্যমনস্ক ভাবে, নদীর ঘাট হইতে যে আলোটি গ্রামের দিকে আসিতেছিল—সেই আলোটিকেই লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার বাড়ীর পিছনে অদূরে রাস্তার উপরে আলোটি আসিতেই সে ভূপাল ও জমাদারকে চিনিল। রাত্রে জমাদারের আসা এমন নূতন কথা নয়। ভূপালই কতদিন এমনই করিয়া জমাদারকে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে তো এমন সন্ধ্যা রাত্রে নয়। আর এমন সাজ পোষাক পরিয়াও নয়! তাহা ছাড়াও জমাদারকে দেখিয়াই কেমন তাহার মনে পড়িয়া গেল নজরবন্দী বাবুকে। সে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। দূরে দূরে পথের পাশের জঙ্গলে থাকিয়া অনুসরণ করিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপের বকুলতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপাল জমাদারকে লইয়া শ্রীহরির বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। দুর্গা একটু হাসিল। এক একটা গরু রাত্রে চুরি করিয়া মাঠে ফসল খাইয়া ফেরে। যে গরু এ আস্বাদ একবার পাইয়াছে—সে আর ভুলিতে পারে না। শিকল দিয়া বাঁধিলে সে খুঁটা উপড়াইয়া রাত্রে মাঠে যায়। ছিরুপাল নাকি সাধু হইয়াছে! তাই সে হাসিল। কিন্তু নূতন নারীটি কে? একজন কেহ আছেই। সে কে? দুর্গা কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না। শ্রীহরির বাড়ীর গোপনতম পথের সন্ধান তাহার সুবিদিত, কতরাত্রে সে আসিয়াছে। হাতের চুড়িগুলি উপরে তুলিয়া নিঃশব্দে সে আসিয়া শ্রীহরির ঘরের পিছনে দাঁড়াইল।

জমাদার বলিতেছিল—নির্ঘাৎ দু'বছর ঠুঁকে দোব।

শ্রীহরি বলিল—চলুন তা' হ'লে—জোর কমিটি বসেছে। জগন ডাক্তার, শালা হরেন ঘোষাল, গিরশে ছুতোর—অনে কামার তো আছেই। নজরবন্দীকে সব ঘিরে বসেছে। উঠুন তা' হ'লে।

দুর্গা শিহরিয়া উঠিল। নিঃশব্দে দ্রুতপদে সে পথের উপরে আসিয়াই ক্ষণেক ভাবিয়া লইয়াই, বেশ করিয়া চুড়ি বাজাইয়া ঝঙ্কার তুলিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক পরমুহূর্ত্তেই প্রশ্ন ভাসিয়া আসিল—কে? কে যায়?

—আমি।

—কে আমি?

—আমি বায়েনদের দুর্গা দাসী।

—দুর্গা! আরে—আরে—শোন—শোন!

—না।

ভূপাল আসিয়া এবার বলিল—জমাদারবাবু ডাকছে।

এক মুখ হাসিয়া লইয়া দুর্গা ভিতরে আসিয়া বলিল—আ মরণ আমার। তাই বলি চেনা গলা মনে হচ্ছে—তবু চিনতে লারছি! জমাদার বাবু! কি ভাগ্যি আমার! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আমি!

দেবু ঘোষও ঘরে উপস্থিত ছিল—সে বাহির হইয়া গেল।

জমাদার হাসিয়া বলিল—ব্যাপার কি বল্ দেখি? আজকাল না কি পিরীতে পড়েছিস? প্রথম শুনলাম অনে কামার, তারপর শুনছি নজরবন্দীবাবু!

দুর্গা হাসিয়া বলিল—বলেছে তো আপনার মিতে; পাল! পরক্ষণেই সে বলিল—আজকাল আবার গমস্তা মশাই বলতে হবে বুঝি। গমস্তা মশাই মিছে কথা বলেছে। মনের রাগে বলেছে—

বাধা দিয়া জমাদার বলিল—মনের রাগে? তা' রাগ তো হতেই পারে। পুরনো বন্ধুলোককে ছাড়লি কেন তুই?

দুর্গা বলিল—মুচি-পাড়াকে পাড়া আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলে আপনার মিতে। ঘরে টিন দেবার জন্যে টাকা চাইলাম। তা' আমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিলে আপনার বন্ধুলোক। সত্যি মিথ্যে শুধোন আপনি।

শ্রীহরির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। জমাদার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্গা কি বলছে পাল মশাই? জমাদারের কণ্ঠস্বর পাল্টাইয়া গিয়াছে।

দুর্গা লক্ষ্য করিয়া বুঝিল—একটা বুঝা-পড়ার সময় আসিয়াছে। সে বলিল, ঘাটে থেকে আসি জমাদারবাবু!

জমাদার উত্তর দিল না। সে স্থির দৃষ্টিতে শ্রীহরির দিকে চাহিয়াছিল। দুর্গা বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল—আজ কিন্তুক মাল খাওয়াতে হবে জমাদারবাবু, পাকি মাল!

শ্রীহরির জঙ্গলে ভরা খিড়কীর পুকুর। চন্দ্রবোড়া সাপের জন্য বিখ্যাত। দুর্গা সেই জঙ্গলে ঢুকিয়া নিশাচরীর মত নির্ভয় নিঃশব্দ পদক্ষেপে অতি দ্রুত গতিতে আসিয়া ছায়ামূর্ত্তির মত চকিতে অনিরুদ্ধের খিড়কীর দরজায় প্রবেশ করিল। আবার বাহির হইয়া গেল। ঘাটে হাত পা ধুইয়া যখন সে শ্রীহরির ঘরে ঢুকিল—তখন জমাদারের মুখ আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

দুর্গা আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—সাপ!

—সাপ! কোথায়?

—খিড়কীর ঘাটে। এই প্রকাণ্ড বড়। চন্দ্রবোড়া। এই দেখুন জমাদারবাবু। বলিয়া সে ডান পা খানি আলোর সম্মুখে ধরিল। একটা ক্ষত স্থান হইতে কাঁচা রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

জমাদার এবং শ্রীহরি উভয়েই এবার আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! জমাদার বলিল—বাঁধ—বাঁধ! দড়ি, দড়ি! পাল দড়ি নিয়ে এস।

শ্রীহরি দড়ির জন্য ভিতরে যাইতে যাইতে বিরক্তি ভরে বলিল—কি বিপদ! কোথা থেকে বাধা এসে জুটল দেখ দেখি! দড়ি আনিয়া ভূপালের হাতে দিয়া শ্রীহরি বলিল—বাঁধ। জমাদার বাবু, আসুন চট করে ওদিকের কাজটা সেরে আসি।

দুর্গা বিবর্ণ মুখে করুণ দৃষ্টিতে জমাদারের দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে জমাদারবাবু? চোখে তাহার জল ছল ছল করিয়া উঠিল।

জমাদার আশ্বাস দিয়া বলিল—কোন ভয় নাই! ভূপালের হাত হইতে দড়ি লইয়া সে নিজেই বাঁধিতে বসিল। ভূপালকে বলিল—থানায় গিয়ে লেক্সিন নিয়ে আয়। আর ওঝা কে আছ ডাক এক্ষুনি!

দুর্গা বলিল—আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও জমাদারবাবু! ওগো, আমি মায়ের কোলে মরব গো!

শ্রীহরি বলিল—সেই ভাল। ভূপাল ওকে বাড়িতে দিয়ে আসুক। দীনু ওঝা, আর মিতে গড়াঞীকে ডাক। ছুটে যাবি আর আসবি। চলুন জমাদারবাবু।

ভূপাল দুর্গাকে বাড়ি পৌছাইয়া দিয়া ওষুধ ও ওঝার জন্য দ্রুত গতিতে চলিয়া গেল। দুর্গার মা হাঁউ-মাঁউ আরম্ভ করিয়া দিল। পাতুর বউ সকরুণ মমতায় আতঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল—কি সাপ ঠাকুরঝি।

দুর্গা পায়ের বাঁধন আল্গা করিতে করিতে বলিল—দাদা কই বউ? কামারের হোথা হ'তে ফিরে এসেছে?

—এসেছে। এই খানিক হ'ল পাড়া পানে গেল। ডাকব?

—না।

দুর্গার মা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দুর্গা, মাথার খোঁপার বেঁলকুড়ি কাঁটাটা খুলিয়া আলোর সম্মুখে তাহার অগ্রভাগটা দেখিতেছিল—পাতুর বউ বলিল—হ্যাঁ, ফুটিয়ে দেখ দেখি লাগছে কি না! সাপ তুমি দেখেছ ঠাকুরঝি? কি সাপ?

দুর্গা বলিল—কাল সাপ। অতি গোপন প্রচ্ছন্ন হাসি তাহার ঠোঁটের কোণে খেলিয়া গেল।

সাপে তাহাকে কামড়ায় নাই, নিজেই সে বেলকুঁড়ির কাঁটাটা পায়ে ফুটাইয়া রক্তপাত করিয়াছে। নহিলে কি সকলে পলাইবার অবকাশ পাইত, না জমাদার তাহাকে নিষ্কৃতি দিত! সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মদ খাইয়া—জমাদারের ও ছিরুর সে মূর্ত্তি মনে করিয়া ঘৃণায় সে শিহরিয়া উঠিল। ক্রমশঃ

সাময়িকী

ব্যবস্থাপরিষদের আগামী অধিবেশন—

আগামী ২৭শে নবেম্বর হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের আগামী অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং সেই অধিবেশনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিলের আলোচনা হইবে স্থির হইয়াছে : মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল ও বঙ্গীয় খাঁটি খাদ্যদ্রব্য বিল। ইহা ছাড়া বঙ্গীয় কৃষি-খাতক দ্বিতীয় সংশোধন বিল, বঙ্গীয় টাউট (আদালতের দালাল) বিল ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত হইয়া পরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। বঙ্গীয় পত্তনী তালুক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিল, বঙ্গীয় শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় মাতৃমঙ্গল বিল, চা-বাগান বিল এবং কলিকাতা ও শহরতলী পুলিশ আইন সংশোধন বিল ব্যবস্থাপক সভায় আগে আলোচিত হইয়া গিয়াছে। সেগুলি পরিষদে উপস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই নয়টি বিল ছাড়া আরও পাঁচটি বিল (যাহা বিগত অধিবেশনে সরকারপক্ষ উপস্থিত করিতে পারেন নাই) আছে—বঙ্গীয় পুষ্করিণী উন্নয়ন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় রাজস্ব আইন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিকশিক্ষা বিল, বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল ও বঙ্গীয় অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব বিল। আরও তিনটি বিলের আলোচনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—বঙ্গীয় সরকারী রেকর্ড বিল, বঙ্গীয় প্রমোদকর আইন সংশোধন বিল ও বঙ্গীয় আইন সভা সদস্যদের সুবিধা ও ক্ষমতা বিল। প্রায় চল্লিশটি বে-সরকারী বিলও আলোচনার অপেক্ষায় আছে। এই বিলগুলির পশ্চাতে একটা নূতন কিছু করার উদগ্র আগ্রহ ছাড়া দেশের বা দশের হিতসাধনের কোন চেষ্টা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। উপরন্তু এগুলাকে আমরা পরাধীন দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দেশের স্কন্ধে অনাবশ্যক গুরুভার বলিয়াই গণ্য করি।

বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন—

বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইনটি যখন বিলের আকারে ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হয় তখন সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, এই ট্যাক্সের আঁচ ব্যবসায়ীদের গায়ে লাগিবে না, বরং ক্রেতাদের স্কন্ধেই ইহা চাপান হইবে। কাজেই এখন দরিদ্র জনসাধারণকেই এই কর দিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই আইনের খসড়ার ভাষাও যথেষ্ট অস্পষ্ট, ফলে ব্যবসায়ীরা সরকারী আদেশ মত হিসাবাদি রাখিতে বিশেষ নাজেহাল হইতেছেন। যে পণ্যদ্রব্যের উপর ট্যাক্স আছে তাহার জন্য এক খাতা, আর যে জিনিসের উপর ট্যাক্স নাই তাহার জন্য স্বতন্ত্র হিসাবের খাতার নির্দ্দেশ আছে। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা যে ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। নূতন আইনটি সম্বন্ধে প্রথমে লোক সঠিক ধারণা করিতে না পারায় ক্রেতাদের পক্ষ হইতে তখন তেমন আন্দোলন হয় নাই। প্রথম হইতে তীব্র আন্দোলন করিলে আজ অবস্থা হয় ত অন্যরূপ হইতে পারিত। বিক্রেতাদের মত ক্রেতাদেরও সজাগ হইয়া কার্য্য করা দরকার। এখনও ব্যবস্থাপরিষদে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করার সময় আছে; নূতন আইনটি পাশ করিতে গিয়া সরকার নিজেদের সমর্থনে মাদ্রাজেও উক্ত আইন আছে এরূপ নজির প্রদর্শন করেন; কিন্তু আমরা জানি, মাদ্রাজে যে বিক্রয়কর আছে তাহার পশ্চাতে জাতি-গঠনমূলক কার্য্যের তাগিদ ছিল, অপর পক্ষে বাঙ্গালায় সেরূপ কোন তাগিদের বালাই ছিল না; অন্তত সরকার পক্ষের নিকট হইতে আমরা সেরূপ কোন পরিকল্পনার আভাষ পাই নাই। বিক্রয়কর আইনের সম্পর্কে আর একটি বড় কথা বলিবার আছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলিকে এই আইনের কবল হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলিকে কর দিতেই হইবে। অথচ বাঙ্গালায় যে কয়খানা মাসিক পত্রিকা কোন প্রকারে টিকিয়া আছে, কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ও এই ট্যাক্সের চাপে সেগুলির পরিচালনাও কষ্টসাধ্য হইবে। আর একটা কথা, ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক ব্যবস্থা করিলে ব্যবসায়ীদের

পক্ষে সুবিধার হইত ; কিন্তু মাসে মাসে হিসাব ও ট্যাক্স জমা দেওয়ার ব্যবস্থায় তাঁহাদের যে অপরিসীম অসুবিধা হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। এইসব অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে অবিলম্বে বিবেচনা করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

দোকান কর্ম্মচারী আইনের ফল—

বাঙ্গালার দোকান কর্ম্মচারী আইন কার্য্যকরী হওয়ার পর হইতে ছোটখাট দোকানের কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় একটি সভা হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহার উপর কোন কোন জিনিসের দাম দ্বিগুণ তিনগুণে দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতাও যথেষ্ট কমিয়াছে। এই অবস্থায় দোকান কর্ম্মচারী আইন অনুসারে সপ্তাহে দেড় দিন কাজ কারবার বন্ধ রাখিতে হইতেছে। তাহাছাড়া ছুটিছাটা, পালপার্ব্বণও আছে। সুতরাং এই অবস্থায় দোকানের মালিকদের পক্ষে যোগ্য বেতন দিয়া সকল কর্ম্মচারীকে বহাল রাখাও কঠিন, আবার এই অতিবড় দুঃসময়ে তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিলেও তাহারা যায় কোথায়? দোকানের মালিক ও কর্ম্মচারী—উভয়ের সম্মুখেই দারুণ সমস্যা। দোকানদারগণ যদিও টিকিয়া আছেন, কর্ম্মচারীদের অবস্থা ক্রমেই সুদুঃসহ হইয়া পড়িতেছে। আইনকে কার্য্যে পরিণত করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই যাঁহাদের একমাত্র দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব রক্ষার ফলাফলের প্রতি যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন, এ সমস্যার সমাধানে তাঁহারা কি বলিতে চাহেন?

সিংহলে ভারতীয় সমস্যা—

সম্প্রতি ভারত সিংহল অনুসন্ধান সম্মিলনে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, সিংহল ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে কলম্বো ও সিংহলের অপর ছয়টি স্থানে একই সময়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয়দের সভায় তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সিংহল সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুসারেই ভারত সরকার সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত সম্মিলনে ঐ বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ভারত-সিংহল চুক্তির আপত্তিজনক ধারাগুলির প্রতিবাদে বিভিন্ন সভায় বহু প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সিংহল মহাসভার সভাপতি বক্তৃতায় বলেন যে, ভারত সিংহল চুক্তির খসড়া অনুসারে শুধু চা-কর প্রভৃতি ক্ষেত্রস্বামীরাই উপকৃত হইবে। কারণ অপটু শ্রমিক আমদানির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়ার ফলে চা-করেরা সস্তায় শ্রমিক পাইবে। এই চুক্তিদ্বারা সিংহলী জাতিও অপূরণীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সিংহল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা মাদ্রাজে পৌছিয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে দিল্লীতে গিয়া তাঁহারা সিংহল-ভারত চুক্তির দ্বারা ভারতীয়দের যে সমস্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহার বিবরণ ভারত সরকারের নিকট উপস্থিত করিবেন।

বড়লাটের শাসনপরিষদ—

বড়লাটের শাসন পরিষদে যখন পাঁচজন অতিরিক্ত ভারতীয় সদস্য গৃহীত হয় তখন সেই ব্যাপারে কেহই কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করে নাই। তাহার কারণ, শাসন পরিষদে যে সমস্ত ভারতবাসী আছেন বড়লাট যদি তাঁহাদের নির্দ্দেশমত কাজ না করেন এবং পরিষদের সদস্যগণকে যদি সকল ব্যাপারে বড়লাটের হুকুম মানিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে শাসন পরিষদে যতজন ভারতবাসীই থাকুন না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা যাইতেছে। দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, দেশশাসন সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারের নীতি ও কর্ম্মপন্থা—এমন কি, উচ্চপদে সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ-সম্পর্কিত প্রত্যেকটি সমস্যা শাসন-পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত করা হইবে এবং পরিষদ যে সিদ্ধান্ত করিবেন বড়লাট যতদূর সম্ভব তাহা মানিয়া লইবেন—এই ধরণের একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দেশবাসীর দাবী পূর্ণ হইবে না। কেন না, যতদিন না শাসন পরিষদের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের মিলিত সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবেন ততদিন দেশবাসী সন্তুষ্ট হইবে না। বড়লাট পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্তও যদি মানিয়া লইতে বাধ্য হন তাহা হইলেও দেশবাসী জনকয়েক ভারতবাসীর বিচার বুদ্ধির

উপর দেশের সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব স্থায়ীভাবে অর্পণ করিতে পারে না! যাহা হউক, বর্ত্তমানে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে তাহা যদি কাজে পরিণত হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর হাতে কিছু যে নূতন ক্ষমতা আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ক্ষমতা যদি সদস্যের নিজের স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত না হইয়া দেশের স্বার্থরক্ষায় যথাযথভাবে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে দেশের রাজনৈতিক সমস্যার একটা মীমাংসার পথও সুগম হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে যে কিছুই হইবে না—এইটাই আপাতত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার নবব্যবস্থা—

রবীন্দ্রনাথের নামানুসারে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নির্ম্মিত গ্রন্থাগারের নামকরণ করিবার জন্য সম্প্রতি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমণি গুপ্ত মহাশয় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সানন্দে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। প্রস্তাবে বলা হয় অতঃপর উক্ত গ্রন্থাগারের নাম হইবে 'লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয় ঠাকুর গ্রন্থাগার'। যিনি সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আবার সেই জ্ঞানভাণ্ডারকেই চির-সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার স্মৃতি রক্ষার এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

নূতন সাহিত্যাচার্য্য—

লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর বিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি. এল্., পি. এইচ-ডি মহাশয়কে এবার সাহিত্যাচার্য্য (ডক্টর অফ্ লিটারেচার) উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। ডক্টর বিমলাচরণ বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি 'প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বর্ণিত ভারতবর্ষ' নামক এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার একমাত্র পুত্রের আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা ব্যথিত; আমরা ডক্টর লাহার এই উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ঢাকার অবস্থা—

ঢাকা শহরে তৃতীয়বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক তীব্র মনোভাবের ফলে যখন বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের প্রতিমা নিরঞ্জন বন্ধ রহিয়াছে তখন ঢাকা শহরে ঈদের মিছিল বাহির হইতে দেওয়া হইয়াছে। সংবাদ-পত্রে প্রতিদিন যে বিবরণ পাঠ করিতেছি তাহা আসল অবস্থার ভগ্নাংশ। লুঠ, তরাজ, হত্যা—এ যেন খোলাম-কুচির মত। ঢাকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের এই সত্যটাই মনে জাগিতেছে যে, সরকার গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদিগকে আয়ত্বাধীন করিতে পারে নাই। যাঁহাদের তর্জ্জনী হেলনে উভয় সম্প্রদায় মানুষের জীবন লইয়া গুণ্ডারা এই রকম ছিনিমিনি খেলিতেছে সেই সব দেশের শত্রুকে ধরিয়া আবশ্যক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে ঢাকার এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীভূত হইবে না।

জয়প্রকাশ নারায়ণের চিঠি—

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন পত্র বলিয়া সরকার যাহা প্রকাশ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে মহাত্মাজীর বিবৃতিতে ভাবিবার অনেক কিছুই আছে। এই বিবৃতির মধ্যে বিনা বিচারে আটকবন্দীদের দুরবস্থা সম্পর্কে যে তীব্র সমালোচনা আছে তাহার দিকে সরকারের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের ঐ পত্রখানা প্রকাশ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে আটক বন্দীদের ব্যবস্থা কঠোরতর করিবার ব্যবস্থা হইলে সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। এই সব বিনা বিচারে বন্দী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের অবস্থার সহিত গান্ধীজী সামরিক বন্দীদের অবস্থার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সামরিক বন্দীদের কিরূপ রাজার হালে রাখা হয়। গান্ধীজীর দৃষ্টি যখন আটক বন্দীদের প্রতি পতিত হইয়াছে তখন তাঁহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকারে সরকারও অধিকতর অবহিত হইবেন—এই আশা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

বাঙ্গালায় বন্যা—

মহাযুদ্ধের দৌলতে আমরা দরিদ্র বাঙ্গালীরা একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি নূতন ট্যাক্সের ভারে যখন হাঁপাইয়া উঠিয়াছি ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃতিও আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় যে বন্যা হইয়াছে তাহাতে উক্ত জেলার এক অংশ

আজ গৃহহীন অন্নহীন বস্ত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্ত যখন কোন পথই খুঁজিয়া পাইতেছিল না সেই সময় প্রকৃতির এই রুদ্রমূর্ত্তি দেশবাসীকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছে। হাজার হাজার নরনারী শিশুবৃদ্ধ আজ আশ্রয়হীন, অন্নহীন। চাষ আবাদের সম্ভাবনা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। ১৯২০ সালের দামোদরের বন্যার তুলনায় এবারের বন্যা নেহাৎ নগণ্য নহে, অথচ দুর্দ্দশ্যগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্যের ব্যবস্থা তেমনভাবে করা হইতেছে না। কত লোক যে গৃহহারা, বস্ত্রহারা, গৃহপালিত পশুহারা হইয়া পড়িয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

বেঙ্গল টাইম—

সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার জনগণ যে 'সময়' লইয়া অভ্যস্ত, সম্প্রতি সরকারের নির্দ্দেশে তাহা রাতারাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া 'বেঙ্গল টাইম'-এ রূপান্তরিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা যে ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে এতটুকুও চিন্তা করিয়াছেন, তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। কলিকাতার আপিস আদালতে চাকরি করিয়া যাঁহারা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করেন তাঁহারা সকলেই যে কলিকাতার বাসিন্দা নহেন, এ সত্যটাও কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ জানা আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশ পঞ্চাশ সত্তর টাকা আয়ের লোক যে শহরতলী বা মফঃস্বল হইতে নববিধান অনুযায়ী সময়ে বর্ষা শীত উপেক্ষা করিয়া আহারাদি শেষ করিয়া যথাসময়ে (বেঙ্গল টাইমে) কর্ম্মস্থানে হাজিরা দিতে পারে না (এবং পারাও সম্ভব নহে) তাহা কর্ত্তৃপক্ষের জানা নাই। তাহা ছাড়া কলিকাতায় আসিয়া হোটেলে আহারের ব্যবস্থাও তাহাদের স্বল্প আয়ে সম্ভব নহে। কলিকাতা কর্পোরেশন বেঙ্গল টাইম মানিয়া লইয়াও সাড়ে দশটায় আপিসের কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন। সময়ের নাম না বদলাইয়া আধ ঘণ্টা আগে কার্য্য আরম্ভ করিয়া আধ ঘণ্টা আগে ছুটির ব্যবস্থা করিলেই কাজটা সহজ হইয়া যাইত।

ছাত্রসম্মিলনী—

গত ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর গৌহাটী ধর্ম্মসভা প্রাঙ্গণে প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন—ভারত বহুধা বিভক্ত এবং বহু ধর্ম্ম ও জাতির বাসস্থান হইলেও ভারতীয়গণের পরস্পরের মধ্যে একটা সংস্কৃতিগত ও জাতিগত ঐক্যের বন্ধন আছে। যাহাতে ভারতে সেই ঐক্য বজায় থাকে, সকলেরই সে জন্ত যত্নবান হওয়া উচিত।

যক্ষ্মারোগীদের স্বাস্থ্যনিবাস—

দার্জিলিং-এর নিকটবর্ত্তী লারিনগাঁওয়ে যক্ষ্মারোগীদের জন্ত একটি আধুনিক ধরণের স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতেছে। এই সংবাদে অনেকেই স্বস্তিবোধ করিবেন। এখানে তিনশত রোগীর জন্ত শয্যার ব্যবস্থা থাকিবে এবং উহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সত্তর-আশী লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এই টাকাটার অধিকাংশই নিখিল ভারত যক্ষ্মা সমিতি বহন করিবেন। দেড় শত একর জমির উপর পরিকল্পিত এই স্বাস্থ্যনিবাসের সহিত যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা শিক্ষার জন্তও একটি শিক্ষাকেন্দ্র থাকিবে। বাঙ্গালায় বৎসরে প্রায় দশহাজার লোক দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই রোগ চিকিৎসার জন্ত সরকারের সক্রিয় ব্যাপক মনোযোগের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অথচ এই মারাত্মক ব্যাধি যে প্রতিদিনই বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তিকে নির্জ্জীব করিয়া দিতেছে তাহা অতি স্পষ্ট। আমরা এই নব-পরিকল্পিত যক্ষ্মা-নিবাসের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

বঙ্গীয় পরিষদে ব্যয়বাহুল্য—

বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যপরিচালনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, গত আর্থিক বৎসরে পরিষদের কার্য্যপরিচালনা বাবদ বাঙ্গালা সরকারের প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। অন্তান্ত খরচ ছাড়া পরিষদ সদস্তগণের সফর ও দৈনিক ভাতা ইত্যাদির জন্ত নাকি সাড়ে তিনলক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় করিতে হইয়াছে। বেতনাদির ব্যাপার ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গত এক বৎসরে ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকগুলিতে এক একটি অপদার্থ আইনকে কেন্দ্র করিয়া যে বিবাদ বিতর্ক ও হট্টগোল হইয়াছে, তাহাতে

জনগণের কতখানি উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু হাজার রকমের ট্যাক্সদ্বারা উৎপীড়িত জনগণের কষ্টার্জ্জিত এই বিপুল অর্থব্যয়ে জনগণের স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হইয়াছে তাহারও একটা রিপোর্ট বাহির হওয়া উচিত।

পরলোকে নীলিমা দেবী—

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী নীলিমাদেবী দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর মাত্র বিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা নানাগুণের অধিকারিণী কুমারী নীলিমার অকালবিয়োগে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতামাতা ও স্বজনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

বাঙ্গালায় আদমসুমারির ফল—

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে বাঙ্গালায় আদমসুমারির ফল প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার এবং মুসলমানের সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। এই হিসাবে হিন্দু-মুসলমান কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে লোক গণনার কাগজপত্র নিরপেক্ষ কোন কমিটির দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য বড়লাটের নিকট তার প্রেরিত হইয়াছে। মুসলমানদের পক্ষ হইতেও বলা হইয়াছে—এই হিসাব সঠিক নহে, হইতে পারে না। দুই পক্ষই যখন অসন্তুষ্ট, তখন কি সরকার কাগজপত্র পরীক্ষা করাইবার জন্য সত্য সত্যই আবার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? যে দেশে মাথার সংখ্যার উপর দেশ-শাসন হইতে দেশের যাবতীয় চাকরীর বিভাগ পর্য্যন্ত নির্ভর করে সেখানে যতক্ষণ না লোক-গণনায় সকলে নিঃসন্দেহ হয়, ততক্ষণ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

পরলোকে ডাঃ সত্যপ্রসাদ—

তিরাশী বৎসর বয়সে ডাঃ সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন; ইনি পরলোকগত ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ডঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর অগ্রজ। তিনি দীর্ঘকাল চিকিৎসক হিসাবে কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন; কিন্তু কর্ম্মময় জীবনেও সুদীর্ঘকাল তিনি কলিকাতার অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের গুরুদায়িত্বসম্পন্ন কার্য্য করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি ছিল অনন্যসাধারণ, কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

পরলোকে সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে ষষ্ঠী গাঙ্গুলী মহাশয়ের অকালে আকস্মিক পরলোকগমনে কলিকাতার সমাজ-জীবনে একটি বিশিষ্ট লোকের অভাব হইল। তিনি কলিকাতার নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বীমা কোম্পানীর সাফল্য—

বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশ যে ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সমকক্ষতা লাভ করিতেছে, তাহা হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডের ১৯৪০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলেই বুঝা যায়। যুদ্ধের জন্য অসুবিধা সত্ত্বেও আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার নূতন বীমা সংগ্রহ করিয়াছে। জীবন বীমা ফণ্ডে এক বৎসরে ৪৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়া উহা মোট ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ২৫ লক্ষ টাকার দাবী প্রদান করিয়াছে। এই বীমা কোম্পানী পরিচালনের সহিত বাঙ্গালার বহু শ্রেষ্ঠ মণীষীর সংযোগ দেখা যায়। আমরা কোম্পানীর দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী বড়দিনের ছুটীতে কাশীধামে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন হইবে। সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন কাশীধামেই রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সে জন্য এবারও সম্মিলনে একদিন রবীন্দ্র স্মৃতি দিবস অনুষ্ঠান করিয়া রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত

প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে সভাপতি করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং বহু কর্ম্মী উহার বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, রবীন্দ্র স্মৃতি দিবস ছাড়াও তিন দিন সম্মিলনের অধিবেশন হইবে এবং মূল সম্মিলন ব্যতীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, বৃহত্তর বঙ্গ ও প্রবাসী বাঙ্গালীর সমস্যা, সঙ্গীত এবং ললিতকলা এই কয়টি বিভাগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইবে। কাশীধামে সোনারপুরায় সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে। কাশীতে শুধু সম্মিলনের আকর্ষণে নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শনের সুযোগ লাভের জন্য বহু সাহিত্যিকের সমাগম হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নূতন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—

কলিকাতা সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র এবং বরাবর সকল পরীক্ষাতেই বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। ভারতের ইতিহাস



শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনিলচন্দ্রের নিকট অনেক কিছু প্রত্যাশা করে এবং আমাদের বিশ্বাস তিনি নিরলসভাবে দেশের দাবী পূরণে যত্নশীল হইবেন।

দাতা শতং জীবতু—

মুর্শিদাবাদ লালগোলার দানবীর মহারাজা সার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় কে-টি, সি-আই-ই মহাশয় সম্প্রতি



লালগোলার মহারাজা সার যোগীন্দ্রনারায়ণ

শতবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করা সকলের পক্ষেই সৌভাগ্যের পরিচায়ক; মহারাজা তাঁহার সুকৃতির দ্বারা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন। দানের জন্য লালগোলার মহারাজা বহুকাল পূর্ব্বে স্বনামখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার দান শুধু নিজ জেলার মধ্যে বা নিজ জমীদারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তাহা প্রসারিত। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগে তিনি বহু বৎসর বার্ষিক ৮ শত টাকা দান করিয়াছেন। বহরমপুর হাসপাতালের জন্য ছয় লক্ষ টাকা, লালগোলা স্কুলের জন্য দেড় লক্ষ টাকা, মুর্শিদাবাদ জেলার জলকষ্ট নিবারণে লক্ষ টাকা, লালগোলা

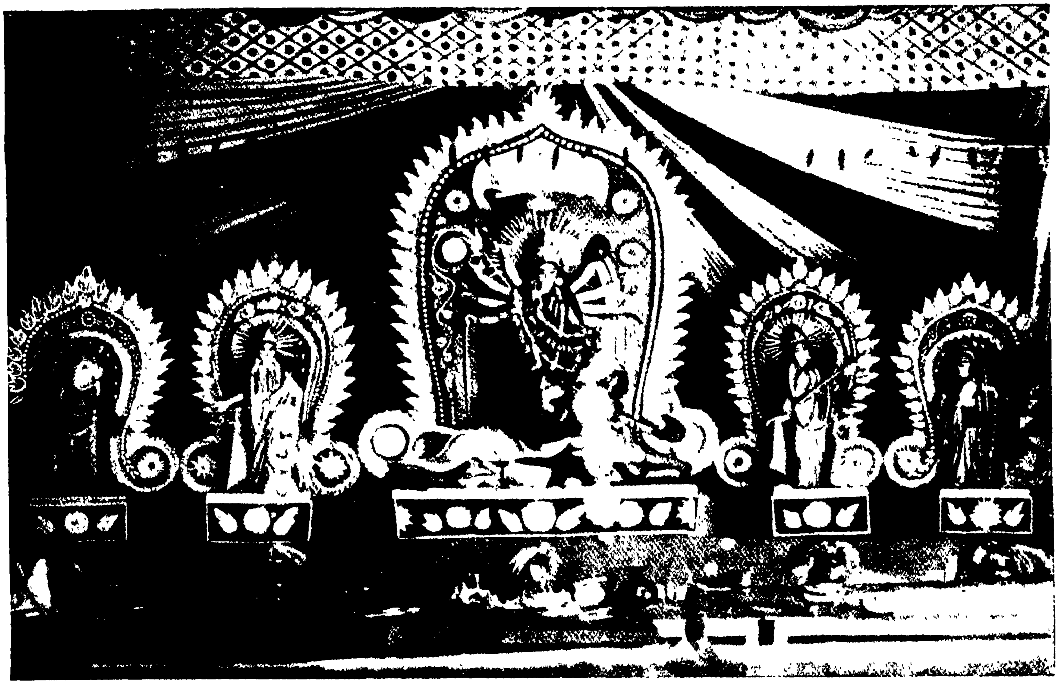
লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বড় বড় দান ছাড়াও তিনি পুষ্করিণী খনন, ইঁদারা নির্ম্মাণ, মন্দির ও মসজিদ সংস্কার, পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে কত যে অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু সাহিত্যিকও তাঁহার প্রদত্ত অর্থে পুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজা সারা জীবন অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করিয়াছেন। অর্থের মধ্যে থাকিয়াও এমন ত্যাগের জীবন অতি বিরল। তাঁহার পুত্রদ্বয়, কন্যা ও জামাতা ইতঃপূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পৌত্র কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ইতিমধ্যে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। বাঙ্গালার সাহিত্য সমাজেও তিনি সুপরিচিত। মহারাজা আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া দেশের ও দশের জন্য সদনুষ্ঠানে রত থাকুন —ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

বাঙ্গালার বাহিরে দুর্গোৎসব—

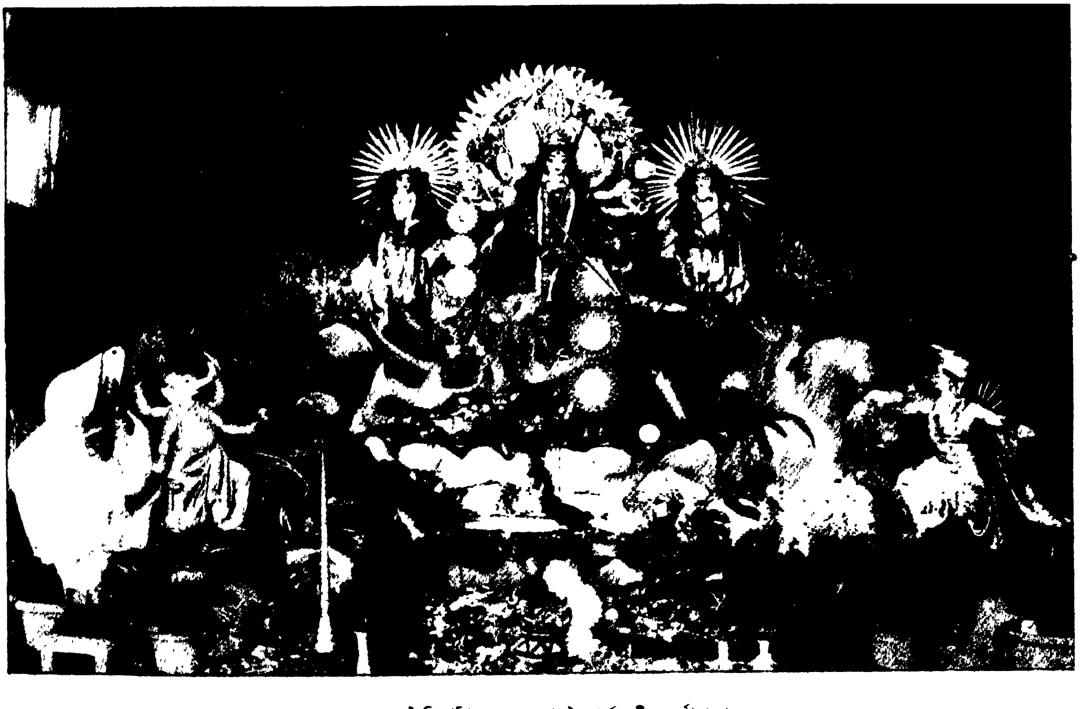
সুদূর করাচী হইতে শ্রীযুতঅপূর্ব্বভূষণ গুপ্ত জানাইয়াছেন যে করাচীতে প্রবাসী বাঙ্গালীরা সমারোহের সহিত এবার সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা করিয়াছেন। একজন মহারাষ্ট্রবাসী কুম্ভকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রায় ২৫০ জন প্রবাসী বাঙ্গালী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভূরিভোজন ও আমোদ-প্রমোদে অবাঙ্গালী বন্ধুরাও যোগদান করেন। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে শ্রীযুত প্রফুল্ল দাশগুপ্ত জানাইয়াছেন—তথায় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডির বাঙ্গালী অধিবাসীরা যোগদান করিয়াছিলেন। সপ্তমী ও নবমীর রাত্রিতে 'আগামী কাল' ও 'সীতা' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অষ্টমীর দিন পেশোয়ারের কুমারী ভারতী মুখার্জ্জি এবং রাওলপিণ্ডির কুমারী মঞ্জুলা ঘোষ ও কুমারী ঝরণা সরকার নৃত্য দেখাইয়াছিলেন। নবমীর দিন এক প্রীতিভোজেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। রেঙ্গুন সহরেও স্থানীয় বাঙ্গালীদের উদ্যোগে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা হইয়াছে। পূজার ৪ দিনই সন্ধ্যার পর পূজা মণ্ডপে নানাপ্রকার উৎসবের ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় সকল হিন্দুই এই উৎসবে যোগদান করেন এবং সকলের মধ্যেই প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গালার বাহিরে যাঁহারা দুর্গাপূজা করিয়া বাঙ্গালীর বিশেষত্ব রক্ষা করেন, তাঁহারা বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

আফগানিস্থানের সহিত বাণিজ্য—

কাবুলে ভারতের তরফ হইতে বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য যে কর্ম্মচারী আছেন তাঁহার ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ভারত-বাণিজ্য-বিস্তারের এখনও অনেক সুযোগ রহিয়াছে। কেবল কাবুল কেন ভারতের সন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশ এমন কি চীনেও বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। যে অসুবিধার জন্য ইহা হয় না, তাহার অনেকটাই আমাদের করায়ত্ত নহে। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ আছে। আফ্‌গানিস্থানের সহিত ধীরে ধীরে আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ৫০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে ৭০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে সূতি-বস্ত্রাদি প্রধান। ১৯৩৮-৩৯ সাল (২৬,৩১,০০০ টাকা) হইতে কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ৩২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা হইয়াছে। এখানে জাপান ও বৃটেন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহা হইলেও খুচরা দর হিসাবে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের দাম সস্তা। পশমী বস্ত্র ১,৭৬২ হইতে (১৯৩৯-৪০) ৯,৯৩৪ টাকা হইয়াছে। জুতার বাজারে বাহিরের প্রতিযোগী বিশেষ নাই; মোট ব্যবসায়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭০ হাজার হইতে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার হইয়াছে। সিমেণ্ট, কাচদ্রব্য, লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি রেশমী দ্রব্য, কাগজ, উদ্ভিজ্জ তৈল, মশলা, রক্ষিত খাদ্যাদি, সকল পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, যদিও বর্ত্তমানে তাহার পরিমাণ খুব বেশী নহে। যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র, চিনি, লবণ, রঞ্জনের দ্রব্যাদির বাজার আশানুরূপ প্রসার লাভ না করিয়া সঙ্কুচিত হইতেছে। এদিকে ব্যবসায়ী মহলে অবহিত হইলে ভাল হয়। আফগানিস্থান হইতে প্রায় ৪কোটী টাকার মাল ভারতে প্রবেশ করিয়াছে; তাহার অনেকখানি হয়ত রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। এই ৪ কোটী টাকার মধ্যে নানাপ্রকার ফল শজী প্রায় ১ কোটী টাকা, আর পারস্যের মেষ শাবকের চর্ম্ম আড়াই কোটী টাকা। কম্বল, কার্পেট ও পশুলোম মিলিত হইয়া ১৬ লক্ষ টাকা হয়। সজীব পশু, মশলা, ছাগ ও মেষ চর্ম্ম প্রভৃতি আফগানিস্থান হইতে অন্যান্য পণ্য। ১৯৩৮-৩৯ হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে প্রায় দেড় কোটী টাকার আমদানী বাড়িয়াছে এবং তাহা সমস্তই পশুচর্ম্মের মূল্য।



সিমলা সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব ফটো—ডি-রতন



বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা



জোড়াসাঁকো সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব ফটো— ডি-রতন



দর্জ্জিপাড়া (ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী লেন) সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব ফটো—ডি-রতন

সতীশচন্দ্র সেন—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় গত ৮ই অক্টোবর ৭৪ বৎসর বয়সে গিরিডিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার শব পরদিন কলিকাতায় আনিয়া কেওড়াতলা শ্মশানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। সতীশবাবু শুধু এটর্নি ছিলেন না, দেশকর্ম্মী ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে এবং দুইবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে জনসেবা করিয়াছিলেন। কয়লার ব্যবসার সহিত তিনি সম্পর্কিত ছিলেন এবং দুইবার ভারতীয় কয়লা ব্যবসায়ী সমিতি—ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সতীশবাবু বহু চিত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন এবং অধুনালুপ্ত আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের পরিচালক বোর্ডের সভাপতি রূপে তাঁহার নাট্যকলা প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার [illegible]পাড়ায় কীর্ত্তিচন্দ্র সেনের বংশে ১৮৬৮ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহার জন্ম হয় এবং স্বগ্রামের উন্নতির জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীদের জন্য তিনি পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্কুল পরিচালন, দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতিতে অর্থসাহায্য করিয়া গিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি এডভোকেট ছিলেন এবং হাইকোর্টে ওকালতি করিয়াছেন। কোম্পানীর আইনে তাঁহার মত পাণ্ডিত্য কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র সেন এম-বি-ই ভারত গভর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ সলিসিটার এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার—কনিষ্ঠ ডাক্তার সুধীরচন্দ্র সেন আসানসোলের প্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসক—এক কন্যা, বহু পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতি বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।



সতীশচন্দ্র সেন

পরলোকে যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

উত্তরবঙ্গ দিনাজপুরের যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ২৫শে আশ্বিন অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার একজন খাঁটি দেশকর্ম্মীর অভাব ঘটিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি আইন ব্যবসায়ে লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ হইলেও আপনার কর্ম্মশক্তি শুধু সঙ্কীর্ণ বিষয়ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, দেশের সেবায়ও তাহা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ কারাবরণেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। অসহযোগ আন্দোলনের যুগ হইতে জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কলিকাতা হইতে দূরে মফঃস্বল শহরে থাকিয়া যে সকল জাতীয় কর্ম্মী দেশবাসীকে কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে জাতীয়তার আলো বিকীরণ করিয়াছেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা এই জ্ঞানী, কৃতী ও প্রবীণ জননায়কের মৃত্যুতে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি।

চীনাবাদাম বাণিজ্য—

চীনাবাদাম ভারতের খুব পুরাতন পণ্য বলিয়া পরিগণিত না হইলেও ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে তাহার একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। ইদানীং এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিতেছে, তন্মধ্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় বিস্তার সম্বন্ধে ভারত সরকারের পরামর্শদাতা (Agricultural Marketing Adviser to the Government of India) প্রকাশিত পুস্তকখানি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে বর্ত্তমান বাণিজ্য সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিবার সুযোগ আছে; আমরা ইহা আরও একটু বিশদ করিবার জন্য এই প্রসঙ্গে অন্যান্য সংবাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি। ১৮০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ভারতের চীনাবাদামের উল্লেখ পাওয়া যায় না; সম্ভবত চীন, মানিলা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে ঐ সময় উহা আনীত হইয়া থাকিবে; ১৮৭১ সালে রপ্তানি শুরু হইলেও ১৮৭৮-৭৯ সালের পূর্ব্বে সরকারী হিসাবের খাতায় উহার স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। এই সালে ২৫,৪৭২ হন্দর বাদাম ১,৬৪,৪২০ টাকার বাহিরে যায়, তন্মধ্যে এক ফরাসীর অংশ ২২,৭৩৭ হন্দর অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে ঐ সময় ফ্রান্সই আমাদের প্রধান খরিদ্দার ছিল। ১৮৮০-৮১ সালে তৈল রপ্তানি শুরু হয় এবং ২,৭৫৯ টাকা মূল্যে ২,৭৮৮ গ্যালন তৈল বিদেশে বিক্রীত হইয়াছিল। চীনাবাদাম রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৮-২৯সালে ৭,৮৮, ৪০৭ টন মাল ১৯ কোটী ৩৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় সরকারী হিসাবে চীনাবাদাম আমদানিও ১৮৭৮-৭৯ সালে শুরু হয়; পরিমাণ ১৯ হন্দর ১৪৭ টাকায় জাঞ্জিবার ও মোজাম্বিক হইতে আসে। বর্ত্তমানে ৯০ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ৩৬ লক্ষ টন বাদাম প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে করমণ্ডল-জাতীয় বাদামই প্রধান। ১৯৩৮-৩৯ সালে ওজন হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাদাম (৮,৩৫,১০৩ টন) রপ্তানি হইয়াছে। ঐ সালে নেদরলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড প্রধান খরিদ্দার ছিল। চীনাবাদাম তৈলের রপ্তানি খুব বেশী নহে। ব্রহ্মে কমবেশ ৪,০০০ ও অন্যান্য দেশে ৫,০০০ টন রপ্তানি হয়। ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হওয়ার পূর্ব্বে ছয় লক্ষ টাকা তাহার মূল্য ছিল। এখন ব্রহ্ম সমেত উহা ৪৮ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। খইলের রপ্তানির পরিমাণ অনেক বেশী; ওজনে প্রায় চার লক্ষ টন এবং মূল্য প্রায় আড়াই কোটী টাকা। তন্মধ্যে ইংলণ্ড আমাদের সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা। রপ্তানির পর ভারতে ১৪ লক্ষ টন খোসা সমেত বাদাম, ৩ লক্ষ ২৮ হাজার টন তৈল এবং ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টন খইল পড়িয়া থাকে। সমস্ত শস্যের শতকরা ৬৬ ভাগ অংশ এখন ভারতবাসী নিজে ব্যবহার করে। বীজের জন্য শতকরা ১২ ভাগ, বাদাম হিসাবে ৬ ভাগ এবং তৈল নিষ্কাসনের জন্য মোট শস্যের ৪০ ভাগ ব্যবহৃত হয়। মাথা পিছু লোকে সওয়া এক পাউণ্ড বাদাম ব্যবহার করে, ব্রহ্মে সে ক্ষেত্রে তিন পাউণ্ড ব্যবহার করে। সাধারণে আরও চীনাবাদাম অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাহিরে চীনাবাদামের এখনও খুব চাহিদা আছে। কিন্তু বণিকেরা একই রকমের বাদাম পায় না বলিয়া ভারতীয় বাণিজ্যের বিপুল বাধা বর্ত্তমান। এই দিকে বিশেষ মনোযোগ না দিলে উন্নতির আশা কম। বাদামের দাম অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে; বর্ত্তমানে এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত যে সরকার হইতে চাষীকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। ভারতীয় একটি প্রধান পণ্যের এরূপ দুর্দ্দশা শুভলক্ষণ নহে।

গান্ধী-জয়ন্তী—

মহাত্মা গান্ধীর ত্রিসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র গত ১৫ই আশ্বিন মহাসমারোহে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, ত্যাগে শৌর্য্যে মনুষ্যত্বে অদ্বিতীয় পুরুষ মহাত্মাজী তাঁহার জীবনের পূর্ণ পরিণতির অধ্যায়ে উপনীত হইয়াছেন—সুদীর্ঘ জীবনে তিনি দেশের জীবন ও সংস্কৃতির

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে জাতির মনে একদিকে জাগিয়াছে যেমন স্বাধীনতা-লাভের আগ্রহ, অপরদিকে আসিয়াছে তেমনই ত্যাগ ও

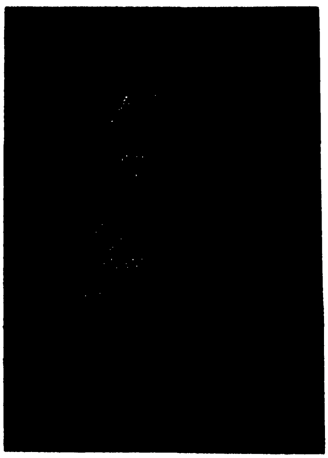


রেঙ্গুনে দুর্গাপূজা উৎসবে সমবেত প্রবাসী বাঙ্গালীবৃন্দ

সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সহিত আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্টির সংযোগ ঘটাইয়া মহাত্মাজী যে নব-দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, সমগ্র সভ্য জগতে তাহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কবিগুরুর পর এ যুগের ভারতে আর এত বড় মহৎ চরিত্র দেখা যায় নাই। জাতির দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথ আজ পরলোকে, কিন্তু গান্ধীজী আজিও দেশের সম্মুখে ভাস্বর হইয়া আছেন, তাই এত বড় দুর্দ্দিনেও ভারত মনের বল হারায় নাই। জাতির পথপ্রদর্শক, জাতীয় মর্য্যাদার মূর্ত্ত বিগ্রহ—মহাত্মাজীর এই জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা তাঁহার শতায়ু কামনা করিয়া সেই সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

পরলোকে অনন্তকুমার সেন—

গত ৫ই আশ্বিন পরলোকগত 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র ও পরলোকগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র অনন্তকুমার সেন মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া রোগে তের দিন ভুগিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। অনন্তকুমার বিদ্যাসাগর কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইত। একদিকে যেমন মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল তেমনই ক্রীড়ামোদী বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার এই অকাল বিয়োগে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতা শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন ও পরিজনগণকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।



শ্রীমতী শেফালী গুপ্ত

শেফালী গুপ্ত—

২৪ পরগণা সোনারপুর নিবাসী স্বর্গত প্রসাদ দাস সেনগুপ্তের কন্যা শ্রীমতী শেফালী গুপ্ত এবার দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি মহিলাদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন।

বৃটিশের হিতসাধিনী প্রবৃত্তি—

ভারতবর্ষ যে কেমন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে সম্প্রতি ভারত-সচিব মিঃ আমেরি তাঁহার স্বাভাবিক আমীরী চালে আমেরিকার নরনারীকে তাহা জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সমর প্রচেষ্টায় বিঘ্ন উৎপাদন করার অভিযোগে যে চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াছেন তাহা জনৈক ভারতীয় বিচারকেরই বিচারফল। বৃটিশ সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ভারতীয় হাকিম ভারতীয় আইন অনুসারে ভারতীয়কে দণ্ডদান করিয়াছেন, ইহাতে বৃটিশ সরকার হস্তক্ষেপ না করিয়া আইনের মর্য্যাদাই যে রক্ষা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই থাকিতে পারে না; আর ইহাকে অবশ্যই ভারতে অবাধ স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে! পণ্ডিতজীকে চারি বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা রূপ কাজটা যে খুবই সঙ্গত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার আশায় আর একজন বিশিষ্ট ইংরেজ বলিয়াছেন যে, ইহা বাহ্যত কারাদণ্ড হইলেও আসলে পণ্ডিতজীকে নিভৃতে একান্তে উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনার সুযোগ দান ছাড়া আর কিছুই নহে। আগের বার কারাবাসকালে তিনি একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এবারকার দীর্ঘতর কারাবাসে তিনি আরও ভাল গ্রন্থ রচনা করিবার সুযোগ পাইবেন। অতঃপর যদি কেহ ভারতে বৃটিশ সরকারের হিতসাধিনী প্রবৃত্তির অকপটতায় সন্দেহ করে তবে তাহাকে বেরসিক বলিতেই হইবে!

এই বেরালই বনে গেলে বনবেরাল হয়—

অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রি-সভার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শ্রমিক-দল দেশের ভাগ্যবিধাতারূপে দেখা দিয়াছেন কিন্তু সরকারী নীতির, বিশেষ করিয়া যুদ্ধে সাহায্যদান সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ার মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন ইহাতে হয় নাই। বিলাতে শ্রমিকদল যতদিন সরকারের বিরোধিতা করিয়াছেন, ততদিন তাঁহারা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে সাম্রাজ্যবাদের বাঁধা বুলি তাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। অস্ট্রেলিয়াতেও শ্রমিকদলের অভ্যুদয়ের সূচনা দেখিয়া যাঁহারা ভীত হইয়া পড়িতেছিলেন তাঁহারা মিঃ কার্টিনের প্রথম বক্তৃতাতেই হাঁপ ছাড়িতে পারিয়াছেন। কার্টিন সাহেব জানাইয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্বতন সরকারের অনুসৃত নীতিই পালন করিয়া চলিবেন।

কবিরাজ শিবনাথ সেন—

কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার কবিরাজ শিবনাথ সেন মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক গমনে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নগরের সামাজিক উন্নতিকর ব্যবস্থার সহিতও নিজেকে সংযুক্ত করেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের অধীন যক্ষ্মারোগীদের জন্য পাতিপুকুর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি উপাধি গ্রহণের পর তিনি আয়ুর্বেদ চর্চ্চায় মনোযোগী হন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন।

ছাত্রের কৃতিত্ব—

শ্রীমান্ রমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়া 'বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার" পাইয়াছেন। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায়ও সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ইনি মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ) অন্যতম জমিদার প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র।

রাজ্যরত্ন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়—

বরদার খবরে প্রকাশ, বরদা রাজ্যের নায়েব দেওয়ান ও রাজস্বসচিব কর্নেল কুমার শ্রীশিবরাজ সিংহ অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থলে রাজ্যরত্ন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হইয়াছে। তিনি একত্রিশ বৎসর কাল বরদা রাজ্যে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার পদোন্নতিতে বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি হইল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পরলোকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী—

ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী

দেবী” নব্বই বৎসর বয়সে গত ১৫ই আশ্বিন পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভারতের বীমা-জগতে



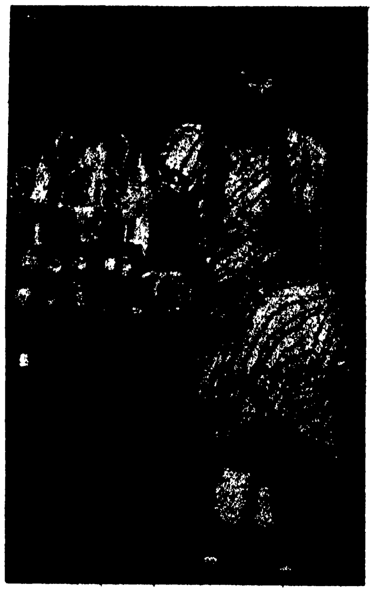
শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

সুপরিচিত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বোম্বাই প্রদেশে কাটাইয়াছিলেন, ফলে মারাঠী, গুজরাটী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের স্ত্রী-শিক্ষার অনুকূলে ও পর্দ্দা প্রথার বিরুদ্ধে জ্ঞানদানন্দিনী একসময় প্রবল আন্দোলন করিয়াছিলেন। মাতৃহারা দেবর রবীন্দ্রনাথকে পুত্রস্নেহে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও অন্যান্য পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতীয় ব্যবসায়ী ও আয়কর—

বাঙ্গালা প্রদেশে আয়কর ধার্য্য করিতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষ দেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেন তাহার প্রতিবাদে সম্প্রতি কলিকাতা শহরের বড় বড় ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হরতাল পালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিযোগ এই যে, ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানকে যে সব অসুবিধা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে সেই সব অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ইহা হইতে এই সত্যটাই প্রমাণিত হয় যে, যাঁহারা আয়কর ধার্য্য করেন তাঁহারা একের প্রতি এতটুকু সন্দেহ পোষণ করেন না, অপরের প্রতি দস্তুর মত সন্দেহ পোষণ করেন। এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হওয়া আবশ্যক এবং একযোগে প্রতীকারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যদি এই সকল প্রতিষ্ঠান ও শেয়ারের বাজার হরতালের ফলে বন্ধ থাকে তাহা হইলে নানা দিক দিয়াই দেশের সমূহ অনিষ্ট অনিবার্য্য; সুতরাং যাহাতে সব দিক বজায় রাখিয়া প্রতীকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় সেই চেষ্টাই সকলের একযোগে করা উচিত।

শ্রীমতী দীপ্তি মজুমদার গত বৎসর নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি



শ্রীমতী দীপ্তি মজুমদার

তিনি কথক ও কথাকলি নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

ভাগলপুর কলেজে সাহিত্য সম্মিলন—

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভাগলপুর কলেজে সাহিত্য সংঘের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনে সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলন শেষে শ্রীযুত নারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় ছাত্রগণ কর্তৃক দুইখানি ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনীত হইয়াছিল।

রাজবন্দী-সমস্যা—

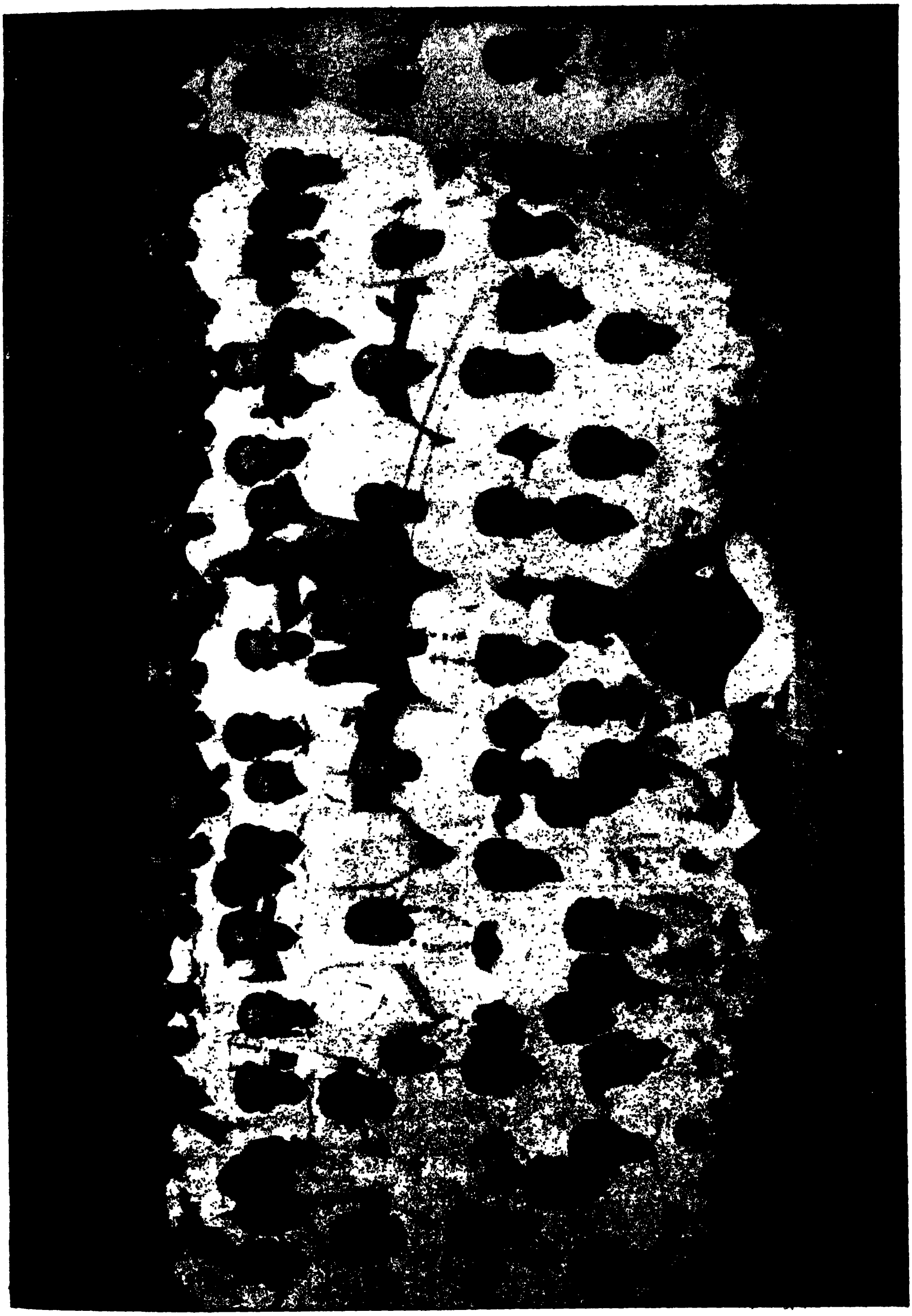
ভারতে রাজবন্দীসমস্যা পুনরায় গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমত, ভারতরক্ষার তাগিদ এবং দ্বিতীয়ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমনের ওজুহাত—এই উভয়ের যোগাযোগে রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারী বিবরণে জানা যায়, যুদ্ধারম্ভের সময় হইতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতরক্ষা আইনের বলে বিনা বিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা ১৭২৪ জন। ইহা ছাড়া যাঁহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তির সংখ্যাও ২০০৬ জন। তাছাড়া আবার বাঙ্গালা দেশের প্রতিই কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টিটা একটু বেশী! ইহার প্রমাণ গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা এক বাঙ্গালাতেই অর্দ্ধেকেরও বেশী অর্থাৎ—১৬১০ জন। এই রাজবন্দীদের ন্যায্য দাবী পূরণ না করায় দেউলী বন্দীশালায় প্রায় ২২৫ জন বন্দী অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। দেউলীর বন্দীদিগের অনশন ধর্ম্মঘটের ফলে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন, প্রতিবাদ চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও এই মর্ম্মে আলোচনা চলিতেছে। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি দূর করিবার জন্য অবিলম্বে সরকারের চেষ্টিত হওয়া দরকার।

বাঙ্গালায় নূতন অর্ডিন্যান্স—

ঢাকায় উপর্য্যুপরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা শাসক সম্প্রদায়ের অযোগ্যতারই পরিচয় দিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু এ দেশবাসীদের মনে করার উপর শাসক সম্প্রদায়ের শাসননীতির কিছুমাত্র মিল না থাকায় বিরোধ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার গবর্ণর ভারত শাসন আইনের ৮৮ ধারানুযায়ী 'বাঙ্গালায় উপদ্রববহুল অঞ্চল সম্পর্কিত অর্ডিনান্স' শীর্ষক একটি নূতন আইনজারি করিয়াছেন। এই অর্ডিনান্স অবিলম্বে (গত ৪ঠা নবেম্বর হইতেই) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নবলব্ধ আইনের বলে উপদ্রববহুল অঞ্চল হইতে পাইকারীভাবে জরিমানা ধার্য্য ও আদায় করিতে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। উপদ্রববহুল অঞ্চলে বে-আইনী কার্য্যকলাপের ফলে কেহ শারীরিক আহত হইলে কিংবা কাহারও সম্পত্তির ক্ষতি হইলে জরিমানা দ্বারা সংগৃহীত অর্থ হইতে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতেও সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অশান্তি দূর হোক ইহা সকলেরই কামনা, কিন্তু যে গুণ্ডামি দমন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, তাহা অহিংস নিরপরাধ জনগণের পক্ষে দমন করা যে সম্ভব নহে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ উপদ্রববহুল অঞ্চলের নিরপরাধ ব্যক্তিদেরও এই পাইকারী জরিমানার হাত হইতে নিষ্কৃতি মিলিবে না!

বলাইচাঁদ গোস্বামী স্মৃতি-পাঠাগার—

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' পরিচালনা করেন সেই সময় যে কয়জন বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন, পরলোকগত পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। গোস্বামী মহাশয় ছিলেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অন্যতম বংশধর এবং হিন্দুর শাস্ত্র, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি ছিলেন একজন স্বনাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ১৩১৮ সালে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে অসংখ্য পুস্তক অবহেলায় নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি ছয়ের পল্লীর কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় ও প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পরিচালনাধীনে পণ্ডিত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থায় তাঁহারই সংগৃহীত গ্রন্থ লইয়া একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই নূতন পাঠাগারটির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাগ্রহে কামনা করি।



ভাগলপুর কলেজে সাহিত্য-সম্মেলন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম-এ

বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোটগল্পের পটভূমিকা অন্বেষণ করিতে বসিলে রবীন্দ্রনাথের কথাই সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে ভাসিয়া ওঠে এবং তাঁহার ছোটগল্পের আলোচনা করিতে হইলে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা অমর হইয়া বিশ্ব-সাহিত্যে যে অক্ষয় কীর্ত্তি-সৌধটি রচনা করিয়াছে, ছোটগল্পের অসামান্য খ্যাতিও অঙ্গাঙ্গিভাবে তাহার সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের জনক বা উদ্ভাবক নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় অনেক ছোটগল্প রচিত হইয়াছে। তৎকালে উপন্যাস ও ছোটগল্পে কোন ভেদ না করিয়া বহু অজ্ঞাতনামা লেখক অগণিত ছোটগল্প রচনা করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাস ও ছোটগল্প স্বতন্ত্র বস্তু জ্ঞান করিয়া এবং রচয়িতার নাম প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছোটগল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। যদিও তিনি ছোটগল্পের আদি রচয়িতা বা স্রষ্টা নহেন, তথাপি তিনি ছোটগল্পের শৈশবাবস্থায় উহার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ছোট গল্পের সেই শৈশব যুগ হইতে শুরু করিয়া জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বাধিক ছোটগল্প রচনা করিয়াছেন।

এখন আমাদের আলোচ্য, রবীন্দ্রনাথের কোন্ গল্পটি বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার প্রথম ছোটগল্পরূপে অভিহিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রথম ছোটগল্পটির সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিব। ১২৮০ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে 'মধুমতী' নামে একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। প্রথমেই বলিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলির রচয়িতাদের নাম প্রকাশ পায় নাই। 'মধুমতী' গল্পটির সম্বন্ধে এই নিয়মটির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা গেল অর্থাৎ ইহার রচয়িতা গল্পটির নীচে "শ্রী পূঃ" এই সাঙ্কেতিক নামটি ব্যবহার করায় এই গল্পটিকে আর অজ্ঞাতনামা ছোটগল্পলেখকের রচনা বলিয়া পরিচয় দেওয়া সঙ্গত হবে না। বিশেষতঃ, পরে উক্ত সাঙ্কেতিক "শ্রী পূঃ" মহাশয়কে সমালোচকগণ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তিনিই বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম ছোট-গল্প রচয়িতার সম্মান পাইযাছেন।

ইহার পরবর্ত্তী ছোটগল্প—রবীন্দ্রনাথের "ঘাটের কথা"। ১২৯১ বঙ্গাব্দে ইহা প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও ভাষার ভিতর দিয়া জীবনের প্রকাশ-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে ইহা সাহিত্য-রসিকদের অন্তরে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

ছোটগল্পের আদিকালের আদি ছোটগল্পলেখক এডগার এলেন পো'র A Tale of Ragged Mountains নামে ছোটগল্পটি যে সকল গুণের প্রাচুর্য্যে প্রশংসিত, রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা'ও সেই মাধুর্য্যে মণ্ডিত।

'ঘাটের কথা'য় রবীন্দ্রনাথ কি প্রমাণিত করিতেছেন তাহা লক্ষণীয়।

"পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসরের মেয়ে মাথার সিঁদুর মুছিয়া আবার তাহার দেশের সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

কুসুমের মর্ম্মন্তুদ চিত্র আঁকিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখাইতে চান—হিন্দু সমাজের এই বাল্যবিবাহ দূষণীয়। কারণ উহা নারীজাতির সর্ব্বনাশকর। তাই কুসুমকে বাল-বিধবা করিয়া তিনি কুসুমের পরবর্ত্তী জীবনে দেখাইবেন যে, কুসুম কখনও সেই বৈধব্যের ব্রহ্মচারিণী জীবন পালনে সমর্থা হইবে না, সে নিশ্চয়ই যৌবন কালোচিত বহ্নিতে ঝাঁপ দিবে। কিন্তু তাঁহার রচনাকৌশলে বহুরূপী যে সন্ন্যাসীটি আসিলেন কুসুমের সম্মুখে, সে আর কেহ নহে—কুসুমেরই ছদ্মবেশী স্বামী। কুসুম জানিত, স্বামী মরিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মরে নাই, সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কুসুমকে পতিতা করিলেন না, সমাজকেও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন—বাল্য-বিবাহ কিরূপ দোষাবহ। কুসুম যে-সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইয়াছিল, সে কুসুমের স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি, তাহার স্বামী নহে। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার প্রকৃত স্বামী হইয়া কুসুমের মনের দৌর্ব্বল্য—সে যে ব্যভিচারিণী—লক্ষ্য করিয়া বলিল :

'আমাকে তোমায় ভুলিতে হইবে, আমি আজ এখান থেকে চলিলাম।'

ঘাটের প্রস্তরশিলা এই দুঃখের স্মৃতি বুকে খোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাই সে আজ আকাশে বাতাসে বলিতেছে—'হায় নারীর মন!'

কুসুম বুঝিল এই সন্ন্যাসীই তাহার স্বামী; কিন্তু সে অ-স্বামী ভজনে তাহাব নিকট পাপজ আত্মা নিবেদন করিয়াছিল—যেহেতু সে তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, প্রাণে মনে তাহাকে ভালবাসিযাছে। কিন্তু পবে যখন বুঝিল, এই সন্ন্যাসীই তাহার প্রকৃত স্বামী এবং তাহাকে পতিতা জানিয়া চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতেছে, তখন সে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জ্জনই শ্রেয় মনে কবিল।

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বাল্যবিবাহ ও বাল বিধবার শোচনীয় পরিণাম সমাজের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি আর্টের দোহাই দিয়া কুসুমকে অনাচারের কদর্য্য পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারিতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই বয়সের লেখনীও এমন সুযোগ সত্ত্বেও পঙ্কে প্রবিষ্ট হয় নাই।

এই ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি Parable of the Prodgial Son-এর উক্তির মতই সার্থক হইযাছে।

"ঘাটের কথা" মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প। ইহাতে যে সামাজিক ত্রুটির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ইহার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্পটির আলোচনা করিলাম। তাঁহাব ছোটগল্প-সমুদ্রের ইহা একটি উপল মাত্র।

মৃত্যু-সত্য

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

আমার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হবে যবে
তোমরা শিয়রে আসি, করো না ক্রন্দন;
পুষ্প-মাল্যে সাজায়ো না দেহটারে সবে,
প্রীতির মালিকা দিয়া করো না বন্ধন।

প্রাণহীন দেহটিরে বিছায়ে শয্যায়
মিথ্যা শোভাযাত্রা করা; আত্ম-তৃপ্তি লাগি'
নীরবে হৃদয় কোণে চাপিয়া ব্যথায়,
আমারে ভুলিয়া যেও—এই ভিক্ষা মাগি।

যদি পার, ধরণীর ধূলিকণা দিযা—
লেপন করিযা দিও, সর্ব্বাঙ্গ আমার;
কিবা ছিল, কি রাখিব, কিবা যাব নিযা?
ধূলি সত্য; অন্যসব তাহারই আধার।

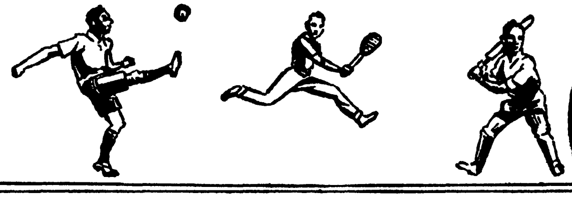
মৃত্যুর তোরণদ্বারে, মিথ্যা কাঁদা, মিথ্যা আড়ম্বর
বেঁচে থাকা স্বপ্ন, তাই, মৃত্যু সত্য আসে নিরন্তর!

শুনেছ কি মৃতের ক্রন্দন?

শ্রীপুষ্পাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনেছ কি মৃতের ক্রন্দন?
লেলিহান বুভুক্ষার নগ্নমূর্ত্তি
দেখেছ কি চোখে?
রাত্রিদিন অনুক্ষণ কামনায় শত রাগ আশা,
বৃশ্চিক্ দংশন সম
জানায় সে জীবনের তীব্র অভিশাপ;
জীবনের শৈলমূল করিয়া দাহন
পানপাত্র ভরি দিয়া বিষে—
শেষ হওয়া সঙ্গীতের সুর
থেমে যাওয়া রোদনের রেশ
ধৈর্য্যহীন দীনতার দান;
কঠিন আঘাত
হৃদয়ের মর্ম্মমূলে করিয়া সংঘাত
জানায় জানায় শুধু রুদ্ধ হাহাকার—
ব্যর্থ প্রেম মালিন্যের ভার;
সেই ক্লিষ্ট জীবনের যত সম্ভাবনা,
বুভুক্ষায় মৌন মূক শুধু!

খেলা-ধূলা





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রোভার্স কাপ ফাইনাল ঃ

১৮৯১ সাল থেকে রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। আই এফ এ শীল্ডের পরই রোভার্স কাপের জনপ্রিয়তা। ফার্ষ্ট ব্যাটেলিয়ান উষ্টার রেজিমেণ্ট প্রথম রোভার্স কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করে। খেলার দ্বিতীয় বছরেও তারা বিজয়ী হয়। এ পর্য্যন্ত সব থেকে বেশীবার কাপ বিজয়ের সম্মান পেয়েছে সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান মিডল্‌সেক্স রেজিমেণ্ট (১৮৯৭, ১৯২৪-২৬) এবং ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ান চেশায়ার রেজিমেণ্ট (১৯০২-১৯০৪, ১৯২৭)। বে-সামরিক দলের মধ্যে বাঙ্গালোর মুসলীম প্রথম বিজয় লাভ করে ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৮ সালে তারা দ্বিতীয় বার কাপ পায়। মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৪০ সালে কাপ বিজয়ী হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে তারা ১৯৩৭ সালের ফাইনালে বাঙ্গালোর মুসলীম দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ফাইনালে মহমেডান দল বাঙ্গালোর মুসলীম দলকে পরাজিত করে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। এই দুইটী বে-সরকারী দল ছাড়া ১৯২৩ সালে মোহনবাগান ক্লাব এবং ১৯৩৯ সালে হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট দল রানার্স-আপ্ হয়েছিল।

ওয়েলস্ রেজিমেণ্ট ২-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত ক'রে এবৎসরের কাপ বিজয়ী হয়েছে।

স্মরণ থাকতে পারে এবৎসরের আই এফ এ শীল্ড খেলায় বোম্বাইয়ের এই ওয়েলস্ রেজিমেণ্ট দলই কলকাতার ফুটবল মাঠে নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলা দেখাতে পারেনি বরং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আই এফ এ শীল্ড থেকে বিদায় নিয়েছিল।

রোভার্স কাপ ফাইনালে তারা কলকাতার ফুটবল চ্যাম্পিয়ান মহমেডান দলকে কেবল পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করায়নি, উচ্চাঙ্গ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়ও তারা দিয়েছিল। গত বৎসর বোম্বাই দল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ৩-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে পরাজিত হয়। তাছাড়া ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালেও উক্ত গোলের ব্যবধানে মহামেডান দল ওয়েলস্ রেজিমেণ্টের কাজে বিজয়ী হয়েছিল।

এবৎসরের ফাইনালে তারা প্রথম শ্রেণীর খেলা দেখিয়ে তাদের পূর্ব্ব পরাজয়ের গ্লানি দূর করে মহামেডান দলের উপর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। মাঠে প্রায় দশ সহস্র দর্শক দুইটী শক্তিশালী পুরাতন প্রতিদ্বন্দী দলের জয় পরাজয় দেখবার জন্য উপস্থিত ছিল। ওয়েলস্ রেজিমেণ্ট দলের খেলা বিজিত দল অপেক্ষা অনেক উন্নত হয়েছিল এবং মহমেডান দল সর্ব্বদিক থেকেই বিপক্ষ দল অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর খেলা দেখিয়েছিল। তাদের স্বাভাবিক ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় না পেয়ে সমর্থকেরা হতাশ হন। ওয়েলস্ রেজিমেণ্ট দলের রক্ষণভাগে ব্রোণ্ডি এবং বেলী মহমেডান দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের গোল করবার সমস্ত সন্ধান ব্যর্থ করেন। এই খেলোয়াড়দ্বয়ের খেলার সম্মুখে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের গতিবেগও যথেষ্ট হ্রাস পায়। নূরমহম্মদের স্বাভাবিক খেলা একেবারেই খোলেনি। আক্রমণভাগে একমাত্র রসিদের খেলারই নাম করা যায়। সৈনিক দলের আক্রমণভাগে ল্যাংটনকে নিঃসন্দেহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা চলে। অক্লান্ত পরিশ্রমে মাঠের চারিপাশ থেকে বল নিয়ে দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের গোল করবার সুযোগ দিয়েছেন। যথাসময়ে বলের আদান প্রদান তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য। রক্ষণ-ভাগের রাইট ব্যাক ব্রোণ্ডি এবং হাফব্যাক লাইনে বেলির খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোলে কালু খাঁ একাধিকবার পরাজিত হলেও কয়েকটি শক্ত সর্ট প্রতিরোধ করেন।

সিরাজুদ্দিন এবং জুম্মা খাঁ গোল রক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। রসিদ খাঁ পরিশ্রম করে খেলেছেন কিন্তু বাচ্চি খাঁ এবং মাসুম বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে কোনমতেই পেরে উঠেন নি। অন্যায় ভাবে পদচালনার জন্য মাসুম রেফারী কর্ত্তৃক সতর্কিত হন। খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাজমহম্মদকে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষকের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে মাঠ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হতে হ'য়েছিল।

খেলা আরম্ভের সাত মিনিটে হিল ল্যাংটনের সহযোগিতায় দলের প্রথম গোলটি করেন। ষ্টোন দলের সর্ব্বশেষ গোলটি দেন। এই গোলটির জন্যও ল্যাংটনের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল।

ওয়েলস্ রেজিমেণ্ট : উইলিয়ামস ; জেমস্ এবং ব্রোগ্ডি জোনস, ইভেন্স এবং বেলি ; মুর, ষ্টোন, ল্যাংটন, হিল এবং টমাস।

মহমেডান স্পোটিং : কালু খাঁ ; সিরাজুদ্দিন এবং জুম্মা খাঁ ; বাচ্চি খাঁ, রসিদ খাঁ এবং মাসুম ; নুরমহম্মদ, তাহের, রসিদ, সাবু এবং তাজমহম্মদ।

বাঙ্গলার ক্রিকেট ঃ

দীর্ঘদিন ধরে বেঙ্গল জিমখানা এবং বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের মধ্যে ক্রিকেট পরিচালনা ব্যাপার নিয়ে যে বিরোধ চলছিল সম্প্রতি তার অবসান হয়েছে। ফলে বেঙ্গল জিমখানা ও বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের মনোনীত প্রতিনিধিগণ বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেট পরিচালনা কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা করবেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেঙ্গল জিমখানা এই বিরোধে নেমেছিল তা সম্পূর্ণ সফল না হলেও এই পরিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গলা প্রদেশের ক্রিকেট ইতিহাস আজ নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ লাভ করল। পূর্ব্বে পরিচালনা কমিটিতে বাঙ্গালীর কোন ক্ষমতা ছিল না ; বর্ত্তমানে তাদের প্রাধান্য পুরামাত্রায় রয়েছে। বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেট খেলার উৎকর্ষ লাভের জন্য তাঁরা যদি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন তা হলে আশার কথা।

কিন্তু এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে বিশেষ যে আগ্রহশীল তা আমাদের মনে হয় না। আন্তঃপ্রাদেশিক রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা অল্প দিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে। বাঙ্গলা প্রদেশ ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বিহার প্রদেশের সঙ্গে। অথচ এখনও খেলোয়াড় বাছাই করে তাঁদের খেলায় অভ্যস্ত করবার কোনরূপ ব্যবস্থা দেখছি না। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলি কিন্তু খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্রিকেট খেলার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য দলকে শক্তিশালী ক'রে প্রতিযোগিতায় যোগদান করা। বোম্বাই প্রাদেশিক এসোসিয়েশন তাঁদের বাছাই ক্রিকেট খেলোয়াড়দের একত্র করে নিয়মিত ভাবে খেলা অনুশীলন করতে বাধ্য করেছেন। মহারাষ্ট্র দল যথেষ্ট শক্তিশালী। গত দু বৎসর তারা রঞ্জি কাপ বিজয়ী হয়েছে। এই দলও খেলোয়াড়দের খেলায় অভ্যাস রাখবার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রিকেট দলের সঙ্গে খেলেছে। যুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ, সিন্ধু, বিহার প্রভৃতি সকল প্রদেশই ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একমাত্র বাঙ্গলাদেশই এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন ক'রেছে। বাঙ্গলার ক্রিকেট দল যে শক্তিশালী তা নয় তাছাড়া শক্তিশালী দলেরও খেলায় অনুশীলন প্রয়োজন। এই অবস্থায় পরিচালকমণ্ডলী যদি প্রতিযোগিতার সময়ে সময়ে খেলোয়াড় মনোনয়ন ক'রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করেন তাহলে তার ফল যে মোটেই ভাল হবে না এ. আমাদের একাধিকবারের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আশা করি পরিচালকমণ্ডলী বাঙ্গলা ক্রিকেট দলের সম্মান রক্ষার জন্য এ বিষয়ে মনোযোগী হবেন।

আর একটি ব্যাপারে এসোসিয়েশনের বিশেষতঃ জিমখানার অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেছে। তার উল্লেখ না করলে তাঁদের এই কাজের সমর্থন করা হয়। দুঃখের বিষয় যে, বেঙ্গল জিমখানার অনুমোদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা এসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান স্কুলস স্পোর্টস এই তিনটি শক্তিশালী ক্রিকেট প্রতিষ্ঠান থেকে বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনে কোন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় নি অথচ এঁরা সকলেই বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েসনের সঙ্গে বিরোধিতার সময় বেঙ্গল জিমখানাকে একান্ত ভাবে সমর্থন করে এসেছেন। নিকট ভবিষ্যতে আমরা আশা করি এই তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করতে এসোসিয়েশন কোনরূপ দ্বিধা বোধ করবেন না। এঁদের সহযোগিতায় এসোসিয়েশনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ছাড়া কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হবে না।

বর্ত্তমান বৎসরের বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীর নাম :

সভাপতি : মিঃ জে সি মুখার্জ্জি ; সহ-সভাপতি : মিঃ এ এ লেসলি ; সম্পাদক : মিঃ পি গুপ্ত ; কোষাধ্যক্ষ : অমরনাথ ঘোষ।

টেবল টেনিস ঃ

বেঙ্গল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের সকল বিভাগের খেলা শেষ হয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে মাদ্রাজের ভি শিবরামন ১৮-২১, ২১-১৪, ১৬-২১, ২১-১৮, ২১-১২, গেমে আর ই মরিটনকে পরাজিত করেছেন। শিবরামন গত বৎসর অল্ ইণ্ডিয়া টুর্ণামেণ্টের সিঙ্গলসের ফাইনালে পরাজিত হন। উপর্যুপরি দু'বৎসর সিঙ্গলস বিজয়ী হয়েছে অবাঙ্গালী খেলোয়াড়। গত বৎসর বোম্বাইয়ের কে এইচ্ কাপাদিয়া সিঙ্গলস বিজয়ী হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ বৎসরের মত গত বৎসরও আর ই মরিটন ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন।



গাউস মহম্মদ

জুনিয়ারদের সিঙ্গলসে : কুমার ঘোষ ২১-১৮, ১৭-২১, ২১-১৮, ২১-১২ গেমে অমিয় চক্রবর্ত্তীকে পরাজিত করেছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে : মিস আর নাগ ১৮-২১, ২১-১৯, ২১-২০, ২১-১৫ গেমে মিস এন এজরাকে পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলসে : শিবরামন এবং হোসেন ২১-১৬, ১-১৬, ১৮-৩১, ১৯-২১, ২১-১২ গেমে গুহ এবং রায়কে পরাজিত করেন।

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা ঃ

ভারতের লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের র‍্যাঙ্কিং কমিটি ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ১৯৪১-৪২ সালের ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রকাশ করেছেন।

পুরুষ : (১) গাউস মহম্মদ (২) ইফতিকার আমেদ (৩) এস এস আর সোহানী (৪) দিলীপ বসু (৫) ওয়াই সিংহ

মহিলা : মিস্ লীলা রাও (২) মিস ডুবাস (৩) মিস হাজী এবং মিসেস সি ম্যাসে

'এ' ক্লাস : সি বার্কার ; জে এম মেটা ; খসু সেন ; সোহন লাল এবং এ সিংহ।

১৯৪০-৪১ সালের পুরুষদের তালিকায় গাউস মহম্মদ এবং ইফতিকার আমেদ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। গত বৎসরের চতুর্থ স্থান অধিকারী এস এস আর সোহানী এবার তৃতীয় স্থানে এসেছেন। বাংলার দিলীপ বসু এই সর্ব্বপ্রথম ক্রমপর্য্যায় তালিকায় স্থান পেয়েছেন। যুধিষ্ঠির সিংহ গতবারে তৃতীয় স্থানে ছিলেন, এবার নেমে গেছেন পঞ্চমে।

মিস লীলা রাও এ বৎসরও মহিলাদের প্রথম স্থান পেয়েছেন। মিস ডুবাস, মিস হাজী এবং মিসেস সি ম্যাসে এঁরা গত বৎসর কেউ ক্রমপর্য্যায় তালিকায় স্থান পান নি। এঁদের স্থান ছিল 'এ' ক্লাসে।



লীলা রাও

ইংলণ্ডে লন টেনিস ঃ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্র কো পে ক্রীড়া জগতের অবস্থা শোচনীয় আকার নিয়েছে। বিমান আক্রমণের হাত থেকে টেনিস ট্রফিগুলি রক্ষার জন্য ক্রীড়ামোদিরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে ইংলিস লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের কোন কোন ট্রফি লণ্ডনের মাটির তলার কোন না কোন স্থানে সু র ক্ষি ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উইম্বলডন ট্রফিগুলি নেই। সেগুলি অন্যত্র কোন নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ডে ভি স কাপ অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ায় রয়েছে। কিন্তু হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়ানসীপ, কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ানসীপ, এবং জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান সীপের খেলাগুলি পুনরায় আরম্ভ হলে হয়ত নূতন ট্রফির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যুদ্ধের জন্যে মেলবারী লন্ টেনিস ক্লাবের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে।

পৃথিবীর লন্ টেনিস খেলোয়াড়রা এই সংবাদ শুনে শোক প্রকাশ করবেন। ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়ানসীপের পরই এদের পরিচালিত হার্ড কোর্ট টুর্ণামেণ্টের খ্যাতি ছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতই মেলাবী ক্লাব বোমা বর্ষণের ফলে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষার জন্য জমির মালিক সামান্য মাত্র জমির উপর ভাড়া ধার্য্য করলেন কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিকে চালনা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠল। সকলেই আশা করছেন যুদ্ধ বিরতির পর ক্লাবের দ্বার নব পর্য্যায়ে উদ্‌ঘাটন করা হবে।

লণ্ড্রী ব্যবসায়ে ডোনাল্ড বাজ ও সিডনি উড ঃ

ভূতপূর্ব্ব আমেরিকান এবং উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ডোনাল্ড-বাজ সম্প্রতি তাঁর পৃথিবীর পেশাদারী টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ হারিয়ে লণ্ড্রী ব্যবসায়ে মনোযোগ দিয়েছেন। ১৯৩১ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান সিডনি উড তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার।

টেনিসে পেশাদার ও সখের খেলোয়াড় ঃ

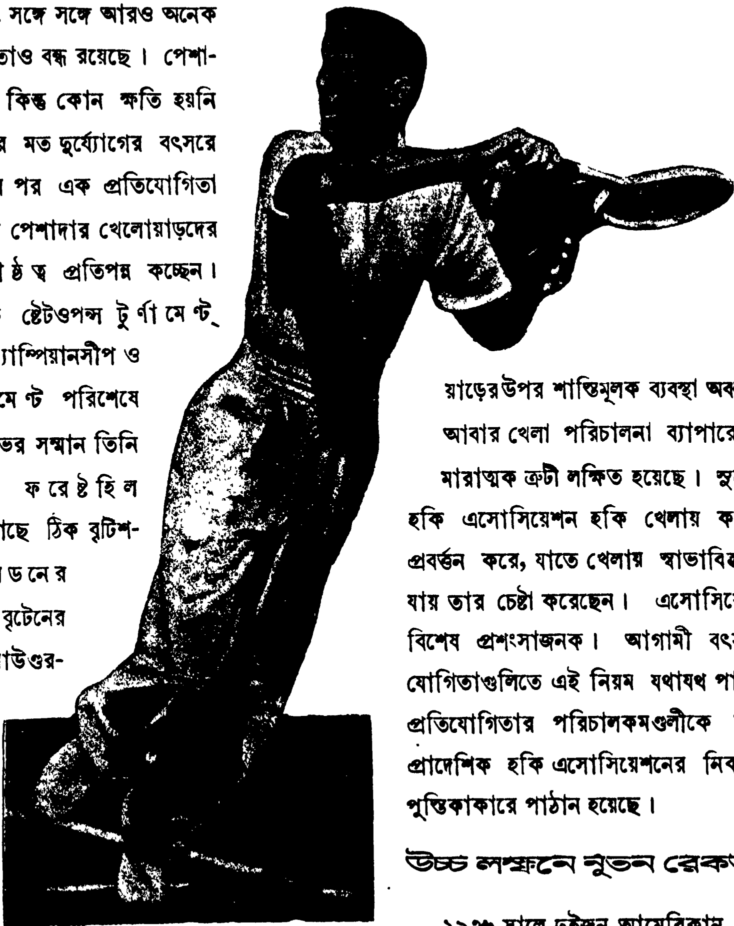
ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর অন্য কোথাও পেশাদার এবং সখের টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা হয় নি। নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশন এই দুই শ্রেণীর খেলোয়াড়দের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে টেনিস মহলে সাড়া এনে দিয়েছেন। এইরূপ খেলার ব্যবস্থার জন্য তাঁরা আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার টেনিস এসোসিয়েশনের কাছ থেকে অনুমতিও গ্রহণ করেছেন। ইউরোপের মহাযুদ্ধের জন্য অনেক স্থানের টেনিস এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব নেই। সেই কারণে এসোসিয়েশনের কাছ থেকে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। মোটের উপর তাঁরা এই দুই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অনুমতি পেয়েই সম্প্রতি পেশাদার এবং সখের খেলোয়াড়দের একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যেই এসোসিয়েশন সখের খ্যাতনামা খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ, ইফতিকার আমেদ, এস এল আর সোহানী প্রভৃতিকে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে সিরাজুল হক, রামসেবক আলাবক্স, মুরাদ খাঁ প্রভৃতিও নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। এই খেলা কোথায় এবং কোন তারিখে হবে তার এখনও কোন সঠিক খবর প্রকাশিত হয় নি। ভারতীয় টেনিস এসোসিয়েশনের অনুকরণে পৃথিবীর অন্যান্য টেনিস প্রতিষ্ঠানও এইরূপ খেলার ব্যবস্থা করবেন বলে আমরা আশা করছি।

একমাত্র টেনিস খেলা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য খেলাধূলায় পেশাদার এবং সখের খেলোয়াড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোন বাধা নেই। টেনিস এসোসিয়েশনগুলিই কেবল এতদিন তাদের আভিজাত্য বজায় রেখে সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তুলে রেখেছেন। আশা করি সেই ব্যবধানের প্রাচীর নিকট ভবিষ্যতে ভূমিসাৎ করে উভয় সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়দের মিলিত হয়ে খেলবার সুযোগ দিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের

টেনিস এসোসিয়েশনগুলি কোনরূপ কার্পণ্য প্রকাশ করবেন না।

ফ্রেড পেরী ঃ

যুদ্ধের ফলে সখের টেনিসখেলা প্রায় বন্ধ রয়েছে ব'ললেও চলে। কেননা সখের টেনিস খেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ উইম্বলডন নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বড় বড় প্রতিযোগিতাও বন্ধ রয়েছে। পেশাদার খেলোয়াড়দের কিন্তু কোন ক্ষতি হয়নি এবং ১৯৪১ সালের মত দুর্য্যোগের বৎসরে ফ্রেড পেরী একের পর এক প্রতিযোগিতা জয় ক'রে জগতের পেশাদার খেলোয়াড়দের ভেতর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কচ্ছেন। প্রথমে ইউনাইটেড ষ্টেটওপন্স টুর্ণামেণ্ট, তারপর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ ও রাউণ্ডরবিন টুর্ণামেণ্ট পরিশেষে ইষ্টার্ণ টুর্ণামেণ্ট লাভের সম্মান তিনি অর্জ্জন ক'রেছেন। ফরেষ্টহিল আমেরিকানদের কাছে ঠিক বৃটিশদের কাছে উইম্বলডনের মতই প্রিয় হ'লেও বৃটেনের যুদ্ধে সাহায্য কল্পে রাউণ্ডরবিনের মত প্রতিযোগিতা চালাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। টিলডেন, পেরী, বাজ ও রিচার্ডসনের মত পেশাদার খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে দর্শকদের আনন্দবর্দ্ধন ক'রেছিলেন। কিন্তু পেরীর খেলা এবার অতুলনীয়। এই প্রতিযোগিতা জয়লাভ ক'রতে তাঁকে হারাতে হ'য়েছে বাজ, টিলডেন ও রিচার্ডসনের মত খেলোয়াড়দের। বাজের সহযোগিতায় পেরী সমস্তগুলি ডবলস্ খেলাও জয়লাভ ক'রেছেন।



ফ্রেড পেরী

হকির নূতন নিয়মাবলী ঃ

হকি খেলার নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে খেলোয়াড়রা যেভাবে অখেলোয়াড়ী আচরণের পরিচয় দিয়ে আসছিলেন তাতে ভারতীয় হকি এসোসিয়েসন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। গত বৎসর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খেলায় হকি খেলোয়াড়দের আচরণ চরমে পৌছায়। এই অখেলোয়াড়ী আচরণের পরিচয় দেওয়ার জন্য একাধিক খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড়ের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আবার খেলা পরিচালনা ব্যাপারে আম্পায়ারগণের মারাত্মক ত্রুটী লক্ষিত হয়েছে। সুখের কথা ভারতীয় হকি এসোসিয়েশন হকি খেলায় কয়েকটি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করে, যাতে খেলায় স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষা করা যায় তার চেষ্টা করেছেন। এসোসিয়েশনের এই কার্য্য বিশেষ প্রশংসাজনক। আগামী বৎসরের হকি প্রতিযোগিতাগুলিতে এই নিয়ম যথাযথ পালনের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলীকে বাধ্য করা হবে। প্রাদেশিক হকি এসোসিয়েশনের নিকট এই নিয়মগুলি পুস্তিকাকারে পাঠান হয়েছে।

উচ্চ লম্ফনে নূতন রেকর্ড ঃ

১৯৩৬ সালে দুইজন আমেরিকান এ্যাথেলেট জনসন ও অলব্রিটন উচ্চ লম্ফনে ৬ ফিট ৯¾ ইঞ্চি অতিক্রম করে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি অরিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের লে স্টিয়ার্স ৬ ফিট ১০-⅛ ইঞ্চি অতিক্রম ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেছেন।

পোলভল্টে নূতন রেকর্ড ঃ

১৯৪০ সালে জুন মাসে ওয়ারমারদাম ১৫ ফিট ১⅛ ইঞ্চি অতিক্রম করে পৃথিবীর পোলভল্টে যে নূতন রেকর্ড

ক'রেছিলেন সম্প্রতি ১৫ ফিট ৫¾ ইঞ্চি অতিক্রম ক'রে তিনি তাঁর পূর্ব্বোক্ত রেকর্ড ভঙ্গ ক'রেছেন।

জো লুই ঃ

ষাটহাজার দর্শকের সামনে জো লুই নিউইয়র্ক পোলো মাঠে ক্যালিফোর্ণিয়ার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা নোভাকে পরাজিত ক'রে স্বীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। খেলা হবার কথা ছিল পনোর রাউণ্ড; ষষ্ঠ রাউণ্ডে জোকে বিজয়ী ব'লে ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৭ সালে জুন মাসে জো, জেমস ব্রাডডককে পরাজিত ক'রে পৃথিবীর হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান হন। পরে এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁকে আঠারবার লড়তে হয়।



জো লুই

নোভা সম্প্রতি ম্যাক্স বেয়ারকে পরাজিত করার সম্মান অর্জ্জন করেন এবং জ্যাক ডেমপসের মতে তিনিই নাকি 'শ্বেতজাতীর আশা' যাঁর কাছে জোর পরাজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়ে নোভার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। খেলার পরে তিনি স্বীকার ক'রেছেন যে, এরকম দুরবস্থা তাঁর জীবনে কখন হয়নি। উক্ত খেলাটিতে টিকিট বিক্রয় হ'য়েছিলো ৫৮৩,৪২১ ডলারের উপর। জো পেয়েছেন ১৯৩,২৭৪ আর নোভা ৭১,৭৬৫।

মহারাষ্ট্র ও বরদা ঃ



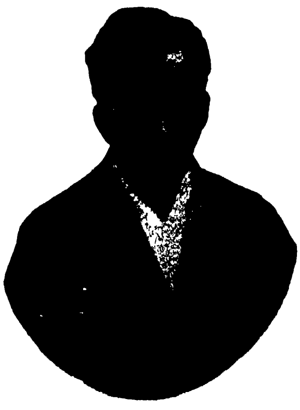
সি এস নাইডু



হাজারে

রণজিট্রপি বিজয়ী ভারত বিখ্যাত মহারাষ্ট্র দল এক প্রীতি সম্মেলন খেলায় বরদার নিকট ১৯৪ রানে পরাজিত

হ'য়েছে। সমগ্র খেলার ভেতর হাজারের ব্যক্তিগত কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। তিনি উভয় ইনিংসে মাত্র ৭১ রানে ১২টি উইকেট পান তার ভেতর দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যাটট্রিক ক'রেছিলেন। এরপরই ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সি এস নাইডুর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ২ ইনিংসে ৯৫ রান করেন এছাড়া ৭টি উইকেট পেয়েছেন। মহারাষ্ট্রের এক যাদব ছাড়া আর কারো খেলা উল্লেখযোগ্য হয়নি। মহারাষ্ট্রের স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে তাদেরই ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় হাজারে বিপক্ষ দলে যোগদান করার ফলে এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পড়িতে হয়।



নাওমল

মহারাষ্ট্র দল পুনরায় পরাজিত ঃ

মহারাষ্ট্রদল করাচীতে সিন্ধুদলের সহিত খেলায় ১৬০

পরাজিত হ'য়েছে। প্রথম ইনিংসে তাহাদের ব্যাটিংয়ে অকৃতকার্য্যতাই এই পরাজয়ের কারণ। সিন্ধু প্রথমে ব্যাট ক'রে ২৭৩ রান করে; সর্ব্বোচ্চ রান করেন মোবেদ ৬০। মহারাষ্ট্রের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১১০ রানে। মোবেদ ও নওমল যথাক্রমে ২৫ ও ৪৫ রানে ৪টি ক'রে উইকেট পান। সিন্ধুর ২য় ইনিংসে ৩২০ রান উঠে। সর্ব্বোচ্চ রান করেন গিরিধারী; তিনি মাত্র ৭ রানের জন্ত সেঞ্চুরী ক'রতে পারেন নি। কিষেণ চাঁদের ৭৪ ও নওমলের ৬৬ রানও উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৩ রান করে। চতুর্থ ইনিংসের মাঠে এত বেশী রান তোলা যথেষ্ট কৃতিত্ব। প্রো: দেওধর দলের সর্ব্বোচ্চ রান তোলেন ৬৭।



মোবেদ

গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ ঃ

গঙ্গা পারাপার প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। বোম্বাইয়ের কয়েকজন সাঁতারু প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। ফলাফল দেওয়া হ'ল: ১ম—শম্ভু সাহা; ২য়—ভূপেন সাধুখান; ৩য়—রাজারাম সাহু; ৪র্থ—জে আর ঝাবওয়ালা (বোম্বাই); ৫ম—এস বি ব্যানার্জ্জি; ৬ষ্ঠ—বি এন পাতিল (বোম্বাই); ৭ম—সুধীর চ্যাটার্জ্জি।

বাঙ্গালী সাঁতারুদের কৃতিত্ব ঃ

বোম্বাই থেকে আগত ভিক্টোরিয়া সুইমিং বাথের সাঁতারুদের সঙ্গে বাঙ্গালী সাঁতারুদের কয়েকটি বিষয়ে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী সাঁতারুগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

সন্তরণের ফলাফল: ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল; প্রথম—শচীন নাগ (হাটখোলা); দ্বিতীয়—দিলীপ মিত্র (বাঙ্গলা); তৃতীয়—রাজারাম সাহু (বাঙ্গলা)। ১ মি: ২/৪/৫ সে:।

৮০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল; প্রথম—মণীন্দ্র চ্যাটার্জ্জি (বাঙ্গলা); দ্বিতীয়—শর্ব্বানী চ্যাটার্জ্জি (বাঙ্গলা); তৃতীয়—বি এন প্যাটেল (বোম্বাই)। সময়—১২ মি: ৩৩/২/৫ সে:।

১০০ মিটার বুক সাঁতার; প্রথম—হরিহর ব্যানার্জ্জি (বাঙ্গলা); দ্বিতীয়—অশোক দে (বাঙ্গলা); তৃতীয়—সামু চ্যাটার্জ্জি (বাঙ্গলা)। সময়—১ মি: ২৫/৩/৫ সে:।

ডাইভিং: আশু দত্ত (বাঙ্গলা), গোপী দে (বাঙ্গলা) ও এস রাতেনা (বোম্বাই) ডাইভিংয়ের কৌশল দেখান।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "কৃষ্ণা" ১৷৽, "শ্মশান ঘাট" ২৲
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দরিদ্রের দাবী"—২৲, "দুর্গে দুর্গতি নাশিনী"—২৲
রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম, এ প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "বালিকা ব্রহ্মজ্ঞা—শ্রীশ্রীশোভা মা"—৷৵৽
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ছদ্মবেশী"—২৷৽
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য-রোমাঞ্চ "রাত্রির যাত্রী"—৷৽
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "বিজয়-অভিযান"—৷৽
শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গীতাভিনয় "নবাব সিরাজদ্দৌলা"—১৷৽
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "যুগের দাবী"—২৲
শ্রীনন্দি শর্ম্মা প্রণীত রঙ্গকাব্য "কাশীর কিঞ্চিৎ"—৸৽
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "চাঁদ ও চকোর"—২৲
আবুল হাসানাৎ প্রণীত "সচিত্র মাতৃমঙ্গল জন্মবিজ্ঞান ও সুসন্তান লাভ"—২৸৽
শ্রীসুবিমল সরকার প্রণীত ছায়াভাষ নাটিকা "ধোপার পাট"—১৷৽
কলেজ বয় প্রণীত রহস্য-কাব্য "ব্ল্যাক বোর্ড"—১৷৽
সুবোধ ঘোষ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ফসিল"—১৷৽
শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত প্রণীত দার্শনিক গ্রন্থ "মৃত্যুর পরে ও পুনর্জ্জন্মবাদ"—২৲
শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত উপন্যাস "সহযাত্রিণী"—২৷৽
শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "মদন-মোহন"—১৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "পঞ্চশরের কীর্ত্তি"—১৸৽
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বহ্নিবলয়"—৩৲
শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন প্রণীত "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (৩য় খণ্ড)—প্রাচীন ভারত"—২৲
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত শিশুপাঠ্য "স্বর্গের দেবতা"—৷৵৽
শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "ঋষি অরবিন্দ"—৷৽
শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য রোমাঞ্চ গ্রন্থ "রোমাঞ্চের দেশে"—৷৽
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রণীত রঙ্গ-নাট্য "ব্ল্যাক্ আউট্"—৸৽
শ্রীমৃণালনাথ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "মনের খেলা"—২৲
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "দানবীর কার্ণেগী"—৷৽
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ছেলেদের বার্ষিকী "সোণালী ফসল"—১৷৽
শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী প্রণীত "মর্ত্ত্যে দেবলীলা"—১৲
শ্রীশামুক প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "ছেলে ধরা সার্কাস"—৷৵৽
শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ভাঙা দেউলের দেবতা"—১৷৽
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "ছায়া কালো কালো"—৷৽
শ্রীবিজয়কুমার বসু প্রণীত "পরিশেষে"—১৷৽
কৃষ্ণদয়াল বসু প্রণীত "এন্ডারসেনের গল্প"—১৲

—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

ঊনত্রিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ় ১৩৪৮—অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

সম্পাদক—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স